নতুন সিলেবাস
৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা

১০০ নম্বরের জন্য

প্রফেসর'স

বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত



প্রফেসর'স প্রকাশন

নতুন সিলেবাস
৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা

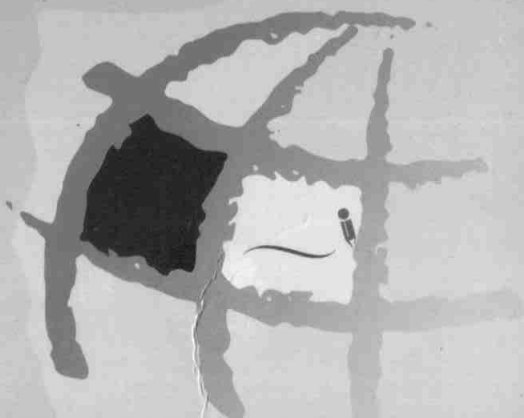
১০০ নম্বরের জন্য

প্রফেসর'স

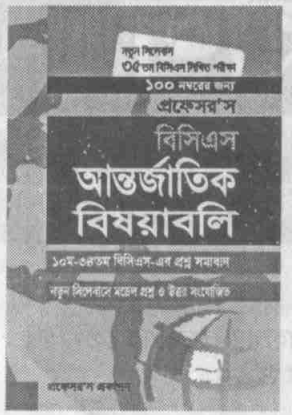
বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত



প্রফেসর'স প্রকাশন



প্রফেসর'স

বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৭/১ দ্বিতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রক : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৩৩০২৯

প্রচ্ছদ : রফিক উল্যাহ, দি ডিজাইনার

পরিবেশক : বর্ণালী বইঘর, ৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ০১৭১২ ২২৩৮৮৩

মূল্য : ৯০০ টাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭

পঞ্চদশ সংস্করণ
মে ২০১৫

Professor's BCS Antorjatik Bisoeaboli
Published by Jashim Uddin
Professor's Prokashon, 37/1 (1st Floor)
Banglabazar, Dhaka 1100
Phone : Office 9584436
Sales Center 7125054, 9533029
Email : pp@professorsbd.com
/professorsprokashonbd
Price : 900.00 Taka

বইটি সম্পর্কে

সিলেবাস উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময় ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নও একটি স্বাভাবিক বিষয়। বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক, মানসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৩৫তম বিসিএস থেকে নতুন নিয়মে, নতুন সিলেবাসের নির্দেশনায় ও নতুন মানবণ্টনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী জেনারেল ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পরীক্ষার্থীদের পূর্বের মতো ১০০ নম্বরের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে পূর্বের মতো ১০০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে কিন্তু নতুন সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনে বহু নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করায় আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির জন্য প্রকাশিত বইটির গুরুত্বও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য না রেখে বাজারে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে গৎবাঁধা কিছু বিষয়কে এলোমেলোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র, পরীক্ষার্থীদের উচিত বই ক্রয়ের আগে সিলেবাসের সাথে সূচিপত্র মিলিয়ে অতঃপর বইটি ক্রয় করা। একমাত্র আমরাই বিষয়টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে প্রকাশ করেছি **প্রফেসর'স বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি** বইটি।

বইটির বিশেষত্ব

- ⊙ ১০ম থেকে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সমাধান।
- ⊙ নতুন সিলেবাসের আলোকে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর।
- ⊙ বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যালোচনায় সাল নির্দেশ।
- ⊙ বিষয় বিশেষজ্ঞ ও বিসিএস ক্যাডারদের দ্বারা অধ্যায় বিন্যাস।
- ⊙ নতুন সিলেবাস ও বিগত বিসিএস প্রশ্ন পর্যালোচনায় অধ্যায়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকা সন্নিবেশ।
- ⊙ প্রতিটি প্রশ্নে সর্বশেষ ও নির্ভুল তথ্য সন্নিবেশের চেষ্টা।
- ⊙ বিসিএস ও পদোন্নতি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন উচ্চতর চাকরি পরীক্ষার মান অনুযায়ী প্রশ্ন নির্বাচন।
- ⊙ অধ্যায়ের গুরুত্ব ও সাম্প্রতিক আলোচিত বিষয়াবলির প্রশ্ন সন্নিবেশ।

প্রফেসর'স প্রকাশন-এর বিসিএস সিরিজের বইগুলো বিগত দেড় যুগ ধরে পরীক্ষার্থীদের কাছে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত। পূর্বের জনপ্রিয়তা এবং আপনাদের সাফল্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত আমাদের এ বইগুলোতেও সমাবেশ ঘটানো হয়েছে বহু মেধাবী, সফল ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ছাপ। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইটি আপনাদের সাফল্য অর্জনে যথাযথ সাহায্য করবে। আপনাদের জন্য রইল আমাদের শুভ কামনা, সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

Syllabus

INTERNATIONAL AFFAIRS

Total Marks 100

(For both General and Technical/Professional Cadres)

Brief Description

International Affairs is a compulsory paper for candidates of competitive examinations under the Public Service Commission, Bangladesh and applicable to both general professional cadre. This paper deals with conceptual issues and actors in the study of international affairs. It starts with a basic understanding of international affairs, its nature and evolution. It focuses on both conceptual and empirical issues in international affairs. Under this paper basic concepts and theories such as power, balance of power, realism, liberalism/neo-liberalism, foreign policy, security, trade, and environment will be addressed. The empirical focus of the paper is on understanding bilateral and multilateral relations, processes, functions, and politics of regional and global institutions. The paper is divided into two sections : conceptual and empirical issues.

Objective

The paper strives to understand a basic knowledge about international affairs. It aims to examine whether the candidates are well equipped with the key concepts, perspectives and theories for explaining global phenomena to deal with policy matters effectively. Another purpose of the paper is to examine analytical capacity of the candidates about global issues and events that are closely linked with domestic arena.

Proposed Distribution of Marks :

1. Short Conceptual Notes : 10 out of 12 — $10 \times 4 = 40$
2. Analytical Questions : 3 out of 4 questions — $3 \times 15 = 45$
3. Problem-solving question — $1 \times 15 = 15$

Section A : Conceptual Issues

1. **Introduction to International Affairs :** Significance of international affairs; meaning and scope of international affairs; linkage between international affairs and international politics.
2. **Actors in the World :** Modern state, types of state, sovereignty, non-state actors, international institutions, relations between state and non-state actors.
3. **Power and Security :** Power, national power, balance of power, disarmament, arms control, geopolitics, terrorism.
4. **Major Ideas and Ideologies :** Nationalism, imperialism, colonialism, neo-colonialism, post-modernism, globalization and new world order.
5. **Foreign policy and Diplomacy :** concepts of foreign policy and diplomacy, decision-making process, determinants of foreign policy, diplomatic functions, immunities, and privileges.
6. **International Economic Relations :** International trade, free trade, protectionism, foreign, aid, debt crisis, foreign direct investment (FDI), financial liberalization, regionalism, regionalization, North-South gap, global poverty, MDGs
7. **Global Environment :** Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy.

Section B : Empirical Issues

1. **The United Nations System :** The UN and its organs, importance and limitations of the UN, Reforms of the UN, Role of the Security Council, UN Peacekeeping and peace-building functions, Human rights agenda, Environmental agenda, International Court of Justice, and Women empowerment.
2. **Foreign Relations of Major Powers :** USA, Russia, UK, China, France, Germany, India, Japan etc.
3. **Global Initiative and Institutions :** World Bank, IMF, ADB, G8, G-77, WTO, Kyoto Protocol, COP etc.
4. **Regional Institutions :** SAARC, BIMSTEC, EU, ASEAN, NATO, APEC, OIC, AU, GCC.
5. **Major Issues and Conflicts in the World :** The Palestine Problem, the Arab Spring, the Kashmir Issue, the Syrian Crisis, Persian Gulf Conflict, nuclear issue and Iran, the North Korean issue, territorial disputes in Southeast and East Asia, Nuclear proliferation and other contemporary issues.
6. **Politics in South Asia :** India-Pakistan relations, Bangladesh-India relations, regional integration, water dispute, border problems and terrorism.
7. **Bangladesh in International Affairs :** Major achievements, challenges, future directions.

Sections C : Problem-solving

The candidates may be asked to come up with an analysis of a problem and its solution on any aspect of global developments and security issues, such as trade, climate change, foreign aid, arms proliferation etc.

সূচি

BCS প্রশ্ন ও সমাধান : ১০ম - ৩৪তম

- ৩৪তম বিসিএস ২০১৪ ..... ০৩
- ৩৩তম বিসিএস ২০১২ ..... ১৭
- ৩২তম বিসিএস ২০১২ (বিশেষ) ২১
- ৩১তম বিসিএস ২০১১ ..... ২৬
- ৩০তম বিসিএস ২০১১ ..... ৩২
- ২৯তম বিসিএস ২০১০ ..... ৩৮
- ২৮তম বিসিএস ২০০৯ ..... ৪৩
- ২৭তম বিসিএস ২০০৬ ..... ৪৭
- ২৫তম বিসিএস ২০০৫ ..... ৫০
- ২৪তম বিসিএস ২০০৩ ..... ৫৬
- ২৩তম বিসিএস ২০০১ (বিশেষ) ৬২
- ২২তম বিসিএস ২০০১ ..... ৬৬
- ২১তম বিসিএস ১৯৯৯ ..... ৭১
- ২০তম বিসিএস ১৯৯৯ ..... ৭৭
- ১৮তম বিসিএস ১৯৯৮ ..... ৮২
- ১৭তম বিসিএস ১৯৯৬ ..... ৮৬
- ১৫তম বিসিএস ১৯৯৪ ..... ৮৯
- ১৩তম বিসিএস ১৯৯২ ..... ৯৩
- ১১তম বিসিএস ১৯৯১ ..... ৯৭
- ১০ম বিসিএস ১৯৯০ ..... ১০২

Section A Conceptual Issues

অধ্যায় - ০১

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ধারণা
Introduction to International Affairs

Syllabus — Introduction to International Affairs : *Significance of international affairs; meaning and scope of international affairs; linkage between international affairs and international politics.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ০৪
অথবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

সূচি

০২. 'সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব' সম্পর্কিত থিসিসের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে? *[২৪তম বিসিএস]* ০৮

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝেন? ১২
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন। ১২
গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। ১২

০৪. ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়? ১৫
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন। ১৫

০৫. ক. আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি? ১৭
খ. আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন। ১৭

০৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। ২১

০৭. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মডেল হিসেবে আন্তঃসভ্যতা সংলাপের ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন। ২৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়? ২৭
০২. আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংজ্ঞা দিন। ২৮
০৩. আন্তঃসভ্যতা সংলাপ (Inter-civilization Dialogue) কি? ২৮
০৪. বাফার স্টেট (Buffer State) কি? ২৯
০৫. শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব বা The Uniting for Peace Resolution বলতে কি বোঝায়? ২৯
০৬. আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে ক্রীড়াতত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ২৯

টীকা

- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২৯
- আন্তর্জাতিক রাজনীতি ৩০
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ৩১
- সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ৩২
- আন্তঃসভ্যতা সংলাপ ৩২
- এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা *[১৮তম বিসিএস]* ৩৩
- এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌশক্তি ৩৩
- চতুর্থ বিশ্ব ৩৪
- আন্তর্জাতিকতাবাদ ৩৪
- ক্রীড়াতত্ত্ব ৩৪

অধ্যায় - ০২

বিশ্ব নেতৃত্ব
Actors in the World

Syllabus — Actors in the World : *Modern state, types of state, sovereignty, non-state actors, international institutions, relations between state and non-state actors.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. স্নায়ুযুদ্ধ কি? স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]* ৩৫

সূচি

০২. বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ কি অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন? *[২৩তম বিসিএস]* ৪০

০৩. 'জাতীয় নিরাপত্তা' ও 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' বলতে কি বোঝেন? বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোর নিরাপত্তার সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]* ৪৫

০৪. স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এসব দেশের অবস্থান তুলে ধরুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৪৯

০৫. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কি? এ আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক এর সাফল্য মূল্যায়ন করুন। পরবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় এর আবশ্যকতা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? *[৩৪তম বিসিএস]* ৫৩

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. ক. রাষ্ট্র বলতে কি বোঝেন? ৫৮
খ. রাষ্ট্র গঠনের উপাদান পর্যালোচনা করুন। ৫৮

০৭. ক. রাষ্ট্রের প্রকারভেদ আলোচনা করুন। ৬২
খ. আপনি কি মনে করেন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার মূল চরিত্র হারিয়েছে? ৬২

০৮. ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ৬৪
খ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব পর্যালোচনা করুন। ৬৪

০৯. বিশ্বায়নের এ যুগে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিষয়টি তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না— ব্যাখ্যা করুন। ৬৭

১০. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। ৬৯

১১. ক. রাষ্ট্র কি? ৭১
খ. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন। ৭১

১২. ক. সার্বভৌমত্ব কি? ৭৪
খ. সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। ৭৪
গ. সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন। ৭৪

১৩. ক. স্বল্পোন্নত দেশ বলতে কি বোঝেন? ৭৭
খ. স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ৭৭

১৪. ক. স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs) বলতে কি বোঝায়? ৮০
খ. একটি দেশ LDCs কিনা তা কে ঠিক করে? ৮০
গ. বর্তমান বিশ্বে কতগুলো দেশ LDCs-ভুক্ত? ৮০
ঘ. সবচেয়ে জনবহুল LDCs কোন দেশ? ৮০

১৫. কমনওয়েলথের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৮৩

১৬. ক. কমনওয়েলথ কি? ৮৬
খ. কমনওয়েলথ-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বর্ণনা করুন। ৮৬
গ. বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কমনওয়েলথ-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। ৮৬

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. রাষ্ট্র কি? ৯০
০২. রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ৯০

সূচি

০৩. রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি? ৯০
০৪. সার্বভৌমত্ব বলতে কি বোঝেন? ৯১
০৫. সংবিধান বা শাসনতন্ত্র কি? ৯১
০৬. একনায়কতন্ত্র কি? ৯১
০৭. ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র কি? ৯১
০৮. আরোপিত রাজধানী কাকে বলে? ৯২
০৯. ন্যাম (NAM) কি? এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ৯২
১০. ন্যাম (NAM) প্রাথমিকভাবে গঠিত হয় কখন? এর উদ্যোক্তা কারা ছিলেন? ৯২
১১. ন্যামের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? সর্বশেষ সদস্য দেশের নাম কি? ৯২
১২. ন্যাম (NAM)-এর প্রথম ও সর্বশেষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? ৯২
১৩. ন্যাম ট্রয়কা (NAM Troika) বলতে কি বোঝায়? ৯২
১৪. 'পঞ্চশীল' বলতে কি বোঝায়? ৯৩
১৫. ন্যামকে অধিক কার্যকর করার জন্য কি কি কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? ৯৩
১৬. NAM-এর বার্তা সংস্থার নাম কি? ৯৩
১৭. কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট কি? ৯৩
১৮. কমনওয়েলথের বর্তমান প্রধান কে? এর সদর দপ্তর কোথায়? ৯৪
১৯. কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিবের নাম কি? ৯৪
২০. কমনওলেথের সদস্যপদ ত্যাগকারী দেশগুলো কি কি? ৯৪
২১. কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালাগুলো কি কি? ৯৪
২২. কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো কি কি? ৯৪
২৩. CPA কি? ৯৪
২৪. ম্যাগনাকার্টা কি? ৯৪
২৫. কমনওয়েলথ-এর আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সংক্ষেপে লিখুন। ৯৫

টীকা

ফিফথ কলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী ৯৫
আয়রন কার্টেন ৯৬
ইন্টারপোল (Interpol) *[৩২তম; ২৪তম বিসিএস]* ৯৬
সিরডাপ *[২৯তম বিসিএস]* ৯৬
ওপেক *[২৯তম বিসিএস]* ৯৬
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ *[২৯তম বিসিএস]* ৯৭
কমনওলেথ-এর নতুন সনদ ৯৭
সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS) ৯৮
আফ্রিকম ৯৮
ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস ৯৮
ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন ৯৯
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) ৯৯
কমনওয়েলথ (Commonwealth) ৯৯
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM) ১০০
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত *[৩০তম বিসিএস]* ১০০
এনজিও ১০০

সূচি

অধ্যায় - ০৩

ক্ষমতা ও নিরাপত্তা
Power & Security

Syllabus — Power and Security : *Power, national power, balance of power, disarmament, arms control, geopolitics, terrorism.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. 'বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী মনোভাব বেশ প্রকট'—এই বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কী একমত? এর জন্য আল-কায়েদা কতটুকু দায়ী? আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ১০৪

০২. ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক গঠনে কিভাবে প্রভাবিত করছে—আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]* ১০৯

০৩. শক্তির ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা কি একটা অনিবার্য বাস্তবতা? *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি পর্যালোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি এর পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে? *[২৩তম বিসিএস]*
অথবা, 'সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে'–এ উক্তির যথার্থতা তুলে ধরুন।
অথবা, আপনি কি মনে করেন সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে?– আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন। ১১৩

০৪. নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। এটা কতটুকু সত্য যে, নিরস্ত্রীকরণ বিশ্ব শান্তির পূর্বশর্ত? *[২৭তম বিসিএস]* ১১৬

০৫. উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় পাকিস্তান ও ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ কি প্রভাব ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন? *[২১তম বিসিএস]* ১২০

০৬. মধ্য এশিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করুন। *[২৯তম; ২৪তম বিসিএস]* ১২৩

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. ক. জাতীয় শক্তি কি? ১২৭
খ. জাতীয় শক্তির উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১২৭

০৮. জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশটির অবস্থান নির্ণয়ে কি ভূমিকা পালন করে? ১৩১

০৯. ক. শক্তি ও জাতীয় শক্তির ধারণা দিন। ১৩৪
খ. জাতীয় শক্তির কাঠামো ও উপাদান আলোচনা করুন। ১৩৪
গ. একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির গুরুত্ব উপস্থাপন করুন। ১৩৪

১০. জাতীয় শক্তির পরিমাপ ও মূল্যায়নপূর্বক এ প্রসঙ্গে জাতীয় শক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করুন। ১৩৯

১১. ক. শক্তিসাম্য তত্ত্ব আলোচনা করুন। ১৪৩
খ. শক্তিসাম্য রক্ষার কৌশল বা পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। ১৪৩

১২. ক. শক্তিসাম্য কি? ১৪৬
খ. শক্তিসাম্য ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। ১৪৬

১৩. 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে শক্তি বা ক্ষমতা'– জাতীয় শক্তির ধারণায় এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ১৪৯

১৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫২

সূচি

১৫. ক. সন্ত্রাসবাদ কি? ১৫৬
খ. বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? ১৫৬

১৬. 'বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার সন্ত্রাসবাদে নতুন মাত্রা যোগ করেছে'—এ উক্তির আলোকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণ করুন। ১৬১
অথবা, 'বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার বঞ্চনা সন্ত্রাসবাদে মানুষকে উৎসাহিত করেছে'– আলোচনা করুন।

১৭. ক. নিরস্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝেন? ১৬৫
খ. নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি বিবরণ দিন। ১৬৫
অথবা, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রবিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তার বাস্তবতা বিষয়ে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

১৮. ক. নিরস্ত্রীকরণ কি? ১৭০
খ. আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ১৭০

১৯. ক. NPT ও CTBT সম্পর্কে ধারণা দিন। ১৭৫
খ. চুক্তি দুটির বাস্তবায়নে সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৭৫

২০. 'পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা পৃথিবীর পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনবে।'—আপনার মতামত লিখুন। ১৭৯

২১. বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে, তাই ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন।—আলোচনা করুন। ১৮২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. জাতীয় শক্তি কি? ১৮৭
০২. জাতীয় শক্তির প্রকারভেদগুলো কি কি? ১৮৭
০৩. জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো কি কি? ১৮৭
০৪. রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান বলতে কি বোঝায়? ১৮৮
০৫. শক্তির রাজনীতি কি? ১৮৮
০৬. আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র বলতে কাকে বোঝানো হয়? ১৮৮
০৭. জাতীয় শক্তিতে সামাজিক উপাদানের ভূমিকা কি? ১৮৮
০৮. জাতীয় শক্তির মূল্যায়ন কিরূপে করা যায়? ১৮৮
০৯. শক্তিসাম্য কি? ১৮৯
১০. শক্তিসাম্যের ধরন বা প্রকারগুলো কি কি? ১৮৯
১১. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের বর্তমান অবস্থা কি রূপ? ১৮৯
১২. দ্বি-মেরুপ্রবণতা কি? ১৮৯
১৩. সাম্প্রতিক বিশ্ব রাজনীতির প্রভাবক হিসেবে আদর্শ (Ideology)-এর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। ১৮৯
১৪. শক্তিসাম্যের প্রকারভেদ লিখুন। ১৯০
১৫. শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ১৯০
১৬. নিরস্ত্রীকরণ কি? ১৯১
১৭. শান্তিপূর্ণ উপায় বলতে কি বোঝায়? ১৯১
১৮. কি কি কারণে নিরস্ত্রীকরণ অত্যন্ত জরুরি? ১৯১
১৯. NPT কি? এটি কখন স্বাক্ষরিত হয়? ১৯১
২০. CTBT কি? বাংলাদেশ কখন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে? ১৯১
২১. WMD-এর পূর্ণরূপ কি? ১৯২
২২. SALT ও START কি? ১৯২
২৩. আইএনএফ (INF) চুক্তি বলতে কি বুঝায় এবং এই চুক্তি কোন অস্ত্র ব্যবহারের বেলায় প্রযোজ্য? ১৯২
২৪. 'SORT' চুক্তির মূল লক্ষ্য কি? ১৯২
২৫. SDI বা তারকা যুদ্ধ কি? ১৯২
২৬. ICBM কি? ১৯২

সূচি

২৭. ডার্টি ডজন (Dirty Dozen) কি? ১৯৩
২৮. রাসায়নিক অস্ত্র বলতে কি বোঝায়? ১৯৩
২৯. ক্লাস্টার বোমা কি? ১৯৩
অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চুক্তিসমূহ ১৯৪

টীকা

ভূ-রাজনীতি ১৯৭
কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ ১৯৭
নতুন কৌশলগত অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি (নিউ স্টার্ট) ১৯৭
পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি (NPT) ১৯৮
গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (সল্ট-১) ১৯৮
পরমাণু অস্ত্র হ্রাস চুক্তি ১৯৮
রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি ১৯৯
ভার্সাই চুক্তি (১৭৮৩) ও ভার্সাই শান্তিচুক্তি (১৯১৯) ১৯৯
খেমাররুজ *[১৩তম বিসিএস]* ২০০
আল কায়েদা ২০০
হামাস ২০০
অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম ২০০
অপারেশন ডেজার্ট ফক্স ২০০
জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা *[২৫তম বিসিএস]* ২০০
জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন *[২৫তম বিসিএস]* ২০১
বিশ্ব স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি *[২০তম বিসিএস]* ২০১
ক্লাস্টার বোমা ২০২
আকসা চুক্তি ২০২
অস্ত্র বাণিজ্য রোধে জাতিসংঘ চুক্তি ২০২
গুচ্ছবোমা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কার্যকর ২০৩
অসলো সনদ ২০০৭ ..... ২০৩
পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক) নিষিদ্ধকরণ চুক্তি ২০৩
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA) ২০৪
শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ ২০৪
নেভি সিল ২০৪
সেন্ট্রাল ইনট্যালিজেন্স এজেন্সি (CIA) ২০৫
কেজিবি ২০৫
আইএসআই ২০৬
এফবিআই ২০৬
বাফার জোন ২০৭
বোকো হারাম ২০৭
সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস ২০৭
ক্রিমিয়া ২০৯
বিশ্ব অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর ২১০
শার্লি হেবদো হত্যাকাণ্ড ২১০

সূচি

অধ্যায় - ০৪

প্রধান মতবাদসমূহ ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা
Major Ideologies & New World Order

Syllabus — Major Ideas and Ideologies : *Nationalism, imperialism, colonialism, neo-colonialism, post-modernism, globalization and new world order.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. 'বিশ্বায়ন' প্রত্যয়টির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ২১২

০২. বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী? *[৩০তম বিসিএস]*
অথবা, বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক দরিদ্র দেশসমূহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন। *[২৪তম বিসিএস]* ২১৭
অথবা, বিশ্বায়ন সুযোগ (Opportunities) এবং আশঙ্কার (Threats) সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং অদক্ষদের জন্য আশঙ্কা।" —এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. ক. জাতীয়তাবাদ কি? ২২২
খ. জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমধারা আলোচনা করুন। ২২২

০৪. ক. সাম্রাজ্যবাদ কি? ২২৬
খ. সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আলোচনা করুন। ২২৬

০৫. 'পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর'—লেনিনের এ উক্তির আলোকে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশল তুলে ধরুন।
অথবা, সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের কারণ এবং বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন।
অথবা, বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করুন। ২৩১

০৬. ক. উপনিবেশবাদ কি? ২৩৬
খ. উপনিবেশ স্থাপনের কারণ, সাম্প্রতিককালের উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২৩৬
অথবা, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুক্তি এবং সাম্প্রতিককালের উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৭. ক. নয়া উপনিবেশবাদ কি? ২৪২
খ. নয়া উপনিবেশবাদ উত্থানের কারণ ও শোষণের পদ্ধতি আলোচনা করুন। ২৪২

০৮. ক. উত্তর আধুনিকতাবাদ কি? ২৪৮
খ. উত্তর আধুনিকতাবাদ (Post-modernism)-এর চরিত্র ও লক্ষণ আলোচনা করুন। ২৪৮

০৯. ২০৫০ সাল নাগাদ কিরূপ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আপনি মনে করেন? ২৫১

১০. ক. নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New International Economic Order) বলতে কি বুঝেন?
খ. নব্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপাদানগুলো কি কি? ২৫৩
গ. এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী সংগঠনগুলোর বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. জাতীয়তাবাদ কি? ২৫৮
০২. সাম্রাজ্যবাদ কি? ২৫৮
০৩. ঔপনিবেশিকতা বলতে কি বোঝেন? ২৫৮

সূচি

০৪. নয়া-উপনিবেশবাদ কি? ২৫৮
০৫. বিশ্বায়ন (Globalization) বলতে কি বোঝায়? ২৫৯
০৬. কোন কোন বিষয়ের উপর বিশ্বায়ন প্রভাব বিস্তার করে? ২৫৯
০৭. 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলতে কি বোঝায়? ২৫৯

টীকা

বিশ্বায়ন (Globalization) *[৩২তম বিসিএস]* ২৫৯
নব-ঔপনিবেশিকতাবাদ *[১১তম বিসিএস]* ২৬০
মার্শাল ম্যাকলুহান ২৬০
জাতীয় মুক্তি ২৬১
সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ২৬২
বৈদেশিক সাহায্য ২৬২
জাতীয়তাবাদ ২৬২
সাম্রাজ্যবাদ ২৬৩
ঔপনিবেশিকতা ২৬৩
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ২৬৪
আধিপত্যবাদ ২৬৪

অধ্যায়- ০৫

পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি
Foreigh Policy & Diplomacy

Syllabus — Foreign policy and Diplomacy : *Concepts of foreign policy and diplomacy, decision-making process, determinants of foreign policy, diplomatic functions, immunities, and privileges.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে আমরা কি বুঝি? বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[৩৪তম; ৩১তম বিসিএস]* ২৬৬
০২. 'স্বার্থ সংরক্ষণ' কূটনীতিকের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব—এ দায়িত্ব পালনে কী কী বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে লিখুন। *[২৯তম বিসিএস]* ২৬৯
০৩. 'এই বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে'–আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। *[২৫তম বিসিএস]* ২৭১

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. ক. পররাষ্ট্রনীতি কি? ২৭৫
খ. একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির গুরুত্ব আলোচনা করুন। ২৭৫
০৫. ক. কূটনীতি বলতে কি বোঝেন? ২৭৮
খ. কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন। ২৭৮
০৬. কূটনীতির গুরুত্ব ও কার্যাবলী আলোচনাপূর্বক কূটনীতিবিদদের ভূমিকা আলোচনা করুন। ২৮১
০৭. 'কূটনীতি বিদেশনীতি পরিচালনার একটি হাতিয়ার'।— আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন। ২৮৮

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. পররাষ্ট্রনীতি কি? ২৯১

সূচি

০২. কূটনীতি (Diplomacy) কি? ২৯১
০৩. প্রকাশ্য কূটনীতি (Open Diplomacy) কি? ২৯২
০৪. কূটনীতিবিদদের কাজগুলো কি কি? ২৯২
০৫. কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের শ্রেণী বিভাজন লিখুন। ২৯২
০৬. গণতান্ত্রিক কূটনীতি কি? ২৯২
০৭. গোপন কূটনীতি কি? ২৯৩
০৮. ব্যক্তিগত কূটনীতি কি? ২৯৩
০৯. 'কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন' কি? ২৯৩
১০. বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় হাতিয়ার হিসেবে কূটনীতির ভূমিকা কি? ২৯৩
১১. 'পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি পরস্পর নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ'—ব্যাপারটি বুঝিয়ে লিখুন। ২৯৩

টীকা

কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্তি *[৩০তম বিসিএস]* ২৯৪
মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি *[১৮তম বিসিএস]* ২৯৪
নতুন কূটনৈতিক সম্পর্ক : ভারত-চীন ২৯৫
প্রতিরোধ কূটনীতি ২৯৫
পেরেস্ত্রয়কা ২৯৬
গ্লাসনস্ত ২৯৬
পিং পং ডিপলোমেসি ২৯৬
গুজরাল ডকট্রিন ২৯৬
ট্রম্যান ডকট্রিন ২৯৬
নিক্সন ডকট্রিন ২৯৭
ডোমিনো থিউরি ২৯৭
কূটনৈতিক অসুস্থতা ২৯৭

অধ্যায়- ০৬

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক
International Economic Relations

Syllabus — International Economic Relations : *International trade, free trade, protectionism, foreign aid, debt crisis, foreign direct investment (FDI), financial liberalization, regionalism, regionalization, North-South gap, global poverty, MDGs*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন। *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন। মন্দা প্রতিরোধে ওবামা প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন কী? *[৩০তম বিসিএস]* ৩০০
০২. একটি অভিন্ন ইউরোপ বা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? *[২৪তম বিসিএস]* ৩০৬
০৩. গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দা ইউরো জোনে কি বিরূপ প্রভাব ফেলছে? সংকট উত্তরণে ইউরো জোনের দেশগুলো কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? *[৩৩তম; ৩২তম বিসিএস]*
অথবা, ইউরো জোনের কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটনের কারণ বর্ণনা করুন। কিভাবে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? ৩০৯

০৪. MDG কি? MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, জাতিসংঘ প্রণীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' (MDGs) কি? এ বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন। ৩১৩

০৫. "বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।"– আলোচনা করুন এবং এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ৩১৮

০৬. আঞ্চলিকতাবাদ কি? আপনি কি মনে করেন আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতিভূমকিস্বরূপ? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন। *[১৩তম বিসিএস]*
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতা কি? আঞ্চলিক সহযোগিতা কি বিশ্ব সহযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী না পরিপূরক? আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]* ৩২২

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়?
খ. বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করুন। ৩২৫

০৮. ক. আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট বলতে কি বোঝেন?
খ. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩৩০

০৯. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৩৩৩

১০. মন্দা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন। ৩৩৮

১১. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার মতামত লিখুন। ৩৪৩

১২. বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণের সপক্ষে আপনার যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করুন। ৩৪৯

১৩. ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কিরূপ প্রভাব রাখছে বলে আপনি মনে করেন? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতি উল্লেখ করুন। ৩৫৪

১৪. 'বিশ্ব বাণিজ্যে চীন একটি অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।'—এ উক্তির আলোকে আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন। ৩৫৮

১৫. 'চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে খর্ব করবে'— এ প্রসঙ্গে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন। ৩৬১

১৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতিরেকে কিভাবে জাপান নিজেকে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছে—আলোচনা করুন। ৩৬৮

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. মুক্তবাজার অর্থনীতি কি? ৩৭১
০২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়? ৩৭১
০৩. অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) কি? ৩৭১
০৪. অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিগুলো কি কি? ৩৭১
০৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩৭২
০৬. মুদ্রাস্ফীতি কি? ৩৭২
০৭. মুদ্রাসংকোচন বলতে কি বোঝায়? ৩৭২

০৮. ডাম্পিং কি? ৩৭৩
০৯. ট্যারিফ কি? ৩৭৩
১০. পণ্য বিনিময় চুক্তি কি? ৩৭৩
১১. কার্টেল (Cartel) কি? ৩৭৩
১২. 'রুলস অব অরিজিন' বলতে কি বোঝায়? ৩৭৩
১৩. অবমূল্যায়ন কি? ৩৭৪
১৪. ভূ-অর্থনীতি কি? ৩৭৪
১৫. আঞ্চলিকতাবাদ কি? ৩৭৪

টীকা

Purchasing Power Parity *[২৩তম বিসিএস]* ৩৭৫
জিএসপি (GSP) *[২২তম বিসিএস]* ৩৭৫
জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) *[৩২তম বিসিএস]* ৩৭৫
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) *[৩২তম বিসিএস]* ৩৭৬
আঙ্কটাড (UNCTAD) ৩৭৬
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ৩৭৬
ভিওআইপি ৩৭৭
WTO *[২৮তম; ২৩তম; ২২তম; ১৭তম বিসিএস]* ৩৭৭
AIIB : চীনের বিশ্বব্যাংক ৩৭৭
নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ৩৭৮
আঞ্চলিকতাবাদ ৩৭৯
বিশ্ব দারিদ্র্য ৩৭৯
গণমাধ্যম ৩৭৯
বৈদেশিক বিনিয়োগ ৩৮০
উত্তর-দক্ষিণের ফারাক্কা ৩৮০

অধ্যায় - ০৭

বৈশ্বিক পরিবেশ
Global Environment

Syllabus — Global Environment : *Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. "বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"– আলোচনা করুন। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ৩৮২

০২. 'গ্রিন হাউজ ইফেক্ট' (Green House Effect) বলতে কি বোঝায়? এর ফলে পরিবেশ ও কৃষিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে? *[২৮তম বিসিএস]*
অথবা, গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এর কী কী প্রভাব পড়তে পারে এবং তা প্রতিকারের উপায় কী বর্ণনা করুন। ৩৮৭

০৩. বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন। এগুলো মোকাবিলার জন্য কি কি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে? *[২৫তম বিসিএস]*
অথবা, বিশ্বের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন। *[২৩তম বিসিএস]* ৩৯১

০৪. 'জলবায়ুর পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন। *[২৯তম বিসিএস]* ৩৯৫

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. 'জলবায়ুর পরিবর্তন ও উন্নয়নশীল বিশ্ব' শিরোনামে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন। ৩৯৭

০৬. ক. বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে অন্তরায়সমূহ কি কি?
খ. আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফলাফল কি হতে পারে? ৪০১

০৭. ক. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ কি?
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব আলোচনাপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তনে কিভাবে ধনী ও গরিব দেশগুলো পরস্পরের মুখোমুখি তা আলোচনা করুন।
গ. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনে কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন? ৪০৬

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কি? ৪০৯
০২. রিও (পরিবেশ) সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য নীতিগুলো তুলে ধরুন। ৪০৯
০৩. পরিবেশগত শরণার্থী বলতে কি বোঝায়? ৪১০
০৪. জলবায়ু কূটনীতি কি? ৪১০
০৫. গ্রিন পিস কি? ৪১০

টীকা

I The World Climate Conference-3. *[২৯তম বিসিএস]* ৪১১
I প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি *[২১তম বিসিএস]* ৪১১
I নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন ৪১২
I COP18 ও কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ বৃদ্ধি ৪১২
I রিও+২০ সম্মেলন ৪১২
I ডারবান রোডম্যাপ ৪১৩
I প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন (রিও ঘোষণা) ৪১৩
I দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন) ৪১৪
I মন্ট্রিল প্রটোকল ৪১৫
I গ্রিন পিস ৪১৬
I জলবায়ু পরিবর্তন *[৩২তম বিসিএস]* ৪১৬
I গ্রিন হাউস ইফেক্ট *[২২তম; ২০তম বিসিএস]* ৪১৬
I আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহারসংক্রান্ত নীতিমালা ৪১৭
I ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন ৪১৭
I গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধে ঐতিহাসিক চুক্তি ৪১৭
I LIMA COP 20 ৪১৮
I ইবোলা ভাইরাস ৪১৮

Section B Empirical Issues

অধ্যায়-০১

জাতিসংঘ
The United Nations

Syllabus — The United Nations System : *The UN and its organs, importance and limitations of the UN, Reforms of the UN, Role of the Security Council, UN Peacekeeping and peace-building functions, Human rights agenda, Environmental agenda, International Court of Justice, and Women empowerment.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করুন। পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘের কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[৩০তম বিসিএস]* ৪২৩

০২. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার মতামত প্রদান করুন। *[২১তম বিসিএস]* ৪২৮

০৩. জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার জন্য আপনি কি সংস্থাটির সনদের সংশোধন বাঞ্ছনীয় মনে করেন? আলোচনা করুন। *[১৩তম বিসিএস]* ৪৩১

০৪. "জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।"– আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
অথবা, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মসূচিতে অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন। *[২৯তম বিসিএস]* ৪৩৫

০৫. জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডের সফলতা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করুন। *[১৭তম বিসিএস]* ৪৩৮

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. ক. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
খ. নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর করতে আপনার সুপারিশমালা ব্যক্ত করুন। ৪৪২

০৭. পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? ৪৪৭

০৮. ক. ভেটো (Veto) ক্ষমতা কি?
খ. আপনি কি মনে করেন একটি পুনর্গঠিত জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ নীতির বিলুপ্তি ঘটানো উচিত। যৌক্তিকতাসহ আলোচনা করুন। ৪৫০

০৯. আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৪৫৩

১০. ক. আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও কার্যাবলী উল্লেখপূর্বক এর দুর্বলতা তুলে ধরুন।
খ. আন্তর্জাতিক আদালতের সংস্কারে আপনার সুপারিশ ব্যক্ত করুন। ৪৫৭

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ সৌদি আরব কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো আলোচনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]* ৪৬১

সূচি

০২. জেনেভা কনভেনশন কি? এর মূল উদ্দেশ্য কি? ৪৬২
০৩. CEDAW (সিডও)-এর পূর্ণরূপ কি? এটি কোন ধরনের দলিল বা চুক্তি? ৪৬২
০৪. শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব বা The Uniting for Peace Resolution বলতে কি বোঝায়? ৪৬৩
০৫. জাতিসংঘ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ৪৬৩
০৬. জাতিসংঘের সরকারি ভাষা কয়টি ও কি কি? এর দাপ্তরিক ভাষা কি? ৪৬৩
০৭. জাতিসংঘ সনদ কত সালে এবং কোথায় স্বাক্ষরিত হয়? ৪৬৩
০৮. জাতিসংঘের প্রথম ও বর্তমান মহাসচিবের নাম কি এবং তারা কোন দেশের অধিবাসী? ৪৬৩
০৯. জাতিসংঘে এ পর্যন্ত কতজন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন? এর মধ্যে সর্বশেষ এশীয় মহাসচিব কে? ৪৬৩
১০. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা কত? নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়? ৪৬৪
১১. জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্রের নাম কি? এটি জাতিসংঘের কততম সদস্যপদ লাভ করে? ৪৬৪
১২. জাতিসংঘ ব্যতীত এর কোন কোন অঙ্গসংস্থা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে? ৪৬৪
১৩. জাতিসংঘের মূল সংস্থা কয়টি ও কি কি? ৪৬৪
১৪. জাতিসংঘের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত এবং কত সালে স্থাপিত হয়? ৪৬৪
১৬. আটলান্টিক সনদ (Atlantic Treaty) কি? ৪৬৪
১৭. নিষেধাজ্ঞা (Embargo) এবং বয়কট (Boycott) কি? ৪৬৪
১৮. ভেটো ক্ষমতা কি? ৪৬৪
১৯. বেইজিং নারী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা কি কি? ৪৬৫
❍ জাতিসংঘ : গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ৪৬৫

টীকা

। জাতিসংঘ ৪৮২
। সাধারণ পরিষদ ৪৮৩
। নিরাপত্তা পরিষদ ৪৮৩
। অছি পরিষদ (Trusteeship Council) ৪৮৩
। সচিবালয় (Secretariat) ৪৮৩
। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ *[৩৩তম বিসিএস]* ৪৮৪
। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত *[৩১তম; ২৪তম বিসিএস]* ৪৮৪
। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ৪৮৫
। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ৪৮৫
। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৪৮৬
। UNESCO ৪৮৬
। বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU) ৪৮৬
। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) ৪৮৬
। জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) ৪৮৭
। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) ৪৮৭
। বিশ্ব বুদ্ধি সম্পদ সংস্থা (WIPO) ৪৮৭
। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD) ৪৮৮
। আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO) ৪৮৮
। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) ৪৮৮

সূচি

। জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR) ৪৮৮
। জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU) ৪৮৮
। UNFPA ৪৮৯
। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ ৪৮৯
। এসকাপ (ESCAP) ৪৮৯
। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ৪৮৯
। সর্বজনীন মানবাধিকার *[২১তম বিসিএস]* ৪৮৯
। প্লাটফরম ফর অ্যাকশন ৪৯০
। বেইজিং নারী সম্মেলন ৪৯০
। ইয়াল্টা সম্মেলন ৪৯০
। জাতিসংঘ নারীবিষয়ক সম্মেলন বেইজিং + ৫ ..... ৪৯১
। শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ ..... ৪৯১
। সিডও সনদ ৪৯২
। মানবাধিকার চুক্তি ৪৯২

অধ্যায়-০২

ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক সম্পর্ক
Foreign Relations of Major Powers

Syllabus — Foreign Relations of Major Powers : *USA, Russia, UK, China, France, Germany, India, Japan etc.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করুন।
অথবা, দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও প্রভাব কী? ওবামা প্রশাসনের আফগান নীতি পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৪৯৪
০২. যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা'র প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৪৯৮
০৩. যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে রাজনৈতিক ও সামরিক উপাদান কি ভূমিকা পালন করে? *[২৫তম বিসিএস]*
অথবা, চীন-মার্কিন সম্পর্কের প্রকৃতি পরীক্ষা করুন। *[২৩তম বিসিএস]* ৫০৫

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির গতিধারা পর্যালোচনা করুন। ৫১০
০৫. সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে রাশিয়ার বৈদেশিক সম্পর্কের একটা বাস্তব চিত্র বর্ণনা করুন। ৫১৪
০৬. সুয়েজ সংকটের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক সম্পর্ক কেমন তা আলোচনা করুন। ৫১৬
০৭. গণচীনের পররাষ্ট্রনীতির অতীত ও বর্তমান এবং এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন। ৫১৯
০৮. অর্থনৈতিক ও সামরিক পরশক্তি হিসেবে সাম্প্রতিক চীনের আবির্ভাব পশ্চিমা বিশ্ব ও এশীয় অঞ্চলে পশ্চিমাদের দালাল রাষ্ট্রগুলোর যে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫২২

০৯. ভারত ও চীন এ দু'দেশের কোনটি সকল দিক বিবেচনায় একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অধিকতর শক্তিশালী দেশরূপে আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতি প্রভাবিত করতে পারে তা যুক্তিসহ আলোচনা করুন। ৫২৫

১০. পঞ্চম প্রজাতন্ত্র বা ১৯৫৮ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ফ্রান্সের বৈদেশিক সম্পর্ক আলোচনা করুন। ৫৩০

১১. জাপানের সামরিক আকাঙ্ক্ষা, চীনের অর্থনৈতিক উত্থান এবং ভারতের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতির ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প অঙ্কন করুন। ৫৩২

১২. ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ক্রমবিকাশ আলোচনাপূর্বক একুশ শতকে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান নির্ণয় করুন। ৫৩৭

১৩. বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কতটা দ্বন্দ্বমূলক ও কতটা সহযোগিতামূলক হবে বলে আপনি মনে করেন?
অথবা, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী'।– যুক্তিসহ আপনার মতামত দিন। ৫৪০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম ও তাদের পদবি কি? ৫৪৩
০২. সংক্ষেপে চীনের পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখ করুন। ৫৪৩
০৩. 'এক দেশ দুই নীতি' বলতে কি বোঝায়? কোন দেশে এ নীতি চালু রয়েছে? ৫৪৩
০৪. PL-480 কি? ৫৪৩
০৫. ভারতে মুক্তবাজার অর্থনীতির জনক কে? ৫৪৩
০৬. যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ৫৪৩
০৭. যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য কি কি? ৫৪৪
০৮. ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। ৫৪৫
০৯. চীনের বিচ্ছিন্নতাবিরোধী আইন ও তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখুন। ৫৪৫
♦ **ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র পরিচিতি** ৫৪৬

টীকা

মার্কিন অর্থনৈতিক সুনামি ৫৬০
প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি ৫৬০
'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি *[২২তম বিসিএস]* ৫৬১
ম্যাগনাকার্টা *[৩০তম বিসিএস]* ৫৬১
ফরাসি বিপ্লব *[৩০তম বিসিএস]* ৫৬১
আফিম যুদ্ধ ৫৬২
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৫৬২
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৫৬৩
ফকল্যান্ড যুদ্ধ ৫৬৩
শিল্প বিপ্লব ৫৬৪
রুশ বিপ্লব ৫৬৪
আমেরিকার বিপ্লব/স্বাধীনতা যুদ্ধ ৫৬৫
চীনা বিপ্লব ৫৬৫
হংকং *[১১তম বিসিএস]* ৫৬৬
হিরোশিমা ৫৬৬

বাস্তিল দুর্গ ৫৬৭
পেন্টাগন *[১৩তম বিসিএস]* ৫৬৭
হংকংয়ে ছাতা বিপ্লব ৫৬৭
বারাক ওবামার দ্বিতীয় মেয়াদ ৫৬৮
সিআইএস (CIS) *[২৮তম বিসিএস]* ৫৬৮
ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি *[১১তম বিসিএস]* ৫৬৮
আনজুস (ANZUS) ৫৬৮

অধ্যায়- ০৩

বৈশ্বিক উদ্যোগ ও সংস্থা
Global Initiatives & Institutions

Syllabus — Global Initiatives and Institutions : *World Bank, IMF, ADB, G8, G-77, WTO, Kyoto Protocol, COP etc..*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তরজ

০১. 'বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।' আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৫৭০
০২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর পটভূমি ও কার্যসম্পাদন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন। *[২৫তম বিসিএস]* ৫৭৪
০৩. অনুন্নত দেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ভূমিকা আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]* ৫৭৮

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গ্রুপ-৭৭ এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৫৮২
০৫. 'স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ভূমিকা অনেক সময় সমালোচনার উর্ধ্বে নয়'— যুক্তিসহ আলোচনা করুন। ৫৮৫
০৬. ক. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি?
খ. দারিদ্র্য হ্রাসে বিশ্বব্যাংকের সাফল্য উল্লেখ করুন। ৫৮৮
০৭. ক. WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সম্পর্কে কি জানেন?
খ. WTO সম্পর্কে উন্নত ও স্বল্পোন্নত বিশ্বের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। ৫৯৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট' বলতে কি বোঝেন? ৫৯৮
০২. কিয়োটো প্রটোকল কোন ধরনের চুক্তি এবং এর মূল উদ্দেশ্য কি? ৫৯৮
০৩. জি-৮ বলতে কি বোঝায়? এটি কি উদ্দেশ্য গঠিত হয়? ৫৯৮
০৪. G-77 বলতে কি বোঝায়? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ৫৯৮
০৫. ADB কি? এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি? ৫৯৮
০৬. বিশ্বব্যাংক কি? এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি? ৫৯৯
০৭. আইএমএফ (IMF) কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? ৫৯৯
০৮. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? ৫৯৯

সূচি

টীকা

বিশ্বব্যাংক	৫৯৯
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) *[৩৩তম ও ৩০তম বিসিএস]*	৬০০
দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা *[৩১তম বিসিএস]*	৬০০
কিয়োটো প্রটোকল *[৩১তম বিসিএস]*	৬০১
পিএসআই	৬০১
ব্রেটন উডস চুক্তি	৬০২
জি-৮ (G-8)	৬০২

অধ্যায় - ০৪

আঞ্চলিক সংস্থা
Regional Institutions

Syllabus — Regional Institutions : *SAARC, BIMSTEC, EU, ASEAN, NATO, APEC, OIC, AU, GCC.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে SAARC-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* *অথবা,* আঞ্চলিক সহযোগিতার ফোরাম হিসেবে সার্ক (SAARC)-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]* *অথবা,* সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সার্ক (SAARC) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছে? আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]* *অথবা,* দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে SAARC-এর ভূমিকা কতটুকু উজ্জ্বল? *[২৩তম বিসিএস]*	৬০৫
০২. ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে লিখুন। *[২৪তম বিসিএস]*	৬০৭
০৩. বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা কেন? এর সাথে রাশিয়া কেন ও কিভাবে সম্পৃক্ত হতে চায়? *[১৮তম বিসিএস]*	৬১০
০৪. APEC কি? APEC শীর্ষ সম্মেলনের আলোকে বিশ্ব রাজনীতিতে APEC-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]*	৬১৩
০৫. সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে OIC'র ভূমিকা নিরূপণ করুন। *[১৮তম বিসিএস]* *অথবা,* মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষায় ওআইসি (OIC)-এর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন। *[২৮তম বিসিএস]*	৬১৭
০৬. OPEC তার সদস্যদেশগুলোর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষণ করতে পেরেছে? বিশ্লেষণ করুন। *[২৪তম বিসিএস]* *অথবা,* 'ওপেক' (OPEC) কি? সদস্য দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে এই সংগঠন সাধারণত কি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে? জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি একটি তেল আমদানিকারী স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? *[২২তম বিসিএস]*	৬২১

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. তিন দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে সার্কের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।	৬২৪
০৮. 'পাক-ভারত রাজনৈতিক বৈরিতা সার্ক ও সাপটার সফলতার পথে প্রধান অন্তরায়।' —আলোচনা করুন।	৬২৮

সূচি

০৯. ক. SAPTA ও SAFTA সম্বন্ধে ধারণা দিন। খ. এগুলো থেকে বাংলাদেশ যেসব সুবিধা পেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করুন। *অথবা, সাফটা' (SAFTA) কি? এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।*	৬৩১
১০. সার্ক (SAARC) কি একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছে? এ ব্যাপারে আপনার মতামত দিন। *অথবা,* দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যাশা পূরণে SAARC-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।	৬৩৪
১১. ক. বিমসটেক (BIMSTEC) কি? খ. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন হিসেবে বিমসটেকের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করুন।	৬৩৭
১২. ক. পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ন্যাটো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? খ. এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিয়ে ন্যাটোর একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরুন।	৬৪১
১৩. আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় আফ্রিকান ইউনিয়নের ভূমিকা আলোচনা করুন।	৬৪৬

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. ISAF কি?	৬৫০
০২. SAFTA কি? এটি কখন থেকে কার্যকর হবে?	৬৫০
০৩. ASEAN-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত এবং এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?	৬৫০
০৪. SAARC কখন গঠিত হয়? এর পরবর্তী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?	৬৫০
০৫. বিমসটেক (BIMSTEC) কি? এর নামের বর্তমান পূর্ণরূপ কি?	৬৫০
০৬. বিমসটেকের (BIMSTEC) প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?	৬৫১
০৭. ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) কখন আত্মপ্রকাশ করে? এটি কোন চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়?	৬৫১
০৮. ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU)-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত এবং EU ভুক্ত নতুন ২টি দেশের নাম লিখুন।	৬৫১
০৯. সাফটা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত Trade Liberalization Program (TLP) সম্পর্কে আলোকপাত করুন।	৬৫১
১০. ভারতের ইতিবাচক নেতৃত্ব সার্ককে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে?	৬৫১
১১. ন্যাটো (NATO) কি? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?	৬৫১
১২. ন্যাটোর (NATO) বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?	৬৫২
১৩. ন্যাটোর (NATO) সর্বশেষ যোগ দেয়া দুটি দেশের নাম লিখুন।	৬৫২
১৪. ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কয়টি ও কি কি?	৬৫২
১৫. ন্যাটোর পূর্ববর্তী সদর দপ্তর কোথায় ছিল এবং কত সালে এটি স্থানান্তরিত হয়?	৬৫২
১৬. ন্যাটো-২০ কি?	৬৫২
১৭. এনআরএফ (ন্যাটো রেসপন্স ফোর্স) কি?	৬৫৩
১৮. ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্যগুলো কি কি?	৬৫৩
১৯. APEC কি? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?	৬৫৩
২০. NAFTA ও AFTA কি?	৬৫৩
২১. ওআইসি (OIC) কি? এর সদর দপ্তর কোথায়?	৬৫৩
২২. ওআইসি (OIC) কখন গঠিত হয় এবং এর প্রেক্ষাপট কি?	৬৫৪
২৩. ওআইসি (OIC)-এর মহাসচিব কিভাবে নির্বাচিত হয়?	৬৫৪
২৪. ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলো কি কি?	৬৫৪
২৫. ওআইসির প্রথম এবং সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?	৬৫৪
২৬. ওআইসি (OIC)-এর বর্তমান সদস্য কত ও কি কি?	৬৫৪

২৭. GCC-এর পূর্ণরূপ কি? এর সদস্য কয়টি? ৬৫৫
২৮. আফ্রিকান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? ৬৫৫
২৯. আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য দেশ কতটি ও কি কি? ৬৫৫
আঞ্চলিক সংস্থা সংগঠন পরিচিতি ৬৫৫

টীকা

I সাপটা এবং সাফটা *[৩০তম; ২৭তম বিসিএস]* ৬৬১
I আফটা (AFTA) ৬৬২
I এপেক (APEC) ৬৬২
I SAIC *[২৩তম বিসিএস]* ৬৬২
I আসিয়ান *[২১তম বিসিএস]* ৬৬২
I ন্যাটোর পুনর্গঠন *[১৭তম বিসিএস]* ৬৬৩
I এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক *[১৩তম বিসিএস]* ৬৬৩
I ডি-৮ (D-8) ৬৬৪
I আরব লীগ (League of Arab States) ৬৬৪
I আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU) ৬৬৪
I উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC) ৬৬৫
I ন্যাটো (NATO) ৬৬৫
I ওআইসি *[২৯তম বিসিএস]* ৬৬৫
I ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ৬৬৫

অধ্যায় - ০৫

বিশ্বের দ্বন্দ্ব ও বিবদমান বিষয়
Major Issues and Conflicts in the World

Syllabus — Major Issues and Conflicts in the World : *The Palestine Problem, the Arab Spring, the Kashmir Issue, the Syrian Crisis, Persian Gulf Conflict, nuclear issue and Iran, the North Korean issue, territorial disputes in Southeast and and East Asia, Nuclear proliferation and other contemporary issues.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের দাবিতে গণঅসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণসমূহ বর্ণনা করে বিস্তারিত লিখুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৬৬৯
০২. কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। *[১৩তম বিসিএস]* ৬৭২
০৩. ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে কি কি ধরনের সঙ্কট আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন? জ্বালানি বাজারে এর কি প্রভাব পড়তে পারে? *[৩৩তম বিসিএস]* ৬৭৫
০৪. আপনি কি অদূর ভবিষ্যতে দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণের কোনো সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। যদি করেন তবে এই পুনরেকত্রীকরণের সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প কি হতে পারে? *[২১তম বিসিএস]* ৬৭৮

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. 'আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে'— ফিলিস্তিন সমস্যার আলোকে এ উক্তির যথার্থতা বিচার করুন। ৬৮৪

০৬. 'মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন।'— পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিন। ৬৮৭
০৭. ক. ইয়েমেন সংকট কি?
খ. ইয়েমেনের বর্তমান অবস্থা বর্ণনাপূর্বক মধ্যপ্রাচ্যে এর কিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন? ৬৯১
০৮. ক. সিরিয়ায় সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের কারণ ও গৃহযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করুন।
খ. সিরিয়ায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? ৬৯৪
০৯. পারস্য উপসাগরের জলভাগ ও দ্বীপগুলো নিয়ে উপকূলবর্তী দেশগুলোর দ্বন্দের বর্ণনা দিন। ৬৯৮
১০. ইরানে পারমাণবিক সংকটের প্রেক্ষাপট ও উক্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হ্রাসকল্পে যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা আলোচনা করেন। ৭০০
১১. পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি ব্যাখ্যা করুন এবং এর আলোকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর অবস্থান ব্যক্ত করুন। ৭০৪
১২. ক. কিউবা সংকট কি?
খ. যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা কতটুকু? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৭০৯

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. দারফুর কোথায় অবস্থিত? কোন দুটি জাতি নিয়ে দারফুর সংকট সৃষ্টি হয়েছে? ৭১২
০২. শয়তানের অক্ষশক্তি (Axis of evil) বলতে কোন কোন দেশকে বোঝানো হয়? ৭১২
০৩. 'গ্রিন লাইন' কি? ৭১২
০৪. বাফার স্টেট (Buffer State) কি? ৭১২
০৫. নো ম্যান্স ল্যান্ড (No Man's Land) কি? ৭১২
০৬. Jewish Protocol বা ইহুদি প্রোটোকল কি? ৭১৩
০৭. পিএলও'র (PLO) সদর দপ্তরের নাম কি? ৭১৩
০৮. ৩৮° অক্ষরেখা কি? ৭১৩
০৯. Sunshine পলিসি কি? ৭১৩
১০. জাপানের চারটি প্রধান দ্বীপের নাম লিখুন। ৭১৩
১১. PLO কি? এর অবিসংবাদিত নেতার নাম কি? ৭১৩
১২. বেলফোর কে ছিলেন? তার ঘোষণা কেন বিখ্যাত? ৭১৩
১৩. জেরুজালেম কেন বিখ্যাত? ৭১৩
১৪. রোডম্যাপ কি? ৭১৪
১৫. গ্রিন লাইন ও সিম লাইন কি? ৭১৪

টীকা

I আইএস ৭১৪
I উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা *[১১তম বিসিএস]* ৭১৪
I সিরিয়া সংকট ৭১৫
I কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধাবস্থা ৭১৫
I উপসাগরীয় যুদ্ধ ৭১৬
I সানশাইন পলিসি ৭১৭
I 'Wye River' চুক্তি *[২১তম বিসিএস]* ৭১৭
I কোরিয়ার যুদ্ধ ৭১৮

ইরাক যুদ্ধের সমাপ্তি ৭১৮
ইরাক-ইরান যুদ্ধ ৭১৯
ইরানের ইসলামী বিপ্লব ৭১৯
হরমুজ প্রণালী *[১১তম বিসিএস]* ৭১৯
শাত-ইল-আরব ৭২০
সুয়েজ খাল ৭২০
আবু মুসা ৭২১
পশ্চিম তীর ৭২১
গাজা ৭২১
ম্যাকাও ৭২২
মিন্দানাও ৭২২
গোলান মালভূমি ৭২২
মসুল ৭২৩
কুর্দিস্তান ৭২৩
ইয়াসির আরাফাত ও পলোনিয়াম বিতর্ক ৭২৩
সার্বভৌম রাষ্ট্র ফিলিস্তিন ৭২৪
বেলফোর ঘোষণা ৭২৪
পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি ৭২৫
ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি ৭২৬
ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা *[৩০তম বিসিএস]* ৭২৬
হামাস-ফাতাহ ঐতিহাসিক ঐক্যচুক্তি ৭২৭
হামাস ৭২৭
ফাতাহ ৭২৮
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ৭২৮
ইউক্রেন সংকট ৭২৮
ইয়াজিদি সম্প্রদায় ৭২৯
যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণগত উত্তেজনা ৭৩০

অধ্যায় - ০৬

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি
Politics in South Asia

Syllabus — Politics in South Asia : *India-Pakistan relations, Bangladesh-India relations, regional integration, water dispute, border problems and terrorism.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]* ৭৩২
০২. কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। *[১৩তম বিসিএস]* ৭৩৬
০৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উপর একটি রচনা লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৭৩৮
০৪. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার উপর আলোচনা করুন। পানি বণ্টন ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে আপনার মতামত উল্লেখ করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ৭৪৫

০৫. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে? উভয় দেশের পানি বণ্টন সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হতে পারে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]* ৭৪৯
০৬. বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণজনিত সমস্যা ও এর সমাধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৭৫৩
০৭. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন পর্যালোচনা করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য করণীয় আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]* ৭৫৬
০৮. দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট রয়েছে। এ সঙ্কট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো ভূমিকা আছে কি? আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৭৫৮
০৯. দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক ব্যবসা ও তার নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৭৬২
১০. ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর শেষে ঘোষিত যৌথ ইশতেহার-এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এরপর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? *[৩১তম বিসিএস]* ৭৬৬
অথবা, ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ও ভারতের অর্থমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে দু দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১১. 'ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি' দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক প্রতিযোগিতাকে কোন দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন? ৭৭০
১২. পাকিস্তান ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এবং বাংলাদেশের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ৭৭৫
১৩. ক. ট্রানজিট বলতে কি বোঝায়?
খ. ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের কি কি লাভ হতে পারে এবং কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে? ৭৭৬
গ. ভারত এই ট্রানজিটের ব্যাপারে এত আগ্রহ প্রকাশ করছে কেন?
১৪. বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিন এবং এ মামলার রায় বিশ্লেষণ করুন। ৭৮০
১৫. দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান ও আল-কায়েদার উত্থানকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের নিরাপত্তার বিষয়টা আলোচনা করুন। ৭৮৬
১৬. পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরুন। ৭৮৯
১৭. ক. আঞ্চলিকতাবাদ কি? ৭৯২
খ. এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতার সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. 'লাইন অব কন্ট্রোল' কি? ৭৯৫
০২. সেভেন সিস্টার্স (Seven Sisters) কি? ৭৯৫
০৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়? ৭৯৫
০৪. র‍্যাডক্লিফ লাইন কি? ৭৯৫

০৫. পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত কতবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে? ৭৯৫
০৬. 'পঞ্চশীল' বলতে কি বোঝায়? ৭৯৫
০৭. ২৪তম অক্ষরেখা কি? ৭৯৬
০৮. টিপাইমুখ বাঁধ এবং বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৭৯৬
০৯. গোল্ডেন ওয়েজ, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলতে কি বোঝায়? ৭৯৬

টীকা

ভারত-চীন যুদ্ধ ৭৯৭
পাক-ভারত যুদ্ধ ৭৯৭
জাফনা দ্বীপ ৭৯৭
বাংলাদেশ-ভারত নদী সম্পর্ক ৭৯৭
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্পর্ক ৭৯৮
এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক ৭৯৯
বন্দি প্রত্যর্পণ ও ভিসা সহজীকরণ চুক্তি ৭৯৯
ট্রানজিট, করিডোর, ছিটমহল ৮০০
অপারেশন পুশ ব্যাক ৮০০
জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট ৮০০
কাশ্মিরের নিয়ন্ত্রণ রেখা ৮০১
সিমলা চুক্তি ৮০১
ফারাক্কা বাধ ৮০২

অধ্যায়-০৭

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ
Bangladesh in International Affairs

Syllabus — Bangladesh in International Affairs : *Major achievements, challenges, future directions.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৮০৪
০২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৮০৭
০৩. 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। *[৩০তম; ১৫তম বিসিএস]*
অথবা, সার্কের প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক' (SAARC)-এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (SAARC)-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[২৯তম বিসিএস]* ৮০৯
অথবা, 'আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিহার্য।' আলোচনা করুন। *[২৫তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ৮১৫
০৫. স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে অর্জনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৮১৯
০৬. অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহের বর্ণনা দিন। ৮২৩
০৭. জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সম্পর্ক আলোচনা করুন। ৮২৬
০৮. জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৮৩২
০৯. বৈদেশিক সাহায্য কি? বাংলাদেশ কি কি উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ৮৩৬
১০. এ পর্যন্ত জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষী মিশন গঠিত হয়েছে? বর্তমানে বাংলাদেশ কোন কোন মিশনে শান্তিরক্ষায় কাজ করছে? ৮৩৮
১১. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা আলোচনা করুন। ৮৪২
১২. বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ৮৪৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? ৮৪৯
০২. কত সালে সার্ক গঠিত হয়? এর উদ্যোক্তা কে? ৮৪৯
০৩. বাংলাদেশ কবে সিডও সনদ স্বাক্ষর করে? ৮৪৯
০৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম লিখুন। ৮৪৯
০৫. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি? ৮৪৯
০৬. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন। ৮৫০
০৭. বাংলাদেশের আসিয়ান (ASEAN) জোটে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা লিখুন। ৮৫০
০৮. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন। ৮৫১

টীকা

টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ ৮৫১
টিকফা ৮৫২
শান্তির সংস্কৃতি ৮৫২
বাংলাদেশ-ভারত নৌ ট্রানজিট চুক্তি ৮৫২
ঢাকায় BIMSTEC সচিবালয় ৮৫৩
IPU'র প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ৮৫৩
CPA'র চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ ৮৫৩
উন্মোচিত মহিষের জীবনরহস্য ৮৫৪
পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ ৮৫৪
সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি ৮৫৪

সূচি

Section C Problem Solving

Syllabus : *The candidates may be asked to come up with an analysis of a problem and its solution on any aspect of global developments and security issues, such as trade, climate change, foreign aid, arms proliferation etc.*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০১. আইএস কিভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ? আইএস-এর কবল থেকে বিশ্বকে নিরাপদ রাখতে করণীয় বিষয় কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	৮৫৮
০২. আফ্রিকার অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ নাইজেরিয়ায় বোকো হারামকে কেন্দ্র করে দেশটির অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং সমাধানের পথগুলো আলোচনা করুন।	৮৬০
০৩. বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্য এবং বিশ্বকে অস্ত্রের ঝনঝনানিমুক্ত করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?	৮৬৩
০৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুত অর্থের বাস্তবায়নে সমস্যা এবং সমাধানকল্পে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করুন।	৮৬৬
০৫. পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী ও অনুন্নত দেশগুলোতে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সমাধান হিসেবে কী কী করা যেতে পারে?	৮৭০
০৬. বিশ্বের ভয়াবহ কয়েকটি ভূমিকম্পের পরিচয় প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কতটুকু? ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনামূলক মতামত দিন।	৮৭৫
০৭. সবুজ অর্থনীতি কি? সবুজ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক উল্লেখপূর্বক টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এর ভূমিকা আলোচনা করুন। সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও করণীয় কি? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করুন।	৮৭৯
০৮. রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায় নির্দেশ করুন। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত বলে মনে করেন কি?	৮৮৩
০৯. জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার জন্য আপনি কি সংস্থাটির সংশোধন বাঞ্ছনীয় মনে করেন? সংস্কারের রূপরেখা বিষয়ে আপনার নিজের মতামতগুলো দিন।	৮৮৮
১০. 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা সে দেশগুলোর উন্নয়নের অন্তরায়'— বিষয়টি আলোচনাপূর্বক সমাধানের পথগুলো নির্দেশ করুন।	৮৯২
১১. জিএসপি কি? সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার এ দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে কিরূপ প্রভাব ফেলবে? জিএসপি সুবিধা বহাল রাখতে হলে বাংলাদেশকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে?	৮৯৬
১২. ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে কি কি বাধা রয়েছে? এগুলো দূরীকরণে আপনার সুপারিশ কি?	৯০১
১৩. ইউরো জোনের কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণ বর্ণনা করুন। কিভাবে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?	৯০৬

মডেল প্রশ্ন ও উত্তর

- মডেল টেস্ট-০১ ..... ৯১৩
- মডেল টেস্ট-০২ ..... ৯১৪
- মডেল টেস্ট-০৩ ..... ৯১৫
- মডেল টেস্ট-০৪ ..... ৯১৬
- মডেল টেস্ট-০৫ ..... ৯১৭

৩৫তম বিসিএস



BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস ২০১৪	২৩তম বিসিএস ২০০১
৩৩তম বিসিএস ২০১২	২২তম বিসিএস ২০০১
৩২তম বিসিএস ২০১২	২১তম বিসিএস ১৯৯৯
৩১তম বিসিএস ২০১১	২০তম বিসিএস ১৯৯৯
৩০তম বিসিএস ২০১১	১৮তম বিসিএস ১৯৯৮
২৯তম বিসিএস ২০১০	১৭তম বিসিএস ১৯৯৬
২৮তম বিসিএস ২০০৯	১৫তম বিসিএস ১৯৯৪
২৭তম বিসিএস ২০০৬	১৩তম বিসিএস ১৯৯২
২৫তম বিসিএস ২০০৫	১১তম বিসিএস ১৯৯১
২৪তম বিসিএস ২০০৩	১০ম বিসিএস ১৯৯০

BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস ২০১৪

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং অথবা ২নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ৪ × ৫ = ২০

ক. জেনেভা কনভেনশন কি এবং এর মূল উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : জেনেভা কনভেনশন একটি মানবাধিকার চুক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট জেনেভায় পৃথিবীর ৫৮টি দেশের মধ্যে যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সাথে আচরণবিধির ওপর ৪টি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চারটি চুক্তিই 'জেনেভা কনভেনশন' নামে পরিচিত।

জেনেভা কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য : জেনেভা কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধাহত ও যুদ্ধবন্দিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এ চুক্তিতে বলা হয় যে, যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে, কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাদের ওপর কোনো প্রকার শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চাপিয়ে দেয়া যাবে না, বন্দি হওয়ার পরপরই তাদের বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে ইত্যাদি মানবাধিকার শর্ত এ চুক্তিতে অন্তর্নিহিত ছিল। এতে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বন্দি প্রত্যর্পণ নির্ধারিত হলে কিংবা কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বন্দিদের আশ্রয় দিতে সম্মত হলে বন্দিদের বন্দিদশা থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

খ. ট্যারিফ ও ট্যাক্স-এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : কোনো আমদানি বা রপ্তানিজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি শুল্কই হচ্ছে ট্যারিফ। অর্থাৎ ট্যারিফ হলো আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা, যাতে সরকার কর্তৃক আমদানি-রপ্তানির ওপর আরোপিত কর নির্দিষ্ট করা থাকে।

ট্যাক্স হলো সরকারি রাজস্বের উৎস যেটি, বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে প্রদেয় অর্থ। অর্থাৎ যার বিনিময়ে ট্যাক্স দাতা সরকারের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না।

ট্যারিফ ও ট্যাক্সের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয় :

১. ট্যারিফ সাধারণত আমদানি-রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের ওপর আরোপ করা হয়। কিন্তু ট্যাক্স-কোনো ব্যক্তির আয় বা সম্পদের ওপর আরোপ করা হয়।

২. ট্যারিফ বাধ্যতামূলক নয়। প্রয়োজনবোধে ট্যারিফ প্রদান করতে অস্বীকার করা যায়। কিন্তু ট্যাক্স বাধ্যতামূলক অর্থাৎ ট্যাক্স অস্বীকার করা যায় না।

৩. ট্যারিফের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা থাকে। কিন্তু ট্যাক্সের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সুবিধা থাকে না।

৪. ট্যারিফের পরিধি ট্যাক্সের পরিধি অপেক্ষা কম। পক্ষান্তরে, ট্যাক্সের পরিধি ট্যারিফের পরিধি অপেক্ষা বেশি।

৫. ট্যাক্স ও ট্যারিফ উভয়টি সরকারি রাজস্ব আয়ের উৎস। তবে ট্যাক্স আরোপ করা হয় দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, সম্পদ ও নাগরিকের আয়ের উপর। অন্যদিকে ট্যারিফ আরোপ হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উপর।

গ. সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কাজ কি? এর সদর দপ্তর কোথায়?

উত্তর : সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ট্রাইব্যুনাল ITLOS-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি International Tribunal for the Law of the Sea। তৃতীয় সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর 'সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন'-এ স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানির হামবুর্গভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমুদ্রবিষয়ক বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। বিভিন্ন দেশের ২১ জন বিচারক নিয়ে এ ট্রাইব্যুনাল গঠিত। বর্তমানে ১৬০টি দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) এ প্রতিষ্ঠানটির অধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ মার্চ ২০১২ এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মামলার রায় প্রদান করে। ৭ জুলাই ২০১৪ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করে নেদারল্যান্ডসের রাজধানী দি হেগ শহরে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA) এবং উক্ত রায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে ৮ জুলাই ২০১৪। বর্তমানে ITLOS এর সদর দপ্তর জার্মানির 'হামবুর্গে' অবস্থিত।

ঘ. কূটনীতিকগণ কর্মরত অবস্থায় কোনো দেশে কি ধরনের সুবিধাদি ও দায়মুক্তি (Immunities) পেয়ে থাকেন?

উত্তর : কূটনৈতিক মিশন, কূটনীতিক ও তার পরিবারের সদস্যরা এবং নির্ভরশীলরা বিদেশে অথবা স্বাগতিক দেশে ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশনস (১৯৬১)-এর আওতায় দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। যেমন— মিশন অফিস ও রাষ্ট্রদূতের বাসা অনতিক্রমণীয়। পূর্ব অনুমতি ছাড়া এসব স্থানে বা অন্যান্য স্বদেশভিত্তিক প্রশাসনিক ও কারিগরি স্টাফদের বাসায় (বিশেষ করে স্বাগতিক দেশে) প্রবেশ করা যায় না। তারা যে রাষ্ট্রে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাদের উপর সে রাষ্ট্রের আদালতের এখতিয়ার থাকে না। কোনো গুরুতর অভিযোগে অবাঞ্ছিত (Persona non grata) ঘোষণা করে বহিষ্কার করা যেতে পারে কিন্তু তারা জেল জরিমানা হতে মুক্ত থাকবেন। তাদের স্বদেশে প্রেরিত ও তাদের কাছে স্বদেশ থেকে আগত কোনো চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি স্বাগতিক রাষ্ট্রের কারো খোলার বা পরীক্ষা করার কোনো অধিকার নেই। কূটনীতিক বাসভবনে বা দপ্তরে কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি বা তল্লাশি চালানো যায় না। মিশন ও কূটনীতিকরা সবধরনের কাস্টমস্ ডিউটি, ট্যাক্স, পৌরকর ইত্যাদি পরিশোধ থেকে মুক্ত থাকবেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের বিশেষ আইনগত সুবিধা তারাই ভোগ করবেন যারা গ্রহণকারী রাষ্ট্রে কূটনৈতিকদের মর্যাদার

অধিকারী হবেন অথবা যারা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিট করে দেন কর্মস্থল থেকে ফেরা বা যোগদানের পথে। অধিকন্তু যদি একজন কূটনীতিককে একটি বাধ্যবাধকতাকে লঙ্ঘন করতে দেয়া যায় যা স্বাগতিক দেশের দেওয়ানি আইনের আওতায় পড়ে এবং কূটনৈতিক দায়মুক্তি দাবি করে সেক্ষেত্রে স্বাগতিক রাষ্ট্র প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে সংশ্লিষ্ট কূটনীতিক কর্তৃক পালনীয় বাধ্যবাধকতা পূরণে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেরণকারী দেশ সংশ্লিষ্ট কূটনীতিকের দায় মুক্তি প্রত্যাহার করতে পারে।

ঙ. Balance of Power বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : শক্তিসাম্য বা Balance of Power হলো ক্ষমতা ও শক্তির পরিমাপের সমতা বজায় রাখা। শক্তি সাম্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে মর্গেনথ্যু ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তার মতে, শক্তিসাম্য কথাটা পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও অর্থ প্রায় একই রকম। মর্গেনথ্যু সাম্য (Balance) ও ভারসাম্যকে (Equilibrium) সমার্থক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিসমূহকে (Forces) নিয়ে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে স্থিতিশীলতার নাম হলো Balance of Power বা শক্তিসাম্য। তিনি শক্তিসাম্যকে চারটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহারের পক্ষপাতী। যথা : ১. কোনো বিশেষ অবস্থা অর্জনের জন্য গৃহীত নীতি, ২. কোনো বাস্তব অবস্থা, ৩. মোটামুটিভাবে শক্তির সমবণ্টন এবং ৪. শক্তির যে কোনো ধরনের বণ্টন।

চ. উপনিবেশবাদ এবং নব-উপনিবেশবাদ বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর : উপনিবেশবাদ : ল্যাটিন শব্দ 'কলোনিয়া' (Colonia) থেকে ইংরেজি 'কলোনি' (Colony) বা উপনিবেশ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। 'উপনিবেশ' শব্দটির মূল অর্থ হলো 'মানবসমাজের একটি স্থানান্তরিত অংশ'। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে উপনিবেশ বলতে বোঝায় (১) দেশের সীমান্তের বাইরে কোনো রাষ্ট্রের বসতি স্থাপন; অথবা (২) রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ড উক্ত রাষ্ট্রের কাছে নির্দিষ্টভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে। আবার অনেকের মতে, কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিকানাধীন দূরবর্তী ভূখণ্ডকে উপনিবেশ বলে।

নব-উপনিবেশবাদ : প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ কর্তৃক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার নাম হলো নব-উপনিবেশবাদ বা New-Colonialism। নব-ঔপনিবেশিকতার ফলে আফ্রিকার বহু দেশে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক প্রাধান্যের স্থলে অর্থনৈতিক প্রাধান্য বজায় থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখল নব ঔপনিবেশিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ছ. কিয়োটো চুক্তি কি? এ চুক্তিটি কি উদ্দেশ্যে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

উত্তর : বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য বিশ্ব উষ্ণতা রোধে জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কিয়োটো চুক্তি বা প্রটোকল স্বাক্ষর করা হয়। এটি কার্বন নির্গমন কমানোর একমাত্র আইনগত চুক্তি। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালে। চুক্তিটি কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে। এর মেয়াদ শেষ হয় ২০১২ সালে ছয়টি গ্রিন হাউস গ্যাস-Carbon-di-oxide, Methane, Nitrous oxide, Sulphur hexafluoride, Hidrofluorocarbons and perflurocarbons কমানোর লক্ষ্যে এই কিয়োটো চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিতে বলা হয় যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন ২০০৮-২০১২ সাল নাগাদ ১৯৯০ সালের পর্যায়ে নিয়ে আসবে তথা গড়ে ৫ শতাংশ হারে হ্রাস করবে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক দেশকে নিজ দেশে উৎপন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমান অনুযায়ী হ্রাস করতে হবে। চুক্তিতে ৮ শতাংশ হারে

সুইজারল্যান্ড, মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন; ৭ শতাংশ হারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ৬ শতাংশ হারে কানাডা, হাঙ্গেরি, জাপান, পোল্যান্ড, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউক্রেনকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করতে বলা হয় ২০১২ সালের মধ্যে। কিন্তু উল্লিখিত সময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন না হওয়ায় চুক্তিটি দ্বিতীয় মেয়াদে ২০২০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এখন পর্যন্ত ২৭টি দেশ এর পক্ষে অনুসমর্থন দিয়েছে।

২. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) : $৪ \times ৫ = ২০$

ক. জাপানের আইনসভা

জাপানি আইনসভার নাম ডায়েট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে প্রণীত নতুন সংবিধান অনুযায়ী ডায়েটের ক্ষমতা ও পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়। ডায়েট দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। নিম্নকক্ষ 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস' এবং উচ্চ কক্ষ 'হাউস অব কাউন্সিলরস'। 'হাউস অব কাউন্সিলরস'-এর সদস্য সংখ্যা ২৪২। এ সভা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। অর্ধেক সদস্য প্রতি ৩ বছর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস'-এর মোট সদস্য ৪৮০। ৪৮০ জন সদস্য মোট ১১৮টি 'নির্বাচনী জেলা' থেকে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক জেলায় ৩ থেকে ৫ জন সদস্য থাকেন। সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ভোটার একটি করে ভোট দেন। যেসব সদস্য সর্বোচ্চ ভোট পান তারা জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস'-এ আসেন। 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস' চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। তবে সরকার যে কোনো সময় এ হাউস বিলুপ্ত করতে পারে। বিলুপ্ত হলে ৪০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন দিতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানি রাজনীতিতে ডায়েটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে জাপানি রাজনীতির মূলধারা ডায়েটকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে।

খ. বিশ্বায়ন (Globalization)

বিশ্বায়ন মূলত একটি সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষই একটি একীভূত বিশ্বব্যবস্থায় মিলিত হচ্ছে, যা বিশ্বায়নের ধারণাকে আরো জোরালো করে তুলছে। বিশ্বায়ন ধারণাকে অভিহিত করা হয়েছে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুপ্ত করছে। এটি এমন একটি সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা যে আমাদের জীবনের অধিকাংশ দিকই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে বিশ্বায়নকে অনেকে বি-আঞ্চলিকীকরণ (Delocalisation) প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন।

গ. এশিয়ান হাইওয়ে

এশিয়ান হাইওয়ে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার এক যুগান্তরকারী কর্মপরিকল্পনা। এশিয়ার ৩২টি দেশকে যুক্ত করবে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক। এক লাখ চল্লিশ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এই নেটওয়ার্কের আওতায় প্রতিটি দেশ পরস্পরের সাথে সড়ক পথে যুক্ত হবে। এশিয়ান হাইওয়ের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পূর্বদিকে চীন, মঙ্গোলিয়া ও ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিমদিকে তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ; দক্ষিণদিকে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার; দক্ষিণ পূর্বদিকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বাংলাদেশের এশিয়ান হাইওয়ে সংক্রান্ত তিনটি প্রস্তাব রয়েছে। প্রথমত, ভারত থেকে বেনাপোল-যশোর হয়ে ঢাকার ভেতর বা পাশ দিয়ে সিলেট-তামাবিল রাস্তায় পূর্বভারতে অনুপ্রবেশ সড়ক নির্মাণ। দ্বিতীয়ত, একটি সড়ক ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ হয়ে মিয়ানমারে প্রবেশ।

তৃতীয়ত, রুটটি মিয়ানমার থেকে ভারতের তামু দিয়ে প্রবেশ করে ডাউকি-তামাবিল-সিলেট-ঢাকা হয়ে বাংলাবান্ধা-শিলিগুড়িকে সরাসরি যুক্ত করবে নেপালের কাঁকরভিটার সাথে। পরবর্তীতে উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলোতে আরো কিছু সংশোধনী আনা হয়। পরিশেষে বলা যায়, এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক বাস্তবায়িত হলে এশিয়ায় যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব আসবে এবং এশিয়া হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক শক্তি।

ঘ. এ্যামব্যাসেডর ও হাইকমিশনার

এ্যামব্যাসেডর ও হাইকমিশনারের মাঝে মর্যাদাগত তেমন পার্থক্য নেই। দুটিই একরাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রে প্রেরিত সর্বোচ্চ শ্রেণীর কূটনীতিক দূতকে বুঝায়। তবে হাইকমিশনার বলতে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সর্বোচ্চ শ্রেণীর কূটনীতিকদের বুঝানো হয়। কমনওয়েলথ হলো ব্রিটেনসহ একসময় ব্রিটেনের অধীনে ছিল এমন রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন। রাষ্ট্রদূতকে তখনই হাইকমিশনার বলা যাবে যখন দুটি দেশই কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হয়। যেমন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ভারতে নিয়োগ পেলে তাকে হাইকমিশনার বলা হবে। তেমনিভাবে বাংলাদেশে নিয়োজিত ভারতের রাষ্ট্রদূতও হাইকমিশনার নামে পরিচিতি পাবেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ্যামব্যাসেডর নামে এবং বাংলাদেশে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতও এ্যামব্যাসেডর নামে পরিচিতি পাবেন। কেননা বাংলাদেশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হলেও যুক্তরাষ্ট্র কমনওয়েলথভুক্ত দেশ নয়। তাই কমনওয়েলথ বহির্ভূত দেশসমূহের সর্বোচ্চ কূটনীতিবিদ কিংবা বহির্ভূত কোনো দেশের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কূটনীতিকদের বলা হয় এ্যামব্যাসেডর।

ঙ. বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাত্র তিনমাসের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকাতে একটি ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত এই চুক্তির শিরোনাম ছিল "The Indo-Bangladeshi Treaty of Friendship, Co-operation and Peace"। বাংলাদেশের পক্ষে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। চুক্তিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, উভয় দেশের সীমান্তকে শান্তিপূর্ণ পর্যায়ে রাখা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি। এ চুক্তিটিতে ছিল ১২টি দফা এবং চুক্তিটি নবায়নযোগ্য ছিল। চুক্তিটির মেয়াদ ১৯৯৭ সালে শেষ হলেও উভয় দেশই চুক্তিটি নবায়ন করতে সম্মত থাকে। কিন্তু ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে গঙ্গার পানি নিয়ন্ত্রণ করলে চুক্তিটির সফলতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতামূলক অনেক চুক্তি হয়েছে। যেমন– ট্রানজিট ব্যবহারের নিয়ম নিয়ে, করিডোর সমস্যা নিয়ে, সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনে, সীমান্ত হত্যা হ্রাসকরণে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক অনেক আলোচনাই শোনা গিয়েছে। এসবের বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরো বন্ধুত্বপরায়ণ হবে।

চ. নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য দেশের ভূমিকা

নিরাপত্তা পরিষদ ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য। নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হচ্ছে : জাতিসংঘের নীতিমালা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে এমন সকল বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করা, এসব বিবাদ মিটানোর পদ্ধতি অথবা মীমাংসার

শর্তাবলী সুপারিশ করা, সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরি করা, শান্তির প্রতি হুমকির বাস্তবতা বা আগ্রাসনের ঘটনা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া প্রভৃতি। নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা বেশি হলেও কার্যত এদের তেমন ভূমিকা নেই। ভেটো প্রদানের ক্ষমতা কেবল স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রয়েছে। তবে পরিষদের কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫ সদস্যের মধ্যে ৯ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতি বছর ৫টি সদস্য তার ২ বছর মেয়াদ শেষ করে বিদায় নেয় এবং নতুন ৫টি সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। মূলত স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর খেয়াল-খুশির উপরই অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নির্ভরশীল থাকতে হয়।

ছ. World Economic Forum

World Economic Forum বা বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম একটি অলাভজনক স্বাধীন, নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, যা আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কাজে যুক্ত রয়েছে। এটি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত কলগনিতে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক এজেন্ডা তৈরিতে রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী, একাডেমিকসহ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে আন্তরিকভাবে এটি কাজ করে থাকে। সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করার খ্যাতি রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির। বিশ্ব জনমত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে অসংখ্য সম্মেলন, গবেষণামূলক কাজ, টাস্ক ফোর্স গঠন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের চেষ্টা চালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, World Economic Forum (WEF) নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে দু বছর আগে একটি কোটা পদ্ধতি চালু করে। বিশ্বের ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নিজেদের ৪ জন পুরুষ প্রতিনিধির বিপরীতে অবশ্যই একজন নারী প্রতিনিধি পাঠাবে। তবে সর্বশেষ সম্মেলনে ১৫ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব করে। এই ফাউন্ডেশন মূলত ১০০০টি সদস্য কোম্পানি দ্বারা অনুদানকৃত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩. ক. বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দা (Great Depression) কখন শুরু হয় এবং এর পিছনে কি কি কারণ ছিল? ১০

উত্তর : বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দা (Great Depression) দেখা দিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পরে। বিশ্ব ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ যখন অর্থনীতি মন্দার দিকে ধাবিত হয় তখন সমগ্র বিশ্ব মন্দার দিকেই ধাবিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ জার্মানদের উগ্র জাতীয়তাবাদ নীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিপক্ষে অক্ষশক্তি (Axis powers) যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ৬ এপ্রিল ১৯১৭ সালে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, সার্বিয়া, বেলজিয়াম ও রাশিয়া। অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক অক্ষশক্তি হিসেবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের ফলেই বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহামন্দা দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর মহামন্দা (দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন) সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে গভীর অমাবস্যা সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা নতুন কোনো ঘটনা নয়। যুগে যুগে মন্দা-মহামন্দার অভিঘাতে দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে সমগ্র বিশ্বের মানুষ। মহামন্দা কেটে গিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সুবাতাসও প্রবাহিত হয়ে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে মানুষের জীবনে। পুনরায় বিশ্ববাসীকে মুখোমুখি হতে হয়েছে মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতির। মন্দা-মহামন্দা বিভিন্ন কারণে ফিরে এসেছে বারবার। ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত তেমনি এক দীর্ঘ মন্দাকালের কথা জানা যায়। এর সূত্রপাত হয়েছিল ইউরোপ ও আমেরিকায় যার পশ্চাতে ছিল শেয়ারবাজার ধস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট ডিপ্রেশন : দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অর্থনীতির চাকা যেদিকে প্রবাহিত হয় বিশ্ব অর্থনীতিও সেদিকে প্রবাহিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও অর্থাৎ ১৯২৯-৩৪ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেট ডিপ্রেশন এর মন্দ সময় হলে তা দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলে। কর্মক্ষম ও কর্মেচ্ছুক প্রতি চারজনের একজন তখন বেকার। কেইনসীয় অর্থনীতির সমর্থক অধ্যাপক জন কেনেথ্ গ্যালব্রেথের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে তখন কার্যকর চাহিদা হ্রাসের ফলে উৎপাদন হ্রাস পায় আবার আয়ের অসম বণ্টন ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে কয়েকটি কোম্পানির হাতে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার ত্রুটি বিশ্বমন্দাকে ঘনীভূত করে। মনিটারিস্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মিলটন ফ্রিডম্যান মহামন্দার প্রধান কারণ সম্পর্কে মুদ্রার যোগান হ্রাস পাওয়াকে শনাক্ত করেন। মহামন্দার পরিস্থিতি যেমন রুজভেল্টকে হোয়াইট হাউজে আসতে সাহায্য করে একইভাবে মহামন্দার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য অনেকে 'ফ্যাসিজম'কে সমর্থন করায় হিটলার ক্ষমতায় এসেছিলেন। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বৃহৎ এ মন্দা অনুভূত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯২৯ সালে। এটি চলতে থাকে ১৯৩৪ সাল এমনকি চল্লিশের দশক পর্যন্ত। রাষ্ট্র ও অঞ্চলভেদে পার্থক্য ঘটেছে এ মন্দার গভীরতা ও সময়কালের। মহামন্দার সূত্রপাত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে-এর পেছনে ছিল শেয়ারবাজার ধস। তাছাড়া ক্রমাগত উচ্চ হারের বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি, ঋণগ্রস্ততা বিনিয়োগের ক্রমহ্রাস এবং বৈশ্বিক দ্বন্দ্বের কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এক ভয়াবহ অস্থিরতা বিরাজ করেছিল।

মহামন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দার পেছনে একক কোনো কারণ বিদ্যমান নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দার পেছনে যেসব কারণ বিদ্যমান সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পুঁজিবাদ ব্যবস্থা :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো পুঁজিবাদ ব্যবস্থার দিকে ঝুকে পড়েছে। সর্বোচ্চ মুনাফার তাড়নায়ই পুঁজিবাদ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সমগ্র পৃথিবীকে শক্তির দ্বারা নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার প্রাণান্ত চেষ্টা চলে। সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে উৎপাদনশীল শিল্প-পুঁজির পাশাপাশি ক্রমশ বেশি বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে লগ্নিপুঁজি। লগ্নি-পুঁজি বিনিয়োগে সরাসরি উৎপাদন বাড়ায় না, তাই প্রকৃত বিচারে বলা যায় এ পুঁজি অনুৎপাদনশীল। শুরুর দিকে উৎপাদনশীল ভূমিকা ছিল লগ্নিপুঁজির, পরবর্তীতে সে লক্ষ্য ধরে রাখতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকে সঙ্কটপূর্ণ করে তোলে। শুরু হয় পুঁজিবাদের স্থবিরতা।

২. **বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি :** বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার অন্যতম একটি কারণ বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি। যা রোধে বিশ্বের সরকার প্রধানরা নানাবিধ উদ্যোগ নিলেও ঠেকাতে পারেনি। এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি নাজুক অবস্থায় পড়ে তেলসমৃদ্ধ বিশেষ করে তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো। কারণ এসব দেশে হঠাৎ করে বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষতার সঙ্গে মুদ্রা পরিচালনায় তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে তেল আমদানিকারক দেশগুলোতে তেল, খাদ্যসহ নিত্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

৩. **দুর্বল মুদ্রানীতি ও অব্যবস্থাপনা :** বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দার অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক তথা মুদ্রানীতির দুর্বলতা ও অব্যবস্থাপনা। বিশেষজ্ঞরা এর মূলে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে অভিযুক্ত করেছে। বিংশ শতাব্দী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করলেও বাজারে অর্থনীতির নীতিগত দুর্বলতা পৃথিবীতে এ রকম মহামন্দা সৃষ্টি করেছে এবং করবে। বিশ্বব্যাপী এ মহামন্দা তারই একটি প্রতিফল।

৪. **উৎপাদন সমস্যা :** বিশ্বের অর্থনৈতিক এ মহামন্দার আরেকটি কারণ অধিক উৎপাদন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতিরা তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা লুটে নেওয়ার জন্য তাদের অর্জিত মুনাফার বড় একটা অংশ শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়া আবার জনসাধারণের প্রকৃত আয়কে সীমিত করে রাখে। ফলে শিল্প উৎপাদনে পুঁজি খাটিয়ে উৎপাদন বাড়ালেও তার চাহিদা প্রত্যাশিত হারে বড়ে না, সেজন্য বিক্রিও তেমন বাড়ে না। অন্যদিকে গুদামে পণ্যদ্রব্য জমে পাহাড়সম হয়ে পড়ে। তাই শিল্পে বিনিয়োগ করাটা আর লাভজনক থাকে না অথচ সর্বোচ্চ মুনাফা তাদের চাই, সে লক্ষ্যে পুঁজিও খাটাতে হবে। এভাবে অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ এবং অধিক উৎপাদন বিশ্বে অর্থনৈতিক মহামন্দার যৌক্তিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. **ভোগবাদী মার্কিন অর্থনীতি :** বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে প্রতিষ্ঠা করেছে ভোগবাদী দেউলিয়া অর্থনীতি। তারা এতটাই ভোগবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল যে সামান্য বিপর্যয় ঠেকাতেও অক্ষম। তাদের অর্থনীতিতে সঞ্চয় প্রবৃত্তি ছিল না বললেই চলে। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্থনৈতিক মন্দা মহামন্দায় রূপ নেয়। সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেও এ বিপর্যয়ের হাত থেকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। মার্কিন মন্দা ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী সংক্রমিত হয়। কাজেই এ কথা বলা যায় যে মার্কিন অর্থনীতির বিপর্যয়ই বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ।

৬. **আর্থিক খাতে রাষ্ট্রপ্রধানদের উদাসীনতা :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ব্যাংকিংসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল খাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নিয়ে এসেছে। এর সাথে উন্নত দেশের ব্যাংকসমূহ সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় কোনো রকমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা না থাকায়। এ ব্যাংকসমূহ সুপথে-বিপথে বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং অর্থনৈতিক বিপদের সম্মুখীন হয়।

৭. **শেয়ারবাজার ধস :** বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দার পেছনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল শেয়ারবাজার ধস। শেয়ারবাজারের ধসের প্রভাব দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পায় প্রায় ৫০ শতাংশ। শিল্পের উৎপাদন কমে যায় দেশে দেশে। মানুষের ব্যক্তিগত আয়, সরকারের আয়, দ্রব্যমূল্য ও মুনাফা সবই মারাত্মক হ্রাস পায়। আমেরিকাতে বেকারত্বের হার দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে। অন্যান্য দেশে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত। কৃষিপণ্যের মূল্য প্রায় ৬০ ভাগ কমে যাওয়ায় দারুণ আর্থিক সংকটে পড়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ করার মতো হ্রাস পায় জাতীয় আয়। ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট মহামন্দাকে ভয়াবহ উল্লেখ করা হয়। কোনো একটি দেশ এ মন্দার জন্য দায়ী না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ মন্দার সূত্রপাত হয়। আর সে মন্দা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্ব মহামন্দা দেখা দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সাথে সারা বিশ্বের অর্থনীতি জড়িত। এর বিশেষ কারণ হলো আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচার মাধ্যম হচ্ছে মার্কিন ডলার। মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমার অর্থ হলো অন্যদেশেরও ক্রয়ক্ষমতা কমা। মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা মানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অর্থনীতিতেও মন্দা সৃষ্টি হওয়া। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামন্দা সৃষ্টিতে মার্কিন অর্থনীতির মহামন্দা প্রধানত দায়ী। বিশেষ করে পুঁজিবাদী বিশ্বের অতি উদারীকরণ নীতি এ মন্দার পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়াও এর জন্য দায়ী মুক্তবাজার অর্থনীতি পরিচালনায় ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি।

খ. নুরেমবার্গ বিচার বলতে কি বুঝায়? এখানে কাদের বিচার করা হয়? ১০

উত্তর : কেউ কোনো অপরাধ করলে তার বিচার হতে হবে সমাজের এ নিয়ম সভ্যতার বোধের অন্তর্গত। হত্যা, নির্যাতন, সম্পদ লুণ্ঠন বা সম্পদহানি প্রাচীনকাল থেকেই মানব সমাজে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। এসব অপরাধের বিচার ও শাস্তির বিধান ভারত, চীন, মেসোপটেমিয়া, গ্রীস ও মিসরের প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।

নুরেমবার্গ বিচার : নুরেমবার্গ বিচার ১৯৪৫-৪৬ সালে জার্মানির ভ্যাভারেরয়া প্রদেশের নুরেমবার্গ শহরে অনুষ্ঠিত কিছু বিচার প্রক্রিয়ার নাম। তখন ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল নাৎসি বাহিনীর নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ গঠন করে এবং তাদের বিচার করে। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো ছিল মূলত চার ধরনের। যথা :

এক. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। যেমন— আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা, যুদ্ধের জোগাড় এবং যুদ্ধ শুরু করা।

দুই. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। যেমন— মানুষকে সমূলে বিনাশ করা, বাসস্থান থেকে বিতাড়ন করা এবং গণহত্যা।

তিন. যুদ্ধাপরাধ তথা যুদ্ধের আইনসমূহ লঙ্ঘন।

চার. উপরিউক্ত তিনটি অপরাধ করার সাধারণ পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র করা।

ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল : ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল নুরেমবার্গ বিচার করার অধিকার পেয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৮ আগস্ট লন্ডনে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির মাধ্যমে। ঐ দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সের প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিরা লন্ডনে মিলিত হয়ে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে, যাতে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তির কর্মকর্তাদের দ্বারা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে সংঘটিত অপরাধের বিচার করতে বলা হয়। পরবর্তীতে আরো ১৯টি দেশ চুক্তিটিকে সমর্থন জানায়।

১৯৪৫ সালের ৩০ আগস্ট পরাজিত জার্মানির রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যখন মিত্রশক্তির কন্ট্রোল কাউন্সিল (এসিসি) গঠিত হয় তখনও বিচারের পদ্ধতি সম্পর্কে শরিকদের ভেতর যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এসিসির নীতিমালায় বলা হয়েছে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্মিলিতভাবে করা হলেও যারা পরে যার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় ধরা পড়বে সেই দেশ তাদের বিচার করবে। ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল (আইএমটি) ২৪ জন শীর্ষ নাৎসি নেতার বিচার শেষ হওয়ার পর আইএমটির বিলুপ্তি ঘটে। তার স্থলে গঠন করা হয় নুরেমবার্গ মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল (এনএমটি)।

নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের গঠন ও কার্যক্রম : মানবজাতির ইতিহাসে নৃশংসতম গণহত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ ও মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়। জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি বাহিনী, ইতালিতে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট বাহিনী এবং প্রাচ্যে জেনারেল তেজোর রাজকীয় জাপানি বাহিনীর গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের কথা বিশ্ববাসী কখনও ভুলে যাবে না। হিটলারের নাৎসি বাহিনী এবং তাদের সহযোগী গেস্টাপো ও অন্যান্য বাহিনী যেভাবে ইহুদি, কমিউনিস্ট ও অজার্মানদের হত্যা করেছে সভ্যতার ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। যুদ্ধের ইতিহাসবিদরা নাৎসিদের এ নৃশংসতাকে আখ্যায়িত করেছেন হলোকস্ট বা শোয়াহ নামে।

২০ নভেম্বর ১৯৪৫ নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এর আগে ১৮-১৯ অক্টোবর মিত্রশক্তির আইনজীবীরা 'আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে' যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ২৪ জন শীর্ষস্থানীয় নাৎসি নেতা ও সমরনায়ক এবং ৭টি সংগঠনকে সুপরিকল্পিতভাবে লাখ লাখ মানুষকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে ৬৫ পৃষ্ঠার অভিযোগনামা পেশ করেন।

বিচার শুরু হওয়ার আগে নাৎসি পার্টির প্রধান হিটলার এবং তার দুই শীর্ষ সহযোগী হিমলার ও গোয়েবলস আত্মহত্যা করার জন্য বিচার থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। অভিযুক্তদের তালিকায় ১ নম্বর আসামি ছিলেন ডেপুটি ফুয়েরার মার্টিন বোরমান। গ্রেফতারের আগেই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯টি তদন্ত দল অভিযুক্ত নাৎসি নেতাদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে তদন্ত করেছেন। নাৎসি সরকারের দলিল, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র সংগ্রহ করা ছাড়াও তারা অনেক বন্দি নির্যাতন শিবির পরিদর্শন এবং প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের জবানবন্দী নথিবদ্ধ করেছিলেন।

নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য ৭টি নীতি বা ধারা প্রণয়ন করা হয়েছিল। ৬নং ধারায় বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক আইনে যেসব অপরাধ শাস্তিযোগ্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে—ক. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, খ. যুদ্ধাপরাধ ও গ. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, নুরেমবার্গ নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানও অব্যাহতি পাবেন না। এই নীতিমালার ভিত্তিতেই প্রস্তুত করা হয়েছিল অভিযোগনামা।

নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের নীতি ও কার্যবিধি প্রণয়নের সময় মিত্রপক্ষের আইনজীবীরা সম্ভাব্য সকল চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। জাস্টিস জ্যাকসন তার উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য সমালোচনা ও বিরুদ্ধ যুক্তি অত্যন্ত মেধা ও দক্ষতার সাথে খণ্ডন করেছেন। একটি সমালোচনা নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল গঠনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এটি ছিল 'বিজয়ীর বিচার'।

নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের উদ্বোধনী ভাষণে জাস্টিস জ্যাকসন এ বিষয়ে বলেছিলেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আদালত গঠনসহ আইনজীবী ও বিচারক সবই নিয়োগ করতে হয়েছে যুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তিকে পরাজিত অক্ষশক্তির অপরাধের বিচারের জন্য। অভিযুক্তদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসনের কারণে সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ কেউ নেই বললেই চলে, যারা এ বিচারে আগ্রহী হতে পারে। এক্ষেত্রে হয় পরাজিতদের বিচার করতে হবে বিজয়ীদের, নয় তো পরাজিতদের অপরাধের বিচারের ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে।' অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছিল, ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে অভিযুক্তদের আপিলের সুযোগ নেই, এমনকি বিচারকদের সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনেরও কোনো সুযোগ কার্যবিধিতে রাখা হয়নি।

নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে জাস্টিস জ্যাকসনের উদ্বোধনী ভাষণের মতোই আকর্ষণীয় ছিল তার সমাপনী ভাষণ। ২৬ জুলাই ১৯৪৫-এ প্রদত্ত এই ভাষণের উপসংহারে শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের একটি উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, অভিযুক্তরা বলছেন তারা হত্যা, হত্যার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের এই দীর্ঘ তালিকায় বর্ণিত অপরাধের সাথে যুক্ত ছিলেন না। তারা এ বিচারের সামনে এমনভাবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছেন যেভাবে রক্তরঞ্জিত গ্লচেস্টার দাঁড়িয়েছিলেন তার নিহত রাজার লাশের সামনে। এদের মতো গ্লচেস্টারও বিধবা রানীকে বলেছিলেন, আমি হত্যা করিনি। রানী জবাবে বলেছিলেন, তাহলে বলো তারা নিহত হয়নি, কিন্তু তারা মৃত। যদি এদের (অভিযুক্তদের) সম্পর্কে বলা হয় এরা নিরাপরাধ, তাহলে তা এমনই সত্য হবে যুদ্ধ বলে কিছু হয়নি, কেউ নিহত হয়নি, কোনো অপরাধের ঘটনাও ঘটেনি।

নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে ৪টি মিত্র দেশের ৮ জন বিচারক ছিলেন যাদের একজন পূর্ণ সদস্য অপরজন বিকল্প সদস্য। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন ইংল্যান্ডের লর্ড জাস্টিস জিওফ্রে লরেন্স, ৪টি দেশের ৫২ জন আইনজীবী ছিলেন সরকারের পক্ষে।

নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের একটি সচিবালয় ছিল। বিভিন্ন বিভাগে মোট ১৮ জন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম দফা বিচারকালে ৬ জন ছিলেন সচিব, ২ জন মার্শাল, অনুবাদ বিভাগের প্রধান ছিলেন ৩ জন, প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান ১ জন, সাক্ষীদের তলব ও সাক্ষ্য প্রমাণ বিভাগের ১ জন প্রধান, অভিযুক্তদের তথ্য বিভাগের প্রধান ১ জন, দলিল ও রেকর্ডের বিভাগের দায়িত্বে ১ জন, রেকর্ড সম্পাদক ১ জন এবং মুদ্রণ বিভাগের পরিচালক ১ জন। এ সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগে তিন শতাধিক কর্মচারী ছিলেন। এ বিচারকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য আমেরিকা থেকে ৬৪০ জন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি নুরেমবার্গ এসেছিলেন যাদের ভেতর ১৫০ জন ছিলেন আইনজীবী।

নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করলেও নুরেমবার্গ ট্রায়ালের রেকর্ড কখনও ভাঙ্গা যাবে না। বিচার চলাকালে কয়েকশ সৈন্য ৭৫ মি.মি. কামান সমেত প্যালেস অব জাস্টিসের চতুর্দিকে টহল দিত। শতাধিক মিলিটারি পুলিশ আদালত ভবনের ভেতর টহল দিত। জনশক্তির বিবেচনায় নুরেমবার্গ ট্রায়ালের দ্বিতীয় উদাহরণ বিচারের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি।

যাদের বিচার করা হয়

১ অক্টোবর ১৯৪৬ নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে প্রথম পর্যায়ে শীর্ষস্থানীয় ২৪ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারে ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ৩ জনকে যাবজ্জীবন, ২ জনকে ২০ বছর, ১ জনকে ১৫ বছর এবং ১ জনকে ১০ বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩ জন খালাস পায়। অভিযুক্ত বাকি দুজনের ভেতর জার্মান শ্রমিক ফ্রন্ট ডিএএফ-এর প্রধান গুস্তাভ ক্রুপকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য মেডিকেল বোর্ড বিচারের সম্মুখীন হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে। অপর অভিযুক্ত ডাঃ রবার্ট লাই বিচার শুরু হওয়ার আগে ২৫ অক্টোবর ১৯৪৫ তারিখে আত্মহত্যা করেন। নাৎসি পার্টির সেক্রেটারি, ডেপুটি ফুয়েরার মার্টিন বোরমানের অনুপস্থিতিতে বিচার হয়েছিল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

নুরেমবার্গ ট্রায়াল বলতে সাধারণভাবে প্যালেস অব জাস্টিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের প্রথম বিচারকে গণ্য করা হয়, যার সময়কাল ছিল ১০ মাস। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত নুরেমবার্গের প্যালেস অব জাস্টিসে আরও ১২টি মামলার বিচার হয়েছিল যেখানে ২০০ জন নাৎসি রাজনৈতিক নেতা, সামরিক কর্মকর্তা ও পেশাজীবীর বিচার হয়েছিল। এদের মধ্যে ২৪ জনকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, ৩৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। ৯৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩৫ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়। গুরুতর অসুস্থতা ও বার্ধক্যের কারণে ৪ জনকে বিচার থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ৪ জন বিচার চলাকালে আত্মহত্যা করেছিলেন। এ ট্রাইব্যুনালে নিম্নোক্ত ১২টি মামলা হয়েছিল :

১. ডক্টর্স ট্রায়াল (৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ – ২০ আগস্ট ১৯৪৭) : ২৪ জনের বিচার হয়েছিল,
২. মিলচ ট্রায়াল (২ জানুয়ারি – ১৬ এপ্রিল ১৯৪৭) : ১ জনের বিচার হয়েছিল,
৩. জাজেস ট্রায়াল (৫ মার্চ – ৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭) : ১৬ জনের বিচার হয়েছিল,
৪. পল ট্রায়াল (৮ এপ্রিল – ৩ নভেম্বর ১৯৪৭) : ১৮ জনের বিচার হয়েছিল,
৫. ফ্লিক ট্রায়াল (১৯ এপ্রিল – ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৭) : ৬ জনের বিচার হয়েছিল,

৬. আই জি ফারবেন ট্রায়াল (২৭ আগস্ট ১৯৪৭ – ৩০ জুলাই ১৯৪৮) : ২৪ জনের,
৭. হস্টেজেস ট্রায়াল (৮ জুলাই ১৯৪৭ – ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) : ১২ জনের,
৮. রুশা বা রাশিয়া ট্রায়াল (২০ অক্টোবর ১৯৪৭ – ১০ মার্চ ১৯৪৮) : ১৫ জনের,
৯. আইনসাজ গ্রুপেন ট্রায়াল (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ – ১০ এপ্রিল ১৯৪৮) : ২৭ জনের,
১০. ক্রুপ ট্রায়াল (৮ ডিসেম্বর ১৯৪৭ – ৩১ জুলাই ১৯৪৮): ১২ জনের,
১১. মিনিস্ট্রিজ ট্রায়াল (৬ জানুয়ারি ১৯৪৮ – ১৩ এপ্রিল ১৯৪৯) : ২১ জনের বিচার করা হয়েছিল।
১২. হাই কমান্ড ট্রায়াল (৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৭ – ২৮ অক্টোবর ১৯৪৮) : ১৪ জনের বিচার করা হয়েছিল।

নুরেমবার্গ ট্রায়াল সম্পর্কে বলা যায়, আইন শাস্ত্রের ইতিহাসে এত বড় বিচার কখনও হয়নি। এ বিচার আন্তর্জাতিক আইনকে সমৃদ্ধ করেছে। সভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার ও শাস্তির বোধ প্রতিষ্ঠা করেছে। যার ফলে দেশে দেশে অনুরূপ অপরাধ বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর আগে বা পরে কোনো দেশের ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানকারী সামরিক-বেসামরিক নেতৃবৃন্দকে কখনও আদালতের কাঠগড়ায় এভাবে দল বেঁধে দাঁড়াতে হয়নি যেমনটি হয়েছে নুরেমবার্গে। একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিমণ্ডলী কিংবা কোনো দল বা সংগঠন যত শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেন কেউই উর্ধ্বে নয় নুরেমবার্গের বিচার এই বোধটিও প্রতিষ্ঠা করেছে।

এসব বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের রায়ে অপরাধের বৈশিষ্ট্য এবং বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবেচনা ও বিচার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা ও মাত্রা সংযোজিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থা হয়েছে সমৃদ্ধ। যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল বিশাল আয়োজনের পাশাপাশি আইনি লড়াইয়ের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় বিশ্বের বিচারব্যবস্থায় তা এক নতুন অধ্যায়, অতীতে যেমনটি দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে কি না সন্দেহ।

৪. ক. ষোড়শ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? ৪
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩।

খ. বিশ্ব রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভূমিকা ও কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩।

গ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতিগুলো লিখুন। ৬
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩।

৫. ক. APEC কি? এ সংস্থাটি কত সালে, কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়? ৪
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৩।

খ. APEC এর মূল তিনটি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৪ × ৩ = ১২
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৩।

গ. APEC কর্তৃক অনুসরিত নীতিমালাগুলো সদস্য দেশগুলোর জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেছে কি? করে থাকলে পয়েন্ট আকারে লিখুন। ৪
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৩।

৬. ক. অর্থনৈতিক কূটনীতির সংজ্ঞা দিন। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৬৬।

খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকগুলো সাম্প্রতিক সময়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৯৪।

৭. ক. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ সৌদি আরব কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গ সংস্থার অন্যতম একটি নিরাপত্তা পরিষদ, যার অপর নাম স্বস্তি পরিষদ। ১৯৪৬ সালে ১১টি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হলেও ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ সনদ সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১১টি থেকে বাড়িয়ে ১৫টি করা হয়। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছর মেয়াদে নির্বাচিত হয়।

১৭ অক্টোবর ২০১৩ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় সৌদি আরব। নির্বাচিত হওয়ার পরদিন ১৮ অক্টোবর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করে এক নজিরবিহীন ঘটনার জন্ম দেয় দেশটি। বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, সবার আগে প্রয়োজন জাতিসংঘের সংস্কার।

দীর্ঘদিনের ফিলিস্তিন সমস্যা, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত করাসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা এবং দ্বিমুখী নীতির কারণে সৌদি কর্তৃপক্ষ এমন ঘোষণা দেয়। নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানায়, এর জন্য বিশ্বসভার সর্বোচ্চ এ পরিষদের অসম নীতি দায়ী।

তবে সৌদি আরবের এমন হতাশা নতুন বা আকস্মিক নয়। বরং বহু বছর ধরে পুঞ্জীভূত হতাশার দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ। এর আগে একই ধরনের হতাশা ব্যক্ত করে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিতে অস্বীকৃতি জানান সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সৌদ আল ফয়সাল। সৌদি আরবের এ হতাশা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কারণে।

শিয়া অধ্যুষিত দেশ ইরান ও সিরিয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন মোটেই পছন্দ নয় সৌদি আরবের। ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের জের ধরেই হয়তো কথা ছিল ইরানকে যেভাবেই হোক কোণঠাসা করে রাখার।

ইরান ও ইসরাইলকে ইঙ্গিত করে সৌদি আরবের অভিযোগ, মধ্যপ্রাচ্যকে পরমাণু অস্ত্রসহ গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত করার ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ। একই সাথে বিগত ৬৭ বছর ধরে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে একাধিকবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অমীমাংসিত ও স্পর্শকাতর এ বিষয় এখনও বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে জাতিসংঘ।

মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ ব্যর্থতার কারণ হিসেবে সৌদি আরব দায়ী করছে 'ইন্টারন্যাশনাল ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস' বা আন্তর্জাতিক বৈষম্য নীতিকে।

ফিলিস্তিনিদের তাড়িয়ে ইসরাইল সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও অবহেলিত থেকে গেছে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৈষম্য নীতির কারণে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ ইস্যুতে সীমাহীন দীর্ঘ শান্তি আলোচনা। জাতিসংঘের এমন ব্যর্থতায় ক্ষোভ যেন শেষ সীমায় পৌঁছেছে সৌদি আরবসহ গোটা আরব বিশ্বের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, সৌদি আরবের অভিযোগ মূলত যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে। কারণ বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের জন্য তাদের মায়াকান্না দেখা গেলেও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের প্রতিশ্রুতির কোনো বাস্তবায়ন নেই।

ফিলিস্তিন সমস্যার সাথে জড়িত আছে ইরান ও সিরিয়া ইস্যু। ঐ অঞ্চলে ইরানের উত্থান স্বাভাবিকভাবেই সৌদি আরবের জন্য মাথা ব্যথার কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের গানে ঠোঁট মেলানো ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। তাই ইরানই ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে মূল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

একদিকে লেবাননের শিয়া গেরিলা গোষ্ঠী হিজবুল্লার সাথে ইরানের সখ্যতা, অন্যদিকে সিরিয়ার শিয়া একনায়ক বাশার আল আসাদের সাথে দহরম মহরম সম্পর্কের কারণে অস্বস্তিতে সৌদি আরব। অনেকে মনে করছেন, পরমাণু ইস্যুতে ইরানকে শায়েস্তা না করে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনায় যাওয়ার পদ্ধতিটা সম্ভবত সৌদি কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি। সৌদি আরব সিরিয়ার বিদ্রোহীদের পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে আসলেও শেষ মুহূর্তে দামেস্ক ও তেহরানকে কোণঠাসা করার সে উপায়টাও যেন হাতছাড়া হয়ে যায়। লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করলেও আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ নিরাপত্তা পরিষদ। বরং রাসায়নিক অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে সব কিছুই যেন ভন্ডুল হয়ে গেলো। রাতারাতি খলনায়ক থেকে নায়কে পরিণত হলেন প্রেসিডেন্ট আসাদ।

এসব কারণে সৌদি কর্তৃপক্ষ মনে করছে, সবার আগে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। মূলত জাতিসংঘের এ সংস্কার চায় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ছাড়া অনেকেই। স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনের আশঙ্কা বহু আকাঙ্ক্ষিত সংস্কার হলে বিশ্ব ক্ষমতার ভারসাম্য ও ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। তার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন খেলোয়াড়ের আমদানি ঘটবে। আর এর ফলে জাতিসংঘ নিজেই তার বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

সৌদি আরবের রাজনৈতিক ঐতিহ্য হলো ঘটনার পিছনে থেকে কলকাঠি নাড়ানো। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে এভাবেই নিজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিল করে থাকে দেশটি। বিশেষ করে জি-টুয়েন্টির সদস্য হিসেবে গত কয়েক বছরে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের অবস্থান আরো জোরদার করতে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র সৌদি আরব।

খ. পণ্য বিনিময় বা বার্টার অব কমোডিটিস বলতে কি বুঝায়? কোন পরিস্থিতিতে পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়? ১০

৮. ক. সন্ত্রাসবাদ কি? "মুসলিম বিশ্ব সন্ত্রাসের শিকার"—এ বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? ব্যাখ্যা দিন। ১০

খ. জাতিগত সংঘাত বলতে কি বুঝায়? এই সংঘাত সৃষ্টির মূল কারণগুলো বর্ণনা করুন। ১০

৩৩তম বিসিএস ২০১২

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরসহ মোট আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২ × ১০ = ২০

ক. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দুইটি দেশের নাম কি? স্বীকৃতি প্রদানের তারিখ কত?

উত্তর : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দুইটি দেশের নাম ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) এবং ভুটান (৭ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

খ. প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কি কি? তন্মধ্যে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুতির পরিমাণ কত?

উত্তর : প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো হলো বিশ্বব্যাংক, জাইকা, আইডিবি এবং এডিবি। বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ১২০ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু ২৯ জুন ২০১২ বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ এনে অর্থায়নের চুক্তি বাতিল করলে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই সেতুর ৩৪ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহযোগিতা করার জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রনেতাকে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা দেয়া হয়? এটি কে গ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করায় 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' দেয়া হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। ২৫ জুলাই ২০১১ তার পুত্রবধূ ও বর্তমান কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী তার পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন।

ঘ. থ্রি জি (3G) বলতে কি বুঝায়? সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠান 3G চালু করে?

উত্তর : থ্রিজি (3G) বলতে বোঝায় 3rd Generation বা তৃতীয় প্রজন্ম। ১৪ অক্টোবর ২০১২ প্রথমবারের মতো থ্রিজি প্রযুক্তির মোবাইল সেবার পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার চালু করে টেলিটক কোম্পানি। বর্তমানে বাংলাদেশের সবকটি মোবাইল অপারেটর-ই থ্রি জি (3G) সেবা গ্রাহকদের দিচ্ছে।

ঙ. NATO এর সদর দপ্তর কোথায়? এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম লিখুন।

উত্তর : NATO-এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলস। NATO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮। দেশগুলো হচ্ছে— আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, গ্রিস, তুরস্ক, জার্মানি, স্পেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়া।

চ. ২০১২ সালে সাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কে কে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? তারা কোন দেশের নাগরিক?

উত্তর : ২০১২ সালে সাহিত্যে চীনের মো ইয়ান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্যার জন বি. গার্ডন (যুক্তরাজ্য) ও সিনইয়া ইয়ামানাকা (জাপান) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পান ফ্রান্সের প্যাট্রিক মোদিয়ানো ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুক্তরাষ্ট্রের জন ও' কিফ, নরওয়ের এডভার্ড মসার ও মে-ব্রিট।

ছ. টি-২০ বিশ্বকাপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কে? ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ কোথায় হবে?
উত্তর : টি-২০ বিশ্বকাপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকা। ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। তবে পরবর্তী টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত হবে ভারতে।

জ. সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনে বারাক ওবামা নির্বাচিত হলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন? তিনি কোন দলের প্রার্থী ছিলেন?
উত্তর : ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বারাক ওবামার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিট রমনি। তিনি 'রিপাবলিকান পার্টি'-এর প্রার্থী ছিলেন।

ঝ. WTO Ministerial conference কত দিন পরপর হয়? ২০১৩ সালের Ministerial conference কোথায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে?
উত্তর : WTO Ministerial Conference দুই (২) বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৩ সালের Ministerial Conference অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার বালিতে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে কেনিয়ার নাইরোবিতে।

ঞ. UNFCCC বলতে কি বুঝায়? কবে কোথায় এটি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : United Nations Framework Convention on Climate Change. এটি জাতিসংঘের আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক সংস্থা। ১৯২ (পর্যবেক্ষক দেশ ৪) সদস্য বিশিষ্ট UNFCCC এর সদর দপ্তর জার্মানির বন-এ অবস্থিত। UNFCCC স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলনে।

ট. BRICS কি? কবে, কোথায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়? কোন কোন দেশ এর সদস্য?
উত্তর : BRICS হলো বিশ্বের বর্ধনশীল অর্থনীতির ৫ দেশ নিয়ে গঠিত একটি অর্থনৈতিক জোট। সদস্য দেশগুলোর ইংরেজি আদ্যক্ষর নিয়ে ১৬ মে ২০০৮ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিকস-এর সদস্য দেশগুলো হলো ব্রাজিল (Brazil), রাশিয়া (Russia), ভারত (India), চীন (China) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa)।

ঠ. D-8 (ডি-৮) এর সদস্য দেশসমূহের নাম লিখুন।
উত্তর : তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়া।

ড. সর্বশেষ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন কোথায় ও কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে?
উত্তর : সর্বশেষ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন ইরানের তেহরানে ২৬-৩১ আগস্ট ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তদশ সম্মেলন ভেনিজুয়েলার কারাকাসে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

২. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৪ × ৫ = ২০

ক. মালালা ইউসুফজাঈ
উত্তর : তালেবানদের হামলার শিকার পাকিস্তানের নারীশিক্ষা আন্দোলনের অকুতোভয় কিশোরী মালালা ইউসুফজাঈ। পাকিস্তানে নারী শিক্ষা ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় লড়ে যাচ্ছিলেন এ কিশোরী। তালেবানী শাসনে পড়াশোনা না করতে পারার যন্ত্রণা এবং তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকার মানুষের জীবন-যাপন নিয়ে ২০০৯ সালে বিবিসি'র ওয়েব ব্লগে উর্দু সংস্করণে লেখা শুরু করেন মালালা। I am afraid শিরোনামে ব্লগ লেখার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিকভাবে সবার নজর কাড়ে মালালা। এর প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয় সে। নারী শিক্ষার পক্ষে সোচ্চার এ কিশোরীর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ৯ অক্টোবর ২০১২ মিঙ্গোরো শহরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে গুলি করে জঙ্গিরা। কিন্তু কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যায় মালালা। পরবর্তীতে মালালাকে ঘিরে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা ও দেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১০ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ সারা বিশ্বে মালালা দিবস পালন করে। এছাড়া বিশ্বের সব মেয়েশিশুকে ২০১৫ সালের মধ্যে স্কুলগামী করতে পাকিস্তান এবং ইউনেস্কো নতুন মালালা পরিকল্পনা ঘোষণা করে। নারী শিক্ষায় সহায়তায় গঠিত হয় ইউনেস্কো মালালা ফান্ড। এমনকি ২০১৩ সালের

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদানের জন্য তার পক্ষে আনুষ্ঠানিক আবেদন করে বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ। সর্বশেষ ২০১৪ সালে মালালা বিশ্বের সবচেয়ে দামি পুরস্কার শান্তিতে 'নোবেল' পদক পান। এর আগে ২০১২ সালের ওয়ার্ল্ড পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি ফাউন্ডেশনের 'সাহসিকতা পুরস্কার' লাভ করেন মালালা ইউসুফজাঈ। তার সম্মানে তার বাবা জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাঈকে জাতিসংঘের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। 'ডটার অব পাকিস্তান' ঘোষণার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস করেছে পাকিস্তান আইনসভা। এরপর তাকে 'ডটার অব পাকিস্তান' ঘোষণা করে দেশটির সরকার। তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির আইনপ্রণেতা রবিয়ান সাদাত কাইমখানি জাতীয় পরিষদে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

খ. আন্না হাজারে ও ভারতের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন
উত্তর : ভারতের প্রখ্যাত সমাজকর্মী আন্না হাজারে। ভারতে দুর্নীতিবিরোধী কঠোর আইনের দাবিতে কয়েক দফা অনশনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। গণআন্দোলনে রূপ নেয়া তার দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে নড়বড়ে অবস্থানে চলে যায় সরকার। ২০১১ সালের এপ্রিলে প্রথমবারের মতো দুর্নীতি ও কালো টাকার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেন আন্না হাজারে। সে সময় সরকার তাকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানায় এবং সুশীল সমাজের বাছাইকৃত লোকদের নিয়ে নতুন দুর্নীতি দমন আইনের খসড়া প্রণয়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু কয় মাস বাদেই তা পরিত্যক্ত হয় এবং ভারত সরকার নিজের মতো করে তৈরি করে একটি বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করে। এর প্রতিবাদে আন্না হাজারে ১৬ আগস্ট ২০১২ দ্বিতীয় দফা অনশনের ঘোষণা দিলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং জেলে পাঠানো হয়। এতে ভারতজুড়ে হৈচৈ পড়ে যায় এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়ে হাজারের সমর্থকরা। ফলে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই সরকার আন্নাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

গ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
উত্তর : IMF-এর পূর্ণরূপ International Monetary Fund। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮টি দেশ। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। এ সংস্থার নির্বাহী প্রধানের পদবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক। আর্থিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা এবং কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন করা এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত পরিচালক পর্ষদ, কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী, প্রধান পরিচালক ও সচিবালয় নিয়ে। বর্তমানে IMF এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে রয়েছেন, ফ্রান্সের ক্রিস্তিন লাগার্দ (৫ জুলাই ২০১১ থেকে বর্তমান)।

ঘ. রোহিঙ্গা সমস্যা এবং রামু ইস্যু
উত্তর : সাম্প্রতিক কালের মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যকার জাতিগত দাঙ্গায় আবারও জীবন্ত হয়ে ওঠে রোহিঙ্গা ইস্যু। দেশটির পদদলিত সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গা জাতির ওপর নির্যাতনের ভুলে যাওয়া ইতিহাস আবারও জ্বলন্ত হয়ে উঠে। রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। পরবাসেও আশ্রয়দাতার গলার কাঁটা— শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তারা আশ্রয় খুঁজছে বেশ কয়েক দশক ধরে। বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় দমনাভিযানের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গারা এখনো বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

এমন অবস্থায় ঐ জাতিগত দাঙ্গাকে পুঁজি করে বাংলাদেশের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ কক্সবাজারের রামুতে কয়েকটি বৌদ্ধ প্যাগোডায় রাতের অন্ধকারে ব্যাপক অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশাসনসহ দেশের সচেতন নাগরিকের কারণে তা আর ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারেনি।

ঙ. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

উত্তর : জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের জন্যে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী মূল অঙ্গসংস্থা হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council– ECOSOC) গঠিত হয়। প্রথমে এ পরিষদের সদস্য ১৮ থাকলেও ১৯৬৫ সালে ২৭ এবং ১৯৭৩ সালে ২৭ থেকে ৫৪ করা হয়। পরিষদের সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে; প্রতিটি সদস্যের রয়েছে একটি করে ভোট এবং একজন প্রতিনিধি। প্রতিবছর ১৮টি সদস্য পদ শূন্য হলে সেই আসনগুলোতে নির্বাচন হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও নীতি-নির্ধারণী প্রস্তাবাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ উন্নয়নের জন্যে সহযোগিতা ও কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণত সংস্থার কাজ নিয়ে আলোচনার জন্যে বছরে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে মিলিত হয়। প্রতিবছর একমাস স্থায়ী দুটি অধিবেশনে মিলিত হয় একবার নিউইয়র্কে, আরেকবার জেনেভায়। অধিবেশনে মন্ত্রীসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা যোগ দেয় যাতে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। পরিষদের গোটা বছরের কাজকর্ম পরিচালিত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে। ১৯৪৬ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ECOSOC-এর প্রথম সভাপতি ভারতের রাম সোয়ামি মুদালিয়ার। সভাপতির মেয়াদকাল ১ বছর। অঞ্চলভিত্তিক সদস্য দেশ– আফ্রিকা ১৪, এশিয়া ১১, পূর্ব ইউরোপ ৬, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ১০, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য ১৩টি।

চ. BIMSTEC

উত্তর : দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুনর্গঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা বিমসটেক বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রথম চিন্তা আসে ১৯৯৭ সালে। এর মূল উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ড এ সংক্রান্ত একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরি করে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার সাথে যোগাযোগ করে। উক্ত দেশগুলো থাইল্যান্ডের কনসেপ্টের সাথে নীতিগত সম্মতি প্রদান এবং জোটে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তখন চারটি দেশের নামের ইংরেজি বানানের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা Economic Co-operation (EC) যোগ করে সংস্থার নামকরণ করা হয় বিসটেক বা BISTEC (Bangladesh, India, Sri-Lanka, Thailand Economic Cooperation)। পরে ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর মিয়ানমার এ সংস্থায় যোগদান করায় নামকরণ করা হয় বিমসটেক বা BIMSTEC অর্থাৎ Bangladesh, India, Myanmar, Sri-Lanka, Thailand Economic Cooperation। এর পরে নেপাল ও ভুটান এ সংস্থায় যোগ দেয়। নেপাল ও ভুটান নতুন সদস্য হওয়ায় এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ৩১ জুলাই ২০০৪ এ সংস্থার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয় এবং বিমসটেক (BIMSTEC) শব্দটি অপরিবর্তিত রেখেই সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয়। নতুন নাম হচ্ছে Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation সংক্ষেপে BIMSTEC। উল্লেখ্য, ঢাকায় ২০১৪ সালে বিমসটেকের সদর দপ্তর চালু হয়।

৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার উপর আলোচনা করুন। পানি বণ্টন ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে আপনার মতামত উল্লেখ করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪৫।

৪. "জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।"– আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩৫।

৫. MDG কি? MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩১৩।

৬. "বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"– আলোচনা করুন। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৮২।

৭. নেপালের নদীতে জলবিদ্যুতের বিশাল সম্ভাবনাকে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল জ্বালানি সংকট নিরসনে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে তা আলোচনা করুন। ১০

৮. গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দার কারণসমূহ আলোচনা করুন। এ সংকট নিরসনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩০৯।

৯. ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে কি কি ধরনের সংকট আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন? জ্বালানি বাজারে এর কি প্রভাব পড়তে পারে? ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৭৫।

১০. "বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।"– আলোচনা করুন এবং এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩১৮।

১১. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয় এবং উপযোগিতার বিষয়টি আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩।

১২. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে SAARC-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৫।

৩২তম বিসিএস : ২০১২

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রাথীদিগকে ১ এবং ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২×১০ = ২০

i. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, যা সাধারণভাবে শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত, কত তারিখে কোন সনে সম্পাদিত হয়?
উত্তর : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বা পার্বত্য শান্তি চুক্তি ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জাতীয় সংসদের তৎকালীন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)।

ii. **মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ কোনটি? কোন তারিখে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়?**
উত্তর : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ ভারত। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

iii. **ফেসবুক (Facebook) কি? এর আবিষ্কারক কে?**
উত্তর : ফেসবুক হচ্ছে ইন্টারনেটে সামাজিক সম্পর্কের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। দূরে থাকা বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন কিংবা আপনজনদের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায় এর মাধ্যমে। পুরনো বন্ধুদের সাথে নতুন করে পরিচয় ও বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখা, নতুন বন্ধু খোঁজা, বিভিন্ন নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে যুক্ত থাকাসহ সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে ফেসবুকের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা যায়। এর আবিষ্কারক বা প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্ক জুকারবার্গ। তিনি ২০০৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

iv. **ICIMOD কি? এই সংস্থার সদস্য কারা?**
উত্তর : ICIMOD-এর পূর্ণরূপ International Centre for Integrated Mountain Development। ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদানে সহযোগিতা করে থাকে। এর সদস্য ৮টি দেশ হলো আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল এবং পাকিস্তান। সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

v. **ভারতীয় পার্লামেন্টের কক্ষ দুটির নাম কি?**
উত্তর : দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম কাউন্সিল অব স্টেটস বা রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা লোকসভা।

vi. **কিয়োটা প্রটোকল কোথায় গৃহীত হয়? এর মেয়াদ কখন শেষ হবে?**
উত্তর : ভূমণ্ডলের তাপবৃদ্ধি ও আবহাওয়ামণ্ডলের পরিবর্তন রোধবিষয়ক কিয়োটো প্রটোকল ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ জাপানের কিয়োটোয় স্বাক্ষরিত হয়। কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর ২০১২। অতঃপর ২৬ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত UNFCCC-এর ১৮তম সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ৮ বছর বৃদ্ধি করে ২০২০ সাল পর্যন্ত করা হয়।

vii. **'Witness to Surrender' এবং 'Surrender at Dhaka' বই দুটির লেখক কারা?**
উত্তর : Witness to Surrender— বইটির পাকিস্তানি লেখক সিদ্দিক সালিক (Siddique Salik) এবং Surrender at Dhaka—বইটির লেখক ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব (J.F.R. Jacob)।

viii. **জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন কোন সদস্য রাষ্ট্রের 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে?**
উত্তর : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫ সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে।

ix. **কোন সনে বাংলাকে ভাগ করা হয়? ঐ সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?**
উত্তর : শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলাকে ভাগ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন (মেয়াদকাল ১৮৯৯-১৯০৫)।

x. **ওসামা বিন লাদেনকে হত্যাকারী মার্কিন বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের নাম কি?**
উত্তর : ওসামা বিন লাদেনকে হত্যাকারী মার্কিন বাহিনীর সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশেষ ইউনিটের নাম ইউএস নেভিসিলস।

xi. **ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান মহাসচিব কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক?**
উত্তর : ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (পূর্বনাম ইসলামী সম্মেলন সংস্থা) বর্তমান মহাসচিব আইয়াদ বিন আমীন মাদানি। দশম মহাসচিব হিসেবে ১ জানুয়ারি ২০১৪ তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সৌদি আরবের নাগরিক।

xii. **বিখ্যাত গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতা (Gettysburg Address) কে, কখন প্রদান করেন?**
উত্তর : বিখ্যাত গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতা প্রদান করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন। ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সৈনিকদের জাতীয় গোরস্থানে তিনি এ বক্তৃতা করেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোর অন্যতম।

২. **টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) :** $৪ \times ৫ = ২০$

i. **জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs)**
উত্তর : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goals–MDGs) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেটসহ সবধরনের উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং সাফল্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন– CPD-সহ অন্যরা সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং চলমান পরিস্থিতিতে এ লক্ষ্য অর্জন আশানুরূপ নয় বলে মনে করেন। জাতিসংঘ গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ৮টি লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যসমূহ হলো :
লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।
লক্ষ্য-২ : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।
লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।
লক্ষ্য-৬ : এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

ii. **আরব বসন্ত (Arab Spring)**
উত্তর : ২০১০ সালের শেষের দিকে আরব রাষ্ট্রসমূহের জনগণের বিভিন্ন দাবিতে যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন সংঘটিত হয় তাই আরব বসন্ত বা আর-রবিউল আরাবী নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এর আরেক নাম আরব গণজাগরণ। পুলিশের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে

আত্মাহুতি প্রদানকারী তিউনিশিয়ার নাগরিক মোহাম্মদ বুয়াজিজির মৃত্যুর মাধ্যমে ১৮ ডিসেম্বর ২০১০ সালে এটি শুরু হলেও ক্রমেই তা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিষয়ের পরিপেক্ষিতে জন্ম নিয়েছে এই আরব বসন্ত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আরব দেশসমূহে বিদ্যমান রাজতন্ত্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন আরব দেশসমূহে শ্রমিক শোষণ চলছিল। যার ফলে ভেতরে ভেতরে আরো অনেক আগেই মৃদু প্রতিবাদ দানা বাঁধছিল। বিগত দশকে এ অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং এ গণজাগরণ ত্বরান্বিত হয়। এ গণজাগরণের ফলে তিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবিদিন বেন আলী বরখাস্ত হন এবং পালিয়ে সৌদি আরবে নির্বাসনে যান। ১৪ মার্চ ২০১১ তার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর ক্রমে আলজেরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মৌরিতানিয়া, সুদান, ওমান, সৌদি আরব, মিশর, ইয়েমেন, ইরাক, বাহরাইন, লিবিয়া, কুয়েত, মরক্কো, পশ্চিম সাহারা অঞ্চল, সিরিয়া ও ইসরাইলে এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষোভে সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ফেসবুক ও টুইটারের ভূমিকাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ বিক্ষোভের ফলে মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদচ্যুত হন এবং তার সরকার ক্ষমতা হারায় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এখনো সেখানে প্রতিরোধ চলছে। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি ২০ অক্টোবর ২০১১ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ বিক্ষোভের মুখে কিছুদিনের মধ্যে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সিরিয়া এবং বাহরাইনে সরকার পরিবর্তন না ঘটলেও বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। কুয়েত, লেবানন এবং ওমানে বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে শীঘ্রই সরকার বদল হবে। মরক্কো ও জর্ডানে বিক্ষোভের ফলে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আলজেরিয়া এবং ইরাকসহ বিভিন্ন দেশে এখনও বিক্ষোভ চলছে। মূলত গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন এবং স্বৈরাচারী সরকার বদলই এই আরব গণজাগরণের লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা মতে ৩০ হাজার থেকে ৩৭ হাজার লোক এই আরব গণজাগরণে শহীদ হয়েছেন। অভ্যুত্থানে সহযোগিতা ও অবদানের জন্য ইয়েমেনের তাওয়াক্কুল কারমান ২০১১ সালে লাইবেরিয়ার অন্য দুজন নারীর সাথে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

iii. জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change)

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বিশ্ব নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির অধিকাংশই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণ এবং বনভূমি উজাড় করার ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এর ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আধুনিককালে ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস, শিল্পায়নের ফলে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এর ফলে ১৮৫০-১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

iv. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)

উত্তর : ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য দেশভিত্তিক PRSP বা Poverty Reduction Strategy Papers কার্যক্রম গ্রহণ করে, যার বাংলা করা হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। এখানে ২০০০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি' যেসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের টার্গেট নিয়েছে তার বাস্তবায়নের পথ সুগম করার কথা বলা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা, যা মূলত সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থায়ীকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোর দেয়। এটি মূলত ৮টি বিষয়ের ওপর জোর দেয়, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের বড় সমস্যা। এগুলো হলো : ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২. পুষ্টি, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৪. সুশাসন, ৫. মাতৃস্বাস্থ্য, ৬. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৭. দুর্নীতি দমন, ৮. সবসময় তদারক করা (ওপরের বিষয়গুলো)। প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে ২৩ অক্টোবর ২০০৮ শিক্ষা ও কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুমোদন করে সরকার। এ পিআরএসপির মেয়াদ তিন বছর, অর্থাৎ ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত। তিন বছর মেয়াদি এ দলিলকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক জাতীয় পরিকল্পনা বা দারিদ্র্য বিমোচনের দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পর জুলাই ২০১২ থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

v. বিশ্বায়ন (Globalization)

উত্তর : বিশ্বায়ন মূলত একটি সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষই একটি একীভূত বিশ্বব্যবস্থায় মিলিত হচ্ছে, যা বিশ্বায়নের ধারণাকে আরো জোরালো করে তুলছে। বিশ্বায়ন ধারণাকে অভিহিত করা হয়েছে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুপ্ত করছে। এটি এমন একটি সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা যে আমাদের জীবনের অধিকাংশ দিকই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে বিশ্বায়নকে অনেকে বি-আঞ্চলিকীকরণ (Delocalisation) প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন।

vi. ইন্টারপোল (Interpol)

উত্তর : International Criminal Police Organisation সংক্ষেপে Interpol। ইন্টারপোল হলো পুলিশ বাহিনীর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। ১৯২৩ সালে বিশ্বের ৫০টি দেশ মিলে পুলিশ বিভাগকে আধুনিকীকরণ এবং অপরাধীদেরকে দ্রুত চিহ্নিত ও ধরার লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। ইন্টারপোলের সদর দপ্তর ফ্রান্সের লিওঁতে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক কারণে কিছুদিন এর কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ১৯৪৬ সাল থেকে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হয়। ইন্টারপোলের একটা সাধারণ পরিষদ রয়েছে। এর অধিবেশন এক এক সময় এক এক সদস্য রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ত্বরিত যোগাযোগ স্থাপন, অপরাধীদের সন্ধান, গতিরোধ, গ্রেপ্তার ইত্যাদির জন্য এই কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্র ১৯০টি। বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে।

উদ্দেশ্য : ইন্টারপোলের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

- পুলিশ বিভাগ বা পুলিশ বাহিনীকে অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিনিময় করা।

লিখিত আন্তর্জাতিক - ৩

- এক দেশের অপরাধী অন্য দেশে যেন সহজে গা ঢাকা দিতে না পারে সে ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত কোনো আসামীকে স্বদেশে ফেরত দান।
- সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অপরাধ অনুসন্ধানের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- বিশ্বের অপরাধ দমন জোরদার করা এবং নাগরিক জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে? উভয় দেশের পানি বণ্টন সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হতে পারে আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪৯।

৪. স্নায়ুযুদ্ধ কি? স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫।

৫. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানা-পোড়েন পর্যালোচনা করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৫৬।

৬. আঞ্চলিক সহযোগিতার ফোরাম হিসাবে সার্ক (SAARC) এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৫।

৭. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩৫।

৮. গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোজোনে কি বিরূপ প্রভাব ফেলেছে? সংকট উত্তরণে ইউরোজোনের দেশগুলো কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩০৯।

৩১তম বিসিএস : ২০১১

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২ × ১০ = ২০

i. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে? যে কোনো প্রধান দুটি নদীর নাম উল্লেখ করুন।
উত্তর : যৌথ নদী কমিশন প্রদত্ত তথ্যমতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী ৫৪টি। তবে বাংলাপিডিয়ার সূত্রমতে আন্তঃসীমান্ত নদী ৫৫টি। প্রধান দুটি অভিন্ন নদীর নাম হচ্ছে– ১. গঙ্গা; ২. ব্রহ্মপুত্র।

ii. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা কত এবং বর্তমানে (২০১১ সালে) কোন কোন দেশ এই পরিষদের অস্থায়ী সদস্য?
উত্তর : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ১০টি। ২০১১ সালে এ পরিষদের অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে– বসনিয়া এ্যান্ড হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, গ্যাবন, লেবানন

ও নাইজেরিয়া (মেয়াদকাল ২০১০-২০১১) এবং জার্মানি, পর্তুগাল, দ. আফ্রিকা, ভারত ও কলম্বিয়া (মেয়াদকাল ২০১১-২০১২)। বর্তমানে, এ পরিষদে নির্বাচিত অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে– শাদ, চিলি, জর্ডান, লিথুয়ানিয়া ও নাইজেরিয়া (মেয়াদকাল ২০১৪-২০১৫) এবং ভেনিজুয়েলা, অ্যাঙ্গোলা, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড ও স্পেন (মেয়াদকাল ২০১৫-২০১৬)।

iii. নিম্নলিখিত দেশসমূহের যে কোনো দুটির রাজধানীর নাম লিখুন :
(১) এঙ্গোলা; (২) হাইতি; (৩) ফিজি; (৪) উরুগুয়ে।
উত্তর :

দেশ	রাজধানী
১. এঙ্গোলা	লুয়ান্ডা
২. হাইতি	পোর্ট অব প্রিন্স
৩. ফিজি	সুভা
৪. উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও

iv. জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রাগুলো কি কি?
উত্তর : জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে–
(১) চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা।
(২) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
(৩) নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
(৪) শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।
(৫) মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।
(৬) এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
(৭) টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
(৮) উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

v. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কত তারিখে, কোথায় শপথ গ্রহণ করেন এবং সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কারা ছিলেন?
উত্তর : বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়ার (তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা, এবং বর্তমানে মুজিবনগর) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন। তাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত থাকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

vi. ASEAN-এর সদস্য রাষ্ট্র কারা?
উত্তর : ASEAN বা Association of South East Asian Nations-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০টি। এগুলো হচ্ছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া।

vii. ডুরান্ড লাইন কি? এ লাইন কোন কোন দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে?
উত্তর : স্যার মোর্টিমার ডুরান্ড কর্তৃক ১৮৯৬ সালে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে যে সীমারেখা চিহ্নিত হয় তা ডুরান্ড লাইন নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান ডুরান্ড লাইন বরাবর সীমান্তের উত্তরাধিকার লাভ করে এবং তা

এখনো এ দেশ দুটির (আফগানিস্তান-পাকিস্তান) মধ্যকার সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত। তবে ১৯৪৯ সালে আফগানিস্তানের জাতীয় পরিষদ এ সীমারেখার ন্যায্যতা অস্বীকার করে এবং এখনো আফগান সরকার তা অস্বীকার করে আসছে।

viii. ওয়াল স্ট্রিট কোথায় অবস্থিত? এটি কেন বিখ্যাত?

উত্তর : ওয়াল স্ট্রিট যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। এটি শেয়ার ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।

ix. ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কি? এর বার্ষিক সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম হচ্ছে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ ফোরাম বিশ্বের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক বা একাডেমিক নেতৃবৃন্দের সাথে সংযোগ সাধন করে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এর বার্ষিক সভা দাভোস, সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এটি একটি জেনেভাভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা, যেটি তার বার্ষিক সভার জন্যই সর্বাধিক পরিচিত।

x. কোন দেশের আইনসভা কংগ্রেস নামে পরিচিত? কংগ্রেস-এর কক্ষগুলি কি কি?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। দুটি কক্ষের সমন্বয়ে মার্কিন কংগ্রেস গঠিত। প্রথম কক্ষের নাম হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস (House of Representatives) বা প্রতিনিধি পরিষদ এবং দ্বিতীয় বা উচ্চ কক্ষের নাম সিনেট (Senate)। প্রতিনিধি পরিষদের বর্তমান সদস্য ৪৩৫ জন ও সিনেট সদস্য ১০০ জন।

xi. গুগল কি? এটি কোন কাজে লাগে?

উত্তর : গুগল হচ্ছে একটি সার্চ ইঞ্জিন। গুগল অনুসন্ধান (সার্চ) ওয়েবের বৃহত্তম অনুসন্ধান ইঞ্জিন। তথ্য খোঁজার পাশাপাশি বর্তমানে ই-মেইল, সামাজিক নেটওয়ার্কিং ভিডিও, শেয়ারিং, নিউজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুগলের সেবা রয়েছে।

xii. ১৯৪৭ সালে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান কে ছিলেন?

উত্তর : স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। তিনি ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ১৩ মে ১৯৬২ পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

xiii. ২০১২ সালের অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? ২০০৮ সালের অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর : ২০১২ সালের ৩০তম অলিম্পিক যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে ২৯তম অলিম্পিক গেমস চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০১৬ অলিম্পিক গেমস ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিওতে অনুষ্ঠিত হবে।

২. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৪ × ৫ = ২০

ক. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ

উত্তর : জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫ এবং প্রত্যেকে একটি করে ভোটের অধিকারী। পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য। দেশগুলো হলো চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। স্থায়ী সদস্যদের 'ভেটো' (আমি মানি না) দেয়ার অধিকার রয়েছে। অস্থায়ী দশ সদস্য দুবছরের জন্য সাধারণ সভার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে নির্বাচিত হন। এশিয়া থেকে ২টি, আফ্রিকা থেকে ৩টি, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ২টি, পূর্ব ইউরোপ থেকে ১টি, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ২টি করে মোট ১০টি দেশ অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই কোনো সদস্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারে না। সদস্য না হলেও একটি দেশ আলোচনায় উপস্থিত থাকতে পারে,

বিশেষত যদি বিষয়টি তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়। ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী প্রতিটি সদস্যদেশ এক মাসের জন্য পরিষদের সভাপতি হয়। সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হচ্ছে : জাতিসংঘের নীতিমালা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমন সকল বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা, এসব বিবাদ মেটানোর পদ্ধতি অথবা মীমাংসার শর্তাবলী সুপারিশ করা, সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরি করা, শান্তির প্রতি হুমকির বাস্তবতা বা আগ্রাসনের ঘটনা চিহ্নিত করা এবং এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা সুপারিশ করা, আগ্রাসন বন্ধ বা প্রতিরোধ করতে শক্তি প্রয়োগ না করে অর্থনৈতিক অবরোধ বা আর কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সে ব্যাপারে সদস্যদের আহ্বান জানানো, কোনো আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেয়া, নতুন কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা, রণকৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে অছির দায়িত্ব পালন করা, জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগের জন্য সাধারণ পরিষদে সুপারিশ করা এবং সাধারণ পরিষদের সাথে একযোগে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নির্বাচন করা।

খ. দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা

উত্তর : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্যোগে এ পর্যন্ত যে সকল বাণিজ্য আলোচনা সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত একটি বাণিজ্য আলোচনা। এটি ২০০১ সালের নভেম্বরে শুরু হলেও সমন্বয়হীনতা এবং মতৈক্যের অভাবে আজও কোনো সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি। কাজেই এখনো এ বাণিজ্য আলোচনাটি সমাপ্ত হয়নি। এ বাণিজ্য আলোচনায় যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– কৃষি বিষয়ক আলোচনা। কৃষির বিষয়ে উন্নত বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী ভারত, চীন, ব্রাজিল, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝে ব্যাপক আলোচনা হলেও অগ্রগতি হয়েছে সামান্য। যুক্তরাষ্ট্রকে কৃষির ব্যাপারে আরো বেশি বাজার উন্মুক্ত করার আহ্বান করা হয়েছে। এ রাউন্ডে 'বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব' বা Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর নবায়নকৃত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দোহা সম্মেলনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র TRIPS এর আগের শর্তগুলোকে নমনীয় বললেও অন্যান্য দেশের চাপের মুখে ২০০৩ সালে নতুন TRIPS চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দোহা মন্ত্রীপর্যায়ের ঘোষণায় বাণিজ্য মন্ত্রীগণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষ এবং পার্থক্যকারী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ঐকমত্য হন। তারা এ ধরনের চুক্তিকে আরো সুস্পষ্ট কার্যকরী এবং বাস্তবায়নযোগ্য করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলো পূর্ববর্তী উরুগুয়ে রাউন্ডে আলোচিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে কম ধারণক্ষমতা বা কম কারিগরী সহায়তার কথা তুলে ধরেন। তারা আরো অভিযোগ করেন যে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা যেমন উন্নত বিশ্বে টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানিতে সুযোগ দেয়ার সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারছেন না। দোহা রাউন্ডটি ২০০১ সালে কাতারের মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে শুরু হলেও ২০০৩ সালে কানকুনে ও ২০০৫ সালে হংকংয়ে এ ধরনের সম্মেলন আবার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জেনেভা, প্যারিস ও পটসডামেও এ রাউন্ড সম্পর্কিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সর্বশেষ জুলাই ২০০৮ সালে কৃষি পণ্য আমদানি নিয়মনীতি সম্পর্কিত আলোচনাটি মতৈক্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। ২০১১ সালে জেনেভার দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ২০১১ সালের শেষ নাগাদ দোহা রাউন্ড বাণিজ্য

আলোচনা শেষ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দ্রুত এ রাউন্ড শেষ করার জন্য দরকার হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তন তথা নমনীয়তা। আর তা হলেই এ রাউন্ড আলোচনার সুফল সারা বিশ্ব বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্ব ভোগ করতে পারবে।

গ. নরম্যান্ডির যুদ্ধ

উত্তর : নরম্যান্ডির যুদ্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে মিত্রবাহিনী ও জার্মান নাৎসিদের মাঝে সংঘটিত একটি বড় সামরিক সংঘর্ষ। মিত্রবাহিনীর পক্ষে ছিল ১২ জাতি। এ যাবতকাল পর্যন্ত সর্ববৃহৎ সামুদ্রিক ও সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিল– অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, গ্রিস, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে মিত্রবাহিনী পরিচালিত এ সামরিক অভিযানের কোডনেম বা সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন ওভারলর্ড'। 'অপারেশন ওভারলর্ড' এর ব্যাপ্তি ছিলো তিন মাসেরও কিছু বেশি সময়। আর D-Day (Deliverance Day) বা মুক্তির দিন থেকে অর্থাৎ ৬ জুন ১৯৪৪ থেকে ৩০ জুন ১৯৪৪ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলে মিত্রবাহিনীর নিরাপদ অবস্থান গড়ে তোলার সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন নেপচুন'। তবে নরম্যান্ডির যুদ্ধ D-Day এর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, যখন মিত্রবাহিনী নরম্যান্ডি উপকূলে ৩০০ বিমানের সাহায্যে ১৩,০০০ বোমা নিক্ষেপ করে। এছাড়াও ছয়টি প্যারাসুট গ্রুপ ঐ উপকূলে অবতরণ করে রেললাইন বিচ্ছিন্ন করে, সেতু ভেঙে দেয় এবং আবাদী জমি দখলে নেয়। ১৯৪৪ সালের জুনের প্রথম দিকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে মিত্রবাহিনীর ৫,০০০ সামুদ্রিক যুদ্ধজাহাজ, ৪,০০০ মোটরযান এবং ১১,০০০ যুদ্ধবিমান নরম্যান্ডিতে পৌঁছায়। জুনের ১১ তারিখে মিত্রবাহিনীর ৩,২৬,০০০ সৈন্য, ৫৫,০০০ যুদ্ধযান এবং ১,০৫,০০০ টন রসদ এ উপকূলে পৌঁছায়। নরম্যান্ডির যুদ্ধের এ সময়ের মধ্যে জুলাই মাস ছিল মিত্রবাহিনীর জন্য একটি দুঃসময়। এ সময়ে জার্মান সশস্ত্র বাহিনী সীন নদীর উত্তর উপকূলে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের অবস্থানে বাধ্য করে। তবে ১৯ জুলাই বহু কষ্টে আমেরিকান সৈন্যরা সেন্ট-লু দখল করে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি সাধন করেন। জুলাইয়ের শেষে মিত্রবাহিনীর ভাগ্যে সুপরিবর্তন চলে আসে। 'অপারেশন কোবরা' সফল হওয়ায় আমেরিকান সৈন্যরা শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে ফেলে এবং ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে।

আগস্টের শুরুর দিকে জার্মান বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ হয়। আগস্টের এ সময়ে জার্মান সৈন্যরা এ উপকূল ছাড়তে বাধ্য হয় এবং তারা সীন নদী পাড়ি দিয়ে জার্মানিতে চলে যায়।

নরম্যান্ডির যুদ্ধের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, প্রায় চার লক্ষ পঁচিশ হাজারেরও বেশি জার্মান ও মিত্রবাহিনীর সদস্য মারা যায়, আহত হয় বা হারিয়ে যায়। ধারণা করা হয় যে ২,০০,০০০ জার্মান সৈন্য নিহত বা আহত হয়, ২০,০০,০০০ সৈন্য বন্দী করা হয়। যাদেরকে পরে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আমেরিকার কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফ্রান্সের ১৫ থেকে ২০ হাজার বেসামরিক লোক এ যুদ্ধে নিহত হন। নরম্যান্ডির এ যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানদের পশ্চিম জার্মানি সীমান্ত পর্যন্ত হটিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

ঘ. আরব বসন্ত

উত্তর : *৩২তম বিসিএস ২৩ পৃষ্ঠা দেখুন।*

ঙ. কিয়োটো প্রটোকল

উত্তর : বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য বিশ্ব উষ্ণতা রোধে জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর করা হয়। প্রটোকলটি স্বাক্ষরিত

হয় ১৯৯৭ সালে। এর মেয়াদ শেষ হয় ২০১২ সালে। এরপর কাতারের রাজধানী দোহায় ২৬ নভেম্বর ৮ ডিসেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত UNFCCC-এর ১৮তম সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ৮ বছর বৃদ্ধি করে ২০২০ সাল পর্যন্ত করা হয়। প্রটোকলটি কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫। প্রটোকলে বলা হয় যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন ২০০৮-২০১২ সাল নাগাদ ১৯৯০ সালের পর্যায়ে নিয়ে আসবে তথা গড়ে ৫ শতাংশ হারে হ্রাস করবে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক দেশকে নিজ দেশে উৎপন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ অনুযায়ী হ্রাস করতে হবে। প্রটোকলে ৮ শতাংশ হারে সুইজারল্যান্ড, মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন; ৭ শতাংশ হারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ৬ শতাংশ হারে কানাডা, হাঙ্গেরি, জাপান, পোল্যান্ড, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউক্রেনকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করতে বলা হয় ২০১২ সালের মধ্যে।

চ. আন্তর্জাতিক বিচার আদালত

উত্তর : জাতিসংঘ সনদের অবিচ্ছেদ্য অংশ এক আন্তর্জাতিক চুক্তি 'স্ট্যাটিউট অফ দি কোর্ট'-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। জাতিসংঘের সদস্য মাত্রই স্ট্যাটিউট অফ দি কোর্টের শরীক। আদালতের দপ্তর নেদারল্যান্ডের দি হেগ-এ অবস্থিত। তবে প্রয়োজন মনে করলে আদালত অন্যত্রও বসতে পারে। আদালতের খরচ বহন করে জাতিসংঘ। International Court of Justice হলো জাতিসংঘের প্রধান বিচার প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র আবশ্যকীয়ভাবেই এর আওতাধীন এবং এর বিচারের রায় মানতে বাধ্য। সর্বমোট ১৫ জন বিচারপতির সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। কোনো বিচারক এক মেয়াদের বেশি নির্বাচিত হতে পারেন, তবে একই সাথে এক দেশ থেকে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। আদালতে বিচারপতিগণের কার্যকাল ৯ বছর। দায়িত্ব পালনকালে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণ কূটনৈতিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ আদালতের একজন সভাপতি থাকেন যিনি ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে এবং তারা নিজেদের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট যে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ পেশ করতে পারে। আদালত তখন এ সংক্রান্ত আইনগত দিক বিবেচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। তবে কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালত হস্তক্ষেপ করে না। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে আন্তর্জাতিক আদালত আইনগত উপদেশমূলক মতামত প্রদান করতে পারে। তবে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে অনায়াসেই এ আদালতের ব্যর্থতা ফুটে ওঠে।

৩. বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণজনিত সমস্যার উপর বিস্তারিত আলোচনা করুন। সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৫৩।

৪. ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর শেষে ঘোষিত যৌথ ইশতেহার-এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এরপর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৬৬।

৫. দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট রয়েছে। এ সংকট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো ভূমিকা আছে কি? আলোচনা করুন।

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৫৮।

৬. আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্রের দাবিতে গণঅসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণসমূহ বর্ণনা করে বিস্তারিত লিখুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৬৯।

৭. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩০০।

৮. অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে আমরা কি বুঝি? বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৬৬।

৯. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও কমনওয়েলথ-এর কার্যক্রমের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। বর্তমানে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও কমনওয়েলথ্ কি যথার্থতা হারিয়ে ফেলেছে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩ ও ৮৬।

৩০তম বিসিএস : ২০১১

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ এবং ২ নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২ × ১০ = ২০

ক. **BIMSTEC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ কি? আগে এর পূর্ণরূপ কি ছিল?**
উত্তর : BIMSTEC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ হচ্ছে Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation। ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকের মাধ্যমে BIMSTEC আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। তখন চারটি দেশের নামানুসারে এর নামকরণ ছিল BISTEC এবং এর পূর্ণরূপ ছিল Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Co-operation। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর মিয়ানমার এ সংস্থায় যোগদান করায় নামকরণ হয় BIMSTEC, যার পূর্ণরূপ ছিল Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Co-operation। ২০০৩ সালে নেপাল ও ভুটান যোগদান করার পর ২০০৪ সালের ৩১ জুলাই এর পূর্ণরূপ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করে।

খ. **জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে? জাতিসংঘ দিবস কবে?**
উত্তর : ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন সানফ্রান্সিসকোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রশ্নে জাতিসমূহের সম্মেলনে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ সনদ রচনা করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। উক্ত সনদ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে।

গ. **এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? এই ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়?**
উত্তর : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ২২ আগস্ট ১৯৬৬ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৬। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৭, যার ৪৮টি সদস্য দেশ এশীয় এবং বাকি ১৯টি সদস্য দেশ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এর সদর দপ্তর ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত।

ঘ. **২০১০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক?**
উত্তর : ২০১০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন চীনের কারাবন্দী ভিন্নমতাবলম্বী মানবাধিকার কর্মী ও অধ্যাপক লিউ জিয়াওবো। তার অবদান হচ্ছে চীনে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ সময় ধরে অহিংস আন্দোলন।

ঙ. **বাংলাদেশ ককাস কি? এটি কোন দেশের আইন সভায় গঠিত হয়?**
উত্তর : বাংলাদেশ ককাস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের অর্থাৎ হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের কয়েক জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কমিটি, যারা বাংলাদেশের জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে দাবি উত্থাপন করে থাকেন। এর মূল উদ্যোক্তা ও কো-চেয়ারম্যান হলেন জোসেফ ক্রাউলি এবং উক্ত কমিটিতে ৩১ জন সদস্য রয়েছেন।

চ. **বর্তমান বিশ্বে কোন দেশে চারটি রাষ্ট্রধর্ম রয়েছে? ধর্মগুলো কী কী?**
উত্তর : রাশিয়া ফেডারেশনের রাষ্ট্রধর্ম চারটি। ১৯৯৭ সালে আইন পাসের মাধ্যমে খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ এবং ইহুদি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়।

ছ. **African Union (AU)-এর পূর্বনাম কি ছিল? AU-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?**
উত্তর : African Union (AU)-এর পূর্বনাম ছিল Organisation of African Unity (OAU)। Organisation of African Unity প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ২৫ মে। ২০০২ সালের ৯ জুলাই এর নাম পরিবর্তিত হয়ে African Union হয়।
AU-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে। তিনি ২০ জানুয়ারি ২০১৫ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। AU-এর প্রেসিডেন্টের মেয়াদ কাল ১ বছর।

জ. **জি-৮ এর সদস্য দেশগুলোর নাম কী? জি-৮ এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : জি-৮ এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো হলো : কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ইতালি, জাপান ও রাশিয়া। জি-৮ এর কোনো সদর দপ্তর নেই। প্রতিবছর একবার সদস্যভুক্ত দেশসমূহের নামের আদ্যক্ষরের ক্রমানুসারে প্রতিটি দেশে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঝ. **ইন্টারপোল (Interpol)-এর পূর্ণরূপ কি? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : Interpol নামকরণ করা হয়েছে International-এর Inter এবং Police-এর pol নিয়ে। Interpol-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে International Criminal Police Organization। Interpol-এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের লিওঁতে অবস্থিত।

ঞ. **বর্তমান বিশ্বে LDC দেশ কতগুলো? LDC তালিকাভুক্তি থেকে বের হওয়ার জন্য ন্যূনতম বার্ষিক মাথাপিছু আয় কত হওয়া দরকার?**
উত্তর : ১ জানুয়ারি ২০১১ মালদ্বীপ LDC ভুক্ত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসায় বর্তমান বিশ্বে LDC ভুক্ত দেশের সংখ্যা ৪৮টি। ECOSOC-এর মতে, নিম্ন আয় শর্ত মোতাবেক যে সকল দেশের মোট জাতীয় আয় তিন বছরে গড়ে ৭৫০ ডলারের নিচে এবং ৯০০ ডলার অতিক্রম করেনি তারা হচ্ছে LDC-ভুক্ত দেশ। আবার UNDP-এর HDI

রিপোর্ট অনুসারে, যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারের নিচে সেগুলো LDC তালিকাভুক্ত দেশ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং LDC তালিকাভুক্তি থেকে বের হওয়ার জন্য একটি দেশের ন্যূনতম বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারের উপরে থাকতে হবে।

ট. ভারতে 'সেভেন সিস্টার্স' বলতে কি বুঝায়? 'সেভেন সিস্টার্স'-এর নামগুলো কী কী?

উত্তর : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামী সাতটি রাজ্য একত্রে সেভেন সিস্টার্স হিসেবে পরিচিত। রাজ্যগুলো হলো— আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মণিপুর, মেঘালয় ও মিজোরাম।

ঠ. European Union কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) প্রতিষ্ঠিত হয় ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২৮। সর্বশেষ সদস্য ক্রোয়েশিয়া (১ জুলাই ২০১৩)।

ড. লেবাননের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কী? তিনি কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক?

উত্তর : লেবাননের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম মাইকেল সুলায়মান (Michel Suleiman)। মাইকেল সুলায়মান ২৫ মে ২০০৮ থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি মেরোনাইট ক্যাথোলিসিজম (Maronite Catholicism) ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুসারী।

ঢ. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সাফারি পার্কের নাম কী? এটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রথম সাফারি পার্কের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক। এটি কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায় অবস্থিত। এটি উদ্বোধন করা হয় ১৯ জানুয়ারি ২০০১।

ণ. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রথম মহাসচিবের নাম কী? তিনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

উত্তর : ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রথম মহাসচিব ছিলেন টেংকু আব্দুর রহমান। তার কার্যকাল ছিল ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। তিনি মালয়েশিয়ার নাগরিক ছিলেন। উল্লেখ্য, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান নাম ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা। ২৮ জুন ২০১১ বর্তমান নামকরণ করা হয়।

২. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) : $৪ \times ৫ = ২০$

ক. সাপটা এবং সাফটা; খ. কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্তি; গ. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত; ঘ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল; ঙ. ম্যাগনা কার্টা; চ. ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা; ছ. ফরাসি বিপ্লব।

ক. সাপটা এবং সাফটা

উত্তর : সাপটা : সাপটা (SAPTA-SAARC Preferential Trading Arrangement) হচ্ছে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার সম্পাদিত একটি বাণিজ্য চুক্তি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান এবং আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সাপটা স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের শেষ দিন ১১ এপ্রিল সার্ক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে SAPTA কার্যকর হয়।

সাপটার (SAPTA) গুরুত্ব :

১. সার্কের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে সাপটা চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সংরক্ষণবাদী নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাপটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৩. প্রাথমিকভাবে সার্কভুক্ত দেশগুলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে ১০% হারে শুল্ক হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্যকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৪. সাপটা চুক্তির ফলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে শিপিং, সার, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

সাফটা (SAFTA) : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। চুক্তিটিতে ছয়টি বিষয় বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে– ক. বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি, খ. রুলস অব অরিজিন, গ. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, ঘ. সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, ঙ. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ ও পার্থক্য নির্দেশকারী সুবিধা, চ. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি। SAFTA-এর পূর্ণরূপ South Asian Free Trade Area। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৬ জানুয়ারি ২০০৪ (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান) এবং কার্যকর হয় ১ জুলাই ২০০৬ থেকে। সাফটাভুক্ত দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভুটান, ভারত, নেপাল ও আফগানিস্তান।

এ চুক্তির লক্ষ্যসমূহ হলো :

১. এ অঞ্চলের মধ্যে ট্যারিফ, প্যারা-ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ ও বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার মতো অন্যান্য বাধা দূর করা;

২. সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন স্পর্শকাতর পণ্য ও লেনদেন বহির্ভূত রাখার তালিকা শনাক্ত করা;

৩. অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্তি

উত্তর : কূটনৈতিক মিশন, কূটনীতিক ও তার পরিবারের সদস্যরা এবং নির্ভরশীলরা বিদেশে অথবা স্বাগতিক দেশে ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশনস (১৯৬১)-এর আওতায় দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। যেমন- মিশন অফিস ও রাষ্ট্রদূতের বাসা অনতিক্রমণীয়। পূর্ব অনুমতি ছাড়া এসব স্থানে বা অন্যান্য স্বদেশভিত্তিক প্রশাসনিক ও কারিগরী স্টাফদের বাসায় (স্বাগতিক দেশে বিশেষ করে) প্রবেশ করা যায় না। তারা যে রাষ্ট্রে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাদের উপর সে রাষ্ট্রের আদালতের এখতিয়ার থাকে না। কোনো গুরুতর অভিযোগে অবাঞ্ছিত (Persona non grata) ঘোষণা করে বহিষ্কার করতে পারে কিন্তু তারা জেল জরিমানা হতে মুক্ত থাকবেন। তাদের স্বদেশে প্রেরিত ও তাদের কাছে স্বদেশ থেকে আগত কোনো চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি স্বাগতিক রাষ্ট্রের কারো খোলার বা পরীক্ষা করার কোনো অধিকার নেই। কূটনীতিকদের বাস ভবনে বা দপ্তরে কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি বা তল্লাশি চালানো যায় না। মিশন ও কূটনীতিকরা সবধরনের কাস্টমস্ ডিউটি, ট্যাক্স, পৌরকর ইত্যাদি পরিশোধ থেকে মুক্ত থাকবেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের বিশেষ আইনগত সুবিধা তারাই ভোগ করবেন যারা গ্রহণকারী রাষ্ট্রে কূটনৈতিক মর্যাদার অধিকারী হবেন অথবা যারা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিট করে দেন কর্মস্থল থেকে ফেরা বা যোগদানের পথে। অধিকন্তু যদি একজন কূটনীতিককে একটি বাধ্যবাধকতাকে লংঘন করতে দেয়া যায় যা স্বাগতিক দেশের দেওয়ানী আইনের আওতায় পড়ে এবং সেক্ষেত্রে কূটনৈতিক দায়মুক্তি দাবি করে সেক্ষেত্রে স্বাগতিক রাষ্ট্র প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে সংশ্লিষ্ট কূটনীতিক কর্তৃক পালনীয় বাধ্যবাধকতা পূরণে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেরণকারী দেশ সংশ্লিষ্ট কূটনীতিকের দায় মুক্তি প্রত্যাহার করতে পারে।

গ. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

উত্তর : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের যাত্রা শুরু ১ জুলাই ২০০২ এবং এটি কার্যক্রম শুরু করে ৯ নভেম্বর ২০০৬। নেদারল্যান্ডের রাজধানী হেগে এ আদালতের ১৮ জন বিচারপতি

তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। এটিই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম স্থায়ী যুদ্ধাপরাধ আদালত। যুক্তরাষ্ট্র এই আদালত বর্জন করেছে এবং সরাসরি আদালত গঠনের বিরোধিতা করেছে। রাশিয়া ও চীন এই আদালতকে মেনে নেয়নি। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশের ৩টিই এই আদালতকে সমর্থন করে না। তবে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই আদালত গঠনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে। ১৯৯৮ সালে রোম চুক্তির প্রতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশ অনুমোদন দেয়ার পর বছরের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠিত হয়। নেদারল্যান্ডের রানী বিট্রিক্সের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়।

ঘ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

উত্তর : IMF-এর পূর্ণরূপ International Monetary Fund। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮টি দেশ। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। এ সংস্থার নির্বাহী প্রধানের পদবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক। আর্থিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা এবং কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন করা এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত পরিচালক পর্ষদ, কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী, প্রধান পরিচালক ও সচিবালয় নিয়ে।

ঙ. ম্যাগনাকার্টা

উত্তর : ম্যাগনাকার্টা-এর বাংলা অর্থ হলো 'স্বাধীনতা সনদ'। ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসে এই চুক্তি 'ম্যাগনাকার্টা' নামে পরিচিত। সেই সময়ে রাজা ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, রাজা যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। ব্যাপক আন্দোলনের পরিণতিতে ইংল্যান্ডের জনগণ রাজার নিকট থেকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত এই সনদ আদায় করে নিয়েছিল। এই সনদের মৌল বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. রাজা প্রজাদের নিকট থেকে নিজের জন্য কোনো অর্থ আদায় করতে পারবেন না।
২. পার্লামেন্টের মতামত না নিয়ে রাজা প্রথম পুত্রকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত বা প্রথমা কন্যার বিয়ে সাব্যস্ত করতে পারবেন না।
৩. বিচার ছাড়া কাউকে কারারুদ্ধ করা, শাস্তি প্রদান করা বা আইনের আশ্রয়চ্যুত করা চলবে না।
৪. কোনো আইনগত অধিকার বা বিচার বিলম্বিত করা বা তা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না।
৫. স্থায়ী দেওয়ানি আদালত বা Civil Court প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই চুক্তির সুপ্রভাব শুধু ইংল্যান্ডে নয় অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতালিপ্সু রাজা সহজে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাননি। কিন্তু সকল সামন্ত মিলে রাজা জনকে লন্ডনের কাছে এক দ্বীপে বন্দি করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি বিচার বিভাগকেও অনেকটা নিরপেক্ষ করেছিল।

চ. ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা

উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পবিত্র স্থান ফিলিস্তিন তুরস্কের সুলতানের শাসনাধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন ব্রিটিশদের দখলে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ইহুদিদের পক্ষে ফিলিস্তিন ত্যাগ করলে ১৯৪৮ সালে

ফিলিস্তিনে ইহুদিরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৮ সালে মিশর অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সাথে একজোট হয়ে ইসরাইল আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয়। অতঃপর ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৭৩ সালে আরবদের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকবারই আরবরা পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় স্বদেশভূমি উদ্ধারের জন্য ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত ১৯৬৪ সালে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (PLO) গড়ে তোলেন। ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য ইয়াসির আরাফাত বিশাল বাহিনী গঠন করেন। ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় এবং ইয়াসির আরাফাত প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। জাতিসংঘ পিএলও-কে স্বীকার করে নেয়। ইসরাইল সরকার ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদের ভয়ে ভীত হয়ে তাদের অবস্থানের ওপর বারবার আঘাত হানে। তাদের প্রধান অবস্থান লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বারবার হামলা করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের সহায়তায় বর্তমানে ইসরাইল, আরব দেশসমূহ এবং পিএলওর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পিএলও-ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ছ. ফরাসি বিপ্লব

উত্তর : ১৭৭৮ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের নানা উত্তাল ঘটনাধারা 'ফরাসি বিপ্লব' নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সামন্ত যুগের পুরনো বিধি-বিধান পাল্টে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে এবং রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সম্মিলিত সামাজিক আধিপত্যের অবসান হয়। ইতিহাসবিদগণ সাধারণভাবে ফরাসি বিপ্লবের যেসব কারণ নির্দেশ করে থাকেন সেগুলো হলো : ১. গোটা ইউরোপে তৎকালীন ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ছিল না, ২. ধনী ও নতুন বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় কোনো ধরনের অংশ ছিল না, ৩. চাষীরা ছিল সচেতন এবং সামন্তব্যবস্থায় তাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না, ৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা যেসব দার্শনিক বলতেন তাদের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল, ৫. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসি সহায়তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য করে তুলেছিল।

সব মিলিয়ে সংকট ঘনিয়ে আসছিল এবং পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছিল সবাই। ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় চাচ্ছিল তাদের ক্ষমতা জোরদার করে নিতে। পক্ষান্তরে রাজা যখন এস্টেটস জেনারেল বা অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন, তখন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করলো। ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ ফরাসি দার্শনিক লেখকবৃন্দ (যেমন–ভলতেয়ার, রুশো) পুরনো বিধানকে বাতিল করে ব্যক্তি অধিকার ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পক্ষে জোরালো মত প্রচার করেছিলেন। ত্রিমুখী এই টানাপোড়েনে শেষ থার্ড এস্টেটস বা জনগণের পক্ষের শক্তি নিজেদেরকে জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ হিসেবে ঘোষণা করে এবং একটি লিখিত ফরাসি সংবিধান প্রণয়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয় এবং আজও এই তারিখটি বিশ্বব্যাপী ফরাসি বিপ্লবের দিন হিসেবে পালিত হয়।

নতুন জাতীয় পরিষদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল সামন্তবাদের অবসান সংক্রান্ত ডিক্রি এবং মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণকারী ফরাসি বিপ্লব নানা জটিলতার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে নেপোলিয়নের অভ্যুদয় আবার একনায়কী ব্যবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর কোনো কিছুই আর আগের মতো

ছিল না। বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলার শক্তি নেপোলিয়নেরও ছিল না। অভিজাতশ্রেণী ও ধর্মগুরুরা বিপ্লবের পূর্বের ক্ষমতা আর ফিরে পায়নি। মধ্যশ্রেণী ও কৃষকদের বর্ধিত অধিকার ও অর্জনকে সমীহ করে চলতে হয়েছিল সবাইকে। বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুগ যুগ ধরে প্রেরণাসঞ্চারী হয়ে আছে ফরাসি বিপ্লব।

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উপর একটি রচনা লিখুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৩৮।

৪. 'বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী মনোভাব বেশ প্রকট'— এই বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কী একমত? এর জন্য আল কায়েদা কতটুকু দায়ী? আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১০৪।

৫. বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২১২।

৬. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন। মন্দা প্রতিরোধে ওবামা প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন কী? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩০০।

৭. সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করুন। পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘের কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪২৩।

৮. দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক ব্যবসা ও তার নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৬২।

৯. দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও প্রভাব কী? ওবামা প্রশাসনের আফগান নীতি পর্যালোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৯৪।

২৯তম বিসিএস : ২০১০

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রার্থীদিগকে ১ এবং ২ নম্বর প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।।

নম্বর

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২×১০ = ২০

ক. আসিয়ান (ASEAN)-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : আসিয়ান (ASEAN)-এর সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত।

খ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানকারী দেশগুলোর নাম কি?
উত্তর : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে 'ভেটো' (আমি মানি না) প্রদানকারী ৫টি দেশ হলো– ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২. যুক্তরাজ্য, ৩. ফ্রান্স, ৪. চীন ও ৫. রাশিয়া।

গ. গ্রিন পিস কি?
উত্তর : গ্রিন পিস হলো আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন। ১৯৭১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক এ সংগঠনটির শাখা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে।

ঘ. WTO কখন কাজ শুরু করে?
উত্তর : WTO (World Trade Organization) ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে কাজ শুরু করে।

ঙ. স্টেট অব দি ইউনিয়ন কি?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রতিনিধি সভা ও সিনেট উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বছরের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে যে ভাষণ দেন তাকে স্টেট অব দি ইউনিয়ন বলা হয়।

চ. ভারতের প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রপতির নাম কি?
উত্তর : ভারতের প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রপতি হলেন ড. জাকির হোসেন। মেয়াদকাল ১৩ মে ১৯৬৭ থেকে ৩ মে ১৯৬৯।

ছ. উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (G.C.C)-এর সদস্য কারা?
উত্তর : উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC)-এর সদস্য দেশ ৬টি হলো সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

জ. IAEA-এর পুরো নাম কি? এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : IAEA-এর পূর্ণরূপ হলো International Atomic Energy Agency। এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত।

ঝ. জাতিসংঘের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেলের নাম কি?
উত্তর : জাতিসংঘের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ট্রাইগভে লাই (নরওয়ে)।

ঞ. ডি-৮ এর সদস্যগুলোর নাম কি?
উত্তর : ডি-৮ এর সদস্য দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়া।

ট. কোন কোন দেশ CTBT স্বাক্ষর করেনি?
উত্তর : সিটিবিটি স্বাক্ষর করেনি এমন দেশগুলো হলো ভুটান, কিউবা, ভারত, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া, ডোমিনিকা, মৌরিশাস, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, টোঙ্গা ও টুভ্যালু।

ঠ. Aila শব্দের অর্থ কি? এটি কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর : ঘূর্ণিঝড় 'Aila' অর্থ ডলফিন বা শুশুক জাতীয় এক ধরনের প্রাণী। এটি মালদ্বীপের দিভেহী ভাষার শব্দ।

ড. পানামা খাল কোন কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে?
উত্তর : পানামা খাল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে।

ঢ. Uyghur জাতি কারা এবং এদের বাসস্থান কোথায়?
উত্তর : Uyghur হলো তুরস্কের একটি মুসলিম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। উইঘুররা তুরস্কভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হলেও তাদের অধিকাংশের বাস চীনের উত্তর-পশ্চিম জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে, যেখানে তারা চীনের স্বীকৃত ৫৬টি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একটি হিসেবে বাস করে। এছাড়াও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে তাদের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

ণ. কিয়োটো (Kyoto) প্রটোকলের মেয়াদ কবে শেষ হবে?
উত্তর : ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর UNFCCC অনুসমর্থনকারী দেশসমূহ জাপানের

কিয়োটো শহরে আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে এমন একটি প্রটোকল গ্রহণে সম্মত হয়, যা কিয়োটো প্রটোকল নামে পরিচিত। এর মেয়াদ ছিল ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত। কিন্তু ২৬ নভেম্বর–৮ ডিসেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত UNFCCC-এর ১৮তম সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ৮ বছর বৃদ্ধি করে ২০২০ সাল পর্যন্ত করা হয়।

২. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) : $৪ \times ৫ = ২০$

ক. ওআইসি; খ. সিডো; গ. সিরডাপ; ঘ. ড. এ পি জে আবদুল কালাম; ঙ. ওপেক; চ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ; ছ. The World Climate Conference-3.

ক. ওআইসি

উত্তর : OIC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ (২৮ জুন ২০১১ থেকে) Organisation of the Islamic Cooperation (প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ণরূপ Organisation of the Islamic Conference)। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে সংস্থাটি গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কেবলা পবিত্র মসজিদুল আল-আকসাতে ইসরাইল কর্তৃক সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংস্থাটির জন্ম। OIC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭। সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। প্রথম মহাসচিব মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান। বর্তমান মহাসচিব সৌদি আরবের আইয়াদ বিন আমীন মাদানি। OIC-এর মূল লক্ষ্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা মোকাবিলা করাসহ মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ করা এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করা। OIC-এর অঙ্গ-সংগঠন ১১টি। ১. ইসলামিক সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্সিল, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. নির্বাহী কমিটি, ৫. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিচার আদালত, ৬. মানবাধিকার বিষয়ক স্বাধীন স্থায়ী কমিশন, ৭. স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটি, ৮. সাধারণ সচিবালয়, ৯. সাবসিডিয়ারি অর্গান, ১০. বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট এবং ১১. অনুমোদিত ইনস্টিটিউট। সংস্থাটির ৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটি হলো ১. আল কুদস কমিটি (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৫; সদর দপ্তর রাবাত, মরক্কো), ২. স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স–OMIAC (প্রতিষ্ঠা ১৯৮১; সদর দপ্তর ডাকার, সেনেগাল), ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইকোনোমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল কো-অপারেশন–COMCEC (প্রতিষ্ঠা ১৯৮১; সদর দপ্তর আঙ্কারা, তুরস্ক) ও ৪. স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলোজিক্যাল কো-অপারেশন–COMSTECH (প্রতিষ্ঠা ১৯৮১; সদর দপ্তর ইসলামাবাদ, পাকিস্তান)।

খ. সিডো

উত্তর : CEDAW-এর পূর্ণরূপ Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women। সিডও সনদ হচ্ছে নারী অধিকারের একটি দলিল। দীর্ঘকাল থেকে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দূর করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশন। সিডও সনদ হলো নারীর সকল প্রকার মানবিক অধিকার সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক বিল। এ সনদ ৩০টি ধারা সংবলিত। এ ধারাগুলো আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ, ধারা ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ, ধারা ১৭ থেকে ২২ পর্যন্ত সিডও কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক। তৃতীয় ভাগ, ধারা ২৩ থেকে ৩০ পর্যন্ত সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এ দলিলে স্বাক্ষর করে।

গ. সিরডাপ

উত্তর : CIRDAP-এর পূর্ণরূপ Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific। সংস্থাটি গঠিত হয় ৬ জুলাই ১৯৭৯। CIRDAP প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)। CIRDAP-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪টি। এগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার। সংস্থাটির সদর দপ্তর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পল্লীর জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও ভাগ্যোন্নয়ন। সিরডাপের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৪-২৮ জানুয়ারি ২০১০ ঢাকায়।

ঘ. ড. এ পি জে আবদুল কালাম

উত্তর : ড. আবুল পাকির জয়নুল আবেদীন আবদুল কালাম সংক্ষেপে এ পি জে আবদুল কালাম ১৫ অক্টোবর ১৯৩১ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২৫ জুলাই ২০০২ থেকে ২৫ জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত ৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনকালে তিনি জনগণের প্রেসিডেন্ট (People's President) হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ভারতে ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য তাকে ভারতের মিসাইলম্যান (Missile Man of India) বলা হয়। তিনি ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। আমেরিকার সর্বোচ্চ প্রকৌশল সংক্রান্ত পুরস্কার 'হুভার মেডেল' প্রথম এশীয় হিসেবে ড. আবদুল কালাম লাভ করেন। এছাড়াও তার গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য তিনি ভারতের সর্বোচ্চ জাতীয় বেসামরিক সম্মাননা পদক পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, ভারতরত্ন পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। ড. কালামের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Wings of Fire।

ঙ. ওপেক

উত্তর : OPEC-এর পূর্ণরূপ Organisation of the Petroleum Exporting Countries। এটি গঠিত হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৫ (ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা)। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২। সদস্য দেশগুলো হলো আলজেরিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, কাতার, নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, লিবিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অ্যাঙ্গোলা ও ইকুয়েডর। আরব বহির্ভূত সদস্য ইরান, নাইজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, ইকুয়েডর ও ভেনিজুয়েলা। এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত। OPEC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে তেলের উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা।

চ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ

উত্তর : NAM-এর পূর্ণরূপ Non Aligned Movement বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চতুর্থ সম্মেলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্ররূপে বিশ্বে পরিচিত হয়। ১৯৭৩ সালের আলজিয়ার্স সম্মেলনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দান করেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উক্ত সম্মেলনে তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হবে তা ব্যাখ্যা করেন এবং অপরাপর সদস্য দেশের ভূমিকার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

১৯৭৬ ও ১৯৭৯ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে দলের নেতৃত্ব দান করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি িয়াউর রহমান। উভয় সম্মেলনে তিনি বলিষ্ঠ ও তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি ও আদর্শাবলী অনুসরণ করে চলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং শক্তি ব্যবহারের বিশ্ব নয়, বরং মানবতা রক্ষার বিশ্ব গঠনে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। ১৯৮৩ ও ১৯৮৯ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তম শীর্ষ ও নবম সম্মেলনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলন দুটিতে এইচ এম এরশাদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৮৬ সালে অষ্টম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৯২ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় দশম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সালে কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের একাদশ শীর্ষ সম্মেলনেও বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০৩ সালে মালয়েশিয়ার পুত্রাজায়ায় অনুষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ সম্মেলন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। ২০০৬ সালের ১১-১৬ সেপ্টেম্বর কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সম্মেলনেও বাংলাদেশ ফিলিস্তিন পরিস্থিতি, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ১৫-১৬ জুলাই ২০০৯ ন্যামের ১৫তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মিশরে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সম্মেলনে পরবর্তী তিন বছরের জন্য এশিয়া অঞ্চলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সর্বশেষ সম্মেলন (ষোড়শ) হয় ২৬-৩১ আগস্ট ২০১২ সালে ইরানের তেহরানে। পরবর্তী (সপ্তদশ) সম্মেলন হবে ২০১৫ সালে ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে। বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে এসেছে ও জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে আসছে। জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রতি অবিচল আস্থা ও সমর্থন বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি।

ছ. The World Climate Conference-3.

উত্তর : বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)-এর আয়োজনে ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে The World Climate Conference-3 বা তৃতীয় জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অনুন্নত দেশগুলো জলবায়ু সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার তথ্য, প্রকল্প সেবা আদান-প্রদান করবে, জলবায়ু সংক্রান্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে একত্রে কাজ করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সকল চ্যালেঞ্জ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করবে বলে জাতিসংঘের WMO-এর আওতায় 'Global Framework for Climate Services' নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির প্রধান ৪টি উপাদান হলো– ১. পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা অবলম্বন করা, ২. গবেষণা, কাঠামো ও পূর্বাভাস, ৩. জলবায়ু সংশ্লিষ্ট তথ্য, ৪. ব্যবহারকারীর কর্মসূচি সীমা নির্দিষ্টকরণ। এ চারটি উপাদানের প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে এবং শেষ দুটি উপাদান ঐক্যবদ্ধভাবে World Climate Service System-এর আওতায় অর্জন করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। 'Global Framework for Climate Services' চুক্তির উন্নতিতে পরবর্তীতে উচ্চ পর্যায়ের অস্থায়ী টাস্কফোর্স গঠন করা হবে বলে চুক্তিতে বলা হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। নীতিনির্ধারক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এনজিও নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বিশ্বের কমপক্ষে ১৫টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এ সম্মেলনে অংশ নেন।

৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৭।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে– এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৯৫।

৫. বিশ্বায়ন সুযোগ (Opportunities) এবং আশঙ্কার (Threats) সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং অদক্ষদের জন্য আশঙ্কা।" –এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২১৭।

৬. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মসূচিতে অন্যতম প্রধান অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩৫।

৭. মধ্য এশিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২৩।

৮. সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সার্ক (SAARC) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছে? আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৫।

৯. 'স্বার্থ সংরক্ষণ' কূটনীতিকের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে কী কী বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে লিখুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৬৯।

২৮তম বিসিএস : ২০০৯

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২ × ১০ = ২০

ক. ICRC-এর সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ICRC (International Committee of the Red Cross)-এর সদর দফতর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

খ. প্রথাগতভাবে বছরের কোন দিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়?
উত্তর : সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার।

গ. কোন দুটি আরব রাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড (Camp David) চুক্তি স্বাক্ষরের ফলশ্রুতিতে ইসরাইলের সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে?
উত্তর : মিশর ও জর্ডান।

ঘ. বাংলাদেশকে 'তলাহীন ঝুঁড়ি' বলে কে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন?
উত্তর : সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার।

ঙ. 'তাসখন্দ চুক্তি' কখন এবং কোন দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি; ভারত-পাকিস্তান।

চ. 'সেভেন সিস্টার্স' (Seven Sisters) বলতে ভারতের কোন রাজ্যগুলোকে বোঝায়?

উত্তর : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামী সাতটি রাজ্য একত্রে 'সেভেন সিস্টার্স' হিসেবে পরিচিত। রাজ্যগুলো হলো– আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মণিপুর, মেঘালয় ও মিজোরাম।

ছ. BIMSTEC-এর পূর্ণনাম কি এবং এর সদস্য কোন কোন দেশ?

উত্তর : The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. সদস্য দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান।

জ. আরব বিশ্বের বাহিরে ওপেক (OPEC) দেশগুলোর নাম কি?

উত্তর : ইরান, ভেনিজুয়েলা, নাইজেরিয়া, ইকুয়েডর ও অ্যাঙ্গোলা।

ঝ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM)-এর প্রধান উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর : ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ সুকর্ন এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের।

ঞ. ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় দিবস কোন তারিখে উদ্‌যাপিত হয়?

উত্তর : ভারত : ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস; ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস; ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস (গান্ধী জয়ন্তী)।

পাকিস্তান : ২৮ জানুয়ারি, পাকিস্তান দিবস; ২৩ মার্চ, প্রজাতন্ত্র দিবস; ১৪ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস।

ট. আইসল্যান্ড ও মৌরিতানিয়ার রাজধানীর নাম কি?

উত্তর : আইসল্যান্ড– রিকজাভিক ও মৌরিতানিয়া– নোয়াকচট।

ঠ. ওআইসি (OIC)-র বর্তমান মহাসচিবের নাম কি?

উত্তর : ওআইসি'র বর্তমান মহাসচিব সৌদি নাগরিক আইয়াদ বিন আমীন মাদানি। তিনি ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এখন পর্যন্ত দশম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

ড. চাঁদে অবতরণকারী প্রথম দুই মহাশূন্যচারীর নাম কি?

উত্তর : নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

ঢ. আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (ICC) সদর দফতর কোথায়?

উত্তর : দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

২. যে কোনো পাঁচটির উপর সংক্ষেপে লিখুন : $৪ \times ৫ = ২০$

ক. ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO)

উত্তর : WTO-এর পূর্ণরূপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)। এর পূর্ববর্তী সংস্থার নাম ছিল গ্যাট (General Agreement on Tariffs and Trade সংক্ষেপে GATT)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। এই মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের পর বিশ্ব বাণিজ্যে ধস নামে। যুদ্ধদানবের দাপাদাপিতে অধিকাংশ দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ধস নামে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। এ প্রেক্ষিতে সুষম বাণিজ্য বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ সময়ে পুঁজিবাদী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাদীরা সমাজতন্ত্র রোধকল্পে এবং অর্থনৈতিক উপনিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শহর ব্রেটন উডসে মিলিত হয়। 'ব্রেটন উডস কনফারেন্সে' তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংস্থা তিনটি হচ্ছে

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) ও আইটিও (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা)। ব্রেটন উডস সম্মেলনে প্রথম দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন না পাওয়াতে আইটিও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। আইটিও যখন প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না, তখন আইটিওর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালে জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্যনীতি নিয়ে বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাত্র ২৩টি দেশ তাতে প্রাথমিকভাবে স্বাক্ষর করে। এ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৩টি দেশে গ্যাট (GATT) কার্যকর হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী শুল্ক ও বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে গ্যাট চুক্তিতে ব্যাপক সংশোধনী আনয়ন করা হয়। একটি সর্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসার ও উদারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির আলোকে ধারাবাহিক ব্যাপক আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৫ এপ্রিল ১৯৯৫ মরক্কোতে ১২৪টি দেশের এবং ইউরোপিয়ান কমিউনিটির প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলনে মারকাস ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় বহুজাতিক এবং অনেক চুক্তির মূর্ত প্রকাশ হিসেবে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬০। সর্বশেষ সদস্য দেশ ইয়েমেন (২৬ জুন ২০১৪)।

খ. ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক

উত্তর : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৬ সালে জোবরা গ্রামে যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প চালু করেছিলেন ১ অক্টোবর ১৯৮৩ সালে এসে তা গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রামীণ প্রকল্পটি 'গ্রামীণ ব্যাংক' নামকরণ করে একটি বিশেষায়িত ঋণদান প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারি করা হয় এবং ঐ বছরের ১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ও ৩ অক্টোবর থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যানসহ ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। শুরুতে পরিশোধিত মূলধনের ৪০% ব্যাংকটির ঋণ গ্রহীতাগণ এবং অবশিষ্ট ৬০% বাংলাদেশ সরকার ও সরকারি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে ৯৪ ভাগ শেয়ার গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের এবং বাকি ৬ ভাগ সরকারের। ২০১১ সালের ৩১ মার্চ শেষে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৫৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংক তার সদস্যদের গৃহ নির্মাণ ঋণ, উচ্চ শিক্ষা ঋণ ও ভিক্ষুকদের জন্য সুদমুক্ত 'সংগ্রামী সদস্য কর্মসূচি' ঋণসহ বিভিন্ন ঋণ প্রদান কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের মৃত্যুর পর ঋণ ও সুদ মওকুফ করার জন্য ঋণ বীমা সঞ্চয় তহবিল সুবিধা প্রদান করছে।

গ. সিআইএস (CIS)

উত্তর : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সংস্থা CIS। এর পূর্ণরূপ Commonwealth of Independent States. এটি গঠিত হয় ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১। সদস্য সংখ্যা ১১। এর সদস্য দেশগুলো হলো রাশিয়া, আজারবাইজান, ইউক্রেন, বেলারুশ, মলদোভা, আর্মেনিয়া, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান। সংস্থাটির সদর দপ্তর বেলারুশের রাজধানী মিনস্কে অবস্থিত।

ঘ. **White House এবং White Hall;**

উত্তর : White House (হোয়াইট হাউস)

হোয়াইট হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম। এটি ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। আয়ারল্যান্ডের জেমস হোবান নামে এক স্থপতি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে শুরু করে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। হোয়াইট হাউস সর্বমোট ১৮ একর জমি নিয়ে অবস্থিত। এটি ছয়তলা বিশিষ্ট বাড়ি, যার দুটি তলা বেইজমেন্টে অবস্থিত। বাড়ির ওপর তলার গোলাপি রঙের ঘরে থাকেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তার পরিবার। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর হোয়াইট হাউস পরিদর্শন বন্ধ করে দেয়া হয়।

White Hall (হোয়াইট হল)

হোয়াইট হল লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টারে অবস্থিত একটি সুরম্য অট্টালিকা। ১৫৩০-১৬৯৮ পর্যন্ত সময়কালে এটি ইংরেজ শাসনকর্তাদের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টারে হোয়াইট হল নামে একটি সড়ক রয়েছে, যেখানে যুক্তরাজ্য সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। এ কারণে হোয়াইট হল নামটি কেন্দ্রীয় সরকারের সমার্থক শব্দ বা মেটোনিম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ঙ. **নেলসন ম্যান্ডেলা**

উত্তর : বর্ণবাদ বিরোধী অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। পুরো নাম নেলসন রোলিহলাহা ম্যান্ডেলা (ডাক নাম ম্যাদিবা)। ১৯১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকেই শহরের আমতাতা (Umtata) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘদিনের শ্বেতাঙ্গশাসন ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সাহসী রাজনৈতিক সংগ্রামই আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান ও নোবেল বিজয়ী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগ করেন। ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববাসীর আন্দোলনের মুখে বর্ণবাদী সরকার ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেয়। ম্যান্ডেলা ১৯৯৪ সালের ১০ মে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অবসর নেন। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর ২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর জোহানেসবার্গে মৃত্যুবরণ করেন এবং ১৫ ডিসেম্বর নিজ গ্রাম কানুতে তাকে সমাহিত করা হয়।

চ. **Amnesty International**

উত্তর : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহের অন্তর্গত সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৮ মে ১৯৬১। এর প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ আইনবিদ পিটার বেনেনসন। সদরদপ্তর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার বিরোধী যে কোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। এছাড়া সারা বিশ্বে যেসব নারী ও শিশু নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হচ্ছে সে ব্যাপারেও এ সংস্থা সোচ্চার। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বর্তমান মহাসচিব ভারতের সলিল শেঠি (জুলাই ২০১০ থেকে বর্তমান)।

ছ. **দ্বি-জাতি তত্ত্ব**

উত্তর : পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। 'একজাতি একরাষ্ট্র' এটিই হচ্ছে দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূলমন্ত্র। তার মতে, হিন্দু ও মুসলমানেরা দুটি পৃথক জাতি। তাদের কৃষ্টি-কালচার স্বতন্ত্র। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। এমনকি তাদের নাম পরিচয়ও আলাদা। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান একত্রে আহার করে না। সুতরাং যে কোনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি। তাই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা প্রয়োজন।

৩. যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট Barak Obama-র প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৯৮।

৪. মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষায় ওআইসি (OIC)-এর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৭।

৫. উন্নয়নশীল দেশে শিশু অধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও সুরক্ষায় প্রতিবন্ধকতা কি? ১৫

৬. 'গ্রিন হাউজ ইফেক্ট' (Green House Effect) বলতে কি বোঝায়? এর ফলে পরিবেশ ও কৃষিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৮৭।

৭. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮০৪।

৮. প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করুন। ১৫

২৭তম বিসিএস : ২০০৬

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে] নম্বর

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২০

ক. **গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায়?**

উত্তর : বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নেপালের লুম্বিনি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে।

খ. **বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয় কত তারিখ?**

উত্তর : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সুপারিশক্রমে ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়।

গ. **NAFTA-এর সদস্য দেশ কয়টি?**

উত্তর : NAFTA (North American Free Trade Agreement)-এর সদস্য ৩টি দেশ। এগুলো হলো : ১. যুক্তরাষ্ট্র, ২. কানাডা ও ৩. মেক্সিকো।

ঘ. **কখন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর কার্যক্রম শুরু হয়?**

উত্তর : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয় ২২ আগস্ট ১৯৬৬। তবে এটি ১৯৬৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ৬৭ এবং এর সদর দপ্তর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অবস্থিত।

ঙ. **আকিয়াব কোন নদীর তীরে অবস্থিত?**

উত্তর : মিয়ানমারের আকিয়াব সমুদ্রবন্দরটি কালাধর নদীর তীরে অবস্থিত।

চ. **মাইক্রোসফট কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নির্বাহীর নাম কি?**

উত্তর : মাইক্রোসফট কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নির্বাহীর নাম স্টিভ বালমার (এপ্রিল ২০১৩)।

ছ. জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য কোন দেশ?

উত্তর : জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান (১৯৩তম)। ১৪ জুলাই ২০১১ দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

জ. UNIMOG কি?

উত্তর : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের একটি অপারেশনের নাম UNIMOG (United Nations Iraq-Iran Military Observation Group)। শাতিল আরব জলপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইরান-ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে জাতিসংঘ ১৯৮৮ সালের আগস্টে অপারেশনটি চালু করে। ১৯৯১ সালে দেশ দুটি সকল সেনা প্রত্যাহার করলে ফেব্রুয়ারিতে মিশনটি স্থগিত করা হয়।

ঝ. WIPO কি?

উত্তর : WIPO-এর পূর্ণরূপ হলো World Intellectual Property Organization। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হলো ১. বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল বা বুদ্ধিসম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করা ও শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানো, ২. সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন এবং ৩. শিল্প ও সাহিত্যকর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটানো।

ঞ. NASA-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা হলো NASA (National Aeronautics and Space Administration)। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত NASA'র সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

ট. মিয়ানমারের বার্তা সংস্থার নাম কি?

উত্তর : মিয়ানমারের বার্তা সংস্থার নাম 'মিয়ানমার নিউজ এজেন্সি' (MNA)। উল্লেখ্য, এটি সামরিক জান্তা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা।

ঠ. উন্নয়নশীল দেশসমূহের নতুন জোট ডি-৮-এর সদস্য কারা?

উত্তর : ১৯৯৭ সালে গঠিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগঠন D-8-এর সদস্য হলো ১. মালয়েশিয়া, ২. তুরস্ক, ৩. মিশর, ৪. ইন্দোনেশিয়া, ৫. পাকিস্তান, ৬. বাংলাদেশ, ৭. ইরান ও ৮. নাইজেরিয়া।

ড. গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় কত ঘণ্টা আগে?

উত্তর : ৬ ঘণ্টা আগে।

২. যে কোনো পাঁচটির ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : ২০

ক. জন হাওয়ার্ড; খ. ১৩তম ন্যাম সম্মেলন; গ. সিডিসি (CDC); ঘ. ফারাক্কা বাঁধ; ঙ. এপেক (APEC); চ. সাফটা (SAFTA); ছ. ন্যাম (NAM)।

ক. জন হাওয়ার্ড

উত্তর : অস্ট্রেলিয়ার ২৫তম প্রধানমন্ত্রী জন উইনস্টন হাওয়ার্ড। স্যার রবার্ট মেনজিস-এর পর তিনি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি দেশটির হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ নির্বাচিত হন নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যের বেনেলং বিভাগ থেকে। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ২৯তম ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত। জন হাওয়ার্ড লিবারেল পার্টির নেতা ছিলেন। ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণকারী এ নেতা দীর্ঘদিন কোয়ালিশন বিরোধী দলের প্রধান ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। তার সরকার পরবর্তীতে ১৯৯৮, ২০০১ এবং ২০০৪ সালে পুনর্নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ার করব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য, ইমিগ্রেশন, ইরাক যুদ্ধ এবং আদিবাসী ইস্যুতে তিনি ব্যাপক আলোচিত ছিলেন। ২০০৭ সালে তার নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন কেভিন রুডের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টির কাছে পরাজিত হয়।

খ. ১৩তম ন্যাম সম্মেলন

উত্তর : মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ২০-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ত্রয়োদশ ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যোগদান করেন। এ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মোহাম্মদ ন্যামের পরবর্তী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৩তম সম্মেলনে নতুন দুটি দেশকে ন্যামের সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। দেশগুলো হলো এশিয়ার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দ্বীপরাষ্ট্র পূর্ব তিমুর ও সাবেক ব্রিটিশ কলোনি সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইস। এর ফলে ন্যামের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১৬তে। বর্তমানে ন্যামের সদস্য সংখ্যা ১২০। ত্রয়োদশ ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে যুদ্ধ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত অবস্থানের কথা প্রবলভাবে বিবৃত হয়েছে। কুয়ালালামপুরে যখন এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন বিশ্ব মানবতা ইরাক ও ফিলিস্তিনি সংকট নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের নেতাদের বক্তব্য বর্তমান বিশ্বে জরুরি সংকটগুলোর ব্যাপারে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও ভিন্নতর মাত্রা উন্মোচিত হয়েছে। ন্যামের সর্বশেষ ১৬তম সম্মেলন আগস্ট ২০১২ ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০১৫ সালে ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে।

গ. সিডিসি (CDC)

উত্তর : সিডিসি (CDC)-এর পূর্ণরূপ Centers for Disease Control and Prevention। যুক্তরাষ্ট্রের 'হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস' বিভাগ পরিচালিত সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের ডেকান্ত কাউন্টিতে অবস্থিত। জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানদানে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে কাজ করছে। কিভাবে রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ প্রতিকার (বিশেষত ইনফেকশনজনিত রোগে) করতে হয় তা জনগণের মধ্যে ফোকাস করছে। মূলত স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচারণা চালাতেই সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। ১ জুলাই ১৯৪৬ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ড. জোসেফ মন্টিন।

ঘ. ফারাক্কা বাঁধ

উত্তর : কলকাতা বন্দরকে পলির হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত কর্তৃক মনোহরপুরের কাছে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক ও ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ১৬.৫ কিমি উজানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ করেছে। ভারত কর্তৃক গঙ্গার পানির একতরফা প্রত্যাহার বাংলাদেশের কেবল প্রতিবেশ ও পরিবেশ ব্যবস্থা ধ্বংস করছে না বরং এ দেশের কৃষি, শিল্প, বনজসম্পদ ও নৌযোগাযোগের মতো অর্থনৈতিক খাতগুলোর ওপরও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। সংকট নিরসনে বহুবার উদ্যোগ নিলেও বিভিন্ন কারণে তা ভেস্তে গেছে। পরিশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়।

ঙ. এপেক (APEC)

উত্তর : APEC বা Asia Pacific Economic Co-operation হলো একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২১টি দেশ নিয়ে এ জোট গঠিত। এ জোট ১৯৮৯ সালের ৬ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলা। APEC-এর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত। উল্লেখ্য, APEC-এর প্রধান উদ্যোক্তা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক।

চ. সাফটা (SAFTA)

উত্তর : *৩০তম বিসিএস দেখুন।*

ছ. ন্যাম (NAM)

NAM-এর পূর্ণরূপ Non-Aligned Movement বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। উদ্যোক্তা হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ সুকর্ন এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে, বেলগ্রেড সম্মেলনে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০। সর্বশেষ সদস্য আজারবাইজান ও ফিজি (২৫ মে ২০১১)। মূলনীতি ১. প্রত্যেকের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন; ২. অনাক্রমণ; ৩. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান; ৪. অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

৩. 'বিশ্বায়ন' প্রত্যয়টির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২১২।

৪. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ১৫

৫. শক্তির ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা কি একটা অনিবার্য বাস্তবতা? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১১৩।

৬. 'অর্থনৈতিক কূটনীতি' কি? নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতি কেন গুরুত্ব পেয়েছে তা আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৬৬।

৭. সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৪।

৮. নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। এটা কতটুকু সত্য যে, নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১১৬।

৯. 'বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।' আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৭০।

১০. স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য কি? বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এসব দেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৯।

২৫তম বিসিএস : ২০০৫

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো ৪টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২০

ক. আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ও এর সদস্যসংখ্যা কত?

উত্তর : আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত এবং জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ এর সদস্য। এটি জাতিসংঘের মূল বিচার বিভাগীয় সংগঠন। এ আদালত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আইনগত বিরোধের মীমাংসা করে। আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে। তারা ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ১৫ জন বিচারকের মধ্যে একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ৩ বছর মেয়াদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকেন।

খ. CEDAW-এর পুরো নাম কি?

উত্তর : CEDAW-এর পূর্ণরূপ Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination Against Women। সিডও সনদ হচ্ছে নারী অধিকারের একটি দলিল। দীর্ঘকাল থেকে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দূর করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশন।

গ. Agenda-21 কি?

উত্তর : জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলন নামে 'জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন' (United Nations Conference for Environment and Development) অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল ৪০টি অধ্যায় বিশিষ্ট Agenda-21। বিশাল আকৃতির এই দলিলের প্রথম পর্বে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, তৃতীয় পর্বে মুখ্য গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা এবং চতুর্থ পর্বে রয়েছে Agenda 21-এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি।

ঘ. রুয়ান্ডার গণহত্যায় জড়িত জনগোষ্ঠী দুটোর নাম কি?

উত্তর : রুয়ান্ডা গণহত্যার সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠী দুটি 'হুতু' ও 'তুতসি'। রুয়ান্ডা পূর্ব-মধ্য আফ্রিকার ক্ষুদ্রতম একটি দেশ। ১৯৬২ সালের ১ জুলাই রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে রাষ্ট্র ও ক্ষমতা নিয়ে 'হুতু' ও 'তুতসি' জাতির মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এসে গোষ্ঠী দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে এবং এক পর্যায়ে শুরু হয় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, যাতে ৭ এপ্রিল–১৫ জুলাই ১৯৯৪ সালের প্রায় ১০০ দিনের গণহত্যায় ৫ থেকে ১০ লক্ষ তুসসি নিহত হয়।

ঙ. Loc বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : LOC-এর পূর্ণরূপ Line of Control, যা মূলত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা। ভারত অধিকৃত জম্মু -কাশ্মীর এবং পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ-কাশ্মীরের মধ্যকার সীমারেখা বা যুদ্ধবিরতি রেখাটিই LOC নামে অধিকতর পরিচিত।

চ. Loya Jirga কি?

উত্তর : পশতু শব্দগুচ্ছ 'লয়া জিরগা' (Loya Jirga)-এর ইংরেজি হলো 'grand council'। শত শত বছরের এ পুরনো প্রতিষ্ঠানটি ইসলামিক শরীয়া বা পরামর্শ সভার আদলে গঠিত। বিভিন্ন আফগান সম্প্রদায়ের (যেমন– পশতুন, হাজারা, তাজিক ও উজবেক) সম্মানিত ও জ্যেষ্ঠ নেতাদের সর্বোচ্চ পরিষদ হলো 'লয়া জিরগা'। ঐতিহাসিকভাবে এর দায়িত্ব ছিল আন্তঃগোত্রীয় বিরোধের নিষ্পত্তি, সামাজিক সংস্কার এবং নতুন সংবিধান অনুমোদন করা। বর্তমানে 'লয়া জিরগা' বলতে একটি বৃহৎ গণসভা বোঝায়, যার প্রধান কার্যাবলী হলো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নাম ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (National Assembly)। নিম্নকক্ষের নাম ওলেসি জিরগা (House of the People) এবং উচ্চকক্ষের নাম মেশরানো জিরগা (House of the Elders)।

ছ. Patriot Act-এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে Patriot Act প্রণীত হয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ ও

প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই আইনটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার স্বরূপ। এই আইনের মাধ্যমে সরকার যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে বিবেচিত এমন সব বিদেশীকে আটক রাখাসহ বিভিন্ন রকম ক্ষমতা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, এই আইন বলে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে যে কোনো ব্যক্তির টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট বা কম্পিউটারে আড়িপাতা, ছাত্রদের নোট ও লাইব্রেরি থেকে আহরিত কাগজপত্র, তথ্যাদি আটক বা পরীক্ষার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

জ. SAGQ কি?

উত্তর : SAGQ (South Aisa Growth Quadrangle) হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশের মধ্যকার ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক। এর সদস্য দেশগুলো হচ্ছে— বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও নেপাল। উপমহাদেশের এই চারটি দেশের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এই দেশগুলোর জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে SAGQ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

ঝ. OSCE কবে গঠিত হয়েছিল?

উত্তর : OSCE অর্থাৎ Organization for Security and Co-operation in Europe গঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বর্তমান নামকরণ করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পরিহার করে মানবাধিকারকে জোরদার করে পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক স্থাপনই এর উদ্দেশ্য। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭ এবং সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত। সর্বশেষ সদস্য মঙ্গোলিয়া, ২১ নভেম্বর ২০১২।

ঞ. আর্জেন্টিনা কত সালে ফকল্যান্ড দ্বীপ দখল করে নিয়েছিল?

উত্তর : আর্জেন্টিনা ১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল ব্রিটেনের কাছ থেকে ফকল্যান্ড দ্বীপ দখল করে। আর্জেন্টিনা থেকে প্রায় ৪০০ মাইল পূর্বে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপ ফকল্যান্ড। ২১৯৬ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট ব্রিটেনের উপনিবেশ এই দ্বীপপুঞ্জটির উপর ১৯২০ সাল থেকে আর্জেন্টিনা তাদের সার্বভৌমত্ব দাবি করে আসছিল। তারপর ১৯৮২ সালে এক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আর্জেন্টিনা দ্বীপটি দখল করে নেয়। অবশ্য একই বছর ১৩ জুন ব্রিটেন পুনরায় দ্বীপটির দখল নেয়।

ট. ২০০৭ সালে কোন দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবে?

উত্তর : ২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮। সর্বশেষ সদস্য ক্রোয়েশিয়া ১ জুলাই ২০১৩।

ঠ. CARICOM কি?

উত্তর : CARICOM-এর পূর্ণরূপ Caribbean Community Market। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১ আগস্ট ১৯৭৩। সদস্য দেশ ১৫টি। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কর কাঠামো ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সহযোগিতা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এটি গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর গায়ানার জর্জ টাউনে অবস্থিত।

ড. কম্পুচিয়ার নতুন রাজার নাম কি?

উত্তর : সাবেক কম্পুচিয়া বা বর্তমান কম্বোডিয়ার রাজা হচ্ছেন নরদম সিহানুকের পুত্র নরদম সিহামনি। কম্বোডিয়া এশিয়া মহাদেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের একটি দেশ। কুখ্যাত খেমারুজ গেরিলা নেতা পলপট রাজতন্ত্র উৎখাত করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। তবে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে ১৯৯৩ সালে পুনরায় সিহানুক কম্বোডিয়ার রাজা হন।

২. যে কোনো পাঁচটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : ২০

ক. জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defense)। খ. Operation Enduring Freedom। গ. গণহত্যা নিরোধ ও শান্তি বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন। ঘ. 'Galileo' Project। ঙ. জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন। চ. ইউক্রেনের রাজনৈতিক সংকট। ছ. দারফুর সংকট।

ক. জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defense)

উত্তর : বিশ্বের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি যেন হুমকি না হতে পারে সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা, যা National Missile Defence বা NMD পরিকল্পনা নামে পরিচিত। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহেন কংগ্রেসে এ প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, এটা আমাদের মিত্ররাষ্ট্র রাশিয়াসহ অন্য রাষ্ট্রের জন্য কোনোরূপ হুমকি নয় এবং ১৯৭২ সালের ABM চুক্তির বিপক্ষেও নয়। মার্কিন প্রশাসনের মতে, এটা ABM চুক্তির লঙ্ঘন নয় বরং চুক্তিটিকে কিছুটা মোডিফিকেশন করা। বুশ প্রশাসনের ঘোষণানুযায়ী, এ সিস্টেম যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গরাজ্যেই কার্যকর করা হবে। শিল্পনগরী আলাস্কাতেই তারা ১০০টি Missile interceptor বসানোর পরিকল্পনা করেছে এবং ২০০৪ সালের মধ্যেই আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ Space-Based Infrared System (SBIRS) প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। এ SBIRS রাডারের মাধ্যমে শত্রু রাষ্ট্রগুলোর খবরাখবর সরবরাহ করবে এবং অটোম্যাটিক্যালি শত্রু মোকাবিলার জন্য কাজ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্যোগের সরাসরি বিরোধিতা করেছে চীন ও রাশিয়া। চীন মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর দ্বারা চীনের প্রতি একটি হুমকি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে আর রাশিয়া মনে করে এর দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই বিতর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য বলছে, এটা শুধু ইরান, উত্তর কোরিয়ার মতো সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলোর হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। এছাড়া ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়া বলেছে, দক্ষিণ কোরিয়া যদি এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দেয়, তাহলে তারা দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা থেকে ফিরে আসবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলে সফলতা আসুক বা না আসুক, NMD পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে, যা বিশ্বের শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রতি বিরাট হুমকি সৃষ্টি করবে।

খ. Operation Enduring Freedom

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার ও তালেবান মিত্র ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম' নামে পরিচিত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির ২৭ দিন পর ৭ অক্টোবর মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে আফগানিস্তানে প্রচণ্ড হামলা করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বেতার-টিভিতে দেয়া ভাষণে এ সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দেন। উপর্যুপরি বিমান হামলার ফলে ২০০১ সালের ১২ নভেম্বর তালেবান বাহিনী রাজধানী কাবুল ছাড়তে বাধ্য হয় এবং সেই সাথে 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম'-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়।

গ. গণহত্যা নিরোধ ও শান্তি বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন

উত্তর : ১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতিসংঘের আওতায় সুবিস্তৃত ইস্যুতে গৃহীত হয়েছে প্রায় ৮০টি চুক্তি ও ঘোষণা। ছয়টি চুক্তিতে রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক এর মান্যতা তদারকির জন্য বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসমূহ যখন এ সকল চুক্তি অনুসমর্থন করে তখন তারা নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর দ্বারা স্বীয় মানবাধিকার আইন ও প্রথার পুনর্মূল্যায়নে সম্মতি প্রদান করে। এরই আলোকে ১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় 'গণহত্যার অপরাধ নিরোধ ও শাস্তিবিষয়ক কনভেনশন'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় গণহত্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন কার্যক্রম হিসেবে, যার উদ্দেশ্য কোনো জাতি, গোষ্ঠী, মহাজাতি বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধ্বংসসাধন, এতে অপরাধীদের ন্যায় বিচারের মুখোমুখি করতে রাষ্ট্রসমূহকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়েছে। ১৩২টি রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

ঘ. 'Galileo' Project

উত্তর : Galileo Project যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA কর্তৃক গৃহীত একটি অনুসন্ধানী 'Project। বৃহস্পতির বিভিন্ন উপগ্রহে আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল, ভূপ্রকৃতিতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা প্রভৃতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে NASA কর্তৃক 'Galileo' মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে এটি বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার কক্ষপথে পৌঁছে ইউরোপার প্রচুর ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ইউরোপায় শুধু পানি নয়, রীতিমতো একটা মহাসমুদ্রের আলামত খুঁজে পেয়েছেন। আর পানি মানেই জীবনের অস্তিত্ব। ইউরোপা আমাদের চাঁদের চেয়ে সামান্য ছোট। ব্যাস ৩ হাজার ২০০ কিলোমিটার। বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জীবনের অস্তিত্ব থাকার মতো সব ধরনের উপাদানই রয়েছে ইউরোপার পানিতে। সুতরাং উদ্দেশ্যগত দিক থেকে NASA-এর Galileo প্রচেষ্টা প্রজেক্ট সফল একটি ছিল।

ঙ. জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন

উত্তর : সব ধরনের জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংসসাধনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭১ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction)। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত চুক্তিটি জীবাণু অস্ত্র এবং রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (BWC) নামে অভিহিত। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং ১৯৭৫ সালে এটি কার্যকর হয়। ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিকঘটিত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ছিল এ চুক্তির লক্ষ্য। এ চুক্তিতে জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্র উন্নয়ন, উৎপাদন ও মজুদ নিষিদ্ধ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া), ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশ এ চুক্তির উদ্যোক্তা।

চ. ইউক্রেনের রাজনৈতিক সংকট

উত্তর : রাশিয়া নাকি পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে ভবিষ্যত মৈত্রী স্থাপন করবে— মূলত এ বিষয় নিয়ে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক সংকটের সূত্রপাত। ইইউ'র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ কর্তৃক প্রত্যাখানের পর ২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে দেশটিতে আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার ২২ বছরে সবচেয়ে মারাত্মক সহিংস পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। এ সহিংসতায় প্রায় শতাধিক লোক নিহত হয়। হতাহতের ঘটনার পর রক্তের সিঁড়ি বেয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইইউ'র তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় সরকার ও বিরোধীদেরে মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যাতে রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতা ছেড়ে আগাম নির্বাচন ও একটি জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠনে সম্মত হয়। কিন্তু সরকার বিরোধীরা রাজপথ না ছেড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকলে বিক্ষোভের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ রাজধানী কিয়েভ ছেড়ে যান এবং বিক্ষোভকারীরা তার কার্যালয় ও বাসভবন দখল করে নেয়। একই দিনে ইউক্রেনের পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে অপসারণ করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পার্লামেন্ট ইউক্রেনের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নবনির্বাচিত স্পিকার ওলেকজান্ডার তুশ্চিনভকে নিয়োগ দেয়। ২৫ মে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ. দারফুর সংকট

সুদানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ দারফুর। এটি প্রতিবেশী শাদ ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সীমান্তে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৬০ লাখ লোকের বাস। এদের প্রায় সবাই ধর্মীয়ভাবে মুসলিম। অবশ্য নৃতাত্ত্বিক বিচারে দারফুরের জনগোষ্ঠী সিমেটিক আরব এবং কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই দুটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে কোনো বিরোধ ছিল না। কিন্তু সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর উস্কানিতে দারফুরে কৃষ্ণাঙ্গরা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। যার পরিণতিতে বহুকাল ধরে শান্তিতে বসবাসকারী জাতি দুটির মধ্যে সংঘাতের সূচনা হয়। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম এ দেশটি জড়িয়ে গেছে জাতিগত সহিংসতায়। পশ্চিম সুদানের দারফুর অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে ভয়াবহ নৃশংসতা। রুয়ান্ডার হুতু-তুতসি সংঘাতের পর এতবড় মানবিক বিপর্যয় আর হয়নি বলে জাতিসংঘের দাবি। ফলে জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ একাধিক দেশ এখন মানবিক বিপর্যয় রোধ করতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চায়। অবশ্য দারফুরের কৃষ্ণাঙ্গরা সুদান সরকারের বিরুদ্ধে অবহেলা-বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে। আর এই বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য গঠিত হয় সুদান লিবারেশন আর্মি (এসএলএ) এবং জাস্টিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি মুভমেন্ট (জেম)। এদের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের জন্য খার্তুম সরকার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আরব বংশোদ্ভূতদের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র। জানজাবিদ নামক এই সংগঠনটি রাষ্ট্রীয় মদদে শুরু করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দমনাভিযান। ফলে দারফুরে ঘটে মানবিক বিপর্যয়। জাতিগত সংঘাতে দারফুরে প্রাণ হারায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। বাস্তুচ্যুত হয়েছে প্রায় ১০ লাখ লোক।

৩. প্রস্তাবিত দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন একটি ভিন্নতর ইউনিয়ন। এর সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিল ও অমিল কোথায়? আলোচনা করুন। ১৫

৪. "এই বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে"– আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৭১।

৫. যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে রাজনৈতিক ও সামরিক উপাদান কি ভূমিকা পালন করে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫০৫।

৬. বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন। এগুলো মোকাবিলার জন্য কি কি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৯১।

৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর পটভূমি ও কার্যসম্পাদন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৭৪।

৮. বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন প্রকার মেরুকরণের কারণ ও সম্ভাব্য ফলাফল আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫।

২৪তম বিসিএস : ২০০৩

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২ নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২০

ক. জাতিসংঘের সনদ কোথায় ও কখন স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : ইয়াল্টা কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে ইউনাইটেড নেশনস-এর অধিবেশন বসে। সে অধিবেশন শেষে ২৬ জুন জাতিসংঘ সনদ গৃহীত ও ৫০টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২৪ অক্টোবর এ সনদ কার্যকর হয়।

খ. WTO কখন কাজ শুরু করে?

উত্তর : ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি কিউবার রাজধানী হাভানায় GATT চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যে কার্যক্রম শুরু হয় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তা-ই পরবর্তীতে WTO-তে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে GATT (গ্যাট) WTO-তে রূপান্তরিত হয়ে তার কার্যক্রম শুরু করে।

গ. ইরান ও থাইল্যান্ডের পূর্বনাম কি?

উত্তর : ইরান একটি ইতিহাসখ্যাত স্বতন্ত্র সভ্যতা তথা পারস্য সভ্যতার পাদভূমি। ইতিপূর্বে দেশটির নাম ছিল পারস্য। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দেশ থাইল্যান্ড পূর্বে শ্যাম দেশ নামে পরিচিত ছিল।

ঘ. UN Fourth World Conference on Women কখন ও কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের ১৮৫টি দেশের সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

ঙ. 'রিও প্যাক্ট' কোথায় ও কখন স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : এই বসুন্ধরাকে নিরাপদ আবাসস্থল বা আশ্রয়রূপে গড়ে তোলার জন্য পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতার বিশাল পরিব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন। এ সম্মেলনেই রিও প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়।

চ. মোট কতটি দেশ CTBT-তে স্বাক্ষর করেনি?

উত্তর : ১৩টি (এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত)।

ছ. Dayton Accord-এর মাধ্যমে কোন সমস্যার সুরাহা হয়?

উত্তর : ডেটন চুক্তির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন পরবর্তী তৎকালীন সার্বীয় প্রেসিডেন্ট স্লোভোদান মিলোসেভিচ বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় তারই অবসান ঘটে। বসনীয় জনগণের স্বাধীনতার দলিল এ ডেটন চুক্তি ১৯৯৫ সালের ১ ডিসেম্বর প্যারিসে স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য এ চুক্তিটির উদ্যোগ নেয়া হয় আমেরিকার ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ডেটনে।

জ. NAM-এর বর্তমান সভাপতি কে?

উত্তর : ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি (আগস্ট ২০১৩-বর্তমান)।

ঝ. HIPC-এর পুরো নাম কি?

উত্তর : HIPC-এর পুরো নাম Heavily Indebted Poor Countries. অত্যধিক ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশসমূহের বৈদেশিক ঋণ কমানোর লক্ষ্যে প্রথম সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৯৬ সালে। এ সকল দেশসমূহের জন্য বিশ্বব্যাংক ও IMF কর্তৃক HIPC ঋণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে HIPC-এর কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হয় ও গতি ত্বরান্বিত হয়।

ঞ. কোন শহর World Conference Against Racisim-এর আয়োজক?

উত্তর : ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এক প্রস্তাবের মাধ্যমে বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্য, বিদেশী বিদ্বেষ ও সংশ্লিষ্ট অসহিষ্ণুতা বিরোধী বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সিদ্ধান্তের আলোকেই ৩১ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ এ সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা হলেও আয়োজক শহর ছিল ডারবান।

ট. OIC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ১৯৬৯ সালে মোট ২৫টি মুসলিম দেশ নিয়ে গঠিত ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার বর্তমান মোট সদস্য সংখ্যা ৫৭। সর্বশেষ সদস্য দেশ আইভরি কোস্ট (২০০১ সালে)।

ঠ. ILO-এর সদর দপ্তর কোথায়?

উত্তর : ILO বা International Labour Organization বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

ড. IAEA-এর পুরো নাম কি?

উত্তর : IAEA-এর পুরো নাম International Atomic Energy Agency বা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা। এটি জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ সংস্থা, যার সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়।

২. যে কোনো পাঁচটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : ২০

ক. International Court of Justice, খ. The Durand Line, গ. কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রম (SAP), ঘ. রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি, ঙ. Truth and Reconciliation Commission, চ. INTERPOL, ছ. Operation Defensive Shield

ক. International Court of Justice

উত্তর : *৩২তম বিসিএস দেখুন।*

খ. The Durand Line

উত্তর : বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার চিহ্নিত সীমারেখাকে বলা হয় ডুরান্ড লাইন। স্যার মোর্টিমার ডুরান্ড কর্তৃক ১৮৯৬ সালে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে এ সীমারেখা চিহ্নিত করা হয়। ডুরান্ড লাইনের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৮৯৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পাক-ভারত সীমানা নির্ধারণ করার জন্য স্যার ডুরান্ডের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৯৫ সালে ব্রিটেন ও আফগানিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুসারে ডুরান্ড লাইনের পশতুন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় আর অন্য অংশ আফগান

সরকারের শাসনাধীনে থেকে যায়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান ডুরান্ড লাইন বরাবর সীমান্তের উত্তরাধিকার লাভ করে এবং এখনো এটি এ দেশ দুটির (আফগানিস্তান-পাকিস্তান) মধ্যকার সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত। তবে ১৯৪৯ সালে আফগানিস্তানের জাতীয় পরিষদ এ সীমারেখার ন্যায্যতা অস্বীকার করে এবং এখনো আফগান সরকার তা অস্বীকার করে আসছে।

গ. কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রম (SAP)

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য গঠিত হয় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। এ প্রেক্ষিতে আশির দশকে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে যে কর্মসূচি গ্রহণ করে তাই কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রম বলে পরিচিত। এতে উদ্দিষ্ট দেশগুলোর বিদ্যমান কাঠামো ও নীতিমালার পুনর্বিন্যাস করে তাকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার উপযোগী করার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

উপাদান : সাধারণভাবে SAP-এর তিনটি উপাদান রয়েছে।

১. **চাহিদা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম :** চাহিদা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বলতে মোট চাহিদা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য যোগানকে বোঝায়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় নীতিমালাসমূহ যদি কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয় তবে তা সরকারি ও বেসরকারি উভয়খাতেই অর্থের সমাগম ঘটায়। আবার দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

২. **কাঠামোগত কার্যক্রম :** এই কার্যক্রমের আওতায় পড়ে–
   ক. খাদ্য ও কৃষি খাত থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা।
   খ. বৈদেশিক ঋণ সময়মতো পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান।
   গ. আর্থিক উদারীকরণ ও সুদের হার যৌক্তিকীকরণ।
   ঘ. মুদ্রার রিজার্ভ ও তারল্যের হার নির্ধারণ।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম :** অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোগত বিষয়াদী এই ভাগে পড়ে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—
   ক. সরকারি খাতসমূহের পুনর্বিন্যাস। এর মধ্যে রয়েছে বেসরকারিকরণ ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার।
   খ. স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সেবাক্ষেত্রে বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর সংস্কার।
   গ. পল্লী জনপদ ইত্যাদির রাস্তাঘাট, বিদ্যুতায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ।

ঘ. রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি

উত্তর : যেসব ক্ষতিকর ও প্রাণঘাতী রাসায়নিক উপাদান যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলোকে বলা হয় রাসায়নিক অস্ত্র। সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে (The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Chemical Weapons and on their Destruction) ১৯৯২ সালে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতৃবৃন্দ রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তির বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছান এবং ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল এটা কার্যকর হয়। সে সময় থেকেই নেদারল্যান্ডের হেগস্থ রাসায়নিক অস্ত্রসমূহ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) CWC-এর ধারাসমূহের বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে।

ঙ. Truth and Reconciliation Commission

উত্তর : পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বর্ণবৈষম্য ও জাতিবৈষম্য যেসব দেশে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৯০-এর দশকে শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসানের পর বর্ণবাদ প্রথার বৈষম্য কমতে শুরু করে। দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সরকার বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। পূর্বের ঘৃণ্য বর্ণবাদ প্রথা বাদ দিয়ে সহনশীল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য এবং অতীত কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ না বাড়িয়ে মানবাধিকার রক্ষা ও জাতিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে একটি কমিশন গঠন করা হয় যার নাম Truth and Reconciliation Commission।

নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন Reconciliation-এর স্থপতি। ২৬ জুলাই ১৯৯৫ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার The Promotion of National Unity and Reconciliation Act পাস করে। অতীতের ঘটনাসমূহের দলিল সংগ্রহ, বর্বরোচিত ঘটনাসমূহের অনুসন্ধান প্রভৃতি লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর থেকে Truth and Reconciliation Commission (TRC) তাদের কর্মসূচি শুরু করে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অতীতের পুনঃপুন সংঘটিত অন্যায়-অবিচার ও দুঃখ-দুর্দশা, সহিংসতাকে প্রতিরোধ করে একটা অভিন্ন সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটানো, যা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে একটা উচ্চ স্থান দখল করবে। এই কমিশনের কর্মসূচির মাধ্যমে বর্ণবাদ অধ্যায়ের অবসান ঘটে।

বর্ণবাদ প্রথা থেকে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনেক বাধা ছিল। ১ মার্চ ১৯৬০ থেকে বর্তমান সংবিধান প্রণীত হওয়া পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের ভিতরে ও বাইরে মানবাধিকারের লঙ্ঘন, অন্তর্দ্বন্দ্ব বৈষম্য সৃষ্টি প্রভৃতি অবস্থা থেকে এ সকল ঘটনার শিকার মানুষের পুনর্বাসন ও সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধের জন্য Truth and Reconciliation Commission কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। এ কমিশনের অধীনে তিনটি কমিটি গঠিত হয়। যথা–

i. Committee on Human Right Violation; ii. Committee on Amnesty; iii. Committee on Reparation and Rehabiliation

এছাড়াও এ সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

Truth and Reconciliation Commission-এর চেয়ারম্যান ছিলেন আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু এবং ১৭ জন কমিশনার আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিশনের রিপোর্ট ১৯৯৮ সালের ২৪ অক্টোবর ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

Truth and Reconciliation আইনের মৌলিক ধারাগুলো হলো :

১. ১৯৬০ সালের অক্টোবর হতে ১৯৯৪ সালের ১০ মে (ম্যান্ডেলার শাসনক্ষমতা গ্রহণের দিন) পর্যন্ত সংঘটিত সার্বিক অপরাধের ওপর রিপোর্ট প্রদান।
২. দোষীদেরকেও তাদের অপরাধ থেকে ক্ষমতালাভের সুযোগ দান।
৩. কোনো ব্যক্তি যেই হোক না কেন, সকলের একটা সমন্বিত লক্ষ্য থাকতে হবে।
৪. মানবাধিকার ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষা।
৫. সর্বোপরি ভবিষ্যতে যাতে মানবাধিকারের লঙ্ঘন না ঘটে তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

অনেক সমস্যা, Nationalist Party গুলোর তীব্র বাধা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও এ কমিশন (TRC) তার মিশন শেষ করে। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকাতে

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, তারপরও এর মাধ্যমে দেশটি একটি দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে এবং মীমাংসা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক সাফল্য ভবিষ্যতের আশার সূচনা করে।

চ. INTERPOL

উত্তর : International Criminal Police Organisation সংক্ষেপে Interpol। ইন্টারপোল হলো পুলিশ বাহিনীর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। ১৯২৩ সালে বিশ্বের ৫০টি দেশ মিলে পুলিশ বিভাগকে আধুনিকীকরণ এবং অপরাধীদেরকে দ্রুত চিহ্নিত ও ধরার লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে ইন্টারপোলের সদর দপ্তর ফ্রান্সের লিওঁতে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক কারণে কিছুদিন এর কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ১৯৪৬ সাল থেকে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হয়। ইন্টারপোলের একটা সাধারণ পরিষদ রয়েছে। এর অধিবেশন এক এক সময় এক এক সদস্য রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ত্বরিত যোগাযোগ স্থাপন, অপরাধীদের সন্ধান, গতিরোধ, গ্রেপ্তার ইত্যাদির জন্য এই কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্র ১৯০টি (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান, ৩১ অক্টোবর ২০১১)। বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে।

উদ্দেশ্য : ইন্টারপোলের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

- পুলিশ বিভাগ বা পুলিশ বাহিনীকে অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিনিময় করা।
- এক দেশের অপরাধী অন্য দেশে যেন সহজে গা ঢাকা দিতে না পারে সে ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত কোনো আসামীকে স্বদেশে ফেরত দান।
- সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অপরাধ অনুসন্ধানের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- বিশ্বের অপরাধ দমন জোরদার করা এবং নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

ছ. Operation Defensive Shield

উত্তর : Operation Defensive Shield হলো ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে ইসরাইলি বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সামরিক অভিযান। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলি বাহিনী কর্তৃক পশ্চিম তীর ভূখণ্ড দখলের পর থেকে এটা ছিল সর্ববৃহৎ সামরিক অভিযান। হিব্রু ভাষায় এ অভিযান Homat Magen নামে পরিচিত।

পটভূমি : ২০০২ সালের মার্চ মাসে কিছু ফিলিস্তিনি গ্রুপ—হামাস, ইসলামিক জিহাদ এবং আল-আকসা মর্টার ব্রিগেড (ফাতাহ-এর সামরিক শাখা) কর্তৃক সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলায় ১২৫-এর অধিক ইসরাইলি বেসামরিক লোক নিহত হয়। ২০০২ সালের ২৭ মার্চ পাসওভার গণহত্যা (Passover Massacre) নামে পরিচিত ঘটনার দ্বারা এই আক্রমণের মাত্রা আরো তীব্র হয়। এই আক্রমণে নেতানিয়ার পার্ক হোটেলে একজন ফিলিস্তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ৩০ জনকে হত্যা করে।

উপরোক্ত ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ ২৮ মার্চ ২০০২ ইসলামী প্রতিরক্ষা বাহিনী (IDF) জরুরি ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্যের (২০,০০০ জন) সমাবেশ ঘটায়, যেটা ছিল ১৯৮২ সালের লেবানন যুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ।

লক্ষ্য : এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল–

১. ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত গ্রাম ও শহরগুলোতে প্রবেশ করে জঙ্গিগ্রুপ ও তাদের সাহায্যকারীদের গ্রেফতার করা।
২. ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবহৃত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা।
৩. জঙ্গী গ্রুপগুলোর গোপন আস্তানার সন্ধান ও তাদের সুযোগ-সুবিধা নষ্ট করা।
৪. বিস্ফোরক দ্রব্য, গবেষণাগার, অস্ত্র উৎপাদন কারখানা চিহ্নিতকরণ ও ধ্বংস করা।
৫. ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রবহনকারী ও তাদেরকে বাধাদানকারী যে কোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়। বেসামরিক লোকদের ক্ষতি ব্যতীত এই হামলা চালানোর নির্দেশ দেয়া হলেও বাস্তবে তা হয়নি।

অভিযান : ৩ এপ্রিল ২০০২ ইসলামী প্রতিরক্ষা বাহিনী পূর্ব জেরুজালেম ও হেবরন ব্যতীত অন্যান্য ফিলিস্তিনি শহরে সামরিক অভিযান চালায়। বড় ধরনের সংঘর্ষের স্থানসমূহ ছিল– ১. নাবলুস, ২. বেথেলহেম (Bethlehem), ৩. রামাল্লা, ৪. জেনিন।

অভিযান চলাকালীন সকল ফিলিস্তিনি শহরে কঠোর সান্ধ্য আইন (কারফিউ) বলবৎ ছিল। মানবাধিকার গ্রুপগুলোর অভিযোগ যে, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ফিলিস্তিনিদের অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগও দেয়া হয়নি এবং ইসরাইল সমন্বিতভাবে শাস্তি প্রদান করেছে যেটা চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের লঙ্ঘন। কিছু শহরে স্বল্প সময়ের জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করা হলেও অন্যান্য শহরে এক সপ্তাহ বা তার অধিককাল কারফিউ বলবৎ থাকে। জেনিনে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলে এবং কাউকেই বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। বেথেলহেমের নেটিভিটি চার্চে কিছু ফিলিস্তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলে অচলাবস্থা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পাঁচ সপ্তাহ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

বেশি মর্মস্পর্শী ছিল জেনিনের সংঘর্ষ এবং ইয়াসির আরাফাতের সদর দপ্তর অবরুদ্ধ করা। জেনিনের শরণার্থী ক্যাম্পে IDF কর্তৃক ফিলিস্তিনি গণহত্যা চালানো হয়। যদিও জেনিনের গণহত্যার অভিযোগকে ইসরাইল অস্বীকার করে। ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা আত্মরক্ষার্থে বেসামরিক লোকদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

সরকারিভাবে এই অভিযান ১০ মে, ২০০২ শেষ হলেও জবরদখল ও কারফিউ তারপরও বলবৎ ছিল। এর পরপরই Operation Determined Path চালানো হয়।

এই Operation Defensive Shield-এর সর্বশেষ ফলাফল ছিল অনেক সন্দেহভাজন ফিলিস্তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেফতার ও হত্যা, বেসামরিক লোক হত্যা, আবাসিক এলাকার ধ্বংসসাধন, আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর সংখ্যা হ্রাস করা এবং সর্বোপরি মানবজাতির (ফিলিস্তিনি) ওপর নৃশংস ও বর্বরোচিত হামলা চালানো।

৩. মধ্য এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২৩।

৪. বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক দরিদ্র দেশসমূহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২১২।

৫. ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে লিখুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৭।

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রণীত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির 'রোডম্যাপ' সম্পর্কে প্রতিবেদন দিন। ১৫

৭. OPEC তার সদস্য দেশগুলোর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষণ করতে পেরেছে বিশ্লেষণ করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬২১।

৮. 'সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব' সম্পর্কিত Samuel P. Huntington থিসিসের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৮ ।

২৩তম (বিশেষ) বিসিএস : ২০০১

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২ নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২ × ১০ = ২০

ক. ন্যাটো কোন সালে গঠিত হয়েছিল?
উত্তর : ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organization) ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল গঠিত হয়। উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা সোভিয়েত ব্লকের সম্ভাব্য সামরিক হুমকি মোকাবিলায় গঠিত হয়েছিল।

খ. কোন শহরের নাম বিগ অ্যাপেল?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের নাম বিগ অ্যাপেল। এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী এবং বর্তমানে এখানে জাতিসংঘের সদর দপ্তরসহ বহু আন্তর্জাতিক দপ্তর রয়েছে।

গ. কোন রেখা দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দ্বি-খণ্ডিত?
উত্তর : ৩৮তম অক্ষরেখা দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দ্বি-খণ্ডিত। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোরিয়া একক রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৫০ সালে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পরে এই রেখাই দুই কোরিয়ার মধ্যে স্থায়ী সীমানা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ঘ. Fifth Republic কি?
উত্তর : Fifth Republic বা পঞ্চম প্রজাতন্ত্র হলো ফ্রান্সের একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ১৯৫৮ সালে দ্য গল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনি পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ রিপাবলিকের দুর্বলতা দূরীকরণের নামে ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট পদ এবং দুর্বল পার্লামেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই Fifth Republic নামে পরিচিত। অবশ্য এই ব্যবস্থার অপর নাম গলবাদ (Gaullism)। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ছিল Fifth Republic-এর একাধিপত্যের যুগ।

ঙ. ভেনিজুয়েলা প্রজাতন্ত্র কোন মহাদেশে?
উত্তর : ভেনিজুয়েলা প্রজাতন্ত্র দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত। দেশটি এ মহাদেশের উত্তরাংশে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ঘেঁষে অবস্থিত।

চ. গোবি মরুভূমি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : গোবি মরুভূমি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত মঙ্গোলিয়ায় অবস্থিত। ১০,৪০,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই বিশাল মরুভূমিটি মঙ্গোলিয়ার মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত।

ছ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে (ডিসি অর্থ ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া)।

জ. যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র্যের হার কত?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র্যের হার ১৪.৫%। *[রিপোর্ট : ফরবেস ২০১৪ অনুযায়ী]*

ঝ. কোন সংস্থাটির পরিবর্তে WTO গঠিত হয়েছে?
উত্তর : GATT বা General Agreement on Tariff and Trade-এর পরিবর্তে WTO গঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে গ্যাট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৩ সালে উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত গ্যাট-এর অষ্টম সম্মেলনে গ্যাট-এর পরিবর্তে World Trade Organization বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নামকরণ করা হয়। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে WTO-এর কার্যক্রম শুরু হয়।

ঞ. 'বিশ্বগ্রাম' ধারণার প্রবক্তা কে?
উত্তর : 'বিশ্বগ্রাম' বা 'Global Village' ধারণার প্রবক্তা হলেন মার্শাল ম্যাকলুহান।

ট. গণচীন কখন ম্যাকাও'র ওপর সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়?
উত্তর : ম্যাকাও'র ওপর গণচীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর। ১৯ ডিসেম্বর রাত ১২ টার সময় ম্যাকাওর ওপর থেকে পর্তুগালের ৪৪২ বছরের কর্তৃত্বের চির অবসান ঘটে। ১৯৮৭ সালের ১৩ এপ্রিল পর্তুগাল ও চীনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক পর্তুগালের কাছ থেকে চীন ম্যাকাও লাভ করে।

ঠ. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের মর্যাদা কি?
উত্তর : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের মর্যাদা ভয়ংকরী নিরপেক্ষতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ দেশটি বিজয়ী ও বিজিতের এই ভেদনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থান নেয়। সুইজারল্যান্ডের এই নিরপেক্ষ নীতিকে বলে 'ফিয়ার্স নিউট্রালিটি'। অবশ্য সুইজারল্যান্ড সরাসরি জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক ছিল। তাছাড়া দেশটির সম্মেলনের শহর নামে খ্যাত জেনেভায় রয়েছে বহু সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর। (২০০২ সালে সুইজারল্যান্ড তাদের ফিয়ার্স নিউট্রালিটি বা ভয়ংকরী নিরপেক্ষতার মর্যাদা উপেক্ষা করে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করেছে)।

২. নিচের যে কোনো পাঁচটির ওপর টীকা লিখুন : ৪ × ৫ = ২০
ক. Purchasing Power Parity; খ. এডামস পিক; গ. গুনটার গ্রাস; ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি; ঙ. WWW; চ. SAIC; ছ. জেনারেল ডি গাউল; জ. WTO.

খ. Purchasing Power Parity
উত্তর : ক্রয়ক্ষমতা সমতা বা পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (Purchasing Power Parity) আন্তঃদেশীয় মুদ্রার প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপের একটি জনপ্রিয় সূচক। এটি একটি তত্ত্বীয় পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুটি ভিন্ন মুদ্রা দীর্ঘমেয়াদে বিনিময় হারের সাহায্যে তাদের ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা সমতার তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী বিনিময় হার-ই মূলত ঐ দুই মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার হার। ১৯১৮ সালে সুইডেনের অর্থনীতিবিদ

গুস্তাফ কাসেল এই তত্ত্বটি প্রচার করেন। এটি একটি পণ্যের একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ বাজারে, কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের একটিই মাত্র মূল্যমান থাকবে।

পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি একটি জনপ্রিয় অর্থনৈতিক সূচক এবং যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা দেশসমূহের তুলনাযোগ্য জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই সূচকটি প্রায় ব্যবহার করে থাকে, তবু এর সমর্থনে গবেষণালব্ধ ফলাফল আদৌ নিরঙ্কুশ নয়। গত প্রায় ১০০ বছরে এ তত্ত্বটি নিয়ে শত শত গবেষণা হলেও নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে বাস্তবে এ তত্ত্বটি প্রমাণযোগ্য।

খ. এডামস পিক

শ্রীলংকায় অবস্থিত একটি পর্বতশৃঙ্গ বা পর্বতচূড়া। প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ একটি মগ্নচূড়া এটি। এ স্থানটি ঐতিহাসিকভাবেও বিখ্যাত। প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ)-এর নামের সাথে এ স্থানটির স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। জান্নাত থেকে আদম (আ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল সিংহলের এ স্থানে। এটি পবিত্র স্থান হিসেবে খ্যাত।

গ. গুনটার গ্রাস

১৯৯৯ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী জার্মান লেখক। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাস 'দ্য টিন ড্রাম' লেখার জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।। জার্মান ভাষার এ বইটির নাম 'ব্লেখট্রোমেল'। উপন্যাসটি নাৎসিবাদের ভেতর বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্তের ইতিহাসভাষ্য। গুন্টার গ্রাস ১৯২৭ সালের ১৬ অক্টোবর পোল্যান্ডের বন্দর নগরী ডানজিগে জন্মগ্রহণ করেন। লেখায় হাত দেয়ার আগে ভাস্কর ছিলেন তিনি। ১৯৪৮ সালে ভর্তি হন ডুসেলডর্ফ একাডেমি অব আর্টে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত পশ্চিম বার্লিনে স্টেট একাডেমি অব আর্ট-এ পড়াশোনা করেছেন। ডুসেলডর্ফ আর বার্লিন এই দুই শহরে থাকাকালীন লেখালেখি বলতে কবিতাই ছিল তার বিচরণভূমি। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিনে ভাস্কর হিসেবেই কাজ করেছেন। প্যারিসে থাকাকালীন ১৯৫৬ সালে হাত দেন অমর উপন্যাস 'টিন ড্রাম' লেখায়। গুন্টার গ্রাস ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

দুই যুগের হানাহানি ও সংঘাতের পর দীর্ঘ আলোচনার সফল পরিসমাপ্তিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের লবিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সপ্তম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চার খণ্ড সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হয়।

ঙ. WWW

তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক এক নতুন সংযোজন www। এর পূর্ণরূপ হলো World Wide Web। তথ্য, চিত্র এবং শব্দ—এই তিনের সমন্বয়ে কম্পিউটার বা ইন্টারনেট জগতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় www। World Wide Web পরিচালনা করতে বিশেষ সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়। যেমন– Microsoft, Mosaic, Explorer, Netscape প্রভৃতি সফটওয়্যারের মাধ্যমে www ব্যবহার করা যায়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের উদ্ভাবক হলেন টিম বার্নার্স লি। টিম বার্নার্স লি জেনেভার পার্টিকেল সিস্টেম ইনস্টিটিউটে থাকাকালীন হাইপারটেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করেন। তার তৈরি কোড বিজ্ঞানীদের একটি ছোট কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের কাজকে সহজ করে। ১৯৯০ সালে এ প্রোগ্রামের নামকরণ করা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web সংক্ষেপে www)।

চ. SAIC

সার্কভুক্ত দেশসমূহের কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের আধুনিক কলা-কৌশল আদান প্রদান করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAARC Argicultural Information Centre বা SAIC)। সার্কের ৮ সদস্য বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান এর সদস্য। এর সদর দপ্তর ঢাকায় (ফার্মগেটস্থ খামারবাড়ি সংলগ্ন) অবস্থিত। সার্ক কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান লক্ষ্য হলো :

১. সদস্যভুক্ত দেশসমূহের কৃষি তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ।
২. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম, লাগসই প্রযুক্তি ও উন্নত কৃষি কৌশল সম্পর্কীয় বই-পুস্তক প্রকাশনা।
৩. কৃষি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক পত্রপত্রিকা, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা।
৪. কৃষকদের নিকট তথ্যাদি পৌছাবার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা।

ছ. জেনারেল ডি গাউল

সমরনেতা, রাষ্ট্রনায়ক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনের সাহসী যোদ্ধা। ডি গাউলের (Charles de Gaulle) জন্ম ১৮৯০ সালের ২২ নভেম্বর, ফ্রান্সে। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালের মে মাসে নাৎসি বাহিনী ফ্রান্স অধিকার করে নিলে তিনি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়টি সফল ট্যাঙ্ক অভিযান চালান, লাভ করেন মার্শাল উপাধি। বিজয়ী নাৎসি বাহিনীর কাছে ক্ষমতাসীন ফরাসি সরকার আত্মসমর্পণ করলে ডি গাউল লন্ডনে পালিয়ে যান এবং বেতারযোগে স্বদেশবাসীর প্রতি প্রতিরোধসংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাতে থাকেন। ফলে তার অনুপস্থিতিতেই তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে ডি গাউল যখন অবসর জীবনযাপন করছিলেন, তখন শুরু হয় আলজেরীয় যুদ্ধ এবং স্বদেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ। তাকে অবিলম্বে সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এ বছরই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে আলজেরীয় সঙ্কট নিরসন করেন। রাষ্ট্রনেতা হিসেবে ডি গাউলের কৃতিত্ব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ন্যাটো সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসা এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ। তার মৃত্যু হয় ১৯৭০ সালের ৯ নভেম্বর।

জ. WTO

উত্তর : *২৮তম বিসিএস দেখুন।*

৩. শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি পর্যালোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি এর পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১১৩।

৪. বিশ্বের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৯১।

৫. চীন-মার্কিন সম্পর্কের প্রকৃতি পরীক্ষা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫০৫।

৬. দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের (SAARC) ভূমিকা কতটুকু উজ্জ্বল? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৫।

৭. বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ কি অবদান রাখতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪০।

২২তম বিসিএস : ২০০১

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ ও ২ নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : $২ \times ১০ = ২০$

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টরাল কলেজে কত জন নির্বাচক থাকেন?
উত্তর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি জটিল প্রকৃতির ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ নির্বাচন প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষভাবে একটি নির্বাচক সংস্থা বা Electoral College-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যসংখ্যা মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের (সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ) সমান। অর্থাৎ ইলেকটোরাল কলেজের সদস্য সংখ্যা (১০০ + ৪৩৫ + ৩ ওয়াশিংটন ডিসি) ৫৩৮ জন। এই ৫৩৮টি ইলেকটোরাল ভোট ৫০টি অঙ্গরাজ্য এবং রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। প্রথমে প্রতিটি রাজ্যে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচক সংস্থার সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর নির্বাচিত নির্বাচক সংস্থার সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেন। ভোটদান শেষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের ভোট বাক্স সিলগালা করে রাজধানীতে পাঠানো হয়। পরের বছর ৬ জানুয়ারি সিনেটের সভাপতি কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সকল সদস্যের সামনে ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ করেন। সাধারণত ৫৩৮টি ইলেকটোরাল ভোটের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অবশ্য বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে ৫৩৮টি ইলেকটোরাল ভোটের মধ্যে ন্যূনতম ২৭০টি ভোট প্রয়োজন।

খ. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। উল্লেখ্য, ৩০ বছর মেয়াদি এই চুক্তি সম্পাদিত হয় নয়াদিল্লিতে। চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের পক্ষে সে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া।

গ. 'সাইক' (SAIC) কি এবং কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের নাম সাইক (SAIC)। যার পূর্ণরূপ হচ্ছে SAARC Agricultural Information Centre। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সাইকের সদর দপ্তর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ফার্মগেট এলাকায় অবস্থিত। সার্কভুক্ত দেশসমূহের কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, তথ্য আদান-প্রদান ও বিশ্লেষণ এই সংস্থার প্রধান কাজ। সার্কের ৮ দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক কলা-কৌশল আদান-প্রদান করা। আর এ লক্ষ্যে সাইক গঠিত হয়েছে।

ঘ. 'আল-আকসা ইন্তিফাদা' কি?
উত্তর : আল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দিস মসজিদকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের অধিকার থেকে মুক্ত করার জিহাদি আন্দোলনের নাম 'আল আকসা ইন্তিফাদা'। ইন্তিফাদা অর্থ গণআন্দোলন। এই গণআন্দোলনে ফিলিস্তিনি যুবকদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে শক্তি যুগিয়েছে।

ঙ. UNHCR কি এবং এর সদর দফতর কোথায়?
উত্তর : UNHCR হচ্ছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা। এর পূর্ণরূপ United Nations High Commissioner for Refugees। ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের নিরাপত্তা বিধান এবং শরণার্থী সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে এই সংস্থা নেতৃত্বদান ও সমন্বয় সাধন করে। UNHCR ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে দু বার নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

চ. 'আল-কুদস' (Al-Quds) কি?
উত্তর : ফিলিস্তিনের প্রাণকেন্দ্র জেরুজালেমে অবস্থিত 'আল কুদস' যা সাধারণভাবে বায়তুল মোকাদ্দিস নামে পরিচিত। এই আল কুদস শরীফ মুসলমানদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান। ১৯৬৯ সালে এই পবিত্র স্থানে ইসরাইলি সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়ে মসজিদটিতে অগ্নি সংযোগ করে। এই ইহুদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এরই প্রেক্ষিতে মুসলিম দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ ১৯৬৯ সালে ওআইসি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালে বায়তুল মোকাদ্দিস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ওআইসির ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'আল কুদস' কমিটি গঠন করে। বাংলাদেশ এই কমিটির সদস্য।

ছ. বাংলাদেশ কোন বছর সিটিবিটি (CTBT) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে?
উত্তর : বাংলাদেশ সিটিবিটি বা Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১৯৯৬ সালে। আর সিটিবিটি চুক্তি অনুমোদন করে ২০০০ সালের ৮ মার্চ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সিটিবিটি অনুমোদনে বিশ্বের ২৮তম দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম এই চুক্তি অনুমোদন করে।

জ. 'ওয়ার্ল্ড ব্যাংক'-এর সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)-এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

ঝ. **'ন্যাম ট্রয়কা' (NAM Troika) বলতে কি বোঝায়?**

উত্তর : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যাম সম্মেলনে গৃহীত একটি সিদ্ধান্তের নাম ন্যাম ট্রয়কা (NAM Troika)। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ ন্যাম সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত হয় যে, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ন্যাম-এর ত্রয়োদশ সম্মেলনের জন্য বর্তমান, বিগত ও ভবিষ্যৎ (যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা, কলম্বিয়া এবং বাংলাদেশ) চেয়ারম্যানগণ একত্রিত হয়ে ত্রয়োদশ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ডারবান সম্মেলনের এই সিদ্ধান্তটি 'ন্যাম ট্রয়কা' নামে অভিহিত।

ঞ. **'সাপটা' (SAPTA)-র পুরো নাম কি?**

উত্তর : SAPTA-এর পুরো নাম SAARC Preferential Trading Arrangement বা দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, সার্কভুক্ত সাতটি (বর্তমান সদস্য ৮টি) দেশ ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৭ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সময় এই চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে SAPTA কার্যকর হয়।

ট. **'সিএফসি' (CFC) বলতে কি বোঝায়?**

উত্তর : সিএফসি হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (Cloro Floro Carbon)। এটি গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায়। বিশেষ করে ওজোন স্তরের ক্ষয়কারী পদার্থের মধ্যে সিএফসি'র ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সিএফসি মূলত ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রনিক সার্কিট পরিষ্কার করতে, ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনারের শীতলীকরণ হিসেবে, ঔষুধ স্প্রে করার বোতলে, ফাস্ট ফুড প্যাকেট তৈরিতে এবং ফোমের গদিসহ বিভিন্ন সামগ্রিতে। এছাড়াও জেট ইঞ্জিন, মোটরযান, রকেট, সুপারসনিক বিমান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে বাতাসে এই পরিবেশ ধ্বংসকারী সিএফসি গ্যাস নির্গত হয়।

ঠ. **'ওজোন স্তর' (Ozone layer) কি জন্য প্রয়োজন?**

উত্তর : পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১১ কিমি ওপর থেকে ৫০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বলে স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এই স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরের ওপরের স্তরই হচ্ছে ওজোন স্তর বা Ozone layer। এই স্তরটি আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার পুরো ওজোন (O_3) গ্যাসে নির্মিত। এই ওজোন স্তর ক্ষতিকর বিভিন্ন রশ্মি থেকে বিশ্ববাসী তথা বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করে। ওজোন স্তর ক্ষয় হয়ে ফুটো হয়ে গেলে ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বা অতি বেগুনি রশ্মি নির্গত হয়, যা জীবন জগতের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

ড. **সুয়েজ খালের দুই প্রান্তে কোন কোন জলরাশি অবস্থিত?**

উত্তর : সুয়েজ খাল মিশরে অবস্থিত। জাহাজ চলাচলের জন্য পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম খাল। এ খাল লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। অর্থাৎ সুয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ প্রান্তে লোহিত সাগর অবস্থিত।

২. **যে কোনো পাঁচটির ওপর টীকা লিখুন :** $৪ \times ৫ = ২০$

ক. 'গ্রিনহাউস ইফেক্ট' (Green house effect); খ. ডব্লিউটিও (WTO); গ. কাশ্মিরের নিয়ন্ত্রণরেখা (LOC); ঘ. বিমসটেক (BIMSTEC); ঙ. জিএসপি (GSP); চ. সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন; ছ. 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি; জ. সুশীল সমাজ।

ক. **'গ্রিনহাউস ইফেক্ট' (Green house effect)**

উত্তর : গ্রিনহাউস শব্দের আক্ষরিক অর্থ সবুজ ঘর। আর গ্রিনহাউস ইফেক্ট অর্থ সবুজ ঘর প্রতিক্রিয়া। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবী নামের গ্রহটি ক্রমশ উত্তপ্ত

হচ্ছে। দক্ষিণ গোলার্ধে ওজোন স্তরের ফাটল দিয়ে বিনা বাধায় ঢুকছে ক্ষতিকর বিভিন্ন রশ্মি। এখানে সেখানে হলুদ বৃষ্টি ও বাতাসে ক্লোরাফ্লোরো-কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সবুজ বনাঞ্চল, গলে যাচ্ছে ইউসেমিটি পর্বতের শুভ্র তুষার। কলকারখানার ধোঁয়া, জ্বালানি শক্তি দহন, অধিক জনবসতি ইত্যাদি কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। তাছাড়াও বিভিন্ন রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হচ্ছে ক্ষতিকর মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন গ্যাস ইত্যাদি। এসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে এবং সৃষ্টি করছে একটি দুর্বোধ্য স্তর, যার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপ ওপরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবার ফিরে আসছে পৃথিবীর দিকে। এ অবস্থাকে বলা গ্রিনহাউস ইফেক্ট।

খ. **ডব্লিউটিও (WTO)**

উত্তর : *২৮তম বিসিএস দেখুন।*

গ. **কাশ্মিরের নিয়ন্ত্রণরেখা (LOC)**

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটি সীমান্ত রেখাকে লাইন অব কন্ট্রোল (LOC) বলা হয়। এটি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীর ও ভারত অধিকৃত জম্মু কাশ্মীরের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা। এটি যেহেতু বিভক্ত কাশ্মীরের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা এবং এ রেখা বরাবর বিবদমান দুটো দেশের সীমান্ত রেখা চিহ্নিত— সেহেতু এ রেখাটি কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা হিসেবেও আখ্যায়িত হয়।

ঘ. **বিমসটেক (BIMSTEC)**

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুনর্গঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা বিমসটেক বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রথম চিন্তা আসে ১৯৯৭ সালে। এর মূল উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ড এ সংক্রান্ত একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরি করে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার সাথে যোগাযোগ করে। উক্ত দেশগুলো থাইল্যান্ডের কনসেপ্টের সাথে নীতিগত সম্মতি প্রদান এবং জোটে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তখন চারটি দেশের নামের ইংরেজি বানানের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা Economic Co-operation (EC) যোগ করে সংস্থার নামকরণ করা হয় বিসটেক বা BISTEC (Bangladesh, India, Sri-Lanka, Thailand Economic Cooperation)। পরে ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর মিয়ানমার এ সংস্থায় যোগদান করায় নামকরণ করা হয় বিমসটেক বা BIMSTEC অর্থাৎ Bangladesh, India, Myanmar, Sri-Lanka, Thailand Economic Cooperation. এর পরে নেপাল ও ভুটান এ সংস্থায় যোগ দেয়। নেপাল ও ভুটান নতুন সদস্য হওয়ায় এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ৩১ জুলাই ২০০৪ এ সংস্থার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয় এবং বিমসটেক (BIMSTEC) শব্দটি অপরিবর্তিত রেখেই সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয়। নতুন নাম হচ্ছে Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation সংক্ষেপে BIMSTEC।

ঙ. **জিএসপি (GSP)**

GSP-এর পূর্ণরূপ Generalized System of Preference। জিএসপি একটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুবিধার নাম। এটি একটি অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা। GSP মূলত সাধারণীকৃত অগ্রাধিকার ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে

বিশেষ অগ্রাধিকার পায় তাকেই বলে GSP। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের পোশাক আমদানির ক্ষেত্রে জিএসপি পদ্ধতি আরোপ করে, যার ফলে বাংলাদেশ ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইইউভুক্ত দেশসমূহতে শুল্কমুক্ত পোশাক রপ্তানি করতে পারতো। এ পরিস্থিতির আলোকে বলা যায়, মূলত ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত কোটামুক্ত সুবিধা কাজে লাগাতে পেরেছে। কিন্তু এর পরবর্তী পোশাক শিল্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে কৌশলগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। উল্লেখ্য, জিএসপি পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত পায়। এসব সুযোগ-সুবিধা হারানোর কারণে বাংলাদেশ ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে পোশাক শিল্পের ব্যবসায় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে প্রয়োজন পণ্যের মান উন্নত করা এবং কৌশলগত বাণিজ্যিক পদ্ধতি অনুসরণ।

চ. সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন

বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জোরদার এবং দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রোগব্যাধি, অন্যায়-অবিচার, সহিসংতা, সন্ত্রাস ও অশিক্ষা দূরীকরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০ শেষ হয় তিন দিনব্যাপী 'জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন'। জাতিসংঘের ৫৫তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৮৯টি (বর্তমান সদস্য ১৯৫) দেশের মধ্যে ১৫০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। 'দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী বিশ্বের ১০০ কোটি মানুষের জন্য ২০১৫ সাল নাগাদ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘের নিউইয়র্কস্থ সদর দপ্তরে ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এই শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। জাতিসংঘের এই মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন শুধু জাতিসংঘেরই নয়, ইতিহাসের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ কূটনৈতিক সমাবেশ বা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মহা মিলনমেলা।

একুশ শতকের এই বিশ্ব কেমন হবে? কেমন হবে তার রূপ? গরিব দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন হবে? কিভাবে তাদের দারিদ্র্য কমানো সম্ভব? ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সামনে রেখে মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর শীর্ষ সম্মেলন শেষে 'সহস্রাব্দ ঘোষণাপত্র' নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। আট পৃষ্ঠার এই ঘোষণাপত্রে শান্তি, নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা চালানোর দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

ছ. 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি

এক দেশ দুই নীতি বা 'ওয়ান কান্ট্রি টু পলিসি'র দেশ চীন। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন মধ্যরাতে হংকং চীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে চীন সরকার এই নীতি প্রণয়ন করে। চীনের শাসনাধীনে যাওয়ার পূর্বে হংকংয়ের অর্থনীতি ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। অন্যদিকে চীনের অর্থব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সমাজতান্ত্রিক। এ অবস্থায় চীন সরকার হংকংয়ের পূর্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উক্ত নীতি প্রবর্তন করে।

জ. সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজের ধারণাটি নতুন হলেও এর প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় জন লক, রুশোসহ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের লেখনীতে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় এন্টোনিও গ্রামসির লেখায়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুশীল সমাজকে আপনরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। কেননা এ অঞ্চলের

সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও কড়া বিধি-নিষেধের কারণে সেখানে কোনো রাজনৈতিক ও বেসরকারি ব্যবসায়িক কিংবা বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নি। কমিউনিজমকে টিকিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্ট মডেলে সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের চেষ্টাও করা হয় দীর্ঘকাল। কিন্তু কোনো কিছুতেই শেষ রক্ষা হয় নি। কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনে এক সময় লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে আসে। তখনই প্রশ্ন আসে, কোন শক্তি তাদেরকে এতো বাধা-নিষেধ আর নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করলো? এটি মূলত সুশীল সমাজ। এরা সরকারে থাকে না, আবার কর্পোরেট গ্রুপেও থাকে না। এরা সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরের মাঝামাঝি একটি গ্রুপ। এদের ধর্ম হলো এরা সরকার ও প্রাইভেট সেক্টর উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরা সরকারকে সহযোগিতাও করতে পারে আবার সরকারবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরকারের ভিতও নাড়িয়ে দিতে পারে।

৩. মূল চীনের সঙ্গে তাইওয়ানের একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু লিখুন। প্রসঙ্গক্রমে এই সম্ভাব্য সংযুক্তির পক্ষের ও বিপক্ষের উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ১৫

৪. মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। এই প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫০৫।

৫. 'সাফটা' (SAFTA) কি? এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৩১।

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা নিয়ে কি কারণে সমস্যা ও বিলম্ব ঘটেছিল? শেষ পর্যন্ত কিভাবে সমস্যার নিষ্পত্তি হয়? সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরম্পরা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১৫

৭. 'ম্যাড কাউ' (Mad Cow) রোগ কি? এ সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন। ১৫

৮. 'ওপেক' (OPEC) কি? সদস্য দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে এই সংগঠন সাধারণত কি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে? জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি একটি তেল আমদানিকারী স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬২১।

২১তম বিসিএস : ২০০০

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং ও ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২ × ১০ = ২০

ক. জাতিসংঘে বর্তমানে কয়টি ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চলে?

উত্তর : জাতিসংঘে সরকারি ভাষা সম্পর্কিত সনদে ৬টি ভাষা যথা : ইংরেজি, চীনা, ফ্রেঞ্চ, রুশ, আরবি এবং স্পেনিশ ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে দাপ্তরিক ভাষা দুটি। যথা : ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ।

খ. ফারাক্কার পানিবণ্টন চুক্তি প্রথম কখন সম্পাদিত হয় এবং এটাতে নিজ নিজ দেশের পক্ষে কে কে স্বাক্ষর করেন?

উত্তর : ফারাক্কার পানিবণ্টন চুক্তি প্রথম ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল সম্পাদিত হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর করেন।

গ. ৩৮তম অক্ষ রেখার বিশেষ গুরুত্ব কি?

উত্তর : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা হিসেবে এ রেখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. Maginot Line কি?

উত্তর : জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক জার্মান-ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।

ঙ. যৌথ নিরাপত্তা কি?

উত্তর : সাধারণভাবে যৌথ নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি এমন এক ব্যবস্থা, যাতে কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কেবলমাত্র সে রাষ্ট্র অথবা তার মিত্র রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। যৌথ নিরাপত্তা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থায় 'প্রত্যেক রাষ্ট্র সকল রাষ্ট্রের এবং সকল রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত'। এ নীতিতে বিশ্বাসী অধ্যাপক জর্জ সোয়ার্জেন বার্গার তার 'Power Politics' গ্রন্থে বলেন, 'Collective Security means Machinery for joint action is order to prevent of counter any attack against an established international order.'

চ. 'ভূ-অর্থনীতি' কি?

উত্তর : ভূ-অর্থনীতির বর্তমান ধারণার ব্যবহার শুরু হয় Edward Luttwak থেকে। তিনি ১৯৯০ এর দশকে তার প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও বইয়ের মাধ্যমে ভূ-কৌশলের নতুন বাস্তবতাকে বিভিন্ন নামে ব্যাখ্যা করেন যা পরবর্তীতে পাবলিক এজেন্ডায় পরিণত হয়। Luttwak তার ভূ-অর্থনীতির ধারণা বলতে বুঝিয়েছেন 'The contenution of the ancient rivalry of the nations by new industrial means.' 'যুদ্ধ' আজকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে বাণিজ্য দখলে'। তাই ভূ-অর্থনীতি বলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক কত দূর এগিয়েছে সেটা লক্ষ্য নয়, বরং দেশের পণ্যের জন্য বিশ্ব বাজার কতটুকু দখল হয়েছে সেটাই বড় লক্ষ্য। এ প্রেক্ষাপট ভূ-অর্থনীতির দুটি মৌলিক দিক ব্যাখ্যা করে :

ক. পরিভাষাটি হলো একটি নতুন ও ঐতিহাসিক ভূ-কৌশল এবং ঐতিহাসিক ভূ-কৌশল প্রপঞ্চ এবং

খ. নতুন অবস্থা থেকে সৃষ্ট একটি কৌশলগত আচরণ।

এভাবে পরিভাষাটির একটি কৌশলগত মাত্রা (dimension) রয়েছে— এটি একটি নীতি নির্ধারণী ধারণাও বটে।

ছ. Third Reich কি?

উত্তর : Reich (রাইখ) একটি জার্মান শব্দ। এর অর্থ সাম্রাজ্য। তৃতীয় রাইখ (Third Reich) হলো জার্মান রাষ্ট্রে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত হিটলারের শাসনকাল। উল্লেখ্য, প্রথম রাইখ ছিল জার্মান রাষ্ট্রে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ৯৬২ থেকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাইখ ছিল ১৮৭১ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (বিসমার্ক থেকে উইলহেম)।

জ. 'Second-track diplomacy' কি?

উত্তর : বিবদমান দেশের দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সমস্যা সমাধানে যখন পেশাদার কূটনীতিকগণ ব্যর্থ হন, তখন সেই সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সিভিল সোসাইটি যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাই 'Second-track diplomacy.'

ঝ. অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (Persona-non-grata) বলতে সাধারণত সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে, অথবা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সাধারণত সে ব্যক্তিকে ঘোষণা করা হয় যিনি (বিদেশি ব্যক্তি ও কূটনীতিকসহ) গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থবিরোধী, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী ক্রিয়া-কর্মে জড়িত থাকেন, কিংবা মন্তব্য করেন।

ঞ. কোন যুক্তি দেখিয়ে ভারত এখনো পর্যন্ত CTBT-তে স্বাক্ষর করেনি?

উত্তর : এ চুক্তিতে পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ, পরিমাণ হ্রাস এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু এর কোথাও উৎপাদন বন্ধ কিংবা উৎপাদিত অস্ত্রের সমূলে ধ্বংসের কথা বলা হয় নি। NPT চুক্তিতে বলা হয়েছে জানুয়ারি ১৯৬৭-এর মধ্যে যারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এর বাইরে অন্য কোনো দেশ এই অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পাবে না। এ চুক্তি মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং চীন পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হবার সুযোগ লাভ করে। তাই ভারত এর প্রতিবাদ করে NPT স্বাক্ষর দানে বিরত থাকে। ভারতের যুক্তি হলো হয় সবার অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে, না হয় অন্যদেরকেও উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে। এই যুক্তি দেখিয়ে ভারত এখনো পর্যন্ত CTBT-তে স্বাক্ষর করে নি।

ট. Asian Development Bank-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : Asian Development Bank-এর সদর দপ্তর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অবস্থিত।

ঠ. Dayton Agreement কোন আন্তর্জাতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য সম্পাদিত হয়েছিল?

উত্তর : ১৯৯৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর Dayton Agreement বসনীয় সংকট নিরসনের জন্য সম্পাদিত হয়েছিল।

২. নিচের যে কোনো পাচঁটির ওপর টীকা লিখুন : $৪ \times ৫ = ২০$

ক. বার্লিন দেয়াল; খ. প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি; গ. 'Wye River' চুক্তি'; ঘ. কারগিল যুদ্ধ; ঙ. চেচনিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ; চ. কাঠামোগত সমন্বয় নীতি; ছ. আসিয়ান; জ. সর্বজনীন মানবাধিকার।

ক. বার্লিন দেয়াল

উত্তর : ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানি কর্তৃক বার্লিন শহরকে বিভক্ত করে নির্মিত প্রাচীর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিনকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুটি অংশে ভাগ করে পূর্ব জার্মানি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে এবং পশ্চিম জার্মানিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত অংশে সমাজতন্ত্র এবং অন্য অংশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়। মতাদর্শগত পার্থক্যের প্রতীক হিসেবে ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানি বার্লিন প্রাচীর গড়ে তোলে। দুটি খণ্ডিত অংশের মধ্যে যোগাযোগ বা আদানপ্রদান ছিল সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্বাচেভ কর্তৃক 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরস্ত্রোইকা' নীতি ঘোষিত হওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নাগরিক অধিকারের আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগে সমাজতান্ত্রিক দেশ পূর্ব জার্মানিতেও।

১৯৮৯ সালে সাবেক পূর্ব জার্মানির বড় শহরগুলোতে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ শুরু হয়। তারা গণতন্ত্র আর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের দাবি জানায়। ৯ অক্টোবর পূর্ব জার্মানির লাইপজিগে নাগরিক আন্দোলনের ডাকে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ রাস্তায় নামে। সেটাই ছিল পূর্ব জার্মান কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তম নাগরিক বিদ্রোহ। শুধু লাইপজিগ নয়, আন্দোলনের ঢেউ লাগে রাজধানী পূর্ব বার্লিনেও। ৪ নভেম্বর পূর্ব বার্লিনের প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্ডার স্কোয়ারে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নানা অস্থিরতা আর বিক্ষোভের মুখে পূর্ব জার্মানির চ্যান্সেলর এরিখ হোনিকার স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেন। ধস নামতে শুরু করে কমিউনিস্ট সরকারের অভ্যন্তরে। ৮ নভেম্বর পদত্যাগ করেন পূর্ব জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। ৯ নভেম্বর আটাশ বছরের বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর আটাশ বছর বার্লিন শহরকে বিভক্ত করে রেখেছিল এই প্রাচীর।

১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর বার্লিন প্রাচীরের কোল ঘেঁষে বার্লিন গেটের পাশেই অবস্থিত রাইখসটাগ (জার্মান পার্লামেন্ট ভবনের সামনে) এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।

খ. প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি

উত্তর : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত আন্তর্জাতিক দলিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে রিও সম্মেলনকে সামনে রেখে এ চুক্তি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিল জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি। পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের আগেই সেটি চূড়ান্ত করে স্বাক্ষরের জন্য ধরিত্রী সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৫৪টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত তা অনুমোদন বা অনুসমর্থন করে নি। বাংলাদেশ এতে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। এই কনভেনশন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার বলতে এই বোঝায় যে, এর ব্যবহার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিতভাবে করতে হবে যাতে দীর্ঘমেয়াদেও এর সম্পদ সঙ্কুচিত না হয়। সেই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার বলতে বংশগতির ধারা বহনকারী জিন সমেত কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের ব্যবহার বুঝায়। জীব ও জড় পরিবেশ নিয়ে গঠিত পরিবেশ ব্যবস্থাকেও আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। নিজ নিজ জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রতিটি দেশের পূর্ণ অধিকার আছে। এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বও আছে। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন সচিবালয় কানাডার মন্ট্রিলে অবস্থিত।

গ. 'Wye River' চুক্তি

উত্তর : ২৪ অক্টোবর ১৯৯৮ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডের ওয়েইরিভার সম্মেলন কেন্দ্রে একটানা নয় দিনের আলোচনার পর হোয়াইট হাউসে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে নতুন 'অন্তর্বর্তীকালীন সমঝোতা স্মারক' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একে 'ওয়েই রিভার চুক্তি' বা 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতা করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জর্ডানের বাদশাহ হোসেন।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বর্ধিত ইহুদি জনসংখ্যার আবাসনের নামে জেরুজালেমের ইহুদি ছিটমহল 'হারহোমাতে' আবাসিক প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। জেরুজালেমকে রাজধানী করার ঘোষণাও তিনি দেন। ফিলিস্তিনি সরকার ও স্বাধীনতাপন্থী ইসলামী গ্রুপগুলো এর বিপক্ষে অবস্থান নিলে ফিলিস্তিনি-ইসরাইল সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইসরাইলের দখলীকৃত ১৩ শতাংশ ভূমি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে

ছেড়ে দিতে বললে ইসরাইল তা অস্বীকার করে। ইসরাইল প্রথমে নয় শতাংশের বেশি ভূমি ছাড়তে নারাজ ছিল। ইসরাইলের এ অনমনীয়তার কারণে চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্বিত হয়। অতঃপর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডলিন অলব্রাইট একটি আপোস ফর্মুলা পেশ করেন। এ ফর্মুলায় ১৩ শতাংশের মধ্যে ৩ শতাংশকে প্রাকৃতিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা এবং ইহুদি বসতি স্থাপনাকারীরাও সেখানে বসবাস করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব মানতে রাজি হয় নি। চুক্তি স্বাক্ষরে ইসরাইল রাজি না হলেও ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ঘোষণা দেন তিনি ৪ মে ১৯৯৯ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবেন। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র উভয় কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করে। এ চুক্তিকে ১৯৯৯ সালের ৪ মের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে অনুমান করা হয়।

চুক্তির শর্ত ছিল ইসরাইল ১৯৬৭ সালে দখলকৃত পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূ-খণ্ড ফিলিস্তিনিদের হাতে হস্তান্তর করবে। এছাড়া ইসরাইল কারাগারে আটক ৩০০০ ফিলিস্তিনি বন্দিদের মধ্যে ৭৫০ জনকে মুক্তি দেবে এবং পশ্চিম তীর ও গাজার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদের যাতায়াতের জন্য নিরাপদ করিডোর বা সংযোগ পথ স্থাপন করার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে এ চুক্তিতে। অপরদিকে পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরাইলি সেন্য প্রত্যাহার শুরুর দু মাসের মধ্যে পিএলও কেন্দ্রীয় পরিষদ ১৯৬৪ সালের পিএলও সনদে অন্তর্ভুক্ত ইসরাইল রাষ্ট্র উচ্ছেদের ঘোষণা বিলুপ্ত করবে। এ ছাড়া ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ইহুদিবিরোধী সশস্ত্র চরমপন্থী গ্রুপের অবকাঠামো ধ্বংস, চরমপন্থীদের গ্রেপ্তার এবং ইসরাইলবিরোধী হামলার অভিযুক্ত চরমপন্থীদের বিচারসহ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত সন্ত্রাস বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করবে।

ইসরাইলের কয়েকজন মন্ত্রীসহ অনেকে এবং ফিলিস্তিনি চরমপন্থী দলগুলো এ চুক্তির বিরোধিতা করে। চমরপন্থী দলগুলোর বিরোধিতার মাঝেও ৩০ অক্টোবর '৯৮ ফিলিস্তিনি মন্ত্রিসভায় চুক্তিটি অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু ৬ নভেম্বর ৯৮ জেরুজালেমের ইহুদা নামক স্থানে চরমপন্থী ফিলিস্তিনিদের বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হলে ইসরাইল একতরফাভাবে চুক্তিটিকে স্থগিত ঘোষণা করে।

ঘ. কারগিল যুদ্ধ

উত্তর : জম্মু ও কাশ্মীরের কারগিল ও দ্রাস সেক্টরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৯৯ সালের ৬ মে থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত। তবে এ যুদ্ধ কোনোভাবেই সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিগণিত না হয়ে বরং স্থানীয় যুদ্ধ (Local War)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কারগিল ও দ্রাস হচ্ছে কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ রেখার নিকটবর্তী দুটি শহর। এই শহর দুটির ওপর দিয়ে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শ্রীনগর ও লেহর সংযোগকারী সড়ক ন্যাশনাল হাইওয়ে অবস্থিত। সুতরাং এটি ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে পাকিস্তানের মদদপুষ্ট বিভিন্ন মৌলবাদী গ্রুপ ও ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কারগিল ও দ্রাসের উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী কারগিল পবর্তশৃঙ্গে অবস্থানরত পাকিস্তানি অণুপ্রবেশকারীদের ওপর বিমান হামলা চালানোর মাধ্যমে এ যুদ্ধের আংশিক ব্যাপকতা লাভ করে। পাকিস্তান প্রথম দিকে এ যুদ্ধে তার সৈন্যদের অংশগ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে তা স্বীকার করে নেয়। এ যুদ্ধটি স্থানীয় ভিত্তিক এক ধরনের ছায়াযুদ্ধ (Proxy War) হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি সীমিত যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সমতুল্য বিধায় একে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমগুলো কারগিল যুদ্ধ বলে অভিহিত

করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের উদ্যোগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ৫ জুলাই ১৯৯৯ অনুষ্ঠিত আলোচনা ও এক ধরনের চাপের মাধ্যমে পাকিস্তানকে এ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করানো হয়েছে; যা ভারতের জন্য একটি বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। ক্লিনটন-নওয়াজ বৈঠক অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি অনুযায়ী পাক-ভারত নিয়ন্ত্রণ রেখার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কারগিল ও দ্রাস এলাকা থেকে জঙ্গি অণুপ্রবেশকারীদের প্রত্যাহার করে নেন।

ঙ. চেচনিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ

উত্তর : চেচনিয়া রুশ ফেডারেশনের অন্তর্গত একটি স্বাধীনতাকামী মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। রাশিয়ার উত্তরে ককেশাস অঞ্চলে ১ লাখ ৩৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশ চেচনিয়া। লোক সংখ্যা ১৪ লাখ। রাজধানী 'গ্রোজনী' (জওহারগালা)। চেচনিয়ার অধিকাংশ জনগণই মুসলিম। চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন বিশ্বের সবচেয়ে বিলম্বিত বিষয়। চেচেনরা বহু বছর ধরে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে আসছে এবং তাদের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসনের ইতিহাস প্রায় চারশ বছরের। পিটার দি গ্রেট থেকে শুরু করে বর্তমান পুতিন পর্যন্ত সব শাসকই চেচেনদের স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। এক্ষেত্রে রাজতান্ত্রিক জার, সমাজতান্ত্রিক স্ট্যালিন, গণতন্ত্রী ইয়েলৎসিন-পুতিনসহ সব রুশ নেতার ভূমিকাই ছিল এক ও অভিন্ন।

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে দীর্ঘকালের রুশ দুঃশাসনের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশায় স্বাধীনচেতা চেচেনরা ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে এক গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন চেচনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং চেচনিয়াকে পদানত করার জন্য প্রেসিডেন্টের শাসন জারি করে সেখানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু চেচেনদের প্রতিরোধের মুখে রুশ আগ্রাসন সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৯১ সালের ২৯ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোভিয়েত বাহিনীর সাবেক জেনারেল জোখার দুদায়েভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনি ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুদায়েভের এই পদক্ষেপে রাশিয়া ক্ষেপে যায়। ১৯৯৪ সালের ২৬ নভেম্বরের পর রাশিয়া চেচনিয়ায় আগ্রাসন শুরু করে। ১১ ডিসেম্বর বিপুল সৈন্য ও ট্যাঙ্ক বহর পাঠিয়ে চেচেন রাজধানী গ্রোজনী অভিযান শুরু করে। রুশ বাহিনীর প্রত্যাশা ছিল দ্রুত চেচনিয়ার পতন ঘটবে। কিন্তু পরাশক্তি রাশিয়া প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। অবশেষে দীর্ঘ দুই মাস যুদ্ধের পর রাশিয়া সমগ্র গ্রোজনী দখল করে। ফলে চেচেনরা গেরিলা যুদ্ধের পথ অবলম্বন করে। এখনো সেই গেরিলা যুদ্ধ চলছে।

ছ. আসিয়ান

উত্তর : ASEAN-এর পূর্ণরূপ Association of South-East Asian Nations (দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্র সংস্থা)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৮ আগস্ট, ১৯৬৭। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০। সদস্য দেশগুলো হলো মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া। সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। সর্বশেষ সদস্য কম্বোডিয়া (৩০ এপ্রিল ১৯৯৯)। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৫। সেগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড। ষষ্ঠ সদস্য ব্রুনাই (১৯৮৪)। সপ্তম সদস্য ভিয়েতনাম (১৯৯৫)। অষ্টম

ও নবম সদস্য মিয়ানমার ও লাওস (১৯৯৭)। আসিয়ানের সর্বশেষ দশম সদস্য দেশ হলো– কম্বোডিয়া (৩০ এপ্রিল ১৯৯৯)। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি।

জ. সর্বজনীন মানবাধিকার

উত্তর : ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হচ্ছে : ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নির্যাতন থেকে অন্য দেশে আশ্রয় চাওয়া ও আশ্রয় লাভ, ভয়, অভাব, নির্যাতন ও দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার। নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্বেশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ঘোষণা প্রযোজ্য। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার দিনটি উপলক্ষে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রে মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৬৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৯৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী পালিত হয়। পঞ্চাশতম বার্ষিকীর মূল বক্তব্য ছিল 'সবার জন্য সকল মানবাধিকার'। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা খসড়া প্রণয়নে মূল অবদান রেখেছেন ইলিনর রুজভেল্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), রেনে কাসিন (ফ্রান্স), চার্লস মালিক (লেবানন), পেং চুন চ্যাং (চীন), হারনাম সান্তাক্রুজ (চিলি), আলেকজান্দ্রে বোগোসোলভ, আলেক্সি পাভলভ (সোভিয়েত ইউনিয়ন), লর্ড ডুকেসতন, জিওফ্রে উইলসন (যুক্তরাজ্য), উইলিয়াম হজসন (অস্ট্রেলিয়া) এবং জন হামফ্রে (কানাডা)।

৩. সম্প্রতি সিয়াটলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধিবেশন ভেস্তে যাবার কারণসমূহ আলোচনা করুন। ১৫

৪. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার মতামত প্রদান করুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪২৮।

৫. স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কতটুকু উজ্জ্বল? ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৮৭।

৬. দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতির ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ কি প্রভাব ফেলেছে বলে আপনার মনে হয়? ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২০।

৭. আপনি কি অদূর ভবিষ্যতে দুই কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের কোনো সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন? যদি করেন তবে এই পুনঃএকত্রিকরণের সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প কি হতে পারে? ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৭৮।

২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-৯৯

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।।

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে : ২০

ক. অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার কখন প্রবর্তন করা হয়? ১৯৯৮ সালে পুরস্কারটি কে পেয়েছেন?
উত্তর : অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় ১৯৬৮ সালে এবং ১৯৬৯ সাল থেকে এটি প্রদান করা শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঙালি, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধ্যাপক ড. অমর্ত্য সেন।

খ. SAPTA ও SAFTA কি?
উত্তর : **SAPTA :** দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্য চুক্তি বা SAARC Preferential Trading Arrangement-কে সংক্ষেপে বলা হয় SAPTA। এটি ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনের সময় স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়।

SAFTA : SAFTA হলো South Asian Free Trade Area বা দক্ষিণ এশিয়ার মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে এটি গঠিত হয়েছে। ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে SAFTA কার্যকর হয়।

গ. White Hall এবং Kremlin কি?
উত্তর : **White Hall :** White Hall হলো লন্ডনে অবস্থিত ব্রিটিশ সরকারের সাবেক কার্যালয়। এটি রানীর সাবেক সরকারি বাসভবন।
Kremlin : Kremlin হলো রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি কার্যালয়।

ঘ. ডুরান্ড লাইন ও ম্যাকমোহন লাইন কি?
উত্তর : **ডুরান্ড লাইন :** ১৮৯৬ সালে স্যার মোর্টিমার ডুরান্ড কর্তৃক ভারত (বর্তমান পাকিস্তান) ও আফগানিস্তানের মধ্যে চিহ্নিত সীমা রেখাকেই বলে ডুরান্ড লাইন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের এ সীমা রেখাটি আফগানিস্তান স্বীকার করে না।

ম্যাকমোহন লাইন : ব্রিটিশ নাগরিক স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক ভারতের অরুণাচল রাজ্য এবং তিব্বতের সুবন সিরি, সিয়াং এবং লোহিত সীমান্ত জুড়ে চিহ্নিত সীমা রেখাই ম্যাকমোহন লাইন। এ রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ১১২৬.৫৪ কিলোমিটার (৭০০ মাইল)। এটি ভারত ও চীনের সীমানা নির্দেশক লাইন।

ঙ. 'ইউরো' কি এবং কোন কোন দেশে 'ইউরো' চালু আছে?
উত্তর : 'ইউরো' হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের একক মুদ্রা। এ মুদ্রার জনক রবার্ট মুন্ডেল। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরো চালু হয়। তখন ১১টি দেশ– বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করে। ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি গ্রিস, ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি স্লোভেনিয়া, ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি সাইপ্রাস ও মাল্টায় ইউরো মুদ্রা চালু হয়। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি স্লোভাকিয়ায় ইউরো মুদ্রা চালু হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি এস্তোনিয়ায় ইউরো মুদ্রা চালু হয়। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি লাটভিয়া এবং সর্বশেষ ১ জানুয়ারি ২০১৫ লিথুয়ানি ইউরো মুদ্রা চালু করে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ভুক্ত ১৯টি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু হলো।

চ. কখন এবং কোথায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১ শাসনামলে) সাথে ১০ মাসে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন ও দ্বিতীয় চিপ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ আর পার্বত্যবাসীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা।

ছ. বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ শীর্ষ সম্মেলন কবে ও কোথায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল? বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণের সাথে বাংলাদেশের নাম কেন জড়িত?
উত্তর : বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনূসের উদ্যোগে ২-৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ শীর্ষ সম্মেলন। ওয়াশিংটনের ডিসি হোটেলে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম এই শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুগ্ম সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন।
গ্রামীণ ব্যাংক সর্বপ্রথম এই ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। এ জন্যই বাংলাদেশের নাম ক্ষুদ্র ঋণের সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

জ. Indemnity কি?
উত্তর : 'Indemnity'-এর শাব্দিক অর্থ হলো ক্ষতি বা শাস্তি এড়াবার আইনি ব্যবস্থা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা এবং একই বছরের ৩ নভেম্বর কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। এই সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করে নেয়া একটি অগণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকারবিরোধী ব্যবস্থা হলো ১৯৭৫ সালের 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'। The Indemnity Ordinance, 1975 (Ordinance No, 2 of 1975) জারি করে উপর্যুক্ত হত্যাগুলোর বিচার কার্য রহিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে।

ঝ. কসোভো সংকটের কারণগুলো কি ছিল?
উত্তর : কসোভো কমিউনিস্ট শাসিত যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের সময় সার্বিয়ার অংশ ছিল। ১৯৭৪ সালে প্রদেশটি ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে সার্বিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচ স্বায়ত্তশাসন বাতিল ঘোষণা করেন এবং সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকদের ওপর দমনাভিযান ও গণহত্যা শুরু করেন। এর ফলেই কসোভো সংকট শুরু হয়। কসোভো সংকটের প্রধান কারণগুলো হলো সার্ব খ্রিস্টানদের আধিপত্যবাদী নীতি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিগত নির্মূল অভিযান পরিচালনা ও স্বায়ত্তশাসন বাতিল ইত্যাদি। বিশ্বের ১৯৪তম দেশ হিসেবে ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কসোভো সার্বিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

ঞ. নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫টি দেশ। এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য ৫টি দেশ। স্থায়ী সদস্যগুলো হচ্ছে– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্স। অস্থায়ী সদস্য দেশ ১০টি। অস্থায়ী সদস্য দেশগুলোর মেয়াদ দুই বছর। উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির মেয়াদকাল ১ মাস।

ট. আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদর দফতর কোথায় এবং এর বিচারপতির সংখ্যা কত?

উত্তর : আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদর দফতর নেদারল্যান্ডের হেগে অবস্থিত। এর বিচারকের সংখ্যা ১৫ জন। আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতির মেয়াদকাল তিন বছর। আর বিচারকের কার্যকাল নয় বছর।

ঠ. তিয়েনআনমেন স্কোয়ার কি এবং কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাজধানী বেইজিং নগরীতে ৪০ হেক্টর এলাকা জুড়ে তিয়েনআনমেন স্কোয়ার অবস্থিত। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর এখানে দাড়িয়ে মাও সেতুং চীনকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে ছাত্ররা গণতন্ত্রের দাবিতে এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে শাসকগোষ্ঠী নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ ঘটায়। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন হংকং হস্তান্তরের আনন্দঘন অনুষ্ঠানটি এখানেই সর্ববৃহৎ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়।

২. যে কোনো পাঁচটির ওপর টীকা লিখুন : ২০

ক. গ্রিনহাউস অ্যাফেক্ট; খ. বিশ্ব স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি; গ. ক্রীড়া তত্ত্ব (Game Theory); ঘ. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ; ঙ. গুজরাল ডকট্রিন; চ. ভারত ও পাকিস্তানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ; ছ. সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী; জ. প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র।

ক. গ্রিনহাউস ইফেক্ট

উত্তর : *২২তম বিসিএস দেখুন।*

খ. বিশ্ব স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি

উত্তর : মানববিধ্বংসী এক ক্ষুদ্র অস্ত্র স্থলমাইন থেকে বিশ্বের নিরীহ মানুষকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে কানাডার রাজধানী অটোয়ায় চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন এ চুক্তিকে সমর্থন না করলেও তারা অনুষ্ঠানে পর্যবেক্ষক পাঠায়। প্রতি বছর স্থলমাইনে অন্তত ২৬ হাজার মানুষ নিহত বা পঙ্গু হয়ে যায়। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান দুদিনব্যাপী এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ প্রশ্নে বিগত দিনগুলোতে কানাডা অগ্রণী ভূমিকার অংশ হিসেবে প্রথম এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

স্থলমাইন নিষিদ্ধ করার পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির এ আন্দোলনের প্রধান হলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জোডি উইলিয়ামস। যুদ্ধে ব্যবহৃত এ স্থলমাইন মাটির নিচে রাস্তাঘাট, পাহাড়, সমতলে শস্যদানার মতো পুঁতে রাখা হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তা আর তোলা হয় না। ফলে শিশু-বৃদ্ধসহ নিরীহ সাধারণ মানুষ চলতে-ফিরতে যখন অগোচরে থাকা এ স্থলমাইনের উপর পা ফেলে তখন এর বিস্ফোরণে হয় তারা মারা যায় অথবা পঙ্গু হয়। দেখা গেছে, স্থলমাইন তৈরিতে ব্যয় হয় ৩ থেকে ৪ ডলার। পক্ষান্তরে একটি মাইন অপসারণে ব্যয় হয় এক হাজার ডলার। সারা বিশ্বে এখনো পোঁতা আছে কমপক্ষে এক কোটি মাইন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো খাদ্য, ওষুধ ও বাসস্থান সঙ্কটে জর্জরিত হওয়ায় ব্যয়বহুল এ মাইন অপসারণ তাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। সেজন্য সারা বিশ্বে শুরু হয়েছে এ মানববিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ আন্দোলন। কানাডার অটোয়ায় স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণের যে চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হয় তার খসড়া প্রণয়ন হয়েছিল নভেম্বর ১৯৯৭ সালে সুইডেনের রাজধানী অসলোতে। সে সম্মেলনে ৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে স্থলমাইন নিষিদ্ধ করার চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলাদেশ ১২৬তম দেশ হিসেবে ১৯৯৯ সালের মে মাসে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৯ সালের ১ মার্চ থেকে স্থলমাইনের উৎপাদন এবং এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে 'অটোয়া চুক্তি' কার্যকর হয়। এ চুক্তিতে মাইন ক্ষেত্রগুলো পরিষ্কার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ. ক্রীড়া তত্ত্ব (Game Theory)

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো বিশ্ব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক শক্তির অধীনস্থ বিষয়। কূটনীতি, বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কের বিশ্লেষণ নিয়েই এই রাজনীতির বিষয়বস্তু গঠিত। আর ক্রীড়াতত্ত্ব বা Game Theory হলো বিশ্ব রাজনীতির একটি বিশেষ কৌশল, যা দ্বারা নানা রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশেষভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কারো কারো মতে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিও এক ধরনের ক্রীড়াবিশেষ এবং এসব ক্ষেত্রেও সাফল্য নির্ভর করে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল ও স্ট্র্যাটেজির সঠিক উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল, ও স্ট্র্যাটেজির যথার্থ মূল্যায়ন এবং এ তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার উপর। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এ তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন। বস্তুত এ তত্ত্বের প্রয়োগ রীতি হচ্ছে আঙ্কিক সমীকরণের মাধ্যমে। ১৯২১ সালে ফরাসি অঙ্কশাস্ত্রবিদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম এ তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে জন ফন নিউম্যান (হাঙ্গেরি), অস্কার সর্গেনস্টার্ন (জার্মানি) প্রমুখ এ তত্ত্বের আরও বিকাশ সাধন করেন। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে এ ক্রীড়াতত্ত্বটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

ঙ. গুজরাল ডকট্রিন

উত্তর : ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দরকুমার গুজরাল প্রতিবেশী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যেসব পলিসি ও পন্থা গ্রহণ করেন তাই 'গুজরাল ডকট্রিন' নামে পরিচিত। ইন্দরকুমার গুজরাল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে দু দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে সচিব ও মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠান করেন। পরে দু দেশের সরকারপ্রধানের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে দু দেশের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস পায়। তাছাড়া ১৯৯৭ সালের ১৯ জুন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হটলাইন চালু হয়।

চ. ভারত ও পাকিস্তানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ

উত্তর : ভারত-পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিষয়টি বহুদিন ধরেই বিশ্বব্যাপী আলোচিত একটি বিষয়। ১৯৭৬ সালে পাকিস্তান সীমান্তের কাছে রাজস্তান মরুভূমিতে ভারত প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। পরবর্তীতে পাকিস্তানও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়। ১৯৯৮ সালে ভারত রাজস্তানের পোখরানে পরীক্ষামূলকভাবে ৩টি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরই পাকিস্তান বেলুচিস্তানের চাগাই মরুভূমিতে ৫টি বিস্ফোরণ ঘটায়। উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৯৯৯ সালে কারগিল উপত্যকায়। এ প্রেক্ষাপটে দেশ দুটি মারাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। ভারতের ত্রিশুল, অগ্নি, পৃথ্বীর বিপরীতে পাকিস্তান তৈরি করে ঘোরী, হাতফ-১, ২, ৩ ইত্যাদি। আর দুই প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব থেকেই সূত্রপাত হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার, যা এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে।

ছ. সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী

উত্তর : *২১তম বিসিএস দেখুন।*

৩. 'নিরাপত্তা' এবং 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' বলতে কি বোঝায়? নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত? ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৫।

৪. রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট দেশটিকে পুনরায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে– আপনি কি এই মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করেন? আলোচনা করুন। ১৫

৫. এপেক কি? মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে সদ্যসমাপ্ত এপেক শীর্ষ সম্মেলনের আলোকে বিশ্ব রাজনীতিতে এপেকের ভূমিকা আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৩।

৬. আঞ্চলিক সহযোগিতা কি? আঞ্চলিক সহযোগিতা কি বিশ্ব সহযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী না পরিপূরক? আলোচনা করুন। ১৫

৭. বাংলাদেশের নিরাপত্তার সমস্যাটি মূলত সামরিক নয়, এটি বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বিষয় আলোচনা করুন। ১৫

৮. পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতির আলোকে চীনের সাথে জাপান ও রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন। ১৫

১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-৯৮

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে : ২০

ক. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান দফতর কোথায় এবং এর সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM) কোনো প্রধান দফতর নেই। তবে যে দেশ ন্যামের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় সেই দেশে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১২০টি দেশ।

খ. সেভেন সিস্টার্স বলতে কোন কোন ভারতীয় রাজ্যগুলোকে বোঝায়?
উত্তর : সেভেন সিস্টারস বলতে ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় স্বাধীনতাকামী ৭টি রাজ্যকে বোঝায়। রাজ্যগুলো হলো– অরুণাচল, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও আসাম।

গ. ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাঁটিটির নাম কি এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত যে মার্কিন বিমান ঘাঁটি বন্ধ করা হয়েছে এর নাম কি ছিল?
উত্তর : ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাঁটির নাম দিয়াগো গার্সিয়া। ফিলিপাইনে অবস্থিত সুবিক বে নামক মার্কিন ঘাঁটিটি সম্প্রতি বন্ধ করা হয়েছে।

ঘ. যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল দলের বর্তমান নেতার নাম কি? জাপানের পার্লামেন্টের নাম কি?
উত্তর : যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল দলের বর্তমান নেতা ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন। জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট।

ঙ. তৃতীয় বিশ্ব থেকে অস্ত্র ব্যবসায় লিপ্ত ৪টি দেশের নাম লিখুন।
উত্তর : ১. দক্ষিণ আফ্রিকা, ২. ভারত, ৩. কাজাখস্তান, ৪. পাকিস্তান।

চ. এক দেশ দুই নীতি বলতে কি বোঝায়? দেশটির নাম কি?
উত্তর : ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন মধ্যরাতে হংকং চীনের শাসনাধীন হওয়ার পর 'এক দেশ দুই নীতি' কার্যকর করা হয়। 'এক দেশ দুই নীতি' বলতে বোঝায় হংকং-এর ওপর চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও হংকং তার আগের সুবিধাদি ভোগ করবে। বিশেষ করে অর্থনীতিতে অবাধমুক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বত্রই হংকং পূর্বের মতো সুযোগ সুবিধা পাবে। অর্থাৎ দেশ একটি কিন্তু নীতিতে একটু ভিন্ন। দেশটির নাম হলো চীন।

ছ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য থেকে বাদ পড়েছে কোন কোন দেশ?
উত্তর : তাইওয়ান (একমাত্র তাইওয়ানই বাদ পড়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় নাম রিপাবলিক অব চায়না)।

জ. তুরস্ক ও ইরানের যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রীর ও রাষ্ট্রপতির নাম লিখুন।
উত্তর : তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর নাম আহমেদ দাভোতোগলু (২৮ আগস্ট ২০১৪-বর্তমান) এবং ইরানের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম হাসান রুহানি (৩ আগস্ট ২০১৩– বর্তমান)।

ঝ. বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সম্পর্ক কি এবং এদের সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বজুড়ে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে ১-২২ জুলাই ব্রেটন উডসের জাতিসংঘের মনিটারি এন্ড ফিনানশিয়াল কনফারেন্সে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কার্যক্রম শুরু করে যথাক্রমে ১৯৪৬ সালের ২৫ জুন এবং ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ। উভয় সংস্থার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে।

ঞ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্ষুদ্রতম দেশ এবং এর শাসকের নাম লিখুন।
উত্তর : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ হলো সিঙ্গাপুর। আয়তন ৬৯৩ বর্গকিলোমিটার। দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হলেন লি হিয়েন লুং (১২ আগস্ট ২০০৪-বর্তমান)।

ট. একাধিক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত তিনটি নদীর নাম দেশসহ লিখুন।
উত্তর : মেকং নদী : দৈর্ঘ্য ৪১৮০ কিমি। উৎপত্তিস্থল তিব্বতের মালভূমি। এ নদীটি প্রবাহিত হয়েছে চীন, লাওস, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার ওপর দিয়ে।
গঙ্গা নদী : দৈর্ঘ্য ২৬৫৫ কিমি। উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ। এ নদীটি প্রবাহিত হয়েছে নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে। আর পতিত হয়েছে মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে।
ইউফ্রেটিস নদী : দৈর্ঘ্য ২৭৯৯ কিমি। উৎপত্তিস্থল আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি। প্রবাহিত হয়েছে তুরস্ক, ইরাক ও ইরানের ওপর দিয়ে। এ নদীটি পতিত হয়েছে পারস্য উপসাগরে।

ঠ. ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণের কারণগুলো কি ছিল?
উত্তর : ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাক আকস্মিকভাবে কুয়েত দখল করে নেয় এবং কুয়েতকে ইরাকের ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে। অবশেষে অনেক ধ্বংস ও যুদ্ধের পর ১৯৯১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধের প্রধান কারণ হলো :
ক. কুয়েত ইরাককে দেয়া ৫৫০ কোটি ডলার ঋণ মওকুফ করতে অস্বীকার করে।
খ. বুবিয়ান ও ওয়ারবা দ্বীপের ওপর ইরাকের দাবিও কুয়েত প্রত্যাখ্যান করে।
গ. কুয়েত এই দুই দ্বীপ উপসাগরের মুখে সাত-ইল আরবের প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণ করে।

২. যে কোনো পাঁচটির ওপর টীকা লিখুন : ২০
ক. এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা; খ. মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি; গ. ছিটমহল, করিডোর, ট্রানজিট; ঘ. বঙ্গোপসাগরে সম্পদ আহরণ; ঙ. নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন; চ. মানবিক অধিকার।

ক. এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বদলে যাওয়া বিশ্ব রাজনীতিতে শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশের জোট, অন্যদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক জোট। শক্তিসাম্যের (Ballance of Power) নীতির ওপর গড়ে উঠে সামরিক জোট। একদিকে মার্কিন মদদপুষ্ট ন্যাটো, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছত্রছায়ায় ওয়ারশ প্যাক্ট (Warshaw Pact)। এই দ্বিমেরুকরণ বিশ্বের পালাবদল ঘটে বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক মেরুকেন্দ্রিক হয়ে

উঠেছে। সোভিয়েত জোটের ভাঙনের পর ওয়ারশ প্যাক্টও বিলুপ্ত হয়। ফলে ন্যাটোই এখন গোটাবিশ্বে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো আগে যারা ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত ছিল ন্যাটো তাদেরকে নিজেদের জোটে ধাপে ধাপে আনতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এককেন্দ্রিয় বিশ্বব্যবস্থার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ কথা বলছে, রাশিয়া নখ-দাঁতহীন হয়ে পড়েছে, সেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বড় বেশি অসহায় বোধ করছে। এজন্য এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার কথা মনে রেখেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছোট বড় দেশ জোটবদ্ধ হচ্ছে।

খ. মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি

উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু পূর্বেকার যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব তথা মধ্যপ্রাচ্য বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছে। এর কারণ বহুবিধ হলেও মূল কারণ হলো ক্রমাগত মার্কিন স্বার্থের ওপর সন্ত্রাসীদের আঘাতের প্রেক্ষিতে মার্কিন শাসকগোষ্ঠী ধরেই নিয়েছে যে, এ মুহূর্তে তাদের একমাত্র শত্রু মুসলমানরা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেও মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই দেখা যায়, ইরাককে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেলের প্রতি আগ্রহ। তাই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের বহুদিনের প্রতীক্ষা। ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। ফলে জাতিসংঘের বহুজাতিক বাহিনীর সহযোগিতায় উপসাগরীয় যুদ্ধের পরেই যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে স্থায়ীভাবে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সুযোগ পায়। সবশেষে ২০০৩ সালে ইরাকে পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্র আছে এ অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক দখল করে নেয়।

সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো :

- ইরান-ইরাক-সিরিয়াকে এক ঘরে করে রাখা।
- মিশরের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখা।
- যেসব রাজতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত সেসব দেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করা।
- আরবরা যাতে ইসরাইলকে আক্রমণ না করে সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
- মধ্যপ্রাচ্যের মূল্যবান সম্পদ জ্বালানি তেলের বিশ্ব বাজারে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা।
- সর্বোপরি ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

গ. ট্রানজিট, করিডোর, ছিটমহল

উত্তর : ট্রানজিট : একটি দেশ দ্বিতীয় দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো দেশের জন্য যখন পণ্য বহন করে নিয়ে যায়, তখন তা হয় প্রথম দেশটির জন্য ট্রানজিট-সুবিধা। অর্থাৎ দ্বিতীয় দেশটি তাদের ভূখণ্ড (সড়ক বা নৌপথে) ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার মাধ্যমে ট্রানজিট-সুবিধা দেয়। যেমন– বাংলাদেশি পণ্যবাহী যান যখন ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল বা ভুটানে যায়, তখন তা হলো ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে ট্রানজিট-সুবিধা দেয়া।

করিডোর : সাধারণত দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে করিডোর সৃষ্টি হয়। যেমন– বাংলাদেশ যখন ভারতীয় পণ্যবাহী যানকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আগরতলায় যাওয়ার সুযোগ দেয়, তখন তা হয় করিডর-সুবিধা। অর্থাৎ, এখানে তৃতীয় কোনো দেশের সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু ট্রানজিটের ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। তাই ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পণ্যসামগ্রী উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোয় যাওয়ায় জন্য বাংলাদেশি ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দেয়াটা হলো মূলত করিডোর-সুবিধা। একটু বৃহত্তরভাবে এটাকে 'ভারত থেকে ভারতে ট্রানজিট' বলা যেতে পারে।

ছিটমহল : উদাহরণ হিসেবে ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ও বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের কিছু ভূখণ্ডই ছিটমহল। বাংলাদেশ ও ভারতের এ ধরনের ১৬২টি ভূখণ্ড এক একটি ছিটমহল হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশে এবং ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এ ১৬২টি ছিটমহলের অধিবাসীরা 'ছিটের মানুষ' বলে পরিচিত। মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ থাকলেও ছিটমহলবাসীর কোনো দেশ নেই, নেই কোনো পরিচয়। বাংলাদেশ যেমন এদের নাগরিকত্ব দেয়নি, দেয়নি ভারতও। পড়াশুনা, জীবিকা, সবকিছুতেই তারা পরনির্ভরশীল। ব্রিটিশ শাসকদের খেয়াল-খুশির বলি দেশহীন, পরিচয়হীন এসব মানুষ। সীমান্তের ঘেরা টোপে বন্দিশালার মানুষ তারা। নানা জটিলতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কোনো পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব হয় না বাংলাদেশ কিংবা ভারতের পক্ষে। ফলশ্রুতিতে অনুন্নয়নের বেড়াজালে পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত হয়েই থাকতে হয় ভাগ্যবিড়ম্বিত ছিটমহলবাসী মানুষগুলোকে।

ঘ. বঙ্গোপসাগরে সম্পদ আহরণ

উত্তর : ঐতিহাসিক কাল থেকেই সমুদ্র মানব সভ্যতার বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম ছাড়াও জানা-অজানা বিপুল সম্পদের আধার হিসেবেও সমুদ্র বরাবরই জাতিসমূহের বিরোধের কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। সীমানা নির্ধারিত না থাকার ফলে বিগত চার দশক যাবত বাংলাদেশের জনগণ সমুদ্রতলদেশের সম্পদ (যেমন– তেল, গ্যাস) আহরণে কোনো উদ্যোগ নিতে পারে নি। এছাড়া সুনির্দিষ্ট সীমানার অভাবে এ দেশের জেলে সম্প্রদায় যেমন মৎস্য আহরণে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তেমনি আমাদের মৎস্য সম্পদ অন্য দেশের জেলেরা অবাধে শিকার করেছে। তাই বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ অধিক জরুরি ছিল। বিগত ১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানির হামবুর্গস্থ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল তথা ইটলস কর্তৃক বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল ও রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর নানাবিধ সম্পদে ভরপুর। মৎস্য, ঝিনুক, মুক্তা, কাকড়া, ইউরেনিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল-এ সকল সম্পদের মধ্যে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ সামুদ্রিক মৎস্য চিংড়ি, কাকড়া, ঝিনুক ইত্যাদি আহরিত হচ্ছে।

চ. মানবিক অধিকার

উত্তর : জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষেরই সর্বজননস্বীকৃত কিছু অধিকার রয়েছে, সে অধিকারগুলোই মানবিক অধিকার। যেমন প্রত্যেক মানুষেরই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ আরো কিছু মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের সকল মানুষের মানবিক

অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়েছে। এ ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের রয়েছে স্বাস্থ্যরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার উপযোগী জীবন-মান অর্জন, শিক্ষা লাভ, কর্মসংস্থান, অবসর জীবন যাপন, সামাজিক নিরাপত্তা লাভ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার। এছাড়াও অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রতিটি মানুষের নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, চলাচলের স্বাধীনতা, নিজস্ব মতামত প্রকাশ, সভা-সমিতি গঠন ও সমাবেশে মিলিত হওয়া, আইনে মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা, নির্বিচারে গ্রেফতার হওয়া থেকে অব্যাহতি লাভ, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্দোষ হিসেবে গণ্য হওয়ার অধিকার ভোগ করা।

৩. ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্ক : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৩২।

৪. বিশ্বব্যাপী গোত্রগত দ্বন্দ্বের কারণগুলো আলোচনা করুন। আগামীতে বর্তমান রাষ্ট্র ধারণা পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র সংখ্যা বেড়ে যাবে কি? ১৫

৫. সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ওআইসি'র ভূমিকার পর্যালোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখন পৃষ্ঠা ৬১৭।

৬. অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ভূমিকা আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৭৮।

৭. বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা কেন? এর সাথে রাশিয়া কেন ও কিভাবে সম্পৃক্ত হতে চায়? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১০।

৮. ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গঠনে কিভাবে প্রভাবান্বিত করছে উদাহরণসহ আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১০৯।

১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-৯৬

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ১ থেকে ৮ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন : ২০

ক. ডি-ডে'র পূর্ণ নাম কি?
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনী ফ্রান্স থেকে জার্মান সৈন্যদের বিতাড়িত করার জন্য এক বিশাল অভিযান শুরু করে। ১৯৪৪ সালের ৫ মে মিত্রবাহিনী ১ লক্ষ ৭৬ হাজার সৈন্য নিয়ে উত্তাল ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলে হাজির হয়। জার্মান বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে জার্মান সৈন্যরা এখানে চরমভাবে পরাজিত হয়। এ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঘোষিত হয় ডি-ডে। ডি-ডে এর অর্থ হলো Dawn Day।

খ. ১৯১৮ সালে বিশ্বশান্তির জন্য 'চৌদ্দ দফা' কে উপস্থাপন করেছিলেন?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।

গ. ECO কি?
উত্তর : ECO-এর পূর্ণরূপ হলো Economic Co-operation Organisation। এর সদস্য সংখ্যা ১০। দেশগুলো হলো– ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কিরগিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, আজারবাইজান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং তুরস্ক।

ঘ. ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনের প্রধান অংশগ্রহণকারী কারা ছিলেন?
উত্তর : ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে প্রধান অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন– আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পঁয়েকার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ।

ঙ. স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অনুসৃত ধারক নীতির হাতিয়ার হিসেবে যে সকল আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সংগঠন গড়ে তুলেছিল তার মধ্য থেকে কমপক্ষে চারটির নাম উল্লেখ করুন।
উত্তর : ১. NATO, ২. ANZUS, ৩. CEATO, ৪. CENTO.

চ. হেবরন হত্যাকাণ্ড কে সংঘটিত করেছিল?
উত্তর : গোল্ড স্টেন বারুচ নামে জনৈক ইহুদি ব্যক্তি হেবরন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল। ১৯৯৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হেবরন মসজিদে নামাজরত অবস্থায় ৬৩ জন মুসলমানকে ঐ ব্যক্তি গুলি করে হত্যা করে।

ছ. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের চারজন প্রধান উদ্যোক্তার নাম কি?
উত্তর : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চারজন প্রধান উদ্যোক্তা হলেন– ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ ডি টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল নাসের এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. সুকর্ন।

জ. পূর্ব তিমুর কিসের জন্য বিখ্যাত?
উত্তর : পূর্ব তিমুর পৃথিবীখ্যাত চন্দন কাঠের জন্য বিখ্যাত। এটি প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। এটি পর্তুগালের একটি উপনিবেশ ছিল। ২০ মে ২০০২ দেশটি বিশ্বের ১৯২তম দেশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এর রাজধানীর নাম দিলি। এটি জাতিসংঘের ১৯১তম সদস্য।

ঝ. ফরাসি দেশের (ফ্রান্স) প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম লিখুন।
উত্তর : এডিথ ক্রিসন (১৫ মে ১৯৯১-২ এপ্রিল ১৯৯২)।

ঞ. 'মেইন ক্যাম্প' কি?
উত্তর : মেইন ক্যাম্প (Mein Kampf) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান নায়ক জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর এডলফ হিটলারের লিখিত আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থ। মেইন ক্যাম্প ভলিউম ১ প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে এবং ভলিউম ২ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে।

ট. উপমহাদেশ থেকে যারা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের মধ্য থেকে কমপক্ষে দুজনের নাম লিখুন।
উত্তর : ১. সি ভি রমন, ভারত (পদার্থ বিজ্ঞান) এবং ২. প্রফেসর আবদুস সালাম, পাকিস্তান (পদার্থ বিজ্ঞান)।

ঠ. 'খেমাররুজ' বলতে কি বোঝেন?
উত্তর : কম্বোডিয়ার এক সময়ের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী গেরিলা সংগঠন। এটি চীনের মার্কসবাদী উগ্র কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসারী। ১৯৭৬ সালে জেনারেল পলপটের নেতৃত্বে এই বাহিনী খুব দ্রুত

রাজনীতির শীর্ষে চলে আসে এবং ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৯ সালে পলপটের পতন ঘটে এবং ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে পলপটের মৃত্যু হয়। বর্তমানে খেমাররুজরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে গেছে। তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা খুব একটা সক্রিয় নয়।

২. জাতিসংঘকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা কি তা বিবৃত করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩১।

৩. জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডের সফলতা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩৮।

৪. দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গোটা ইউরোপের পরিবর্তন এবং পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে বিবেচনা করবেন? ১৫

৫. ক. রিওডি জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন (ধরিত্রী সম্মেলন) মূল্যায়ন করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৯১।

খ. সম্প্রতি বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত মহিলা বিষয়ক জাতিসংঘের এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য এবং এর প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোচনা করুন। ১৫

৬. দক্ষিণ এশীয় পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আগ্রহ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৭০।

৭. বর্তমান রুশ পররাষ্ট্র নীতির প্রধান প্রধান দিক আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫১৪।

৮. নিচের যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : ২০
ক. পুলিৎজার প্রাইজ; খ. আইভি লীগ; গ. ম্যাসট্রিচট চুক্তি; ঘ. ন্যাটোর পুনর্গঠন; ঙ. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা; চ. টেনেসি উইলিয়াম; ছ. ১৯৯৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীদের সম্মেলন।

ক. পুলিৎজার প্রাইজ
উত্তর : হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজারের (১৮৪৭-১৯১১) নামানুসারে তার রেখে যাওয়া অর্থ থেকে প্রতিবছর সাংবাদিকতা, সাহিত্যে ও সংগীতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আমেরিকায় প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। প্রতিবছর সাংবাদিকতায় ১৪টি, সাহিত্যে ৬টি এবং সংগীতে ১টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিদের এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার ১৯১৭ সাল থেকে প্রদান শুরু হয়েছে। প্রতিবছর মে মাসে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারের মূল্যমান পূর্বে ছিল ৫০০ ডলার। বর্তমানে প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান ৫ হাজার ডলার।

গ. ম্যাসট্রিচট চুক্তি
উত্তর : ম্যাসট্রিচট হচ্ছে নেদারল্যান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এই শহরে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EEC)-এর ১২টি দেশ মিলিত হয়ে অভিন্ন ইউরোপ গঠনের উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যা ম্যাসট্রিচট চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির অন্যতম সফলতা হলো ইউরো মুদ্রা, যা ১৯৯৯ সালে চালু হয়।

ঘ. ন্যাটোর পুনর্গঠন
উত্তর : বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ন্যাটোকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর সামরিক জোট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল উত্তর আটলান্টিক চুক্তির মাধ্যমে এ সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য, ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঘটে। সেই সাথে গোটা বিশ্ব প্রধানত দুটি (যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনি প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে পশ্চিমা দেশগুলো স্ব স্ব দেশের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশ কর্তৃক এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সামরিক মৈত্রী জোট গঠনের পরিকল্পনা করতে থাকে। ইতোমধ্যে জার্মানির সমস্যা নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিরোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করে। এ বিরোধ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক বার্লিন শহর অবরোধে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের হুমকি থেকে রক্ষার লক্ষ্যে একটি সামরিক জোট গঠনের প্রস্তাব করে। মার্কিন এ প্রস্তাবকে কমিউনিস্টবিরোধী ইউরোপীয় দেশগুলো স্বাগত জানায়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল 'উত্তর আটলান্টিক চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে North Atlantic Treaty Organization সংক্ষেপে NATO গঠিত হয়। প্রথমে ১২টি দেশ ন্যাটো ভুক্ত হয়। ১৯৫২ সালে এ সংস্থায় যোগ দেয় গ্রিস ও তুরস্ক। ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানি এবং পরে স্পেন সদস্যপদ লাভ করায় ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা ১৬তে উন্নীত হয়। ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা ১৬ তে উন্নীত হওয়ার পর এ সংস্থার সম্প্রসারণ দীর্ঘ সাড়ে চার দশককাল বন্ধ ছিল। আবার ২০০৪ সালের ২৯ মার্চ পূর্ব ইউরোপের সাতটি সাবেক কমিউনিস্ট দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাটোতে যোগদান করায় NATO'র সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৬টিতে। ২০০৯ সালের ১ এপ্রিল আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া যোগদান করায় বর্তমানে এ সংস্থার সদস্য সংখ্যা ২৮টিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সদর দপ্তর ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।

ঙ. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা
উত্তর : *২৮তম বিসিএস দেখুন।*

১৫তম বিসিএস : ১৯৯৩-৯৪
নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন। ২০

ক. ইউনিফেম-এর পূর্ণনাম কি?
উত্তর : UNIFEM-এর পূর্ণনাম হলো United Nations Development Fund for Women. এটি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

খ. 'ওয়াটার গেট' কেলেঙ্কারি কি?

উত্তর : ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক নদীর তীরবর্তী ওয়াটারগেট নামক ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক দলের সদর দপ্তর অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ১৭ জুন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, রিপাবলিকান দল ডেমোক্রেটদের গোপন আলোচনা ও নির্বাচনি কৌশল জানার জন্য তাদের সদর দপ্তরে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। এ ব্যাপারে ৫ জন হাতেনাতে ধরা পড়ে। রিপাবলিকান শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে নির্বাচনি বৈতরণী পার হয়। কিন্তু মার্কিন পত্রপত্রিকা এর রহস্য উদঘাটন করতে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশ হয় যে, তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল ও হোয়াইট হাউস স্টাফ চিফসহ উচ্চতম পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিরাই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এদের মধ্য থেকে হোয়াইট হাউসের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা জন ডিন এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ম্যাকগ্রোভার সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দেন। ১৯৭৩ সালের ৯ নভেম্বর আদালত অভিযুক্ত ৭ জনের ৬ জনকে কারাদণ্ড দেয়। ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট ৬৪টি টেপ তলব করে। ১৯৭৪ সালের ২৭-২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত জুডিশিয়ারি কমিটির সভায় প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির দায়ে অভিশংসন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায় ৫ আগস্ট নিক্সন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সকল দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেন এবং ৯ আগস্ট পদত্যাগ করেন।

গ. জাতিসংঘের চারজন মহাসচিবের নাম লিখুন।

উত্তর : ১. দ্যাগ হ্যামারশোল্ড; ২. জাভিয়ার প্যারেজ দ্য কুয়েলার; ৩. ড. বুট্রোস ঘালি; ৪. বান কি মুন।

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীদের সরকারি পদ কি? তাদের নাম উল্লেখ করুন।

দেশ	পদ	নাম
যুক্তরাষ্ট্র	সেক্রেটারি অব স্টেট	জন ফরবেস কেরি
যুক্তরাজ্য	সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অ্যাফেয়ার্স	ফিলিপ হ্যামন্ড
ভারত	মিনিস্টার অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স (বিদেশ মন্ত্রী)	সুষমা স্বরাজ

ঙ. চীন ও জাপানের পার্লামেন্টের নাম উল্লেখ করুন।

উত্তর : চীনের আইনসভার নাম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস। আর জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট। (এটি দু কক্ষ বিশিষ্ট-নিম্নকক্ষ; হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস এবং উচ্চ কক্ষ; হাউস অব কাউন্সিলরস)।

চ. কোন সালে এবং কোন মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল?

উত্তর : ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

ছ. বর্তমানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে? তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য?

উত্তর : বর্তমানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হলেন শিনজো অ্যাবে। তিনি লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (LDP) সদস্য।

জ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন দুজন– রুজভেল্ট ও হ্যারি এস ট্রুম্যান এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উইনস্টন চার্চিল।

ঝ. আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যম সংক্রান্ত চারটি সংস্থার নাম লিখুন।

উত্তর : SAARC, BIMSTEC, ASEAN, GCC.

ঞ. কমনওয়েলথ বলতে কি বোঝেন? কমনওয়েলথ দেশভুক্ত চারজন প্রধানমন্ত্রীর নাম লিখুন।

উত্তর : বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংস্থা হলো কমনওয়েলথ (Common Wealth)। সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন এবং আশ্রিত দেশসমূহের সংগঠন এটি। ব্রিটেনের রাজা বা রানী এর প্রতীকী প্রধান। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন 'স্টাচু অব ওয়েস্ট মিনিস্টার'-এ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়ার মাধ্যমে সাবেক 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' কমনওয়েলথ নামে স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৪। কমনওয়েলথ-এর বর্তমান মহাসচিব ভারতের কমলেশ শর্মা এবং এর প্রধান ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

কমনওয়েলথভুক্ত ৪টি দেশের প্রধানমন্ত্রী :

১. বাংলাদেশ–শেখ হাসিনা; ২. পাকিস্তান– মিয়া মোহাম্মদ নওয়াজ শরীফ (৫ জুন ২০১৩–বর্তমান); ৩. অস্ট্রেলিয়া– টনি অ্যাবোট (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩-বর্তমান) ৪. ব্রিটেন– ডেভিড ক্যামেরন।

ট. বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সভাপতিদ্বয়ের নাম কি?

উত্তর : বিশ্বব্যাংকের সভাপতি– জিম ইয়ং কিম (১ জুলাই ২০১২– বর্তমান)।
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সভাপতি– তাকোহিকো নাকাও (২৮ এপ্রিল ২০১৩ – ২৩ নভেম্বর ২০১৬)।

ঠ. সাহিত্যে ১৯৯১, ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম কি?

উত্তর : ১৯৯১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার লেখিকা নাদিম গার্ডিমার।
১৯৯২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডেরেক ওয়ালকট।
১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা টনি মরিসন।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন– প্যাট্রিক মোদিয়ানো (ফরাসি কথাশিল্পী)।

২. নিচের যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : ২০

ক. নাফটা (NAFTA) ও সাপটা (SAPTA); খ. জেরিকো; গ. হযরতবাল মসজিদ; ঘ. জেনারেল আইদিদ; ঙ. সারাজেভো; চ. অপারেশন সী এনজেল; ছ. সার্ক গেমস, ১৯৯৩; জ. ভার্সাই চুক্তি।

ক. নাফটা (NAFTA) ও সাপটা (SAPTA)

উত্তর : নাফটা ও সাপটা ভিন্ন ভিন্ন দুটি বাণিজ্য চুক্তির নাম। NAFTA-এর পূর্ণরূপ North American Free Trade Agreement অর্থাৎ উত্তর আমেরিকান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালে। এর সদস্য সংখ্যা ৩। দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। চুক্তিটি কার্যকরী হয় ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি। অন্যদিকে সাপটাও একটি বাণিজ্য চুক্তির নাম। SAPTA-এর পূর্ণরূপ SAARC Preferential Trading Arrangement. সাপটা ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনের সময় স্বাক্ষরিত হয়। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত এ চুক্তিটি কার্যকরী হয় ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

খ. জেরিকো

উত্তর : জেরিকো জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি শহর। এর আয়তন প্রায় ৬০ বর্গ কিলোমিটার। এই শহরের মোট লোকসংখ্যার ৯৫% সুন্নি মুসলমান এবং ৫% খ্রিস্টান। অধিবাসীদের ভাষা আরবি। এদের প্রধান আয়ের উৎস খাবার দ্রব্যাদি ও পর্যটন কেন্দ্র। ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিএলও স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে এ জেরিকো শহর ও গাজা অঞ্চল নিয়ে ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসিত আবাসভূমি গড়ে ওঠে।

গ. হযরতবাল মসজিদ

উত্তর : ভারত অধিকৃত কাশ্মীর অঙ্গরাজ্যের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ হযরতবাল মসজিদ। বাবরী মসজিদের ঘটনার অব্যবহিত পরেই এ মসজিদ নিয়ে ভারতে এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিককালের কাশ্মীরে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এ সমস্যার জন্ম দিয়েছে মাত্র জন চল্লিশেক দ্বিতীয় সারির মুজাহিদ। জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) এ মুসলিম গেরিলারা ভারতের সৈন্যদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৫ অক্টোবর ১৯৯৩ মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করলে ভারতীয় সৈন্যরা মসজিদটি অবরোধ করে এবং মসজিদে খাদ্য-পানি বন্ধ করে দেয়। মুজাহিদরা কমপ্লেক্সে বসবাসকারী নিরাপরাধ নাগরিক হত্যা ও মসজিদ উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। তাদের দাবি ছিল, কয়েকজন বিশিষ্ট কাশ্মীরী নেতাকে মুক্তি দিতে হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী মুজাহিদদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়, নতুবা মসজিদে হামলা চালানোর হুমকি দেয়। তবে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৩ মুজাহিদরা বিভিন্ন দফায় মসজিদের অবস্থান থেকে সরে এলে আসন্ন বিপদ কেটে যায়।

ঙ. সারাজেভো

উত্তর : সারাজেভো হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়া হার্জেগোভিনার রাজধানী। সারাজেভোর মোট জনসংখ্যার ৮৭% মুসলমান। সারাজেভো মূলত বসনিয়ার রাজধানী। তবে সম্মিলিত বসনিয়া হার্জেগোভিনার রাজধানীও এই সারাজেভোকেই রাখা হয়। সার্ব মুসলিম যুদ্ধের বর্তমান অবস্থান এই শহরটি মুসলিম সরকারের অধীনে রয়েছে।

চ. অপারেশন সী এনজেল

উত্তর : ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল কক্সবাজারসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লাখ মানুষ মারা যায় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়। দেশের উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসে। মার্কিন টাস্কফোর্স পরিচালিত সেই ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের নাম দেয়া হয় 'অপারেশন সি এঞ্জেল' (Operation Sea Angel)। উপদ্রুত এলাকায় মার্কিন টাস্কফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অভিযানের প্রধান ছিলেন হেনরি সি স্ট্রাকপোল।

জ. ভার্সাই চুক্তি

উত্তর : ভার্সাই চুক্তি বলতে দুটি বিখ্যাত চুক্তিকে বোঝায়। একটি প্রথম ভার্সাই চুক্তি ও অন্যটি দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ১৭৮০ সালে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় প্রথম ভার্সাই চুক্তি। দেশ দুটির মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষায় সমঝোতা সাধনের উদ্দেশ্যে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে ৪ জুলাই ১৭৭৬ ব্রিটেনের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির সঙ্গে ইউরোপের মিত্রশক্তির চুক্তি। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ এবং পরাজিত জার্মানির মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে স্বাক্ষরিত হয় বলে একে ভার্সাই চুক্তি (দ্বিতীয়) বলা হয়। এ চুক্তি সম্পাদনের আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের উড্রো উইলসন, গ্রেট ব্রিটেনের ডেভিড লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের জর্জ ক্লেমেসঁ এবং ইতালির অরলান্দো। রাশিয়া এতে অংশ নেয়নি। জার্মানির কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এই চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হলো :

১. জার্মানিকে খণ্ড-বিখণ্ড করা;

২. জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে স্বীকার করানো এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা;
৩. এটা বিজয়ী রাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয়া চুক্তি।

চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্তের মধ্যে ছিল, জার্মানির উপনিবেশগুলোকে লীগ অব নেশন্স-এর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া। ডানজিগকে স্বাধীন নগরে পরিণত করা; জার্মানির সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে দেয়া; রাইনল্যান্ড এলাকা মিত্রশক্তির দখলে আনা এবং তার বেসরকারিকরণ। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি ১৯২১ সালে এ চুক্তি মোতাবেক সাব্যস্ত হয় যে, জার্মানি ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। স্বভাবতই এ চুক্তি জার্মানির জন্য শুধু চরম অবমাননাকরই ছিল না জার্মান অর্থনীতির জন্যও এটা ছিল দুর্বহ। ১৯৩২ সালে জার্মানি ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৩৫ সালেই (দ্বিতীয়) ভার্সাই চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করে।

৩. বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সমস্যার পটভূমি কি? সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের মূল্যায়ন করুন। ১৫

৪. ভেটো ক্ষমতা কি? আপনি কি মনে করেন যে একটি পুনর্গঠিত জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগের রীতির বিলুপ্তি ঘটানো উচিত? যৌক্তিকতাসহ আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৫০।

৫. পিএলও-ইসরাইল চুক্তিটির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করুন। ১৫

৬. ফারাক্কা বাঁধের ব্যাপারে বাংলাদেশ এবং ভারতের পারস্পরিক অবস্থানের পেছনে যে সকল নির্ধারক কাজ করেছে তা মূল্যায়ন করুন। দুটি দেশের মধ্যে একটি স্থায়ী সমঝোতায় উপনীত হবার অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করুন। ১৫

৭. আঞ্চলিক সংস্থার সাফল্যের পূর্বশর্তগুলো কি? সার্ক সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত 'ঢাকা ঘোষণা' উল্লেখ করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৫।

৮. বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ নির্ণয় করুন। এই অভ্যুদয়ের ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের নিরাপত্তা নীতিতে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৬৮।

৯. বাংলাদেশ ও চীন সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন। ১৫

১৩তম বিসিএস : ১৯৯১-৯২

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন : ২০

ক. অ্যাঙ্কটাড-এর পূর্ণ নাম কি?
উত্তর : UNCTAD— United Nations Conference on Trade and Development.

খ. ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী কে? তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য?
উত্তর : বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, লিকুদ পার্টি।

গ. নিম্নলিখিতগুলো কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত?
ফ্লিট স্ট্রিট; ওয়াল স্ট্রিট।
উত্তর : ফ্লিট স্ট্রিট : লন্ডনে অবস্থিত। এটি সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থান।
ওয়াল স্ট্রিট : নিউইয়র্কে অবস্থিত। এটি শেয়ার বাজারের জন্য বিখ্যাত।

ঘ. ইনোসিস কি?
উত্তর : গ্রিসের সাথে সাইপ্রাসের সংযুক্তির জন্য আন্দোলনরত একটি সংগঠন।

ঙ. নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম এশীয় কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক?
উত্তর : নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম এশীয় হলেন ভিয়েতনামের লি ডাক থো। তিনি ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি এ পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেন।

চ. ১৯৯১ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কে কে ছিলেন?
উত্তর : উত্তর কোরিয়া– রোহ তায়েউ [বর্তমানে কিম জং উন]।
দক্ষিণ কোরিয়া– কিম দায়ে জং [বর্তমানে পার্ক জিউন হাই]।

ছ. গাম্বিয়া ও জাম্বিয়ার রাজধানীগুলো কি?
উত্তর : গাম্বিয়ার রাজধানী-বানজুল এবং জাম্বিয়ার রাজধানী-লুসাকা।

জ. লোকসংখ্যায় জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম সদস্য রাষ্ট্র কোনটি? সেটি কোন মহাদেশে অবস্থিত?
উত্তর : লোকসংখ্যায় জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র হলো টুভ্যালু। লোকসংখ্যা ১১,৬৪০ জন। এটি ওশেনিয়া মহাদেশে অবস্থিত। দেশটির আয়তন মাত্র ২৬ বর্গ কিমি। রাজধানীর নাম ফুনাফুতি।

ঝ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান কোন তারিখে পার্ল হারবার আক্রমণ করে? পার্ল হারবার কোথায়?
উত্তর : ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর। এটি প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত। এখানে ছিল মার্কিন নৌঘাঁটি।

ঞ. কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিব কে?
উত্তর : কমলেশ শর্মা, ভারত (১ এপ্রিল ২০০৮-বর্তমান)।

ট. নিম্নলিখিতগুলোর সদর দফতর কোথায়?
আফ্রিকীয় ঐক্য সংস্থা; উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ।
উত্তর : আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা– আদ্দিস আবাবা (ইথিওপিয়া)। বর্তমানে সংস্থাটির নাম আফ্রিকান ইউনিয়ন।
উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ– রিয়াদ (সৌদি আরব)।

ঠ. নিম্নলিখিত দেশগুলোর অধিবাসীদের প্রধান ভাষা কি?
শ্রীলংকা, ফিলিপাইন্স।
উত্তর : শ্রীলংকা– সিংহলি; ফিলিপাইন্স– ফিলিপিনো।

২. নিচের যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : ২০
ক. পেন্টাগন, খ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক; গ. খেমাররুজ; ঘ. পশ্চিম তীর; ঙ. সল্ট-১; চ. ইরিত্রিয়া; ছ. সার্বিয়া।

ক. পেন্টাগন
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির অদূরে অবস্থিত একটি পাঁচ কোণবিশিষ্ট দালান। পাঁচটি দিক বা কোণবিশিষ্ট বলেই এর নাম পেন্টাগন। এ দালানেই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে পেন্টাগন (Pantagon) বলতে শুধু এ ভবনটিকেই বোঝায় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষকেও বোঝায়।

খ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
উত্তর : ADB-এর পূর্ণরূপ Asian Development Bank. প্রতিষ্ঠিত হয় ২২ আগস্ট ১৯৬৬। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৩১ এবং বর্তমান সদস্য ৬৭টি দেশ। সদর দপ্তর ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সদস্য দেশসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে কারিগরি সাহায্য প্রদান। নির্বাহী প্রধান প্রেসিডেন্ট। তার মেয়াদকাল ৫ বছর।

এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য :
(i) অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সরকারি মূলধনকে কার্যকরভাবে বিনিয়োগে ব্যবহার করা।
(ii) এসক্যাপের অন্তর্ভুক্ত স্বল্পোন্নত অঞ্চলের প্রকল্প ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।
(iii) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রবৃদ্ধিগত বৈষম্য দূরীকরণ।
(iv) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
(v) নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সাহায্য প্রদান করা এবং
(vi) জাতিসংঘের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা ও সম্পর্ক বজায় রাখা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলি আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, এ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হলো আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

গ. খেমাররুজ
সত্তরের দশকে গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী ও গেরিলা সংগঠনের নাম খেমাররুজ। কম্বোডিয়ার এই বিপ্লবী সংগঠনটি অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। চীনের মার্কসবাদী উগ্র এই কমিউনিস্ট সংগঠনটির নেতৃত্ব দেন পলপট। ১৯৬০-এর দশকে ক্ষমতায় ছিলেন সিহানুক। ১৯৭০ সালে মার্কিন বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল ননলক। ক্ষমতা হারানোয় সিহানুক গড়ে তোলেন গেরিলা গ্রুপ এবং তার সাথে যোগ দেন কম্যুনিস্ট পলপট। তাদের যৌথ গেরিলা তৎপরতায় সহায়তা দান করে চীন, রাশিয়া ও উত্তর ভিয়েতনাম। আন্দোলন-সংগ্রাম এক পর্যায়ে পলপটের হাতে চলে আসে। পলপটের নেতৃত্বে এই আন্দোলন কম্বোডিয়ার ক্ষমতা দখল করেছিল ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত খেমাররুজ কম্বোডিয়ায় শ্রেণিহীন কম্যুনিস্ট সমাজ কায়েমের নামে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। উক্ত সময়ে কম্বোডিয়ার প্রায় কুড়ি লাখ অসহায় মানুষ তাদের হাতে বিভিন্নভাবে প্রাণ দিয়েছে। ক্ষমতায় এসে খেমাররুজরা মানবতার চরম সীমালঙ্ঘন করে। ফলে ১৯৭৯ সালে কম্বোডিয়াবাসীর মৌন সমর্থন নিয়ে ভিয়েতনামপন্থী বাহিনী তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করে। ফলে তারা চীন ও থাইল্যান্ডে আশ্রয় নেয়। তাদের বাড়াবাড়ি বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য চীন এক পর্যায়ে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে তারা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গ্রুপ-উপগ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়।

ঘ. পশ্চিম তীর
পশ্চিম তীর জর্ডান নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত পার্বত্য সমভূমি অঞ্চল। ১৯৬৭ সালে জর্ডানের কাছ থেকে দখল করার পর থেকে এটি ইসরাইলের অধিকারে ছিল। বর্তমানে এটি ফিলিস্তিন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ১৯৯৪ সালের ২৯ আগস্ট ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তি

স্বাক্ষরের পর থেকে ইসরাইল জেরিকো শহরসহ পশ্চিম তীর ফিলিস্তিনি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এবং ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম তীরের জনস্বাস্থ্য, আয়কর, শিক্ষা, পর্যটন ইত্যাদি থাকবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে এবং প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়সমূহ থাকবে যৌথ বাহিনীর হাতে। তবে এই চুক্তি সত্ত্বেও পশ্চিম তীরের ওপর এখনো সম্পূর্ণ প্যালেস্টাইনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঙ. সল্ট-১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে হেলসিংকি ও ভিয়েনাতে অত্যাধুনিক ও অতি মারাত্মক মারণাস্ত্র সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে যে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সেটা ছিল কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা বা SALT-এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মস্কো সফরে গেলে দুই দেশের মধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ বন্ধ ও অন্যান্য আক্রমণমূলক অস্ত্র নির্মাণ ৫ বছরের জন্য মুলতবি রাখার অঙ্গীকারসম্পন্ন একটি চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি আংশিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সালের ২৮ মে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সীমিতকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চ. ইরিত্রিয়া

ইরিত্রিয়া বর্তমানে স্বাধীন একটি দেশ। ইতিপূর্বে এটি ইথিওপিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ ছিল। দীর্ঘকাল ধরে ইরিত্রিয়াবাসী স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে অবশেষে ১৯৯৩ সালের ২৪ মে ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা লাভ এবং একই বছরের ২৮ মে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। দেশটির রাজধানীর নাম আসমারা, ভাষা আরবি এবং মুদ্রার নাম বির।

ছ. সার্বিয়া

সাবেক যুগোশ্লাভিয়া প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রভূমি। ২০০৩ সাল পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল বিশ্ব মানচিত্রে। অবশেষে ২০০৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মানচিত্র থেকে যুগোশ্লাভিয়ার বিলুপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। উল্লেখ্য, ১৮৭৮ সালে স্বাধীন রাজ্য সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্র গড়ে ওঠেছিল।

৩. তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করুন। ১৫

৪. কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৩৬।

৫. মুসলিম বিশ্বের প্রধান সংহতি স্থাপনকারী ও সংহতি বিনষ্টকারী শক্তিগুলো কি? আপনি কি মনে করেন যে মুসলিম বিশ্ব ঐক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আপনার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখান। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১০৪।

৬. ১৯৭২ সাল থেকে চীন-মার্কিন সম্পর্কের ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫০৫।

৭. বিশেষ এজেন্সিসমূহ বলতে কি বুঝায়? উন্নয়নশীল দেশসমূহকে আর্থিক সহায়তাদানকারী এরূপ একটি এজেন্সির ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৭৮।

৮. জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার উদ্দেশ্যে আপনি কি সংস্থাটির সনদের কিছু সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন? আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩১।

৯. আপনি কি মনে করেন যে আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্তরায়? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩২২।

১১তম বিসিএস : ১৯৯০-৯১

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন। ১০ × ২ = ২০

ক. গত কয়েক দশক যাবৎ প্রতি বছর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৬ অক্টোবর ও ১০ ডিসেম্বর উদযাপন করে থাকে। অল্প কথায় এ দুই দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উল্লেখ করুন।
উত্তর : ১৬ অক্টোবর 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' হিসেবে পালিত হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO-এর উদ্যোগে এ দিবসটি পালিত হয়। বিশ্বে সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। ১০ ডিসেম্বর 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সেই বছর থেকে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর এ দিবস পালিত হচ্ছে।

খ. জাপানের চারটি প্রধান দ্বীপের নাম কি?
উত্তর : জাপানের ৪টি প্রধান দ্বীপ হলো : ১. শিকুকু; ২. কিউসু; ৩. হনসু এবং ৪. হোক্কাইডু।

গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কে? তিনি কার স্থলাভিষিক্ত হন?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন জো বাইডেন। ২০ জানুয়ারি ২০০৯ তিনি ডিক চেনির স্থলাভিষিক্ত হন। জানুয়ারি ২০১৩ সালে ওবামা প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি পুনঃনির্বাচিত হন।

ঘ. পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের নাম কি? রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে তিনি কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? নাম ইংরেজিতে লেখা চলবে।
উত্তর : পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের নাম ব্রোনিস্লে কোমোরোয়াস্কি (Bronislu Komorwski)। তিনি ৮ জুলাই ২০১০ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি সিভিক প্লাটফর্ম (লিবারেল কনজারভেটিভ) দলের সাথে জড়িত ছিলেন।

ঙ. ইউনেসকোর চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।
উত্তর : ইউনেস্কোর চারটি উদ্দেশ্য হলো : ১. সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন; ২. আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ গবেষণার উন্নয়ন; ৩. সংবাদ মাধ্যমগুলোর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান; ৪. বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা।

চ. আরব-বিশ্বের বহির্ভূত চারটি ওপেক সদস্য রাষ্ট্রের নাম লিখুন।
উত্তর : আরব বিশ্বের বহির্ভূত চারটি ওপেক সদস্য রাষ্ট্র হলো : ১. ইকুয়েডর; ২. নাইজেরিয়া; ৩. ভেনিজুয়েলা এবং ৪. ইরান।

ছ. অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, ইরাক ও ইসরাইলের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর নাম কি?
উত্তর : ১. অস্ট্রেলিয়া– অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি; ২. ব্রিটেন– কনজারভেটিভ পার্টি; ৩. ইরাক– ইউনাইটেড ইরাকি অ্যালায়েন্স, ৪. ইসরাইল– লিকুদ পার্টি।

জ. ব্রেটেন উডস কোথায়? এই স্থানের সঙ্গে কোন দুটি সংস্থার নাম জড়িত?
উত্তর : ব্রেটন উডস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের একটি শহরের নাম। ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই এই স্থানে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পুনর্গঠন উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstructions and Development–IBRD) এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund–IMF) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে IBRD বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ৫টি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি।

ঝ. নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো কোন সালে সংঘটিত হয়?
বান্দুং সম্মেলন; ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু; প্রেসিডেন্ট চসেস্কুর পতন; নামিবিয়ার স্বাধীনতা লাভ।
উত্তর : বান্দুং সম্মেলন – ১৯৫৫ সালে।
ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু–১৯৮৪ সালের ৩০ অক্টোবর।
প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চসেস্কুর পতন–১৯৮৯ সালে।
নামিবিয়ার স্বাধীনতা লাভ–২১ মার্চ ১৯৯০।

ঞ. নরডিক পরিষদের সদস্য দেশগুলোর নাম লিখুন।
উত্তর : নরডিক পরিষদের সদস্য দেশগুলো হলো : ১. নরওয়ে; ২. সুইডেন; ৩. আইসল্যান্ড; ৪. ডেনমার্ক এবং ৫. ফিনল্যান্ড।

ট. ওআইসি'র মহাসচিব কে?
উত্তর : ওআইসি'র বর্তমান মহাসচিব সৌদি আরবের আইয়াদ বিন আমীন মাদানী। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারিতে ওআইসি'র দশম মহাসচিব হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ঠ. ১৯৬৮ সালের পারমাণবিক বিস্তার রোধ চুক্তিতে এখনো স্বাক্ষর করেনি এমন চারটি রাষ্ট্রের নাম লিখুন।
উত্তর : ১৯৬৮ সালের পারমাণবিক বিস্তার রোধ চুক্তিতে এখনো স্বাক্ষর করেনি এমন চারটি রাষ্ট্র হলো : ১. ভারত; ২. পাকিস্তান; ৩. চীন এবং ৪. ফ্রান্স।

২. নিচের যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : $৪ \times ৫ = ২০$
ক. নব-ঔপনিবেশিকতাবাদ; খ. হরমুজ প্রণালী; গ. ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি; ঘ. জেরুজালেম; ঙ. বায়াফ্রা; চ. হংকং; ছ. কুইবেক; জ. উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা।

ক. নব-ঔপনিবেশিকতাবাদ
উত্তর : প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ কর্তৃক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার নাম হলো নব-ঔপনিবেশিকতাবাদ বা New-colonialism. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। একে একে তাদের উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। অতঃপর তারা তাদের হারানো উপনিবেশগুলোর ওপর নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়।

নব-ঔপনিবেশিকতার ফলে আফ্রিকার বহু দেশে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক প্রাধান্যের স্থলে অর্থনৈতিক প্রাধান্য বজায় থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখল নব্য ঔপনিবেশিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খ. হরমুজ প্রণালী
উত্তর : ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীর নাম হরমুজ প্রণালী (Hormuz Straits)। এটি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের (ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি) উপসাগর পার হয়ে সমুদ্রে পৌছার একমাত্র পথ। তাছাড়াও বিদেশি জাহাজগুলোকে তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আসতে হলে আরব সাগর থেকে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে হয়।

হরমুজ প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান যুগে যুগে বহু যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে। এসব যুদ্ধে বিশ্বের পরাশক্তি ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। এর কারণ এ প্রণালীটি ৬০ কিমি-এর বেশি চওড়া না হলেও এ পথ দিয়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি তেলবাহী ট্যাংকার বের হয়ে আসে। হরমুজ প্রণালীর মাধ্যমে সরবরাহকৃত তেল পাশ্চাত্য দেশসমূহের উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

অন্যদিকে হরমুজ প্রণালীর প্রবেশ পথে আবু মুসা, বড় টাম্ব ও ছোট টাম্ব দ্বীপগুলোর অবস্থানের কারণে এ প্রণালীর গুরুত্ব ব্যাপক। এই দ্বীপগুলো হরমুজ প্রণালীর একেবারে কাছাকাছি বলে এদের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ পথ জিব্রাল্টার অথবা লোহিত সাগরের প্রবেশপথ এডেনের গুরুত্বের সাথে। হরমুজ প্রণালীসহ এই দ্বীপগুলো যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে, যে শক্তির কাছে এই অঞ্চলটি রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাভজনক হবে। সব দিক থেকে এই তিনটি দ্বীপ এবং হরমুজ প্রণালী পরস্পরের পরিপূরক।

হরমুজ প্রণালীর এই গুরুত্বের কারণে ইরানের শাহ এ প্রণালীর তীরে বিশেষ করে ওমানের সমুদ্র উপকূলে কোনো বিদেশি শক্তিকে ঘাঁটি করতে দেয়নি।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের মূল রয়েছে এই প্রণালীর ওপর কে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে সে কারণটি। ইরান হরমুজ প্রণালীর ওপর দিয়ে বিদেশি জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে পারস্য উপসাগরীয় কিছু দেশের সাথে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়।

গ. ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি
উত্তর : স্নায়ুযুদ্ধের লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত জোট ওয়ারশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্যকে সুসংহত করতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিল ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা। এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৫ সালের ১৪ মে। পূর্ব ইউরোপে একের পর এক অকমিউনিস্ট সরকার গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই প্রাগে প্রটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেই সামরিক জোটের পরিসমাপ্তি ঘটে। অল্প কথায়, ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি পূর্ব ইউরোপে নাটকীয় পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। এ ঘটনা একদিকে যেমন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে, অপরদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে ন্যাটো জোট তথা পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ঘ. জেরুজালেম
উত্তর : জেরুজালেম মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পবিত্র নগরী। ভূমধ্যসাগর থেকে ৫৫ মাইল পূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৮০ মিটার (২৬০০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত। ১৯৪৮ সালে এই নগরী জর্ডান ও

ইসরাইলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইসরাইলের অংশ (বা নতুন জেরুজালেম) ডিসেম্বর ১৯৪৯ থেকে ইসরাইলের রাজধানী। এই জেরুজালেমের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত যায়ন পর্বত ও স্কোপাস পর্বতসমূহ। জর্ডান অংশে পড়েছে যায়ন পর্বত ছাড়া সমুদয় পবিত্রভূমিসহ পুরোনো জেরুজালেম নগরী। জেরুজালেমের পূর্ব অংশ পুরোনো নগরী, পশ্চিম অংশ নতুন নগরী। জর্ডান নদীর মোহনায় পশ্চিমে ২৬০০ ফুট উঁচু পর্বতের ওপর এই নগরী একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মতো এবং দুই পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এটি প্রথম সুলাইমান কর্তৃক নির্মিত (১৫৪২ খ্রি.) ও প্রাচীরবেষ্টিত হয়। প্রাচীরের মধ্যে চারটি মহল আছে। পূর্ব দিকের মুসলিম মহলে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং পুরোনো মরিয়া পর্বতের ওপর নির্মিত উমর মসজিদ ও আল-আকসা মসিজদ অবস্থিত। বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর ইহুদিদের কাছেও পবিত্র। বায়তুল মুকাদ্দাসের দক্ষিণ-পশ্চিমের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সিনাগগ (ইহুদি উপাসনালয়) সংবলিত ইহুদিমহল ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে বেশির ভাগ নষ্ট হয়েছে। খ্রিস্টান মহল পুরোনো নগরীর উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এখানে যিশুখ্রিস্টের সমাধিগৃহ আছে।

খ্রি.পূ. ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলনীয়দের কাছে জেরুজালেমের পতন ঘটে। তারপর এক সময় এটি ম্যাকাবি ও হেরড রাজাদের নগরী ছিল। প্রথম দিকের রোমক সম্রাটগণ এই পবিত্র নগরীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ৭০ খ্রিস্টাব্দে টাইটাস (বা তিতস) এই নগরী আক্রমণ করে ধ্বংস করেন। পরের বছর সম্রাট হাদ্রিয়ান এই নগরী পুনর্নির্মাণ করেন। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হযরত উমরের অধিকারে আসে এবং পবিত্রভূমির মর্যাদা লাভ করে। ১০৯৯ সালে ক্রুসেড যোদ্ধাগণ বুইয়ঁ (Bouillon)-র গডফ্রের নেতৃত্বে জেরুজালেম জয় করে লাতিন রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেন। ১৯১৭ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে মুসলমানদের কাছ থেকে লর্ড অ্যালেনবি এই নগরী জয় করে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন। এ সময় জেরুজালেম থেকে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ অছি-শাসন পরিচালিত হতো। অছি-শাসন শেষ হলে জেরুজালেমের কর্তৃত্ব নিয়ে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। কিছুদিন যুদ্ধ করার পর ইহুদিরা পুরানো জেরুজালেম আরবদের অধিকারে ছেড়ে দেয় এবং নতুন জেরুজালেমে নিজেদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারপর ১৯৬৭ সালের ৫-১০ জুন আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল বহু আরব এলাকাসহ জেরুজালেম নগরীও পুরোপুরি দখল করে। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে ইসরাইলি পার্লামেন্টে একটি বিল পাস করা হয়। তার বলে সর্বকালের জন্য এই নগরীকে ইসরাইল রাষ্ট্রের একমাত্র অবিভাজ্য রাজধানী রূপে ঘোষণা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও জেরুজালেমের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ রয়েছে। অবশ্য ইসরাইল তার পূর্বসিদ্ধান্তে অটল রয়েছে।

ঙ. বায়াফ্রা

উত্তর : নাইজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটি স্থানের নাম বায়াফ্রা। ১৯৬৭ সালে এ অঞ্চলের স্বাধীনতাকামীরা বায়ফ্রা নামকরণ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। এই অঞ্চলের সংখ্যাগুরু ইবু উপজাতির লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওজুকোর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৭-৮০ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের এটাই প্রধান কারণ। প্রায় তেরো বছর বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার পর ১৯৮০ সালে ওজুকো দেশ থেকে পলায়ন করেন এবং বায়াফ্রা বাহিনী নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। উল্লেখ্য, গৃহযুদ্ধকালে তানজানিয়া ও গ্যাবন বায়াফ্রাকে স্বীকৃতি দেয়।

চ. হংকং

উত্তর : হংকং চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায় কতগুলো দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। হংকং ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল। এটি ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই চীনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চীনের বিশেষ

প্রশাসনিক অঞ্চলের স্বীকৃতি পায়। আয়তন ১০০০ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি। জনসংখ্যা ৭০ লক্ষাধিক। ৯৫ শতাংশ হংকংবাসী জাতিগতভাবে চীনা। চীনের অধীনে হলেও হংকং যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। হংকং-এর মুখ্য প্রশাসক হচ্ছেন গভর্নর। তাকে সাহায্য করেন একটি স্থানীয় নির্বাহী পরিষদ। গভর্নর নিজেই ঐ পরিষদ সদস্যদের নিযুক্ত করেন। তিনি একটি নিরপেক্ষ ও দক্ষ আমলাগোষ্ঠীও নিয়োগ করেন। আমলাদের বেশির ভাগ সিনিয়র পদে চীনারা নিয়োজিত। হংকং-এ একটি ৬০ সদস্যের নির্বাচিত আইন পরিষদও আছে। প্রশাসন আইন পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সরকারি ব্যয়ও নির্ধারণ করে আইন পরিষদ। হংকং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক ও সার্ভিস সেন্টার। বিগত ৩৫ বছরের অধিককাল যাবৎ হংকং-এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। হংকং-এর মাথাপিছু জিডিপি অধিকাংশ পশ্চিমা দেশের তুলনায় বেশি। হংকং বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দিক থেকে হংকং বিশ্বের সপ্তম স্থানে। চীনের বৈদেশিক বিনিয়োগের ৬০ শতাংশই হংকং-এর।

ছ. কুইবেক

উত্তর : কানাডার ১০টি প্রদেশের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ হলো 'কুইবেক'। এটি সম্পদশালী প্রদেশ। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। আয়তন ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪০ বর্গমাইল। কুইবেকের ৮৫ শতাংশ অধিবাসী ফরাসি ভাষায় কথা বলে অথচ রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজি। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে প্রদেশটিতে স্বাধীনতার দাবিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে স্বাধীনতা পন্থীদের পরাজয় হয়। ঐক্যের সমর্থক কানাডার প্রধানমন্ত্রী নিজেও কুইবেকের বাসিন্দা। বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা লুসিয়েন বুচার পরাজয় স্বীকার করেন। তবে এটা সত্য যে, স্বাধীনতার সমর্থক গোষ্ঠী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ধারাবাহিকতায় হয়তো একদিন স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে কুইবেক স্থান করে নেবে।

জ. উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা

উত্তর : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ কোরিয়া উপদ্বীপ নামে বিশ্বে পরিচিত ছিল। দেশ দুটো দীর্ঘদিন যাবৎ এক ভাষা, এক সংস্কৃতি এবং অখণ্ড জাতিসত্তার চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্ব দুই পরাশক্তির অধীনে দুটো ব্লকে বিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে দুই কোরিয়া বিভক্ত হয়। কোরিয়ার দক্ষিণাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে, অপরদিকে উত্তর কোরিয়া দখল করে কমিউনিস্ট রাশিয়া। ১৯৫০ সালের ২৫ জুন সীমান্ত উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়া ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করলে দক্ষিণ কোরিয়া সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে চীন উত্তর কোরিয়ার পক্ষ নেয়, অপরদিকে জাতিসংঘ দক্ষিণ কোরিয়াকে সহায়তা করার জন্য সব রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানায়। উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই। যুদ্ধবিরতির পরপরই দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিশ্চয়তা প্রদান করে। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর থেকেই উভয় দেশের মধ্যে একটা বৈরীভাব বিরাজ করছে।

দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ সম্ভব কি না তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং সেই সুবাদে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের প্রেক্ষাপটে নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনালগ্নে বিভক্ত কয়েকটি দেশ একীভূত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় জার্মানি, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেনের একত্রীকরণের ঘটনাসমূহ। তবে আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে কোরিয়ার অবস্থা তুলনামূলকভাবে একটু ভিন্ন হিসেবে বিবেচিত। দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের পেছনে উত্তর ও

দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও কতিপয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তা এ মুহূর্তে বেশ কঠিন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ আঞ্চলিক পরাশক্তিসমূহের আন্তরিক ইচ্ছা ও বাস্তব উদ্যোগ না থাকলে তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কৌশলগত রাজনীতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে, দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।

৩. নেলসন মেন্ডেলার মুক্তির পর দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতিতে কি কি প্রধান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? আলোচনা করুন। ১৫

৪. ১৯৯০-৯১ সালের উপসাগরীয় সঙ্কটকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার বিস্তারিত পর্যালোচনা করুন। ১৫

৫. ১৯৮৯ সালে সরকার পরিবর্তনের পর যেসব নতুন সমস্যা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, সেগুলো আলোচনা করুন।

৬. পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে জার্মান পুনঃএকত্রীকরণের প্রভাব মূল্যায়ন করুন। ১৫

৭. একটি আঞ্চলিক সংস্থার সাফল্যের পূর্বশর্তগুলো কি? আপনি কি মনে করেন যে আসিয়ান ও সার্ক এই পূর্বশর্তগুলো পূরণ করেছে? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৩০ ও ৬০৫।

৮. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৮৪।

৯. বর্তমান বিশ্ব যেসব প্রধান পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো কি? আপনার মতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক সমস্যা কোনটি? এ সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ দিন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৮২।

১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-৯০

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ১ থেকে ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. যে কোনো দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিন : ১০ × ২ = ২০

ক. জাতিসংঘের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত তার প্রতিটি মহাসচিবের নাম ও উক্ত পদাধিকারের সময়সীমা লিখুন।

নাম	দেশ	মেয়াদকাল
১. ট্রাইগভে লাই	নরওয়ে	০২.০২.১৯৪৬-১০.১০.১৯৫২
২. দ্যাগ হ্যামারশোল্ড	সুইডেন	১০.০৪.১৯৫৩-১৮.০৯.১৯৬১
৩. উ থান্ট	মিয়ানমার	৩০.১১.১৯৬১-৩১.১২.১৯৭১
৪. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	০১.০১.১৯৭২-৩১.১২.১৯৮১
৫. জাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	০১.০১.১৯৮২-৩১.১২.১৯৯১
৬. ড. বুট্রোস বুট্রোস ঘালি	মিশর	০১.০১.১৯৯২-৩১.১২.১৯৯৬
৭. কফি আনান	ঘানা	০১.০১.১৯৯৭-৩১.১২.২০০৬
৮. বান কি মুন	দ. কোরিয়া	০১.০১.২০০৭- বর্তমান

নোট : ট্রাইগভে লাই জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব হলেও তার পূর্বে যুক্তরাজ্যের স্যার গ্লাডউইন জেব ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে ১৯৪৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

খ. পোল্যান্ড, রুমানিয়া, পূর্ব জার্মানি ও চেকোস্লাভাকিয়ার নতুন সরকার প্রধানসমূহের নাম লিখুন।
উত্তর : পোল্যান্ড– ব্রোনিস্লে কোমোরোয়াস্কি (প্রেসিডেন্ট)
রুমানিয়া– ক্লয়াস লোহানিস (প্রেসিডেন্ট)
জার্মানি– এঞ্জেলা মার্কেল (চ্যান্সেলর)
[দুই জার্মান বর্তমানে একীভূত]
চেক প্রজাতন্ত্র–বহাঘলাভ সবোতকা (প্রধানমন্ত্রী)
স্লোভাকিয়া– রবার্ট ফিকো (প্রধানমন্ত্রী)
[চেক ও স্লোভাকিয়া বর্তমানে আলাদা প্রজাতন্ত্র]

গ. ন্যাটো কবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার বর্তমান সদস্যসমূহ কোন কোন রাষ্ট্র? এর কোনো সহযোগী সদস্য আছে কি?
উত্তর : ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ন্যাটো সৃষ্টি হয়। ১৯৯৯ সালের মধ্যে এ সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১৯-এ উন্নীত হয়। এর সদস্য দেশগুলো হলো– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, গ্রিস, তুরস্ক, জার্মানি, স্পেন, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড। তাছাড়া ২০০৪ সালের ২৯ মার্চ পূর্ব ইউরোপের ৭টি দেশ– লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া ও লাটভিয়া ন্যাটোতে যোগদান করে। সর্বশেষ ২০০৯ সালে আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া সদস্যপদ লাভ করে। ফলে বর্তমান ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮-এ।

ঘ. আইএনএফ চুক্তি বলতে কি বোঝায় এবং এই চুক্তি কোন অস্ত্র ব্যবস্থার বেলায় প্রযোজ্য?
উত্তর : INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) হলো মাঝারি পাল্লার আণবিক শান্তি চুক্তি। ৩০০ থেকে ৩৫ হাজার মাইল পাল্লার মাটি থেকে ক্ষেপণযোগ্য আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের বেলায় এ চুক্তিটি প্রযোজ্য।

ঙ. বুশ প্রশাসনে যুক্ত বাহিনীসমূহের চেয়ারম্যান এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার পরিচালকের নামদ্বয় লিখুন।

চ. কোন তিনটি সোভিয়েত বাল্টিক প্রজাতন্ত্র আলাদা হতে চায় এবং এদের রাজধানী কি কি?
উত্তর : ১. লাটভিয়া (রিগা); ২. লিথুনিয়া (ভিলনিয়াস); ৩. এস্তোনিয়া তাল্লিজ [ইতোমধ্যে লাটভিয়া ২১ আগস্ট ১৯৯১, লিথুনিয়া ১৯৯১ সালে এবং এস্তোনিয়া ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা লাভ করেছে। এমনকি তিনটি দেশ জাতিসংঘের সদস্য পদও লাভ করেছে।]

ছ. সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাতন্ত্রগুলো কি কি?
উত্তর : সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাতন্ত্রগুলো হলো– ১.আজারবাইজান ২. উজবেকিস্তান, ৩. কিরগিজস্তান, ৪. কাজাকিস্তান, ৫. তুর্কমেনিস্তান এবং ৬. তাজিকিস্তান। উল্লেখ্য, মধ্য এশিয়ার এ পাঁচটি দেশ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯১ সালে পর্যায়ক্রমে দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। আর ১৯৯২ সালের ২ মার্চ দেশগুলো জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

জ. জর্জ হাবাস কে এবং তার রাজনৈতিক পরিচয় কি?
উত্তর : জর্জ হাবাস ১৯২৫ সালের ২ আগস্ট ফিলিস্তিনি শহর লিদ্দার এক বনেদি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে গড়ে ওঠা পপুলার ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের (PFLP) প্রতিষ্ঠাতা। ২৬ জানুয়ারি ২০০৮ জর্জ হাবাস মারা যান। উল্লেখ্য, লিদ্দা শহর এখন ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত।

ঝ. নাইজেরিয়া, জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া, লাইবেরিয়া ও উগান্ডার সরকার প্রধানদের নাম কি?
উত্তর : নাইজেরিয়া– মোহাম্মাদু বুহারি (প্রেসিডেন্ট– ২৯ মে ২০১৫–)।
জিম্বাবুয়ে– রবার্ট মুগাবে (প্রেসিডেন্ট)।
কেনিয়া– উহুরু কেনিয়াত্তা (প্রেসিডেন্ট)।
লাইবেরিয়া– ইলেন জনসন সারলিফ (প্রেসিডেন্ট)।
উগান্ডা– ইউয়েরি মুসেভিনি (প্রেসিডেন্ট)।

ঞ. মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্স-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নাম লিখুন।
উত্তর : মালয়েশিয়া–আনিফা এইচজে আমান।
ইন্দোনেশিয়া– রেটনো মারসুডি।
ফিলিপিন্স– আলবার্ট এফ. ডেল রোসারিও।

ট. ভারতীয় কাশ্মীর অংশের গভর্নর কে এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সেখানে নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যাখ্যা কি?
উত্তর : নিরেনদার নাথ ভোরা। ভারত জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজি নয়। কারণ ভারত কাশ্মীরকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে।

ঠ. বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সভাপতিদ্বয়ের নাম কি?
উত্তর : বিশ্বব্যাংক– জিম ইয়ং কিম [১ জুলাই ২০১২– বর্তমান]।
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক– তাকোহিকো নাকাও [২৮ এপ্রিল ২০১৩ – ১৩ নভেম্বর ২০১৬]।

২. নিচের যে কোনো পাঁচটি ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন : ৪ × ৫ = ২০
ক. প্রেসিডেন্ট চসেস্কুর পতন; খ. আজারবাইজান সম্পর্কে সোভিয়েত বক্তব্য; গ. পানামায় মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য; ঘ. মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস করার পরিকল্পনা; ঙ. কাশ্মীর সংক্রান্ত পাকিস্তানের নীতি; চ. প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিং-এর সংখ্যালঘু সরকার; ছ. শ্রীলংকা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার; জ. ভারত-নেপাল দ্বন্দ্ব।

৩. জার্মান পুনঃএকত্রীকরণে বাধাগুলো কি কি? এটা কি আদৌ সম্ভব? ১৫

৪. যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে গর্বাচেভের সম্পর্ক উন্নয়নের মূল কারণ কি? দূর ভবিষ্যতে এটা কি টিকে থাকবে? ১৫

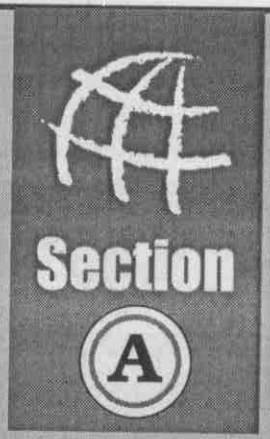
৫. ইউরোপে কম্যুনিজম-এর পতনের তুলনায় এশিয়া ও সারা তৃতীয় বিশ্বের ভবিষ্যৎ কি? ১৫

৬. আপনি কি মনে করেন যে, পানামায় মার্কিন আক্রমণ ও আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণকে একই গুণে যাচাই করা যায়? এই দুই ক্ষেত্রে বিশ্ব জনমত কিভাবে স্পষ্টতই আলাদা বলা যায়? ১৫

৭. ভারতে ভিপি সিং সরকারের টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? ভিপি সিং-এর তুলনায় কাশ্মীর প্রশ্নে রাজীব গান্ধীর ধারণাকে আপনি কিভাবে বিবেচনা করবেন? ১৫

৮. স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে তৃতীয় বিশ্বের মিত্রদের প্রতি মার্কিন আচরণ কি রকম হবে? এই সমস্ত দেশের শাসকবর্গ কি বর্তমানে নিরাপত্তাহীন বোধ করছে? ১৫

৯. বিশ্ব অর্থনীতিতে জাপানের আধিপত্যের ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৬৮।



Conceptual Issues

① আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ধারণা
Introduction to International Affairs

② বিশ্ব নেতৃত্ব
Actors in the World

③ ক্ষমতা ও নিরাপত্তা
Power & Security

④ প্রধান মতবাদসমূহ ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা
Major Ideologies & New World Order

⑤ পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি
Foreigh Policy & Diplomacy

⑥ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক
International Economic Relations

⑦ বৈশ্বিক পরিবেশ
Global Environment

অধ্যায়
০১

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ধারণা
Introduction to International Affairs

Syllabus

Introduction to International Affairs : Significance of international affairs; meaning and scope of international affairs; linkage between international affairs and international politics.

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]*
অথবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

০২. *'সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব' সম্পর্কিত স্যামুয়েল পি হান্টিংটন থিসিসের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে? [২৪তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. *ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝেন?*
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

০৪. *ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়?*
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

০৫. *ক. আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি?*
খ. আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

০৬. *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।*

০৭. *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মডেল হিসেবে আন্তঃসভ্যতা সংলাপের ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়?*

০২. *আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংজ্ঞা দিন।*

০৩. *আন্তঃসভ্যতা সংলাপ (Inter-civilization Dialogue) কি?*

০৪. *বাফার স্টেট (Buffer State) কি?*

০৫. *শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব বা The Uniting for Peace Resolution বলতে কি বোঝায়?*

০৬. *আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে ক্রীড়াতত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।*

টীকা

I আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
I আন্তর্জাতিক রাজনীতি
I আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি
I সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব
I আন্তঃসভ্যতা সংলাপ
I এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা [১৮তম বিসিএস]
I এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌশক্তি
I চতুর্থ বিশ্ব
I আন্তর্জাতিকতাবাদ
I ক্রীড়াতত্ত্ব

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ I সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]
অথবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে বিরাজ করছে একমেরুকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবাধ সাম্রাজ্য বিস্তারের যে সুযোগ করে দিয়েছে তার প্রমাণ মিলে স্বাধীন সার্বভৌম ইরাকে মার্কিনিদের হামলার মাধ্যমে। অন্যদিকে বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতার নিয়ম-কানুন, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও আইন সবকিছুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মার্কিন সমর্থনে ইসরাইল বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ফিলিস্তিনে তার দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে। নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে বন্দি ইরানের (২ এপ্রিল ২০১৫ বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছে তেহরান ও ছয় বিশ্বশক্তি) সাথে সম্প্রতি কিছুটা সমঝোতামূলক আচরণ করলেও উত্তর কোরিয়ার ওপর একের পর এক হুমকি, অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাকে লঙ্ঘন করে তালেবান দমনের নামে নিরীহ ও সাধারণ জনগণের উপর বোমা নিক্ষেপ করছে; মুসলিম বিশ্ব নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। মুসলমানদের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য ও চিত্র প্রকাশ করছে। এদিকে ২ মে ২০১১ আল কায়েদা প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের ইসলামাবাদের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন হামলায় নিহত হয়। এরূপ অস্থিতিশীল পরিবেশে তাই প্রশ্ন উঠেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে কথা বলতে গেলে বর্তমান পৃথিবীর অধীশ্বর, পরাক্রমশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বলতে হয়। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য দেশ। ২০ জানুয়ারি ২০০৯ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন মার্কিন ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা। শেষ হয় বিশ্বে সংঘাতকে উস্কে দেয়া 'Preemptive Attack' অর্থাৎ 'আক্রান্ত হওয়ার আগেই সম্ভাব্য আক্রমণকারীকে আক্রমণ' তত্ত্বের প্রবক্তা জর্জ ডব্লিউ বুশের ৮ বছর মেয়াদি শাসনামল। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য

তিনি ফেলে গেছেন দুটি অসমাপ্ত যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা এবং বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক অপ্রিয় অবস্থান। শপথ নিয়েই জাতির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাষণ দেন বারাক ওবামা। প্রায় ২০ মিনিটের সেই ভাষণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে বদলে দেয়ার দিক নির্দেশনা। যে পরিবর্তনের স্লোগান তুলে তিনি আমেরিকায় ঝড় তোলেন, সে পরিবর্তন শুরুর অঙ্গীকার করেন তিনি। অন্যদিকে ইরাক যুদ্ধে দৃশ্যত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী জয়লাভ করলেও প্রতিনিয়ত গেরিলা হামলায় হতাহতের সংখ্যা বাড়ছেই। ইরাক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তাণ্ডবলীলা এখনও শেষ হয়নি। (১৯ আগস্ট ২০১০ ইরাক থেকে বিদায় নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষ কমব্যাট বাহিনী। এর ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ঘোষিত ৩১ আগস্ট সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাহার করা হয় কমব্যাট সেনাদের। আর এর মধ্য দিয়েই কার্যত ইরাক যুদ্ধের ইতি টানে যুক্তরাষ্ট্র) ওবামা আরও বলেন তার প্রশাসন সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেয়ে গণতন্ত্র, কূটনীতি ও উন্নয়নকেই বেশি অগ্রাধিকার দেবে। তিনি ইরানের রকেট প্রযুক্তির সাফল্যের মোকাবিলায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেন। তাই বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নিবে বলা কঠিন। তবে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্ভাব্য যে ঘটনাগুলো ঘটতে পারে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দীর্ঘায়িতকরণ :** নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে যে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি হয়েছে ভবিষ্যতে তা আরও দীর্ঘায়িত হবে। একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ করেছিল। তাই বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য বিশ্বে আরও কিছুদিন বজায় থাকবে।

২. **সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মেরুকরণ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র দেশ ব্রিটেন ও স্পেনের সহযোগিতা নিয়ে যেমন ইরাকে আক্রমণ করেছে তেমনি নিরাপত্তা পরিষদের অপর সদস্য দেশ ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়া এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। ফলে প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদ ইরাক যুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে সরাসরি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের তৎকালীন ১৯২টি দেশের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন জোট মাত্র ৫০টি দেশের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল। বাকি ১৪২টি দেশ ইরাক আক্রমণের বিপক্ষে ছিল। ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জার্মানির নেতৃত্বে একটি নতুন জোট আবির্ভূত হয়, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য খর্ব করে। অনুরূপভাবে পারমাণবিক শক্তিধর উত্তর কোরিয়া ইস্যু নিয়েও বর্তমান বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

৩. **বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী মনোভাব তীব্র হবে :** ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ শুরু করলে খোদ ব্রিটেন, আমেরিকাসহ সারাবিশ্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রদর্শিত হয়। আর এর ফলেই ৪ নভেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বুশ সমর্থিত রিপাবলিকান পার্টির শোচনীয় পরাজয় ঘটে। প্রতি বছরের ২০ মার্চ ইরাক আক্রমণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইরাক আক্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ছাড়াও এ যুদ্ধের সমর্থক দেশ অস্ট্রেলিয়া ও স্পেনের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী স্লোগান, ব্যানার, ফেস্টুনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় ইরাকের ওপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর আক্রমণ ছিল অবৈধ। দিন দিন বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী জনমত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা বিশ্ববাসী সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর তাণ্ডব এখনও প্রত্যক্ষ করছে।

৪. **দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে :** বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসী নীতির কারণে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ বিশ্বের ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় প্রতিভাত হয়েছে যে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনেকটাই দুর্বল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। জাতিসংঘের বর্তমান ভূমিকায় বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন নীতির বিরোধী অনেক দল আছে যারা মনে করে যে কোনো সময় যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর হামলা করতে পারে। যেমন : সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইরানসহ অনেক দেশ। আবার বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশ আছে যারা আমেরিকার ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছে না। এমনকি মার্কিন স্বার্থ বিরোধী কাজ করা একরকম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া যেসব ছোট রাষ্ট্রের সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে সেসব দেশ এখন জাতীয় বাজেটে কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে ব্যয় কমিয়ে দিয়ে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করছে। এর ফলে দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

৫. **মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকট হবে :** মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত ইরাক, ইরান, কুয়েত ও সৌদি আরবে রয়েছে বিশাল তেলের ভাণ্ডার। আমেরিকা যদি মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নেয় তবে সকল তেল কোম্পানি আমেরিকার স্বার্থের অনুকূলে তেল উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা মেনে চলবে। ফলে বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যা দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করবে। তবে এটি কখনোই হতে দিবে না ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো। কেননা মধ্যপ্রাচ্যে তাদেরও স্বার্থ রয়েছে। এ কারণেই ইরাক যুদ্ধের সময়ে শুধু ব্রিটেন ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত সকল দেশ আক্রমণের বিপক্ষে ছিল এবং ভবিষ্যতে ইরান আক্রমণের প্রশ্ন উঠলেও তারা বিপক্ষে থাকবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইউএসএ এবং ইইউ-এর মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দিতে পারে।

৬. **জাতিসংঘের গুরুত্ব কমে যাবে :** জাতিসংঘের ভূমিকা দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। কেননা জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করেছিল। ইসরাইল ফিলিস্তিনে আক্রমণ করেছে। আবার হয়তো যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়াও আক্রমণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন কাঠামোর ত্রুটির কারণে অনেক অন্যায় করেও বৃহৎ শক্তিগুলো পার পেয়ে যাচ্ছে। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনাও সম্ভব হয়নি। যেমন ইসরাইল বার বার ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালালেও শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে নিন্দা প্রস্তাবও গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আবার ইরাকে হামলাও থামাতে পারেনি। সিরিয়ার ওপর সম্ভাব্য হামলা রোধ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই এখন বিশ্ব জনমত জাতিসংঘের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্ববাসী এখন মনে করে জাতিসংঘ এখন আমেরিকার হাতের পুতুল এবং মার্কিনিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই কাজ করে যাচ্ছে। তাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের সচেতন দেশগুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় জাতিসংঘের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

৭. **পরাশক্তির প্রভাব বেড়ে যাবে :** বর্তমান বিশ্বে যে পেশীশক্তি নির্ভর রাজনীতি শুরু হয়েছে তাতে পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সংখ্যা বেড়ে যাবে। জাতিসংঘকে পাশ কাটানোর যে সংস্কৃতি

যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে তা অন্যান্য পরাশক্তির মধ্যে সংক্রমিত হলে বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে পড়বে। ক্ষমতার রাজনীতির ফলে অনেক দেশই পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে চাইছে। যেমন– ইরান যে কোনো সময় মার্কিন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু দেশটি পারমাণবিক শক্তি অর্জনে বদ্ধপরিকর। এ প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া বৈ কমবে না।

৮. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অনীহা বেড়ে যাবে :** বর্তমান বিশ্বে একমাত্র গণতন্ত্রই বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা যেমন ব্যাহত হয়েছে তেমনি গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা হয়েছে প্রসারিত। গণতন্ত্রকেই বিবেচনা করা হয়েছে জনকল্যাণে নিবেদিত এবং সর্বজন গ্রহণীয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে। আর এ গণতন্ত্রের অন্যতম মডেল হিসেবে বিশ্ববাসী এতদিন জেনেছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের নাম। কিন্তু গণতন্ত্রের লেবাসধারী উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলো তাদের আগ্রাসী নগ্ন চরিত্রের উন্মোচন ঘটিয়ে কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে বিতর্কিত করে ফেলেছে। ফলে সমাজতন্ত্রসহ কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার অন্যান্য বিকল্পের প্রতি বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষিত হবে বলে আমাদের মনে হয়। এর প্রমাণও মিলছে। বিভিন্ন দেশের শাসন ক্ষমতায় বর্তমানে জয়লাভ করছে উদারপন্থিদের পরিবর্তে কট্টরপন্থীরা, যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী না হলেও সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। যেমন— ইরান, ফিলিস্তিন ইত্যাদি। কারণ এসব দেশের জনগণ নিজেদের অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র একটি জনকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থা হলেও এর আদর্শের তথা কথিত চর্চাকারীদের কুকর্মের কারণে গণতন্ত্রের প্রসার ও অগ্রযাত্রার যে ক্ষতি হলো তার প্রভাব আগামী দশকে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপর পরিলক্ষিত হবে এবং বর্তমান ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো যদি এ লেবাস পরিবর্তন না করে তবে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

৯. **মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে :** ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর টুইন টাওয়ার হামলা পরবর্তী সময়ে আমেরিকার সন্দেহভাজন দেশগুলোর তালিকায় ব্যতিক্রমভাবে দু একটি দেশ বাদ দিলে প্রায় সব মুসলিম দেশকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল কায়েদার সাথে সম্পর্ক আছে এ ভয় দেখিয়ে আমেরিকা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে চাপে রেখেছে এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। আমেরিকা তার আগ্রাসী শক্তি ব্যবহার করে আজ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে বর্তমানে সিরিয়া ও ইয়েমেনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকা বিরোধী মনোভাব দিন দিন আরো প্রবল হচ্ছে, যা ক্রমান্বয়ে বিশ্বজুড়ে আইএস (ইসলামিক স্টেট)-এর পাশাপাশি আরো লাদেন, আরো হামাস, আল কায়েদা জন্ম দিবে বলে মনে করা হয়।

১০. **অস্ত্রের প্রবাহ বেড়ে যাবে :** আগামী দশকে বিশ্বে অস্ত্রের প্রবাহ বেড়ে যাবে বহুগুণে। অনেক দুর্বল রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাছে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয় করবে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং তাইওয়ান। বিগত দু দশকে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এ তিনটি দেশের কাছে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র বিক্রয় করেছে। আবার অনেক দেশের অস্ত্র সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর কাছে চলে যায় এবং প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র সরকার বিরোধী বা প্রতিপক্ষ দলগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা জিইয়ে রাখে। ফলে এর প্রভাব পড়বে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর।

১১. **ওআইসি হুমকির সম্মুখীন হবে :** ইরাক দখলের মতো যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরান, সিরিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো দেশে হামলা বা দখল করে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এটি হলে ওআইসি তার স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হবে— এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

আগামী দিনের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা আমেরিকা হাতে নিয়েছে তা প্রতিরোধ করা এখন বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে আমেরিকার শক্তিশালী অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ সাহায্য এবং সহযোগিতা মার্কিন বিরোধী প্রচারণাকে দুর্বল করে দিবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অবশ্য নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেয়ে গণতন্ত্র, কূটনীতি ও উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে ইরানের রকেট প্রযুক্তির সাফল্যের মোকাবিলায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করারও প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন। তাই ইতিহাস বলে দিবে আগামীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

০২ । 'সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব' সম্পর্কিত স্যামুয়েল পি হান্টিংটন থিসিসের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে? *[২৪তম বিসিএস]*

উত্তর : বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন পৃথিবী বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাডস তার 'Youth' উপন্যাসে সভ্যতাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাতে লেখেন 'The fast spoke to me, but it was in a western voice'. তখনই পৃথিবী বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন থিসিস লেখেন 'The Clash of Civilizations' নামে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রচলন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পৃথিবীর সকল সভ্যতা যখন একই স্বরূপ গ্রহণ করছে, তখনই হান্টিংটন সভ্যতাসমূহের মধ্যে বিভক্তি রেখা টেনে ১৯৯৩ সালে Foreign Affairs-এ প্রকাশ করেন 'The Clash of Civilizations' নামক থিসিস। এই অদ্ভুত থিসিসের মূল কথা ছিল ভবিষ্যৎ সংঘাতের চরিত্র হবে সভ্যতাভিত্তিক, রাষ্ট্রভিত্তিক নয় এবং এই সভ্যতা শক্তিশালী হবে 'সাংস্কৃতিক যোগসূত্র'-এর ভিত্তিতে, যার মূল উপাদান হবে ধর্ম। তার মতে ভবিষ্যৎ সংঘাত হবে ইসলাম, চীন বনাম পাশ্চাত্যের মধ্যে। তিনি এই থিসিসে ইসলামকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার এই থিসিস আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। ৫৬ বছর ধরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত 'The Clash of Civilizations' তত্ত্বের জনক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটন ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮ মৃত্যু বরণ করেন।

থিসিসের মূল বক্তব্য : হান্টিংটন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, সভ্যতাভিত্তিক সংঘাতই আগামী দিনের বাস্তবতা। তাই তিনি তার এই থিসিসে Civilizational border এঁকেছেন সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের উপর ভিত্তি করে। তার মতে, এভাবে পৃথিবীর প্রধান প্রধান সভ্যতাসমূহ হলো : ১. পাশ্চাত্য, ২. ল্যাটিন আমেরিকান, ৩. আফ্রিকান, ৪. ইসলামিক, ৫. কনফুসিয়াস, ৬. হিন্দু, ৭. স্লাভিক-অর্থোডক্স এবং ৮. জাপানিজ।

হান্টিংটন মনে করেন অতীতে সংঘাতের চরিত্র ছিল আদর্শভিত্তিক আর ভবিষ্যতের সংঘাতের চরিত্র হবে সংস্কৃতিভিত্তিক। সংস্কৃতিই একটি সভ্যতাকে অন্য সভ্যতা থেকে পৃথক করে। হান্টিংটন তার থিসিসের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন :

ক. **বহুপাক্ষিক ও বহু সভ্যতাভিত্তিক বিশ্ব রাজনীতি :** এক সময় ছিল যখন আধুনিকীকরণ বলতে পাশ্চাত্যকরণকেই বুঝাতো। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকীকরণ বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বুঝায়। এর ফলে বিশ্বের অনেক সভ্যতা যেমন— চীন ও ভারত নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অটুট রেখে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিকীকরণে সফলতা লাভ করেছে। এভাবে অনেক সভ্যতা পৃথিবীতে শক্তিশালী হচ্ছে এবং পৃথিবীর রাজনীতি বহু পাক্ষিক ও বহু সভ্যতাভিত্তিক চরিত্র ধারণ করেছে।

খ. **ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন :** ঐতিহাসিকভাবেই ক্ষমতার ভারসাম্য বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। এই সময় ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে নিম্নলিখিত কারণে :
– এশীয় সভ্যতাসমূহের ক্ষমতাবৃদ্ধি;
– ইসলামিক সভ্যতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

গ. **বিকাশমান সভ্যতাভিত্তিক পৃথিবী :** ভবিষ্যতে পৃথিবী সভ্যতাভিত্তিক চরিত্র ধারণ করবে এবং কতগুলো দেশের সমন্বয়ে এক একটি সভ্যতা তৈরি হবে। এ ক্ষেত্রে European Union, AFTA, NAFTA, ASEAN ইত্যাদি আঞ্চলিক সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঘ. **পাশ্চাত্য বনাম অন্যান্য সভ্যতা :** স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় পাশ্চাত্য চিন্তায়ও পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্যের জনগণের ধারণা হলো West is the universal, West is the best. অথচ এই ধারণা অন্যান্য সভ্যতার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

ঙ. **পাশ্চাত্যের অস্তিত্ব :** পাশ্চাত্য জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করছে কিভাবে আমেরিকানরা তাদের পাশ্চাত্য রূপকে প্রকাশ করে। তবে এটি বাস্তবতা যে, পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্য তবে সর্বজনীন নয়।

Huntington মনে করেন স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার এই পরিবর্তনের কারণে বিকাশমান পাশ্চাত্য বনাম ইসলামিক ও চীনা সভ্যতার মধ্যে সংঘাত অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এর লক্ষণ হিসেবে তিনি নিম্নলিখিত ইস্যুগুলো তুলে ধরেন :

- চীনের জিডিপি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- চীনা ও ইসলামিক সভ্যতা উভয়েই তাদের সামরিক খরচ বৃদ্ধি করছে;
- চীন কর্তৃক আবিষ্কৃত যুদ্ধাস্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামিক দেশগুলো ক্রয় করে;
- প্রযুক্তিগতভাবেও চীন অনেক উন্নত;
- চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও শক্তিশালী এবং
- ইসলামিক ও চীনা সভ্যতার মধ্যকার সম্পর্কও অত্যন্ত মধুর।

এভাবে শক্তিশালী চীনা সভ্যতার সাথে শক্তিশালী ইসলামিক সভ্যতার সমন্বয়ে এমন এক শক্তি তৈরি হবে, যা পাশ্চাত্য শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করবে। এই হলো সংক্ষিপ্ত কথায় Huntington-এর থিসিসের মূল বক্তব্য।

মূল্যায়ন : হান্টিংটনের থিসিসকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যায়। নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত ইস্যুগুলো ব্যাখ্যা করতে হয় :

১. **পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া :** হান্টিংটনের ধারণা হলো পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে স্তিমিত হচ্ছে। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, মিডিয়া, আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কারণে পাশ্চাত্যকরণ আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

২. **ক্ষমতার ভারসাম্য :** ক্ষমতার ভারসাম্যে কোনো পরিবর্তন আসছে না। পাশ্চাত্য দেশগুলোই ধনী আর প্রাচ্যের দেশগুলো দরিদ্র এবং এই ধনী-দরিদ্র্যের তফাৎ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পাশ্চাত্যই প্রাচ্যকে শাসন করবে।

৩. **ধর্ম :** ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ধর্ম সর্বদাই সংঘাতের বিষয় ছিল না। যেমন ভারতে বহু শতাব্দী ধরে হিন্দু-মুসলিম জনগণ বসবাস করছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে তাদের মধ্যে প্রধান কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেখা যায়নি।

৪. **সুপ্ত শত্রু :** হান্টিংটন ইসলামিক সভ্যতাকে সুপ্ত শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ ইসলামিক দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং পাশ্চাত্যের সাথেই তাদের সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক।

৫. **মৌলবাদ :** মৌলবাদের উত্থান সম্পর্কিত প্রপাগান্ডা এবং ইসলামিক দেশগুলোকে মৌলবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা হান্টিংটনের এই থিসিসকে দুর্বল করেছে।

৬. **সম্ভাব্য শত্রু :** হান্টিংটন ইসলামকে সম্ভাব্য শত্রু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইসলামিক দেশগুলো পাশ্চাত্যের দেশসমূহের তুলনায় সমরাস্ত্র, সামরিক বাহিনী, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতি ইত্যাদি সবদিক থেকেই দুর্বল।

Huntington-এর থিসিসের অন্যান্য দুর্বল দিকগুলো হলো :

– তিনি পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক সংকটকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন;

– ইসলামিক সভ্যতার মধ্যে ইরান বনাম ভারতীয় সম্পর্ককে অনুধাবন করেননি।

– ধর্ম ছাড়াও জাতিসত্তাভিত্তিক সংঘাত যে পৃথিবীর জন্য একটা মহাবিপর্যয় তা তিনি গুরুত্ব দেননি।

– খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাও তিনি উপেক্ষা করেছেন।

সুতরাং Huntington-এর থিসিস 'The Clash of Civilizations' তার যথাযথ গুরুত্ব হারিয়েছে।

ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ : হান্টিংটনের থিসেসের উপরোল্লিখিত সমস্যা সত্ত্বেও থিসিসটিকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

প্রথমত, রাষ্ট্র বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের মূল অভিনেতা হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও সে তাকে সভ্যতায় সমর্পণ করবে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালনের জন্য।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যের সদয় আধিপত্য (benign hegemony) অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের সমন্বয়ে বৃহৎ সভ্যতা হিসেবে বিকাশ লাভ করতে সাহায্য করবে।

থিসিসের প্রয়োগ : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হান্টিংটনের এই থিসিস এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের হাওয়া পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিকেই আন্দোলিত করেছে। এই থিসিসের প্রয়োগ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে লক্ষ্য করা যায় :

১. **Nip in the bud নীতি :** হান্টিংটনের এই থিসিসের কারণেই আমেরিকা 'nip in the bud' নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে অঙ্কুরে ধ্বংস করা।

২. **সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ :** সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ হলো এই থিথিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ। আমেরিকা পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আশ্রয় ও প্রশ্রয়দানের তথাকথিত অভিযোগ তুলে দেশগুলোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু করেছে। এভাবে আমেরিকার আগ্রাসী মনোভাবের কারণে মুসলিম দেশগুলোর অস্তিত্ব আজ সঙ্কটের মুখোমুখি, যা এই থিসিসের প্রয়োগ।

৩. **শয়তানের অক্ষশক্তি ঘোষণা :** আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে শয়তানের অক্ষশক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন, হান্টিংটনের থিসিসই বুশ প্রশাসনকে এ ধরনের ঘোষণা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৪. **ইরাক যুদ্ধ :** ইরাক যুদ্ধকেও হান্টিংটনের থিসিসের ফলাফল বলা যায়। পৃথিবীর এই প্রাচীন জনপথটিও পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে দখলদারিত্বের অবসান ঘটে ১৯ আগস্ট ২০১০ ইরাক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শেষ কমব্যাট বাহিনীর বিদায়ে এবং খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি প্রচার করা শুরু করে।

৫. **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন :** পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শক্তিশালী সংস্কৃতিগুলোও নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। ভারত বলিউডের মাধ্যমে এবং যুক্তরাষ্ট্র সিএনএন এবং হলিউডের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং ছোট ছোট সংস্কৃতিগুলোকে গ্রাস করছে।

৬. **ধর্মযুদ্ধ :** এই থিসিস ধর্মযুদ্ধকেও উৎসাহিত করছে। ইরাক যুদ্ধের প্রাক্কালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ এ যুদ্ধকে ক্রুসেড হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

আমরা একটি নতুন বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে যাচ্ছি এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। তবে এ কথা হলফ করে বলা যাবে না যে, আমরা এমন এক বিশ্বে পদার্পণ করতে যাচ্ছি যেখানে সভ্যতার আদেশই চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ বলে প্রতিফলিত হবে। সভ্যতা ও সভ্যতাসমূহের যথার্থতা বিদ্যমান থাকবে এ কথা সত্য। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, সভ্যতাসমূহ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না। বরং রাষ্ট্রই সভ্যতাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া রাষ্ট্র নিজেও তার রক্তের বন্ধনকে ছিন্ন করে যখন তা সে প্রয়োজন মনে করে। তাই সভ্যতা তার নিজের উপাদানসমূহের স্বার্থ কতটুকু রক্ষা করতে পারে তার উপরই নির্ভর করে সভ্যতার অস্তিত্ব ও শক্তি। আর এই জন্যই সভ্যতাসমূহের সংঘাত কথাটিও একটি অমীমাংসিত বিষয় হিসেবে রয়ে গেল। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই থিসিসের প্রয়োগ পূর্বে আলোচনা করা হলেও এর যথার্থতা প্রমাণ করা অসম্ভব। তবে সভ্যতা ও সভ্যতাসমূহের মধ্যকার সংঘাত নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ যে একটি সংঘাতকে অনিবার্য করে তুলবে এটি নিশ্চিত করে বলা যায়।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩ । ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝেন?
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতি সাধন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেহেতু সহযোগিতা ও সংঘর্ষ উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সেহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন বর্তমান জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাধ্যমে জানা যায় কিভাবে বিভিন্ন জাতি ও তার সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ফলে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির আন্তর্জাতিক আচরণ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতি সাধন সম্ভব।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ইংরেজিতে বলা হয় 'International relations'. 'International' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় জেরেমি বেন্থামের লেখায়। জেরেমি বেন্থাম International jurisprudence-এর কথা বলতে গিয়ে, 'international' শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে 'International' শব্দটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কারণে ও প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি পরস্পরের কাছাকাছি আসে ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এর ফলে এদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের সম্বন্ধ ও সম্পর্ক। এ সম্পর্কের পরিধি ক্রমশ ব্যাপক হলেও এর মূলে রয়েছে পরস্পর নির্ভরশীলতা।

এ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক কুইন্সি রাইট বলেন, 'International relations is concerned with the study of the behaviour of groups of major importance in the life of the world'. অর্থাৎ, বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত।

Richard Snyder এবং তার সহযোগীদের মতে, 'It is one of our basic methodological choices to define, the state as its official policy makers.' অর্থাৎ রাষ্ট্রকে আমরা তার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণেতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারি।

কিন্তু অধ্যাপক পামার ও পারকিন্স আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো স্থির সংজ্ঞা প্রদান করতে আগ্রহী নন। তাদের মতে, 'The study of international relations, like the world community itself, is in transition.' অর্থাৎ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নও পরিবর্তনশীল।

তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় আদি এইচ ডকটরের সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন, 'The study of international relations is mainly concerned with the study of actions, reactions and interactions among certain entities, usually national states'. অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা বিশ্লেষণে Stanley Haffmann-এর সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'যেসব উপাদান এবং কার্যকলাপ বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু

সাধারণত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। তবে ক্রিয়া বলতে এখানে যে কোনো রাষ্ট্রের কার্যাবলীকেই বোঝায় যা অন্য রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আর অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া হলো প্রথম রাষ্ট্রের গৃহীত কার্যাবলীর জবাবে দ্বিতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায় তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি প্রথমত প্রথম রাষ্ট্রটিকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলবে। যদি প্রথম রাষ্ট্রটি সৈন্য সরিয়ে না নেয় তাহলে দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি প্রথম রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখার উদ্যোগ নিতে পারে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তাদের মতে, বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে এমন সকল উপাদান ও কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান; যেমন— জাতিসংঘ, আরব লীগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করে।

ইতিহাস বলতে আমরা যেমন বাস্তব ঘটনা ও ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ উভয়কে বুঝে থাকি তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আমরা একে বিষয় ও বিষয়বস্তু উভয় অর্থে বুঝি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। যেসব ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমাজজীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারে সেগুলোই শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলোকে 'As Aspect of Social Reality' বলা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা এসব ঘটনা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেহেতু মানুষের আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে সেহেতু অনেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সমাজবিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত মনে করেছেন। তারা মনে করেন সংঘর্ষ ও সহযোগিতাকে বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়ে সমাজের বিকাশের নানা দিকগুলোকে কিভাবে উন্মোচন করা যায় তার আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কও সমগ্র সমাজের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

শক্তিসাম্য স্থাপন বা যুদ্ধ এড়ানোর জন্য বিশ্বের নানা রাষ্ট্র যে প্রচেষ্টা চালায় তাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে যেসব সংস্থা বা সংগঠন গড়ে উঠেছে সেগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করে থাকে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতিগত গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পটভূমি, ধর্ম ও মতাদর্শ আদৌ এক নয়। আর এসব পার্থক্য হেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নানারকম হয়ে থাকে। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এসব পার্থক্য নিয়েও বিশদ আলোচনা করতে হয়।

হফম্যান ও বার্টনসহ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিজ্ঞান পদবাচ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বার্টনের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হিসেবে এর কাজ হলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। বার্টনের ভাষায়, 'International relations can merely suggest that it certain events take place, certain results are likely to follow, that certain policies are likely to produce certain consequences, it can state alternative goals, but their selection is a matter of policy.'

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদান অধ্যয়ন আবশ্যক। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নত করে সংঘর্ষ হ্রাস এবং সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করার জন্যও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। নিচে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, কল্যাণকামী মানুষের লক্ষ্য হলো উন্নতমানের বিশ্ব, বিশ্ব পরিস্থিতি ও পরিবেশ গড়ে তোলা। তবে এ লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্র, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাজ ও আচরণ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ আবশ্যক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সে জ্ঞানলাভে আমাদেরকে সাহায্য করে। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষেরা শান্তি-সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী কিন্তু এগুলো অর্জনের পথেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করে বিধায় আমাদেরকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করা দরকার।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। অথচ সার্বভৌমত্ব ছাড়া জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব বজায় রেখে কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক সমাজকে সমৃদ্ধ করতে হলে আন্তর্জাতিক সমাজের গঠন, চরিত্র ও কাজকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হওয়া জরুরি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নের মাধ্যমেই এ সচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব।

পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে এ সংঘাত প্রশমন করা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়ন করা জরুরি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি বহুল পঠিত ও ব্যাপক বিস্তৃত বিষয় হিসেবে এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বিশ্বের সকল উপাদানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং বিশ্বসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কখনও উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা চায় না। শান্তির পরিমণ্ডল তৈরি করা ও একে সযত্নে রক্ষা করার জন্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এটি চর্চার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

০৪ । ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝেন?
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে পরস্পর পরিবর্তনশীল বলে মনে করলেও সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিভাষা দুটিকে পৃথককরণের প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধ্যানধারণা বিরাজমান থাকলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্বতন্ত্র 'discipline' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উভয়ের পরিধির বিষয়ে তাত্ত্বিকগণ এখনও ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম না হলেও Morgantheau মনে করেন, 'The core of international relations is international politics.' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মর্মবস্তু হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতি। তবে সাধারণত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আন্তর্জাতিক কৌশল ইত্যাদি বিষয়গুলো একইসাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি উভয়েরই পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ইংরেজিতে বলা হয় 'International relations'. 'International' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় জেরেমি বেন্থামের লেখায়। জেরেমি বেন্থাম International jurisprudence-এর কথা বলতে গিয়ে, 'International' শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে 'International' শব্দটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কারণে ও প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি পরস্পরের কাছাকাছি আসে ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এর ফলে এদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের সম্বন্ধ ও সম্পর্ক। এ সম্পর্কের পরিধি ক্রমশ ব্যাপক হলেও এর মূলে রয়েছে পরস্পর নির্ভরশীলতা। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, একটি রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার পক্ষে নিঃসঙ্গবাদ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। চলার পথে কোনো না কোনো সময় তাকে অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছাকাছি আসতে হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তবে প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে আরও নির্ভরশীল করে তুলেছে।

এ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক কুইন্সি রাইট বলেন, International relations is concerned with the study of the behaviour of groups of major importance in the life of the world.' অর্থাৎ, বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত।

Richard Snyder এবং তার সহযোগীদের মতে, 'It is one of our basic methodological choices to define, the state as its official policy makers.' অর্থাৎ রাষ্ট্রকে আমরা তার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণেতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারি।

কিন্তু অধ্যাপক পালমার ও পারকিন্স আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো স্থির সংজ্ঞা প্রদান করতে আগ্রহী নন। তাদের মতে, 'The study of international relations, like the world community itself, is in transition.' অর্থাৎ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নও পরিবর্তনশীল।

তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় আদি এইচ ডকটরের সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন, 'The study of international relations is mainly concerned with the study of actions, reactions and interactions among certain entities, usually national states.' অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা বিশ্লেষণে Stanley Haffmann-এর সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'যেসব উপাদান এবং কার্যকলাপ বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য

আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন থেকে বিকশিত হলেও বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। আর তাই অনেক উৎসাহী তাত্ত্বিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে বিশেষভাবে পৃথক করে আলোচনা করতে আগ্রহ বোধ করেন। তবে এখনো অনেক পণ্ডিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে পরস্পর পরিবর্তনশীল বলে মনে করে থাকেন। নিচে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো :

প্রথমত, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সঙ্কীর্ণ অর্থে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক এককের সম্পর্ক এবং কূটনীতিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্ব সমাজের বিভিন্ন জনগণ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সব ধরনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক পালমার ও পারকিন্সও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের রেখা টেনেছেন। তাদের মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক একক হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়। অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের পরিধিটা আদৌ ব্যাপক নয়। তাই শ্লেচার বলেন, 'Many writers who equate international relations with international politics do not define their terms usually. They usually regard politics as a form of inter-group struggle or even as a struggle for power.'

তাই একটু ভিন্নভাবে বললে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে রাজনীতির প্রাধান্যটাই বেশি। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তা শুধু রাজনীতিকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সম্পর্কও বিদ্যমান রয়েছে। তাই পালমার ও পারকিন্সের অভিমত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পালমার ও পারকিন্স বলেন, 'Whereas international relations is a term properly embracing the totally of the relations among peoples and groups in the world society and the forces, pressures and processes which determine the way men love and act and think... the international relation is a broader term than international politics.'

তৃতীয়ত, অনেক লেখক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কথাটি বলতে বেশি উৎসাহী। তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হলেন Morgantheau। তার মতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়লাভ করা অথবা নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার প্রবণতা বা

আকাঙ্ক্ষা বেশি। Morgantheau আরও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ রাজনৈতিক নয় অথবা সবসময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত তাও বলা যায় না। তবে সব রাষ্ট্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য রাজনীতি। তিনি বলেন, 'International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim.'

চতুর্থত, অনেকের মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যকার সরকারি রাজনৈতিক সম্পর্ককে বোঝায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের সম্পর্কই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পঞ্চমত, আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান তাত্ত্বিক K. J. Holsti-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হলো সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সংঘটিত বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যকার সব সম্পর্কই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। অন্যদিকে তার মতে, Only the political interaction between states which is sponsored by government is international politics.'

মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকেই স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিকাশ। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর জটিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতির বিশেষ গুরুত্ব সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে পৃথক করে আলোচনা করতে আগ্রহী। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা অবশ্যই রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্ব সমাজের বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবং তার সদস্যদের মধ্যকার সব সম্পর্ককেই অন্তর্ভুক্ত করে।

০৫। ক. আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি?
খ. আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতি রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করে। এ আলোচনায় জাতি রাষ্ট্রের উর্ধ্বে অবস্থিত কর্তৃত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন ও সার্বভৌম। আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অপর রাষ্ট্রের ওপর কোনো না কোনো বিষয়ে নির্ভরশীল। এভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের দরকার অন্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা। আর এ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে যে নীতি গ্রহণ করা হয় তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি। এখানে একটি কথা অনস্বীকার্য যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব কোনো কালেই মঙ্গলজনক নয়। অপরদিকে, রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহনশীল মনোভাব তাদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাসের নিশ্চয়তা দিবে এবং এভাবেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি

অনেক বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথাটি বলতে বেশি উৎসাহী। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন Morgantheau। তার মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়লাভ করা অথবা নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষা বেশি। Morgantheau আরও বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ রাজনৈতিক নয় অথবা সবসময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত তাও বলা যায় না। তবে সব রাষ্ট্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য রাজনীতি। তিনি বলেন, 'International politics, like all politics, is a struggle for power.

Whatever the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim.' অনেকে মনে করেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ককে বোঝায়। K J Holsti-এর মতে, 'The political interaction between states which is sponsored by government is international politics.'

আন্তর্জাতিক রাজনীতি সঙ্কীর্ণ অর্থে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক এককের সম্পর্ক এবং কূটনীতিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। অনেক আন্তর্জতিক বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য টেনেছেন। তবে এখনো অনেক পণ্ডিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে পরস্পর পরিবর্তনশীল বলে মনে করেন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনেকটা সম্পর্কযুক্ত।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদান

আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় অনেকগুলো উপাদান দ্বারা। এদের মধ্যে কতকগুলো তুলনামূলকভাবে স্থায়ী আর বাকিগুলো প্রায়ই পরিবর্তনশীল। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে এর প্রত্যেকটিই কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলো হলো :

১. **ভৌগোলিক অবস্থান :** আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। Morgantheau যথার্থই বলেছেন, 'The most stable factor upon which the power of a nation depends is obiously geography.' (ভূগোল সবচেয়ে স্থায়ী উপাদান, যার ওপর কোনো দেশের শক্তি নির্ভর করে)। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিকল্পে আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র জাতিসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। ভৌগোলিক অবস্থান আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ থেকে চতুর্দিক দিয়ে কয়েক হাজার মাইল পানিবেষ্টিত বলে তার শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ অন্যান্য বৃহৎ শক্তি তাদের অতি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ইংল্যান্ডের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন অথবা হিটলার বার বার চেষ্টা করেও ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করতে পারেনি। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে দেশটিকে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। দারদানেলিস ও বসফরাস পার হয়ে ভূমধ্যসাগরে ও আধিপত্য বিস্তারে তার এ প্রচেষ্টা 'Worm-Water Outlet Policy' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের আয়তন, আকৃতি, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। স্বভাবতই বৃহৎ আয়তনের দেশ অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

২. **প্রাকৃতিক সম্পদ :** প্রাকৃতিক সম্পদ আরেকটি উপাদান, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরই কোনো দেশের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিঙ্কন বলেছেন, 'একটি দেশের শক্তি-সামর্থ্য প্রধানত তার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখল অথবা অভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।' প্রাকৃতিক সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা : ক. খাদ্য ও খ. কাঁচামাল।

ক. **খাদ্য :** সাধারণত যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে দেশ খাদ্য ঘাটতি আছে দেশের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে। তাই দেখা যায়, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে অধিকতর বাড়াতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশ আজ খাদ্যে স্বনির্ভর না হওয়ার দরুন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অনেক দুর্বলতা দেখা যায়।

খ. **কাঁচামাল :** আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে যেমন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল, যা শিল্প উৎপাদনে ও দেশের সমৃদ্ধি আনয়নে সাহায্য করতে পারে। শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়ের জন্যই শিল্পকারখানার উৎপাদনের ওপর কোনো দেশের শক্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কয়লা ও লৌহ ব্যবহারের ওপরই কোনো দেশের শান্তিকালীন সমৃদ্ধি ও যুদ্ধকালীন ক্ষমতা নির্ভর করতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর খনিজ তেলের গুরুত্ব বেড়ে যায়, তখন তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত। এছাড়া আধুনিক পারমাণবিক ক্ষমতা ও মহাশূন্য বিজয়ের যুগে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কাজে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয় বলে ঐ ধাতুর অর্থনৈতিক এবং সামরিক মূল্য বেড়ে গেছে। সেই সাথে শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ঐ দেশগুলোর, যে দেশগুলোতে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়।

৩. **শিল্প সামর্থ্য :** কোনো দেশ যদি শক্তির উচ্চ সিঁড়িতে আরোহণ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই শিল্প ও কারিগরি বিদ্যায় উন্নতি সাধন করতে হবে। ইতিহাসও এ সাক্ষ্য দেয় যে, যতদিন পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন একটি শিল্পোন্নত জাতি হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ততদিন পর্যন্ত সে ছিল সমগ্র বিশ্বে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলেও দেখা যায়, ১৮৭০ সালের পর জার্মানি যখন শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে তখন থেকেই সে ফ্রান্সের তুলনায় অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে চীনের শিল্পোৎকর্ষ বিশ্বমোড়লদের ভাবনাতাড়িত করছে। অপরদিকে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ইউরেনিয়ামের মতো মূল্যবান খনিজসম্পদ থাকার পরও তা কাজে লাগাতে না পারায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার কোনো গুরুত্ব নেই।

৪. **সামরিক শক্তি :** একটি জাতির ভৌগোলিক অবস্থান প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প সামর্থ্য প্রভৃতি উপাদান বাদে, যার মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রে তার জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে, তা হলো তার উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি। বস্তুত আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরতা ব্যাপারটি এত সুস্পষ্ট যে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। Morgantheau-এর মতে, সামরিক প্রস্তুতির জন্য দরকার এমন একটি সামরিক সংগঠন, যা পররাষ্ট্রনীতিকে সহায়তা করতে সক্ষম। সামরিক শক্তি নির্ভর করে একটি দেশের প্রযুক্তিবিদ্যা, নেতৃত্ব ও সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতার ওপর। সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নের জন্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে। এর কারণ হলো সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখা যাতে যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হলে জয়লাভ করা যায়। এছাড়াও উন্নতমানের আধুনিক সমরাস্ত্র যুদ্ধ ব্যতিরেকেই শুধু ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম।

৫. **জনসংখ্যা :** সাধারণভাবে বললে যে দেশ জনবহুল, সে দেশই শক্তিশালী। তবে জনসংখ্যা মানবসম্পদে পরিণত না করতে পারলে তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, একমাত্র উন্নত দেশগুলোর জন্য বিপুল জনসংখ্যা শক্তির উৎস, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোর জন্য বিপুল জনসংখ্যা শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে

অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার জনসংখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করলে শক্তির সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রায় ৭৭ লাখ বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে গঠিত অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৩৬ লাখ এবং প্রায় ১ কোটি বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে গঠিত কানাডার জনসংখ্যা ৩ কোটি ৫৫ লাখ। এ দুই-এর মাঝামাঝি ৯৬ লাখ বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৩২ কোটি ২৬ লাখ। তাই এটা নিশ্চিত যে, উক্ত দুটি দেশের মতো জনসংখ্যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কখনো বিশ্বের বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারত না। অন্যদিকে, প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যা থাকার দরুন অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা অন্যান্য সম্পদে ধনী হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়নি। তবে জনসংখ্যার গুণগত মান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. **জাতীয় চরিত্র ও মনোবল :** কোনো দেশের চরিত্র ও মনোবলের ওপরও সে দেশের শক্তি অনেকটা নির্ভর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও ইংরেজদের জাতীয় মনোবলের দরুন ইংল্যান্ড অনেকটা অবিচলিত থাকে। অন্যদিকে, ফরাসিদের জাতীয় মনোবলের অভাবে আগেই হিটলার বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পরও অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে জার্মানি যে আবার শক্তিশালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে জার্মানদের জাতীয় চরিত্র। কোনো দেশের জনগণ জাতীয় চরিত্রের অধিকারী না হলে, অর্থাৎ একই মনোভাবাপন্ন ও উন্নয়নশীল না হলে, সে দেশ উন্নতি করতে পারে না।

৭. **সরকারের দক্ষতা :** কোনো দেশের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে সে দেশের সরকারের কর্মকাণ্ডের ওপর। সরকারের নীতি যদি এমন হয়, যার ফলে সে দেশের জনগণ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সে দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। কেননা কোনো বিপদকালীন সময়ে জনগণ তাদের সরকারকে সমর্থন দেবে না।

৮. **কূটনৈতিক নৈপুণ্য :** কূটনৈতিক কলা-কৌশল একটি দেশের জাতীয় শক্তিতে নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার মাধ্যমে দেশটিকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে পারে। কার্যকর পররাষ্ট্রনীতির অভাবে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় যুক্তরাষ্ট্র একটি সম্ভাবনাময় মহাশক্তি হয়েও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জার্মানি একদা বিসমার্কের (Prince Otto Von Bismarck) কূটনীতির মাধ্যমে ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎশক্তিকে পরাজিত করে নিজেকে এক মহাশক্তিতে পরিণত করে। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জার্মান যে এক মহাশক্তির মর্যাদায় আসীন হয়, তা তার উজ্জ্বল কূটনীতির জন্যই। পাকিস্তানও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এ উপমহাদেশে কোনো উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর উন্নতমানের কূটনীতি পাকিস্তানকে উপমহাদেশে একটি শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে সাহায্য করে।

৯. **ক্রীড়াতত্ত্ব :** এক শ্রেণীর আর্থ-সমাজবিদ মনে করেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিও এক ধরনের ক্রীড়াবিশেষ এবং এসব ক্ষেত্রেও সাফল্য নির্ভর করে নিজের শক্তি, সামার্থ্য, টেকনিক, স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদির সঠিক উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য, টেকনিক ও স্ট্রাটেজির যথার্থ মুল্যায়ন এবং এই তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার ওপর।

১০. **সংস্কৃতি :** প্রত্যেকটি সমাজেই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রয়েছে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ সে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির একটি অংশ হচ্ছে দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা এবং লোকাচার। প্রতিটি সমাজে এগুলো আলাদা। মানুষের জীবনকে এগুলো প্রভাবিত করে। যেমন— যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ উন্নত রাষ্ট্রগুলোর বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, তা অনেকটা তাদের উন্নত সংস্কৃতির কারণে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাদের সংস্কৃতি অধিগ্রহণের ফলে এসব দেশের ওপর তারা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

কোনো দেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শক্তির প্রয়োজন। শক্তি ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্র তার অনুসৃত নীতিকে বাস্তবায়িত করে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দরকার কোনো জাতির সার্বিক বল, যা সে জাতির পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যাবলীকে বাস্তবে রূপায়িত করে কাজে লাগাতে পারে।

০৬। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে বিরাজ করছে একমেরুকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবাধ সাম্রাজ্য বিস্তারের যে সুযোগ করে দিয়েছে তার প্রমাণ মিলে স্বাধীন সার্বভৌম ইরাকে মার্কিনিদের হামলার মাধ্যমে। অন্যদিকে বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতার নিয়ম-কানুন, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও আইন সবকিছুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মার্কিন সমর্থনে ইসরাইল বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ফিলিস্তিনে তার দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে। ইরান ও উত্তর কোরিয়ার ওপর একের পর এক হুমকি, অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চলেছে। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাকে লংঘন করে তালেবান দমনের নামে নিরীহ ও সাধারণ জনগণের উপর বোমা নিক্ষেপ করছে; মুসলিম বিশ্ব নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। মুসলমানদের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য ও চিত্র প্রকাশ করছে। এরূপ অস্থিতিশীল পরিবেশে তাই প্রশ্ন উঠেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্ভাব্য যে ঘটনাগুলো ঘটতে পারে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দীর্ঘায়িতকরণ :** নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে যে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি হয়েছে ভবিষ্যতে তা আরও দীর্ঘায়িত হবে। একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ করেছিল। তাই বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য বিশ্বে আরও কিছুদিন বজায় থাকবে।

২. **সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মেরুকরণ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র দেশ ব্রিটেন ও স্পেনের সহযোগিতা নিয়ে যেমন ইরাকে আক্রমণ করেছে তেমনি নিরাপত্তা পরিষদের অপর সদস্য দেশ ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়া এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। ফলে প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদ ইরাক যুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে সরাসরি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের তৎকালীন ১৯২টি দেশের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন জোট মাত্র ৫০টি দেশের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল। বাকি ১৪২টি দেশ ইরাক আক্রমণের বিপক্ষে ছিল। ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জার্মানির নেতৃত্বে একটি নতুন জোট আবির্ভূত হয়, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য খর্ব করে। অনুরূপভাবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ইস্যু নিয়েও বর্তমান বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

৩. **বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী মনোভাব তীব্র হবে :** ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ শুরু করলে খোদ ব্রিটেন, আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। আর এর ফলেই দেখা যায় ৪ নভেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বুশ সমর্থিত রিপাবলিকান পার্টির বিপুল পরাজয় ঘটে। শুধু তাই নয়, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৮ ঘটে বুশকে লক্ষ্য করে এক ইরাকি সাংবাদিকের জুতা নিক্ষেপের মতো ঘটনা। প্রতি বছরের ২০ মার্চ ইরাক আক্রমণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইরাক আক্রমণকারী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ছাড়াও এ যুদ্ধের সমর্থক দেশ অস্ট্রেলিয়া ও স্পেনের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী স্লোগান, ব্যানার, ফেস্টুনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় ইরাকের ওপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর আক্রমণ ছিল অবৈধ। দিন দিন বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী জনমত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আবারও বিশ্ব জনমত উপক্ষো করে ইরানে হামলা চালায় তবে তার জন্য চরম খেসারত গুণতে হবে মার্কিন তথা ওবামা প্রশাসনকে। কেননা বিশ্ববাসী সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর তাণ্ডব এখনও প্রত্যক্ষ করছে। তাছাড়া মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সংহতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. **দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে :** বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসী নীতির কারণে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ বিশ্বের ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় প্রভাবিত হয়েছে যে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনেকটাই দুর্বল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। জাতিসংঘের বর্তমান ভূমিকায় বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন নীতির বিরোধী অনেক দল আছে যারা মনে করে যে কোনো সময় যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর হামলা করতে পারে। যেমন : ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি। আবার বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশ আছে যারা আমেরিকার ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছে না। এমনকি মার্কিন স্বার্থ বিরোধী কাজ করা একরকম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া যেসব ছোট রাষ্ট্রের সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে সেসব দেশ এখন জাতীয় বাজেটে কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে ব্যয় কমিয়ে দিয়ে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করছে। এর ফলে দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়বে।

৫. **মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকট হবে :** মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত ইরাক, ইরান, কুয়েত ও সৌদি আরবে রয়েছে বিশাল তেলের ভাণ্ডার। আমেরিকা যদি মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নেয় তবে সকল তেল কোম্পানি আমেরিকার স্বার্থের অনুকূলে তেল উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা মেনে চলবে। ফলে বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যা দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করবে। তবে এটি কখনোই হতে দিবে না ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো। কেননা মধ্যপ্রাচ্যে তাদেরও স্বার্থ রয়েছে। এ কারণেই ইরাক যুদ্ধের সময়ে শুধু ব্রিটেন ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত সকল দেশ আক্রমণের বিপক্ষে ছিল এবং ভবিষ্যৎ ইরান আক্রমণের প্রশ্ন উঠলেও তারা বিপক্ষে থাকবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইউএসএ এবং ইইউ-এর মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দিবে।

৬. **জাতিসংঘের গুরুত্ব কমে যাবে :** জাতিসংঘের ভূমিকা দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। কেননা জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করেছিল। ইসরাইল ফিলিস্তিনে

আক্রমণ করেছে। আবার হয়তো যুক্তরাষ্ট্র ইরানেও আক্রমণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন কাঠামোর ত্রুটির কারণে অনেক অন্যায় করেও বৃহৎ শক্তিগুলো পার পেয়ে যাচ্ছে। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনাও সম্ভব হয়নি। যেমন ইসরাইল বার বার ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালালেও শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে নিন্দা প্রস্তাবও গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আবার ইরাকে হামলাও থামাতে পারেনি। ইরানের ওপর সম্ভাব্য হামলা রোধ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই এখন বিশ্ব জনমত জাতিসংঘের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্ববাসী এখন মনে করে জাতিসংঘ এখন আমেরিকার হাতের পুতুল এবং মার্কিনিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই কাজ করে যাচ্ছে। তাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের সচেতন দেশগুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় জাতিসংঘের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

৭. **পরাশক্তির প্রভাব বেড়ে যাবে :** বর্তমান বিশ্বে যে পেশীশক্তি নির্ভর রাজনীতি শুরু হয়েছে তাতে পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সংখ্যা বেড়ে যাবে। জাতিসংঘকে পাশ কাটানোর যে সংস্কৃতি যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে তা অন্যান্য পরাশক্তির মধ্যে সংক্রমিত হলে বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে পড়বে। ক্ষমতার রাজনীতির ফলে অনেক দেশই পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে চাইছে। যেমন– ইরান, উত্তর কোরিয়া মনে করে ইরাক দখলের পর যে কোনো সময় তাদের মার্কিন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হবে। তাই দেশ দুটি পারমাণবিক শক্তি অর্জনে বদ্ধপরিকর। এ প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া বৈ কমবে না।

৮. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অনীহা বেড়ে যাবে :** বর্তমান বিশ্বে একমাত্র গণতন্ত্রই বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা যেমন ব্যাহত হয়েছে তেমনি গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা হয়েছে প্রসারিত। গণতন্ত্রকেই বিবেচনা করা হয়েছে জনকল্যাণে নিবেদিত এবং সর্বজন গ্রহণীয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে। আর এ গণতন্ত্রের অন্যতম মডেল হিসেবে বিশ্ববাসী এতদিন জেনেছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের নাম। কিন্তু গণতন্ত্রের লেবাসধারী উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলো তাদের আগ্রাসী চরিত্রের নগ্ন উন্মোচন ঘটিয়ে কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে বিতর্কিত করে ফেলেছে।

ফলে সমাজতন্ত্রসহ কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার অন্যান্য বিকল্পের প্রতি বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষিত হবে বলে আমাদের মনে হয়। এর প্রমাণও মিলছে। বিভিন্ন দেশের শাসন ক্ষমতায় বর্তমানে জয়লাভ করছে উদারপন্থিদের পরিবর্তে কট্টরপন্থীরা, যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী না হলেও সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। যেমন— ইরান, ফিলিস্তিন ইত্যাদি। কারণ এসব দেশের জনগণ নিজেদের অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র অবশ্যই একটি জনকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থা হলেও এর আদর্শের তথা কথিত চর্চাকারীদের কুকর্মের কারণে গণতন্ত্রের প্রসার ও অগ্রযাত্রার যে ক্ষতি হলো তার প্রভাব আগামী দশকে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপর পরিলক্ষিত হবে এবং বর্তমান ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো যদি এ লেবাস পরিবর্তন না করে তবে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়বে।

৯. **মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে :** ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার হামলা পরবর্তী সময়ে আমেরিকার সন্দেহভাজন দেশগুলোর তালিকায় ব্যতিক্রমভাবে দু একটি দেশ বাদ দিলে প্রায় সব মুসলিম দেশকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, লাদেন এবং আল কায়েদার সাথে সম্পর্ক আছে এ ভয় দেখিয়ে আমেরিকা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে চাপে রেখেছে এবং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। আমেরিকা তার আগ্রাসী শক্তি ব্যবহার করে আজ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে বর্তমানে সিরিয়া ও ইরানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকা বিরোধী মনোভাব দিন দিন আরো প্রবল হচ্ছে, যা ক্রমান্বয়ে বিশ্বজুড়ে আরো লাদেন আরো হামাস, আল কায়েদা জন্ম দিবে বলে মনে করা হয়।

১০. **অস্ত্রের প্রবাহ বেড়ে যাবে :** আগামী দশকে বিশ্বে অস্ত্রের প্রবাহ বেড়ে যাবে বহুগুণে। অনেক দুর্বল রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাছে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয় করবে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং তাইওয়ান। বিগত দু' দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ তিনটি দেশের কাছে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র বিক্রয় করেছে। আবার অনেক দেশের অস্ত্র সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর কাছে চলে যায় এবং প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র সরকার বিরোধী বা প্রতিপক্ষ দলগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা জিইয়ে রাখে। ফলে এর প্রভাব পড়বে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর।

১১. **ওআইসি হুমকির সম্মুখীন হবে :** ফিলিস্তিন ইরাক দখলের পর যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরান সিরিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো দেশে হামলা বা দখল করে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এটি হলে ওআইসি তার স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হবে—এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

আগামী দিনের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা আমেরিকা হাতে নিয়েছে তা প্রতিরোধ করা এখন বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে আমেরিকার শক্তিশালী অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ সাহায্য এবং সহযোগিতা মার্কিন বিরোধী প্রচারণাকে দুর্বল করে দিবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অবশ্য নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেয়ে গণতন্ত্র, কূটনীতি ও উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে ইরানের রকেট প্রযুক্তির সাফল্যের মোকাবিলায় মার্কিন ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করারও প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন। তাই ইতিহাস বলে দিবে আগামীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

০৬ । আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি মডেল হিসেবে আন্তঃসভ্যতা সংলাপের ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি ও মডেল সম্পর্কিত বিতর্ক দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে বিশ্বব্যবস্থায় যখন কোনো অস্থিরতা বিরাজ করে বা কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় তখন এ বিতর্ক নতুনভাবে উত্থিত হয়। আর এরই প্রেক্ষিতে জন্ম হয় নতুন চিন্তার, নতুন তত্ত্বের। এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ ও স্নায়ুযুদ্ধ, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও অস্থির নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রভৃতি যুগে যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন নতুন মডেল বিনির্মাণে কাঁচামাল যুগিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতি ও

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল হান্টিংটন (Samuel Huntington) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে চিত্রকল্প উপস্থাপন করেন তা নতুন শতাব্দীতে বিশ্বকে নতুন পথে পরিচালিত করতে থাকে। তার 'সভ্যতার সংঘাত' (Clash of Civilization) তত্ত্বের প্রভাবে যুদ্ধের মাদকতায় পেয়ে বসে পশ্চিমা মোড়লদের। পশ্চিমের সাথে পূর্বের বিশেষ করে মুসলিম সভ্যতার সম্পর্ক হয়ে উঠে তিক্ততর, একের পর এক মুসলিম দেশ পশ্চিমা দেশগুলোর রোষানলে পড়তে থাকে। এমনি এক ক্রান্তিকালে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক নতুন মডেল উপস্থাপন করেন। তিনি যুদ্ধ ও সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতা, বিশ্বব্যবস্থাকে ভাঙনের পরিবর্তে গড়নের এবং আধিপত্যবাদের পরিবর্তে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে 'সভ্যতাসমূহের সংলাপ' (Civilizational Dialogue)-এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নবতর মডেল উপস্থাপন করেন। তিনি পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের বিপরীতে একটি সমন্বয়বাদী স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মডেল তুলে ধরেন।

প্রথমত, পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে মডেল তৈরি করেন তার অন্যতম দিক হলো সর্বদা নিজের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য বাইরের কোনো বিপরীত শক্তির উপস্থিতি আবিষ্কার করা। অন্যকথায়, নিজের নিরাপত্তার জন্য শত্রুর আবশ্যকতা তাদের সকল মডেলের কেন্দ্রবিন্দু। এ প্রেক্ষিতে 'বাস্তববাদী দার্শনিক (Realist) রবার্ট সিলপিন এবং হান্টিংটনের কথা উল্লেখ করা যায়। তাদের কথা হলো, 'There can be no true friend without true enemy.' তাদের বক্তব্য হলো, 'Unless we hate what we are not, we can not love what we are.' অর্থাৎ আমরা যা না তাকে যদি আমরা ঘৃণা করতে না পারি তাহলে আমরা যা তাকে আমরা ভালোবাসতে পারব না। এ প্রেক্ষিতে Huntington-এর নিজের কথা হলো, 'For peoples seeking identity enemies are essential and the potentially most dangerous enmities occur across the fault lines of words major civilization.'

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের বক্তব্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তারা সবকিছুই পশ্চিমা নীতি, আদর্শ ও ধাঁচে বিশ্লেষণ করেন। বিশেষ করে Huntington তার তত্ত্বে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিবার্য সংঘাতের কথা বলে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন সংস্কৃতি একে অপরকে অস্বীকৃতি দানের ফলে তাদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

Huntington-এর এ তত্ত্বে Intercultural sensitivity কিংবা dialectical fusion process এর বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা বিশ্বায়ন (Globalization), গণতন্ত্র (Democracy) প্রভৃতির নামে সবকিছুই বিভিন্ন দেশ, জাতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য করে উপস্থাপন করেন। তাদের এ সর্বজনীনতাবাদ (Universalism)-এর ধারণায় অন্যান্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্বীকৃতিদানের পরিবর্তে অন্যদের Inferior বলে ধরে নেয়া বা আজ্ঞা করার যে প্রবণতা তা আজ তাদের প্রতি অন্যদের ঘৃণা ও প্রতিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থত, পশ্চিমাদের 'শত্রুকে অঙ্কুরে ধ্বংস' (Nip in the bud) নীতির কারণে বিশ্ব আজ সংঘাতময়।

এমনি একটি প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হয় আন্তঃসভ্যতা সংলাপের ধারণা। এর মৌলিক তাত্ত্বিক দিকগুলো হলো :

প্রথমত, বিশ্ব নাগরিকত্ব (World Citizenship) বা বিশ্ব সংস্কৃতির ধারণা যেমন বাস্তবসম্মত নয় তেমনি অনিবার্য শত্রুতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত ধারণাটিও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং Other relation-এর ধরনটি অনিবার্যভাবে শত্রুতামূলক (adversial) না হয়ে ভালোবাসা, সহানুভূতি,

সমঝোতা আর আলোচনামূলকও হতে পারে। আন্তঃসভ্যতা সংলাপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপস্থিতি এবং পারস্পরিক বিভেদ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিভেদ কমিয়ে এনে সভ্যতাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতা একে অপরের কাছাকাছি এসে অপরের ভালো দিকগুলো অনুধাবন করত তা আত্মীকরণ (Intercultural sensitivity)-এর মাধ্যমে যে কোনো সংঘাত এড়ানো সম্ভব। তবে একতরফা সাংস্কৃতিক সমজাতিকীকরণ (Cultural Homogenization)-এর প্রক্রিয়া সমর্থনীয় নয়।

দ্বিতীয়ত, আন্তঃসভ্যতা সংলাপের ক্ষেত্রে dialectical fusion প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে এক ধরনের মিলন ঘটবে এবং এর মাধ্যমে একটি মধ্যপন্থা বেরিয়ে আসবে।

তৃতীয়ত, সংলাপের ফলে সভ্যতাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অস্বীকৃতি (Rejectionism)-এর যে প্রবণতা তা অনেকাংশে লোপ পাবে। বরং আন্তঃসংস্কৃতি লেনদেন (Inter cultural borrowing)-এর মাধ্যমে প্রতিটি সংস্কৃতিই সমৃদ্ধ হবে।

চতুর্থত, আন্তঃসভ্যতা সংলাপের ধারণাটি friend/enemy dichotomy থেকে জাত অনুমানভিত্তিক হুমকির মোকাবিলার মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ধারণারও বিরোধী। পশ্চিমা সভ্যতা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যেভাবে ইসলামী সভ্যতার বিরুদ্ধে কোমর বেধে নেমেছে তা কোনো অর্থেই মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা আনতে পারে না। বরং শত্রুদের সাথে আলোচনায় বসলে তা বন্ধুত্ব না হলেও স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পঞ্চমত, আন্তঃসভ্যতা সংলাপের ধারণাটি বিশ্বায়নের (Globalization) নামে পশ্চিমীকরণ (Westernization)-এর বিরোধী। বরং বিশ্বায়নের পরিবর্তে Glocalization-এর পক্ষে এর অবস্থান, যেখানে বিশ্বায়নের অর্থ হবে প্রতিটি সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব আবহে বেড়ে ওঠার সুযোগ দান এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সহযোগিতামূলক যোগাযোগ বৃদ্ধি, সর্বোপরি সংস্কৃতিসমূহের নিজস্বতা ও বৈচিত্র্যকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন।

ষষ্ঠত, আন্তঃসভ্যতা সংলাপের আরেকটি দিক হলো বিদ্যমান সভ্যতাগুলোর কোনোটির অবস্থানই এমন হওয়া উচিত নয় যে, এর যাবতীয় বিশ্বাস, আচরণ, সংস্কৃতিই সর্বোত্তম এবং এটি অন্যান্য সংস্কৃতিকে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ সভ্যতাসমূহের সম্পর্ক ও লেনদেনের বিষয়টি একপক্ষীয় (Monological) প্রক্রিয়া নয় বরং এটি হতে হবে সংলাপমূলক (Dialogical) যেখানে যাবতীয় আন্তঃসম্পর্ক সংলাপ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থিরকৃত হবে। হেবারমাস (Habeourmas) এটিকে বলেছেন Communicative Retionality। এ প্রক্রিয়ার মূলকথা হলো গঠনমূলক সংলাপে অংশগ্রহণকারী কোনো পক্ষই তার নিজের বিশ্বাস ও দৃষ্টিকে অন্যের ওপর না চাপিয়ে বরং একে অপরের বিষয়গুলোকে বুঝে শুনে আত্মীকরণ করবে এবং এ প্রক্রিয়ায় একটি নতুন কিছু বেরিয়ে আসবে, যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্ক বিশ্লেষণের এ মডেলটি তুলনামূলকভাবে অধিকমাত্রায় গঠনমূলক (Constructive) ও শান্তি প্রয়াসী। পশ্চিমাদের শত্রুকে সুপ্ত অবস্থায় মেরে ফেলা এবং আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কাছে এ তত্ত্বটি তেমন কার্যকর না হলে পৃথিবীর অধিকাংশ শান্তিপ্রিয় মানুষই এ ধরনের একটি বিশ্ব প্রত্যাশা করে, যেখানে প্রতিটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে টিকে থাকবে। দ্বন্দ্ব নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই এ নীতির মূলকথা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ইংরেজিতে বলা হয় 'International relations'. 'International' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় জেরেমি বেন্থামের লেখায়। জেরেমি বেন্থাম International jurisprudence-এর কথা বলতে গিয়ে, 'International' শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে 'International' শব্দটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কারণে ও প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি পরস্পরের কাছাকাছি আসে ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এর ফলে এদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের সম্বন্ধ ও সম্পর্ক। এ সম্পর্কের পরিধি ক্রমশ ব্যাপক হলেও এর মূলে রয়েছে পরস্পর নির্ভরশীলতা। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, একটি রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার পক্ষে নিঃসঙ্গবাদ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। চলার পথে কোনো না কোনো সময় তাকে অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছাকাছি আসতে হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তবে প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে আরও নির্ভরশীল করে তুলেছে।

এ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক কুইন্সি রাইট বলেন, International relations is concerned with the study of the behaviour of groups of major importance in the life of the world.' অর্থাৎ, বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত।

Richard Snyder এবং তার সহযোগীদের মতে, 'It is one of our basic methodological choices to define, the state as its official policy makers.' অর্থাৎ রাষ্ট্রকে আমরা তার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণেতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারি।

কিন্তু অধ্যাপক পালমার ও পারকিন্স আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো স্থির সংজ্ঞা প্রদান করতে আগ্রহী নন। তাদের মতে, 'The study of international relations, like the world community itself, is in transition.' অর্থাৎ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নও পরিবর্তনশীল।

তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় আদি এইচ ডকটরের সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন, 'The study of international relations is mainly concerned with the study of actions, reactions and interactions among certain entities, usually national states.' অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা বিশ্লেষণে Stanley Haffmann-এর সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'যেসব উপাদান এবং কার্যকলাপ বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও।

প্রশ্ন-০২ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : অনেক বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথাটি বলতে বেশি উৎসাহী। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন Morgantheau। তার মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়লাভ করা অথবা নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষা বেশি। Morgantheau আরও বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ রাজনৈতিক নয় অথবা সবসময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত তাও বলা যায় না। তবে সব রাষ্ট্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য রাজনীতি। তিনি বলেন, 'International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim.' অনেকে মনে করেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ককে বোঝায়। K J Holsti-এর মতে, 'The political interaction between states which is sponsored by government is international politics.'

আন্তর্জাতিক রাজনীতি সঙ্কীর্ণ অর্থে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক এককের সম্পর্ক এবং কূটনীতিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। অনেক আন্তর্জতিক বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য টেনেছেন। তবে এখনো অনেক পণ্ডিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে পরস্পর পরিবর্তনশীল বলে মনে করেন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনেকটা সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন-০৩ আন্তঃসভ্যতা সংলাপ (Inter-civilization Dialogue) কি?

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি ও মডেল সম্পর্কিত বিতর্ক দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে বিশ্বব্যবস্থায় যখন কোনো অস্থিরতা বিরাজ করে বা কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় তখন এ বিতর্ক নতুনভাবে উত্থিত হয়। আর এরই প্রেক্ষিতে জন্ম হয় নতুন চিন্তার, নতুন তত্ত্বের। এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ ও স্নায়ুযুদ্ধ, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও অস্থির নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রভৃতি যুগে যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন নতুন মডেল বিনির্মাণে কাঁচামাল যুগিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল হান্টিংটন (Samuel Huntington) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে চিত্রকল্প উপস্থাপন করেন তা নতুন শতাব্দীতে বিশ্বকে নতুন পথে পরিচালিত করতে থাকে। তার 'সভ্যতার সংঘাত' (Clash of Civilization) তত্ত্বের প্রভাবে যুদ্ধের মাদকতায় পেয়ে বসে পশ্চিমা মোড়লদের। পশ্চিমের সাথে পূর্বের বিশেষ করে মুসলিম সভ্যতার সম্পর্ক হয়ে উঠে তিক্ততর, একের পর এক মুসলিম দেশ পশ্চিমা দেশগুলোর রোষানলে পড়তে থাকে। এমনি এক ক্রান্তিকালে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক নতুন মডেল উপস্থাপন করেন। তিনি যুদ্ধ ও সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতা, বিশ্বব্যবস্থাকে ভাঙনের পরিবর্তে গড়নের এবং আধিপত্যবাদের পরিবর্তে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে 'সভ্যতাসমূহের সংলাপ' (Civilizational Dialogue)-এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নবতর মডেল উপস্থাপন করেন। তিনি পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের বিপরীতে একটি সমন্বয়বাদী স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মডেল তুলে ধরেন।

প্রশ্ন-০৪ বাফার স্টেট (Buffer State) কি?

উত্তর : বিবদমান দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বাফার স্টেট (Buffer state) বলা হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে এ ধরনের রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী দেশ বেলজিয়াম বাফার স্টেট হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন-০৫ শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব বা The Uniting for Peace Resolution বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' বা 'The Uniting for Peace Resolution' হলো বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব। ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ এটি অনুমোদন করে। জাতিসংঘ সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী কোনো সদস্য পরিষদে আলোচিত কোনো প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করলে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় না। তাই নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের মতানৈক্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং তার প্রতি ভীতি প্রদর্শন বা আগ্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে এ প্রস্তাবের ক্ষমতা বলে সাধারণ পরিষদ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মতবিরোধ দেখা দিলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ পরিষদ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। সুতরাং বিশ্বশান্তি রক্ষায় এ প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

প্রশ্ন-০৬ আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে ক্রীড়াতত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো বিশ্ব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক শক্তির অধীনস্থ বিষয়। কূটনীতি, বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কের বিশ্লেষণ নিয়েই এই রাজনীতির বিষয়বস্তু গঠিত। আর ক্রীড়াতত্ত্ব বা Game Theory হলো বিশ্ব রাজনীতির একটি বিশেষ কৌশল, যা দ্বারা নানা রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশেষভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কারো কারো মতে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিও এক ধরনের ক্রীড়াবিশেষ এবং এসব ক্ষেত্রেও সাফল্য নির্ভর করে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল ও স্ট্র্যাটেজির সঠিক উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল, ও স্ট্র্যাটেজির যথার্থ মূল্যায়ন এবং এ তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার উপর। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এ তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন। বস্তুত এ তত্ত্বের প্রয়োগ রীতি হচ্ছে আঙ্কিক সমীকরণের মাধ্যমে। ১৯২১ সালে ফরাসি অঙ্কশাস্ত্রবিদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম এ তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে জন ফন নিউম্যান (হাঙ্গেরি), অস্কার সর্গেনস্টার্ন (জার্মানি) প্রমুখ এ তত্ত্বের আরও বিকাশ সাধন করেন। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে এ ক্রীড়াতত্ত্বটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

টীকা

♦ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ইংরেজিতে বলা হয় 'International relations'. 'International' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় জেরেমি বেন্থামের লেখায়। জেরেমি বেন্থাম International jurisprudence-এর কথা বলতে গিয়ে, 'International' শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে 'International' শব্দটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কারণে ও

প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি পরস্পরের কাছাকাছি আসে ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এর ফলে এদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের সম্বন্ধ ও সম্পর্ক। এ সম্পর্কের পরিধি ক্রমশ ব্যাপক হলেও এর মূলে রয়েছে পরস্পর নির্ভরশীলতা। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, একটি রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার পক্ষে নিঃসঙ্গবাদ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। চলার পথে কোনো না কোনো সময় তাকে অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছাকাছি আসতে হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তবে প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে আরও নির্ভরশীল করে তুলেছে।

এ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক কুইন্সি রাইট বলেন, International relations is concerned with the study of the behaviour of groups of major importance in the life of the world.' অর্থাৎ, বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত।

Richard Snyder এবং তার সহযোগীদের মতে, 'It is one of our basic methodological choices to define, the state as its official policy makers.' অর্থাৎ রাষ্ট্রকে আমরা তার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণেতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারি।

কিন্তু অধ্যাপক পালমার ও পারকিন্স আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো স্থির সংজ্ঞা প্রদান করতে আগ্রহী নন। তাদের মতে, 'The study of international relations, like the world community itself, is in transition.' অর্থাৎ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নও পরিবর্তনশীল।

তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় আদি এইচ ডকটরের সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন, 'The study of international relations is mainly concerned with the study of actions, reactions and interactions among certain entities, usually national states.' অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা বিশ্লেষণে Stanley Haffmann-এর সংজ্ঞা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'যেসব উপাদান এবং কার্যকলাপ বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও।

♦ আন্তর্জাতিক রাজনীতি

অনেক বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথাটি বলতে বেশি উৎসাহী। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন Morgantheau। তার মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়লাভ করা অথবা নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষা বেশি। Morgantheau আরও বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি কাজ রাজনৈতিক নয় অথবা সবসময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত তাও বলা যায় না। তবে সব রাষ্ট্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য রাজনীতি। তিনি বলেন, 'International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim.' অনেকে মনে করেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ককে বোঝায়। K J Holsti-এর মতে, 'The political interaction between states which is sponsored by government is international politics.'

আন্তর্জাতিক রাজনীতি সঙ্কীর্ণ অর্থে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক এককের সম্পর্ক এবং কূটনীতিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। অনেক আন্তর্জতিক বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য টেনেছেন। তবে এখনো অনেক পণ্ডিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে পরস্পর পরিবর্তনশীল বলে মনে করেন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনেকটা সম্পর্কযুক্ত।

♦ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি

সাধারণত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। তবে ক্রিয়া বলতে এখানে কোনো রাষ্ট্রের কার্যাবলীকেই বোঝায় যা অন্য রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আর অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া হলো প্রথম রাষ্ট্রের গৃহীত কার্যাবলীর জবাবে দ্বিতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায় তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি প্রথম রাষ্ট্রটিকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলবে। যদি প্রথম রাষ্ট্রটি সৈন্য সরিয়ে না নেয় তাহলে দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি প্রথম রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখার উদ্যোগ নিতে পারে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তাদের মতে, বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে এমন সকল উপাদান ও কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান; যেমন— জাতিসংঘ, আরব লীগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করে।

ইতিহাস বলতে আমরা যেমন বাস্তব ঘটনা ও ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ উভয়কে বুঝে থাকি তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আমরা একে বিষয় ও বিষয়বস্তু উভয় অর্থে বুঝি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। যেসব ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমাজজীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারে সেগুলোই শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলোকে 'As Aspect of Social Reality' বলা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা এসব ঘটনা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেহেতু মানুষের আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে সেহেতু অনেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সমাজবিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত মনে করেছেন। তারা মনে করেন সংঘর্ষ ও সহযোগিতাকে বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়ে সমাজের বিকাশের নানা দিকগুলোকে কিভাবে উন্মোচন করা যায় তার আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কও সমগ্র সমাজের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

শক্তিসাম্য স্থাপন বা যুদ্ধ এড়ানোর জন্য বিশ্বের নানা রাষ্ট্র যে প্রচেষ্টা চালায় তাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে যেসব সংস্থা বা সংগঠন গড়ে উঠেছে সেগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করে থাকে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতিগত গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পটভূমি, ধর্ম ও মতাদর্শ আদৌ এক নয়। আর এসব পার্থক্য হেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নানারকম হয়ে থাকে। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এসব পার্থক্য নিয়েও বিশদ আলোচনা করতে হয়।

হফম্যান ও বার্টনসহ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিজ্ঞান পদবাচ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বার্টনের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হিসেবে এর কাজ হলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। বার্টনের ভাষায়, 'International relations can merely suggest that it certain events take place, certain results are likely to follow, that certain policies are likely to produce certain consequences, it can state alternative goals, but their selection is a matter of policy.'

♦ সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন পৃথিবী বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাডস তার 'Youth' উপন্যাসে সভ্যতাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাতে লেখেন 'The fast spoke to me, but it was in a western voice'. তখনই পৃথিবী বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন থিসিস লেখেন 'The Clash of Civilizations' নামে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রচলন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পৃথিবীর সকল সভ্যতা যখন একই স্বরূপ গ্রহণ করছে, তখনই হান্টিংটন সভ্যতাসমূহের মধ্যে বিভক্তি রেখা টেনে ১৯৯৩ সালে Foreign Affairs-এ প্রকাশ করেন 'The Clash of Civilizations' নামক থিসিস। এই অদ্ভুত থিসিসের মূল কথা ছিল ভবিষ্যৎ সংঘাতের চরিত্র হবে সভ্যতাভিত্তিক, রাষ্ট্রভিত্তিক নয় এবং এই সভ্যতা শক্তিশালী হবে 'সাংস্কৃতিক যোগসূত্র'-এর ভিত্তিতে, যার মূল উপাদান হবে ধর্ম। তার মতে ভবিষ্যৎ সংঘাত হবে ইসলাম, চীন বনাম পাশ্চাত্যের মধ্যে। তিনি এই থিসিসে ইসলামকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার এই থিসিস আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। ৫৬ বছর ধরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত 'The Clash of Civilizations' তত্ত্বের উদ্ভাবক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি হান্টিংটন ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮ মৃত্যুবরণ করেন।

♦ আন্তঃসভ্যতা সংলাপ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি ও মডেল সম্পর্কিত বিতর্ক দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে বিশ্বব্যবস্থায় যখন কোনো অস্থিরতা বিরাজ করে বা কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় তখন এ বিতর্ক নতুনভাবে উত্থিত হয়। আর এরই প্রেক্ষিতে জন্ম হয় নতুন চিন্তার, নতুন তত্ত্বের। এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ ও স্নায়ুযুদ্ধ, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও অস্থির নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রভৃতি যুগে যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন নতুন মডেল বিনির্মাণে কাঁচামাল যুগিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল হান্টিংটন (Samuel Huntington) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে চিত্রকল্প

উপস্থাপন করেন তা নতুন শতাব্দীতে বিশ্বকে নতুন পথে পরিচালিত করতে থাকে। তার 'সভ্যতার সংঘাত' (Clash of Civilization) তত্ত্বের প্রভাবে যুদ্ধের মাদকতায় পেয়ে বসে পশ্চিমা মোড়লদের। পশ্চিমের সাথে পূর্বের বিশেষ করে মুসলিম সভ্যতার সম্পর্ক হয়ে উঠে তিক্ততর, একের পর এক মুসলিম দেশ পশ্চিমা দেশগুলোর রোষানলে পড়তে থাকে। এমনি এক ক্রান্তিকালে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক নতুন মডেল উপস্থাপন করেন। তিনি যুদ্ধ ও সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতা, বিশ্বব্যবস্থাকে ভাঙনের পরিবর্তে গড়নের এবং আধিপত্যবাদের পরিবর্তে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে 'সভ্যতাসমূহের সংলাপ' (Civilizational Dialogue)-এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নবতর মডেল উপস্থাপন করেন। তিনি পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের বিপরীতে একটি সমন্বয়বাদী স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মডেল তুলে ধরেন।

♦ এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা *[১৮তম বিসিএস]*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বদলে যাওয়া বিশ্ব রাজনীতিতে শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশের জোট, অন্যদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক জোট। শক্তিসাম্যের (Ballance of Power) নীতির ওপর গড়ে উঠে সামরিক জোট। একদিকে মার্কিন মদদপুষ্ট ন্যাটো, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছত্রছায়ায় ওয়ারশ প্যাক্ট (Warshaw Pact)। এই দ্বিমেরুকরণ বিশ্বের পালাবদল ঘটে বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক মেরুকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত জোটের ভাঙনের পর ওয়ারশ প্যাক্টও বিলুপ্ত হয়। ফলে ন্যাটোই এখন গোটাবিশ্বে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো আগে যারা ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত ছিল ন্যাটো তাদেরকে নিজেদের জোটে ধাপে ধাপে আনতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ কথা বলছে, রাশিয়া নখ-দাঁতহীন হয়ে পড়েছে, সেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বড় বেশি অসহায় বোধ করছে। এজন্য এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার কথা মনে রেখেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছোট বড় দেশ জোটবদ্ধ হচ্ছে।

♦ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌশক্তি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশের বিপক্ষে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর পরিকল্পনা করে সে সময় পাকিস্তানের পরম মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র। তখন থেকেই বাংলাদেশের মানুষের কাছে সপ্তম নৌবহর এক আতঙ্কের নাম। সম্প্রতি ভারতীয় এক পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠাচ্ছে। এ খবরে তোলপাড় পড়ে যায় দেশজুড়ে। এর পরপরই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই এ খবরকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন প্যানেট্টা জানান মূল ঘটনাটি। যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়। বাজেট সংকট সত্ত্বেও পেন্টাগন এশিয়ায় মার্কিন উপস্থিতি বৃদ্ধির নতুন কৌশল বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রায় ৬০ ভাগ রণতরী এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। এখন ৫০ ভাগ রণতরী রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে স্নায়ুযুদ্ধের পর কৌশলগতভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন বাঁক হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। এ নতুন পদক্ষেপকে তারা একটি নামও দিয়েছেন 'pivot' যার অর্থ হলো একটি আবর্তকেন্দ্র। অর্থাৎ এখন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের সমরসজ্জা আবর্তিত হবে।

♦ চতুর্থ বিশ্ব

প্রথম বিশ্ব, দ্বিতীয় বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্ব ধারণা থেকে উদ্ভব হয়েছে চতুর্থ বিশ্ব ধারণার। চতুর্থ বিশ্ব বলতে বোঝায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সেই সকল দেশসমূহকে যাদের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত নিম্ন, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা নেই, ভবিষ্যৎ উন্নয়নেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। পৃথিবীর পরিবর্তন হলেও এসব দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এসব দেশসমূহের বর্তমান অবস্থা যেমন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, তেমনি অদূর ভবিষ্যতেও তাদের দারিদ্র্য থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

♦ আন্তর্জাতিকতাবাদ

আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো এমন একটি মতবাদ বা নীতি যে নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জাতিকে একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অথবা বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। জাতীয়তাবাদ যেমনভাবে একটি জাতির মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার কথা নির্দেশ করে, তেমনি আন্তর্জাতিকতাবাদ দেশের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে। আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে একাত্মতা ও মিলনের অনুভূতি। অন্যকথায়, আন্তর্জাতিকতাবাদ বলতে বিশ্বের সকল জনগণের সেই একাত্মতা ও মিলনের চেতনাকে বোঝায় যা জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে সকল জাতিকে এক হতে সাহায্য করে। মধ্যযুগের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দান্তে এ নীতির ভিত্তিতে এক বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। গোল্ডস্মিথের মতে, 'ব্যক্তি কেবল তার রাষ্ট্রের সদস্যই নয়, বরং বিশ্বেরও নাগরিক।' এ অনুভূতিই আন্তর্জাতিকতাবাদ। আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রেরণায় বিভিন্ন জাতি নিজেদের স্বীয় জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে এবং বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তির স্বার্থে অন্যান্য জাতির সাথে সহযোগিতা করতে প্রবৃত্ত হয়।

♦ ক্রীড়াতত্ত্ব (Game Theory) *[২০তম বিসিএস]*

আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো বিশ্ব পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক শক্তির অধীনস্থ বিষয়। কূটনীতি, বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কের বিশ্লেষণ নিয়েই এই রাজনীতির বিষয়বস্তু গঠিত। আর ক্রীড়াতত্ত্ব বা Game Theory হলো বিশ্ব রাজনীতির একটি বিশেষ কৌশল, যা দ্বারা নানা রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশেষভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কারো কারো মতে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিও এক ধরনের ক্রীড়াবিশেষ এবং এসব ক্ষেত্রেও সাফল্য নির্ভর করে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল ও স্ট্র্যাটেজির সঠিক উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল, ও স্ট্র্যাটেজির যথার্থ মূল্যায়ন এবং এ তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার উপর। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এ তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন। বস্তুত এ তত্ত্বের প্রয়োগ রীতি হচ্ছে আঙ্কিক সমীকরণের মাধ্যমে। ১৯২১ সালে ফরাসি ভঙ্কশাস্ত্রবিদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম এ তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে জন ফন নিউম্যান (হাঙ্গেরি), অস্কার সর্গেনস্টার্ন (জার্মানি) প্রমুখ এ তত্ত্বের আরও বিকাশ সাধন করেন। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে এ ক্রীড়াতত্ত্বটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।



বিশ্ব নেতৃত্ব
Actors in the World

Syllabus | *Modern state, types of state, sovereignty, non-state actors, international institutions, relations between state and non-state actors.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *স্নায়ুযুদ্ধ কি? স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]*

০২. *বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ কি অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন? [২৩তম বিসিএস]*

০৩. *'জাতীয় নিরাপত্তা' ও 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' বলতে কি বোঝেন? বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোর নিরাপত্তার সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]*

০৪. *স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এসব দেশের অবস্থান তুলে ধরুন। [২৭তম বিসিএস]*

০৫. *জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কি? এ আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক এর সাফল্য মূল্যায়ন করুন। পরবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় এর আবশ্যকতা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? [৩৪তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. ক. *রাষ্ট্র বলতে কি বোঝেন?*
খ. *রাষ্ট্র গঠনের উপাদান পর্যালোচনা করুন।*

০৭. ক. *রাষ্ট্রের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।*
খ. *আপনি কি মনে করেন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার মূল চরিত্র হারিয়েছে?*

০৮. ক. *রাষ্ট্র কাকে বলে?*
খ. *রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব পর্যালোচনা করুন।*

০৯. *বিশ্বায়নের এ যুগে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিষয়টি তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না— ব্যাখ্যা করুন।*

১০. *রাষ্ট্রের সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।*

১১. ক. *রাষ্ট্র কি?*
খ. *আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন।*

১২. ক. সার্বভৌমত্ব কি?
খ. সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
গ. সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।
১৩. ক. স্বল্পোন্নত দেশ বলতে কি বোঝেন?
খ. স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
১৪. ক. স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs) বলতে কি বোঝায়?
খ. একটি দেশ LDCs কিনা তা কে ঠিক করে?
গ. বর্তমান বিশ্বে কতগুলো দেশ LDCs-ভুক্ত?
ঘ. সবচেয়ে জনবহুল LDCs কোন দেশ?
১৫. কমনওয়েলথের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
১৬. ক. কমনওয়েলথ কি?
খ. কমনওয়েলথ-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বর্ণনা করুন।
গ. বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কমনওয়েলথ-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. রাষ্ট্র কি?
০২. রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
০৩. রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি?
০৪. সার্বভৌমত্ব বলতে কি বোঝেন?
০৫. সংবিধান বা শাসনতন্ত্র কি?
০৬. একনায়কতন্ত্র কি?
০৭. ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র কি?
০৮. আরোপিত রাজধানী কাকে বলে?
০৯. ন্যাম (NAM) কি? এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১০. ন্যাম (NAM) প্রাথমিকভাবে গঠিত হয় কখন? এর উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?
১১. ন্যামের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? সর্বশেষ সদস্য দেশের নাম কি?
১২. ন্যাম (NAM)-এর প্রথম ও সর্বশেষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
১৩. ন্যাম ট্রয়কা (NAM Troika) বলতে কি বোঝায়?
১৪. 'পঞ্চশীল' বলতে কি বোঝায়?
১৫. ন্যামকে অধিক কার্যকর করার জন্য কি কি কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?
১৬. NAM-এর বার্তা সংস্থার নাম কি?
১৭. কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট কি?
১৮. কমনওয়েলথের বর্তমান প্রধান কে? এর সদর দপ্তর কোথায়?
১৯. কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিবের নাম কি?
২০. কমনওলেথের সদস্যপদ ত্যাগকারী দেশগুলো কি কি?
২১. কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালাগুলো কি কি?
২২. কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো কি কি?
২৩. CPA কি?
২৪. ম্যাগনাকার্টা কি?
২৫. কমনওয়েলথ-এর আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সংক্ষেপে লিখুন।

টীকা

ফিফথ কলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী	আফ্রিকম
আয়রন কার্টেন	ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস
ইন্টারপোল (Interpol) [৩২তম; ২৪তম বিসিএস]	ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন
সিরডাপ [২৯তম বিসিএস]	ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)
ওপেক [২৯তম বিসিএস]	কমনওয়েলথ (Commonwealth)
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ [২৯তম বিসিএস]	জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)
কমনওয়েলথ-এর নতুন সনদ	আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত [৩০তম বিসিএস]
সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS)	

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। স্নায়ুযুদ্ধ কি? স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]

উত্তর : আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়, বরং এখানে একটি ঘটনার পশ্চাতে একাধিক কারণ বিদ্যমান থাকে এবং ঘটনার পরবর্তী পর্যায়েও একাধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; যেমন আমরা যুদ্ধ, চুক্তি, সন্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতার বেলায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারী একাধিক শক্তির উপস্থিতি বা স্বার্থ লক্ষ্য করে থাকি। জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও পরবর্তীতে বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তি এই যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলে বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, মানবিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এক সময়কার শক্তিধর রাষ্ট্র জার্মানি, জাপান, ইতালির ক্ষমতায় ভাটা পড়ে এবং ক্ষমতার সে স্থান দখল করে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, প্রকারান্তরে পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব।

স্নায়ুযুদ্ধ

ঠাণ্ডা লড়াই বা স্নায়ুযুদ্ধের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে উঠে আসে উইনস্টন চার্চিলের ওয়েস্ট মিনিস্টার কলেজের বক্তৃতার মাধ্যমে, ৫ মার্চ ১৯৪৬। যদিও চার্চিল 'Cold War' শব্দটিকে সরাসরি ব্যবহার করেনি, বরং সোভিয়েত এবং মার্কিন সম্পর্কের অবনতির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ বার্নার্ড বারুচ সরাসরিই বলেছিলেন : 'Let us not be deceived— Today we are in the midst of the Cold War.'তবে আমেরিকার ওয়াল্টার লিপম্যান এই 'Cold War' শব্দটি প্রথম সংবাদপত্রে ব্যবহার করেন। তিনি তৎকালীন রুশ-মার্কিন সন্দেহমূলক ও ভীতিকর সম্পর্ককে 'Cold War' বলে উপস্থাপন করেন।

ইংরেজি 'Cold War' শব্দটি বাংলায় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ঠাণ্ডা লড়াই, স্নায়ুযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, প্রচারযুদ্ধ ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দুটি পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রজোট প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে পরস্পরের প্রতি যে যুদ্ধভাব বজায় রেখেছিল বা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাকেই ঠাণ্ডা লড়াই বলে অভিহিত করা হয়।

International World book of Encyclopedia-তে ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Cold war is the struggle for power and influence between the communist nations and the western allies led by the united states.'

সুতরাং বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সুপার পাওয়ার হিসেবে রুশ-মার্কিন উত্থান এবং তাদের অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা মতবাদের বৈপরীত্য বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রকে মার্কিন এবং রুশ ব্লকে বিভক্ত করে দেয় এবং সুপার পাওয়ারদ্বয় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রচারণা চালায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন কোনো প্রত্যক্ষযুদ্ধ বাধেনি। বরং বিশ্বব্যবস্থার স্নায়ুবিক চাপ বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এমন পরিস্থিতিই 'স্নায়ুযুদ্ধ', 'শীতলযুদ্ধ', 'প্রচারযুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যেমন স্থিতিশীলতা এনেছে তদ্রূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতারও জন্ম দিয়েছে। ৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটায় এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র একে একে স্বাধীনতা লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় লালিত বহু রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। স্নায়ুযুদ্ধের অনুসৃত আদর্শকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বে চলমান বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন দেশের সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ লাঘব করা হয়। কিন্তু এসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কিছু নেতিবাচক প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন– জাতিগত দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় সংঘাত, সন্ত্রাসবাদ, উত্তর-দক্ষিণ দ্বন্দ্ব, দুষ্প্রাপ্য সম্পদের কঠোর প্রতিযোগিতা এবং সর্বোপরি অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দারুণভাবে কলুষিত হতে থাকে। নিচে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও প্রবণতা তুলে ধরা হলো :

১. **একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা :** স্নায়ুযুদ্ধের পূর্বে এবং চলাকালীন সময় বিশ্ব দুটি মেরুতে বিভক্ত ছিল কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অবসান বিশ্বব্যবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত করে। এশিয়ার সর্বত্রই একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে এই পরাশক্তি ন্যাটোর সহায়তায় আবার কখনও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের কথা বলে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করে এবং কথিত শান্তির লক্ষ্যে পরিচালিত এসব যৌথ সামরিক অভিযানের অধিকাংশের বেলায় নেতৃত্বে থাকে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধোত্তর সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন সামরিক অভিযানের ব্যয়ভার মার্কিনিরা একা বহন করেনি। বরং ন্যাটোভুক্ত বিভিন্ন দেশকে বহন করতে হয়েছে। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কুয়েত, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়াতে যৌথ সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।

২. **শান্তিরক্ষা মিশন :** স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় চলমান বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিন-ঘেঁষা প্রধান শক্তিগুলোই মূল ভূমিকা পালন করে। এসব শান্তিরক্ষা মিশনের অন্তরালে পুঁজিবাদের বিস্তার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যহত থাকে। ১৯৪৮-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ১৩টি এবং পরবর্তী ১০ বছরে আরো বেশ কিছু শান্তিরক্ষা মিশন গঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে পরবর্তীতে মে ১৯৮৮ থেকে অক্টোবর ১৯৯৩ পর্যন্ত প্রায় ২০টির মতো শান্তিরক্ষা মিশন গঠিত হয়। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৬৯-এ এবং যেখানে ১ লক্ষাধিক সামরিক-বেসামরিক সদস্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

৩. **মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের প্রভাব বিস্তার :** পূর্ব-পশ্চিমের আদর্শিক দ্বন্দ্বে পশ্চিমের জয় হয় এবং পশ্চিমা বিশ্ব সারা বিশ্বে তাদের প্রভাব বিস্তারের খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। ১৯৯০-এ উপসাগরীয় সংকটের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। অত্র এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা না থাকায় তারা আফগানিস্তান ইরাক ও লিবিয়া আক্রমণ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিমা বিশ্ব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শান্তি প্রক্রিয়া অব্যহত রাখা, অর্থনীতির উদারীকরণের কথা বললেও তারা মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করে।

৪. **NATO এবং EU-এর সম্প্রসারণ :** স্নায়ুযুদ্ধের পর ইউরোপীয় অঞ্চলে NATO এবং EU-এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত ব্লকের বিভিন্ন রাষ্ট্র NATO এবং EU-তে যোগ দেয়। সর্বশেষ ১ জুলাই ২০১৩ ক্রেয়েশিয়া EU-তে যোগ দেয়ায় সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮-এ। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্যেই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জোটবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৫. **বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার গতিশীলতা বৃদ্ধি :** স্নায়ুদ্ধের সমাপ্তির পূর্বে জাতীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এই ধারণা পোষণ করা হতো যে, তারা নিজেরাই তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সীমান্ত বিরোধ বৃদ্ধি পায়। আর এসব সমস্যার সমাধানকল্পে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের নামে পুঁজিবাজার অর্থনীতি তথা বাজার উন্মুক্ত করার প্রেসক্রিপশন দেয় এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

৬. **অর্থনৈতিক জোট গঠন :** স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে 'এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সংস্থা (APEC) এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোকে নিয়ে উত্তর-আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (NAFTA)। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোট জি-২০, আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (ARF), বিমসটেক (BIMSTEC) প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এসব বাণিজ্যিক জোটের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে গতিশীলতা দান করা এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা।

৭. **মার্কিনিদের জনপ্রিয়তা হ্রাস :** স্নায়ুযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় মার্কিন আগ্রাসী মনোভাব তাদের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তায় ফাটল সৃষ্টি করে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মার্কিন নীতি হুমকির সম্মুখীন হয়। নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য দেশের মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি দ্বিমুখী বলে সমালোচিত হয়, যা বিশ্বজুড়ে মার্কিন স্বার্থ ও ভাবমূর্তিকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করে।

৮. **বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থা :** আপাতদৃষ্টিতে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থা এককেন্দ্রিক মনে হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থায় তিন মেরু বা বহুমেরুকেন্দ্রিক। এই তিন মেরু গঠিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং প্রাক্তন অক্ষশক্তিকে নিয়ে।

৯. **নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার :** নিরস্ত্রীকরণ কিংবা অস্ত্র বিস্তার রোধকে শর্ত হিসেবে নিয়ে পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্ব নিরসন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম হাতে নেয়। কারণ, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র বৃদ্ধি এবং উৎপাদনে অধিক জোর দেয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ব্রাজিল, ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বে একাধিক পরমাণু জোট রয়েছে।

১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীরের পতন, ১৯৯০ সালে দুই জার্মানির একীভূত হওয়া এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং সেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আসে নতুনত্ব এবং শাসন ব্যবস্থায় আসে মৌলিক পরিবর্তন। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বিশ্বব্যবস্থায় স্নায়ুযুদ্ধের অবসান তো ঘটেইনি বরং তা নতুন আঙ্গিকে বিরাজ করছে।

০২ ॥ বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ কি অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে আধুনিকীকরণের মাপকাঠিতে বিশ্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল বিশ্ব। বিশ্বের যেসব দেশ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাদেরকে সাধারণত উন্নত দেশ বলা হয়। আর বিশ্বের কিছু দেশ আছে, যারা তাদের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল সেসব দেশকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশসমূহকে Traditional Society-এর আওতাভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এসব দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে Traditional Society থেকে Modern Society এর দিকে অগ্রসর হয়। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় বিশ্ব কি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একটির নেতৃত্বে ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং অন্যটির নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির জোট। এ দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব থেকে শুরু হয় Cold War বা ঠাণ্ডা লড়াই। ঠিক সে সময় সদ্য ঔপনিবেশক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত যে দেশগুলো কোনো গোষ্ঠীতে না গিয়ে বরং তাদের নিজস্ব যোগ্যতায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজস্ব স্থান দখল করে নিয়েছিল সে দেশগুলোই ছিল তৃতীয় বিশ্ব। কোনো সামরিক জোট গঠনেও বিরোধী ছিল এ দেশগুলো। অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত এ দেশগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা টিকিয়ে রেখে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী শক্তির বিরুদ্ধে জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।

তবে তৃতীয় বিশ্বের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। সাধারণত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশকে যৌথভাবে তৃতীয় বিশ্ব বলা হয়। অনেকের মতে Least Developed Countries (LDCs) ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে একত্রে তৃতীয় বিশ্ব বলা হয়। যেসব দেশ শিল্প বিকাশ, বাণিজ্য প্রসার, জীবনযাত্রার নিম্ন মান, মাথাপিছু আয়, মোট জাতীয় উৎপাদন, শিক্ষা বিস্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে সেসব দেশকে তৃতীয় বিশ্ব বলে ধরে নেয়া হয়।

তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শাসিত এবং শোষিত। ফলে এখানকার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে, যা সব তৃতীয় বিশ্বের দেশেই চোখে পড়ে। নিচে তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

১. **রাজনৈতিক কাঠামো :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিতে দেখা হয় না। এ কারণে এ দেশগুলোতে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক পটভূমি গড়ে উঠেনি।

২. **রাজনৈতিক দলের ভিত্তি :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দলসমূহ সাধারণত কোনো ব্যক্তির প্রভাবে গঠিত হয়। কখনো কখনো ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন– ভারতবর্ষের মুসলিম লীগের কথা বলা যায়। আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩. **দলীয় কোন্দল :** তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো কোন্দল। বিশুদ্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির অভাবে দলীয় কোন্দলের জন্ম হয়।

৪. **রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য :** রাজনৈতিক আনুগত্য দলের আদর্শের প্রতি না হয়ে দলের প্রতি হয়ে থাকে। দলের সদস্যরা আশা করেন যে, নেতৃবৃন্দ দলের আদর্শকে আরও জনপ্রিয় করার চেয়ে সব সদস্যের স্বার্থ পূরণ করার চেষ্টা করেন।

৫. **বিপর্যস্ত অর্থনীতি :** দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে এখানে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে না। ফলে অর্থনীতি নাজুক।

৬. **শিক্ষাব্যবস্থা :** তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ শিশু স্কুলে না গিয়ে ক্ষেতে-খামারে, কারখানায় কাজ করে। এছাড়া মেয়ে শিশুদের বেশিরভাগই স্কুলে যায় না, ফলে শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল।

৭. **বিরোধী দলের ভূমিকা :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিরোধী দলগুলো বৈপ্লবিক আন্দোলনকারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়। বিরোধী দলগুলো সরকার কর্তৃক আনীত প্রস্তাব ভালো হলেও নিরর্থক সমালোচনা করে বাধার সৃষ্টি করে।

৮. **বাস্তব অবস্থা এড়ানো :** বিদেশী চাপে হোক কিংবা ক্ষমতা চিরদিন আকড়ে থাকার জন্যই হোক প্রকৃত সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে গৌণ সমস্যাকে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখানো তৃতীয় বিশ্বের দেশের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. **আমলাদের কর্তৃত্ব :** তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক কাঠামো এবং ভূমিকার কারণে আমলাগণ নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় সেখানে প্রকৃত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তারাই গ্রহণ ও অনুশীলনে তৎপর হয়ে থাকে।

১০. **একতার অভাব :** তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও একতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে রাজনৈতিক যোগাযোগের অভাব। তাছাড়া এখানে সর্বজনবিদিত কোনো রাজনৈতিক পদ্ধতি নেই।

১১. **রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের উত্তেজনা ও বিদ্রোহ :** তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশের রাজনৈতিক কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। তাদের কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট করা থাকে না। যার ফলে উত্তেজনাও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। যেমন– এরশাদের শাসনক্ষমতা ত্যাগের সময়।

১২. **জনমতের গুরুত্বহীনতা :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে রাজনৈতিক আলোচনার খুব সামান্য যোগাযোগ থাকে। কারণ ক্ষমতাসীন দল সবসময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জনমতের ওপর তেমন গুরুত্বারোপ করে না।

১৩. **ক্ষমতার উৎস :** উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল বা ব্যক্তি। এখানে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় না বরং ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়।

১৪. **আইনগত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অসচেতনতা :** উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আইনগত উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে খুব কমই সচেতন থাকে। মূলত এসব দেশের মানুষের জীবনাদর্শ বিভিন্ন হওয়ায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না। বহুদলীয় গণতন্ত্রের অভাব রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উপায় অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।

১৫. **ক্ষমতার উপশাখা :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ক্ষমতার উপশাখা দেখা যায়। যেমন– আমলাদের কেবল গণপ্রশাসন নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু কোনো কোনো দেশে দেখা যায় যে তারা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর এজেন্ট। উপযুক্ত প্রশাসকের অভাবে এটা হয়ে থাকে।

১৬. **জাতীয় নেতৃত্বের অভাব :** প্রয়োজনীয় জাতীয় নেতৃত্বের শূন্যতা তৃতীয় বিশ্বে প্রায়ই দেখা যায়। এসব দেশের অধিকাংশ নেতাই স্বার্থপরতার সীমালঙ্ঘন করায় তারা জাতীয় নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করতে পারে না।

১৭. **বৈধ মানদণ্ডের অভাব :** বৈধ মানদণ্ডের অভাব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকার বদল ও কার্যক্রমের জবাবদিহিতার বৈধ কোনো মানদণ্ড না থাকায় জাতিকে চরম মাশুল দিতে হয়।

১৮. **আইন-শৃঙ্খলার অবনতি :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা সঠিকভাবে মান্য করা হয় না। এখানে সংবিধানে কেবল নীতি ও বিধি নিষেধ লিপিবদ্ধ থাকে। বাস্তবে প্রয়োগ নেই।

১৯. **মূল্যবোধের অবক্ষয় :** মূল্যবোধের অবক্ষয় তৃতীয় বিশ্বের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এর কারণ ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে ধরনের চর্চা গড়ে উঠেছে তাতেই জনগণের মাঝে মূল্যবোধহীনতা ও আদর্শের অবক্ষয় সাধিত হয়েছে। এখানে প্রতিপক্ষ পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে।

২০. **সংস্কৃতি :** বিদেশী শাসনে সংস্কৃতির স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে অধিকাংশ তৃতীয় বিশ্বের দেশ। ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের প্রভাব কায়েম করতে সংস্কৃতি ধ্বংসের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র করে এবং তারা সফলও হয়।

২১. **সুনির্দিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠী :** উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, এখানে স্বল্প সংখ্যক স্বার্থগোষ্ঠী আছে, যাদের নির্ধারিত লক্ষ্য আছে। তবে এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি দলের এজেন্ট। তাদের কাজ দলের পক্ষে জনমত গঠন করা।

২২. **ক্যারিজম্যাটিক নেতৃত্বের প্রভাব :** বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে রাজনৈতিক দল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না। দলের জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয় দলের ক্যারিজম্যাটিক নেতৃত্বের গুণে। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড, স্বার্থকতা, ব্যর্থতা মূলত নেতার দ্বারাই প্রভাবিত। সুতরাং দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের উপযুক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব থেকে পৃথক। তবে এসব দেশ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রগতি অর্জনের চেষ্টা করছে।

সাম্প্রতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের প্রাসঙ্গিকতা/গুরুত্ব

তৃতীয় বিশ্বের উত্থান আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশির ভাগ এশীয় ও আফ্রিকান উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার এবং নিজেদের সমস্যা নিরূপণ ও সমাধানের চেষ্টা চালায়। এতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি জটিল আকার ধারণ করে। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তৃতীয় বিশ্ব, উন্নত, উন্নয়নশীল, উত্তর দক্ষিণ ব্যবধান কমিয়ে বিশ্বকে সকলের জন্য সমান অধিকার সৃষ্টির যে দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস তা ইতোমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যেকার সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এছাড়া উন্নত বিশ্ব কিভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছাকাছি আসতে পারে, কিভাবে জাতিসংঘকে আরও শক্তিশালী করা যায় এবং কল্যাণমুখী করা যায়, সেক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছে। বিশ্ব রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্ব এদের সৃষ্টি করা বিভিন্ন সংগঠন থেকে সহজে বোঝা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কুফল কাটিয়ে উঠার আগেই ১৯৪৫ সালে আরবরাষ্ট্রগুলো মিলে আরব লীগ গঠন করে, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর গোটা দুনিয়া দু' ভাগে বিভক্ত হয়। এর একদিকে ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের কিছু দরিদ্র দেশ, যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। অপরদিকে ছিল বিশাল শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশ, যারা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এবং এর মিত্রশক্তিদের আগ্রাসন ঠেকাতে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল গঠন করে NATO (North Atlantic Treaty Organization)। অপরদিকে রাশিয়া সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তার মিত্রদের নিয়ে গঠন করে ওয়ারশ চুক্তি (WARSAW Pact)। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলো কোনো দলে না গিয়ে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। পরে ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষতার খসড়া প্রস্তুত করে এবং ১৯৬১ সালে মূলত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ সুকর্ন যুগোশ্লাভিয়ার যোসেফ মার্শাল ব্রোজ টিটো, মিশরের জামাল আব্দুল নাসের এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মিলে NAM (Non-Aligened Movement)-এর গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সময় জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা ও ন্যায়নীতি বিপন্ন হলে ভারত নিরপেক্ষ থাকবে না। নেহেরুর এ ঘোষণায় তৎকালীন বিশ্বের মুরুব্বীরা নড়ে চড়ে বসেন।

পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালের ১৫ জুন জেনেভায় অনুষ্ঠিত আঙ্কটাড-এর প্রথম বৈঠকের শেষে ৭৭টি উন্নয়নশীল দেশ একটি যৌথ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে G-77 গঠন করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতিসংঘ ব্যবস্থার অধীনে সব আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যৌথ সমঝোতা উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার প্রসার ঘটানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে G-77 গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। G-77 বিশ্ব অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা নিম্নরূপ : ১. সর্বজনীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন, ২. পুঁজি সরবরাহের সুষম সমন্বয়, ৩. টেকসই উন্নয়ন, ৪. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশের অংশগ্রহণ, ৫. দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা, ৬. আফ্রিকার ঋণ লাঘব, ৭. দুর্নীতি রোধ, ৮. আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, ৯.তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, ১০. দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সুষম বণ্টন।

এছাড়া বিশ্ব রাজনীতিতে G-77— ১. আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়ন, ২. শান্তি স্থাপন, ৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন, ৪. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ৫. মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান, ৬. স্থলমাইন অপসারণ, ৭. অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও ৮. জাতিসংঘের বাজেট সঙ্কট দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিভিন্ন ধরনের জোট গঠন ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সম্মিলিতভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যৌথ প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্যে রপ্তানি খাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশের অংশীদারিত্ব প্রতি বছর কমছে এ বাণিজ্য বৈষম্য দূর করতে তৃতীয় বিশ্ব বর্তমানে উন্নত বিশ্বের সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত। তৃতীয় বিশ্বের সদস্যরা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কিয়োটো সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অর্থনীতি ও পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণের ব্যাপারেও আলোচনা করছে। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মেলন; যেমন– ড্রাগ সামিট, জনসংখ্যা বিষয়ক সম্মেলন, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন ইত্যাদিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের জোরালো মতামত তুলে ধরেছে।

বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে ছিটকে পড়ছে। তারা বঞ্চিত হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ থেকে। দিন দিন তাদের ঋণের পরিমাণ বেড়ে

যাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উন্নত দেশগুলোকে সাহায্য সহযোগিতা করার আহ্বান করছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যার ব্যাপারে ইসরাইল দখলকৃত ফিলিস্তিন অঞ্চলগুলোকে মুক্ত করতে তৃতীয় বিশ্ব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

বিশ্বায়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্ব, ব্যাপক হারে দারিদ্র্য, নিয়ন্ত্রণহীন অসুখ, নিরক্ষরতা, বিশুদ্ধ পানির অভাব, সুষম খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এ অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য জাতিসংঘের সাথে যৌথ উদ্যোগে নিরলস চেষ্টা করছে। তৃতীয় বিশ্বের জন্মলগ্ন থেকেই যারা সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে তাদের সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্রগুলো একমত হয়েছে। নতুন শতাব্দীতে পরিবর্তনশীল বিশ্বে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তৃতীয় বিশ্ব কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণের দেশগুলো বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলোর মতো যাতে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশ যেন বিশ্বায়ন থেকে বঞ্চিত না হয় সেক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং বিদেশী পুঁজির অধিক সরবরাহ যাতে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার না করে এবং পুঁজি বিনিয়োগ যেন অনুন্নত দেশের সার্বিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও লাগসই উন্নয়নের জন্য উন্নত বিশ্বের সহযোগিতা সব সময় প্রয়োজন। তাই উন্নয়নশীল বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, মুদ্রা ও বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের কোনো নেতিবাচক প্রভাব যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে স্পর্শ না করে তৃতীয় বিশ্ব সেদিকে খেয়াল রাখছে। বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে সব উন্নয়নশীল দেশই উপকৃত হবে না। তারপরও উরুগুয়ে রাউন্ডের চুক্তির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের সব সদস্যকে আহ্বান জানানো হয়েছে। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি সদস্যদেশগুলোর আস্থা সৃষ্টিতে এবং LDCs (Least Developed Countries) ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো রপ্তানি বাণিজ্য খাতে অগ্রাধিকার পায় সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এছাড়াও উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যের যে খাতগুলোতে সুবিধা রয়েছে সে খাতগুলোতে অনুন্নত দেশগুলোর জন্য অগ্রাধিকার প্রদানে তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তৃতীয় বিশ্ব মনে করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো যদি নীতিমালা পরিবর্তন বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও জোরদার করে তাহলে পারস্পরিক উন্নয়ন সম্ভব এবং অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব বাজারে প্রবেশাধিকারের অভাবে তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দ্রুত অর্থনীতি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাল মিলাতে পারছে না। তাই ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় বিশ্ব কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিতে কিছু অক্ষমতা আছে। LDCs ভুক্ত রাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্যে সংস্থা যাতে আরও সুবিধা প্রদান করতে পারে তার ওপরে গুরুত্ব দেয়।

উন্নয়ন ও শান্তি— এ দুটি বিষয় পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শান্তির জন্য উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এর জন্য দূর করতে হবে ক্ষুধা, অশিক্ষা, অসুস্থতা ও দারিদ্র্য। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে' তৃতীয় বিশ্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার নিশ্চিত, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বিশ্বব্যাপী স্থলমাইন অপসারণে সব ধরনের সহযোগিতা এবং এর

বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের সামাজিক ও আর্থিক সহযোগিতা বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তঃসহযোগিতা বৃদ্ধি, বিশ্বে সব ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের বিরোধিতা, অবৈধ অস্ত্রপাচার, মাদক পাচার, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের বলিষ্ঠ ভূমিকা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর ষষ্ঠ সম্মেলন, যা ২০০৫ সালে হংকং-এ অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে কৃষি ভর্তুকিকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো জোটবদ্ধ হয় এবং উন্নত বিশ্বকে এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। সম্মেলনের শেষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ১৯ পৃষ্ঠার হংকং ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিখাতে ২০১৩ সাল থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং স্বল্পোন্নত দেশকে ৯৭ ভাগ পণ্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা দেবে। যাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৭৫০ ডলারের কম তারাই এ সুবিধা পাবে। ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

তৃতীয় বিশ্ব বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিশ্ব গড়ে তুলতে তৃতীয় বিশ্ব যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা জাতিসংঘসহ উন্নত বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। ইতিহাসের পরিক্রমায় হয়তো এ তৃতীয় বিশ্বই একদিন উন্নত বিশ্বে পরিণত হবে। সেই দিন মনে হয় বেশি দূরে নয়।

০৩। 'জাতীয় নিরাপত্তা' ও 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' বলতে কি বোঝেন? বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোর নিরাপত্তার সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]*

উত্তর : জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি প্রতিটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নয়নশীল, অনুন্নত, এমনকি উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেরও জাতীয় নিরাপত্তার সমস্যা থাকতে পারে। তবে প্রশ্ন হলো কোন রাষ্ট্র কতটা দক্ষতার সাথে এ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে? এক্ষেত্রে দেখা যায়, উন্নত বিশ্বের বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রগুলো যতটা দক্ষতার সাথে এ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলো তা ততটা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারে না। কারণ এ সকল দেশ কেবল যে আকৃতিতে ছোট তা-ই নয়, বরং এরা অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দুর্বল, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অদক্ষ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অনেক পিছিয়ে। তাই দেখা যায়, এদের নিরাপত্তা নানাদিক থেকে বিঘ্নিত হতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এ সকল দেশের নিরাপত্তা সমস্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ। তবে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এ সকল দেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা

জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি অস্পষ্ট। এর কোনো সুস্পষ্ট অর্থ নির্ধারণ আজও সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞ এটিকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন। যেমন—Encyclopedia of Social Science-এ জাতীয় নিরাপত্তা বলতে বোঝানো হয়েছে, 'The ability of a nation to protect it's internal values from external threats.' অর্থাৎ, জাতীয় নিরাপত্তা বলতে কোনো একটি দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধকে (Values) বহিঃআক্রমণ থেকে রক্ষার সামর্থ্যকে বোঝায়। ম্যাকনামারা নিরাপত্তাকে উন্নয়নের সমার্থক

বলতে চেয়েছেন। তার মতে, 'Security is development and without development there can be no security.' (নিরাপত্তা বলতে বোঝায় উন্নয়ন এবং উন্নয়ন ব্যতীত কোনো নিরাপত্তা থাকতে পারে না)। Burry Bugan বলেন, 'National Security means the security of whole socio-political entity. It is about countries as well as about states. It concerns the way of life of self-governing people, including their social, cultural, political and economic modes of organization and their rights to develop themselves under their own rule.'

সুতরাং জাতীয় নিরাপত্তা একটি বহুমাত্রিক ধারণা। অনেকে এটিকে কেবলই একটি সামরিক বিষয় ভেবে ভুল করে থাকে। প্রকৃতার্থে জাতীয় নিরাপত্তা কোনো দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, সর্বোপরি নিজের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে অন্য রাষ্ট্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার সামর্থ্যকেই বোঝায়।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র

কোনো একটি দেশ ক্ষুদ্র না বৃহৎ তা মাপার অনেক মাপকাঠি থাকতে পারে। তাই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় তা এক বাক্যে বলা মুশকিল এবং একে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রেও অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। তবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের শ্রেণীবিন্যাসের বেলায় তার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সামর্থ্যকেই বিবেচনায় আনা উচিত। এ প্রেক্ষিতে বিখ্যাত নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান তার 'The Security of Small States in Third World' গ্রন্থে বলেন, 'A small state is a state with a very low coventional war capability, not only in absolute global comparative terms but also vis-a-vis the large powers in it's region.' অর্থাৎ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে ঐ রাষ্ট্রকে বোঝায় যার যুদ্ধের সামর্থ্য খুবই কম এবং গতানুগতিক। এটা কেবল বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তুলনা নয়, বরং আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিগুলোর তুলনায়ও হতে পারে।'

সুতরাং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে ঐ সকল রাষ্ট্রকে বোঝায়, যে সকল রাষ্ট্র কেবল নিজস্ব সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না। বরং এজন্য অন্য কোনো রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান অথবা ভারসাম্য রক্ষা কিংবা বলপ্রয়োগকারী অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সমস্যা

উন্নয়নশীল তথা তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্য হয়তো একরূপ নাও হতে পারে। তবে এ সকল রাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতি ও সামরিক ব্যবস্থায় যে অবস্থানে রয়েছে তাতে এদের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে এদের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কতিপয় সাধারণ সমস্যা গোচরীভূত হয়। যেমন—

প্রথমত, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার সমস্যা মূলত তাদের ক্ষুদ্র আকৃতি বা দুর্বল জাতীয় শক্তি থেকেই উদ্ভূত। কেননা কোনো বহিঃআক্রমণের মোকাবিলা করতে তারা অক্ষম। তাদের এ দুর্বল অবস্থান একদিকে তাদেরকে অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে অন্যদিকে এ দুর্বল অবস্থানের কারণে অন্যান্য রাষ্ট্র এদেরকে আক্রমণ করতে পরোয়া করে না।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনাধীন। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সময় এ সকল রাষ্ট্র স্বাধীন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এদের সীমান্তসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ই অমীমাংসিত ও অস্পষ্ট থেকে যায়। তাই অমীমাংসিত ও অস্পষ্ট এ সীমান্ত প্রায়ই আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিরোধ যখন বিশেষত কোনো বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে হয় তখন তা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, যার অন্যতম উদাহরণ হলো বাংলাদেশ।

তৃতীয়ত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর শক্তি-সামর্থ্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর আধিপত্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দেয়। যেমন—শক্তিশালী প্রতিবেশী ভিয়েতনামের শিকার কম্বোডিয়া ও লাওস। অনেক সময় দুই আঞ্চলিক শক্তির প্রাধান্যের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে অনাবশ্যক মূল্য দিতে হয় এবং বিবদমান যে কোনো একটি রাষ্ট্রের সাথে অনাবশ্যক শত্রুতার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সৌদি আরব অনেকটা এরূপ পরিস্থিতির শিকার।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো তাদের স্বতন্ত্র সার্বভৌম অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মর্জিমাফিক কাজ করতে হয়। তাই এ সকল রাষ্ট্রকে অনেক সময় বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপের মুখে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর ও জোট বাঁধতে হয়। এতে জোট বর্হিভূত ও চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সব রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ফলে দেখা যায়, চাপের মুখে স্বাক্ষর করা অসম চুক্তি কিংবা চুক্তির ফলে সৃষ্ট শত্রুতা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন এ অবস্থাটা বেশি দেখা যেত। তখন ক্ষুদ্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো NAM গঠনের মাধ্যমে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করত। বর্তমানে ন্যামের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পাওয়ায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আপন আপন নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষায় বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে চুক্তি ও সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা বলা যায়।

পঞ্চমত, দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ ও কলহ অনেক সময় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রমণ বা অযাচিত হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করে দেয়। সাম্প্রতিককালে অবশ্য এ জাতীয় প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর এ সকল রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করলেও তারা জাতিগঠনে ব্যর্থ হয়। তখন রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশেরই প্রকৃতি দাঁড়ায় 'এক দেশ বহু জাতি' বা 'জাতি নয়, শুধু দেশ'। ফলে এ সকল দেশে জাতীয় সংহতির সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে যা প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ককেও অনেক সময় বিষিয়ে তোলে। এ জাতীয় সমস্যার অন্যতম উদাহরণ হলো বর্তমান আফগানিস্তান। দেশটির অভ্যন্তরীণ সমস্যার সূত্র ধরেই একে মার্কিন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয়।

ষষ্ঠত, ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে তাদের সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির মুখে। সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থার অতিরিক্ত নাক গলানোর কারণে এসব দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ নাজুক অবস্থায় উপনীত। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসব দেশের অবস্থা খুবই নড়বড়ে। এমন কি অনেক সময় এ সকল দেশ তাদের নিজেদের স্বাধীন প্রতিরক্ষা নীতিও প্রণয়ন করতে পারে না। যেমন—বাংলাদেশকে তার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দাতাদের মর্জির প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। অনেক সময় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের ব্যাপারেও দাতাদের অনুমোদন নিতে হয়। এমনকি অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পেরে অনেক দেশ বৃহৎ শক্তির হাতে নিজেদের নিরাপত্তার ভার তুলে দিতেও বাধ্য হয়। এর অন্যতম উদাহরণ নেপাল।

সপ্তমত, দক্ষ কূটনীতিও একটি দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর কূটনৈতিক দক্ষতা ও সামর্থ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিদেশে এদের মিশনগুলোতে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক যোগান ও লোকবলের অভাব রয়েছে। এমনকি এ সকল দেশের কূটনীতিকরা বহির্বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে পারে না। ফলে অনেক সময় বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তার নিরাপত্তার সাথে জড়িত, এমন বিষয়েও পূর্ব থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

অষ্টমত, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, প্রযুক্তিগত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়নশীল অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। তাছাড়া এদের অনেকের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনীও নেই। যেমন—মালদ্বীপ, ভুটান, কুয়েত প্রভৃতি। বাংলাদেশের মতো অনেক দেশ রয়েছে যাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকলেও যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে এ বাহিনী তেমন শক্তিশালীরূপে গড়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া এসব দেশের যথাযথ প্রযুক্তি ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় তাদের বিশাল সশস্ত্র বাহিনী অনেক ক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসে না।

নবমত, নানা সীমাবদ্ধতা ও সামর্থ্যহীনতার কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যখন নিজেরা তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, তখন তারা অনেক সময় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ওপর ভরসা করে। কেননা সভ্য দুনিয়ায় এক দেশ আরেক দেশকে যেনতেনভাবে আক্রমণ করে বসবে এবং অন্যরা তা চেয়ে চেয়ে দেখবে তা হতে পারে না। এ উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘসহ অন্যান্য অনেক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা ও সংগঠন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে এ সকল সংগঠনও তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। কেননা জাতিসংঘ আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বৃহৎশক্তির রাবার স্ট্যাম্প সংগঠনে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা যেমন—সার্ক, আসিয়ান, আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রভৃতিও আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী দেশগুলোর করায়ত্ত। এমতাবস্থায় দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে বাধ্য হয়েই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের বলি হতে হচ্ছে।

নিরাপত্তা সমস্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর করণীয়

ওপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তার ব্যাপারে অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এরপরেও একটা বিষয় অনস্বীকার্য, আন্তর্জাতিক বিশ্বে তাদের একটি স্বাধীন-সার্বভৌম অস্তিত্ব রয়েছে। এটাই তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান ভিত্তি। এমতাবস্থায় এ সকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা যেতে পারে :

১. **প্রতিরোধের প্রাথমিক সামর্থ্য অর্জন :** অর্থনৈতিক দুর্বলতা, কৌশলগত অসুবিধা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো বড় ধরনের কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে না সত্য, তারপরেও তাদের অন্তত প্রতিরোধের প্রাথমিক সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। এজন্য প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি সার্বক্ষণিক সামরিক বাহিনী থাকা আবশ্যক।

২. **দক্ষ কূটনীতি :** উন্নয়নশীল বিশ্বের এ সকল ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে কূটনীতিতে আরো দক্ষ ও উন্নত হতে হবে। ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান মনে করেন, 'A prudent and well thoughtout foreign policy is a small states first line of defence'। সুতরাং একটি দক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব দেশকে তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। সেজন্য তাদেরকে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রথমে যে কোনো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। অর্থাৎ নিজের শক্তি না থাকলেও অন্যান্য রাষ্ট্রের শক্তিকে বিপদের সময় নিজের পক্ষে ব্যবহারের মতো কূটনৈতিক দক্ষতা দেখাতে হবে।

৩. **নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা :** বর্তমানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যুগে কোনো দেশই পুরোপুরি নিরাপদ থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর উচিত সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং যেসব দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় জড়িত তাদের সাথে কোনো বিরোধে না জড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী কোনো শক্তিশালী দেশের মুখোমুখি না হয়ে বরং সবসময় এদের পেছনে পেছনে থেকে গা বাঁচিয়ে যাওয়াটাই উত্তম।

৪. **সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা :** নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ সকল ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর উচিত সর্বপ্রথম তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করা এবং জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করা। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত কোনো পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব নয়, বরং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা যে হুমকির মুখে তা সুস্পষ্ট। এসব দেশ আজ বৃহৎ শক্তিগুলোর অস্ত্রের মুখে বেঁচে আছে। তাদের জীবন আজ বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর করুণার মুখাপেক্ষী। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বাধীন সত্তা হিসেবে তাদের টিকে থাকার যে স্বীকৃতি এটাই তাদের একমাত্র ভরসা। একে ভর করেই তাদের টিকে থাকতে হবে। আর স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে হলে তাদেরকে প্রথমেই নিজের ঘর গোছাতে হবে। কেননা এসব দেশের নিরাপত্তার মূল হুমকি প্রধানত অভ্যন্তরীণ এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের পথ তৈরি করছে।

০৪। স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এসব দেশের অবস্থান তুলে ধরুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ পূর্বের তুলনায় আরো অধিক অন্তহীন সমস্যায় নিপতিত হয়। এরা হয়ে পড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ। এদের অবস্থান হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত দেশ হিসেবে। উন্নত বিশ্বের নিকট এসব দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, গৃহযুদ্ধ, শিশু মৃত্যু, মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এদের নিত্যসঙ্গী। অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, শাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির অভাব এদের চিরচেনা। ঋণের ভারে জর্জরিত এসব দেশের প্রত্যেকটি শিশু মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া এদেরকে স্পর্শ করে না। এসব স্বল্পোন্নত দেশসমূহে মোট লোকসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দশ ভাগ। অথচ বিশ্ব বাণিজ্যে এদের অংশগ্রহণ মাত্র ০.৫ ভাগ। ২০১১ সালের ১ জানুয়ারির হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের (LDCs) সংখ্যা ৪৮।

স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **নিম্ন জীবনযাত্রার মান :** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় নিম্ন, তাই জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। এর মূলে রয়েছে কতকগুলো পরিমাণগত ও গুণগত কারণ। যথা– নিম্ন আয়, অপর্যাপ্ত বাসস্থান, দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, উচ্চ জন্মহার, নিম্ন গড় আয়ু, কাজের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি।

২. **নিম্ন মাথাপিছু আয় :** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর GDP নিম্ন, কারণ উৎপাদন কম। তাই মাথাপিছু আয়ও কম। উন্নত দেশগুলোতে যেখানে গড় মাথাপিছু আয় ১০ হাজার ৪ শ ১৭ মার্কিন ডলার, সেখানে স্বল্পোন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় মাত্র ৭৭৫ ডলার।

৩. **উৎপাদনের নিম্নহার :** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উৎপাদনশীলতার স্তর নিম্ন। এর মূলে যে কারণগুলো বিদ্যমান তা হলো :
   ক. পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব;
   খ. দক্ষ শ্রমের অভাব ও
   গ. প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব।

৪. **দুর্বল অর্থনীতি :** স্বল্পোন্নত তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় নয়। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় উপনিবেশবাদ ও নির্ভরশীল করে রাখার সুপরিকল্পিত কূটকৌশলকে। এছাড়া শিল্পায়নের জন্য যে কূটকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন তা এদের নেই।

৫. **শিক্ষার অনগ্রসরতা :** স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ নিছক তাদের প্রয়োজনের তাগিদে একটি সংকীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নস্থ কর্মচারী সৃষ্টি করা, দক্ষ জনবল নয়। বিগত কয়েক দশকের পথ পরিক্রমায় এর কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং এর মানেরও উন্নতি হয়নি।

৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব :** LDC-ভুক্ত দেশগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ, রাজনৈতিক দলের কলহ ও আঞ্চলিক শক্তির উত্থান। এসব কারণে রাজনৈতিক দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবসময় বিরাজ করে। যার ফলস্বরূপ দেশের রাজনীতিতে সারাক্ষণ স্থিতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৭. **শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা :** প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপ, ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রভাব বিদ্যমান থাকায় শাসন ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলো সুফলভোগী হতে পারছে না।

৮. **অগণতান্ত্রিক মনোভাব :** গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা। কিন্তু পরিবারতন্ত্র, স্বৈরশাসন, দুর্নীতি, জবাবদিহিতাহীন নেতৃত্ব, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, স্বেচ্ছাচারিতা, অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের চর্চা গণতন্ত্র চর্চার পথকে রুদ্ধ করছে। ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অনেকটাই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন।

৯. **কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা :** স্বল্পোন্নত দেশের ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬৬ ভাগ লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত। এসব দেশসমূহের কৃষিখাত থেকে GDP-তে অবদান গড়ে ২০-৩০ ভাগ। কৃষিকাজের ফলে শিল্পায়নের প্রসার হয়নি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেনি।

১০. **ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা :** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় দাতা দেশগুলোর সহায়তায় এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে নেয়া ঋণের মাধ্যমে। উন্নয়ন ব্যবস্থায় বাহ্যিক হস্তক্ষেপ, উচ্চহারে সুদ প্রদান, ব্যবস্থাপনায় অদূরদর্শিতা ইত্যাদি কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত নড়বড়ে। ফলস্বরূপ একদিকে ঋণের বোঝা অন্যদিকে দরিদ্রতা বেড়ে চলছে সমহারে।

১১. **সামরিক শক্তির হস্তক্ষেপ :** তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘন ঘন সরকার বদল। রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক যন্ত্রে সামরিক শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য বিদ্যমান, যা সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনার পথে প্রধান বাধা।

১২. **খাদ্য সংকট :** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অনেক দেশই খাদ্য সংকটের শিকার। তাদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। যার ফলে খাদ্য সংকট নিরসনকল্পে প্রতিবছর উন্নত দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে এবং এতে পরনির্ভরশীলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান

বিশ্বায়ন একটি সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন বিষয়। বিশ্বায়ন বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। জাতি-রাষ্ট্রের সীমানাকে তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি একীভূত গ্রামে পরিণত করেছে। বিশ্বায়ন

শব্দটি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থে বা অনুষঙ্গে সৃষ্টি হলেও অনিবার্যভাবে তার প্রতিভাস এসে পড়েছে বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। নিচে বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অবস্থান ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **ধনী-দরিদ্র বৈষম্য ও মানব বঞ্চনা :** বিশ্বের ১ ভাগ ধনী মানুষ ৫৭ ভাগ দরিদ্র মানুষের সমান আয় করে। আমেরিকার ১০ ভাগ ধনী জনগণের আয় বিশ্বের ৪৩ ভাগ দরিদ্র জনগণের সমান। ১৯১৩ খ্রিঃ বিশ্বে দরিদ্রের হার ছিল ১৩.১ ভাগ, যা ১৯৯২ খ্রিঃ এসে দাঁড়িয়েছে ৭৭.১ ভাগে। বিশ্বে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২৬০ কোটি, পানীয় ও জল সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ১৮০ কোটি, পুষ্টি সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ৮৪ কোটি। বিশ্বের ১৫০ কোটি মানুষ ৬০ বছর বয়স হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে।

২. **তথ্য প্রবাহ ও বঞ্চনা :** পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে, তথ্যের অবাধ প্রবাহের গল্প এখন বিশ্বময়। অথচ পরিসংখ্যানে দেখা যায় এ তথ্য প্রবাহজনিত সুবিধাসমূহ উন্নত দেশসমূহই বেশি ভোগ করে। অনুন্নত দরিদ্র রাষ্ট্রের অশিক্ষিত জনগণ হচ্ছে বঞ্চিত। Internet World Statistics-এর তথ্য মতে, বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহার চিত্রে পরিদৃশ্যমান হয় যে, এশিয়ায় ২৭.৫%, ইউরোপে ৬৩.২%, আমেরিকায় ৭৮.৬%, আফ্রিকায় ১৫.৩%, মধ্যপ্রাচ্যে ৪০.২% ভাগ, ওশেনিয়ায় ৬৭% লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। মোট ইন্টারনেট ব্যবহারের ৯০% ব্যবহার করে ধনী দেশের লোকেরা এবং ১০% ব্যবহার করে গরিব দেশের লোকেরা।

৩. **শিক্ষাব্যবস্থা :** বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব মারাত্মক। বিশ্ব বিদ্যালয়গুলো বিগত দেড়শ বছরেও এমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বায়নে হারাচ্ছে তার মর্যাদা, স্বকীয়তা। উচ্চ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা রূপান্তরিত হচ্ছে পণ্যে। হারাচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। মেধাস্বত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির পেটেন্ট বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কিনে নিচ্ছে। যার ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনক্ষম হচ্ছে না। পাশ্চাত্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভীড় বেড়ে গেছে।

৪. **ভাষার গোলক ধাঁধা :** বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের প্রায় ৭ হাজার ভাষার মধ্যে প্রতি সপ্তাহে দুটি এবং প্রতিবছর শতাধিক ভাষা অপমৃত্যুর কবলে পড়ছে। আর মৃত সারিতে নাম লিখিয়েছে ম্যাসাচুসেটের ক্যাটওয়া, আলাস্কার ওয়াক, লাটভিয়ার লিভোনিয়ান। বিশ্বের ৬০-৯০ ভাগ ভাষা অদূর ভবিষ্যতে এমনি পরিণতি লাভ করবে। ২০৫০ খ্রিঃ ৩৫০ কোটি লোকের ভাষা হবে ইংরেজি। বিশ্বের প্রতিটি দরিদ্র দেশে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা স্থান করে নিচ্ছে। মানুষ নিজেকে স্মার্ট করে নেয়ার জন্য মাতৃভাষার মধ্যে ইংরেজি, জাপানি, ফার্সি, আরবি, ভাষার মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। এভাবে আপ-টু-ডেট হওয়ার প্রবণতা দরিদ্র দেশের সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন :** বিশ্বায়নের নামে মানুষকে যেভাবে স্যাটেলাইট চ্যানেল পশ্চিমা সংস্কৃতি সরবরাহ করছে তাতে একে নিঃসন্দেহে 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন' বলে বর্ণনা করা যায়। সাংস্কৃতিক এ আগ্রাসনকে অনেকে 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বায়ন একটি দেশের মূল্যবোধ, সমাজবীক্ষণ ও জীবনধারণের ধ্যান ধারণাকে সুকৌশলে অনুন্নত দরিদ্র দেশের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এটাই ঘটছে বিশ্বজুড়ে। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল

দেশগুলোর সমাজ জীবন ক্রমাগত এ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এসে পড়ছে। এসব দেশের মানুষের আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তায় যা কিছু দেশজ তাকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ।

৬. **সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন :** দিন দিন বিশ্বায়নের প্রভাবে দরিদ্র দেশের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। যৌনতা, হিংস্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় বা আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব সন্ত্রাসবাদে রূপ নিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন দুর্ধর্ষ গেরিলা সংস্থা। দেহ ব্যবসা বিশ্ব বাণিজ্যের অংশে পরিণত হয়েছে। প্রবীণদের সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। একান্নবর্তী পরিবারগুলো দ্রুত ভেঙে পড়ছে। মানুষ হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক। যত দিন যাচ্ছে এ সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, মূল্যবোধে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ প্রতিভাত হচ্ছে। বিনোদনের মাধ্যমে সঙ্গীত ব্যবস্থায় রক অ্যান্ড রোল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দিন দিন হিপ্পিদের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

৭. **যোগাযোগ ব্যবস্থা :** বিশ্বায়নের অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন। অতীতের হাতি বা ঘোড়া বা গরুর গাড়ি, নৌকা, পালকি ইত্যাদির স্থলে বর্তমানে সাইকেল, মোটর সাইকেল, ট্রেন, যন্ত্রচালিত নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, বিমান, মাইক্রোবাস, বাস প্রভৃতি দখল করে নিয়েছে। জীবনকে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গতিশীল করে তুলেছে। সময়কে অনেক বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং যাতায়াতকে করেছে আরামপ্রদ।

৮. **পুঁজি প্রবাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য :** বিশ্বায়নে পুঁজি অবাধে আসবে, অবাধে যাবে। কিন্তু বাস্তবে উন্নয়নশীল দেশ এ পদক্ষেপ গ্রহণের পর পুঁজি কেবল বাইরের দিকে যেতেই থাকে। এ ব্যবস্থায় পুঁজি একটি দেশে প্রবেশ করে শেয়ার বাজার ও রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ে ফটকাবাজির জন্য। তারপর বহুগুণে স্ফীত হয়ে সামান্য ঝড়ের আভাসেই ছুটে পালায়। বিশ্বায়নের মূল চালিকাশক্তি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। শিল্পপণ্যের বাণিজ্য গত ৫০ বছরে ১শ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ খ্রি. যেখানে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯৫ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ ট্রিলিয়ন ডলারে। ব্যবসা-বাণিজ্যখাত অর্থনীতির অন্যান্য খাত থেকে দ্রুততম সময়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের সম্ভাবনাময় স্থানে পুঁজি বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকৃত দেশকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ছে নির্ভরশীল দরিদ্র দেশগুলো। বহুজাতিক কোম্পানির প্রেসক্রিপশনে দরিদ্র দেশগুলোকে সকল নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বিশ্বায়ন যে মিথ (কারণ, ব্যাখ্যা) নিয়ে হাজির হয়েছিল তাতে স্বল্পোন্নত দেশের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি– যদি এ বিশ্বায়ন পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন না হতো। বর্তমান বিশ্বায়নে সম্পদশালীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। আর স্বল্পোন্নত দেশগুলো দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়ন যেহেতু একটি প্রক্রিয়া বা ধারণা তাই এ প্রক্রিয়া বা ধারণাকে থামিয়ে রাখা বা বাধাদান করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়ন যতই আমরা অপছন্দ করি না কেন এ বৃহত্তর প্রক্রিয়া থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বের হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, এখন যা উচিত তা হলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ভেবে-চিন্তে সামনে এগিয়ে যেতে হবে যাতে তারা এ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে সুবিধা লাভ করতে পারে। অপরদিকে উন্নত, ধনী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোকে শোষণের মানসিকতা পরিহার করে সকলের সুবিধার স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

০৫। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কি? এ আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক এর সাফল্য মূল্যায়ন করুন। পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় এর আবশ্যকতা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বি-মেরুপ্রবণ ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ ভারাক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিশ্বে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় ধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সামনে রেখে সৃষ্টি করা হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন এসেছে। দ্বি-মেরুভিত্তিক রাজনীতি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিদায় নিয়েছে। একমেরুভিত্তিক (Unipolar System) বিশ্বব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ মহলে তাই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন কি?

জোট নিরপেক্ষ বা জোটবদ্ধতা কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির একটা কৌশল। জে ডব্লিউ বার্টন (J W Burton)-এর মতে, সাধারণ অর্থে জোট নিরপেক্ষতা বলতে কোনো দেশের এমন পররাষ্ট্রনীতি নির্দেশ করে, যা কোনো কমিউনিস্ট বা পাশ্চাত্য জোটের সাথে জোটভুক্ত নয়। অর্থাৎ–The term non-alignment is commonly used to describe the foreign policies of nations which are not in alliance with either the communist or the western block .

কেউ কেউ অবশ্য জোট নিরপেক্ষতা বলতে দুই বৃহৎ শক্তি থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করাকে বুঝিয়েছেন। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে Principal of equidistance বা সমদূরত্ব নীতি জোট নিরপেক্ষতা নয়।

জওহরলাল নেহেরু বলেন, 'আমি যখন বলি আমরা কোনো শক্তি জোটের সাথে নিজেদের জড়িত করি না, তার অর্থ এই নয় যে, এক দেশের তুলনায় অন্য দেশের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে না।'

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ১৯৫৪ সালে ভারত সফরকালে এক যুক্ত ইশতেহারে বলেন, 'The policy of non-alignment with blocks in neither neutrality, nor neutralism...but constituer an active. Positive and constructive policy aiming at collective peace which is the only possible foundation for collective security.' অর্থাৎ, কোনো জোটভুক্ত না হওয়ার অর্থ নিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতার নীতি নয়। জোট নিরপেক্ষতা একটি সক্রিয় ইতিবাচক ও গঠনমূলক নীতি এবং এ নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌথ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটিই যৌথ নিরাপত্তার একমাত্র বাস্তব ভিত্তি।

জোট নিরপেক্ষতা আজ আর কোনো আন্দোলন নয়, বরং এটি একটি অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। জোট নিরপেক্ষতা কোনোরূপ নিঃসঙ্গতা নয়, বরং এটি সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ এবং জাতিগত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন, যার ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ বাসস্থান।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে যখন ব্রিটিশ, ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ উপনিবেশের পতন ঘটে, তখন ঐসব দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সময় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গোটা বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দেশ দুটি ঠাণ্ডা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সদ্য ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে কোনো একটা বিশেষ শিবিরে যোগ দেয়া সম্ভব ছিল না। ফলে তারা গড়ে তোলেন NAM (Non-Aligned Movement)।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গঠন

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৫৫ সালের এপ্রিল বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনের মাধ্যমে। যদিও বান্দুং সম্মেলনে মার্শাল টিটো যোগদান করেননি, কিন্তু বান্দুং সম্মেলনের পর বেলগ্রেডে টিটো, মিসরের জামাল আবদুল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার ড. সুকর্ন এবং ভারতের জওহরলাল নেহেরুর মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল। সেখানেই NAM-এর জন্ম চূড়ান্ত হয়। ১৯৬১ সালের ১-৬ সেপ্টেম্বর জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের প্রথম সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল মাত্র ২৬টি দেশ।

NAM গঠনের কারণসমূহ :

১. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে কোনো একটা বিশেষ শিবিরে যোগদান করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাদের পুনর্গঠনের জন্য সকল বৃহৎ রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল।

২. বৃহৎ শক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাওয়া।

৩. সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

৪. স্নায়ুযুদ্ধের যোগদান থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

৫. সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী ধারণার বিকাশ সাধন।

৬. সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।

৭. নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে এশিয়া ও আফ্রিকায় অনেক দেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালা : ১৯৫৫ সালের জোট নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে পঞ্চশীল নীতি গৃহীত হয়। সংক্ষেপে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতি হলো প্রধানত তিনটি : ১. বিশ্বশান্তি রক্ষা, ২. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ৩. জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জোরদার করা।

NAM-এর পর্যালোচনা

মূলত স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হতে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বহুসংখ্যক রাষ্ট্র প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোনো জোটের অনুসারী না হয়ে, কোনো একটি আদর্শকে গ্রহণ না করে, স্নায়ুযুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে জোটবদ্ধ ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি উদাসীন থেকে এবং নিজেদের ভূখণ্ডকে কোনো জোটের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে না দিয়ে এ আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও নীতি বিশ্লেষণ করে আর্নেস্ট লেফেভার (Ernest Lefever) এ আন্দোলনের মর্মবাণী সম্পর্কে ছয়টি সূত্র উল্লেখ করেন :

১. এই আন্দোলন রাষ্ট্রের (জোটবহির্ভূত) রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে।

২. এর ফলে স্বাধীনতার বক্তব্য উপস্থাপন এবং কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভব হয়।

৩. এ আন্দোলন ছোট ছোট জাতিকে যে সমস্যার সাথে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই, তাতে জড়িয়ে পড়া থেকে মুক্তি দেয়।

৪. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সহজভাবে কাজ করতে পারে।

৫. সামরিক দায়িত্বে ব্যবহৃত জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়।

৬. প্রত্যেক জোট থেকে জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য অনুদান পাওয়া সম্ভব হয়।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্য ও ফলাফল : স্নায়ুযুদ্ধের পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করে। এ আন্দোলন স্নায়ুযুদ্ধের ওপর এক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা চাপ সৃষ্টিকারী (Pressure group) হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা তাদের কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্যের দাবি রাখে। যেমন—

১. দুটো পরাশক্তিই তাদের বলয়ের বাইরের দেশকে নিজেদের বলয়ে নিয়ে আসার জন্য তোষণনীতি অবলম্বন করে। এর ফলে জোটভুক্ত দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়।

২. নিজস্ব নিরাপত্তার প্রতি কোনো প্রকার হুমকি সৃষ্টি হলে পরাশক্তিদ্বয়ের যেকোনো একটির সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যেতো। আফগানিস্তান সংকটের সময় মুজাহিদদের প্রতি মার্কিন সমর্থন এর প্রকৃত উদাহরণ।

৩. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে জোট নিরপেক্ষ সদস্যরা যৌথ জনমত গঠন করে পরাশক্তিদের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে, যা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

৪. এ আন্দোলন স্নায়ুযুদ্ধের ব্যাপ্তি রোধ করে বিশেষ শান্তি স্থাপনে সহায়তা করে।

৫. সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ জোট বিশেষভাবে অবদান রাখে। ষাট দশকের শেষের দিকে এ জোট আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইস্যুর চেয়ে অর্থনৈতিক ইস্যুকে প্রাধান্য দেয়। তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদেরই বিশেষ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৭-জাতি গ্রুপ (Group of 77) ও UNCTAD (United National Conference on Trade and Development)। ১৯৭৪ সালের ১ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত হয় NIEO—New International Economic Order.

৬. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হয়।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন যদিও স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যাত্রা শুরু করে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এদের অনেকেই আর জোট নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। এর মূল কারণ ছিল প্রথমত, সদস্য দেশসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান কোন্দল; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় দেশের আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনসমূহ

সম্মেলন	*স্থান*	*অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ*
১ম	*বেলগ্রেড, যুগোশ্লাভিয়া*	*১-৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬১*
২য়	*কায়রো, মিশর*	*৫-১০ অক্টোবর ১৯৬৪*
৩য়	*লুসাকা, জাম্বিয়া*	*৮-১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০*
৪র্থ	*আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া*	*৫-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩*
৫ম	*কলম্বো, শ্রীলংকা*	*১৬-১৯ আগস্ট ১৯৭৬*
৬ষ্ঠ	*হাভানা, কিউবা*	*৩-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯*
৭ম	*নয়া দিল্লি, ভারত*	*৭-১২ মার্চ ১৯৮৩*
৮ম	*হারারে, জিম্বাবুয়ে*	*১-৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬*
৯ম	*বেলগ্রেড, যুগোশ্লাভিয়া*	*৪-৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯*

সম্মেলন	স্থান	অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
১০ম	জার্কাতা, ইন্দোনেশিয়া	১-৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯২
১১তম	কার্টাগোনা, কলাম্বিয়া	১৮-২০ অক্টোবর ১৯৯৫
১২তম	ডারবান, দ. আফ্রিকা	২-৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
১৩তম	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া	২০-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
১৪তম	হাভানা, কিউবা	১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬
১৫তম	শার্ম আল শেখ, মিশর	১১-১৬ জুলাই ২০০৯
১৬তম	তেহরান, ইরান	২৬-৩১ আগস্ট ২০১২
১৭তম	কারাকাস, ভেনিজুয়েলা	২০১৫

সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এর ১৬তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইরানের রাজধানী তেহরানে। শীর্ষ সম্মেলন ৩০-৩১ আগস্ট ২০১২ অনুষ্ঠিত হলেও এর পূর্বে ২৮-২৯ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ২৬-২৭ আগস্ট জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। NAM-এর ১৬তম সম্মেলন চলাকালীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ। ৩০ আগস্ট ২০১২ তিনি মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসির কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪ জুন ২০১৩ ইরানের ১১তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ড. হাসান রুহানি। তাই বর্তমানে ন্যামের চেয়ারম্যান ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানি। পরবর্তী সম্মেলন না হওয়া পর্যন্ত তিনিই এ দায়িত্ব পালন করবেন।

পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন : NAM-এর সপ্তদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ভেনিজুয়েলার কারকাসে ২০১৫ সালে।

প্রথম ন্যাম নারী সম্মেলন : 'বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নারীর ক্ষমতায়ন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ন্যাম নারী সম্মেলন। সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর দুর্দশাসহ নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া প্রতি দুই বছর অন্তর সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। সম্মেলনের শেষ দিন ১০ মে ২০০৫ পুত্রাজায়া ঘোষণা গৃহীত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পুত্রাজায়া ঘোষণায় ৫০টি নির্দিষ্ট বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। সম্মেলনে গৃহীত ৯টি প্রধান বিষয় হচ্ছে : ১. নারী, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ২. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা, ৩. নারী ও শিক্ষা, ৪. নারী ও স্বাস্থ্য, ৫. নারী, গণমাধ্যম এবং তথ্যপ্রযুক্তি, ৬. নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, ৭. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, ৮. লিঙ্গ বৈষম্য, ৯. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নারী।

দীর্ঘ ৫৭ বছরে NAM আজ যে পর্যায়ে এসেছে, বিশ্বব্যাপী যে ভূমিকা রেখেছে, তাতে এ সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘের পর দ্বিতীয় বৃহৎ বিশ্বসংস্থা হচ্ছে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে দেখলে এ জোটের ভূমিকা আজ নগণ্য।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে NAM-এর প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বব্যবস্থার যেসব প্রেক্ষাপটে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সময়ের বিবর্তনে সেসব অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ তাই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কে এখন দুটি মত প্রচলিত।

প্রথম মতামত, বিপক্ষবাদী : হিলারি গুয়েনো (Hillary Ngiweno)-এর মতে, কেউ কেউ বলেন, 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দিন শেষ হয়ে গেছে।' যেসব রাজনৈতিক যোদ্ধারা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে ভিজে বারুদের সাথে তুলনা করেছেন, তাদের যুক্তি হলো :

প্রথমত, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ আন্দোলনের জন্ম হয় তা অর্জিত হয়েছে। আন্দোলেনের জনকদের সামনে লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক নাগপাশ থেকে বিভিন্ন অধিকৃত জনপদের মুক্তিলাভ ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশ এবং ঠাণ্ডা লড়াই যেন উত্তপ্ত সংঘাতে রূপলাভ করতে না পারে সেজন্য দুই পরাশক্তির ওপর চাপ প্রয়োগ। ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটেছে, ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা স্নায়ুযুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটেছে। ফলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন যা অর্জন করার জন্য জন্মলাভ করে তা অর্জন করে এক অর্থে 'নিজস্ব কৃতিত্বের শিকার' হয়ে (Being a victim of his own success) অর্থহীন হয়ে পড়েছে এবং স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

দ্বিতীয়ত, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কার্যকারিতা এতই সামান্য হয়ে পড়েছে যে, শীর্ষ সম্মেলন ছাড়া বেঁচে থাকার উপায় নেই NAM কোনো আন্দোলন গোষ্ঠীর নাম।

তৃতীয়ত, ন্যামের আন্দোলন পশ্চিমা শক্তির সামান্যতমও মত বদলাতে পারেনি।

চতুর্থত, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংঘর্ষ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে কার্যকর রাখা থেকে বিরত রেখেছে।

পঞ্চমত, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে সাফাই গাইলেও নিজেরা অস্ত্রের পাহাড় গড়ছে।

এসব কারণে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন।

দ্বিতীয় মতামত, পক্ষবাদী : বেশ কিছু পর্যালোচকের মতে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা আদর্শের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেই তার যাত্রা সমাপ্ত করতে পারে না। ঔপনিবেশিকতার অবসান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্প্রীতি বা স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পক্ষে তাই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজও টিকে আছে এক জীবন্ত সত্তারূপে। বর্তমান বিশ্বে তাই একদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর সদস্য সংখ্যা, অন্যদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর গুরুত্ব।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে অতীতে কোনো কোনো পর্যালোচক কমিউনিস্টদের সেবায় নিয়োজিত 'ট্রয়ের ঘোড়া' (Trojan Horse) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারপরেও এ আন্দোলন বিশ্বের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত রাষ্ট্রসমূহের সুসংহত সংগঠনরূপে গড়ে উঠেছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কর্মসূচি পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত হয়েছে এর লক্ষ্যও। কিন্তু এর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে বলা যায়, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অপমৃত্যুর কোনো সম্ভাবনা নেই। যদিও স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটেছে, সমাপ্ত হয়েছে দুই পরাশক্তি কেন্দ্রিক আদর্শিক দ্বন্দ্ব, সাংঘর্ষিক পরিবেশের পরিবর্তে বিশ্বময় গড়ে উঠেছে সহযোগিতার এক সুহৃদ পরিবেশ। তবুও এ আন্দোলনের ভিত্তি কোনোক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েনি।

জোট নিরপেক্ষ নীতি কোনো সময়ই 'একলা চলার নীতি' ছিল না। সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবার জন্য সহযোগিতা ছিল এর মূলকথা। প্রধানত আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে দু ধরনের মানসিকতা থেকে এর জন্ম হয়েছে। ১. নেতিবাচক—সামরিক জোটকে সযত্নে এড়িয়ে চলা। ২. ইতিবাচক—স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ এবং জাতীয় প্রয়োজন ও আদর্শকে সামনে রেখে জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজকে পরিচালনা করা। এদিক থেকেও বলা যায়, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সাধারণ কোনো

আন্দোলন নয়। এর প্রয়োজন আজও অনস্বীকার্য। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে জোরদার করার পেছনের কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. দুই পরাশক্তির ক্ষমতা দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটলেও বর্তমান বিশ্বে অঞ্চলভিত্তিক অনেক শক্তি কেন্দ্রের জন্ম হয়েছে।
২. ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটলেও আধিপত্যবাদ বা নয়া ঔপনিবেশিকতার প্রভাবও অনুভূত হচ্ছে তীব্রভাবে।
৩. নতুনভাবে প্রভাব অর্জনকারী আঞ্চলিক শক্তিকেন্দ্রগুলোরও রয়েছে নিজস্ব প্রভাব বলয় বৃদ্ধির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা।
৪. রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বাদ দিলেও বাজার অর্থনীতির এ যুগে বাজার দখলের প্রতিযোগিতাও তীব্র।
৫. বিশ্বময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারাও সুগম নয়। তৃতীয় বিশ্বকে ছাপিয়ে জন্মলাভ করছে চতুর্থ বিশ্বের সবচেয়ে অনগ্রসর কিছু সংখ্যক দেশের (Least Developed Countries) এক সারি। এসব দেশে 'প্রবৃদ্ধিহীন বৃদ্ধির' (Growth without Development) প্রবণতাও অত্যন্ত অশুভ। কেননা এসব দেশ কিছুসংখ্যক বৃহৎ ও অগ্রসরমান দেশের ওপর ক্রমে ক্রমে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

সময়ের দাবিকে বরণ করে এ সংস্থা অতীতে যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন এক পথ রচনা করেছিল, ভবিষ্যতেও তা তেমনি প্রক্রিয়ায় শুধু টিকে থাকবে তাই নয়, সফলভাবে পথও চলবে। কেবল জোট নিরপেক্ষতার রাজনীতি নয়, তৃতীয় বিশ্বের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ন্যাম সংগঠনটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারলে এ আন্দোলনের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি ঘটবে। বিশ্ব এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবে। বিশ্ব শান্তির জন্যও এটা সহায়ক হবে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬। ক. রাষ্ট্র বলতে কি বোঝেন?
খ. রাষ্ট্র গঠনের উপাদান পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : সভ্যতার ইতিহাসে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হলো 'রাষ্ট্র' বা 'State'। গ্রিক নগররাষ্ট্রই 'Feudal state' এবং পরবর্তীতে 'Empire state' হয়ে Nation state বা জাতিরাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ state বা রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, 'The highest political association'। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল একে 'Union of families' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র রাষ্ট্রের পূর্বের সব রূপ থেকে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আর এজন্যই আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের কতিপয় মৌলিক আবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে। বর্তমান জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় জাতিরাষ্ট্রের এ উপাদানগুলোর যথাযথ অস্তিত্ব নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্র

ইংরেজি ভাষায় রাষ্ট্র বলতে বোঝায় 'State', যা গ্রিক শব্দ 'Polis' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। গ্রিক Polis শব্দের অর্থ হলো 'City state' বা নগররাষ্ট্র। উল্লেখ্য, রোমানগণ এ রাষ্ট্রকে Civitas বলতেন। তবে রোমানদের 'Civitas' এর সাথে 'Public welfare' বা জনকল্যাণের ধারণাটি সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু টিউটনরা রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'Status' শব্দটি ব্যবহার করত।

রাষ্ট্র অতি প্রাচীন শব্দ হওয়ায় এর প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ চেষ্টা করে চলেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের ভাষায় রাষ্ট্র হলো 'A union of families and villages having for its end a perfect and self sufficing life by which we mean a happy and honourable life.'

বুন্টসলি বলেছেন, 'The state is politically organised people of a definite territory.' অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনগোষ্ঠীই হলো রাষ্ট্র।

একইভাবে Burgess-এর মতে, রাষ্ট্র হলো 'A particular portion of mankind viewed as an organised unit.' অর্থাৎ সংগঠিত একক মনে করা হয় মানবজাতির এমন অংশকে রাষ্ট্র বলা হয়।

কিন্তু Bodin মনে করেন, 'State is an association of families and their common possessions, governed by supreme power and by reason.' অর্থাৎ রাষ্ট্র হলো পরিবারসমূহ এবং তাদের সাধারণ সম্পত্তির সংঘ, যা চূড়ান্ত ক্ষমতা যুক্তির দ্বারা শোষিত হয়।

তাছাড়া উদ্রো উইলসন বলেছেন, 'একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনগতভাবে সংগঠিত জনসমষ্টি হলো রাষ্ট্র।'

কিন্তু হ্যারল্ড জে. লাস্কি রাষ্ট্রের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, '(State is) a territorial society divided into government and subjects claiming within its allotted physical area, a supremacy over all other institutions.'

এলমন্ড এবং বরার্ট ডাল রাষ্ট্রের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাদের মতে, রাষ্ট্র হলো Political system বা রাজনৈতিক পদ্ধতি। এলমন্ডের মতে, সব স্বাধীন সমাজে বিদ্যমান মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতিই হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা integration এবং adoption-এর কাজ করে।

আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও জটিল। আধুনিক রাষ্ট্র অবশ্যই নিম্নোক্ত মৌলিক উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় :

ক. জনগোষ্ঠী;
খ. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড;
গ. সরকার এবং
ঘ. সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্র গঠনের উপাদান

রাষ্ট্র গঠনের জন্য কয়েকটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। এ উপাদানগুলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় 'Constituent element' বলে। এ উপাদানগুলো তিন ধরনের :

১. বাহ্যিক উপাদান (Physical element),
২. রাজনৈতিক উপাদান (Political element) ও
৩. আধ্যাত্মিক উপাদান (Spiritual element)।

বাহ্যিক উপাদানগুলো হলো জনসংখ্যা ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড; রাজনৈতিক উপাদান হলো সরকার এবং অধ্যাত্মিক উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। অতএব আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান হলো চারটি—

১. জনসংখ্যা (Population); ২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Fixed territory); ৩. সরকার (Government); ও ৪. সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)। নিচে এসব উপাদান বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **জনসংখ্যা :** এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, রাষ্ট্র হলো Human institution বা মানবিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোচ্চ মানবিক সংস্থা বা The highest of all human association। আর তাই অবশ্যই জনসংখ্যা ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। যে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যই জনসংখ্যা দরকার। যে ভূখণ্ডে মানুষের বসবাস নেই তাকে কোনোভাবেই রাষ্ট্র বলা যায় না। অন্যকথায় মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবন্ত প্রাণীই রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। উল্লেখ্য, রাষ্ট্র অবশ্যই

পরিবার থেকে বিকশিত হয়। কিন্তু একটি পরিবারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র গঠন হতে পারে না। রাষ্ট্র গঠিত হতে হলে অবশ্যই একাধিক পরিবার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার আকৃতিও (size of the population) গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটি রাষ্ট্রের জন্য কি পরিমাণ জনসংখ্যা আবশ্যক সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেননি। অনেকের মতে, রাষ্ট্রের জন্য 'size of population' নির্ধারণ করাও ঠিক নয়। তবে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মনে করেন যে, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অবশ্য এতই ব্যাপক হবে না যে, তা শাসন করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এরিস্টটল বলেছেন,

'The number should be neither too small nor too large; it should be large enough to be self-sufficient and small enough to be well-governed.'

কিন্তু এরিস্টটলের শিক্ষক প্লেটো রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার কথা বলেছেন। তার মতে, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অবশ্যই ৫০৫০ জন হতে হবে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ফরাসি দার্শনিক রুশো তার 'Social Contract'-এ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা দশ হাজারের বেশি হওয়া উচিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক দার্শনিকগণ মনে করেন, আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যার কোনো Exact figure নেই। তাদের মতে বর্তমান পৃথিবীতে জনসংখ্যায় ছোট বড় বহু রাষ্ট্র রয়েছে। পৃথিবীতে অসংখ্য রাষ্ট্র রয়েছে, যাদের জনসংখ্যা কোটিতে হিসাব করতে হবে। অন্যদিকে, ভ্যাটিকান সিটি, স্যান মেরিনোর মতো দেশগুলোর জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। ২০১৪ সালের জাতিসংঘ অর্থনীতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ (DESA)-এর জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুসারে ভ্যাটিকান সিটির জনসংখ্যা মাত্র ১০০০ জন এবং স্যান মেরিনোর জনসংখ্যা মাত্র ৩২,০০০ জন। অন্যদিকে ২০১৪ সালে UNFPA-এর জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুসারে ভারত ও চীনের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১২৬ কোটি ৭৪ লাখ ও ১৩৯ কোটি ৩৮ লাখ। তাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্নার বলেন, 'Population must be sufficient to provide a governing body and a number of persons to be governed and of course, sufficient to support a state organisation' 'সুতরাং শাসক নির্বাচন করার মতো শাসিত হওয়ার মতো জনসংখ্যা একটি রাষ্ট্রের থাকতে হবে।

২. **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড :** রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আবশ্যকীয় উপাদান হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা 'Territory'। জেলেনিক বলেন, 'Territory covers the surface of the land within well defined boundaries, the sub-soil, lakes and rivers and also air space above the land'। জেলেনিকের মতে, ভূখণ্ডের ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। কারণ তার মতে সর্বপ্রথম Lever ১৮১৭ সালে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের কথা বলেছেন।

সব আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড একটি আবশ্যকীয় উপাদান। তাই ব্লুন্টসলি বলেছেন, 'The state has its personal basis in the people, So it has its material basis in the land. The people do not become state until they have acquired territory.'

অর্থাৎ রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত ভিত্তি হলো জনগণ আর বস্তুগত ভিত্তি হলো ভূমি। আর তাই কোনো জনসমষ্টিই রাষ্ট্র হতে পারে না যদি না তাদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে।

৩. **সরকার :** রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় আবশ্যকীয় উপাদান হলো সরকার। কোনো রাষ্ট্রই সরকার ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। সরকার হলো একটি রাজনৈতিক সংগঠন। অনেকে বলেন, 'State

is the political organisation through which the collective will of the people is formulated, expressed and executed.'

অর্থাৎ সরকার হলো এমন রাজনৈতিক সংগঠন, যার মাধ্যমে জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা প্রণীত, প্রকাশিত এবং কার্যকর হয়। এটাই বাস্তব যে, সরকারি যন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সরকার এমন একটি সংগঠন, যার মাধ্যমে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জনগণের জন্য সাধারণ নীতিমালা তৈরি হয়।

৪. **সার্বভৌমত্ব :** সার্বভৌমত্বকে বলা হয় রাষ্ট্রের প্রাণ। সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোনো ভূখণ্ডই রাষ্ট্র হতে পারে না। অনেকে সার্বভৌমত্বকে বলেন, 'Supreme element of the statehood'। সার্বভৌমত্ব বা Sovereignty শব্দটির অর্থ হলো Supreme power of the state বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। রাষ্ট্রের এ সার্বভৌমত্ব তার সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতের জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও সেটি জাতিরাষ্ট্র হতে পারেনি। কারণ তখন তার সার্বভৌমত্ব ছিল না। কেননা, সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের এমন ক্ষমতা, যার ফলে বাইরের কোনো শক্তি তার অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সে যে কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা এবং চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম।

গৌণ উপাদান : রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদানগুলোর একটির অনুপস্থিতি হলে যেমন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হয় না, তেমনি রাষ্ট্রের গৌণ উপাদানসমূহ হচ্ছে সেসব উপাদান যার উপস্থিতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও দাবিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। নিচে রাষ্ট্রের গৌণ উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **রাষ্ট্রের স্বীকৃতি :** স্বীকৃতি রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পেতে হয়; একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।

২. **স্থায়িত্ব :** আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই স্থায়িত্বকে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান বলে মনে করেন। তাদের মতে, যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নেই, তা আর যাই হোক না কেন তাকে রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে শাশ্বত বা চিরন্তন বলে মনে করেন। তাদের মতে, শোষণের হাতিয়ার হিসেবে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি; শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তা আপনা থেকে বিলুপ্তি হয়ে যাবে।

৩. **জাতীয়তাবাদ :** রাষ্ট্রের উপাদানগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদ হলো অন্যতম গৌণ উপাদান। যদি কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমাজ একত্রে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ না হয় তাহলে কোনোভাবেই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের অন্যতম হাতিয়ার।

৪. **অধিকার ও সাম্য :** যখন একটি দেশ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয় তখন থেকে সে রাষ্ট্র অধিকার ও মর্যাদার অংশীদার হয়। বহির্বিশ্বে যখন একটি রাষ্ট্র তার মর্যাদা, সাম্য ও অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয় তখন তার সার্বভৌমত্ব অনেক সময় ক্ষুণ্ন হয়।

৫. **সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা :** একটি রাষ্ট্রের গৌণ উপাদানের মধ্যে স্বাধীনতা হলো অন্যতম। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যেমন অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে, তেমনি স্বীকৃতি লাভের পর সে রাষ্ট্রের অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা থাকতে হবে।

উপরিউক্ত উপাদানগুলো রাষ্ট্র গঠনের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, মিডিয়া, সাইবার জোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রের এসব মৌলিক উপাদানগুলোর অধিকাংশই এর যথার্থতা হারিয়েছে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মনে করেন, বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রেরই চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব নেই। সব রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। একইভাবে ভূখণ্ডগত ধারণাও আজ তেমন জোরালো হচ্ছে না। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ভূখণ্ডগত সীমানা মানছে না। এভাবে জাতীয় রাষ্ট্র এবং তার উপাদানগুলো আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

০৭। ক. রাষ্ট্রের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
খ. আপনি কি মনে করেন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার মূল চরিত্র হারিয়েছে?

উত্তর : মানবজাতির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। তাই অনেকে রাষ্ট্রকে বলেন 'The highest of all human associaction'। আর এজন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হলো রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা। মানবসমাজের সবচেয়ে আদিম প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হলেও বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও বিভিন্ন তাত্ত্বিকের পর্যালোচনায় রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের পর রাষ্ট্রের চারিত্রিক দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায়। এ সময়ে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নিজ আদর্শে উজ্জীবিত থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে।

রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

রাষ্ট্র একটি জটিল রাজনৈতিক সংস্থা। এ রাজনৈতিক সংস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন তাত্ত্বিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে আগ্রহী।

এক্ষেত্রে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভের মধ্য দিয়ে দুটি প্রধান চরিত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। এ দুটি রাষ্ট্রব্যবস্থাই দুটি ভিন্ন ও বিপরীত আদর্শকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এগুলো হলো : ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র : পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিকাশ লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে। এ ধরনের রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. রাষ্ট্র জনগণের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার নিরাপত্তা প্রদান করবে;
২. এ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলবে;
৩. Democratic values-এর ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হবে;
৪. অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রাধান্য থাকবে;
৫. বহুদলীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান থাকবে;
৬. নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকবর্গের পরিবর্তন নিশ্চিত করা হবে;
৭. সমাজব্যবস্থায় সুশীল সমাজের প্রধান্য থাকবে;
৮. আমলাব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক হবে;
৯. বল প্রয়োগ নীতি পরিহার করা হবে; রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে না;
১০. জাতীয় সম্পদ বণ্টনে সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে;
১১. সংসদের মতো জনগণের প্রতিনিধিদের প্লাটফরম থাকবে;
১২. জনগণ নিজের চেষ্টায় যা অর্জন করবে তার সবকিছুর মালিক সে নিজেই।

খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে সব মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকবে, যার নির্দেশে সমগ্র দেশ পরিচালিত হবে;
২. রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না;
৩. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষই রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত থাকবে;
৪. দলীয় কাঠামোর অধীনে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে;
৫. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ও লভ্যাংশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে না।

এছাড়াও রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে দুভাগে ভাগ করা হয় : ক. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) এবং খ. ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic State)।

ক. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র : মধ্যযুগের ধর্মীয় শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রদান করেন ম্যাকিয়াভেলি। তার মতে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলন হবে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মের কোনো স্থান থাকবে না। Eric S. Waterhouse ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'Secularism is an ideology which provides a theory of life and conduct as against one provided by a religion.'

তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রধান কথা হলো ধর্মের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে বিভেদের কোনো রেখাপাত করা যাবে না।

এ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ধরনের discrimination হবে না;
২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনো ধর্মীয় সমস্যা না থাকায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়;
৩. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেহেতু সব নাগরিককে অগ্রগতি লাভের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে সেহেতু এখানে স্থিতিশীলতা থাকে;
৪. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জনগণ সত্য, অহিংসা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং
৫. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জনগণের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকে।

এছাড়াও রয়েছে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। নিচে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

খ. জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের তিন ধরনের কার্যাবলীর কথা বলেন। যথা :

১. বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা করে,
২. আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে এবং
৩. বৈধ পারস্পরিক চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন করে।

Individualist বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। তারা রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে আগ্রহী নন। কিন্তু এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অধিকারীরা রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত করার কথা বলেন। তারা রাষ্ট্রকে জনকল্যাণের জন্য তৈরি একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভেবে থাকেন। এক্ষেত্রে রাশিয়া ও চীনের মতো দেশগুলো রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে বিস্তৃত করেছে। এসব দেশ রাষ্ট্রকে মনে করে একটি Welfare

Organization। পুঁজিবাদীরাও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা বলেন; যেমন– ভারত ও ইল্যান্ড। সুতরাং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলী শুধু বিদেশী আগ্রাসন প্রতিহত; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং চুক্তি অনুমোদন করার কাজই করে না বরং তা জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার মূল চরিত্র হারিয়েছে কিনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী দুটি আদর্শিক দ্বন্দ্বই বিরাজমান ছিল। একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, অন্যটি পুঁজিবাদী আদর্শ। এ উভয় আদর্শই দু ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলে এবং পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র ও সমাজকে তাদের আদর্শগ্রহণ করতে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দুটি ব্লক পরিলক্ষিত হয় : সমাজতান্ত্রিক ব্লক ও পুঁজিবাদী ব্লক। আর এভাবেই শুরু হয় শীতল যুদ্ধ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি একটি চরম আঘাত হিসেবে কাজ করে। এ অবস্থায় পৃথিবীর যেসব রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে টিকে ছিল সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো চীন, কিউবা ও ভিয়েতনাম। এসব রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও শুধু কিউবা ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্র পুঁজিবাদী আদর্শের নিকট আত্মসমর্পন করতে থাকে। কারণ চীন ও ভিয়েতনাম বিশ্বের জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে পুঁজিবাদী আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে থাকে :

১. বাজারকে সামান্য পরিমাণ উন্মুক্ত করে;
২. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি উদ্যোগকে জায়েজ করে এবং
৩. নিয়োগ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী আদর্শ অনুসরণ করতে থাকে।

এর ফলে শুধু কিউবা ছাড়া পৃথিবীর অন্যসব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই তাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিসর্জন দিতে থাকে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উদারীকরণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

উপসংহার : বিশ্বে আজ জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো খুব শক্তিশালী হয়েছে এবং তারা বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর জটিলতায় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক অঙ্গনে নিজের অবস্থানকে বজায় রাখতে হলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর কিছু আদর্শিক নীতি পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

০৮। ক. রাষ্ট্র কাকে বলে?
খ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : সামাজিক প্রপঞ্চের (Social Phenomenon) উৎস অনুসন্ধান একটি সমস্যাসঙ্কুল কাজ। রাষ্ট্রও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হলেও পরিবার থেকে রাষ্ট্রের বিকাশের প্রক্রিয়া নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্কের অবসানের জন্য Dr. Garner বলেন, 'The state is neither the handwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family. The state is not a mere artificial mechanical creation or invention but an institution of natural growth or historical evolution'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র ঐশ্বরিক কোনো সৃষ্টি নয় বা এটি কোনো রেজ্যুলেশন বা সম্মেলনের ফলও নয়। কেউ জোর করেও রাষ্ট্র সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া রাষ্ট্রকে শুধু পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং রাষ্ট্র হলো ঐতিহাসিক বিবর্তন বা প্রাকৃতিক বিকাশের ফল। রাষ্ট্র অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠান এবং এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : *রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ৬নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।*

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি অনুসন্ধানে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন এবং তা এখনো চলছে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গভীর গবেষণার ফল হিসেবে আমরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রধান তিন ধরনের তত্ত্বের বিকাশ দেখতে পাই। এগুলো হলো :

ক. কাল্পনিক তত্ত্বসমূহ (Speculative Theories)
খ. অর্ধ-বাস্তব তত্ত্বসমূহ এবং (Half-Actual Theories)
গ. ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহ (Historical Theories)

নিচে এসব তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

ক. কাল্পনিক তত্ত্বসমূহ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি অনুসন্ধানে কাল্পনিক তত্ত্বসমূহ দীর্ঘদিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রধান প্রধান কাল্পনিক তত্ত্বগুলো হলো :

১. **স্বর্গীয় মতবাদ :** এ মতবাদ রাষ্ট্রকে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হলো স্রষ্টার সৃষ্টি এবং তা সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। একইভাবে, শাসনকার্য পরিচালনার বিষয়েও এ তত্ত্বের বক্তব্য হলো—প্রভু স্বয়ং রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন অথবা তিনি তার প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করাবেন। রাজা হলেন স্রষ্টার প্রতিনিধি। যেহেতু রাজা স্রষ্টার প্রতিনিধি সেহেতু এটা জনগণের দায়িত্ব যে, তারা তাদের রাজার প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুগত থাকবে। তাই রাজাকে অস্বীকার এবং রাজার বিরোধিতা করা স্রষ্টাকে অস্বীকার করা বা স্রষ্টার বিরোধিতা করারই নামান্তর। রাজা তার কোনো কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়বদ্ধ নয় বরং স্রষ্টা ইচ্ছা করলে রাজার জবাবদিহিতা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে এ আইন রাজাকে জনগণ ও আইনের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করে।

২. **বলপ্রয়োগ তত্ত্ব :** এ তত্ত্ব রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে বল প্রয়োগের ফলাফল হিসেবে মনে করে। এ তত্ত্ব বলে, দুর্বলের ওপর সবলের উচ্ছৃঙ্খল বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। Oppenheim, Jenks, Bernhardi এবং Treitschke প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলপ্রয়োগ তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। এ বলপ্রয়োগ তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। কারণ–
   – শুধু বল-ই রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারে না;
   – রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে শুধু বলপ্রয়োগই কাজ করেনি;
   – শুধু বল প্রয়োগই রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়;
   – এ তত্ত্বগুলোর বাস্তবায়ন অত্যন্ত বিপজ্জনক;
   – রাষ্ট্রের সৃষ্টি মানুষের সচেতনতার ফলস্বরূপ।

৩. **পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব :** পরিবার হলো রাষ্ট্রের বিকাশের মূল সূত্র। আর তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিষয়ে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক দুটি তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত পিতৃতান্ত্রিক তত্ত্বানুসারে পিতার অভিভাবকত্বে পরিবার সম্প্রসারিত হয়েছে ক্লানে (clan), ক্লান সম্প্রসারিত হয়েছে গোত্রে এবং তারপর চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রে। এভাবে পিতার নেতৃত্বে পরিবারই রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। স্যার হেনরি মেইন এ তত্ত্বের মূল সমর্থক। তিনি তার 'Ancient Law, Early History of Institutions'-এ এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'The elementary group is the family, connected by

common subjection to highest male ascendert. The aggregation of families forms a genus or houses. The aggregation of houses make the tribe. The aggregation of tribes constitutes the commonwealth.'

একইভাবে, মাতৃতান্ত্রিক তত্ত্বও রাষ্ট্রের বিকাশের সূত্র ব্যাখ্যা করে। এ সূত্রের প্রবক্তা হলেন Macleannan, Morgan এবং Jenks. তাদের মতে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সমাজের প্রথম চরিত্র নয়। মাতৃতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে আদিম সমাজের প্রথম স্তরে পিতার কোনো অভিভাবকত্ব ছিল না। মাতার নির্দেশেই পরিবার পরিচালিত হতো। আদিম সমাজে একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকত। আর তাই পরিবারের সন্তানেরা মায়ের অধীনেই বড় হতো। ঐ সমাজ ব্যবস্থায় মা-ই ছিল সম্পত্তির অধিকারী এবং মায়ের মৃত্যুর পর বড় কন্যা সম্পদের মালিক হতো। এভাবে মাতার নেতৃত্বে যে পরিবার ছিল সে পরিবারই গঠন করে জেনাস (genus); আর জেনাস পরিণত হয় গোত্রে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রে।

৪. **সামাজিক চুক্তি মতবাদ :** রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত গবেষণায় সামাজিক চুক্তি মতবাদসমূহ অত্যন্ত প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ। এ মতবাদগুলোর প্রধান প্রবক্তা হলেন– হবস, লক ও রুশো।

তাদের মতে, রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির ফল। তবে সামাজিক চুক্তির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করে। হবসের মতে এ প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল স্বার্থপর ও নৃশংস এবং 'জোড় যার মুল্লুক তার' নীতি সর্বত্র বিরাজমান ছিল। কিন্তু লকের মতে, শুরুতে মানবিক জীবন ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ। অন্যদিকে রুশোর অভিমতও হলো মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে একটি ideal life উপভোগ করেছে। তার মতে, পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায় মানুষ রাষ্ট্র গঠনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। হবসের মতে এ চুক্তি ছিল রাজা ও অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কিন্তু রাজা এ চুক্তির অধীন নয়। এ চুক্তি অনুসারে মানুষ তাকে শাসন করার সব অধিকার রাজাকে প্রদান করে। কিন্তু লকের বক্তব্য হলো প্রকৃতির রাজ্যের শেষ পর্বের বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পেতে দুটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তার মতে, প্রথম চুক্তিটিতে সমাজ গঠন করা হয় এবং দ্বিতীয় চুক্তিটিতে সরকার গঠন করা হয়। লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাজাকে জীবন, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু রুশো যে সামাজিক চুক্তির কথা বলেন সেখানে জনগণ সব ক্ষমতা সমাজের হাতে ন্যস্ত করে। রুশোর মতে সমাজের ইচ্ছাই 'general will'। আর সরকার হলো এ সাধারণ ইচ্ছারই প্রতিনিধি।

খ. **ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক তত্ত্ব :** এ তত্ত্ব রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এ তত্ত্বানুসারে রাষ্ট্র ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদই সঠিক ও সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ। কেননা রাষ্ট্র হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এটা মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ফল। অধ্যাপক বার্জেস-এর মতে, 'রাষ্ট্র মানবসমাজের বিরতিহীন ক্রমবিকাশের ফল।' নিম্নোক্ত উপাদানগুলো রাষ্ট্রের এ ঐতিহাসিক বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে—

১. স্বাভাবিক সামাজিক অভিপ্রায়, ২. কিনশিপ, ৩. ধর্ম, ৪. বল, ৫. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ৬. রাজনৈতিক সচেতনতা।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত উপরিউক্ত তত্ত্বগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, কোনোভাবেই রাষ্ট্র একদিনে সৃষ্টি হতে পারে না। রাষ্ট্র একটি ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। তবে পরিবারই যে রাষ্ট্রের মূল উৎস এ ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায় একমত। যে কোনো প্রক্রিয়ায় হোক পরিবারই চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে রাষ্ট্রের আধুনিককীকরণ হয়—বিকাশ লাভ করে জাতি রাষ্ট্র, যা আজও টিকে আছে।

০৯। বিশ্বায়নের এ যুগে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিষয়টি তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না।— ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : জাতি রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমারেখা। সার্বভৌমত্ব হলো জাতি রাষ্ট্রের স্বীয় নীতির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য। আর ভৌগোলিক সীমারেখার মূলকথা হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় জাতি রাষ্ট্রের অবস্থান এবং এ সীমানার ভেতর অন্য কারো কোনো রকম হস্তক্ষেপ চলে না। কিন্তু বর্তমান globalization-এ বিভিন্ন নীতিমালা এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবং ভৌগোলিক সীমানাও আজ তত্ত্বগত। কারণ বিশ্বায়ন বলে Free Access of Production or Investment-এর নামে এক দেশের ভূখণ্ড ও কাঁচামালের উপর অন্যদেশের পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণ সার্বভৌমত্বের কতিপয় নীতিমালা এমনকি অনেক সময় এর অস্তিত্বকেই বাতিল করে দিচ্ছে।

সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমানা

সার্বভৌমত্ব ধারণাটি অত্যন্ত পুরনো হলেও জাতি রাষ্ট্রের বিকাশের সাথে এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সার্বভৌমত্ব শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Sovereignty', যা ল্যাটিন শব্দ 'superanus' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় 'superanus' অর্থ হলো 'supreme' বা চূড়ান্ত। সার্বভৌমত্বের প্রথম সাংগঠনিক ধারণা প্রদান করেন এরিস্টটল। তিনি 'Supreme power of the state' বা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার কথা বলেছেন।

সার্বভৌমত্বের প্রধান দুটি দিক রয়েছে— অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের মূলকথা হলো প্রতিটি স্বাধীন দেশেই চূড়ান্ত আইনগত কর্তৃত্ব চর্চার জন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সভা রয়েছে। এ ধরনের গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি ও সংস্থার উপর বিদ্যমান থাকে।

অন্যদিকে, বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্র কোনো প্রকার বাহ্যিক কর্তৃত্বের অধীন নয় এবং অন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও সামরিক ক্ষমতা সংক্রান্ত যে কোনো চুক্তি ঘোষণা করার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অনুশীলন করতে পারে।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা প্রদান করে জেলেনিক বলেছেন, 'Sovereignty is the characteristics of the state by virtue of which it cannot be legally bound except by its own or limited by any power other than itself.'

অন্যদিকে Bodin বলেন, 'Sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subjects unrestrained by law.' অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব হলো নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা, যা

আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু উইলোবি সার্বভৌমত্বের আরো সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'Sovereignty is the supreme will of the state.' অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছা।

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা, যে ক্ষমতায় অন্য কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উপাদান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অন্যদিকে ভৌগোলিক সীমানা হলো জাতি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ডের উপর সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যতীত অন্য কারো কোনো আইনগত অধিকার নেই। অন্য কোনো দেশের নাগরিকগণ সে রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চাইলে অবশ্যই তার অনুমতি প্রয়োজন হবে।

বিশ্বায়ন : বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটি নতুন প্রপঞ্চ। এর মূলকথা হলো 'The process of integration'। বিশ্বায়নের প্রধান কাজ হলো অর্থনৈতিক উদারীকরণ। এক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ করতে হবে এবং বাজার ও বিনিয়োগকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

বিশ্বায়নের এজেন্ডাকে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত মূল সংগঠন হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ১৯৯৫ সালে এ সংস্থার মাধ্যমে এমন কিছু নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, যা জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও এর অবিচ্ছেদ্য সীমানার প্রতি হুমকিস্বরূপ। এ নীতিমালাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'Trade Related Investment Measures' এবং 'Trade Related Intellectual Property Rights'। বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ নীতির বিষয়গুলো হলো :

- বিদেশী বিনিয়োগকারীকে দেশী বিনিয়োগকারীর মতো সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে;
- বিদেশী বিনিয়োগকারী নিজের খেয়াল-খুশি মতো যে কোনো সেক্টরে বিনিয়োগ করতে পারবে এবং যে কোনো ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে পারবে;
- উৎপাদিত পণ্যের দাম বিদেশী বিনিয়োগকারীই নির্ধারণ করতে পারবে;
- বিদেশী বিনিয়োগে উৎপাদিত পণ্য যে কোনো দেশে রপ্তানি করা যাবে;
- বিদেশী বিনিয়োগে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে কোনো দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করা যাবে;
- পুঁজিপতি যে কোনো সময় তার বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে পারবে;
- বিনিয়োগকৃত টাকার লভ্যাংশের বিষয়েও বিদেশী বিনিয়োগকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

তাছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেবা খাত সংশ্লিষ্ট এবং মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি করেছে, যার ফলে একটি জাতি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের নামে অন্য একটি জাতি রাষ্ট্রের বা তার নাগরিকদের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে।

বিশ্বায়ন বাণিজ্য উদারীকরণের কথা বলে। এ বাণিজ্য উদারীকরণের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে এমনভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে তার দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করার মতো যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকে না। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক সাহায্যের নামে বিশ্বায়নের এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে।

বিশ্বায়নে Open market বা মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলা হয়, যেখানে পণ্যের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করা হবে। এ অবাধ যাতায়াতের জন্য দেশীয় কোনো ধরনের নীতিমালা আরোপ করা যাবে না। অনেক সময় দেশীয় পণ্যকে প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষার জন্য জাতি রাষ্ট্রগুলো সংরক্ষণ নীতিমালা গ্রহণ করে বিদেশী পণ্যকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা দেয়। অথচ বিশ্বায়নের মুক্তবাজার অর্থনীতির বক্তব্য এ নীতিমালার পরিপন্থী। এভাবে দেশীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সার্বভৌমত্ব জাতি রাষ্ট্রের থাকছে না এবং যার ফলে সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ হচ্ছে।

বিশ্বায়ন বেসরকারিকরণের কথা বলে। অথচ বেসরকারিকরণ অনেক সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আত্মঘাতী পদক্ষেপে পরিণত হয়। বাংলাদেশে আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেয়ায় হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে এবং উৎপাদন বন্ধ হয়েছে, যার চূড়ান্ত প্রভাব পড়ছে আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়। এক্ষেত্রেও এ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের চাপে। তাহলে সার্বভৌমত্ব থাকল কোথায়? যখন অন্যের পরামর্শে নিজের জন্য অকল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন তাকে আর যাই বলা হোক সার্বভৌম আচরণ বলা যাবে না।

বিশ্বায়নের ফলে এক বিশ্ববাজার তৈরি করার কথা বলা হয়, যে বিশ্ববাজারের কোনো ভূখণ্ডগত সীমানা থাকবে না। বিনা শুল্কে এক দেশের পণ্য অন্য দেশের বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে। বিশ্বায়নের এ নীতি সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চার অনুকূল নয়। তাছাড়া এ নীতি জাতীয় সীমানার অস্তিত্বকে স্বীকার করছে না। এভাবে জাতি রাষ্ট্র আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়ন উন্মুক্ত বাণিজ্যে অংশগ্রহণের কথা বলে। অথচ সকল দেশেরই উন্মুক্ত বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। অথচ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যায় চাপে এ সিদ্ধান্তও দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোর দেশগুলোকে মেনে নিতে হচ্ছে। এভাবে সার্বভৌমত্বের ধারণা আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

বিশ্বায়ন একটি জটিল প্রপঞ্চ, যে প্রপঞ্চের অধীনে ওয়াশিংটনকে রাজধানী করে একক বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে পুঁজিপতিরা মাঠে প্রবেশ করেছে। পুঁজিপতিদের এ অগ্রযাত্রার উদ্দেশ্য বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোর কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ চিবিয়ে খেয়ে পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলা। এ অবস্থায় জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও এর সীমানাই প্রধান বাধা। আর এ জন্যই তারা বিশ্বায়নের নামে এমন নীতিমালা তৈরি করেছে, যে নীতিমালার ফলে সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সীমানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বায়নের ফলে জাতি রাষ্ট্রের 'External sovereignty' বিশেষ হুমকির সম্মুখীন।

১০। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

উত্তর : রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান, যা বিবর্তনের ফল। পারিবারিক জীবনব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাই Leacock বলেন, 'It is a result of gradual process running throughout all known history of man and reaching into the remote and unknown past'। এ রাষ্ট্র প্রথমে tribal state-এ পরিণত হয়; অতঃপর oriental state, গ্রিক নগররাষ্ট্র এবং পরবর্তীতে রোমান সাম্রাজ্য ও সামন্তবাদী সমাজ হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক ম্যাকিয়াভেলিই জাতীয় রাষ্ট্রের মূল প্রবক্তা। তবে ১৬৪৮ সালে ওয়েস্ট ফেলিয়ার শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : *রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ৬নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।*

আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের বিকাশ

রাষ্ট্রকে বলা হয়, 'The product of slow and steady process of evolution। তবে বিবর্তনের এ প্রক্রিয়াটি কখনো নিয়মিত ও ধারাবাহিক ছিল না। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাদান ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। আর এজন্যই আধুনিক জাতিরাষ্ট্র বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায়গুলো আলোচনা করা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকাশের পূর্বে আরও পাঁচটি

রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করেন। তবে এ রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলোই চূড়ান্ত পর্যায়ে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। নিচে রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসের এ পর্যায়গুলো আলোচনা করা হলো :

১. **গোত্রীয় সমাজ :** রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সর্বপ্রথম পর্যায়টি হলো গোত্রীয় সংগঠন। পরিবার হলো প্রথম রাজনৈতিক একক। আমরা যদি গোত্রীয় ব্যবস্থাকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব রাষ্ট্র, সরকারব্যবস্থা যেসব উপাদানের মাধ্যমে গঠিত হয় গোত্রীয় সমাজেও সেসব উপাদানের উপস্থিতি ছিল। গোত্রীয় সমাজে দেখা যায় গোত্রপতি বা যেসব নির্বাচিত লোক গোত্রের প্রধান ছিলেন তাদের প্রতি গোত্রের সবারই আনুগত্য ছিল। এ ধরনের আনুগত্যই হলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি। গোত্রপতি গোত্রশাসন করতেন এবং গোত্রের লোকজন তার নির্দেশ মান্য করতেন। কিন্তু যারা গোত্রপতির নির্দেশ অমান্য করত তাদেরকে গোত্রপ্রধান শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিতে পারতেন। এ শাস্তি প্রদানও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, গোত্রীয় ব্যবস্থায় লিখিত কোনো আইন ছিল না। গোত্রীয় ব্যবস্থায় দেখা যায়, যদি কোনো শক্তিশালী গোত্রপতি দুর্বল কোনো গোত্রের ওপর বিজয় অর্জন করতেন তাহলে পরাজিত গোত্রের লোকজন তাকে গোত্রপতি হিসেবে মেনে নিত। এভাবে অধিকাংশ গোত্রই রাষ্ট্রের গুণ অর্জন করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে শহর, নগর ও সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২. **প্রাচ্যীয় সাম্রাজ্য** (The Oriental State) : পূর্বেই বলা হয়েছে গোত্র হলো রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম পর্যায়। কিন্তু এ গোত্রগুলো তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করে এমন স্থানকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করল। এক্ষেত্রে তাদের পছন্দ ছিল এমন স্থান যেখানে তাদের আহারের বস্তু, পানীয় এবং গবাদিপশুর খাদ্য সহজলভ্য হয়। তাছাড়া নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলকেও তারা তাদের বসবাসের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করে। এভাবে দেখা যায়, যেসব অঞ্চলে গোত্রীয় জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পরিপূর্ণ করা সহজ ছিল সেগুলো Tribal centre-এ পরিণত হয়। এ Tribal centre গুলোই রাষ্ট্রের গুণ অর্জন করে এবং ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ ছোট ছোট রাজ্যগুলো বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এক্ষেত্রে ভারতের গঙ্গা ও সিন্ধু নদী, ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী এবং মিশরের নীল নদকে কেন্দ্র করেই বৃহৎ প্রাচ্য দেশীয় সাম্রাজ্যগুলো গড়ে ওঠে।

৩. **গ্রিক নগররাষ্ট্র** (The Greek City-state) : আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশের তৃতীয় পর্যায়টি ছিল নগররাষ্ট্র। গ্রিস ছিল এমন একটি দেশ, যা পাহাড় ও সাগর দ্বারা বেষ্টিত। গ্রিসের জনগণ স্বাধীনতা ভালোবাসত এবং একাকী বসবাস করতে পছন্দ করত। আর এটাই হলো একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে তাদের সংগঠিত না হওয়ার প্রধান কারণ। তাই খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসে নগররাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে। তবে এ নগর রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিরাজমান ছিল। নগররাষ্ট্রের জনগণ সংসদ তৈরি করেছিল এবং সংসদে উপস্থিত হয়েই তারা আইন প্রণয়ন করত। অবশ্য এ নগররাষ্ট্রে কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হতো না এবং সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার ছিল না। নারী, শিশু, দাস শ্রেণী ও বিদেশীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের কোনো সুযোগ ছিল না। তবে এ নগররাষ্ট্রগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এ নগররাষ্ট্রের অনেক নীতিমালাই আজকের আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে।

৪. **রোমান সাম্রাজ্য** (The Roman Empire) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন, 'The Greeks achieved quality, idealism and genius through their small city states, the Romans achieved much through their mighty empire.' অর্থাৎ গ্রিসবাসী তাদের ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের মাধ্যমে অর্জন করে গুণ, আদর্শ এবং সৃজনশীলতা কিন্তু রোমানরা তাদের শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মাধ্যমে এর চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করেছে। প্রায় পাঁচশত বছর যাবৎ রোমান সাম্রাজ্য বিরাজমান ছিল। রাজ্য বিজয়, রাজ্য শাসন, আইন প্রণয়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রোমানরা বিখ্যাত ছিলেন। ইতালিতেই রোমান নগর রাষ্ট্র শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ৫১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমান নগররাষ্ট্রগুলোতে রাজতন্ত্র বিরাজমান ছিল। অতঃপর এ নগররাষ্ট্রগুলো রিপাবলিকে পরিণত হয় এবং তখন থেকেই রোমান সাম্রাজ্য তার শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে রোমান সাম্রাজ্য আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনে এতই উন্নতি লাভ করে যে, আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র পরিচালনায় আজও সেগুলো অনুসরণ করা হচ্ছে।

৫. **সামন্তবাদী রাষ্ট্র** (The Feudal State) : রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়েই সামন্তবাদী সমাজের উদ্ভব হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে Landlord-দের অধীনে সামন্তবাদী সমাজ বিকাশ লাভ করে। এ সামন্তবাদী সমাজে landed aristocracy বিদ্যমান ছিল। ইউরোপেই প্রথম সামন্তবাদী সমাজ জন্মলাভ করে। এ সমাজ ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সব ভূ-সম্পত্তির অধিপতি এবং তিনি Landlordদেরকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতেন। এ সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার শক্তিশালী অস্তিত্ব বজায় রাখে।

৬. **আধুনিক জাতিরাষ্ট্র** (The Modern Nation State) : রেনেসাঁ এবং সংস্কারবাদী আন্দোলন শুরু হলে সামন্তবাদী সমাজগুলো ভেঙে পড়তে থাকে। এ সামন্তবাদী সমাজের পতনও শুরু হয় ইউরোপ থেকে। এ সামন্তবাদী সমাজের পতনের মূলে ইংল্যান্ডে স্যার সপ্তম হেনরি, ফ্রান্সে রাজা ষোড়শ লুই, স্পেনে দ্বিতীয় ফিলিপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পিটার দ্য গ্রেট নেতৃত্ব প্রদান করেন। প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে সামন্তবাদী সমাজ ভেঙে পড়ে এবং জাতীয় রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এ জাতীয় রাষ্ট্রে সব শ্রেণীর লোক বিশেষ করে ব্যবসায়ী ও সেবাদাস শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়। জাতীয় রাষ্ট্র শুরুতেই চূড়ান্ত রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু সিভিল ওয়্যার এবং ফরাসি বিপ্লব এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে। রুশো জনগণের শাসনের কথা বলেন এবং জনগণের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এভাবে শুরু হয় জাতীয় রাষ্ট্রের নতুন ও আধুনিক যাত্রা।

রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রে মানবাধিকার, আইনের শাসনের কথা বলা হয়। এখানে জনগণের ইচ্ছাকে চূড়ান্ত সার্বভৌম ইচ্ছা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়; রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, যারা জনগণের নিকট তাদের কার্যাবলীর জন্য দায়বদ্ধ রয়েছে।

১১ । ক. রাষ্ট্র কি?

খ. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন।

উত্তর : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয় হলো রাষ্ট্র, যাকে বলা হয় 'The greatest of all human association'। রাষ্ট্র সৃষ্টির ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীর ম্যাকিয়াভেলির সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের নানাবিধ কল্যাণ সাধনে রাষ্ট্র বহুবিধ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রকম পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের স্থান দখল

করতে বসেছে– বহুজাতিক সংস্থাগুলো। অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন বর্তমান বিশ্ব যে 'Global World'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার প্রধান একক পরিণত হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোই যেন আজ রাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তত্ত্বগতভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবিকই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতিরাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : *রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ৬নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।*

জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ

আধুনিককালে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা আন্তর্জাতিক সমাজের কথা বলা হয় তার জন্ম ইউরোপে; বিশেষ করে জাতীয় রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান একক হলো জাতীয় রাষ্ট্র। জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশের পর থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বীকৃত আকার ধারণ করে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয় ওয়েস্ট ফেলিয়ার শান্তি চুক্তি থেকে। এ চুক্তি ১৬৪৮ সালে স্বাক্ষরিত হয়। শ্রেচারের মতে, 'The peace of westphalia is a landmark in the development of the western state system'। হার্জের মতে, জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। কারণ জাতীয় রাষ্ট্র পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতা থেকেই গড়ে ওঠে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক শক্তিসাম্য ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জাতীয় রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয় ইউরোপে। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে কয়েকটি জাতীয় রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর এ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো যখন অন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য অগ্রসর হয় তখনই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই সাথে বিস্তৃত হয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাই ফ্রাঙ্কেল বলেন, 'By including overseas territories within their empires, they spread the diversity of the European state-system over the whole globe. In another sense, they united the world physically, by opening communications and culturally, by spreading Europenan culture'।

এভাবে ইউরোপ তার ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্র ও এর রাজনীতি অন্যত্র রপ্তানি করল এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হলো। ইউরোপীয় রাষ্ট্রের এ বিস্তৃতি ঘটলেও এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো (দু একটি ছাড়া) স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল না।

এক সময় এশীয় ও আফ্রিকানরা ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে এখানেও সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটল। তবে সার্বভৌমত্বের এ বিকাশের সাথে সাথে সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যারও উন্নতি সাধিত হয়। ফলে কামানের বারুদের আবিষ্কার সমগ্র সমাজকে বিপ্লবের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু এ সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কারের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপরি কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়। তাছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় অর্থনীতিও দ্রুত বিকাশ লাভ করে। এর ফলে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের খপ্পরে পড়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো তাদের অস্তিত্ব হারায় এবং অন্যদিকে জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এর ফলে তৈরি হয় আন্তর্জাতিক আইন এবং ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তির তিন শত বছর পর আবির্ভাব ঘটে রাষ্ট্রসংঘের। এ অতিবৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি গড়ে ওঠে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন, যার উদ্যোক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। যেমন— ওয়ারশ, ন্যাটো ইত্যাদি। এ সংস্থাগুলোর উৎপত্তির ফলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রতিটি দেশই কোনো না কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য। তবে এ আন্তর্জাতিক

সংস্থার সদস্যপদের জন্য কোনো দেশই তার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে রাজি হয়নি। এ অবস্থায় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রই নানা ধরনের সংঘাতে লিপ্ত হয়। এ সংঘাত অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়। তবে জাতিরাষ্ট্রের অধিপতিরা এই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত তাদের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। সার্বভৌমত্বকে আঁকড়ে ধরে রাখার বিপদ জাতীয় রাষ্ট্র সম্যকভাবে উপলব্ধি করে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জাতিরাষ্ট্রকে স্বীয় সার্বভৌমত্বের মায়া ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয় জাতিরাষ্ট্রের সঙ্কট। ফ্রাঙ্কেল বলেন, 'The present crisis of international soceity is due to a combination of causes : the proliferation of new states, inexperienced in the European traditions of international society and often unwilling to accept then the accumulation of power in the hands of the United States and Soviet Union, but, most of all, to the crisis of the component units, the territorial states.'

জাতিরাষ্ট্রের এ সঙ্কটের পেছনে নানা রকমের কারণ বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যে অস্বাভাবিক অগ্রগতি সাধিত হয় তা জাতীয় রাষ্ট্রের সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লব ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্রকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। তাছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, অ্যান্টি ব্যালাস্টিক মিশাইল এবং মাল্টিপল ইনডিপেনডেন্ট রিএন্ট্রি ভিহাইকল প্রভৃতি মারাত্মক জাতের অস্ত্র আজ অনেক দেশের অস্ত্রভাণ্ডারে মজুদ রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্র। একইভাবে অত্যাধুনিক আকাশ যুদ্ধেরও পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। এ সব প্রযুক্তি দিয়ে ভূখণ্ডগত সীমানাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অতিক্রম করা সম্ভব। ফলে জাতিরাষ্ট্র সংকটের সম্মুখীন হয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর গুরুত্ব হারাতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, কতিপয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংগঠনও তত্ত্বগতভাবে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেও বাস্তবে তা আর থাকছে না। শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রচুর কাঁচামাল প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্তভাবে অন্য রাষ্ট্র দখলের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এভাবে দেখা দেয় সম্রাজ্যবাদ, যার ফলে জাতীয় রাষ্ট্র চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন হয়।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র দেশগুলো তাদের উন্নয়নের জন্য উন্নত দেশের নিকট হাত পাতে। এ নির্ভরশীলতা তাদেরকে উন্নত দেশের নানাবিধ অন্যায় শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করে, যার ফলে জাতীয় রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখীন হয়।

চতুর্থত, পুঁজিবাদীদের প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডাও জাতিরাষ্ট্রের সংকটকে ঘনীভূত করেছে। কারণ পুঁজিবাদীরা চায় একক বিশ্ব রাষ্ট্র, যেখানে তারা তাদের ইচ্ছামতো কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় বাজার সংরক্ষণ করতে পারবে। আর এ লক্ষ্যে তারা ব্যাপক প্রচারণা চালায়।

পঞ্চমত, জোট গঠন বা আঞ্চলিক সংগঠনও জাতিরাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে জাতিরাষ্ট্র এককভাবে আর নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল থাকছে না। সে জন্যই তারা আঞ্চলিক মোর্চা বা জোট তৈরি করে নিজেদের নিরাপত্তা সুসংগত করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ফলে জাতীয় রাষ্ট্র তার গুরুত্ব হারাতে থাকে।

জাতিরাষ্ট্র এক সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে সে আর পূর্বের মতো তার অবস্থান ধরে রাখতে পারছে না। এর প্রধান কারণগুলো হলো– বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের বিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিপ্লব, বৈদেশিক সাহায্য এবং পুঁজিবাদীদের প্রোপাগান্ডা। জাতিরাষ্ট্র একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল এবং জনগণের কল্যাণে তার সৃষ্টি। যতদিন রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে এবং তাদের চাহিদা পূর্ণ করবে ততোদিন সে টিকে থাকবে।

১২। ক. সার্বভৌমত্ব কি?
খ. সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
গ. সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।

উত্তর : ল্যাটিন শব্দ 'সুপারেনাস' (Superanus) থেকে ইংরেজি (Sovereignty) শব্দটি এসেছে। 'সুপারেনাস' শব্দটির অর্থ হলো 'Supreme' অর্থাৎ 'সর্বশ্রেষ্ঠ'। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'Sovereignty' বা 'সার্বভৌমত্ব' বলতে রাষ্ট্রের একক, অবিভাজ্য, নিরঙ্কুশ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবাধ ক্ষমতাকেই বোঝায়। আধুনিক রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌম রাষ্ট্র। সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র গঠনের জন্য অপরিহার্য চারটি উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব হলো চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং তা ভিন্ন কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, ভূখণ্ড ও সুগঠিত সরকার থাকলেই তাকে আমরা রাষ্ট্র বলতে পারি না, যদি না সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতাবলে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি ও স্বীকৃতি পায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের দ্বারা স্বীকৃত হতে হলে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এটা একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা, যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। এ শক্তির বলে সরকার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহির্বিশ্বের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। বিভিন্ন মনীষী প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা হলো :

হল্যান্ডের আইনবিদ হুগো গ্রোটিয়াস (Hugo Grotius)-এর মতে, 'সার্বভৌমত্ব হচ্ছে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, যার হাতে এই ক্ষমতা রয়েছে তার ইচ্ছাই চূড়ান্ত এবং তার কার্যকলাপ অন্য কারো আজ্ঞাধীন নয়।'

ফরাসি লেখক দুগুই (Duguit)-এর মতে, 'রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সকল ব্যক্তিকে শর্তহীন নির্দেশ দেবার ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।'

অধ্যাপক ডব্লিউ. এফ. উইলোবি (W.F. Willoughby) বলেন, 'রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।'

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌমত্বের সাথে কতকগুলো বিষয় সম্পর্কিত থাকে, যাকে বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা হয়। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. **এককত্ব :** সার্বভৌম ক্ষমতা এক ও অনন্য, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম ক্ষমতা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো শক্তি থাকতে পারে না। যদি অন্য কোনো শক্তি থাকত তবে সেই শক্তিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হত এবং একাধিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হত। সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত ক্ষমতা থেকেই আমরা এ অনুসিদ্ধান্ত করতে পারি।

২. **অবিভক্ততা :** সার্বভৌমিকতা প্রকৃতির দিক থেকেই অবিভাজ্য। একে কখনোই বিভক্ত করা যায় না। এটি একই সাথে একের অধিক ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে না। সর্বদাই এটি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। সমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান এ ক্ষমতার অধিকারী

থাকলে সমাজব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত থাকে না এবং সেখানে কোনো কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজন ঘটলে সমাজে বা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই অধ্যাপক গেটেল বলেছেন, 'সার্বভৌমিকতার বিভাজন ধারণাটিই স্ব-বিরোধী।'

৩. **স্থায়িত্ব :** স্থায়িত্ব সার্বভৌমত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সর্বদাই স্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল। সরকার হলো সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারী মাত্র, কিন্তু সরকারের পরিবর্তনের সাথে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যতদিন রাষ্ট্র থাকবে ততদিন সার্বভৌম ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। যতদিন রাষ্ট্র থাকবে ততদিন সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে থাকবে। এ ক্ষমতার অবলুপ্তির সাথে সাথে রাষ্ট্রেরও অবলুপ্তি ঘটবে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সার্বভৌম ক্ষমতা যে ব্যক্তি বা যে সংস্থার দ্বারা ব্যক্ত হয় তার মৃত্যু ঘটলে বা সাময়িকভাবে তার ক্ষমতাচ্যুতি ঘটলে সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান হয় না। অন্য ব্যক্তি বা সংস্থা তা ব্যক্ত করে মাত্র। অবশ্য রাষ্ট্র বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীনে গেলে অথবা দ্বি-খণ্ডিত হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাও আর থাকে না।

৪. **সর্বজনীনতা :** রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা সর্বজনীন। সর্বজনীনতা চরমতার একটি বিশেষ লক্ষণ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সকল ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠন সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন। বহিঃদেশে বসবাসকারী রাষ্ট্রের নাগরিকগণও এ ক্ষমতার অধীনতা থেকে মুক্ত নন। অবশ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতেরা রাষ্ট্রের এ সার্বভৌমত্বের অস্তিত্বের বাইরে থাকে সত্য কিন্তু এটিও সংগঠিত হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশক্রমে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় তাদের বিতাড়িত করতে পারে। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম শক্তি বাধা বন্ধনহীন।

৫. **মৌলিকতা :** রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা হলো মৌলিক, নিরঙ্কুশ, অপ্রতিহত, চূড়ান্ত ও সীমাহীন। অভ্যন্তরের এবং বাইরের কোনো শক্তির নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র প্রণীত আইনকে কোনোভাবেই অস্বীকার বা অবজ্ঞা করতে পারে না। রাষ্ট্র প্রণীত আইনকে লঙ্ঘন করলে আইন ভঙ্গকারীকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। এমনকি গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্র তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে।

৬. **ব্যাপকতা :** ব্যাপকতার অর্থ হলো রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সার্বভৌমিকতার ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান থাকা। এটি সার্বভৌম চূড়ান্ত ক্ষমতারই আরেকটি রূপ। রাষ্ট্রের এলাকাধীন সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের উপরই সার্বভৌমের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকে। শুধু স্থলেই নয়; জলে, সমুদ্রের উপকূলভাগে এমনকি রাষ্ট্রীয় সীমানার আকাশে এবং বাতাসে এর ক্ষমতার ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়।

৭. **অহস্তান্তরযোগ্য :** সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য কর্তৃত্ব। সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করার অর্থ রাষ্ট্রের আত্মহত্যারই নামান্তর। মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করে বাঁচতে পারে না, গাছপালা যেমন অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার এবং বৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করলে বাঁচতে পারে না, তেমনি সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করলে রাষ্ট্রও বাঁচতে পারে না। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের প্রাণ।

৮. **অনন্যতা :** সার্বভৌম ক্ষমতা অনন্য। অন্য কোনো ক্ষমতার সাথে এর তুলনা করা চলে না। রাষ্ট্রের হাতে এই ক্ষমতা রয়েছে বলেই তা অন্যান্য সংঘ বা সংস্থা থেকে অনন্য। এ অনন্য ক্ষমতাবলেই রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকদের নিকট থেকে আনুগত্য লাভ করে থাকে। এজন্যই রাষ্ট্র সার্বভৌম।

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সার্বভৌমিকতার উপর নির্ভরশীল। সার্বভৌমিকতা হলো রাষ্ট্রের সেসব বৈশিষ্ট্য যার প্রভাবে রাষ্ট্র অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অসীম প্রতিপত্তির অধিকারী হয়।

সার্বভৌমত্বের নানা দিক

সার্বভৌমত্বের দিক পৃথিবীর সব দেশ এক নয়। অবস্থান ও প্রকৃতি অনুযায়ী সার্বভৌমত্বের দিক নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব :** ক্ষমতা ভোগের দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমত্বের দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব এবং অপরটি হল বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব।

অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সেই চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা যা দ্বারা রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরস্থ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র সকল জনগণ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বা শর্তহীন আনুগত্য লাভ করে। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

অপরদিকে বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে স্বাধীন থাকে। বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে বলেই একটি রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে অপর রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি, সন্ধি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এবং ভূখণ্ডগত স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে।

২. **কার্যকর সার্বভৌমত্ব ও নামসর্বস্ব সার্বভৌমত্ব :** সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুই ধরনের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন নামসর্বস্ব সার্বভৌম, পার্লামেন্টের আস্থাভাজন মন্ত্রিসভা হল প্রকৃত সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রপ্রধানসহ আইনসভা হল আইনগত সার্বভৌম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের রাজা বা রাণী হলেন সে দেশের নামসর্বস্ব সার্বভৌম। মন্ত্রিসভা হচ্ছে প্রকৃত সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রপ্রধানসহ আইনসভা হচ্ছে আইনগত সার্বভৌম। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা কে প্রয়োগ করছেন তার ভিত্তিতে এই দু ধরনের সার্বভৌমত্বের বিভাজন ঘটে।

৩. **আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব :** কোন ভিত্তিতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ফলেই সার্বভৌমত্বের এই বিভাজন ঘটে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষকেই আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের আদেশই চূড়ান্ত। সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের রায়, নির্বাচকমণ্ডলীর রায়, জনমতের নির্দেশ প্রভৃতি কোনোক্রমেই আইনগত সার্বভৌমত্বের উর্ধ্বে নয়। আইনবিদদের মতে, সার্বভৌমত্বের ধারণাই হচ্ছে আইনগত ধারণা। আইনগত সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের প্রবক্তা জন অস্টিন-এর মতে, গ্রেট ব্রিটেনের রাজাসহ-পার্লামেন্ট (King-in Parliament) হচ্ছে আইনগত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠান।

৪. **জনগণের সার্বভৌমত্ব :** সার্বভৌম ক্ষমতা যখন জনগণের হাতে ন্যস্ত তখন এরূপ সার্বভৌমত্বকে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভগের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হন। সরকারের কার্যাবলি নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এজন্যই জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে সাধারণত নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষমতাকে বোঝানো হয়ে তাকে। ড. গার্নার-এর মতে, 'সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত কোনো রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকগুলীর ক্ষমতাতেই জনগণের সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আধুনিক বিশালায়তন রাষ্ট্রগুলোতে আজ আর প্রাচীন গ্রিসের মত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমানে কার্যকর হচ্ছে। এরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

ইংরেজ দার্শনিক জন লক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যাঁ জাঁক রুশো 'জনগণের সার্বভৌমত্বের' ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 'জনগণের সার্বভৌমত্বের' ধারণাই আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলভিত্তি।

৫. **প্রকৃত গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব :** গণতন্ত্র আধুনিক যুগের সব থেকে জনপ্রিয় সরকার। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত সরকার। গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন ক্ষমতা। গণতন্ত্রে জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। অনেকেই মনে করেন যে, যখন কোনো রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত থাকে শুধু তখনই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে চেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে যেমন বিশাল, জনসংখ্যায়ও তেমনি বিপুল। এরূপ বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমানে প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কার্যকর হচ্ছে। এরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনগণ তথা নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্যে করে। এজন্যই বর্তমান গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকেই বোঝানো হয়ে থাকে। তবে প্রকৃত গণতন্ত্র বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যেভাবে সার্বভৌমত্ব সরাসরি জনগণের হাতে থাকে বর্তমান সময়ের পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে তা থাকে না।

ফরাসি বিপ্লবের মহান নায়ক, সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার সমর্থক রুশো ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অবিসংবাদিত ফরাসি রাষ্ট্র দার্শনিক। তিনি তার 'সোসাল কন্ট্রাক্ট' গ্রন্থে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' তত্ত্বও প্রকাশ করেন। 'আইনসংগত সার্বভৌম তত্ত্বের' প্রবক্তারূপে জন অস্টিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত তার 'আইন শাস্ত্রের ওপর বক্তৃতামালা' গ্রন্থে তিনি আইনগত সার্বভৌমত্বের যে ধারণা ব্যক্ত করেন, তা পরবর্তীতে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে 'একত্ববাদী মতবাদ' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। সার্বভৌম তত্ত্ব রচনা করতে গিয়ে তিনি গভীরভাবে হবস্ ও বেন্থামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের ধারণা তার আইন সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। তার মতে, 'আইন হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নতর ব্যক্তির প্রতি আদেশ।' সুতরাং আইনের সাথে প্রচলিত প্রথা এবং নীতিগত ধারণার কোন সম্পূরক নেই। সার্বভৌমের আদেশই হচ্ছে আইন। একমাত্র সার্বভৌমের হাতেই রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

১৩। ক. স্বল্পোন্নত দেশ বলতে কি বোঝেন?

খ. স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উত্তর : স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলো বর্তমান বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাথাব্যথার কারণ। যদিও উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের নামে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তাদের পছন্দের বিষয় ও উদ্ভাবিত ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং নিজের পছন্দের বাজার সৃষ্টি ও দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আজকের উন্নত দেশগুলো কোনো না কোনো পন্থায় এসব স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলোকে শোষণ-শাসন দ্বারা আজকের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বর্তমান সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন রূপে শোষণ এবং শাসন চালানের চেষ্টা করছে। তাই এসব স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর উচিত নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশি জনসংখ্যা এসব স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমাদের মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে স্বল্পোন্নত দেশের সংজ্ঞা কি এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্বল্পোন্নত দেশ

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হলো সেসব দেশ যাদের মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন কম এবং পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সাক্ষরতার হার কম। তাছাড়া এসব দেশের অর্থনীতি সুরক্ষিত নয়, কারণ

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবস্থা স্থিতিশীল নয়, পণ্য প্রস্তুত ও উৎপাদন কর্মকাণ্ড এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে কম গুরুত্বারোপ ও অনুদাননির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এসব বৈশিষ্ট্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে জাতীয় অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল অবস্থায় রেখেছে। অবশ্য ১৯৯০ সালের পর সব স্বল্পোন্নত দেশ তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতির জন্য বেশ কিছু উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান এবং উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে নীতিমালা গ্রহণ করেছে। যেমন– সরকারি ব্যবস্থায় চালিত সেক্টরগুলোর বেসরকারিকরণ, বিনিয়োগের সহজ শর্ত ইত্যাদি। ১৯৯০ সালের পর থেকে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ স্বল্পোন্নত দেশসহ বিশ্বব্যাপী দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। UNCTAD-এর তথ্য মোতাবেক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের বার্ষিক গড় ১৯৮৬-৯০ সাল পর্যন্ত ছিল ০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেখানে ১৯৯৬-২০০০ সালের বার্ষিক গড় এসে দাঁড়ায় ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। কিন্তু এ সময়ে উন্নত এবং কিছু দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপক হারে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হতে থাকে। এর কারণ হলো সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ পেতে গেলে যেসব সুযোগ-সুবিধা দিতে হয় তা না দিতে পারা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সহজতর প্রক্রিয়া, পর্যাপ্ত কাঁচামালের প্রাপ্তি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার না থাকা। এসব কারণে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ তুলনামূলক হারে খুব কম হচ্ছে। অন্যদিকে চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের হার সবচেয়ে বেশি হারে হচ্ছে। কারণ তারা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে। এছাড়া তারা সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য সঠিক নীতি নির্ধারণ করেছে। তাদের রয়েছে পর্যাপ্ত কাঁচামাল, বিশাল ভূখণ্ড, বড় পণ্যবাজার এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা

ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পাশের দেশ ভারত এবং উত্তরে চীন আগামী বিশ্ব রাজনীতি এবং বাণিজ্যে উদীয়মান শক্তি হতে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রে যেসব অবদান রেখেছে এবং রাখছে তা উল্লেখ করার মতো। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ক্ষুদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ছিল প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, মুসলিম বিশ্বের সাথে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং উন্নত দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা। নিচে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচিত হলো :

১. **সার্ক গঠন :** প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে SAARC গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যে জোট বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তা হলো SAARC। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সফলতা দেখিয়ে দিয়েছে যে অর্থনৈতিক জোটগুলো কতটা শক্তিশালী হতে পারে। আর তাই ২০০৫ সালে বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া ১৩তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে গুরুত্ব পেয়েছে 'সাফটা চুক্তি'।

২. **বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম :** বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ ড. মুহম্মদ ইউনূস কর্তৃক উদ্ভাবিত 'ক্ষুদ্রঋণ' আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন ব্যবস্থা। গ্রামীণ ব্যাংকের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫টি দেশে ১৩১টি অংশীদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০ লাখ পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ সেবা দিচ্ছে। প্রথম বিশ্ব ক্ষুদ্রঋণ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের ১০০ মিলিয়ন দরিদ্রতম মানুষের নিকট ক্ষুদ্রঋণ পৌঁছে দেয়ার জন্য (১৯৯৭-২০০৫) নয় বছরমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ

করা হয়। উল্লেখ্য, এ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রভাবে ২০০০ সালে মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলনে ১৮০ জনেরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সমর্থনে Millennium Development Goals (MDGs) গৃহীত হয়।

৩. **জাতিসংঘে অবস্থান :** ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। সদস্য হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭৯-৮০ সালে এবং ২০০০-২০০১ সালে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তি রক্ষার এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করেছে।

৪. **OIC এবং বাংলাদেশ :** ১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে OIC-তে যোগদান বাংলাদেশকে সুযোগ করে দিয়েছিল মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের। বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সাথে সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সব সময় সমর্থন জানিয়েছে, নির্যাতনের বিপক্ষে সোচ্চার থেকেছে। এ কারণে ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশ কোনো সম্পর্ক স্থাপন করেনি।

৫. **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি :** ৫২'র ভাষা আন্দোলন আজ আর শুধুই আমাদের জাতীয় বিষয় নয়। ভাষার জন্য এমন আন্দোলন এবং আত্মদান বিশ্বের কোথাও দেখা যায়নি। তাই ১৯৯৯ সালে UNESCO ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করছে।

৬. **সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান :** ২০০১ সালের পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিরোধী নীতি সমর্থন বেশ প্রশংসিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইস-এর বাংলাদেশে আগমন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। টনি ব্লেয়ার এবং কন্ডোলিজা রাইস বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিরোধী অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বাংলাদেশকে মডারেট মুসলিম এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৭. **আন্তর্জাতিক বাজারে শ্রমের চাহিদা পূরণ :** স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মানুষ উন্নত দেশগুলোতে যেন কাজের অনুমতি নিয়ে যেতে পারে এবং তাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০০৩ সালে ৪৯টি (বর্তমানে ৪৮টি) স্বল্পোন্নত দেশের মন্ত্রীদের নিয়ে ঢাকায় এ বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা সবাই এতে সম্মত হন। এতে সফলতা পাওয়া গেলে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে খুব ছোট একটি দেশ কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশ। স্বল্পোন্নত দেশ বাংলাদেশে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, দারিদ্র্য, দুর্নীতি। তবুও ২০১৫ সালের মধ্যে MDGs-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি কিছু ক্ষেত্রে বেশ আশাব্যঞ্জক।

স্বল্পোন্নত দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে যে দৃঢ় নেতৃত্ব এবং দেশপ্রেমের প্রয়োজন থাকে তা আজও আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে পাওয়া যায় না। নিজ এবং দলীয় স্বার্থকে রেখে যদি জাতীয় স্বার্থে কাজ করা যায় তবে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষান্বিত হবে। আমাদের এখন রুখতে হবে দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের ভয়াল থাবা এবং সেই সাথে নিতে হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক, যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। আর আমাদের বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

১৪। ক. স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs) বলতে কি বোঝায়?
খ. একটি দেশ LDCs কিনা তা কে ঠিক করে?
গ. বর্তমান বিশ্বে কতগুলো দেশ LDCs-ভুক্ত?
ঘ. সবচেয়ে জনবহুল LDCs কোন দেশ?

উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে সিকি শতাব্দী পার হতে না হতেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এশিয়া, আফ্রিকা সাব সাহারান অঞ্চল, ল্যাটিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার বা বেগবান হয়। যুদ্ধে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং এশিয়ার জাপানের সার্বিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে এসব দেশের অধীনে যেসব স্বাধীনতাকামী উপনিবেশ ছিল তাদের অনেকে সাম্রাজ্যবাদ, শক্তির হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। এসব সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভের পর পূর্বে তুলনায় আরো অধিক অন্তহীন সমস্যায় পড়ে। এরা হয়ে পড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ। এদের অবস্থান হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত দেশ হিসেবে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত জাতিসংঘের অঙ্গ-সংস্থা আঙ্কটাড (UNCTAD) সর্বপ্রথম ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সর্বাধিক অনুন্নত দেশের একটি তালিকা প্রকাশ করে যাতে এসব দেশসমূহকে স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs বা Least Developed Countries) হিসেবে চিহ্নিত করে।

স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs)

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে তুং (Mao Tse Tung) তার ভাষণে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে তিনভাগে ভাগ করেন। যথা–

১. প্রথম বিশ্ব– উন্নত রাষ্ট্রসমূহ
২. দ্বিতীয় বিশ্ব– অপেক্ষাকৃত কম উন্নত রাষ্ট্রসমূহ
৩. তৃতীয় বিশ্ব– উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ

তার মতে, ঔপনিবেশিক শোষণমুক্ত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকেই বলা হয় স্বল্পোন্নত বিশ্ব (LDCs) বা স্বল্পোন্নত দেশ। জন্মলগ্ন থেকেই এরা অনুন্নত এবং পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চল বলে চিহ্নিত।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এসব দেশের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় নিম্ন। খাদ্য ঘাটতি, অপুষ্টি, অশিক্ষা, অসচেতনতা, শিশু মৃত্যু, মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এদের নিত্যসঙ্গী। এসব দেশসমূহের উৎপাদন নিম্ন এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিকায়নের তেমন কোনো ছোঁয়া লাগেনি। অর্থনৈতিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, শাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির অভাব, অন্যায়-অবিচার, মূল্যবোধের অবক্ষয় এদের চিরচেনা। এসব দেশের রাজনীতিতে ধর্ম অধিক প্রভাব বিস্তার করে। এরা ঋণের ভারে জর্জরিত। এসব দেশেসমূহের প্রত্যেকটি শিশু মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া এদেরকে এখনো স্পর্শ করেনি। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মোট লোকসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১০%। অথচ বিশ্ব বাণিজ্যে এদের অংশগ্রহণ মাত্র ০.৫%।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) কর্তৃক প্রতি তিন বছর পর পর LDCs-ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। ECOSOC-এর মতে, LDC বলতে বোঝায়–

ক. **নিম্ন আয় :** যেসব দেশের মোট জাতীয় আয় তিন বছরে গড়ে ৭৫০ মার্কিন ডলারের নিচে এবং ৯০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করেনি।
খ. **দুর্বল মানব সম্পদ :** পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা এর আওতাভুক্ত।
গ. **অর্থনৈতিক অস্থিরতা :** কৃষি উৎপাদনে পণ্য-সেবা রপ্তানিতে, অপ্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে, রপ্তানি বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অস্থিরতা।

জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউএনডিপি (UNDP) প্রকাশিত মানব উন্নয়ন সূচক রিপোর্ট মতে, স্বল্পোন্নত দেশ বলতে বোঝায়–

১. যেসব দেশের জনগণের জীবন প্রত্যাশা (Life Expectancy) ৬০ বছরেরও কম।
২. শিক্ষার শতকরা হার ৮০ ভাগেরও নিচে; এবং
৩. মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারেরও নিচে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে স্বল্পোন্নত দেশ বলতে বোঝায়, সেইসব অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে যাদের গড় আয়ু কম, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিম্ন মাথাপিছু আয়সম্পন্ন এবং যাদের অবস্থান পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলে।

একটি দেশ LDCs কিনা তার নির্ণয়াক

একটি দেশ LDCs কিনা তা নির্ণয় করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি স্থায়ী অঙ্গসংস্থা আঙ্কটাড (UNCTAD– United Nations Conference on Trade and Development)। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক সম্মেলনের মাধ্যমে আঙ্কটাড গঠিত হয়। এর সদর দফতর জেনেভায়। বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৯৪টি দেশ। সর্বশেষ ১৪ জুলাই ২০১১ দক্ষিণ সুদান UNCTAD-এর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। আঙ্কটাড-এর সম্মেলন চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। একটি নির্বাহী বোর্ড এটি পরিচালনা করে। নির্বাহী বোর্ড ছাড়াও এতে ৭টি বিষয়ের ৭টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। নির্বাহী বোর্ডের কর্মকর্তাগণ প্রতিবছরে দুবার মিলিত হন এবং এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। আঙ্কটাড-এর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি নিম্নরূপ–

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা এবং চুক্তি ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
খ. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা; এবং
গ. উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানিযোগ্য মালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালানো।

আঙ্কটাড ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ২৪টি দেশের নাম ঘোষণা করে LDCs'র তালিকা প্রকাশ করে। এ সময়ে দেশের গড় বার্ষিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং শিক্ষার হারের ওপর নির্ভর করে সর্বাধিক অনুন্নত দেশগুলোর মাপকাঠি তৈরি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে জীবনের মান, দেশের অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য, জনসংখ্যার পরিধিসহ একাধিক বিষয় যোগ করা হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে LDCs তালিকা প্রকাশ করা হলে তা অভিজ্ঞমহলে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মানদণ্ডের প্রশ্নে। শেষ পর্যন্ত Committee on Developing Plan (CDP) অনেক আলাপ-আলোচনার পর সর্বাধিক অনুন্নত দেশগুলোর মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এ মানদণ্ডে গড় ব্যক্তিগত আয়, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার হার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ৪৯টি দেশকে LDCs-এর তালিকাভুক্ত করা

হয়। বর্তমানে LDCভুক্ত দেশের সংখ্যা ৪৮টি। বিশ্বের পর্যবেক্ষক আশা করেছিলেন যে, ধীরে ধীরে প্রতিটা 'Least Developed Country'ই এক সময় উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হবে। কারণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মহল থেকে তৎপরতা চালানো হয়। কিন্তু বৃথাই সে চিন্তা করা।

বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিয়ে জাতিসংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। ফরাসি সরকারের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে একাধিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্প্রদায় সর্বাধিক অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যাতে এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়া হয়। এর দ্বিতীয় সম্মেলনও ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। 'প্যারিস ঘোষণাপত্র' স্বাক্ষরিত হয় এ সম্মেলনে। এ ঘোষণাপত্রে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে এলডিসিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ

আঙ্কটাড প্রকাশিত 'এলডিসি রিপোর্ট-২০১১' মতে, বর্তমান বিশ্বে এলডিসিভুক্ত রাষ্ট্রসংখ্যা ৪৮টি। উল্লেখ্য, গত ৪০ বছরে তিনটি দেশ– বতসোয়ানা (১৯৯৪ সালে) এবং কেপ ভার্দে (২০০৭ সালে) এবং মালদ্বীপ (২০১১ সালে) এলডিসির গ্লানি ঘোচাতে পেরেছে। নিচে এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

- **আফ্রিকার ৩৩টি** ➢ অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বারকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, কমোরস, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, জিবুতি, নিরক্ষীয় গিনি, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি বিসাউ, লেসেথো, লাইবেরিয়া, মাদাগাস্কার, মালাবি, মালি, মৌরিতানিয়া, মোজাম্বিক, নাইজার, রুয়ান্ডা, সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, টোগো, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া ও জাম্বিয়া।
- **এশিয়ার ৯টি** ➢ আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, পূর্ব তিমুর ও ইয়েমেন।
- **ওশেনিয়ার ৫টি** ➢ কিরিবাতি, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টুভ্যালু ও ভানুয়াতু।
- **ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ১টি** ➢ হাইতি।

সবচেয়ে জনবহুল LDCs দেশ

সবচেয়ে জনবহুল LDC দেশ বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের কাছ থেকে। আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৫ কোটি ৫৮ লাখ। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০১৫ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ ভাগ। ভাষা বাংলা। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। মুসলিম ৯০.৪%, হিন্দু ৮.৫%, বৌদ্ধ ০.৬%, খ্রিস্টান ০.৩% এবং অন্যান্য ০.১%। স্থানীয় সময় গ্রিনিচ সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা আগে। প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৬৯ বছর।

সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, গৃহযুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি সব মিলিয়ে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশগুলো হলো স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)। উন্নত বিশ্বের নিকট স্বল্পোন্নত দেশগুলো হলো লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র। সরকারিভাবে নির্দিষ্ট তথ্যাবলীর মাপকাঠির ভিত্তিতে আঙ্কটাড সর্বাধিক অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে চিহ্নিত করে। আঙ্কটাড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এসব দেশসমূহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। যার প্রেক্ষিতে আঙ্কটাড ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশসমূহের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৮০-র দশকে আঙ্কটাড অনুন্নত দেশগুলোর জন্য একটা শক্তিশালী নতুন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যার ফলে এ দেশগুলোর জন্য বিদেশী সাহায্যের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ আঙ্কটাড-এর উদ্যোগের ফলেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিদেশী সাহায্যের প্রবণতা বৃদ্ধি

পায়। কেবল তা-ই নয়, উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে LDC'র দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ঋণ মওকুফের সুযোগ করে দেয়। পুঁজি বিনিয়োগে সরকারি-বেসরকারি সংগঠনকে উৎসাহিত করে। আঙ্কটাড-এর নির্দেশে এসব দেশসমূহের উন্নয়নে Trust Fund গঠন করা হয়েছে। যাতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সাহায্য করে। এত সব আয়োজন করার পরও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১১ পর্যন্ত LDC থেকে মাত্র তিনটি রাষ্ট্র বের হয়ে যেতে পেরেছে। অন্যান্য দেশগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। তবে তা এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। অভিজ্ঞমহল আশা করেছিলেন, ধীরে ধীরে প্রতিটা LDC এক সময় উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু দীর্ঘ ৪০ বছরে তাদের সে চিন্তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

১৫। কমনওয়েলথের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

উত্তর : সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন ও আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা কমনওয়েলথ (Commonwealth)। ব্রিটিশ শাসিত দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ নামক আন্তর্জাতিক এ সংস্থার জন্ম। নভেম্বর ১৯২৬ ইম্পিরিয়াল সম্মেলনে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস ধারণার পত্তন হয়।

কমনওয়েলথের গঠন

কমনওয়েলথ (Commonwealth), পূর্বনাম ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস (British Commonwealth of Nations)। ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন 'স্ট্যাচুট অব ওয়েস্টমিনিস্টার'-এ উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল লন্ডন ঘোষণা অনুযায়ী সংস্থাটি আধুনিক কমনওয়েলথ হিসেবে আত্মপ্রকাশ। তখন সংস্থাটি থেকে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে কমনওয়েলথ অব নেশন করা হয়।

কমনওয়েলথের সদস্য : বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩।

আফ্রিকা (১৮) : ক্যামেরুন, বতসোয়ানা, রুয়ান্ডা, ঘানা, কেনিয়া, লেসোথো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, মালাবি, মরিশাস ও সিচেলেস।

উত্তর আমেরিকা (১২) : কানাডা, এন্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামা, বার্বাডোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া ও বেলিজ।

এশিয়া (৮) : বাংলাদেশ, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভারত ও শ্রীলংকা।

দক্ষিণ আমেরিকা (১) : গায়ানা।

ওশেনিয়া (১১) : অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, ভানুয়াতু, নাউরু, নিউজিল্যান্ড ও টুভ্যালু।

ইউরোপ (৩) : ব্রিটেন, সাইপ্রাস ও মাল্টা।

বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ করে ১৮ এপ্রিল ১৯৭২। বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের জন্য পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করে ১৯৭২ সালে এবং ১৯৮৯ সালে পুনরায় যোগদান করে। কমনওয়েলথ ত্যাগকারী দেশ আয়ারল্যান্ড (১৯৪৯ সালে) ও জিম্বাবুয়ে (৭ ডিসেম্বর ২০০৩)। কমনওয়েলথের সর্বশেষ সদস্য রুয়ান্ডা (২৮ নভেম্বর ২০০৯)। সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে ফিজির (১ সেপ্টেম্বর ২০০৯-বর্তমান)।

কমনওয়েলথ সচিবালয় ও এর দায়িত্ব : ১৯৬৫ সালের পূর্বে কমনওয়েলথের কোনো সচিবালয় ছিল না। ১৯৬৫ সালে লন্ডনে কমনওয়েলথ-এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি সদস্য দেশগুলোকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দানের সাথে সাথে সম্মিলিতভাবে বহুপক্ষীয় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমে হিসেবে কাজ করে। ১৯৭৬ সালে কমনওয়েলথ সচিবালয় জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক মর্যাদা লাভ করে। কমনওয়েলথ মহাসচিব সচিবালয়ের প্রধান এবং তিনি রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। সচিবালয়ের সদর দপ্তর লন্ডনের মার্লবরো হাউজে অবস্থিত। সচিবালয় প্রতি দুবছর পরপর সরকারপ্রধানদের সম্মেলন ও নিয়মিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকসহ বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। সরকারগুলোর ইচ্ছানুসারে সচিবালয় বিভিন্ন কমনওয়েলথ কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন করে এবং কারিগরি সহযোগিতার জন্য পৃথকভাবে অর্থায়িত কমনওয়েলথ ফান্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা যুগিয়ে থাকে।

কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সহযোগিতার প্রধান প্রধান ক্ষেত্র : কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সহযোগিতার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হলো—

- শিক্ষা;
- স্বাস্থ্য;
- রপ্তানি বাজার উন্নয়ন;
- আইনগত বিষয়সমূহ;
- খাদ্য উৎপাদন;
- পল্লী ও শিক্ষা উন্নয়ন;
- অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
- প্রশিক্ষণ;
- নারী উন্নয়ন;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

কমনওয়েলথের অঙ্গসংস্থা ও সংগঠনসমূহ : কমনওয়েলথের কার্যক্রমকে সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে এর কিছু অঙ্গসংস্থা রয়েছে। এগুলোর কিছু রয়েছে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে এবং কতগুলো রয়েছে বিভিন্ন সদস্য দেশে। কমনওয়েলথের প্রধান সংস্থাগুলো হলো—

- কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট
- কমনওয়েলথ সায়েন্স কাউন্সিল
- সিএবি ইন্টারন্যাশনালস
- কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন

এছাড়া কমনওয়েলথের আরো কিছু সংস্থা রয়েছে, যেগুলো কমনওয়েলথের নানাক্ষেত্রে অগ্রগতির সহঅংশীদার। এদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

- অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিস
- কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন
- কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন

কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা : ১৯৬৫ সালে লন্ডনে কমনওয়েলথের সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কোনো সংবিধান নেই। ১৯৭১ সালের ১৪-২২ জানুয়ারি সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা গৃহীত হয়। এ নীতিমালা অনুসারে কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের যাবতীয় কার্যাবলী পালন করে থাকে। কমনওয়েলথের নীতিসমূহ হলো—

ক. জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন ও সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা।
খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সমর্থন।
গ. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাবলম্বী নির্বিশেষে সমঅধিকার।
ঘ. বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস।
ঙ. স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার।

উপরিউক্ত নীতিমালার আলোকে কমনওয়েলথ সদস্যগণ বিভিন্ন বৈঠকে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করে। এর ফলে পারস্পরিক সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

কমনওয়েলথের কার্যক্রম : কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে এর ব্যাপক অবদান। এক্ষেত্রে কমনওয়েলথের অবস্থান হলো ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অংশীদারিত্ব, শিক্ষাব্যবস্থা ও পেশাগত বন্ধনে মিল সৃষ্টি করা। এর উদ্দেশ্য প্রথমে উচ্চশিক্ষা জোরদার এবং ক্ষুদ্র দেশগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নের পথে সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ। শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কমনওয়েলথ নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে :

১. ১৯৬০ সাল থেকে ব্রিটেনের সহায়তাপুষ্ট কমনওয়েলথ বৃত্তি ও ফেলোশিপ পরিকল্পনা। এতে প্রতি বছর দেড় হাজার মানুষকে প্রধানত স্নাতকোত্তরদের ঐ বৃত্তি ও ফেলোশিপ দেয়া হয়।
২. 'কমনওয়েলথ অব লার্নিং'—এটি ভ্যাঙ্কুভারভিত্তিক আন্তঃসরকারি সহযোগিতা উন্নয়নে এজেন্সি, যারা দূরশিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগের ওপর কাজ করছে। ব্রিটেন এ সংস্থাটির প্রধান তথ্য ডেটাবেজ তৈরিতে সহায়তা করছে।
৩. মিল্টন কিনেসে ওপেন ইউনিভার্সিটিতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ফেটার অব ডিস্ট্যান্স লার্নিং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো এবং বাদ বাকি দেশগুলোতে ছাত্রদের দূরশিক্ষা কোর্স সম্পর্কে তথ্য যোগায়।

বাংলাদেশে কমনওয়েলথের কার্যক্রম : অন্যান্য দেশের মতো কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য বাংলাদেশেও কমনওয়েলথের শাখা রয়েছে, যার নাম 'বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সোসাইটি'। কমনওয়েলথভুক্ত স্বাধীন দেশগুলোর জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, সমঝোতা ও সহযোগিতার চেতনায় বিশ্বাসী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়েই গড়ে উঠেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

ক. বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথভুক্ত অন্য দেশসমূহের জনগণের মধ্যে সমঝোতা জোরদার করা।
খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; যেমন– বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, প্রেসক্লাব, ছাত্র সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ইত্যাদির সাথে কমনওয়েলথভুক্ত অন্য দেশগুলোর অনুরূপ সংগঠনের সহযোগিতা ও সমঝোতা সৃষ্টি।

গ. দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর সাথে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর অনুরূপ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সহযোগিতা গড়ে তোলা।

ঘ. বাংলাদেশ এবং কমনওয়েলথের অন্য দেশগুলোর ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহের মধ্যে সফর বৃদ্ধি ও বিনিময়।

ঙ. বাংলাদেশ এবং কমনওয়েলথভুক্ত অন্যদেশগুলোর মধ্যে সম্প্রদায়গত, গোষ্ঠীগত ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন চিহ্নিত করা ও তার উন্নয়ন ঘটানো।

চ. সাধারণভাবে সবার জন্য এবং বিশেষ করে সদস্যের উপকারার্থে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা।

ছ. অসহায় লোকজনকে সহায়তার লক্ষ্যে দাতব্য কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা ও বাড়ানো।

দ্বিতীয় বৃহৎ আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কমনওয়েলথ তাদের নিজস্ব নীতি ও উদ্দেশ্যের আলোকে বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত জাতিসংঘের সাথে নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমেই কমনওয়েলথ তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে সে লক্ষ্য নিয়েই সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাক—এটাই আজ সকলের প্রত্যাশা।

১৬। ক. কমনওয়েলথ কি?
খ. কমনওয়েলথ-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বর্ণনা করুন।
গ. বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কমনওয়েলথ-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন কমনওয়েলথ। ১৯২৬ সালে 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশন্স' ধারণার পত্তন হলেও আধুনিক কমনওয়েলথ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৯ সালে। কমনওয়েলথের কোনো লিখিত সংবিধান নেই। লন্ডনের মার্লবরো হাউজে কমনওয়েলথ-এর সদর দপ্তর অবস্থিত। কমনওয়েলথ-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। সর্বশেষ সদস্য রুয়ান্ডা (নভেম্বর ২০০৯)। ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণী কমনওয়েলথের প্রতীকী প্রধান। সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বিভিন্নতা থাকলেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মিলও রয়েছে প্রচুর। পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে এ ঘনিষ্ঠতা আরো দৃঢ় করার ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কমনওয়েলথ-এর ৫ম ও বর্তমান মহাসচিব ভারতের কমলেশ শর্মা, বর্তমান চেয়ারপার্সন শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি মাইথ্রিপালা সিরিসেনা। কমনওয়েলথ-এর প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৪ সালে এবং সরকারপ্রধানদের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৭১ সালে। প্রতিবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার কমনওয়েলথ দিবস পালিত হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও মোজাম্বিক কমনওয়েলথ সদস্য। আবার ব্রিটিশ উপনিবেশ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েও মিয়ানমার, বাহরাইন, ইরাক, মিসর, জর্ডান, কুয়েত, কাতার, সুদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত কমনওয়েলথ-এর সদস্য হয়নি।

কমনওয়েলথ-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

কমনওয়েলথ-এর কোনো লিখিত সংবিধান নেই। এ সংগঠনটির কোনো কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদও নেই। তাই এ সংগঠনটি পরিচালনার জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে কমনওয়েলথ-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ঠিক করা হয়। এ

নীতিমালা অনুসারে কমনওয়েলথ সদস্যসমূহ তাদের কার্যাবলী পালন করে থাকে। কমনওয়েলথ-এর নীতিমালা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন ও জাতিসংঘের সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা।
২. ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সমর্থন।
৩. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাজনৈতিক মতাবলম্বী নির্বিশেষে সম-অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান।
৪. স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান।
৫. বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস।
৬. গণতান্ত্রিক দেশসমূহে কমনওয়েলথ সহযোগিতার প্রসার ঘটানো।
৭. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা।
৮. কমনওয়েলথ সিদ্ধান্তসমূহ জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ও নীতিমালার আলোকে কমনওয়েলথ সদস্যগণ বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন; এসব শীর্ষ সম্মেলনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক, রপ্তানি বাজার উন্নয়ন, আইনগত বিষয়সমূহ, খাদ্য উৎপাদন, পল্লী ও শিক্ষা উন্নয়ন, নারী ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। এর ফলে পারস্পরিক সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কমনওয়েলথ-এর ভূমিকা

জাতিসংঘের বাইরে কমনওয়েলথ হচ্ছে একমাত্র সংগঠন যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের সমাবেশ ঘটেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সরকারের ধরন নির্বিশেষে যে কোনো দেশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য হতে পারে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। কমনওয়েলথ গঠনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজভুক্ত স্বাধীন দেশসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে কমনওয়েলথ বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **ঔপনিবেশিক ধারণা পরিত্যাগ :** ১৭৭৬-পরবর্তী আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো উন্নত দেশগুলো ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার তার ঔপনিবেশিক মানসিকতাও ত্যাগ করে। এ প্রেক্ষিতে বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য সমুন্নত রাখতে ঔপনিবেশিক দেশগুলোর স্বাধীনতা অর্জনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তারা তাদের সাংবিধানিক পরিবর্তন আনে। এভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে সমান মর্যাদা প্রদান করে। যার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

২. **গণতন্ত্রের উন্নয়ন :** কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বেশকিছু দেশেই গণতন্ত্র এখনো দুর্বল। কমনওয়েলথ গণতন্ত্রের উন্নয়নে এসব দেশের সরকার প্রধানরা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারেতে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে গণতন্ত্রের উন্নয়নসহ মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে কমনওয়েলথ ভূমিকার প্রসারতার কথা বলা হয়। গণতান্ত্রিক দেশসমূহকে সহায়তা প্রদান ও টেকসই উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

৩. **রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তদারকি :** কমনওয়েলথ তার সদস্য দেশগুলোকে গঠনমূলক সহযোগিতা করতে রাজনৈতিক বিষয়াবলীর বিভাজন করে থাকে। কমনওয়েলথ সদস্য দেশসমূহের রাজনৈতিক বিষয়াবলী দেখাশোনার জন্য কমনওয়েলথ-এর রয়েছে বিভাগীয় সেবা কমিটি ও বিশেষ দল। বিভাগীয় সেবা কমিটি সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর সরকারকে সহায়তা করার জন্য গবেষণা করে থাকে। কমনওয়েলথ এ গবেষণামূলক প্রতিবেদন সরকার প্রধানদের নিকট সরবরাহ করে থাকে।

৪. **মানবাধিকারের ওপর গুরুত্বারোপ :** কমনওয়েলথের একটি অপরাধ ইউনিট বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগ সদস্য দেশগুলোর অপরাধ প্রতিরোধে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া এ বিভাগ সদস্য দেশগুলোর সীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। এ বিভাগের 'ক্রাইম ওয়াচ বুলেটিন' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে, যাতে অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয়। সদস্য দেশগুলোকে এ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। ফলে সদস্যসমূহের মানবাধিকার রক্ষা করা সহজতর হয়।

৫. **মানব সম্পদ উন্নয়ন :** কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলোর মানব সম্পদ উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকে। এ উপলক্ষে কমনওয়েলথ বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া কমনওয়েলথ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। এজন্য কমনওয়েলথ শিক্ষার মান উন্নয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি শক্তিশালী করা, কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের ছাত্রছাত্রীদের অবাধ শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদারে গুরুত্বারোপ করে।

৬. **দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকই কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের অন্তর্গত। ফলে এসব দেশের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে ধনীদরিদ্র্য, বৈষম্য দিন-দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কমনওয়েলথ ধনী-দরিদ্র্য-বৈষম্য নিরসনে বিশ্বের সব উন্নত রাষ্ট্রের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে।

৭. **বাণিজ্য চিন্তাধারা :** কমনওয়েলথ যদিও কোনো অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সংগঠন নয়, তথাপিও বাণিজ্যনির্ভর এ পৃথিবীতে কমনওয়েলথ তার সহযোগিতাকে আরো জোরদার করতে বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করছে। ফলে সদস্য দেশগুলো পরস্পর পরস্পরের আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের সুবিধা সুষমভাবে ভোগ করার জন্য বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টিতে কমনওয়েলথ অঙ্গীকারবদ্ধ।

৮. **নিরপেক্ষতা বজায় :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ– এ দুই ব্লকে ভাগ হয়ে যায়। স্নায়ুযুদ্ধকালীন এক সংকটময় বিশ্ব পরিস্থিতিতে কমনওয়েলথ চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরূপ অস্বস্তিকর পরিবেশে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা ছিল মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ঔপনিবেশিক স্বাধীন দেশগুলোকে একটি নিরপেক্ষ ভাবধারায় সংগঠিত করা। এক্ষেত্রে কমনওয়েলথ তাদের নিজেদের ধ্যানধারণা সমুন্নত রেখে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে।

৯. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা :** কমনওয়েলথ-এর ১৩তম ডারবান শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনৈতিক ঘোষণাপত্রে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়। এ লক্ষ্যে ২০ কোটি ডলারের একটি ফান্ড

গঠন করা হয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ব্যবধান দূরীকরণে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়। কমনওয়েলথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোকে বৈজ্ঞানিক ও কৌশলগত সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

১০. **শিল্পোন্নয়নে সহযোগিতা :** কমনওয়েলথ তৃতীয় মহাসচিব এমেকা এনায়াকু ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশসহ (G-৮) অন্যান্য উন্নত দেশগুলোকে কমনওয়েলথভুক্ত শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহের শিল্পোন্নয়নে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীগণ কানাডার অটোয়াতে মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দরিদ্র দেশসমূহে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেন।

১১. **অর্থনৈতিক তহবিল গঠন :** কমনওয়েলথ তার সদস্য দেশসমূহকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক তহবিল গঠন করেছে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য একটি তহবিল গঠন করে। এ তহবিলে সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক তহবিলের সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০০ মিলিয়ন ডলার। কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের বৈঠকে আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয় যা আফ্রিকার বহুমুখী উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

১২. **অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি :** কমনওয়েলথ তার ফান্ড ফর টেকনিক্যাল কোঅপারেশন দ্বারা সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। এ সংস্থার অর্থ সমাগম ঘটে সদস্য দেশের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ দিয়ে। এ সংস্থা অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে আইনগত পরামর্শ প্রদান, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পাবলিক সেক্টর পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

কমনওয়েলথ বেশ পুরনো সংগঠন। একসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলো। সেই ভিত্তিতে দেশগুলোর মধ্যে এক ধরনের একতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কেননা তাদের অভিজ্ঞতা প্রায় এক ধরনের হয়েছে। বর্তমানে তাদের সমস্যাগুলোও এক। এই অভিন্নতার জন্যই কমনওয়েলথের সাংগঠনিক কাঠামোর ভেতর সামষ্টিক গতির জন্য সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। কমনওয়েলথ সদর দপ্তরকে এ সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাই উদ্যোগ নিতে হবে। এখন পর্যন্ত এ উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক হয়নি। ভবিষ্যতে না হলে কমনওয়েলথ তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ রাষ্ট্র কি?

উত্তর : মানবজাতির যতগুলো গোষ্ঠী আছে তার মধ্যে রাষ্ট্র প্রধান ও ক্ষমতাশালী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু এরিস্টটল থেকে আজ পর্যন্ত অনেকে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।' শুধু পরিবার ও গ্রাম সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি, এর মাধ্যমে স্বনির্ভর জীবনযাপনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুতরাং, 'সুবিধা লাভের নিমিত্তে অধিকারের সাধারণ ধারণা ও পারস্পরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অসংখ্য সমাজের একত্রিকরণকেই রাষ্ট্র বলে।

প্রশ্ন-০২ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর : যখন কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনসম্প্রদায় নিজের সরকার দ্বারা শাসিত হয় এবং সে সরকারের আদেশ অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে সমান প্রযোজ্য হয় তখন গঠিত হয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য চারটি। যথা : জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

১. **জনসমষ্টি** (Population) : রাষ্ট্রের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন নির্দিষ্ট জনসংখ্যা। জনসংখ্যা আবশ্যক সত্য কিন্তু কতজন দরকার তার কোনো নির্দিষ্টতা নেই।

২. **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Territory) : জনসংখ্যা যেমন আবশ্যক তেমনি ভূখণ্ডেরও প্রয়োজন। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ভিন্ন রাষ্ট্র হতে পারে না। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করলে রাষ্ট্র হবে না, স্থায়ীভাবে কোনো ভৌগোলিক আয়তনের মধ্যে অবস্থান করতে হবে।

৩. **সরকার** (Government) : রাষ্ট্রের জন্য জনসংখ্যা ও আয়তন যথেষ্ট নয়, এর জন্য আবশ্যক সরকার। সরকার হলো পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রকে জাহাজের সাথে তুলনা করলে সরকার হলো তার নাবিক।

৪. **সার্বভৌমত্ব** (Sovereignty) : সার্বভৌমত্ব হলো চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং তা ভিন্ন কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, ভূখণ্ড ও সুগঠিত সরকার থাকলেই তাকে আমরা রাষ্ট্র বলতে পারি না, যদি না সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে।

প্রশ্ন-০৩ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে মূল পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো :

১. রাষ্ট্র একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন এবং সরকার এর অংশমাত্র। সরকার ভিন্ন রাষ্ট্র সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণভাবে পরিচালিত হতে পারে না। রাষ্ট্র সমগ্র বিষয় এবং সরকার তার খণ্ডাংশ।

২. সরকারের তিনটি অঙ্গ যথা : আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। তিনটি বিভাগের দ্বারা সরকার পরিচালিত হয় কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শাসক ও শাসিত সবারই অবস্থান।

৩. রাষ্ট্র ধারণামাত্র, একে দেখা বা স্পর্শ করা যায় না। এটি ভাবধারা এবং অদৃশ্য বস্তু অথচ সরকার দেখা যায়। রাষ্ট্রকে অনুভব করা গেলেও দেখা যায় না। সরকার একটি দর্শনীয় বস্তু।

৪. রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকার অস্থায়ী। রাষ্ট্রের পরিবর্তন হতে পারে না, সরকার যে কোনো সময়ে রদবদল হতে পারে।

৫. সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং এর মূল মালিক দেশের জনগণ। সরকারের কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। বরং বলা যায়, সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্ট।

৬. রাষ্ট্র ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে এর অবস্থান অথচ সরকারের সাথে ভূখণ্ডের সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন-০৪ সার্বভৌমত্ব বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : সার্বভৌমত্ব হলো চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং তা ভিন্ন কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, ভূখণ্ড ও সুগঠিত সরকার থাকলেই তাকে আমরা রাষ্ট্র বলতে পারি না, যদি না সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতাবলে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি ও স্বীকৃতি পায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের দ্বারা স্বীকৃত হতে হলে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এটা একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা ,যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। এ শক্তির বলে সরকার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহির্বিশ্বের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

প্রশ্ন-০৫ সংবিধান বা শাসনতন্ত্র কি?

উত্তর : সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হলো কতগুলো আইনের সমষ্টি, যা দ্বারা রাষ্ট্রের মূলনীতি, সরকারের সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি, এর বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক, জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, অধিকার ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকে। বিশিষ্ট দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, 'শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের এরূপ জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে'। সুতরাং বলা যায়, সরকার শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি, শাসনতন্ত্র সরকারের সৃষ্টি নয়, এটি সার্বভৌমিকতার সৃষ্টি। তাই সংবিধান প্রতিটি দেশের একটি নিরবিচ্ছিন্ন অংশ। সংবিধান লিখিত ও অলিখিত দু-ই ধরনের হতে পারে।

প্রশ্ন-০৬ একনায়কতন্ত্র কি?

উত্তর : ল্যাটিন শব্দ Dictator (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) থেকে Dictatorship অর্থাৎ একনায়কতন্ত্র শব্দটির উৎপত্তি। কোনো শাসক বা গোষ্ঠীবিশেষ শাসিতের মতামতের ধার না ধরে একচ্ছত্রভাবে শাসনকার্য চালিয়ে গেলে তার বা তাদের শাসনকে বলা হয় একনায়কত্ব। রোমান প্রজাতন্ত্রের সময় থেকে এর উৎপত্তি। এ সময় জরুরি অবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসহ সাত বছরের জন্য একজন ডিক্টেটর নিয়োগের ক্ষমতা রোমান সিনেটকে প্রদান করা হয়। একনায়কতন্ত্র 'এক জাতি, এক দল ও এক নেতা' এ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এটা দ্বারা জনগণের অধিকার অস্বীকার করা হয় এবং জনগণ একনায়কের নির্দেশ কার্যকরী করতে বাধ্য থাকে। এজন্য অনেকে একে স্বৈরতন্ত্রও বলে থাকে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব কায়েম আছে। যেমন– বুর্জোয়া একনায়কত্ব, সর্বহারা একনায়কত্ব, সাময়িক একনায়কত্ব ইত্যাদি। এ শাসনব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক বিরোধী দলকে নির্মমভাবে দমন করা হয় বা বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এর দ্বারা বাক স্বাধীনতা সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয় এবং জনমত গঠনের সব উপাদান রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

প্রশ্ন-০৭ ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র কি?

উত্তর : ভৌগোলিক পরিসরে যেসব রাষ্ট্রের মাঝে অন্য কোনো রাষ্ট্রের অংশবিশেষ বা পুরো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অবস্থান রয়েছে, সেসব রাষ্ট্রকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ইতালির নাম উল্লেখ করা যায়। ইতালির অভ্যন্তরে সানমারিনো এবং ভ্যাটিকান সিটি দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র অবস্থিত।

প্রশ্ন-০৮ আরোপিত রাজধানী কাকে বলে?

উত্তর : সাধারণত একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রের রাজধানীকে কেন্দ্র করে। কখনো কখনো রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা অন্য কোনো প্রয়োজনে রাজধানীকে সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর করতে দেখা যায়। রাজধানীর এরূপ স্থানান্তরকে 'আরোপিত রাজধানী' বলা হয়। বিশ্বের বহু দেশে এরূপ বিশেষ প্রয়োজনে রাজধানীকে স্থানান্তরের ঘটনা ঘটেছে। যেমন– ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), অটোয়া (কানাডা), ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া) ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০৯ ন্যাম (NAM) কি? এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : NAM বলতে বোঝায় Non-Aligned Movement বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশ তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সময় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গোটা বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সদ্য ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কোনো একটা শিবিরে যোগ দেয়া সম্ভব ছিল না। ফলে তারা গড়ে তোলেন ন্যাম, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সম্মেলনে।

প্রশ্ন-১০ ন্যাম (NAM) প্রাথমিকভাবে গঠিত হয় কখন? এর উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর : NAM প্রাথমিকভাবে গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। NAM গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ সুকর্ন, মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের এবং ঘানার প্রেসিডেন্ট কাওমি নক্রুমা।

প্রশ্ন-১১ ন্যামের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? সর্বশেষ সদস্য দেশের নাম কি?

উত্তর : ন্যামের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০। ন্যামের সর্বশেষ দুটি সদস্য দেশের নাম আজারবাইজান ও ফিজি। এ দুটি দেশ ২৫ মে ২০১১ NAM-এ যোগদান করে।

প্রশ্ন-১২ ন্যাম (NAM)-এর প্রথম ও সর্বশেষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : NAM-এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালের ১-৬ সেপ্টেম্বর যুগোস্লাভিয়ার (বর্তমানে বিলুপ্ত) বেলগ্রেডে। ১২০ সদস্যবিশিষ্ট জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সর্বশেষ ও ১৬তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ২৬-৩১ আগস্ট ইরানের রাজধানী তেহরানে।

প্রশ্ন-১৩ ন্যাম ট্রয়কা (NAM Troika) বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বা ন্যাম সম্মেলনে গৃহীত একটি সিদ্ধান্তের নাম ন্যাম ট্রয়কা। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ ন্যাম সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত হয় যে, ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ন্যাম-এর ত্রয়োদশ সম্মেলনের জন্য বর্তমান, বিগত ও ভবিষ্যৎ (যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা, কলম্বিয়া এবং বাংলাদেশ) চেয়ারম্যানগণ একত্রিত হয়ে ত্রয়োদশ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ডারবান সম্মেলনের এ সিদ্ধান্তটি 'ন্যাম ট্রয়কা' নামে অভিহিত। উল্লেখ্য ত্রয়োদশ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-১৪ 'পঞ্চশীল' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : 'পঞ্চশীল' হলো ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারত-চীন সম্পর্ক নির্ধারণের নিমিত্তে গৃহীত পাঁচটি নীতি। 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত ঐ পাঁচটি নীতিই 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন' (ন্যাম)-এর পথ আরও ত্বরান্বিত করেছিল। এ পাঁচটি নীতি হলো— ক. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, খ. ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গ. অনাগ্রাসন, ঘ. অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা এবং ঙ. সমতা ও পারস্পরিক সুবিধা প্রদান।

প্রকৃতপক্ষে এ 'পঞ্চশীল' নীতির ওপর ভিত্তি করেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন-১৫ ন্যামকে অধিক কার্যকর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?

উত্তর : বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাব এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা যখন প্রশ্নের সম্মুখীন তখন ন্যামের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান ১২০ সদস্যের এ সংস্থা বিশ্বের দুর্বল, ক্ষুদ্র এবং শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রসমূহের একমাত্র ভরসার স্থলরূপে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ন্যামকে অধিক কার্যকর করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন—

ক. শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নে ভূমিকা রাখা;
খ. সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ এবং জাতীয় প্রয়োজন ও আদর্শকে সামনে রেখে জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে পরিচালনা;
গ. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্পদ, জনসংখ্যা, পণ্যের সুষম বণ্টন ইত্যাদির মাধ্যমে সকল সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন;
ঘ. জাতিসংঘের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখা;
ঙ. সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ তৈরিতে সুষম মুক্তবাণিজ্য এলাকা ঘোষণা;
চ. সামরিক জোট গঠনে বিরোধিতা করা এবং কোনো সদস্য রাষ্ট্র যাতে এরূপ জোটের দিকে না ঝোঁকে সেদিকে খেয়াল রাখা;
ছ. স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আদান-প্রদান করা;
জ. আণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখা;
ঝ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরূপে দু-তৃতীয়াংশ ন্যামভুক্ত সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রদের অবস্থান সুদৃঢ় করা এবং
ঞ. ন্যামকে সক্রিয় ও গতিশীল করতে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করা।

প্রশ্ন-১৬ ন্যাম (NAM)-এর বার্তা সংস্থার নাম কি?

উত্তর : ন্যাম (NAM)-এর বার্তা সংস্থার নাম NAM News Network (NNN)। ২০০৬ সালের ১৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থার সদর দপ্তর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে।

প্রশ্ন-১৭ কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট কি?

উত্তর : ১৯২৬ সালের সাম্রাজ্য সম্মেলনে (ইম্পেরিয়াল কনফারেন্স) ডমিনিয়নগুলোকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং তখন থেকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস ধারণার পত্তন হয়। ১৯৩১ সালে ডমিনিয়নের সংজ্ঞা স্ট্যাচুট অব ওয়েস্ট মিনিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে বলা হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

অধীন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলো কোনোভাবেই একে অন্যের অধীনস্থ নয় এবং তাদের মর্যাদা সমান। রাজার প্রতি এদের সাধারণ আনুগত্য থাকলেও এরা স্বাধীনভাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনসের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর কমনওয়েলথের চরিত্র বদলে যায় নাটকীয়ভাবে। প্রথমত, এটি বহুবর্ণের সংস্থায় পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ সালে রাজা ছাড়াও রাষ্ট্রপ্রধান আছেন এমন দেশকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয়ত, নামের শুরুতে যে ব্রিটিশ শব্দটি ছিল তা বাদ দিয়ে এটি কমনওয়েলথ অব নেশনস রূপে আবির্ভূত হয়।

প্রশ্ন-১৮ কমনওয়েলথের বর্তমান প্রধান কে? এর সদর দপ্তর কোথায়?

উত্তর : কমনওয়েলথের বর্তমান প্রধান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এর সদর দপ্তর মার্লবরো হাউস, লন্ডন (স্থাপিত হয় ১৯৬৫ সালে)।

প্রশ্ন-১৯ কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিবের নাম কি?

উত্তর : বর্তমান মহাসচিব কমলেশ শর্মা (ভারত); ১ এপ্রিল ২০০৮-বর্তমান।

প্রশ্ন-২০ কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগকারী দেশগুলো কি কি?

উত্তর : কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগকারী দেশগুলো হলো : আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও গাম্বিয়া। আয়ারল্যান্ড কমনওয়েলথ ত্যাগ করে ১৮ এপ্রিল ১৯৪৯, জিম্বাবুয়ে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয় ২০০৩ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং গাম্বিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করে ৩ অক্টোবর ২০১৩।

প্রশ্ন-২১ কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালাগুলো কি কি?

উত্তর : কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালাগুলো হলো : ১. জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন ও সিদ্ধান্ত মেনে চলা; ২. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সমর্থন; ৩. জাতি-ধর্ম-বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সমঅধিকারের স্বীকৃতি, ৪. বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস; ৫. স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার।

প্রশ্ন-২২ কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো কি কি?

উত্তর : কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ হলো : ১. শিক্ষা, ২. স্বাস্থ্য ৩. খাদ্য উৎপাদন, ৪. অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ৫. রপ্তানি বাজার উন্নয়ন, ৬. পল্লী ও শিক্ষা উন্নয়ন, ৭. আইনগত বিষয়সমূহ, ৮. প্রশিক্ষণ, ৯. নারী উন্নয়ন, ১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

প্রশ্ন-২৩ CPA কি?

উত্তর : সিপিএ কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলোর পার্লামেন্টসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা। ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময়ে তিনি এ জাতীয় একটি সংস্থা গঠনের ঘোষণা দেন। রাজার সেই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১১ সালে 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)' গঠিত হয়। সে সময় এর সদস্য ছিল মাত্র চারটি দেশ : কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯২১ সালে আইরিশ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হলে নতুন ডমিনিয়নরূপে আইরিশ ফ্রি স্টেটের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রশ্ন-২৪ ম্যাগনাকার্টা কি?

উত্তর : ব্রিটেন সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লবের অধিকারী হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে তাদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এ সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলো অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে হস্তচ্যুত

হলে ইংরেজ ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হয়। সুতরাং উত্তর আমেরিকার মতো কানাডাতে যখন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উত্থাপিত হয় তখন লর্ড ডারহামকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক নীতিতে যেসব পরিবর্তনের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত এ রিপোর্টই ইতিহাসে কমনওয়েলথের 'ম্যাগনাকার্টা' নামে পরিচিত। এ রিপোর্টে বৈদেশিক নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলোকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান করতে সুপারিশ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-২৫ কমনওয়েলথ-এর আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : নভেম্বর ১৯২৬ ইম্পেরিয়াল সম্মেলন বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েথ অব নেশনস ধারণার পত্তন হয়। আধুনিক কমনওয়েলথের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের এ সংস্থায় প্রবেশের মাধ্যমে। তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে কমনওয়েলথ নানা কার্যক্রমের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারেতে কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক পুনর্গঠন ও এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। এছাড়া ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে 'সিএমএপি' (মিলব্রুক কমনওয়েলথ অ্যাকশন প্রোগ্রাম) গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হারারে ঘোষণা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে একটি অবকাঠামো দাঁড় করায়। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে নাইজেরিয়ায় মানবাধিকার অবস্থা আরও নিম্নতর হওয়ায় কমনওয়েলথ নাইজেরিয়ার ওপর নানারকম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৯৯৭ সালে কমনওয়েলথের সভায় সিয়েরা লিওনের অংশগ্রহণ স্থগিত করা হয়। আবার ১৯৯৯ সালে কমনওয়েলথ গঠিত বহুজাতিক পুলিশ পর্যবেক্ষক দল সলোমন আইল্যান্ডে স্থিতি অবস্থা গ্রহণ করে। ২০০০ সালের জুনে ফিজি সরকার সে দেশের কিছু সশস্ত্র বেসামরিক লোকজন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কমনওয়েলথ তাদের সব ধরনের বৈঠক থেকে ফিজির সদস্যপদ স্থগিত করে। ২০০৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য আবার সদস্যপদ স্থগিত করা হয়। ২০০২ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে একুশ শতকের নানা সমস্যা মোকাবিলার ব্যাপারে নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে কমনওয়েলথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে সহায়তা বৃদ্ধি, HIV বা এইডস নিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্র চর্চা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নতকরণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর শক্তি বৃদ্ধি, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ইত্যাদি নানা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্বে তাদের প্রভাব অব্যাহত রেখেছে।

টীকা

♦ ফিফথ কলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী

স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)-এর সময় যখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা চতুর্দিক থেকে মাদ্রিদ আক্রমণ করে, তখন ফ্রাঙ্কোর বিশ্বস্ত অনুচরেরা ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি শক্তিকে সরকারেরই অভ্যন্তর থেকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। এই গোপন বাহিনী ফিফথ কলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এই শব্দটির দ্বারা সাধারণত এমন বিশ্বাসঘাতকদের বোঝানো হয়ে থাকে, যারা স্বীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের শত্রুদের স্বার্থে কাজ করে।

♦ আয়রন কার্টেন

কমিউনিস্ট দেশ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির বহিঃপ্রকাশ রোধ করার জন্য সংবাদ মাধ্যম, বিদেশীদের আগমন ইত্যাদির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এ পদ্ধতিকে আয়রন বা লৌহযবনিকা বলা হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম আয়রন কার্টেন (Iron Curtain) নীতি প্রবর্তন করে। চীন দেশ কর্তৃক গৃহীত এ ব্যবস্থাকে Bamboo Curtain বলা হয়।

♦ ইন্টারপোল (Interpol) *[৩২তম; ২৪তম বিসিএস]*

International Criminal Police Organisation সংক্ষেপে Interpol। ইন্টারপোল হলো পুলিশ বাহিনীর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। ১৯২৩ সালে বিশ্বের ৫০টি দেশ মিলে পুলিশ বিভাগকে আধুনিকীকরণ এবং অপরাধীদেরকে দ্রুত চিহ্নিত ও ধরার লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। ইন্টারপোলের সদর দপ্তর ফ্রান্সের লিওনে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক কারণে কিছুদিন এর কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ১৯৪৬ সাল থেকে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হয়। ইন্টারপোলের একটা সাধারণ পরিষদ রয়েছে। এর অধিবেশন এক এক সময় এক এক সদস্য রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ত্বরিত যোগাযোগ স্থাপন, অপরাধীদের সন্ধান, গতিরোধ, গ্রেপ্তার ইত্যাদির জন্য এই কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্র ১৯০টি। বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে। ইন্টারপোলের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

- পুলিশ বিভাগ বা পুলিশ বাহিনীকে অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিনিময় করা।
- এক দেশের অপরাধী অন্য দেশে যেন সহজে গা ঢাকা দিতে না পারে সে ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত কোনো আসামীকে স্বদেশে ফেরত দান।
- সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অপরাধ অনুসন্ধানের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।
- বিশ্বের অপরাধ দমন জোরদার করা এবং নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

♦ সিরডাপ *[২৯তম বিসিএস]*

CIRDAP-এর পূর্ণরূপ Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific. সংস্থাটি গঠিত হয় ৬ জুলাই ১৯৭৯। CIRDAP প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)। CIRDAP-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪টি। এগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার। সংস্থাটির সদর দপ্তর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পল্লীর জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও ভাগ্যোন্নয়ন। সিরডাপের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৪-২৮ জানুয়ারি ২০১০ ঢাকায়।

♦ ওপেক *[২৯তম বিসিএস]*

OPEC-এর পূর্ণরূপ Organisation of the Petroleum Exporting Countries। এটি গঠিত হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৫ (ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা)। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২। সদস্য দেশগুলো হলো আলজেরিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, কাতার,

নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, লিবিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অ্যাঙ্গোলা ও ইকুয়েডর। আরব বহির্ভূত সদস্য ইরান, নাইজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, ইকুয়েডর ও ভেনিজুয়েলা। এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত। OPEC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে তেলের উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা।

♦ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ *[২৯তম বিসিএস]*

NAM-এর পূর্ণরূপ Non Aligned Movement বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চতুর্থ সম্মেলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্ররূপে বিশ্বে পরিচিত হয়। ১৯৭৩ সালের আলজিয়ার্স সম্মেলনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দান করেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উক্ত সম্মেলনে তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হবে তা ব্যাখ্যা করেন এবং অপরাপর সদস্য দেশের ভূমিকার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ১৯৭৬ ও ১৯৭৯ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে দলের নেতৃত্ব দান করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। উভয় সম্মেলনে তিনি বলিষ্ঠ ও তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি ও আদর্শাবলী অনুসরণ করে চলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং শক্তি ব্যবহারের বিশ্ব নয়, বরং মানবতা রক্ষার বিশ্ব গঠনে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। ১৯৮৩ ও ১৯৮৯ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তম শীর্ষ ও নবম সম্মেলনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলন দুটিতে এইচ এম এরশাদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৮৬ সালে অষ্টম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় দশম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সালে কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের একাদশ শীর্ষ সম্মেলনেও বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০৩ সালে মালয়েশিয়ার পুত্রাজায়ায় অনুষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ সম্মেলন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। ২০০৬ সালের ১১-১৬ সেপ্টেম্বর কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সম্মেলনেও বাংলাদেশ ফিলিস্তিন পরিস্থিতি, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ১৫-১৬ জুলাই ২০০৯ ন্যামের ১৫তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মিশরে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সম্মেলনে পরবর্তী তিন বছরের জন্য এশিয়া অঞ্চলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। NAM-এর ১৬তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৬-৩১ আগস্ট ২০১২ ইরানে এবং ১৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০১৫ সালে ভেনিজুয়েলায়। বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে এসেছে ও জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে আসছে। জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রতি অবিচল আস্থা ও সমর্থন বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি।

♦ কমনওয়েলথ-এর নতুন সনদ

১১ মার্চ ২০১৩ কমনওয়েলথ-এর ঐতিহাসিক এক সনদে স্বাক্ষর করেন সংস্থার প্রধান ও ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। রানি যে সনদে স্বাক্ষর করেন তাতে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ১৬টি সাধারণ বিশ্বাসকে কমনওয়েলথ-এর সমন্বিত মূল্যবোধ বা সংস্থার মৌলিক নীতিমালা হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়। এগুলো হলো— গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা, সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, সুশাসন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা ও সমঝোতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরিবেশ রক্ষা এবং চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার ইত্যাদি। এছাড়াও কমনওয়েলথে তরুণ ও সুশীল সমাজের ভূমিকাকে ঐ সনদে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। রানি নিজেই তার বক্তব্যে ঐ সনদকে কমনওয়েলথের উন্নয়ন ও নবায়নের চলমান যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো কমনওয়েলথ ও এর সব সদস্য দেশের প্রত্যাশা ও মূল বিশ্বাসকে নিয়ে এ সনদ রচিত হলো।

সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন এবং আশ্রিত দেশসমূহ নিয়ে গঠিত সংগঠন কমনওয়েলথ। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে। এ সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন 'স্ট্যাটিউট অব ওয়েস্ট মিনিস্টার'-এ উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে উপনিবেশগুলো কমনওয়েরথ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস। আধুনিক কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২৬ এপ্রিল ১৯৪৯ 'লন্ডন ঘোষণা' অনুযায়ী। তখন সংস্থাটি থেকে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' করা হয়। বর্তমান প্রধান রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এর সচিবালয় মার্লবরো হাউস, লন্ডন। সচিবালয় প্রতিষ্ঠা ১৯৬৫ সালে। সংস্থাভুক্ত দেশসমূহের কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের বলা হয় হাইকমিশনার। বর্তমান সদস্য ৫৪। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে ৩২তম দেশ হিসেবে; ১৮ এপ্রিল ১৯৭২। ব্রিটিশ শাসন বহির্ভূত সদস্য দেশ মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা। কমনওয়েলথ দিবস মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার। পঞ্চম ও বর্তমান মহাসচিব কমলেশ শর্মা (ভারত); ১ এপ্রিল ২০০৮–বর্তমান।

♦ সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS)

ITLOS-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি International Tribunal for the Sea। তৃতীয় সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর এটি 'সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন'-এ স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানির হামবুর্গভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমুদ্র বিষয়ক বিরোধ মীমাংসা করে থাকে। বিভিন্ন দেশের ২১ জন বিচারক নিয়ে এ ট্রাইব্যুনাল গঠিত। বর্তমানে ১৬০টি দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) এ প্রতিষ্ঠানটির অধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ মার্চ ২০১২ এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় প্রদান করে।

♦ আফ্রিকম

মিশর ছাড়া আফ্রিকার ৫৩টি দেশের জন্য মার্কিন সামরিক তৎপরতা ও সহযোগিতার জন্য গঠিত যৌথ বাহিনী আফ্রিকম (AFRICOM)। মূলত এ বাহিনী গঠিত হয়েছিল ১ অক্টোবর ২০০৭, যা মার্কিন-ইউরোপীয় যৌথবাহিনীর আওতাধীন ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এটি কার্যকরী হয় ১ অক্টোবর ২০০৮। অনুমোদন লাভ করে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০। যৌথবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল উইলিয়াম ই. ওয়ার্ড। এর সদর দপ্তর ক্যালি ব্যারাকস, স্টুটগার্ট, জার্মানি।

♦ ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে গঠিত হয়েছে নতুন সংস্থা ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস (UNASUR বা UNASUL)। সংগঠনের স্প্যানিশ নাম Union de Naciones Suramericans-এর শব্দসংক্ষেপ UNASUR। সংগঠনের পর্তুগিজ নাম Uniao de Nacoes Sul-Americanas-এর সংক্ষিপ্ত রূপ UNASUL. এটি একটি বহুজাতিক এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা, যা দুটি আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সংস্থার সম্মিলিত রূপ। বাণিজ্যিক সংস্থা দুটি হচ্ছে মারকোসার ও আন্দিয়ান কমিউনিটি। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গঠিত এ সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ লাভ করে ২৩ মে ২০০৮। ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের তৃতীয় সম্মেলনে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পরই গঠিত হয় ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস, যার পূর্বসুরী ছিল সাউথ আমেরিকান কমিউনিটি অব নেশনস (CSN)। ২০০৭ সালের ১৬ এপ্রিল প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান জ্বালানি সম্মেলনে এটি বিলুপ্ত হয়।

সদর দপ্তর কুইটো (ইকুয়েডর) এবং কোচাবাম্বা (বলিভিয়া)। ব্যাংকের নাম ব্যাংক অব দ্য সাউথ (কার্যক্রম শুরু ৯ ডিসেম্বর ২০০৭)। সদস্য দেশ ১২টি; দেশগুলো হচ্ছে : আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, গায়ানা, প্যারাগুয়ে, পেরু, সুরিনাম, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা। পর্যবেক্ষক দেশ পানামা ও মেক্সিকো। অফিসিয়াল ভাষা ৪টি (ডাচ, ইংরেজি, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ)।

♦ ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন

গ্রিনল্যান্ডের বেলাভূমি থেকে জর্ডানের মরুপ্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য গঠন করা হয়েছে এক নতুন সংস্থা ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর বার্সেলোনা প্রক্রিয়ার নতুন সংস্করণ এ সংস্থা, যা চালু হয় ১৯৯৫ সালে। প্যারিসে ১৩ জুলাই এ নতুন আঞ্চলিক জোটের যাত্রা শুরু হয়। এ সংস্থার আহ্বায়ক/রূপকার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সার্কোজি। সদস্য দেশ ৪৩টি; ইইউভুক্ত ২৭টি দেশ এবং আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, মিশর, ইসরাইল, জর্ডান, লেবানন, মৌরিতানিয়া, মোনাকো, মন্টিনিগ্রো, মরক্কো, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ, সিরিয়া, তিউনিসিয়া ও তুরস্ক। সদর দপ্তর স্পেনের বার্সেলোনায় অবস্থিত।

♦ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)

IDB-এর পূর্ণরূপ Islamic Development Bank। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ওআইসির অর্থমন্ত্রিদের সম্মেলনে IDB প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কার্যক্রম শুরু হয় ২০ অক্টোবর, ১৯৭৫। এর আর্থিক লেনদেন শুরু হয় জানুয়ারি, ১৯৭৬। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৬। সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম দেশসমূহের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত করা। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আহমদ মুহাম্মদ আলী।

♦ কমনওয়েলথ (Commonwealth)

কমনওয়েলথ হলো সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন এবং আশ্রিত দেশসমূহ নিয়ে গঠিত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন 'স্ট্যাচু অব ওয়েস্ট মিনিস্টার'-এ উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। অতঃপর ১৯৪৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব নাম ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশসন। এ সংস্থার প্রতীকী প্রধান ব্রিটেনের রাজা বা রানী। সদর দপ্তর মার্লবরো হাউস, লন্ডন (স্থাপিত হয় ১৯৬৫ সালে)। নির্বাহী প্রধান মহাসচিব। প্রতিবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার কমনওয়েলথ দিবস পালিত হয়। এ সংস্থার সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতের পদবি হলো হাইকমিশনার। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। সদস্য দেশসমূহ হলো :

- ☐ আফ্রিকা (১৮) : ক্যামেরুন, বতসোয়ানা, রুয়ান্ডা, গাম্বিয়া, ঘানা, কেনিয়া, লেসোথো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, মালাবি, মরিশাস ও সিচেলে।
- ☐ উত্তর আমেরিকা (১২) : কানাডা, এন্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামা, বার্বাডোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া ও বেলিজ।
- ☐ এশিয়া (৮) : বাংলাদেশ, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভারত ও শ্রীলংকা।
- ☐ দক্ষিণ আমেরিকা (১) : গায়ানা।
- ☐ ওশেনিয়া (১১) : অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, ভানুয়াতু, নাউরু, নিউজিল্যান্ড ও টুভ্যালু।
- ☐ ইউরোপ (৩) : ব্রিটেন, সাইপ্রাস ও মাল্টা।

বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। আয়ারল্যান্ড কমনওয়েলথ ত্যাগ করে ১৯৪৯ সালে, জিম্বাবুয়ে ৭ ডিসেম্বর ২০০৩ ও গাম্বিয়া ৩ অক্টোবর ২০১৩। এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা : ১. জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন ও সিদ্ধান্ত মেনে চলা; ২. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সমর্থন; ৩. জাতি-ধর্ম-বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সমঅধিকারের স্বীকৃতি, ৪. বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস; ৫. স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার।

♦ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)

NAM-এর পূর্ণরূপ Non Aligned Movement বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। উদ্যোক্তা হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ সুকর্ন এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে, বেলগ্রেড সম্মেলনে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০। সর্বশেষ সদস্য সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস ও হাইতি। মূলনীতি ১. প্রত্যেকের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন; ২. অনাক্রমণ; ৩. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান; ৪. অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

♦ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত *[৩০তম বিসিএস]*

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের যাত্রা শুরু ১ জুলাই ২০০২ এবং এটি কার্যক্রম শুরু করে ৯ নভেম্বর ২০০৬। নেদারল্যান্ডের রাজধানী হেগে এ আদালতের ১৮ জন বিচারপতি তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। এটিই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম স্থায়ী যুদ্ধাপরাধ আদালত। যুক্তরাষ্ট্র এই আদালত বর্জন করেছে এবং সরাসরি আদালত গঠনের বিরোধিতা করেছে। রাশিয়া ও চীন এই আদালতকে মেনে নেয়নি। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশের ৩টিই এই আদালতকে সমর্থন করে না। তবে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই আদালত গঠনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে। ১৯৯৮ সালে রোম চুক্তির প্রতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশ অনুমোদন দেয়ার পর বছরের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠিত হয়। নেদারল্যান্ডের রানী বিট্রিক্সের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়।

♦ এনজিও

Non-Government Organisation (NGO) অর্থাৎ বেসরকারি সংস্থা। সাধারণত বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরিদ্র বা পশ্চাৎপদ জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য, তাদের স্বাস্থ্য বা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, পরিবেশ উন্নয়ন ও বনায়নের জন্য, এইডস, কুষ্ঠ, ডায়রিয়া বা অনুরূপ ভয়াবহ ব্যাধিসমূহের মোকাবিলার জন্য, সম্প্রদায় বিশেষের উন্নয়নের জন্য, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অথবা অপর কোনো জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা কাজ করে সেসব সংস্থাকেই বলে এনজিও। অবশ্য বর্তমানে কোনো কোনো এনজিও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্রের বিকাশ, সুষ্ঠু নির্বাচন ইত্যাদি সুনিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক কাজেও সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষপাতী। বস্তুত, অনুন্নত দেশসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন এবং পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নে যেমন এনজিওদের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, তেমনি এনজিওসমূহ ক্রমবর্ধমান হারে সংশ্লিষ্ট দেশের সমাজ ও রাজনীতির ওপরও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। অনেকে অভিযোগ করেন যে, এনজিওরা আসলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণকে দারিদ্র্যের একটা স্তরে বেঁধে রাখার জন্য এবং ওই দেশকে উন্নত বিশ্বের বাজার হিসেবে বজায় রাখার স্বার্থেই কাজ করে, তাই তারা কোনো দেশের মৌলিক শিল্পায়ন, বিদ্যুতায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, রেলওয়েসহ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে কোনো বিনিয়োগ করে না, যদিও এরূপ বিনিয়োগই একটা জাতির সার্বিক উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী অবদান রাখতে পারে।

অধ্যায় ০৩

ক্ষমতা ও নিরাপত্তা
Power & Security

Syllabus | *Power and Security : Power, national power, balance of power, disarmament, arms control, geopolitics, terrorism.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *'বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী মনোভাব বেশ প্রকট'—এই বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কী একমত? এর জন্য আল-কায়েদা কতটুকু দায়ী? আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]*

০২. *ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক গঠনে কিভাবে প্রভাবিত করছে—আলোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]*

০৩. *শক্তির ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা কি একটা অনিবার্য বাস্তবতা? [২৭তম বিসিএস]*

অথবা, শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি পর্যালোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি এর পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে? [২৩তম বিসিএস]

অথবা, 'সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে'-এ উক্তির যথার্থতা তুলে ধরুন।

অথবা, আপনি কি মনে করেন সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে?— আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

০৪. *নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। এটা কতটুকু সত্য যে, নিরস্ত্রীকরণ বিশ্ব শান্তির পূর্বশর্ত? [২৭তম বিসিএস]*

০৫. *উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় পাকিস্তান ও ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ কি প্রভাব ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন? [২১তম বিসিএস]*

০৬. *মধ্য এশিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করুন। [২৯তম; ২৪তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. *ক. জাতীয় শক্তি কি?*

খ. জাতীয় শক্তির উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৮. *জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশটির অবস্থান নির্ণয়ে কি ভূমিকা পালন করে?*

০৯. ক. শক্তি ও জাতীয় শক্তির ধারণা দিন।
খ. জাতীয় শক্তির কাঠামো ও উপাদান আলোচনা করুন।
গ. একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির গুরুত্ব উপস্থাপন করুন।
১০. জাতীয় শক্তির পরিমাপ ও মূল্যায়নপূর্বক এ প্রসঙ্গে জাতীয় শক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করুন।
১১. ক. শক্তিসাম্য তত্ত্ব আলোচনা করুন।
খ. শক্তিসাম্য রক্ষার কৌশল বা পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।
১২. ক. শক্তিসাম্য কি?
খ. শক্তিসাম্য ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
১৩. 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে শক্তি বা ক্ষমতা'—জাতীয় শক্তির ধারণায় এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।
১৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৫. ক. সন্ত্রাসবাদ কি?
খ. বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?
১৬. 'বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার সন্ত্রাসবাদে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।'—এ উক্তির আলোকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণ করুন।
অথবা, 'বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার বঞ্চনা সন্ত্রাসবাদে মানুষকে উৎসাহিত করেছে'– আলোচনা করুন।
১৭. ক. নিরস্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝেন?
খ. নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি বিবরণ দিন।
অথবা, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রবিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তার বাস্তবতা বিষয়ে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।
১৮. ক. নিরস্ত্রীকরণ কি?
খ. আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
১৯. ক. NPT ও CTBT সম্পর্কে ধারণা দিন।
খ. চুক্তি দুটির বাস্তবায়নে সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২০. 'পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা পৃথিবীর পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনবে।'—আপনার মতামত লিখুন।
২১. বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে, তাই ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন।—আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. জাতীয় শক্তি কি?
০২. জাতীয় শক্তির প্রকারভেদগুলো কি কি?
০৩. জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো কি কি?
০৪. রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান বলতে কি বোঝায়?
০৫. শক্তির রাজনীতি কি?
০৬. আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র বলতে কাকে বোঝানো হয়?
০৭. জাতীয় শক্তিতে সামাজিক উপাদানের ভূমিকা কি?
০৮. জাতীয় শক্তির মূল্যায়ন কিরূপে করা যায়?
০৯. শক্তিসাম্য কি?
১০. শক্তিসাম্যের ধরন বা প্রকারগুলো কি কি?
১১. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের বর্তমান অবস্থা কি রূপ?
১২. দ্বি-মেরুপ্রবণতা কি?

১৩. সাম্প্রতিক বিশ্ব রাজনীতির প্রভাবক হিসেবে মতবাদ (Ideology)-এর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
১৪. শক্তিসাম্যের প্রকারভেদ লিখুন।
১৫. শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
১৬. নিরস্ত্রীকরণ কি?
১৭. শান্তিপূর্ণ উপায় বলতে কি বোঝায়?
১৮. কি কি কারণে নিরস্ত্রীকরণ অত্যন্ত জরুরি?
১৯. NPT কি? এটি কখন স্বাক্ষরিত হয়?
২০. CTBT কি? বাংলাদেশ কখন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে?
২১. WMD-এর পূর্ণরূপ কি?
২২. SALT ও START কি?
২৩. আইএনএফ (INF) চুক্তি বলতে কি বুঝায় এবং এই চুক্তি কোন অস্ত্র ব্যবহারের বেলায় প্রযোজ্য?
২৪. 'SORT' চুক্তির মূল লক্ষ্য কি?
২৫. SDI বা তারকা যুদ্ধ কি?
২৬. ICBM কি?
২৭. ডার্টি ডজন (Dirty Dozen) কি?
২৮. রাসায়নিক অস্ত্র বলতে কি বোঝায়?
২৯. ক্লাস্টার বোমা কি?

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চুক্তিসমূহ

টীকা

- ভূ-রাজনীতি
- কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ
- নতুন কৌশলগত অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি (নিউ স্টার্ট)
- পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি (NPT)
- গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (সল্ট-১) [১৩তম বিসিএস]
- পরমাণু অস্ত্র হ্রাস চুক্তি
- রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি [২৪তম বিসিএস]
- জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন
- ভার্সাই চুক্তি (১৭৮৩) ও ভার্সাই শান্তিচুক্তি (১৯১৯)
- আল কায়েদা
- অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম
- অপারেশন ডেজার্ট ফক্স
- জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defense) [২৫তম বিসিএস]
- জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন [২৫তম বিসিএস]
- বিশ্ব স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি [২০তম বিসিএস]
- ক্লাস্টার বোমা
- আকসা চুক্তি
- অস্ত্রবাণিজ্য রোধে জাতিসংঘ চুক্তি
- গুচ্ছবোমা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কার্যকর
- অসলো সনদ ২০০৭
- পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক) নিষিদ্ধকরণ চুক্তি
- আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA)
- শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ
- নেভি সিল
- সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA)
- কেজিবি
- আইএসআই
- এফবিআই
- বাফার জোন
- বোকো হারাম
- সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস
- ক্রিমিয়া
- বিশ্ব অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর
- শার্লি হেবদো হত্যাকাণ্ড

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী মনোভাব বেশ প্রকট'-এই বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কী একমত? এর জন্য আল-কায়েদা কতটুকু দায়ী? আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : বর্তমানে ইসলাম যে যুগ অতিক্রান্ত করছে এটা ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে ক্রান্তিকাল। মুসলিম উম্মাহর সামনে আজ যেসব সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে, অতীতে আর কখনও তাদেরকে এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। এক হিসেবে মুসলিম উম্মাহর পুরো ইতিহাসটাই সমস্যাসংকুল। রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের সূচনাকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো শতাব্দী, শতাব্দীর কোনো অংশ বা কোনো দশকে এমন অতীত হয়নি। কিন্তু ঐসব সমস্যা-সঙ্কট আর আজকের সমস্যা-সঙ্কটের মধ্যে বড় ধরনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অতীতের যত সমস্যা ও বিপদাপদ ছিল তা সাধারণত জীবনের কোনো এক অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমানদের সাময়িকভাবে কোনো শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে, পরাজিত হতে হয়েছে, পিছনে ফিরে আসতে হয়েছে– এটা সামরিক পরাজয় বা সামরিক পশ্চাদপদতার বিষয় ছিল। অথবা মুসলমানদের কোনো শাসন ক্ষমতা দুর্বল হয়েছে, ভিনদেশী মজবুত হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে অধঃপতনের শিকার হয়েছে। এটা ছিল রাজনৈতিক ময়দানে দুর্বলতা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা সভ্যতাজনিত যে দুর্বলতা তা মোটামুটি সব যুগেই ছিল। কিন্তু তখনকার যুগে মুসলমানদের বংশধারা, তাদের শিক্ষা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ রীতিনীতি বাইরের আশঙ্কা ও হামলা থেকে নিরাপদ ছিল। বর্তমানে যে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা সামনে এসেছে, শুধু আজ নয় বিগত দেড়শত বছর ধরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা হচ্ছে আগত প্রতিটি দিন, প্রতিটি সূর্যোদয় সঙ্কট অথবা হতাশার এক নতুন দিগন্ত নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। আজকে ইসলামী জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা শঙ্কামুক্ত। সবকিছু বর্তমানে যথারীতি পশ্চিমা হামলার শিকার।

বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী মনোভাবের কারণ

পশ্চিমা বিশ্ব বলতে মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টান শাসিত দেশসমূহকেই বোঝানো হয়। আর এই পশ্চিমা জগতের মানুষরাই গণতন্ত্রের নাম আওড়িয়ে যতই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামকে সহ্য করতে পারে না। তারা ইসলামের প্রকৃত ও মূল আদর্শ ও নীতির কথা না বলে নিজেদের বানানো বানোয়াট বিকৃত ধারণা প্রচার করেই দিনের পর দিন মানুষের মধ্যে ইসলাম ভীতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমাদের ইসলাম বিরোধী মনোভাব হলো তারা মনে করে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। অতএব এরা সন্ত্রাসী না হয়ে আর কী হবে? বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম বিরোধী যে সকল মনোভাব প্রচলিত রয়েছে তা হলো :

১. ইসলামের ব্যাপক বিকাশ পশ্চিমা বিশ্বকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সেজন্য তারা ইসলাম ও কোরআন ভীতিতে সারাক্ষণ ভুগছে। কোরআন পোড়ানোর মতো বর্বরতার মাঝেই তাদের সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ফুটে উঠছে। এ উৎকণ্ঠা কমানোর জন্য তারা ইসলাম বিরোধী শক্তিকেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি ইসলামের দ্রুত প্রসারকে ঠেকানোর জন্য পশ্চিমারা একমাত্র পথ হিসেবে ইসলামের নীতিমালা ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচারণা চালাচ্ছে। যাতে কেউ এ ধর্মকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ না পায়। কারণ কেউ একবার ইসলামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তা থেকে সে কোনো দিনই বিচ্যুত হবে না এবং ক্রমান্বয়ে এর প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

২. পশ্চিমাদের ইসলাম বিরোধী মনোভাবের আরেকটি কারণ, তারা মনে করে ইসলাম জঙ্গীবাদী ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে হযরত (স)-এর তরবারির আঘাতে। প্রতিষ্ঠার ১৫শ বছর পরও ইসলাম জঙ্গীবাদ থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। এ ধর্মের নীতিমালা ও আদর্শ জঙ্গীবাদকে উৎসাহিত করে। যা সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

৩. পশ্চিমারা মনে করে ইসলাম নারীর ওপর জুলুমকারী ধর্ম। এ ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ব্যাপক আঘাত করা হয়েছে। নারীকে দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। ইসলামে নারীকে নিচুশ্রেণীর প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. পশ্চিমাদের কতিপয় গোষ্ঠী ও মহল মনে করে 'মুসলমানরাই হচ্ছে যত সমস্যার মূল'। তাদের ধারণা মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের এরূপ ইসলাম বিরোধী মনোভাবের কারণ পৃথিবীর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর পশ্চিমা গণমাধ্যম, গবেষক, চিন্তাবিদ ও নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলোর মুখে মুখে সর্বদা একই আলোচনা শুরু হয়, সমাজতন্ত্রের পতনের পর পশ্চিমাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক ইসলাম। হান্টিংটনের মন-মস্তিষ্কে এ কথা ছেয়ে গেছে, ইসলাম ও পশ্চিমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব সংঘাত অনিবার্য। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, বাহরাইন, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণ, ধ্বংসলীলা ও জবর দখলের ঘটনা একই প্রেক্ষাপটে চলছে। পশ্চিমাদের কাছে মুসলিম মানে দাড়িওয়ালা, অস্ত্রধারী, উন্মত্ত সন্ত্রাসী—তাদের এক নম্বর শত্রু আমেরিকাকে ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৫. পশ্চিমারা ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ জনমনে ইসলাম ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমারা মনে করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই কেবল মানুষ খুন করে, বোমা ফাটায়, সন্ত্রাসী হামলা চালায়। আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা সুশীল, সভ্য, বোমা ফাটায় না, সন্ত্রাস করতে জানে না। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ তেলের ওপর দখলদারিত্ব কায়েমের জন্য তৎপর। তাই তারা ইসলামকে দানবীয় ধর্ম এবং মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী বলে মুসলিম দেশগুলোর ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করছে।

৬. ইসলামের অবস্থান পশ্চিমাদের সবসময়ই খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে। খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাবের পর ইসলাম ধর্ম আবির্ভূত হয়। এ ধর্ম হলো পৃথিবীতে আবির্ভূত সর্বশেষ ধর্ম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলাম ধর্মের এ মর্যাদা খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মনে ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ জাগিয়েছে ইসলামের প্রতি।

৭. পশ্চিমারা মনে করে ইসলাম একটি মৌলবাদী ধর্মব্যবস্থা। এ ধর্মব্যবস্থায় বিশ্বাসীরা ইসলামী মৌলবাদী নামে পরিচিত। এ ইসলামী মৌলবাদীরা আজকের বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তাই ইসলামী মৌলবাদীদের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষায় পশ্চিমারা পুলিশি দায়িত্ব পালন করছে।

৮. পশ্চিমারা মনে করে ইসলামই পাশ্চাত্যের আধুনিকতাবাদের প্রতি একমাত্র হুমকি। আর এ ভাবনা থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর প্রতিরোধ ভেঙে দেয়ার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করছে। কেউ কেউ ইসলামের সাথে পশ্চিমাদের এ অবস্থানকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় ক্রুসেড বলে দাবি করছে।

৯. মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক, বাহরাইন প্রভৃতি দেশে যে পরিমাণ তেল সঞ্চিত আছে তা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জ্বালানি চাহিদার একমাত্র অবলম্বন। কেননা তেলের বিকল্প জ্বালানি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের তেলের ওপর নির্ভরশীল। তাই তেল সম্পদকে লুণ্ঠনের নামে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারণা চালিয়ে মুসলিম বিশ্বকে চাপে রেখে পশ্চিমা বিশ্ব তার অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করছে।

১০. মুসলিম বিশ্ব সামরিক ও বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। এ দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহ মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নানাবিধ সংঘর্ষ, কলহ, বিবাদ সৃষ্টি করে তাদের অস্ত্র ব্যবসাকে চাঙ্গা করে রেখেছে।

পশ্চিমাদের ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম

১. মার্চ ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত গেইনসভিল্লি গীর্জার পাদ্রী টেরি জোনস পবিত্র কোরআন অবমাননা করে এর এক কপি জনসম্মুখে পুড়িয়ে দেয়।

২. পাশ্চাত্যের আধুনিক বর্বরবাদী বিশেষ মহল মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী এবং মানবতার মুক্তিরদূত ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে অবমাননা করে ডেনমার্কের জিল্যান্ড পোস্টেন নামের একটি অখ্যাত পত্রিকায় বিশ্বনবী (স)-র অবমাননাকর ১২টি কার্টুন প্রকাশ করে। ডেনমার্কের পর সুইডেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, জার্মানি ও আরো কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের কিছু পত্রপত্রিকায় ঐ ১২টি কার্টুন ছাপানো হয়। ডেনমার্কের ঐ পত্রিকাটি মুসলমানের পবিত্র অনুভূতিতে আরো বেশি আঘাত দেয়ার লক্ষ্যে 'মুহাম্মদের কোন ছবি আপনাদের কাছে আছে? 'তাকে হত্যা করুন ও পুরস্কার নিন'–শীর্ষক একটি প্রতিযোগিতাও সম্পন্ন করে।

৩. ইসলাম বিরোধী প্রবন্ধ ও বই লেখায় পশ্চিমারা বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করে। তার প্রমাণ, ইসলাম বিরোধী বই লেখার কারণে সালমান রুশদিকে তারা পুরস্কৃত করেছে। ইসলাম বিরোধী লেখকদের তারা তাদের দেশে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়।

৪. ফ্রান্সের পুলিশ কর্তৃক হিজাব পরিহিতা মহিলাদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। এমনকি ফ্রান্সসহ কয়েকটি দেশ মুসলিম মহিলাদের হিজাব পরা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রবর্তন করে নিষিদ্ধ করেছে।

৫. পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো প্রতিনিয়ত কৌশলে মুসলমানদেরকে সহিংসতাকামী, পশ্চাৎপদ ও বখাটে হিসেবে তুলে ধরছে। এরা সত্যকে বিকৃত করছে। তারা ঘুরিয়ে-পেচিয়ে সব কিছুর জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের দায়ী হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। শুধু রেডিও টেলিভিশনই নয় পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রগুলোও এ কাজ করছে। ইসলাম আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য তারা বিভিন্ন রকম প্রবন্ধ ও কার্টুন প্রকাশ করছে।

৬. পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। তারা বিভিন্ন রকম চলচ্চিত্র তৈরি করে তাতে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্ততা। ইসলাম বিরোধী ধর্মীয় অবমাননাকর চলচ্চিত্রে দেখানো হচ্ছে মুসলমানরা জঙ্গী, সন্ত্রাসী, অসভ্য, বর্বর।

৭. এছাড়া ফেসবুকসহ বিভিন্ন ইসলামবিরোধী সংগঠন ইসলাম বিরোধী প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। বিভিন্ন রকম ইসলাম বিরোধী সভা, সেমিনার পরিচালনা করছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করছে ইসলাম ধর্মের মৌলিক চিন্তা চেতনাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালীন নাৎসি জার্মানির চিন্তাধারার সাথে তুলনা করে।

৮. পশ্চিমারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতের ভিত্তিতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করছে, গণহত্যা চালাচ্ছে, মুসলিম রচিত গ্রন্থাদি আগুনে পোড়াচ্ছে। তার প্রমাণ স্পেন বিপর্যয়ের পর এবং হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে আশি হাজার গ্রন্থ পোড়ানো। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে হামলা চালিয়ে ত্রিশ লাখ গ্রন্থ আগুনে ভস্মীভূত করা। ইরাক (২০০৩-২০১১) যুদ্ধের সময় জাতীয় গ্রন্থাগার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রাচীন পুস্তক নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে পশ্চিমারা সবসময়েই বই পোড়ানোর মতো ন্যক্কারজনক কাজ করে এসেছে। আর প্রচার করে বেড়ায় এ গ্রন্থগুলো ইসলামী জঙ্গিবাদে উৎসাহিত করার জন্য লিখিত।

৯. ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করছে ইসলাম হলো একমুখী ধর্ম, যা কিনা নিশ্চল, পরিবর্তনবিমুখ। এ ধর্ম অন্য ধর্মের মূল্যবোধের সাথে শরীক হতে চায় না। এটা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অন্যকেও প্রভাবিত করে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় ইসলাম অনেক নিচু স্তরের। এ ধর্মাবলম্বীরা বর্বর, যুক্তিহীন, আদিম ও যৌনতাড়িত। ইসলাম প্রকৃতিগতভাবে উত্তেজিত, মারমুখী, হুমকিস্বরূপ, সন্ত্রাসের সমর্থক। সভ্যতার সংঘাতের জন্য দায়ী, এটি কোনো ধর্ম নয়। বরং একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ, যা কিনা রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

১০. ইসলাম ভীতির কারণে সামাজিকভাবে পাশ্চাত্যে মুসলমানদের আজ নানাভাবে নিগ্রহ ও বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে পুরো পশ্চিমা জগতে। মুসলিমদের উপর আক্রমণ ও ভয়-ভীতির মতো ঘটনা এখন অহরহ ঘটছে এবং তাদের সংস্কৃতিকে অনবরত কটুক্তি করা হচ্ছে। যেমন– পশ্চিমা দেশগুলোতে পর্দানশিন মেয়েদের অনেক সময় হিজাব টেনে খুলে ফেলা হয়। মুসলমানদের লাদেন হিসেবে ডাকা হয়। এমনকি তাদের দিকে থু থু নিক্ষেপ করা হয়। সুইজারল্যান্ডে গণভোট দিয়ে মসজিদের মিনার নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞারোপ করা হয়েছে। নামের শুরুতে 'মুহাম্মদ' এবং নামের শেষে 'ইসলাম' শুনলে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় এবং মনে করে জঙ্গি, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী প্রভৃতি।

আল-কায়েদা ও পশ্চিমা বিশ্ব : বর্তমানে ইসলামী জঙ্গিবাদ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ব্যথা যার, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একসময়ে ছিল আধুনিক জঙ্গিবাদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সবচেয়ে ট্রাজেডি হলো, আজ এটি তারই গলার ফাঁস হিসেবে দেখা দিয়েছে। আর এক্ষেত্রে আমেরিকাই সবচেয়ে বেশি হুমকিগ্রস্ত। এটা প্রমাণিত যে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষ প্রান্তে যখন আমেরিকা-সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তি পরস্পর শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল, তখন হঠাৎ সুযোগ এসে যায় আমেরিকার হাতে। একটি ভুল চিন্তার ফসল হিসেবে সোভিয়েত সরকার আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। আর এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আফগানরা চিরকালই লড়াকু ও স্বাধীনতা প্রিয় জাতি। যেহেতু আফগানিস্তান মুসলিম প্রধান এবং ধর্মভীরু, এই সুযোগটা কাজে লাগায় আমেরিকা। তারা তালেবানদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় এবং আল-কায়েদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নানাভাবে। এভাবে নব্য মুসলিম জঙ্গিবাদ অনেকটা আমেরিকার স্বার্থে, আমেরিকার জন্য গড়ে ওঠে। একে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগায় পশ্চিমারা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভয়ংকরভাবে মার খায়, আমেরিকা কৌশলগতভাবে জয়লাভ করে। এর মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। কিন্তু আমেরিকা এমন এক মুনাফাবাদী রাষ্ট্র, শত্রু ছাড়া যার এক মুহূর্তও চলে না। কারণ তার অর্থের বড় যোগান আসে অস্ত্র উৎপাদন থেকে, যার সঙ্গে আবার রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরাই জড়িত। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আপন মুদ্রাদোষেই বিলুপ্ত হলো, তখন আমেরিকার নতুন শত্রুর দরকার হলো। এর মধ্যেই আবার ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল হান্টিংটন কর্তৃক সভ্যতার দ্বন্দ্ব তত্ত্ব প্রদান। এ তত্ত্বের সার কথা হলো এই যে, এতকাল সমাজতন্ত্র ছিল আমেরিকা তথা মার্কিন পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড়

শত্রু। সেই শত্রুর বিনাশ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তারা নিরাপদ নয়, বরং এখন তাকে আরেক শত্রুর মুখোমুখি ও মোকাবেলা করতে হবে। সেই শত্রু হলো মুসলিম বিশ্ব। এবার আর তত্ত্ব বা মতবাদের সংঘাত নয়– এই সংঘাত দুই সভ্যতার। মোটকথা, মুসলিম সভ্যতার সাথে খ্রিষ্টীয় সভ্যতার। পশ্চিমারা খুব দ্রুত এ তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে। কারণ দুর্বল, ভঙ্গুর, পশ্চাৎপদ মুসলমানদের ওপর অতীত ক্রুসেডীয় প্রতিশোধ গ্রহণ এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদ লুণ্ঠন করা যাবে। এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে আফগানিস্তান থেকে তালেবান হঠানোর নামে আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করে। সাদ্দাম হোসেনকে কুয়েত দখলে উস্কানি দিয়ে ইরাক দখল করে। এভাবে প্রায় রাতারাতি মুসলিম বিশ্বকে জোরপূর্বক প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে তার মুনাফার পথ আরো প্রশস্ত করে তোলে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আমেরিকা সত্যিই ভীত ছিল, কেননা সে ছিল শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সে অর্থে মুসলিমরা খুবই দুর্বল। কিন্তু এত দুর্বলের ক্ষেত্রে তার সুনামহানি ঘটাতে পারে বলে এক নতুন কৌশল হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় মুসলমানরা খুব ভয়ংকর এক জাতি, তারা অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক, তাদের কাছে এমন সব অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে যে, বিশ্ব খুবই হুমকিগ্রস্ত। আফগানিস্তানে মহিলাদের প্রতি ব্যাপক অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার ও বর্বর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আল-কায়েদা পরিচালিত তালেবান সরকার দিয়ে, যা মানবতাবিরোধী। কাজেই তালেবান হঠিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে মার্কিন মদদে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠিত সে মার্কিন স্বার্থেই তার সৃষ্টিকে আক্রমণ করা হয়। এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে মার্কিনীরা একেক মুসলিম রাষ্ট্রে একেক ধরনের নীতি গ্রহণ করে জাল বিস্তার করেছে এবং আবেগ প্রবণ মুসলিমরা সহজেই এ ফাঁদে পা দিয়েছে।

হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যার ন্যায় ১/১১ সাজিয়েছে। আল-কায়েদা নামে ভৌতিক সংগঠন বানিয়ে এর প্রধান লাদেনকে ধরার নামে মুসলিম দেশে দেশে নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে চলেছে। অবশেষে ২ মে ২০১১ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদের একটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে নিরস্ত্র ওসামা বিন লাদেনকে এবং উত্তর আরব সাগরে নাকি তার লাশ সমাহিত করা হয়। কিন্তু সন্দেহজনক মনে হলেও বাস্তব সত্য, আজ দিকে দিকে প্রশ্ন উঠেছে লাদেন নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল কি আদৌ? নাকি পশ্চিমা স্বার্থ বা উদ্দেশ্য হাসিলে এমন কাল্পনিক সংগঠন ও ব্যক্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল।

সারা বিশ্বে ঘরে-বাইরে ইসলাম আজ নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইসলামের ভেতরকার নানারকম টানাপোড়ন এবং বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের ও অবিশ্বাসীদের সমালোচনার মূল কারণ মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ লুটে নেয়া, স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করা, অস্ত্র ব্যবসার বাজার চাঙ্গা করা। আর এ অসৎ উদ্দেশ্য অর্জনে পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বকে নিয়ে খেলছে। এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি খ্রিষ্টান মিশনারি ও বিদেশী এনজিওগুলো। যাই হোক ইসলাম ও পশ্চিমা কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এরা পরস্পরকে অনেক কিছু দিতে পারে। যদি একজন আরেকজনের উপর প্রভাব বিস্তার না করে বরং জ্ঞানের সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রবাহ দ্বারা আধুনিক বিশ্ব গড়তে মনোনিবেশ করে। এক্ষেত্রে পশ্চিমাদের অবশ্যই আগ্রাসী মনোভাব প্রত্যাহার করতে হবে। করতে হবে মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাদের মনোভাবের পুনর্মূল্যায়ন। মুসলিম বিশ্বের উচিত হবে নিজেদের মধ্যে বিরাজমান আদর্শগত বিভেদ হ্রাস করা, সকল সমস্যাতে পশ্চিমাদের বিষদোগার না করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সৃষ্টি করা, সকল ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। তবেই বিশ্বে শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

০২। ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক গঠনে কিভাবে প্রভাবিত করছে—আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : ভূ-রাজনীতি (Geo-politics) এবং ভূ-অর্থনীতি (Geo-economics) বর্তমান বিশ্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিভাষা। আধুনিক 'ভূ-রাজনীতি'র ধারণা বিশ শতকের প্রথমভাগে জন্ম হলেও 'ভূ-অর্থনীতি'র ধারণা সম্পূর্ণ নতুন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় এই 'ভূ-অর্থনীতি' ধারণার জন্ম। সাধারণভাবে রাজনৈতিক উপাদান ও প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত প্রয়োগই হলো ভূ-রাজনীতি; অন্যদিকে ভূ-অর্থনীতিও অর্থনৈতিক উপাদান ও প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত প্রয়োগ। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক গঠনে ভূ-রাজনীতি ও ভূ অর্থনীতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ভূ-রাজনীতির ধারণা

ভূ-রাজনীতি হলো একটি পররাষ্ট্রনীতি পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি তত্ত্ব। এটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার পারস্পরিক অবস্থানের সাবধানতার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে এবং বৈদেশিক কর্মকাণ্ড ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে কৌশল হিসেবে কাজ করে থাকে। সর্বোপরি ভূ-রাজনীতি হলো কূটনীতির একটি বাস্তব নির্দেশিকা। যে কোনো দেশের আন্তর্জাতিক কৌশল নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্ক এবং প্রতিরক্ষা কৌশলসমূহের ওপর জাতীয় অবস্থান, সম্পদের লোকেশন এবং অন্যান্য ভৌগোলিক উপাদানসমূহের প্রভাবও ভূ-রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

'Buffer State'-এর ধারণা হলো ভূ-রাজনৈতিক। কোনো একটি ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রের অবস্থান যদি দুটি বড় ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে হয়, তাহলে তাকে 'Buffer State' বলে। উদাহরণস্বরূপ— প্যারাগুয়ের কথা বলা যায়। এটি একটি ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্র, যা দুটি শক্তিশালী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মধ্যে অবস্থিত। 'Buffer State' সর্বদাই ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। কখনও কখনও 'Buffer State' অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী নিরাপত্তা লাভের জন্য প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি রাষ্ট্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে পারে। তাছাড়া 'Checkerboard Phenomena' এবং Hertland Thesis'ও ভূ-রাজনৈতিক ধারণা। 'Checkerboard Phenomena' হলো আমার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীরা আমার শত্রু, আর তাদের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীরা আমার বন্ধু। আর 'Hertland Thesis'-এ গুরুত্ব দেয়া হয় মহাদেশীয় Core Country কে, যে দেশটি অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি সুবিধা লাভ করতে পারে।

ভূ-অর্থনীতির ধারণা

ভূ-অর্থনীতির বর্তমান ধারণার ব্যবহার শুরু হয় Edward Luttwak থেকে। তিনি ১৯৯০ এর দশকে তার প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও বইয়ের মাধ্যমে ভূ-কৌশলের নতুন বাস্তবতাকে বিভিন্ন নামে ব্যাখ্যা করেন যা পরবর্তীতে পাবলিক এজেন্ডায় পরিণত হয়। Luttwak তার ভূ-অর্থনীতির ধারণা বলতে বুঝিয়েছেন 'The contenution of the ancient rivalry of the nations by new industrial means.'

'যুদ্ধ' আজকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে বাণিজ্য দখলে। তাই ভূ-অর্থনীতি বলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক কত দূর এগিয়েছে সেটা লক্ষ্য নয়, বরং দেশের পণ্যের জন্য বিশ্ব বাজার কতটুকু দখল হয়েছে সেটাই বড় লক্ষ্য। এ প্রেক্ষাপট ভূ-অর্থনীতির দুটি মৌলিক দিক ব্যাখ্যা করে :

ক. পরিভাষাটি হলো একটি নতুন ও ঐতিহাসিক ভূ-কৌশল এবং ঐতিহাসিক ভূ-কৌশল প্রপঞ্চ এবং

খ. নতুন অবস্থা থেকে সৃষ্ট একটি কৌশলগত আচরণ।

এভাবে পরিভাষাটির একটি কৌশলগত মাত্রা (dimension) রয়েছে— এটি একটি নীতি নির্ধারণী ধারণাও বটে। উপরোল্লিখিত দুটি ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ভূ-অর্থনীতি সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি।

প্রথমটি হলো ঐতিহাসিক বিশেষত্ব। এ বিষয়টি Luttwak যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো বিশ শতকের শেষ দিকেও ভূ-অর্থনীতির কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত (Precedent) ছিল না। মধ্যপ্রাচ্য, বলকান এবং পৃথিবীর অন্যান্য হতাশাজনক স্থানেও ঐতিহাসিকভাবে পুরাতন পদ্ধতিতেই ভৌগোলিক সংঘাত বিদ্যমান ছিল। সংঘাতময় এসব অনুন্নত এলাকায় এখনও সামরিক শক্তিই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে রয়ে গেছে। এসব এলাকার কূটনীতিও ক্লাসিক্যাল, যা শুধু দুর্বল বন্ধুকে নিশ্চয়তা দিতে এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাতে সামরিক শক্তিকে ক্ষমতা ও প্রভাবের মূল উৎস হিসেবে ব্যবহার করতেই ব্যস্ত। অন্যদিকে বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় স্থানগুলো যেমন আমেরিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য। দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ এখন কল্পনাতীত এবং রাশিয়া ও অন্যান্য ছোট ছোট রাষ্ট্রসমূহ যথা— কিউবা, ভিয়েতনাম ও সিরিয়ার পক্ষেও এসব উন্নত দেশের নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সামরিক শক্তি এবং ক্লাসিক্যাল কূটনীতি বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় এলাকায় তাদের সনাতনী গুরুত্ব হারিয়েছে।

অন্যদিকে রাষ্ট্র এখনও 'Common National Identity'-এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা অন্যান্য ভৌগোলিক অঞ্চলকে নিজের থেকে পৃথক করে দেখে। দেশগুলো হলো ভৌগোলিক সত্তা এবং যেগুলো বিশেষভাবে 'আমরা' অনুভূতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং 'তারা' অনুভূতি থেকে পৃথক। প্রত্যেকটি দেশের সীমান্তই ঐ সমস্ত দেশকে চিহ্নিত করে। এমনকি যখন দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতের চিন্তাই করা যায় না এবং যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক সংগঠনে প্রত্যেকে পরস্পরকে সাহায্য করে তখনও তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি হয় বিপরীতমুখী। বিশ্ব রাজনীতিতে সনাতনী পদ্ধতিতে নিজেকে প্রকাশ করতে এসব কাঠামোগত প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক সংঘাত বজায় রয়েছে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ভীতি এখনও ব্যবসায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাশাপাশি 'পরিবর্তনের' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও রয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রে আমেরিকান, ইউরোপিয়ান এবং জাপানিদের সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে প্রধানত অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রসমূহের প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ নতুন মাত্রাকেই Luttwak ভূ-অর্থনীতি বলেছেন। সুতরাং ভূ-অর্থনীতি হলো, 'The product of the progress of civilization, a characteristic of the most advanced stages of its evolution.'। এটি একটি কেন্দ্রীয় প্রপঞ্চ (centre phenomenon) এবং এর সীমানা স্পেস দ্বারা নির্ধারিত, যেখানে উন্নত রাষ্ট্রসমূহ মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত।

Luttwak তার ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে সমর্থন করতে ভূ-অর্থনীতিকে ক্লাসিক্যাল মার্কেন্টালিজম থেকে পৃথক রেখেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, ভূ-অর্থনীতি ক্লাসিক্যাল মার্কেন্টালিজম থেকে বেশি কিছু, যা শুধু প্রাচীন অনুশীলনকে নতুনভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রকাশিত নয়। এখানে অন্তত একটি সাদৃশ্য বিদ্যমান; উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র জনগণকে ছাড়িয়ে যায়। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য গুরুত্বহীন নয়।

প্রথমত, মার্কেন্টালিজম এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক। অন্যদিকে, ভূ-অর্থনীতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক অর্থাৎ শিল্পসমূহে নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং উন্নত সেবা প্রদান করা।

দ্বিতীয়ত, মার্কেন্টালিজম সর্বদাই যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা মার্কেন্টালিজম ছিল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের অধস্তন রূপ। মার্কেন্টালিজম এমন অর্থনৈতিক নিয়মনীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে শাসন করত যে মার্কেন্টালিস্ট সংঘাতে কেউ হেরে গেলে পুনরায় যুদ্ধের ভিন্ন নিয়মে সে হারানো বিষয় ফিরে পেতে পারত। অন্যদিকে ভূ-অর্থনীতি হলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় রাষ্ট্রের একটি কৌশল, যে রাষ্ট্রগুলো ইতিমধ্যে যুদ্ধকে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে পরিহার করেছে। ভূ-অর্থনীতির এ সময়ে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণগুলোই শুধু অর্থনৈতিক নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাদানগুলোও অর্থনৈতিক। যদি বাণিজ্যিক বাকবিতণ্ডা রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ নেয়, তবে সে রাজনৈতিক সংঘাত সংঘটিত হয় বাণিজ্যিক অস্ত্রের মাধ্যমেই। যেমন—

- আমদানি নিয়ন্ত্রণ;
- রপ্তানি বাণিজ্যে সাবসিডি প্রদান;
- প্রতিযোগিতামূলক প্রযুক্তিগত প্রকল্পে অর্থায়ন;
- নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় সমর্থন এবং
- প্রতিযোগিতামূলক অবকাঠামোর সংস্থান করা ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক বিশেষত্ব ছাড়া ভূ-অর্থনীতির দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদেরকে নেতৃত্ব দেয় তা হলো কৌশলগত মাত্রা (Stratagic Dimension)। ভূ-অর্থনীতির ধারণা গড়ে ওঠে কৌশল বা সামরিক কৌশলগত মডেলের ওপর ভিত্তি করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিনিয়োগ, গবেষণা এবং শিল্পোন্নয়ন করে, কিন্তু যখন রাষ্ট্র এসব কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে, সাহায্য করে অথবা পরিচালনা করে তখনই এগুলো ভূ-অর্থনৈতিক। ভূ-অর্থনীতির শব্দকোষে আদর্শ ব্যবসায় এবং অর্থনৈতিক নীতি বা পদক্ষেপ অবশ্যই কৌশলগত প্রক্রিয়ায় হবে। এ কৌশলগত যুদ্ধে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বিনিয়োগের পুঁজি হবে 'firepower', উন্নত পণ্য তৈরির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সাবসিডি প্রদান করা হবে 'Weapon Innovation', রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত 'Market Penetration' হলো সামরিক ভিত্তি, অভ্যন্তরীণ শিল্পকে রক্ষার জন্য প্রদত্ত ট্যারিফ হলো 'Defended frontier' এবং ভূ-অর্থনীতিতে অপ্রকাশ্য বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ হলো 'Ambush'-এর মতো।

এভাবে যখন ভূ-অর্থনীতির বিভিন্ন দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত এর প্রধান তিনটি মাত্রা লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো ভূ-অর্থনীতির একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করে :

১. ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থানের একটি নির্দিষ্ট অবস্থা;
২. একটি কৌশলগত ব্যবহার বা ভূ-অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত একটি কৌশল এবং
৩. একটি সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ।

সুতরাং জাতীয় অর্থনীতির লক্ষ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক কৌশলকে বিশ্লেষণ করে ভূ-অর্থনীতি। এ কৌশল প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব অর্জন বা বিশ্ব বাজারে দেশীয় কোনো পণ্যের বাজার দখল করার জন্য জাতীয় কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করতে গৃহীত হয়।

ভূ-রাজনীতির প্রভাব

ভূ-রাজনীতির সংজ্ঞা, ধারণা ও তত্ত্বসমূহ আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক গঠনে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ভূ-রাজনৈতিক উপাদানগুলোই একটি

রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রভাবক। এক্ষেত্রে 'Checkerboard Phenomenon'-তে যেসব ধারণা ও তত্ত্ব গুচ্ছভাবে প্রকাশিত সেগুলোকে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

- জাতিসমূহ তাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশগুলোকে ভয় করে এবং তাদের দূরবর্তী প্রতিবেশী দেশগুলোকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ— প্যারাগুয়ে একটি দুর্বল, ছোট এবং নিঃসঙ্গ দেশ হিসেবে একটি Checkerboard Actor এবং দক্ষিণ আমেরিকার এ Checkerboard Phenomenon-তে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ভারসাম্যের মাধ্যমে অথবা তার শক্তিশালী প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করে তার সীমান্ত নিরাপত্তা দাবি করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে 'Chaco War'-এর সময় প্যারাগুয়ে তার সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েছিল। তাছাড়া প্যারাগুয়ে Chaco War-এ বিরোধিতাকারী বলিভিয়ার যে কোনো ধরনের আক্রমণ থেকেও নিরাপত্তা চেয়েছিল।
- বিভিন্ন দেশের সীমান্ত সংঘাতেও এ ভূ-রাজনীতির প্রভাব বিদ্যমান। যেমন— The Triple Alliance War এবং Chaco War উভয়টিই ছিল সীমান্ত সংঘাত।
- ভূ-রাজনীতির কারণে Buffer State গুলো তাদের ভূখণ্ড হারায়। উদাহরণস্বরূপ— দক্ষিণ আমেরিকার 'Buffer State'গুলো যেমন— প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, ইকুয়েডর এবং উরুগুয়ে স্বেচ্ছায়, বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা শান্তির নামে নিজেদের ভূমি হারিয়েছে।

পৃথিবীর সকল মহাদেশেই ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব বিদ্যমান। এ ভূ-রাজনীতির কারণেই প্রত্যেকটি দেশ তার ভূ-কৌশলগত উপাদানসমূহকে ব্যবহার করে তার পররাষ্ট্রনীতিকে বেশি লাভবান করার জন্য। এ খেলায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর নিকট দুর্বল রাষ্ট্রগুলো হেরে যায়। আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর সবই ভূ-রাজনীতির বলি। ভূ-রাজনীতির কারণেই কাশ্মীর সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় কাশ্মীরকে নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের ভূ-রাজনীতি এ অঞ্চলের আঞ্চলিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করেছে।

ভূ-অর্থনীতির প্রভাব

পূর্বেই বলা হয়েছে ভূ-অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক উপাদানের কৌশলগত ব্যবহার। এটি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের সম্পর্ক গঠনে প্রভাব বিস্তার করছে। ভূ-অর্থনীতির কারণেই কানকুন সম্মেলন বিপর্যস্ত হয়েছে। ডব্লিউটিও-এর এ সম্মেলনে ভূ-অর্থনীতিই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে আমেরিকা ও ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ভূ-অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর জন্যই ১৯৭৩ সালে আরবরা তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। বাংলাদেশের প্রাচ্যমুখী পররাষ্ট্রনীতিও ভূ-অর্থনীতির প্রভাব।

বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান; যথা— ডব্লিউটিও, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রভুত্ব করছে এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছোট ছোট দেশগুলোর বাজার দখল করে অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভবান হচ্ছে। ট্যারিফ, সাবসিডি ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বলা হচ্ছে বাজারকে উন্মুক্ত করতে এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সকল হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে। অর্থনৈতিক সাহায্য এবং ঋণও এ ভূ-অর্থনৈতিক কৌশলে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থনৈতিক অবরোধ, বাজার দখলের প্রতিযোগিতা এসবই ভূ-অর্থনৈতিক।

আসিয়ান, আফটা, নাফটা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উপাদান ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আরও কার্যকর ব্যবহারের জন্য। অর্থনীতি এসব আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটগুলোর মধ্যে একদিকে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও জটিল করছে অন্যদিকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাতকেও প্রসারিত করেছে।

ভূ-অর্থনীতি 'Buffer State'গুলোকে অর্থনৈতিক জায়ান্টদের শোষণের শিকার বানিয়েছে। বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড সম্পর্ক, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে অস্থিরতা এবং বাংলাদেশের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের গভীর সম্পর্ক এ ভূ-অর্থনীতির প্রভাব। অর্থনৈতিক কৌশলের কারণেই হিন্দুত্ববাদী ভারত ইরানের মতো একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অগণতান্ত্রিক সৌদি আরবের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলছে।

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় পুঁজি তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুশীলনের কৌশলে পরিবর্তন এনেছে। পুঁজি এখন আর সমরাস্ত্রের মাধ্যমে বাজার দখল করতে উৎসাহিত হয় না, বরং সে অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাদান ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকেই তার আধিপত্য বিস্তার করার জন্য ব্যবহার করতে চায়। আন্তর্জাতিক কাঠামোতে ভূ-রাজনীতি ভূ-অর্থনীতিতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং ভূ-অর্থনীতি ঐ কাঠামোর মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থনৈতিক উপাদান ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার যে দেশ যত উন্নত কৌশলে করতে পারবে সে দেশ একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে তত শক্তিশালী ক্ষমতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এ প্রসঙ্গে Luttwak লিখেছেন, 'Geo-economics offers the only possible substitute for the melitary and diplomatic roles.'

০৩। শক্তির ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা কি একটা অনিবার্য বাস্তবতা? *[২৭তম বিসিএস]*

অথবা, **শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি পর্যালোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি এর পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে?** *[২৩তম বিসিএস]*

অথবা, **'সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে'—এ উক্তির যথার্থতা তুলে ধরুন।**

অথবা, **আপনি কি মনে করেন সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে?– আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।**

উত্তর : শক্তির ভারসাম্যের নীতি মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি রাষ্ট্র বা কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্র যদি একত্র হয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে সেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমষ্টি অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। অতএব, কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটকে অন্যান্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেয়া উচিত নয়। একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট যদি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, অন্য কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট তার আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম নয়, তখন তার মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাব সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে সম ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট যদি বর্তমান থাকে, তবে কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটই অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটকে সহজে আক্রমণ করতে সাহসী হয় না। এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অধিকতর নিরাপদ হয়ে ওঠে এবং শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে।

শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power)

শক্তির ভারসাম্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Prof. Sydney B Fay তার 'Encyclopaedia of the Social Scienes'-এ বলেছেন, 'It means such a just equilibrium in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong to enforce its will upon the others.' অর্থাৎ শক্তিসাম্য হলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে এমন একটি ভারসাম্যের অবস্থা, যার ফলে তাদের মধ্যে কোনো একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের ইচ্ছা আরোপ করতে পারে না।

Prof. Georg Schwarzenberger তার Power politics গ্রন্থে বলেন, 'Balance of power is a certain amount of stability in international relations'.

Quincy Wright বলেন, 'It is a system designed to maintain a continuous conviction in any state that if it attempts aggression, it would encounter an invincible combination of other.' অর্থাৎ, শক্তির ভারসাম্য হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে, কোনো রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠলে তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপরাজেয় জোটের সম্মুখীন হতে হবে।

Prof. Morgenthau বলেন, 'The balance of power and politics aiming at its presentation are not only envitable but one an essential stablishing factor in a society of sovereign state.'

Prof. Frankle-এর মতে, 'শক্তিসাম্য বলতে ভারসাম্যমুখী একটি প্রবণতাকে বোঝায়। শক্তিসাম্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজনীতি একটা ভারসাম্যের পক্ষে অগ্রসর হয়।'

মোটকথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের সমক্ষমতাসম্পন্ন যদি অন্য কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট থাকে তবেই শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে।

শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতি

শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মোটামুটিভাবে যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **জোট ও প্রতিদ্বন্দ্বী জোট (Alliances and Counter Alliances) :** অন্য দেশের সাথে জোট ও প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠন করে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতি অতীতকাল থেকেই প্রচলিত। ইউরোপে যখনই কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অধিকতর শক্তিশালী হয়ে অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের ওপর আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করে ভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তখনই অন্যান্য রাষ্ট্র ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে।

২. **ক্ষতিপূরণ নীতি (Compensations) :** ক্ষতিপূরণ নীতি দ্বারা শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। যদি কোনো কারণে একটি রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি পায় তবে অপর রাষ্ট্রেরও সমপরিমাণ শক্তি বৃদ্ধির অধিকার আছে। অন্যথায় শক্তিসাম্য ব্যাহত হবে। এটাই হলো ক্ষতিপূরণ নীতির মূল কথা। Prof. Morgenthau বলেন, ক্ষতিপূরণ নীতি শক্তিসাম্যের একটি প্রধান অবলম্বন। রাজনৈতিক আপোষ রক্ষার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনায় দর কষাকষি অতি সাধারণ ধরনের ক্ষতিপূরণ নীতি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেহেতু এটা অঙ্গাঙ্গিভাবে শক্তিসাম্যের সাথে জড়িত।'

৩. **বিভাজন ও শাসন (Divide and Rule) :** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই নীতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতিপক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে না দিয়ে তাকে দুর্বল রেখে শক্তিসাম্য বজায় রাখাই এই নীতির উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন সরকার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজের অনুকূলে শক্তিসাম্য স্থাপন করার চেষ্টা করে।

৪. **অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ (Armament and Disarmament) :** সামরিক প্রস্তুতি ও অস্ত্রসজ্জা দ্বারা সাধারণত শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বৃহৎ রাষ্ট্রই অস্ত্রসজ্জায় তার প্রতিপক্ষের সমান এবং সম্ভব হলে অধিকতর শক্তিশালী হতে চায়। সমস্ত শক্তিমান রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করার ফলে কোনো স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই যদি যুদ্ধপ্রস্তুতি ক্রমশ বাড়িয়ে যায় তা পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম দেবে, যা যুদ্ধের অনুকূল আবহাওয়াই সৃষ্টি করবে। তাই এ কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন, শান্তির জন্য প্রয়োজন নিরস্ত্রীকরণ। প্রত্যেক রাষ্ট্রই যদি সমান হারে নিরস্ত্রীকরণে রাজি হয় তবে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং যুদ্ধের আবহাওয়া দূর করা দুইই সম্ভব হবে।

৫. **বাফার স্টেট (Buffer State) :** দুটি শক্তিশালী দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে অনেক সময় বিশেষভাবে সাহায্য করে। দুটি বৃহৎ ও পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে যদি একটি ছোট রাষ্ট্র বর্তমান থাকে তবে বৃহৎ দুটি রাষ্ট্রের বৈরীভাব সহজে যুদ্ধের রূপ ধারণ করতে পারে না। ফলে শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে।

৬. **অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ (Internal Interfere) :** কোনো কোনো সময় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে বৃহৎ শক্তিগুলো শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের শক্তিকে সংহত রাখার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপ করেছিল।

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশেষত স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্বব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো পরিবর্তন এসেছে যার ফলে শক্তির ভারসাম্য নীতির কার্যকারিতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ায় শক্তিসাম্যের কার্যকারিতা এখন আর আগের মতো প্রাসঙ্গিক নয়। যেমন—

১. **জাতীয়তাবাদী ধারণার অবসান :** জাতীয়তাবাদী ধারণার সাথে শক্তিসাম্যের ধারণা জড়িত। কিন্তু বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বায়নের যুগ। ফলে জাতীয়তাবাদী ধারণার হ্রাসের সাথে শক্তিসাম্যের ধারণাও অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

২. **আদর্শের গুরুত্ব বৃদ্ধি :** বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আদর্শগত উপাদান এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, আদর্শ আজ জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করেছে। অর্থনৈতিকভাবে সমমনা আদর্শগত জাতিগুলোই আজ সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কাজেই শক্তিসাম্যের তাৎপর্য অনেক হ্রাস পেয়েছে।

৩. **বিশ্ব জনমত :** আধুনিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করতে পারে না। বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত। এমতাবস্থায় কোনো রাষ্ট্র যদি আগ্রাসী হতে চায় তাহলে তাকে বিশ্বের প্রতিকূল জনমতের চাপের সম্মুখীন হতে হয়।

৪. **অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব :** বর্তমানে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের প্রতিযোগিতা সেই স্থান দখল করেছে। অর্থনৈতিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্যকে গুরুত্ব দেয়া হয় না।

৫. **শক্তি পরিমাপের অসুবিধা :** রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিমাণ অনুমান করা যায় না। সে কারণে কোনো রাষ্ট্র শক্তিসাম্য অর্জন করেছে কিনা তা-ও পরিমাপ করা যায় না। এমতাবস্থায় শক্তিসাম্য তত্ত্ব গুরুত্বহীন।

৬. **দ্বন্দ্ব ও সংঘাত :** শক্তিসাম্য তখনই কার্যকরী হয় যখন পরস্পর বিভিন্ন সমশক্তিশালী রাষ্ট্র বা জোটের অবস্থান থাকে এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বর্তমান এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপনে সকল রাষ্ট্রই বিশ্বাসী। সে কারণে শক্তিসাম্য বর্তমানে অনেকটা অগ্রহণীয়।

৭. **জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন :** জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শক্তিসাম্য নীতির বিরোধী। এ আন্দোলনের সদস্যভুক্ত কোনো রাষ্ট্র কোনো শক্তিসাম্যের জোটে অংশ নিতে চায় না। এ কারণে এই তত্ত্ব বর্তমানে পুরোপুরি প্রয়োগ করা যায় না।

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি তার পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিশেষত, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির জোরে যা খুশি তা করার পদক্ষেপ গ্রহণ, শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তাকে অর্থবহ করে তুলছে। যদি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে জাতিসংঘ সর্বজনীন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারতো তাহলে শক্তিসাম্য তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যেতো। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের (নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন) বিশেষত, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। এই পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যেও আবার গোষ্ঠীগত ও স্বার্থগত অনৈক্য বিদ্যমান। সে কারণে তারা বিশ্ববাসীর চাহিদা অনুযায়ী অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। তাছাড়া তাদের মধ্যেও শক্তি অর্জনের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়, বিশ্ব নেতৃত্ব নিয়ে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে বিশ্ব নেতৃত্বের সে একক শক্তিশালী দেশ। কিন্তু তার এই ধারণার প্রতি মাঝে মধ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় তারই এক সময়ের মিত্র নিরাপত্তা পরিষদের অন্য স্থায়ী সদস্য। ফ্রান্স ইতোমধ্যে বলেছে যে, বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র ক্ষমতাশালী এ কথা ভাবলে সে ভুল করবে। অর্থাৎ সামনের দিনগুলোতে বিশ্ব ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবে সেটা সুস্পষ্ট। তাছাড়া এখন পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও বৃহৎ যুদ্ধ নিরসনের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শক্তিসাম্যের জন্যই (সমহারে অস্ত্র প্রতিযোগিতা) এখন পর্যন্ত কোনো বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এমতাবস্থায় সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে এমন বলা যাবে না।

০৪ ॥ নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য কি? নিরস্ত্রীকরণ কি বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত– আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ, অশান্তি ও মানবতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা। বিংশ শতাব্দীতে অস্ত্র প্রতিযোগিতার খেলা হিসেবে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে, ইতিহাসকে করেছে কলঙ্কিত। তাই শান্তিকামী মানুষ পৃথিবীকে সংঘাতময় থেকে শান্তিময় করতে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পথে পা বাড়ায়। এক্ষেত্রে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে জার সম্রাট নিকোলাস অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। যার পথ ধরে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে হেলসিংকি সম্মেলন, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের

চুক্তি, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে SALT-১ চুক্তি, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে SALT-২ চুক্তি, ১৯৯৬ সালে সিটিবিটি চুক্তি, ২০১৩ সালে অস্ত্র বাণিজ্য রোধে জাতিসংঘ চুক্তিসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধ কাম্য নয়। কারণ যুদ্ধের বিভীষিকা বহুবার মানবজাতির ইতিহাসকে বিপর্যস্ত করেছে। মানুষ এক সময় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে অস্ত্র নির্মাণ করেছে এখন সে অস্ত্রই মানুষের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে, অস্ত্রের ভীতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে মানুষ এগিয়ে এসেছে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা হ্রাসে অথবা অস্ত্র উৎপাদন বন্ধে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ এ অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)

আভিধানিক অর্থে নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায়, শক্তি প্রয়োগ অথবা সশস্ত্র সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে যেসব যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে হ্রাস করা বা বর্জন করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরস্ত্রীকরণ হলো কোনো রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা, অথবা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা। নিরস্ত্রীকরণ বস্তুত অস্ত্রের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ নয়, বরং অস্ত্র হ্রাসকরণ। মর্গেনথাউ-এর মতে, অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সব ধরনের অস্ত্র হ্রাস করা অথবা বর্জন করাকে নিরস্ত্রীকরণ বলে।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ (Arms control)

নিরস্ত্রীকরণের আধুনিক সংস্করণ হলো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায়, অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসবে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট মস্কোতে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তিতে (Nuclear Test Ban Treaty) স্বাক্ষরই প্রথম আশাব্যঞ্জক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি। কিন্তু এত ডামাডোল পেটানো সত্ত্বেও মস্কো চুক্তিটি ছিল আংশিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি। কারণ এটি শুধু বায়ুমণ্ডল, মহাশূন্য ও পানির নিচে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ আরোপ করলেও ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। এ সময় এ ফাঁকটুকু রাখায় এটা নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পদ্ধতি খোলা ছিল এবং এভাবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য আশাব্যঞ্জক হলেও প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপটির মূল্য কমে যায়। চীন তাই একে প্রতারণা (Fraud) বলে অভিহিত করে এবং সকল পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করার উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানায়।

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রায়ই সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে কমিয়ে, নিয়ন্ত্রিত করে এবং সম্ভব হলে সম্পূর্ণরূপে দূর করে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা, তবুও তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যটি প্রকৃতিগত নয়, শুধু পরিমাণগত। নিচে ধারাবাহিকভাবে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পার্থক্যগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. নিরস্ত্রীকরণ অস্ত্রশস্ত্রকে বর্জন করতে অথবা হ্রাস করতে প্রস্তাব দেয়; অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব দেয়, অন্তত কারো কারো মতে, অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসবে।

২. নিরস্ত্রীকরণ হলো সনাতন ধারণা কিন্তু জাতিসমূহ যখন নিরস্ত্রীকরণে সম্মত না হয় অর্থাৎ তারা অস্ত্রশস্ত্র বিলোপ অথবা হ্রাস না করে, তখন তারা এ সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য নতুন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে– তা হলো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ যাকে নিরস্ত্রীকরণের আধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে।

৩. নিরস্ত্রীকরণকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করলে কেবল অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস বা বিলোপ সাধনকেই বোঝায় না, সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাসকেও বোঝায়। অপরদিকে, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বলতে চুক্তি বা সমঝোতার ভিত্তিতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট বা পরিমাণগতভাবে অস্ত্র উৎপাদন করাকে বোঝায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ উভয়েরই লক্ষ্য যুদ্ধ সম্ভাবনা হ্রাস করে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে কমিয়ে আনা এবং বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করা।

নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত কি-না

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ যাবৎ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো উদ্যোগই সার্বিক সাফল্য অর্জন করেনি। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আটলান্টিক সনদ, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও চীন কর্তৃক বিঘোষিত মস্কো ঘোষণা, জাতিসংঘ সনদের ২৬ নং ধারা ইত্যাদির লক্ষ্য ছিল অস্ত্র হ্রাসকরণ। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমানে বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগতভাবে বারংবার অস্ত্র হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তাতে তেমন কোনো ফলোদয় হয়নি। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানায় যে, তারা হাইড্রোজেন বোমা আয়ত্ত করেছে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনো চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়নি। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে যে, অস্ত্র হ্রাসকরণের অন্যতম শর্ত হলো, বিদেশী ঘাঁটিসমূহ প্রত্যাহার, যা মেনে নিলে যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্য থেকে ঘাঁটিসমূহ তুলে নিতে হয়। একই বছর যুক্তরাজ্য দাবি করে যে, বিশ্বের যেখানেই যুদ্ধের পাঁয়তারা দেখা যাবে, সেখানেই জাতিসংঘকে তদারকির অবাধ অধিকার দেয়া হোক। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাব-কমিটিতে ব্যাপারটি প্রেরণ করা হয় এবং সাব-কমিটি লন্ডনে মিলিত হয়। কিন্তু ১৯৫৭ মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলোচনার পর আলোচনা পরিত্যক্ত হয়। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন উক্ত কমিশন থেকে স্বীয় সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মার্শাল বুলগানিন তার ৪ দফা প্রস্তাব আলোচনার জন্য জেনেভায় এক সম্মেলনের প্রস্তাব দেন। এ ৪ দফা হলো–

১. দু-তিন বছরের জন্য পারমাণবিক ও তাপ পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখা;
২. আণবিক হাইড্রোজেন বোমা জাতীয় অস্ত্র তৈরি পরিত্যাগ করা;
৩. ন্যাটো এবং ওয়ারশ জোটের সদস্যদের মধ্যে অনাগ্রাসন চুক্তি সম্পাদন করা; এবং
৪. মধ্য ইউরোপে একটি আণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা গঠন করা, যে এলাকার মধ্যে থাকবে সমগ্র জার্মানি, পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া। এ প্রস্তাবের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে, যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের উদ্যোগের প্রতি অশ্রদ্ধা জানিয়ে অন্য কোনো আলোচনায় শরীক হতে রাজি নয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে যে প্রস্তাব দেয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে তা নাকচ করে দেয়। একপক্ষের প্রস্তাব অন্যপক্ষ নাকচ করার এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে এবং নিষ্ফল নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গড়ে উঠতে থাকে পরাশক্তিসমূহের বিপুল থেকে বিপুলতর মরণাস্ত্রের ভাণ্ডার।

মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন এবং তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে মতবিরোধের অবকাশ নেই। অ্যাটম, হাইড্রোজেন ও নিউট্রন বোমা, আণবিক বোমাবাহী দূর পাল্লা এবং মাঝারি পাল্লার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং সাবমেরিন, নক্ষত্রযুদ্ধের পরিকল্পনা মানবজাতির ভবিষ্যৎ

এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। ভীতি এবং সন্ত্রাসের মধ্যে বিশ্ববাসী দিন গুনছে। তাই যুদ্ধের আতঙ্ক মানুষকে বার বার শান্তির উৎস সন্ধানে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়া যেখানে সম্ভব নয় তখন মানুষ বিকল্প হিসেবে অন্য পথের সন্ধান করতে বাধ্য হচ্ছে। আর নিরস্ত্রীকরণই হচ্ছে প্রধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উত্তেজনা হ্রাস ও সামরিক সামর্থ্য কমিয়ে মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। নিচে বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় :** আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও বিশ্বশান্তির জন্য নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা সঞ্চারিত করে। অস্ত্রের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়। এর ফলে বিরোধ এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া অস্ত্রের প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক উত্তেজনাকে ব্যাপকতর করে তোলে। নিরস্ত্রীকরণ রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া ব্যতিরেকে নিরস্ত্রীকরণ অর্থহীন। রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতা এবং আতঙ্ক দূর করতে নিরস্ত্রীকরণ অত্যাবশ্যক।

২. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে :** নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সাহায্য করে। নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে পূর্ব পশ্চিমের অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অগ্রগতি ঘটবে, উত্তেজনা হ্রাস পাবে এবং দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব হবে।

৩. **অর্থনীতির সামরিকীকরণ প্রতিরোধে :** অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বহু দেশের অর্থনীতিকে সামরিক বাহিনী এবং প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। জাতীয় ব্যয় বরাদ্দের বিপুল অংশ সামরিক খাতে ব্যয় হয়। অস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনকারী বহু সংস্থা গড়ে উঠেছে। লাখ লাখ ব্যক্তি অস্ত্র উৎপাদন সংস্থায় নিযুক্ত হয়েছে। কোটি কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এ কারণে নিরস্ত্রীকরণ অর্থনীতিতে এক ভয়ঙ্কর মন্দা সৃষ্টি করবে যা অতীতের সকল মন্দার ইতিহাসকে ম্লান করবে।

৪. **পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে :** পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্যও নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। আণবিক মরণাস্ত্র পরীক্ষা পরিবেশকে দূষিত করে। সমুদ্রতল, ভূ-ভাগ, মরুভূমি এবং বায়ুমণ্ডল যেখানেই আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হোক না কেন, পরিবেশ দূষিত হতে বাধ্য। তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার উপায় নেই। এর ফলে সমুদ্রের মাছসহ বিভিন্ন প্রাণী বিলুপ্ত হয়, বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে মানুষের নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। কাজেই পরিবেশকে বাঁচাতে নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

৫. **প্রয়োজনীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধে :** মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার রোধের জন্য নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী মরণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। এ আর্থিক সম্পদকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যায়। মানবজাতির কল্যাণে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজন তা অস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বব্যাপী চাষাবাদ এবং বাস্তুসংস্থানের জন্য প্রচুর জমি প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণের পরিবর্তে সামরিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য জমি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদর্শিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে ৫,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি জমি অনুৎপাদনশীল সামরিক প্রয়োজনে বরাদ্দকৃত হচ্ছে। তাছাড়া তামা, নিকেল, প্লাটিনাম, অ্যালুমিনিয়াম অস্ত্র উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরস্ত্রীকরণের ফলে ঐসব সম্পদ মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

৬. **উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে :** উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যও নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। উন্নত দেশসমূহ নিজেদের মুনাফার প্রয়োজনে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অস্ত্র রপ্তানির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে। উপরন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে অস্ত্র রপ্তানিকারী দেশসমূহ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে। বিপুল পরিমাণ সামরিক ব্যয় উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনকেই বিপদগ্রস্ত করে না, তাদেরকে বৈদেশিক ঋণের নাগপাশে আবদ্ধ করে। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়বরাদ্দের কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা যায়। প্রতিবছর ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের ফলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে হয়। মরণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য এবং সামরিক খাতে দেশে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ হিসাব করলে এর যথার্থতা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন যুদ্ধ সংগঠিত হয়। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। যুদ্ধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের কারণে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শঙ্কিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হলেও সমস্ত পৃথিবী আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বেলিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সচেতন মানুষ ভেবেছিল যদি পারমাণবিক অস্ত্র এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সমগ্র সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে চেতনা হয় যে, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। নিরস্ত্রীকরণের সাথে মানুষের অস্তিত্ব জড়িত। নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে মানুষ ধ্বংস হতে পরিত্রাণ পাবে। অস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে যদি রোধ করা যায় তবে সবলের হাত থেকে দুর্বল রক্ষা পাবে এবং পৃথিবী স্থিতিশীল হবে। তাই বলা যায় 'নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত।'

০৫ ▮ উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় পাকিস্তান ও ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ কি প্রভাব ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন? *[২১তম বিসিএস]*

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে আধুনিক সভ্যতার নিষ্ঠুর ফসল পারমাণবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ। দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিষয়টি বহুদিন ধরেই বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর ওয়াশিংটন সফরের সময় (১৯৯৪) উপমহাদেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এ সময় নরসীমা রাও জানিয়ে দেন যে, ভারত NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty) বা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না। এ বক্তব্যে পাকিস্তান ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও ভারত তার অবস্থান পরিবর্তন করেনি। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে (CTBT) বিশ্বের ১৮২ টি দেশ স্বাক্ষর করলেও ভারত এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি, ফলে পাকিস্তানও এ চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।

পরমাণু অস্ত্রের সূচনা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে এবং ২৭ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করে। ফলে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘটে। এ বিরোধকে কেন্দ্র করে উভয় রাষ্ট্র অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ১৯৬৫ সালে সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে উভয়েই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বারের মতো ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয়েই অস্ত্র উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অতঃপর ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান সীমান্তের কাছে রাজস্থান মরুভূমিতে ভারত প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। পরবর্তীতে পাকিস্তানও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়। ১৯৯৮ সালে ভারত রাজস্থানের পোখরানে পরীক্ষামূলকভাবে ৩টি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরই পাকিস্তান বেলুচিস্তানের চাগাই মরুভূমিতে পাঁচটি বিস্ফোরণ ঘটায়। সর্বশেষ উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ১৯৯৯ সালে কারগিল উপত্যকায়। আর দুই প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব থেকেই সূত্রপাত হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার।

ভারত ও পাকিস্তান ব্যালিস্টিক মিসাইল চিত্র

ভারত			পাকিস্তান		
মিসাইলের নাম	*পাল্লা (কিমি)*	*ধরন*	*মিসাইলের নাম*	*পাল্লা (কিমি)*	*ধরন*
অগ্নি-১	*৭০০-৮০০*	*স্বল্পপাল্লার*	*হাতফ-I, IA, IB*	*৭০-১০০*	*স্বল্পপাল্লার*
অগ্নি-২	*২৫০০*	*উচ্চমধ্যম পাল্লার*	*আবদালি-১*	*১৮০*	*স্বল্পপাল্লার*
অগ্নি-৩	*৩৫০০*	*উচ্চমধ্যম পাল্লার*	*ঘোরি*	*১৫০০*	*মধ্যম মাত্রার*
অগ্নি-৫	*৫০০০-৬০০০*	*আন্তঃমহাদেশীয়*	*ঘোরি-২ (হাতফ VA)*	*২০০০-২৫০০*	*উচ্চমধ্যম মাত্রার*
পৃথ্বি-১, ২, ৩	*১৫০, ২৫০, ৩৫০-৬০০*	*স্বল্পমাত্রার*	*ঘোরি-৩*	*৩০০০-৩৫০০*	*উচ্চমধ্যম মাত্রার*
সাগরিকা	*৭০০-১৯০০*	*স্বল্পমাত্রা সাবমেরিন*	*গজনবি (হাতফ-৩)*	*২৯০*	*স্বল্পপাল্লার*
ধানেশ (Dhanash)	*২৫০*	*স্বল্পপাল্লার*	*আবদালি-১*	*২৯০*	*স্বল্পপাল্লার*
সূর্য (Surya)	*১২০০*	*উচ্চমাত্রার*	*শাহীন-১*	*৭৫০*	*স্বল্পপাল্লার*
			শাহীন-২	*২৫০০-৩৫০০*	*উচ্চমধ্যম মাত্রার*
			শাহীন-৩	*৪০০০-৪৫০০*	*উচ্চমধ্যম মাত্রার*

পারমাণবিক পরীক্ষার ফলাফল

পাকিস্তান ও ভারত দক্ষিণ এশিয়ার দুটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ায় বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা ব্লক দেশ দুটির উপর কঠিন অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। অবশ্য পরবর্তীতে তা তুলে নেয়। নিচে পাকিস্তান ও ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার ফলাফল আলোচনা করা হলো :

১. **ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা :** পাক-ভারত পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে আপাতদৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ায় ত্রাসের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধের একমাত্র প্রতিরোধক হলো পারমাণবিক অস্ত্র। ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতি এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করেনি, তদুপরি উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণ আবেগপ্রবণ, আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রচণ্ড আগ্রহী ও উৎসাহী। ফলে জনগণের মধ্যকার যুদ্ধবাদী উচ্ছ্বাস এবং শাসকদের দুর্বিনীত আচরণ পারমাণবিক যুদ্ধ অনিবার্য করে তুলতে পারে। এ কারণে পাক-ভারতে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে উঠা আঞ্চলিক নিরাপত্তার দিক তো বটেই বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার দিক থেকে বিপজ্জনক।

২. **পরিবেশগত প্রভাব :** পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার যে কত ভয়াবহ হতে পারে সে সম্পর্কে পাক-ভারতের জনসাধারণ অবগত নয়। কোনো নগরীর উপর অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের একটি বোমা বিস্ফোরিত হলে ৫-৬ কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত অর্ধেক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। বিস্ফোরক কেন্দ্রের ২ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সব প্রাণী নিশ্চিহ্ন

হয়ে যাবে। শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের কারণেই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চোখ জ্বালা, বমি হওয়া এবং শরীরে ফোসকা উঠতে শুরু করে। বিস্ফোরণের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়ায় জেনেটিক সমস্যার কারণে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে এবং তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকবে। ১৯৪৫ সালে জাপানে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার অভিশাপ আজও জাপানি জনগণ বহন করছে।

৩. **ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব :** পাক-ভারত পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সামরিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও পাকিস্তান সমসংখ্যক পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে ভারতের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এ উপমহাদেশে বিরাজমান যুদ্ধের হুমকি এবং ইতঃপূর্বে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিত চার-চারটি যুদ্ধের সম্ভাব্য পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৪. **শান্তি ও স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে :** ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ এবং পাকিস্তানের পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ জটিল করে তুলেছে। পাক-ভারত অস্ত্র প্রতিযোগিতা এ অঞ্চলের উন্নয়ন ও জাতিসমূহের মাঝে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশকে স্তব্ধ করবে।

তবে পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে ভারতের সাম্রাজ্যবাদিতা আজ সত্যিই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির সার্থক উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৮ সালের পাক-ভারত পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এ ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরবর্তী দুদেশের মধ্যে যে শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরবর্তীতেও দুদেশের মধ্যে কাশ্মীর সীমান্তে বেশ কয়েকবার বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়েছে। দুদেশে ইতোমধ্যে শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে সচিব পর্যায়ে কয়েকবার আলোচনায় মিলিত হলেও এখন পর্যন্ত ফলদায়ক কিছুই হয়নি। সুতরাং এ পারমাণবিক শক্তির মদদে ও যুদ্ধ উন্মাদনায় দুদেশের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবণতা থেকে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে এ অঞ্চলের প্রায় ১৭০ কোটিরও বেশি লোককে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, 'পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা স্নায়ুযুদ্ধের মতো স্থায়ী স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারেনি বরং একটা ভয়াবহ ভীতির ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে।'

পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে কোনো পারমাণবিক যুদ্ধ বাঁধলে এর প্রতিক্রিয়া শুধু এ দুটি রাষ্ট্রের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা উপমহাদেশের অন্যান্য দেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে মানুষ, পশু-পাখি ও প্রকৃতির অপরিসীম ক্ষতিসাধন করতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১১-এর দিকে নজর দিলে দেখা যায়, অশিক্ষা, দারিদ্র্য লাগামহীনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধির কোনো ঘাটতি নেই। দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৫০% নিরক্ষর মানুষের বাস। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তানের পরমাণু লড়াইকে কেন্দ্র করে যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছে এর প্রভাব দক্ষিণ এশিয়াতো বটেই সমগ্র এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তুলছে। এ প্রসঙ্গে Institue for Strategic and International Studies-এর সাবেক প্রধান Noordin Sopiee বলেছেন, 'ভারত-পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তোলার পাশাপাশি এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলছে।'

পাক-ভারত পরমাণু লড়াই থামাতে জাতিসংঘের ভূমিকা

পাক-ভারত পরমাণু অস্ত্রবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ :

- পরীক্ষামূলক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়।
- নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রই পাক-ভারতকে পরমাণু অস্ত্র শক্তিধর দেশের মর্যাদা না দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।
- সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) ও পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (NPT) তে নিঃশর্তভাবে স্বাক্ষর করতে বলে।
- নতুন করে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ না ঘটানো এবং পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে বিরত থাকতে বলে।
- কাশ্মীরসহ বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানকে আলোচনার টেবিলে এসে সকল বিরোধ মিটিয়ে ফেলার অনুরোধ করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি দেশ।

পাক-ভারত আলোচনায় অস্ত্র সীমিতকরণ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। উভয় দেশই NPT ও CTBT চুক্তি স্বাক্ষর না করে একাধিক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরিস্থিতি অশান্ত করে তুলেছে। এ ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বড় ধরনের অন্তরায়। পাকিস্তানের কাছে আছে হাতফ, ঘোরী, শাহিন মিসাইল ঠিক তেমনি ভারতের কাছে রয়েছে পৃথ্বী, সাগরিকা ইত্যাদি। শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন অস্ত্র সীমিতকরণ ও অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করা। ১৯৯৯ সালে লাহোর ঘোষণায় বলা হয়েছিল উভয় দেশ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পূর্বে পরস্পর পরস্পরকে অবহিত করবে এবং এ সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবে। কিন্তু সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরনোন্মুখ, যে কোনো সময় যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। এতে বিঘ্ন হতে পারে দক্ষিণ এশিয়া তথা উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা।

দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনগণ। তবু পারমাণবিক প্রতিযোগিতা এ অঞ্চলের পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। পাকিস্তানের সাবেক অর্থমন্ত্রী ও UNDP'র উপদেষ্টা ড. মাহবুবুল হকের মতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বছরে প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার খরচ করে অস্ত্র আমদানি করতে। তার মতে ১০ বছর যদি এটা 'ফ্রিজ' করে রাখা যায় তাহলে সাশ্রয় হবে ৫০ বিলিয়ন ডলার, যা দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। কিন্তু তাদের ন্যূনতম চাহিদাটুকু উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। পাকিস্তান ও ভারতে দারিদ্র্য যেখানে নিত্যসঙ্গী সেখানে এ দুটি দেশ আজ লিপ্ত হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায়, যা এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

০৬ ▮ মধ্য এশিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করুন। *[২৯তম; ২৪তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্য এশিয়া বিশ্বের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভূকৌশলগত দিক দিয়ে মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব তাৎপর্যবহ। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের পরেই তেল ও গ্যাস মজুদের দিক দিয়ে রয়েছে মধ্য এশিয়া। এ অঞ্চলে রয়েছে কাস্পিয়ান সাগর। ৬৫ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস মজুদ তুর্কমেনিস্তানে ২.৯ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ রয়েছে। কাজাখস্তানে ৯ থেকে ৪০ বিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুদ আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর

১৯৯১ সালে ৬টি স্বাধীন, সার্বভৌম মুসলিম দেশ নিয়ে মধ্য এশিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ভূরাজনৈতিক দিক দিয়েও মধ্য এশিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মধ্য এশিয়া থেকেই ইউরোপ, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের উপর দিয়ে আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কাজেই ভূরাজনৈতিক দিক দিয়েও এটি যেমন কৌশলগত এলাকা হিসেবে পরিচিত, তেমনি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এখানে রয়েছে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। এসব দিক বিবেচনায় মধ্য এশিয়া বর্তমান বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্যের পরেই বৃহৎ শক্তিবর্গের দ্বিতীয় রাজনৈতিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

মধ্য এশিয়ার পরিচিতি

ভৌগোলিক দিক থেকে মধ্য এশিয়া এশিয়া মহাদেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে মধ্য এশিয়া। মধ্য এশিয়া বলতে বোঝায়— সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত মুসলিম উপনিবেশসমূহকে, যে উপনিবেশসমূহ ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এ অঞ্চলের উত্তরে রাশিয়া, পূর্বে চীন, দক্ষিণে আফগানিস্তান, ইরান এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এ অঞ্চলের মোট আয়তন ৪০,৮১,০০০ বর্গ কিমি এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ১৬ লাখ। নিচে মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের পরিচিতি

দেশের নাম	*রাজধানী*	*আয়তন (বর্গ কিমি)*	*লোকসংখ্যা*	*ভাষা*	*স্বাধীনতা লাভ*
কাজাখস্তান	*আস্তানা*	*২৭,১৭,৩০০*	*১ কোটি ৬৪ লাখ*	*কাজাখ*	*১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১*
কিরগিজস্তান	*বিশবেক*	*১,৯৮,৫০০*	*৫৪ লাখ*	*কিরগিজ*	*৩১ আগস্ট ১৯৯১*
তাজিকিস্তান	*দুশানবে*	*১,৪৩,১০০*	*৭১ লাখ*	*তাজিক*	*৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১*
তুর্কমেনিস্তান	*আসখাবাদ*	*৪,৮৮,১০০*	*৫২ লাখ*	*তুর্কমেন*	*২৭ অক্টোবর ১৯৯১*
উজবেকিস্তান	*তাসখন্দ*	*৪,৪৭,৪০০*	*২ কোটি ৮১ লাখ*	*উজবেক*	*১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১*
আজারবাইজান	*বাকু*	*৮৬,৬০০*	*৯৪ লাখ*	*আজারবাইজানি*	*১৮ অক্টোবর ১৯৯১*

মধ্য এশিয়ার ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব

ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করে যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে গুরুত্বের দাবিদার ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে বলকান অঞ্চল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং নব্বইয়ের দশকের প্রথম থেকে অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে মধ্য এশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্য এশিয়ার ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির পেছনে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **ভৌগোলিক গুরুত্ব :** বিশ্ব মানচিত্রে ভূকৌশলগত দিক থেকে মধ্য এশিয়া অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। এ কারণে অতীতে চেঙ্গিস খান ও হালাকু খান এ অঞ্চল করতলগত করেছিল। আর একই কারণে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এ অঞ্চলটি গ্রাস করেছিল। যে দেশ এ অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রক হবে তারাই পারবে দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ককেশীয় অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে। যেমন–

ক. মধ্য এশিয়া ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে সহজেই মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ।

খ. মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব বেড়েছে কাস্পিয়ান সাগরের জন্য। মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত লবণাক্ত হ্রদ কাস্পিয়ান সাগর। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯২ ফুট নিচে। পৃথিবীর বৃহত্তম স্থল পরিবেষ্টিত এ জলাশয়ের আয়তন ৩,৯৫,২৯৯ বর্গ কিমি। এতে প্রচুর লবণ আছে। বাকু তেল কেন্দ্র, আস্ত্রাখান, তাব্রিজ এর উপকূলবর্তী প্রধান বন্দর। মৎস্য ও সীল শিকার কেন্দ্ররূপে কাস্পিয়ান সাগরের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ. মধ্য এশিয়া অঞ্চলের কাজাখস্তানে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র 'বাইকনুর'। কেন্দ্রটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও মহাকাশ স্টেশনে মানুষ প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তান বাইকনুর মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

২. **খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য :** ভৌগোলিক কারণে মধ্য এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ বিরাজমান থাকায় পরাশক্তির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ এ অঞ্চলে থাকায় পরাশক্তিসমূহের লোলুপ দৃষ্টি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর ওপর এখন অনেক বেশি। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পর মধ্য এশীয় অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে। যার মধ্যে রয়েছে জ্বালানি তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু ইত্যাদি। এসব মূল্যবান সম্পদ দখলে তিন পরাশক্তি তথা চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অনেকে মনে করেন, এ অঞ্চলটি স্থলবেষ্টিত হওয়ার কারণে তেল ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করে সহজে পরিবহন করা সম্ভব। আর এজন্য রুট হিসেবে আফগানিস্তানকে ব্যবহার করা সহজ। এ থেকেই সহজে অনুমেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের অজুহাতে আফগানিস্তানকে দখল করেছে।

৩. **রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু :** মধ্য এশিয়ার দেশগুলো যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিল তখন এর তেমন পরিচিতি ছিল না। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটে। দীর্ঘ কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে এসব সদ্যস্বাধীন দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। ফলে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশসমূহে সাহায্য ও সহযোগিতার নামে প্রবেশ করে। অন্যদিকে মধ্য এশিয়ার এসব দেশসমূহ মুসলিম হওয়ায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে অবস্থান হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতিক কারণে মধ্যপ্রাচ্যের নিকটও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলের দেশগুলো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ায় ভবিষ্যতে যাতে কোনো মরণাস্ত্র এ দেশসমূহ তৈরি করতে না পারে বা কোনো মুসলিম দেশ হতে মরণাস্ত্র সংগ্রহ না করতে পারে বা কোনো মার্কিন বিরোধী শক্তির হাতে না যেতে পারে তাও পরাশক্তির চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ে। কাজেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া আফগানিস্তানে তালেবান দমনের অজুহাতে আফগানিস্তান দখল, ইরাকে জীবাণু অস্ত্রের সন্ধানে সাদ্দামকে হটিয়ে ইরাক দখল, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্ব প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার গুরুত্বকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

৪. **অর্থনৈতিক শক্তি :** মধ্য এশিয়ার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভের পর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যাত্রা শুরু করলে এ অঞ্চলের দেশগুলো দ্রুত প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর তেল ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া তেল ও গ্যাস মজুদের দিক থেকে বর্তমানে বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্যের পরই মধ্য এশিয়ার অবস্থান। ফলে রাজনৈতিক কোম্পানিগুলো এ

অঞ্চলের তেল ও গ্যাসভাণ্ডার লুণ্ঠনে নানা ফন্দি ফিকির করছে। এছাড়া অত্র অঞ্চলটি স্থলবেষ্টিত হওয়ায় এখানে উৎপাদিত তেল, গ্যাস খুব সহজেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে সরবরাহ করা যাবে। পরিবহন ব্যবস্থার এ সুযোগ এ অঞ্চলের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৫. **ধর্মীয় গুরুত্ব :** মধ্য এশিয়ার দেশগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মুসলিম বিশ্বে এ অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইসলামের সম্প্রসারণ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্য মুসলিম বিশ্বের সাথে মধ্য এশিয়ার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কাছাকাছি হওয়ার কারণে এখানে ইসলাম আরো দ্রুত সম্প্রসারণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে বিশ্বে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটলে একদিন মুসলিম বিশ্বই বর্তমান পরাশক্তিগুলোর জন্য ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে দেখা দিবে। তাই পরাশক্তিগুলো ভবিষ্যৎ হুমকির ভয়ে ভীত হয়ে মধ্য এশিয়ার প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর অব্যাহত রেখেছে।

৬. **মুসলিম পরমাণু শক্তিধরদের নিয়ন্ত্রণে :** বর্তমান বিশ্বে বৃহৎ শক্তিবর্গ মুসলিম দেশসমূহ নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাদের ধারণা এ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ ও দেশসমূহ এক সময় তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে। তাই চ্যালেঞ্জ হয়ে যাতে না উঠতে পারে এজন্য শুরু থেকেই এদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আর এজন্য মুসলিম একমাত্র পরমাণু শক্তিধর দেশ পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে নিতে তালেবান খোঁজার নামে ঘনঘন সীমান্তে হামলা ও নিরীহ জনগণকে হত্যা করা, ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে অজুহাতে নানা অভিযোগ ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, তারই বলিষ্ঠ প্রমাণ। আফগানিস্তান দখলের পর এখন ইরান ও পাকিস্তান দখলের প্রচেষ্টা চলছে। কারণ এদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলে মধ্য এশিয়াও সহজে হাতের নাগালে এসে যাবে।

৮. **অস্ত্র ব্যবসার সম্ভাবনাময় এলাকা :** মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে দেখা যায়, এটি আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় বাজার। এ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রেখে অস্ত্র ব্যবসাকে চাঙ্গা রাখার লক্ষ্যে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বৃহৎ শক্তিবর্গ এ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে কূটকৌশল চালাচ্ছে। এক দেশের সাথে অপরেক দেশের দ্বন্দ্ব বাধিয়ে কিংবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্র তৈরি করছে।

৯. **বৃহৎ শক্তিবর্গের ওপর নজরদারি :** মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর উত্তরে রয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ পরাশক্তি রাশিয়া, পূর্বে রয়েছে চীন, দক্ষিণে রয়েছে সম্ভাবনাময় নতুন উদীয়মান শক্তি ভারত ও পরাশক্তি চীন। এ বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্মপন্থা ও গতিবিধি নজরদারি করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য মধ্য এশিয়া নিয়ন্ত্রণে নানা কর্মপন্থার আয়োজন করে চলেছে। বলা হয়, বর্তমান এক মেরুভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ হুমকি হিসেবে চীন দেখা দিবে। কাজেই চীনের ওপর নজরদারি করতে মধ্য এশিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

১০. **চীন, মার্কিন ও রাশিয়ার স্বার্থ :** মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিবেশী দেশ চীন ও রাশিয়া। চীনের জন্য হুমকি হয়ে আছে মধ্য এশিয়ার জাতিগত বিরোধ। চীনের স্বায়ত্তশাসিত জিনজিয়াং প্রদেশের কাজাখ, কিরঘিজ ও উইঘুরদের সাথে মধ্য এশিয়ার কাজাখ এবং কিরঘিজদের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। উইঘুররা স্বতন্ত্র ভূমির দাবি করে যা ইনার মঙ্গোলিয়া অঞ্চলেও বিস্তৃতি ঘটতে পারে। কারণ, এসব অঞ্চল বিশেষ করে দক্ষিণ কাসাগার অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে ফারগানা উপত্যকার অংশ। এ ধরনের দাবি চীনের অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয় এবং চীন যে এ ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর তা বলাই বাহুল্য। এদিক থেকে মধ্য এশিয়া চীনের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্য এশিয়ার দেশগুলো এক সময় বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের পর মধ্য এশিয়ার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বৃহৎ পরাশক্তি রাশিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা মধ্য এশিয়ায় যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তেমনি ভূকৌশলগত গুরুত্বও রয়েছে। কাজেই রাশিয়া চাইবে না তার প্রতিবেশী ও সাবেক দখলকৃত অংশে কেউ এসে নিয়ন্ত্রণ করুক বা সম্পদ লুণ্ঠন করুক। কাজেই এদিক থেকে মধ্য এশিয়া রাশিয়ার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি চাহিদার বৃহৎ অংশ সরবরাহ হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে এখন জ্বালানি থামবে মধ্য এশিয়ায়। তাছাড়া মার্কিন হুমকি হিসেবে রয়েছে মধ্য এশিয়ার পাশে চীন ও রাশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং চীন ও রাশিয়ার হুমকি মোকাবিলায় মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করছে সাহায্য, সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে। কাজেই মার্কিন জ্বালানি নিরাপত্তা ও চীন, রাশিয়া মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় মধ্য এশিয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতাও সমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্য এশিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধির মূলে রয়েছে এ অঞ্চলের জ্বালানি সম্পদ। জ্বালানি সম্পদই এ অঞ্চলে পরাশক্তির দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে। তাই পরাশক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় মধ্য এশিয়াকে ও দাবার গুটিতে পরিণত করতে চায়। মধ্য এশিয়া যাতে মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় বৃহৎ শক্তিবর্গের (Great game) গ্রেট গেম এ পরিণত না হয় এজন্য এ অঞ্চলের দেশগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে সকল বিবাদের অবসান ঘটিয়ে পরাশক্তিসমূহ থেকে দূরে থাকা। যদি তারা তা করতে সক্ষম হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে মধ্য এশিয়া হবে বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭। ক. জাতীয় শক্তি কি?

খ. জাতীয় শক্তির উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : জাতীয় শক্তি বলতে কেবল অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রাকৃতিক সম্পদ বা লোকবলকেই বোঝায় না। অনেক উপাদানের সমন্বয়েই জাতীয় শক্তির প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা যায়। তবে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে বিশেষ উপাদান জাতীয় শক্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে পারে। যেমন– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আণবিক মারণাস্ত্রে শক্তি প্রাধান্য অর্জন করেছে। কয়েক শতাব্দী ধরে জনসংখ্যাকেই জাতীয় শক্তির উৎসরূপে গণ্য করা হতো। কারণ, সেনাবাহিনীর সংখ্যার ভিত্তিতেই জাতীয় শক্তি নির্ধারিত হতো। রাষ্ট্রের সম্ভাব্য নৈপুণ্যের পরিচয় পেতে জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জাতীয় শক্তি (National Power)

জাতীয় শক্তির সংজ্ঞা জানার পূর্বে আমাদের জানা দরকার শক্তি বা ক্ষমতা (Power) কি? সাধারণত ক্ষমতা বলতে কোনো ব্যক্তির অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মন, ইচ্ছা ও কর্মের ওপর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে সোয়ার্জেনবার্গার (Schwargenbergar) তার Power Politics গ্রন্থে বলেন, 'Power is the capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in care of non-compliance.'

সুতরাং জাতীয় শক্তি হলো কোনো রাষ্ট্রের এরূপ সক্ষমতা (Capacity) যার মাধ্যমে সে অন্য রাষ্ট্রের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে চার্লস তার 'Principles of International Relations' গ্রন্থে বলেন, 'National power is the capacity of a state to exert coercive influence upon other states and to resist such influence exerted by others upon it.'

প্যাডেলফোর্ড এবং লিঙ্কনের মতে, জাতীয় শক্তি হলো কোনো দেশের শক্তি ও সামর্থ্যের সমষ্টি যা সে তার জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও জাতীয় লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োগ করে। (National power can be defined as some total of the strength and capabilities of a state harnessed and applied to the advancement of its national interests and the attainment of its national objectives.)

সুতরাং জাতীয় শক্তির ধারণাটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে :

– এটি একটি রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতার সমষ্টি;

– এটি কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যকর করার অন্যতম হাতিয়ার;

– এটি কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যম।

জাতীয় শক্তির উপাদান

জাতীয় শক্তির নির্ধারক উপাদানসমূহকে অরগানসকি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা : শক্তির প্রকৃতি নির্ধারণকারী এবং শক্তির সামাজিক নির্ধারণকারীসমূহ। ক্ষমতার নির্ধারণকারীরূপে তিনি ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক কাঠামো এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসের প্রকৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া কূটনৈতিক দক্ষতা প্রচারকেও তিনি শক্তির উপাদানরূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ লেখক কূটনীতি ও ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার ও কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভ্যানডাইক শক্তির বারটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : ১. ভৌগোলিক ভিত্তি, ২. জনসংখ্যা, ৩. উৎপাদন দক্ষতা, ৪. যাতায়াত ও যোগাযোগ, ৫. বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, ৬. সরকারি সংগঠন ও প্রশাসন, ৭. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ৮. সামরিক অবস্থান, ৯. ধ্যান-ধারণা, ১০. গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগ, ১১. সামরিক ব্যবস্থা ও ১২. নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা। আবার অনেকে জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পগত ক্ষমতা, কৃষিগত শক্তি, সামরিক শক্তি ও সচলতা ইত্যাদি বাস্তব উপাদান এবং নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব, সরকারের ধরন, সুনাম, বৈদেশিক সমর্থন ও নির্ভরশীলতা ইত্যাদি অবাস্তব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। পামার এবং পারকিন্স ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, মতাদর্শ, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বকে জাতীয় শক্তির উপাদান রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জাতীয় শক্তির প্রধান উপাদানসমূহের আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১. **ভূগোল :** জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় শক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান এবং নির্ধারকরূপে ভূগোলের ভূমিকা অপরিসীম। ইতিহাসকে চলমান ভূগোল হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিশ শতকে বিশ্বের পরিধি হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে বিশ্বের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিভিন্নভাবে মানুষ পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে জানার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌত ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভৌগোলিক উপাদানকে ভূখণ্ডকেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমানে এমন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে গ্রহণ করা হয় যে, ভূ-বিদ্যাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রনীতিবিদগণ ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে পররাষ্ট্রনীতিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন।

২. **অবস্থান :** ভৌগোলিক উপাদানের অংশরূপে কোনো দেশের অবস্থানের বিষয় যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তার ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ভূমিকা নির্ধারণ করে। অবস্থান, জাতীয় অর্থনীতি, সামরিক শক্তি, প্রতিরক্ষা, কূটনীতি ও সম্পর্কের প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায়, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল অগ্রগতি বিভিন্ন দেশকে নিকটবর্তী করেছে। কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে সে দেশ একটি সামুদ্রিক শক্তি বা স্থলশক্তি হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য চেষ্টা করবে কিনা। গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের অবস্থান তাদের সামুদ্রিক শক্তিতে পরিণত করেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী হওয়ায় তার অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম জার্মানির অবস্থান তাদের বিশেষভাবে স্থলশক্তিতে পরিণত করেছে। এভাবে অবস্থান কোনো দেশের সামরিক এবং নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে আসছে।

৩. **ভূ-ভাগের আয়তন :** ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে কোনো দেশের ভূ-ভাগের আয়তন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচিত হয়। কোন দেশ কতটা ভূ-ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে তার ওপরে তার ক্ষমতা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে তার সম্পদ, ব্যবহারযোগ্য জমি, আয়তন, ভূপ্রকৃতির বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার। ভূ-ভাগের আয়তনের ওপর কোনো দেশের শক্তির নির্ভরশীলতা প্রমাণের জন্য পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কোনো দেশের আয়তন তার শক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও শুধু আয়তনকে কেন্দ্র করেই শক্তির বিকাশ ঘটে না। আয়তনের সাথে সম্পদ এবং জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হলে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

৪. **জলবায়ু :** ভৌগোলিক উপাদানের একটি অংশ হিসেবে জলবায়ু অনেকাংশেই জাতীয় শক্তির সাথে যুক্ত। কোনো দেশের অবস্থানই তার জলবায়ুকে নির্ধারণ করে। অবস্থান অনুসারে দেশসমূহ উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ, মেরু এবং নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। জলবায়ুর সাথে কোনো দেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জনসাধারণের উৎপাদনশীলতা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভরশীল। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ বেশি পরিশ্রমী হয়। তাদের কর্মদক্ষতা উষ্ণ অঞ্চলের মানুষের কর্মক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি হয়। আবার উত্তাপ বা শৈত্যবিশিষ্ট চরম জলবায়ু কৃষির উৎপাদনে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গতিধারায় তাই দেখা যায়, সকল শক্তিশালী দেশই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। যদিও এ ধারণা আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে অনেকক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়।

৫. **জনসংখ্যা :** জাতীয় শক্তির উপাদানরূপে দুটি সম্পর্কের ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরা যায়। যথা : মানবিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। এ মানবিক সম্পদের অংশই হলো জনসংখ্যা। সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে মানবিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা কোনো দেশের প্রয়োজন ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সহজসাধ্য হয়। দক্ষ ও শিক্ষিত জনসমষ্টিই পারে জাতীয় শক্তিকে ত্বরান্বিত করতে। জনসংখ্যা যেমন অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার ও সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন, ঠিক তেমনিভাবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ অর্থনীতিকে দুর্বল করে।

৬. **প্রাকৃতিক সম্পদ :** প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা কোনো দেশের বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়ায় একটা বড় বাধা। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে খনিজসম্পদ, বনজসম্পদ, বন্যপ্রাণী, মৃত্তিকার উর্বরতা ইত্যাদিকে বোঝায়। প্রাকৃতিক সম্পর্ক ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের সমন্বয়ে কোনো দেশ আধুনিক

শিল্প, যোগাযোগ, যাতায়াত ব্যবস্থা, সামরিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের সাথে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সুষ্ঠু সমন্বয়ের ফলে জাতীয় অর্থনীতি এবং শক্তির দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

৭. **অর্থনৈতিক বিকাশ :** কোনো জাতির শক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সংগঠন এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা। বিশ্বায়নের যুগে যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সে দেশের জাতীয় শক্তির মাপকাঠিরূপে কাজ করে। অর্থনৈতিক উপাদান জাতীয় জীবনের প্রতিটি অংশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা কেবল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও কল্যাণ সাধনের সাথে জড়িত থাকে না, পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের জন্যও অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়।

৮. **রাজনৈতিক কাঠামো :** জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। শক্তির উপাদানের অস্তিত্বই তার প্রসারে সাহায্য করে না। ঐ উপাদানসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রয়োগ করা দরকার। সরকার এ ঐক্যসাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কার্যকলাপ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগে সরকারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যানস্ জে. মর্গেনথাউ-এর মতে, 'একটি সুষ্ঠু বা উৎকৃষ্ট ধরনের সরকার ব্যতীত পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।' তাছাড়া আমলাতন্ত্র ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রকৃতি ও সাফল্যও মূলত সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি ও সাফল্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৯. **নেতৃত্ব :** যোগ্য নেতৃত্ব জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। নেতৃত্ব এককভাবে ক্ষমতার প্রকৃত প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও ক্ষমতার অন্যান্য উপাদানকে ঐক্যবদ্ধ রূপদানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুত্ব রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক বিকাশ, মানবিক সম্পদ, সামরিক দক্ষতা ইত্যাদি উপাদানকে কতটা, কখন এবং কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, তাও নির্ভর করে জাতীয় নেতৃত্বের দক্ষতা এবং কর্মকুশলতার ওপর। নেতৃত্ব অন্যান্য উপাদানের সাথে তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১০. **কূটনীতি :** জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে 'কূটনীতি'-কে গণ্য করতে অনেকের আপত্তি থাকলেও কূটনীতি দেশের ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে থাকে। এটা পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও মাধ্যমের সমন্বয়সাধনে সহায়তা করে। কূটনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতেই কোনো দেশ স্থির করে যে, সে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সাথে কিভাবে নিজেকে যুক্ত করবে। উনবিংশ ও বিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি, দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত না করার নীতি তার কূটনৈতিক বিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

১১. **সামাজিক উপাদান :** জাতীয় শক্তির প্রভাবক হিসেবে সামাজিক উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। এ উপাদানের মধ্যে প্রধানত জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় উপাদান রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় থাকলে এবং তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় হলে যে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার এবং ক্ষমতা প্রয়োগে সুবিধা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি করে না, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও সংশ্লিষ্ট দেশের ভূমিকার গুরুত্ব হ্রাস করে।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় শক্তি শুধু তার ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সরকার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, কূটনীতি, নেতৃত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। জাতীয় শক্তির এক উপাদান অন্য উপাদানের ওপরেও নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই সকল উপাদান এখানে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বন্ধনে যে আবদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়ের যথার্থ অনুধাবন ব্যতীত জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

০৮। জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশটির অবস্থান নির্ণয়ে কি ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কর্মকাণ্ডের সাথে শক্তির ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ। পামার এবং পারকিন্সের মতে, 'Like sovereignty and nationalism, national power is a vital and inseparable feature of the state system.'। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি দেশের অবস্থান এবং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য জাতীয় লক্ষ্যকে কার্যকর করার হাতিয়ার হলো তার জাতীয় শক্তি। কেননা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার ও দরকষাকষির ক্ষেত্রে জাতীয় শক্তি একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তবে একটি দেশের শক্তি বা ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিষয় ও উপাদান কার্যকর থাকতে পারে। যেমন— স্নায়ুযুদ্ধের সময় যেখানে সামরিক শক্তি কোনো একটি দেশের জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ছিল, বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ একটি দেশের জাতীয় শক্তির অন্যতম বিচার্য বিষয়। তবে কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আকার, আকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈচিত্র্য সে দেশের জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে স্থায়ী উপাদান হিসেবে বিবেচ্য।

জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব

জাতীয় শক্তির যেসব উৎস বা উপাদান রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী উপাদান হলো কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যাবলী। এ প্রসঙ্গে Morgantheau-এর বক্তব্য হলো, 'The most stable factor upon which the power of a nation depends is obviously geography.'

তবে ভৌগোলিক উপাদানের আবার কতকগুলো দিক রয়েছে। যেমন—

ক. **ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location) :** কোনো একটি দেশের জাতীয় শক্তি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর প্রেক্ষিতে তার অবস্থান দ্বারা অনেকাংশে স্থিরকৃত হয়। এর আবার কতকগুলো দিক আছে। যেমন—

১. **ক্ষমতার কেন্দ্র সাপেক্ষে অবস্থান :** এ ধরনের অবস্থানের বিশেষ দিকগুলো হলো :

প্রথমত, কোনো রাষ্ট্র যখন আন্তর্জাতিকভাবে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল বা রাষ্ট্রসমূহ থেকে দূরে অবস্থিত হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যেমন—নিউজিল্যান্ড।

দ্বিতীয়ত, কোনো রাষ্ট্র যখন এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত হয় যেখানে বৃহৎ শক্তিগুলোর নানামুখী স্বার্থ জড়িত সে দেশ স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাচে পতিত হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে সে বলির পাঠাও হতে পারে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি।

তৃতীয়ত, কোনো রাষ্ট্র যখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র বা অঞ্চলের সাথে অবস্থান করে তখন সে রাষ্ট্রটি এমনিতেই সেসব অঞ্চলের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে, যা তার জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। যেমন— সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং দূরপ্রাচ্যের সীমান্ত থাকায় এসব অঞ্চলের রাজনীতিতে দেশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ছিল।

২. **মহাসাগরের প্রেক্ষিতে অবস্থান :** কোনো একটি দেশের বাণিজ্য ও নৌ-শক্তি মহাসাগরের সাথে তার সীমান্ত তথা অনুপ্রবেশের সুবিধার ওপর নির্ভর করে। যেসব দেশ সহজে জলপথের সাথে মিশতে পারে, সেসব দেশ স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত দেশের তুলনায় অধিক সুবিধা ভোগ করে। যেমন— নেপাল ও বাংলাদেশ—এ দুটি দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের কারণে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি বিশেষ প্রভাব ফেলে। যেমন— জার আমল থেকেই রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) 'Warm Water Outlet Policy' অনুসরণ করে আসছে। কেননা ভূমধ্যসাগর থেকেই কৃষ্ণ সাগরে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে একমাত্র দার্দানালেস এবং বসফরাস প্রণালী ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এ প্রসঙ্গে একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে ভিশিনস্কি (Andre Vishinskey) বলেছিলেন, 'If warship has to sail from the Mediterranean sea to the Black sea it must pass through the Dardhanelles whether the government in Moscow Czarist or Communist.'

৩. ভৌগোলিক অবস্থান একটি দেশের নিরাপত্তা নীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন— একদিকে পাকিস্তান এবং একদিকে চীনের মতো দুটি পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী থাকায় ভারতের সবসময়ই একটি কঠোর নিরাপত্তা নীতি অনুসরণ করতে হয় এবং এদের একের নিরাপত্তা নীতির যে কোনো পরিবর্তন অন্যের নিরাপত্তা নীতিকে প্রভাবিত করে।

খ. **রাষ্ট্রের আকৃতি :** রাষ্ট্রের আকৃতি কোনো একটি দেশের নিরাপত্তা নীতি ও কৌশল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানকে বেশ প্রভাবিত করে। সাধারণত বৃহৎ আকৃতির দেশসমূহ এক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। যেমন– সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহৎ আকৃতির কারণে শত্রুরা সব সময়ই এ দেশটিকে দখলের ব্যাপারে ভীত থাকত। নেপোলিয়ন এবং হিটলার উভয়েই দেশটি দখল করতে ব্যর্থ হন। এ প্রসঙ্গে মর্গেনথ্যু (Morgenthau) বলেন, 'Geography has made the conquest of Russian territory a liability for the conqueror rather than an asset. Instead of the conqueror's swallowring of the territory and gains strength from it, it is rather the territory that swallow the conqueror, sapping his strength.'

গ. **আকৃতি ও গঠন (Topography) :** একটি দেশের আকৃতি ও ভৌগোলিক গঠন দেশটির নিরাপত্তা ও সামর্থ্যের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে'। যেমন– পর্বতবহুল দেশসমূহে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা তেমন সুবিধা করতে পারে না। অন্যদিকে যে দেশ সহজেই তার আন্তর্জাতিক নদীপথের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে সেসব দেশ তুলনামূলকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সামরিক শক্তির দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ার কথা বলা যায়। এ দেশটির বিশাল সীমানা থাকলেও কোনো দিক দিয়েই সহজে সমুদ্র উপকূলে প্রবেশ করা যায় না। ফলে তাকে মাত্র দুটি স্বাভাবিক প্রণালীর ওপর নির্ভর করতে হয়।

ঘ. **জলবায়ু :** একটি দেশের জলবায়ুও তার ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে এবং জলবায়ু জাতীয় শক্তি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশসমূহ সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের কথা বলা যায়।

ঙ. **সীমানা (Boundaries) :** কোনো একটি দেশের সীমারেখা তার জাতীয় শক্তি নির্ধারণে একটি স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে দেখা দিতে পারে। কেননা সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে একটি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। এক্ষেত্রে যেসব দেশের পাঁচটি বা ছয়টি দেশের সাথে সীমান্ত রয়েছে সেসব দেশ তুলনামূলকভাবে যেসব দেশের মাত্র একটি দেশের সাথে সীমান্ত রয়েছে তার চেয়ে বেশি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দেশ; যেমন– যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি নাকি, উপমহাদেশীয় দেশসমূহ; যেমন— রাশিয়া, জার্মানি বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব

কোনো দেশের জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অনেক। এটি অধিকাংশ সময় ইতিবাচক প্রভাব ফেললেও অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। যেমন—

প্রথমত, যেসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সেসব দেশ তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী। বিশেষ করে জ্বালানি সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দরকষাকষির ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু মাটির নিচে অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ এক্ষেত্রে তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না। একটি দেশ যখন যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে তার প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও উত্তোলন করে নিজস্ব মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখনই তা তার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। কিন্তু দেশটি এক্ষেত্রে যখন তার মালিকানা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় তখন এ প্রাকৃতিক সম্পদ দেশটির তেমন কোনো কাজেই আসেনি। অনুরূপভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিকভাবে এ অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য সুসংবাদ হলেও এ তেল সম্পদই এ অঞ্চলের জনগণের জন্য এখন ব্যাপক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ অঞ্চলকে সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎসস্থলে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয়ত, যেসব দেশ কাঁচামালে সমৃদ্ধ এবং এ কাঁচামালকে চূড়ান্ত দ্রব্য (Finished Product)-এ পরিণত করতে সক্ষম সেসব দেশ অনায়াসেই অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা একটি দেশের জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা জনগণের অন্ন যোগাতে না পারলে বাকি সব শক্তিই অর্থহীন হয়ে পড়ে, যার অন্যতম উদাহরণ হলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে নৌপথের দখলদারিত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি স্থলভাগের দখল বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। যেমন— Alfred Mahan যেখানে নৌ-শক্তির প্রাধান্যের কথা বলেছেন, Maukinder সেখানে তার বিপরীতটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জনসংখ্যার অভিগমন (Migration)-এর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ফ্রান্সের দাঙ্গা, সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রভৃতি থেকে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক চোরাচালানের রুটগুলোর অবস্থানের প্রেক্ষিতে একটি দেশের অবস্থানও একটি দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। এসব রুটের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ স্বাভাবিকভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনার শিকার হয়।

০৯। ক. শক্তি ও জাতীয় শক্তির ধারণা দিন।
খ. জাতীয় শক্তির কাঠামো ও উপাদান আলোচনা করুন।
গ. একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির গুরুত্ব উপস্থাপন করুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি বা ক্ষমতা (Power) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা সভ্যতাগুলোর অস্তিত্ব ও সামগ্রিক বিকাশধারাকে এর জাতীয় শক্তির (National Power) সর্বোচ্চ সমন্বয় হিসেবে দেখতে পাই। জাতীয় শক্তি বা National Power রাজনৈতিক প্রপঞ্চের এমন এক প্রত্যয় যার মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন, সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধির বীজ নিহিত রয়েছে। বস্তুত জাতীয় শক্তি এমন এক ধারণা যা কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর সুসমন্বয় সাধন করে এর অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক উপাদানের কৌশলগত নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। তাইতো অধ্যাপক Norman D. Palmer and Howard C. Perkins যথার্থই বলেছেন– 'National power is a vital and inseparable feature of the state system.' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় জীবনের এক অত্যাবশ্যক ও অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয় শক্তি'।

শক্তি (Power)

অর্থনৈতিক আলোচনায় অর্থ (Money) ও পদার্থবিদ্যার আলোচনায় শক্তি (Energy) যে ভূমিকা পালন করে থাকে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মৌলিক উপাদান হলো– শক্তি (Power)। সাধারণ অর্থে শক্তি বলতে ক্ষমতা বা কৌশলগত প্রজ্ঞা বোঝানো হলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শক্তি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ শক্তি হলো এমন এক ধরনের সামর্থ্য বা সক্ষমতা, যার সাহায্যে কোনো মানুষ অন্যের মন ও কাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। জর্জ সোয়ার্জেনবার্গার তাঁর 'Power Politics' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– 'Power is the capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in case of non-compliance.' অর্থাৎ শক্তি হলো একজনের ইচ্ছাকে অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা এবং যদি তারা সেটা না মানতে চায় তখন তাদের ওপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার সামর্থ্য।' শক্তির বহিঃপ্রকাশ প্রধানত সামরিক ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হলেও বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষমতা (Economic Power) ও রাষ্ট্রের সার্বিক শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, তার মূলমন্ত্র হলো শক্তি। বস্তুত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জাতির অবস্থান কোথায় হবে এবং বিশ্বব্যবস্থায় তার ভূমিকা ও গুরুত্ব কি হবে তা সবই ঐ জাতীয় শক্তি কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক Hans J. Morgenthau বলেন– 'The struggle for power is universal in time and space and is an undeniable fact of experience' অর্থাৎ 'শক্তির লড়াই সর্বজনীন স্থান, কাল নির্বিশেষে অভিজ্ঞতার আলোকে অনস্বীকার্য একটি ঘটনা।'

জাতীয় শক্তি (National Power)

কোনো দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা সুসংহতকরণে জাতীয় শক্তি মুখ্য নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিক অর্থে শক্তি (Power) ব্যতীত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কোনো রাষ্ট্রই তার অনুসৃত নীতিকে বাস্তবায়িত করতে পারে না। অতএব, জাতীয় শক্তি হলো কোনো জাতির সামগ্রিক শক্তি কাঠমো, যা সে জাতি তার পররাষ্ট্রনীতির সফল প্রয়োগ ও উদ্দেশ্যাবলীর যথাযথ বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে পারে।

অধ্যাপক Charles O. Lerce Jr.-এর ভাষায়, 'National power is the capacity of state to exert coercive influence upon other states and to resist such influence exerted by other states upon it.' অর্থাৎ 'জাতীয় শক্তি হলো কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতা, যার সাহায্যে সে অপর রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং নিজের ওপর অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারকে প্রতিহত করতে পারে।' (তথ্যসূত্র : Principles of International Politics' 1956 : 61)

অধ্যাপক Norman J. Padelford ও George A. Lincoln এর মতে– 'National Power may be defined as the sum total of the strength and capabilities of a state harnessed and applied to the advancement of its national interests and the attainment of its national objectives.' অর্থাৎ 'জাতীয় শক্তি হলো জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন ও তার উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক শক্তি ও সামর্থ্যের যোগফল।' (International Politics, 1954 : 193)

অতএব, জাতীয় শক্তি হলো কোনো জাতির সামগ্রিক ক্ষমতা বা সর্বগ্রাসী জাতীয় সামর্থ্য যা বিশেষভাবে অন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্র বা জাতির আচরণ ও কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

জাতীয় শক্তি কাঠামো

কোনো দেশের জাতীয় শক্তির গঠনকাঠামো তার বিশেষ বিশেষ কৌশলগত অবস্থান দ্বারা গড়ে ওঠে–

১. ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থান,
২. সমরকৌশল ও সামরিক দক্ষতা,
৩. শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক অবস্থান,
৪. রাজনৈতিক সংহতির উন্নয়ন ও
৫. জাতীয় মৌলিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ জনমত।

বস্তুত জাতীয় শক্তিকে অনুধাবন করতে হলে এর কাঠামোগত প্রত্যয় ও উপাদানসমূহের ভিত্তি জানা অপরিহার্য।

জাতীয় শক্তির উপাদান

জাতীয় শক্তি মূলত অনেকগুলো উপাদানের সমষ্টি। যেগুলোর মধ্যে কতকগুলো তুলনামূলকভাবে স্থায়ী, আর বাকিগুলো অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী অর্থাৎ যেগুলো প্রায়শই পরিবর্তনশীল। জাতীয় শক্তি গঠনে ঐসব উপাদান মুখ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

জাতীয় শক্তির স্থায়ী উপাদান : জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে তুলনামূলক স্থায়ী উপাদানগুলো নিচে আলোচিত হলো :

১. **ভৌগোলিক অবস্থান :** জাতীয় শক্তি নির্ধারণে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব সর্বাধিক। Morgenthau যথার্থই বলেছেন– 'The most stable factor upon which the power of a nation depends is obviously geography' (১৯৬৯ : ১০৬)। সে হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'গতিশীল ভূগোল' বেশ গুরুত্ব বহন করে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে কোনো দেশের আয়তন, আকৃতি, ভূ-প্রকৃতি, জলসীমা, সমুদ্রসীমা, জলবায়ু ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. **প্রাকৃতিক সম্পদ :** কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে প্রাচুর্য না থাকলে তার পক্ষে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। খাদ্য ও কাঁচামালের প্রাচুর্যই পারে জাতীয় শক্তিকে সুদৃঢ়

করতে। বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিটি দেশের জন্যই খাদ্য নিরাপত্তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না বলেই বাংলাদেশের মতো দেশগুলো বিশ্বে অনেকটা দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির পরিচায়ক হিসেবে প্রতীয়মান। কারণ খাদ্য আমদানি করতে গিয়ে অনেক সময় সরকারকে এমন সব নীতি গ্রহণ করতে হয় প্রকৃতপক্ষে যেগুলো মোটেই অনুকূল নয়, যা শক্তি ক্ষুণ্ন করে থাকে। অন্যদিকে প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য খনিজ সম্পদসহ বিভিন্ন কাঁচামালের গুরুত্বও অত্যধিক। তাই বলা যায়, সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য যেমন খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের দরকার, তেমনি যুদ্ধের সময়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩. **শিল্প সামর্থ্য :** শিল্পের উন্নয়ন ও উন্নত শিল্প অবকাঠামোই পারে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে, যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। বর্তমান বিশ্বের সকল শিল্পোন্নত দেশই বিশ্বব্যবস্থায় সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

৪. **সামরিক প্রস্তুতি :** একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীই একটি দেশের জাতীয় শক্তির মূল প্রতিবিম্ব। কোনো দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ়করণে সুপ্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনীকে জাতীয় শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৫. **জনসংখ্যা :** জাতীয় শক্তি নির্ধারণে জনসংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী উপাদান। আর এ জনসংখ্যাকে অবশ্যই 'Optimum Population' বা 'কাম্য জনসংখ্যা' হতে হবে। জনগণের সার্বিক জীবনমান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতার সম্মিলন, উৎপাদন ক্ষমতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও অপেক্ষাকৃত তরুণ জনসমষ্টি জাতীয় শক্তির বিকাশ ঘটায়।

জাতীয় শক্তির অস্থায়ী উপাদান : এছাড়া জাতীয় শক্তির অস্থায়ী উপাদানসমূহের মধ্যে জাতীয় চরিত্র ও মনোবল (National character and Morale), সরকারের দক্ষতা (Quality of Government) এবং কূটনৈতিক নৈপুণ্য (Quality of Diplomacy) বেশ উল্লেখযোগ্য। কেননা উন্নত জাতীয় চরিত্র ও দৃঢ় মনোবলের কারণেই জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও এশিয়ার সর্বোন্নত দেশ ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো দেশের জনগণের জাতীয় মনোবল ঐ দেশের সরকারের দক্ষতার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অধ্যাপক Morgenthau বলেন– "The quality of government is patently a source of strength or weakness with respect to most of the factors upon which national power depends, especially in view of the influence the government exerts upon natural resources, industrial capacity and military preparedness."

অন্যদিকে, কূটনৈতিক নৈপুণ্য একটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে উচ্চমর্যাদা ও উচ্চস্থান দান করতে পারে। তাই তো Morgenthau যথার্থই বলেছেন–

'Of all the factors that make for the power of a nation, the most important, however unstable, is the quality of diplomacy.'

অন্যত্র Morgenthau কূটনীতির দক্ষতা ও নৈপুণ্যকে জাতীয় শক্তির মস্তিষ্ক বলে উল্লেখ করেন, 'Diplomacy, one might say, is the brain of national power, as national morale is its soul.' (Morgenthau, 1969, 135)

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাণিজ্য উদারীকরণের বর্তমান সময়ে 'Economic Diplomacy' বা অর্থনৈতিক কূটনীতি বিশ্বের প্রায় সকল দেশেরই পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি এমন এক শক্তি, যা সুদূর অতীতকাল থেকেই মানবসমাজ ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। প্রখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কস (Karl Marx) ও তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদের (Historical Materialism) এর আলোচনায় অর্থনীতিকে সমাজের 'মৌল কাঠামো' বা 'Basic structure' বলে অভিহিত করেছেন। তাই বলা যায়, 'অর্থনীতির ভিত্তি' জাতীয় শক্তির স্বরূপ উন্মোচন ও জাতীয় শক্তির সামগ্রিক বিকাশে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যয় হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।

অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড ও লিংকন তাদের International Politics গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

'The economic life of a state is primarily conditioned by its possession or lack thereof, of natural resources.' অর্থাৎ– একটি দেশের অর্থনৈতিক জীবন তার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখল অথবা অভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। (International Politics 1954 : 29)

অর্থনৈতিক শক্তির বেশ কিছু নিয়ামক রয়েছে। যেগুলো নিম্নরূপ :

ক. **সামগ্রিক সম্পদ কাঠামো ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা :** অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) এর 'Science of wealth' বা 'সম্পদের বিজ্ঞান' হলো সার্বিক অর্থব্যবস্থা। এ সম্পদ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট সকল দ্রব্য ও সেবার সমন্বয়ে গঠিত যা মানবসভ্যতার গঠন ও বিকাশে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এ সম্পদ কাঠামোর চারটি ক্ষেত্র রয়েছে। যথা –

১. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা,
২. সম্পদের মালিকানা,
৩. সম্পদের ব্যবহার ও উন্নয়ন,
৪. সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রবৃদ্ধি।

খ. **শিল্প সামর্থ্য :** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যেসব দেশ শিল্পোন্নত, বাস্তবিক অর্থে সেসব দেশ বা জাতি অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি উন্নত। উন্নত শিল্পব্যবস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই থাকতে হবে–

১. উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন সম্পর্কের সার্বিক উন্নয়ন;
২. প্রকৌশল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
৩. শিল্পের গুণগত মান ও উন্নয়ন;
৪. ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় দক্ষতা; এবং
৫. সঠিক নীতিপরিকল্পনা ও শিল্প সম্পদের প্রসার।

একটি উন্নত অর্থব্যবস্থার দ্বারাই জাতীয় শক্তি কাঠামোর প্রবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব, আর সেজন্য শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যাপক Morgentheau বলেন, 'The technology of modern warfare and communications has made the over-all development of heavy industries an indispensable element of national power.'

গ. **বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থান :** অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো বৈদেশিক বাণিজ্যের সার্বিক প্রসারণ ও ভারসাম্য অনুকূলে রাখা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজের অবস্থান সুদৃঢ়করণের মাধ্যমেই শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত গড়ার মাধ্যমে জাতীয় শক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

ঘ. **বিনিয়োগ (Investment) :** বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করার জন্য দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ অপরিহার্য। এজন্য বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্য সারাবিশ্বে পররাষ্ট্রনীতি তথা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র এককভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। বিশেষত, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ, সর্বোচ্চ জাতীয় শক্তির সুসমন্বয়, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা, কমিউনিজমের বিলোপ ও স্নায়ুযুদ্ধে ব্যাপক বিজয় লাভ তথা নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনো দেশের বিরুদ্ধে অবাধ আগ্রাসন চালাতে পেরেছে। আর এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে শুধু উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক পরাশক্তির অধিকারী বলেই। এক মেরু বিশ্বের একমাত্র একাধিপতি আজ যুক্তরাষ্ট্রই।

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সামরিক শক্তির গুরুত্ব

কোনো রাষ্ট্র কতটুকু শক্তিশালী এবং তার জাতীয় শক্তির গতি-প্রকৃতি ঐ দেশের সামরিক ক্ষমতার ওপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। স্পাইকম্যান উল্লেখ করেন যে সর্বশেষ বিচারে যুদ্ধ করার সামর্থ্যের মধ্যে একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি জাতির ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প সামর্থ্য প্রভৃতি উপাদান বাস্তবিকভাবে যার মাধ্যমে তার জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে, তা হলো তার উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি (Military preparedness)। বস্তুত জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি এতটাই সুস্পষ্ট যে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন হয় না। অধ্যাপক Lerche (লার্চ) তাই যথার্থই বলেছেন, "The most obvious and immediately available manifestation of national power is military power." অর্থাৎ "জাতীয় শক্তির অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুসংহত অভিব্যক্তিই হলো সামরিক শক্তি।"

অধ্যাপক Morgenthau বলেন, "Military preparedness requires a military establishment capable of supporting the foreign policies pursued." অর্থাৎ "সামরিক প্রস্তুতির জন্য দরকার এমন একটি সামরিক সংগঠন যা পররাষ্ট্রনীতিকে সহায়তা করতে সক্ষম।"

কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সামরিক শক্তি যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে, তা হলো–

১. **প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) :** বর্তমান এ নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে একটি জাতির ভাগ্য প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল এবং এক্ষেত্রে দুর্বলতাসমূহ অন্যকিছু দ্বারা পূরণ করা একেবারেই অসম্ভব। উপনিবেশবাদের (Colonialism) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় ষোড়শ শতকে যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার মূলে ছিল ইউরোপীয়দের উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার কার্যকরী ব্যবহার। বিগত শতাব্দীতে আমরা প্রযুক্তিবিদ্যার চরম ব্যবহার দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, যা জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে।

সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নের জন্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এছাড়াও উন্নতমানের আধুনিক সমরাস্ত্র যুদ্ধ ব্যতিরেকে শুধু ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম। তাই রাসেল ওয়ারেন হো (Russell Warren Howe) তার ,'WEAPONS' নামক গ্রন্থে বলেন–'In our era, the major weapons systems have become a feature more politics, economics and diplomacy than of the battlefield.' অর্থাৎ 'আমাদের যুগে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র পদ্ধতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতিতে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।'

২. **নেতৃত্ব (Leadership) :** সামরিক কৌশল ও নেতৃত্বের মান যে-কোনো জাতির শক্তি নির্ধারণে অন্যতম বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। সামরিকভাবে দক্ষ ও কুশলী ব্যক্তিগণ যুদ্ধ পরিকল্পনায় ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবধারা ও Tactics প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারেন। এভাবে সামরিক নেতৃত্ব জাতীয় শক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

৩. **সশস্ত্র সৈন্যসংখ্যা ও সামরিক দক্ষতা (Quantity and quality of armed forces) :** সামরিক দিক থেকে দেখতে গেলে একটি জাতির শক্তি প্রধানত নির্ভর করে সৈন্য ও অস্ত্রের পরিমাণ এবং তাদের বিভিন্ন শাখায় সুষ্ঠু ও কার্যকরী বণ্টনের ওপর। একটি দেশের কার্যকরী সামরিক শক্তির জন্য সশস্ত্র বাহিনীর মোট সংখ্যা ও তাদের দক্ষতা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থা ও অন্যান্য সামরিক সুযোগসুবিধা বুঝে সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন শাখায় এমনভাবে সংগঠিত করা উচিত, যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা এমন এক নতুন বিশ্বব্যবস্থায় উপনীত হয়েছি যেখানে সকল রাষ্ট্রের স্বার্থ ও তার নিরাপত্তা বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একমাত্র হাতিয়ার হলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করে সামরিক ভিত সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে জাতীয় শক্তি কাঠামো শক্তিশালী ও অর্থবহ করে তোলা।

১০। জাতীয় শক্তির পরিমাপ ও মূল্যায়নপূর্বক এ প্রসঙ্গে জাতীয় শক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করুন।

উত্তর : জাতীয় শক্তি

'জাতীয় শক্তি'-এর ইংরেজি পরিভাষা হলো 'National Power'। ক্ষমতা বা Power বলতে যেহেতু অন্যকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যকে বোঝায় সেহেতু 'National power' হলো অন্য রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের পণ্ডিতগণ এ জাতীয় শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক লার্চ বলেন, 'National power is the capacity of a state to exert coercive influence upon other states and to resist such influence exerted by other states upon it.' অর্থাৎ, জাতীয় শক্তির অর্থ হলো এক বা একাধিক রাষ্ট্রের উপর একটি রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা এবং নিজের উপর অন্য রাষ্ট্রের অনুরূপ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করার সামর্থ্য। কিন্তু অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড মনে করেন, 'National power may be defined as the sum total of the strength and capabilities a state harnessed and applied to the advancement of its national interest and the attainment of its national activities.' অর্থাৎ, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সব ধরনের ক্ষমতার যোগফলকে জাতীয় শক্তি বলে অভিহিত করা যায়।

অনেক তাত্ত্বিক আবার জাতীয় শক্তিকে বৈদেশিক নীতির সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক পামার এবং পারকিন্স লিখেছেন, 'শক্তি বলতে এমন এক উপায়কে বোঝায়, যার দ্বারা একটি রাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র এবং বৈদেশিক নীতিকে কাজে প্রয়োগ করে।'

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় শক্তি হলো জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন ও তার উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য একটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থ্যের যোগফল আর এ যোগফলই আন্তর্জাতিকভাবে একটি রাষ্ট্রের সম্মান, মর্যাদা ও অস্তিত্বের ভিত্তি।

জাতীয় শক্তির পরিমাপ ও মূল্যায়ন (Measurement and Evaluation of National Power)

কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি পরিমাপ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তথাপি শক্তির পরিমাপ বর্তমান সময়ে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কোনো একটি রাষ্ট্রকে তার পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তির তুলনামূলক বিচার করা প্রয়োজন। ফ্রাংকেলের ভাষায়, শক্তি হলো একটা Relational Concept। তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছাড়া শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না। তুলনা করার প্রসঙ্গে পরিমাপ করার প্রশ্ন দেখা দেয়।

রাষ্ট্রের শক্তি সম্পর্কে ধারণা করার একটা উপায় হলো যুদ্ধ। কোনো রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি যুদ্ধের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। যুদ্ধে জয়ী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী এবং পরাজিত রাষ্ট্রকে দুর্বল রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে যুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় শক্তি নির্ণয়ের বিষয়কে সবাই সমর্থন করেন না। কারণ সব রাষ্ট্র সব সময় যুদ্ধ করে না। যেমন বিগত একশতাব্দীকাল সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড কোনো প্রকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। এর অর্থ এই নয় যে, এ রাষ্ট্র দুটি শক্তিহীন বা দুর্বল রাষ্ট্র। তাছাড়া যুদ্ধ কখনও দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত হয় না। একাধিক রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র কতখানি শক্তিধর তা বোঝার উপায় নেই।

স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় জাতীয় শক্তির পরিমাপ করা যায় কিন্তু পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে অপরিবর্তনশীল মাপকাঠী দিয়ে শক্তির পরিমাপ করা অবাস্তব ব্যাপার। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শতত পরিবর্তনশীল। অতীতে জাতীয় শক্তি বিচার করা হতো ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে। বর্তমানে জাতীয় শক্তির এসব উপাদান বিদ্যমান থাকলেও পারমাণবিক অস্ত্র, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য কৌশল অতীতের ঐতিহ্যবাহী পরিমাপকসমূহকে গুরুত্বহীন করে ফেলেছে। আজ যে রাষ্ট্রকে ক্ষমতাবান বলে মনে হয়, কিছুদিন পর সে রাষ্ট্রকে ক্ষমতাবান বলে নাও মনে হতে পারে। অথচ তার পূর্ব ক্ষমতাতো হ্রাস পায়নি– বরং বেড়েছে বলা চলে।

কোনো রাষ্ট্র কতখানি পারমাণবিক অস্ত্র, যুদ্ধ জাহাজ ও সরঞ্জাম, সৈন্য, বোমারু বিমান প্রভৃতির মালিক, সে বিচারে তার শক্তি নির্ণয় করা যায় না। কারণ সাম্প্রতিক বিশ্বে এসব সমরাস্ত্র ইচ্ছামতো প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই।

জাতীয় শক্তির পরিমাপ আলোচনা প্রসঙ্গে Deutsch-এর অভিমত উল্লেখ করা যায়। তার মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জোট তৈরির প্রবণতা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র এবং বহু বৃহৎ রাষ্ট্রও একা একা থাকতে চায় না। সম্ভাব্য আগ্রাসন মোকাবিলা করার জন্য তারা জোট তৈরি করেছে। একটি জোটের অন্তর্গত সমস্ত রাষ্ট্রের শক্তি একত্রিত হওয়ার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়– যা জোটের বাইরে থাকলে সম্ভব হতো না। যেমন ন্যাটো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর নেতা। ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলো সমন্বিত হওয়ায় তাদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় শক্তির উপাদান নির্ণয় করা সহজ নয়। কিন্তু এর মূল্যায়ন করা আরো কঠিন ব্যাপার। জাতীয় শক্তি নির্ণয়ের বহুবিধ উপাদানের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিয়ে তাকে অন্য উপাদানগুলোর তুলনায় বেশি মূল্যবান বলে অভিহিত করা যায় না। জাতীয় শক্তি উৎপাদনে কোন উপাদান বেশি মূল্যবান তা স্থান-কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অতীতে কয়লা উৎপাদনকারী রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিক সমৃদ্ধশালী থাকার ফলে ঐসব রাষ্ট্র শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হতো। পরবর্তীতে তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোকে শক্তির আধার হিসেবে নিরূপণ করা হতো। বর্তমান পারমাণবিক যুগে

ইউরেনিয়াম অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে এসব মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর অধিকারী রাষ্ট্রগুলোই শক্তিধর হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। এসব সামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য যথোপোযুক্ত বিজ্ঞান প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগকারী রাষ্ট্রসমূহই বর্তমানে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিত।

রাষ্ট্রীয় জীবনে শক্তি অপরিহার্য উপাদান। শক্তিহীন জাতি মর্যাদাহীন ও গুরুত্বহীন জাতিতে পরিণত হয়। বর্তমানে প্রতিটি জাতিই জাতীয় শক্তির ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছে। জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে কোনোটিকেই অবমূল্যায়ন করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রনায়কগণ জাতীয় শক্তির প্রাথমিক উপাদান ও তাদের পারস্পরিক গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। জাতীয় শক্তি অর্জনের নিমিত্তেই আজ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হলো প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ জাতীয় শক্তি।

জাতীয় শক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা (National Power and National Security)

বর্তমান বিশ্বে যে রাষ্ট্র বা জাতি যত শক্তিশালী, সে রাষ্ট্র তত বেশি নিরাপদ। রাষ্ট্রের শক্তির সাথে বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জড়িত থাকে। এ উপাদানগুলোকে সমন্বিতভাবে 'সামর্থ্য' (Capability) বলা যায়। কিন্তু শক্তি কোনো সংখ্যাগত ধারণা নয়। কোনো রাষ্ট্রের শক্তি অর্থাৎ জাতীয় শক্তি তার কাজকর্মের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শক্তিকে সামর্থ্যের মাপকাঠি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায়।

জাতীয় শক্তি বলতে কেবল অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রাকৃতিক সম্পদ বা জনবলকেই বোঝায় না। অনেক উপাদানের সমন্বয়েই জাতীয় শক্তির প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা যায়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো উপাদান জাতীয় শক্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে পারে। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে আণবিক মারণাস্ত্রের শক্তি প্রাধান্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকেই জাতীয় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এ কারণেই এসব রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্র অপেক্ষা জাতীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশি নিরাপত্তা ভোগ করে থাকে।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে জনসংখ্যাকেই জাতীয় শক্তির উৎস রূপে গণ্য করা হতো। কারণ যে দেশের জনসংখ্যা যত বেশি, তাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যাও তত বেশি এবং সেনাবাহিনীর সংখ্যার ভিত্তিতেই কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তিকে পরিমাপ করা হয়। এক সময় পদাতিকবাহিনীকেই সামরিক শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আগ্রাসন থেকে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা সেনাবাহিনীর ওপর অর্পিত প্রধান দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার ধারক-বাহক হিসেবে সেনাবাহিনী জাতীয় শক্তির প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত হতো।

বর্তমান সময়ে অনেকে মনে করেন, জাতীয় শক্তির প্রধান উৎস হলো অর্থনৈতিক উপাদান। কারণ সামরিক প্রযুক্তি, সেনাবাহিনী, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার সবকিছুই অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।

আন্তর্জাতিক সমাজে কোনো রাষ্ট্রের ভূমিকা নির্ধারিত হয় সে রাষ্ট্রের নিজস্ব বা জাতীয় শক্তি দ্বারা। বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভূমিকা পালন করেছে, সে ভূমিকা ব্রিটেন ও ফ্রান্স পালন করেনি। বিশ্বরাজনীতিতে ভূমিকা পালন করার প্রধান উৎস সে রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি। নৈতিকতা, সততা বা জাতীয়তাবোধহীন দরিদ্র ও শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলো বিশ্বরাজনীতিতে কোনো প্রকার ভূমিকা পালনে অসমর্থ। যেমন— নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ বা অন্যান্য ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভূমিকাহীন। এসব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যে কোনো সময় আগ্রাসন চালালে তা প্রতিহত করার মতো জাতীয় শক্তি এসব রাষ্ট্র প্রদর্শন করতে সমর্থ হয় না।

শক্তি সম্পর্কে মর্গেনথ্যু-এর সংজ্ঞা সর্বজন সমর্থিত। তিনি বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির কাজকর্ম, আচরণ ও মনের ওপর অন্য কোনো ব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে তবে সে ব্যক্তিকে শক্তিধর বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের আচরণকে প্রভাবিত করে তখন তাকে শক্তি বলা যায়।

ই. এইচ. কার (Edward Halle Carr) জাতীয় শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) সামরিক শক্তি (খ) অর্থনৈতিক শক্তি এবং (গ) জনমতের ওপর শক্তি।

জাতীয় শক্তি প্রকাশ করা অথবা একটা পরাক্রমশালী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শেষ অস্ত্র বা উপায় হলো যুদ্ধ।

বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রই সামরিক শক্তিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেবলমাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যেই অতীতে বহু রাষ্ট্র ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিককালেও সামরিক ক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের স্তর বিন্যাস করা হয়। সামরিক দিক থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই রাষ্ট্র অনেক সময় ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অতীতে এবং বর্তমানেও বহু রাষ্ট্রে সামরিক শক্তিকেই তাদের জাতীয় শক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান উপাদান বলে মনে করে। পামার এবং পারকিনসন বলেছেন– National power is in the final analysis of Military Power.

আধুনিক যুগে কোনো রাষ্ট্র সামরিক বা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দিক থেকে শক্তিশালী হতে না পারলে, সে যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, তেমনি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সমরোপকরণে দুর্বল হলে রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতার দিক থেকে সে দেশ দুর্বল হতে বাধ্য। আধুনিক আণবিক বোমা আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য আক্রমণাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্রের ওপরেই কোনো কোনো দেশের সামরিক শক্তির প্রকৃতি নির্ভরশীল। জাতীয় শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রসমূহই নিজ নিজ জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তির সাথে সামরিক শক্তিও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বর্তমানে সবচেয়ে সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলোই জাতীয় শক্তিতে মহাশক্তিধর বিধায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনেও এরা একচ্ছত্র। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীতে আবদ্ধ রেখে এ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো বিশ্বে নব্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। এক্ষেত্রে জাতীয় শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রেও পরনির্ভরশীল হয়ে আছে। এসব রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালী দাতা রাষ্ট্রসমূহের আনুকূল্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সম্পদ বা প্রাচুর্য্য থাকার ফলে শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো অনায়াসে যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বিধায় ধনী রাষ্ট্রগুলো সামরিক শক্তিতেও শ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠত্ব তাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শক্তিকে একটা উপায় (Means) হিসেবে মনে করেন। অন্যের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার উপায় হলো শক্তি। অন্যের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন— প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি বা ভাবমূর্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি। শক্তিকে এসব লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শান্তি, নিরাপত্তা বা জাতীয় প্রগতি অর্জনের নিমিত্তে শক্তি প্রয়োগের কথা অনেকে বলে থাকেন। সব ক্ষেত্রেই শক্তি একটা উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বাস্তব রাজনীতির প্রবক্তাগণ শক্তিকে উপায় এবং উদ্দেশ্য দু'টি অর্থেই ব্যবহার করতে চান। তাদের মতে, রাষ্ট্র শক্তিধর না হতে পারলে, জাতীয় প্রগতি বা স্থায়ী শান্তি বা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রতিটি

রাষ্ট্রের লক্ষ্যই হলো নিজের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখা, শক্তি ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। সুতরাং প্রতিটি রাষ্ট্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য হলো শক্তি অর্জন করা। শক্তির সাথে নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শক্তি কোনো স্থিতিশীল বিষয় নয়। শক্তি একটা উদ্দেশ্য বা উপায় হিসেবে বিবেচিত হলেও পরিবর্তনের সাথে সাথে একে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হয়। কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা রাষ্ট্র যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করল সে শক্তি সেই সময়ের জন্য তার নিরাপত্তার প্রয়োজনে যথেষ্ট মনে হতে পারে। কিন্তু সে পরিমাণ শক্তিই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। সুতরাং নিরাপত্তা বা শক্তি বা জাতীয় প্রগতি– যদি সেই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয়, তবে তাকে আরো অধিক পরিমাণ শক্তি অর্জন করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি ও নিরাপত্তা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রই জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় শক্তি ব্যতীত জাতীয় নিরাপত্তা অলীক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১১। ক. শক্তিসাম্য তত্ত্ব আলোচনা করুন।
খ. শক্তিসাম্য রক্ষার কৌশল বা পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : 'শক্তিসাম্য' বা 'Balance of Power' ধারণাটি অতিপ্রাচীন হলেও আধুনিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকদের আলোচনায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর চিন্তায় বিকশিত এ শক্তি সাম্যের ধারণাটি অধ্যাপক পামার ও পারকিন্সের ভাষায় বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি প্রধান নীতি হিসেবে এর গুরুত্ব বজায় রেখেছে। একইভাবে, অধ্যাপক Morgenthau বলেন, 'The balance of power and policies aiming at its preservation are not only inevitable but are an essential stabilizing factor in a society of sovereign nations.' অর্থাৎ শক্তিসাম্য এবং এটা রক্ষা করার জন্য গৃহীত নীতিসমূহ শুধু অনিবার্য নয়, এটা সার্বভৌম জাতি সমবায়ে গঠিত সমাজের স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য অত্যাবশ্যক উপাদান। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় শক্তিসাম্য তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

শক্তিসাম্য

শক্তিসাম্যের ধারণাটি অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রচলিত হওয়ায় বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন সময় ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে 'শক্তিসাম্য'কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্য Inis L. Claude লিখেছেন, 'The trouble with the balance of power is not that it has no meaning, but that it has too many meanings.' অর্থাৎ শক্তি সাম্যের বিষয়ে সমস্যা এই নয় যে, এর কোনো অর্থ নেই বরং, প্রধান সমস্যা হলো এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। যা হোক, শক্তিসাম্য সম্পর্কে গবেষণা থেমে নেই। অধ্যাপক সিডনি বি. ফে (Sidney B. Fay) 'Encyclopedia of the Social Science'-এ লিখিত তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধে শক্তি সাম্যের ধারণা প্রদান করে বলেছেন, 'It (balance of power) means such a just equilibrium in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becaming sufficiently strong to enforce its will upon the other.' অর্থাৎ শক্তিসাম্য হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা, যা যে কোনো একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হবে যাতে সে অপরের উপর তার ইচ্ছাকে জোর

করে চাপিয়ে দিতে না পারে। অন্যদিকে কুইন্সি রাইট (Quincy Wright) বলেছেন, 'যে কোনো রাষ্ট্র যদি আগ্রাসক হওয়ার বাসনা পোষণ করে তাহলে তাকে প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে এ প্রত্যয় গড়ে উঠার অপর নাম শক্তি সাম্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার আগ্রাসন অন্য রাষ্ট্র অবশ্যই প্রতিহত করবে। আর আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য জোটগতভাবে যে শক্তি তৈরি হয় তাই শক্তিসাম্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কুইন্সি রাইট আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিসাম্য তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। একইভাবে হার্টম্যান (Hartmann)ও রাইটকে সমর্থন করেছেন এবং তাদের উভয়ের মতেই সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য তৈরি হওয়াই শক্তির ভারসাম্যের প্রধান লক্ষ্য। তাই হার্টম্যান (Hartmann) লিখেছেন, 'The balance of power is the product of rival alliance blocs and their relative strength in terms of one another. It is only to the potential aggresses that it is an arrangement for the frustration of aggression.'

কিন্তু প্রখ্যাত তাত্ত্বিক বার্টন (Burton) শক্তিসাম্য বা শক্তির ভারসাম্যকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশুদ্ধ (Pure) এবং তাত্ত্বিক (theoretical) এ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিসাম্য তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তার মতে ভারসাম্য অবস্থার সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণই হলো বিশুদ্ধ অবস্থায় শক্তিসাম্য। অন্যদিকে তত্ত্বগতভাবে, শক্তিসাম্য হলো একটি ব্যবস্থার নাম, যে ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। বার্টনের ভাষায়– 'In its pure form the balance of power means the maintenance of an equilibrium so that no state or states can without good cause be an aggressor.'

কেউ কেউ শক্তিসাম্যকে ভারসাম্য না বলে 'ভারসাম্য অর্জনের প্রবণতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এদের মধ্যে ফ্রাঙ্কেল অন্যতম এবং তার মতে 'It is a tendency towards equilibrium'.

কিন্তু আই. এল. ক্লাউড (I. L. Claude) শক্তি সাম্যকে একটি নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে ভারসাম্য তৈরি করা বা রক্ষা করার নীতিকে শক্তিসাম্য বলা হয়।

Hans J. Morgenthau শক্তিসাম্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার মতে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শক্তিসাম্য পরিভাষাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি 'Balance of power' এবং 'Equilibrium of power'-কে মোটামুটি একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। তার মতে স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিসমূহকে নিয়ে গড়ে উঠা ব্যবস্থার মধ্যে স্থিতিশীলতার নাম হলো শক্তিসাম্য। মর্গেনথ্যু শক্তিসাম্য কথাটির চারটি ভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। যথা :

১. ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট স্তর বা অবস্থা অর্জন করার জন্য এটা একটা নীতি;
২. এটি ক্রিয়াকলাপের একটি বাস্তব অবস্থা;
৩. এটি হলো শক্তির প্রায় সমবন্টন অথবা;
৪. এটা হলো শক্তির যে কোনো রকম বণ্টন।

সুতরাং সোজা কথায় শক্তিসাম্যের মূলকথা হলো 'সাম্যাবস্থা'। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্য হলো স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এমন এক ধরনের সাম্যাবস্থা, যেখানে কোনো একক শক্তি বা শক্তির সমবায়ের এমন ক্ষমতা থাকবে না, যার ফলে অন্যদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়।

শক্তিসাম্য তত্ত্ব

শক্তিসাম্য তত্ত্বে নির্দিষ্ট সাম্যাবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় আচরণের মধ্যে সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তির সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করা, যার ফলে কোনো রাষ্ট্র বা জোট অন্য কোনো রাষ্ট্র বা জোটের জন্য হুমকিস্বরূপ হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শক্তিসাম্য তত্ত্বে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলা হয়।

শক্তিসাম্য তত্ত্বটি তিনটি অনুমিত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেগুলো হলো :

১. প্রথম অনুমিত সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তির সমতা থাকলে দুটি বিবদমান পক্ষের উভয়ের চিন্তা থাকে যে, তাদের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিজয় লাভে ইচ্ছুক কোনো একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বিজয় লাভ করতে চায়। দিনা জিনেসের গবেষণায়ও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। তিনি তার গবেষণার উপসংহারে বলেন, 'A state will not go to war if it percieves its power as significantly less than that of the enemy at the time that such a decision must be made.'
২. দ্বিতীয় অনুমিত সিদ্ধান্তে দেখা যায়, যদি দুটি রাষ্ট্র বা মৈত্রী জোটের শক্তি সমান হয় এবং তারা পরস্পরের সম্মুখীন হয় তাহলে উভয়ের পরাজয়ের সম্ভাবনাও সমান। তাই এ অবস্থা উভয়কেই আগ্রাসনমূলক কার্যাবলী থেকে বিরত রাখবে।
৩. তৃতীয় অনুমিত সিদ্ধান্তটি উপরিউক্ত পরস্পর বিরোধী অনুমিত সিদ্ধান্ত দুটি থেকে বিকাশ লাভ করেছে। আর তা হলো সমশক্তিসম্পন্ন দুটি রাষ্ট্র বা মৈত্রীজোটের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কম এবং কখনো দ্বন্দ্ব হলেও তা অত্যন্ত নিচু পর্যায়ের হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ক' যদি তার শক্তি বৃদ্ধি করে তাহলে অনুরূপ 'খ'ও 'ক'-এর মতো শক্তি অর্জন করতে চাইবে। আর এ ক্ষেত্রে 'খ' যদি একাকী ব্যর্থ হয় তাহলে সে 'গ', 'ঘ' এবং 'ঙ'-এর সাহায্য গ্রহণ করবে এবং এভাবে সে 'ক'-এর ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টা করে। তাই কোনো রাষ্ট্র বা জাতির শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টাকে বাধা প্রদান করলে এক ধরনের সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ শক্তির সাম্যাবস্থা দু'ধরনের— একক শক্তিসাম্য এবং বহুমুখী শক্তিসাম্য।

যাহোক, শক্তিসাম্য শক্তির ভারসাম্য অবস্থাকেই নির্দেশ করে এবং এ অবস্থা অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশল

অধিকাংশ তাত্ত্বিকই মনে করেন বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শক্তির ভারসাম্য আবশ্যক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞগণ শক্তির ভারসাম্য অর্জনের নিম্নোক্ত কৌশলগুলোর কথা বলেছেন :

১. বিভাজন ও শাসন : বিভাজন ও শাসননীতি শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি প্রাচীন নীতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে এ নীতির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ফরাসিরা জার্মানদেরকে দুর্বল করার জন্য এ নীতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে। একইভাবে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের বিরোধিতায় রাশিয়ার উৎসাহ একই নীতির বহিঃপ্রকাশ। যাহোক, এ নীতির মূলকথা হলো কোনো রাষ্ট্র বা জোট অধিক শক্তিশালী হলে তার প্রতিপক্ষ বন্ধুরাষ্ট্র অথবা জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে ঐ অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রটি থেকে দূরে সরিয়ে এনে অথবা বিচ্ছিন্ন করে সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টা নেয়া।
২. মৈত্রীজোট : মৈত্রীজোট শক্তিসাম্য বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। অধ্যাপক Morgenthau-এর মতে 'Alliances are a necessary function of the balance of power operating within a multistate system.'

যাহোক, মৈত্রীজোট হলো শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য বা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব স্ব স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক দেশের সংঘবদ্ধ হওয়া। তবে অধিকাংশ সময়েই এ মৈত্রীজোটের স্থায়িত্ব খুবই সামান্য হয়।

৩. **অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ :** নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও অস্ত্রীকরণ শক্তিসাম্য বজায় রাখা কৌশল হিসেবে কাজ করে। সাধারণ কথায় অস্ত্রীকরণ হলো যে প্রধান উপায়গুলোর মাধ্যমে একটি জাতি তার নিজস্ব শক্তির দ্বারা শক্তিসাম্য রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্রীকরণের ভয়াবহতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সুশীলসমাজ আজ নিরস্ত্রীকরণের কথা বলছে।

৪. **ক্ষতিপূরণ :** অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল হিসেবে ক্ষতিপূরণ নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। এ নীতি অনুসারে একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্র জয়ের মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্যে যে প্রভাব ফেলে সে প্রভাব দূর করার জন্য তার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে সমান অপর একটি রাষ্ট্র অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দ্বারা দখলকৃত রাজ্যটির অংশবিশেষ জয়ের মাধ্যমে শক্তির সাম্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবে।

৫. **হস্তক্ষেপ :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দেখা যায়, কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে। আদি ডকটরের মতে, হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বন্ধুভাবাপন্ন সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। স্পেনের গৃহযুদ্ধের হস্তক্ষেপে এ ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

৬. **সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র :** সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র বা 'Buffer state'ও শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, বেলজিয়াম, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজমান শক্তির ভারসাম্য দীর্ঘদিন বিশ্বকে নিরাপদ রেখেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে এ ভারসাম্য অবস্থায় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার একক আধিপত্যে সমগ্র বিশ্ব দখল করে চলছে। তাই যে কোনো উপায়ে বর্তমানেও শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

০৩। ক. শক্তির সাম্য কি?
খ. শক্তিসাম্য ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : শক্তির সাম্য

শক্তিসাম্যের ধারণাটি অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রচলিত হওয়ায় বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন সময় ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে 'শক্তিসাম্য'কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্য Inis L. Claude লিখেছেন, 'The trouble with the balance of power is not that it has no meaning, but that it has too many meanings.' অর্থাৎ শক্তিসাম্যের বিষয়ে সমস্যা এই নয় যে, এর কোনো অর্থ নেই, বরং প্রধান সমস্যা হলো এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। যা হোক, শক্তিসাম্য সম্পর্কে গবেষণা থেমে নেই। অধ্যাপক সিডনি বি. ফে (Sidney B. Fay) 'Encyclopedia of the Social Science'-এ লিখিত তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধে শক্তিসাম্যের ধারণা প্রদান করে বলেছেন, 'It (Balance of power) means such a just equilibrium in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong to enforce its will upon the other.' অর্থাৎ শক্তিসাম্য হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা, যা যে কোনো একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হবে, যাতে সে অপরের ওপর তার ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে। অন্যদিকে কুইন্সি রাইট (Quincy wright) বলেছেন, 'যে কোনো রাষ্ট্র যদি আগ্রাসক হওয়ার বাসনা পোষণ করে তাহলে তাকে প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে এ প্রত্যয় গড়ে ওঠার অপর নাম শক্তিসাম্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার আগ্রাসন অন্য রাষ্ট্র অবশ্যই প্রতিহত করবে। আর আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য জোটগতভাবে যে শক্তি তৈরি হয় তাই শক্তিসাম্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কুইন্সি রাইট আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিসাম্য তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। একইভাবে হার্টম্যান (Hartmann)ও রাইটকে সমর্থন করেছেন এবং তাদের উভয়ের মতেই সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য তৈরি হওয়াই শক্তির ভারসাম্যের প্রধান লক্ষ্য। তাই হার্টম্যান (Hartmann) লিখেছেন, 'The balance of power is the product of rival alliance blocs and their relative strength in terms of one another. It is only to the potential aggresses that it is an arrangement for the frustration of aggression.'

কিন্তু প্রখ্যাত তাত্ত্বিক বার্টন (Burton) শক্তিসাম্য বা শক্তির ভারসাম্যকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশুদ্ধ (Pure) এবং তাত্ত্বিক (Theoretical) এ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিসাম্য তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তার মতে ভারসাম্য অবস্থার সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণই হলো বিশুদ্ধ অবস্থায় শক্তিসাম্য। অন্যদিকে তত্ত্বগতভাবে, শক্তিসাম্য হলো একটি ব্যবস্থার নাম, যে ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শক্তিকে ব্যবহার করা হয়। বার্টনের ভাষায়, 'In its pure form the balance of power means the maintenance of an equilibrium so that no state or states can without good cause be an aggressor.'

কেউ কেউ শক্তিসাম্যকে ভারসাম্য না বলে 'ভারসাম্য অর্জনের প্রবণতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এদের মধ্যে ফ্রাঙ্কেল অন্যতম এবং তার মতে 'It is a tendency towards equilibrium'.

কিন্তু আই. এল. ক্লাউড (I. L. Claude) শক্তিসাম্যকে একটি নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে ভারসাম্য তৈরি করা বা রক্ষা করার নীতিকে শক্তিসাম্য বলা হয়।

শক্তিসাম্যের প্রকৃতি

শক্তিসাম্যের প্রকৃতি নিয়ে মর্গেনথ্যু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'শক্তিসাম্য কথাটা পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও অর্থ মোটামুটি একরকম। সাম্য ও ভারসাম্যকে 'মর্গেনথ্যু একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। তার মতে, স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিসমূহকে নিয়ে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে স্থিতিশীলতার নাম হলো শক্তিসাম্য (It signifies stability within a system composed of a number of autonomous forces)। শক্তিসাম্য ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনো শক্তি যদি সামান্য বিনষ্ট করার জন্য উদ্যত হয় তাহলে সাম্যকে পুনরায় স্থাপনের জন্য অন্যান্য শক্তি সক্রিয় উদ্যোগ নেয়। অর্থাৎ শক্তিসমূহের মধ্যে অস্থিতিশীল অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না। স্থিতিশীলতা আনার জন্য সব রাষ্ট্রই উদগ্রীব। মর্গেনথ্যু বলেছেন, মানব শরীর থেকে আরম্ভ করে সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সর্বত্রই সাম্য বিরাজমান।

মর্গেনথ্যু মনে করেন, শক্তিসাম্য ছাড়া কোনো জাতীয় রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং নিজেদের বাঁচার তাগিদে রাষ্ট্রগুলো সাম্য অর্জনের জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যাবে। সাফল্য যে সবসময় আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু শক্তিসাম্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনার ব্যাপারে শক্তিসাম্য অত্যন্ত কার্যকর একটি উপাদান।

মর্গেনথ্যু আরও বলেছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির চত্বরে অনেক সময় শক্তিসাম্য অসাম্য অবস্থার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তাই বলে শক্তিসাম্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, শক্তিসাম্য ঠিকমতো কার্যকর হতে পারে না। পরিস্থিতি অনুকূল হলে শক্তিসাম্য কার্যকর হবে বলে মর্গানথাউ মনে করেন। মর্গেনথ্যু-এর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে শক্তিসাম্য।

শক্তিসাম্যের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে হার্টম্যান বলেছেন যে, পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শক্তিসাম্য গড়ে ওঠে না। হার্টম্যানের ভাষায়—'The balance of power ... is almost entirely an accidental by product of the existence of two alliance groupings, each formed to counter the power and ambetions of the other.' আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি হঠাৎ কোনো কারণে জটিল আকার ধারণ করে এবং কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যদি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করার মানসে নতুন শক্তি জোট গড়ে তোলে। বিরোধী শক্তির সাথে ক্ষমতার সমতা আনা আদৌ লক্ষ্য নয়। আসল লক্ষ্য হলো আগ্রাসন যাতে ঘটতে না পারে অথবা ঘটলে তা কিভাবে মোকাবিলা করা যাবে। সুতরাং শক্তিসাম্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করা হয় না। কারণ এটা পুরোপুরি পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম ধারণা করা না গেলে শক্তিসাম্য সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। শক্তিসাম্যকে যারা ভারসাম্য অর্থে ব্যবহার করতে চান, হার্টম্যান তাদের সাথে একমত নন। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্য আদৌ স্থায়ী নয়।

শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন লেখক শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক মর্গানথাউ শক্তিসাম্যের বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর চারটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। যথা :

১. শক্তিসাম্য হলো ক্রিয়াকলাপের একটি নির্দিষ্ট স্তর বা আস্থা অর্জন করার জন্য একটি নীতি।
২. এটি হলো ক্রিয়াকলাপের একটি বাস্তব অবস্থা।
৩. মোটামুটিভাবে শক্তির সমবণ্টন।
৪. শক্তির যে কোনো রকম বণ্টন।

অবশ্য শক্তিসাম্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নোক্তভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় :

১. **ভারসাম্য অবস্থার সংরক্ষণ :** ভারসাম্য অবস্থার সংরক্ষণ হলো শক্তিসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ভারসাম্য অবস্থার সংরক্ষণ হলে কোনো রাষ্ট্র বা একাধিক রাষ্ট্র উপযুক্ত কারণ ছাড়া আগ্রাসক হতে পারবে না। অতএব বলা যেতে পারে শক্তিসাম্য ব্যবস্থা হলো আগ্রাসন রোধ করার একটি যন্ত্র বা উপায়।

২. **অভারসাম্য অবস্থা :** শক্তিসাম্য বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বোঝাবে এমন কোনো কথা নেই। অ-ভারসাম্য অবস্থাও বুঝাতে পারে। বার্টন তাই শক্তিসাম্যকে অভারসাম্য অবস্থা বলে মনে করেন। সবক্ষেত্রে শক্তিসাম্য অভারসাম্য পরিস্থিতি বোঝাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে একাধিক রাষ্ট্র যখন একটা অনুকূল শক্তিসাম্য অবস্থা অর্জন করে ফেলে সেটা যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর দেয়।

৩. **ভারসাম্য অর্জন করার প্রবণতা :** রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভারসাম্য অর্জন করার প্রবণতা শক্তিসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ভারসাম্য অর্জন করতে গেলে রাষ্ট্রগুলোকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও এ কাজে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকে। সেজন্য ফ্রাঙ্কেল বলেছেন যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও শক্তিসাম্যের একটি অংশ।

৪. **আগ্রাসন বিরোধী মনোভাব :** অধ্যাপক কুইন্সি রাইট বলেছেন যে কোনো রাষ্ট্র যদি আগ্রাসক হওয়ার বাসনা পোষণ করেন তাহলে তাকে প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে এ প্রত্যয় গড়ে ওঠার অপর নাম শক্তিসাম্য। অতএব অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলা শক্তিই হলো শক্তিসাম্য।

৫. **নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা :** নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার প্রবণতা শক্তিসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আগ্রাসন ঘটে গেছে অথবা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে এ উভয় অবস্থায় নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য শক্তিসাম্য ব্যবহৃত হয়।

৬. **এটি একটি নীতি :** বহু রাষ্ট্র ভারসাম্য অর্জনকে একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কোনো একটি বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রাধান্যকে প্রতিহত করে স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করতে হলে, পাল্টা শক্তি জোট গঠন করে সেই অপ্রতিহত ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে ফেলতে হবে। ক্লাউড বলেছেন, নীতি হিসেবে যখন শক্তিসাম্যকে ব্যবহার করার কথা ওঠে তখন এর মধ্যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার আভাস পাওয়া যায়। কারণ, কি নীতি অনুসরণ করলে এক বা একাধিক রাষ্ট্র বাড়তি ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে অথচ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলা যাবে না সে বিষয়টি সহজভাবে বোধগম্য নয়। ক্লাউড বলেছেন, শক্তিসাম্যকে ভারসাম্য বা অভারসাম্য অর্থে ব্যবহার করার চেয়ে নীতি হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। চার্চিল একবার বলেছিলেন, 'Balance of power is the wonderful unconscious tradition of British foreign policy.' একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় চার্চিল শক্তিসাম্যকে ভারসাম্য বা অভারসাম্য অবস্থা হিসেবে বোঝাতে চাননি। বরং তিনি একে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

শক্তিসাম্য মূলত একটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যবস্থা। এর অধীনে শক্তির সমবণ্টন বা মোটামুটি বণ্টন লক্ষ্য করা যায়। তবে ভারসাম্য, অভারসাম্য বা নীতি বা ব্যবস্থা হিসেবে শক্তিসাম্যকে বিচার করার মধ্যে ইতিবাচক প্রবণতা পরিস্ফুটিত হয়। কিন্তু এর নেতিবাচক দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই কোনো কোনো লেখক শক্তিসাম্যকে সাধারণত প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন উড্রো উইলসন শক্তিসাম্যের ওপর বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না। লীগ অব নেশনসকে উইলসন বিশ্ব পার্লামেন্টের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে; শক্তিসাম্যের প্রয়োজন হবে না।

১৩। 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে শক্তি বা ক্ষমতা।'– জাতীয় শক্তির ধারণায় এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল উপাদান হলো জাতি রাষ্ট্র (Nation state)। আর এ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়লাভ করা অথবা নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার প্রবণতা থাকে। তাই মর্গেনথ্যু বলেছেন, 'International politics, like all politics, is a struggle for power whatever the ultimate aim of international politics, power is always the immediate aim.'। তাই রাজনীতিবিদ বা

প্রশাসকরা ধর্মীয়, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে যে উদ্দেশ্য সাধনেই ব্রত হন না কেন ক্ষমতার লড়াই ছাড়া এ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতা আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল উৎস এবং এ ক্ষমতা জাতি রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ।

ক্ষমতা (Power)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, ম্যাকিয়াভেলি, হবস, নিডসে প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'ক্ষমতা'র উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। একইভাবে ক্যাটলিন, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, মর্গেনথ্যু প্রমুখ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ক্ষমতাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'Fundamental concept' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ম্যাকাইভার আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটেছে তার সবকিছুই ক্ষমতাকেন্দ্রিক।' কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় একমত হতে পারেননি।

ক্ষমতা সম্পর্কে মর্গেনথ্যু-এর ব্যাখ্যাকে অনেকে যথাযথ ব্যাখ্যা হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'When we speak of power, we mean man's control over the minds and actions of other men.' অর্থাৎ যখন আমরা ক্ষমতার কথা বলি তখন আমরা ক্ষমতা বলতে বুঝি অন্য ব্যক্তির কাজকর্ম, আচার-আচরণ এবং মনের উপর কোনো ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ। শ্লেচারও প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন। তার মতে, 'ক্ষমতা হলো কাউকে ভয় দেখিয়ে বা পুরস্কৃত করে কোনো কাজ করানো বা নিজের মতে আনার সামর্থ্য।' আর অরগানস্কি মনে করেন, 'Power is the ability to determine the behaviour of others.' অর্থাৎ অন্যের আচরণ নির্ধারণের সামর্থ্যই হলো ক্ষমতা। অরগানস্কি মনের উপরের চেয়ে অন্যের আচরণের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন এ জন্য যে, অধিকাংশ সময়ই একজনের মনের উপর অন্যজনের কোনো প্রভাব থাকলেও তা তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অরগানস্কির মতোই ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এডওয়ার্ড মিল। তার ভাষায় ক্ষমতা হলো, 'The ability to influence the behaviour of others in accordance with one's own ends'। কিন্তু Max Weber ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'Social relation'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে। তিনি বলেন,'Power as the possibility given to an actor, within a determined social relation of ruling as he wishes.'

যা হোক, ক্ষমতা বা শক্তি হলো কাজ করার সামর্থ্য। আর কাজ করার এ সামর্থ্য ব্যবহৃত হয় মূলত অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করা বা অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তবে শক্তি বা ক্ষমতার মধ্যে বল প্রয়োগের বিষয়টি নিহিত থাকলেও অনেক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকই ক্ষমতা ও পীড়নকে এক করে দেখেন না।

জাতীয় শক্তি

'জাতীয় শক্তি'-এর ইংরেজি পরিভাষা হলো 'National Power'। ক্ষমতা বা Power বলতে যেহেতু অন্যকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যকে বোঝায় সেহেতু 'National Power' হলো অন্য রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্কের পণ্ডিতগণ এ জাতীয় শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক লার্চ বলেন, 'National power is the capacity of a state to exert coercive influence upon other states and to resist such influence exerted by other states upon it.' অর্থাৎ, জাতীয় শক্তির অর্থ হলো এক বা একাধিক রাষ্ট্রের উপর একটি রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা এবং নিজের উপর অন্য রাষ্ট্রের অনুরূপ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করার সামর্থ্য। কিন্তু অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড মনে করেন, 'National power may be defined as the sum total of the strength and capabilities a state harnessed and applied to the advancement of its national interest and the attainment of its national activities.' অর্থাৎ, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সব ধরনের ক্ষমতার যোগফলকে জাতীয় শক্তি বলে অভিহিত করা যায়।

অনেক তাত্ত্বিক আবার জাতীয় শক্তিকে বৈদেশিক নীতির সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা ক
অধ্যাপক পামার এবং পারকিন্স লিখেছেন, 'শক্তি বলতে এমন এক উপায়কে বোঝায়, যার দ্বা
রাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র এবং বৈদেশিক নীতিকে কাজে প্রয়োগ করে।'

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় শক্তি হলো জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন ও তার উদ্দেশ্যাবলী বা
জন্য একটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থ্যের যোগফল আর এ যোগফলই আন্তর্জাতিকভাবে একটি
সম্মান, মর্যাদা ও অস্তিত্বের ভিত্তি।

জাতীয় শক্তির প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি বা ক্ষমতা

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমতার লড়াই। আন্তর্জাতি
একটি জাতি কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম তা বিচার করা হয় শক্তির মাধ্যমেই।
শক্তিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত নির্ধারক। আমরা যদি আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহকে
করি তাহলে দেখতে পাব প্রতিটি ক্ষেত্রেই শক্তি বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে। তাই অধ্যাপক
পারকিন্স বলেন, 'শক্তিই হলো রাজনীতির প্রধান উপাদান।' একইভাবে অধ্যাপক মর্গেনথ্
'The struggle for power is universal in time and space and is an undeniable
experience'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে শক্তি ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ অ

তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এ শক্তি অবশ্যই জাতীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর জাতীয়
বলীয়ান হয়েই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে একটি জাতি তার জা
সংরক্ষণ করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় শক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকায় অ
রাজনীতিতে বিভিন্ন দেশের স্ব স্ব প্রভাব বিস্তারের মাত্রায় তারতম্য ঘটে এবং এভাবে স্ব
স্বার্থের পরিমাণও নির্ধারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় অ
রাজনীতিতে এর প্রভাব বিস্তারের মাত্রা এবং এ প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অর্জিত জাতী
পরিমাণও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বজুড়ে তার জাতীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটা
তাই পৃথিবীর সব সমস্যা সমাধানে বা নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টিতে তার একক আধিপত্য
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধ এবং এভাবে নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে মার্কিন
অনমনীয় ভূমিকা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তির প্রাধান্যেরই প্রমাণ। একইভাবে ভারত, চী
ইত্যাদি আঞ্চলিক শক্তিগুলো যে তাদের স্বার্থ রক্ষায় আঞ্চলিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এ
প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা কর
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয় শক্তিরই প্রাধান্য। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারত
তাদের স্ব স্ব শক্তি বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে।

তবে জাতীয় শক্তি ব্যবহারের চারটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা— ১. প্ররোচনা, ২. পুরস্কার, ৩. শাস্তি এবং ৪. ব
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক সামর্থ্য দ্বারা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তার উদ্দেশ্য নির্ধারণে বিশেষভাবে সী
উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়; নিজস্ব সামর্থ
অনেক রাষ্ট্রই বিশ্ব রাজনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার কোনো রাষ্ট্রের সা
সামান্য যে, তার দ্বারা বিশ্ব রাজনীতিতে সামান্যতম ভূমিকা পালনও সম্ভব নয়। যেহেতু বিভিন্ন
বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে এর ভূমিকা বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু জাতীয় শ
উপাদানও এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শক্তির প্রধান উপাদানগুলো হলো :

- ভৌগোলিক অবস্থান,
- জনসংখ্যা ও মানবিক শক্তি,

– প্রাকৃতিক সম্পদ,
– কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উপাদান,
– সামরিক সংগঠন,
– রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা,
– প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিক্ষার মান,
– জাতীয় মনোবল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থান।

উল্লেখ্য, ই এইচ কার জাতীয় শক্তিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন– সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ও জনমতের উপর শক্তি। জাতীয় শক্তি প্রকাশ করা অথবা একটি পরাক্রমশালী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শেষ অস্ত্র বা উপায় হলো যুদ্ধ। প্রতিটি রাষ্ট্রই সামরিক শক্তিকে যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। অতীতে দেখা গিয়েছে, শুধু সামরিক শক্তির সাহায্যেই বহু রাষ্ট্র ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। বর্তমানেও রাষ্ট্রের স্তরবিন্যাস নির্ভর করে সামরিক ক্ষমতার ওপর। সামরিক দিক থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই রাষ্ট্র অনেক সময় ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে জয়-পরাজয় রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাই পামার এবং পারকিন্স বলেছেন, চূড়ান্ত পর্বে জাতীয় শক্তি হলো সামরিক শক্তি (National power is in final analysis military power)।

একইভাবে, জাতীয় শক্তির অন্য একটি বহিঃপ্রকাশ হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতা। এ অর্থনৈতিক ক্ষমতাও আবার সামরিক শক্তির সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। আর তাই অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান রাষ্ট্র। কারণ বর্তমানে সম্পদ বা প্রাচুর্য ছাড়াই যুদ্ধের সামরিক ব্যয় বহন সম্ভব হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবান বিধায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই ই এইচ কার বলেছেন, 'The whole progress of civilization has been so closely bound up with the economic development that we are not surprised to trace, throughout modern history, and increasingly intemate association between military and economic power.'

উপসংহার : জাতীয় শক্তির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব বিস্তারের মাত্রা। আর এভাবেই প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণে সামর্থ্য হয়। তবে এক্ষেত্রে জনমতের গুরুত্বও অপরিসীম। প্রতিটি দেশই আন্তর্জাতিকভাবে তার জাতীয় শক্তি প্রদর্শন করতে চাইলে তার জনমতকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

১৪ ▮ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে বলকান অঞ্চল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পূর্ব ইউরোপ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমনিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি মধ্যপ্রাচ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়ামের ব্যাপক সম্ভাবনা যখন বৃহৎ শক্তিগুলোর দৃষ্টি কাড়ল, তখন থেকেই এ অঞ্চলে তারা তাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা চরমভাবে অনুভব করলো। তাছাড়া স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের টানাটানিতে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, সুয়েজ সংকটসহ অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের সূচনা

হয়েছিল। কিন্তু '৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ইরাকের ভুলের সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার একক শক্তিমত্তার পরীক্ষাটাও চালাল উপসাগরীয় অঞ্চলেই। ১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চলে অশান্তির আরেকটি পটভূমি রচিত হয়। ফিলিস্তিনি জনগণের লাশের মিছিল তো ছিলই, তারপর ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণের দায়ে লাদেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণার পরও কুরুক্ষেত্র হলো মধ্যপ্রাচ্য। আমেরিকার রোষানলের প্রথম শিকারও হলো আফগানিস্তানের নিরপরাধ মুসলমান। এরপর ব্যাপক গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে— এ অভিযোগ তুলে দখল করে নেয়া হয় ইরাক। তারপর নানা ছুতোয় পশ্চিমা বিশ্বের সাথে এ অঞ্চলের কোনো না কোনো দেশের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। আর এ কারণেই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নীতিনির্ধারণে মধ্যপ্রাচ্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ও সীমানা

মধ্যপ্রাচ্য বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায় এবং এর আওতায় কোন কোন দেশ রয়েছে তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য তিনটি মহাদেশ— ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত। তবে এ ব্যাপারে অনেকটাই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে মোট দেশ রয়েছে ২২টি। আর মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা হলো পশ্চিমে মরক্কো ও আলজেরিয়া, পূর্বে আফগানিস্তান, উত্তরে ইরান ও তুরস্ক এবং দক্ষিণে ইয়েমেন ও সুদান। এ বিরাট অঞ্চলের আয়তন প্রায় পঞ্চাশ লাখ বর্গমাইল এবং এ অঞ্চলে ৩০ কোটিরও বেশি লোকের বাস। মধ্যপ্রাচ্যের জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশেরও বেশি মুসলমান। তবে খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকজনও রয়েছে। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানকে কেউ কেউ দক্ষিণ এশিয়ায়, আবার কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব

বলা হয়, 'মধ্যপ্রাচ্য হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু'। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিটি ইস্যুতে কোনো না কোনোভাবে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো না কোনো দেশ, জাতি বা গোষ্ঠী ও গ্রুপের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনলেও দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির মূল আলোচনায় রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য।

প্রথমত, আরব-ইসরাইল বা ফিলিস্তিন সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে অবদান রেখে আসছে। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে অদ্যাবধি এ দ্বন্দ্ব চলছে। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে আরব ও ইসরাইলিদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া ফিলিস্তিনি আরব ও ইসরাইলিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অবিরাম চলছে। আর এ সংকটের আবর্তে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলোও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন সমীকরণে অঙ্ক কষে প্রত্যেকেই নিজেদের সুবিধামতো কখনো কোনো পক্ষকে সমর্থন দিচ্ছে কিংবা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সবসময়ই তাদের পররাষ্ট্রনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বিবেচ্য বিষয় হিসেবে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে অদ্যাবধি ইরাক ও কুয়েতকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল আলোচনায় চলে আসে। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্ব যখন একটা নতুন অবস্থার দিকে মোড় নিচ্ছিল, তখন ফ্রান্সিস ফুকোয়ামাসহ অনেকেই ভেবেছিলেন যুদ্ধের দিন

শেষ, তাই ইতিহাসেরও পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধ সে ধারণাকে পাল্টে দিয়ে যুদ্ধের উপসর্গ এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাত পাকা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলো। আর তাই দেখা যাচ্ছে, উপসাগরীয় যুদ্ধের দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগ পেরিয়ে গেলেও ইরাক এখনো রয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

তৃতীয়ত, আফগানিস্তান ইতিহাসের একটি বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র হিসেবেই পরিচিত। রাশিয়ার আফগানিস্তান আক্রমণ ও দীর্ঘ যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় একসময় আফগানিস্তান সম্পর্কে অনেক মিথ্যের জন্ম দিয়েছিল। তারপর থেকে দেশটি অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। অর্থনীতি চরমভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এমতাবস্থায় তালেবান সরকার ক্ষমতায় এসে দেশটিতে ইসলামী শাসন কায়েম করলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পুনরায় দেশটির ওপর পতিত হয়। তারপর ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় লাদেনের জড়িত থাকার অভিযোগ এবং আফগানিস্তানে তার আশ্রয় গ্রহণকে উপলক্ষ করে সেখানে নতুন শতাব্দীর বর্বরতম হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। এভাবে আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্যরা তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি তালেবানদের হটিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নতুন সরকারও গঠন করে। এরপর থেকে এখনো কোনো না কোনোভাবে আফগানিস্তানের প্রসঙ্গটিও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা আলোচনায় চলে আসে।

চতুর্থত, উপসাগরীয় যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সৌদি আরব ও কুয়েতে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এ এলাকায় তার ঘাঁটিগুলোতে ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল এবং আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ অনেক এলাকা সম্পর্কে আমেরিকার আগ্রহে ভাটা পড়লেও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ক্রমশ যেন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। বিশেষত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে যে খেলা শুরু হয়েছে সে খেলার ক্ষেত্র এখনো মধ্যপ্রাচ্য। ইরাক আক্রমণ ও দখল তারই প্রমাণ বহন করে।

পঞ্চমত, ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইরান আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে টিকে রয়েছে। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতটা উচ্চবাচ্য না করলেও কিছুদিন আগেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরান, ইরাক এবং উত্তর কোরিয়াকে শয়তানের আখড়া হিসেবে আখ্যা দিয়ে ইরাককে আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এমতাবস্থায় ইরানও কৌশলী মন্তব্য ও বিবৃতির মাধ্যমে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করে আসছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে কয়টি উত্তপ্ত ইস্যু আছে তার প্রায় সবকটিই কোনো না কোনোভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে জড়িত।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বের কারণ

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্টতা বেশি থাকার পেছনে অনেক বিষয় জড়িত। কেননা মধ্যপ্রাচ্য তার ভূ-কৌশলগত অবস্থান, ইতিহাস, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় অবস্থা সব দিক থেকেই বিশ্বের অন্যান্য এলাকার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এ এলাকার অবস্থানও একটু ভিন্ন। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বেশি হওয়ার পেছনে যে সকল কারণ মুখ্য সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. **ভূ-কৌশলগত অবস্থান :** ভূ-কৌশলগত দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্য রয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। ফলে যে দেশ বা শক্তি এ অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করে তারা আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় এর অবস্থান থেকে অনেকটা লাভবান হয়। কারণ :

১. মধ্যপ্রাচ্য তিনটি মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। মহাদেশ তিনটি হলো এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। কোনো কোনো বৃহৎ শক্তি যদি এ এলাকায় তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে তাহলে উল্লিখিত তিনটি মহাদেশেই কমবেশি তার প্রভাব পড়ে।

২. মধ্যপ্রাচ্যে যে নৌ ও সড়ক যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে তাতে এ অঞ্চল থেকে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সহজেই যাওয়া যায়।

৩. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের বৃহৎ শক্তিসমূহ এ অঞ্চলটির লাগোয়া এবং ইরান, ইরাকসহ যে সকল দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপন আপন ভূমিকা পালনে সচেষ্ট, এ সকল দেশ এ অঞ্চলেই অবস্থিত। ফলে দেখা যায়, এ অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে এ সকল বৃহৎ শক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির অর্থ হলো বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। তাই দেখা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোনো না কোনো প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সংশ্লিষ্টতা এসেই যায়।

খ. **তেলসম্পদ :** প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হ্যারল্ড ব্রাউন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলকে মনে করেন, 'The lifeblood of modern industrial societies.' তিনি আরো বিশ্বাস করেন , The loss of this to the economics of the west and the industrialised for east would be a blow of catastrophic proportions.' বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক, বাহরাইন প্রভৃতি দেশে যে পরিমাণ তেল সঞ্চিত আছে তা-ই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জ্বালানি চাহিদার একমাত্র অবলম্বন। কেননা তেলের বিকল্প জ্বালানি কার্যকর অর্থে এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাছাড়া ব্রিটেনের নর্থ স্কির তেলকূপগুলোর উত্তোলন এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো, সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশসমূহ ও নরওয়ের মজুদ ভাটার পথে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল সরবরাহও ১৯৭০ সালের পর থেকেই নিম্নগামী। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি পরাশক্তির নজরই মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। কেননা মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো সুবিধামতো এ অঞ্চলের তেলসম্পদ হাতিয়ে নেয়া।

গ. **অস্ত্র ব্যবসার সম্ভাবনাময় এলাকা :** মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আঞ্চলিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে দেখা যায়, এটি আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় বাজার। এ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রেখে অস্ত্র ব্যবসাকে চাঙ্গা রাখার লক্ষ্যেই গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বৃহৎ শক্তিগুলো এ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে কূটকৌশল চালাচ্ছে। এক দেশের সাথে আরেক দেশের দ্বন্দ্ব বাধিয়ে কিংবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

ঘ. **আদর্শগত বা ধর্মীয় গুরুত্ব :** আদর্শগত তথা ধর্মীয় দিক থেকেও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা জেরুজালেম পৃথিবীর সকল মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত। মক্কা ও মদীনায় যথাক্রমে পবিত্র কাবা শরীফ ও রাসূল (স)-এর জন্মস্থান এবং রওজা শরিফ অবস্থিত হওয়ায় মুসলমানদের কাছে এ স্থানগুলোর গুরুত্ব অসীম। এমতাবস্থায় এ সকল স্থানের ওপর কোনো ধরনের আঘাত হলে গোটা বিশ্ব সম্প্রদায়কে কোনো না কোনোভাবে নাড়া দেবে। তাই মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরে গোটা বিশ্বের সকল ধর্মের লোকেরই কমবেশি আগ্রহ ও অনুভূতি রয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের সাথে এ এলাকায় অনেক কিছুই জড়িত। ফলে একদিকে বিধর্মীরা এ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে কাবু করতে চায়, আবার মুসলমানরাও এ অঞ্চলের পবিত্রতা রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প।

ঙ. **তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য ক্ষেত্র :** অনেকেই মনে করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যই হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম ক্ষেত্র। এখান থেকেই আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে। এ ধারণার সাথে অনেকে একমত না হলেও একে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী

সবচেয়ে মারাত্মক যে সামরিক সংঘর্ষ তা এ অঞ্চলেই হয়েছে। প্রথমে ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক অভিযানের সময়। এমনকি বিশ্ব নেতৃবৃন্দসহ অনেকেই মনে করেন, প্যালেস্টাইন সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটবে। কেননা এ সকল ঘটনার মূলসূত্র সেখানেই। তাই এ জাতীয় সংঘর্ষ ও যুদ্ধ একদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিতে পারে বলে যে ধারণা তাকে অমূলক বলা যায় না।

চ. **সন্ত্রাসের দায় :** বিশ্বের অনেক দেশেই সন্ত্রাস রয়েছে এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ দেশীয়, আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে এ প্রবণতা একটু বেশি। কেননা এ অঞ্চলের ওপর আধিপত্যবাদের ছোঁয়া চরমে পৌঁছলে জনগণ স্বাভাবিক পন্থায় তা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে অনেক সময় গেরিলা আক্রমণের আশ্রয় নেয়। তাদের স্বাধিকার আদায়ের এ সংগ্রামকেই পশ্চিমা মিডিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী চক্র সন্ত্রাস বলে চালিয়ে দেয় এবং বিশ্বব্যাপী কোথাও কোনো অঘটন ঘটলেই তা উদোর পিণ্ডি বুদোড় ঘাড়ে চাপিয়ে মুসলমানদের দোষী করে। বৃথা দোষী হওয়ার এ পশ্চিমা চক্রান্তে এখন মুসলমান জাতি বিভ্রান্ত। আর তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক আক্রমণ ও দখল করে ইরান, সৌদি আরবসহ অনেক দেশকেই উত্যক্ত করছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছ. **আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা :** মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই জটিল। এদের পারস্পরিক সম্পর্কের এ জটিলতা অনেক ক্ষেত্রেই বৈরিতা ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। বিশেষ করে ইরান-ইরাক যুদ্ধ দীর্ঘদিন এ এলাকাকে অস্থিতিশীল করে রেখেছিল। তারপর ইরাক-কুয়েত দ্বন্দ্বের জের ধরেই ইরান-মার্কিন বর্তমান তিক্ততার সূত্রপাত। আর প্যালেস্টাইনের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের দেশটির প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর পড়েছে। এভাবে কোনো না কোনো দেশ ও এলাকায় অস্থিতিশীলতা লেগেই আছে। তাই দেখা যায়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন আলোচনা, পর্যালোচনা ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যের প্রসঙ্গটি অনায়াসেই এসে যায়।

বিশ্বের দৃষ্টি যদি মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি না পড়ত, তাদের লোভ যদি এ এলাকায় জনগণকে জ্বালিয়ে না মারতো, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য তার নিজের সম্পদ দিয়ে হাজার হাজার বছর টিকে থাকতে পারতো। তবে মধ্যপ্রাচ্যের যে অবস্থান, সম্পদ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ধর্মীয় ঐতিহ্য—তাতে বিশ্ববাসীর কাছে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব থেকেই যাবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও এর গুরুত্ব কোনোদিন একেবারে ফুরিয়ে যাবে না।

১০। ক. সন্ত্রাসবাদ কি?
খ. বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উত্তর : বর্তমান বিশ্ব ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত। আধুনিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এই যুগে বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। কিন্তু এহেন মানবিক সমস্যাকে পেছনে ফেলে যে সমস্যাটি গোটা বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে তা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ বা Terrorism। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অতীতে যে ছিল না তা নয়, কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে ইতিহাসের ভয়াবহতম সন্ত্রাসী হামলার পর

সন্ত্রাসবাদ নামক অজানা জুজুর ভয় উন্নত রাষ্ট্রতো বটেই, পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোরও ঘুম হারাম করে দিয়েছে। তাই সন্ত্রাসবাদ নিয়ে হচ্ছে বিস্তর গবেষণা, চলছে সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ অনুসন্ধান এবং এর প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবনের প্রাণান্তকর প্রয়াস।

সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদ শব্দের উৎপত্তি : সন্ত্রাসবাদ বা Terrorism শব্দটির উদ্ভব হয় ফ্রান্সে ১৭৮৯-১৭৯৯ সালের ফরাসি বিপ্লব চলাকালীন সময়। এ সময়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু এবং জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে 'The Regime de La Terreur' (Reign of Terror) নামে একটি বিশেষ পরিষদ গঠিত হয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য এই Terreur রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ঠিক তখন থেকেই Terror শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শব্দটি তেমন পরিচিতি লাভ করেনি। উনিশ শতকের শেষের দিকে রুশ বিপ্লবীরা জার শাসনের বিরুদ্ধে terreur-কে তাদের সহিংস সংগ্রামের উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে Terrorism বা সন্ত্রাসবাদ শব্দটি সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর Terrorism সরকারবিরোধী সহিংস আন্দোলনের জনপ্রিয় হাতিয়ারে পরিণত হয়, যার ধারাবাহিকতা বর্তমানকাল পর্যন্ত বিদ্যমান।

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা : ঘটনার আকস্মিকতা ও প্রকৃতি দেখলে অনেকেই সন্ত্রাসবাদকে শনাক্ত করতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তাই সন্ত্রাসবাদের সর্বজনস্বীকৃতি (universally accepted) সংজ্ঞা এখনো প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। সন্ত্রাসবাদের সাদামাটা সংজ্ঞা দিয়েছে Brian Jenkins. তার মতে, 'Terrorism is the use or threatened use of force designed to bring about political change.' অর্থাৎ, রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগের হুমকিই সন্ত্রাসবাদ। বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন Walter Lagueur, 'Terrorism constitutes the illegitimate use of force of achieve political objective when innocent people are targeted.' অর্থাৎ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিরপরাধ জনগণকে লক্ষ্য করে অবৈধ শক্তি প্রয়োগই হচ্ছে সন্ত্রাস। মার্কিন State Department সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'Premeditated, politically motivated violence perpetrated against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience.' তবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI প্রণীত বহুল আলোচিত সংজ্ঞাটি হলো, 'Terrorism is the unlawful use of force or violence against persons of property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.' অর্থাৎ, সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো সরকার, বেসরকারি জনগণ অথবা অন্য যে কোনো অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের ওপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিসংতা ব্যবহারকে সন্ত্রাসবাদ বলা হয়।

সন্ত্রাসবাদের উপাদান : মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-র Counter Terrorist Centre-এর সাবেক উপপ্রধান পল পিলারের মতে, সন্ত্রাসবাদের চারটি উপাদান রয়েছে :

১. এটা পূর্ব পরিকল্পিত (premeditated), অর্থাৎ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সম্পাদিত আকস্মিক কোনো কর্ম নয়।

২. এটা রাজনৈতিক (Political), তথা অপরাধমূলক নয়, যেমনটি মাফিয়া চক্র অর্থোপার্জনের জন্য করে থাকে। বরং এটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পিত কর্ম।

৩. এর টার্গেট বেসামরিক জনগণ (civilians), সেনাবাহিনী বা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কোনো বাহিনী নয়।

৪. এটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী (sub-national group) কর্তৃক পরিচালিত, কোনো দেশের সেনাবাহিনী বা সামরিক বাহিনী কর্তৃক নয়।

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বিতর্ক

যেহেতু সন্ত্রাসবাদের সর্বজন স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই, তাই কারা সন্ত্রাসী বা কারা সন্ত্রাসী নয় তা নিরূপণ করা বেশ দুরূহ। এ ব্যাপারে যে কথাটি বহুল প্রচলিত তা হলো, 'One man's terrorist is another man's freedom fighter.' অর্থাৎ, যে একজনের কাছে সন্ত্রাসী সে অন্যজনের কাছে মুক্তিযোদ্ধা। যেমন—কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু মুসলিম বিশ্বসহ অনেকের কাছে তারা স্বাধীনতাকামী। তাদের যৌক্তিক দাবি খোদ জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। অনুরূপভাবে ইসরাইলি বাহিনী যখন নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালিয়ে নিরপরাধ লোকদের হত্যা করে তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে তখন তা বিবেচিত হয় আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা পাল্টা হামলা করলে তা সন্ত্রাসবাদ বলে উচ্চবাচ্য করা হয়। মার্কিন তাঁবেদারী না করলে কতিপয় রাষ্ট্র হয় সন্ত্রাসীদের মদদদাতা। পক্ষান্তরে কন্ট্রা বিদ্রোহীদেরসহ বিভিন্ন গুপ্তহত্যা ও গণহত্যার জন্য মার্কিনীরা যখন সামরিক সহায়তা দেয়, তখন তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয় না। এমনকি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত অভিযান কখনোই সন্ত্রাসবাদ নয়। এই কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের মতো জঘন্য একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। সুতরাং যত দিন পর্যন্ত বিশ্বে গণমানুষের দাবি, মৌলিক মানবাধিকার ও সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদের সীমারেখা নিরূপণ সম্ভব হবে না।

সন্ত্রাসবাদের কারণ

অনেকে মনে করেন, সন্ত্রাসবাদের কারণ নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ সন্ত্রাস একটি অশুভ শক্তি এবং একে নির্মূল করাই মূল কথা। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যেসব পরিস্থিতির কারণে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হচ্ছে তার সমাধান না করে শুধু সন্ত্রাসের উপসর্গগুলোর ওপর ভিত্তি করে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' চালালে তা আরো সন্ত্রাসের জন্ম দেবে। রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নানা কারণে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়ে থাকে। সন্ত্রাসের মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য ২০০৩ সালের ৯-১১ জুন নরওয়ের রাজধানী অসলোতে The Norwegian Institute of International Affairs বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে যেসব মূল কারণ উত্থাপন করা হয় এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. **ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা :** বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা বা Imbalance of Power। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে গেছে। সেই সাথে সৃষ্টি হয়েছে কিছু কিছু আঞ্চলিক পরাশক্তি। শক্তির অসমতা এতটাই প্রকট যে নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারছে না তখনই আশ্রয় নিচ্ছে সন্ত্রাসের।

২. **ধর্মীয় উগ্রবাদ :** অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে যাদের ধারণা তাদের বিরোধীদের হত্যা করে নির্মূল করতে পারা পূণ্যের কাজ। অনেক মুসলমান আছেন যারা মনে করেন বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ করাই জিহাদ। তেমনি অনেক উগ্রপন্থী খ্রিস্টানও এটাকে Crusade বা পবিত্র ধর্মযুদ্ধ মনে করে। ফলে এরা সবাই জড়িয়ে পড়ে সন্ত্রাসবাদে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় মূলনীতির অপব্যাখ্যার ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় উগ্রবাদ (Religions Extremism) বর্তমানে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ।

৩. **সন্ত্রাসে মদদ দান :** বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো যখন তাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে মদদ যোগায় তখন প্রায় নিরস্ত্র নির্যাতিত জনগণ অনন্যোপায় হয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইসরাইলকে নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন। এর ফলে শুধু ইসরাইলিরাই আক্রান্ত হচ্ছে না খোদ আমেরিকাকেও চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

৪. **আগ্রাসন :** অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসন ব্যাপক সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়ে গোটা বিশ্বকে এখন বিপজ্জনক করে তুলেছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে আমরা এর বিকাশ লক্ষ্য করেছি। এমনকি একবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এই যুগে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাকে চালানো আগ্রাসন গোটা বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের উর্বর লীলাভূমিতে পরিণত করেছে।

৫. **ধর্মীয় ও বর্ণবৈষম্য :** বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুধু ধর্ম ও বর্ণের কারণে অনেক মানুষ প্রতিনিয়ত বৈষম্য ও নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। কোনো অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন ধর্মীয় ও বর্ণবাদী কারণে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অথবা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন মারাত্মক সামাজিক অসন্তোষ ও সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়।

৬. **রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ :** সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিস্তারের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ইসরাইল। এই নীতির কারণে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিকার হচ্ছে তারা নিজেরাই।

৭. **দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য :** দারিদ্র্যকে অনেকে সন্ত্রাসের মূল কারণ হিসেবে মনে না করলেও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ উন্নত দেশগুলোর দ্বারা ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকারে চরম বিক্ষুব্ধ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কানকুন সম্মেলন স্থলে কৃষক নেতা লি কিয়াং-এর আত্মাহুতি সেই ক্ষোভেরই চরম বহিঃপ্রকাশ। ঠিক এমনিভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দিচ্ছে।

৮. **দ্রুত আধুনিকায়ন :** দ্রুত আধুনিকায়নের ফলে এ বিশ্বের এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে অধিক সুবিধাভোগী অপরদিকে বাকিদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অসন্তোষ। দ্রুত পরিবহন ও যোগাযোগ, সংবাদ মাধ্যম, মারণাস্ত্র ইত্যাদি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সন্ত্রাসের ভয়াবহতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। ফলে কোনো গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই জ্বালানি ভর্তি দুটি বিমানকে বোমা বানিয়ে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।

৯. **পাল্টা সন্ত্রাস** (Counter Terrorism) **:** যুক্তরাজ্যের লিচেস্টরশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এন্ড্রু সিল্কের মতে, পাল্টা সন্ত্রাস তথা সন্ত্রাসের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমননীতির ফলে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক অবৈধ গুপ্ত হত্যা, ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লিবিয়ায় পাল্টা সামরিক হামলা এবং দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডে বিনা বিচারে দাফনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত Counter-terrorism নীতি যে হিতে বিপরীত হয়েছে তা আমেরিকা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ প্রতিকারের উপায়

প্রতিটি সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ এমনকি সন্ত্রাসীরাও সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করে কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তারা বাধ্য হয়ে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। তাই যেসব পরিস্থিতির কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্ম হয় সেসব বিষয় চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেই কেবল সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা সম্ভব। জাতিসংঘের 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন' দপ্তরের কর্মকর্তা Dr. Alex P. Schmid সন্ত্রাস দমনে আটটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। সেগুলো হলো :

১. **রাজনৈতিক এবং সরকারি ব্যবস্থা** (Political and Government Measures) : সন্ত্রাসবাদকে প্রথমে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে : ক. সুশাসন (Good Governance); খ. গণতন্ত্র (Democracy); গ. আইনের শাসন (Rule of Law); ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice)।

২. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা** (Economic and Social Measures) : সন্ত্রাসের প্রতিকার চাইলে অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে মি. এলেক্স ইউএনডিপির দারিদ্র্য সূচক ও সন্ত্রাসবাদ সূচকের মধ্যে তুলনামূলক Statistical test চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, সন্ত্রাসের সাথে আইনের শাসনের সম্পর্কের চেয়ে সন্ত্রাসের সাথে দারিদ্র্যের সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল।

৩. **মনস্তাত্ত্বিক-শিক্ষামূলক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা** (Psychological-Educational-Communicational Measures) : সন্ত্রাসীদের দলভুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডা চালাতে হবে। সন্ত্রাসীদের দুর্বল করার জন্য প্রকাশ্য ও গোপনে, প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক মনস্তাত্ত্বিক অভিযান চালাতে হবে।

৪. **সামরিক ব্যবস্থা** (Military Measures) : ক্ষেত্রবিশেষে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সীমিত আকারে সামরিক (পুলিশী) পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, তবে তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়। কারণ মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না।

৫. **বিচার বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা** (Judicial and Legal Measures) : সন্ত্রাস দমনের জন্য বিচার বিভাগ ও আইনি ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করতে হবে। যাতে সন্ত্রাসীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। এ ব্যাপারে নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত Counter Terrorism Committee এবং ভিয়েনায় গঠিত Global Progamme against Terrorism-এর কর্মকৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. **পুলিশ ও জেলখানা পদ্ধতি ব্যবস্থা** (Police and Prison System Measures) : পুলিশের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুলিশের কাছে সন্ত্রাসীদের তথ্য জানাতে পারে। তেমনিভাবে আটককৃত অনুতপ্ত সন্ত্রাসীদের কাজে লাগিয়ে বন্দি ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের নৈতিক মনোবল ভেঙে দিতে হবে।

৭. **গোয়েন্দা তৎপরতা ব্যবস্থা** (Intelligence and Secret Service Measures) : সন্ত্রাস দমনে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় জোরদার করতে হবে। সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম, বস্তুগত সহায়তা ও অর্থায়নের উৎস বের করার জন্য Raster Fahndung Techniqne অবলম্বন করতে হবে।

৮. **অন্যান্য ব্যবস্থা** (Other Measures) : সামাজিক সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে হবে যাতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের মনোবল অটুট থাকে। একই সাথে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও কমিয়ে ফেলতে হবে।

মানুষ কখনও সন্ত্রাসী হয়ে জন্মায় না, পরিস্থিতিই তাকে সন্ত্রাসী করে তোলে। তাই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করলে সন্ত্রাস দমন সম্ভব হবে বলে অনেকেই আশাবাদী। পরিশেষে জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি Wang Yingfan-এর ভাষায় বলতে হয়, 'An integrated approach involving political, diplomatic, economic, legal and other means should be adopted in his regard.'

১৬। 'বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার সন্ত্রাসবাদে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।'— এ উক্তির আলোকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণ করুন।
অথবা, **'বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার বঞ্চনা সন্ত্রাসবাদে মানুষকে উৎসাহিত করেছে।'– আলোচনা করুন।**

উত্তর : বিশ্ব এখন এমন এক সময় পার করছে যখন সন্ত্রাস মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। বছরের এমন কোনো দিন নেই যে, বিশ্বের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ দৈনন্দিন জীবনে সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে না। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই সন্ত্রাসকে নিন্দা করে। কিন্তু তারপরও সন্ত্রাসী তৎপরতা থেমে নেই, যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিতে পরমাণু অস্ত্র বৃদ্ধি করে চলেছে। এ অস্ত্রের পেছনে প্রতিবছর হাজার হাজার ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে এর লালন-পালন করছে। অথচ পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে ১০০ কোটির অধিক মানুষ প্রতিদিন খাদ্য কিনে খেতে না পেরে ক্ষুধার্ত থাকে। ঐ সব দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নেই। ঐ সব দেশ দারিদ্র্য, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সমস্যায় জর্জরিত। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এভাবে অধিকারহারা মানুষ অধিকার আদায়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিচ্ছে; বিশ্বব্যাপী অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপক বিস্তার বিশ্ববাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। একের পর এক রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হচ্ছে। পাশাপাশি সন্ত্রাসী কার্যক্রমও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নেতৃত্বে ৩ মে ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে দু'দিনব্যাপী পরমাণু নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর কাছ থেকে ভবিষ্যতে পরমাণু অস্ত্র হ্রাস এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আরো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এসব গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক অস্ত্র অথবা এর প্রযুক্তি যেন কোনোভাবেই বেহাত হয়ে না যায় কিংবা সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে গিয়ে না পড়ে তার গ্যারান্টি চাওয়া হয়।

সন্ত্রাসবাদের রকমফের

সন্ত্রাসের ইংরেজি শব্দ Violence. অভিধানে Violence-এর অর্থ দেয়া হয়েছে প্রচণ্ডতা, হিংস্রতা, সহিংসতা, হিংস্র আচরণ ইত্যাদি। বল প্রয়োগ, শক্তি প্রয়োগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহ, বর্ণগত দাঙ্গা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সন্ত্রাসের সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। তাই কারা সন্ত্রাসী বা কারা সন্ত্রাসী নয় তা নিরূপণ করা খুবই দুরূহ। এ ব্যাপারে যে কথাটি প্রচলিত আছে, তা হলো

'One man's terrorist is another man's freedom fighter." অর্থাৎ যে একজনের কাছে সন্ত্রাসী সে অন্যজনের কাছে মুক্তিযোদ্ধা। যেমন— ইসরাইলি বাহিনী যখন নিরস্ত্র ফিলিস্তিনীদের ওপর হামলা চালিয়ে নিরপরাধ লোকদের হত্যা করে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, ভূমিদখল করে তখন তা পরাশক্তির কাছে বিবেচিত হয় আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে। কিন্তু ফিলিস্তিনীরা পাল্টা হামলা করলে তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে উচ্চবাচ্য করা হয়। বিশেষ সম্প্রদায় নিন্দামুখর হয়ে ওঠে। আবার কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু মুসলিম বিশ্বসহ অনেকের কাছে তারা স্বাধীনতাকামী। কাজেই যতদিন পর্যন্ত বিশ্বে গণমানুষের দাবি, মৌলিক মানবাধিকার ও সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব না হবে, ততদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের সীমারেখা নিরূপণ করা অসম্ভব।

বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার সন্ত্রাসবাদে নতুন মাত্রা

এক ব্যক্তি চায় অন্য ব্যক্তির ওপর প্রতিষ্ঠা, এক জাতি চায় অন্য জাতির ওপর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে। এরূপ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভুত্ব, প্রভাব, কর্তৃত্ব, প্রতিষ্ঠা বিস্তারে ক্ষমতা অর্জনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে। উদ্দেশ্য পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাকে সমীহ করে চলুক, ভয় করুক, তার কথা শুনুক। শুরু হয় অস্ত্র প্রতিযোগিতা। বৃহৎ ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো তাদের শক্তি ও ক্ষমতার দাপটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তারের হিংস্র খেলায় মত্ত। আর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। প্রত্যেকেই তার শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করে একে অন্যকে পদানত করতে চায়। এতে নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয় অস্ত্র না হয় এর জনগণ সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। নিচে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ এবং কারণ বিস্তারিত আলোচিত হলো :

১. **অবৈধ দখলদারিত্ব এবং সন্ত্রাস :** আমরা এরূপ দেখতে পাই আফগানিস্তানে তালেবান হঠানোর নামে এবং ইরাকে পরমাণু অস্ত্রের অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক দখলের ফলে অজস্র গুপ্তহত্যা, বিতর্কিত ১১ সেপ্টেম্বর, ৭ জুলাই এর সৃষ্টি। ইরাক, আফগানিস্তান এখন যুদ্ধে পর্যুদস্ত রাষ্ট্র। এর সাধারণ জনগণ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে গুপ্তহত্যা, বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে; বেড়েছে সন্ত্রাসী তৎপরতা।

২. **অসম অস্ত্র প্রতিযোগিতা :** কতিপয় রাষ্ট্র নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় অন্যদের অবদমন করতে পুরনো অচল তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে সামরিক শক্তি ও উপায়কে বেছে নেয়। যে নীতি শত্রুতা বৃদ্ধি করে, তা মানবতা বিরোধী। এরূপ মানববিধ্বংসী নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে প্ররোচিত করে। এরূপ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না পেরে বঞ্চিত জাতি বা সম্প্রদায় টিকে থাকার বিকল্প পথ খোঁজে। আর তাই বাধ্য হয়ে তারা বেছে নেয় সন্ত্রাসের পথ। প্রথম আণবিক বোমা তৈরি ও ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ অমানবিক কাজ যুক্তরাষ্ট্রকে ও এর মিত্রদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কর্তৃত্বের অধিকারী করে তোলে। এ কর্তৃত্ব অন্য দেশের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে প্রধান অবদায়ক হিসেবে কাজ করে। আর তাই পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ পরমাণু শক্তির অধিকারী হতে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে চলেছে।

৩. **পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক নীতি :** বেসরকারি হিসেব মতে, পৃথিবীতে ২০ হাজারের বেশি পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। এর অর্ধেকেরও বেশি মজুদ আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে অন্যপক্ষ নিজেদের বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে। আর এখন এই উভয় পক্ষই লঙ্ঘন করে চলেছে সকল নিয়মনীতি। আন্তর্জাতিক

সম্পর্কে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলো আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নিরাপত্তা পরিষদ ও আইএইএ-'র সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে, অগ্রাধিকার সুবিধা ভোগ করে অপারমাণবিক দেশগুলো ভবিষ্যতে যাতে পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হতে না পারে তার জন্য প্রস্তাব পাস করায়। এরূপ বৈষম্যমূলক নীতি পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনে প্ররোচিত করে। বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী বা উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন তাদের অধিকার আদায়ে এবং বৈষম্য দূরীকরণে এসব শক্তিধর দেশগুলোর ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত রাখতে বেছে নেয় সন্ত্রাস বা সহিংসতার পথ। আর এক্ষেত্রে এদেরকে সাহায্য করে লাভবান রাষ্ট্রসমূহ।

৪. **উগ্রবাদী সংগঠন এবং সন্ত্রাস :** বিশ্বের সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মার্কিন হামলায় নিহত আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনকে 'ধর্মীয় কর্তব্য' (religious duty) বলে অভিহিত করেন। এটা নিঃসন্দেহ যে, যদি সন্ত্রাসীরা পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পারে বা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির উপাদান পেয়ে যায়, তাহলে তারা এগুলো ব্যবহারের পথ খুঁজবে। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা সন্ত্রাসবাদের নতুন ধরনের উত্থান; যা সন্ত্রাসীদেরকে নতুন পথ দেখিয়ে দেয়। বিশ্বে শক্তিশালী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো পারমাণবিক শক্তিধরদের অত্যাচার-অন্যায় থেকে মুক্তি পেতে সন্ত্রাসের নিত্যনতুন পন্থা উদ্ভাবন করে চলেছে।

৫. **সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে মদদ লাভ :** স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের প্রভাব বলয় বৃদ্ধিতে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। অনেক রাষ্ট্রও সন্ত্রাসী সংগঠনকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে নিজেদের অনুসারী সরকার বসিয়েছে, বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে। পরবর্তীতে তাদের অবস্থান এসব দেশ থেকে সরিয়ে নিলে এ অস্ত্রগুলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বা দলগত সন্ত্রাসের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর বর্তমানে এরূপ অস্ত্র বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করেছে।

৬. **অর্থের সহজলভ্যতা :** বিশ্বের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো তাদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে পরিচালিত করে। সন্ত্রাসী দলগুলো নিজেদের দলীয় অবস্থান শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে কাজ করে। দলের সদস্যদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর্মী নিয়োগ করে। অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ বৃদ্ধি করে, সদস্যদের অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে তারা অভিযানমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। এদের অর্থের যোগান আসে ধর্মীয় দাতব্য সংস্থা থেকে, সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা থেকে বা চাঁদাবাজি করে। সামাজিক অসমতা, বৈষম্য, বেকারত্ব, শিক্ষার অনগ্রসরতা, আইনের শাসনের অভাব প্রভৃতি কাঠামোগত সমস্যা সন্ত্রাসের মাত্রাকে বহুভাবে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। নতুন নতুন সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে।

৭. **ফিলিস্তিনিদের অধিকার বনাম সন্ত্রাস :** ফিলিস্তিন সমস্যা বিশ্বের জটিলতম সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীব্র এবং প্রাচীন। এটি ৬২ বছরেরও বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে রেখেছে যার প্রভাব গোটা বিশ্বে নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে। এর ফলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক যেমন খারাপ হয়েছে, তেমনি বৃহৎ শক্তিগুলো এ সমস্যার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছে। ফিলিস্তিন সমস্যার কারণে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে জন্ম হয়েছে অনেক সন্ত্রাসী সংগঠনের। এ সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে ইসরাইল প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো আরো বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। পাল্লা দিয়ে তারা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিভিন্ন বিস্ফোরক সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছে।

৮. **বিশ্বের এককেন্দ্রিকতা এবং সন্ত্রাস :** বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে একমেরুকেন্দ্রিক। এ একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার হীন কামনা চরিতার্থে ইচ্ছেমতো বিশ্বব্যবস্থাকে ব্যবহার করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো কোনো দেশের ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে কিংবা দিচ্ছে। আবার কোনো কোনো দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করছে। মার্কিন ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও স্বার্থ চরিতার্থে বিশ্ব অশান্ত হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ অন্যায্য কার্যক্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে কিছু কিছু আঞ্চলিক পরাশক্তির। শক্তির অসমতার কারণে নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদের।

৯. **অধিকার আদায়ে বাধা এবং সৃষ্ট সন্ত্রাস :** বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটেছে। এসব জাতিগোষ্ঠী তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যই মূলত এ রূপ সংঘাতময় পথ বেছে নিয়েছে। যে পর্যন্ত না তারা সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সে পর্যন্ত তারা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। যেমন— ভারতের সেভেন সিস্টারস্ রাজ্যসমূহ, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাষ্ট্রবিহীন কুর্দি জাতিগোষ্ঠী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মরো মুসলিম জাতিগোষ্ঠীরা তাদের স্বাধীনতার দাবিতে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধির মূলে রয়েছে স্বৈরাচারী, একনায়কতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ও নিপীড়িত, নিগৃহীত, অধিকারবঞ্চিত জনগণের মধ্যকার বৈষম্যমূলক আচরণ। এ অধিকারবঞ্চিত জাতিগোষ্ঠী যখন তাদের প্রাপ্য বা ন্যায্য অধিকার আদায়ে স্বাভাবিক প্রচেষ্টা চালানোর পরও বঞ্চিত হয়, তখনই বাধ্য হয়ে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

১০. **উগ্র ধর্মীয় মনোভাব এবং সন্ত্রাসবাদ :** অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে যাদের ধারণা, তাদের বিরোধীদের হত্যা করে নির্মূল করতে পারা পুণ্যের কাজ। অনেক মুসলমান আছেন যারা মনে করেন বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ করাই জিহাদ। তেমনি অনেক উগ্রপন্থি খ্রিস্টানও এটাকে ধর্মযুদ্ধ (Crusade) বলে মনে করে। ফলে এরা সবাই স্ব স্ব ধর্ম রক্ষার্থে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে ধর্মকে ব্যবহার করে উগ্রপন্থার পথ অবলম্বন করে। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদে জড়িয়ে পড়ে। আর এসব সংগঠন বিশ্বের উন্নত ও আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। ব্যয় করে প্রচুর অর্থ।

বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সীমিতকরণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; পাশাপাশি বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রভৃতি নিরসনে কাজ করে গেলেও এর কোনোটির ক্ষেত্রেই তেমন কোনো উন্নতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। আর এ না হওয়ার মূলে রয়েছে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের ইতিবাচক মানসিকতার অভাব। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও বিশ্বে প্রভাব বৃদ্ধিতে যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, সেই পারমাণবিক অস্ত্র আজ বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। বিশ্বের শক্তিপ্রিয় মানুষের সন্ত্রাস ও পারমাণবিক অস্ত্র কাম্য নয়। কেননা পারমাণবিক অস্ত্র ও সন্ত্রাস উভয়ই শান্তি বিনষ্ট করে, পৃথিবীকে অশান্ত করে। পারমাণবিক শক্তির অধিকারী বৃহৎ ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহ তাদের শক্তি ও ক্ষমতার দাপট দেখাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তারের হিংস্র খেলায় মত্ত হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জনগণ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। তাই এ কথা যথার্থই যে, বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার বঞ্চনা ও পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার সন্ত্রাসবাদে মানুষকে উৎসাহিত করেছে।

১৭। ক. নিরস্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝেন?

খ. নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি বিবরণ দিন।

অথবা, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রবিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তার বাস্তবতা বিষয়ে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে অন্তত ৮টি দেশের হাতে শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে এবং আরো বেশ কিছু রাষ্ট্রের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রযুক্তি আছে বা প্রযুক্তি অর্জনে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা সম্পর্কে বিশ্ববাসী প্রথম অবহিত হয় ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট ও ৯ আগস্ট; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। সে বোমার শক্তি ছিল ১৫ কিলোটন অর্থাৎ ১৫০০০ টন টিএনটি (TNT)-এর জ্বালানি শক্তির সমান। আধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতা মাপা হয় মেগাটনে (এক মেগাটন = ১০৬ টন টিএনটি)। মাত্র ২০ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন একটি পারমাণবিক অস্ত্র ৪৮ বর্গমাইল এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে। এ রকম ৫০টি অস্ত্র যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী এলাকায় নিক্ষেপ করা হয় তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৪০ ভাগ জনগণ, শতকরা ৫০ ভাগ প্রধান সুযোগ-সুবিধা এবং শতকরা ৬০ ভাগ শিল্প-কারখানাকে ধ্বংস করে ফেলবে। শুধু পারমাণবিক অস্ত্র নয়, ভয়াবহ রাসায়নিক অস্ত্র (Chemical weapons), জীবাণু অস্ত্র (Biological weapons) প্রভৃতির মজুদও ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পাল্লার নানা ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম এসব শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম।

নিরস্ত্রীকরণ

পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা বর্তমান বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত ও শঙ্কিত করে রেখেছে। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রাংকেল বলেন, এসব পারমাণবিক অস্ত্রের বহুল ব্যবহার এমন অনিষ্ট করবে এবং এমন অনমনীয়ভাবে প্রতিশোধমূলক অনিষ্টের দ্বার খুলে দেবে, যা কোনো সমাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য হবে। এর পরিণামে আমাদের সভ্যতার সম্পূর্ণ বিনাশ হতে পারে।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতা ও এর নির্মাণ ব্যয়ের দিক বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ মহলে এসব অস্ত্র প্রতিযোগিতার ওপর কিভাবে যবনিকা টানা যায় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নিরস্ত্রীকরণকে বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণকে শান্তির প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হতো, এখন সেটাকে মানব জাতির বেঁচে থাকার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বর্তমান সময়ে নিরস্ত্রীকরণ যে মানুষের বেঁচে থাকার সাথে যথার্থই সম্পর্কযুক্ত এ বিষয়টি নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত দলিলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। মানুষের সামনে দুটো পথ খোলা আছে : হয় আমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে থামিয়ে নিরস্ত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হবো অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হবো।

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) বলতে বোঝায় অস্ত্রশস্ত্রসমূহের উৎপাদন বন্ধ এবং মজুদ হ্রাস করে ক্রমান্বয়ে অস্ত্রশস্ত্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা। অপরদিকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ অস্ত্রশস্ত্রের মজুদকে স্বীকার করে, তবে সেগুলোর ব্যবহারের ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। জর্জ এ মিনকলন বলেন, নিরস্ত্রীকরণ

অস্ত্রশস্ত্রকে নির্মূল বা হ্রাসকরণের সুপারিশ করে। অন্যদিকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কিছু পরিমাণ অস্ত্র থাকার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করে, কিন্তু এগুলো পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকতে হবে। (Disarmament suggests elimination or reduction of armaments; arms control suggests, at least to some, that armaments might continue to exist, but would be subject to regulation.)

নিরস্ত্রীকরণের ধারণাটা অনেকটা উচ্চাভিলাষী। সেক্ষেত্রে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি বেশ বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত। নিরস্ত্রীকরণ অনেকটা সনাতনী ধারণা কিন্তু জাতিসমূহ যখন নিরস্ত্রীকরণে সম্মত না হয় অর্থাৎ তারা অস্ত্রশস্ত্রসমূহ বিলোপ না করে, তখন বিশ্বব্যাপী বিকল্প হিসেবে নতুন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় আর তার নাম হচ্ছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে বহুপাক্ষিক নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সীমিতকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং চরম ধ্বংসাত্মক অস্ত্রসমূহ (Weapons of Mass Destruction) হ্রাসকরণ এবং ক্রমান্বয়ে বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পারমাণবিক, রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্রের বাইরে প্রচলিত অস্ত্রসমূহ যেমন— বহনযোগ্য হালকা অস্ত্র, ভূমিমাইন প্রভৃতির বিস্তৃতিও মানবজাতির জন্য বিশাল হুমকিস্বরূপ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য একটা বিশেষ ফোরাম আছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১১ নম্বর সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মূলনীতিসহ সহযোগিতার সাধারণ মূলনীতি রক্ষার দায়িত্ব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে দেয়া হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণ বিষয়াদি তদারকির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের দুটি সংস্থা রয়েছে :

১. **নিরস্ত্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (Disarmament & International Security Committee) :** এটা সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশনের সময় মিলিত হয় এবং সাধারণ পরিষদের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকি করে।

২. **জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ কমিশন (United Nations Disarmament Commission) :** এটি জাতিসংঘের একটা বিশেষ অঙ্গ, যা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে জাতিসংঘে মোট তিনটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো যথাক্রমে ১৯৭৮, ১৯৮২ এবং ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Conference on Disarmament) : নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জাতিসমূহের জন্য একমাত্র বহুপাক্ষিক আলোচনা ফোরাম।

নিরস্ত্রীকরণ বিভাগ (Department of Disarmament) : জাতিসংঘ সদর দপ্তরে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত একটি বিভাগ আছে। প্রচলিত অস্ত্র সংক্রান্ত নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান, বিভিন্ন অস্ত্র চুক্তিতে নির্ভুল তথ্য প্রদান, নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় সহায়তা করা প্রভৃতি এ বিভাগের দায়িত্ব।

জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (UN Institute on Disarmament Research) : এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর জেনেভায় অবস্থিত এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে বিশ্ববাসী দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিষয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও মূলত বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে এ সমস্যাটি সমাধানের প্রথম আহ্বান জানানো হয়। ১৮৯৯ সালের প্রথম হেগ সম্মেলনে পাশবিক অস্ত্রসমূহ যেমন—বুলেট, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদিকে বিধি বহির্ভূত করে যুদ্ধকে কিছুটা সহনীয় করার চেষ্টা করা হয়। ১৯০৭ সালের দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনে অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র তৈরি সীমাবদ্ধ রাখতে বা এগুলোর মজুদ কমাতে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বহুপাক্ষিক পদক্ষেপসমূহ

রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহুপাক্ষিক নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রেও দারুণ পরিবর্তন এসেছে। এ যাবৎকাল অর্জিত বিভিন্ন কর্মসূচি নিম্নরূপ :

১. **পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি :** ইংরেজিতে একে বলা হয় Nuclear Non-Proliferation Treaty সংক্ষেপে NPT। ১৯৬৮ সালের ১২ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে NPT গৃহীত হয়। একই সালের ১ জুলাই স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ বছর মেয়াদি এ চুক্তিতে ৪০টি দেশ স্বাক্ষর করে। ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়। ১৯৯৫ সালে চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হলে ১৯৯৮ সালে পুনরায় চুক্তিটি নবায়ন করা হয়। ১৯০টি দেশ চুক্তিটি নবায়ন করে। ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি। উত্তর কোরিয়া চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও ২০০৩ সালে প্রত্যাহার করে। বাংলাদেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে ও অনুমোদন করেছে।
চুক্তির মূল বিষয়সমূহ :
ক. ক্রমান্বয়ে বিশ্ব থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন,
খ. নতুন করে অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ,
গ. অস্ত্র রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ,
ঘ. পারমাণবিক অস্ত্রকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা, ইত্যাদি।

২. **ব্যাপক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি :** ইংরেজিতে একে বলা হয় Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, সংক্ষেপে CTBT। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫১তম অধিবেশনে CTBT গ্রহণ করা হয়। সদস্য দেশসমূহের স্বাক্ষরের জন্য চুক্তিটি উন্মুক্ত রাখা হয়।
চুক্তির ১৪(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি কার্যকরী হবে না যতক্ষণ না পারমাণবিক গবেষণা রিয়্যাক্টর-সমৃদ্ধ ৪৪টি দেশের প্রত্যেকটি এ চুক্তি অনুমোদন না করে।
ভারত এবং পাকিস্তানসহ কতিপয় দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি। রাশিয়া, আমেরিকা, চীন চুক্তিটি এখনো অনুমোদন করেনি। চুক্তিটি কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

৩. **রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত চুক্তি (Chemical Weapons Convention) :** সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংস সাধন। সম্মেলনটি ১৯৯২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়, ১৯৯৩ সালের ১৩ জানুয়ারি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ১৯৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল এটা কার্যকরী হয়। সে সময় থেকেই নেদারল্যান্ডের হেগস্থ রাসায়নিক অস্ত্রসমূহ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) CWC-এর ধারাসমূহের বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে।

৪. **জীবাণু অস্ত্রসংক্রান্ত চুক্তি (Biological Weapons Convention) :** সব ধরনের জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংসসাধন সংক্রান্ত সম্মেলনটি ১৯৭১ সালে সমাপ্ত হয়, যা ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ কার্যকরী হয়।

৫. **অটোয়া কনভেনশন (Ottawa Convention) :** মানববিধ্বংসী স্থলমাইনের ব্যবহার, মজুদ, উৎপাদন এবং হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত সম্মেলনটি কানাডার অটোয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর এটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত এবং ১৯৯৯ সালের ১ মার্চ কার্যকর হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ১৬১টি দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালের ৭ মে ১২৬তম সদস্য হিসেবে এটিতে স্বাক্ষর করে ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর অনুমোদন করলে কার্যকর হয় ২০০১ সালের ১ মার্চ। চুক্তিটি বর্তমানে কার্যকরী রয়েছে।

৬. **অ্যান্টার্কটিক চুক্তি (Antarctic Treaty) :** ১৯৫৯ সালের ১ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত এ চুক্তিটি ১৯৬১ সালের ২৩ জানুয়ারি কার্যকর হয়। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে সব ধরনের অস্ত্রের পরীক্ষা ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

৭. **মহাকাশ ও পানির নিচে অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (Outer Space Treaty) :** ১৯৬৭ সালের ২৭ জানুয়ারি পানির নিচে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এ যাবৎকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৫টি আইনি উপাদান (Legal instrument) অনুমোদন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে—

1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including Moon and Other Celestial Bodies —1967.
2. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (The Rescue Agreement) —1967.
3. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Space Liability Convention)—1971.
4. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (The Registration Convention) — 1974.
5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (the Moon Agreement) — 1979.

এগুলো ছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে কতিপয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এগুলো হচ্ছে—

ক. **ট্লাটেলোলকো চুক্তি (Treaty of Tlatelolco) :** ১৯৬৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত এবং ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল কার্যকর করা হয়। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী উল্লিখিত অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, ব্যবহার, উৎপাদন, মজুদ অথবা অর্জন নিষিদ্ধ করা হয়। পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী পাঁচটি দেশই এ চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ।

খ. **কতিপয় প্রচলিত অস্ত্রসংক্রান্ত চুক্তি (Convention on Certain Conventional Weapons) :** ১৯৮০ সালের ১০ অক্টোবর কতিপয় ক্ষতিকারক প্রচলিত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির অধীনে আরো চারটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গ. **রারোতোঙ্গা চুক্তি (Treaty of Rarotonga) :** ১৯৮৫ সালের ৬ আগস্ট দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা চুক্তি (South Pacific Nuclear Free Zone Treaty) নামে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী বর্ণিত অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ, স্থাপন, পরীক্ষা, পারমাণবিক বর্জ্য ফেলানো নিষিদ্ধ করা হয়।

ঘ. **ব্যাংকক চুক্তি (Treaty of Bangkok) :** ১৯৯৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা চুক্তি (South-East Asia Nuclear-Weapons-Free Zone Treaty) নামে এ চুক্তিটি স্বাক্ষর এবং ১৯৯৭ সালের ২৮ মার্চ কার্যকর করা হয়।

ঙ. **পেলিনদাবা চুক্তি (Treaty of Pelindaba) :** ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল আফ্রিকান অঞ্চল পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত সংক্রান্ত চুক্তিটি (African Nuclear-Weapons-Free Zone Treaty) স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০০৯ সালের ১৫ জুলাই কার্যকর হয়। এ চুক্তিটি আফ্রিকা অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহ : নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পর্যায়েও অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়ে এবং পরে দুই পরাশক্তি এ ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র দ্রুত কমিয়ে আনবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয় :

১. **সল্ট-১ (Strategic Arms Limitation Talk) :** ১৯৭২ সালের ২৭ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। Anti-Ballistic System সীমিত করা, Strategic Offensive Forces-এর ক্ষেত্র সাময়িকভাবে সীমিতকরণ এবং Anti-Ballistic Missile সীমিতকরণ-ই ছিল চুক্তিটির মূল বিষয়।

২. **সল্ট-২ :** এটি যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ জুন স্বাক্ষরিত হয়। আক্রমণাত্মক অস্ত্র ২৪০০-এর মধ্যে সীমিত রাখা এবং ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা ২২৫০-এর মধ্যে সীমিত রাখা এ চুক্তির মূল বিষয় ছিল।

৩. **স্টার্ট-১ (Strategic Arms Reduction Treaty—I) :** এটিও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মূল বিষয় ছিল ২০০১ সালের মধ্যে আমেরিকা ও রাশিয়া উভয় দেশের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ১৬০০-এর মধ্যে এবং পারমাণবিক ওয়্যারহেড ৬০০০-এর মধ্যে কমিয়ে আনা এবং ১৯৯১ সালে যে অস্ত্র মজুদ ছিল তার ত্রিশ শতাংশ হ্রাস করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯২ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরাধিকারী হিসেবে রাশিয়ান ফেডারেশন, বেলারুশ, কাজাকিস্তান এবং ইউক্রেনকে স্বীকার করে START-I চুক্তির অধীন লিসবন প্রটোকল স্বাক্ষর করা হয়। অবশ্য ১৯৯৬ সালে রাশিয়ান ফেডারেশন ছাড়া বাকি রাষ্ট্রগুলো তাদের পারমাণবিক অস্ত্রসমূহ রাশিয়ান ফেডারেশনের কাছে হস্তান্তর করে। ২০০৯ সালের ৫ ডিসেম্বর স্টার্ট-১ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়।

৪. স্টার্ট-২ চুক্তি : ১৯৯৩ সালের ৩ জুন আমেরিকা ও রাশিয়া স্টার্ট-২ চুক্তি অনুযায়ী ২০০৩ সালের মধ্যে পারমাণবিক ওয়্যারহেড ৩,৫০০-এ কমিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হয়।

৫. নিউ স্টার্ট : নিউ স্টার্ট (New START) যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। ২০১০ সালের ৮ এপ্রিল চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চুক্তিটি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ৫ ডিসেম্বরে মেয়াদ শেষ হওয়া স্টার্ট ১-এর স্থলাভিষিক্ত হয় নিউ স্টার্ট।

বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ বিস্তৃতি বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। এজন্যই সারা বিশ্ব আজ অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যাপারে সতর্কভাবে অগ্রসর হচ্ছে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থাসহ বিশ্বের পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রসমূহ আজ এ ভয়াবহ অস্ত্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে অস্ত্র সীমিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, কাগজে-কলমে ছাড়া বাস্তবে সেরকম উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Stars War বা তারকা যুদ্ধ পরিহার করলেও নতুন করে 'Theatre Missile Defence' কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নতুন নতুন দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হচ্ছে। আরো অনেক দেশ এ মারণাস্ত্র তৈরির কৌশল অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যা বিশ্ববাসীর জন্য অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সচেতন হতে হবে। তবেই বিশ্ব এসব অস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়ন কার্যক্রমে মনোনিবেশ করতে পারবে।

১৮। ক. নিরস্ত্রীকরণ কি?
খ. আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে স্বঘোষিত ৮টি দেশের হাতে শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে এবং আরো বেশ কিছু রাষ্ট্রের হাতে গোপন পারমাণবিক অস্ত্রের প্রযুক্তি আছে বা অনেক দেশ প্রযুক্তি অর্জনে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা সম্পর্কে বিশ্ববাসী প্রথম অবহিত হয় ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট ও ৯ আগস্ট; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। সে বোমার শক্তি ছিল ১৫ কিলোটন অর্থাৎ ১৫০০০ টন টিএনটি (TNT)-এর জ্বালানি শক্তির সমান। আধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতা মাপা হয় মেগাটনে (এক মেগাটন = $১০^{৬}$ টন টিএনটি)। মাত্র ২০ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন একটি পারমাণবিক অস্ত্র ৪৮ বর্গমাইল এলাকা পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে। এ রকম ৫০টি অস্ত্র যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী এলাকায় নিক্ষেপ করা হয় তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৪০ ভাগ জনগণ, শতকরা ৫০ ভাগ প্রধান সুযোগ-সুবিধা এবং শতকরা ৬০ ভাগ শিল্প-কারখানাকে পুড়িয়ে ফেলবে। শুধু পারমাণবিক অস্ত্র নয়, ভয়াবহ রাসায়নিক অস্ত্র (Chemical weapons), জীবাণু অস্ত্র (Biological weapons) প্রভৃতির মজুদও ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পাল্লার নানা ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম এসব শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম।

নিরস্ত্রীকরণ

পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা বর্তমান বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত ও শঙ্কিত করে রেখেছে। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রাংকেল বলেন, এসব পারমাণবিক অস্ত্রের বহুল ব্যবহার এমন অনিষ্ট করবে এবং এমন অনমনীয়ভাবে প্রতিশোধমূলক অনিষ্টের দ্বার খুলে দেবে, যা কোনো সমাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য হবে। এর পরিণামে আমাদের সভ্যতার সম্পূর্ণ বিনাশ হতে পারে।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতা ও এর নির্মাণ ব্যয়ের দিক বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ মহলে এসব অস্ত্র প্রতিযোগিতার ওপর কিভাবে যবনিকা টানা যায় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নিরস্ত্রীকরণকে বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণকে শান্তির প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হতো, এখন সেটাকে মানব জাতির বেঁচে থাকার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বর্তমান সময়ে নিরস্ত্রীকরণ যে মানুষের বেঁচে থাকার সাথে যথার্থই সম্পর্কযুক্ত এ বিষয়টি নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত দলিলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। মানুষের সামনে দুটো পথ খোলা আছে : হয় আমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে থামিয়ে নিরস্ত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হব অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হব।

আধুনিক বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য নিরস্ত্রীকরণ অনিবার্য। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা উত্তেজনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। অস্ত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অন্যকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়। বর্তমান যুগে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা সমগ্র বিশ্বে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্রেরও সামরিক ঘাঁটি বিভিন্ন দেশে রয়েছে। যে কোনো সময় এসব ঘাঁটির কোনো একজন সেনাধ্যক্ষের সাময়িক ভুলের কারণেও সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে। বর্তমানে রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫৭ মেগাওয়াটের আণবিক বোমা ব্যবহার করতে সক্ষম। ১৯৪৫ সালে এর চেয়ে বহুগুণে কম শক্তিশালী আণবিক বোমায় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অস্ত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নিরস্ত্রীকরণ রাজনৈতিক উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে সহায়তা করবে। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া ব্যতীত নিরস্ত্রীকরণ অর্থহীন। রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাসের প্রচেষ্টা নিরস্ত্রীকরণে উৎসাহ জোগাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধ সৃষ্টি করে। যেমন, অ্যাটম বোমা উৎপাদনে সাফল্যের ঘটনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার রূপে প্রয়োগ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র আণবিক মারণাস্ত্রের প্রাধান্যের মাধ্যমে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নও অ্যাটম বোমা তৈরির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হবার প্রচেষ্টা করেছে। এভাবেই হাইড্রোজেন বোমা থেকে নক্ষত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।

আণবিক মারণাস্ত্রের আতঙ্ক বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ যদি সর্বাত্মক না হয়ে আংশিক হয়, তথাপি তা মানুষের মনে শান্তি ও নিরাপত্তার ধারণা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নোয়েল বেকার অভিমত প্রকাশ করেন, নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সাহায্য করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৮১৭ সালের রাশ-ব্যগট চুক্তি এবং ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন নৌবাহিনী সংক্রান্ত নিরস্ত্রীকরণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ১৯২২ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত নৌবাহিনী সংক্রান্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং গ্রেট ব্রিটেনের নৌবাহিনীর পরিমাণ হ্রাসের ফলে তাদের সম্পর্ক উন্নত হয়।

অধ্যাপক মর্গানথ্যু অবশ্য নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, অস্ত্র আছে বলেই মানুষ যুদ্ধ করে না। তারা যুদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করে বলেই অস্ত্র সংগ্রহ বা উৎপাদনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ অস্ত্রের জন্যই যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধের প্রবণতা থেকেই অস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণের পাশাপাশি যুদ্ধংদেহী মনোভাবও দূর করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির সামরিকীকরণ রোধের জন্যও নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বহুদেশের অর্থনীতিকে সামরিকবাহিনী এবং প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। জাতীয় ব্যয় বরাদ্দের বিপুল অংশ সামরিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র সামরিক খাতে বারশ কোটি ডলারেরও অধিক অর্থ অস্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যয় করে থাকে। এ ব্যয় বাৎসরিক হিসেবে পৃথিবীর সামগ্রিক পণ্যমূল্যের আটগুণেরও বেশি এবং সমস্ত অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের দুই তৃতীয়াংশের অর্ধেক।

অস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম উৎপাদনকারী বহু সংস্থা গড়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থেকে কর্মসংস্থান করছে। কোটি কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে নিরস্ত্রীকরণ অর্থনীতিতে ভয়ানক মন্দাভাব সৃষ্টি করবে, যা অতীতের সকল মন্দার ইতিহাসকে ম্লান করে দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তরের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, অস্ত্র বিক্রয় হ্রাস পেলে ৫২০০০ ব্যক্তি কর্মহীন হয়ে পড়বে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয়ের ৬৯% সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়েছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯৮৩ সালে ঐ খাতে ব্যয় করেছে যথাক্রমে ৫০% এবং ৩৩%।

সামরিক খাতে বরাদ্দকৃত প্রতি ১ বিলিয়ন ডলার গৃহ নির্মাণ শিল্পে, চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে কয়েক মিলিয়ন কর্মক্ষম ব্যক্তি বেকারত্বের শিকারে পরিণত হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেমন— জার্মানি, স্পেন, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলোতেও বেকারত্বের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কিন্তু ঐসব দেশে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক থেকে গঠনমূলক প্রকল্প রূপায়ণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার মতো সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদিত প্রতিটি নিউট্রন বোমার তেজস্ক্রিয়তা হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর বর্ষিত অ্যাটম বোমার পাঁচগুণ।

নিউট্রন বোমার তেজস্ক্রিয়তা মানবদেহের জীবন্ত কোষের আণবিক যৌগ ছিন্ন করে। নিউট্রন বোমার বিস্ফোরণের ফলে এর ৮০০ মিটারের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করবে। ১৪০০ মিটার দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী মানুষ কঠোর যন্ত্রণা ভোগের পর মারা যাবে।

রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগ বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করেছে। কয়েক বছর পূর্বে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক বিশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পাঁচ মিলিয়ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট কোনো শহরে বিমান থেকে রাসায়নিক অস্ত্র নিক্ষেপ করা হলে কোনো প্রকার চিকিৎসার পূর্বেই ৮০,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। আরও ৭০,০০০ মানুষ অচিরেই মৃত্যুবরণ করবে।

তাছাড়া যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এ গ্যাস পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। সমুদ্রতল, ভূগর্ভ, মরু অঞ্চল এবং বায়ুমণ্ডলে আণবিক তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা কোনো প্রকারে সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ মহাসমুদ্রে বিপুল পরিমাণ আণবিক বর্জ্য

নিক্ষেপ করে। সামুদ্রিক প্রাণীর জন্য এ বর্জ্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর ফলে সমুদ্রের পানি মারাত্মক দূষিত হয়ে সামুদ্রিক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬১-১৯৭১ সালের মধ্যে ২,০০,০০০ টন নাপাম বোমা এবং ৭৫ মিলিয়ন লিটার বিষাক্ত তরল পদার্থ নিক্ষেপ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের ১৩ মিলিয়ন হেক্টর চাষের জমি ধ্বংস করেছিল। এরা গণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের জলসেচব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। পঞ্চাশের দশকে ইংরেজবাহিনী মালয়েশিয়ার কৃষিজাত পণ্য ধ্বংস করেছিল।

এসব সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলো নিজেদের প্রতিশোধের স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। নিজেদের এ প্রতিশোধ স্পৃহা কার্যকর করার জন্য অন্য দেশের পরিবেশ ধ্বংস সাধনেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। নিরস্ত্রীকরণের ফলে পৃথিবীর মানুষ অন্তত মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকার আশ্বাস পেতে পারে।

চতুর্থত, অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তা মানবজাতির কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। আণবিক শক্তি পরিচালিত একটি ট্রিডেন্ট সাবমেরিন তৈরির জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়। এ অর্থে ১৬ বিলিয়ন ছাত্রের এক বছরের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা যায়। একটি আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তা দিয়ে ১টি উন্নত মানের হাসপাতাল নির্মাণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বের নানা ধরনের দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। এসব রোগব্যাধি আবিষ্কারের জন্য গবেষণা খাতে উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করলে অচিরেই এসব রোগের ওষুধ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হবে।

উন্নত দেশগুলো অস্ত্র সজ্জার জন্য কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করছে, অথচ অনুন্নত দেশগুলোতে অগণিত মানুষ দারিদ্র্য, রোগ শোক, অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নিরস্ত্রীকরণ আবশ্যক। উন্নত দেশগুলো নিজের মুনাফার প্রয়োজনে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অস্ত্র রপ্তানির কেন্দ্রে পরিণত করেছে। উপরন্তু, উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে অস্ত্র রপ্তানিকারী দেশসমূহ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। বিপুল পরিমাণ সামরিক ব্যয় উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনকেই কেবল বিপদগ্রস্ত করে না, তাদেরকে বৈদেশিক ঋণের নাগপাশেও আবদ্ধ করে। ১৯৫৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেন হাওয়ার বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, 'Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies in the final sense, a theft from those who are hungry and are not fed, those who are cold and are not clothed."

অস্ত্র নির্মাণ করার জন্য কেবল যে, অর্থের অপচয় হচ্ছে, তাই নয়, এর ফলশ্রুতি হিসেবে শ্রমিকের শ্রম, বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। অস্ত্র ব্যবসায়ীর প্ররোচনার ফলে বা শক্তি প্রদর্শন করার জন্য সামরিক বাহিনীর আগ্রহের দরুন পৃথিবী যে কোনো সময় স্থায়ী যুদ্ধ বা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পথে অগ্রসর হতে পারে। এরূপ আণবিক যুদ্ধ সভ্যতার আত্মহত্যার সামিল হবে। বর্তমানে শান্তি ও ধ্বংসের প্রশ্ন অবিভাজ্য। অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্ব নিরাপত্তার সাথে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পঞ্চমত, মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল অপচয় ও অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য নিরস্ত্রীকরণ অনিবার্য। বিশ্বব্যাপী মারণাস্ত্র উৎপাদনে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা যদি মানব কল্যাণে ব্যবহার করা হয় তবে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইবে। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সম্পদ মানব কল্যাণে ব্যয় করা না হয়ে অস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দুঃখ দুর্দশা সাধারণ মানুষের চিরদিনের সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের খাদ্য উৎপাদন ও বাসস্থানের জন্য চাষাবাদের জমিসহ প্রচুর জমি আবশ্যক। কিন্তু মানুষের এ অপরিহার্য প্রয়োজন পূর্ণ করার পরিবর্তে সামরিক স্বার্থ রক্ষার জন্য জমি ব্যবহারে উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে ৫,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও অধিক জমি অনুৎপাদনশীল সামরিক প্রয়োজনে বরাদ্দকৃত রয়েছে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর ৭০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি নিজের দখলে রেখেছে, যার পরিমাণ সমগ্র আয়ারল্যান্ডের ভূখণ্ডের সমান।

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত মহামূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদও অস্ত্র উৎপাদনের ন্যায় অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশসমূহ গড়ে তাদের কাঁচামালের শতকরা ৫-১০ ভাগ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করে।

অস্ত্র সজ্জার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তা মানব জাতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে ব্যয় করা যায়। বিগত কয়েক বছরে দুর্ভিক্ষ ও খরায় আফ্রিকাসহ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোতে কয়েক মিলিয়ন মানুষ অনাহারে ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু এসব দিকে দৃকপাত করার সময় অস্ত্র প্রতিযোগী অশুভ শক্তিসমূহের দৃষ্টিপাত হয় না। উপরন্তু অস্ত্রের উৎপাদন প্রতি বছর বেড়েই চলছে। প্রতিবছরই ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের ফলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করতে হয়।

১৯৮৪ সালে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর ১৩০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র ক্রয় করেছে। নব্বই সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ বছরের জন্য ২৬ বিলিয়ন ডলার সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। নক্ষত্র যুদ্ধের জন্য ১৫০০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল। একমাত্র ন্যাটো জোটভুক্ত দেশসমূহের সামরিক প্রস্তুতির জন্য ব্যয় হয়েছে ৬৮০ বিলিয়ন ডলার।

বর্তমান বিশ্বে অস্ত্র পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অস্ত্র প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা মনুষকে ভাবতে শিখিয়েছে। তাই বলা যায়, নিরস্ত্রীকরণ ছাড়া মানুষের বাঁচার কোনো পথ নেই।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। যুদ্ধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের কারণে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শঙ্কিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হলেও সমস্ত পৃথিবী আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বেলিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সচেতন মানুষ ভেবেছিল যদি পারমাণবিক অস্ত্র এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সমগ্র সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে চেতনা হয় যে, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। নিরস্ত্রীকরণের সাথে মানুষের অস্তিত্ব জড়িত। নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে মানুষ ধ্বংস হতে পরিত্রাণ পাবে। অস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে যদি রোধ করা যায় তবে সবলের হাত থেকে দুর্বল রক্ষা পাবে এবং পৃথিবী স্থিতিশীল হবে। তাই বলা যায় 'নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত।'

১৯। ক. NPT ও CTBT সম্পর্কে ধারণা দিন।
খ. চুক্তি দুটির বাস্তবায়নে সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ব প্রত্যক্ষ করে ভয়াবহ মারণাস্ত্রের ধ্বংসলীলা। মুহূর্তের মধ্যে মানব সভ্যতার একটা বিরাট অংশ ধ্বংসের করালগ্রাসে নিপতিত হয়। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা দেখে বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে যায় এবং তখন থেকেই প্রচেষ্টা চলতে থাকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার। পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন অপেক্ষা পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তার বিষয়টা অধিকতর শঙ্কা ও ভয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে আধুনিককালে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের আশঙ্কা নানা দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এবং ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় সে দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তাকে অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ করে দিয়েছে। এমনও দেখা গেছে, অনেক ইউরেনিয়াম/প্লুটোনিয়ামসমৃদ্ধ কারখানায় কেবল বেতন প্রদানের অভাবে কোনো নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সুযোগে এ মারণাস্ত্রের প্রযুক্তি দেশের বাইরে হস্তান্তরিত হতে পারে। এভাবে ক্রমান্বয়ে এ অস্ত্রশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে পৌছে যেতে পারে, যা হবে বিশ্বের জন্য একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। জোসেফ ফ্রাঙ্কলিনের ভাষায়, পারমাণবিক অস্ত্রের বহুল ব্যবহার বা প্রসার এমন ধ্বংস আনবে এবং এমন প্রতিশোধমূলক ধ্বংসের দ্বার খুলে দেবে, যা যে কোনো সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে এবং তার পরিণাম হবে আমাদের সভ্যতার পরিপূর্ণ ধ্বংস সাধন।

নিরস্ত্রীকরণের প্রেক্ষাপট : উপরোল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হতে থাকে এবং বিশ্বে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে জাতিসংঘের সনদে এ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণকে একটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এখান থেকেই মূলত নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্র নিঃশেষ সংক্রান্ত আলোচনা শক্ত ভিত্তি লাভ করে।

ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কৌশল আবিষ্কার করার প্রেক্ষাপটে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দুই পরাশক্তি তাদের একচেটিয়া আধিপত্যের প্রতি একটা বড় ধরনের হুমকি অনুভব করে এবং অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের পারমাণবিক প্রাধান্য বজায় রাখার ব্যাপারে ভীষণভাবে তৎপর হয়। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধসংক্রান্ত একটি ব্যাপকভিত্তিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তারা এটা বাস্তবায়নের প্রয়াস পায়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পরাশক্তিদ্বয় বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রসমূহকে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায় কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৬৮ সালে জেনেভায় ১৭ সদস্যবিশিষ্ট নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধসংক্রান্ত একটি যৌথ খসড়া চুক্তি পেশ করে। এ খসড়া চুক্তি অন্যান্য ক্ষমতালিপ্সু দেশসমূহ কর্তৃক প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়।

পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি (NPT)

Nuclear Non-Proliferation Treaty বা NPT বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যু। এ চুক্তি বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার হ্রাস করবে বলে আশা করা গেলেও ১৯৯৮ সালে পাকিস্তান এবং ভারত কর্তৃক পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষায় NPT সম্পর্কে নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার যুগে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে শক্তিশালী দেশগুলো এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার সিনেটে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ সংক্রান্ত একটি চুক্তির পক্ষে বিল পাস হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৬৮ সালে প্রথমবারের মতো NPT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬৮ সালের এই চুক্তিটি কার্যকরী হয় ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ থেকে। ১৯৯৫ সালে চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হয়। অতঃপর ১৯৯৫ সালে চুক্তিটি পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা হয়। NPT চুক্তিটি পুনর্বিবেচনা এবং চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে। উত্তর কোরিয়াসহ ১৮৯টি দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও উত্তর কোরিয়া ২০০৩ সালে প্রত্যাহার করে। এখন পর্যন্ত ভারত, পাকিস্তান এবং ইসরাইল NPT-তে স্বাক্ষর করেনি।

NPT হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় বহুপাক্ষিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি। বাংলাদেশ চুক্তিটি সই করেছে এবং ইতিমধ্যে অনুমোদনও করেছে। এ চুক্তির কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো : পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত দেশসমূহ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী না হওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়া এবং চুক্তির সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রসমূহ নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

বিভিন্ন অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধকল্পেও চুক্তি সাধিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে অ্যান্টার্কটিকাতে পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ ও পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে চুক্তি সাধিত হয়েছে, ১৯৬৭ সালে মহাশূন্যে পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি এবং ১৯৭১ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠে পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সাধিত হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসানের জন্য, নিরস্ত্রীকরণের জন্য, সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য সরল বিশ্বাসে আলাপ-আলোচনা করে যাবে।

অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বাক্ষরিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে পদ্ধতিগত বর্ধিষ্ণু হারে প্রচেষ্টা চালানো এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পারমাণবিক অস্ত্রের পরিপূর্ণ বিলোপ সাধন (Ultimate goal of the total elimination of nuclear weapons)।

নতুন স্বাক্ষরিত চুক্তিটির দুটি ধারা রয়েছে :

১. পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রগুলো পারমাণবিক অস্ত্র নেই এমন রাষ্ট্রে অস্ত্র উৎপাদন, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে না এবং এ ব্যাপারে কোনো সাহায্যও করবে না।

২. যেসব দেশে অস্ত্র নেই সেসব দেশ নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ থেকে কোনো রকম সাহায্য ও প্রযুক্তি গ্রহণ করবে না।

এছাড়াও উৎপাদিত অস্ত্রের ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ, ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, নতুন অস্ত্র উৎপাদন না করা, পারমাণবিক প্রকল্প শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা এবং বাণিজ্যিকীকরণ নিষিদ্ধ করাসহ নানাবিধ ধারা-উপধারা চুক্তিটিতে সংযোজিত হয়।

চুক্তিটির মূল্যায়ন : পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিটি সর্বমহলে প্রশংসিত হলেও এবং এ ব্যাপারে একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলেও তৃতীয় বিশ্বের কতিপয় দেশসহ বেশ কয়েকটি দেশ এ চুক্তিকে দারুণভাবে সমালোচনা করেছে। এক সময় চীন ছিল চুক্তিটির বড় সমালোচক। চীনের মতে, এটা ছিল সম্পূর্ণ অসম চুক্তি (Out and out unequal treaty) ও বৃহৎ শক্তিবর্গ কর্তৃক শক্তির রাজনীতি খেলার একটি কৌশল (A tactic of power politics being played by the big nations)। অনেক দেশ এটাকে big powers' nuclear monopoly হিসেবে আখ্যায়িত করে। এসব দেশের যুক্তি হচ্ছে :

১. পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী নয় কিন্তু ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা অর্জনের প্রত্যাশী দেশসমূহের কাছ থেকে চিরতরে পারমাণবিক অস্ত্র দূরে রাখার কৌশল হিসেবে এটা করা হয়েছে। তারা নিজেদের অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ না করে অন্যদের পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করতে বলে।

২. এই চুক্তিটি হচ্ছে একটি অসম চুক্তি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশসমূহ অস্ত্র হ্রাস এবং নির্মূল করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবে। তবে এ ব্যাপারে তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বা কোনো সময়সীমা নেই।

৩. শিল্প-প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রসরকামী দেশসমূহ যাদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র নেই তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য এ অস্ত্রের অধিকারী হওয়া থেকে দূরে থাকতে চায় না।

৪. এ চুক্তিটি Haves ও Haves not-এ দুটি Block সৃষ্টি করেছে এবং Haves-দের ক্ষমতা ও প্রভাব আরো পাকাপোক্ত করেছে।

৫. এ চুক্তি Haves not-দের নিরাপত্তা প্রদান প্রসঙ্গে কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করেনি এবং এ ব্যাপারে শক্তিধর দেশগুলোও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

৬. চুক্তিটি আরো একটা কারণে বৈষম্যমূলক। কারণ চুক্তিতে অপারমাণবিক দেশের ক্ষেত্রে অস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা Monitoring ও যাচাই-বাছাই করার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু পারমাণবিক দেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা বা সুযোগ নেই।

৭. চুক্তির আরেকটি ত্রুটিপূর্ণ দিক হলো চুক্তিটি বিশ্বের সকল দেশকে একত্রিত করতে পারেনি।

NPT-এর প্রতি হুমকি

১. NPT নিরস্ত্রীকরণের ওপর বিশ্বের সবচেয়ে বড় চুক্তি হলেও পাকিস্তান এবং ভারত যথাক্রমে ২৮ মে ও ১৩ মে ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালায়, যা NPT-র প্রতি একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

২. পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশসমূহ কর্তৃক গৃহীত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা অসম্পূর্ণ রয়ে যাচ্ছে।

৩. চুক্তির শর্তানুযায়ী পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি কতিপয় দেশ কর্তৃক পালিত হচ্ছে না।

তবে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এ চুক্তিটি একটি পরিপূর্ণ চুক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং বিশ্ব থেকে ভয়াবহ পারমাণবিক অস্ত্র চিরতরে বিলুপ্ত হবে।

CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty)

ব্যাপকভিত্তিক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের ৫১তম অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং একই সালের ২৪ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরের জন্য চুক্তিটি উন্মুক্ত করা হয়। তখন ৭১টি দেশ স্বাক্ষর করে।

চুক্তিটি মূলত পারমাণবিক অস্ত্রের যে কোনো ধরনের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বা অন্য কোনো ধরনের বিস্ফোরণকে নিষিদ্ধ করে, যা প্রকৃতপক্ষে পারমাণবিক অস্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। এখানে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের পরিস্থিতি বা অবস্থা তদারকির ব্যবস্থা আছে।

চুক্তিটির ১৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক গবেষণা চুল্লির অধিকারী ৪৪টি দেশের প্রত্যেকটি কর্তৃক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিটি কার্যকরী হবে না।

চুক্তির ১৪(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখার তিন বছরের মধ্যে চুক্তিটি কার্যকরী না হলে যেসব দেশ ইতোমধ্যে চুক্তিটি অনুমোদন করেছে, তাদেরকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যার উদ্দেশ্য হবে চুক্তিটির কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করার কৌশল উদ্ভাবন। এ হিসেবে ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ৯২টি দেশ উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

দুর্বল দিক : এ চুক্তির সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে :

১. উত্তর কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, কিউবা, সৌদি আরব, সিরিয়া, ভুটান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

২. ১৮৩টি দেশ চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করলেও মাত্র ৩৬টি দেশ অ্যানেক্স ২ (ANNEX-2) অনুমোদন করে।

৩. পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী ৮টি দেশের মধ্যে মাত্র ৩টি দেশ (ফ্রান্স, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্য) চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীন চুক্তিটি অনুমোদন না করায় একটা বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস চুক্তিটি অনুমোদনের বিরোধী।

CTBT-র প্রতি ভারতের অভিযোগ

১. CTBT চুক্তিটি বৈষম্যমূলক, কারণ ৮টি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা বা বাধ্যবাধকতা এখানে নেই।

২. এ চুক্তি কম্পিউটারের সাহায্যে অস্ত্রপরীক্ষা করাকে নিষিদ্ধ করে না, যার ফলে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশসমূহ কম্পিউটারের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্রের গুণগত মান পরীক্ষা করতে পারে। পরাশক্তিসমূহ এখন সেটাই করছে।

৩. চুক্তিটির বাস্তবায়নও অনেকটা বাধ্যতামূলক। কারণ চুক্তির শর্তানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করলেই চুক্তিটি কার্যকরী হবে।

৪. চুক্তির অপর শর্তানুযায়ী, তিন বছরের মধ্যে চুক্তিটি কার্যকরী না হলে চুক্তিটি অনুমোদনকারী দেশসমূহকে নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হবে এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা নির্ধারণ করা হবে। ভারত 'পদক্ষেপসমূহ'কে অবরোধ অথবা অন্য কোনো প্রেসারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে, যা ভারতের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পাকিস্তানের CTBT স্বাক্ষর এবং অনুমোদনের বিষয়টা মূলত ভারতের ওপর নির্ভরশীল। ভারত চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করলে পাকিস্তানও চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করবে। পাকিস্তান এককভাবে নিরস্ত্রীকরণের বিপক্ষে থাকতে চায় না। পাকিস্তান এককভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয় এবং ভারতকে একটি আঞ্চলিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে আহ্বান জানায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন CTBT চুক্তি স্বাক্ষর, অনুমোদন করলে উত্তর কোরিয়াও চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করবে। উত্তর কোরিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা দেশটিকে পারমাণবিক অস্ত্রের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং পরীক্ষা করাকে সমর্থন করবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ভীতির আশঙ্কা (Threat Perception) চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার একটা বড় কারণ। তারপরও উত্তর কোরিয়া চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করবে, যদি সে এতদঞ্চলের অপরাপর দেশের সামরিক ক্ষমতার সাথে একটা ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাতে পারে।

রাশিয়া, চীনসহ অপরাপর স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ যারা এখনো চুক্তিটি অনুমোদন করেনি তারাও মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি অনুমোদন দিলেই যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করবে। কারণ বিশ্বের বেশির ভাগ জনগণই পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তারের বিরুদ্ধে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ৮৪% লোক মনে করে যে, সিনেটের উচিত চুক্তিটিতে অনুমোদন দেয়া। কাজেই আশা করা যায়, অচিরেই চুক্তিটি কার্যকরী হবে।

NPT ও CTBT চুক্তি দুটি পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ এবং ক্রমান্বয়ে অস্ত্র বিলোপ করার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। কতিপয় দেশের উচ্চাভিলাষী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চুক্তি দুটি ব্যাপকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না। মূলত পারমাণবিক দেশসমূহের বৈষম্যমূলক নীতির কারণেই অনেক দেশ চুক্তি দুটির বিপক্ষে অবস্থান করছে। এসব দেশ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অবশ্যই অপরাপর দেশ চুক্তি দুটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করবে। আশা করা যায়, অচিরেই চুক্তি দুটি বিশ্বের সকল দেশ স্বাক্ষর ও অনুমোদন করবে এবং মানব জাতির স্বার্থে গোটা বিশ্ব পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত হবে।

২০। 'পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা পৃথিবীর পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনবে।' —আপনার মতামত লিখুন।

উত্তর : ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের পর বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা ছিল স্থিতিশীল বিশ্বের। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের পতনের পর বিশ্ব ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। বিগত বছরগুলোর বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে প্রমাণিত হয় বিশ্বের পরিবেশগত ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে চলেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ তো বটেই রাজনৈতিক পরিবেশও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। ১৯৪৫ সালের শুরুতে মার্কিন বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম প্রকাশ্যে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সেই থেকে শুরু হয়ে আজও চলছে পরমাণু অস্ত্রের সম্প্রসারণ। একাধিক রাষ্ট্র এই অস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় পৃথিবীর পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। কেননা একাধিক পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণসহ ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের বিস্ফোরণের প্রভাবে আজও বিশ্ব পরিবেশ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেখা যায় কোনো দেশ একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে অন্য দেশ এর জবাব দেয় আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা : ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক দক্ষতায় অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের ভারী মৌলের বিভাজন ঘটিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৪৬ সালে দুটি এবং ১৯৪৮, ৫০ ও ৫৭ সালে আরো পাঁচটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার পরমাণু বোমার প্রযুক্তিগতবিদ্যাকে আরো নিখুঁত করে তোলে। তৎকালীন আরেক সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানী শাখারভের নেতৃত্বে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রমাণ দিল তাদের ক্ষমতা। ফলে মার্কিনীদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটে। শুরু হয় পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। 'Balance of Power' বজায় রাখতে উভয় দেশই আরো বেশি মনোযোগী হয় পরমাণু প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে সামরিক শক্তি অর্জনে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৪ সালে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এর জবাব দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পাশাপাশি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে পৌঁছালো পরমাণু অস্ত্র অর্জনের ক্ষমতা। ১৯৬৪ সালে এশিয়ার মাটিতে চীন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার সক্ষমতা জানান দিল। পরবর্তীতে ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া এই ক্ষমতা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে পাকিস্তান প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় একাধিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে।

স্বঘোষিত ৮ দেশের প্রথম পারমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের খতিয়ান

দেশ	বিস্ফোরণের তারিখ	
	পারমাণবিক বোমা	হাইড্রোজেন বোমা
১. যুক্তরাষ্ট্র	১৬ জুলাই ১৯৪৫	১ মার্চ ১৯৫৪
২. সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)	২৯ আগস্ট ১৯৪৯	২২ নভেম্বর ১৯৫৫
৩. যুক্তরাজ্য	৩ অক্টোবর ১৯৪৯	৮ নভেম্বর ১৯৫৭
৪. ফ্রান্স	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০	২৪ আগস্ট ১৯৬৮
৫. চীন	১৬ অক্টোবর ১৯৬৪	১৭ জুন ১৯৬৭
৬. ভারত	১৮ মে ১৯৭৪	-
৭. পাকিস্তান	২৮ মে ১৯৯৮	-
৮. উত্তর কোরিয়া	৯ অক্টোবর ২০০৬	-

বিশ্বের পারমাণবিক পরীক্ষাসমূহ : বিশ্বে এ যাবত ২০৬০টি পারমাণবিক পরীক্ষা হয়েছে, যার অধিকাংশই ঘটিয়েছে বৃহৎ সামরিক শক্তিধর পাঁচটি দেশ। এ ছাড়াও ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া, ভারত ও পাকিস্তান অজ্ঞাত সংখ্যক বিস্ফোরণ ঘটায়।

দেশের নাম	বিস্ফোরণ (ভূ-পৃষ্ঠ)	বিস্ফোরণ (ভূ-গর্ভ)	পরীক্ষার সংখ্যা
যুক্তরাষ্ট্র	২১৭	৮১৫	১,০৩২
রাশিয়া	২১৯	৪৯৬	৭১৫
যুক্তরাজ্য	২১	২৪	৪৫
ফ্রান্স	৫০	১৬০	২১০
চীন	২১	২২	৪৩
ভারত	৭	–	৭
পাকিস্তান	৬	–	৬
উত্তর কোরিয়া	৩	–	৩

[সূত্র : www.atomicarchive.com]

হুমকির মুখে বিশ্ব পরিবেশ : পরিবেশগত সমস্যা আজ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে প্রধান আলোচ্য বিষয়। রিও ডি জেনিরিও ও জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণের উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য পারমাণবিক পরীক্ষা অনেকাংশে দায়ী। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির বিস্ফোরণের প্রভাব আজও রয়ে গেছে। ঐ বোমার তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের ফল জাপানের পরিবেশ এবং মানুষের উপর আজও ভর করছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্ব পরিবেশ গবেষণা সংস্থা World Watch Institute তাদের ১৯৯৯ সালের বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিশ্বের পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য ঘন ঘন পারমাণবিক পরীক্ষাকে অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করে। ১৯৯০ সালের পর থেকে পৃথিবীর অনেক দেশেই কার্বন-ডাই অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ শতকরা ২০ থেকে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ১৮০ কোটির চেয়ে বেশি মানুষ বিশুদ্ধ বাতাস থেকে বঞ্চিত হয়।

বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর পরিবেশ আজ দূষিত হচ্ছে। মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে উন্নত দেশগুলোতেই দূষণ বেশি হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা গ্রিনহাউস গ্যাসের পাশাপাশি পরমাণু মৌলের তেজস্ক্রিয়তার কথাও বলেছেন। এসব কারণে বায়ুমণ্ডলে বহির্গামী তাপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। আর তাতে বাড়ছে পৃথিবীর উত্তাপ।

আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন 'Green Peace'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার বছরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)-এর পরিমাণ যত বেড়েছে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে গত তিনশ পঁচিশ বছরে।

গত ১০০ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ ডিগ্রি থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ১০ হাজার বছরের ইতিহাসে তাপ বৃদ্ধির এটাই সর্বোচ্চ মাত্রা। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাড়বে সমুদ্রতলের উচ্চতা। গত শতাব্দীতে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১-২ সেমি। ভূমণ্ডলীয় উত্তাপের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়বে ৩০-৫০ সেন্টিমিটার। এর ফলে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলগুলো নিমজ্জিত হবে। একই সাথে সূর্যের বিকিরণকৃত আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির কারণে মানুষের শারীরিক ক্ষতি সাধিত হবে।

পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধকল্পে অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব : পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) পর্যালোচনা শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালে ২-২৭ মে, নিউইয়র্কে। বিশ্বের ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেয়। ২৭ বছরের পুরোনো 'NPT' অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য চারটি পরমাণু শক্তিধর দেশ NPT অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানোর সুপারিশ করে। এ নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সাথে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর তীব্র মতভেদ হয়। তীব্র মার্কিন চাপে পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণ ও প্রসাররোধ চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্নে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একাধিক উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিরা বলেছিলেন বাস্তবসম্মত মূল্যায়নের ভিত্তিতে ডেটন চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দাবি ছিল পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো তাদের পরমাণু অস্ত্রের ভাণ্ডার নষ্ট করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করুক এবং চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন এমনভাবে হোক যাতে করে পরমাণু অস্ত্রের প্রসার রোধ করা যায়। চুক্তির মেয়াদ অনির্দিষ্টকাল বাড়ানো হবে না কি নির্দিষ্ট একটা সময় সীমার জন্য বাড়ানো হবে সে বিষয়ে ভোটাভুটিতে স্থির করা হয়। কিন্তু ১২টি আরব রাষ্ট্রের পক্ষে মিশর ও আলজেরিয়া একটি বিকল্প সূত্র আনে। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসরাইলকে NPT-তে স্বাক্ষর করানো। ভোটে সিদ্ধান্ত হয় যুক্তরাষ্ট্র ও পারমাণবিক শক্তিধর চারটি রাষ্ট্র NPT'র জন্য অনির্দিষ্টকালে সিদ্ধান্ত বাড়ানো হয়। ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল NPT-তে স্বাক্ষর না করার কারণে ভারত বরাবরই NPT চুক্তির বিরোধিতা করেছে।

পাকিস্তান বলেছে নয়াদিল্লি NPT স্বাক্ষর করলে তারাও উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরে এলেই তারা NPT-তে স্বাক্ষর করবে। পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির সার্থকতা নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলেও ঝড় উঠেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এই চুক্তির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি পারমাণবিক প্রতিযোগিতাকেই ত্বরান্বিত করবে।

পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বন্ধ করার চুক্তি CTBT'তে স্বাক্ষরে পরমাণু শক্তিধর প্রধান পাঁচটি রাষ্ট্রই অনীহা প্রকাশ করছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, NPT নিয়ে মতবিরোধ মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ১৯৬৮ সালের মস্কো, ওয়াশিংটন ও লন্ডনে পরমাণু অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ১৯৭০ সালে এ চুক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠার পর থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের কল্পনা আরো প্রসারিত করেছিলেন ঐতিহাসিক START (Strategic Arms Reduction Treaty) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। START-1 ও START-2 চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ঐকমত্যে পৌছায়। START চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। প্রথম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন মিখাইল গর্বাচেভ এবং জর্জ বুশ। এ চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশই মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র শর্তসাপেক্ষে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়। START-2 চুক্তিতে বরিস ইয়েলেৎসিন বুশের সাথে একমত হয় যে, ২০০৩ সালের মধ্যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলবে এবং অন্যান্য পরমাণু অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করবে। পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণের মাধ্যমেই পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্য আনয়ন সম্ভব। NPT'র যথাযথ বাস্তবায়ন ও CTBT-তে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের স্বাক্ষর প্রদানের ফলে পরিবেশের হুমকি অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র যে বোমা নিক্ষেপ করেছিল তার ক্ষতিকারক প্রভাব আজও জাপানিরা বহন করে চলেছে। এখনো সেখানে জমি অনুর্বর রয়ে গেছে, জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু। তেজস্ক্রিয়তার ভয়াবহতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরেনোবিল বিস্ফোরণ। পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণ ঘটানোতে বায়ুমণ্ডলের ক্ষতি হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে বাতাসে ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অন্য রাষ্ট্রগুলোকে পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে সহায়তা করা এবং পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তির সহজলভ্যতা পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তারে ভূমিকা রাখছে। যে কারণে কোনো রাষ্ট্রই নিজেকে নিরাপদ মনে করছে না। নিজস্ব নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হচ্ছে। একটি মাত্র পারমাণবিক অস্ত্রের আক্রমণেই বিশ্বে ঘটতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধের ঘটনা যা ধ্বংস করে দিতে পারে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। শক্তিধর পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রগুলোর আন্তরিকতাই পারে পরমাণু অস্ত্রের ভাণ্ডার ধ্বংসের উদ্যোগ নিতে।

২১। বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে, তাই ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন। —আলোচনা করুন।

উত্তর : তিন দশকেরও অধিককাল পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মরটন এ. কাপলান (Morton A. Kaplan) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার (System) গঠন সম্পর্কে ৬টি মডেলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এ বিকল্প মডেলগুলোর প্রত্যেকটি অন্যগুলো থেকে কিরূপ স্বতন্ত্র তা নির্দেশ করতে তিনি কিছু নীতিমালা ও এগুলোর মধ্যকার আন্তঃক্রিয়ার নমুনাও উপস্থাপন করেন। এ মডেলগুলোর প্রত্যেকটি কি ধরনের আচরণের মাধ্যমে সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে পারে তা দেখানোর জন্য তিনি কতকগুলো অত্যাবশ্যক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। কাপলান প্রকল্পিত মডেলগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশৃঙ্খলা সহ্য করে টিকে থাকতে পারলেও অত্যধিক গণ্ডগোলের ফলে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আরেকটি ব্যবস্থায় রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়। কাপলান প্রকল্পিত ৬টি

ব্যবস্থার শেষ ৩টি কাল্পনিক হলেও তা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর। ষাটের দশক যা ছিল কাপলানের কল্পনায়, নব্বইয়ের দশকে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা বাস্তবে পরিণত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বিমেরু ব্যবস্থা বিলীন হয়ে বর্তমানের যে আন্তর্জাতিক বিশ্ব ব্যবস্থাটি আত্মপ্রকাশ করছে তা কাপলান প্রকল্পিত পঞ্চম অর্থাৎ প্রধান শক্তি সংবলিত ব্যবস্থা (Hierarchical System) হিসেবে অভিহিত করা যায়, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে প্রধান শক্তি হিসেবে বিরাজমান। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে একমেরু ব্যবস্থা (Unipolar System) বলে বর্ণনা করেছেন।

এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা : চার্লস ক্রাউথামার নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মার্কিন ভূমিকার দিকে দৃষ্টি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর একক মেরুত্ব। বর্তমান বিশ্ব কাঠামো বহুমেরুভিত্তিক নয়। সন্দেহ নেই, ভবিষ্যতে বহুমেরু বিশ্বের উত্থান ঘটবে। এমনও হতে পারে, অন্য প্রজন্মের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমতুল্য বিশ্বশক্তির উদয় হবে এবং বিশ্ব ব্যবস্থা ফিরে যাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বযুগে। কিন্তু আমরা এখন সেখানে নেই, আগামী কয়েক দশকে সে অবস্থা ফিরে আসবে তাও নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এককেন্দ্রিকতাই মূর্ত। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে তার ক্ষমতা যেভাবে হ্রাস পেয়েছে তাতে তার পক্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাবকে বাধাদান করা আর সম্ভব নয়।

এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : স্নায়ুযুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমেরু ব্যবস্থার প্রধান কর্মক হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর তাই সমগ্র বিশ্বের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধ, সোমালিয়া ও হাইতি সংকট, আফগানিস্তান হামলা, ইরাক দখল, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে হুমকি, ইসরাইলকে মদদ দান প্রভৃতিতে মার্কিন ভূমিকা এ সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে।

এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : উনিশ শতকের শুরু থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করতে আরম্ভ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণের ফলে সে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ঝগড়া, কলহ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিতে লিপ্ত না হয়ে অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয় যা তাকে একটি বৃহৎ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জার্মানির অবারিত সাবমেরিন যুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে সে বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করতে ঐ মহাসময়ে জড়িয়ে পড়লেও পরবর্তীতে আবার বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিতে ফিরে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানের অতর্কিত শক্তিশালী মার্কিন নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণের ফলে সে আবার ঐ যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত অক্ষ-শক্তির পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্নায়ুযুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অনেকটা নিঃশেষিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী দুটো পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এ দুটো পরাশক্তির মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে যাকে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই বলে অভিহিত করা হয়। এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হলো পরস্পর

বিরোধী দুটো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারকদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। তাদের প্রচেষ্টা ছিল সরাসরি যুদ্ধে না গিয়েও তাদের অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রচারণা শক্তির মাধ্যমে নিজস্ব ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ানো এবং বন্ধু ও মিত্ররাষ্ট্রের সহায়তায় অপরের ধ্বংস সাধন করা। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এবং মার্কিন ধনতন্ত্রবাদের মধ্যকার এ আদর্শের দ্বন্দ্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে যদিও উত্তেজনা কখনো চরম আকার ধারণ করে আবার কখনো তা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। উনিশ শত আশির দশকের শুরুতে ক্ষমতায় এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান (Ronald Reagan) সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর হন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নিয়তি ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে স্থান নেয়ার জন্য নির্ধারিত।' এর পরের বছর তিনি ঐ সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তিটিকে 'অশুভ সাম্রাজ্য' (The evil empire) হিসেবে অভিহিত করেন।

মার্কিনীদের উত্থান ও সোভিয়েতের পতন : ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করতে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ (Mikhail Gorbachev) মার্কিনীদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে পরাজিত হয় তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম হলো সে দেশটি শিল্পোন্নয়ন-উত্তর যুগে শুধু শিল্পোন্নত হিসেবে বিরাজ করছিল। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার পর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে, "শুধু প্রগাঢ়, অত্যধিক উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশটির অবস্থান দৃঢ়ীকরণের নিশ্চয়তা দিতে পারে।" এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি 'পেরেস্ত্রয়িকা' (Perestroika) অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাস এবং গ্লাসনস্ট (Glasnost) অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণকে উৎসাহিত করতে প্রচারণা ও রাজনৈতিক খোলামেলা নীতি অনুসরণের প্রস্তাব রাখেন। গর্বাচেভের এ সংস্কারসমূহের পেছনে সদিচ্ছা থাকলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে এগুলো মার্কিনিদের অঙ্গুলিসংকেতে সমাধা করেছেন। আসলে তাঁর অত্যুৎসাহী নীতি যে প্রলোভনের হাতছানি দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ সর্বাত্মক ব্যবস্থার অধীনে নিষ্পেষিত জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারূপী জিনকে বোতল থেকে মুক্ত করে দেয়, পরে তিনি সেটাকে আবার বোতলে পুরে ফেলে ছিপি বন্ধ করতে ব্যর্থ হন। ফলস্বরূপ তার ক্ষমতায় আরোহণের সময় যে দেশটি প্রবল পরাক্রমশালী হিসেবে বিরাজমান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে মাত্র ৪ বছরের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে তার প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়।

এভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর শুরু হয় একমেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার কর্ণধার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বময় প্রভাব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারের তাণ্ডবলীলা।

বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্ব শান্তি হুমকির মুখে

এ প্রশ্নের আলোচনায় ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে একের পর এক মার্কিন ছোবল আসতে থাকা, মানবাধিকারের রক্ষক হয়ে এসে ভক্ষকে পরিণত হওয়া, সন্ত্রাসবাদ রোধ করার নামে বিশ্বময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি আলোচনা সাপেক্ষ। নিচে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিশ্ব শান্তির হুমকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচিত হলো :

০১. **উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং মার্কিনীদের বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার :** ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তরকালে যখন ভূতপূর্ব পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত ভীতি দূর হয়েছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অহংকারী, বীরধর্মপূর্ণ ভাববাদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইসলামের উত্থানকে কাল্পনিক শত্রু হিসেবে

চিহ্নিত করে তাকে নির্মূল করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। এর সুবর্ণ সুযোগ আসে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ ও দখল করে নিলে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ বুশ (সিনিয়র বুশ) কুয়েতকে মুক্ত করার নামে মধ্যপ্রাচ্যে তার সেনাবাহিনী পাঠানোর সুযোগ পান– কুয়েতকে ইরাকের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়ার অজুহাতে। কিন্তু মার্কিন মূল উদ্দেশ্য হলো মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ নিশ্চিত করা ও তার মিত্র দেশ ইসরাইলকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। প্রেসিডেন্ট বুশ মিত্র ও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন নিতে বন্ধু রাষ্ট্রসহ বিশ্বকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ইরাকের কুয়েত দখল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সূচনাকারী সারায়েভো ঘটনা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আভাসদানকারী মিউনিকের ঘটনা। সুতরাং এটাকে আর অধিক দূর অগ্রসর হতে না দিয়ে পূর্ব থেকেই সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আর এজন্য তিনি একটি কোয়ালিশন গঠন করেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ থেকেও কুয়েতকে ইরাকের দখলমুক্ত করার জন্য শক্তি প্রয়োগেরও সমর্থন পান। ইরাকের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণকারী 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' (Operation Desert Storm) জয়ের ক্ষেত্রে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে টনিকের মতো কাজ করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ কিন্তু এখনো সামরিক শক্তিতে বিশ্বসেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করতে সমর্থ হয় যে সামরিক শক্তিই সর্বসেরা এবং এটাই তাকে বিশ্বের বুকে একাধিপত্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে তার একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন রাষ্ট্রসমূহকে দ্বার্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে সে কোনোক্রমেই তার প্রভাবকে খাটো হতে দেবে না এবং সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত মত প্রকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এছাড়াও ইরাকের সামরিক ক্ষমতা হ্রাস, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা দূরীকরণের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে তার মিত্র দেশ ইসরাইলকে ইরাকের সম্ভাব্য সামরিক আক্রমণের ভীতি থেকে রক্ষা করেছে। এভাবে একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় যুদ্ধের বিজয়ের পর প্রত্যেকটি অন্যায় কাজ প্রতিরোধের নামে বিশ্বের পুলিশম্যানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

০২. **আফগানিস্তানে হামলা :** ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রতিরক্ষা ভবন টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নায়ক আল কায়েদাকে চিহ্নিত করে আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে দোষী করে আফগানিস্তানে যে বর্বরোচিত হামলা চালায়, তা বিশ্ব বিবেককে স্তম্ভিত করে দেয়।

০৩. **ইরাক দখল :** ইরাকের জীবাণু অস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র আছে এরূপ ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাকে আক্রমণ করে ইরাককে দখলে নেয়– হাজার হাজার নারী-শিশু হত্যা, ধর্ষণের মধ্য দিয়ে, যা ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। আর এ অমানবিক কাজের জন্য বুশকে সংবাদ সম্মেলনে ৫ বছর পরে ইরাকের মাটিতে জুতো খেতে হয়।

০৪. **আরব বিশ্বের দিকে লোলুপ দৃষ্টি :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তার মহতী উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেও বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত আরব বিশ্বে এর ব্যত্যয় দেখা যায়। এর কারণ হলো, যেসব রক্ষণশীল আরব শাসক মার্কিন স্বার্থকে সিদ্ধি করে সেখানে সে চায় না যে, গণতন্ত্রের ঢেউ এসে তার বর্তমানের সুবিধাদি ভাসিয়ে নিয়ে যাক। এজন্যই সে ইরানের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার চেষ্টা চালায় এবং আলজেরিয়ার সামরিক শাসকবৃন্দ গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সনাতন এলিটদের হাতে ক্ষমতা প্রদান করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে নীরব সম্মতি জানায়।

ক্ষমতার ভারসাম্য

ক্ষমতার ভারসাম্য বলতে বোঝায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এমন এক ধরনের সাম্য অবস্থা, যেখানে কোনো একক শক্তি অথবা শক্তির সমবায়কে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে দেয়া যায় না, যাতে অন্যদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, ক্ষমতার ভারসাম্য হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতা বা শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্য অবস্থা, যা যে কোনো একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হতে যাতে সে অপরের ওপর তার ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে। ক্ষমতার ভারসাম্য হলো দুটো বা দু'দল রাষ্ট্রের শক্তির ঘনীভূতকরণ বা দুটো বিপরীতমুখী শিবিরকে বোঝায়। যেমন– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা শক্তিবর্গের মধ্যকার সাম্য। ক্ষমতার ভারসাম্যের এরূপ অবস্থাকে সাধারণত দ্বিমেরুকরণ (Bipolarisation) বলে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা হলো একমেরুকেন্দ্রিক অর্থাৎ যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য বজায় আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসেবে বৈধতার প্রশ্ন যাচাই-বাছাই না করে কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গৃহীত বিভিন্ন কার্যকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সে যে উপায়টি অবলম্বন করছে তা হলো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে কুক্ষিগত করে তার অনুমোদনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে তার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সমালোচনামুখর না হতে পারে। বিশ্বের বুকে বর্তমানে টিকে আছে এমন একটি পরাশক্তি হিসেবে সে তার আপাত মহতী উদ্দেশ্য সাধন যেমন– বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখা ও তা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক সময় তার আচরণে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে তার বৈরী অথবা অপছন্দের কোনো সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে সে যে মহতী উদ্দেশ্য সাধনের দোহাই দেয়, যেসব সরকার তার স্বার্থ-সিদ্ধি করে তারা একই রকম কার্যাবলীতে লিপ্ত থাকলেও তাদের বেলায় সে নীরব থাকে। তাই এ কথা সর্বাংশে সত্য– বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাই ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ জাতীয় শক্তি কি?

উত্তর : জাতীয় শক্তি বলতে কেবল অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ বা লোকবলকেই বোঝায় না। অনেক উপাদানের সমন্বয়েই জাতীয় শক্তির প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা যায়। তবে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে বিশেষ উপাদান জাতীয় শক্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে পারে। যেমন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আণবিক মারণাস্ত্রের শক্তি প্রাধান্য অর্জন করেছে। কয়েক শতাব্দী ধরে জনসংখ্যাকেই জাতীয় শক্তির উৎস রূপে গণ্য করা হতো। কারণ, সেনাবাহিনীর সংখ্যার ভিত্তিতেই জাতীয় শক্তি নির্ধারিত হতো।

প্রশ্ন-০২ জাতীয় শক্তির প্রকারভেদগুলো কি কি?

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তিই হলো চূড়ান্ত নির্ধারক। কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি, ন্যায়নীতি, মর্যাদা ইত্যাদি এবং এসব ব্যতীত অন্য সকল মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও প্রসারিত করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। জাতীয় শক্তিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। ইএইচ কার-এর মতে, জাতীয় শক্তি তিনভাগে বিভক্ত; যথা : ক. সামরিক শক্তি, খ. অর্থনৈতিক শক্তি ও গ. জনমতের শক্তি।

আবার পামার ও পারকিন্স-এর মতে, জাতীয় শক্তি ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা : ক. সামরিক শক্তি, খ. অর্থনৈতিক শক্তি, গ. জনমতের শক্তি এবং ঘ. কূটনৈতিক শক্তি।

প্রশ্ন-০৩ জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর : জাতীয় শক্তি নির্ধারক উপাদানসমূহকে অরগানসকি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— শক্তির প্রকৃতি নির্ধারণকারী (Natural determinants of power) এবং শক্তির সামাজিক নির্ধারণকারীসমূহ (Social determinants of power)। ক্ষমতা নির্ধারণকারী রূপে তিনি ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক কাঠামো এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসের প্রকৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া কূটনৈতিক দক্ষতা প্রচারকেও তিনি শক্তির উপাদানরূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ লেখক কূটনীতি ও ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার ও কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভ্যানডাইক শক্তির বারোটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) ভৌগোলিক ভিত্তি, (২) জনসংখ্যা, (৩) উৎপাদন দক্ষতা, (৪) যাতায়াত ও যোগাযোগ, (৫) বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, (৬) সরকারি সংগঠন ও প্রশাসন, (৭) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, (৮) সামরিক অবস্থান (৯) ধ্যান-ধারণা, (১০) গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগ (১১) সামরিক ব্যবস্থা এবং (১২) নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা (wisdom)। আবার অনেকে জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পগত ক্ষমতা, কৃষিগত শক্তি, সামরিক শক্তি ও সচলতা প্রভৃতি বাস্তব উপাদান (tangible elements) এবং নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব, সরকারের ধরন, সুনাম, বৈদেশিক সমর্থন ও নির্ভরশীলতা প্রভৃতি অবাস্তব উপাদানের (intangible elements) কথা উল্লেখ করেছেন। পামার এবং পারকিনস ভূগোল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, মতাদর্শ, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বকে জাতীয় শক্তির উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রশ্ন-০৪ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো জাতীয় শক্তি কেবল তার ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সরকার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, কূটনীতি, নেতৃত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবস্থানও তার ক্ষমতা নির্ধারণে সাহায্য করে। কোনো রাষ্ট্র সামরিক ও অর্থনৈতিক জোটের শরিক হতে পারে, আবার কোনো রাষ্ট্র জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতে পারে। কোনো রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরশীলতার এবং পরনির্ভরশীলতার মাত্রার ওপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানও বহু পরিমাণে নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন-০৫ শক্তির রাজনীতি কি?

উত্তর : সব রাজনৈতিক ক্ষমতাই প্রয়োগ এবং অর্জনের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার উপস্থিতি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তুলনায় অনেক বেশি অনুভূত হয়। এ কারণেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অনেক সময়ে 'শক্তির রাজনীতি' (Power Politics) নামে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন-০৬ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র বলতে কাকে বোঝানো হয়?

উত্তর : সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের (Super powers) ধারণা গুরুত্ব লাভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যার শক্তি ও সামর্থ্য এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমবেত শক্তির সমকক্ষ হতে পারেনি। এ রাষ্ট্রের হাতে এমন সব আণবিক অস্ত্র রয়েছে, যা অন্য রাষ্ট্রকে ধ্বংসের পক্ষে পর্যাপ্ত।

প্রশ্ন-০৭ জাতীয় শক্তিতে সামাজিক উপাদানের ভূমিকা কি?

উত্তর : জাতীয় শক্তির সাথে সামাজিক উপাদানও জড়িত। সামাজিক উপাদানের মধ্যে প্রধানত জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় উপাদান রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোনো দেশের জনসাধারণ যদি একই বর্ণ ও ধর্মভুক্ত হয়, তাহলে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় লক্ষ্য পূরণের কর্মসূচি রূপায়ণ করা সহজ হয়। বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগত সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় থাকলে এবং তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় হলে যে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার এবং ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি করে না, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের ভূমিকার গুরুত্বও হ্রাস করে।

প্রশ্ন-০৮ জাতীয় শক্তির মূল্যায়ন কিরূপে করা যায়?

উত্তর : জাতীয় শক্তির মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন কাজ। জাতীয় শক্তি নির্ণয়ে বহুবিধ উপাদানের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিয়ে তাকে অন্য উপাদানগুলোর তুলনায় বেশি মূল্যবান বলে অভিহিত করা যায় না। শক্তি উৎপাদনে কোন উপাদান বেশি মূল্যবান তা স্থান-কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অতীতে কয়লা উৎপাদনকারী রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিক সমৃদ্ধশীল থাকার ফলে ঐসব রাষ্ট্র শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হতো। পরবর্তীতে তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোকে মুক্তির আধার হিসেবে নিরূপণ করা হতো। কিন্তু বর্তমান পারমাণবিক যুগে ইউরেনিয়াম অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে এসব মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর অধিকারী রাষ্ট্রগুলোই শক্তিধর হিসেবে পরিচিত হতে পারে। এসব সামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগকারী রাষ্ট্রসমূহই বর্তমানে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করছে।

প্রশ্ন-০৯ শক্তিসাম্য কি?

উত্তর : শক্তিসাম্য হলো ক্ষমতা ও শক্তির পরিমাণের সমতা বজায় রাখা। শক্তিসাম্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে মর্গেনথ্যু ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তার মতে, শক্তিসাম্য কথাটা পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও অর্থ প্রায় একই রকম। মর্গেনথ্যু সাম্য (balance) ও ভারসাম্যকে (equilibrium) সমার্থক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিসমূহকে (forces) নিয়ে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে স্থিতিশীলতার নাম হলো শক্তিসাম্য।

প্রশ্ন-১০ শক্তিসাম্যের ধরন বা প্রকারগুলো কি কি?

উত্তর : শক্তিসাম্যের ব্যবস্থার সাথে জড়িত এলাকা এবং অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে তার বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা করা যায়। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে শক্তিসাম্যকে স্থানীয় (Local), আঞ্চলিক (Regional), মহাদেশীয় (Continental) এবং বিশ্বব্যাপী (World wide) শক্তিসাম্যে বিভক্ত করা যায়। শক্তিসাম্যের ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের সংখ্যার ভিত্তিতে তাকে বহুকেন্দ্রিক (Multipolar), ত্রিকেন্দ্রিক (Tri-ploar) এবং দ্বি-কেন্দ্রিক (Bi-polar) ধরনের বিভক্ত করা যায়।

প্রশ্ন-১১ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের বর্তমান অবস্থা কি রূপ?

উত্তর : বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শক্তিসাম্যের ধারণার রূপান্তর ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে যথাক্রমে পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক জোট গঠিত হয়েছে। এ দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্ব বা সংক্ষেপে বলা যায় নির্জোট আন্দোলনই ভারসাম্য রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নই চল্লিশের দশকের শেষ থেকে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্যকে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকেই সামরিক প্রাধান্যকে শক্তি অর্জন এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষার মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করেছে। অনেকে মনে করেন, যে সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্র যৌথভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছে।

প্রশ্ন-১২ দ্বি-মেরুপ্রবণতা কি?

উত্তর : দ্বিমেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বলতে এমন একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝান হয়, যেখানে দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলো দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। দ্বি-মেরুপ্রবণতা প্রকৃতপক্ষে দুটি শিবিরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝায়। মতাদর্শগতদিক থেকেই এ দুটি শিবিরের বা জোটের উদ্ভব ঘটে। একটি জোট হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমা বা পুঁজিবাদী জোট। আর এ জোটের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ছিল ওয়াশিংটন। অন্য জোটটি ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক জোট। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল মস্কো। এই দুই নেতৃত্ব এবং দুটি প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন ধারা দ্বি-কেন্দ্রিক বা দ্বি-মেরুপ্রবণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১৩ সাম্প্রতিক বিশ্ব রাজনীতির প্রভাবক হিসেবে মতবাদ (Ideology)-এর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে ব্যবহারিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রক্রিয়া হলো বিশ্ব রাজনীতি। বিশ্ব রাজনীতিকে মূলত দুটি উপাদান বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, যা হলো– শক্তি (Power) এবং আদর্শ (Ideology)। অধ্যাপক ফ্রিডম্যান-এর ভাষায়, শক্তি এবং আদর্শের সংমিশ্রণের ফলেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। তবে আন্তর্জাতিক

রাজনীতি কেবল শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বর্তমান সময়ে শক্তির সাথে আদর্শের বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতি অত্যন্ত জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। এখানে যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের বড় ভাবনার বিষয়। বিশ্বে আদর্শগত দ্বন্দ্বে বিশ্ব আজ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দু' খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। এ দ্বন্দ্বের এক পক্ষে রয়েছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি শক্তিশালী পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ, আর অন্য পক্ষে রয়েছে রাশিয়া, সাম্যবাদী চীন ও অন্যান্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভিন্ন ধারার সূচনা হয়েছে, তবুও আদর্শগত বিভেদ থাকলেও এ আদর্শের ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিধারা।

প্রশ্ন-১৪ শক্তিসাম্যের প্রকারভেদ লিখুন।

উত্তর : শক্তিসাম্য হলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি ভারসাম্যের অবস্থা, যাতে কোনো একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের ইচ্ছা আরোপ করতে না পারে। শক্তিসাম্যকে একটি নীতি হিসেবে গণ্য করলে এ ধারণা করা যায়, এর লক্ষ্য হলো একটি কাম্য বা প্রত্যাশিত শক্তির সম্পর্ক স্থাপন করা। শক্তিসাম্যের প্রতিক্রিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে শক্তিসাম্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. বহু কেন্দ্রিক, খ. ত্রি-কেন্দ্রিক ও গ. দ্বি-কেন্দ্রিক।

ক. **বহুকেন্দ্রিক :** শক্তিসাম্যের প্রতিক্রিয়ার সাথে বহু রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলেই এরূপ শক্তিসাম্যের সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এ ধরনের শক্তিসাম্যের উদ্ভব হয়।

খ. **ত্রি-কেন্দ্রিক :** শক্তিসাম্যের প্রক্রিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে তিনটি রাষ্ট্র জড়িত থাকলেই এরূপ শক্তিসাম্যের সৃষ্টি হয়।

গ. **দ্বি-কেন্দ্রিক :** শক্তিসাম্যের প্রক্রিয়ার সাথে দুটি রাষ্ট্র বা দুটি শিবির জড়িত থাকলেই এরূপ শক্তিসাম্যের সৃষ্টি হয়।

দ্বি-কেন্দ্রিক শক্তিসাম্যের তুলনায় ত্রি-কেন্দ্রিক বা বহুকেন্দ্রিক শক্তিসাম্য অনেক বেশি কাম্য এবং স্থিতিশীল বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জোট গঠন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে এ অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। কয়েকটি সার্বভৌম এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহাবস্থানের মধ্যেই শক্তিসাম্যের অবস্থাকে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায়।

প্রশ্ন-১৫ শক্তিসাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর : শক্তিসাম্যকে বহুক্ষেত্রে বিশৃশান্তি ও আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যবর্তী একটা অবস্থানরূপে গণ্য করা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তিসাম্যের বেশকিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যাদের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য হলো :

ক. শক্তিসাম্যের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ধরন এবং ক্ষমতার সম্পর্কের পরিবর্তন হয়।

খ. শক্তিসাম্যকে কোনো অবস্থায় ঈশ্বরের দান হিসেবে গণ্য করা সম্ভব নয়। মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শক্তিসাম্যের অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাধান্য দানকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কখনো কখনো যুদ্ধে যোগদান করতে হবে।

গ. শক্তিসাম্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো শক্তিসাম্যের পরিস্থিতিকে বাস্তব ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

ঘ. শক্তিসাম্যের তত্ত্ব এমন একটি তত্ত্ব, যা গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র কোনো ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর নয়। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং অন্যান্য উপাদান অনুকূল না হলে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

ঙ. শক্তিসাম্যের তত্ত্ব প্রধানত বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। শক্তিসাম্য বজায় রাখতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজন, যা ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তির ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন-১৬ নিরস্ত্রীকরণ কি?

উত্তর : আভিধানিক অর্থে নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায়, শক্তি প্রয়োগ অথবা সশস্ত্র সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে যেসব যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে হ্রাস করা বা বর্জন করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরস্ত্রীকরণ হলো কোনো রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা, অথবা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা। নিরস্ত্রীকরণ বস্তুত অস্ত্রের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ নয়, বরং অস্ত্র হ্রাসকরণ। মর্গেনথাউ-এর মতে, অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সব ধরনের অস্ত্র হ্রাস করা অথবা বর্জন করাকে নিরস্ত্রীকরণ বলে।

প্রশ্ন-১৭ শান্তিপূর্ণ উপায় বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : শান্তিপূর্ণ উপায় বলতে বোঝায় যুদ্ধের উত্তেজনা থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রচেষ্টা ও সমঝোতার পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রাচীনকাল থেকে বিবাদ মীমাংসার দুটি পদ্ধতি চলে আসছে। একটি হলো শান্তিপূর্ণ উপায় আর দ্বিতীয়টি হলো যুদ্ধ ঘোষণা। বহুকাল পূর্বে সিসেরো (Ciscero) বলেছিলেন যে, মতপার্থক্য মিটিয়ে ফেলার দুটি উপায়ের মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝানো আর অন্যটি সামরিক শক্তি প্রয়োগ। প্রথমটা মানুষ ব্যবহার করে আর দ্বিতীয়টির প্রচলন পশুসমাজে দেখা যায়। উত্তেজনা থেকে সবসময় যুদ্ধের উৎপত্তি হয়, তা ঠিক নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে বিরোধ দেখা দেয় এবং সেই বিরোধ যুদ্ধের আকার ধারণ করে। যদি সব বিবদমান দলকে এক জায়গায় উপস্থিত করে তাদের মধ্যে মতবিনিময়ের পথকে প্রশস্ত করা যায়, তাহলে বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-১৮ কি কি কারণে নিরস্ত্রীকরণ অত্যন্ত জরুরি?

উত্তর : নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে বাস্তবানুগ এবং গ্রহণযোগ্য যুক্তিগুলো হলো— প্রথমত, নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সীমিতকরণ এবং প্রশমনে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, নিরস্ত্রীকরণ প্রতিটি জাতির প্রয়োজনীয় সম্পদকে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা উৎপাদনকারী দেশে অর্থনীতির সামরিকীকরণের প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হ্রাসের জন্যও নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। উপরিউক্ত কারণগুলো ব্যতীতও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও বিশ্বশক্তির জন্য নিরস্ত্রীকরণ অত্যাবশ্যক। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অস্ত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে অন্যের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়। এর ফলে বিরোধ ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন-১৯ NPT কি? এটি কখন স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : NPT হলো Nuclear Non Proliferation Treaty বা পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি। চুক্তিটি ১৯৬৮ সালে গৃহীত হয় এবং ৪০টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। প্রাথমিকভাবে এ চুক্তির মেয়াদ ছিল ২৫ বছর। ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ থেকে NPT কার্যকরী হয়। ১৯৯৫ সালে এর মেয়াদ শেষ হলে এর মেয়াদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাড়ানো হয়। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৮৯টি দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশও এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলো অন্য কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই, এ রকম দেশে কোনো অস্ত্র বিক্রয় কিংবা অস্ত্র তৈরিতে সহযোগিতা করতে পারবে না।

প্রশ্ন-২০ CTBT কি? বাংলাদেশ কখন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে?

উত্তর : CTBT হলো ব্যাপক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Comprehensive Test Ban Treaty. ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫১তম অধিবেশনে CTBT

গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সিটিবিটি বা Comprehensive Test Ban Treaty চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর। আর সিটিবিটি চুক্তি অনুমোদন করে ২০০০ সালের ৮ মার্চ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সিটিবিটি অনুমোদনকারী বিশ্বের ২৮তম দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম এই চুক্তি অনুমোদন করে।

প্রশ্ন-২১ WMD-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : WMD-এর পূর্ণরূপ Weapons of Mass Destruction বা ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহ। বর্তমান বিশ্বে WMD একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যু। ১৯৯০ সালে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর এ ধারণাটি আরো গুরুত্ব লাভ করে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ২০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র বাহিনী ইরাকের কাছে WMD আছে অভিযোগে দেশটিতে আক্রমণ চালায়।

প্রশ্ন-২২ SALT ও START কি?

উত্তর : SALT ও START উভয়ই অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি। SALT-এর পূর্ণরূপ Strategic Arms Limitation Talks, যা ১৯৭২ সালের ২৭ মে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে SALT-1 হিসেবে স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৭৯ সালে SALT-2 নামে পুণরায় স্বাক্ষরিত হয়। অন্যদিকে START-এর পূর্ণরূপ হলো Strategic Arms Reduction Treaty, যা ২০০১ সালে প্রথমে START-1 হিসেবে কার্যকর হয়। START-2 নামে দ্বিতীয়বারের মতো স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালে। অন্যদিকে ২০১০ সালের ৮ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয় নিউ স্ট্যার্ট চুক্তি যা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে কার্যকর হয়।

প্রশ্ন-২৩ আইএনএফ (INF) চুক্তি বলতে কি বুঝায় এবং এই চুক্তি কোন অস্ত্র ব্যবহারের বেলায় প্রযোজ্য?

উত্তর : আইএনএফ (INF) হলো মাঝারি পাল্লার আণবিক শান্তি চুক্তি। ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) স্বাক্ষরিত হয়। ৩০০ থেকে ৩৫ হাজার মাইল পাল্লার মাটি থেকে ক্ষেপণযোগ্য আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের বেলায় এ চুক্তিটি প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-২৪ 'SORT' চুক্তির মূল লক্ষ্য কি?

উত্তর : মস্কোতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে ২০০২ সালের ২৪ মে স্বাক্ষরিত চুক্তির নাম 'Treaty Between the United States of American and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions' (SORT). ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়। এ চুক্তির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া কেউই তাদের পারমাণবিক ওয়ারহেড ২২০০-এর বেশি উৎপাদন না করা।

প্রশ্ন-২৫ SDI বা তারকা যুদ্ধ কি?

উত্তর : Strategic Defence Initiative বা কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ সংক্ষেপে SDI নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালের ২৩ মার্চ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান SDI উপস্থাপন করেন। এ কর্মসূচি হলো কতগুলো অস্ত্র ও সমর সরঞ্জামের সমাহার, যা মহাকাশ, আবহাওয়ামণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে মহাকাশ কিংবা ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত হবে। এ ব্যবস্থা মহাশূন্যভিত্তিক হওয়ায় একে তারকাযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের ভূমিতে আঘাত হানার আগেই তা প্রতিহত করা সম্ভব।

প্রশ্ন-২৬ ICBM কি?

উত্তর : ICBM-এর পূর্ণরূপ Inter-Continental Ballistic Missile. এটি এমন এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র যে ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে হামলা করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সবশেষে উত্তর কোরিয়ার হাতে এমন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

প্রশ্ন-২৭ ডার্টি ডজন (Dirty Dozen) কি?

উত্তর : প্রাণিজগৎ তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পৃথিবীর বারোটি মারাত্মক বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যই 'ডার্টি ডজন' নামে পরিচিত। যাদের মধ্যে ৮টি কীটনাশক (অলড্রিন, ডায়েলড্রিন, ক্লোরডেন, অ্যানড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ডিডিটি, মিরেক্স এবং টক্সাফেন), দুটি শিল্পজাত রাসায়নিক দ্রব্য (পিসিবি এবং হেক্সাক্লোরোবেনজিন) এবং বাকি দুটি ডাই অক্সিন ও ফিউরান কলকারখানায় উৎপন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত। এ বিষাক্ত দ্রব্যগুলো খাদ্যচক্রে প্রবেশ করার মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় সব পরিবেশের সব ধরনের জীবজন্তুর ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এমনকি ক্রটিপূর্ণ শিশুর জন্ম, ক্যান্সার উৎপাদন এবং ভ্রূণ বিকাশের নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টিতেও এ পদার্থগুলো প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। তাই বিশ্বব্যাপী পরিবেশকে রক্ষায় ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১২২টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে পরিবেশ দূষক এ ১২টি বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সীমিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ২৩ মে সুইডেনের স্টকহোমে ৯০টি দেশের কর্মকর্তারা বিশ্বে বিভিন্ন রোগ ও মৃত্যুর জন্য 'ডার্টি ডজন'-কে দায়ী করে এর ব্যবহার সীমিতকরণে জাতিসংঘের একটি যুগান্তকারী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। যদিও বাংলাদেশে ১৯৬২ সালে অ্যানড্রিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়, তথাপি ফসলের ক্ষেতে মাটিতে বসবাসকারী ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করতে বাংলাদেশে এখনো অন্যান্য কীটনাশকের ব্যবহার হরহামেশাই লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি ডার্টি ডজনের এ তালিকা আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। এ তালিকায় আরো যুক্ত হয়েছে লিনডেনসহ নতুন আটটি কীটনাশক। লিনডেন মূলত কাঠের পোকা, মানুষের মাথার উকুন ও খোসপাচড়া রোধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৮ রাসায়নিক অস্ত্র বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সাধারণত মাস্টার্ড গ্যাস, লিউইসাইট, ফসফেন, হাইড্রোজেন সায়নাইড ইত্যাদি ক্ষতিকর উপাদান দ্বারা তৈরি অস্ত্রই 'রাসায়নিক অস্ত্র' নামে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যক্কারজনক ইরাকি আগ্রাসন সময়কালে ইরাকে অভিযান চালানোর প্রধান অজুহাতই ছিল ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র। যদিও পরবর্তীতে তাদের এ অজুহাত মিথ্যাচার রূপ লাভ করে। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাসায়নিক অস্ত্র হলো : ব্লাড অ্যাজেন্টস – হাইড্রোজেন সায়ানাইড; ব্লিস্টার অ্যাজেন্টস – মাস্টার্ড গ্যাস, লিউইসাইট; চোকিং অ্যাজেন্টস – ফসফেন, ক্লোরিন এবং সার্ভ অ্যাজেন্টস – সারিন, টাবুন, ভিএক্স, সোমান।

প্রশ্ন-২৯ ক্লাস্টার বোমা কি?

উত্তর : ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমা হলো অসংখ্য ছোট ছোট বোমার আকারে তৈরি কন্টেইনার, যা নিক্ষেপের পর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে অধিকাংশই বিস্ফোরিত হয় না, কিন্তু আঘাত পেলে ও ছুঁড়ে ফেললে বছরের পর বছর ধরেও এ বোমাগুলোর কার্যকারিতা থেকে যায়। বেসামরিক নাগরিক বিশেষ করে শিশুরা এ বোমার শিকারে পরিণত হয়। বোমাটির উজ্জ্বল রং ও ক্ষুদ্র আকৃতির কারণে শিশুরা সহজেই অবিস্ফোরিত এসব বোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। একটি কন্টেইনার বা সিলিন্ডারের ভেতর ২০২টি পর্যন্ত ক্ষুদে বোমা থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্লাস্টার বোমা তৈরি করা হলেও সব ধরনের বোমার কার্যপদ্ধতি মোটামুটি একই ধরনের। এ বোমার সামরিক নাম সিবিইউ ৮৭/বি। এর রয়েছে কম্বাইন্ড ইফেক্ট মিউনিশন, যার প্রতিটির ওজন ৯৫০ পাউন্ড। মাঝারি উচ্চতায় বিভিন্ন বিমান থেকে এ বোমা নিক্ষেপ করা যায়। এ বোমা সর্বোচ্চ ৯ মাইল দূরের লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। বোমাগুলো আকর্ষণীয় রঙের হয় এবং মাটিতে পড়ে কিছু বোমা অবিস্ফোরিত অবস্থায় থাকে, যা পরে বিস্ফোরিত হয়। ২০০৩ সালে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী এ বোমা ব্যবহার করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ, কসভো সংঘাত এবং ২০০১ সালে আফগানিস্তান যুদ্ধে, ইরাক যুদ্ধে এবং ২০০৮-০৯ সালে গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে এ বোমা ব্যবহৃত হয়।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চুক্তিসমূহ

আউটার স্পেস চুক্তি ১৯৬৭

প্রশ্ন : মহাকাশ ও পানির নিচে অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (Outer Space Treaty) কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৭।
প্রশ্ন : মহাদেশ ও পানির নিচে অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা চুক্তি কবে কার্যকর হয়?
উত্তর : ১০ অক্টোবর ১৯৬৭।

ট্লাটেলোলকো চুক্তি ১৯৬৭

প্রশ্ন : ট্লাটেলোলকো চুক্তি (Treaty of Tlatelolco) স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭।
প্রশ্ন : ট্লাটেলোলকো চুক্তি কবে কার্যকর হয়?
উত্তর : ২২ এপ্রিল ১৯৬৯।
প্রশ্ন : ট্লাটেলোলকো চুক্তির উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, ব্যবহার, উৎপাদন, মজুদ অথবা অর্জন নিষিদ্ধ করা হয়।

পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (NPT) ১৯৬৮

প্রশ্ন : NPT-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Nuclear Non-Proliferation Treaty.
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে NPT অনুমোদিত হয় কবে?
উত্তর : ১২ জুন ১৯৬৮।
প্রশ্ন : NPT স্বাক্ষর করা হয় কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯৬৮।
প্রশ্ন : NPT কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ৫ মার্চ ১৯৭০।
প্রশ্ন : NPT স্বাক্ষরকারী দেশ কতটি?
উত্তর : ১৯০টি (উল্লেখ্য, ইসরাইল, ভারত এবং পাকিস্তান স্বাক্ষর করেনি)।
প্রশ্ন : NPT থেকে নিজেকে প্রত্যাহারকারী দেশ কোনটি?
উত্তর : উত্তর কোরিয়া (২০০৩ সালে)।
প্রশ্ন : NPT চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তাররোধ।

জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন ১৯৭২

প্রশ্ন : জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন (Biological Weapons Convention) উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : সব ধরনের জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংস সাধন।
প্রশ্ন : জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন কবে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়?
উত্তর : ১০ এপ্রিল ১৯৭২।
প্রশ্ন : জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন কবে কার্যকর হয়?
উত্তর : ২৬ মার্চ ১৯৭৫।

সল্ট-১ (SALT-1) ১৯৭২

প্রশ্ন : SALT-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Strategic Arms Limitation Talks.
প্রশ্ন : SALT-১ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ২৬ মে ১৯৭২।
প্রশ্ন : SALT-১ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : এন্টি ব্যালিস্টিক সিস্টেম সীমিতকরণ।
প্রশ্ন : SALT-১ চুক্তিতে কোন কোন দেশ স্বাক্ষর করে?
উত্তর : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : SALT-১ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের জেরাল্ড ফোর্ড এবং রাশিয়ার লিওনিদ ব্রেজনেভ।
প্রশ্ন : SALT-১ মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদন করা হয় কবে?
উত্তর : ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।
প্রশ্ন : SALT-১ চুক্তি কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ৩ অক্টোবর ১৯৭২।

এবিএম (ABM) চুক্তি ১৯৭২

প্রশ্ন : ABM TREATY-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Anti-Ballistic Missile Treaty.
প্রশ্ন : ABM চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ২৬ মে ১৯৭২।
প্রশ্ন : ABM চুক্তি কোন দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন : ABM চুক্তি মার্কিন সিনেটে অনুমোদিত হয় কবে?
উত্তর : ৩ আগস্ট ১৯৭২ (কার্যকর হয় ৩ অক্টোবর ১৯৭২)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র কবে একতরফাভাবে ABM চুক্তি থেকে নিজকে প্রত্যাহার করে?
উত্তর : ১৩ জুন ২০০২।

সল্ট-২ (SALT-2) চুক্তি ১৯৭৯

প্রশ্ন : SALT-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ১৮ জুন ১৯৭৯।
প্রশ্ন : SALT-২ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : আক্রমণাত্মক অস্ত্র ২৪০০-এর মধ্যে এবং নিক্ষেপকারী ক্ষেপণাস্ত্র ২২৫০ এর মধ্যে সীমিত রাখা।
প্রশ্ন : SALT-২ চুক্তিতে কোন কোন দেশ স্বাক্ষর করে?
উত্তর : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : SALT-২ চুক্তি স্বাক্ষর করেন কে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের জিমি কার্টার ও রাশিয়ার লিওনিদ ব্রেজনেভ।
প্রশ্ন : কোন চুক্তিটি মার্কিন সিনেটে অনুমোদন হয়নি?
উত্তর : সল্ট-২।

স্টার্ট-১ চুক্তি ১৯৯১

প্রশ্ন : START-1 চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ৩১ জুলাই ১৯৯১।
প্রশ্ন : START-1 চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন দুটি দেশের মধ্যে?
উত্তর : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : START-1 চুক্তি কবে কার্যকর হয়?
উত্তর : ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
প্রশ্ন : START-1-এর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় কবে?
উত্তর : ৫ ডিসেম্বর ২০০৯।

রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন ১৯৯২

প্রশ্ন : রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।
প্রশ্ন : রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় কবে?
উত্তর : ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৩।
প্রশ্ন : রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ২৯ এপ্রিল ১৯৯৭।
প্রশ্ন : রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংস করা।

স্টার্ট (START)-২ চুক্তি ১৯৯৩

প্রশ্ন : START-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Strategic Arms Reduction Treaty.
প্রশ্ন : স্টার্ট-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ৩ জানুয়ারি ১৯৯৩।
প্রশ্ন : স্টার্ট-২ চুক্তিতে কোন কোন দেশ স্বাক্ষর করে?
উত্তর : রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : স্টার্ট-২ চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয় দেশের পারমাণবিক অস্ত্র, বিশেষত দূরপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা।
প্রশ্ন : স্টার্ট-২ চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : রাশিয়ার মস্কোতে।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট স্টার্ট-২ চুক্তি অনুমোদন করে কবে?
উত্তর : ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

সিটিবিটি (CTBT) ১৯৯৬

প্রশ্ন : সমন্বিত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।
প্রশ্ন : CTBT-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.
প্রশ্ন : CTBT চুক্তির উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : নতুন করে আর কেউ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না এবং আগের গুলো ধ্বংস করে সীমিত করা।
প্রশ্ন : CTBT চুক্তি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫১তম অধিবেশনে উত্থাপন করে কোন দেশ?
উত্তর : অস্ট্রেলিয়া।
প্রশ্ন : অস্ট্রেলিয়া কবে CTBT চুক্তি উত্থাপন করে?
উত্তর : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।
প্রশ্ন : CTBT চুক্তির বিপক্ষে ভোট দেয় কোন কোন দেশ?
উত্তর : ভারত, লিবিয়া ও ভুটান।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কবে?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ CTBT চুক্তি স্বাক্ষরকারী কততম দেশ?
উত্তর : ১২৯তম দেশ।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদন করে কবে?
উত্তর : ৮ মার্চ ২০০০।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদনকারী কততম দেশ?
উত্তর : ২৮তম দেশ।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার কততম CTBT অনুমোদনকারী দেশ?
উত্তর : প্রথম।
প্রশ্ন : সিটিবিটি স্বাক্ষর করেনি এমন দেশ কোনগুলো?
উত্তর : ভুটান, কিউবা, ভারত, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া প্রভৃতি।

স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি ১৯৯৭

প্রশ্ন : স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
প্রশ্ন : স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তির উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : স্থলমাইন ব্যবহার, মজুদ, উৎপাদন ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা।
প্রশ্ন : স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোথায়?
উত্তর : কানাডার অটোয়ায়।
প্রশ্ন : স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ১ মার্চ ১৯৯৯।
প্রশ্ন : স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি এমন দেশ কোনগুলো?
উত্তর : রাশিয়া, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, ইসরাইল, পাকিস্তান।
প্রশ্ন : স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তির অপর নাম কি?
উত্তর : অটোয়া চুক্তি।
প্রশ্ন : স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ কোনটি?
উত্তর : কানাডা।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে কবে?
উত্তর : ৭ মে ১৯৯৮।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরকারী কততম দেশ?
উত্তর : ১২৬তম (অনুমোদন করে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০)।

সর্ট (SORT) ২০০২

প্রশ্ন : SORT বা মস্কো চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ২৪ মে ২০০২ (কার্যকর হয় ১ জানুয়ারি ২০০৩)।
প্রশ্ন : SORT কোন দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : SORT-এর লক্ষ্য কি?
উত্তর : ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার কেউই তাদের পারমাণবিক ওয়ারহেড ২২০০-এর বেশি উৎপাদন না করা।

নিউ স্টার্ট (New START) ২০১০

প্রশ্ন : স্টার্ট (START) কি?
উত্তর : পরমাণু অস্ত্র কমাতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি।
প্রশ্ন : নিউ স্টার্ট (New START) কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ৮ এপ্রিল ২০১০।
প্রশ্ন : নিউ স্টার্ট কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : প্রাগ, চেকপ্রজাতন্ত্র।
প্রশ্ন : নিউ স্টার্ট কে কে স্বাক্ষর করেন?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ।
প্রশ্ন : নিউ স্টার্ট কবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট অনুমোদন করে?
উত্তর : ২২ ডিসেম্বর ২০১০ (৭১-২৬ ভোটে)।
প্রশ্ন : নিউ স্টার্ট কবে রাশিয়ার ফেডারেল কাউন্সিল অনুমোদন করে?
উত্তর : ২৬ জানুয়ারি ২০১১।
প্রশ্ন : নিউ স্টার্ট কবে কার্যকর হয়?
উত্তর : ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ (মেয়াদ শেষ হবে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।
প্রশ্ন : নিউ স্টার্ট কোন চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়?
উত্তর : কৌশলগত অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি-১ (স্টার্ট-১)।
প্রশ্ন : কৌশলগত অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি-১ (স্টার্ট-১)-এর মেয়াদ কবে শেষ হয়?
উত্তর : ৫ ডিসেম্বর ২০০৯।

টীকা

◆ ভূ-রাজনীতি

সভ্যতার আদিকাল থেকে একটা দেশ অপর এক বা একাধিক দেশকে এই যুক্তিতে জয় করে নিত যে, অধিকৃত অঞ্চল ব্যতীত দেশটি ভৌগোলিকভাবে পূর্ণাঙ্গ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে না। একই যুক্তিতে এক-একটা অঞ্চলকে পরিণত করা হত করদরাজ্য বা কলোনিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অন্যের এলাকা সরাসরি দখল করে নেওয়ার রেওয়াজ উঠে যায় বললেই চলে। বরং উল্টোটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একের পর এক কলোনি স্বাধীনতাই অর্জন করতে থাকে। বিকল্প হিসেবে এখন ভৌগোলিক অনিবার্যতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, যৌথ নিরাপত্তা ইত্যাদির নামে গঠন করা হয় বিভিন্ন জোট, সম্পাদিত হয় বিভিন্ন প্রোটোকল। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিকই এক-একটা অঞ্চলের ভৌগোলিক বিশেষত্ব ও সুবিধাসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যে, ঐ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জোটবদ্ধতা ও যৌথ প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে। এভাবে, কোনো রাষ্ট্র যদি নিজ স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় নিজের প্রভাববলয় সৃষ্টি করতে বা বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয় তা হলে এই প্রচেষ্টাকে বলে ভূ-রাজনীতি। একইভাবে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র যদি তাদের সাধারণ স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক কোনো জোট, ঐক্য বা সহযোগিতা গড়ে তোলে, তা হলে সেটাও ভূ-রাজনীতির আওতায় পড়ে। আবার কোনো একটি একক দেশও তার ভৌগোলিক বাস্তবতার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, লেনদেন বা সহযোগিতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে পারে।

◆ কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ

কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ বা Strategic Defence Initiative (SDI) তারকা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালের ২৩ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোন্যাল্ড রিগ্যান আমেরিকার কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এক গবেষণা কর্মসূচির প্রস্তাব করেন। এই ব্যবস্থা কিছুটা মহাশূন্যভিত্তিক হওয়ায় একে তারকা যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। পারমাণবিক ও কৌশলগত অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তরোত্তর অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে চলে। এই প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র মূলত দুটি কারণে SDI কর্মসূচি নেয় :

১. যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্রই তাদের যুদ্ধের মূল ভিত্তি, যা কম্পিউটার দ্বারা পরিচালিত। এক্ষেত্রে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম মিসাইল আঘাতে কম্পিউটার ব্যবস্থা অচল করে দেয় তাহলে ভূমিভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ অকেজো হয়ে যাবে। তাই যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক আঘাত প্রতিহত করার লক্ষ্যে SDI কর্মসূচির গুরুত্বারোপ করে।
২. ইউরোপে সোভিয়েত শক্তি এবং প্রাধান্য সুস্পষ্ট। ওয়ারশ জোটের কৌশলগত অস্ত্র বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপভিত্তিক আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে SDI প্রকল্প গ্রহণ করে।

◆ নতুন কৌশলগত অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি (নিউ স্টার্ট)

পরমাণু অস্ত্র কমাতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে নতুন কৌশলগত অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি (নিউ স্টার্ট) স্বাক্ষরিত হয় চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে। ৮ এপ্রিল ২০১০ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও রাশিয়ার

প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ নিজ নিজ দেশের পক্ষে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটিতে উভয় দেশের সরকার আগামী সাত বছরের মধ্যে রণকৌশলগত আণবিক বোমার সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে ১,৫৫০-এ নামিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বোমা বহনের জন্য রকেটের সংখ্যাও কমিয়ে অর্ধেক, অর্থাৎ ৮০০ করা হবে। নতুন এ চুক্তিতে দুই দেশের মধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাসের ওপরও জোর দেয়া হয়। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরমাণু বোমা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ২২ ডিসেম্বর ২০১০ এবং রাশিয়ার ফেডারেল কাউন্সিলে ২৬ জানুয়ারি ২০১১ অনুমোদন করে। নিউ স্টার্ট চুক্তিটি স্টার্ট-১ (কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে স্টার্ট-১ স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৯ সালের ৫ ডিসেম্বরে এর মেয়াদ শেষ হয়। START–Startegic Arms Reduction Treaty. ১৯৮২ সালে স্টার্ট চুক্তির প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান। এটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই, যা কার্যকর হয় ১৯৯৪ সালের ৫ ডিসেম্বর।

♦ পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি (NPT)

পারমাণবিক অস্ত্রসংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হিসেবে এটা পরিচিত। প্রধান প্রধান পারমাণবিক শক্তিশালী দেশসহ (চীন ছাড়া) বহু দেশ এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করে ১৯৬৮ সালে এবং এটি ১৯৭০ সালে কার্যকর হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলো অন্য কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই, এরকম দেশের কাছে কোনো অস্ত্র বিক্রয় করতে পারবে না কিংবা অস্ত্র তৈরিতে সহযোগিতাও করতে পারবে না। পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশও এ চুক্তি মোতাবেক কোনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না কিংবা কোনো দেশের কাছ থেকেও পারমাণবিক অস্ত্র ক্রয় করতে পারবে না। তবে কিছু কিছু কারণ নির্দেশ করে চীন, পাকিস্তান, ভারত, ইসরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকা এ চুক্তিতে সই করা থেকে বিরত রয়েছে।

♦ গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (সল্ট-১) *[১৩তম বিসিএস]*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে হেলসিংকি ও ভিয়েনাতে অত্যাধুনিক ও অতি মারাত্মক মারণাস্ত্র সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে যে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সেটা ছিল কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা বা SALT. এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মস্কো সফরে গেলে দুই দেশের মধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ বন্ধ ও অন্যান্য আক্রমণমূলক অস্ত্র নির্মাণ ৫ বছরের জন্য মুলতবি রাখার অঙ্গীকারসম্পন্ন একটি চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি আংশিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সালের ২৮ মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সীমিতকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

♦ পরমাণু অস্ত্র হ্রাস চুক্তি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২৪ মে ২০০২ এক ঐতিহাসিক পরমাণু অস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির আওতায় দুই দেশ আগামী ১০ বছরে তাদের পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করবে। ক্রেমলিনে বুশ ও পুতিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত এ চুক্তিতে ২০১২ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মোতায়েনকৃত কৌশলগত পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা হ্রাস করে যথাক্রমে ১ হাজার ৭০০ এবং ২ হাজার ২০০-তে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়। বর্তমানে উভয় দেশের ৬ হাজারটি করে পরমাণু অস্ত্র প্রস্তুত রয়েছে। ক্রেমলিনের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হলে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি

এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু ছিল। তিন পৃষ্ঠার এ চুক্তিতে যে কেবল দু' দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরমাণু অস্ত্র হ্রাসের অঙ্গীকার করা হয় তাই নয়, সম্ভবত এটিই দু'দেশের মধ্যে এ বিষয়ে শেষ চুক্তি। ১৯৯১ সালের START-1 চুক্তির ভিত্তিতে বর্তমান চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরে উভয় প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিসা রাইস এবং রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভ্লাদিমির রুশাইলো।

♦ রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি *[২৪তম বিসিএস]*

যেসব ক্ষতিকর ও প্রাণঘাতী রাসায়নিক উপাদান যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলোকে বলা হয় রাসায়নিক অস্ত্র। সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে (The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Chemical Weapons and on their Destruction) ১৯৯২ সালে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতৃবৃন্দ রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তির বিষয়ে মতৈক্যে পৌছান এবং ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল এটা কার্যকর হয়। সে সময় থেকেই নেদারল্যান্ডের হেগস্থ রাসায়নিক অস্ত্রসমূহ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) CWC-এর ধারাসমূহের বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে।

♦ জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন

সব ধরনের জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংসসাধনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭১ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (The Convention on the Prohibition of the Development Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on there destructions)। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত চুক্তিটি জীবাণু অস্ত্র এবং রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (BWC) নামে অভিহিত। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং ১৯৭৫ সালে এটি কার্যকরী হয়। ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিনঘটিত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ছিল এ চুক্তির লক্ষ্য। এ চুক্তিতে জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্র উন্নয়ন, উৎপাদন ও মজুদ নিষিদ্ধ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া), ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশ এ চুক্তির উদ্যোক্তা।

♦ ভার্সাই চুক্তি (১৭৮৩) ও ভার্সাই শান্তিচুক্তি (১৯১৯)

ভার্সাই চুক্তি বলতে দুটি বিখ্যাত চুক্তিকে বুঝায়। একটি প্রথম ভার্সাই চুক্তি ও অন্যটি দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ১৭৮৩ সালে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় প্রথম ভার্সাই চুক্তি। দেশ দুটির মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষায় সমঝোতা সাধনের উদ্দেশ্যে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে ৪ জুলাই ১৭৭৬ ব্রিটেনের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির সঙ্গে ইউরোপের মিত্রশক্তির চুক্তি। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ এবং পরাজিত জার্মানির মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে স্বাক্ষরিত হয় বলে একে ভার্সাই চুক্তি (দ্বিতীয়) বলা হয়। এ চুক্তি সম্পাদনের আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের উড্রো উইলসন, গ্রেট ব্রিটেনের ডেভিড লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের জর্জ ক্লেমেসঁ এবং ইতালির অরলান্দো। রাশিয়া এতে অংশ নেয়নি। জার্মানির কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্তের মধ্যে ছিল, জার্মানির উপনিবেশগুলোকে লীগ অব নেশন্স-এর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া। ডানজিগকে স্বাধীন নগরে পরিণত

করা; জার্মানির সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে দেয়া; রাইনল্যান্ড এলাকা মিত্রশক্তির দখলে আনা এবং তার বেসরকারিকরণ। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি ১৯২১ সালে এ চুক্তি মোতাবেক সাব্যস্ত হয় যে, জার্মানি ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। স্বভাবতই এ চুক্তি জার্মানির জন্য শুধু চরম অবমাননাকরই ছিল না জার্মান অর্থনীতির জন্যও এটা ছিল দুর্বহ। ১৯৩২ সালে জার্মানি ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৩৫ সালেই (দ্বিতীয়) ভার্সাই চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করে।

♦ আল কায়েদা

বহুল আলোচিত, নন্দিত-নিন্দিত ওসামা বিন লাদেনের সংগঠনের নাম আল কায়েদা। বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই আল কায়েদার সদস্য আছে বলে ধারণা করা হয়। বসনিয়া, চেচনিয়া, তাজিকিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও কসোভোতে মুসলিম যোদ্ধাদের সমর্থন, সাহায্য ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে আল কায়েদার সদস্যরা। আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ সংগঠনটির জন্মের পটভূমি। ১৯৮৮ সালের দিকে আল কায়েদা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করা এবং ইসলামী দেশসমূহ থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিম নামধারী শাসকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যে সরকার শরীয়াহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। সৌদি ধনকুবের লাদেন তাঁর সম্পত্তির একটা বিরাট অংশ ব্যয় করে আল কায়েদার সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা আল কায়েদার জন্য সাহায্য পাঠিয়ে থাকে। এসব সাহায্য সবই আসে ব্যক্তি পর্যায় থেকে। ইসলামের বাস্তবপন্থি মুসলিমরা আল কায়েদার জন্য আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য যুগিয়ে থাকে।

♦ অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম

১৯৯১ সালে ইরাক আকস্মিকভাবে কুয়েত দখল করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে হটানোর জন্য যে সামরিক অভিযান শুরু করে তার সাংকেতিক নাম 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম বা অপারেশন মরু ঝড়'। এই অপারেশনের নামে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন কতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও তা বহাল রাখা হয়।

♦ অপারেশন ডেজার্ট ফক্স

১৯৯৮ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের সাংকেতিক নাম 'অপারেশন ডেজার্ট ফক্স' (Operation Desert Fox)। ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর মাত্র চারদিনের অভিযানে আক্রমণকারী ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ ইরাকের ওপর ভয়াবহ বিমান হামলা পরিচালনা করে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে। তারা ইরাকের লক্ষ্যবস্তুর ওপর নিক্ষেপ করে ৪২৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। রাশিয়া ও চীন এই অভিযানের প্রতিবাদ জানায়। বিশ্ববাসী ইঙ্গ-মার্কিন এই হামলাকে নিছক শক্তির দাম্ভিকতা এবং মানবতার বিরুদ্ধে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করে।

♦ জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defense) *[২৫তম বিসিএস]*

বিশ্বের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি যেন হুমকি না হতে পারে সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা, যা National Missile Defence বা NMD পরিকল্পনা নামে পরিচিত। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহেন কংগ্রেসে এ প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, এটা আমাদের মিত্ররাষ্ট্র রাশিয়াসহ অন্য রাষ্ট্রের জন্য কোনোরূপ হুমকি নয় এবং ১৯৭২ সালের ABM চুক্তির বিপক্ষেও নয়। মার্কিন প্রশাসনের মতে, এটা ABM চুক্তির লঙ্ঘন নয় বরং চুক্তিটিকে

কিছুটা মোডিফিকেশন করা। বুশ প্রশাসনের ঘোষণানুযায়ী, এ সিস্টেম যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঙ্গরাজ্যেই কার্যকর করা হবে। শিল্পনগরী আলাস্কাতেই তারা ১০০টি Missile interceptor বসানোর পরিকল্পনা করেছে এবং ২০০৪ সালের মধ্যেই আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ Space-Based-Intrered System (SBIRS) প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। এ SBIRS রাডারের মাধ্যমে শত্রু রাষ্ট্রগুলোর খবরাখবর সরবরাহ করবে এবং অটোম্যাটিক্যালি শত্রু মোকাবিলার জন্য কাজ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্যোগের সরাসরি বিরোধিতা করেছে চীন ও রাশিয়া। চীন মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর দ্বারা চীনের প্রতি একটি হুমকি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে আর রাশিয়া মনে করে এর দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই বিতর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য বলছে, এটা শুধু ইরান ও উত্তর কোরিয়ার মতো সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলোর হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। এছাড়া ইতোমধ্যে উত্তর কোরিয়া বলেছে, দক্ষিণ কোরিয়া যদি এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দেয়, তাহলে তারা দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা থেকে ফিরে আসবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলে সফলতা আসুক বা না আসুক, NMD পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে, যা বিশ্বের শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রতি বিরাট হুমকি সৃষ্টি করবে।

♦ জীবাণু অস্ত্র কনভেনশন এবং বিষাক্ত অস্ত্র কনভেনশন *[২৫তম বিসিএস]*

সব ধরনের জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন, মজুদ নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭১ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (The Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction)। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত চুক্তিটি জীবাণু অস্ত্র এবং রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (BWC) নামে অভিহিত। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং ১৯৭৫ সালে এটি কার্যকর হয়। ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিনঘটিত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ছিল এ চুক্তির লক্ষ্য। এ চুক্তিতে জীবাণু ও বিষাক্ত অস্ত্র উন্নয়ন, উৎপাদন ও মজুদ নিষিদ্ধ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া), ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশ এ চুক্তির উদ্যোক্তা।

♦ বিশ্ব স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি *[২০তম বিসিএস]*

মানববিধ্বংসী এক ক্ষুদ্র অস্ত্র স্থলমাইন থেকে বিশ্বের নিরীহ মানুষকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে কানাডার রাজধানী অটোয়ায় চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন এ চুক্তিকে সমর্থন না করলেও তারা অনুষ্ঠানে পর্যবেক্ষক পাঠায়। প্রতি বছর স্থলমাইনে অন্তত ২৬ হাজার মানুষ নিহত বা পঙ্গু হয়ে যায়। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান দুদিনব্যাপী এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ প্রশ্নে বিগত দিনগুলোতে কানাডা অগ্রণী ভূমিকার অংশ হিসেবে প্রথম এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। স্থলমাইন নিষিদ্ধ করার পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির এ আন্দোলনের প্রধান হলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জোডি উইলিয়ামস। যুদ্ধে ব্যবহৃত এ স্থলমাইন মাটির নিচে রাস্তাঘাট, পাহাড়, সমতলে শস্যদানার মতো পুঁতে রাখা হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তা আর তোলা হয় না। ফলে শিশু-বৃদ্ধসহ নিরীহ সাধারণ মানুষ চলতে-ফিরতে যখন অগোচরে থাকা এ স্থলমাইনের উপর পা ফেলে তখন এর বিস্ফোরণে হয় তারা মারা যায় অথবা পঙ্গু হয়। দেখা গেছে, স্থলমাইন তৈরিতে ব্যয় হয় ৩ থেকে ৪ ডলার। পক্ষান্তরে একটি মাইন অপসারণে ব্যয় হয় এক হাজার ডলার। সারা বিশ্বে এখনো পোঁতা আছে কমপক্ষে এক কোটি মাইন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো খাদ্য, ওষুধ ও বাসস্থান সঙ্কটে জর্জরিত হওয়ায় ব্যয়বহুল এ মাইন অপসারণ তাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। সেজন্য সারা বিশ্বে শুরু হয়েছে এ মানববিধ্বংসী

যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ আন্দোলন। কানাডার অটোয়ায় স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণের যে চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হয় তার খসড়া প্রণয়ন হয়েছিল নভেম্বর ১৯৯৭ সালে সুইডেনের রাজধানী অসলোতে। সে সম্মেলনে ৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে স্থলমাইন নিষিদ্ধ করার চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলাদেশ ১২৬তম দেশ হিসেবে ১৯৯৯ সালের মে মাসে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৯ সালের ১ মার্চ থেকে স্থলমাইনের উৎপাদন এবং এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে 'অটোয়া চুক্তি' কার্যকর হয়। এ চুক্তিতে মাইন ক্ষেত্রগুলো পরিষ্কার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

♦ ক্লাস্টার বোমা

ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমা হলো অসংখ্য ছোট ছোট বোমার আকারে তৈরি কন্টেইনার, যা নিক্ষেপের পর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে অধিকাংশই বিস্ফোরিত হয় না, কিন্তু আঘাত পেলে ও ছুঁড়ে ফেললে বছরের পর বছর ধরেও এ বোমাগুলোর কার্যকারিতা থেকে যায়। বেসামরিক নাগরিক বিশেষ করে শিশুরা এ বোমার শিকারে পরিণত হয়। বোমাটির উজ্জ্বল রং ও ক্ষুদ্র আকৃতির কারণে শিশুরা সহজেই অবিস্ফোরিত এসব বোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। একটি কন্টেইনার বা সিলিন্ডারের ভেতর ২০২টি পর্যন্ত ক্ষুদে বোমা থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্লাস্টার বোমা তৈরি করা হলেও সব ধরনের বোমার কার্যপদ্ধতি মোটামুটি একই ধরনের। এ বোমার সামরিক নাম সিবিইউ ৮৭/বি। এর রয়েছে কম্বাইন্ড ইফেক্ট মিউনিশন, যার প্রতিটির ওজন ৯৫০ পাউন্ড। মাঝারি উচ্চতায় বিভিন্ন বিমান থেকে এ বোমা নিক্ষেপ করা যায়। এ বোমা সর্বোচ্চ ৯ মাইল দূরের লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। বোমাগুলো আকর্ষণীয় রঙের হয় এবং মাটিতে পড়ে কিছু বোমা অবিস্ফোরিত অবস্থায় থাকে, যা পরে বিস্ফোরিত হয়। ২০০৩ সালে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী এ বোমা ব্যবহার করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ, কসভো সংঘাত এবং ২০০১ সালে আফগানিস্তান যুদ্ধে, ইরাক যুদ্ধে এবং ২০০৮-০৯ সালে গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে এ বোমা ব্যবহৃত হয়।

♦ আকসা চুক্তি

প্রতিরক্ষা বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত চুক্তি Acquisition and Cross-Servicing Agreement–ACSA। ২০১২ সালের মধ্যেই চুক্তিটি স্বাক্ষর হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে। ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বাংলাদেশের কাছে 'আকসা'র প্রস্তাব করে। দীর্ঘদিন পর ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আবারো চুক্তিটি করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে পত্র পাঠায়। তখন এ চুক্তিটির নাম ছিল 'ন্যাটো মিউচ্যুয়াল সাপোর্ট অ্যাক্ট'। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা ও সরবরাহ বিনিময় সহজ করার জন্য এটি করা হয়েছিল। তবে ন্যাটো সদস্য নয় এমন দেশগুলোর সরকারের সঙ্গেও আকসা চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৮৬, ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে তা সংশোধন করা হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত মিত্র বা জোটের শরিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়ভাবে আকসার ব্যাপারে আলোচনা করছে। এ চুক্তির খসড়া অনুযায়ী, উভয় দেশের সেনাবাহিনী উভয়কে লজিস্টিক সাপোর্ট, সরবরাহ ও সেবা প্রদান করতে পারবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানি, এয়ারক্রাফটসহ যোগাযোগ, জ্বালানি তেল, গোলাবারুদ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, পোশাক, লুব্রিকেন্টস ও অপারেশনের জন্য বেইজ সাপোর্ট।

♦ অস্ত্রবাণিজ্য রোধে জাতিসংঘ চুক্তি

বিশ্বে প্রতি বছর সাত হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বাণিজ্য হয়। অস্ত্র ব্যবহার করে সংঘটিত সহিংসতায় বিশ্বে প্রতি মিনিটে একজন মানুষের মৃত্যু হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে প্রচলিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্যের রাশ টেনে ধরতে জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলো একটি আন্তর্জাতিক অস্ত্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ লক্ষ্যে ২০১২ সালের ২-২৭ জুলাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি খসড়া সম্মেলন হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন এ ব্যাপারে

সময় চাইলে সম্মেলনটি ভেস্তে যায়। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ নতুন করে সম্মেলন আহ্বান করে, যার নাম দেয়া হয় জাতিসংঘ অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক সম্মেলন (UN Conference on the Arms Trade Treaty)। ২০১৩ সালের ১৮-২৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ইরান, উত্তর কোরিয়া ও সিরিয়ার বিরোধিতার কারণে সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তিটির অনুমোদন হওয়া আটকে গেলে তা পাঠানো হয় জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের কাছে। এরপর বান কি মুন তা ভোটাভুটির জন্য সাধারণ পরিষদে পাঠান। বিশ্বে প্রচলিত অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ২ এপ্রিল ২০১২ ঐতিহাসিক চুক্তি অনুমোদন করে ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। এ চুক্তির আওতায় বিশ্বে বছরে সাত হাজার কোটি ডলারের অস্ত্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। চুক্তির পক্ষে ১৫৪ এবং বিপক্ষে পড়ে তিন (ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়া) ভোট। ভোটদানে বিরত থাকে ২৩ সদস্য।

♦ গুচ্ছবোমা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কার্যকর

গুচ্ছবোমা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (Cluster Bomb Ban Treaty) কার্যকর হচ্ছে ১ আগস্ট ২০১০। চুক্তিটি কার্যকরের অন্যতম শর্ত ছিল ৩০টি দেশ কর্তৃক অনুমোদন। আন্তর্জাতিক এ চুক্তিতে সব ধরনের গুচ্ছবোমার উৎপাদন বন্ধ এবং এরই মধ্যে যেসব রাষ্ট্র এগুলোর প্রয়োগ ঘটিয়েছে, তাদের কাছ থেকে হতাহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ে চাপ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে এ বোমার ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি নিষিদ্ধ করার জন্য ২০০৮ সালের ১৯-৩০ মে প্রথম চুক্তিটি উপস্থাপিত হয়। ২০০৮ সালের ৩ ডিসেম্বর অসলোতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১০ সালে ৩০টি দেশ এটির অনুমোদন দেয়। আর ১০৪টি দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে। অনুমোদন কিংবা স্বাক্ষরের তালিকায় নেই যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও ইসরাইলের মতো বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো। অন্যদিকে ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানি এবং স্পেন চুক্তিটিকে অনুমোদন দিয়েছে। ব্রিটেন এবং ইতালি স্বাক্ষর করলেও অনুমোদন দেয়নি। ২০১০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বারকিনা ফাসো এবং মলদোভা চুক্তিটি অনুমোদন করলে মোট অনুমোদনকারী দেশের সংখ্যা হয় ৩০টি।

♦ অসলো সনদ ২০০৭

ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমা হলো অসংখ্য ছোট ছোট বোমার আকারে তৈরি কন্টেইনার, যা নিক্ষেপের পর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে অধিকাংশই বিস্ফোরিত হয় না, কিন্তু আঘাত পেলে ও ছুঁড়ে ফেললে বছরের পর বছর ধরেও এ বোমাগুলোর কার্যকারিতা থেকে যায়। বেসামরিক নাগরিক বিশেষ করে শিশুরা এ বোমার শিকারে পরিণত হয়। বোমাটির উজ্জ্বল রং ও ক্ষুদ্রআকৃতির কারণে শিশুরা সহজেই অবিস্ফোরিত এসব বোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী গুচ্ছ (ক্লাস্টার) বোমা ব্যবহার নিষিদ্ধকরণে ২-৪ ডিসেম্বর ২০০৭ নরওয়ের অসলোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত হয় গুচ্ছ বোমা সনদ (Convention on Cluster Munitions–CCM)। ২০০৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ব্যাপক আলোচনা ও বৈঠকের পর এ সনদ গৃহীত হয়।

♦ পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক) নিষিদ্ধকরণ চুক্তি

১৯৬৩ সালের ৫ আগস্ট মস্কোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক) নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১০ অক্টোবর ১৯৬৩ চুক্তিটি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ফ্রান্স ও চীন ব্যতিরেকে বহু রাষ্ট্র এ চুক্তির আওতায় আসে। এ চুক্তির মূল কথা দুটি ১. ভূ-পৃষ্ঠে, মহাশূন্যে বা সমুদ্র তলদেশে কোনো প্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের

পরীক্ষা করা যাবে না এবং ২. শুধু ভূ-গর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো যাবে। তবে সেক্ষেত্রেও নিশ্চিত করতে হবে যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা অপর কোনো ক্ষতিকর উপসর্গ যেন ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে আসতে না পারে। চুক্তিভুক্ত কোনো দেশ ইচ্ছা করলে তিন মাসের নোটিশ সাপেক্ষে এই চুক্তির আওতা থেকে সরে আসতে পারে।

♦ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA)

আইএইএ (IAEA—International Atomic Energy Agency) বলতে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থাকে বোঝায়। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৯ জুলাই ১৯৫৭ সালে। জাতিসংঘভুক্ত হয় ১৪ নভেম্বর ১৯৫৭। এর সদরদপ্তর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অবস্থিত। আইএইএ-এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সকল দেশের আণবিক শক্তিকে শান্তি ও প্রগতির কাজে লাগানো, এ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য কোনো সদস্য রাষ্ট্র যেন তার সামরিক খাতে ব্যবহার করতে না পারে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। প্রতিবছর একবার এর বৈঠক হয়। এর ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। এর প্রধান মহাসচিব। জাপানের নাগরিক ইউকিয়া আমানো ৩০ নভেম্বর ২০০৯ সালে এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বোর্ড অব গভর্নসের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে নির্বাচিত হন। আইএইএ-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬৪।

♦ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে। আর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ হচ্ছে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের শাখা। এ বিভাগের ওপর শান্তিরক্ষা কার্যক্রম তদারকি করা, দিক নির্দেশনা দেয়া, সুপারিশ করা, পরিকল্পনা করাসহ নানাবিধ দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এ বিভাগটি জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এর সাংগঠনিক কাঠামো Office of Operations এবং Office of Mission Support-এ দু ভাগে বিভক্ত। Office of Mission Support এর অন্তর্ভুক্ত প্রশাসনিক বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ, লোকবল বিভাগ প্রভৃতি। বিভাগীয় প্রধান মহাসচিবের পক্ষে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করেন; কার্যক্রমের নীতিমালা ও নির্দেশনা তৈরি করে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মহাসচিবকে পরামর্শ দেন।

♦ নেভি সিল

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষের লড়াইয়ে বিশেষ পারদর্শী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে অভিজাত কমান্ডো বাহিনীগুলোর অন্যতম নেভি সিল। এ বাহিনী ফ্রগম্যান, দ্য টিমস ও গ্রিন ফেসেস নামেও পরিচিত। এর নামকরণ করা হয় SEa, Air and Land-এর আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত SEAL থেকে। অত্যন্ত কঠিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যুদ্ধে প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের দক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের সেরা কমান্ডো বাহিনী নেভি সিল সদস্যরা ব্যবহার করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি— ব্লাক হক হেলিকপ্টার, মনুষ্যবিহীন বিমান (ড্রোন), দূর নিয়ন্ত্রিত রোবট, দ্রুত রং পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা চশমা, উড়াল গাড়ি প্রভৃতি। ১৯৬২ সালের ১ জানুয়ারি গঠিত এ বাহিনীর প্রত্যেকেই এক একটি টিভি সম্প্রচার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করেন। তাদের শরীরে থাকা টিভি ক্যামেরা দিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ২ মে ২০১১ লাদেন হত্যার দৃশ্য ওয়াশিংটনে বসে সরাসরি দেখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। প্রচুর শারীরিক যন্ত্রণা এবং কখনো

কখনো মানসিক ব্যথা নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে, হিন্দুকুশ পর্বতের ১০ হাজার ফুট উপরে, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশের দুর্গম মরুভূমি এবং পৃথিবীর গহীন অরণ্যে প্রশিক্ষণ নেয়া এ বাহিনীর সেনারা বিশ্বের ৩০টি দেশে সন্ত্রাস বিরোধী লড়াই ও মিশনে নিয়োজিত। এ বাহিনীর সদস্যরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক, আফগানিস্তানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অসংখ্য সফল অভিযান চালায়। এ বাহিনীর সদর দপ্তর ক্যালিফোর্নিয়া ও ভার্জিনিয়ায়।

♦ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA)

১৯৪৭ সালের ২৬ জুলাই প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি' বা সিআইএ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা গুপ্তচর-বিভাগ। সিআইএ'র পত্তন হয়েছিল মূলত ব্রিটিশদের দৌলতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকার কোনো কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর সংস্থা ছিল না। ১৯৪২ সালে ব্রিটেনের চাপে পড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ওএসএস অর্থাৎ 'অফিস অব দ্য স্ট্রাটেজিক সার্ভিস' গড়ে তোলেন দেশের গোয়েন্দাদের কাজে সংহতি ও সমন্বয় আনার উদ্দেশ্যে। এটি পরিচালনার ভার ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত যোদ্ধা ও প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম ডোনোভান-এর ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ওএসএস'কে সরকারিভাবে ভেঙে দেয়া হয়। কিন্তু চাকরিতে বহাল থাকেন এর অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী। এদের নিয়েই প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের উদ্যোগে রিয়ার এডমিরাল সিডনি সৌয়ার্স-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ। এদের কাজ ছিল রাষ্ট্রপতির কাছে গুপ্ত খবর একত্র করে ব্যাখ্যা করা। ১৯৪৭ সালে সারা পৃথিবীতে শীতল যুদ্ধ হয়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত সংঘের অধীনে চলে যায়। আমেরিকাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন সৃষ্টি করে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হয়। 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি' করা হয়। এ নতুন সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে গোয়েন্দাগিরি করা এবং মূল্যবান গুপ্ত সংবাদ একত্র করে তার বিশ্লেষণ করা। এর প্রথম নির্দেশক ছিলেন এডমিরাল রোসকো হিলেন কোয়েটার। এ সংস্থায় যারা কর্মরত তাদের ভাষায় এর নাম 'দ্য কোম্পানি'। এর সদর দপ্তর অবস্থিত ভার্জিনিয়ার ল্যাঙলে শহরে। দ্বিতীয় সদর দপ্তরও ভার্জিনিয়াতেই, ম্যাকলিন অঞ্চলে। এদের বেশির ভাগই নিয়মিত কাজের জন্য প্রকাশ্যে নিযুক্ত। এরা ঘটনা বা খবরাখবরের বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করেন। গোপন কাজে নিয়োজিত গোয়েন্দা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিছু জানতে পারে না। এদের চাকরি প্লানস ডিভিশন বা পরিকল্পনা বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এরাই পরিচালনা করে আমেরিকান দূতাবাসগুলোর সিআইএ দপ্তর, যার সাংকেতিক নাম 'স্টেশন'।

♦ কেজিবি

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি। পুরো নাম 'কোমিতেত গোসুদরস্তভেন্নোই বেজোপাস্তনোস্তি' অর্থাৎ 'সোভিয়েত কমিটি অব স্টেট সিকিউরিটি' বা 'সোভিয়েত রাজ্য নিরাপত্তা সমিতি'। ষোড়শ শতক থেকে তৎপর 'রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স' সংগঠনের ধাঁচে এই গোয়েন্দা সংস্থার জন্ম হয় রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে। তখন এর নাম ছিল 'চেকা' চেকার প্রধান ছিলেন পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী রাশিয়ার প্রথম সাম্যবাদী গোয়েন্দা ফেলিক্স জেরঝিনস্কি কেজিবি'র গোয়েন্দারা এখনো নিজেদের 'চেকিস্ক' বলে গর্ব করে। ১৯২২ সালে চেকার নাম বদলে জিপিইউ করা হয়। কিছুদিন পর একে ওজিপিইউ বলা হতে থাকে। যার অর্থ দাঁড়ায় 'রাজ্যের রাজনৈতিক প্রশাসন'। ১৯৩৪ সালে একে এনকেবিডি বলা হয়। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ গুপ্ত এজেন্সিকে কেজিবি নামে

অবহিত করা হয়। এর সদর দপ্তর অবস্থিত মস্কোর জেরঝিনস্কি স্কোয়ারে। বিশ শতকের নব্বই দশকের এক হিসাব অনুসারে কেজিবি'তে কর্মরত লোকের সংখ্যা প্রায় দু'লাখ। শোনা যায়, রাশিয়ার বাইরে অ-রুশ কর্মীর সংখ্যা সাড়ে সাত লাখেরও বেশি। কেজিবি'র মূল দায়িত্ব দেশের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং মিলিটারি শাখা জিআরইউ'র সঙ্গে সমন্বিতভাবে গোটা বিশ্বে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা।

পরবর্তীতে কেজিবি একটি স্মর্শ (Smersh) নামক হত্যাকারীদের সংস্থাও স্থাপন করেছিল। এর অর্থ হলো 'বিশ্বাসঘাতক গোয়েন্দাদের মৃত্যু'। এ সংগঠনের কাজ ছিল, যে সকল গোয়েন্দাদের ওপর সন্দেহ হতো যে তারা শত্রুদের হাতে হাত মিলিয়েছে তাদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। ১৯৪৬ সালে স্মর্শকে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সেই জায়গায় 'ডিপার্টমেন্ট ফাইভ' নামক এজেন্সি খোলা হয় যা স্মর্শ-এর মতোই হত্যাকাণ্ড ঘটাত। কেজিবি'কে সাহায্য করার জন্য জিআরইউ বা সোভিয়েত ফৌজী সিক্রেট সার্ভিস নামে একটি মিলিটারি গুপ্ত সংগঠনও আছে। যার কার্যালয় ১৯ নামেনসকি স্ট্রিট মস্কোয় অবস্থিত। আমেরিকা থেকে অ্যাটম বোমার রহস্য চুরি করে রাশিয়ায় নিয়ে আসার কাজ জিআরইউ-এরই ছিল। রুডোল্ফ এবেল ও কোনোন মেলোডির মতো বিখ্যাত গোয়েন্দা জিআরইউ-এরই দান। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্লার্ডস ফুশ আর রোসেনবর্গ দম্পতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করা আর অ্যাটম বোমের রহস্য জেনে নেয়া জিআরইউ-এরই সাহসিক কার্য ছিল।

♦ আইএসআই

পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের পুরো নাম 'ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সি'। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ আইবির (Inteligence Burenu) কর্মচ্যুত পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নিয়ে আইবি পুনর্গঠিত হয়। জানা যায়, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আইএসআই বা ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সি (Inter Services Agency) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভুট্টোর সে আশা পূরণ হয়নি।

পরে ক্রমান্বয়ে আইএসআই আন্তর্জাতিক মানের গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়। এ সংস্থার প্রধান কার্য এলাকা ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে এ সংস্থার তৎপরতা আছে বলে জানা যায়। আসামের বিদ্রোহী গ্রুপ 'উলফা'র সঙ্গে আইএসআইর যোগসাজশ আছে বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে আফগান, তালেবান এবং বাংলাদেশের মৌলবাদী বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

♦ এফবিআই

FBI-এর পূর্ণ নাম Federal Bureau of Investigation। ১৯০৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট পশ্চিম আমেরিকার দস্যু ও পূর্ব আমেরিকার অপরাধীদের দমনের উদ্দেশ্যে এফবিআই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে এডলার হুভার মাত্র ২৯ বছর বয়সে এই গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হন এবং সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারের ওপর আক্রমণের গোপন সংবাদ পেয়েও তা কাজে লাগাতে না পারায় মার্কিন সরকার মনে করে যে, আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির জন্য এফবিআই তেমন উপযুক্ত নয়। ফলে Central Intelligence Agency (CIA)-এর সৃষ্টি হয় এবং এফবিআই কার্যত অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়। কঠোর শৃঙ্খলাসম্পন্ন এই সংস্থার প্রত্যেক এজেন্টই সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধ, অস্ত্রের ব্যবহার, অপরাধের

কলাকৌশল পরীক্ষা, আইন, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী নাৎসি গোয়েন্দাদের রহস্য উদঘাটন ও পরবর্তীকালে কেজিবি এজেন্টদের নির্মূল করার কৃতিত্ব FBI-এর। এর আর একটি অন্যতম কৃতিত্ব হলো নাৎসিদের খবর পাঠানোর গুপ্ত ব্যবস্থা মাইক্রোডটের রহস্য বের করা। এটি পৃথিবীর এমন একটি গুপ্তচর বিভাগ যারা অপরাধী আর বিদেশী গুপ্তচরদের সঙ্গে একই সঙ্গে মোকাবিলা করে।

♦ বাফার জোন

দুটো বৈরী (এবং বিশেষত সাম্প্রতিককালে বৈরী) দেশের বা গ্রুপের মধ্যে অবস্থিত এলাকা যেখানে অবশ্য কোনো পক্ষই সামরিক সমাবেশ ঘটায়নি। অর্থাৎ দুপক্ষের মধ্যে একধরনের বিভেদকারী জোন রয়েছে যা প্রাথমিকভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে ভুলক্রমে কোনো সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস করে বা পরিণামে স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে। এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো পক্ষ বাফার জোনের অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে অপর পক্ষকে আক্রমণ করবে না এটা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের মতো নিরপেক্ষ সংস্থাকে অনেক সময় অস্ত্রে সজ্জিত ছোট আকারের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের আহ্বান জানানো হয়। গোলান মালভূমি ও সিরিয়ার বাকি অংশের মধ্যে, সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র এবং তুর্কী সাইপ্রাস (উত্তর সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র)-এর মধ্যকার জোনসমূহে এ ধরনের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন আছে। জাতিসংঘের বাইরেও কখনো কখনো বহুজাতিক বাহিনীর আওতায় একই ধরনের ভূমিকা কেউ কেউ পালন করতে পারে। যেমন– মিসর ও ইসরাইলের মাঝে সিনাই এলাকার পূর্ব এলাকা পাহারা দেয়ার জন্য নিয়োজিত বহুজাতিক বাহিনী ও পর্যবেক্ষকরা (Multinational Force and Observers).

♦ বোকো হারাম

বোকো হারাম বা জামাতু আহিস সুন্নাহ লাদ্দাআওতিহ ওয়াল-জিহাদ নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন যারা আল-কায়েদার মতো পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। আত্মঘাতী বোমা হামলা তাদের প্রধান যুদ্ধপদ্ধতি এবং আল-কায়েদার মতো 'আদর্শ' বাস্তবায়নে চরমপন্থী। বোকো শব্দটি হাউসা ভাষার আর হারাম এসেছে আরবি থেকে। বোকো অর্থ পশ্চিমা শিক্ষা। বোকো হারাম মানে পশ্চিমা শিক্ষা পাপ। মোহাম্মদ ইউসুফ ২০০১ সালে বোকো হারাম প্রতিষ্ঠা করেন। নাইজেরিয়ার বোরনো প্রদেশের রাজধানী মাইদুগুরির নিকটবর্তী শহর দাম্বোয়ায় বোকো হারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে বোকো হারাম শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে বোকো হারামের প্রধান ঘাঁটি। বোকো হারামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষের তৈরি আইন ও আধুনিক বিজ্ঞানকে দলটি অস্বীকার করে। আল-কায়েদার ইসলামিক সদস্য সৌদি আরব ও যুক্তরাজ্যের কিছু গোষ্ঠী বোকো হারামের তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া আল মুনতাদা ট্রাস্টও তহবিল জুগিয়ে থাকে। দেশটিতে ২০১২ সালে ৬২০ জন ও ২০১১ সালে ৪৫০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যার জন্য জঙ্গি দলটিকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বোকো হারাম তিন থেকে ১০ হাজার মানুষ হত্যা করেছে। তাদের সঙ্গে একিউআইএমের সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা হয়।

বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গিগোষ্ঠীর নাম 'বোকো হারাম'। নাইজেরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার দখল এখন তাদের হাতেই। তাদের জঙ্গি কর্মকাণ্ড-বর্তমানে নাইজেরিয়া ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী ক্যামেরুন পর্যন্ত পৌঁছেছে। নাইজেরিয়ার সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ বোকো হারামের নিষ্ঠুরতার শিকার। দেশটির উত্তর-পূর্বে গোষ্ঠীটির উত্থানে পাঁচ বছর ধরে সেখানে চলছে মানবতা সঙ্কট।

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেছিল। সেই অভিযানে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাসহ অসংখ্য সদস্যকে হত্যা করা হয়। জীবিতরা এরপর সুদান, আলজেরিয়া, এমনকি আফগানিস্তানেও আশ্রয় নেয়। সেখানে থেকেই ওই অঞ্চলের জঙ্গিগোষ্ঠীদের কাছে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে নাইজেরিয়ায় ফিরে আসে। প্রথমে বোকো হারাম স্থানীয় মুসলিমদের কাছে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিকল্প ব্যবস্থা প্রণয়ন করার স্বপ্ন দেখালেও এখন কাজ শুধু দখলদারিত্ব বৃদ্ধি। আমেরিকার সরকারি কর্মকর্তাদের হিসাব অনুযায়ী, দেশি জিম্মি মুক্তির মাধ্যমে এই গোষ্ঠী মাসে ১০ রক্ষাধিক ডলার পর্যন্ত আয় করে থাকে। আর বিদেশি জিম্মি মুক্তি থেকে আয় আরো বেশি। যেমন, ২০১৩ ফেব্রুয়ারি মাসে সাত সদস্যের এক ফরাসি পরিবারকে মুক্তির দিয়ে তারা ৩০ লাখ ডলার আয় করেছে।

সবমিলিয়ে নাইজেরিয়ার ওই গোষ্ঠীর বর্তমান বার্ষিক আয় ১০ কোটি ডলারের বেশি।

দখল করা অঞ্চলের পুলিশ স্টেশন এবং সামরিক সরবরাহগুলোই বোকো হারামের অস্ত্রের প্রধান উৎস। বর্তমানে তারা যুদ্ধে রকেটচালিত গ্রেনেড, অযাসল্ট রাইফেল, পিকআপ ট্রাক এবং সাঁজোয়া যান ব্যবহার করে। ২০১৪ সাল নাইজেরিয়ার একটি স্কুল থেকে ২ শত ছাত্রী বোকো হারাম কর্তৃক অপহরণ হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় খুবই গুরুত্ব পায়। সম্প্রতি গোষ্ঠীটির প্রধান শেকাউ ইরাক-সিরিয়ার জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের প্রধান আবু বকর আল-বাগদাদিকে 'খলিফা' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে এবং নাইজেরিয়ার সরকারের পরিবর্তন ঘটলে নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী বোকো হারামের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করে। তাদের অসংখ্য ঘাটি ধ্বংস করে সেখান থেকে কয়েকশ নারী ও শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

♦ সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করার পরিকল্পনা ঠিকভাবেই সামনের দিকে এগোচ্ছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া ২১১৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১৪ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই সিরিয়ার সব রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে আগেই একটি সমঝোতা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ নভেম্বর ২০১৩ অস্ত্রের মজুদ ধ্বংসের বিস্তারিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে হেগ-ভিত্তিক রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণবিষয়ক সংস্থা 'অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রহিবিশন অব কেমিক্যাল ওয়েপন্স' (OPCW)। জাতিসংঘ ও OPCW'র যৌথ টিম এ অস্ত্র ধ্বংস কর্মসূচি তত্ত্বাবধান করছে। এ ব্যাপারে সিরিয়া সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করে। ২১ আগস্ট ২০১৩ সিরিয়ার বিদ্রোহীদের ওপর সেনাবাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের পর পশ্চিমা হামলা থেকে বাঁচতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করতে সম্মত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের করা একটি চুক্তির আওতায় এ টিম সিরিয়ায় যায়। রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদের স্থানগুলো পরিদর্শন ও এসব অস্ত্র তৈরির স্থাপনা ধ্বংস করার কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর এখন এ টিমের সামনে সবচেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা রয়েছে, তা হলো সারিন ও মাস্টার্ড গ্যাসসহ ৫০০ টনের মতো মারাত্মক বিষাক্ত রাসায়নিক অস্ত্রগুলো ধ্বংসের জন্য শীঘ্রই তা সমুদ্রবন্দরে নিয়ে তৃতীয় কোনো দেশের জাহাজে তোলা। এসব অস্ত্র বাণিজ্যিকভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার ব্যাপারে প্রথমে আলবেনিয়া আগ্রহ দেখালেও পরে অবশ্য দেশটি তা অস্বীকার করে। এসব অস্ত্র প্রথমে প্যাক করে বিশেষ কনটেইনারে তুলে লেবানন সীমান্ত এলাকা থেকে সিরিয়ার সংঘাতকবলিত এলাকার ভেতর দিয়ে রাজধানী থেকে ১৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত লাতাকিয়া সমুদ্রবন্দরে অবস্থানরত নরওয়ে ও ডেনমার্কের দুটি জাহাজে তোলার পর সেগুলো তোলা হবে মার্কিন জাহাজ এমভি কেপ রে-তে। এমভি কেপ রে-তে নতুন

সংযোজিত দুটি ফিলড-ডেপ্লয়েবল হাইড্রোলিসিস সিস্টেমের (FDHS) মাধ্যমে রাসায়নিক উপাদানগুলো নিষ্ক্রিয় করার কথা। সাগরের এমন অংশে রাসায়নিক উপাদানগুলো ধ্বংস করা হবে, যেখানে সাগর উত্তাল নয়, শান্ত থাকবে। OPCW'র তত্ত্বাবধানে এ অভিযানে ৩৬ জন প্রযুক্তিবিদ অংশ নেবেন। এছাড়া ২৫ সদস্যের মার্কিন ক্রুর একটি শক্তিশালী দলও থাকবে।

♦ ক্রিমিয়া

কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত ছোট উপদ্বীপ ক্রিমিয়া। শতকের পর শতক ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয় ভূখণ্ডটি। গ্রিক-স্কিথিয়ান-বাইজেন্টাইন-জেনোয়াদের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায় ক্রিমিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে। এছাড়া বহিরাগত আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল গথ এবং হানরা। তবে যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে ক্রিমিয়া উপদ্বীপে সবচেয়ে বেশি সময় অবস্থান করার ইতিহাস আছে টার্কিভাষী মোঙ্গলদের। তারা স্থানীয়দের মধ্যে মিশে গিয়ে 'ক্রিমিয়ান তাতার' জাতিগোষ্ঠীর প্রবর্তন করে। 'গোল্ডেন হোর্ড' থেকে স্বাধীন হওয়ার পর এটি তুর্কি উপনিবেশে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে রাশিয়ার প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৭৪ সালে 'কুচুক কাইনারজি শান্তিচুক্তি'তে ক্রিমিয়া রাশিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। পরের শতকেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ১৮৫৩–১৯৫৬ সালে রাশিয়া এবং ইউরোপের (ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক সংঘবদ্ধ) যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় ক্রিমিয়া। বিংশ শতকে ক্রিমিয়া পরিণত হয় রাশিয়ান, ক্রিমিয়ান তাতার, ইউক্রেনিয়ান এবং ইহুদিদের মিলিত আবাসভূমিতে। শিল্প-সাহিত্যে এ অঞ্চলের বেশ খ্যাতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। ক্রিমিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক বিখ্যাত রাশিয়ান কবি, লেখক ও শিল্পী। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ক্রিমিয়ায়ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অনেক ক্রিমিয়ান তাতার জার্মানির দোসরে পরিণত হয়। সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন তখন এ পুরো জাতিগোষ্ঠীকেই ক্রিমিয়া থেকে মধ্য এশিয়ায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে প্রায় দুই লাখ মানুষকে ক্রিমিয়া থেকে বের করে দেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও বিতাড়িত হয় অনেক তাতার। তবে অনেক কমিউনিস্ট নেতার সমর্থনে আশির দশকে তাতাররা আবার ক্রিমিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ পায়। কিন্তু আগের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে তারা সোভিয়েত বিমুখ হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালে একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্রিমিয়া উপদ্বীপটি ইউক্রেন প্রশাসনকে 'উপহার' দেন। তবে উপদ্বীপটির সেভাস্টোপোল শহরে রাশিয়ান নৌঘাঁটি রেখে দেয়া হয়। নব্বইয়ের দশক থেকেই এ নৌঘাঁটি রাশিয়া-ইউক্রেনের বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়।

সর্বশেষ ২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউক্রেনের রুশপন্থী প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ ইইউর সাথে একটি বাণিজ্যচুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর থেকেই বিরোধীদের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে ইউক্রেন। পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, দেশত্যাগ এবং পশ্চিমা-রাশিয়া দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে রুশ সীমান্তে অবস্থিত ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ক্রিমিয়ায় সেনা মোতায়েন করে রাশিয়া। সর্বশেষ ক্রিমিয়ার রুশপন্থী জনগণের ভোটে নির্ধারিত হয় ক্রিমিয়ার ভাগ্য।

১৬ মার্চ ২০১৪ ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৬.৬ শতাংশ ভোটার রাশিয়ার সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেয়। ঐ গণভোটের পর ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ১৭ মার্চ ২০১৪ নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং রুশ ফেডারেশনে যোগ দেয়ার আনুষ্ঠানিক আবেদন জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিমিয়াকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে ডিক্রি জারি করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির

পুতিন। এরপর ১৮ মার্চ ২০১৪ রাশিয়ায় ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ক্রিমিয়ার নেতারা। এর মাধ্যমে একদিনের স্বাধীন ক্রিমিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব আর সম্ভবত এটাই হচ্ছে ইতিহাসে সবচেয়ে স্বল্পায়ু রাষ্ট্র। নতুন আইন অনুযায়ী ক্রিমিয়ায় এখন রুশশাসিত দুটি নতুন প্রশাসনিক ক্রিমিয়া এবং বন্দরনগর সেভাস্তোপোল অঞ্চলে গঠিত।

♦ বিশ্ব অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর

বিশ্বে প্রতিবছর ৭-৮ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বাণিজ্য হয়। অস্ত্র ব্যবহার করে সংঘটিত সহিংসতায় বিশ্বে প্রতি মিনিটে একজন মানুষের মৃত্যু হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে প্রচলিত অস্ত্র ও গোলাবারুদের নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্যের রাশ টেনে ধরতে জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলো একটি আন্তর্জাতিক অস্ত্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ ধারাবাহিকতায় বিশ্বে প্রচলিত অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ২ এপ্রিল ২০১২ ঐতিহাসিক চুক্তি অনুমোদন করে ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। চুক্তির পক্ষে ১৫৪ এবং বিপক্ষে পড়ে তিন (ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়া) ভোট। ভোটদানে বিরত থাকে ২৩ সদস্য।

৩ জুন ২০১৩ বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করার পর এ পর্যন্ত চুক্তিটির পক্ষে ১৩০টি দেশ স্বাক্ষর করে এবং ৬১টি দেশে তা অনুমোদিত হয়। চুক্তিটি কার্যকরের জন্য ৫০টি দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। ফলশ্রুতিতে চুক্তিটি (ATT) কার্যকর হয় ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪। অস্ত্র বাণিজ্যে শীর্ষ দেশ চীন, রাশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। তবে অস্ত্র নির্মাণে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে পাঁচটি দেশে (ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও স্পেন) এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এমনকি ইসরাইলও এ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, কিন্তু সিনেট তা অনুমোদন করেনি। বাংলাদেশ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও এখনও তা অনুমোদন করেনি।

♦ শার্লি হেবদো হত্যাকাণ্ড

ফ্রান্সের ব্যাঙ্গাত্মক সাপ্তাহিক সাময়িকী শার্লি হেবদো (Charlie Hebdo)। ৭ জানুয়ারি ২০১৫ ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত এ সাময়িকীর অফিসে ঘটে এক হামলার ঘটনা। এ হামলায় নিহত হন সাময়িকীটির প্রধান সম্পাদক স্টিফেন সার্বোনার, ৩ জন কার্টুনিস্ট ও ২ পুলিশসহ মোট ১২ জন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক কার্টুন প্রকাশ করায় এ হামলা এবং হামলার দায় স্বীকার করে আল কায়দার ইয়েমেনী শাখা। এটাকে ফ্রান্সের মাটিতে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা বলে উল্লেখ করা হয়। ঘটনার পর দিন ফরাসি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত হন পত্রিকা অফিসে হামলাকারী ভ্রাতৃদ্বয় সাইদ কোশি ও শরীফ কোশি। এর আগে ২০০৭ সালে মহানবী (স)-কে ব্যঙ্গ করে আঁকা ড্যানিশ পত্রিকার একটি কার্টুন পুনর্মুদ্রণ করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে শার্লি হেবদো। ২০১১ সালে মহানবী (স)-কে কটাক্ষ করে একটি লেখা ছাপা হয় পত্রিকাটিতে। ২০১২ সালে মহানবী (স)-এর অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে পত্রিকাটি। ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বিশ্বকে চরম ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত করে। পরবর্তীতে শার্লি হেবদো তার অফিসে হামলা-পরবর্তী সংখ্যায় আবারো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে। ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ প্রকাশিত সাময়িকীটির ১৭৮তম সংখ্যার প্রচ্ছদে এ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। বিতর্কিত সাময়িকীটির ১৭৮তম সংখ্যায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের পাশাপাশি বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদেরও কার্টুন ছাপে। ১৬তম পাতায় ছাপানো হয় এ কার্টুন।

অধ্যায় ০৪

প্রধান মতবাদসমূহ ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা
Major Ideologies & New World Order

Syllabus *Major Ideas and Ideologies : Nationalism, imperialism, colonialism, neo-colonialism, post-modernism, globalization and new world order.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *'বিশ্বায়ন' প্রত্যয়টির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]*

০২. *বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী? [৩০তম বিসিএস]*

অথবা, বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক দরিদ্র দেশসমূহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন। [২৪তম বিসিএস]

অথবা, বিশ্বায়ন সুযোগ (Opportunities) এবং আশঙ্কার (Threats) সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং অদক্ষদের জন্য আশঙ্কা।" –এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. ক. *জাতীয়তাবাদ কি?*

খ. *জাতীয়তাবাদের উপাদান, ক্রমধারা ও বিকাশ আলোচনা করুন।*

০৪. ক. *সাম্রাজ্যবাদ কি?*

খ. *সাম্রাজ্যবাদের কারণ/উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।*

গ. *সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আলোচনা করুন।*

০৫. *'পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর।'—লেনিনের এ উক্তির আলোকে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশল তুলে ধরুন।*

অথবা, সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের কারণ এবং বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন।

অথবা, বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

০৬. ক. *উপনিবেশবাদ কি?*

খ. *উপনিবেশ স্থাপনের কারণ ও সাম্প্রতিককালের উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

অথবা, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুক্তি এবং সাম্প্রতিককালের উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৭. ক. *নব্য উপনিবেশবাদ কি?*
খ. *নব্য উপনিবেশবাদের ধরন, লক্ষ্য ও শোষণের পদ্ধতি আলোচনা করুন।*
০৮. ক. *উত্তর আধুনিকতাবাদ কি?*
খ. *উত্তর আধুনিকতাবাদ (Post-modernism)-এর চরিত্র ও লক্ষণ আলোচনা করুন।*
০৯. *২০৫০ সাল নাগাদ কিরূপ একটি বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আপনি মনে করেন?*
১০. ক. *নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New International Economic Order) বলতে কি বুঝেন?*
খ. *নব্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপাদানগুলো কি কি?*
গ. *এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী সংগঠনগুলোর বর্ণনা দিন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *জাতীয়তাবাদ কি?*
০২. *সাম্রাজ্যবাদ কি?*
০৩. *ঔপনিবেশিকতা বলতে কি বোঝেন?*
০৪. *নব্য-উপনিবেশবাদ কি?*
০৫. *বিশ্বায়ন (Globalization) বলতে কি বোঝায়?*
০৬. *কোন কোন বিষয়ের উপর বিশ্বায়ন প্রভাব বিস্তার করে?*
০৭. *'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলতে কি বোঝায়?*

টীকা

। বিশ্বায়ন (Globalization) [৩২তম বিসিএস]
। নব্য-ঔপনিবেশিকতাবাদ [১১তম বিসিএস]
। এলডিসি বা স্বল্পোন্নত দেশ
। মার্শাল ম্যাকলুহন
। জাতীয় মুক্তি
। সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ
। বৈদেশিক সাহায্য
। জাতীয়তাবাদ
। সাম্রাজ্যবাদ
। ঔপনিবেশিকতা
। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
। আধিপত্যবাদ

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'বিশ্বায়ন' প্রত্যয়টির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়ন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। ইংরেজি 'Globe' থেকে Globalization শব্দটি এসেছে, যার অর্থ বিশ্বায়ন। এটা একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া গোটা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। জাতি-রাষ্ট্রের সীমানাকে তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে (Global village) পরিণত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, "Globalization is a process of development of the world into a single interested economic unit"। বিশ্বায়ন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুষঙ্গে সৃষ্টি হলেও অনিবার্যভাবে তার প্রতিভাস এসে পড়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রায়। বিশ্বায়ন নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন। বিশ্বায়ন দেশে দেশে, মানুষে মানুষে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে এ পৃথিবী হয়ে

উঠেছে মানুষের নিজের দেশ। মানুষে মানুষে ভাষা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে, সহযোগিতা ও পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে, অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্ব সভ্যতার উন্নতি যেমন একদিকে ত্বরান্বিত হচ্ছে তেমনি অবনতিও ঘটছে ক্ষেত্রবিশেষে। মানুষ ক্রমে ক্রমে যেমন পরিণত হচ্ছে বিশ্ব নাগরিকে, তেমনি আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব সন্ত্রাসবাদে রূপ নিয়েছে, বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে, মানুষে মানুষে সন্দেহ-অবিশ্বাস হ্রাস করেছে, আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা সুস্পষ্ট করেছে, পুঁজিপ্রবাহ বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে, বিশ্বায়ন বিশ্বময় পাশ্চাত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর। তারপরও বলা যায়, বিশ্বায়নের রয়েছে হাজারো সম্ভাবনা, সুকঠিন চ্যালেঞ্জ ও অজানা শঙ্কা। নিচে বিশ্বায়নের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

বিশ্বায়ন ও আর্থ-সামাজিক মাত্রা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান ঢেউ ধনী ও গরিব দেশের মানুষের জীবনে সমানভাবে প্রভাব ফেলেছে। কোথাও এ প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক আবার কোথাও তা নেতিবাচক। একই প্রজন্মের ক্ষেত্রে স্থানবিশেষে কোথাও এটি নিয়ে এসেছে সমৃদ্ধি আবার কোথাও অর্থনৈতিক ধস। যেমন– মালয়েশিয়া, চীন কিংবা ভারতের ব্যাঙ্গালোরের আইটি সেক্টরে এটি নিয়ে এসেছে বিপুল সমৃদ্ধি। বিপরীতদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়টের মতো গাড়ি নির্মাণ শিল্পকেন্দ্রগুলোতে যে ধস নেমে এসেছে তার জন্যও দায়ী এ বিশ্বায়ন। অনেক অর্থনীতিবিদ বিশ্বাস করেন বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশ্বায়ন নিজের যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে তা নিম্নরূপ :

– পশ্চিমা অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য নিম্ন মজুরি। আর কোম্পানিগুলোর জন্য উচ্চ মুনাফা।

– দরিদ্র দেশগুলোর শহর এলাকায় বিপুল জনস্রোত।

– জোরদার প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের নিম্নহার। গত ৫০ বছরে ধারণাতীত বিত্ত বৈভব এসেছে। আর এর পেছনে প্রধান ভূমিকা ছিল বিশ্বায়নের। সম্পদ ও সমৃদ্ধির এ বিশাল স্তূপ এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ছেড়ে পূর্বের দরিদ্র দেশগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে। চীন, মালয়েশিয়া, ভারত ও থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোর এককালের হতদরিদ্র অর্থনীতি বিশ্বায়নের সুবাদেই আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

নিচে বিশ্বায়নের আর্থ-সামাজিক ভূমিকা উপস্থাপন করা হলো—

১. **ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়নের মূল চালিকাশক্তিই হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। শিল্পপণ্যের বাণিজ্য গত ৫০ বছরে ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে যেখানে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯৫ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০,০০০ বিলিয়ন ডলারে (বিশ্ব বাণিজ্য রিপোর্ট ২০১২ অনুসারে)। ব্যবসা-বাণিজ্য খাত অর্থনীতির অন্যান্য খাত থেকে দ্রুততম সময়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিভিন্ন শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণের চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলো সহজ করে দিয়েছে। বিশেষ করে ধনী দেশগুলোয় শিল্প পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও চীন এ দেশগুলোর অন্যতম। দেশগুলো তাদের জনগণের জীবনযাত্রার মানে নাটকীয় উন্নতি ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিপুল শিল্প পণ্য রপ্তানি করে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন তাদের পুঁজি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিনিয়োগ শুরু করেছে। শ্রম ব্যয় কমানোর লক্ষ্যেই পুঁজির এ ভিন্ন গন্তব্যে যাত্রা। একই সাথে পণ্যবাজারের কাছাকাছি শিল্পকারখানা স্থাপনও এর অন্যতম কারণ। বিশ্ব বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র কয়েকটি কোম্পানির কব্জায় রয়েছে।

২. **বিশ্বায়ন ও পুঁজি প্রবাহ :** উন্নত অর্থনীতিগুলো এতদিন যাবৎ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের অবধারিত গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতেও এ প্রবাহ ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু বিশ্বায়নের এ সময়ে সে স্রোতধারা যেন পুরোপুরি উল্টে গেছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও কেউ ভাবতে পারেনি যে সাবেক ব্রিটিশ স্টিল কোম্পানি দক্ষিণ এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার মতো এলাকায় বিনিয়োগের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে, বিশ্বায়নে উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অনুন্নত দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রচুর মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে। তারপর সামান্য মুদ্রাস্ফীতি হলেই ঝড়ের বেগে ছুটে পালাচ্ছে। ফলে অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশগুলো কয়েক ঘণ্টায় বা দিনে মারাত্মকভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

৩. **পণ্যের জন্য লড়াই ও বিশ্বায়ন :** বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষ করে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ২০০০ খ্রি. থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বের মোট জ্বালানি চাহিদার ৮৫ ভাগ দখল করে আছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের কারণেই ঘটছে এটা। এর ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারকে অতিক্রম করেছে। বিশ্বব্যাপী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ্বের বহু দেশে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। খাদ্যাভাবের কারণে কোনো কোনো দেশের সরকারের পতন ঘটে এবং রাস্তায় ব্যাপক আন্দোলন হয়।

৪. **অর্থনৈতিক গতিপথের নতুন মানচিত্র ও বিশ্বায়ন :** যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপ বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব হারিয়েছে। এমনকি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং নতুন নতুন ভোগ্য পণ্যসামগ্রী তৈরি ও চমকপ্রদ সেবাসমূহ আবিষ্কারের বিষয়টিও আজ তাদের একক কর্তৃত্বে নেই। উদীয়মান বাজারগুলো এখন দ্রুত প্রসার লাভ করছে। আর এগুলো জোরদার হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে, উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর শিল্পকারখানায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল গ্রহণের ত্বরিত গতির কারণে।

৫. **বিশ্বায়ন ও মেধা আকর্ষণ :** প্রতিভা বা মেধা ও দক্ষ শ্রমশক্তি বৈশ্বিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। আর এ সম্পদের দখল নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে বহু প্রতিযোগী। পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতি বয়োবৃদ্ধ কর্মী এবং শ্রম স্বল্পতায় ভুগছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের শ্রম শক্তির ভারসাম্যও তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। ফলে অনুন্নত বিশ্ব মেধাপাচার সমস্যায় ভুগছে।

৬. **পরিবেশ ব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়নের ফলে প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে মানুষের চোখের বন্ধ দরজা খুলে গেছে। মানুষ একচেটিয়া কারবার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তার পছন্দমতো পণ্য ক্রয়ে সক্ষম হচ্ছে। পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনও বেড়েছে বহুগুণে। ফলে উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জ্বালানি তেল, গ্যাস ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশও দিন দিন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, দাবানল বিশ্বে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ফলে প্রতিবছর ঘটছে অসংখ্য প্রাণহানি।

৭. **বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বিশ্বায়ন :** বাজারে কতটুকু বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও দক্ষতা আনতে পারছে তা-ই নির্ধারণ করছে বিশ্বায়নের শ্রেষ্ঠত্ব। বাজারভিত্তিক মূল্যনির্ধারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের পানি এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির একটি কূটকৌশল। একটি দেশ যখন চরম অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খায় ঠিক তখনই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সুযোগ নেয়। তার শেষ রক্তটুকু শুষে নেয়ার

প্রক্রিয়া চলতেই থাকে– যতক্ষণ না আগুন জ্বলে ওঠে। যেমন– বলিভিয়ার পানি, ইকুয়েডরের গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে আইএমএফ দরিদ্র মানুষদের দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাতে উসকে দেয়। এ ধরনের গণবিক্ষোভ ঠেকাতে সরকারকেও আরো রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়। দেশ থেকে আরো পুঁজি উধাও হয়। সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এতে বিদেশি কর্পোরেশনগুলোর পোয়াবারো হয়। তাছাড়া এ সুযোগে সংশ্লিষ্ট দেশের অবশিষ্ট সম্পদও মুড়ি-মুড়কির দামে হাতিয়ে নেয়।

বিশ্বায়ন ও রাজনৈতিক মাত্রা

১. **বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিকতাবাদ :** সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার পরই পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতাবাদ চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠলেও স্নায়ুযুদ্ধের রূঢ় বাস্তবতা দেশে দেশে, মানুষে মানুষে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিভেদ বাড়িয়ে দেয়। বাড়িয়ে দেয় উত্তেজনা। গানবোট ডিপ্লোমেসি, স্টার ওয়ার পৃথিবীর জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে থাকে। বিশ্বশান্তি এসে দাঁড়ায় হুমকির মুখে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর মানুষে মানুষে, দেশে দেশে সন্দেহ অবিশ্বাস কমে এসেছে। গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চালু হয়েছে অভিন্ন মুদ্রা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে উঠেছে আসিয়ান (ASEAN), আফ্রিকায় আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)। বৃদ্ধি পেয়েছে সহযোগিতা ও লেনদেন। বিলুপ্ত হয়েছে একলা চলার দিন। ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগানিস্তানে মার্কিন নগ্ন আক্রমণের বিরোধিতা করে বিশ্ব ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ করে, বিশ্ববাসী নিন্দা জানায়, কোথাও সন্ত্রাসী হামলা হলে তীব্র নিন্দা জানায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বিশ্ব দুর্যোগকবলিত রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

২. **সামরিক দিক ও বিশ্বায়ন :** সংঘাত ও ব্যবসা মিলে গেছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাচ্ছে বেসরকারি খাতে। আন্তর্জাতিক বেসামরিক-সামরিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। কোনো কোনো দেশে ভাড়াটে সৈন্যরা খনি ও জ্বালানির ব্যবস্থাপনা রক্ষায় ভাড়া খাটছে। অস্ত্র বিক্রি ও তৈরির হিড়িক লেগেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিবছর সাত হাজার কোটি টাকার অস্ত্র বাণিজ্য হয়। বিশ্বে যে পরিমাণ অস্ত্র মজুদ আছে তা দিয়ে এমন ১৫টি পৃথিবী ধ্বংস করা যাবে। জাতীয় বাজেটের একটা বৃহৎ অংশ সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে গণচীন। অস্ত্র ক্রয়ে ব্যয় হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, যাতে বর্তমানে শীর্ষ দেশ ভারত। অস্ত্র বিক্রিতে শীর্ষ অবস্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাদার অব অল বোম্ব (Mother of All Bombs)-এর বিপরীতে রাশিয়া তৈরি করেছে ফাদার অব অল বোম্ব (Father of All Bombs–FOABs)-এ যেন অস্ত্রের প্রতিযোগিতা।

৩. **একমেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন :** স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্ব পরিণত হয়েছে একমেরুভিত্তিক বিশ্বে। এ মেরুর ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে একমেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শক্তির ভারসাম্য ভেঙে একক শক্তির উত্থান ঘটেছে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে। মার্কিন নেতৃত্ব বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে মত্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালেবান দমনের নামে ২০০১ সালে আফগানিস্তান, ২০০৩ সালে ইরাক দখল করে হাজারো মানুষকে হত্যা করেছে। ন্যায়বিচার ও সন্ত্রাস রোধ প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

৪. **বহুজাতিক কোম্পানির দৌরাত্ম্য ও বিশ্বায়ন :** উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে ধীরে ধীরে ঐ সকল দেশের অর্থনীতিকে গ্রাস করে নিয়েছে। ঐ সকল দেশের রাজনীতিকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত করছে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ভয়-ভীতি ও হুমকি দিচ্ছে। নিজেদের মতো না চললে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেবে, একঘরে করে রাখবে বলছে। এসবই হয়েছে বিশ্বায়নের প্রভাবে।

৫. **অপরাধ ও বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়ন অপরাধের বহু সুযোগ খুলে দিয়েছে। আজ দুনিয়ায় মাদকসেবীর সংখ্যা ২০ কোটি। মাদক ব্যবসা পরিণত হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্যে। গরিব, অনুন্নত দেশ থেকে নারী পাচার এখন জমজমাট শিল্পের রূপ নিয়েছে। প্রতিবছর পূর্ব ইউরোপের ৫ লাখ নারী পশ্চিম ইউরোপে নিয়ে দেহ ব্যবসায় নিয়োগ করা হয়। তৈরি হয়েছে অপরাধী চক্রের এক গ্লোবাল নেটওয়ার্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার দামি গাড়ি হাইজ্যাক করে তা মস্কোয় নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। ইউক্রেনের কোনো মেয়েকে সারা জীবনের জন্য পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। আফগানিস্তানের সীমান্তে অস্ত্র ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক মাত্রা

সমাজ ও সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, কারণ সংস্কৃতি হলো মানুষের অস্তিত্বের দ্যোতক। সংস্কৃতি হলো সভ্যতাতরুর পুষ্প। ফল দিয়ে যেমন গাছ চেনা যায় তেমনি সংস্কৃতির রূপরেখা দিয়ে সমাজ সভ্যতা চেনা যায়। বিশ্বায়ন সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যা নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

ক. **কৃষি, চিকিৎসা ও বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়ন কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। আগে মানুষ কৃষি জমি চাষে লাঙ্গল-জোয়াল-মই ব্যবহার করতো। কিন্তু এখন বিশ্বায়নের এ যুগে সে স্থান ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার। পানি সেচ যন্ত্র হিসেবে দোন বা সেঁওতি ব্যবহার না হয়ে স্যালো মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও জমি দিন দিন উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলছে। রাসায়নিক সারের প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির মাছ। বিশ্বায়ন ঝাঁকি জাল, কই জাল, ফাঁস জাল, বাঁশ জালের স্থানে পরিবর্তন এনে মৎস্য শিকারে কারেন্ট জাল বা হুইলের ব্যবহার এনে দিয়েছে। আগের মানুষ অশিক্ষিত ছিল বিধায় পীর-ফকিরের ঝাঁড়-ফুঁক, পানি পড়া, তাবিজ-কবজ, মানত-দান দক্ষিণায় বিশ্বাস করে আপদ-বিপদ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতো। কিন্তু এখন শিক্ষিত হওয়ার কারণে ডাক্তারের কাছে যায়। আগের দিনে কলেরা-বসন্তে গ্রামময় উজাড় হয়ে যেত। এখন কলেরা-বসন্ত মামুলি রোগে পরিণত হয়েছে। তবে এখন নতুন নতুন রোগ এইডস, বার্ডফ্লু ইত্যাদি দেখা দিয়েছে।

খ. **পরিবার ব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন :** আগে পরিবার ছিল যৌথ। এখন দিন দিন একক পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। আগে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালোবাসা গভীর থাকলেও এখন এ বন্ধন শিথিল হয়েছে। সামান্য কারণেই ভুল বোঝাবুঝিতে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আগে একটি পরিবারে একাধিক সন্তান জন্মাতো। এখন একটি পরিবার অনধিক দুটি সন্তান জন্ম দিয়ে জনসংখ্যা হ্রাসে সচেষ্ট রয়েছে। অতীতে মানুষ ঘরে আসবাবপত্র হিসেবে একটি চকি, দুটি চেয়ার বা বেঞ্চ রাখতো। এখন বক্সখাট, ওয়ার্ড্রপ, ড্রেসিং টেবিল, টিভি, রেডিও, স্টিলের আলমারি আরো কত কী? এভাবে বিশ্বায়ন দিন দিন মানুষের চাহিদার পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

গ. **ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিশ্বায়ন :** ভাষাই একমাত্র মাধ্যম যা মানুষের কথা একে অপরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে সহায়তা করে। কিন্তু দিন দিন আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে এক ভাষা অন্য ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মানুষ নিজেকে স্মার্ট করার জন্য ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফরাসি ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে জগাখিচুড়ি ভাষার উদ্ভব ঘটাচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বে প্রতিসপ্তাহে দুটি এবং প্রতিবছরে শতাধিক ভাষা অপমৃত্যুর কবলে পড়ছে। ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিশ্বের ৩৫০ কোটি লোকের ভাষা হবে ইংরেজি, ২০০ কোটি লোকের ভাষা হবে মান্দারিন, ১০০ কোটি লোকের ভাষা হবে হিন্দি।

বিশ্বায়ন পোশাক-পরিচ্ছদে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এখন নারীরা সেলোয়ার কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ছেড়ে জিনস্, টি-শার্টের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পুরুষের লুঙ্গি, পাজামা-পাঞ্জাবি জিনস, গ্যাবাডিন, কোর্ট, টাই দখল করেছে।

ঘ. **সামাজিক নীতি, মূল্যবোধ এবং বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়নের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ তাদের নিজ নিজ সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধকে হারিয়ে ক্রমেই পশ্চিমা ধ্যানধারণানির্ভর সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজে যৌনতা, হিংস্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজি নতুন বর্ষ পালনে কিংবা ১৪ ফেব্রুয়ারি পালনে হিড়িক লেগেছে। প্রেম ভালোবাসা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার থেকে দেহসর্বস্বে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের দিন দিন অবনতি ঘটছে। গুরুজন ভক্তি নতুন প্রজন্মের কাছে বিকৃত রূপ ধারণ করেছে।

ঙ. **শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিশ্বায়ন :** বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষা রূপান্তরিত হচ্ছে পণ্যে। হারাচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। মেধাস্বত্ব ও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পত্তির পেটেন্ট বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কিনে নিচ্ছে। যার ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনক্ষম হচ্ছে না। পাশ্চাত্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভীড় বেড়ে গেছে। বিশ্বায়ন খেলাধুলার ক্ষেত্রে এক অভূত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, দাবা, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেবিল টেনিস, লন টেনিস এখন বিশ্বের সর্বত্র চলছে। জার্মানির গুটেনবার্গে টাইপরাইটার আবিষ্কার যেমন রেনেসাঁ ঘটিয়েছে তেমনি বিশ্বায়ন খেলাধুলায় বিশ্বে রেনেসাঁ ঘটিয়েছে।

বিশ্বায়নের মূলমন্ত্রই হলো Convergence বা বৈচিত্র্যকে লুপ্ত করে একটি মাত্র ছাঁচে বিশ্বকে ঢেলে সাজানো। তাই বিশ্বের পাঁচতারা হোটেলগুলো, বড় বড় নগরী, ধনীক শ্রেণীর পোশাক, খাদ্য, রাজনীতি এমনকি মানসিক সম্পর্কেও যেন কোনো ভেদাভেদ নেই। অপরদিকে বিশ্বায়ন শিক্ষা, চিকিৎসা, উৎপাদন, চিন্তা-চেতনা, বিশ্ব পরিচিতির পথকে বেগবান করছে। তাই বিশ্বায়নকে বহুপাক্ষিক বলা যায়। তবে বর্তমান বিশ্বে স্রোতের ন্যায় ধাবমান বিশ্বায়নে উন্নত রাষ্ট্রই সুবিধাভোগী সবচেয়ে বেশি। বিশ্বায়ন যে মিথ নিয়ে উদ্ভব হয়েছিল সে মিথ ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করছে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। ফলে বিশ্বায়নে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। কাজেই এরূপ বিশ্বায়ন অনভিপ্রেত।

০২। বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী? *[৩০তম বিসিএস]*

অথবা, **বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক দরিদ্র দেশসমূহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন।** *[২৪তম বিসিএস]*

অথবা, **বিশ্বায়ন সুযোগ (Opportunities) এবং আশঙ্কার (Threats) সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং অদক্ষদের জন্য আশঙ্কা।"—এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন।** *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ্বায়ন এখন সবার মুখে মুখে। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সবার মুখেই শব্দটি শোনা যাচ্ছে অহরহ। বর্তমান বিশ্বে বহুল উচ্চারিত বিশ্বায়ন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া (Process)। বিভিন্ন দেশের national যে boundary-গুলো রয়েছে সেগুলো তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে (Global village) পরিণত করা যায়। আর তাই Internationalization, Multinationalization Liberalization, Dissemination ইত্যাদি শব্দগুলোকে এর কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা যায়।

বিস্ময়কর জটিল এই একুশ শতকের বাস্তবতার যুগে কোনো ধারণার সহজ সরল সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। কারণ এ যুগকে বলা হয় উত্তর-আধুনিককাল। যেখানে কোনোকিছুই সহজভাবে নির্ণয় বা সংজ্ঞায়িত করার উপায় নেই, বরং এর সবকিছুই সংজ্ঞাহীন কিংবা বহুমাত্রিক ও বহু আর্থিক সংজ্ঞাময়, যা আসলে পরস্পর বিরোধী। ঠিক তেমনি বিশ্বায়ন সম্পর্কে নানাজনে নানা ধরনের ধারণা জ্ঞাপন করে থাকেন। এখানে কয়েকটি ধারণা উপস্থাপন করা হলো—

ক. বিশ্বায়ন হলো অনেকের জন্য অনেক কিছু করা;
খ. বিশ্বায়ন হলো অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ;
গ. বিশ্বায়ন হলো সীমানাবিহীন (Borderless) বিশ্ব;
ঘ. বিশ্বায়ন হলো বিশ্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একত্রীকরণ;
ঙ. সামাজিক দায়বদ্ধতার চেয়ে নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া;
চ. বিশ্বায়ন ব্যবস্থা উদারীকরণের সমার্থক;
ছ. বিশ্বায়ন হলো সীমানামুক্তকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণ;
জ. বিশ্বায়ন ধারণার পেছনে রয়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতি।

উপরিউক্ত সংজ্ঞায়ন থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিশ্বায়নের কোনো স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা নেই। একে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাই সংক্ষেপে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা প্রদান অত্যন্ত দুরূহ।

বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য

ইংরেজি 'Globalization' বা 'বিশ্বায়ন' শব্দটি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন। এটি একটি ধারণা (concept)। মজার ব্যাপার হলো ধারণাটি নতুন নয়। এর অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল, তবে ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন গতিতে। একই কাজ যেমন অবস্থাভেদে আহার করা, খাওয়া ও গেলা হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বায়নও একেক সময় একেক রূপ ধারণ করে।

অতীতের কলম্বাস, ভাস্কো-দা-গামা, লিভিংস্টোন, এডওয়ার্ড কুক-এর দুঃসাহসী সমুদ্র বিজয়ী অভিযাত্রীর ভৌগোলিক আবিষ্কার অথবা বিভিন্ন দেশের বণিকদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা অথবা হিউয়েন সাং, ফা-হিয়েন, আল বেরুনী, ইবনে বতুতা, মার্কো পোলোর মতো পরিব্রাজকদের বিশ্ব সফরকে বিশ্বায়নের প্রাথমিক পর্যায় বা সূচনা বলা যায়।

আধুনিক বা আজকের বিশ্বায়ন বিভিন্ন কারণে স্বতন্ত্র। উরুগুয়ে রাউন্ড, গ্যাট, ডব্লিউটিও ইত্যাদি নামে আসলে সমগ্র বিশ্বকে একটি বাজারে পরিণত করার চেষ্টা চলে আসছে অনেক দিন থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর খুড়িয়ে চলা পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও দুই পরাশক্তির আদর্শিক দ্বন্দ্ব স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম দেয়। তবে বর্তমানে যে 'বিশ্বায়ন'-এর কথা মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে এর সূচনা হয় সংস্কারবাদী সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ-এর 'পেরেস্ত্রৈকা' (Perestroika) এবং 'গ্লাসনস্ত' (Glasnost) নীতি থেকে যেখানে গর্বাচেভ চেয়েছিলেন বিশ্ব ব্যবস্থার পুনঃসংস্করণ, উদারনীতি, নতুনভাবে বিশ্বচিন্তা, সকলের জন্য শান্তি, বৃহৎশক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি। এক্ষেত্রে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের হেলসিংকি (ফিনল্যান্ড) অধিবেশনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশ এ 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির বহুল প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করেন। বিশ্বায়ন এখন এগিয়ে চলছে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে।

বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো–

১. বিশ্বায়ন বিশ্বকে একমেরুকেন্দ্রিকতা থেকে বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে পরিণত করেছে।
২. বিশ্বায়ন বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে শত্রুতা হ্রাস করেছে; অপরিচিতি, ব্যবধান কমে আসছে।
৩. বিশ্বায়ন মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে ভাষাগত, আচার-আচরণগত ব্যবধান কমিয়ে দিচ্ছে। সারা পৃথিবী যেন হয়ে উঠেছে মানুষের নিজের দেশ। মানুষ ক্রমেই যেন হয়ে উঠেছে বিশ্ব নাগরিক।
৪. বিশ্বায়ন মানুষে-মানুষে ভাষা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়ে বিশ্ব সভ্যতার উন্নতিও ত্বরান্বিত করছে।
৫. বিশ্বায়ন একলা চলার নীতি রোধ করে 'দশে মিলি করি কাজ' নীতির প্রসার ঘটিয়েছে।
৬. বিশ্বায়ন নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রসার ঘটিয়েছে নতুন নীতি ও নতুন ভঙ্গিতে।
৭. বিশ্বায়ন দরিদ্র দেশের লোক-সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।
৮. বিশ্বায়ন উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।
৯. বিশ্বায়ন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসার করার পাশাপাশি শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে।
১০. বিশ্বায়ন যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।
১১. বিশ্বায়ন পূর্বের এককেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।
১২. বিশ্বায়ন পণ্য ও সেবার মান উন্নত করে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে।
১৩. বিশ্বায়ন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রসার ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বিশ্বময় প্রসারিত করতে পারছে।
১৪. বিশ্বায়ন সন্ত্রাস ও অপরাধ জগৎকে প্রসারিত করে দিয়েছে।
১৫. বিশ্বায়ন পরিবেশগত সমস্যা দিন-দিন বৃদ্ধি করে চলেছে। ফলে পরিবেশ দিন দিন মানুষের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বিশ্বকে মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে।
১৬. বিশ্বায়ন তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ প্রসারিত করার পাশাপাশি যৌনতা-হিংস্রতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।
১৭. বিশ্বায়ন বহুজাতিক কোম্পানির দৌরাত্ম্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে।
১৮. বিশ্বায়ন মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে সন্দেহ ও অবিশ্বাস হ্রাস করে দিয়েছে।
১৯. বিশ্বায়ন আঞ্চলিকতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রসার ঘটিয়েছে। গড়ে তুলেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন (EU, AU, ASEAN), যা সহযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থার নিদর্শন।
২০. বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে প্রসারিত করছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে মানুষের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, জীবনযাপন, পরিবার ব্যবস্থা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও দরিদ্র দেশসমূহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া উন্নত-অনুন্নত রাষ্ট্রের মানুষের জীবনে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে। কোথাও এ প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক আবার কোথাও তা নেতিবাচক। একই প্রজন্মের ক্ষেত্রে স্থানবিশেষে

কোথাও নিয়ে এসেছে সমৃদ্ধি আবার কোথাও নেমেছে অর্থনৈতিক ধস। তবে বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি দরিদ্র দেশসমূহে। নিচে ধারাবাহিকভাবে দরিদ্র দেশসমূহে বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করা হলো–

১. **ধনী-দরিদ্র বৈষম্য ও মানব বঞ্চনা :** বিশ্বের ধনী ১ ভাগ মানুষ ৫৭ ভাগ দরিদ্র মানুষের সমান আয় করে। আমেরিকার ধনী ১০ ভাগ জনগণের আয় বিশ্বের ৪৩ ভাগ দরিদ্র জনগণের সমান। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের দরিদ্রের শতকরা হার ছিল ১৩.১ ভাগ যা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৭.১ ভাগে। বিশ্বে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২৬০ কোটি। পানীয় জল সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ১৮০ কোটি, পুষ্টি সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ৮৪ কোটি। বিশ্বের ১৫০ কোটি মানুষ ৬০ বছর বয়স হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে।

২. **শিক্ষাব্যবস্থা :** বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব মারাত্মক। শিক্ষাব্যবস্থা বিগত দেড়শ বছরেও এমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বায়নের ফলে হারাচ্ছে তার মর্যাদা, স্বকীয়তা। উচ্চ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা রূপান্তরিত হচ্ছে পণ্যে। হারাচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। মেধাস্বত্ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির পেটেন্ট বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কিনে নিচ্ছে। যার ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনক্ষম হচ্ছে না। পাশ্চাত্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভীড় বেড়ে গেছে।

৩. **ভাষার গোলক ধাঁধা :** বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের প্রায় ৭ হাজার ভাষার মধ্যে প্রতি সপ্তাহে দুটি এবং প্রতিবছর শতাধিক ভাষা অপমৃত্যুর কবলে পড়ছে। এ মৃত সারিতে নাম লিখিয়েছে ম্যাসাচুসেটের ক্যাটওয়া, আলাস্কার ওয়াক, লাটভিয়ার লিভোনিয়ান। বিশ্বের ৬০ থেকে ৯০ ভাগ ভাষা অদূর ভবিষ্যতে এমনি পরিণতি লাভ করবে। ২০৫০ খ্রিস্টাব্দে ৩৫০ কোটি লোকের ভাষা হবে ইংরেজি। বিশ্বের প্রতিটি দরিদ্র দেশে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা স্থান করে নিচ্ছে। মানুষ নিজেকে স্মার্ট করে নেয়ার জন্য মাতৃভাষার মধ্যে ইংরেজি, জাপানি, ফার্সি, আরবি ভাষার মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। এভাবে আপ-টু-ডেট হওয়ার প্রবণতা দরিদ্র দেশের সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন :** বিশ্বায়নের নামে মানুষকে যেভাবে স্যাটেলাইট চ্যানেল পশ্চিমা সংস্কৃতি সরবরাহ করছে, তাকে নিঃসন্দেহে 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন' বলে বর্ণনা করা যায়। সাংস্কৃতিক এ আগ্রাসনকে অনেকে 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বায়ন একটি দেশের মূল্যবোধ, সমাজবীক্ষণ ও জীবনযাপনের ধ্যান ধারণাকে সুকৌশলে অনুন্নত দরিদ্র দেশের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আর এটাই ঘটছে বিশ্বজুড়ে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমাজ জীবন ক্রমাগত এ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এসে পড়ছে। এসব দেশের মানুষের আচার-আচরণে, ভাবনা-চিন্তায় যা কিছু দেশজ তাকে সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুষঙ্গ।

৫. **সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন :** দিন দিন বিশ্বায়নের প্রভাবে দরিদ্র দেশের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। যৌনতা, হিংস্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় বা আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব সন্ত্রাসবাদে রূপ নিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন দুর্ধর্ষ গেরিলা সংস্থা। দেহব্যবসা বিশ্ব বাণিজ্যের অংশে পরিণত হয়েছে। প্রবীণদের সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। একান্নবর্তী পরিবারগুলো দ্রুত ভেঙে পড়ছে। মানুষ হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক। যত দিন যাচ্ছে এ সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, মূল্যবোধে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ প্রতিভাত হচ্ছে। বিনোদনের মাধ্যম সঙ্গীত ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য রক অ্যান্ড রোল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দিন দিন হিপ্পিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

৬. **যোগাযোগ ব্যবস্থা :** বিশ্বায়নের অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন। অতীতের হাতি বা ঘোড়া বা গরুর গাড়ি, নৌকা, পালকি বর্তমানে সাইকেল, মোটর সাইকেল, ট্রেন, যন্ত্রচালিত নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, বিমান, মাইক্রোবাস, বাস দখল করে নিয়েছে। জীবনকে যোগাযোগ ব্যবস্থা গতিশীল করে তুলেছে। সময়কে অনেক বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং যাতায়াতকে করেছে আরামপ্রদ।

৭. **পুঁজি প্রবাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য :** বিশ্বায়নে পুঁজি অবাধে আসবে, অবাধে যাবে। কিন্তু বাস্তবে উন্নয়নশীল দেশে এ পদক্ষেপ গ্রহণের পর পুঁজি কেবল বাইরের দিকে যেতেই থাকে। এ ব্যবস্থায় পুঁজি একটি দেশে প্রবেশ করে শেয়ার বাজার ও রিয়েল স্টেট ব্যবসায় ফটকাবাজির জন্য। তারপর বহুগুণে স্ফীত হয়ে সামান্য ঝড়ের আভাসেই ছুটে পালায়। বিশ্বায়নের মূল চালিকাশক্তি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। শিল্পপণ্যের বাণিজ্য গত ৫০ বছরে ১শ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে যেখানে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯৫ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬,৬৬৫ বিলিয়ন (বিশ্ব বাণিজ্য রিপোর্ট ২০১৪) ডলারে। ব্যবসা-বাণিজ্য খাত অর্থনীতির অন্যান্য খাত থেকে দ্রুততম সময়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের সম্ভাবনাময় স্থানে পুঁজি বিনিয়োগ করে এ বিনিয়োগকৃত দেশকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ছে নির্ভরশীল দরিদ্র দেশগুলো। বহুজাতিক কোম্পানির প্রেসক্রিপশনে দরিদ্র দেশগুলোকে সকল নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

৮. **পরিবেশ ব্যবস্থা :** বিশ্বায়ন পরিবেশের ওপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। নতুন ভোগ্য পণ্যের চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ মাত্রা শিল্পায়িত এ যুগে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পরিবেশে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ওজোন স্তরে ফাটল বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য দায়ী উন্নত বিশ্ব। কিন্তু এ দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে দরিদ্র বিশ্বের ঘাড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলো। আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তনে বিশ্বে দিন-দিন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, দাবানল, ভূমিকম্প বেড়েই চলেছে।

৯. **কৃষি ও চিকিৎসাব্যবস্থা :** বিশ্বায়ন কৃষিক্ষেত্রে দরিদ্র বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। পূর্বে মানুষ কৃষিকাজে লাঙ্গল, জোয়াল, মই ব্যবহার করতো। এখন সেখানে ট্রাক্টর ব্যবহার করছে। কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে। কৃষি আবাদে সেচ যন্ত্র হিসেবে দোন বা সেঁওতি ব্যবহারের পরিবর্তে স্যালো মেশিন ব্যবহার করছে। আগে শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষ পীর-ফকিরের ঝাড়-ফুঁক, পানি-পড়া, তাবিজ-কবজ, মানত, দান-দক্ষিণায় বিশ্বাস করে আপদ-বিপদ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করত। কিন্তু বর্তমানে মানুষ শিক্ষিত হওয়ার ফলে, আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে। এককালের কলেরা-বসন্ত মহামারী থাকলেও আজ তা প্রায় বিলুপ্তির পথে, উন্নত ঔষধ আবিষ্কার হওয়ার ফলে। আগের দিনে লোকে পীর-ফকিরের দ্বারস্থ হতো, তারা তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে গ্রাম বন্ধন, দেহ বন্ধন, ঘর বন্ধন করে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করত। এ অবস্থা এখন বিদূরিত প্রায়। এখানেই মানুষের চেতনা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। পুরানো বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আস্থা জন্মেছে। পরিবারের জনসংখ্যা হ্রাসে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে জন্ম শাসনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

বিশ্বায়ন যে পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছিল তাতে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি– যদি এ বিশ্বায়ন পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন না হতো। বর্তমান বিশ্বায়নে সম্পদশালীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। আর দরিদ্র দেশগুলো দিন দিন দরিদ্র হয়ে পড়ছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের এ প্রক্রিয়াকে থামিয়ে রাখা বা বাধাদান করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়নকে যতই আমরা অপদস্থ করিনা কেন এ বৃহত্তম প্রক্রিয়া থেকে দরিদ্র দেশগুলোর বের হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এখন যা উচিত তা হলো দরিদ্র দেশসমূহকে ভেবে-চিন্তে সুবিধা-অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে যাতে তারা এ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হতে পারে। পাশাপাশি উন্নত ধনী পুঁজিবাদী দেশসমূহকে শোষণের মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বায়ন বিশ্বকে মারাত্মক বিপদে ফেলবে। বিশ্বকে করে তুলবে বসবাসের অযোগ্য। এ বিরূপ পরিবেশ থেকে কারো রেহাই থাকবে না।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩। ক. জাতীয়তাবাদ কি?

খ. জাতীয়তাবাদের উপাদান, ক্রমধারা ও বিকাশ আলোচনা করুন।

উত্তর : জাতীয়তাবাদ মূলত ইউরোপীয় ধারণা। মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের জন্ম কবে এ অনুসন্ধানী প্রশ্ন মাথায় রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, আধুনিক বিশ্বের রাজনীতিকে 'জাতীয়তাবাদ' গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। জাতীয় স্বার্থের পক্ষে পরাধীন দেশগুলোতে মানুষের লড়াই ও জীবন বিসর্জন এবং বিশ শতকে বড় বড় দুটি বিশ্বযুদ্ধও হয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে। ব্যাপক মাত্রায় জাতীয়তাবাদী চেতনা পৃথিবীব্যাপী বিস্তারের ফলে '৬০ ও '৭০-এর দশক পর্যন্ত পৃথিবীর মানচিত্রে পরাধীন প্রায় শতাধিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মন্ত্র জাতীয়তাবাদকে কেউ কেউ রাষ্ট্রধর্ম বলেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ এক ব্যাপক স্থান দখল করে রেখেছে।

জাতীয়তাবাদ

প্রত্যেক জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার থাকা উচিত–এ স্লোগানকে ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর সার্বভৌম ক্ষমতার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। কেউ কেউ মনে করেন (যেমন– H. L. Featherstone) যে, জাতীয়তাবাদের সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। তবুও জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেই 'ঐক্যবোধ' বা Hans Kohn-এর ভাষায় 'A State of Mind'-এর ওপরই জোর দেন।

জাতীয়তাবাদ নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যার সুবিধার্থে এখানে তাদের কয়েকজনের মতামত তুলে ধরা হলো :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী C.J.H. Hayes জাতীয়তাবাদকে 'জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের দুটি পুরনোভাবের আধুনিক অনুভূতিপ্রবণ সংমিশ্রণ ও অতিরঞ্জন' বলে চিহ্নিত করেছেন (A Modern emotional fusion and exaggeration of two very old phenomena of nationality and patriotism)।

Hans Kohn বলেছেন, 'জাতীয়তাবাদ মূলত এক মানসিক অবস্থা চেতনার ক্রিয়া' (Nationalism first and foremost a state of mind, act of consciousness)।

অধ্যাপক লাস্কির কথায়, 'জাতীয়তাবাদ সাধারণভাবে এক ধরনের মানসিকতা। এটি দু'ধারায় পরিপুষ্ট। একটি পুরনো স্মৃতি সম্পদ এবং অন্যটি পরস্পরের একত্রে বসবাস করার সম্মতি।'

আবার অধ্যাপক স্নাইডারের (L. L. Snyder) মতে, 'জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার ফলাফল। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসাধারণের মানসিকতা, অনুভূতি ও চিন্তা চেতনার ফল।'

উপরে বর্ণিত জাতীয়তাবাদের ধারণা বা সংজ্ঞাসমূহ থেকে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ এক ধরনের চেতনা। যে চেতনার ফলে কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠী নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করে, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সাথে একাত্মবোধ করে এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, স্বকীয়তা রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়ে নিজে একত্রিত হয়ে এ মহামিলনের আনন্দে শামিল হয়। এ লড়াইয়ের দুটি দিক রয়েছে। ১. সামাজিক এবং ২. রাজনৈতিক।

সামাজিক দিক থেকে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক মনে করে এবং একইসাথে এ জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক দিক থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। দেশপ্রেম এবং দেশাত্মবোধ যে জাতীয়তার প্রধান স্তম্ভ তা জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায়।

জাতীয়তাবাদের উপাদান

জাতীয়তাবাদ কি তা বোঝার জন্য জাতীয়তাবাদের উপাদান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কোনো সমাজে জাতীয়তার চেতনা দানা বাঁধার পেছনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভূমিকা পালন করে, যা মূলত জাতীয়তাবাদের উপাদান।

১. **একই ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস :** নির্দিষ্ট ও পাশাপাশি ভূখণ্ডে বসবাস একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের অন্যান্য উপাদান হাজির থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক নৈকট্যের অভাবে একটি যাযাবর জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী মানসিক সূত্রে যুক্ত হতে পারে না। যদিও এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। যেমন জেরুজালেমে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহুদিগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেও নিজেদের মধ্যে একটি মানসিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

২. **বংশগত ঐক্য :** বংশগত ঐক্যের প্রভাব গভীর, যা মানসিক ঐক্য সৃষ্টি করে। যদিও আধুনিক নৃবিজ্ঞানীগণ বংশগত ঐক্যকে কাল্পনিক সম্বন্ধ বলে প্রচার করছেন। তারা বলেছেন, পৃথিবীর কোনো জাতির মধ্যেই রক্তের বিশুদ্ধতা নেই। সুতরাং বংশগত ঐক্য থাকলেই যে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা হবে তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। যেমন– জার্মান, ডাচ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি একই বংশ হতে উদ্ভূত হলেও একই জাতীয়তাবাদের বন্ধনে নেই। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বংশের লোকের বসবাস সত্ত্বেও তারা একই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ।

৩. **ভাষার ঐক্য :** মানুষের মননের ও ভাবের বাহন ভাষা। যার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই ভাবের বিনিময়ের ফলে ঐক্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়। অবশ্য উদাহরণ আকারে বলা যায়, সুইস জনসাধারণ তিনটি ভিন্ন ভাষায় কথা বলেও একই জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ। আবার মিশর ও সৌদি আরবের লোকজন একই ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও তারা ভিন্ন জাতি।

৪. **ধর্মের ঐক্য :** ধর্ম জাতীয়তাবাদ গঠনে একটি বড় শক্তি। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এশিয়া ও ইউরোপের বহু জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে কাজ করেছে। ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম হলেও ভিন্ন উদাহরণ আকারে হাজির আছে বহুধর্মের দেশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র।

৫. **অর্থনৈতিক ঐক্য :** কোনো জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন এক ও অভিন্ন হয় তখন তারা একই জাতীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়।

৬. **এক শাসন ব্যবস্থা :** দীর্ঘ সময় একই শাসনব্যবস্থার অথবা শক্তির অধীনে থাকলে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বভাবতই নানা বিষয়ে যে ঐকমত্য ঘটে তাই জাতীয়তার চেতনা তৈরি করে।

৭. **ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য :** জাতীয়তাবাদ গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য। কেউ কেউ জাতীয়তাবাদের চেতনাকে মূলত ঐতিহ্যগত বা ভাবগত চেতনা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহ্যবোধ তাদেরকে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করতে পারে।

জাতীয়তাবাদের ক্রমধারা ও বিকাশ

লিখিত ইতিহাসের বরাতে বলা যায়, প্রাচীন যুগে গ্রিক ও হিব্রুদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণা দেখা যায়। গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলো বিধ্বস্ত হওয়ার পর তার ধ্বংসস্তূপেই রোমানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে যখন দেশ পরিচালিত হতে থাকে তখন জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়। এর পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের ধারণা জন্মলাভ করে। এ ধারা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্বল হয়ে গেলেও আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা তখনও জন্মায়নি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ নতুন করে প্রাণ পায়, যখন ল্যাটিন ভাষার আধিপত্যের বিপরীতে বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ মাতৃভাষার ব্যবহার বাড়তে থাকে। একইসাথে মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের বিপরীতে ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে শক্তিশালী রাজাদের উত্থান ঘটছিল। যার সাথে যুক্ত হচ্ছিল বিভিন্ন বণিক, দালাল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত উত্থান। এই শ্রেণীগুলো তাদের আর্থিক সুবিধা এবং নিরাপত্তার জন্য সমবেত হচ্ছিল রাজার পতাকা তলে। ফলে রাজা এবং এ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে দেশ রক্ষার নামে জনতার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হয়।

ষোড়শ শতকে এ কাজে রাজাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সাহায্য করতে যিনি সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন তিনি হলেন নিকালো মেকিয়াভেলি। এ কারণে তাকে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রধান ব্যক্তিত্ব বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ মূলত সুদৃঢ় হয়।

পোল্যান্ডের ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ১৭৭২ সালে জাতীয়তাবাদী চেতনা জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে। এর আগ পর্যন্ত জনগণের কোনো ধরনের সম্মতি ছাড়াই রাজা বা সম্রাট জনপদ বিলিবন্টন করত। কিন্তু পোল্যান্ডের ভাগাভাগির ফলে জনগণের মধ্যে এক তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। দেশের বিভিন্ন অংশ জনগণের সম্মতি ছাড়া বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতো বিক্রয় কিংবা ভাগাভাগি হওয়া অন্যায়– এই ভাবনা জাতীয়তাবাদের গতিকে বেগবান করে। আগুনে তেল ছিটানোর মতো ফরাসি বিপ্লবের বিপ্লবী স্লোগান : সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা আরো জোরদার করে। এই সবই প্রচারিত হচ্ছিল জনগণের সার্বভৌমিকতার নামে।

বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে যখন ফরাসি আধিপত্যবাদের জন্ম হয় এবং সেই আধিপত্যের পায়ের নিচে দলিত হতে থাকে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশ তখন দেশের জনগণ দেশ রক্ষার জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফরাসি বিপ্লবোত্তর ম্যাজেনি (Mazini), ফিখটে (Fictite) প্রমুখ লেখকের রচনা জাতীয়তাবাদের ভাবনা আরও প্রসারিত করে। ম্যাজিনি প্রচার করেন, একই ঐতিহ্য ও প্রথার বন্ধনে শরীক ইতালীয়রা এক জাতি। ফিখটে বলেন, জার্মানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। জাতীয়তার ভাবধারায় প্রভাবিত ইতালি ও জার্মান জাতি এভাবে একত্রিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ ও বিংশ শতাব্দী জাতীয়তাবাদের গৌরবোজ্জ্বল যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই সালে জাতীয় রাষ্ট্রের ওপর ভিত্তি করে ইউরোপের মানচিত্র নতুন করে আঁকা হলে চেক, পোল, স্লাভ জাতিগুলো নতুন রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং দূরপ্রাচ্যে জাতীয়তার ভিত্তিতে অনেকগুলো জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উদাহরণস্বরূপ– ১৯৪৫ সালে কোরিয়া, ১৯৪৬ সালে ফিলিপাইন, ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান, ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন হয়। '৬০ এর দশকে আফ্রিকায় বহুসংখ্যক নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে ঠাণ্ডাযুদ্ধ বা স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল তার প্রেক্ষিতে অনেক পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধে, যার ফলে অনেক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের সৃষ্টি। সব দেশে একই ধরনের উপাদানে এবং একইভাবে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। জোর করে কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পনা করে কোনো জাতি সৃষ্টি করা যায় না। মানব প্রকৃতির মধ্যেই জাতীয়তাবাদের চেতনা দেখা যায়। মানুষ তার পরিচিত নিজ পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। তার সাথে একাত্ম হয়, ভালোবাসে। এসবই মানুষের স্বভাব বা স্বাভাবিক ধর্ম। পরিচয়হীন পরিবেশের প্রতি তার ভয় এবং অজ্ঞানতাবশে ঘৃণাও জাগে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের পরিচিত পরিবেশের পরিধিও বিস্তার লাভ করে। বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে মানুষ তার পারিবারিক সীমানা পেরিয়ে গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদির সাথে সাথে গোটা দেশ ও জাতিকে তার নিজের বলে ভাবতে শিখেছে। তাই নিজের দেশের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও তাকে ভালোবাসাই বর্তমান যুগের মানুষের কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। একদিন হয়তো মানুষ গোটা বিশ্বকে তার নিজের বলে ভাববে। তখন জাতীয়তাবাদ বিশ্বমানবতাবাদে রূপান্তরিত হবে। তাই অনেকেই জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতার পথে একটি পদক্ষেপ বলে মনে করেন। একটি জাতীয় রাষ্ট্রের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ নানা গোষ্ঠীও থাকতে পারে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই এ রকম দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলো ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ। Nation বলতে আমরা যা বুঝি তার অনেক বৈশিষ্ট্যই এ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে থাকে। কিন্তু তবুও এগুলোকে আমরা nation বা জাতি বলি না। কারণ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা এ গোষ্ঠীগুলোর নেই। রাজনৈতিকভাবে স্বেচ্ছায় একটি বড় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এ গোষ্ঠীগুলো একত্রে বাস করতে চায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ঐক্য থাকা সত্ত্বেও একটি বৃহত্তর জাতীয়তাবোধের মধ্যে বাস করতে পারে।

০৪ । ক. সাম্রাজ্যবাদ কি?
খ. সাম্রাজ্যবাদের কারণ/উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
গ. সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আলোচনা করুন।

উত্তর : ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে আমরা দেখি প্রাচীনকাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাবিলন, মিসর, পারস্য, রোম ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ প্রাচীনকালেই সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে পর্তুগাল, স্পেন, ব্রিটেন প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের উপকূলবর্তী দেশের নাবিকেরা আবিষ্কারের নেশায় বিভিন্ন দিকে যাত্রা আরম্ভ করে এবং তাদের ভৌগোলিক আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপনে পরিণতি লাভ করে।

কেবল পশ্চিমা শক্তিগুলো নয়, এশিয়াতে জাপানও সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রসারিত হয় চীনের দিকে। ১৮৯৪ সালে চীনকে পরাজিত করে জাপান ফরমোজা এবং আরো কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগ হলো সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগ। যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে জাপান, ইতালি ও জার্মানি তাদের সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে সাম্রাজ্য রক্ষা করার মতো শক্তি আর ব্রিটেনের থাকে না। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রধানত ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠাতে তা দমন করার শক্তিও ব্রিটেনের ছিল না। ব্রিটেন দূরদর্শিতার সাথে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তৎকালীন ভারতবর্ষ, মিয়ানমার, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ফ্রান্স তার সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ফ্রান্স ১৯৪৫ সালে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এভাবে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ বা ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদ নীতি শেষ হতে থাকে। কিন্তু যে কারণে এসব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করেছিল তা বর্তমানেও অক্ষুণ্ন থাকায় এ রাষ্ট্রসমূহ নতুন পদ্ধতিতে আবারও সাম্রাজ্যবাদ তৈরি করে, যেখানে তারা সরাসরি কোনো রাষ্ট্র দখল না করে তার বাজার দখল করে নিচ্ছে। একেই বলা হয় নব্য সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি জানি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিজ্ঞানসম্মত কোনো সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, একটি দেশ নিজ স্বার্থে অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশ বা সঙ্কুচিত করে তার উপর যখন নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করার চেষ্টা চালায় তখনই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। ওয়েবস্টার অভিধান অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ অর্থ, 'The policy, practice or advocacy of seeking to extend the control, domination or empire of a nation.'

Charles Hodges তার 'The Background of International Relation' বইতে সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'It involves the inposition of control– open or covert, direct or indirect of our people by another.'

Parker T. Moon সাম্রাজ্যবাদকে অ-ইউরোপীয় দেশের ওপর ইউরোপীয় দেশের প্রভুত্ব বলে বর্ণনা করেন কিন্তু ইতিহাসের দিকে নজর ফিরালে তা ভুল প্রমাণিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে জাপানের নীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতি। ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর ইসলামিক সাম্রাজ্য ইউরোপের একটি অংশে বিস্তার লাভ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট করে হিটলার তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন।

নানা পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করা যায় এবং সরকারের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা ও চেষ্টা ছাড়াও সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীতে বহুদিন ধরে সাম্রাজ্য প্রচলিত এবং এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ

একটি দেশের লোক যখন অন্য দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং সে দেশকে নিজেদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করে তখন সাধারণভাবে আমরা তাকে উপনিবেশ বলি। উপনিবেশের সাথে মাতৃভূমির সম্পর্ক বেশিরভাগ সময়ই সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়। উপনিবেশ অনেকটা নিজ দেশের স্বাভাবিক বিস্তার। Hobson-এর মতে 'Colonialism, in its best sense, is a natural outflow of nationality.' (J. A. Hobson – Imperialism : A study)

সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক এবং এর সাথে সামরিক অভিযান ও যুদ্ধ বিগ্রহ অনেক বেশি মাত্রায় জড়িত। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি আকারে বোঝা যায় না। উপনিবেশ ও মাতৃভূমির সম্পর্ক যে অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ায় তা প্রমাণ করে আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, যা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম নামেই পরিচিত। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে খুব পরিষ্কারভাবে কোনো পার্থক্য টানা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের কারণ/উদ্দেশ্য

সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। বর্তমানকালে নব্য সাম্রাজ্যবাদ এবং এর কিছু আগে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে যে সাম্রাজ্যবাদ চলে আসছে তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক, নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়, উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ, কাঁচামাল সংগ্রহ প্রভৃতি কারণে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণই সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টির পিছনে একমাত্র কারণ নয়। আরো নানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন করা হয়। যেমন– জাতীয়তাবাদ, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নিজস্ব ধর্ম ও সভ্যতা প্রচার, উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যার বাসস্থান প্রভৃতি কারণে সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন করা হয়। নিচে এগুলো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলো :

১. **জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা :** সাম্রাজ্য স্থাপনের মাধ্যমে নিজের দেশের মর্যাদা, শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রবণতা জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিহিত আছে। নিজ দেশের পতাকা অন্য দেশে স্থাপন করে নিজ ভাষা, সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রসারিত করে জাতীয়তাবাদী মন তৃপ্তি লাভ করে। Hans Kohn তার 'Nationalism and Imperialism is the Hither East' গ্রন্থে লিখেছেন, 'The imperialism & nationalism are interlocked'। উগ্র জাতীয়তাবাদ বা Racialism সহজেই সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়। যেমন– জার্মানির নাৎসি দল তথাকথিত দুর্বল জাতির উপর জার্মানির প্রভুত্ব স্থাপনের স্বাভাবিক অধিকারে বিশ্বাসী ছিল। এবার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির দিকে তাকালে দেখবো প্রতিটি রাষ্ট্রই জাতীয় স্বার্থের খাতিরে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, বিশ্ব রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে। সামরিক বা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করে একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। সাম্রাজ্য থেকে কাঁচামাল যোগাড় করে এবং উৎপাদিত পণ্য সাম্রাজ্যে বিক্রয় করে একটি তুলনামূলক ছোট রাষ্ট্রও যে অন্যতম শক্তিতে পরিণত হতে পারে তার প্রমাণ ব্রিটেন।

২. **রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা জোরদারকরণ :** রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আরো জোরদার করার জন্য অনেক রাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপনে আগ্রহী হয়। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া অধিকার করে। ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য জিব্রাল্টার, মাল্টা, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে।

৩. **ধর্মীয় প্রচারণা :** ধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যেও অনেক সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের খ্রিস্টান মিশনারিরা আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গিয়ে জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন কাজ করে তাদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নেতাদের অবদান রয়েছে। পূর্ববর্তী যুগে ইসলামিক সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বেশি।

৪. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাত :** যদিও জাপান, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তাদের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বসবাসের জন্য সাম্রাজ্যের প্রয়োজন বলে যুক্তি দেখিয়েছে কিন্তু বাস্তবে তা পুরোমাত্রায় সঠিক নয়। শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও সাম্রাজ্য স্থাপনের পর লোকের চাপ এসব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে কমে গেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইতালি উদ্বৃত্ত জনগণের অজুহাতে আফ্রিকাতে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যায়, আফ্রিকাতে ইতালীয় সাম্রাজ্যে মাত্র চার হাজারের কাছাকাছি ইতালিয়ান রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগের দশ বছর (১৯০৪-১৯১৩) জার্মানি তার সাম্রাজ্যে বছরে গড়ে মাত্র ৩০ জন করে লোক পাঠাত।

৫. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন :** সাম্রাজ্য স্থাপনের পিছনে যে কারণটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা হলো অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনৈতিকভাবে রাষ্ট্রকে আরো শক্তিশালী ও বাজার দখল করার জন্যই মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা অজুহাতে সাম্রাজ্য স্থাপন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সরাসরি হতো এবং পরবর্তীতে বাজার দখলের মাধ্যমে হতো। সরাসরি সাম্রাজ্য স্থাপনে সমস্যা তৈরি হওয়ায় বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) এবং পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৈরি করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৌশলে এবং নৈতিকতার খোলস পড়ে সাম্রাজ্যবাদকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। নব্য সাম্রাজ্যবাদ মূলত এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এগুতে পারছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিল্প বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি রাষ্ট্রের শিল্পপতিরা কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় এবং উদ্বৃত্ত মূলধন বা পুঁজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

অর্থনৈতিক সংস্কার করে শ্রমিক শ্রেণীর মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন হবে না বলে তিনি মনে করেন।

লেনিন-মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করে বলেছেন, পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। তার 'IMPERIALISM : THE HIGHEST STAGE OF CAPITALISM' গ্রন্থে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে 'The monopoly stage of capitalism' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত থাকায় মালিক শ্রেণী উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার সুযোগ পান না এবং দেশে উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করাও সম্ভব হয় না। সে অবস্থাতে সাম্রাজ্য স্থাপন করে জিনিসপত্র বিক্রি এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করাই পুজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায়। হবসনের ব্যাখ্যার সাথে লেনিনের মতবাদ মিল থাকলেও মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। হবসন অর্থনৈতিক সংস্কারকে সমাধান মনে করলেও লেনিন মনে করেছেন, পুঁজিবাদী সমাজে মালিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। সুতরাং পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য।

এ আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, সরাসরি ভৌগোলিক সাম্রাজ্য স্থাপনের যুগ শেষ হয়ে গেছে বললেও আমরা দেখি এখন আবার নতুন করে সরাসরি সাম্রাজ্য স্থাপন করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী বিভিন্ন রাষ্ট্র আফগানিস্তান তারপর ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী হাত প্রসারিত করেছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে ধুয়া তুলে তারা এ নব্য সাম্রাজ্য স্থাপন করছে।

মূলত অস্ত্র ব্যবসায়ীদের অস্ত্র বিক্রি, তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তগত করার অভিপ্রায়ে তারা এ সাম্রাজ্য বিস্তার করছে। এসব সাম্রাজ্যবাদ এবং নব্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে দেশপ্রেমিক এবং সচেতন মানুষ জাতীয় মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে।

জাতীয় মুক্তি : জাতীয় মুক্তি কি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেয়া না গেলেও বিভিন্ন ঘটনা এবং উদাহরণের মাধ্যমে তা বোঝানো যায়। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন রোধ করার জন্য এবং স্বাধিকার ও নিজেদেরকে নিজেরা শাসন করার অধিকার আদায়ের জন্য যেসব দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করা হয়েছিল সেসব রাষ্ট্রের নাগরিকরা যুগে যুগে রুখে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক বা চরমপন্থা অবলম্বন করে জাতীয় মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করেছে।

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের তৈরি কংগ্রেস এবং পরবর্তীতে মুসলিম লীগ যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি সময় দাঁড়িয়েছিল, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যেই ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতার মতো অনেক দেশপ্রেমিক যোদ্ধা সরাসরি ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন।

আজকে ইরাকের দিকে তাকালে আমরা দেখবো সেখানে আমেরিকার ভাষ্য অনুযায়ী 'সন্ত্রাসী'রা, যারা সেই দেশের নিপীড়িত জনগণের অংশ, তারা তাদের জাতির মুক্তির জন্য লড়ছেন, আত্মঘাতী হচ্ছেন, সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন জাতীয় মুক্তির জন্য। একটি জাতির মুক্তির কথা বলতে গেলে প্রথমেই তার মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি সামনে চলে আসে। তাছাড়া নাগরিকদের যথাযথ অধিকার জাতীয় মুক্তির অংশ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি জাতি তার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনীতিকে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী করে তোলা, তার মেধাকে পাচার হতে না দিয়ে নিজেদের জন্য কাজে লাগানো, নিজেদের পরিবেশ রক্ষা করা, কলকারখানা তৈরি ও কৃষি উৎপাদনে সাফল্য অর্জনসহ সকল ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে জাতীয় মুক্তি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে সবসময়ই। কেননা একটি জাতিকে অপর একটি জাতি যখন শোষণ করে, নিজেদের পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে তার অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে দেয়, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত করে, তখন সেই নিপীড়িত জাতির মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে। নিপীড়িত জাতিটি জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই সংগ্রাম করে।

সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি

রথসচাইল্ড ও রকফেলারদের বহু শতাব্দী পূর্বেই রোমান, পারস্য প্রভৃতি সাম্রাজ্য ছিল। নানাবিধ উদ্দেশ্য ছাড়াও এ সাম্রাজ্য স্থাপনের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন, উপঢৌকন, সোনা ইত্যাদি হস্তগত করা। সেই সাম্রাজ্যবাদ থেকে বর্তমানের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য হলো বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ সুসংগঠিতভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের বাজার দখল এবং শ্রমকে শোষণের মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয় করছে। এ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ অন্যদেশে বিনিয়োগ করে, সেই দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং একই সাথে নিয়ন্ত্রণ করে তার রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে। এর পেছনে মূল কারণ যে অর্থনীতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরাসরি ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদ ব্যবস্থা এখন না থাকলেও নব্য সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে এখন যে ব্যবস্থা চলছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং তার বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশের খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করে রাখছে। মাইকেল প্যারেন্টি যিনি একজন প্রগতিশীল মার্কিন চিন্তাবিদ, তিনি বলেন, 'উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বড় বড় প্রতিষ্ঠান এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় এ যাবৎ প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের তিন চতুর্থাংশ দখল করে আছে।' প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করার পাশাপাশি বৈদেশিক সম্প্রসারণের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন খরচ কমিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা তোলা। যেসব দেশে সস্তায় প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়, সে দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ মুনাফা তোলে।

সুতরাং এটি বোঝা যাচ্ছে যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত দেশের মানুষ মুক্তি অর্জনের জন্য সোচ্চার হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মাধ্যমে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো যে অন্যায় ও অন্যায্য চুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর জনগণের ক্ষতি করছে তার বিরুদ্ধে আজ জনগণ সোচ্চার। মেক্সিকোর কানকুনে তাই কোরীয় কৃষক আত্মাহুতি দিতে পারেন। লক্ষ লক্ষ জনগণ এসব চুক্তির বিরোধিতা করে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

বর্তমানে সাধারণ জনগণের কাছে এটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদের পন্থা হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এগুলো কোনো মানবকল্যাণমুখী সংস্থা নয়, এগুলো অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান। এদের দেয়া কোটি কোটি টাকার ঋণের বদলে বাংলাদেশের সরকার সব ধরনের শর্ত মেনে নিচ্ছে।

এদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বেসরকারিকরণ চলছে। ফলে আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এসব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিবহন প্রভৃতি মৌলিক চাহিদার খাতগুলো নিয়ে ব্যবসা করছে। তাই মানুষ এখন উচ্চশিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য সেবার জন্য তার জমি, সম্পদ, গৃহপালিত পশু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে গড়ে উঠছে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

একটি জাতি তার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি, মেধাপাচার রোধের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি অর্জনের পথ খোঁজে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তাদের অস্ত্র ব্যবসায়কে চাঙ্গা রাখার জন্য যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল নিয়ে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীব্যাপী গণমানুষের স্বর সোচ্চার হয়েছে। জাতীয় মুক্তি কেবল নিজের মুক্তি নয়। অপরের এবং সমষ্টির মুক্তির মধ্য দিয়েই জাতীয় মুক্তি অর্জন সম্ভব।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-তে কৃষি চুক্তি হলে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের কৃষকদের ভয়াবহ ক্ষতি হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের খাদ্যের সার্বভৌমত্ব। কৃষক তার স্থানীয় বীজ ব্যবহার করতে চায় অথচ কৃষি চুক্তি হলে তাকে জেনেটিক্যালি মডিফাইড (GM) বীজ ব্যবহার করতে হবে, যে খাদ্য ইউরোপের জনগণ বর্জন করেছে। এসবের বিরুদ্ধে জনগণ দাঁড়িয়েছে। জাতীয়ভাবে এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজ জাতির হাতে রাখতে চেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ নতুন পথে নতুন রূপ নিয়ে আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। তাই জনগণ নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও নিজ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এভাবেই হয়তো জাতীয় মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে।

০৫। 'পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর।'—লেনিনের এ উক্তির আলোকে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশল তুলে ধরুন।
অথবা, **সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের কারণ এবং বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন।**
অথবা, **বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করুন।**

উত্তর : বর্তমান বিশ্বের বৈশিষ্ট্যগত চিত্র হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বর্ধিত শ্রেণীবৈষম্য, দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য বৃদ্ধি এবং উন্নত সাম্রাজ্যবাদী ও প্রভাবাধীন দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কৌশলে তাদের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে তা-ই মূলত সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদঘাটনে যেসব সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ ব্যাপৃত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Karl Marx, F. Engles এবং V. I. Lenin।

Karl Marx পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ধনতন্ত্রের বা পুঁজিবাদের পতনের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। বিশ শতকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তার বাস্তবসম্মত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন লেনিন এবং এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসীয় ব্যাখ্যার নতুন সংযোজন সাধিত হয়। এ বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বহুল পরিচিত সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্ব।

সাম্রাজ্যবাদ

প্রচলিত অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বলতে যা বোঝায় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস এ ধারণাটিকে ব্যবহার করেন। তাদের মতে, 'সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, যা প্রকাশ পায় একটি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের অপর একটি দেশের ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।' সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস যে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন লেনিনের তত্ত্বের সেটিই ছিল মূল ভিত্তি। লেনিন তার 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' বইতে বলেন, 'The highest stage of capitalism is imperialism.' অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রের একচেটিয়া স্তরই হলো সাম্রাজ্যবাদ।

লেনিন অন্যত্র বলেন, 'The imperialism is not only monopoly capitalism, but also parasitic, decaying moribund capitalism.'

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদ বিকাশের সর্বশেষ স্তর রূপে অভিহিত করে এর প্রধান ৩টি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যথা :

১. সাম্রাজ্যবাদ হলো একচেটিয়া পুঁজিবাদ;
২. সাম্রাজ্যবাদ হলো ক্ষয়িষ্ণু বা পরগাছা পুঁজিবাদ এবং
৩. সাম্রাজ্যবাদ হলো মুমূর্ষু পুঁজিবাদ।

১. **সাম্রাজ্যবাদ হলো একচেটিয়া পুঁজিবাদ :** যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের একচেটিয়াভাবে উত্তরণের অভিব্যক্তি সেহেতু লেনিন এ স্তরের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। যথা :

প্রথমত, পুঁজির কেন্দ্রীকরণ এমন একটি স্তরে পৌঁছায় যে, এর ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া কারবার, যা গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে ব্যাংকে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া পুঁজির বদৌলতে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত হয় তাকে নতুন বাজার লাভের আশায় বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।

চতুর্থত, পুঁজির রপ্তানি ও বাজার দখলের প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চমত, গোটা বিশ্বের বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে প্রয়োজন দেখা দেয় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার। কেননা এর ফলেই সে দেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা সুনিশ্চিত হয়।

২. **সাম্রাজ্যবাদ হলো ক্ষয়িষ্ণু বা পরগাছা পুঁজিবাদ :** লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের এক চূড়ান্ত রূপ। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বহিঃপ্রকাশকে কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, লেনিন দেখিয়েছেন যে, একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের ফলে উৎপাদিত শক্তির বিকাশ ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অন্য দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং এর ফলে তারা যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায় তাকে কেন্দ্র করে এদের জীবনযাত্রা হয়ে উঠে ব্যভিচার, অনাচার ও ভোগ-বিলাসমুখী। এ কারণে লেনিন এদেরকে পরগাছা আখ্যা দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া পুঁজিবাদ শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে শ্রমিক শ্রেণীর এক অংশকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে প্ররোচিত করে।

চতুর্থত, একচেটিয়া পুঁজিবাদ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিপন্ন বোধ করলে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়।

৩. **সাম্রাজ্যবাদ হলো মুমূর্ষু পুঁজিবাদ :** একাধিক কারণে লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের স্তর রূপে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত, সীমিত হলেও একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন শক্তির যে অগ্রগতি ঘটে তা সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান।

দ্বিতীয়ত, বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্থায়িত্বকে ক্রমশ সঙ্কটাপন্ন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ক্রমশ উজ্জ্বল করে তোলে।

তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে অসমভাবে। ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনেক সময় প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুপ্রশস্ত করে।

সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্বকে পশ্চিমা সমালোচকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করেছেন। লেনিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের পর সমাজতন্ত্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা কল্পনাই রয়ে গেছে এবং বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও খুব ক্ষীণ। কেননা পুঁজিবাদী দেশের পণ্ডিতরা তৃতীয় বিশ্বের লোকের এমন 'মগজ ধোলাই' করেছেন যে, তারা মনে করে তারা নির্যাতন এবং শোষণ হজম করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে আর উন্নত দেশের লোকেরা শোষণ এবং নির্যাতনের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে।

এটা তাদের ভাগ্য কর্তৃক নিহিত। এ ধরনের ধারণা তৃতীয় বিশ্বের লোকের মাঝে বদ্ধমূল হওয়ার কারণ পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহলের বিভিন্ন প্রগতিশীল তত্ত্বের অপব্যাখ্যা। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বও ঠিক এ ধরনের অপব্যাখ্যার শিকার। পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সাম্রাজ্যবাদ হলো মূলত একটি রাজনৈতিক ধারণা, যার সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। যেমন— Morgantheau-এর মতে, 'সাম্রাজ্যবাদ হলো স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করার একটি নীতি মাত্র।' M. Lazarus-এর মতে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত বিস্তার লাভের পিছনে একাধিক অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধানত দায়ী। D K Fieldhouse, W Rostow প্রমুখ এ মত পোষণ করেন যে, পুঁজির রপ্তানির সাথে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে এক করে দেখাটা ভুল। এদের মতে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে পুঁজিবাদের যে প্রাচুর্যশীল বিকাশ হতে শুরু করে তারই পরিণতিতে উদ্বৃত্ত পুঁজিকে রপ্তানি করার প্রবণতা দেখা দেয়। সেই সাথে এ কথাও বলা হয় যে, অনুন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত করার অভিপ্রায়ে পুঁজির রপ্তানি করা হয়ে থাকে। পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা লেনিনের বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করার জন্য আরও একটি যুক্তি উপস্থাপন করেন। এদের মতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর উপনিবেশগুলোতে কোনো স্বার্থ ছিল না। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে অনেক দেশের কাছেই উপনিবেশগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসার, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রমবর্ধমান সমর্থন, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অধীন বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মনোভাব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। তাছাড়া বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিভিন্ন জোটের উত্থান প্রভৃতি কারণে সাবেক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। এ নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের শোষণ প্রক্রিয়া ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য নতুন কৌশল; যেমন– অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সীমান্তবিরোধ সৃষ্টি, দেশের অভ্যন্তরে আন্তঃউপজাতীয় বিরোধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উৎসাহ দান, অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপে ইন্ধন সৃষ্টি এবং মতাদর্শগত কৌশল প্রভৃতি গ্রহণ করেছে। নিচে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ধরন ও কৌশল তুলে ধরা হলো :

১. **স্বনির্ভরশীলতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি :** প্রতিটি দেশ স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নীতিতে বিশ্বাসী। পরিকল্পিত পথে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অন্যায়ের অবসান ঘটানোই তাদের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের মূল লক্ষ্য অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অর্থনীতির অংশে পরিণত করা এবং ঐসব দেশের সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। এজন্য তারা সব সময়ই চেষ্টা করে এসব দেশের স্বনির্ভরশীলতা অর্জন ব্যর্থ করতে। এ লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি দক্ষতার বিকাশ যাতে ঘটাতে না পারে সেজন্য নিজ দেশের প্রযুক্তিবিদ্যাকে ঐসব দেশে হস্তান্তর করে। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়ন এবং সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জিত হলে তার পরনির্ভরতা হ্রাস পেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এটাই প্রধান অন্তরায়। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশ এখনো চেষ্টা করে, যে কোনো মূল্যেই তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে।

২. **অর্থনৈতিক সাহায্য এবং ঋণ :** সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর শোষণ ও তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অন্যতম মাধ্যম হলো অর্থনৈতিক সাহায্য এবং ঋণ প্রদান। এ ঋণ ও সাহায্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের শর্ত আরোপিত থাকে। সাধারণত ঋণ এবং অর্থনৈতিক সাহায্যকে পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ব প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, উন্নয়নের নামে অনুন্নত দেশগুলো দাতাগোষ্ঠী বা দেশগুলোর কাছ থেকে ঋণ এনে উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। কেননা প্রতি বছর দেশগুলোকে সুদ হিসেবে ঋণদানকারী দেশগুলোর হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে দিতে হচ্ছে। পাশাপাশি ঋণের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে দেশগুলো অন্যান্য দিক দিয়ে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে।

৩. **বেসরকারি বিনিয়োগ :** অনুন্নত দেশে উন্নত দেশের বেসরকারি বিনিয়োগও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের আরেকটি মাধ্যম। ১৯৫৩-১৯৬২ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৫০০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ১৪,৪০০ মিলিয়ন ডলার মুনাফা নিজের দেশে পাঠায়। আফ্রিকা পৃথিবীর মোট মুক্তার শতকরা ৯৫ ভাগ, সোনার ৬৪ ভাগ এবং ক্রোমিয়ামের ৪৫ ভাগ উৎপাদন করে। কিন্তু সম্পদের ১০ ভাগও আফ্রিকার জনসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ হয় না। বিদেশী পুঁজি এ সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে। মুক্তবাজার অর্থনীতি চালুর পর থেকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা দারুণভাবে বেড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৪. **চুক্তি সম্পাদন :** দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অন্যান্য দেশের রাজনীতি এবং সামরিক প্রস্তুতিতেও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কোথাও কোথাও দেখা গেছে, উপনিবেশ থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়ার সময় ঔপনিবেশিক শক্তি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সামরিক নানা শর্ত আরোপের চেষ্টা করেছে। ফরাসি সরকার পশ্চিম আফ্রিকায় প্রাক্তন উপনিবেশের সাথে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেছিল। সেনেগাল, চাদ, নাইজার, গ্যাবন প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে ফ্রান্স তাদের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করেছিল। ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তির ফলে সেখানে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। চুক্তির ফলে কিউবায় রয়েছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সাহায্যে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোকে শর্তাধীনে আবদ্ধ রেখে প্রকৃত ক্ষমতা কুক্ষিগত করছে।

৫. **পুতুল সরকার গঠন :** কোনো দেশে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সে দেশে পুতুল সরকার গঠন করে। বস্তুত পুতুল সরকার গঠনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজেদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালায়। যখনই কোনো দেশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে তখনই সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটানো, নাশকতামূলক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দান, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো আবার কখনো বা সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেয়। যেমন— হাইতিতে প্রেসিডেন্ট যোসেফ অ্যারিস্টিড বিরোধী আন্দোলন এবং তার দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একই সময়ে ভেনিজুয়েলায়ও শ্যাভেজবিরোধী আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। অবশ্য হুগো শ্যাভেজ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে এর সমুচিত জবাব দেন। ইরাকের

সাদ্দাম সরকারের পতন এবং সে দেশে পুতুল সরকার গঠনের মাধ্যমে ইঙ্গ-মার্কিন জোট তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। আফগানিস্তানেও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নামে সে দেশে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিলির আলন্দে সরকারের পতনের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। মিসরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে উৎখাত করে সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল সিসির (৮ জুন ২০১৪–) স্থলাভিষিক্তি সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার গঠনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৬. **রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সারা বিশ্বে চক্রান্তের জাল বিস্তার করে চলেছে। উদ্দেশ্য তাদের একটাই— অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তাদের নিয়ন্ত্রণ বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। তাদের সামরিক ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এজন্য এসব দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদপন্থী শক্তি, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, উপজাতীয় বিরোধ ইত্যাদিকে উসকে দিচ্ছে। যেমন— শ্রীলংকার তামিল সমস্যার পিছনে ভারতের প্রচ্ছন্ন হাত রয়েছে। তাছাড়া আফ্রিকার কঙ্গো, ঘানা প্রভৃতি গোত্রভিত্তিক সমাজে অস্থিতিশীলতা, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদির জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। কেননা এ অস্থিতিশীলতার মাধ্যমে ঐসব দেশের ওপর তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখে। এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নতুন পদ্ধতিতে বিভিন্ন অনুন্নত দেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির দ্বারা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে।

৭. **সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও নিজের স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করে। এ পদ্ধতিকে সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অনুপ্রবেশ বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সব সময়ই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সকল প্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও উদ্যোগের বিরোধী। এজন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। তারা অন্য দেশের শিক্ষাজগতে অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নেয়। নিজের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবর্তনের জন্য ঐসব দেশকে চাপ দেয়। অর্থ সাহায্য ও নানা সংস্থা এবং তহবিল গঠনের মাধ্যমে তাদের কৌশলকে রূপদানের চেষ্টা করে। উদাহরণ হিসেবে ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন ফাউন্ডেশন গঠনের প্রচেষ্টার কথা বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সুস্থ, চিন্তাশীল, গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গতিরোধ এবং অসুস্থ, প্রতিক্রিয়াশীল, অশালীন সাংস্কৃতিক মননশীলতা গড়ে তুলে অন্যদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে সব সময়ই চেষ্টা করে এবং এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনেকটা সফল।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল তথা সব দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে বিঘ্নিত করছে বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা। বর্তমানে ইরান, উত্তর কোরিয়া, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় তার সমমনা অন্য রাষ্ট্রগুলোও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের নামে বিভিন্ন দেশের ওপর তাদের আধিপত্য পাকাপোক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশের নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি যতদিন বজায় থাকবে ততদিন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উত্তেজনা দূর করা সম্ভব নয়। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রকৃত বন্ধুভাবাপন্ন দেশের আন্তরিক সাহায্য এবং সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদ অবসানে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য পৃথিবীর সকল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হানাহানির কথা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

০৬। ক. উপনিবেশবাদ কি?

খ. উপনিবেশ স্থাপনের কারণ ও সাম্প্রতিককালের উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অথবা, **ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুক্তি এবং সাম্প্রতিককালের উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

উত্তর : বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র তুলনামূলক দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে তাকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করে। উপনিবেশ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ আদৌ সৃষ্টি হতো না। যদিও সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে অনেক সময় কিছুটা পার্থক্য করা হয়। উপনিবেশ হলো বহিরাগত ব্যক্তিদের দ্বারা বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অধিকৃত ও তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেশ। Hobson-এর ভাষায় 'Colonialism, in its best sense, is a natural outflow of nationality.' [J.A. Hobson, Imperialism : A Study]।

উপনিবেশবাদ

ঔপনিবেশিকতাবাদ হলো অন্য দেশকে উপনিবেশ হিসেবে রাখার মতবাদ। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশের ভূমি, শ্রম, কাঁচামাল ও বাজার দখল করার জন্য যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করে তাই ঔপনিবেশিকতাবাদ। উপনিবেশ সৃষ্টির ফলে সাম্রাজ্যবাদ তৈরি হয়। পশ্চিম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রথম দিকের শিকার হয়েছিল অন্য ইউরোপীয়রা। যেমন– প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে আয়ারল্যান্ড যে দেশটির প্রথম উপনিবেশ হয়েছিল তা পরবর্তীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী হাত প্রসারিত হয়েছে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিরুদ্ধে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে শুধু কাঁচামাল ও শ্রমের উৎস থাকেনি, একই সাথে পরিণত হয়েছে এদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বে পণ্যসামগ্রী ছাড়াও পুঁজি রপ্তানি শুরু করে যা হয় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, বিনিয়োগ ও ঋণের আকারে। পুঁজি রপ্তানি ও বিনিয়োগের পরও এসব দরিদ্র রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন বন্ধ হয়নি বরং অবাধ লুণ্ঠন বৃদ্ধি পেয়েছে, এগুলো হচ্ছে ঔপনিবেশিকতাবাদের কৌশল।

তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উপনিবেশ শাসনাক্রান্ত জাতিগুলো যখন একে একে উপনিবেশের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে শুরু করল, তা হলো কেবল ভৌগোলিকভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তি। কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মুক্তি বা প্রকৃত মুক্তি আসেনি। IMF বা World Bank-এর মতো অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পরোক্ষভাবে এ উপনিবেশবাদকে বজায় রাখার জন্য। তাই প্রখ্যাত মার্কিন চিন্তাবিদ ও নীতি বিশ্লেষক মাইকেল প্যারেন্টি বলেন, এখন উপনিবেশ স্থাপনকারী বা সাম্রাজ্যের নাম দেয়া হয় 'কমনওয়েলথ' এবং উপনিবেশগুলোর নাম দাঁড়ায় 'টেরিটোরি' বা 'ডোমিনিয়ন'।

উপনিবেশ শাসনের বিরুদ্ধে যুক্তি : উপনিবেশ বা নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সাধারণত বামপন্থী এবং গণমুক্তির আন্দোলনে যারা যুক্ত তারাই রুখে দাঁড়ায়। সুতরাং তাদের কাছ থেকে এ অপশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তি বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি তবে দেখবো এ উপনিবেশবাদ আমাদের কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। সবার উপর খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছে।

শোষিত জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সার্বিকভাবে এবং ধনীক ও তাবেদারী শ্রেণী তাদের সকল স্বকীয়তা ও সম্মান হারাচ্ছে ও নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও তা তাদের স্বভাবের রকমফের করতে পারেনি। পুঁজির ধর্ম পালন করতে গিয়ে তারা নিজ নিজ ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে এবং কিছু 'রিচুয়াল' পালন করে এ শোষক ও এলিট গোষ্ঠী জনগণের সামনে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে উপনিবেশ দ্বারা আক্রান্ত রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠী সবসময়ই ঋণের জালে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রমের স্বল্প মজুরি, বেকারত্ব, মৌলিক চাহিদা, যেমন– শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়ার সমস্যা প্রভৃতি দেখা দেয় উপনিবেশের শিকার রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

সাম্প্রতিককালের বিশ্ব রাজনীতির দিকে তাকালে আমরা দেখবো সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে সমগ্র পৃথিবীর নিরীহ জনগোষ্ঠীকে শোষিত করছে। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের যে সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হয়েছে তার শিকার হয়েছে আফ্রিকার হাজার হাজার শিশু। আফগানিস্তানে নিজেদের তৈরি আল কায়েদাকে দমন করার নামে মার্কিন আগ্রাসন কিভাবে হত্যা করছে নিরীহ আফগানদের। ইরাকের শত বছরের ঐতিহ্য ধ্বংস করেছে, হত্যা ও চরম নির্যাতন করছে এ উপনিবেশবাদ তেলের জন্য।

ফিলিস্তিনি নিরীহ শিশু, হোক সে খ্রিস্টান বা মুসলমান তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে আমেরিকার মদদপুষ্ট ইসরাইল। ইট-পাটকেলের বিরুদ্ধে কামান দেগেছে, যা চরম মানবতাবিরোধী।

ইহুদি ও খ্রিস্টান নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বিশ্বজুড়ে অন্য ধরনের এক উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করছে। যারা এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গেছে তাদেরকে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী ও জঙ্গি আখ্যা দিয়েছে। অথচ নিজেদের সন্ত্রাসকে বৈধ করেছে 'জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা' ও 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামে।

সাম্প্রতিককালের উপনিবেশবাদ বা নব্য উপনিবেশবাদ

সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার। এখন যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে তেমনভাবে পার্থক্য করা যায় না, তাই এ মুহূর্তে এ দুটি ধারণাকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা যদি নব্য উপনিবেশবাদ তথা নব্য সাম্রাজ্যবাদের চেহারার দিকে তাকাই তাহলে এদের আধিপত্যের পিছনে কিছু পদ্ধতি ও প্রভাব দেখতে পাব। এ পদ্ধতি ও প্রভাবগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

১. **বাজার ব্যবস্থা :** তৃতীয় বিশ্বের উপর বর্তমান যে সাম্রাজ্যবাদ চলছে তা মূলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর। তাই তৃতীয় বিশ্বের বাজার ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ করে এ নব্য সাম্রাজ্যবাদ। রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজারের প্রভুত্ব বজায় রাখে ক্রেতা তথা উন্নত বিশ্ব। শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাজারে প্রবেশ করার জন্য একটি দরিদ্র দেশ অন্যান্য গরিব দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াতে ধনী দেশগুলো তাদের নিজেদের জন্য সুবিধাজনক সব বাণিজ্য শর্ত আরোপ করে এবং দরিদ্র দেশগুলোকে একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে দেয়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্য এবং দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য বাণিজ্য জোট গঠনের উদ্যোগ নিলে বা গঠন করলেও তারা তেমন সফল হয় না। যেমন– সার্ক এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। রাজনৈতিক মতপার্থক্য, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং বিকল্প বাজারের অভাব এ দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল চিন্তাবিদ মাইকেল প্যারেন্টি তার 'Against Empire' গ্রন্থে জানান, আফ্রিকা মহাদেশের দেশেগুলোর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাত্র ৬ ভাগ নিজেদের মধ্যে হয়। বাকি সবটুকু হয় ইউরোপ, জাপান, উত্তর আমেরিকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে। নব্য সাম্রাজ্যবাদের শিকার এ দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো সব সময়ই তাদের রপ্তানি পণ্যের জন্য কম মূল্য পায়। অথচ শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে পণ্য আমদানির জন্য এসব দরিদ্র দেশকে দিতে হয় অনেক বেশি দাম।

প্যারেন্টির মতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো শিল্প পণ্য তৈরির সাহস দেখালে শিল্পোন্নত শক্তিগুলো তাদের প্রযুক্তি ও ঋণ প্রদান বন্ধ করাসহ বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেয়। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো বিপুল বিনিয়োগ, বিপণনের উন্নত কৌশল, একচেটিয়া পেটেন্ট এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা দিয়ে স্থানীয় বাণিজ্য উদ্যোগগুলোকে বাজারে প্রবেশে বাধা দান করে।

২. **ঋণের আধিপত্য :** ঋণের আধিপত্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নব্য উপনিবেশবাদের বড় রকমের একটি কৌশল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে যখন সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র মুক্ত হতে আরম্ভ করলো এবং ভৌগোলিক স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করলো তখন উন্নত রাষ্ট্রসমূহ, যারা এতদিন ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে আসছিল, তারা নিজেদের বাজার ধরে রাখা এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। এসব প্রতিষ্ঠান অনুন্নত দেশগুলোকে ঋণ দেয়া শুরু করে চড়া সুদ ও শর্তের মাধ্যমে।

দরিদ্র দেশগুলোতে অধিকাংশ শিল্প কারখানার মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণ বিদেশী কোম্পানিগুলোর হাতে থাকে। যেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মালিকানা কম সেখানে থাকে তাদের ভেটো ক্ষমতা। আবার কোনো শিল্প উদ্যোগের সম্পূর্ণ মালিকানা কোনো একটি দেশের হওয়ার পরও প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার থাকায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন– বড় কোম্পানিগুলো অশোধিত তেল উৎপাদনের মাত্র ৩৮ শতাংশের মালিক হলেও পরিশোধন ও সরবরাহের প্রায় পুরোটাই তাদের কব্জায়।

অনুন্নত ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এরকম সম্পর্ক থাকার জন্য প্যারেন্টি মনে করেন, গরিব দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেয়াকে সহজ পথ হিসেবে মনে করে। যে দেশগুলো ঋণগ্রস্ত তাদের আয়ের বড় একটি অংশ চলে যায় ক্রমবর্ধমান হারে ঋণ পরিশোধে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে সামান্য অবশিষ্ট থাকে।

প্যারেন্টি জানাচ্ছেন, আশির দশকের শেষভাগে প্যারাগুয়ের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশই চলে গেছে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ করতে। অধিকাংশ ঋণগ্রস্ত দেশকেই ঋণ পরিশোধে তাদের রপ্তানি আয়ের এক তৃতীয়াংশ থেকে দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে হয়। ১৯৮৩ সালের দিকে বিদেশী ব্যাংকগুলো তৃতীয় বিশ্বের প্রদত্ত ঋণ থেকে যে পরিমাণ সুদ পেয়েছে, তা সেখানে তাদের সরাসরি বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে তিনগুণ বেশি।

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, এসব ঋণ বাতিল করে এ অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে। কিন্তু বাস্তবে এমন আশংকা করা অযৌক্তিক নয় যে, এ ঋণ পরিশোধ না করলে কোনো দেশ আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্পমেয়াদি ঋণ পাবে না। তাছাড়া ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানো দেশগুলোর বৈদেশিক একাউন্ট আটকে রাখা, বৈদেশিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং রপ্তানি বাণিজ্য হাতছাড়া হওয়ার আশংকা থেকেই যায়।

ফলে ঋণখেলাপি না হওয়ার জন্য দরিদ্র দেশগুলোর আরও ঋণ নিতে হয় এবং নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য দেশটিকে অবশ্যই IMF বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রদত্ত কাঠামো পুনর্বিন্যাসের শর্তে মত দিতে হয়। এ কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে দেশগুলোতে খাদ্যে ভর্তুকি এবং গৃহায়ন ও অন্যান্য মানবসেবা খাতের বরাদ্দ কমে যায়। ফলে বঞ্চিত হয় সাধারণ জনগণ।

ঋণগ্রহীতা দেশকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে হয়। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখতে হয়। দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি করতে হয়। তাছাড়া ঋণগ্রহীতা দেশকে স্থানীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তুকি বাতিল করার পাশাপাশি বিদেশী কোম্পানিগুলোকে উদারভাবে শুল্ক ছাড় দিতে হয়। সুতরাং সাম্প্রতিককালে নব্য উপনিবেশবাদের মাধ্যমে যে ঋণের জালে আমরা আবদ্ধ হচ্ছি, সে ঋণ পরিশোধের অর্থ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সম্পদের একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির মালিকদের হাতে জমা হচ্ছে।

৩. **বৈদেশিক সাহায্য (!) :** বৈদেশিক সাহায্যের পাশে বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেয়ার অর্থ হচ্ছে, আদৌ একে কোনো 'সাহায্য' বলা যায়, নাকি নব্য উপনিবেশ তথা নব্য সাম্রাজ্যবাদের একটি হাতিয়ার হচ্ছে এ সাহায্য? আমরা জানি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যগ্রহীতা দেশসমূহকে ওয়াদা করতে হয় যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ধার্যকৃত দামে মার্কিন পণ্য কিনবে এবং এ পণ্য বহন করা হবে মার্কিন জাহাজে। এ প্রসঙ্গে প্যারেন্টি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করে না, কেবল বেসরকারি খাতে সহায়তা দেয়। এ সহায়তার খুব ছোট একটা অংশ ঐ দেশের অভাবী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে। এ সাহায্যের একটি বড় অংশ চলে যায় মার্কিন বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের জন্য ভর্তুকি হিসেবে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য একটা অংশ চলে যায় দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীর হাতে।

অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্যের ফলাফল দাঁড়ায় সামান্য কিছু লোকের হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়া। এ অর্থ মূলত তৃতীয় বিশ্বের এনজিও (NGO)-এর হাতে চলে আসে এবং লুটপাট চলে। উন্নত দেশগুলো নব্য উপনিবেশবাদ স্থাপনের জন্য বৈদেশিক সাহায্যকে ব্যবহার করে। তাই এ সাহায্য অনুন্নত দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র দেশগুলো নিজেরা নিজেদের সম্পদ ও বণ্টন ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চাইলে এ সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। যেমন– চিলিতে ১৯৭০ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অ্যালেন্দে সরকার যখন সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় তখন সেখানে সব মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। কেননা এ সংস্কার সম্পদশালী বিনিয়োগকারী তথা নব্য উপনিবেশ সৃষ্টিকারীদের সুযোগ-সুবিধা ক্ষুণ্ন করেছিল।

কিছুক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্যও বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– নিকারাগুয়ার সমবায় খামার ও ভূমি সংস্কারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সেখানকার বাজারে ওয়াশিংটন জোয়ার ও হিমায়িত মুরগি ডাম্প করেছিল। ওয়াশিংটন সোমালিয়াতেও একইভাবে তাদের স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি পঙ্গু করে ফেলা ও স্থানীয় উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সেখানে ভুট্টা পাঠায়।

বৈদেশিক সাহায্যের একটি অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এটি ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের একটি কনসোর্টিয়াম। এরা এমন সব প্রকল্পে শতশত কোটি ডলার যোগান দেয় যে, প্রকল্পগুলো অত্যাচারী শাসকশ্রেণীকে জোরদার করে এবং বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের ভর্তুকি

দেয়। এসব প্রকল্প দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও পরিবেশের বিপক্ষে যায়। এ ডলারের বেশিরভাগ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের কাছ থেকে। প্যারেন্টি বলেন, আশির দশকে বিশ্বব্যাংক উত্তর-পশ্চিম ব্রাজিলে বনভূমি ধ্বংস করে একটি মহাসড়ক নির্মাণ করে। এরপর কয়েক লক্ষ একর বনভূমি সাফ করে দেয়া হয়, যা মূলত করা হয় ধনী ব্রাজিলিয়ান পশুখামার মালিকদের ব্যবসায়ের স্বার্থে। ১০ বছরের মধ্যে পুরো এলাকা দারিদ্র্য ও ব্যাধিতে ভরে যায়।

বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে জিম হাইটওয়ার মন্তব্য করেন, 'বিশ্বব্যাংক মাত্র ৫০ বছরে যা করেছে, পৃথিবীর সব ব্যাংক ডাকাতরা মিলে এ পর্যন্ত তার এক শতাংশের এক-দশমাংশও করতে পারেনি।'

৪. **ইচ্ছাকৃত সহিংসতা :** সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আধিপত্যের আরেকটি বড় ফলাফল হচ্ছে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে শান্তিপূর্ণভাবে উপনিবেশ বিস্তারের ঘটনা প্রায় পাওয়া যায় না। শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশ স্থাপনকারীরা নিজেদের সামরিক শক্তির জোরে অন্য কোনো দেশ ও জাতির ভৌগোলিক অবস্থান দখল করে তাদের সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্টা করে। নিশ্চিহ্ন করে তাদের কারুপণ্য ও শিল্পসমূহ। অতীতে পর্তুগিজরা অ্যাঙ্গোলায়, বেলজিয়ামরা কঙ্গোতে, জার্মানরা দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায়, ফরাসিরা উত্তর আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ও ইন্দোচীনে, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে, জাপানিরা কোরিয়ায়, মার্কিনিরা উত্তর আমেরিকায় এভাবে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে এবং এখন এ নব্য উপনিবেশবাদের সময়ও আমরা দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় এক পন্থায় আফগানিস্তান, ইরাকে আধিপত্য চালাচ্ছে। পূর্বে যেমন লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে নিধন ও দাসে পরিণত করা হয়েছে ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে ঠিক তেমনি সাম্প্রতিককালের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দরিদ্র মানুষ নব্য উপনিবেশবাদের শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে দাসত্ব করছে, ইরাকের মানুষ সরাসরি নিহত হচ্ছে।

মাইকেল প্যারেন্টি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের জন্য সন্ত্রাস এক নৈমিত্তিক অস্ত্র। মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CIA) এবং এ ধরনের সংগঠনের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যে বিভিন্ন বংশবদ রাষ্ট্রের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে গোয়েন্দাগিরি, নজরদারী, জেরা, অত্যাচার, ভীতি প্রদর্শন ও খুন করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট বেনিং-এ অবস্থিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্কুল অফ আমেরিকান (SOA)-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মার্কিন বংশবদ রাষ্ট্রগুলোর সামরিক অফিসারদের অত্যাচার চালানোর সর্বাধুনিক কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে সারা ল্যাটিন আমেরিকার জনসাধারণ এর নাম দিয়েছে, 'খুনীদের পাঠশালা' (স্কুল অফ অ্যাসাসিনস/ SOA)। এল সালভাদরের গ্রামগুলোতে হত্যাযজ্ঞ এবং নৃশংসতা চালানোর দায়ে অভিযুক্ত অধিকাংশ সামরিক অফিসার এখানে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া অস্ত্রে সজ্জিত সালভাদরের সেনাবাহিনী গণমুক্তি বাহিনীগুলো ধ্বংস করার জন্য এবং যেসব গ্রামবাসীর ঐ বাহিনীর গেরিলাদের প্রতি সমর্থন ছিল তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। মাত্র ৪০ লক্ষ মানুষের এ দেশটিতে আমেরিকার সাহায্য পুষ্ট সরকারি বাহিনী ১৯৭৮–১৯৯৪ সালের মধ্যে ৭০ হাজার সালভাদরীয়কে হত্যা করে। দেশত্যাগ করে ৫ লাখ ৪০ হাজার সালভাদরীয়।

এর প্রতিবেশী গুয়াতেমালায় সিআইএ সৃষ্ট ৩৫ বছরের যুদ্ধে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ। নিখোঁজ হয় ৬০ হাজার মানুষ। গেরিলাদের প্রতি সহানুভূতি আছে এ সন্দেহে প্রায় ৪৪০টি গ্রাম ধ্বংস করা হয়, হত্যা করা হয় এর বাসিন্দাদের। প্রায় ১০ লাখ লোক অন্য দেশে পালিয়ে যায়। ১০ লাখ মানুষ নিজেদের আবাস ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন মদদপুষ্ট সেনাবাহিনী ১৯৬৫ সালে ৫ থেকে ১০ লাখের মতো নিরীহ জনগণকে হত্যা করে। নিউইয়র্ক টাইমস ১২ মার্চ ১৯৬৬ একে 'আধুনিককালের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বর্বর গণহত্যা' নামে আখ্যায়িত করে।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে বর্তমানে যে উপনিবেশবাদ চলছে তার থাবা কত নিষ্ঠুর ও নির্মম। নিজেদের স্বার্থে গণতন্ত্রের দাবিদার রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত রাষ্ট্র এভাবেই বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন চালায়, উপনিবেশবাদের থাবা দিয়ে ধ্বংস করে দেয় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক অবস্থা।

উপনিবেশিক যুগে অন্যদেশ বিজয় বা দখল করার জন্য যেখানে সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হতো, সাম্প্রতিককালের সামরিক শক্তির প্রয়োগ তার চেয়েও বেশি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী সমরাস্ত্রের মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ সমরাস্ত্র গড়ে তোলার কথিত উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে গণতন্ত্র রক্ষা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদ বিরোধী, বৈপ্লবিক বা গণমুখী জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর বিরোধিতা করা, রাশিয়া বা কিউবার আগ্রাসন প্রতিরোধ করা নয়। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র এবং পানামায় যার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৫. **Low Intensity Conflict বা নিচু মাত্রার যুদ্ধ :** বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় এককভাবে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রচুর ব্যয় করে, যা বহন করে সে দেশের জনসাধারণ। ফলে সাম্রাজ্য স্থাপনকারী রাষ্ট্রটির জনগণ এ ব্যয় বহন করতে করতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন কোনো রাষ্ট্রে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সে দেশের ওপর জোরপূর্বক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তখন তার নিজের দেশের বহু সৈন্য হতাহত হয়। এতে সে দেশের জনগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া রাজনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এর জন্য ওয়াশিংটনের নীতি নির্ধারকরা 'নিচু মাত্রার যুদ্ধ' কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এ যুদ্ধ জনগণের চোখে পড়ে না। এটি হচ্ছে বদলিযুদ্ধ। এ যুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মার্কিন মদদপুষ্ট সরকারি বাহিনী দিয়ে যুদ্ধ চালানো হয়। এক্ষেত্রে আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাদের তাবেদার সরকারকে সামরিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দাব্যবস্থা ইত্যাদি সহায়তা দেয় এবং উদারভাবে অর্থ সাহায্য দেয়। বড় আকারে না করে এরা ছোট পরিসরে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, এদের গুপ্তঘাতক দল শহরে-গ্রামে অবাধে হত্যা করে। আইনের ফাঁক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে প্যারা মিলিশিয়া ফোর্স, যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, রাজনৈতিকভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যারা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করে তাদেরকে এ ফোর্স নির্যাতন ও হত্যা করে।

নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে রিগ্যান ও সিনিয়র বুশ প্রশাসন এক দশক ধরে যুদ্ধ চালিয়েছে। ফিলিপাইনে ২০ বছরের বেশি, কলম্বিয়ায় ৩০ বছরের বেশি যুদ্ধ চালানো হয়। এ যুদ্ধে তেমনভাবে বড় হত্যাযজ্ঞ, লড়াই বা নাটকীয় কোনো বিজয় বা বিপর্যয় না থাকায় তেমনভাবে তা নজর কাড়ে না।

৬. **গ্যাট :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর নতুন কৌশল হচ্ছে গ্যাট। বিশেষ অর্থে রাজনৈতিক এলিটদের সম্প্রতি নেয়া দুটো উদ্যোগ হচ্ছে উত্তর আমেরিকার মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (NAFTA) এবং জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড (GATT)-এর উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনা। এগুলো ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর

স্বার্থ হাসিলের জন্য জাতি রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব উপেক্ষা করার কৌশল। নাফটা ও গ্যাট দিয়ে শুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূর করা, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি বিশ্বব্যবস্থার সাথে সমন্বিত করা ও বর্ধিত বাণিজ্যের ফলে সব দেশের উপকৃত হওয়ার কথা বলা হলেও তা আসলে তৃতীয় বিশ্বের জন্য কোনো সুবিধাই বয়ে আনছে না। গ্যাট চুক্তি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা WTO নামে যে আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি করেছে তার আইনগত অবস্থা জাতিসংঘের মতো। যে কোনো দেশের সামাজিক, পরিবেশগত, ক্রেতা স্বার্থসংক্রান্ত এবং শ্রমবিষয়ক আইন খারিজ বা স্থগিত করার কর্তৃত্ব WTO-এর রয়েছে।

কিম মুডি বলেন, গ্যাটের ৫০০ পাতার বিধিমালা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিরুদ্ধে নয়, সরকারগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত। এ বিধিমালা অনুসারে স্বাক্ষরদাতা দেশগুলোকে অবশ্যই শুল্ক হার হ্রাস, কৃষিতে ভর্তুকি বন্ধ, বিদেশী কোম্পানিগুলোকে দেশীয় কোম্পানির মতো সমান সুযোগ প্রদান, কর্পোরেশনগুলোর পেটেন্ট দাবি স্বীকার এবং WTO-এর আমলাদের রায় মানতে হবে। WTO-এর নির্দেশ মোতাবেক কোনো রাষ্ট্র তার আইন পরিবর্তন করতে অস্বীকার করলে গ্যাট সে দেশের ওপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতে পারে। দুর্বল দেশগুলোকে বঞ্চিত করে গ্যাট শক্তিশালী দেশগুলোকে উপকৃত করবে এবং গরিবদের সমবায় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে রক্ষা করবে ধনীদের স্বার্থ। এজন্য কোরীয় কৃষক আত্মাহুতি দেয় যখন তাদের ভর্তুকি কমানোর কথা বলা হয়।

সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর সাম্প্রতিককালের আচরণ এবং কৌশল দেখে বোঝা যাচ্ছে, এখনো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি পায়নি। নামে কেবল স্বাধীন রাষ্ট্র কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রেই এ উপনিবেশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে আমাদেরকে। পুঁজির ধর্মই হচ্ছে বিস্তার এবং গিলে খাওয়া। পুঁজি কখনো স্থির হয়ে থাকতে পারে না। আর পুঁজিবাদী শক্তিগুলো নিজেদের পকেট আরও ভারী করার জন্য পুঁজির বিস্তার ঘটায়, তৈরি করে উপনিবেশ-অস্ত্র হিসেবে নেয় সাম্রাজ্যবাদকে। এ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে লড়াই করার বিকল্প নেই। চুপচাপ বসে থাকলে সাম্রাজ্যবাদ কিছুদিন পর আমাদের মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীকে নিঃস্ব করে দিবে, নিঃস্ব শ্রেণী আরও নিঃস্ব হবে এবং কিছু লোকের হাতে অঢেল অর্থের সমাগম হবে। যার প্রমাণ আমরা আমাদের বাংলাদেশে পেয়েছি। এ দেশে লক্ষাধিক লোক কোটিপতি এবং বাকিদের অবস্থা অর্থনৈতিকভাবে এদের অবস্থান থেকে অনেক নিচে। সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের করালগ্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে এদের কৌশলগুলো যেমন বুঝতে হবে তেমনি কিভাবে তা মোকাবিলা করা যায় তাও আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

০৭। ক. নব্য উপনিবেশবাদ (Neo-Colonialism) কি?
খ. নব্য উপনিবেশবাদের ধরন, লক্ষ্য ও শোষণের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। নব্য উপনিবেশবাদ শব্দটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিধানে সংযোজিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই। পুরাতন উপনিবেশবাদের সাথে নব্য উপনিবেশবাদের তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। নতুন উপনিবেশবাদ হলো এক ধরনের নতুন পরিস্থিতি, যেখানে নতুন কৌশলের মাধ্যমে পূর্বের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ নিজের আধিপত্য ও শোষণ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশলে শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার নব প্রয়াস। নব্য উপনিবেশবাদকে অনেকে 'নতুন পাত্রে পুরনো পানীয়' (old wine in a new bottle) বলে অভিহিত করেন।

নব্য উপনিবেশবাদ

নব্য উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত হলো 'নব্য উপনিবেশবাদ হলো পশ্চাৎগামী উপনিবেশবাদ, যা পুরনো স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য নতুন পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। বর্তমান সময়ে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, মতাদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, অর্থনীতির সামরিকীকরণ, আঞ্চলিক উপজাতীয় কোন্দল সৃষ্টি, অসমবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, বিজ্ঞান, কারিগরী ও কৃৎকৌশলগত দিক থেকে দরিদ্র দেশগুলোকে পরনির্ভরশীল করে তোলা, সন্ত্রাসবাদ ও নাশকতামূলক কাজে উৎসাহদান, কঠোর শর্ত-বিশিষ্ট ঋণদান, মুদ্রার মূল্য হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে সাবেক উপনিবেশগুলোর উপর নতুনভাবে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী B. H. Cohn এর সংজ্ঞানুযায়ী, নব্য উপনিবেশবাদ হলো একটি দেশের উপর অন্য একটি দেশের যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। ('It is simply safer way to relationship of effective domination or control political or economic direct or indirect or one nation over another.')

নব্য উপনিবেশবাদের ধরন

নব্য উপনিবেশবাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো বহুজাতিক উৎপাদন সংস্থা বা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির বাহন। এদের কর্মক্ষেত্রও আন্তর্জাতিক। এসব সংস্থা স্বদেশীয় শিল্পপতিদের অর্থাৎ যে দেশে শিল্প স্থাপন করার প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করা হবে তাদের সহযোগিতায় কাজ করে। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এসব সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করে না। তাদের জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোই বর্তমান বিশ্বে নব্যশক্তি অর্থাৎ পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ রাষ্ট্রগুলো নতুন উপায়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ চালানোর নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। এ কারণে অনেকে নব্য সাম্রাজ্যবাদকে 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ের বিষয়ই নব্য উপনিবেশবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নব্য উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মুক্তিপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ জীবন, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি প্রভৃতি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনুন্নত দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, সামরিকব্যবস্থা প্রভৃতিকে নব্য উপনিবেশবাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এর একটি হলো সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর প্রভাব বিস্তার। এর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তৃতীয় বিশ্বের এই বিশেষ শ্রেণীকে সরাসরি উৎকোচ প্রদান থেকে শুরু করে নানাপদ্ধতির সাহায্যে গ্রহণ করে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর এসব নেতৃবৃন্দ বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়। তাদের প্রদত্ত অর্থ সম্পদ ও নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নিজের ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসে নিমগ্ন হয় এবং দেশক অবনয়নের সর্বনিম্নস্তরে পৌছে দেয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমেও ঋণগ্রহীতা দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পদ্ধতি হলো আর একটি নব্য ঔপনিবেশিক অস্ত্র। যে সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে সে সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দরিদ্র অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের এসব নিয়মনীতি মানতে বাধ্য থাকে। বর্তমান বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বস্তুগত পণ্য অপেক্ষা প্রযুক্তি, তথ্য প্রভৃতি বিষয় উন্নত দেশগুলোর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব ধনী ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো এখন শুধু মূলধন রপ্তানি করে না, তারা প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, তথ্য প্রভৃতি রপ্তানি করে।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের সহানুভূতি অর্জনের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছিল। এদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে বিশ্বের জনগণের মধ্যে প্রচার ও জনমুখী করে তোলা। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সমাজতন্ত্রের গতি মন্থর করার জন্য রাজনৈতিক আসরে অবতীর্ণ হয়। যার প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ নব্য উপনিবেশবাদের জন্মকে উৎসাহিত করে।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নানাপদ্ধতি অবলম্বন করে। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো, এসব দেশে সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের চুক্তির নামে বিশেষ মতাদর্শের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

এছাড়াও সামরিক সম্ভার রপ্তানি করে এবং বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সামরিক অধিনায়কদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নয়া উপনিবেশবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামরিক ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে।

পরিবর্তিত বিশ্ব ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নতুন রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়ার পরও পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এসব নতুন রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। এভাবে পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব বজায় রাখার কারণেই নব্য উপনিবেশবাদের উত্থান ঘটে। হবসন ও লেনিন উভয়েই স্বীকার করেছেন যে সামরিক শক্তি উপনিবেশবাদের নির্ধারক নয়, মূলধনের রপ্তানিই হলো আসল নির্ধারক। উপনিবেশবাদের নির্ধারকের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে নয়া উপনিবেশবাদ দেখা দিয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, নব্য উপনিবেশবাদ নানা ধরনের জটিল পদ্ধতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রগুলোকে উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। এসব ঋণের সাথে জুড়ে দেয়া হয় নানাবিধ কঠিন ও জটিল শর্ত। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ আর্থিক সাহায্যও প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এসব ঋণ সাহায্যের বেশির ভাগই অনুৎপাদনশীল খাতে প্রদান করা হয় এবং তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো ঋণের জালে (Debttrap) আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এ ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে চরমভাবে। দেশগুলোর দুর্বল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর সুযোগ নিয়ে সাহায্যকারী দেশগুলো গ্রহীতা দেশগুলোকে ঋণ প্রদানকালে কঠিন শর্ত আরোপ করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো রাষ্ট্রীয় উন্নতির কথা চিন্তা করে শর্তের বেড়াজালে বন্দি হয়। সাম্রাজ্যবাদের ক্রিয়াকলাপ যতখানি স্পষ্টভাবে দেখা যায় নব্য উপনিবেশবাদের কার্যাবলি তত সহজে দেখা যায় না।

নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের লক্ষ্য ও বিভিন্ন পদ্ধতি

সাবেক উপনিবেশগুলোর উপর পুনরায় যেকোনো প্রকারে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা হলো নব্য উপনিবেশবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সাম্প্রতিক সময়েও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোই নব্য উপনিবেশবাদের শিকারে পরিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার পরও এ অঞ্চলগুলো নানা সমস্যার কারণে কেবল পশ্চাৎপদই থাকেনি বরং ক্রমশ অবোন্নয়নের শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, জনসংখ্যার আধিক্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নেতৃত্বের সংকট প্রভৃতি সমস্যা উন্নয়নশীল জাতিগুলোকে রাহুর মত গ্রাস করছে। এসব সমস্যার ফলাফল হিসেবে আরও বৃহৎ যেসব সংকট উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে সেগুলো হলো– অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, পুঁজির অভাব, বিজ্ঞান, কারিগরি এবং কৃৎকৌশলগত পশ্চাৎপদতা, আধুনিক শিল্পের অভাব, কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সংকট প্রভৃতি। এর ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ ও পুনরুত্থানের জন্য প্রয়োজন বিদেশী ঋণ ও পুঁজি এবং ব্যাপক পরিমাণে বিদেশী বিনিয়োগের। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের এই ব্যাপক নির্ভরশীলতা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ছিল না।

নব্য উপনিবেশবাদের কৌশল হলো অর্থনৈতিক ঋণ ও সাহায্য প্রদানের নামে দরিদ্র দেশগুলোকে স্থায়ীভাবে পরনির্ভরশীল করে শোষণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর ঋণ প্রদানের শর্ত হলো গ্রহীতা দেশগুলো তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ঋণ বা সাহায্য ব্যবহার করতে পারবে না। ফলে সত্যিকার অর্থে উৎপাদনশীল শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার, আমদানি হ্রাস, বেকারত্ব দূরীভূত করা প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোর পক্ষে সম্ভব হয় না।

দাতা দেশগুলোর দেয়া ঋণের শর্ত লঙ্ঘিত হলে ঋণ প্রত্যাহারের ভীতি প্রদর্শন করে। ঋণের জন্য একদিকে যেমন চড়া সুদ আরোপ করা হয়, তেমনি ঋণ শোধের ব্যবস্থাকেও জটিল করে দেয়। যার ফলে দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে নিয়মিত সুদ পরিশোধ করাও কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—আসল ঋণ পরিশোধের বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় সুদূরপরাহত। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কম থাকার ফলে ঋণশোধের ব্যাপারে তাদের প্রভূত হয়রানির শিকার হতে হয়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, পুঁজিবাদী দেশগুলো ঋণ ও অর্থনৈতিক সাহায্যকে তাদের পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে দাতাদেশগুলো বৈদেশিক সাহায্যের হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস, আমদানি রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তন এবং বিনিয়োগের পরিকল্পনাকেও প্রভাবিত করে। ঋণ গ্রহণকারী এসব অনুন্নত দেশ সুদ হিসেবে ঋণ দানকারী দেশের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে দেয়।

পুঁজি লগ্নী করা হলো নব্য উপনিবেশবাদের আর একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার। পুঁজি লগ্নীর একটি বিশেষত্ব হলো, যেসব ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নী করলে দরিদ্র দেশগুলোর প্রকৃত উপকার হবে, সেক্ষেত্রে লগ্নী করা হয় না। যেসব ক্ষেত্র থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলো বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারবে, সেই ক্ষেত্রেই তারা বিনিয়োগ করে।

তৃতীয় বিশ্বকে বিশ্ববাজারে নাজেহাল করা নয়া ঔপনিবেশিক চক্রান্তের আর একটি দিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম ওঠা-নামার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। অপরপক্ষে দরিদ্র দেশগুলোর রপ্তানি পণ্য-সামগ্রী মূলত কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক

এবং এসব পণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ খুবই কম। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পুঁজিবাদী দেশগুলো ঐসকল পণ্যের মূল্যমান হ্রাস করে দেয়। মূল্যমান হ্রাসের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়ের পরিমাণও অল্প। এসব কারণে দরিদ্র দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর কাছে আরো বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বর্তমানে সম্মিলিত জাতিসংঘের কার্যাবলীর সাথে যুক্ত সংস্থাগুলোও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যবস্থায় বহুজাতিক সংস্থার দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। এসব বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকা হলো নব্য উপনিবেশবাদের আর একটি মারাত্মক অস্ত্র। এককথায় বলা যায়, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বর্তমানে এসব বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন।

সাধারণভাবে বহুজাতিক সংস্থা বলতে বিভিন্ন দেশে শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত সংগঠনকেই বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে বহুজাতিক সংস্থা বলতে এমন সব সংস্থাকে বোঝায়, যারা নিজেদের উদ্বৃত্ত পুঁজি ও অকেজো প্রযুক্তি বিভিন্ন অনুন্নত দেশে স্থানান্তর করে তাদের অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সাম্প্রতিককালে ছোট বড় কয়েক হাজার বহুজাতিক কোম্পানি বিশ্বজুড়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করছে। অনুন্নত দেশগুলো এদের কাছে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীকরণ, শিল্পায়নের প্রয়োজন মিটানো এবং পুঁজির অভাব দূর করার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সাহায্য-সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বহুজাতিক সংস্থাগুলো পরিকল্পিতভাবে দরিদ্র দেশগুলোকে তাদের শোষণের কেন্দ্রে পরিণত করেছে। তাদের গৃহীত নীতির ফলে দরিদ্র দেশগুলো দরিদ্রতর হচ্ছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে ক্রমবর্ধমান হারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে যাচ্ছে। তারা নানাশর্ত আরোপ করে তৃতীয় বিশ্বের মেধাজাত সম্পত্তিকে করায়ত্ত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। ফলে অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। দরিদ্র দেশের অর্থনীতি উন্নত দেশের অর্থনৈতিক উপগ্রহে পরিণত হচ্ছে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিঃস্ব করছে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পিছনেও মদদ জোগাচ্ছে। যেসব দেশে এসব বহুজাতিক সংস্থা কর্মরত, স্বাভাবিকভাবেই সে সকল দেশে তারা নিজেদের অনুকূলের সরকার চাইবে। বহুজাতিক সংস্থার সমর্থিত ও অনুকূলের সরকার ক্ষমতাসীন থাকলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করা যাবে। বহু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থা হস্তক্ষেপ করেছে, তার নজির বিরল নয়। লগ্নীকৃত দেশের ক্ষমতাশীল সরকারের প্রতি বিরূপতা পোষণকারী রাজনৈতিক দল, আমলা ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে গণতান্ত্রিক ও জনসমর্থিত সরকারকে পতনের উদ্যোগও বহুক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলো গ্রহণ করেছে।

সামরিক জোট গঠন ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়। নব্য স্বাধীন দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী ধনবান রাষ্ট্রগুলো কখনও ভীতি প্রদর্শন বা কখনও প্রলোভন দেখিয়ে সামরিক জোট বা চুক্তির আওতাভুক্ত করতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত ন্যাটো, শিয়াটো, সেন্টো বা বাগদাদ চুক্তি নব্য উপনিবেশবাদের উদ্যোগে সম্পাদিত হয়েছে।

নব্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো দ্বারা গঠিত জোট শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনাই সৃষ্টি করেনি, ঐ সকল জোটের সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থের দ্বারা সামরিক জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলো ঔপনেবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে প্রতিরোধ ও দমনের জন্যও ব্যবহার করেছে।

সামরিক দিক থেকে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো সামরিক জোট গঠনের প্রধান লক্ষ্য। এ ছাড়া যে সকল রাষ্ট্রে বিদেশী সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকে, সেসব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকে। ফলে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিছক প্রহসনে পরিণত হয়।

নব্য ঔপনিবেশিকতার আর একটি সর্বজনবিদিত পদ্ধতি হলো সামরিক ঘাঁটি স্থাপন। এ সকল সামরিক ঘাঁটি যে কেবলমাত্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা নয়। অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রেরও এরূপ সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্ব রয়েছে এবং পূর্বেও ছিল। গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সে অবস্থিত ন্যাটোর ঘাঁটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাশিং ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ করে ইউরোপে ভীতির সঞ্চার করেছিল।

দুর্বল দেশগুলোতে ক্রীড়নক পুতুল সরকার গঠনের সহায়তা করে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রয়াস পায়। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, নামিবিয়া, এলসালভাদর, হন্ডুরাস, ফিলিপাইন ইত্যাদি রাষ্ট্রে পুতুল সরকার গঠন করে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজেদের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এ ছাড়া ঔপনিবেশিক নব্য শক্তিগুলো কোনো রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকারের পতন ঘটান, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কাজে উস্কানি দেয়া, সামরিক অভ্যুত্থানে মদদ জোগানো এবং কখনও কখনও সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন সরকার অ্যাঙ্গোলার সরকার বিরোধীদের হাতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আফগানিস্তানে সরকার বিরোধীদের অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে। চিলিতে আলেন্দে সরকারের পতনের জন্য সিআইএ'র ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়।

নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি নিজের স্বার্থ কায়েম ও রক্ষার জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল অবলম্বন করে। নব্য উপনিবেশ শক্তি অন্য দেশের শিক্ষা জগতে অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণা সম্বলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকে। তাদের এ কৌশলকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে নানা সংস্থা ও তহবিল গঠন করে। নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি কোনো দেশের সুস্থ, সুচিন্তিত, গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করে অসুস্থ প্রতিক্রিয়াশীল, অশালীন সাংস্কৃতিক মানসিকতা সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জোগায়। বর্তমান বাংলাদেশে ডিশ এন্টিনা কালচার এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনার মাধ্যমে একথা অনুধাবন করা যায় যে, নব্য ঔপনিবেশিকতা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেনি, উপরন্তু বিশ্বশক্তি ও নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করেছে চরমভাবে। ঔপনিবেশিকতা-নব্য ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতা যতদিন বজায় থাকবে ততদিন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উত্তেজনা প্রশমিত হবে না। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা নব্য ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ ও আধুনিকতম রূপ হলো নব্য উপনিবেশবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার পর বিশ্বে পুনরায় নতুন কৌশলে যে সাম্রাজ্যবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকেই নব্য উপনিবেশবাদ হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। নব্য উপনিবেশবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা।

০৮ ▌ ক. উত্তর আধুনিকতাবাদ কি?

খ. উত্তর আধুনিকতাবাদ (Post-modernism)-এর চরিত্র ও লক্ষণ আলোচনা করুন।

উত্তর : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আধুনিক যুগের সূচনা হলেও ১৯১০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত উত্তর-আধুনিকতার সূচনাপর্ব। উত্তর আধুনিকতাবাদ (Post-modernism) আধুনিকতাবাদবিরোধী একটি দার্শনিক আন্দোলনের নাম। বস্তুত উত্তর-আধুনিকতার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই। ইতোমধ্যে 'পোস্টমর্ডার্ন কন্ডিশন', 'রিঅ্যাকশনারী পোস্টমর্ডার্নিজম' এবং 'কনজ্যুমার পোস্টমডার্নিজম' ইত্যাদি বিবিধ ধারার অভ্যুদয়ে অবস্থাটি ঘোলাটে হয়ে পড়েছে।

উত্তর আধুনিকতা

উত্তর আধুনিকতা বলতে বোঝায় সেই অবক্ষয় বা স্বেচ্ছাচারিতা থেকে উত্তরণের প্রয়াসকে যে অবক্ষয় বা স্বেচ্ছাচারিতা দোর্দণ্ড প্রতাপবান আধুনিকতার মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে। উত্তর আধুনিকদের মতে, মানুষ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আধুনিকতার কারণে। দৃষ্টান্তবাদীরা মনে করেন, অবক্ষয় বিভিন্ন কারণে আসতে পারে কিন্তু এর জন্য শুধু আধুনিকতা দায়ী নয় কারণ যুক্তিবাদিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতাবাদ বিশ্বে কল্যাণকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

ফ্রেডারিক নীটসে, জ্যাক দেরিদা (Jacques Derrida), মিশেল ফুকু (Michel Foucault 1926–1984), Fredric Jameson (1934), Douglas (1930–2004), Jean Francois Lyotard (1924 – 1998), লিওতার্দ, Martin Heidegger (1889 – 1984), Richard Rorty (1931 – 2007), Jean Baudrillard (1929 – 2007) প্রমুখ দার্শনিকগণ আধুনিকতাকে অস্বীকার করে উত্তর আধুনিক ধারণার প্রবর্তন করেন। একটি পদ হিসেবে আধুনিক বা modern শব্দটি আবির্ভূত হয় ১৬ শতকের শেষ ভাগে। আধুনিক কথাটির ব্যবহার ব্যাপক এবং এর অর্থ আপেক্ষিক। সাধারণভাবে 'সাম্প্রতিক' বা 'সমসাময়িক' অর্থেই এর ব্যবহার। আবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানা অর্থেও শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ ধারা বা যুগকে চিহ্নিত করার জন্যই এই শব্দটির ব্যবহার সমধিক। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকের শুরুকেই আধুনিকতার সূচনা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসময় থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের যাত্রা শুরু এবং সমৃদ্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা। এই সময় থেকে ইংরেজি ও মার্কিন সাহিত্য নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। বাংলা সাহিত্যে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আধুনিক যুগের বা কালের গণনা হয়ে থাকে। রেমন্ড উইলিয়ামস একজন মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক তিনি তার 'Key Words : A Vocubulary of Culture and Society' গ্রন্থে বলেছেন, modern শব্দটি যখন উদ্ভূত হলো তখন এটি বোঝাত 'বর্তমান'কে। আধুনিকতাবাদী চিন্তকদের মতে আধুনিকতাবাদ বা Modernism হচ্ছে একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও একটি মনোভঙ্গি। উত্তর-আধুনিকতাবাদও একই সাথে একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি মনোভঙ্গি। বিশ শতকের আশির দশকের

মাঝামাঝি সময়ে একাডেমিক গবেষণার পরিসরে উত্তর আধুনিকতাবাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আধুনিকতাবাদ একটি নান্দনিক আন্দোলন (aesthetic movement)। ১৯১০-১৯৩০ পর্যন্ত সময়কে period of 'high modernism' বলা হয়। উত্তর আধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদের প্রায় সকল ধারণাকেই অনুসরণ করে। উত্তর-আধুনিকতার অভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ বছর হলো ১৯৬৮ সাল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসেছিল আধুনিকতার চিন্তাভাবনা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবাদ বা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশই ছিল এর কেন্দ্রবিন্দু।

উত্তর-আধুনিকতার চরিত্র ও লক্ষণ

উত্তর-আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহের বিনিঃশেষ কোনো তালিকা নেই। ফলে কোনো উত্তর-আধুনিক বিষয় বা আশায় সবগুলো লক্ষণের উপস্থিতি আশা করা যায় না। উত্তর-আধুনিকতার একটি অন্যতম লক্ষণ অনাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো কিছুকে ধ্রুব বা আদর্শ জেনে বা শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তর-আধুনিক লেখক কলম তুলে নেন না। এর বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট প্রকরণ কাঠামোকে আশ্রয় করে শিল্পসৃষ্টির অভিলাষই আধুনিকতার পরম বৈশিষ্ট্য। এভাবে উত্তর-আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার তুলনামূলক লক্ষণসমূহ চিনে নেয়া হলে সাহিত্য বিচারের কৌশলটি আরেকটু সহজ হয়ে আসে। আধুনিকতার লক্ষণের প্রতিপৃষ্ঠে উত্তর-আধুনিকতার তুলনামূলক লক্ষণসমূহ নিম্নোক্তভাবে সূত্রাবদ্ধ করা যায়।

আধুনিকতা	উত্তর-আধুনিকতা
রোমান্টিসিজম/প্রতীকধর্মিতা	প্যাটাফিজিক্স/ডাডাইজম
ফর্ম (কাঠামোর চক্রাবদ্ধতা)	এ্যান্টিফর্ম (চক্রহীনতা, উন্মুক্তি)
উদ্দেশ্য নির্ভরতা	ক্রীড়াময়তা
শ্রেণীলগ্নতা	নৈরাজ্য
যুক্তির শাসন	নিস্পন্দন, নীরবতা
ফলাফলপ্রধান, শিল্প সৃষ্টি	প্রক্রিয়াপ্রধান
দূরত্ব	অংশগ্রহণ
সৃজন/সমগ্রায়ন	অবনির্মাণ/বিনির্মাণ
সমন্বয়	বিরোধাভাস
উপস্থিতি	অনুপস্থিতি
প্রকরণ/সীমা	বয়ান/অন্তর্বয়ান
নির্বাচন	একত্রায়ন
ব্যাখ্যা/পাঠ	অ-ব্যাখ্যা/ভুল পাঠ
দ্যোতিত	দ্যোতক
লক্ষণ	বাসনা
প্যারানইয়া	সিজোফ্রেনিয়া
পিতা, ঈশ্বর	পবিত্র ভূত (পবিত্র আত্মা)
অধিবিদ্যা	আয়রনি
সিদ্ধান্ত, মীমাংসা	অমীমাংসা

এ থেকে উত্তর-আধুনিকতার নিটোল একটি ধারণা পাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। তবে এই প্রতিতুলনা থেকে উত্তর-আধুনিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, যার সাহায্যে শিল্প-সাহিত্যে উত্তর-আধুনিকতার লক্ষণবিচার সম্ভব। এই তালিকা হাতে নিয়ে জীবনানন্দের কব্যে উত্তর-আধুনিকতার লক্ষণসমূহ খুঁজে বের করা একটি কৌতূহলোদ্দীপক অনুশীলন হতে পারে। আমরা লক্ষ্য করি, জীবনানন্দ কবিতাকে নির্দিষ্ট কাঠামোর আবদ্ধতা, অর্থময়তা, উদ্দেশ্য-নির্ভরতা, নির্মাণের দায়, ব্যাখ্যাসমৃদ্ধির দাবি, যুক্তির শাসন, সমন্বয় প্রভৃতি থেকে সফলভাবে মুক্ত।

উত্তর আধুনিকতাবাদ সমকালীন চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি শব্দ ও একটি বহু বিতর্কিত অভিধা। স্তুতি, নিন্দা, সমর্থন, অসমর্থন নির্বিশেষে উত্তর-আধুনিকতাবাদ একটি বিপুল আলোচিত-সমালোচিত বির্তকিত একাডেমিক প্রপঞ্চ।

আধুনিকতার অসমাপ্ততা কিংবা অসম্পূর্ণতার ভিত্তিমূলে প্রোথিত এই উত্তরাধুনিক ভাবনার। উত্তর আধুনিকতাবাদ একটি অনিয়তাকার শব্দ। আধুনিকতার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তর আধুনিকতাকে ধরা যায়। সাধারণত বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তর আধুনিকতাকে অভিহিত করা যায়। সাধারণত উত্তর আধুনিকতা বলতে ভাবনার জগতের সেই সকল পরিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রবণতাকে বোঝায় যেগুলো সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, স্থাপত্য, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে উদ্ভূত হয়েছিল।

উত্তর আধুনিকতাবাদের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র হলো সাহিত্য, শিল্পকলা ও দর্শন। সাহিত্যে উত্তর আধুনিকতাবাদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। মিশেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাইদ, নোয়াম চমস্কির অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগ পেরিয়ে উত্তর আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে। ভিন্নমত পোষণকারীরা মর্মগত নৈরাশ্যবোধ থেকেই এই উত্তর আধুনিক যুগ চেতনার উদ্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন।

উত্তর-আধুনিকতা 'উত্তর' ও Post-এর পার্থক্য হিসেবে বলা হয় উত্তর আধুনিকতা ও Postmodernism এক কথা নয়। 'আধুনিকতা'র আগে 'উত্তর' প্রয়োগ দ্বারা তারা 'আধুনিকতা-উত্তীর্ণ' হওয়াকে বোঝাচ্ছেন। পাশ্চাত্যে কিন্তু Postmodernism দ্বারা তা বোঝানো হয়নি। তারা Modernism-এর আগে Post ব্যবহার করে কালগতভাবে Modernism-এর পরবর্তী ধাপকে বুঝিয়েছেন। উত্তর আধুনিকতা বলতে বুঝায় সেই অবক্ষয় বা স্বেচ্ছাচারিতা থেকে উত্তরণের প্রয়াসকে, যে অবক্ষয় বা স্বেচ্ছাচারিতা দোর্দণ্ড প্রতাপবান আধুনিকতার আস্তাকুঁড়ে জন্মলাভ করেছে। উত্তর-আধুনিকদের মতে, আমরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আধুনিকতার কারণে। অবশ্য কোনো কোনো মহল, যেমন দৃষ্টান্তবাদীরা, এমন কিছু মনে করেন না। তাদের মতে, অভয় বিভিন্ন কারণে আসতে পারে, কিন্তু এর জন্য কেবল আধুনিকতাকে দোষারোপ করা যায় না। যদি করা হয়, তবে পরোক্ষভাবে যুক্তিবাদিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদির মতো আধুনিক আলোককে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলা হয়। উত্তর আধুনিকরা আধুনিক-পূর্ব সময়ের মিথ, উপকথা, লোকবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, কৃষ্ণ, হাছন, লালন ইত্যাদিকে সামনে রেখে পুনর্চচায় ব্রতী হতে সবাইকে আহ্বান করে, যা আধুনিকতা এবং উত্তর-আধুনিকতার দ্বন্দ্ব অবসানে ভূমিকা রাখবে।

০৯। ২০৫০ সাল নাগাদ কিরূপ একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : অতীতে বিশ্ব রাজনীতির ধারাগুলো যারা পর্যবেক্ষণ করতেন তারা অবাক হয়ে যেতেন এটা দেখে যে, কিভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা সম্পূর্ণ ওলট-পালট হয়ে যেত। উনবিংশ শতাব্দী এবং তারও আগে হঠকারী ইউরোপীয় শক্তি যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রুশিয়া এসব দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ ছিল একেবারেই রহস্যময় (unpredictable)। ফলে যুদ্ধ কখন লাগবে, কখনইবা তা থামবে তা বোঝার উপায় ছিল না। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল, তার পরিণতি মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ হতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। ১৯৯০ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে দ্বিমেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা (Bipolar World Order) সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। এরপর দুই দশক চলে গেলেও নতুন করে কোনো বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বিশ্বব্যবস্থা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রের বিন্যাস, তাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রক্রিয়া। ২০৫০ সাল নাগাদ যে দেশগুলো বিশ্বে ক্ষমতা চর্চা করবে তাদের সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **যুক্তরাষ্ট্র :** আজকের বিশ্বে অপরাপর শক্তির তুলনায় সামরিক শক্তির দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা অগ্রগামী হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারে তার প্রভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। পরাশক্তি রাষ্ট্র (Super Power) বলতে যা বোঝায় তার সব গুণই যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। দেশটির ৩২ কোটি ২৬ লাখ জনগণ এক বিশাল জনসম্পদ। পশ্চিম পাশে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বপ্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে বন্ধুদেশ কানাডা, দক্ষিণে লিটল সিস্টার মেক্সিকো দ্বারা ঘেরা এই বিশাল দেশটি ভূ-রাজনৈতিকভাবে (Geopolitical) সৌভাগ্যবান রাষ্ট্র। এর প্রযুক্তি এত উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, সামান্য সামান্য বস্তু থেকে শুরু করে সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার, উড়োজাহাজ, মিসাইল, আণবিক বোমা, সাবমেরিন সে নিজেই তৈরি করে। দুনিয়ার আর কোনো দেশ এত বেশি খাদ্য উৎপাদন করে না। এদের এত বেশি টাকা যে মাটির নিচের সম্পদসমূহ ভবিষ্যতের জন্য লুকিয়ে রেখে বিদেশ থেকে কিনে আনে। দেশটিতে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যা নেই। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহ সুদৃঢ়। এ সবই একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এর সামরিক শক্তি বাকি বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম। এর বিমানশক্তির সমকক্ষ হওয়া অন্য কোনো দেশের পক্ষে অনেক সময় সাপেক্ষ। এর অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি জাপানের চেয়ে বেশি। সম্পদ বৃহৎ অর্থনীতি চীনের চেয়ে বেশি। এমন একটি দেশ যে গোটা একবিংশ শতাব্দী ধরে বিশ্বজুড়ে তার রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। কাজেই ২০৫০ সাল নাগাদ যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে তাতে সমমনা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হিসেবেই থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবার অন্যান্য শক্তিধর দেশগুলোর দিকে তাকানো যাক। ২০৫০ সাল নাগাদ যেসব রাষ্ট্র বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারে তারা হলো চীন, রাশিয়া, ভারত, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

২. **চীন :** রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ২০৫০ সালে যে দেশটিকে দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন সেটি হলো গণচীন। আর চীনের সে সম্ভাবনাও রয়েছে। আগামী পঞ্চাশ বছরের সম্ভাব্য বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে চীনের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি। এর রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রায় সবাই ন্যূনতম শিক্ষিত। দেশটির আয়তন বিশাল এবং ভূরাজনৈতিক অবস্থান একেবারে খারাপ নয়। এর সেনাবাহিনী বিশ্বের বৃহত্তম এবং মিসাইল শক্তি অত্যন্ত উন্নত। তবে

এর বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে। প্রধান সমস্যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্ববিরোধিতা। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদারীকরণ করলেও কমিউনিস্ট চীন কোনো রকম রাজনৈতিক সংস্কারের বিরোধী। অর্থনীতি এবং রাজনীতির ভিন্নমুখিতা চীন কিভাবে মোকাবিলা করে তা দেখার বিষয়। যদি বর্তমান অবস্থা চালিয়ে নিতে পারে এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয় তবে ভয়ের কিছু নেই। এরপর রয়েছে তাইওয়ান সমস্যা। চীন তাইওয়ানকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র তাইওয়ানও চীনকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। অর্থাৎ দু পক্ষই নীতিগতভাবে মনে করে যে, চীন এবং তাইওয়ান একই রাষ্ট্র। সমস্যা হলো এই যে, মূল ভূ-খণ্ডের কমিউনিস্ট সরকার মনে করে সেই অভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার হবে কমিউনিস্ট এবং তাইওয়ান চায় সেই অভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার হোক গণতান্ত্রিক। চীন তার তাইওয়ান সমস্যা যদি সামরিক ব্যবস্থা এড়িয়ে সমাধান করতে পারে তবে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের অবস্থান পোক্ত হবে। এছাড়াও চীনের কিছু অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যা রয়েছে।

৩. **ভারত :** ২০৫০ সালের বিশ্বে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চায়। জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে ভারতের স্থান বিশ্বে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং সপ্তম। এর অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু ভারতের কার্যকর বৃহৎ শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তেমন পোক্ত নয়। তাছাড়া দেশটি নানান বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যায় জর্জরিত।

৪. **রাশিয়া :** তবে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ রাশিয়া সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা দুরূহ। বিশ্বযুদ্ধে লড়ার মতো অস্ত্র তৈরি করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের আর কোনো দেশ রাশিয়ার মতো পারঙ্গম নয়। কিন্তু রাশিয়া চেচনিয়ার গৃহযুদ্ধে দারুণ মার খেয়েছে। গণতন্ত্র চালু হলেও সম্পূর্ণ রাশিয়াই এখন কালো টাকার মালিক, পশ্চিমা ব্যবসায়িক গোষ্ঠী আর আঞ্চলিক প্রভুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ছোটখাট বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যা দ্বারাও দেশটি আক্রান্ত। এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে পারলে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়া হবে অত্যন্ত ক্ষমতাধর একটি রাষ্ট্র।

৫. **জাপান :** ২০৫০ সালের বিশ্বব্যবস্থায় জাপানের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। জাপান বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি। তবে মনে হয় ততোদিন যাবৎ সে তার নিরাপত্তার ভার যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে টাকা বানানোয় মনোনিবেশ অব্যাহত রাখবে। এর অন্যথা হলে অর্থাৎ জাপান যদি তার প্রতিরক্ষার জন্য গোলাবারুদ তৈরি করতে শুরু করে তবে বিশ্বরাজনীতির চেহারাই পাল্টে যাবে। তবে সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

৬. **জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স তথা ইইউ :** ২০৫০ সালের বিশ্বে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের অবস্থান একসাথেই আলোচনা করা অধিক যুক্তিযুক্ত। দেশ তিনটি বর্তমানে বিশ্বের যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি। ফ্রান্স আর যুক্তরাজ্য সামরিক দিক থেকে খুব বলীয়ান। কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্বে এসব শক্তিশালী দেশ এককভাবে অন্য কোনো শক্তি বা শক্তি জোটের সাথে বা পরস্পরের মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা শুরু করবে বলে মনে হয় না। এসব দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়নই এককভাবে একবিংশ শতাব্দীর এক বিশাল শক্তিকেন্দ্র। এর সামগ্রিক অর্থনৈতিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কিছুটা বেশি। কিন্তু সামগ্রিক সামরিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কম। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক হবে ২০৫০ সালের বিশ্ব ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক। এই সম্পর্ক আগের মতো উষ্ণ নয়। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না যে, এই সম্পর্ক কখনো সংঘাতের পর্যায়ে গড়াবে।

শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক : ২০৫০ সালে বিভিন্ন শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কেমন থাকবে। এক্ষেত্রে ন্যাটোর কথা সবার আগে বলা দরকার। ন্যাটো বর্তমান বিশ্বের একমাত্র সামরিক জোট। যুক্তরাষ্ট্র চাইবে এই জোটের মাধ্যমে তার সাথে তার ইউরোপীয় মিত্রদের, যাদের রাজনৈতিক আদর্শ একই অর্থাৎ গণতন্ত্র এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখতে। ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠ হতে থাকবে। চীন ও রাশিয়া হয় জোট বাঁধবে নতুবা গণতান্ত্রিক রাশিয়া শক্তিশালী চীনের মোকাবিলা করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে। পশ্চিমা বিশ্লেষকদের মতে, ২০৫০ সালের বিশ্বব্যবস্থাকে সবচেয়ে যা বেশি অস্থিতিশীল করতে পারে তা হলো বিশ্বব্যাপী ইসলামী মৌলবাদের আবির্ভাব। তবে তারাও বিশ্বাস করেন না যে, এই শক্তির প্রভাবে বড় কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হবে। বর্তমান বিশ্বে যেসব সমস্যা রয়েছে যেমন– আফ্রিকার জাতিগত দ্বন্দ্ব, ইসরাইল-ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদি মিটে যাবে। ভারত, চীনের মতো অস্থিতিশীল শক্তিগুলো যে ২০৫০ সাল নাগাদ খণ্ড-খণ্ড হয়ে যাবে সেই সম্ভাবনাও কম।

এ যাবৎ সব বিশ্বব্যবস্থারই নিয়ামক ছিল রাজনীতি। কিন্তু ২০৫০ সালের বিশ্বব্যবস্থার নিয়ামক হবে অর্থনীতি আর গণতন্ত্র। সেখানে চীন হবে সবচেয়ে শক্তিধর, কিন্তু বিশ্ব তখন এককেন্দ্রিক থাকবে না। কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে চীনের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়ে যাবে এবং তাদের নিজস্ব সামরিক প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অনুপম প্রভাবকে ম্লান করবে। মোটকথা ২০৫০ সালের বিশ্ব হবে অনেক বেশি শান্তিময়, যেখানে রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার (Political world order) মতো সামরিক গন্ধযুক্ত শব্দগুচ্ছ তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

০৯। ক. নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New International Economic Order) বলতে কি বুঝেন?
খ. নব্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপাদানগুলো কি কি?
গ. এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী সংগঠনগুলোর বর্ণনা দিন।

উত্তর : পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় শিল্প বিকাশ, অর্থনৈতিক কাঠামো, গণতান্ত্রিক চর্চা, বাণিজ্যিক বিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে যোজন যোজন পার্থক্য। অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং ধনী-দরিদ্র ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ সভায় New International Economic Order বা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা নামে একটি পরিকল্পনা পাস হয়। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো একটি সুষম বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। নতুন এ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা ব্যাপক আলোচিত ও বিতর্কের দাবি রাখে। মূলত বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর প্রত্যাশা ধনী ও দরিদ্র দেশসমূহের মাঝে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং এটি নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব বলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ধারণা।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিকল্পিত নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ধনী-দরিদ্র ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত সময় উন্নয়ন দশক হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করে। স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ৬ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানো এবং উন্নত দেশগুলোকে মোট জাতীয় উৎপাদনের ১ শতাংশ সম্পদ দিয়ে সাহায্য করার কথা বলা হয়। শর্তহীনভাবে এবং কোনো

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য না রেখে যথাসম্ভব বেশি সাহায্য দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। ১৯৭৪ সালে পাস হয় নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নামক পরিকল্পনাটি। কিন্তু পুঁজির মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থামেনি। অধিকন্তু পুঁজিবাজারে এক অঘোষিত সংঘাত চলছে ধনী-দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে। অর্থনৈতিক বহুকেন্দ্রিকতার মধ্যে আচ্ছন্ন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদান

১. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন করা নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধানতম উপাদান।

২. প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় অর্থনীতির অস্তিত্বের প্রশ্নে বহুজাতিক সংস্থার পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার কর্তৃত্ব অনুন্নত তথা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের থাকতে হবে। সার্বিক উন্নয়নের জন্য বহুজাতিক সংস্থাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও স্ব স্ব স্বাগতিক দেশসমূহের থাকতে হবে এবং সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ ভার বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন বহুজাতিক সংস্থার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ কিছু নিয়মাবলি। কারণ উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ তাদের বহুজাতিক সংস্থার সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য অনুন্নত দেশসমূহের স্বার্থের তোয়াক্কা একেবারেই করে না।

৩. অনুন্নত দেশসমূহ ভৌগোলিক অর্থের স্বাধীনতা অর্জন করলেও স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল তথা স্বীয় সম্পদের উপর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করতে পারেনি। এখানে একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এই কিছুকাল পূর্বেও মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ যে সেক্টর হতে অর্থাৎ তেল ক্ষেত্র হতে আসে তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুবা ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণভার ছিল। ফলে ঐ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ পূর্ণ স্বাধীনতাসহ অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি। তাই নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান দাবি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের সম্পদের উপর পূর্ণ স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর IMF,World Bank ইত্যাদি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান উন্নত রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থই সংরক্ষণ করে থাকে। ফলে অনুন্নত দেশসমূহের স্বার্থ হয় উপেক্ষিত। এখানে উল্লেখ্য বিশ্ব ব্যাংক এবং IMF প্রতিষ্ঠান দুটিতে মার্কিন স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছে বারবার। এছাড়াও এ সমস্ত সংস্থায় ভোট প্রদানের সিস্টেম উন্নত দেশের স্বার্থের অনুকূলে। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের স্বার্থে এ সমস্ত উল্লিখিত সংস্থাসমূহের আমূল সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

৫. অনুন্নত দেশসমূহের দাবি এ যে, WTO-এর কিছু কিছু ধারা পরিবর্তন করতে হবে কেননা প্রচলিত ধারার বলে অনুন্নত বিশ্বের পণ্যসমূহ উন্নত দেশে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের পোশাকসমূহ WTO-এর আরোপিত শর্তের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষমতা কিছুটা হলেও হারিয়ে ফেলেছে। তাই WTO-এর নানাবিধ ধারা পরিবর্তন করে উন্নত বিশ্বের বাজারে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পণ্যের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬. উন্নত রাষ্ট্র থেকে অনুন্নত রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির রপ্তানির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এ সম্পর্কিত কঠোর শর্তসমূহ সহজতর করা। অনুন্নত দেশসমূহের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নত প্রযুক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উন্নত দেশসমূহ

বিভিন্ন কঠোর শর্তে বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করে থাকে। তাছাড়া, উচ্চ সুদসহ অপর্যাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে পিছিয়ে দেয়। এজন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য সহজ শর্তে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. অনুন্নত দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের সুষম ও বাস্তবমুখী বাজারজাতকরণের জন্য সমন্বিত পণ্য কর্মসূচি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে অনুন্নত বিশ্বে উৎপাদিত দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

৮. বাস্তবিক অপ্রতুল সম্পদ নিয়ে উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নতি সুদূরপরাহত। কোনো এক সময় আজকের পিছিয়ে পড়া অনুন্নত দেশসমূহ পূর্বে সম্পদশালী ছিল। তাদের সম্পদ নিয়েই আজকের উন্নত দেশসমূহ এত বেশি সম্পদশালী। এ কারণেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে উন্নত দেশসমূহের জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ উন্নয়নশীল দেশের জন্য বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৯. উন্নত দেশসমূহের লাগসই প্রযুক্তিসমূহ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্তভাবে উন্নয়নশীল দেশে বিস্তারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া অনুন্নত দেশে স্থানীয় প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করবে।

নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী সংগঠন

নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যে সকল সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাদের সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো :

বিশ্বব্যাংক (World Bank) : ১৯৪৪ এর জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস শহরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে অর্থ সাহায্য, বিশ্বের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতির হাল ধরতে, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সমতা আনতে, সর্বোপরি ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্য সমবেত সাহায্যের জন্য এক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক গঠিত হয়। ১৯৪৬ এর ২৫ জুন এ ব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক রূপরেখা তৈরির জন্য এই অর্থনৈতিক সম্মেলন থেকে দুটি মুখ্য অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় :

ক. পুনর্গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development বা IBRD) যাকে বিশ্ব ব্যাংক বলেও ডাকা হয় এবং

খ. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (international Monetary Fund বা IMF)

৫টি অঙ্গ সংগঠন নিয়ে বিশ্বব্যাংক গঠিত। এগুলো হলো : আইবিআরডি, আইডিএ, মিগা, আইএফসি ও আইসিএস আইডি।

কার্যক্রম : বিশ্বব্যাংক অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ করে যোগাযোগ, পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ কাঠামোগত উন্নয়নে অর্থ প্রদান করে থাকে।

আইএমএফ (IMF) : আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস শহরে। তবে আইএমএফ এর আর্থিক কাজকর্ম শুরু হয় ১ মার্চ ১৯৪৭ থেকে। আইএমএফ কোনো দাতা সংস্থা বা উন্নয়ন ব্যাংক নয় কিংবা কোনো বিশ্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়, এটা একটি বহুদেশীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। আইএমএফ এর মূল উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় সহযোগিতার পথ প্রথস্ত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। বিনিময় হার স্থিতিশীল ও সুসংহত করা এবং মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক অবমূল্যায়নের প্রবণতা রোধ করা। সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বহুজাতিকভিত্তিক

লেনদেন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সহায়তা প্রদান এবং বিশ্ব বাণিজ্য প্রসারের পথে অন্তরায় দূর করার লক্ষ্যে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা। সদস্য দেশগুলোর ফরেন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্যাবলি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা করে তা উত্তরণের জন্য শলা-পরামর্শ দিয়ে থাকে যাতে করে তারা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাবলীল প্রবাহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিনিময় হার সমন্বয় করার আয়োজন করে।

কার্যক্রম : প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আইএমএফ যে দেশে কাজ করে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলে। আইএমএফ (IMF) তার সদস্য দেশ, যাদের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে তাদের ঋণদান করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশসমূহ ১৯৫৭ সালে রোম চুক্তি অনুযায়ী EEC গঠন করে। ১৯৯২ সালে ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে এ সংস্থার নামকরণ করা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এটিই সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট। জোটের সদস্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই ইইউ গঠন করা হয়। জোটের অর্থনৈতিক গতিধারাকে একটি সমষ্টিগত রূপ প্রদানের জন্য ইইউ একক মুদ্রা ইউরো চালু করে ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি। মূলত নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চেহারার সবচাইতে আধুনিক এবং সমন্বিত রূপ হলো ইউরো। ইউরো চালু হওয়ার পর থেকেই পুঁজিবাজারে ডলার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছে। ইউরো ইইউকে একটি একক শক্তিশালী অর্থনৈতিক চেহারা দিয়েছে। বর্তমানে ইইউভুক্ত দেশের সংখ্যা ২৮টি। বিশ্ব জিডিপির ১৫ শতাংশ বর্তমানে ইইউ এর অন্তর্গত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর অবদান ২০ শতাংশ। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা পরিচালনাকারী একমাত্র সংস্থা। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস সম্মেলনে তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ প্রথম দুটি সংস্থা কার্যকর হয়। মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি না পাওয়াতে ITO কার্যকর হয়নি। এর পরিবর্তে মাত্র ২৩টি দেশের স্বাক্ষরে ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি GATT কার্যকর হয়, যা পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) হিসেবে রূপ লাভ করে। একটি সার্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসার ও উদারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির আলোকে বহুজাতিক এবং অনেক চুক্তির মূর্ত প্রকাশ হিসেবে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) আত্মপ্রকাশ করে। সদস্য দেশসমূহের সাধারণ জনগণের কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে মুক্ত ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বহুজাতিক উদার বাণিজ্য ব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয়। এটা এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে যৌথভাবে যুক্তি-তর্ক, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করাই হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল লক্ষ্য।

ডি-৮ : তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়া ওআইসির এই ৮টি দেশ মিলে (১৯৯৭ সালের ১৫ জুন) ডি-৮ গঠন করে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এর সদর দপ্তর। ওআইসির ৮টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে 'ডি-৮ গঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা জোরদার করা।

খ. ৮টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

গ. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

ঘ. আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতাভিত্তিক নীতি গ্রহণ।

উত্তর আমেরিকা অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (NAFTA) : মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে বেশ কিছুদিন যাবত তিক্ত বিতর্কের পর ১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে নাফটা গৃহীত হয়। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটে বিশ্বের বৃহত্তম অবাধ আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটের। এই চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্পর্কিত সহযোগিতা। নাফটা চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে প্রায় ১৫ বছরেরও অধিককাল পরে বাণিজ্যের অন্তরায় দূর হয়। এ চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য :

ক. বাণিজ্য প্রসার লাভ করবে;

খ. কর্মের সংস্থান হবে;

গ. বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হবে ও

ঘ. মেক্সিকোর শ্রমিকদের যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে।

সাফটা (SAFTA) : সাফটা হলো দক্ষিণ এশিয়ার অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল (South Asian Free Trade Area)। সাফটাতে (SAFTA) আংশিকভাবে বাণিজ্য শুল্ককে রেহাই দেবার কথা বলা হয়েছে। সাফটাতে বাণিজ্য পণ্য পুরোপুরিভাবে শুল্ক ছাড়ের আওতায় পড়বে। এখানে কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রেই শুল্কের বিধিনিষেধ কার্যকর হবে না। সাফটার সদস্য-৮টি। ২০০৬টি সালের ১ জুলাই থেকে সাফটা কার্যকর হলেও পুরোপুরি অবাধ বাণিজ্য চালু হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ২০১৫ সালের মধ্যে।

গ্রুপ-৭৭ : ১৯৬৪ সালের ১৫ জুন জেনেভাতে অনুষ্ঠিত আংকটাডের প্রথম বৈঠকের শেষে ৭৭টি উন্নয়নশীল দেশ একটি যৌথ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে গ্রুপ-৭৭ প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৩৩।

লক্ষ্য :

ক. উন্নয়নশীল দেশসমূহের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

খ. জাতিসংঘ ব্যবস্থার অধীনে সকল আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতা।

গ. উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার প্রসার ঘটানো।

আসিয়ান (ASEAN) : আসিয়ান একটি শক্তিশালী সার্থক আঞ্চলিক সংস্থা। নানাবিধ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে কয়েকটি এশীয় রাষ্ট্রসমূহের ব্যাংকক ঘোষণা স্বাক্ষরের মাধ্যমে ASEAN জন্ম নেয়। আসিয়ানের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০।

লক্ষ্য : দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক প্রগতি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা। এই সংস্থা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এশিয়ার সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। এছাড়া সংস্থাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাসহ শান্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পার্থক্যগুলো দূর করতে বদ্ধপরিকর।

নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New International Economic Order) মূলত বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৪ সালে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল বিগত সত্তর বছরে তার ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং আধুনিকীকরণ হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ জাতীয়তাবাদ কি?

উত্তর : জাতি গঠিত হওয়ার পর জন্মলাভ করে জাতীয়তাবোধ এবং এটি মানসিক ব্যাপার ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা। জিমার্নের কথায়, জাতীয়তাবোধ হলো আত্মিক উত্তরাধিকার। এটি অনুভূতি, চিন্তা ও জীবনধারার পদ্ধতি। এতে নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়, যার সাহায্যে সেই বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে অন্য সব গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিক্ষা দেয়। একই ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করে পরস্পরের মাঝে এমন আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলে, যা তাদের একত্রিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জাতীয়তাবোধ জাতীয় কৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-০২ সাম্রাজ্যবাদ কি?

উত্তর : 'Imperialiste' শব্দ থেকে 'Imperialism' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। ১৮৪৮ সালের পূর্বে লুই নেপোলিয়নের আগ্রাসী নীতিকে বোঝানোর জন্য 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে তৃতীয় নেপোলিয়নের বিরোধীগণ এবং তার ইংরেজ সমালোচকগণও নিন্দাসূচক অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেন। সাম্রাজ্যবাদকে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ অতীতে জাতীয় নীতি রূপায়ণের একটি মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রগতি, উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একবিংশ শতকের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে।

প্রশ্ন-০৩ ঔপনিবেশিকতা বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : ল্যাটিন শব্দ 'কলোনিয়া' (Colonia) থেকে ইংরেজি 'কলোনি' (Colony) বা উপনিবেশ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। 'উপনিবেশ' শব্দটির মূল অর্থ হলো 'মানবসমাজের একটি স্থানান্তরিত অংশ'। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে উপনিবেশ বলতে বোঝায় (১) দেশের সীমান্তের বাইরে কোনো রাষ্ট্রে বসতি স্থাপন; অথবা (২) রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ড উক্ত রাষ্ট্রের কাছে নির্দিষ্টভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে। বর্তমানে দ্বিতীয় অর্থেই উপনিবেশিকতার অর্থ নির্ধারণ করা হয়। প্রথমোক্ত ধরনের উপনিবেশকে বসতি এবং দ্বিতীয় ধরনের উপনিবেশকে শোষণের জন্য গঠিত উপনিবেশ নামে অভিহিত করা হয়। আবার অনেকের মতে, কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিকানাধীন দূরবর্তী ভূখণ্ডকে উপনিবেশ বলে।

প্রশ্ন-০৪ নয়া-উপনিবেশবাদ কি?

উত্তর : প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ কর্তৃক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার নাম হলো নয়া উপনিবেশবাদ বা New-colonialism. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। একে একে তাদের উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা

লাভ করতে থাকে। অতঃপর তারা তাদের হারানো উপনিবেশগুলোর ওপর নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়। নয়া-ঔপনিবেশিকতার ফলে আফ্রিকার বহু দেশ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক প্রাধান্যের স্থলে অর্থনৈতিক প্রধান্য বজায় থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখল নব্য ঔপনিবেশিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন-০৫ বিশ্বায়ন (Globalization) বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : বিশ্বায়ন হলো পারস্পরিক ক্রিয়া ও আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন জাতির সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংস্থাসমূহ বিশ্বজুড়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-০৬ কোন কোন বিষয়ের উপর বিশ্বায়ন প্রভাব বিস্তার করে?

উত্তর : ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কর, যোগাযোগ প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিশ্বায়ন প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

প্রশ্ন-০৭ 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টিকারী বিকৃত জাতীয়তাবাদে পুঁজিবাদী দেশসমূহ নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনে করার সাথে সাথে অনুন্নত, অসভ্য ও অনগ্রসর জাতিকে সভ্য করার মানসিকতা প্রদর্শন করতে থাকে। এ মানসিকতায় তারা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। ব্রিটিশদের মধ্যে তখন এরূপ অহংবোধ কাজ করতো যে, পৃথিবীর সব অসভ্য ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে উন্নত, সভ্য ও সংস্কৃতিবান করার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলোকে শাসন করার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। আর এ ধ্যানধারণা থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে মনে করা হতো 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' (White man's burden)। প্রকৃতপক্ষে, পররাজ্য লোলুপতা, অন্য জাতির প্রতি ঘৃণার ভাব সঞ্চারিত করা এবং অন্য জাতি ও দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারকে তারা শৌর্য্য ও আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমরূপে বিবেচনা করে। উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ এরূপ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালক্রমে এ উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় মুক্তি, স্বদেশপ্রীতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে অনুপ্রেরণাও সৃষ্টি করে।

টীকা

♦ বিশ্বায়ন (Globalization) *[৩২তম বিসিএস]*

বিশ্বায়ন মূলত একটি সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ফলে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষই একটি একীভূত বিশ্বব্যবস্থায় মিলিত হচ্ছে, যা বিশ্বায়নের ধারণাকে আরো জোরালো করে তুলছে। বিশ্বায়ন ধারণাকে অভিহিত করা হয়েছে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুপ্ত করছে। এটি এমন একটি সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা যে আমাদের জীবনের অধিকাংশ দিকই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে বিশ্বায়নকে অনেকে বি-আঞ্চলিকীকরণ (Delocalisation) প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন।

♦ নব-ঔপনিবেশিকতাবাদ *[১১তম বিসিএস]*

নব্য উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত হলো 'নব্য উপনিবেশবাদ হলো পশ্চাদগামী উপনিবেশবাদ, যা পুরনো স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য নতুন পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। বর্তমান সময়ে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, মতাদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, অর্থনীতির সামরিকীকরণ, আঞ্চলিক উপজাতীয় কোন্দল সৃষ্টি, অসমবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, বিজ্ঞান, কারিগরী ও কৃৎকৌশলগত দিক থেকে দরিদ্র দেশগুলোকে পরনির্ভরশীল করে তোলা, সন্ত্রাসবাদ ও নাশকতামূলক কাজে উৎসাহদান, কঠোর শর্ত-বিশিষ্ট ঋণদান, মুদ্রার মূল্য হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে সাবেক উপনিবেশগুলোর উপর নতুনভাবে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী B. H. Cohn এর সংজ্ঞানুযায়ী, নব্য উপনিবেশবাদ হলো একটি দেশের উপর অন্য একটি দেশের যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। ('It is simply safer way to relationship of effective domination or control political or economic direct or indirect or one nation over another.')

♦ মার্শাল ম্যাকলুহন

হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান বিশ্বগ্রাম (Global Village) ধারণার প্রবর্তক। মূলত তিনি ইংরেজি সাহিত্যের কানাডীয় একজন অধ্যাপক ও দার্শনিক। জন্ম কানাডার এডমন্টনে ১৯১১ সালের ২১ জুলাই এবং মৃত্যু কানাডার টরেন্টোতে ১৯৮০ সালের ৩১ ডিসেম্বর। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকলেও পরবর্তীতে মার্শাল ম্যাকলুহান প্রচার মাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়েন। 'আন্ডারস্ট্যানডিং মিডিয়া : দি এক্সটেনশনস অব ম্যান' গ্রন্থটি লিখে তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। 'দ্যা গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি : দ্য মেচিং অব টাইপোগ্রাফিক ম্যান' গ্রন্থটি তার আরেকটি অমূল্য কীর্তি। এটি মূলত মুদ্রণের ইতিহাস ও সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ম্যাকলুহান দেখিয়েছেন, কিভাবে বর্ণলিখন, মুদ্রণ শিল্প ও পরবর্তীতে গণমাধ্যমে চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে যা পরবর্তীতে সামাজিক সংঘটনে প্রভাব বিস্তার করে।

'দ্যা মিডিয়াম অব দি ম্যাসেজ : অ্যান ইনভেনটরী অব ইফেক্টস' ম্যাকলুহানের আরেকটি নাটক সমাদৃত গ্রন্থ। তার লিখিত গ্রন্থ থেকে নিম্নোক্ত জীবন দর্শন পাওয়া যায় :

১. নতুন ইলেকট্রনিক আন্তঃ নির্ভরশীলতা পৃথিবীতে বিশ্বগ্রামের প্রতিকৃতি হিসেবে পুনঃপ্রবর্তন করেছে।

২. অশিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় কেউ ব্যাকরণসিদ্ধ ভুল করতে পারে না।

৩. মুদ্রণলিপি নীরবতার ভাষাকে হস্তগত করেছে।

বিশেষ করে 'দ্যা গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি' গ্রন্থের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যম ও মুদ্রণ শিল্পের প্রভাব। সীমারেখাবিহীন বিশ্ব গঠনের ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও তৎকালীন সময়ে তার এই ধারণাটি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি কিন্তু কিন্তু ইন্টারনেট ও www আবিষ্কারের ফলে বিশ্বগ্রাম বা Global Village ধারণাটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়, যা মার্শাল ম্যাকলুহানের চিন্তাধারার-ই অনুরূপ। ফলশ্রুতিতে মার্শাল ম্যাকলুহানকে বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবক্তা বলা হয়।

♦ জাতীয় মুক্তি

রথসচাইল্ড ও রকফেলারদের বহু শতাব্দী পূর্বেই রোমান, পারস্য প্রভৃতি সাম্রাজ্য ছিল। নানাবিধ উদ্দেশ্য ছাড়াও এ সাম্রাজ্য স্থাপনের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন, উপঢৌকন, সোনা ইত্যাদি হস্তগত করা। সেই সাম্রাজ্যবাদ থেকে বর্তমানের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য হলো বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ সুসংগঠিতভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের বাজার দখল এবং শ্রমকে শোষণের মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয় করছে। এ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ অন্যদেশে বিনিয়োগ করে, সেই দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং একই সাথে নিয়ন্ত্রণ করে তার রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে। এর পেছনে মূল কারণ যে অর্থনৈতিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরাসরি ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদ ব্যবস্থা এখন না থাকলেও নব্য সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে এখন যে ব্যবস্থা চলছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং তার বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশের খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করে রাখছে। মাইকেল প্যারেন্টি যিনি একজন প্রগতিশীল মার্কিন চিন্তাবিদ, তিনি বলেন, 'উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বড় বড় প্রতিষ্ঠান এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় এ যাবত প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের তিন চতুর্থাংশ দখল করে আছে।' প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করার পাশাপাশি বৈদেশিক সম্প্রসারণের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন খরচ কমিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা তোলা। যেসব দেশে সস্তায় প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়, সে দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ মুনাফা তোলে।

সুতরাং এটি বোঝা যাচ্ছে যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত দেশের মানুষ মুক্তি অর্জনের জন্য সোচ্চার হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মাধ্যমে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো যে অন্যায় ও অন্যায্য চুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর জনগণের ক্ষতি করছে তার বিরুদ্ধে আজ জনগণ সোচ্চার। মেক্সিকোর কানকুনে তাই কোরীয় কৃষক আত্মাহুতি দিতে পারেন। লক্ষ লক্ষ জনগণ এসব চুক্তির বিরোধিতা করে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

বর্তমানে সাধারণ জনগণের কাছে এটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদের পন্থা হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এগুলো কোনো মানবকল্যাণমুখী সংস্থা নয়, এগুলো অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান। এদের দেয়া কোটি কোটি টাকার ঋণের বদলে বাংলাদেশের সরকার সব ধরনের শর্ত মেনে নিচ্ছে।

এদের পরমার্শ অনুযায়ী দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বেসরকারিকরণ চলছে। ফলে আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এসব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিবহন প্রভৃতি মৌলিক চাহিদার খাতগুলো নিয়ে ব্যবসা করছে। তাই মানুষ এখন উচ্চশিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য সেবার জন্য তার জমি, সম্পদ, গৃহপালিত পশু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে গড়ে উঠছে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

একটি জাতি তার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি, মেধাপাচার রোধের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি অর্জনের পথ খোঁজে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তাদের অস্ত্র ব্যবসায়কে চাঙ্গা রাখার জন্য যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন দেশে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল নিয়ে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীব্যাপী গণমানুষের স্বর সোচ্চার হয়েছে। জাতীয় মুক্তি কেবল নিজের মুক্তি নয়। অপরের এবং সমষ্টির মুক্তির মধ্য দিয়েই জাতীয় মুক্তি অর্জন সম্ভব।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) তে কৃষি চুক্তি হলে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের কৃষকদের ভয়াবহ ক্ষতি হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের খাদ্যের সার্বভৌমত্ব। কৃষক তার স্থানীয় বীজ ব্যবহার করতে চায় অথচ কৃষি চুক্তি হলে তাকে জেনেটিক্যালি মডিফাইড (GM) বীজ ব্যবহার করতে হবে, যে খাদ্য ইউরোপের জনগণ বর্জন করেছে। এসবের বিরুদ্ধে জনগণ দাঁড়িয়েছে। জাতীয়ভাবে এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজ জাতির হাতে রাখতে চেয়েছে।

♦ সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও নিজের স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করে। এ পদ্ধতিকে সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অনুপ্রবেশ বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সব সময়ই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সকল প্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও উদ্যোগের বিরোধী। এজন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। তারা অন্য দেশের শিক্ষাজগতে অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নেয়। নিজের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবর্তনের জন্য ঐসব দেশকে চাপ দেয়। অর্থ সাহায্য ও নানা সংস্থা এবং তহবিল গঠনের মাধ্যমে তাদের কৌশলকে রূপদানের চেষ্টা করে। উদাহরণ হিসেবে ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন ফাউন্ডেশন গঠনের প্রচেষ্টার কথা বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সুস্থ, চিন্তাশীল, গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গতিরোধ এবং অসুস্থ, প্রতিক্রিয়াশীল, অশালীন সাংস্কৃতিক মননশীলতা গড়ে তুলে অন্যদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে সব সময়ই চেষ্টা করে এবং এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনেকটা সফল।

♦ বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্যের পাশে বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেয়ার অর্থ হচ্ছে, আদৌ একে কোনো 'সাহায্য' বলা যায়, নাকি নব্য উপনিবেশ তথা নব্য সাম্রাজ্যবাদের একটি হাতিয়ার হচ্ছে এ সাহায্য? আমরা জানি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যগ্রহীতা দেশসমূহকে ওয়াদা করতে হয় যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ধার্যকৃত দামে মার্কিন পণ্য কিনবে এবং এ পণ্য বহন করা হবে মার্কিন জাহাজে। এ প্রসঙ্গে প্যারেন্টি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করে না, কেবল বেসরকারি খাতে সহায়তা দেয়। এ সহায়তার খুব ছোট একটা অংশ ঐ দেশের অভাবী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে। এ সাহায্যের একটি বড় অংশ চলে যায় মার্কিন বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের জন্য ভর্তুকি হিসেবে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য একটা অংশ চলে যায় দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীর হাতে।

অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্যের ফলাফল দাঁড়ায় সামান্য কিছু লোকের হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়া। এ অর্থ মূলত তৃতীয় বিশ্বের এনজিও (NGO)-এর হাতে চলে আসে এবং লুটপাট চলে। উন্নত দেশগুলো নব্য উপনিবেশবাদ স্থাপনের জন্য বৈদেশিক সাহায্যকে ব্যবহার করে। তাই এ সাহায্য অনুন্নত দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র দেশগুলো নিজেরা নিজেদের সম্পদ ও বণ্টন ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চাইলে এ সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। যেমন– চিলিতে ১৯৭০ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অ্যালেন্দে সরকার যখন সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় তখন সেখানে সব মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। কেননা এ সংস্কার সম্পদশালী বিনিয়োগকারী তথা নব্য উপনিবেশ সৃষ্টিকারীদের সুযোগ-সুবিধা ক্ষুণ্ন করেছিল।

কিছুক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্যও বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– নিকারাগুয়ার সমবায় খামার ও ভূমি সংস্কারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সেখানকার বাজারে ওয়াশিংটন জোয়ার ও হিমায়িত মুরগি ডাম্প করেছিল। ওয়াশিংটন সোমালিয়াতেও একইভাবে তাদের স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি পঙ্গু করে ফেলা ও স্থানীয় উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সেখানে ভুট্টা পাঠায়।

বৈদেশিক সাহায্যের একটি অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এটি ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের একটি কনসোর্টিয়াম। এরা এমন সব প্রকল্পে শতশত কোটি ডলার যোগান দেয় যে, প্রকল্পগুলো অত্যাচারী শাসকশ্রেণীকে জোরদার করে এবং বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের ভর্তুকি দেয়। এসব প্রকল্প দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও পরিবেশের বিপক্ষে যায়। এ ডলারের বেশিরভাগ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের কাছ থেকে। প্যারেন্টি বলেন, আশির দশকে বিশ্বব্যাংক উত্তর-পশ্চিম ব্রাজিলে বনভূমি ধ্বংস করে একটি মহাসড়ক নির্মাণ করে। এরপর কয়েক লক্ষ একর বনভূমি সাফ করে দেয়া হয়, যা মূলত করা হয় ধনী ব্রাজিলিয়ান পশুখামার মালিকদের ব্যবসায়ের স্বার্থে। ১০ বছরের মধ্যে পুরো এলাকা দারিদ্র্য ও ব্যাধিতে ভরে যায়।

বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে জিম হাইটওয়ার মন্তব্য করেন, 'বিশ্বব্যাংক মাত্র ৫০ বছরে যা করেছে, পৃথিবীর সব ব্যাংক ডাকাতরা মিলে এ পর্যন্ত তার এক শতাংশের এক-দশমাংশও করতে পারেনি।'

♦ জাতীয়তাবাদ

জাতি গঠিত হওয়ার পর জন্মলাভ করে জাতীয়তাবোধ এবং এটি মানসিক ব্যাপার ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা। জিমার্নের কথায়, জাতীয়তাবোধ হলো আত্মিক উত্তরাধিকার। এটি অনুভূতি, চিন্তা ও জীবনধারার পদ্ধতি। এতে নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়, যার সাহায্যে সেই বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে অন্য সব গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিক্ষা দেয়। একই ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করে পরস্পরের মাঝে এমন আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলে, যা তাদের একত্রিত করতে ভয়ানক সহায়ক। জাতীয়তাবোধ জাতীয় কৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়।

♦ সাম্রাজ্যবাদ

'Imperialiste' শব্দ থেকে 'Imperialism' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। ১৮৪৮ সালের পূর্বে লুই নেপোলিয়নের আগ্রাসী নীতিকে বোঝানোর জন্য 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে তৃতীয় নেপোলিয়নের বিরোধীগণ এবং তার ইংরেজ সমালোচকগণও নিন্দাসূচক অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেন। সাম্রাজ্যবাদকে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ অতীতে জাতীয় নীতি রূপায়ণের একটি মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রগতি, উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিংশ শতকের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে।

♦ ঔপনিবেশিকতা

ল্যাটিন শব্দ 'কলোনিয়া' (Colonia) থেকে ইংরেজি 'কলোনি' (Colony) বা উপনিবেশ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। 'উপনিবেশ' শব্দটির মূল অর্থ হলো 'মানবসমাজের একটি স্থানান্তরিত অংশ'। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে উপনিবেশ বলতে বোঝায় (১) দেশের সীমান্তের বাইরে কোনো রাষ্ট্রে বসতি স্থাপন;

অথবা (২) রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ড উক্ত রাষ্ট্রের কাছে নির্দিষ্টভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে। বর্তমানে দ্বিতীয় অর্থেই উপনিবেশিকতার অর্থ নির্ধারণ করা হয়। প্রথমোক্ত ধরনের উপনিবেশকে বসতি এবং দ্বিতীয় ধরনের উপনিবেশকে শোষণের জন্য গঠিত উপনিবেশ নামে অভিহিত করা হয়। আবার অনেকের মতে, কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিকানাধীন দূরবর্তী ভূখণ্ডকে উপনিবেশ বলে।

♦ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

নয়া উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের বিভিন্ন দিকের অন্যতম হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যখন একের পর এক সাবেক উপনিবেশসমূহ স্বধীন হয়ে যেতে থাকে, তখন নয়া উপনিবেশবাদীরা তাদের প্রভাব ও বাজার বজায় রাখার অন্যতম কৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন (Cultural Aggression)-এর নীতি গ্রহণ করে। বিশেষ করে, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, ইরিত্রিয়া, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে পরাজয়ের পর নয়া উপনিবেশবাদীরা আরও সুনিশ্চিত হয় যে, বর্তমান যুগে কোনো জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে জেতা অত্যন্ত দুরূহ। বরং সে-জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমেই সে জাতিকে কাবু করা ও বাগে আনা সহজতর। তাই তারা তাদের প্রদত্ত সাহায্য বা লোন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় অনুন্নত বিশ্বের দেশসমূহে যৌনবিকৃতি, মাদকাশক্তি, অশ্লীল সাহিত্য-চলচ্চিত্র, নয়া উপনিবেশবাদীদের ওপর নির্ভরশীলতার মনোবৃত্তি, মস্তক ধোলাইকৃত বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি উপসর্গের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াতেই তারা অনুন্নত বিশ্বের জনগণের, বিশেষত তরুণসমাজের মন-মানসকে বিপ্লবের দিক থেকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে রাখার প্রয়াস পায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনবাদীরা মনে করে যে, কোনো জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করলে সে জাতির প্রতিরোধক্ষমতাও নষ্ট হতে বাধ্য।

♦ আধিপত্যবাদ

এক রাষ্ট্র যখন অন্য বা অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ বা খর্বিত করে সেসব রাষ্ট্রের সরকার, প্রশাসন, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদির ওপর নিজের প্রাধান্য বা মাতব্বরি চাপিয়ে দিতে চায়, তখন প্রথম রাষ্ট্রের এরূপ প্রবণতাকে বলা হয় আধিপত্যবাদ। সাধারণত কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক বা অন্য কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অপর রাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রের ওপর তার আধিপত্য চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়।

অধ্যায় ০৫

পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি
Foreign Policy & Diplomacy

Syllabus

***Foreign policy and Diplomacy** : Concepts of foreign policy and diplomacy, decision-making process, determinants of foreign policy, diplomatic functions, immunities, and privileges.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে আমরা কি বুঝি? বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? [৩৪তম; ৩১তম বিসিএস]

০২. 'স্বার্থ সংরক্ষণ' কূটনীতিকের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব—এ দায়িত্ব পালনে কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে লিখুন। [২৯তম বিসিএস]

০৩. 'এই বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে'–আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। [২৫তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. ক. পররাষ্ট্রনীতি কি?
খ. একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

০৫. ক. কূটনীতি বলতে কি বোঝেন?
খ. কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

০৬. কূটনীতির গুরুত্ব ও কার্যাবলী আলোচনাপূর্বক কূটনীতিবিদদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

০৭. 'কূটনীতি বিদেশনীতি পরিচালনার একটি হাতিয়ার।'— আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. পররাষ্ট্রনীতি কি?

০২. কূটনীতি (Diplomacy) কি?

০৩. প্রকাশ্য কূটনীতি (Open Diplomacy) কি?

০৪. কূটনীতিবিদদের কাজগুলো কি কি?

০৫. কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের শ্রেণী বিভাজন লিখুন।

০৬. গণতান্ত্রিক কূটনীতি কি?
০৭. গোপন কূটনীতি কি?
০৮. ব্যক্তিগত কূটনীতি কি?
০৯. 'কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন' কি?
১০. বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় হাতিয়ার হিসেবে কূটনীতির ভূমিকা কি?
১১. 'পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি পরস্পর নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ'—ব্যাপারটি বুঝিয়ে লিখুন।

টীকা

। কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্তি [৩০তম বিসিএস]
। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি [১৮তম বিসিএস]
। নতুন কূটনৈতিক সম্পর্ক : ভারত-চীন
। প্রতিরোধ কূটনীতি
। পেরেস্ত্রয়কা
। গ্লাসনস্ত
। পিং পং ডিপলোমেসি
। গুজরাল ডকট্রিন
। ট্রম্যান ডকট্রিন
। নিক্সন ডকট্রিন
। ডোমিনো থিউরি
। কূটনৈতিক অসুস্থতা

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে আমরা কি বুঝি? বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[৩৪তম; ৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : অর্থনৈতিক কূটনীতি অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণী বিষয়াবলীর সাথে জড়িত। অর্থনৈতিক কূটনীতিবিদগণ বিদেশের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিজ দেশের সরকারকে সেই নীতিসমূহ থেকে কিভাবে সর্বোত্তম উপকার লাভ করা যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অর্থনৈতিক কূটনীতি পররাষ্ট্রের কোনো নির্দিষ্ট পলিসির বিপরীতে নিজ দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ কিভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যায় সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেয়।

অর্থনৈতিক কূটনীতি : অর্থনৈতিক কূটনীতি হচ্ছে এমন কিছু কার্যক্রমের সমষ্টি (আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উভয় মিলে) যা সীমানা বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর (রপ্তানি, আমদানি, বিনিয়োগ, ধার-দেনা, সাহায্য, অভিবাসন) রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র বহির্ভূত সংস্থা দ্বারা আধুনিক বিশ্বে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনীতি তথা ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে কূটনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাই অর্থনৈতিক কূটনীতি।

কূটনীতি ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে বেশি নিবদ্ধ ছিল। সময়ের পরিবর্তনে এখন জোর (thrust) দেয়া হয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর। ঔপনিবেশিকতার অবসান, জোটনিরপেক্ষনীতি, তৃতীয় বিশ্বের সংহতি ইত্যাদি আর উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয় না। এ সমস্ত প্রত্যয়ের স্থান দখল করেছে বিশ্বায়ন, অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক ব্লক, আন্তর্জাতিক ব্লক ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে (ইরাক) সামরিক হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক কূটনীতিরই নামান্তর।

অর্থনৈতিক কূটনীতিকে বাণিজ্য কূটনীতিও (Trade/Commercial Diplomacy) বলা হয়। তবে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও এক নয়। অর্থনৈতিক কূটনীতির পরিধি বাণিজ্য কূটনীতির চেয়ে ব্যাপকতর।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী ও অর্থবহকরণে করণীয় : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী ও অর্থবহকরণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বহির্বিশ্বের সাথে কার্যকরী সম্পর্ক গঠন :** সত্যিকারার্থে বাংলাদেশ এখন মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। এ সংকট আসলে বিগত বিশ্বমন্দা, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদির সাথে জড়িত। ফলে এ সংকট থেকে উত্তরণ পেতে চাইলে বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বের সাথে কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আরো কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই এ মুহূর্তে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে দেশে ও বিদেশে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সরকারসহ বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা, ইপিবি, এনবিআর, পিডিবি ইত্যাদির কর্মদক্ষতা বহুগুণে বাড়াতে হবে।

২. **জরুরি অবস্থা মোকাবেলা :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী ও অর্থবহকরণের জন্য জরুরি অবস্থা মোকাবেলার উপযোগী করে পরিচালনা করা উচিত। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে সফল করতে হলে সরকারের সকল শাখাকে এক্ষেত্রে সহায়তা ও সহযোগিতা করতে হেব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বহির্বিশ্বে আমাদের মিশনসমূহকে তাদের দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে। সর্বোপরি এক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সমন্বয় থাকতে হবে যেখানে বেসরকারি খাতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. **বহির্বিশ্বে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা :** বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে বহির্বিশ্বকে আমাদের বোঝাতে হবে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকেও বোঝাতে হবে যে আমরা দারুন সব বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছি এবং আমাদের বাণিজ্যিক পরিবেশ খুবই ভালো।

৪. **বহির্বিশ্বে প্রচারিত বাংলাদেশের নেতিবাচক দিক খতিয়ে দেখা :** বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ব্যাপারে কি কি নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, কেন রয়েছে তাও খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন সমস্যা, যানজট, লোডশেডিং, ঢাকা শহরের উচ্চমাত্রায় পরিবেশ দূষণ, অশান্ত আইন-শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত, টোল আদায়ে অনিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভেতর ও বাইরের ঘটনাবলী এদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। এসব সমস্যার সমাধানে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. **বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা :** বাংলাদেশকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ ঢাকায় পৌছার পর থেকেই সরকার কর্তৃক সকল সহযোগিতা পেতে পারেন এবং বিনিয়োগ বোর্ড এসকল বিনিয়োগকারীর সব সমস্যা কার্যকরীভাবে ও দ্রুততার সাথে গ্রহণ করে। সময় মানেই টাকা। সিঙ্গাপুরে একজন যাত্রী বিমান থেকে নামার পরে ১৫ মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দর ছাড়তে পারেন, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও এক্ষেত্রে গড়ে একঘন্টারও বেশি সময় লাগে। বাংলাদেশে এসে বিমানবন্দরেই একজন বিনিয়োগকারী এদেশের ভাবমূর্তি হিসাব করে ফেলতে পারেন। মালয়েশিয়ার ক্লাং বন্দরে জাহাজ ভেড়ার পর গড়ে ৭ ঘন্টার মধ্যেই কনটেইনার নামানো শুরু হয়, সেখানে চিটাগাং বন্দরে লাগে কয়েকদিন।

৬. **মিশন ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় :** অর্থনৈতিক কূটনীতির বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে। এটি বহুলাংশে ব্যবহৃত হয় একটি দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বুঝাতে। এভাবে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংস্থান বৃদ্ধির কারণেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল ক্ষেত্রেই বিদেশে আমাদের মিশনসমূহ এবং আমাদের বেসরকারি খাতের দক্ষ সমন্বয় দরকার।

৭. **বিনিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটি গঠন :** যদি কোনো বিদেশী বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায় কিংবা যদি বাইরে আমাদের কোনো দূতাবাস সেদেশে আমাদের কোনো রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করতে চায় তাহলে কিভাবে তাদেরকে এগোতে হবে? তাদেরকে কী বিনিয়োগ বোর্ড বা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নাকি কোনো কোম্পানি বরাবর আবেদন করতে হবে? এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থাপনা পাওয়া যায় না। এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে, যারা সপ্তাহে দুই বা ততোধিক মিটিং করবে। এ কমিটিতে থাকবেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন চেম্বার্স, বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা, রপ্তানি উন্নয় ব্যুরো এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ। এ কমিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক শাখার অধীনে থেকে বিভিন্ন ব্যাপারে কাজ করবে। জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও একটি কমিটি থাকতে পারে।

৮. **আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি :** 'সাহায্য নয় বিনিয়োগ চাই' যদিও বর্তমান সময়ের স্লোগান তথাপি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদেশী আর্থিক সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতির দায়িত্ব হচ্ছে এসব সাহায্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হলে সাহায্য আরো বৃদ্ধি করা।

৯. **বাংলাদেশের সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ কার্যসম্পাদন :** বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক সংস্থা ও সম্মেলনে কার্যকরী এমনকি নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করাকেও নির্দেশ করে। এলডিসি, জি-৭৭, ইকোসক, এসকাপ প্রভৃতি সংস্থার সম্মেলনে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা তুলে ধরছে। তবে আমাদেরকে ভারত, আমেরিকায় আমাদের রপ্তানি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দূতাবাসসহ কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাস, ঐ দেশে বাংলাদেশী সংগঠনগুলোকে একযোগে করতে হবে। ওয়াশিংটনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোকে যেমন– দি স্টেট ডিপার্টমেন্ট, USTR জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল, কংগ্রেসসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা যেমন জেসি পেন, গ্যাপ, ওয়ালমার্ট ইত্যাদিকে বাংলাদেশের পণ্যের গুণাগুণ বুঝাতে হবে।

১০. **বাংলাদেশের পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি :** জাপান, অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং আফ্রিকায় বাংলাদেশের পণ্যের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে। জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের রপ্তানি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার রয়েছে। যে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যহার আমরা এখনও করতে পারিনি। এছাড়া ইউরোপের অস্ত্রবাদে সবকিছু (ইবিএ) সুযোগটি আমরা আমাদের রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে কাজে লাগাতে পারি।

১১. **সাফটা কার্যকর :** আমরা সার্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও সার্কের পূর্ণ অর্থনৈতিক সুবিধা পাইনি মূলত ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের কারণে। সাফটাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। ভারতকে তার বাজার সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিকে এ অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে সর্বোচ্চ জোর

দিতে হবে। এ অঞ্চলে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সমস্যাকে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। এ অঞ্চলে আন্তঃসহযোগিতার মাধ্যমে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও হাইওয়ে, দক্ষিণ এশীয় এনার্জি গ্রীড, চট্টগ্রামে গভীর সমুদ্রবন্দর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রেও শরণার্থী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে।

১২. **লবিং :** ১৮৮৫ সালে মালয়েশিয়ার সরকার কেবল বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার আধা দক্ষ শ্রমিকদেরকে সে দেশে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল অসাধারণ লবিংয়ের মাধ্যমে। এখনও সেরকম লবিং করে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অঞ্চলে আমাদের শ্রমশক্তি রপ্তানি করতে হবে।

১৩. **বিদেশে মিশনসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ :** বিদেশে আমাদের মিশনগুলোকে কার্যকরী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরো দ্রুত কাজ করার উপযোগী করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রদূতকে অসাধারণ দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে। তাদের দক্ষতাও আবার পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থনৈতিক কূটনীতি আমাদের অস্তিত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।

উপসংহার : অতএব অর্থনৈতিক কূটনীতি বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবার দাবীদার। আমাদের কূটনীতিদেরকে এ দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকতে হবে। বিশেষ প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক। ভালো দরকষাকষি জ্ঞান আবশ্যক। বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা ইত্যাদিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সর্বোপরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সমন্বয়ের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি খাতকেও একযোগে কাজ করতে হবে।

০২। 'স্বার্থ সংরক্ষণ' কূটনীতিকের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব— এ দায়িত্ব পালনে কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে লিখুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহ একটি একক বিশ্বপল্লীতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এক রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের আদান-প্রদান ঘটে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই। কূটনীতি হলো চতুর কৌশলের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা দূত অন্য রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, সুসম্পর্ক রক্ষাকরণ এবং স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে যে কোনো ধরনের কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া। সাম্প্রতিক কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়।

স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কূটনীতিকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ :

১. **পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করা :** বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজন বিবেচনা সাপেক্ষে জাতীয় শক্তি ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে। সেসব গৃহীত নীতিমালাকে ফলপ্রসূ করার জন্যই কূটনীতির আশ্রয়গ্রহণ করা হয়। কূটনীতি হলো বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্রনীতিকে সফল করে তোলার একটি প্রধান উপায়। পররাষ্ট্রনীতি স্থির করা কূটনীতির কাজ নয়। পররাষ্ট্রনীতিকে স্বার্থক করে তোলাই কূটনীতির উদ্দেশ্য। কাজেই একজন কূটনীতিক পররাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

২. **সমস্যা মীমাংসা ও নীতি বাস্তবায়ন করা :** প্রতিটি রাষ্ট্রকেই অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সমস্যার মীমাংসা, জাতীয় স্বার্থের অবক্ষয় রোধ বা অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু নীতি নির্ধারণই চূড়ান্ত বিষয় নয়, এসব

নীতিসমূহ কার্যকর করা আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্যই আধুনিককালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন উভয়কেই সমান গুরুত্ব অনুসারে বিবেচনা করা হয়। কাজেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ও জাতীয় নীতিসমূহ বাস্তবায়নে একজন কূটনীতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৩. **সম্পর্ক স্থাপন, রক্ষাকরণ ও দেশের পরিচিতি তুলে ধরা** : বহিঃরাষ্ট্রে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতগণ হলেন সবচেয়ে বড় কূটনীতিবিদ। বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, রক্ষাকরণ ও স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এরা কূট-কৌশলগত বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করেন। কোনো দেশের প্রেরিত রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমেই অন্য দেশের কাছে ঐ দেশ পরিচিত হয়। উদ্দেশ্য একটাই— জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

৪. **যোগাযোগ রক্ষাকারী** : কূটনীতিকগণ যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নিজ দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নানা প্রকার সমস্যাবলি নিয়ে কূটনীতিকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন চুক্তির খসড়াও প্রস্তুত করেন।

৫. **চুক্তিসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা** : কূটনীতিকগণ কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতীকী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন না, তিনি বৈধ প্রতিনিধিত্বের কাজও করে থাকেন। কূটনীতিবিদগণ নিজ রাষ্ট্র ও নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং কূটনীতিবিদের স্বাক্ষর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের স্বাক্ষর বলে বিবেচিত হয়। তিনি যাবতীয় সভা-সমিতিতে যোগদান করেন এবং সর্বত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন। কূটনীতিবিদগণ যখন তার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, তখন তিনি রাষ্ট্রের মতামত ব্যক্ত করেন– সেখানে তার নিজের মতামত প্রকাশ করা হয় না।

৬. **নিজ দেশের নাগরিক স্বার্থরক্ষা করা** : রাষ্ট্রদূত যে দেশে নিয়োগ লাভ করেন, সে দেশে বসবাসরত নিজ দেশের নাগরিকদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর ও তত্ত্বাবধান করা রাষ্ট্রদূতের অন্যতম প্রধান কাজ। রাষ্ট্রদূতের নিজ দেশের নাগরিকগণ যাতে অন্য রাষ্ট্রে তাদের চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার অন্যায়, অবিচার বা সমস্যার সম্মুখীন না হয়, সে বিষয়েও রাষ্ট্রদূতকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া এসব নাগরিকগণ কোনো অসামাজিক বা অপরাধমূলক কাজ করে বিদেশে নিজ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে কিনা, সেদিকেও রাষ্ট্রদূতগণ প্রভূত সতর্কতা অবলম্বন করেন।

৭. **তথ্য আদান-প্রদান করা** : কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত রাষ্ট্রের বৈধ সংবাদ ও তথ্যাবলি সংগ্রহ করে নিজ দেশে তা প্রেরণ করেন। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় যে বৈদেশিক নীতি প্রস্তুত করে তার তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করেন কূটনীতিবিদ। একজন কূটনীতিবিদকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিবেদক বলা হয়। রাষ্ট্রদূত অবস্থানকারী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থাও নিজ দেশের সরকারকে অবগত করেন। রাষ্ট্রদূত পৃথিবীর যে প্রান্তের যত দূরের রাষ্ট্রেই নিয়োগপ্রাপ্ত হন না কেন, তার উপর নিয়ন্ত্রণ তার নিজ দেশের সরকারের হাতেই থেকে যায়।

৮. **তথ্য সংগ্রহের কাজ করা** : প্রকৃত অর্থে বিদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে হয়। রাষ্ট্রদূতগণ যে দেশে কর্তব্যরত থাকেন, তাকে সে দেশের পররাষ্ট্রনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত নীতি, সামরিক নীতি এবং সামরিক বিষয়ে সে রাষ্ট্রের প্রস্তুতি, জনমত, রাজনৈতিক দলসমূহের মনোভাব প্রভৃতি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। অন্য রাষ্ট্রের এসব তথ্য ও সংবাদ আহরণের জন্য রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়কে অনেক সময় গুপ্তচরের কাজও করতে হয়। যদিও আন্তর্জাতিক বিধি

অনুসারে কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ কখনো গুপ্তচরের কাজ করতে পারেন না। কিন্তু দেখা যায়, কখনো কখনো বিদেশে অবস্থিত রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়গুলো তাদের নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ আদায় ও সংরক্ষণের জন্য এরূপ গোপন গুপ্তচরবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

কূটনীতিকের বিশেষ দায়িত্ব হলো তার নিজ দেশের নীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ বিদেশে প্রচার করা এবং সে নীতি ও আদর্শের পক্ষে বিদেশে জনমত গঠন করা। তাছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের জাতীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও রাষ্ট্রদূতগণের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রদূত তার ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, চালচলন, কথাবার্তা, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষারুচি প্রভৃতি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের সরকার ও উচ্চ পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে তৎপর থাকেন।

৯. **বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ করা** : কূটনীতিক অনেক সময় নিয়োগপ্রাপ্ত দেশে নিজ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন। বহিঃবাণিজ্য বিষয়ক কর্ম সম্পাদনের জন্য বিদেশে বাণিজ্য দূতগণকে নিয়োগ দান করা হয়। যদি এসব বাণিজ্য দূত অনুপস্থিত থাকেন অথবা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়োগ না দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে কূটনীতিকই বাণিজ্য দূতের দায়িত্বও পালন করতে পারেন।

১০. **বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা** : কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রেরণকারী রাষ্ট্রের সাথে অবস্থানকারী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকা। একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলেই উন্মুক্ত হয় পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বার। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ফলে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সংকটে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। একজন কূটনীতিকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো তার নিজের ও নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

উপসংহার : অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালনা করাই হলো কূটনীতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের জন্য প্রণীত নীতির ফলপ্রসূ রূপায়ণে কূটনীতিকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রসমূহের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা, নিজ রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা, বিশ্বে নিজ রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করে তোলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একজন কূটনীতিবিদ সম্পন্ন করেন। বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং একজন দক্ষ ও যোগ্য কূটনীতিক যেমন তার নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও কূটনীতিবিদদের অবদান ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০৩। 'এই বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে'— আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। *[২৫তম বিসিএস]*

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিশ্লেষক পররাষ্ট্রনীতির অনেক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, যাদের প্রতি দুটির মধ্যে কিছু না কিছু তফাৎ বিদ্যমান। কাজেই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা প্রদান একটি কঠিন কাজ। এখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি প্রামাণিক ইংরেজি বই থেকে পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো : Foreign policy consists of a range of actions taken to seek the national interests by a government of a state with reference to other states and important actors acting on the international stage.

অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো দেশের জাতীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ এবং তাদের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এবং এসব ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় কোনো বিদেশী রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের ওপর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি : বর্তমানে সব দিক দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত তার নিজ সীমানার বাইরে কোনো দেশের ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামাতে আগ্রহী ছিল না। এ ঘটনাকে Isolationism বলা হতো। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সম্প্রসারণবাদের যুগে মার্কিন নেতারা মনে করতেন, কোনো ইউরোপীয় শক্তি যদি গোটা আমেরিকা মহাদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করে তাতেই যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট থাকবে। মার্কিন নেতাদের এ বিশ্বাসকে 'মনরো ডকট্রিন' বলা হয়। কারণ ১৮২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো ইউরোপীয় শক্তিদের সতর্ক করে দেন যে, তারা যেন ল্যাটিন আমেরিকায় কোনো রকম হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করে।

যদিও বলা হয় যে, Isolationism ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল, তবুও তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানির সাবমেরিনগুলো ব্রিটেনের জন্য খাদ্য ও রসদ পরিবহনকারী কয়েকটি আমেরিকান জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবিয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বাধ্য হন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। এভাবে জার্মানি হাতে ধরে Isolationist মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডেকে আনে। এরপরও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের পরিকল্পনামতো ১৯১৯ সালে League of Nations গঠিত হলেও যুক্তরাষ্ট্র তাতে যোগ দেয়নি। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রকে আর একবার ডেকে এনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করানো হলো। সেদিন কয়েক ঝাঁক জাপানি যুদ্ধবিমান পার্ল হারবারে অবস্থিত আমেরিকান নৌঘাঁটিকে আক্রমণ করে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতিতে সদর্পে আবির্ভূত হলো এবং আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছে।

শীতল যুদ্ধকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ট্রুম্যান ডকট্রিন (Truman Doctrince) বাস্তবায়ন, যা ১৯৯০-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত কার্যকর ছিল। প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিজমের প্রভাব বিস্তার রোধ করার মাধ্যমেই কেবল বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে। এজন্য যেসব দেশ ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে রয়েছে, কমিউনিজমকে সেসব দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে। একে বলা হতো Containing communism। কমিউনিউজমকে সীমাবদ্ধ করার জন্য আমেরিকান ক্ষমতা এবং অর্থ ব্যবহারের ওপর ট্রুম্যান জোর দিতেন।

ট্রুম্যান ডকট্রিন কার্যকর করা বা কমিউনিজমের ধ্বংস সাধন, বিস্তার রোধ এবং প্রভাব খর্ব করার জন্য আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমকাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তার পক্ষে যতরকম সম্ভব ন্যায় বা অন্যায় পথে সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এর জন্য সে কোরিয়া ও ভিয়েতনামে দুটি বড় বড় যুদ্ধ করেছে; এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় ডজন ডজন সামরিক সরকার পুষেছে; প্রতি বছর শত শত অ্যাটম বোমা, যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন আর মিসাইল তৈরি করছে এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা CIA (Central Intelligence Agency)-র হাজার হাজার উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দাদের বিশ্বের আনাচে-কানাচে আহোরাত্র সতর্ক রেখেছে। এ সময়টাকে শীতল যুদ্ধের সময় বলা হয়। শীতল যুদ্ধ চলে প্রায় চার দশকেরও বেশি সময়। এতো বেশি সময় ধরে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটি কেন কমিউনিজমের উৎখাতকে তার পররাষ্ট্রনীতির একমাত্র টার্গেটে পরিণত করে তা একটু ভেবে দেখা দরকার।

পুরো বিংশ শতাব্দী ধরেই আমেরিকান জনগণ এবং শাসকরা মনে করে আসছে যে, কমিউনিজম হলো নিছক একটা পাগলামি। তবে এ পাগলামিতে এমন একটা মোহ রয়েছে, যা দুনিয়ার দরিদ্র জাতিগুলোকে জাদু করে বশ করতে পারে। কমিউনিজম সব সময় দরিদ্র মানুষের কথা বলে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং পরে দেশের সকল ভূমি, কারখানা এবং শ্রমকে সকলকে অন্ন-বস্ত্র দানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যেভাবে জবরদখল করে নেয় তাতে উৎপাদন কমে যায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন হয়। ফলে দারিদ্র্য তো কমেই না বরং মানুষ তার স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলে। এ উন্মাতাল শাসন ব্যবস্থা যদি একের পর এক দেশ গ্রাস করতে থাকে তবে তা থেকে আমেরিকাও রেহাই পাবে না। আর আমেরিকায় কমিউনিজমের আগ্রাসন মানে হলো কয়েকশ বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমেরিকান জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা তাদের যে ধনদৌলত আর স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছে, সেসব হাতে ধরে পানিতে ফেলে দেয়া। আমেরিকা এত বড় ক্ষতি স্বীকার করতে রাজি নয়। আর এ আতঙ্ক থেকে মুক্তির পথ একটাই Containment of Communism তথা Truman Doctrine-এর বাস্তবায়ন। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র তার শীতল যুদ্ধকালীন পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত কমিউনিজমের পতনের পর বিশ্বে আজ কমিউনিজমের বিরুদ্ধবাদী কেউ আর কমিউনিজম নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত নয়। তবে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের মোকাবিলা করতে গিয়ে আমেরিকা কিছু নতুন সমস্যা তৈরি করেছে। সেসব সমস্যার মোকাবিলা করাসহ বর্তমান আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতিতে কিছু নতুন এজেন্ডা সংযোজিত হয়েছে।

শীতল যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতি : শীতল যুদ্ধোত্তোর বিশ্বে আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য দাঁড়ায় মূলত ছয়টি :

ক. বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি ছড়িয়ে দেয়া;
খ. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর ইসলামী মৌলবাদের হুমকি নিষ্ক্রিয় করা;
গ. জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানসহ পূর্ব ইউরোপের বন্ধু দেশগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা;
ঘ. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করা;
ঙ. মধ্যপ্রাচ্যের তৈলপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখা এবং
চ. গণচীনের সাথে স্থিতিশীল সম্পর্ক (Strategic Partnership) বজায় রাখা।

বিশ্বের সকল দেশে গণতন্ত্র এবং বাজার অর্থনীতি কায়েম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সবসময়ই ছিল। কারণ এ উদ্দেশ্যেই সে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রায় গোটা বিংশ শতাব্দীটাই লড়েছে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর ইসলামী মৌলবাদ বিষয়টা অনেকটা নতুন। ইরাক, ইরান, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান, সুদান ইত্যাদি দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Rogue Country বলে। কারণ এসব দেশের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মার্কিনি এবং ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর হামলা চালানো হয়। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রও মাঝে মাঝে হামলা চালায়। ইসলামী মৌলবাদ যুক্তরাষ্ট্রের শীতল যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সবচেয়ে বড় উৎকণ্ঠা। ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, লিবিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশে গত কয়েক দশক ধরে যে ইসলামী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র একে বিপজ্জনক এবং তার স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান—এসব বন্ধু দেশের নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য এসব দেশের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা TMD (Theatre Missile Defence), যা কিনা যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি সহায়তায় নির্মাণ করা হবে, গ্রহণ করার কথা কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। দু পক্ষেই গণতন্ত্র এবং বাজার অর্থনীতি বুনিয়াদি ভিত্তি লাভ করেছে। সঙ্গত কারণেই এরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হতে চায়।

মধ্যপ্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খুবই স্পর্শকাতর একটা বিষয়। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নিজ প্রভাব যেন অক্ষুণ্ন থাকে সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সকল রকম সাহায্য করে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর উন্নত বিশ্বের অর্থনীতি অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিজে এ তেলসম্পদের ওপর তার মিত্রদের চেয়ে অনেক কম নির্ভরশীল। তবে তেলের জন্য যদি ইউরোপ, জাপানসহ সমৃদ্ধ অর্থনীতিগুলো ধাক্কা খায় তার প্রভাব আমেরিকান অর্থনীতিতেও ভালোভাবেই পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র তেল ছাড়াও আরো কিছু ভূ-রাজনৈতিক কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর তার প্রভাব বজায় রাখতে চায়। আর এজন্য সে নির্ভর করে ইসরাইলের ওপর।

চীনের সাথে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব। চীন যদি জোর করে তাইওয়ান দখল করতে চায় তবে চীনা আর আমেরিকান সৈন্যদের রক্তে তাইওয়ান প্রণালীর পানি লাল হয়ে যাবে। চীনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই করে আসছে। এত কিছুর পরও চীনের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র। সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এ অম্লমধুর সম্পর্কের নাম দিয়েছেন Strategic Partnership। চীনকে বাণিজ্যিকভাবে জড়িত রেখে চীনের যেসব আচরণ যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ নয়, সেসব আচরণ সংশোধন করার নীতিই হলো Strategic Partnership।

এসব ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের আরেক গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল অংশীদার হলো রাশিয়া। রাশিয়ার গণতন্ত্র এবং বাজার অর্থনীতি সক্রিয় করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

নতুন এ বিশ্বে পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোকে (North Atlantic Treaty Organization) আরো বিস্তৃত করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের বিগত বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস তার পররাষ্ট্রনীতির যে মূলনীতি ঘোষণা করেছেন, 'তার অর্থ হলো যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র আর বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বিশ্ব দেখতে চায়। ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্র কখনো ধ্বংস হয়ে যেতে দেবে না। Rogue State গুলোর স্বভাব ঠিক করতে যুক্তরাষ্ট্র মাঝে মাঝে লাঠিসোটা ব্যবহার করবে'।

২০ জানুয়ারি ২০০৯ বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ ও অভিষেকের মাধ্যমে শেষ হয় বিশ্বে সংঘাতকে উস্কে দেয়া 'Pre-emptive Attack' অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার আগেই সম্ভাব্য আক্রমণকারীকে আক্রমণ তত্ত্বের প্রবক্তা জর্জ ডব্লিউ বুশের ৮ বছর মেয়াদী শাসনকাল। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য তিনি ফেলে যান দুটি অসমাপ্ত যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা এবং বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক অপ্রিয় রাজনৈতিক অবস্থান। ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা।
২. যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী দেশগুলোর নিকট আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখা।
৩. 'বুশ ডকট্রিন' দ্বারা যেসব অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনার দ্বারা নিরসন করে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা।
৪. সন্ত্রাসবাদ দমন করা বিশেষত আফগানিস্তানের তালেবান ও পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চলের সকল সন্ত্রাস ও জঙ্গি-তৎপরতা দমনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।
৫. যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখা, বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের সাথে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া ও বিশ্বে সামরিকভাবে কৌশলগত অবস্থান বজায় রাখা।

৬. ইসরাইলকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সামরিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার ঘোষণা এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলভাণ্ডারকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করার অতীত নীতি অনুসরণ করা।
৭. ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে কোনোক্রমেই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে মেনে না নেয়া।
৮. ইরাক থেকে পর্যায়ক্রমে সৈন্য প্রত্যাহার করে অন্যত্র বিশেষ করে ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সমাবেশ। এক্ষেত্রে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত প্রথম টার্গেট।
৯. চীন ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ এবং ভারতের সাথে কৌশলগত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
১০. মার্কিন বিরোধী দেশ ও সরকারগুলোর সাথে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন ও যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা।

মূলত 'বুশ ডকট্রিন'-এর বিরুদ্ধে ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারণায় সোচ্চার থাকলেও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাই অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও জনকল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় আরো সংকটও বিপর্যয়ের আশংকা বারাক ওবামার জন্য অপেক্ষা করছে; সেজন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪। ক. পররাষ্ট্রনীতি কি?
খ. একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হলো পররাষ্ট্রনীতি এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ হলো যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। তাই সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন বলেছেন, 'We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual and those interests it is our duty to follow.' অর্থাৎ আমাদের কোনো শাশ্বত মিত্র নেই এবং আমাদের কোনো চিরস্থায়ী শত্রুও নেই। আমাদের স্বার্থই হলো শাশ্বত ও চিরস্থায়ী এবং স্বার্থকে অনুসরণ করাই হলো আমাদের দায়িত্ব। তবে জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণে প্রণীত এ পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রভাব সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র দেশগুলো আন্তর্জাতিকভাবে তেমন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে না বিধায় তাদের পররাষ্ট্রনীতিও তারা সেভাবে ঢেলে সাজায়, যেন অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী কোনো দেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয় বা সেসব দেশের জাতীয় স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। একইভাবে, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশগুলো তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে এমনভাবে প্রণয়ন করতে পারে; যার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যধিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সেসব দেশগুলো তাদের জাতীয় স্বার্থকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়।

পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা : যে কোনো রাষ্ট্রের নীতিকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে— অভ্যন্তরীণ নীতি বা Domestic policy এবং পররাষ্ট্রনীতি বা Foreign policy। পররাষ্ট্রনীতির ইংরেজি পরিভাষা হলো 'Foreign Policy'।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। সাধারণভাবে পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো রাষ্ট্রের জাতীয়নীতির সে অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত। উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, A country's foreign policy,

also called the foreign relations policy, consists of selfinterest strategies chosen by the state to safeguard its national interests and to achieve its goals within international relations milieu, The approaches are strategically employed to interact with other countries. এক্ষেত্রে শ্লেচার প্রদত্ত সংজ্ঞা খুবই সংক্ষিপ্ত। তার মতে, 'বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম গ্রহণ করে তাকেই বিদেশ নীতি বলে।' যেমন– একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য যে কোনো বিষয়ে যে কোনো নীতি অনুসরণ করতে পারে এবং এটাই সে দেশের বিদেশনীতির আখ্যা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বিদেশনীতি বা পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে হার্টম্যানের ধারণা একটু ভিন্ন রকম। তার মতে, দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র যে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন নীতি অনুসরণ করে তাকেই বিদেশনীতি বলে। তবে তার মতে, নীতি কথাটার মধ্যে পরিকল্পনার ইঙ্গিত থাকে। কারণ নীতি অবশ্যই পরিকল্পিত হতে হবে।

পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে লার্কে ও সৈয়দের সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থবহ। লেখকদ্বয়ের বক্তব্য হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে। এগুলো মোকাবিলা করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে নানারকম নীতি গ্রহণ করতে হয়। আর এগুলোই হলো বিদেশনীতি। তারা বলেন, 'The foreign policy of a state usually refers to the general principles by which a state governs its reaction to the international enviornment.'। নীতির মাধ্যমেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করেই রাষ্ট্র হয় তার জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করে নতুবা ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তোলে বা মতাদর্শের সম্প্রসারণ ঘটায়।

কিন্তু রাসেট ও স্টার পররাষ্ট্রনীতির আরও বিশ্লেষণমূলক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তারা বিদেশনীতির মধ্যে নীতি ও বিদেশ দুটোকে পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে নীতি হলো সিদ্ধান্ত। আর সিদ্ধান্তের কাজ হলো আচরণের পথ প্রদর্শক হয়ে কাজ করা। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নীতি স্থির হয়। এক নীতির ব্যর্থতা নতুন নীতিকে আমন্ত্রণ জানায়। রাসেট ও স্টারের মতে বিদেশ কথাটার মধ্যে সার্বভৌমতা ও ভূখণ্ডীয়তা নিহিত রয়েছে। একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে যে ঘটনা ঘটে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা মোকাবিলা করতে গেলে অভ্যন্তরীণ নীতি দিয়ে হবে না। তাই অন্য আর এক ধরনের নীতি প্রয়োজন। তাদের মতে অন্য রাষ্ট্রের জনগণ এবং তাদের কাজকর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যে পথনির্দেশ তাকেই বিদেশনীতি বলা হয়। লক্ষ্যে উপস্থিত হতে হলে নানারকম নীতি থাকতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী নীতিটা নির্বাচন করে নেয়াই বিদেশনীতি।

সর্বোপরি, পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো রাষ্ট্রের সেসব কার্যের ধারা, যা সে দেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের কারণে তার সীমারেখার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে। তবে এ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে নিহিত থাকে দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী স্বার্থ।

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির গুরুত্ব : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ অর্জন ও সুরক্ষিত করতে চায়। জাতীয় স্বার্থ ছাড়া আরও বহুবিধ ব্যাপারে রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য আদর্শগত ও বস্তুগত দুই-ই হতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ যাই হোক না কেন তার বাস্তব রূপায়ণের জন্য পদ্ধতি বা কৌশল বিশেষভাবে প্রয়োজন। আবার পদ্ধতি যেমন– তেমন হলেও চলবে না। তাকে সুসংবদ্ধ, শৃঙ্খলবদ্ধ ও নির্দিষ্ট হতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে সুসংহত নীতি প্রচলিত এবং যার দ্বারা তাদের মধ্যস্থিত আচরণ নির্ধারিত এবং নীতিকে মাধ্যম হিসেবে

ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাকেই প্রাত্যহিক কথোপকথনে পররাষ্ট্রনীতি বলে। আর এ পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম।

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক শক্তি : একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। আর একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর। অন্যকথায়, অর্থনৈতিক শক্তি বলতে অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশের মাত্রাকেই বোঝায়। আর সহজ কথায় অর্থনৈতিক উন্নতি হলো শিল্পোন্নয়নের পরিমাণ। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বিপুল জনসংখ্যা ও পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তির সত্যিকারের মাপকাঠি হতে পারে না। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও জনসংখ্যাকে উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে নিয়োগই জাতীয় শক্তির ইন্ধনদাতা হতে পারে।

অরগ্যানস্কি এবং মর্গেনথ্যু প্রমুখ পণ্ডিতেরা অর্থনৈতিক বিকাশ বলতে শিল্পোন্নয়নই বোঝাতে চান। তবে প্রকৃতপক্ষে যে সমাজে বিপুল পরিমাণ কলকারখানা, শহর এবং অসংখ্য রকম উৎপাদন কাজে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি রয়েছে তাকেই শিল্পোন্নত সমাজ আখ্যা দেয়া যায়। শিল্পোন্নত সমাজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রচুর ভোগ্যবস্তু, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও পরিসেবা প্রস্তুত করে। তবে শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, এদের বিক্রয় ও বিপণনের ব্যাপক ব্যবস্থা শিল্পোন্নত সমাজে বিদ্যমান থাকবে। কারণ বিক্রয় না হলে উৎপাদন হবে না। আবার শিল্পোন্নত সমাজে উৎপাদন হবে সর্বাপেক্ষা। কম ব্যয়ে যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যই হলো উৎপাদন ব্যয়কে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা। প্রতিটি শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদন হবে সর্বাধিক। আর শ্রমিকের এ মাথাপিছু উৎপাদনের সাহায্যে দেশের অর্থনীতির হালচাল সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। মাথাপিছু উৎপাদন যত বেশি হবে দেশ তত উন্নত হয়েছে বলে মনে করা হবে।

সুতরাং অর্থনৈতিক শক্তি পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। কারণ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ তার পররাষ্ট্রনীতিকে এমনভাবে প্রণয়ন করে, যাতে তার বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো কাঁচামালের সরবরাহ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। একইভাবে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশও এমনভাবে তার পররাষ্ট্রনীতির বিন্যাস করে যাতে তার আমদানি ও রপ্তানি ব্যাহত না হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে সে যেসব দেশের ওপর নির্ভরশীল সেসব দেশের স্বার্থ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতিতে সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তাছাড়া বর্তমানে সব দেশই অর্থনীতিকে একটি দেশের সম্মান-মর্যাদার প্রধান বিষয় মনে করে। আর তাই পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক শক্তি : প্রতিটি দেশের জাতীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে সে দেশের সামরিক শক্তির মাধ্যমে। আর জাতীয় শক্তি হলো পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের মূল প্রভাবক। একটি দেশের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী অবশ্যই নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয়। আর শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করতে হলে এ তিনটি বিভাগকেই আয়তনে যথেষ্ট বড় এবং উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন হতে হবে। তাছাড়া সামরিক শক্তি সৈন্যবাহিনীর গুণগত দিক, উৎকর্ষতা ও প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভর করে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নতমানের হলে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র সেনাদলের হাতে থাকলে শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ করা সহজ হয়।

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। একদিকে সামরিক শক্তির কলেবর বৃদ্ধির জন্য পররাষ্ট্রনীতিকে সাজানো হয়, অন্যদিকে আবার সামরিক শক্তির প্রভাবে অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন বা সে দেশের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্রনীতিকে সাজানো হয়। যেমন– পাকিস্তানের সাথে চীনের বৈদেশিক সম্পর্ক বিশেষ করে পাকিস্তানের সামরিক ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য। একইভাবে, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান বন্ধু ভেবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছে ঐ

সামরিক সহযোগিতার বিষয়টি মাথায় রেখেই। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি যেমন দুর্বল দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রমুখী করেছে ঠিক একইভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির জোরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য দুর্বল দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সুযোগ নিতে চাচ্ছে।

উপসংহার : বর্তমানে প্রতিটি দেশেরই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন একটি জটিল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর মূল কারণ কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতিকে এড়িয়ে গিয়ে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা দুরূহ কাজ। একইভাবে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাপান ও জার্মানিকে সন্তুষ্ট রেখেই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হবে। আর প্রতিটি দেশকেই নিজেদের সামরিক শক্তির উন্নয়নে বা সামরিক কৌশলগত কারণে অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক সামরিক আধিপত্যের কারণে পররাষ্ট্রনীতিকে ভাবতে হবে। তাছাড়া প্রতিটি দেশের স্ব স্ব সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতারও স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় সে দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে।

০৫ ▌ ক. কূটনীতি বলতে কি বোঝেন?
খ. কূটনীতি ও বিদেশ নীতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

উত্তর : সাধারণত কূটনীতি হলো আপোসের কৌশল বা উপায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের অন্যতম উপায় হলো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা। কারণ বর্তমানে যে জাতীয় রাষ্ট্রের জোয়ার বইছে সে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সীমারেখা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। একইভাবে বর্তমান জগতের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতীয়তাভিত্তিক সার্বভৌম রাষ্ট্রকে বিশ্ব রাষ্ট্রে রূপান্তর করাও কখনো সম্ভব নয়। তবুও মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য বিশ্ব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আবশ্যক। আর বিশ্ব রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য একটি যথোপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রশমন, যে দ্বন্দ্বগুলো বিশ্বকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। স্থায়ী নিরাপত্তার জন্য পূর্বশর্ত স্থাপনের এ পদ্ধতিটিকে আপোসের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন বলে অভিহিত করা যায়। আর আপোসের এই কৌশলকেই বলা হয় কূটনীতি। তবে কূটনীতি এবং বৈদেশিকনীতির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কূটনীতি হচ্ছে বৈদেশিকনীতি বা পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যে প্রয়োগ করার পদ্ধতি।

কূটনীতির সংজ্ঞা : 'কূটনীতি'-এর ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে 'Diplomacy'। 'Diplomacy' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Diploun' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ভাঁজ করা। সভ্যতার বিবর্তনে 'Diploun' 'Diplomacy'-তে পরিণত হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং কূটনীতিবিদগণ কূটনীতির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানে একমত হতে পারেননি। তাই দেখা যাচ্ছে যে, 'কূটনীতি' শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত কূটনীতি হলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা। আবার কেউ একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা ও যোগাযোগকে কূটনীতি বলেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সে প্রক্রিয়াকে কূটনীতি বলা হয়। কিন্তু Sir Ernest Satow-এর মতে, 'কূটনীতি হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সরকারের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ।' অধ্যাপক নিকলসনের মতে, 'কূটনীতি হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পেশাদার ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা বৈদেশিক নীতির প্রয়োগ।' অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড ও

অধ্যাপক লিঙ্কন বলেন, 'The process of representation and negotiation by which states customarily deal with one another in time of peace.' অর্থাৎ, শান্তির সময়ে প্রতিনিধিত্ব এবং আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের সম্পর্ক রক্ষা করার পদ্ধতিই হচ্ছে কূটনীতি। The Oxford English Dictionary-তে কূটনীতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'Diplomacy is the management of international relations by regulations.' অর্থাৎ, কূটনীতি হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা।

লার্কে ও সৈয়দের সংজ্ঞায় কূটনীতি সম্পর্কে একটু ভিন্ন ধারণা পাওয়া যায়। তারা বলেছেন, 'Diplomacy, considered as a technique of state action, is essentially a process whereby communications from one government go directly into the decision making apparatus of another.' অন্যদিকে ফ্রাঙ্কেল বলেন, 'বিদেশনীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করাকে কূটনীতি বলে।' অর্থাৎ বিদেশনীতি বাস্তবায়নের মধ্যে কূটনীতি সীমাবদ্ধ নয়।

অত্যন্ত বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হাস ও হুইটিং কূটনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, 'বিভিন্ন রাষ্ট্র কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরস্পরের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং এক সময় এ চাপ ক্রমশ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। এ পুঞ্জিভূত চাপকেই কূটনীতি বলে।' উল্লেখ্য, দাবি-দাওয়া আদায় করতে গিয়ে উভয় পক্ষ আলোচনায় বসে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কিছু দাবি ত্যাগ করতে হয়। আর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনই কূটনীতির কাজ। অতএব কূটনীতি শুধু সংবাদ বা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া নয়, বরং আলাপ-আলোচনা এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই হার্টম্যান বোঝাপড়াকে কূটনীতির পর্যায়ভুক্ত করেছেন। হার্টম্যান বলেন, 'The art of diplomacy is the art of compromise : To know how and when to compromise is the allmarks of the accomplished negotiator'.

তবে এ কথা সত্য যে, আলাপ-আলোচনার উৎকর্ষের ওপর কূটনীতির সাফল্য নির্ভর করে। কূটনৈতিক কৌশলে পারদর্শী না হলে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া যায় না।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্রের মতাদর্শগত লক্ষ্যসীমায় উত্তরণের প্রয়াসে যে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা হয় তার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে কূটনীতির সারকথা।

কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি : বৈদেশিক সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু হলো কূটনীতি। পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ততম ভাষ্য হলো, 'It is the substance of foreign relations. অন্যদিকে Diplomacy proper is the process by which policy is carried out. তাই পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তব রূপায়ণে কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ এবং মতাদর্শের প্রভাব কূটনীতিবিদদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে দিয়েছে বলে অনেক সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করলেও পররাষ্ট্রনীতির আঙ্গিনা থেকে এখন পর্যন্ত অপসারিত হয়নি। তবে, আন্তর্জাতিক জীবনে কূটনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চলমান প্রক্রিয়া। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিচালন প্রক্রিয়ায় কূটনীতিকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাই কূটনীতির ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে বলে যতই সমালোচনামূলক কথা বলা হোক না কেন পররাষ্ট্রনীতিতে কূটনীতি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। নিচে পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে বিভিন্ন রকম সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে; যেমন– পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আইনসভা ও জনমত ইত্যাদি এবং এগুলোর নির্দিষ্ট ভূমিকাও রয়েছে। কিন্তু প্রণীত এ

নীতিকে কার্যকর করার জন্য যে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তি আবশ্যক তাকেই কূটনীতিবিদ বলে। সুতরাং নীতি নির্ধারণ ও নীতির বাস্তবায়ন দুটোই কূটনীতির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এজন্য পামার ও পারকিন্স বলেছেন, 'Diplomacy provides the machinery and the personnel by which foreign policy is executed. One is substance; the other is method.'

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশই জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে পররাষ্ট্রনীতি প্রস্তুত করে। তবে এক্ষেত্রে মতাদর্শেরও এক ধরনের প্রভাব থাকে। সুতরাং পররাষ্ট্রনীতি হলো একটি লক্ষ্য। আর লক্ষ্যে পৌঁছার অনেক ধরনের পথ রয়েছে। কূটনীতি হলো ঐসব পথের একটিমাত্র পথ। তবে গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলে কূটনীতি সেসব পথগুলোর শীর্ষে অবস্থান করে। মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনা এবং ভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে কূটনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করে।

তৃতীয়ত, পররাষ্ট্রনীতির সংকট মোকাবিলায় কূটনীতির বিশেষ ভূমিকা লক্ষণীয়। তবে এক্ষেত্রে দু' ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেলেও মূলত সংকটকালীন সময়েও কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির পরিপূরক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকদের মধ্যে দু' ধরনের বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। নিকলসন তার 'The Congress of Vienna' গ্রন্থে বলেছেন, 'শান্তির সময় কূটনীতি নানাবিধ পথ অবলম্বন করে উদ্দেশ্য অর্জনে লিপ্ত থাকে।' এ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় কেবল সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশেই কূটনীতি সমস্যা সমাধানে রত থাকে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে কূটনীতি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। তাই নিকলসনের এ বক্তব্যের সাথে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে পামার ও পারকিন্সের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তারা বলেন, 'It is misleading to suggest that diplomacy ceases to function when major international crises arise, especially if they lead war.'

সুতরাং, যেহেতু জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলে যুদ্ধের সময় যখন জাতীয় নিরাপত্তা সংকটের মুখোমুখি ভূমিকা পালন করতে হয়। উল্লেখ্য, শান্তি ও যুদ্ধের সময় কূটনীতিবিদদের ভূমিকা একই রকম থাকে না।

চতুর্থত, কূটনীতি পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে থেকে কাজ করে। অর্থাৎ কূটনীতি কোনো স্বাধীন সংস্থা নয়। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বারা পরিচালিত হয় তা স্বাধীন। অন্যদিকে কূটনীতি একটি পরাধীন সংস্থা যা নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে না।

পঞ্চমত, পররাষ্ট্রনীতিতে কূটনীতির ভূমিকা মুখ্য নয়। এজন্য বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে কূটনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকতে পারে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির কাজ কখনো স্থগিত থাকে না।

উপসংহার : পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে পররাষ্ট্র দপ্তর যদি নীতি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে কূটনীতি সে নীতি কার্যকর করার সাথে সংশ্লিষ্ট। কূটনীতিবিদগণ পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীন কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছানো নীতি। আর কূটনীতি হচ্ছে পেশাদার ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা সে নীতির প্রয়োগ। তাই অধ্যাপক নিকলসন লিখেছেন, 'Diplomacy is not an end but a means; not a purpose but a method. It seeks. by the use of reason, conciliation and the exchange of interests, to prevent major conflicts arising between sovereign states. It is the agency through which foreign policy seeks to attain its purpose by agreement rather than by war'। তবে বর্তমানে কূটনীতি বিদেশে দেশের স্বার্থ রক্ষা করার আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

০৬। কূটনীতির গুরুত্ব ও কার্যাবলী আলোচনাপূর্বক কূটনীতিবিদদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : সাধারণত কূটনীতি হলো আপোসের কৌশল বা উপায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের অন্যতম উপায় হলো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা। কারণ বর্তমানে যে জাতীয় রাষ্ট্রের জোয়ার বইছে সে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সীমারেখা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। একইভাবে বর্তমান জগতের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতীয়তাভিত্তিক সার্বভৌম রাষ্ট্রকে বিশ্ব রাষ্ট্রে রূপান্তর করাও কখনো সম্ভব নয়। তবুও মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য বিশ্ব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আবশ্যক। আর বিশ্ব রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য একটি যথোপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রশমন, যে দ্বন্দ্বগুলো বিশ্বকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। স্থায়ী নিরাপত্তার জন্য পূর্বশর্ত স্থাপনের এ পদ্ধতিটিকে আপোসের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন বলে অভিহিত করা যায়। আর আপোসের এই কৌশলকেই বলা হয় কূটনীতি। তবে কূটনীতি এবং বৈদেশিকনীতির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কূটনীতি হচ্ছে বৈদেশিকনীতি বা পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যে প্রয়োগ করার পদ্ধতি।

কূটনীতির গুরুত্ব ও কার্যাবলী (Importance and Functions of Diplomacy) : আধুনিক বিশ্বের অন্যতম বহুল আলোচিত বিষয় কূটনীতি। অবিচ্ছিন্ন বিশ্ব পল্লীর নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই বর্তমানে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। কূটনীতির উন্মেষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর বিকাশ ও বিশ্বরাজনীতিতে কূটনীতির প্রভাব আলোচনায় কূটনীতির অসীম গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই।

অনেকে মনে করেন, সাম্প্রতিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে কূটনীতিবিদদের ভূমিকা বা কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যবস্থায় কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে, এ কথার সত্যতা স্বীকার করা যায় না।

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দীর্ঘকাল ধরে অদ্যাবধি অব্যাহত গতিতে চলমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক জীবনে কূটনীতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রক্রিয়া।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও কূটনীতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অপরপক্ষে, বৈদেশিক সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু হলো কূটনীতি। কূটনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মর্গেনথাউ কূটনীতিকে আপোসের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির পূর্ব শর্ত প্রতিষ্ঠার হাতিয়াররূপে গণ্য করেছেন। তিনি কূটনীতিকে জাতীয় শক্তির অপরিহার্য উপাদানরূপে উল্লেখ করেছেন।

কূটনীতি বৈদেশিক নীতির সঠিক ও ফলপ্রসূ রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এছাড়াও কূটনীতি আরও বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। মরগ্যানথো কূটনীতির চারটি মৌলিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন–

প্রথমত, বাস্তব এবং সম্ভাব্য ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে কূটনীতি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে ফেলে। তবে ক্ষমতার কথা চিন্তা করে কূটনীতি তার উদ্দেশ্য স্থির করবে, অন্যথায় তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক সম্ভাব্য ক্ষমতা কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে তার সঠিক পরিমাপ বিচার করে, তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাষ্ট্র অতীতে যেমন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ছিল, বর্তমানেও তেমনি আছে। অনেকের মতে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এ নির্ভরশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কোনো একটি রাষ্ট্র এককভাবে নিজের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে, কূটনীতি অন্যান্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহকেও বিবেচনা করে তাদের মূল্যায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। কোনো রাষ্ট্র যদি অন্যান্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না থাকে, তাহলে তার নিজের উদ্দেশ্যও সঠিকভাবে স্থির করতে সক্ষম হবে না। এরূপ অবস্থায় কূটনীতি স্থাপনে, তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়ত, মর্গেনথাউ বলেছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্র যে জাতীয় বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে, কূটনীতির কাজ হলো সেগুলোর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রসমূহের নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ পরস্পরের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ, তা কূটনীতি নির্ধারণ করবে। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হলে কূটনীতিককে বিকল্প পথের অনুসন্ধান করতে হবে। অতএব, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণ করা কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

চতুর্থত, নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য কূটনীতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু তার সবগুলো গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। যথার্থ পথটি বেছে নেয়াই কূটনীতির কাজ।

নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য স্থির করা এবং তা কার্যকর করার জন্য কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মরগানথো কূটনীতির চারটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে কূটনীতি ব্যর্থ হলে জাতি দুধরনের বিপদের সম্মুখীন হবে। ঐ জাতিকে নিজের শক্তি অপচয় করতে হবে এবং শত্রুস্থানীয় জাতির আক্রমণ প্রতিরোধে সে ব্যর্থ হবে। এরূপ জাতীয় স্বার্থ অর্জন কূটনীতির লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবে।

কোনো জাতি অন্য জাতির লক্ষ্য এবং ঐ লক্ষ্য সাধনে তার শক্তি ও সামর্থ্যের বিষয় যথাযথভাবে অনুধাবন করতে না পারলে যুদ্ধের সূচনা ঘটবে।

মর্গেনথাউ শান্তি রক্ষার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত কূটনীতির সর্বশেষ দায়িত্বরূপে রাষ্ট্রের লক্ষ্য পূরণের উপযুক্ত মাধ্যম নির্ধারণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে কূটনীতি তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। যেমন— (১) যুক্তির সাহায্যে প্রত্যয় সৃষ্টি (Persuasion) (২) আপোস (Compromise) এবং (৩) বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন (Threat of force) মর্গেনথাউ মনে করেন, বল প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল কূটনীতি কখনো বুদ্ধিদীপ্ত ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। আবার এককভাবে যুক্তির সাহায্যে অন্যের মনে প্রত্যয় সৃষ্টিতে স্বার্থ এবং আপোসের ওপর নির্ভরশীলতাকেও বুদ্ধিদীপ্ত কূটনীতি বলা চলে না।

মর্গেনথাউ মনে করেন, কোনো বৃহৎ শক্তির প্রতিনিধি নিজের দেশ এবং শান্তির স্বার্থে একই সাথে যুক্তির মাধ্যমে অন্যকে স্বমতে আনার চেষ্টা করবেন। আপোসের সুযোগ গ্রহণ এবং নিজের সামরিক শক্তির সাহায্যে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবেন।

মর্গেথ্যু-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে যুক্তির সাহায্যে অন্যকে স্বমতে আনার প্রয়াস, আপোস এবং বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনের ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপের মধ্যে কূটনৈতিক কৌশল নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন বা কার্যাবলী সম্পন্ন করা ছাড়াও কূটনীতি যে কাজগুলো করে থাকে, তা হলো– ১. প্রতিনিধিত্বমূলক; ২. আলাপ-আলোচনা; ৩. প্রতিবেদন পাঠানো এবং ৪. স্বার্থ সংরক্ষণ।

এছাড়াও কূটনীতি সংঘর্ষ মীমাংসার কাজ করে। এছাড়া কোনো কোনো পণ্ডিত কূটনীতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজের কথা বলেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে যাতে ব্যাপক আদান-প্রদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে, কূটনীতি সেদিকে নজর দেয়। অনেক সময় সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কূটনীতি রীতিমতো তৎপর থাকে।

সম্প্রতি কূটনীতির একটি কাজ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে আলাদা নয়। তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও তাকে সফল করে তুলতে হলে, কূটনীতিবিদকে অবশ্যই সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে।

বর্তমানে কূটনীতিকে কার্যসূচি পরিচালনের কাজও করতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে কার্যসূচি পরিচালনা জনপ্রশাসনের এখতিয়ারভুক্ত হলেও কূটনীতি এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে।

কার্যসূচিগুলো হলো– বহুজাতিক সংস্থা ও সরকারি সংগঠন বিদেশে নানা রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকায় এসব সংস্থার কাজ-কারবারও ক্রমশ বেড়েই চলছে। তাই বহুজাতিক সংস্থা ও সরকারি সংগঠনসমূহ ও বৈদেশিক দপ্তরসমূহ কূটনীতির আওতায় অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে গেছে। কার্যসূচির ব্যর্থতা কেবল আর্থিক ক্ষতির বহর বাড়িয়ে তোলে না, দেশের ভাবমূর্তিকেও বিনষ্ট করে। তাই কূটনীতিকে অবশ্যই এদিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। এটা কূটনীতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং এ বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কূটনীতিকে বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করতে হয়।

আজকাল বহু-সম্পদশালী রাষ্ট্র উন্নয়নশীল বিকাশমান রাষ্ট্রকে নানাভাবে সাহায্য করছে। এ বিদেশী সাহায্য কতখানি কার্যকর বা ফলপ্রসূ হচ্ছে কূটনীতিকে তার খেয়াল রাখতে হয়। সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত কিনা এবং কী পরিমাণ ও কী জাতীয় সাহায্য দেয়া যেতে পারে, তাও কূটনীতির পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত।

উপসংহারে বলা যায়, কূটনীতি পূর্বাপেক্ষা হ্রাস তো পায়ইনি- উপরন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে।

কূটনীতিবিদদের ভূমিকা ও কার্যাবলী (Role and Functions of Diplomats) : বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনার জন্যই কোনো রাষ্ট্রের কূটনীতি পরিচালিত হয়ে থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতগণ কূটনৈতিক কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অন্য রাষ্ট্রে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতগণ নিজ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হন। রাষ্ট্রদূতগণের ওপর নিজ দেশের ভাবমূর্তি বিদেশে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। তাছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের নিকট থেকে নিজ দেশের জন্য কতটুকু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যেতে পারে, সে বিষয়েও কূটনীতিকে তৎপর থাকতে হয়। অর্থাৎ বিদেশে নিজ দেশকে সফল ও স্বার্থকভাবে পরিচিত করার দায়িত্ব একজন কূটনীতিবিদের ওপরই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং কূটনীতিবিদগণ সর্বদাই বিশেষ সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত। সকল রাষ্ট্রেই কূটনীতিবিদদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এবং তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের কার্য সম্পন্ন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে তাদেরকে বিশেষ কতকগুলো সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রদূতগণকে যেসব বহিঃরাষ্ট্রে নিয়োগ প্রদান করা হয়, তারা সেসব রাষ্ট্রের সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের আওতায় থাকেন না। রাষ্ট্রদূতগণ, তাদের অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, তাদের পরিবার-পরিজন সকলেই নিজ নিজ রাষ্ট্রের সরকারের অধীন হিসেবে কাজ করেন। অনেক রাষ্ট্রেই

রাষ্ট্রদূতদের জন্য নির্ধারিত অফিস ও বাসভবনের স্থানকে তাদের নিজস্ব সরকার ও রাষ্ট্রের জায়গা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তারা যে দেশে নিযুক্ত হয়ে থাকেন, সে দেশের সরকার বা সরকারি কর্মকর্তাদের কোনো প্রকার কর্তৃত্ব তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বীকৃত হয় না। কূটনীতিবিদগণ নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ কর বা বাণিজ্য শুল্ক প্রদান করেন না। রাষ্ট্রদূতগণ যেসব রাষ্ট্রে কর্মরত থাকেন, তাদেরকে সেসব রাষ্ট্রের দেওয়ানি ও ফৌজদারি এখতিয়ারের বাইরের বলে মনে করা হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের কর্মচারীগণও কূটনীতিবিদদের সমতুল্য অধিকার ভোগ করে থাকেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, তা হলো কোনো রাষ্ট্রদূত বা তার অফিসের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে যদি কোনো প্রকার সমাজবিরোধী, অবাঞ্ছিত বা অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত থাকেন, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার তাকে সে দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারে।

একটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সে দেশের কূটনীতি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন কূটনৈতিক কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষ মেয়াদে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকেন। কোনো রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি কী হবে তা সে দেশের আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। আইনসভাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থিরিকৃত বৈদেশিক নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সকল প্রকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আধুনিক রাষ্ট্রে কূটনীতিবিদ বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকেন। পালমার এবং পারকিনস এর মতে, কূটনীতিবিদ মাঝে মাঝে নিজের দেশের সরকারের চক্ষু এবং কর্ণের ভূমিকা পালন করেন। তার মুখ্য দায়িত্ব হলো অন্য রাষ্ট্রে নিজ দেশের নীতির প্রয়োগ। নিজের দেশ ও নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে নিজের সরকারকে অবহিত রাখা। পালমার এবং পারকিনস প্রধানত সরকারের নীতি কার্যকর করা, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সংবাদ ও তথ্য প্রেরণমূলক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

জোসেফ সি. গ্রেউ (Grew)-এর মতে, কূটনীতিবিদ প্রধানত একজন দোভাষী এবং দু'ভাবে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে যে দেশে নিয়োগ করা হয়, তিনি সে দেশকে ভালোভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেন। ঐ দেশের অবস্থা, মানসিকতা, কার্যাবলী এবং দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। স্বদেশের সরকারের নিকট তিনি ঐসব বিষয় পেশ করেন। আবার তিনি যে দেশে নিযুক্ত হন, সে দেশের সরকারকে স্বদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। রাষ্ট্রদূতকে দুটি রাষ্ট্রের ভাবধারা এবং শক্তির পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমরূপে গণ্য করা হয়।

জে আর চাইল্ডস কূটনীতিবিদদের কার্যাবলীকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; (ক) প্রতিনিধিত্ব (Representative) (খ) আলাপ-আলোচনা (Negotiation) (গ) প্রতিবেদন প্রেরণ (Reporting) (ঘ) বিদেশে জাতি এবং স্বদেশের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করা (The protection of the interest of the nation and of its citizens in foreign lands)।

কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কার্যাবলীকে মর্গেনথাউ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। (১) প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব (Symbolic representation) (২) আইনগত প্রতিনিধিত্ব (Legal representation) (৩) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব (Political representation)।

মর্গেনথাউ যাকে প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন, পালমার এবং পারকিনস সেটাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী বলে অভিহিত করেছেন। আইনগত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রতীকী

প্রতিনিধিত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত। মর্গেনথাউ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বলতে মূলত পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে কূটনীতিবিদদের ভূমিকার মূল্যায়ন করেছেন।

কূটনীতিবিদদের কার্যাবলীকে কৌলৌম্বিস ও উলফে দু ভাগে ভাগ করেছেন। ১. নিয়মমাফিক কার্যাবলী (Routine functions) ও ২. বিষয়গত কার্যাবলী (Substantive functions)।

নিয়মমাফিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো বিদেশে স্বদেশের নাগরিকদের জন্ম-মৃত্যু বিবাহ ও বিবাহের হিসাবরক্ষণ। পাসপোর্ট বৈধকরণ ও পরিবর্তন এবং স্বদেশের নাগরিকদের সম্পত্তি এবং এবং অন্যান্য স্বার্থ সংরক্ষণ, সামাজিক, কূটনৈতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ভোজসভায় যোগদান প্রভৃতি।

বিষয়গত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী হলো কূটনৈতিক প্রতিবেদন প্রেরণ, আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি।

কূটনীতিবিদদের কার্যাবলী সম্পর্কে কে জে হলসটি বলেছেন, কূটনীতিবিদদের প্রধান কার্যাবলী হলো বিদেশে নিজের দেশের নাগরিকদের সম্পত্তি রক্ষা, প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব, সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ দান এবং নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কূটনীতিবিদদের কার্যাবলীকে নিম্নোক্ত কতকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **কূটনীতিবিদগণ বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন :** বহিঃরাষ্ট্রে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতগণ হলেন সবচেয়ে বড় কূটনীতিবিদ। বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, রক্ষাকরণ ও স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এরা কূটকৌশলগত বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করেন। কোনো দেশের প্রেরিত রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমেই অন্য দেশের কাছে ঐ দেশ পরিচিত হয়। বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক প্রতিনিধি অন্য দেশে নিযুক্ত হলে, তিনি সেই দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে সকল সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আবার নিজেও বিদেশস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঐ রাষ্ট্রের মন্ত্রী, সরকারি কর্মচারী এবং সে দেশের নিযুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ ও আপ্যায়ন করতে পারেন।

   কূটনীতিবিদগণ নিজ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতীক হিসেবে কাজ করে থাকেন। অতীতে বর্তমান সময়ের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন না ঘটার ফলে কূটনীতিবিদগণই বিদেশে তাদের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানদের হয়ে কার্য পরিচালনা করতেন। বর্তমান সময়ে যোগাযোগব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণই অতি অল্পসময়ের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে নিজ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারেন। তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক কার্যাবলী সে দেশে নিয়োগপ্রাপ্ত দক্ষ কূটনীতিকগণই সম্পন্ন করে থাকেন। সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান, জাতীয় উৎসব অথবা শোকসভা প্রভৃতিতে কূটনীতিবিদগণ নিজ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। কোনো রাষ্ট্রদূতকে তার নিজের দেশের সরকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে।

২. **কূটনীতিকগণ যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব পালন করেন :** রাষ্ট্রদূতগণ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে নিযুক্ত দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নিজ দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নানা প্রকার সমস্যাবলী নিয়ে রাষ্ট্রদূতগণ নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন চুক্তির খসড়াও প্রস্তুত করেন।

কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতীকী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন করেন না, তিনি বৈধ প্রতিনিধিত্বের কাজও করে থাকেন। কূটনীতিবিদগণ নিজ রাষ্ট্র ও নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং কূটনীতিবিদের স্বাক্ষর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের স্বাক্ষর বলে বিবেচিত হয়। তিনি যাবতীয় সভা-সমিতিতে যোগদান করেন এবং সর্বত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন। কূটনীতিবিদগণ যখন তার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, তখন তিনি রাষ্ট্রেরই মতামত ব্যক্ত করেন– সেখানে তার নিজের মতামত প্রকাশ করা হয় না।

রাষ্ট্রদূত যে দেশে নিয়োগ লাভ করেন, সে দেশে বসবাসরত নিজ দেশের নাগরিকদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর তত্ত্বাবধান করাও রাষ্ট্রদূতের অন্যতম প্রধান কাজ। রাষ্ট্রদূতের নিজ দেশের নাগরিকগণ যাতে অন্য রাষ্ট্রে তাদের চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার অন্যায়, অবিচার বা সমস্যার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়েও রাষ্ট্রদূতকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া এসব নাগরিক কোনো অসামাজিক বা অপরাধমূলক কাজ করে বিদেশে নিজ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে কিনা, সেদিকেও রাষ্ট্রদূতগণ প্রভূত সতর্কতা অবলম্বন করেন।

৩. **তথ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত কাজ :** কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত রাষ্ট্রের বৈধ সংবাদ ও তথ্যাবলী সংগ্রহ করে নিজ দেশকে তা প্রেরণ করেন। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় যে বৈদেশিক নীতি প্রস্তুত করে তার তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করেন কূটনীতিবিদ। এ প্রসঙ্গে পালমার ও পারকিনস বলেছেন, Reports from diplomats in the field are the raw material of foreign policy. These reports cover nearly every conceivable subject, from the technical studies to appraisals of psychology of nations. এ কারণেই একজন কূটনীতিবিদকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিবেদক বলা হয়। রাষ্ট্রদূত অবস্থানকারী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থাও নিজ দেশের সরকারকে অবগত করেন। রাষ্ট্রদূত পৃথিবীর যে প্রান্তের যত দূরের রাষ্ট্রেই নিয়োগপ্রাপ্ত হন না কেন, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ তার নিজ দেশের সরকারের হাতেই থেকে যায়। রাষ্ট্রদূতকে তার নিজ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে তারবার্তা, টেলিফোন ও টেলেক্স, ফ্যাক্স, ইমেইল প্রভৃতির মাধ্যমে করণীয় কাজ সম্পর্কে নির্দেশ পাঠানো হয় এবং সমগ্র বিষয়েই উক্ত নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্রদূতকে কর্ম পরিচালনা করতে হয়।

একজন রাষ্ট্রদূতকে নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে অবস্থানকালে নিজ বিবেচনার ওপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। তাছাড়া বর্তমানের আন্তর্জাতিকতার যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানগণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একত্রে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদন করে থাকেন। এসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ অথবা তার কোনো বিশেষ প্রতিনিধি যোগদান করেন। ফলে রাষ্ট্রদূতগণের এক্ষেত্রে তেমন কিছুই করণীয় থাকে না। তবে রাষ্ট্রদূতদের কার্যাবলী সংকুচিত হয়েছে বা তাদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। বর্তমান সময়ে বিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতগণকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়।

৪. **তথ্য সংগ্রহের কাজ :** প্রকৃত অর্থে বিদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে হয়। রাষ্ট্রদূতগণ যে দেশে কর্তব্যরত থাকেন, তাকে সে দেশের পররাষ্ট্রনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত নীতি, সামরিক নীতি এবং সামরিক বিষয়ে সেসব রাষ্ট্রের প্রস্তুতি, জনমত, রাজনৈতিক

দলসমূহের মনোভাব প্রভৃতি সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের এসব তথ্য ও সংবাদ আহরণের জন্য রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়কে অনেক সময় গুপ্তচরের কাজও করতে হয়। যদিও আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে রাষ্ট্রদূতগণ বা কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ কখনো গুপ্তচরের কাজ করতে পারেন না। কিন্তু দেখা যায় যে, কখনো কখনো বিদেশে অবস্থিত রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়গুলো তাদের নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ আদায় ও সংরক্ষণের জন্য এরূপ গোপন গুপ্তচর বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ে নানান পদমর্যাদা ও শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীও নিযুক্ত থাকে। এসব কর্মকর্তাগণও নিযুক্ত দেশ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ বিষয়ে নানা ধরনের তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে রাষ্ট্রদূতকে সাহায্য করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত দেশ সম্পর্কে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাষ্ট্রদূতকে নিয়মিতভাবে তার নিজ সরকারের কাছে প্রেরণ করতে হয়। মূলত রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রেরিত এসব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই তার সরকার সে দেশ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে থাকে। রাষ্ট্রদূত প্রেরিত রিপোর্টে তার নিযুক্ত রাষ্ট্রের নীতি ও মনোভাব সঠিক, সুস্পষ্ট ও যথাযথভাবে বর্ণিত না হলে, সে দেশ সম্পর্কে তার নিজের সরকার সঠিক ও নির্ভুলভাবে কোনো নীতি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। রাষ্ট্রদূতগণ তার নিজের সরকারের নিকট থেকেই বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, রাষ্ট্রদূত তার নিজের সরকারের মনোরঞ্জনের জন্য এবং যে সংবাদে তার সরকার খুশি হবেন সেরূপ সংবাদ প্রেরণ করে তোষামোদকারীর ভূমিকাও পালন করেন। যদিও ঐরূপ সংবাদের কোনো সত্যতা বা বাস্তব ভিত্তি বা নির্ভরযোগ্যতা কিছুই থাকে না। কেবলমাত্র ভালো সংবাদ প্রেরণের মাধ্যমে নিজ প্রভুকে খুশি করার মানসিকতা নিয়ে রাষ্ট্রদূতগণ অনেক সময় দায়িত্বহীন তথ্য প্রেরণ করেন। যাতে সাময়িকভাবে নিজ সরকারকে সন্তুষ্ট করা গেলেও ভবিষ্যতের জন্য এক মহাসঙ্কটের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রদূতগণ সাধারণত রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এবং দলীয় সরকারের অনুগত হয়ে কাজ করেন। এর ফলে অনেক সময় বিদেশে অবস্থানকালে তার পক্ষে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের নিরিখে কাজ করতে হয়। যার ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। সর্বদা নিজ দেশের সরকারের সুনজরে থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করলে রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা হয় না।

রাষ্ট্রদূতগণের বিশেষ দায়িত্ব হলো তার নিজের দেশের নীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ বিদেশে প্রচার করা এবং সে নীতি ও আদর্শের পক্ষে বিদেশে জনমত গঠন করা। তাছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের জাতীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও রাষ্ট্রদূতগণের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রদূত তার ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, চালচলন, কথাবার্তা, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষারুচি প্রভৃতি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের সরকার ও উচ্চ পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে তৎপর থাকবেন। অন্যথায় কোনো রাষ্ট্রদূতের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করা পুরোপুরিভাবে কখনোই সম্ভব হবে না।

৫. **বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ :** রাষ্ট্রদূতগণ অনেক সময় নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের নিজ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন। বহিঃবাণিজ্য বিষয়ক কর্ম সম্পাদনের জন্য বিদেশে বাণিজ্য দূতগণকে নিয়োগ দান করা হয়। যদি এসব বাণিজ্য দূত অনুপস্থিত থাকেন অথবা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়োগ না দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতগণই কনসাল (Consuls) বা বাণিজ্য দূতের দায়িত্বও পালন করতে পারেন। বর্তমানে কূটনীতিবিদগণ কার্যসূচি পরিচালনার কাজও করে

থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে কার্যসূচি পরিচালনা করা জনপ্রশাসনের এখতিয়ারভুক্ত হলেও কূটনীতি এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। সাম্প্রতিক অনেক বহুজাতিক সংস্থা ও সরকারি সংগঠন বিদেশে নানা রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকায় এসব সংস্থার কাজ কারবারও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর ফলে বহুজাতিক সংস্থা ও সরকারি সংগঠনসমূহ অবশ্যম্ভাবী রূপে বৈদেশিক দপ্তর ও কূটনীতির আওতায় এসে গেছে। কার্যসূচির ব্যর্থতা কেবল আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে না, দেশের ভাবমূর্তিকেও কালিমালিপ্ত করে। এ বিষয়ে লক্ষ রাখা কূটনীতিবিদদের একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. **বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা :** কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রেরণকারী রাষ্ট্রের সাথে অবস্থানকারী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকা। একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলেই উন্মুক্ত হয় পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বার। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ফলে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সংকটে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। একজন দক্ষ ও কুশলী কূটনীতিবিদই পারেন ভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে নিজ দেশের সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে। একজন রাষ্ট্রদূতের অন্যতম প্রধান কাজ হলো তার নিজের ও নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

বিশ্বের বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে যাতে ব্যাপক আদান-প্রদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে, একজন কূটনীতিবিদ সেদিকেও খেয়াল রাখেন।

মরগানথো বলেন, কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কেবলমাত্র বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে পররাষ্ট্রনীতির স্নায়ুকেন্দ্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণকারী চক্ষু-কর্ণ হিসেবেই গণ্য করা হবে না। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের পররাষ্ট্রনীতির মুখগহ্বর এবং হাত রূপেও গণ্য করা যায়। কারণ তাঁদের মাধ্যমেই স্নায়ুকেন্দ্র থেকে উদ্ভূত অনুভূতি শব্দ এবং ক্রিয়াকলাপে পরিণত হয়।

কূটনীতিবিদদের কার্যাবলী ও ভূমিকা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কূটনীতিবিদদের কার্যাবলী ও দায়িত্বের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত।

০৭। 'কূটনীতি বিদেশনীতি পরিচালনার একটি হাতিয়ার'— আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো বিশ্ব ব্যবস্থার অংশীদার বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক সমন্বিত রূপ। রাষ্ট্রসমূহের নানামুখী স্বার্থ অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগত স্বার্থের জটিল সমীকরণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি আবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রই আপন আপন স্বার্থ ও অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বতন্ত্র নীতি ও কৌশল অবলম্বন করত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিচরণ করে, যাকে বলা হয় পররাষ্ট্র নীতি (Foreign Policy)। রাষ্ট্রগুলো শক্তিমত্তা, নীতি-আদর্শ ও অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র তার বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কর্মপন্থা অবলম্বন করতে পারে। তবে সাধারণত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রক্ষার একটি প্রচলিত ধারা হলো কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি রাষ্ট্রই তার পররাষ্ট্র নীতি ও কৌশলের বাস্তবায়নের জন্য কূটনৈতিক পন্থার আশ্রয় নেয়।

কূটনীতির অর্থ : 'কূটনীতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Diplomacy। এ শব্দটি দ্বারা বাস্তবিক ক্ষেত্রে কি বোঝানো হয় তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে বিস্তর। তবে সাধারণভাবে কূটনীতি বলতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার একটি সুনিপুণ ও দক্ষ কৌশল হিসেবে মনে করা হয়। এর স্বাভাবিক রূপ হলো রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে The Oxford English Dictionary-তে Diplomacy বলতে বোঝানো হয়েছে, 'The management of international relations by negotiation.' অর্থাৎ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনাই হলো কূটনীতি।

অন্যদিকে অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন বলেছেন, 'The process of representation and negotiation by which states customarily deal with one another in time of peace.' তাছাড়া অধ্যাপক হ্যারল্ড নিকলসন তার The Congress of Vienna-তে উল্লেখ করেন, 'It is the agency through which foreign policy seeks to attain its purpose by agreement rather than by war.'

এদের সংজ্ঞায় এটি সুস্পষ্ট যে কূটনীতি বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়ন ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি শান্তিপূর্ণ মাধ্যম বা প্রক্রিয়া এবং স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই তা কার্যকর থাকে।

তবে কূটনীতির বাস্তবধর্মী ও ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিয়েছেন হাস ও সুইটিং। তাদের মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্র কিছু সুযোগসুবিধা আদায় ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরস্পরের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং একসময় এ চাপ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এ পুঞ্জীভূত চাপকেই কূটনীতি বলে।

তাছাড়া Sir Ernest Mason Satow বলেন, 'Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states.' অর্থাৎ কূটনীতি হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সরকারের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ।

সর্বোপরি, বিভিন্ন রাষ্ট্র তার নিরূপিত জাতীয় স্বার্থ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াসে যে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে বাস্তবে রূপদানের যে কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে তাই কূটনীতি।

কূটনীতি বিদেশনীতি পরিচালনার একটি হাতিয়ার– কথাটির ব্যাখ্যা : বিদেশনীতি বা পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থকে (National interest) সংরক্ষণ করা। এটি একটি দেশের পররাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনার গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে। বলা হয়, 'It is the substance of foreign relation' অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি হলো বৈদেশিক সম্পর্কের মূল বক্তব্য। অন্যদিকে কূটনীতি হলো এ নীতিকে বাস্তবায়ন তথা কার্যকর করার মাধ্যম বা প্রক্রিয়া। পামার এবং পারকিন্সের মতে, Diplomacy proper is the process by which policy is carried out. অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যকর করার প্রক্রিয়াই হলো কূটনীতি। সুতরাং একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি এবং লক্ষ্যকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে উপস্থাপন, সে অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কূটনীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক যে পর্যায়েই হোক না কেন কূটনীতির আশ্রয় ছাড়া পররাষ্ট্র নীতি ও সম্পর্কের বিষয়টি অচল হতে বাধ্য। নিম্নে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবে কূটনীতির ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু তথা পররাষ্ট্র নীতি ও কৌশল নির্ধারণে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান; যেমন– রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনসভা প্রভৃতির ভূমিকা থাকে। কিন্তু তাদের এ নীতির সাথে অন্যান্য দেশের নীতি ও স্বার্থের সমন্বয় করত তাকে বাস্তবে রূপদানে যারা মূল ভূমিকা পালন করেন তারা

হলেন কূটনীতিবিদ। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কুশলী কর্মকাণ্ড পররাষ্ট্রনীতিকে অবয়ব দান করে। অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতিকে পররাষ্ট্র সম্পর্কের কাঁচামাল বলা যায় যা কূটনৈতিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে পালমার ও পারকিন্সের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাদের মতে, 'Diplomacy provides the machinery and the personnel by which foreign policy is executed.'

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিরই অনেকগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নানামুখী পদ্ধতি, কৌশল ও মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, যেমন– শক্তি প্রয়োগ, প্রচারণা, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম ও পদ্ধতি হলো কূটনীতি। আধুনিক বিশ্বে কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; যেমন– স্থায়ী প্রতিনিধি, অ্যাম্বেসি, কন্সুলেট প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাধারণত কূটনীতি প্রাতিষ্ঠানিক হলেও এর অনেকগুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক কৌশলও আধুনিককালে অবলম্বন করা হয়।

তৃতীয়ত, কোনো একটি দেশ তার পররাষ্ট্রনীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এক্ষেত্রে কখনও কখনও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নও হতে পারে। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, কূটনীতি কেবল শান্তির সময়ই কার্যকর থাকে। যুদ্ধ বা গোলযোগের সময় কূটনীতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে হ্যারল্ড নিকলসন তার 'The Congress of Vienna' গ্রন্থে বলেন, 'It is the agency through which foreign policy seeks to attain its purpose by agreement rether than by war.' তার মতে, কূটনীতি হলো একটি শান্তির মাধ্যম। যখন কূটনীতি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় তখন তা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে কিন্তু এমতাবস্থায়ও পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর থাকে। যদিও পররাষ্ট্রনীতির সর্বশেষ অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধ। কিন্তু নিকলসনের এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে পালমার এবং পারকিন্স বলেন, 'Diplomacy does not cease of function, as Nicolson suggests, in time of war; although it necessarily plays a different role in wartime, the work of diplomats, as of foreign ministers, may even expand.'

সুতরাং কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতিকে শান্তিপূর্ণ বাস্তবায়নে সহায়তা করলেও যুদ্ধের সময়ে তার সহযোগিতা অব্যাহত রাখে এবং নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

চতুর্থত, আধুনিক কূটনীতিতে গতানুগতিক মিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দফতরের বাইরেও অনেক কৌশল অবলম্বন করা হয়, যা সরাসরি কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয় না কিন্তু দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে চীন-যুক্তরাষ্ট্র পিংপং ডিপ্লোমেসি কিংবা ভারত-পাকিস্তানের Cricket diplomacy এর বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

পঞ্চমত, কূটনীতি কেবল দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয় বরং বহু পাক্ষিক সংস্থা, সংগঠন ও ফোরামের কার্যক্রম ও কূটনৈতিক কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও ভূমিকা এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় তার স্বার্থ সংরক্ষণে কূটনীতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার : সর্বোপরি কূটনীতি ও বিদেশনীতি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং পররাষ্ট্রনীতি বৈদেশিক সম্পর্কের যে গাইডলাইন ও লক্ষ্য স্থির করে কূটনীতি তা বাস্তবায়নে তৎপর থাকে। সুতরাং কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থা। অবশ্য কূটনৈতিক ব্যর্থতা কোনো একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর করার পথে দারুণ বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কূটনীতিই একমাত্র পথ এ কথা বলা যাবে না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ **পররাষ্ট্রনীতি (Foreign policy) কি?**

উত্তর : অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হলো পররাষ্ট্রনীতি এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ হলো যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। তাই সাবেক সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন বলেছেন, 'We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual and those interests it is our duty to follow.' অর্থাৎ আমাদের কোনো শাশ্বত মিত্র নেই এবং আমাদের কোনো চিরস্থায়ী শত্রুও নেই। আমাদের স্বার্থই হলো শাশ্বত ও চিরস্থায়ী এবং স্বার্থকে অনুসরণ করাই হলো আমাদের দায়িত্ব। তবে জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণে প্রণীত এ পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রভাব সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র দেশগুলো আন্তর্জাতিকভাবে তেমন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে না বিধায় তাদের পররাষ্ট্রনীতিও তারা সেভাবে ঢেলে সাজায়, যেন অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী কোনো দেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয় বা সেসব দেশের জাতীয় স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। একইভাবে, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশগুলো তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে এমনভাবে প্রণয়ন করতে পারে; যার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যধিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সেসব দেশগুলো তাদের জাতীয় স্বার্থকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়।

পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে লার্কে ও সৈয়দের সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থবহ। লেখকদ্বয়ের বক্তব্য হলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে। এগুলো মোকাবিলা করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে নানারকম নীতি গ্রহণ করতে হয়। আর এগুলোই হলো বিদেশনীতি। তারা বলেন, 'The foreign policy of a state usually refers to the general principles by which a state governs its reaction to the international enviornment.'।

সর্বোপরি, পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো রাষ্ট্রের সেসব কার্যের ধারা, যা সে দেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের কারণে তার সীমারেখার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে। তবে এ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে নিহিত থাকে দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী স্বার্থ।

প্রশ্ন-০১ **কূটনীতি (Diplomacy) কি?**

উত্তর : সাধারণত কূটনীতি বলতে বোঝায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং কৌশলের প্রয়োগ। আভিধানিক অর্থে কূটনীতি হলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা। আন্তর্জাতিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকেই সৃষ্টি হয় নানাবিধ সমস্যা বা সম্পর্কের বিচিত্র গতি-

প্রকৃতি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বা সুনিপুণ পরিচালনার জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাই কূটনীতি নামে পরিচিত। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ-আলোচনাকেও কূটনীতি বলে।

প্রশ্ন-০২ প্রকাশ্য কূটনীতি (Open Diplomacy) কি?

উত্তর : আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রায়ন ঘটেছে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রেই। গণতন্ত্রায়নের অর্থ হলো স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা। বর্তমানের কূটনীতি অতীতের মতো গোপনীয় বা লুকায়িত কূটনীতি নয়। গণতান্ত্রিক কূটনীতির এ রূপকে 'প্রকাশ্য কূটনীতি' বা Open Diplomacy বলে আখ্যা দেয়া হয়।

প্রশ্ন-০৩ কূটনীতিবিদদের কাজগুলো কি কি?

উত্তর : কূটনীতিবিদদের কার্যাবলীকে নিম্নোক্ত কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায় : ১. কূটনীতিবিদগণ বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব, ২. কূটনীতিকগণ যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব পালন, ৩. তথ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত কাজ, ৪. তথ্য সংগ্রহের কাজ, ৫. বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ, ৬. বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

প্রশ্ন-০৪ কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের শ্রেণী বিভাজন লিখুন।

উত্তর : কোনো রাষ্ট্রের কূটনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়। যেমন—

ক. রাষ্ট্রদূতগণ এবং পোপের দূত (Ambassador and High Commissioner) এবং (Nuncio).
রাষ্ট্রদূতগণ বিদেশে তার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রদূতগণ নিজ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বহিঃরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে প্রেরিত হন।
ভ্যাটিক্যান জাতীয় নগররাষ্ট্রের বৈদেশিক প্রধান প্রতিনিধিকে পোপের দূত বা Nuncio বলা হয়।

খ. বিশেষ কূটনৈতিক মন্ত্রী, কূটনৈতিক প্রতিনিধি (envoys) এবং পোপের উপদূত (internuncio). যারা রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট প্রেরিত হন।

গ. চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স- রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে অথবা নতুন কোনো দূত নিয়োগ করা হয়নি এমন পরিস্থিতিতে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হন।

এছাড়াও রয়েছেন কাউন্সিলর (Counselor) এবং সেক্রেটারিগণ। সেক্রেটারিদের মধ্যে আবার তিন শ্রেণীর বিভাজন রয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় (1st secretary, 2nd secretary, 3rd secretary) সেক্রেটারি। এছাড়াও থাকেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাচি (Attache) ও সহকারী অ্যাটাচিগণ।

প্রশ্ন-০৫ গণতান্ত্রিক কূটনীতি কি?

উত্তর : বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কূটনীতির পরিচালনা পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক ভূমিকায় নানা পরিবর্তনের সাথে সাথে কূটনৈতিক চিন্তা-ধারায় স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা লক্ষ্য করা যায়। অতীতের গোপনীয় বা লুকায়িত কূটনীতির পরিবর্তে এখন কূটনীতিতে এসেছে গণতান্ত্রিক ধারা এরূপ ধারার কূটনীতিকেই গণতান্ত্রিক বা প্রকাশ্য কূটনীতি বলা হয়। প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত রাজারা বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি করলে তা জনসমক্ষে অপ্রকাশিতই থেকে যেত। এরূপ গোপনীয়তা রাষ্ট্রের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব তৈরি করত। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রের জোয়ারে জনগণের সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছে। আর জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই প্রকাশ্য কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। একটি দেশের সরকারের ক্ষমতা চর্চার পিছনে যেমন গণসমর্থনের প্রয়োজন; তেমনি সরকারের কূটনীতির পিছনেও জনসমর্থন প্রয়োজন এটাই গণতান্ত্রিক কূটনীতির মূল বক্তব্য।

প্রশ্ন-০৬ গোপন কূটনীতি কি?

উত্তর : প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজারা বহিঃরাষ্ট্রসমূহের রাজাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি করতেন। কিন্তু, তা সাধারণ জনগণের সমক্ষে কখনো প্রকাশিত হতো না। কেবল রাষ্ট্রসমূহের শাসকদের মধ্যে এরূপ গোপনীয়তার কারণে জনগণ এসব ব্যাপারে অজ্ঞতার অন্ধকারেই থেকে যেত। এরূপ গোপনীয়তাকেই বলা হয় গোপন কূটনীতি (Secret Diplomacy)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত এরূপ কূটনীতির বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় থেকেই মানুষের মনে এরূপ ধারণার উদ্ভব হতে থাকে, গোপন কূটনীতির প্রথা বিশ্বশান্তি স্থাপনের পক্ষে বিরাট অন্তরায়। ফলে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গোপন কূটনীতির পরিবর্তে গণতান্ত্রিক কূটনীতিক ধারার সূচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন গোপন কূটনীতির ব্যর্থতা ও সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে অধিক সচেতন হচ্ছে।

প্রশ্ন-০৭ ব্যক্তিগত কূটনীতি কি?

উত্তর : বিশ্বায়নের এ যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব সম্মেলনে বা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কূটনীতি পরিচালনা করে থাকেন, যাতে রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ ভূমিকা থাকে না। এ ধরনের কূটনীতিকেই ব্যক্তিগত কূটনীতি (Personal Diplomacy) বা সম্মেলনের মাধ্যমে কূটনীতি (Diplomacy by Conference) বলা হয়। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বা আর্ন্তজাতিক সম্পর্কে গতিশীলতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত কূটনীতি নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

প্রশ্ন-০৯ 'কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন' কি?

উত্তর : আন্তর্জাতিক আইন কমিশন ১৯৫৬ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতিসমূহ বিধিবদ্ধকরণের কাজ হাতে নেয় এবং ১৯৫৮ সালে তার দশম অধিবেশনে 'খসড়া বিধানাবলী' সংবলিত একটি দলিল প্রণয়ন করে। এ খসড়া বিধানাবলীর ভিত্তিতে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ও সুবিধাদি জাতিসংঘ সম্মেলনে ১৯৬১ সালের ১৬ এপ্রিল 'কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন' (Viema Convention on Diplomatic Relations) গৃহীত হয়। কনভেনশনটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৬১ সালের ১৮ এপ্রিল। ১৯৬৪ সালের ২৪ এপ্রিল এ কনভেনশন বলবৎ হয়।

প্রশ্ন-১০ বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় হাতিয়ার হিসেবে কূটনীতির ভূমিকা কি?

উত্তর : বৈদেশিক নীতির সঠিক ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য কূটনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক জীবনে কূটনীতি একটি অত্যন্ত গতিশীল প্রক্রিয়া। কূটনীতি ও বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রনীতি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বৈদেশিক সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু হলো কূটনীতি। কোনো রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনসভা, জনমত, সবারই বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন হয় অভিজ্ঞ, দক্ষ, কুশলী, নিপুণ ব্যক্তিদের। এ পরিসেবা (Service) লাভ করা যায় শুধু কূটনীতিবিদের নিকট থেকে। অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন উভয়ই কূটনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রশ্ন-১২ 'পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি পরস্পর নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ'—ব্যাপারটি বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : পররাষ্ট্রনীতির মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন বিশ্বস্ত এবং মূলসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এবং সব তথ্য ও সংবাদের অন্যতম প্রধান উৎস

হলো কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ। সুতরাং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদদের ভূমিকা অপরিসীম। পামার এবং পারকিনস অভিমত পোষণ করেন, বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণই হলেন সরকারের চক্ষু ও কর্ণ বিশেষ। কূটনীতিবিদগণই বিদেশে বসবাসকারী দেশের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করেন এবং বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে নিজের দেশের সরকারকে অবহিত রাখেন। কূটনীতিবিদগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে স্বদেশে প্রেরণ করেন। সরকার পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়নের ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদদের প্রেরিত ঐ সব সংবাদ ও তথ্যাদির ওপর প্রভূত গুরুত্বারোপ করেন। সুতরাং বলা যায়, পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি পরস্পর নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ।

টীকা

♦ কূটনৈতিক সুবিধা এবং দায়মুক্তি *[৩০তম বিসিএস]*

কূটনৈতিক মিশন, কূটনীতিক ও তার পরিবারের সদস্যরা এবং নির্ভরশীলরা বিদেশে অথবা স্বাগতিক দেশে ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশনস (১৯৬১)-এর আওতায় দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। যেমন- মিশন অফিস ও রাষ্ট্রদূতের বাসা অনতিক্রমণীয়। পূর্ব অনুমতি ছাড়া এসব স্থানে বা অন্যান্য স্বদেশভিত্তিক প্রশাসনিক ও কারিগরী স্টাফদের বাসায় (স্বাগতিক দেশে বিশেষ করে) প্রবেশ করা যায় না। তারা যে রাষ্ট্রে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাদের উপর সে রাষ্ট্রের আদালতের এখতিয়ার থাকে না। কোনো গুরুতর অভিযোগে অবাঞ্ছিত (Persona non grata) ঘোষণা করে বহিষ্কার করতে পারে কিন্তু তারা জেল জরিমানা হতে মুক্ত থাকবেন। তাদের স্বদেশে প্রেরিত ও তাদের কাছে স্বদেশ থেকে আগত কোনো চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি স্বাগতিক রাষ্ট্রের কারো খোলার বা পরীক্ষা করার কোনো অধিকার নেই। কূটনীতিকদের বাস ভবনে বা দপ্তরে কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি বা তল্লাশি চালানো যায় না। মিশন ও কূটনীতিকরা সবধরনের কাস্টমস্ ডিউটি, ট্যাক্স, পৌরকর ইত্যাদি পরিশোধ থেকে মুক্ত থাকবেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের বিশেষ আইনগত সুবিধা তারাই ভোগ করবেন যারা গ্রহণকারী রাষ্ট্রে কূটনৈতিক মর্যাদার অধিকারী হবেন অথবা যারা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিট করে দেন কর্মস্থল থেকে ফেরা বা যোগদানের পথে। অধিকন্তু যদি একজন কূটনীতিককে একটি বাধ্যবাধকতাকে লংঘন করতে দেয়া যায় যা স্বাগতিক দেশের দেওয়ানী আইনের আওতায় পড়ে এবং সেক্ষেত্রে কূটনৈতিক দায়মুক্তি দাবি করে সেক্ষেত্রে স্বাগতিক রাষ্ট্র প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে সংশ্লিষ্ট কূটনীতিক কর্তৃক পালনীয় বাধ্যবাধকতা পূরণে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেরণকারী দেশ সংশ্লিষ্ট কূটনীতিকের দায় মুক্তি প্রত্যাহার করতে পারে।

♦ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি *[১৮তম বিসিএস]*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু পূর্বেকার যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব তথা মধ্যপ্রাচ্য বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছে। এর কারণ বহুবিধ হলেও মূল কারণ হলো ক্রমাগত মার্কিন স্বার্থের ওপর সন্ত্রাসীদের আঘাতের প্রেক্ষিতে মার্কিন শাসকগোষ্ঠী ধরেই নিয়েছে যে, এ মুহূর্তে তাদের একমাত্র শত্রু মুসলমানরা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেও মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই দেখা যায়, ইরাককে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেলের প্রতি আগ্রহ। তাই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের বহুদিনের প্রতীক্ষা। ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। ফলে জাতিসংঘের বহুজাতিক বাহিনীর সহযোগিতায় উপসাগরীয় যুদ্ধের পরেই যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে স্থায়ীভাবে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সুযোগ পায়। সবশেষে ২০০৩ সালে ইরাকে পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্র আছে এ অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক দখল করে নেয়।

সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো :

- ইরান-ইরাক-সিরিয়াকে এক ঘরে করে রাখা।
- মিশরের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখা।
- যেসব রাজতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত সেসব দেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করা।
- আরবরা যাতে ইসরাইলকে আক্রমণ না করে সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
- মধ্যপ্রাচ্যের মূল্যবান সম্পদ জ্বালানি তেলের বিশ্ব বাজারে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা।
- সর্বোপরি ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

♦ নতুন কূটনৈতিক সম্পর্ক : ভারত-চীন

নতুন কূটনৈতিক মন্ত্র 'ভারত-চীন ভাই ভাই'। এ মন্ত্রে নবযাত্রা শুরু করেছে এশিয়ার দুই পরাশক্তি ভারত ও চীন। ১৯-২১ মে ২০১৩ চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং ভারত সফরে এসে এ নবযাত্রার সূচনা করেন। ২০১৩ সালের মার্চ মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর এটাই ছিল লি কেকিয়াং-এর প্রথম বিদেশ সফর। সাম্প্রতিককালে সীমান্ত উত্তেজনা নিয়ে দু' দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যখন চরম অবস্থায়, ঠিক তখনই লি কেকিয়াং নতুন কূটনৈতিক মন্ত্র নিয়ে ভারতে হাজির হন। সফরকালে ভারতের ও চীনের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ৮টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এগুলোর মধ্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি প্রাধান্য পায়।

♦ প্রতিরোধ কূটনীতি

জাতিসংঘ সম্ভাব্য যুদ্ধরত জাতিসমূহের মাঝে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বা উভয়পক্ষের সাথে সরাসরি আলোচনা বৈঠকের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ নিরসন ও প্রতিরোধ করে থাকে। জাতিসংঘ প্রবর্তিত এ কূটনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি দেশের মাঝে যখন যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে, শান্তি প্রচেষ্টার সকল দিকই যখন স্তিমিত হয়ে পড়ে তখন জাতিসংঘ বিবদমান দুটি দেশের মাঝে যুদ্ধ প্রশমনে সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে। জাতিসংঘ প্রবর্তিত এ কূটনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ কূটনৈতিক ব্যবস্থা (Preventive Diplomacy) বলা হয়ে থাকে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার ইতিহাসে এ প্রতিরোধ কূটনীতির বহু সফল দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছিল সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের এ প্রতিরোধ কূটনীতির সফল প্রয়োগ দেশ দুটির মাঝে স্থিতিশীল অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল।

♦ পেরেস্ত্রয়কা

পেরেস্ত্রয়কা শব্দের অর্থ সংস্কার বা পুনর্গঠন। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ঘোষিত অর্থনৈতিক সংস্কার নীতিই 'পেরেস্ত্রয়কা' নামে খ্যাত। তিনি বনেদি সমাজতান্ত্রিক ঘরানা থেকে বেরিয়ে এসে তার গ্লাসনস্ত বা খোলা নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নে উদারনৈতিক অর্থনীতি প্রবর্তনের এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ইউয়িন ও পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহে নতুন অর্থনৈতিক সুবাতাস বইতে শুরু করে। এরই সূত্র ধরে মার্কসবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জিত হয়, স্ট্যালিন কঠোরভাবে সমালোচিত হয়, খোদ লেনিনের রচনাবলীর বহুল্যুৎসব করা হয়, বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়, ধর্ম, ব্যক্তিমালিকানা ইত্যাদির পুনঃপ্রচলন শুরু করা হয় এবং একদা বর্জিত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে আবার আবাহন জানানো হয়। এরই ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানি স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং ১৯৯১ সালে Union of Socialist Soviet Republics পরিবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন নামকরণ করা হয় Union of Sovereign Soviet Republics. কিন্তু তাও বেশিদিন টিকেনি। অচিরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়।

♦ গ্লাসনস্ত

রুশ শব্দ গ্লাসনস্ত মানে খোলানীতি। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ এ নীতির প্রবর্তক। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার বা পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন নেতাদের বিরোধিতা বা সমালোচনা করার অবকাশ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়। কিন্তু গর্বাচেভ ক্ষমতাসীন হয়েই অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ঘোষণা করেন যে, অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নির্ভয়ে খোলামেলাভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন এবং পার্টি ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের কর্মকাণ্ডেরও সমালোচনা করতে পারবেন। গর্বাচেভ নিজেই তার এই নীতিকে গ্লাসনস্ত বলে অভিহিত করেন। অনেকটা এই গ্লাসনস্তের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় এবং সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

♦ পিং পং ডিপলোমেসি

পিং পং ডিপলোমেসির ইংরেজি প্রতিশব্দ Shuttle Diplomacy. ১৯৭১ সালে চীনের আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল টেনিস (পিং পং) দল চীন সফর করে। এ জন্য এটার নামকরণ হয়েছে পিং পং কূটনীতি। 'পিং পং কূটনীতি' চীন-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। এর পর থেকে দু দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালেই বেইজিং সফর করেন এবং দু বছর পর ১৯৭৩ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন নিজেই চীন সফর করেন। এতে দু দেশের মধ্যে বৈরিতার অবসান ঘটে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক চীনকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ফলে চীন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে। পক্ষান্তরে তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বাদ পড়ে।

♦ গুজরাল ডকট্রিন

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দরকুমার গুজরাল প্রতিবেশী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যেসব পলিসি ও পন্থা গ্রহণ করেন তাই 'গুজরাল ডকট্রিন' নামে পরিচিত। ইন্দরকুমার গুজরাল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে দু দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে সচিব ও মন্ত্রীপর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠান করেন। পরে দু দেশের সরকারপ্রধানের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে দু দেশের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস পায়। তাছাড়া ১৯৯৭ সালের ১৯ জুন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হটলাইন চালু হয়।

♦ ট্রুম্যান ডকট্রিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের পক্ষ অবলম্বন করার নীতিই ট্রুম্যান ডকট্রিন নামে খ্যাত। ১৯৪৪ সালে গ্রিসে সমাজতন্ত্রী এবং রাজতন্ত্রীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ব্রিটিশরা রাজতন্ত্রীদের সাহায্য করে। ১৯৪৬ সালে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় সোভিয়েত ব্লক পশ্চিমা রাষ্ট্র জোটের বিরোধিতা করে। শুধু ব্রিটেনের পক্ষে গ্রিসের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব না হওয়ায় ব্রিটেন মার্কিন সাহায্য প্রার্থনা করে। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গ্রিসে ও তুরস্কে সাহায্যের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার দানের জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন করে। এটাই ট্রুম্যান ডকট্রিন। তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বলেন, '... আমি (ট্রুম্যান) বিশ্বাস করি যে, মুক্ত জাতিগুলো যাতে তাদের নিজেদের মতো করে ভাগ্য জয় করতে পারে তার জন্য আমাদের সহায়তা করা উচিত।' এই ডকট্রিনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে।

♦ নিক্সন ডকট্রিন

সমাজতান্ত্রিক চীন ও পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'নিক্সন ডকট্রিন' একটি উল্লেখযোগ্য নীতি। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এশিয়ার ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড সফর করেন। চীনের দাবির প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র উক্ত দেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়। যদিও ট্রুম্যানের নীতি ছিল সৈন্য রাখার পক্ষে। অথচ নিক্সন সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে Money and arms not man to help Asian nations to military self sufficient নীতি গ্রহণ করেন। নিক্সনের এই নীতির কারণেই চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন হয়।

♦ ডোমিনো থিউরি

ডোমিনো থিউরির প্রবর্তক সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ডালেস। চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর প্রভাব ও বিস্তৃতির প্রেক্ষিত রচিত হয়। এ কারণে সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈরী দেশ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চীনের প্রভাব মুক্ত রাখার লক্ষ্যে আসিয়ান গঠনের অনুপ্রেরণা যোগায়। এতে বলা হয় যে, যদি একটি দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্লকে চলে যায় তবে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য দেশেও এর বিস্তৃতি ঘটবে। ডোমিনো থিউরি সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতি রোধ করা যায়নি। অবশ্য ডোমিনো থিউরিকেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থায়িত্ব লাভে ব্যর্থ হয়।

♦ কূটনৈতিক অসুস্থতা

যখন কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি, কোনো সফরে যেতে বা কোনো সভা, অনুষ্ঠান বা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অনিচ্ছুক হন, তখন তিনি সাধারণত শারীরিক অসুস্থতারই অজুহাত দেখান, যাতে তার অনুপস্থিতি কোনো অনাহূত সন্দেহ বা জল্পনা-কল্পনার জন্ম না দেয়। অনেক সময় মন্ত্রী বা দলীয় কোনো কর্মকর্তাও একই কারণে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। প্রায়শ সরকার বা দল থেকে কাউকে বহিষ্কারের সময়ও এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।



অধ্যায়

০৬

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক
International Economic Relation

Syllabus

***International Economic Relations** : International trade, free trade, protectionism, foreign aid, debt crisis, foreign direct investment (FDI), financial liberalization, regionalism, regionalization, North-South gap, global poverty, MDGs*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন। [৩১তম বিসিএস]
অথবা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন। মন্দা প্রতিরোধে ওবামা প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন কী? [৩০তম বিসিএস]

০২. একটি অভিন্ন ইউরোপ বা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? [২৪তম বিসিএস]

০৩. গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দা ইউরো জোনে কি বিরূপ প্রভাব ফেলছে? সংকট উত্তরণে ইউরো জোনের দেশগুলো কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? [৩৩তম; ৩২তম বিসিএস]
অথবা, ইউরো জোনের কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটনের কারণ বর্ণনা করুন। কিভাবে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

০৪. MDG কি? MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]
অথবা, জাতিসংঘ প্রণীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' (MDGs) কি? এ বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন।

০৫. "বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।"— আলোচনা করুন এবং এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]

০৬. আঞ্চলিকতাবাদ কি? আপনি কি মনে করেন আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতিহুমকিস্বরূপ? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন। [১৩তম বিসিএস]
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতা কি? আঞ্চলিক সহযোগিতা কি বিশ্ব সহযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী না পরিপূরক? আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়?
খ. বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করুন।

০৮. ক. আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট বলতে কি বোঝেন?
খ. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৯. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা আলোচনা করুন।

১০. মন্দা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

১১. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার মতামত লিখুন।

১২. বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণের সপক্ষে আপনার যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করুন।

১৩. ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কিরূপ প্রভাব রাখছে বলে আপনি মনে করেন? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতি উল্লেখ করুন।

১৪. 'বিশ্ব বাণিজ্যে চীন একটি অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।'—এ উক্তির আলোকে আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন।

১৫. 'চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে খর্ব করবে।'— এ প্রসঙ্গে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

১৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতিরেকে কিভাবে জাপান নিজেকে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছে। আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. মুক্তবাজার অর্থনীতি কি?
০২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়?
০৩. অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) কি?
০৪. অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিগুলো কি কি?
০৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য কি?
০৬. মুদ্রাস্ফীতি কি?
০৭. মুদ্রাসংকোচন বলতে কি বোঝায়?
০৮. ডাম্পিং কি?
০৯. ট্যারিফ কি?
১০. পণ্য বিনিময় চুক্তি কি?
১১. কার্টেল (Cartel) কি?
১২. 'রুলস অব অরিজিন' বলতে কি বোঝায়?
১৩. অবমূল্যায়ন কি?
১৪. ভূ-অর্থনীতি কি?
১৫. আঞ্চলিকতাবাদ কি?

টীকা

- *Purchasing Power Parity [২৩তম বিসিএস]*
- *জিএসপি (GSP) [২২তম বিসিএস]*
- *জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) [৩২তম বিসিএস]*
- *দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) [৩২তম বিসিএস]*
- *আঙ্কটাড (UNCTAD)*
- *জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)*
- *ভিওআইপি*
- *ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO)*
- *AIIB চীনের বিশ্বব্যাংক*
- *নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)*
- *আঞ্চলিকতাবাদ*
- *বিশ্ব দারিদ্র্য*
- *গণমাধ্যম*
- *বৈদেশিক বিনিয়োগ*
- *উত্তর-দক্ষিণ ফারাক*

[২৮তম; ২৩তম; ২২তম; ১৭তম বিসিএস]

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? *[৩১তম বিসিএস]*

অথবা,* বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন। মন্দা প্রতিরোধে ওবামা প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন কী? *[৩০তম বিসিএস]

ভূমিকা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় ১৯৩০ সালে। ১৯৩০ সালের পর বিশ্ব দ্বিতীয়বারের মতো অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হয় ২০০৮ সাল থেকে। এ মন্দার সূত্রপাত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা হয় ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে। এ সময় মার্কিন অন্যতম বিনিয়োগ ব্যাংক লেহম্যান ব্রাদার্সের দেউলিয়া ঘোষণার মধ্য দিয়ে কিংবা মেরিল লিঞ্চের ৮০০ বিলিয়ন ডলার আটকে পড়া ঋণ নিয়ে সমস্যা ও দেউলিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত। ফলে ব্যাংক প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়। কয়েক দিনের মাথায় একের পর এক ব্যাংক, স্টক মার্কেটসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে সূত্রপাত হয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের। অনেক ব্যাংক ঋণ সংকটে পতিত হয়, অনেক ব্যাংক ও শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এরূপ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে তৎকালীন বুশ প্রশাসনের মেয়াদান্তে বারাক ওবামা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন পরিবর্তনের মুখরোচক স্লোগান নিয়ে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ওবামা অর্থনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে ওয়াল স্ট্রিটকে উদ্ধার করতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অনুদান দেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানান, ব্যাপক বিনিয়োগের ঘোষণা দেন, জৈব জ্বালানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেন, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে দ্রুতগতির রেল সুবিধা দেয়াসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর জোর দেন, আগামী পাঁচ বছরে অভ্যন্তরীণ ব্যয় স্থগিত করার প্রস্তাব দেন, স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের উদ্যোগ নেন, আগামী পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ করার একটি নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। মন্দা প্রতিরোধে ওবামার এ পদক্ষেপের সুফল শুরু হয়েছে ২০১০ সাল থেকে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার পর বিশ্বে দ্বিতীয়বারের মতো বড় ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্কটের সূচনা হয় ২০০৭ সাল থেকে। কোনো একটি একক দেশ এ মন্দার জন্য দায়ী না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ মন্দার সূত্রপাত হয়।

বিশেষ করে পুঁজিবাদী বিশ্বের অতি উদারীকরণ নীতি এ মন্দার পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়াও এর জন্য দায়ী মুক্তবাজার অর্থনীতি পরিচালনায় ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি। বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে একটি অযাচিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সে অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তারা অতি উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করে এ অতি উদারীকরণ নীতি এক সময় তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে আবাসন খাতে কোনো ধরনের সামর্থ্য যাচাই না করেই ঢালাওভাবে ব্যাংক ঋণ প্রদান এবং সেই ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা এক পর্যায়ে দেশটির জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই বিশ্বব্যাপী সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এ মন্দা একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ভালোমন্দের ওপর এখনো বিশ্ব অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভরশীল। আর সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে কোনো ধরনের সমস্যা বা সঙ্কট সৃষ্টি হলে অনিবার্যভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপর তার প্রভাব পড়ে। এবারের মন্দা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পেছনে একক কোনো কারণ বিদ্যমান নয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ উপস্থাপন করা হলো :

১. **লগ্নিপুঁজি বৃদ্ধি :** সর্বোচ্চ মুনাফার তাড়নাই পুঁজিবাদকে প্রথম থেকে বাধ্য করেছে কাঁচামাল ও বাজার দখলের গলাকাটা প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে। সমগ্র পৃথিবীকে গায়ের জোরে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগবাটোয়ারা করে নিতে, নতুন শক্তির আবির্ভাবকে গায়ের জোরে আটকাবার চেষ্টা করতে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে পুঁজি বিনিয়োগের অক্ষ পরিবর্তন ঘটাতে। এ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়েই উৎপাদনশীল শিল্প-পুঁজির পাশাপাশি ক্রমশ বেশি বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল লগ্নিপুঁজি। লগ্নি-পুঁজির বিনিয়োগ সরাসরি উৎপাদন বাড়ায় না, তাই প্রকৃত বিচারে-বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে এ পুঁজি অনুৎপাদনশীল। তবু শিল্প-পুঁজির বিকাশে সহায়তার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে লগ্নিপুঁজি শুরুর দিকে উৎপাদনশীল ভূমিকা নিলেও পরিণামে ঘনিয়ে নিয়ে আসে সঙ্কট। বাজার ও কাঁচামালের সীমাবদ্ধতা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকে সঙ্কটপূর্ণ করে তোলে। শুরু হয় পুঁজিবাদের স্থবিরতা।

২. **বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি :** বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম একটি কারণ বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি। ২০০৭ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া এ মুদ্রাস্ফীতি ২০০৮-এ এসে ব্যাপক রূপ ধারণ করে। যা রোধে বিশ্বের সরকারসমূহ নানাবিধ উদ্যোগ নিলেও ঠেকাতে পারেনি। আইএমএফ-এর মতে, এ মুদ্রাস্ফীতির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো। কারণ এসব দেশে হঠাৎ করে বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষতার সঙ্গে মুদ্রা পরিচালনায় তারা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে তেল আমদানিকারক দেশগুলোতে তেল ও খাদ্যমূল্য বেড়ে যায়।

৩. **মুদ্রা নীতির দুর্বলতা ও অব্যবস্থাপনা :** অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম প্রধান কারণ আর্থিক নীতি তথা মুদ্রা নীতির দুর্বলতা ও অব্যবস্থাপনা। এর মূলে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে অভিযুক্ত করা হয়। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ গত ৩০ বছরে বাজার অর্থনীতি কমপক্ষে ১০০ বারের অধিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কাজেই একথা বলা যায় যে, বাজার অর্থনীতির নীতিগত দুর্বলতা পৃথিবীতে নানাবিধ সঙ্কট সৃষ্টি করছে এবং করবে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা তার-ই একটি প্রতিফলন।

৪. **জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি :** বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম একটি কারণ হলো দ্রুত তেলের মূল্য বৃদ্ধি। যা শেষ পর্যন্ত ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের উপরে গিয়ে ঠেকেছিল। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ শিল্পই তেলনির্ভর। তাই হঠাৎ করে তেলের মূল্য বৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার সম্মুখীন হয়।

৫. **অতি উৎপাদন সমস্যা :** বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার আরেকটি কারণ অতি উৎপাদন সঙ্কট। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতিরা তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা লুটে নেয়ার জন্য তাদের অর্জিত মুনাফার একটা বড় অংশ শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়াই আবার ব্যাপক জনসাধারণের প্রকৃত আয়কে সীমিত করে রাখে। তাই শিল্প উৎপাদনে পুঁজি খাটিয়ে উৎপাদন বাড়ালেও তার চাহিদা প্রত্যাশিত হারে বাড়ে না, ফলে বিক্রিও তেমন বাড়ে না। ফলে গুদামে পণ্য দ্রব্যের পাহাড় জমে ওঠে। অন্যদিকে শিল্পে বিনিয়োগ করাটা আর তেমন লাভজনক থাকে না। তাই সর্বোচ্চ মুনাফা তাদের চাই-ই চাই, আর সেজন্য পুঁজিও খাটাতে হবে। পুঁজি খাটায় বিকল্প কোনো ক্ষেত্রে। এভাবে অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ এবং অতি উৎপাদন বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার কারণ।

৬. **ভোগবাদী মার্কিন অর্থনীতি :** স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী একমেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে প্রতিষ্ঠা করেছে ভোগবাদী দেউলিয়া অর্থনীতি। যে অর্থনীতি ও জনজীবন কেবল ক্রেডিট কার্ড নির্ভর। এ অর্থনীতিতে সঞ্চয় প্রবৃত্তি অনুপস্থিত। যাতে টেকসই উন্নয়ন নেই। ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্টক বাজার সব সামান্য বিপর্যয়েই দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ২০০৭ এর ডিসেম্বর থেকে মার্কিন অর্থনীতিতে এরূপ বিপর্যয়ের সূচনা হয়। সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেও এ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ধীরে ধীরে মার্কিন মন্দা সংক্রমিত হয় বিশ্বব্যাপী। কাজেই মার্কিন অর্থনীতির বিপর্যয়ই বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ।

৭. **আর্থিক খাতে সরকারের অনুপস্থিতি :** মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ ব্যাংকিং খাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নিয়ে এসেছে। এর সাথে উন্নত দেশের ব্যাংকসমূহ সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় কোনো রকমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা না থাকায়। এ ব্যাংকসমূহ সুপথে-বিপথে বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরে একটা সময় বিপদের সম্মুখীন হয়। তার বড় প্রমাণ মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাংক লেহম্যান ব্রাদার্সের দেউলিয়াত্ব।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা নিরসনে ওবামা প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মহামন্দা হিসেবে পরিচিত ১৯৩০ এর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর থেকে প্রেসিডেন্ট বুশ-ওবামার শাসনামলের এ মন্দা আমেরিকান অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে খারাপ সময়। মন্দা পরবর্তী আমেরিকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৪৯ মিলিয়ন আমেরিকানের খাদ্য নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, আয় বৈষম্য এতটা প্রকট হয়ে উঠেছে যে, শীর্ষ শতকরা ১ ভাগের আয় নিচের শতকরা ২০ ভাগের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি। বেকারত্বের হার দিন দিন বেড়ে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ২২০ মিলিয়ন মানুষ বেকার। এর মধ্যে ৩৪ মিলিয়ন কর্মসংস্থান নেই ২০০৮ সাল থেকে। আইএলও'র তথ্য মতে, বিশ্বমন্দার পূর্বে বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের হার যে পর্যায়ে ছিল, সে পর্যায়ে পৌঁছতে বিশ্বকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ২০০৮ সালে চারদিকে যখন হাহাকার,

তখন অনেক প্রবাসীই দেশে ফিরে যেতে শুরু করে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ভয়ে কাঁপে আমেরিকা, যখন তখন ধরপাকড় এবং ফোরক্লোজারের ধুম, সেই অভিনব সময়ে আবির্ভাব হয় ওবামা নামের এক যাদুকরের 'আমরা সব পারি' স্লোগান নিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পূর্বেই ঘোষণা দিলেন প্রণোদনা প্যাকেজের। আবাসন সঙ্কট মোকাবিলায় ফ্যানি ম্যাই ও ফ্রেডি নামের দুটি প্রতিষ্ঠানকে ১৫০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেন যুক্তরাষ্ট্রকে কর দিত যেসব নাগরিক, তাদের বাড়ি রক্ষায় ঐ অর্থ ব্যয় করার জন্য। ওয়াল স্ট্রিটকে উদ্ধার করতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অনুদান দেন। স্বাস্থ্যখাত উদ্ধারে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়। যার সাফল্য মার্কিন জনগণের চোখে পড়ার মতো। ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে, গুয়ানতানামো কারাগার বন্ধের মতো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জঙ্গিবাদের অবসানকল্পে এবং বুশের আমলে মারাত্মকভাবে বিপন্ন মার্কিন ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপারেও কিছু বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুদ্রাস্ফীতি রোধে ওবামা প্রশাসন ব্যাংকগুলোর ওপর বিশেষ কর আরোপ করে। বাজার থেকে বাড়তি মুদ্রা সরিয়ে নিতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আইএমএফের হিসাব অনুযায়ী আমেরিকায় ২০১০ অর্থবছরে ৩.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ২১ জানুয়ারি ২০১৩ শপথ গ্রহণ করেন বারাক ওবামা। ২০১৩ সালের তার এ শপথ অনুষ্ঠানের স্লোগান ছিল 'আমেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা নিরসনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রশাসন যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **বাজেট ঘাটতি মোকাবিলায় কর বৃদ্ধিসহ ব্যয় হ্রাস :** যুক্তরাষ্ট্রের ২০১২ সালের বাজেট প্রস্তাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ৩.৭৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজেট উপস্থাপন করেন। এতে বাজেট ঘাটতি হ্রাসে কর বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার ফলে উচ্চ প্রযুক্তি ও পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি খাতে কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। সেই সঙ্গে ব্যয়বহুল কিছু প্রকল্প কাটছাঁট করা হয়েছে। এ ঘাটতি মোকাবিলায় বাজেটে আগামী কয়েক বছর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ওবামার মতে, এ বাজেটের ফলে নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় শুরু করতে বাধ্য হবে। বাজেটে আগামী ৫ বছরের জাতীয় ব্যয় বেঁধে দেয়া হয়েছে। তিনি আগামী দশকে চারশো বিলিয়ন ডলার খরচ বাঁচানোর একটি প্যাকেজের কথাও উল্লেখ করেছেন।

২. **প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস :** প্রতিরক্ষা শক্তি ও এ সম্পর্কীয় ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বৈশ্বিক কাঠামোতে যুক্তরাষ্ট্রের পথচলা বলতে গেলে এখন চ্যালেঞ্জহীন। অর্থাৎ একমেরুভিত্তিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের খেয়াল খুশি ও পরিকল্পনার ওপরই বিশ্ব রাজনীতি ঘুরপাক খায়। কিন্তু এর প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে বিশালাকার প্রতিরক্ষা খরচ হ্রাস করে। মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠতে কর্মসংস্থানের স্বাভাবিক প্রবাহে মানবিক ও সেবামূলক খাতে সাহায্যের পরিমাণ এবং উন্নয়ন সহযোগিতার গতিকে ত্বরান্বিত করতে ওবামা প্রশাসন এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র আগামী ৫ বছরে প্রতিরক্ষা ব্যয় ধাপে ধাপে ৭,৮০০ কোটি ডলার কমিয়ে আনবে। সৈন্য সংখ্যাও ৪৭ হাজার কমানো হবে। ওবামা প্রশাসন আগামী ৫ বছরে সরকারি ব্যয় ১০ হাজার কোটি ডলার কমানোর যে পরিকল্পনা করেছে এরই অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

৩. **অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনী প্যাকেজ প্রস্তাব :** বারাক ওবামা প্রশাসন ৭৮,৯০০ কোটি ডলারের একটি উজ্জীবনমুখী অর্থনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিক্ষা ও জ্বালানিসহ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের পরিকল্পনা। ২০০৭ এর ডিসেম্বরে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হওয়ার পর থেকে আমেরিকায় প্রায় ৩৬ লাখ কর্মী চাকরি হারিয়েছে। এ কর্মসূচির জন্য ধার্য অর্থের ৩৬ শতাংশই কর হ্রাসের জন্য ব্যয় করা হবে এবং বাকিটা সরাসরি বিনিয়োগ করা হবে।

৪. **বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন, বিদ্যুৎ খরচ হ্রাস :** প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার ঠিক ১২ দিন আগে বারাক ওবামা মার্কিন অর্থনীতির মন্দা অবস্থা কাটাতে ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে ভার্জিনিয়ার জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে অর্থনীতিতে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত অন্তত ৭৭৫ বিলিয়ন ডলারের বিলের কথা বলেন। যে বিল পাস হলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার প্রতিযোগিতায় প্রবল ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। এ কারণে ওবামা কর ছাড় কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে শ্রমজীবী পরিবারদের ৯৫% এর ক্ষেত্রে ১০০০ ডলার কর কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আগামী তিন বছরে বিকল্প জ্বালানির উৎপাদন দ্বিগুণ করা হবে। বিদ্যুৎ খরচ কমাতে ফেডারেল সরকারের ভবনসমূহ এবং ২০ লাখ বাড়ি-ঘরের ৭৫% এর বেশি আধুনিক করে তোলা হবে।

৫. **আবাসন সঙ্কট প্রতিরোধ নীতি :** বাড়ি বন্ধক সংক্ষট হচ্ছে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূলে এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ সমস্যাটি ব্যাপক সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রায় ২ মিলিয়ন আমেরিকানরা তাদের বাড়ি হারিয়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কটের শুরুর দিকে। কোনো কোনো তথ্যমতে এ সংখ্যা ৮ মিলিয়নেরও অধিক। এরূপ আবাসন সঙ্কট রোধে ওবামা প্রশাসন আইন পাস করে। যে আইনে তিনটি পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় আবাসন ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা হয়েছে, যেখানে Fannie Mae ও Freddie Mac ব্যাংক আবাসন ঋণ ক্রয় করবে, যেসব বাড়ির বন্ধক ঋণ কম। এ দ্বারা সাধারণ জনগণ ৫% গৃহহীন সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে বন্ধক ঋণের অনুকূলে অনুদানের কথা, যাতে করে বাড়ির মালিক তাদের ঋণের মাসিক বোঝা লাঘব করতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে ব্যাংকের দেউলিয়াত্ব দেখা হবে এবং বন্ধকী ঋণ সংশোধন করা হবে যাতে করে ঋণের প্রধান অংশ পরিশোধ করতে পারে মালিক কর্তৃপক্ষ।

৬. **বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সমন্বিত অভিযান জি-২০ সম্মেলন :** সারা বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন্দায় চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত ঠিক এ সময়েই লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় জি-২০ সম্মেলন। বিশ্বের ধনী ও প্রায় ধনী দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের এ উচ্চস্তরীয় বৈঠকের মূল বিষয় ছিল অর্থনৈতিক মন্দার মোকাবিলা। এ সম্মেলনে বিশ্বমন্দা মোকাবিলায় বিশ্বের ধনী কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের কারণে হাবুডুবু খাওয়া দেশের নেতারা দরিদ্র দেশগুলোকে আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সম্মেলনে জি-২০ দেশের নেতারা নিজেদের দেশগুলোর আর্থিক খাতে আস্থা ফিরিয়ে আনা, প্রবৃদ্ধি বাড়ানো এবং নতুন চাকরি সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তার সবকিছুই

করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আইএমএফ'র কোষাগার তিনগুণ বৃদ্ধি করাসহ মোট ১.১ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র তহবিলে আরো ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়ার কথা বলা হয়। সম্মেলনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, জি-২০ সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ দশ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বাণিজ্যিক বাজার স্বাভাবিক পর্যায়ে পুনরুদ্ধার হবে। ভবিষ্যতে অর্থনীতি দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ সুরক্ষার জন্য এ শীর্ষ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার নতুন কাঠামো গড়ে তুলেছে।

৭. **এমপ্লয় ফ্রি চয়েজ অ্যাক্ট :** চরম দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে বারাক ওবামা প্রশাসন শ্রমিকের সুবিধার্থে এমপ্লয় ফ্রি চয়েজ অ্যাক্ট পাস করে। এ আইনে বলা হয়েছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করলে কোম্পানির বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া কোম্পানি শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করবে এবং নির্বাচন করার অধিকার এ আইনে প্রদান করা হয়।

মূল্যায়ন : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্টিন ফেল্ডস্টেইন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চাঙ্গা হতে আরো অন্তত এক দশক সময় লাগবে। মার্কিন অর্থনীতি নিয়ে বার্ষিক সম্মেলনে হতাশাজনক এ চিত্রে বলা হয়েছে, ফেডারেল রিজার্ভের তহবিল থেকে ৬০০ বিলিয়ন ডলার প্রণোদনা প্রদানের পরিকল্পনা মার্কিন অর্থনীতিকে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে। সামনের দিনগুলোতে মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক নীতি তেমন কোনো কাজে আসবে না। আগামী বছরগুলোতে মার্কিন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে খুবই ধীর গতিতে। মন্দা প্রতিরোধে ওবামা প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানান বিতর্ক রয়েছে। তাছাড়া তার সরকার গৃহীত কিছু কিছু পদক্ষেপ মিশ্র প্রতিক্রিয়ারও জন্ম দিয়েছে। ওবামার সাফল্যের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য সংস্কার নীতি, মন্দাজনিত কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে যেভাবে ধস নামতে শুরু করেছিল তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং খাতসহ অর্থনীতির মূল ভিত্তিগুলো ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ওবামার নানামুখী পদক্ষেপ বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্যাকেজ প্রদানের কারণে তা রক্ষা পায়। এটা তার সাফল্যই বটে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন অতিরিক্ত ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে রক্তক্ষরণ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে পারলেও অবস্থা স্বাভাবিক এর নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। তবে আশার কথা হলো, ইতোমধ্যে আবাসন সেক্টর ও রাস্তাঘাট বিনির্মাণ সেক্টর আগের চেয়ে অনেক বেশি স্থির ও বেগবান হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইউরোপ অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সাথে মন্দা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে, যা মার্কিন রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে এবং চাকরির বাজার বছরখানেকের মধ্যে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসবে বলে ধারণা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সাথে সারা বিশ্বের অর্থনীতি জড়িত। এর বিশেষ কারণ হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন ডলার। মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমার অর্থ হলো অন্যদেশেরও ক্রয়ক্ষমতা কমা। মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা মানে বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের অর্থনীতিতেও মন্দা সৃষ্টি হওয়া। কাজেই মার্কিন অর্থনীতি বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত হলে বিশ্ব অর্থনীতিও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

০২ । একটি অভিন্ন ইউরোপ বা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? *[২৪তম বিসিএস]*

উত্তর : বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সমগ্র ইউরোপ অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে অনেকাংশে বিশ্বের শক্তিশালী অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যেই ইইউ-এর অধীনে সদস্য দেশগুলো তাদের সীমান্ত বাধা উঠিয়ে নিয়েছে। অর্থনৈতিক সংহতি ও অভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অভিন্ন পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারেও তারা এগুচ্ছে জোরকদমে। এরই মাঝে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য প্রণীত হয়েছে একক সংবিধান। যদিও এখনই তা কার্যকর হচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যতে ইইউ রাষ্ট্রের চেহারা নিতে যাচ্ছে কি না বা ইউনাইটেড স্টেটস অব ইউরোপ খুব শীঘ্রই জন্ম নিতে যাচ্ছে কি না সেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকে সম্প্রতি প্রণীত একক সংবিধানকে তুলনা করেছেন ফিলাডেলফিয়ায় প্রণীত মার্কিন সংবিধানের সঙ্গে, যার মাধ্যমে জন্ম হয়েছিল ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার। তবে এ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেই বিরোধ রয়েছে। জার্মানির মতো কতিপয় দেশ ভাবছে ইউরোপের সময় এসেছে একীভূত হবার। অন্যদিকে ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের মতো কতিপয় সদস্য সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সত্তা বিসর্জনদানের ঘোর বিরোধী। এমতাবস্থায় একীভূত তথা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে আশা-নিরাশার মাঝেই তর্ক-বিতর্ক চলছে।

পটভূমি : সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে যে উন্নয়ন ও নতুন সভ্যতার পদযাত্রা সূচিত হয়েছিল তা অনেকাংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে ১৯৩০-এর দশকের দিকে। এ সময় ইউরোপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শক্তিতে পরিণত হয়। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির শক্তিশালী সামরিক উত্থান, মুসোলিনের নেতৃত্বে ইতালির সামরিক উত্থান এ অঞ্চলকে শক্তিশালী সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের অভূতপূর্ব শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নতুন ইউরোপের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকের শুরু থেকেই বিশ্বজুড়ে গড়ে ওঠা দু পরাশক্তির মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব স্নায়ুযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষেত্র বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ইউরোপেও সমানভাবে প্রসারিত হয়েছিল এবং সমগ্র ইউরোপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এ প্রভাব বলয় সমগ্র ইউরোপকে দুটি রাজনৈতিক ও সামরিক শিবিরে বিভক্ত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপে গড়ে উঠেছিল 'পশ্চিমা ব্লক' আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'পূর্ব জোট'। আর এ দুটি জোট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সালে পশ্চিমা ব্লকের ১২টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক জোট ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থা (EEC—European Economic Committee) এবং ১৯৪৯ সালে সামরিক জোট উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO—North Atlantic Treaty Organization) গঠন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের ৭টি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ১৯৪৮ সালে অর্থনৈতিক জোট কমিকন (COMECON—Council for Mutual Economic Assistance) এবং ১৯৫৫ সালে সামরিক জোট Warsaw Pact গড়ে তোলে। পূর্ব ও পশ্চিমের এ অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাবের ফলে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে তুলনামূলকভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দুটি আঞ্চলিক জোটের সৃষ্টি হয়েছিল। মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা

জোটের গণতান্ত্রিক নীতি কাঠামোতে গড়ে ওঠা দেশগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছিল। আর সোভিয়েত নেতৃত্বে পূর্ব জোটের সমাজতান্ত্রিক নীতি কাঠামোতে গড়ে ওঠা দেশগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকাংশে পিছিয়ে গিয়েছিল, যা উভয় অঞ্চলের মাঝে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভেদের বিদ্বেষপূর্ণ ক্ষেত্র রচনা করেছিল এবং সামগ্রিক ইউরোপের উন্নয়ন কাঠামো মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক পতন ও স্নায়ুযুদ্ধের অবসান বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ইউরোপেও পূর্ব ও পশ্চিমের বিভেদ রেখার অনেকাংশে অবসান ঘটায়। পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এ অঞ্চলের দেশগুলো স্বাধীন, মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক নীতি কাঠামো ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা এ অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে নতুন করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিশালী সংহতি গড়ে তোলার জন্য অভিন্ন ইউরোপ গঠনের বিষয়ে নতুন করে উদ্যোগী করে তোলে। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ অঞ্চলের দেশগুলো বেলজিয়ামের ম্যাসট্রিক্ট নগরে অভিন্ন ইউরোপ গঠনের শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা এ নীতি বাস্তবায়নের প্রথম ও শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে সূচিত হয়। এ চুক্তির ওপর ভিত্তি করে এ অঞ্চলের দেশগুলো ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে মুক্ত সীমান্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং ১৯৯৫ সালের শুরু থেকে রাজনৈতিকভাবে বৃহত্তর ইউরোপীয় সংহতি ঘোষণা করে। এ চুক্তির আওতায় জোটভুক্ত দেশগুলো অবাধ যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরির ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জোর অভিমত ব্যক্ত করে। তাছাড়া অভিন্ন প্রতিরক্ষা নীতি গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৯ সালে নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং ১৯৯৪ সালে গঠন করা হয় ইউরোপীয় মনিটরী ইনস্টিটিউট। এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি অভিন্ন নীতি চালু ও এর নীতিকাঠামো পর্যালোচনার জন্য গঠন করা হয় ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB)। ফলে ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ১১টি সদস্য রাষ্ট্রে ইউরো চালু হয়, যদিও তা কার্যকর হয় ২০০২ সালের ১ জুলাই থেকে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট ১৯টি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু রয়েছে। সর্বশেষ ১ জানুয়ারি ২০১৫ সালে ইউরো মুদ্রা চালু করে লিথুয়ানিয়া। অপরদিকে ২০০৩ সালের জুনে সম্পন্ন হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক সংবিধান প্রণয়নের কাজ। গিসকার্ড ডি স্টেইনের নেতৃত্বে গঠিত কনভেনশন দীর্ঘ ১৮ মাস কাজ করার পর ২০০৩ সালের জুনে দুই শতাধিক পৃষ্ঠার খসড়া সংবিধানটি হস্তান্তর করে।

ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাব্যতা : ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান নীতি, কাঠামো ও কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে বর্তমানে বিশেষজ্ঞ মহলে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইউরোপ গঠনের বিষয়ে গুঞ্জন উঠেছে। প্রশ্ন হলো এ গুঞ্জন বাস্তবে রূপ নেয়ার সম্ভাব্যতা কতটুকু? এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাব্যতার বিষয়ে যারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনেন :

১. **একটি রাষ্ট্র গঠন :** একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় ইইউ ইতোমধ্যেই অনেক দূর এগিয়েছে। কেননা ইইউ'র নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সংগীত, মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সুপ্রিম কোর্ট, পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট পদ, একটি ছোটখাট সেনাবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি একটি একক সংবিধান রচনার প্রাথমিক কাজটিও সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং ইইউ'র এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত অগ্রগতিকে একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পথে ধাবমান হওয়ার প্রবণতা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

২. **ইইউ আইনকে প্রাধান্য :** নতুন প্রস্তাবিত সংবিধানে নানাদিক থেকে ইইউকে একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা দিচ্ছে, যদিও কার্যকর ক্ষমতা ছাড়া। যেমন—ইইউ'র একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, একজন প্রেসিডেন্ট থাকবেন। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে ইইউ'র আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে, যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের পরিধিকে সীমিত করবে। তাছাড়া সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রীয় আইনের ওপর ইইউ আইনের প্রাধান্যের বিষয়ও প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩. **ঐক্য ও একক শক্তি প্রতিষ্ঠা :** ইইউ সদস্যদের অভিন্ন সীমান্ত, অভিন্ন বাজার ব্যবস্থা ও অভিন্ন মুদ্রা চালুর যে দৃষ্টান্ত চালু হয়েছে তা অন্যান্য আঞ্চলিক জোটগুলোর তুলনায় ভিন্ন। আরো উল্লেখযোগ্য হলো, এ সকল ব্যবস্থা সেখানে সফল ও শান্তিপূর্ণভাবেই কার্যকর রয়েছে। ফলে অনেক পর্যবেক্ষকই একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে আরো কার্যকর ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বে একটি একক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

৪. **ইউরোপীয় জনগণের সমমুখী চেতনার প্রকাশ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যবাদী আচরণ ও বিশ্বজুড়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের একরূপতার প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় দেশগুলোর ঐক্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় জনগণের সমমুখী চেতনার প্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, যা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

অভিন্ন ইউরোপ গঠনে সমস্যা : তবে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

১. **ক্ষুদ্র দেশগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন :** অধিকাংশ সদস্য দেশের মতে, অভিন্ন ইউরোপীয় নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে এ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশের জনগণ তাদের জাতিগত ও ইতিহাসের আত্মপরিচয় থেকে বঞ্চিত হবে। এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র দেশগুলোর অস্তিত্ব মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। ডেনমার্ক কিংবা বেলজিয়ামের মতো ছোট ছোট দেশগুলোর স্বাধীন সত্তা পূর্ণমাত্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ ব্যবস্থার ফলে রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে পুঁজিপতি শ্রেণি তথা বহুজাতিক সংস্থার উদ্ভব ঘটবে। ফলে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র দেশ ও জাতিগুলোর জাতীয় স্বার্থ অতিমাত্রায় বিঘ্নিত হবে।

২. **ইউরোপের সংহতি বিপন্ন :** ব্রিটিশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার বরাবর অভিন্ন ইউরোপের প্রশ্নে তার দ্বিমত পোষণ করে আসছেন। তার মতে, এ চুক্তির ফলে ব্রিটেন ইউরোপে তার নিরঙ্কুশ স্বার্থ হারাবে। তার মতে, এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জার্মানির অত্যন্ত শক্তিশালী বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং অভিন্ন ইউরোপ গঠনের ফলে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সামগ্রিকভাবে জার্মানির হাতে চলে যাবে। জার্মানির ইউরোপ তথা বিশ্ব নেতৃত্বের প্রবণতা নতুন করে বৃদ্ধি করবে। জার্মানি তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোর প্রভাব খাটাতে উদ্যোগী হয়ে উঠবে। ফলে ব্রিটেনসহ ইউরোপীয় জোটের মাঝে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করবে এবং ইউরোপের শক্তিশালী সংহতিকে অনেকাংশে বিপন্ন করে তুলবে।

৩. **রাজনৈতিক সংকটনের জন্ম :** এ ব্যবস্থার ফলে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও গণঅসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ফলে তুলনামূলকভাবে কম উন্নত দেশের ব্যবসায়ী ও শ্রমিক বেশি অর্থনৈতিক সুবিধার প্রত্যাশায় উন্নত দেশগুলোতে ভিড় জমাবে। পর্তুগাল ও আয়ারল্যান্ডের মতো অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জার্মান ও সুইজারল্যান্ডের মতো দেশসমূহে ভিড় জমাবে। ফলে এসব দেশের শ্রমিকের মান দ্রুত হ্রাস পাবে, যা এ অঞ্চলে নতুন করে রাজনৈতিক ও শ্রমিক অসন্তোষের জন্ম দেবে। জার্মানি ও স্পেনের মতো শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নসমৃদ্ধ দেশে পর্তুগাল ও আয়ারল্যান্ডের মতো অনুন্নত অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে আসা শ্রমিকদের চাপে স্থানীয় দেশের শ্রমিকরা ব্যাপক হারে চাকরি হারাতে পারে, যা এসব দেশে নতুন করে শ্রম অসন্তোষ ও রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিতে পারে।

৪. **ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবস্থান ক্ষুণ্ন :** অভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র দেশগুলোর আরো একটি ভয়ের কারণ হচ্ছে গত ৪০ বছরের ইতিহাসে এসব দেশে ছোট ছোট পুঁজিপতি শ্রেণির জন্ম হয়েছে, যারা এসব দেশের স্বার্থেও আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। সুতরাং ইউরোপ এক হয়ে গেলে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী পুঁজিপতিদের কাছে এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অবস্থান ক্ষুণ্ন হবে। তাই তারা এক ইউরোপ গঠনের পক্ষে তেমন জোর ভূমিকা রাখছে না।

৫. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবন্ধকতা :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয়টিকে সমর্থন নাও করতে পারে। কেননা এটিকে বিশ্বব্যাপী তাদের একাধিপত্যের ক্ষেত্রে চরম বাধা হিসেবে গণ্য করবে। সেক্ষেত্রে ব্রিটেন বা এ জাতীয় মিত্রদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখতে পারে।

ইউরোপের জনগণের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক ঐক্যসহ রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঐক্য বিদ্যমান, যা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

০৩। গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দা ইউরো জোনে কি বিরূপ প্রভাব ফেলছে? সংকট উত্তরণে ইউরো জোনের দেশগুলো কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? *[৩৩তম; ৩২তম বিসিএস]*

***অথবা,* ইউরো জোনের কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটনের কারণ বর্ণনা করুন। কিভাবে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তর : ১৯৯২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ম্যাসট্রিট চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তিতে দেশগুলোর ঘাটতি অর্থায়নে এবং ঋণের মাত্রার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ ছিল। কিন্তু ২০০০ সালের দিকে ইউরো জোনের কিছু দেশ এ সীমাবদ্ধতা মানতে ব্যর্থ হয় এবং তারা ঋণ ও ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত সরকারের রাজস্বের দিকে হাত বাড়ায়। গ্রীসে সরকারি খাতের উচ্চ বেতন-ভাতা এবং পেনশন চুক্তি এ ঋণ সংকটের সাথে জড়িত। তবে বিভিন্ন দেশে সংকটের কারণও ভিন্ন ভিন্ন। ইউরো জোনের আর্থিক ইউনিয়ন নীতি অর্থাৎ অভিন্ন মুদ্রা নীতি অথচ ভিন্ন রাজস্ব নীতিও (কর, সরকারি পেনশন) এ ঋণ সংকটের পেছনে দায়ী। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা দরকার।

ইউরো জোন সংকট কি : ইউরোপীয় সার্বভৌম ঋণ সংকট বা ইউরো জোন সংকটন হচ্ছে ইউরো অঞ্চলের কয়েকটি দেশে চলমান অর্থনৈতিক সংকট যে দেশগুলো তাদের সরকারি ঋণ তৃতীয় পক্ষের সহায়তা ছাড়া মেটাতে অক্ষম। ইউরো অঞ্চলের সংকট বেশ কয়েকটি জটিল কারণের দ্বারা সৃষ্ট যার মধ্যে রয়েছে অর্থের বিশ্বায়ন অর্থাৎ সহজ ঋণ ব্যবস্থা যার ফলে ২০০২-২০০৮ সাল সময়ের মধ্যে ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ লেনদেন হয়েছে। এছাড়া ২০০৭-২০১২ সাল ব্যাপী বিশ্বের মন্দা, আবাসন খাতের প্রসার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈষম্য ইত্যাদি কারণ বিদ্যমান।

ইউরোপীয় সার্বভৌম ঋণ সংকটের কারণ : ইউরো জোনের সংকটের পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। তবে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে–

সরকারি ও বেসরকারি ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি : একক মুদ্রা হিসেবে ইউরোর প্রচলন ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশকে স্বল্প সুদে অধিক ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এ সংকটের আগের বছরগুলোতে। যার ফলে, তুলনামূলকভাবে দুর্বল মুদ্রার দেশের ঋণগ্রহণকারীরা সুবিধাজনক শর্তে প্রচুর ঋণ পেল, যা সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। কিছু দেশ যেমন আয়ারল্যান্ড ও স্পেনে স্বল্প সুদের ফলে আবাসিক ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল, যা অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। অনেক সমালোচক এটাকে ইউরোর সমস্যা বলেও অভিহিত করেছেন।

সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে– অনেক অর্থনীতিবিদ এ ধারণার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাদের মতে বৃহৎ ঋণ অব্যবস্থাপনার ফলেই এ সংকট তৈরি হয়েছে। ২০০৭ সালে ইউরো অঞ্চলে আর্থিক ঘাটতি ছিল মাত্র ০.৬ শতাংশ যা অর্থনৈতিক সংকটের সময় ৭% এ দাঁড়ায়। একই সময়ে গ্রিস সরকারের গড় ঋণ ৬৬% থেকে বেড়ে জিডিপির ৮৪% এসে পৌছায়।

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানের মতে গ্রিসই একমাত্র দেশ যার সংকটের কারণ আর্থিক দায়িত্বহীনতা। ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা রবার্ট সিডেস্কির মতে, 'মূলত ব্যাংকগুলো অস্বাভাবিক ঋণ প্রদানের ফলেই এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে, ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের ফলে নয়।'

বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা : ফিনান্সিয়াল টাইমসের সাংবাদিক মর্টিন ওলফ মন্তব্য করেছেন যে, এ সংকটের মূল কারণ বাণিজ্যে অসমতা। যখন থেকে এই সংকটের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল অর্থাৎ ১৯৯২-২০০৭ সাল পর্যন্ত জার্মানির একটা ভালো অবস্থান ছিল সরকারি ঋণ এবং ঘাটতির ক্ষেত্রে। অথচ ঐ একই সময়ে কয়েকটি দেশের যেমন– পর্তুগাল, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, স্পেনের ব্যালান্স অব পেমেন্টের অবস্থা খুবই নেতিবাচক ছিল, যেখানে ১৯৯৯ সালের পর থেকে জার্মানির বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত বাড়ছিল সেখানে ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল।

প্রচুর ক্যাপিটাল ইনফ্লো হবার ফলে কিছু দেশে সুদের হার কমে গেল এবং অর্থনীতি অযথা ফুলে উঠে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়িয়ে দিল। কিছু সময়ের জন্য প্রচুর মূলধন বা পুঁজির সরবরাহ ঐসব দেশে সম্পদের মায়াচ্ছন্নতা তৈরি করল, সম্পদের দাম বাড়ছিল, মুদ্রামান স্থির ছিল এবং সবকিছু সুন্দর ও স্বাভাবিক লাগছিল। কিন্তু অচিরেই এই ঘোর কেটে গেল। সম্পত্তি বাষ্পের মতো উধাও হয়ে গেল কিন্তু এসব ঋণ রয়েই গেল।

ইউরো অঞ্চলের কাঠামোগত সমস্যা : ইউরো তথা অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। এ অঞ্চলে মুদ্রা অভিন্ন হলেও রাজস্বনীতি, পেনশন এবং কোষাগার কার্যক্রম কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। ইউরো ব্যবস্থায় দেশগুলোর অভিন্ন মুদ্রা গ্রহণ করা দরকার, কিন্তু এটা বাস্তবায়নের জন্য তাদের নির্দিষ্ট কোনো কার্যকর প্রতিষ্ঠান নেই। তাই দেশগুলো তাদের ইচ্ছেমতো করনীতি ও পেনশন দিচ্ছে।

তাই যদিও এ দেশগুলো ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে এ সংক্রান্ত কতিপয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তথাপি তারা সহজেই এগুলোকে না করাটাকে পছন্দ করে। এর ফলে কিছু ফ্রি রাইডার তৈরি হয়েছে, যেমন গ্রিসের রাষ্ট্রাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ইউরোভুক্ত দেশগুলো কর্তৃক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করানো এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করানো এখন অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতি বিদ্যমান।

তদুপরি এখন পর্যন্ত ইউরোপে কোনো ব্যাংকিং ইউনিয়ন গড়ে উঠেনি যার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়। ব্যাংক ডিপোজিট ইন্সুরেন্স ব্যাংককে দেউলিয়া হতে বাধা প্রদান করে। রি-ক্যাপিটাল্যাইজেশনের মাধ্যমে দ্রুত অর্থ সরবরাহ করে তাৎক্ষণিক জরুরি দাবি-দাওয়া মেটানো সম্ভব। এ রকম ব্যবস্থা ২০০৮ সালে 'Trouble Asset Relict Program" এর আওতায় গড়ে উঠেছিল। ইউরোপের অর্থনীতি খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ ছিল কিন্তু তা আবার অস্বাভাবিক স্বাধীন ছিল। এটা একটা মারাত্মক জটিল অবস্থা। এই ধরনের অবস্থা কয়েকটি দেশে থাকলে তারা আবার যদি অভিন্ন মুদ্রা ব্যবহার করে তাহলে যে সংকট ঘটবে এটাইতো স্বাভাবিক।

আর্থিক নীতির অনমনীয়তা : ইউরো অঞ্চলে একটি একক আর্থিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার ফলে কোনো দেশ চাইলেই স্বাধীনভাবে এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না। বিশেষত তারা ইউরো তৈরি করতে পারে না যার দ্বারা তারা দেনা প্রয়োজনে দেনা পরিশোধ করবে এবং খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কমাবে। যেহেতু তারা একই মুদ্রা ব্যবহার করে তাদের বাণিজ্য অংশীদারের মতো তাই তারা মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি বাড়াতে পারে না, যার ফলে তাদের বাণিজ্য ভারসাম্য ভালো হতো এবং নমিনাল জিডিপি এবং কর রাজস্ব বাড়ত।

অন্যদিকে অবমূল্যায়নের ফলে সঞ্চয়কারীর সম্পদের ক্ষতি হয়। যেমন– ইউরোর ২৫% বিনিময় হার কমে যাওয়ায় এবং ৫ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায় ইউরোজোনের যে সকল বিনিয়োগকারী পাউন্ডে বিনিয়োগ করেছেন তারা তাদের পরিশোধে ৩০ শতাংশ কম মুদ্রা পেয়েছেন ২০১১ সালের শেষের দিকে।

বিশ্বাসের অভাব : সংকট শুরুর আগেও ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ভেবেছিল সার্বভৌম ঋণ নিরাপদ। ব্যাংকে প্রচুর বন্ড ছিল দুর্বল অর্থনীতিগুলোর যেমন গ্রিস। এগুলোর প্রিমিয়ামও কম ছিল এবং নিরাপদ বলেও বিবেচিত হতো। যখন সংকট ঘনীভূত হতে লাগল, এটা তখন স্পষ্ট হলো যে গ্রিস এবং অন্যান্য দেশের বন্ডগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এর ফলে এ খাতে ব্যাপক ধস নামল।

তদুপরি বিনিয়োগকারীদের মনে সংকট দ্রুত অপসারিত হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ জাগল। যেহেতু ইউরোভুক্ত দেশগুলোর আর্থিক নীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ (টাকা ছাপাতে পারে না ঋণ পরিশোধে) নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে তাদের সবাইকে মতৈক্যে পৌছতে হয়। ফেডারেল রিজার্ভের মতো ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মসংস্থানের ম্যান্ডেট নেই শুধু মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত ম্যান্ডেট রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সমস্যা : ২০১২-১৩ সালে বহু ইউরোপীয় দেশ মারাত্মক চাপে ছিল বিশেষ করে স্পেন। পুঁজি সরবরাহের সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, বিনিয়োগকারীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এবং ব্যাংকগুলোও একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

জুন ২০১২ এর দিকে ইউরোর বিনিময় হার আরও কমে, তখন গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, বিত্তবানরা তাদের সম্পদ ইউরো জোনের বাইরে পাচার করছে এবং ইউরো অঞ্চলে রাখলেও তা উত্তর ইউরোপীয় দেশে রাখছে। জুন ২০১১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ইতালি ও স্পেন যথাক্রমে ২৮৬ ও ২৩৫ বিলিয়ন ইউরো হারায়। ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো তাদের জিডিপির ১০% মূল্যের সম্পদ হারায়।

ইউরোপীয় সংকটের স্বরূপ

গ্রিস : ১০-১২ বছর আগেও গ্রিসের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ছিল যদিও কিছু অবকাঠামোগত সমস্যা ছিল। ২০০০ সালের পরে বৈশ্বিক মন্দার সময় গ্রিসের অর্থনীতি ব্যাপক মার খায় বিশেষ করে এর জাহাজ শিল্প এবং পর্যটন শিল্পে ধস নামে। সরকার আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করে।

২৩ এপ্রিল ২০১০ গ্রিসে সরকার ৪৫ বিলিয়ন ইউরো ঋণ সহায়তা প্রার্থনা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আইএমএফের কাছে। এর পরই ব্যাপক প্রতিবাদ ও সংঘর্ষ শুরু হতে থাকে।

আয়ারল্যান্ড : এ দেশের সংকট সরকারি ঋণের ফলে সৃষ্টি হয়নি বরং ছয়টি ব্যাংকের অবিবেচনাপ্রসূত ঋণ প্রদানের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আইরিশ ব্যাংকগুলো প্রায় ১০০ বিলিয়ন ইউরো হারায় যার অধিকাংশই আবাসন খাতের জন্য যা ২০০৭ সালে ধসে পড়ে। ২০০৮ সালে অর্থনীতিতেও ধস নামে ২০১০ এ বেকারত্বের হার ১৪% এ পৌছায়। ২০০৭ সালে যেখানে বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল সেখানে ২০১০ সালে জিডিপির ৩২% বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়।

স্পেন : সংকটের পূর্বে স্পেনে তুলনামূলকভাবে কম ঋণ ছিল। আবাসন খাতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমেই এ দেনা পরিশোধ করা হতো। আবাসন খাতে ধস নামার পর ব্যাংকগুলোকে প্রণোদনা দেয়া হয় টিকে থাকার জন্য। ব্যাংকগুলোর অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। অন্যদিকে অন্যান্য খাতেও প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে। ফলে সরকারের ঘাটতি বেড়ে যায়।

পর্তুগাল : আমেরিকান ও ইউরোপীয় সংকট দ্রুত পর্তুগালের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ে। এর সার্বভৌম বন্ড তার ব্যাংকিং হারায়। সরকারের উপর চাপ বাড়ে। ২০১১ সালের সরকার ইইউ-আইএমএফের কাছে ৭৮ বিলিয়ন ইউরো বেইল অডিট প্যাকেজ সাহায্য চায়।

সাইপ্রাস : সেপ্টেম্বর ২০১১ সালের দিকে সাইপ্রাসের সার্বভৌম বন্ডও ব্যাপক মূল্য হারায়। অন্যদিকে রাজস্ব ও কাঠামোগত উন্নতিও ব্যাহত হয়। গ্রিসের ধস দ্বারা দেশটির অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইন্টারন্যাশনাল বেটিং এজেন্সির ক্রেডিট ব্যাংকিং এবং সরকারের পরিশোধে ব্যর্থতা দেশটির অর্থনীতিতে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সংকট উত্তরণে কতিপয় সুপারিশ :

ব্যাংকগুলোকে সরাসরি ঋণ প্রদান : ২০১২ সালের ২৮ জুন ইউরো অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ সংকটাপন্ন ব্যাংকগুলোকে ইউরোপীয় স্ট্যাবিলিটি মেকানিজমের (ইএসএম) মাধ্যমে সরাসরি ঋণ প্রদানে একমত হন, যার ফলে তাদেরকে আর ঐ অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে লোন নিতে হবে না এবং এতে তাদের সার্বভৌম ঋণ বাড়বে না। তবে এটি ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিকল্পনার সাথে জড়িত। ইতোমধ্যেই ইতালি এবং স্পেনে এই সংস্কার কার্যক্রমের সুফল পাওয়া গেছে। তাই এটি আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

সঠিক বিনিয়োগে শিথিলতা : এই সংকট থেকে উত্তরণ পেতে ঐ অঞ্চলের দেশগুলো বিনিয়োগ ক্ষেত্রে যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে সেগুলো শিথিল করা প্রয়োজন। গ্রিস এবং স্পেনে এখন মুদ্রাসংকোচন নীতি কার্যকর রয়েছে, যা কেবল দেশগুলোর মন্দা দীর্ঘায়িতই করবে। আইএমএফের এক প্রতিবেদেন দেখা যায় যে সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি প্রবৃদ্ধির পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। প্রতিবেদনে বলা হয়– আর্থিক কঠোরতার নীতি যেমন কর বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন অর্থনীতিতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে, অন্যদিকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানকারী দেশ জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তুলনামূলকভাবে ভালো করছে।

বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন : সংকটাপন্ন দেশগুলোর উচিত তাদের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় বেশি দক্ষতা অর্জন। এর ফলে দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে এবং বাণিজ্য শর্ত (টার্মস অব ট্রেড) উন্নতি লাভ করবে। ইউরোপীয় দেশগুলো তিন ধরনের চাপের মুখোমুখি হয়– জনতাত্ত্বিক (বেশি বয়স্ক লোক), প্রযুক্তি (কম লোক দ্বারা বেশি কাজ সম্ভব) এবং বিশ্বায়ন (যার ফলে সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং বিশ্বের যে কোনো স্থানে স্বল্প সময়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে)।

মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে এই বাণিজ্য সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব কিন্তু ইউরোজোনের দেশগুলোতে অভিন্ন মুদ্রা হওয়ায় তা সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে অন্যান্য অপশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ অবমূল্যায়ন : অভ্যন্তরীণ অবমূল্যায়নের মাধ্যমে ইউনিট লেবার খরচ কমিয়ে জার্মানি তুলনামূলক দাম/মজুরি এর ১৬ শতাংশ কমিয়ে এনেছে। গ্রিস এবং ইটালিতেও এই পদ্ধতি ফল দিচ্ছে।

রাজস্ব অবমূল্যায়ন : আরেকটি অপশন হচ্ছে রাজস্ব অবমূল্যায়ন। এক্ষেত্রে করপোরেট কর কমিয়ে মূল্য সংযোজন কর এবং পরিবেশ দূষণকারী খাতে কর বাড়ানো যেতে পারে। জার্মানি ও পর্তুগাল ইতোমধ্যে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

চলতি হিসাবের ঘাটতি কমানো : এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থিতিশীলতা ছড়িয়ে যেতে পারে।

ঋণ আবর্তন : ২০১২ সালে স্পেন ও ইতালির ঋণ ক্রয়ের জন্য কিছু প্রস্তাব করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবগুলো দেশ মিলে একটি পরিকল্পনায় পৌঁছতে হবে।

ইউরোপীয়ান রাজস্ব ইউনিয়ন : আর্থিক নীতির মতো রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রেও ইউরোপের দেশগুলোকে একক হতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আবশ্যক।

ব্যাংক সহায়ক প্রতিষ্ঠান : ইউরো অঞ্চলের ব্যাংকগুলোকে দেউলিয়াত্বের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাংক রিকভারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষের দরকার রয়েছে। তবে ৬ জুন ২০১২ এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ইউরোপীয় কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

ইউরোবন্ডস : এ সংকট উত্তরণে ইউরোবন্ড কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ইউরোপীয় কমিশনের মতে এ বন্ড ১৭ ইউরো জাতি কর্তৃকই ইস্যু করা হবে যা স্থিতিশীলতা বন্ড হিসেবে এ সংকট প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

ইউরোপীয় মনিটরি ফান্ড : এর মাধ্যমে সংকটাপন্ন দেশগুলো ঋণগ্রহণ করতে পারে। এটি কেবল এ ধরনের সংকটের সময়ই কাজ করবে। এটি এক্ষেত্রে বন্ড ও ইস্যু করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে অতিদ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। তা না হলে এ সংকট বিশ্বব্যাপী ছড়াতে পারে। করনীতি, বাজারনীতি ইত্যাদি সংশোধন করা দরকার। ব্যাংকগুলো রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। ইউরো জোন ভেঙেও যেতে পারে। এ ব্যাপারে ইউরো জোনের দেশগুলোকে একমত হতে হবে যে তারা রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যথাযথ স্থানে রাখবে।

০৪ । MDG কি? MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
***অথবা,* জাতিসংঘ প্রণীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' (MDGs) কি? এ বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন।**

উত্তর : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকে।

MDG এর লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ : জাতিসংঘের গৃহীত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (MDG–Millennium Development Goal) -এর ৮টি লক্ষ্য আছে। নিচে এসব লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।
লক্ষ্যমাত্রা : ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীতে ক্ষুধার্ত মানুষের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাস।

লক্ষ্য-২ : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
লক্ষ্যমাত্রা : ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা।

লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
লক্ষ্যমাত্রা : ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।

লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।
লক্ষ্যমাত্রা : ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস।

লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।
লক্ষ্যমাত্রা : ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস।

লক্ষ্য-৬ : এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
লক্ষ্যমাত্রা :
১. ২০১৫ সালের মধ্যে এইডস এর বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস।
২. ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস।

লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা।
লক্ষ্যমাত্রা :
১. জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা এবং কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা অঙ্গীভূত করা এবং পরিবেশীয় সম্পদের ক্ষয়রোধ।
২. ২০১৫ সালের মধ্যে সুপেয় পানি প্রাপ্তির সুযোগহীন জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অর্ধেকে হ্রাস।
৩. ২০২০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনমান লক্ষণীয়ভাবে উন্নত করা।

লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য : MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। নিচে MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখ্য করা হলো :

১. **শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্য :** MDG এর লক্ষ্য-৪ এ ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশ সরকার বেশ সাফল্য পেয়েছে। তাছাড়া টিকা দান কর্মসূচি, পুষ্টিমান বাড়ানো, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
২. **মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাফল্য :** MDG এর লক্ষ্য-৫ এ ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাল্যবিবাহ রোধ, প্রশিক্ষিত ধাত্রী দ্বারা প্রসব, প্রসবকালীন জটিলতা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি পদক্ষেপের ফলে এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে।

৩. **চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূরীকরণের সফলতা :** MDG এর লক্ষ্য-১ এ চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সরকার আশা করে যে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্য অনুসারে বিগত বছরগুলোতে দেশের দারিদ্র্য দূর হয়েছে প্রতিবছর ৪.৭ শতাংশ হার। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্য অনুসারে খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালের ৪৪.৭ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশে, যা দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশের এক মাইলফলক অর্জন।
৪. **সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সফলতা :** MDG এর লক্ষ্য-২ এ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুসারে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ৯৮ শতাংশ। আর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ৮০ শতাংশের বেশি। এছাড়া বিনামূল্যে বই বিতরণ, ছেলে-মেয়ে সকলের জন্যই উপবৃত্তির ব্যবস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিরল অর্জন। ২০১৫ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, যা অর্জনের পথে বাংলাদেশ।

MDG অর্জনে বাংলাদেশের ব্যর্থতা : MDG অর্জনে বাংলাদেশের যেমন সাফল্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু ব্যর্থতা। নিচে MDG অর্জনে বাংলাদেশের ব্যর্থতাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে ব্যর্থতা :** MDG এর লক্ষ্য-৩ এ নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গ-বৈষম্য দূর হয়েছে বলে দাবি করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার নারীদের প্রাধান্য দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে বৈষম্য কিছু কমেছে। কিন্তু বৈষম্য দূর করতে নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত জরুরি।
২. **এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধে ব্যর্থতা :** MDG এর লক্ষ্য-৬ এ এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধের কথা বলা হয়েছে। সরকারি তথ্য মতে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে শনাক্তকৃত এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কয়েক হাজার। কিন্তু এ সংখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বেসরকারি হিসেবে এটা কয়েক লাখ হবে। মাদকসেবী এবং পতিতাদের মাধ্যমে এ রোগ বেশি ছড়াতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না।
৩. **টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিতকরণে ব্যর্থতা :** MDG এর লক্ষ্য-৭ এ টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে বনভূমি আছে মাত্র ১৩ ভাগ। কিন্তু ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। তাছাড়া টিউবওয়েলের পানিও আর্সেনিকের কারণে পান করা যাচ্ছে না। আর্সেনিক সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। আর গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি কম হওয়া এবং জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে মানুষ যেভাবে শহরমুখী হচ্ছে তাতে বস্তিবাসীর জীবনমানের উন্নতি সম্ভব নয়।
৪. **উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরিতে ব্যর্থতা :** MDG এর লক্ষ্য-৮ এ উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এরই প্রক্রিয়ায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু ঋণগুলো এমন শর্ত নির্ভর হয় যেখানে উন্নতির চেয়ে অবনতির সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া মুক্ত বাণিজ্যের কারণে আমাদের শিক্ষা খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুশাসনের অভাবে এবং দুর্নীতির কারণে ৫ বার দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ।

MDG-এর লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য ব্যর্থতার খতিয়ান

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
লক্ষ্যমাত্রা ১ : চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ				
লক্ষ্য ১ক : দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.১ জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখা এর নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কি. ক্যাল.)	৫৬.৬	৩১.৫ (২০১০ HIES এর প্রাথমিক হিসাব)	২৯.০	→
১.২ দারিদ্র্য ব্যবধান অনুপাত	১৭.০	৬.৫ (২০১০)	৮.০	→
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ	৬.৫	৮.৮৫ (২০১০)	প্রযোজ্য নয়	-
লক্ষ্য ১খ : মহিলা ও যুবসমাজসহ সকলের জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ				
১.৫ মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার	৪৮.৫	৫৯.৩ (২০১০) (LFS ২০১০)	সকলের জন্য	↓
লক্ষ্য ১গ : ক্ষুধাক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ও জনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৩৭ (২০১০)	৩৩	
১.৯ ন্যূনতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার	২৮.০	১৯.৫ (২০০৫)	১৪.০	↓

উৎস : বিবিএস, UNDP বাংলাদেশ, ২০১১। → on track = ↓২০১৫ এর মধ্যে অর্জন সম্ভব নয়

গৃহীত উন্নয়ন কৌশল/ নীতিসমূহের পর্যালোচনা

১. **দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP–I) সরকারিভাবে ১৬ অক্টোবর ২০০৫ গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীতে PRSP–I (২০০৫-০৮) ও PRSP–II এর মেয়াদ শেষ হলে ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি সংস্থা এবং এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কয়েকশ' এনজিও কাজ করছে। এছাড়া বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা দেয়া হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের জনগণ মঙ্গাকবলিত, দক্ষিণাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলে বন্যা জনগণের ব্যাপক ক্ষতি করে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। তাছাড়া জনগণকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে কখনোই দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব নয়। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যেসব দেশের শিক্ষার হার বেশি তারা তত বেশি উন্নত। তাই সরকারকে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. **প্রাথমিক শিক্ষা :** বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং গরিব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান জোরদার করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা দান করা প্রয়োজন। ২০১৫ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষার জন্য স্কুল এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩. **নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন :** ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সরকার মেয়েদের বিনাবেতনে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। এটা আরো বাড়াতে হবে এবং সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানো না গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত জরুরি। সংসদে নারী আসন,

ইউপি নির্বাচন প্রভৃতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটি পর্যাপ্ত নয়। দেশে যেখানে সরকারি এবং বিরোধী দলীয় প্রধান দুজনেই মহিলা সেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান অনেক নিচে। ধর্মীয় কুসংস্কার, ফতোয়া, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এজন্য দায়ী। তাই শিক্ষিত করা এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারকে এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।

৪. **শিশু মৃত্যু হ্রাস :** বেসরকারি ক্ষেত্রে যে পুষ্টি কার্যক্রম রয়েছে তা সরকারিভাবে এবং ব্যাপক হারে চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া টিকাদান কর্মসূচি দক্ষতার সাথে চালিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসা সেবা গ্রামাঞ্চলে পৌছে দিতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে যে চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে সেখানে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ওষুধপত্রের সহজলভ্যতা এবং দুর্নীতি রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

৫. **মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি :** ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রসূতিসেবা, মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র চালু এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও ডাক্তার রাখা দরকার। তাছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ, শিক্ষার বিস্তার এবং সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা জোরদার করা না গেলে মাতৃমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব নয়।

৬. **এইডস রোধ :** সরকার এইডস নিয়ে খুব সচেতন নয়। কারণ তাদের পরিসংখ্যান এবং বাস্তবতাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। মাদকসেবীদের একই সুচে মাদক গ্রহণ ব্যবহৃত ডিসপজেবল সিরিঞ্জ অবৈধভাবে হাসপাতালে ব্যবহার, অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করা এবং পতিতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। পতিতালয়গুলোতে কনডম ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। সরকারিভাবে এসব নিয়ে তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। বেসরকারিভাবে এইডস নিয়ে যেসব কাজ চলছে তাতে এ ভয়ঙ্কর ব্যাধি রোধ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এইডস এবং অন্যান্য রোগ থেকে জনগণকে রক্ষা করা সম্ভব।

৭. **টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ :** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পলিথিন নিষিদ্ধকরণ, ইটের ভাটায় গাছ পোড়ানো বন্ধ, চিমনি ১২০ ফুট লম্বা করা ইত্যাদি ভালো পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বনায়ন কর্মসূচির ফলে জনগণ সচেতন হচ্ছে এবং সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগতভাবে বৃক্ষরোপণ চলছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে না পারলে ভূমি এবং বনভূমির ওপর চাপ বাড়বেই। তাছাড়া জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে যে হারে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হয়। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো এবং গ্রামীণ উন্নয়ন একান্ত জরুরি।

৮. **উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি :** বাংলাদেশ যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশ তাই দেশের এসব সমস্যাগুলোকে সাহায্যদাতাদের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করতে হবে। এজন্য কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া বিদেশী সহায়তাগুলোর যথাযথ ব্যবহার এবং দুর্নীতিরোধ করতে হবে।

'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য মূলত যে জিনিস দরকার তা হচ্ছে সদিচ্ছা, দুর্নীতি রোধ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গৃহীত নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ। বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে তা বন্ধ করতে না পারলে এ লক্ষ্য পূরণ কেন কোনো লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই দেশে এবং জনগণের উন্নতির স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে অন্যের সাহায্যের আশায় থাকতে হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশ।

০৫। "বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।"– আলোচনা করুন এবং এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রবাসী শ্রমিক, রেমিট্যান্স ও বাংলাদেশের অর্থনীতি একই যোগসূত্রে গাঁথা। কারণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশী শ্রমিক। এদের নিরলস পরিশ্রম, মেধা ও দক্ষতা একদিকে দেশের ভাবমূর্তিকে করছে উজ্জ্বল, অন্যদিকে অর্থনীতির গতিকে রাখছে গতিশীল ও চাঙ্গা।

বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড : বিদেশের বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা মোটামোটি সন্তোষজনক। নিচে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব আলোচনা করা হলো :

১. **বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের পরিসংখ্যান :** বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ করে থাকে। তবে এ জনশক্তি প্রেরণের সংখ্যা স্বদেশ ও বিদেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কম বেশি হয়ে থাকে। নিচে এরূপ একটি তালিকা উল্লেখ করা হলো :

সাল	দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
২০০২	৫৬,২৬৫
২০০৩	৭৪,৫৩০
২০০৪	৮,১৮,৮৭
২০০৫	১,১৩,৬৫৫
২০০৬	১,১৫,৪৬৮
২০০৭	১,৬৫,৩৪৪
২০০৮	২,৮১,৪৪৪
২০০৯	১,৩৪,২৬৫
২০১০	৯,০৬,২১
২০১১	২,২৯,১৪৯
২০১২	২,০৯,৩৬৮
২০১৩	১,৩৩,৭৫৪

[**উৎস :** *জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।*]

উপরের পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০২ সালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২৫ শতাংশ যা ২০১৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৩ শতাংশে।

২. **রেমিট্যান্স :** অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ এর তথ্য মতে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪.৪১ লাখ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল

সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১১,৭২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র শতকরা ১০.৫৫ ভাগ এবং মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫০.৬৪ ভাগ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা ১১.১১ এবং মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫২.৯২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ জিডিপির ৯.৫ শতাংশ।

৩. **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ :** দেশজ সঞ্চয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৯.২৬ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোটেই পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু রেমিট্যান্স প্রবাহের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির ফলে জাতীয় সঞ্চয় ২৯.১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৯.৫১ শতাংশ হয়েছে। গত বছরের তুলনায় বেসরকারি বিনিয়োগ ২০.০৪ শতাংশ থেকে নেমে ১৮.৯৯ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু সরকারি বিনিয়োগ ৬.৫০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৮৫ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। তাই মোট বিনিয়োগ ২০১১-১২ অর্থবছরের ২৬.৫৪ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৮৪ তে পৌঁছেছে।

৪. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি :** ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মন্দা হতে উত্তরণের পরপরই ২০১১-১২ এর প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী মন্দার পুনরাবির্ভাব হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি পুনরায় চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়। এ সময় সামগ্রিকভাবে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে প্রতি বছর গড়ে ৬ শতাংশের বেশি জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এসময় রেমিট্যান্স এর ব্যাপক প্রবাহে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত প্রায় দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। বিশ্বের চলমান ভারসাম্যহীনতা সঠিকভাবে মোকাবেলা এবং টেকসই ও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গত অর্থবছরে অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়। চলতি অর্থবছরেও এসব কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৫. **বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন :** ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মূল বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬১,৩৪৬ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০৪ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩,৯৩৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.২ শতাংশ)। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ১১,৯০৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.১ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৩১,৭১১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১ শতাংশ) সংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬. **মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি :** ২০১২-১৩ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money–M1) ও ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money–M2) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় ব্যাপক মুদ্রা ও সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১৮.১১ শতাংশ ও ১১.০৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৭.৬০ শতাংশ ও ৬.৫৬ শতাংশ। এ সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ও তলবি আমানত উভয়ই বৃদ্ধির কারণে সংকীর্ণ মুদ্রার এ উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এছাড়াও মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির ফলেও সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অন্যদিকে, নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাস পেলেও নিট বৈদেশিক সম্পদ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৭.৬৪ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী বছরে ১১.৮৫ শতাংশ ছিল।

৭. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ :** ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১১ তারিখের ১০৯১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে দাঁড়ায় ১০৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহের তুলনায় অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ২৪ বিলিয়ন (২৪০০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলে সংঘটিত রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য সরকার বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন শ্রম বাজারের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. **জি-টু-জি পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ :** মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে :

১. জর্ডানে বিনা খরচে গৃহকর্মী পাঠানো হচ্ছে এবং গার্মেন্টস খাতে অনধিক ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) টাকা ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

২. বাহরাইনে স্বল্প খরচে সরকারিভাবে জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে দুই দেশে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাহরাইনে জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হবে।

৩. স্বল্প খরচে বিএমইটি এবং বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডান, হংকং, সৌদি আরব, কাতার ও বাহরাইনে নারী কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪. অন্যান্য দেশে জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ সকল নতুন নতুন উদ্যোগের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের অপরাপর দেশ তথা সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, কুয়েত, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়াসহ অন্যান্য দেশে পূর্বের ন্যায় জনশক্তি রপ্তানি অব্যাহত রাখার বিষয়ে সরকার কাজ করছে। শীঘ্রই সৌদি সরকার বাংলাদেশী কর্মীদের আকামা পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করবে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ছাড়াও জি-টু-জি পদ্ধতিতে কোরিয়ায় বিমান ভাড়াসহ মাত্র ৬৫,০০০ টাকায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ায় সরকারিভাবে (জি-টু-জি পদ্ধতিতে) স্বল্প ব্যয়ে (সর্বোচ্চ ৩৩,১৭৮ টাকা) কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বল্প খরচে তিন ব্যাচে ১৯৮ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছেন। একইভাবে হংকং, জর্ডান, সিঙ্গাপুর এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বল্প খরচে নারী কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে থাইল্যান্ডের সাথে

ব্যাপকহারে মৎস্য ও নির্মাণ শিল্পে সরকারিভাবে জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাপানে জিটকোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী কর্মী প্রেরণের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

খ. **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন :** বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সহায়তা দিতে ও বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানে আর্থিক সহায়তা দিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে এপ্রিল/২০১৩ পর্যন্ত ১৭০০ জন বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসন ঋণ বাবদ প্রায় ১৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যাগতদের মধ্যে ৫০ জনকে পুনর্বাসন ঋণ বাবদ প্রায় ১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

গ. **ব্যুরোর কল্যাণ শাখা :** কল্যাণ শাখা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন স্থাপিত একটি সেবাধর্মী শাখা। উক্ত শাখা প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, মৃতের লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান, প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মী বিদেশ হতে মৃত্যুজনিত কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ না পেলে উক্ত মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট হতে প্রাপ্য মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়, ইন্স্যুরেন্স ও বকেয়া বেতনের অর্থ আদায়, বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান, বিদেশে আটকা পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন, বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদানের মতো বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। ২০১১ সালে ৬৮১ জন মৃতের উত্তরাধিকারী পরিবারকে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১১.৬১ কোটি টাকা এবং ২০১২ সালে ১৩০৪ জন মৃতের উত্তরাধিকারী পরিবারকে ২৩.১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মৃত কর্মীর লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ২০১১ সালে ১৮৬৯টি পরিবারকে ৬.৬১ কোটি টাকা এবং ২০১২ সালে ২২০১টি পরিবারকে ৭.৫২ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. **বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন :** রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ নিবন্ধন করা হচ্ছে। ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মার্ট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমানবন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে।

ঙ. **বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিতকরণ :**

I রেমিটেন্স আহরণ এবং বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩০০টি বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে বাংলাদেশের ৪২টি ব্যাংকের প্রায় ৮৫০টি ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;

- বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশস্থ ১৬টি ব্যাংকের বিদেশে ৪৪টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- রেমিটেন্স বিতরণ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করার প্রয়োজনে এ পর্যন্ত ১৬টি Microfinance Institution কে রেমিটেন্স বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- রেমিটেন্স বিতরণ নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে সম্প্রতি দেশের ৪টি ব্যাংক (ঢাকা ব্যাংক লিঃ, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এবং সিটি ব্যাংক এনএ) কে রেমিটেন্স এর অর্থ Mobile Operator গুলোর outlets এর মাধ্যমে বিতরণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণকারীগণকে এককভাবে বা এদেশীয় উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্প স্থাপনের অনুমতি প্রদানের পাশাপাশি Foreign Direct Investment (FDI) আকারে এদেশে বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য দেশে বিবিধ বিনিয়োগ সুবিধা যেমন-(ক) Wage Earners' Development Bond (খ) US Dollar Investment Bond এ (গ) US Dollar Premium Bond এ বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি;
- রেমিটেন্স বিতরণ দ্রুততর ও ব্যয় সশ্রয়ীকরণের লক্ষ্যে Remittance and Payment Partnership Project (FPP)-এর আওতায় Challenge Fund এর মাধ্যমে Remmittance Delivery Infrastructure উন্নয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন;
- বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অধিক রেমিটেন্স প্রেরণকে উৎসাহিত করতে অধিক রেমিটেন্স প্রেরণকারীকে সরকার কর্তৃক CIP মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রম বাজার এক বিশাল সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর রেমিটেন্স পেয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

০৬। আঞ্চলিকতাবাদ কি? আপনি কি মনে করেন আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতিহুমকিস্বরূপ? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন। *[১৩তম বিসিএস]*

অথবা,* আঞ্চলিক সহযোগিতা কি? আঞ্চলিক সহযোগিতা কি বিশ্ব সহযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী না পরিপূরক? আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]

উত্তর : বর্তমান বিশ্বের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়— আন্তর্জাতিকতাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদ। আন্তর্জাতিকতাবাদ অত্যন্ত 'old concept' হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী 'লীগ অব নেশন্স' এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী 'জাতিসংঘ' গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দিকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার নামে আঞ্চলিকতাবাদ বিশেষভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সাফটা, সার্ক, নাফটা, আফ্রিকান ইউনিয়ন এসবই আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ। তাই আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুটি

বিপরীতধর্মী চরিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। আঞ্চলিকতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ উভয়েরই মূল স্পিরিট হলো 'peaceful cooperation and coexistence' অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও সহাবস্থান। সুতরাং কোনোভাবেই শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও সহাবস্থানের বিরোধিতা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

আঞ্চলিকতাবাদ : 'আঞ্চলিকতাবাদ' যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Regionalism'. আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি নতুন প্রপঞ্চ। আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান। বর্তমানে বিশ্বের সব প্রান্তেই আঞ্চলিকতাবাদের জোয়ার বইছে। বৃহৎ শক্তিবর্গ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোও আঞ্চলিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। আঞ্চলিকতাবাদের মূলকথা হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কতিপয় রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ অঞ্চলের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আঞ্চলিকতাবাদের শক্ত উদাহরণ। এছাড়াও রয়েছে– ১. সার্ক, ২. আফ্রিকান ইউনিয়ন, ৩. আরব লীগ, ৪. ইকো, ৫. আসিয়ান ইত্যাদি।

এসব সংগঠন আঞ্চলিকতাবাদের প্রেরণা নিয়ে গঠিত হয়েছে। এ আঞ্চলিকতাবাদের আলোকে তারা পারস্পরিকভাবে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাস করে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোতে নিজেদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের হুমকিস্বরূপ কি না : এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি। আন্তর্জাতিকতাবাদ আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ, যার ইংরেজি পরিভাষা হলো 'Internationalism'. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয়, 'Internationalism implies a feeling of brotherhood nourished by all people of the world. It is a system of feeling, thought and action designed to promote peaceful cooperation and coexistence.' অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবাদ ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি নির্দেশ করে, যা বিশ্বের সব মানুষ লালন করে। শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও সহাবস্থানকে ত্বরান্বিত করার জন্য কর্মকাণ্ড, চিন্তাশক্তি ও অনুভূতির পদ্ধতিটিই হলো আন্তর্জাতিকতাবাদ।

আমাদের সবাই একটি একক সমাজের অংশ এবং আমরা সবাই পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। আর বর্তমানে আমাদের এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেন আরো গভীর চরিত্র লাভ করেছে। তাই বিশ্বের সব জাতিই আজ শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়া ও সহযোগিতার জন্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করছে। আর কোনো দেশ বা জাতির পক্ষেই নিঃসঙ্গভাবে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ একক বিশ্ব গঠনকেই ত্বরান্বিত করছে। তাই সমগ্র পৃথিবীকে একটি পরিবার এবং আমাদেরকে এর সদস্য হিসেবে চিন্তা করা যায়। আমাদের উচিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্পৃহাকে কাজে পরিণত করা।

আমাদের এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী একটি একক বাজারে পরিণত হতে যাচ্ছে। শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও আমরা আজ পরস্পরের নিকটবর্তী। আর নিকটবর্তী হওয়ার এ প্রবণতাই আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি। এজন্যই অধ্যাপক হ্যারল্ড জে লাস্কি বলেছেন, 'There are no longer lotus fields where men may linger careless of the life about them. The world is one and indivisible in a sense so compelling that the only question before us is the method by which we represent its unity.'

একই অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন কতিপয় পণ্ডিতের লেখনিতে। পণ্ডিত ভিষ্ণু শর্মা তার 'পঞ্চতন্ত্র'-তে লিখেছেন, 'The conception of mind and their prevails amongst

the narrow minded people, the broad minded people consider the world as their family.' অর্থাৎ 'আমার' এবং 'তোমার' এ ধরনের অনুভূতি অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের লোকদের মধ্যেই থাকে, প্রসারিত মনের মানুষেরা সারা পৃথিবীকে নিজেদের পরিবারের মতো মনে করে। এখানে আন্তর্জাতিকতাবাদের স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখা যায়, দান্তে ও কান্টের মতো দার্শনিকগণ আন্তর্জাতিকতাবাদের সমর্থন করেছেন।

আন্তর্জাতিকতাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতনের পর রাশিয়ার উদ্যোগে রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া 'Holy Alliance' নামে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলে। অতঃপর নেপোলিয়নকে পুনরায় ক্ষমতা দখল থেকে বিরত রাখতে এবং ইউরোপে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে রাশিয়া, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং ব্রিটেন মিলে গঠন করে 'European Concert'. রাশিয়ার আহ্বানে ১৮৮২, ১৮৯৯, ১৯০৭ সালে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে এ সংগঠনের সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করা হয়। বৈঠকগুলোতে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপও গৃহীত হয়। ১৮৬০ সালে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় গঠিত হয় 'League of Peace'. কিন্তু ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতাবাদের ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধকে চিরতরে বিদায় জানাতে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় গঠন করা হয় 'League of Nations'. কিন্তু হিটলারের ঔদ্ধত্য শেষ পর্যন্ত 'League of Nations'-কেও ব্যর্থ করে দিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় প্রতিষ্ঠা করা হলো জাতিসংঘ, যা আজকে আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল প্রেরণা।

কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদের সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্পর্কই আজ বিতর্কের বিষয়। অনেকে মনে করেন আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদকে বাতিল করে দেয় না, তবে এর ফলে আন্তর্জাতিকতাবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক ভ্রাতৃত্বের চাপে অবশ্যম্ভাবী ফল হলো আন্তর্জাতিক সংগঠনে জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মতবিরোধ।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা যদি আঞ্চলিক সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব সব আঞ্চলিক সংগঠনই জাতিসংঘের নীতিমালা মেনে চলার অঙ্গীকার করে। তাছাড়া এসব সংগঠনের অন্যান্য যে নীতিমালা রয়েছে সেগুলোও পারস্পরিকভাবে overlaping করে। সুতরাং তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে মৌলিক কোনো মতবিরোধ নেই। কারণ উভয় সংগঠনই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস করে।

তবে অদূর ভবিষ্যতে কোনো আঞ্চলিকতাবাদ যদি dominating power অর্জন করে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোতে এর একক আধিপত্য অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে অসন্তুষ্ট করতে পারে, যার ফলে আন্তর্জাতিকতাবাদ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিকতাবাদকে আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্তরায় বলা অনাবশ্যক। আঞ্চলিকতাবাদ যদি আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলনীতিকে বজায় রেখে বিকশিত হয় তাহলে সে আঞ্চলিকতাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের শাখা রূপেই পরিগণিত হবে। তবে আঞ্চলিকতাবাদকে অবশ্যই কোনোক্রমেই উগ্র গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া চলবে না। আঞ্চলিকতাবাদের এরকম ভয়ানক খেলা শুরু হলে আন্তর্জাতিকতাবাদই শুধু সঙ্কটে পড়বে না বরং সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। তাই আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর মূলনীতিকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং পাশাপাশি সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করতে হবে। এভাবেই একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। অন্যথায় আমাদের সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭। ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়?
খ. বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করুন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আদান-প্রদান বা আমদানি-রপ্তানিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। ভৌগোলিক বিশেষীকরণের ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি পার্থক্যের দরুন কোনো বিশেষ অঞ্চল বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা লাভ করে থাকে। যেসব দ্রব্য উৎপাদনে যে দেশের আপেক্ষিক সুবিধা রয়েছে সে দেশ সেসব দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং তা রপ্তানি করে তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করবে। এ ধরনের আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটে।

মুক্তবাজার অর্থনীতি

সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং একই সাথে সমালোচিত বিষয় হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতি। যেহেতু অর্থনীতি কোনো সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তাই অর্থনীতির ধারণা ও কার্যক্রমের যে কোনো পরিবর্তন মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও চিন্তাভাবনার ওপর প্রভাব ফেলে। সেজন্য অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' কেবল অর্থনীতিবিদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা সমাজের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি বর্তমানে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে চলছে নানা যুক্তিতর্ক ও বিতর্ক। পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশ্বের সর্বত্র তাদের বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুক্তবাজার ধারণা প্রণয়ন করে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে একই বাণিজ্য ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা হয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণাতে রয়েছে বিশ্বব্যাপী পণ্যের অবাধ চলাচল, শ্রমের অবাধ যাতায়াত, পুঁজির অবাধ বিনিয়োগ ইত্যাদি।

সাধারণভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্যের অবাধ বিচরণ এবং আদান-প্রদানকে। পণ্যের মূল্য সীমিত, গুণাগুণ ভালো এবং বাজারজাতকরণের আধুনিক প্রযুক্তি যে দেশ যত বেশি আয়ত্ত করতে পেরেছে সে দেশের পণ্য অন্যদেশের বাজার তত বেশি সহজে দখল করতে পেরেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন যে সেখানে সম্পদের বণ্টন ও উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় মূল্য বা দামের ভিত্তিতে, যা মূলত নির্ধারিত হয় ভোক্তা-শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের স্বত্বাধিকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত মিলনের ফলে। McGraw Hill Dictionary of Modern Economics-এর মতে, 'মুক্তবাজার অর্থনীতি হলো অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন এক অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতে কি কি দ্রব্য ও সেবা কি পদ্ধতিতে কার ভোগের জন্য উৎপাদিত হবে সেসব প্রশ্নের মীমাংসার ভার বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা শক্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়।'

মুক্তবাজার অর্থনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নর্থ আটলান্টিকে এক বৈঠকে মিলিত হন যুদ্ধ-পরবর্তীতে সব দেশের জন্য একটি অভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খসড়া নীতি

তৈরি করার জন্য। এরপর ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে ২৬টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি ওয়াশিংটনে একত্রিত হয়ে আটলান্টিক চার্টারের ব্যাপারে একমত হন। এরপর ১৯৪২-৪৪ সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও কানাডা যুদ্ধের পূর্বে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিচ্ছিন্ন প্রবণতা ছিল তা কাটিয়ে ওঠার জন্য জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা চালিয়ে যান। যারই চুক্তি হিসেবে ১৯৪৭ সালের ৩০ অক্টোবর বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সম্মেলনের প্রিপারেটরি কমিটির দ্বিতীয় সেশনের সমাপনী অধিবেশনে 'দি জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ এন্ড ট্রেড (গ্যাট) গৃহীত হয়। এটি কার্যকরী হয় ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। এ গ্যাট (GATT) চুক্তি কতকগুলো সাধারণ নীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়।

১. বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে (MFN—Most Favoured Nation) হিসেবে বিবেচনা করা।
২. সদস্যভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে শুল্কের হার কমিয়ে রাখা।
৩. সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন শুল্কনীতি তৈরি করা।
৪. বাণিজ্য বিষয়ে যে কোনো ধরনের বিতর্ক গ্যাট-এর রূপরেখার আওতায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা।

পরবর্তীতে কয়েক বছর পরপরই এক একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো যাকে এক একটি 'রাউন্ড' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবারই চুক্তিকে পরিবর্ধন ও সংস্কার করা হয়। উরুগুয়ে রাউন্ডের পূর্বে এরকম সাতটি রাউন্ড সম্পন্ন হয়। যেমন— জেনেভা রাউন্ড ১৯৪৭, এনেসি রাউন্ড ১৯৪৯, তুরস্ক রাউন্ড ১৯৫০, জেনেভা রাউন্ড II ১৯৫৫-৫৬, ডিলন রাউন্ড ১৯৬০-৬১, কেনেডি রাউন্ড (১৯৬৪-৬৭), টোকিও রাউন্ড (১৯৭৩-৭৯), কিন্তু উরুগুয়ে রাউন্ডের পূর্বে বৈঠকগুলো মূলত শুল্কের হার কমিয়ে বেশিসংখ্যক পণ্যকে গ্যাটের আওতায় নিয়ে আসা এবং তা উন্নত বাজার অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে বিশ্ব অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে বেশকিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এ দিকে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দা, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কেইনসীয় অর্থশাস্ত্রের ধারণাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে পাশাপাশি জাপান ও পূর্ব-এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এ পরিবর্তনের সময়ে আবার ৮০-এর দশকের শেষ পর্যায়ে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া পুঁজির সম্প্রসারণ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। যার প্রেক্ষিতে উরুগুয়ে রাউন্ডে অনেকগুলো নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন–

১. ননট্যারিফ ব্যারিয়ার-এর বাধা অপসারণ। এর মধ্যে–

   ক. কৃষিপণ্যের ভর্তুকি প্রত্যাহার করা, খ. মাল্টি ফাইবার চুক্তির (MFA) অধীনে বস্ত্র ও টেক্সটাইল সেক্টরে যে কোটা আরোপিত আছে তা অপসারণ করা ইত্যাদি।

২. গ্যাটস (GATS—General Agreement on Trade in Services)-এর আওতায় সেবা খাতকে বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। ফলে বীমা, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাংকিং, চলচ্চিত্র, মিডিয়া, পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য দেশী ও বিদেশী সবক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করা।

৩. ট্রিমস (TRIMs—Trade Related Investment in Measures)-এর আওতায় এতদিন বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব নীতি অনুসৃত হতো, যেমন— যে প্রতিষ্ঠান যেখানে বিনিয়োগ করত, সেখানকার কাঁচামাল, শ্রমিক ও লভ্যাংশের একটি অংশ পুনরায় সেখানে বিনিয়োগ করা। এমনকি সরকারি এমন কিছু খাত ছিল জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাতে বিদেশী বিনিয়োগ অবরুদ্ধ ছিল। কিন্তু ট্রিমস-এর আওতায় এসব নীতি অপসারিত হবে।

৪. ট্রিপস (TRIPS—Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) বা মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ চুক্তির আওতায় কোনো গবেষণা, লেখা ফর্মুলা বা কোনো নতুন পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ সুবিধা ভোগ করবে এবং এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তা বাজারজাতকরণ বা ব্যবহার করতে গেলে তাকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করতে হবে। ট্রিপস চুক্তির আওতায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ২০ বছরের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ সুবিধা ভোগ করবে।

উপরিউক্ত নীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে গ্যাট চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় ১৯৮৬-৯০ সাল পর্যন্ত ২২০০০ পৃষ্ঠার খসড়া দলিলের ওপর আলোচনা করা হয়। তারপর ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে মরক্কোর মারাকাসে ১১৭টি রাষ্ট্র চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এ চুক্তি কার্যকর হয় এবং গ্যাট-এর পরিবর্তে WTO (World Trade Organization) বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ নীতিসমূহের তদারকি করে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব দেশই অর্থনৈতিকভাবে সমান স্তরে নেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এসব দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পভিত্তি দুর্বল, কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা, কর্মক্ষম মানুষের ব্যাপক অংশ বেকার, মোট জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও তা আন্তর্জাতিক পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে এরকম দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অন্তর্ভুক্তি এসব দেশের অর্থনীতিকে আরো মন্দা পরিস্থিতি না উন্নততর পরিস্থিতি তৈরি করবে তা নিয়ে উরুগুয়ে রাউন্ডের শুরু থেকেই বিতর্ক ওঠে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি : বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলো দেখানোর আগে আমরা বিবেচনা করতে পারি কারা এর পক্ষে এবং কারা এর বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধ্বজাধারী শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণা পেয়েছি। এরা মূলত নিজেদের স্বার্থে এবং নিজেদের পুঁজির বিস্তার ও বাজার দখলের উদ্দেশ্যে এ অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে এবং এর পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেয়। অন্যদিকে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে তেমনভাবে লাভবান হয় না। প্রথমত তাদের শিল্প পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। এটি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছে। তাছাড়া উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন চুক্তি এবং বাণিজ্যে নিজেদের স্বার্থকে যতটা প্রাধান্য দেয়, তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থকে তেমনভাবে প্রাধান্য তো দেয়-ই না বরং তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো এবং এদের অধিবাসীরা এবং মানবতাবাদী বিভিন্ন দেশ ও পেশার মানুষ মুক্তবাজার অর্থনীতি বা অবাধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করছে। WTO-এর সম্মেলনের বাইরে বিশ্বায়ন বিরোধী

বিক্ষোভ তা-ই প্রমাণ করে। WTO-এর কানকুন সম্মেলনে কোরীয় কৃষকের আত্মাহুতি এবং সে সম্মেলনের ব্যর্থতা প্রমাণ করে WTO কাদের স্বার্থে কাজ করে। নিচে এ মুক্তবাজার অর্থনীতি বা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হলো–

মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষের যুক্তিসমূহ : মুক্তবাজার অর্থনীতির সপক্ষে যারা অবস্থান করছে তারা যেসব যুক্তি প্রদর্শন করে সেগুলো হলো–

ক. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কথা বলা হয় এবং এ বাজারে উৎপাদনের উপাদানসমূহের অবাধ গতিশীলতা থাকায় উৎপাদকগণ সহজেই কাঙ্ক্ষিত গুণ এবং পরিমাপের উপাদান সংগ্রহ করে উৎপাদনে লিপ্ত হতে পারে।

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনক্ষেত্রে প্রবেশ এবং উৎপাদন থেকে প্রস্থানের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ না থাকায় নতুন উদ্যোগে সহজেই উৎপাদনে লিপ্ত হয়ে দক্ষতা বিকাশ করতে পারে এবং লোকসান দানরত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা সহজেই কারখানা বন্ধ করে নতুন কোনো লাভজনক কাজের সন্ধান করতে পারে।

গ. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ভোক্তা সহজে বিদেশী পণ্যের ভোগের সুযোগ পায়।

ঘ. এ বাজারে অস্বাভাবিক মুনাফার অস্তিত্ব নেই, তাই ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। অন্য বাজারের তুলনায় এ বাজারে সম্পদের সমাবেশ ঘটে এবং অধিকতর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

ঙ. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের জন্য এবং পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া উদ্যোক্তারা তাদের পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং দক্ষতা অর্জন করে।

চ. এ বাজারে দ্রব্যমূল্য তুলনামূলক কম হয়, পণ্যের মান ভালো হয়, যা ক্রেতাদের জন্য সুবিধাজনক।

ছ. এ বাজার বিপুল সংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতার সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় চাহিদা এবং সরবরাহে দাম স্থিতিস্থাপকতা প্রবল থাকে। ফলে কোনো উৎপাদক অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মূল্য বৃদ্ধি করলে তার পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন– একই জাতীয় পণ্যের জন্য ক্রেতাবর্গ বেশি দাম দিতে প্রস্তুত থাকে না বা রাজি থাকে না। তাই উৎপাদক যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারেন না।

জ. আমাদের দেশের পোশাক শিল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। এতে বছরে প্রায় ২৫০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় আসছে, যা আমাদের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি দখল করে আছে। বলা যায় রপ্তানি খাতকে টিকিয়ে রেখেছে। এর দ্বারা আমদানি ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হচ্ছে, যা মুক্ত বাণিজ্যের আশীর্বাদ।

ঝ. শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো গ্যাট চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগেই প্রচার করে ১৯৯৫ সালে ১ জানুয়ারি থেকে গ্যাট চুক্তি কার্যকর হলে ২০০২ সালের মধ্যেই প্রতিবছর ২৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশ্ববাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং এর দ্বারা সদস্যভুক্ত সকল দেশই লাভবান হচ্ছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বিপক্ষে যুক্তিসমূহ : সাম্প্রতিককালের প্রেক্ষাপটে এবং আমাদের দেশের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতির বিপক্ষে বেশি যুক্তি দেখবো। কেননা আমাদের জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতি সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি বয়ে এনেছে। এগুলো হলো–

ক. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদী ক্ষমতার কাঠামোয় কেন্দ্রীয় শক্তির বাইরে অনেক বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী 'এ প্রক্রিয়ায় সম্পদের আরো কেন্দ্রীভবন ঘটবে এবং বিশ্বে দারিদ্র্যের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবে' তা নিয়ে মতামত সংগঠিত করেছেন এবং প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখছেন সেই উরুগুয়ে রাউন্ড থেকেই।

খ. মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে বণ্টন প্রক্রিয়ায় অনেক অসমতা দেখা যায়। ১৯৯৬ সালে ব্রাউন এবং কলিগস একটি প্রাক্কলিত হিসাবের মাধ্যমে দেখিয়েছেন গ্যাট চুক্তির ফলে প্রতিবছর ১৩৬ বিলিয়ন ডলার সেবা খাত থেকে অতিরিক্ত আয় হবে যা মোট বাণিজ্য বৃদ্ধির ৫০ শতাংশ। এর মধ্যে ইউরোপ ৩৯ বিলিয়ন ডলার, যুক্তরাষ্ট্র ৩৭ বিলিয়ন ডলার, জাপান ২৪ বিলিয়ন, অস্ট্রেলিয়া ৯ বিলিয়ন, নিউজিল্যান্ড ৫ বিলিয়ন এবং মাত্র ২৫ বিলিয়ন ডলার পাবে সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশ।

গ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অসংখ্য উৎপাদক স্ব স্ব পণ্যের গুণাগুণ ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নেন। এ বিজ্ঞাপন ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের সাথে যুক্ত করে তা পরোক্ষভাবে ক্রেতার ওপরে আরোপিত হয়। সুতরাং এ বিজ্ঞাপন ব্যয় ক্রেতারই পরোক্ষভাবে বহন করতে হয়।

ঘ. অবাধ বাণিজ্যে উৎপাদকগণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তাই তারা ভবিষ্যতের উচ্চ চাহিদা আন্দাজ করে কোনো কোনো সময় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। ফলে অতি উৎপাদনজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় উৎপাদকের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা বা নৈরাশ্য ভাব সৃষ্টি হয়। এই ভাবে বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে অর্থনীতিতে কিছু পরপর চাঙ্গা মন্দা (Periodic booms and Recession) বাণিজ্যচক্রের (Business cycle) সৃষ্টি হয়।

ঙ. অবাধ বাণিজ্যে ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ হয়। দ্রব্যের সামাজিক পদক্ষেপ গৌণ থাকে। ভোক্তা যদি সামাজিক ও নৈতিকভাবে ক্ষতিকর এমন দ্রব্যের প্রতি আগ্রহী ও অভ্যস্ত হয়ে যায় তারপরও উৎপাদক সেগুলোই উৎপাদন করবে। কিন্তু এতে সমাজের মোট সম্পদের দক্ষ ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।

চ. মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং WTO-এর মাধ্যমে আমাদের কৃষকদের বীজ কেড়ে নেয়া হয়েছে। এখন বাজারে যে বীজ বিক্রি হয় সে বীজ স্থানীয় বীজকে ধ্বংস করেছে, ফসলের বৈচিত্র্য কমিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের বীজ এবং বিভিন্ন ঔষধী গাছগাছড়া পুঁজিবাদী দেশগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে, তারা এগুলোর ওপর পেটেন্ট করেছে।

ছ. অবাধ বাণিজ্যের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। স্থানীয় শিল্পপণ্য বাইরের শিল্পপণ্যের সাথে দাম এবং গুণগত মানে পেরে উঠছে না। ফলে স্থানীয় পুঁজি মার খাচ্ছে। দেশীয় শিল্প কারখানা লোকসান দিতে দিতে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জ. উন্নত দেশগুলো নিজেরা তাদের কৃষি ভর্তুকি না কমালেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কৃষি ও অন্যান্য সেবা খাতে ভর্তুকি কমাতে বলে।

২০০৫ সালে WTO-এর হংকংয়ে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ১৮ ডিসেম্বর যে হংকং ঘোষণা দেয়া হয় তাতে বাংলাদেশ কোনোভাবেই লাভবান হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ২০১৩ সালের মধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি তুলে দেবে; যদিও বলা হচ্ছে, রপ্তানিতে EU ভর্তুকি দেয় ১০০ কোটি ইউরো। অথচ অভ্যন্তরীণ খাতে বিভিন্নভাবে কৃষি খাতে তারা ভর্তুকি দেয় ৫৫০ কোটি ইউরো।

২০১১ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের অষ্টম বৈঠক সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকে নতুন কোনো সম্ভাবনা ও পথনির্দেশনা না দেখিয়ে জেনেভায় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক সমাপ্তি ঘটে। তিন দিনের এই প্রাণহীন বৈঠকে বৈশ্বিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দোহা আলোচনার অচলাবস্থা কাটেনি। যেটুকু অর্জন, তার মধ্যে রয়েছে দোহা আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রীদের ঐকমত্য, সংরক্ষণনীতি, প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি এবং রাশিয়া, সামোয়া ও মন্টিনিগ্রো দেশগুলোর অনুমোদন। সুতরাং মুক্তবাজার অর্থনীতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য গলার ফাঁসস্বরূপ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, মুক্তবাজার অর্থনীতি ধনী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। তারা দরিদ্র দেশগুলোকে তেমন কোনো সুবিধা না দিয়ে বাণিজ্যে একক আধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট। ওপরে ওপরে ভালো কথা বলে ভিতরে ভিতরে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাস, বিশ্বব্যাপী পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহ এবং শ্রমের গতিশীলতা বা অবাধ যাতায়াতকে নিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি একমত হতে পারেনি। 'বিশ্বব্যাপী ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাস করে' এ কথা বলে মুক্তবাজার অর্থনীতির যাত্রা শুরু হলেও তা যে নিরেট অসত্য কথা তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের সাধারণ সচেতন মানুষ তাই এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে। এ মুক্তবাজার আমাদেরকে কোনো উৎপাদক জাতিতে পরিণত না করে ক্রেতা, ভোক্তা (কনজিউমার) জাতিতে পরিণত করছে। তাই আমাদের নিজেদের স্বার্থে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

০৮ । ক. আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট বলতে কি বোঝেন?
খ. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমান যুগ সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিকতার যুগ। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বায়নের কারণে মুক্তবাজার অর্থনীতির এ যুগে কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। নানা কারণে এক দেশকে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। তদুপরি ক্রমবর্ধমান শিল্প-বাণিজ্য ও উন্নয়ন প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রসমূহকে বাণিজ্য জোট গঠনে বাধ্য করেছে। তাছাড়া উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এখন দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। ফলে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জোট গঠনের বিষয়টি ক্রমশ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্বিপাক্ষিকতার পরিধি পেরিয়ে আঞ্চলিক সম্পর্কের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করছে। যেমন : ইইউ, এপেক, নাফটা ও আসিয়ান।

আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট : আধুনিক যুগ শিল্প-বিপ্লব ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছলেও বিশ্বের কোনো দেশই নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Self-Sufficiency) অর্জন করতে পারেনি। তাই চাহিদা পূরণের তাগিদ থেকেই মূলত বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (১৯৩৭) বলেছিলেন, 'কোনো দ্রব্য বাড়তি উৎপাদন করতে গিয়ে যদি তার উৎপাদন ব্যয় ক্রয়মূল্য অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে প্রত্যেক দক্ষ পরিবার-কর্তার ক্ষেত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সে কখনো ঐ দ্রব্য বাড়িতে উৎপাদন করতে যাবে না।' অ্যাডাম স্মিথের এ Absolute Advantage এবং পরবর্তীকালে David Ricardo-র Comparative Advantage Theory-র ওপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপকতা লাভ করে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হলেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূচনালগ্নে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই আমদানির ওপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করা হতো। দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যকে সহজীকরণ ও সম্প্রসারণের ফল থেকেই মূলত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ব্লকের জন্ম।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের সাথে সাথে সারা বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোট গঠন করা হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হচ্ছে এসব

আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক বিবেচনা করে বিভিন্ন দেশ প্রতিবেশী অথবা সমমনা দেশসমূহকে নিয়ে এসব যৌথ অর্থনৈতিক ফোরাম বা আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট গঠন করে। এসব সংগঠন স্বল্প আমদানিমূলক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। সুতরাং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোটের রাজনীতি নতুন বিশ্বব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোটের রাজনীতিই আগামী দিনের বিশ্বব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট : নিচে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **ইউরোপীয় ইউনিয়ন :** ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের প্রভাবশালী আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি। ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ সম্পাদিত রোম চুক্তির মাধ্যমে European Economic Community—EEC গঠনের প্রস্তাব করা হলেও প্রতিষ্ঠার সময় এর নাম European Community নামকরণ করা হয়)। ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর (১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ম্যাসট্রিচট চুক্তির মাধ্যমে) ইউরোপিয়ান কমিউনিটির নামকরণ করা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

গঠনের উদ্দেশ্য

– পারস্পরিক স্বার্থে শুল্ক হার হ্রাসের মাধ্যমে দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের সুলভ ও সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন।
– রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপ ও পরামর্শ।
– সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আত্মরক্ষার কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি।

প্রধান অঙ্গ সংস্থা : ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান অঙ্গসংস্থা ৬টি— ১. ইউরোপীয় কাউন্সিল, ২. ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ৩. ইউরোপীয় কমিশন, ৪. কাউন্সিল অব ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ৫. কোর্ট অব জাস্টিস অব দ্য ইউরোপিয়ান ও ৬. ইউরোপীয় কোর্ট অব এডিটরস।

অর্থবিষয়ক সহযোগী সংস্থা : ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ও ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড।

এক নজরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

নাম : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)
প্রতিষ্ঠা : ১ নভেম্বর ১৯৯৩
সদর দপ্তর : ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)
অফিসিয়াল ভাষা : ২৩টি
মুদ্রার নাম : ইউরো
বর্তমান সদস্য : ২৮। **সদস্য দেশগুলো হলো :** বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সাইপ্রাস, চেকপ্রজাতন্ত্র, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মাল্টা, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ও ক্রোয়েশিয়া।
সদস্য প্রার্থী দেশ ও আবেদনের সময় : তুরস্ক, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৭; ম্যাসিডোনিয়া, ২৪ মার্চ ২০০৪।
সদস্য প্রত্যাশী দেশ : আলবেনিয়া, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা।

২. **APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation) :** বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতামূলক জোট গঠনের যে স্রোত বইছে এর মধ্যে অ্যাপেক হচ্ছে অন্যতম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২১টি দেশ নিয়ে এ জোট গঠিত। এর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুর। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সাহায্য করা। এছাড়া এ অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ জোট ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক। মূলত ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একক বাজার গঠনের চিন্তাধারায় ভীত হয়েই প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো এ জোট গঠনে সচেষ্ট হয়। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বৈঠকে এ জোটের নেতারা অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার কথা ব্যক্ত করে বলেন, এ জোট প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে।

এ জোটে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলোর সাথে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর সমাবেশ ঘটেছে। জোটভুক্ত এই অঞ্চলগুলোর লোকসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০.৫%। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত দ্রব্যের প্রায় ৫৪.৫% এতদঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলের মোট জিডিপির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার ডলার। আর এদের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৩৫০০ বিলিয়ন ডলার। আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪৩.৫%। বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী প্রতিটি দেশই এই জোটের অন্তর্ভুক্ত। এ জোটের সদস্য দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে ওশেনিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও পাপুয়া নিউগিনি; আমেরিকা মহাদেশ থেকে কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও চিলি। আর এশিয়া থেকে রয়েছে ব্রুনাই, চীন, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পেরু ও রাশিয়া। ভারতও অ্যাপেকে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। ভারতও উঠতি অর্থনৈতিক শক্তি। এক্ষেত্রে ভারত যদি অ্যাপেকে যোগ দেয়, তাহলে এ জোটটি বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হবে। অ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলনে ২০২০ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে জোটভুক্ত উন্নত দেশগুলোর জন্য এ সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০১০ সাল, আর অনুন্নত দেশগুলোর জন্য ধরা হয়েছে ২০২০ সাল।

১৯৮৯ সালে আত্মপ্রকাশের পর থেকে অ্যাপেক ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাপেক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে যাচ্ছে। তবে অ্যাপেকভুক্ত ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যবধান হ্রাস না পেলে এর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে WTO যেখানে বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, মুক্তবাজার গঠন, উদার বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন ও বিশ্বায়নে সচেষ্ট, সেখানে বিশ্বায়নের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অ্যাপেকের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

৩. **নাফটা (North American Free Trade Agreement) :** উত্তর আমেরিকা অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা) হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর মধ্যে সম্পাদিত একটি বাণিজ্যিক চুক্তি বা জোট। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট কার্লোস সেলিনাস ডি গোর টারি প্রথম ১৯৯১ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে দু দেশের মধ্যে বিরাজমান বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার প্রস্তাব দেন। ইতিপূর্বে ১৯৮৮ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সময় কানাডার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত ও কার্যকরী হয়। পরে এ অবস্থায় জর্জ বুশ মেক্সিকোর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মেক্সিকো–যুক্তরাষ্ট্র–কানাডা অবাধ একক বাজার গঠনের কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে বিল ক্লিনটন

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে দীর্ঘ ১৪ মাস আলোচনার পর ১৯৯২ সালের ১২ আগস্ট দেশ তিনটির মধ্যে নাফটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর চুক্তিটি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে অনুমোদিত হয়। এ চুক্তির ফলে কৃষি ও উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর মার্কিন শুল্ক ও কোটা প্রথা বিলোপ করা হয়। কতগুলো ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছর এবং কতকগুলো ক্ষেত্রে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এ বিলোপ সাধন করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এ চুক্তি করায় সর্বাধিক উপকৃত হবে মেক্সিকো। মেক্সিকোর সস্তা শ্রম মজুরির জন্য মার্কিন শিল্পপতিরা সেখানে পুঁজি খাটাতে উৎসাহিত হবে এবং এর ফলে বহু বেকার মেক্সিকান চাকরি লাভ করবে। আশা করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ঋণদান ও সাহায্য সংস্থাগুলো মেক্সিকোর যে পুঞ্জিভূত দেনার দায় বহন করছে, বাণিজ্যের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারলে মেক্সিকো সে দায় থেকে অবমুক্তির যোগ্যতা অর্জন করবে। এ চুক্তি ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়। বর্তমানে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য প্রায় ৪৭%। নাফটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, যেখানে ৪৪৪ মিলিয়ন লোক ১৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য এবং সেবা উৎপাদন করে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বে কোনো দেশের পক্ষেই একাকী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন খুবই জরুরি। তাই কয়েকটি দেশ মিলে সহজ শর্তে একে অপরের বাজারে প্রবেশ করার অঙ্গীকার নিয়েই মূলত গঠন করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোট। বর্তমান সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অ্যাপেকের সাফল্য গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে জোট বাঁধতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে।

০৭। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা আলোচনা করুন।
***অথবা,* অনুন্নত বিশ্বের অর্থনীতিতে উন্নত বিশ্বের বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা আলোচনা করুন।**

উত্তর : কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে আধুনিক ঘটনা। সাহায্য কার্যক্রমের নামে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যটি এখন বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে তা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) সূচনা করে। এ দুটি সংস্থা উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে পুঁজির সরাসরি লেনদেনের বর্তমান যে প্রাতিষ্ঠানিক ধারা তা সৃষ্টি করে। বলাবাহুল্য, এর পিছনে বর্তমান বিশ্বের ধনী দেশগুলোর বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে উন্নত বিশ্বের বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা বোঝার জন্য ধনী দেশগুলোর ধনী ও সাহায্যদাতা হয়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনা করা জরুরি।

সাহায্য ও বাণিজ্যের পেছনের কথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবীতে দু'ধরনের দেশ দেখা যায়। একদিকে ছিল শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে এগিয়ে থাকা পুঁজিবাদী আদর্শের সাম্রাজ্যবিস্তারি দেশসমূহ। যাদের নেতৃত্বে ছিল ইংল্যান্ড, তারপর জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি। অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ পুরনো সাম্রাজ্যবিস্তারি হিসেবে বেশ প্রভাবশালী হলেও অর্থ সঞ্চয়ের বিচারে আগের মতো একই তালে এগুতে পারছিল না। সামন্তবাদী জারের রাশিয়াও ছিল দুর্বল সাম্রাজ্যবিস্তারি দেশ।

শিল্পবিপ্লব এবং উপনিবেশগুলো হতে ব্যাপক লুটপাটের সাফল্যে ইংল্যান্ড ধীরে ধীরে একচেটিয়া আধিপত্যশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মেইজি বংশের পুনরুত্থানের ফলে জাপানে পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর হলে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে 'লেট কামার' হিসেবে দেরিতে ঢুকলেও রাষ্ট্রের শক্তিশালী ভূমিকা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জাপান দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে। ওদিকে অন্য মহাদেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শতকের গৃহযুদ্ধের পর দ্রুত পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটে এবং বিশ শতকের প্রথমেই এক বিরাট শক্তি হিসেবে দুনিয়ার বুকে হাজির হয়। বিশ্বের অর্থনৈতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবিস্তারি পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে একদিকে ছিল এদের নেতৃত্ব। অন্যদিকে পৃথিবীর বাকি প্রায় দেশগুলোই ছিল কারো না কারো উপনিবেশ। আর এসব দেশের ওপর ঔপনিবেশিক দখল ও তা লুটপাট করে নিজ দেশের উন্নয়নে যে দেশ যতবেশি ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখিয়েছে সে দেশই পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে তত গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠে। এ দিক বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে থাকলেও তখনকার সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশ ইংল্যান্ডের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারি বিভিন্ন আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার। অন্যদিকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জার্মানি, ফ্রান্স এবং জাপান।

এদিকে উপনিবেশগুলোতে তাদের শোষণ ও লুটপাটের বিপরীতে গড়ে ওঠে প্রতিবাদী জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। একদিকে এই জাতীয় মুক্তির আন্দোলন দমন এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবিস্তারি দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাজার দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকটের কারণে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে অব্যাহত যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল তার প্রভাব পড়ছিল সবগুলো দেশেই। ফলে নিজেদের মধ্যে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা ও পণ্যের বাজার দখলের লড়াই বাড়তে থাকে। এরই একপর্যায়ে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে যায়। মিত্র শক্তির বিজয়ের ফলে জার্মানি বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে অপমানজনক এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ইংল্যান্ডের বিজয় অক্ষত থাকলেও নতুন পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করে। তবে এত দিনের একচেটিয়া পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবিস্তারি বিশ্বের জন্য অসুবিধার ঘটনাটি ঘটে যখন এর বিপরীত আদর্শের একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভব ঘটে।

এ সময় থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে দুটি মতাদর্শের কিন্তু তিন ধরনের অর্থনীতির চর্চা দেখা যায়। একদিকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অর্থনীতি এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী মতাদর্শের সাম্রাজ্যবিস্তারি ও ঔপনিবেশিক দেশগুলোর অর্থনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতি কমবেশি এ ধারায়ই এগোচ্ছিল। ইতিমধ্যেই জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপমানজনক চুক্তিগুলো অস্বীকারের মতো শক্তি অর্জন করে। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ততদিনে একক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্মানি ও জাপান। বিজয়ী শক্তির চাপের মুখে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে তারা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অধীন হয়। দু ভাবে বিভক্ত জার্মানির এক অংশে পুঁজিবাদ অন্য অংশে সমাজতন্ত্র প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে যায় ব্যাপকভাবে। পুঁজিবাদী মতাদর্শের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার কেন্দ্র ইউরোপ থেকে চলে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যুদ্ধ

বিধ্বস্ত ইউরোপে মার্শাল প্ল্যানের আওতায় সাহায্য কর্মসূচি চালু করা হয় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পুনর্গঠনে। এদিকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো মতার্দশগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যোগ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গড়ে তোলে। পরবর্তীতে একে আরো শক্তিশালী করে চীন। কয়েক দশকের মধ্যে এতে ভিয়েতনাম, কিউবা ইত্যাদি দেশ যোগ দেয়।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ও উপনিবেশগুলোতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন জোরদার হওয়ার ফলে উপনিবেশগুলো দ্রুত স্বতন্ত্র 'স্বাধীন' রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিতে থাকে। যারা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বিশ্বব্যাপী নানা জোট বা মেরুকরণের বাইরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন ব্লক গঠন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ব্যাপক বিস্তারের বিপরীতে 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন' নামে তৃতীয় একটি অবস্থান নেয়। যারা নিজেদেরকে অনুন্নত বিশ্বের সদস্য বলে, নিজেদের জন্য স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উপনিবেশবাদ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতির নীতি গ্রহণ এবং কোনো সামরিক জোটে শরিক হওয়া উচিত হবে না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে এ আন্দোলন অনুন্নত বিশ্বের জন্য নয়া আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও পরাশক্তিসমূহের কবলমুক্ত হয়ে নিজেদের সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার জন্য নানা তৎপরতা চালায়। যদিও পরবর্তীতে পুঁজিবাদী মতাদর্শের নিয়ন্ত্রণেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বেশিরভাগ দেশ তৃতীয় বিশ্বের জন্য একটি ভিন্ন সত্ত্বা গঠন করে। অবশেষে বিশ্ব অর্থনীতিতে দুটো ধারাই প্রধান হয়ে ওঠে। যদিও তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্বের ধারা থেকে অনেক ভিন্ন। এ দু ধারার একদিকে সাম্রাজ্যবিস্তারি পুঁজিবাদী ধনী দেশ ও সদ্য স্বাধীন 'অনুন্নত' দেশসমূহ; অন্য ধারায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমর্থনপুষ্ট অন্যান্য দেশ।

প্রথম ধারার অধীন দেশের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক এবং বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ এ ধারার অধীনেই বাস করতেন। এ ধারাই তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মতাদর্শ, প্রভাব ও প্রতিশ্রুতি তৈরি ও টিকিয়ে রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী নানা আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি করে। যেমন– জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এ মতাদর্শের সমর্থনেই গড়ে ওঠে।

সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু অঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহযোগিতাদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৮ সালে দ্বিপাক্ষিক সাহায্য কর্মসূচির সূচনা করে। এ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ১৯৪৮ সালের অর্থনৈতিক সহযোগিতা আইন উদ্ভূত এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECA) পরিচালিত 'মার্শাল পরিকল্পনা'। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রবিধান জারির মাধ্যমে ইসিএ রহিত করা হয়। এরপর অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্য করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আর্থিক সহায়তা বিষয়ক চতুর্থ সূত্র-প্রস্তাবকে কারিগরি সহযোগিতা পরিচালন ব্যবস্থার রূপ দেয়া হয়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নীতিতে অনেক পরিবর্তন আসে। নতুন উন্নয়ন সাহায্য শিরোনামে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার নানা অনুন্নত দেশে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে একক বৃহত্তম সাহায্যদাতা দেশ এবং USAID সারা পৃথিবী জুড়ে বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচি কার্যকর করার প্রতিষ্ঠান। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্যদান ও মূলধন যোগানোর অপর একটি অন্যতম বৃহৎ সংস্থা হচ্ছে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (OECD)।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বহুপাক্ষিক বৈদেশিক অর্থসাহায্য যোগানদাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে সক্রিয় আছে আইডিএ, ইডিবি, ইসি, ইফাড, এনডিএফ, ইউনিসেফ ও ইউএন সিস্টেম।

এসব সংস্থার বৈদেশিক সাহায্য দেয়ার লক্ষ্য হিসেবে প্রচার করা হয় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে বিরাজমান ফাঁক দূর করা এবং আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ঘাটতি দূর করা।

নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য হলো ঋণ ও অনুদান, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাহায্য, খাদ্য সাহায্য, পণ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য। এসব বৈদেশিক সাহায্য নানা শর্ত সাপেক্ষে দেয়া হয়। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সাহায্য যা সাধারণত দশ বা বিশ বছর ধরে গ্রহীতা দেশ দানকারী সংস্থা বা দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা ফেরত দেয়। দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত নমনীয় ঋণ যা স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করে, যার পরিশোধের মেয়াদকাল দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কম সুদে পরিশোধযোগ্য। তৃতীয়ত, সবচেয়ে সুবিধাজনক বৈদেশিক সাহায্য হচ্ছে সরাসরি অনুদান। স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যের সরবরাহ। যেমন– পিএল ৪৮০-এর অধীনে আমেরিকার খাদ্য সাহায্য।

খাদ্য সাহায্য হলো দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো থেকে খাদ্য সরবরাহ অথবা তাদের দ্বারা অন্যদেশে খাদ্য সরবরাহকারীদের অর্থ পরিশোধ, খাদ্য সরবরাহের জন্য পরিবহন, গুদাম ভাড়া, বিতরণ ইত্যাদি যেসব খরচ দাতা দেশগুলো করে থাকে তাও খাদ্য সাহায্য হিসেবে বিবেচিত হয়। একইভাবে পণ্য সাহায্য বলতে বোঝায় পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দাতা দেশগুলোর অর্থ যোগান। যার মধ্যে থাকে ভোগ্যপণ্য, মাধ্যমিক পণ্য এবং শিল্প কারখানার কাঁচামাল। কারিগরি সাহায্য যা প্রকল্প সাহায্যের অংশ হিসেবে দেখানো হয় সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিশেষজ্ঞদের (বিদেশী উপদেষ্টা ও কারিগর) সেবা, ফেলোসিপসহ প্রশিক্ষণ সুবিধাদির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে ঋণ সাহায্য দেয়া হয় তার সাথে নানাবিধ শর্ত ও কনসালট্যান্সির স্বার্থ জুড়ে দেয়া হয়। এ কনসালট্যান্টদের পরামর্শ বা শর্ত এবং সে সাথে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর পরামর্শ বা নির্দেশের মূলকথা হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো যে ভর্তুকি দিচ্ছে তা প্রত্যাহার করা এবং সেবা খাতগুলো উন্নত বিশ্বের ব্যবসায়ীদের জন্য অবাধ করে দেয়া। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় যে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণকে সংকুচিত করা।

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে এ সাহায্য প্রক্রিয়া আসলে উন্নত বিশ্বের ব্যবসায়-বাণিজ্যের একচেটিয়া আধিপত্যের কৌশল। সরাসরি ঔপনিবেশিক দখল ও লুটপাটের পরিবর্তে অর্থনৈতিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নামে নানা চুক্তি ও শর্তের বাধনে বেঁধে নব্য ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও শোষণ চলছে। এক্ষেত্রে তারা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য ধরনের সংস্থা গড়ে তোলে। যেমন– WTO প্রথম দিকে গ্যাট (GATT) নামে পরিচিত ছিল। গ্যাট (GATT or General Agreement on Tariffs and Trade) বাংলায় এর অর্থ 'শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতা'। পণ্যের বিশ্বব্যাপী বিক্রির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সমঝোতার জন্যই এ সংস্থা গড়ে তোলা হয়।

গ্যাট জাতিসংঘের অংশ নয়। ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শহর ব্রেটন উডসে এক কনফারেন্স হয়। যেখানে আন্তর্জাতিক অর্থ, মুদ্রা ও বাণিজ্যব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ কনফারেন্সেই যুদ্ধোত্তর বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বিশ্বব্যাংক (World Bank), মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ (International Monetary Fund) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঠিকঠাক রাখার জন্য গঠিত হয় গ্যাট। সে হিসাবে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং গ্যাট এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন হিসেবে

আখ্যায়িত করা হয় এবং এদের অপরিসীম ক্ষমতার কথা ভেবে অনেকেই একে 'ব্রেটন উডসের দানব' বলেন। ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরে গ্যাটের উরুগুয়ে রাউন্ডে আলোচনা শেষ হয় এবং এ আলোচনার ফলাফলের পক্ষে ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের সরকার সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর করেন এবং ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্যাট আর পুরনো গ্যাট না থেকে বাণিজ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে আগে যে যে এলাকা ছিল তা বেড়ে আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই ধারণা করা হচ্ছিল যে এটা সারা দুনিয়ার বাণিজ্যের পরিচালনা ও শাসনের সর্দার হবে। যা দুনিয়ার উৎপাদন, বিতরণ, বিনিময় ও ভোগের ওপর খবরদারি করবে। এক ধরনের বিশ্ব সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় তাই হয়েছে। এটা এখন পৃথিবীর সকল সদস্য দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম পালন করছে কিনা তা দেখাশোনা করা এবং কেউ নিয়ম অমান্য করলে তার নানাবিধ শাস্তির বিধান করেছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এতদিন আমরা বিশ্বব্যাংক, IMF-কে বেশি চিনতাম। এখন WTO নামটিও উচ্চারিত হচ্ছে। কেউ এ সংস্থার সদস্য না হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চুক্তি মোতাবেক যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলো দেয়া হয় না। ফলে কোনো রাষ্ট্র WTO-এর সদস্য না হলে বিশ্ববাণিজ্যে অংশগ্রহণ তার পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে।

WTO-এর কাজ হিসেবে অফিসিয়ালি প্রচার করা হয়— ১. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য চুক্তি করা, ২. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার ফোরাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করা, ৩. দেশে দেশে বাণিজ্য সংঘাত মিটানোর দায়িত্ব নেয়া, ৪. জাতীয় পর্যায়ে বাণিজ্যনীতির খবরদারি এবং ৫. অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে কাজ করা।

বিশ্ব আজ WTO-এর নানা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো বলছে WTO-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্ত বা নিয়মনীতিগুলো ধনী দেশগুলো নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে গরিব দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অনেকে WTO গড়ে ওঠার অগণতান্ত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যখন নতুন গ্যাট সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল, তখন ধনীদেশগুলো সকলের সাথে বসে তাদের মনমতো সিদ্ধান্ত পাস করাতে না পেরে ডিরেক্টর জেনারেল আরথার ডাঙ্কেলের ঘরে বসে যেসব দেশ সিদ্ধান্তে আপত্তি জানাতো বা আপত্তির সম্ভাবনা ছিল সেসব দেশের প্রতিনিধিদের ডেকে এনে, কাউকে ধমকিয়ে, কাউকে সাহায্যের ঘুষ দিয়ে, আলাদা আলাদাভাবে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিকভাবে সকলের সাথে বসে বাণিজ্য সংক্রান্ত রীতিনীতি গৃহীত হয়নি। পুরো গ্যাট চুক্তির ভিত্তিই হচ্ছে এ চরম অগণতান্ত্রিকতা। WTO-এর TRIMs চুক্তির মাধ্যমে ধনীদেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো গরিব দেশগুলোতে অবাধ বিনিয়োগের কথা বলে। কোম্পানিগুলো কোনো ধরনের বাধা বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই যে কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চায়। এর মাধ্যমে তারা গরিব দেশগুলোর নানা পণ্য ও সেবার বাজার দখল করতে চায়। এ জন্য ধনী দেশগুলো মুক্তবাণিজ্যের নামে দাবি তুলেছে যেখানেই পণ্যের বাজার রয়েছে সেখানেই ঢুকতে দিতে হবে। কোনো রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের মাধ্যমে পণ্যের অবাধ যাতায়াতকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। একই সাথে একটি দেশীয় কোম্পানির জন্য যে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিকে সেসব সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। অথচ তৃতীয় বিশ্বের কোনো শ্রমিক যদি কাজের জন্য কোনো ধনী দেশে যেতে চায় সেখানে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয় না।

তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ শাসকগোষ্ঠীই ধনী বিশ্বের এসব বহুজাতিক কোম্পানির দাবির কাছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য প্রায়ই বিক্রি হয়ে যায়। শাসকগোষ্ঠী জনগণের বা দেশের নামে নানা আর্থিক সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতার রাজনীতিতে ক্ষমতাশালীদের কাছ থেকে নানা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে ধনী দেশের ব্যবসায়ীদের নিজ দেশের পণ্য বাজারে ঢুকতে দেয়। ফলে দেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা তাদের পণ্য ও সেবা ব্যবসায় ধনী দেশের বিশাল পুঁজিওয়ালাদের কাছে হেরে যায়। এভাবে বিশ্বের ধনী দেশগুলো তাদের বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডব্লিউটিও প্রভৃতি আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বহু সংস্থার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নামে একচেটিয়া বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে নব্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী বজায় রেখেছে।

একদিকে অনুন্নত বিশ্বকে বৈদেশিক সাহায্যের নামে ঋণের জালে আটকিয়ে উন্নত বিশ্ব তার নির্দেশমতো চলতে বাধ্য করে এবং উন্নয়নের নামে নানা প্রজেক্ট, অর্থনৈতিক পলিসি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রকল্প চাপিয়ে দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের আসল উন্নয়নকে ঠেকিয়ে রাখে। ঋণ সাহায্যের সাথে নানা মাত্রার সুদের শর্ত জুড়ে দিয়ে গ্রাম্য মহাজনদের মতো শোষণ চালায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নামে বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে সেসব সংস্থার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সেসব সংস্থার নানা নিয়ম-কানুনের শর্তের মধ্যে ফেলে পণ্যের বাজার দখল করছে। একই স্থানীয় পুঁজি বা পুঁজিপতিরা ধনী দেশের পুঁজিপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। ফলে তৃতীয় বিশ্বের পণ্য ও সেবার বাজারে ধনী বিশ্বের একক আধিপত্য কায়েম হচ্ছে। এভাবেই আজকের পৃথিবীতে বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নয়া ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও শোষণ চলছে।

১০ ▌ মন্দা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে প্রথম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় ১৯৩০ সালে। ১৯৩০ সালের পর বর্তমান ভোগবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গত শতাব্দী থেকে এ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। গত শতাব্দীর মতো এ শতাব্দীতে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সূচনা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। আর মার্কিন এ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা হয় ২০০৭ সালের শেষের দিকে মার্কিন অন্যতম বিনিয়োগ ব্যাংক লেহম্যান ব্রাদার্স এর দেউলিয়া ঘোষণা, মেরিল লিঞ্চ-এর ৮০০ কোটি ডলার আটকে পড়া ঋণ নিয়ে সমস্যা ও দেউলিয়া ঘোষণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। ফলে ব্যাংকপ্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়। কয়েকদিনের মাথায় একের পর এক ব্যাংক, স্টক মার্কেটসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। অনেক ব্যাংক ঋণসংকটে পতিত হয়, অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এরূপ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎকালীন বুশ প্রশাসন নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এ মন্দা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ থেকে এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ায়। বিশ্বের প্রত্যেক মহাদেশেই এ মন্দা সংক্রমিত হতে থাকে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়, বেড়ে যায় মুদ্রাস্ফীতি; বেড়ে যায় বেকার সংখ্যা। কমে যায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। ২০০৮ সালকে মন্দার বছর হিসেবেই পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে অতিবাহিত করতে হয়। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পৃথিবীতে দারিদ্র্য, অপুষ্টি বেড়ে যায়। অনেক দেশের রাজনীতিতে আসে পরিবর্তন। মন্দা প্রতিরোধে বিশ্বের সরকারগুলো এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংগঠনগুলো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার সুফল শুরু হয় পরবর্তী বছরের শেষের দিকে।

অর্থনৈতিক মন্দার কারণ : অর্থনৈতিক মন্দার পেছনে একক কোনো কারণ বিদ্যমান নয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। নিচে এ কারণসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো—

১. **অতি উৎপাদনের সংকট :** বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম কারণ অতি উৎপাদনের সংকট। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো অতি মুনাফা লাভে অপরিকল্পিতভাবে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন করে থাকে। এভাবে একদিকে সীমাহীন উৎপাদন, অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর কারসাজিতে উৎপাদক তথা ভোক্তাশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের কারণে গুদামে পণ্যদ্রব্যের পাহাড় জমে ওঠে। পণ্যদ্রব্য অবিক্রীত থাকায় নতুন কোনো শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগও করা যায় না। ফলে ব্যাংকেও অলস টাকার পাহাড় স্ফীত হতে থাকে। এভাবেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী এবং ব্যাংকে ও পুঁজিপতিদের কাছে স্তূপীকৃত টাকা থাকা সত্ত্বেও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো বার বার মন্দায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

২. **মার্কিন ভোগবাদী অর্থনীতি :** স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার ধারক ও বাহকে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে প্রতিষ্ঠা করেছে ভোগবাদী দেউলিয়া অর্থনীতি। যে অর্থনীতির জনজীবন কেবল ক্রেডিট কার্ডনির্ভর। এ অর্থনীতিতে সঞ্চয় প্রবৃত্তি অনুপস্থিত। মানে টেকসই উন্নয়ন হয় না। ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্টক বাজার প্রভৃতি সামান্য বিপর্যয়েই দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ২০০৭ সাল থেকেই মার্কিন অর্থনীতির এরূপ বিপর্যয়ের সূচনা হয়। যা সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেও এ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ধীরে ধীরে মার্কিন মন্দা সংক্রমিত হয় বিশ্বব্যাপী। কাজেই মার্কিন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ।

৩. **ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংক ঋণ :** যুক্তরাষ্ট্রে আয়-ব্যয়ের অন্যতম খাত আবাসন শিল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর এ শিল্পে ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো আবাসন শিল্পে গণহারে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ প্রদান করে। অধিকাংশ ব্যাংকই ঋণগ্রহীতার সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে না বা বিচার করে না। এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ দেয়ার ফলে আবাসন শিল্পে ধস নামে। মন্দার আগে একটি বড় বাড়ির বাসিন্দা এখন বাধ্য হয়ে ছোট বাড়িতে উঠেছে খরচ সামলাতে। আর ছোট বাড়ির বাসিন্দারা অনেকেই হারিয়েছেন নিজের বাড়ির ঠিকানা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মন্দার কারণে ক্রেতা পাচ্ছে না আবাসন শিল্পে।

৪. **জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি :** মন্দার অন্য একটি কারণ হচ্ছে দ্রুত তেলের মূল্য বৃদ্ধি। বর্তমান শিল্পের অধিকাংশ শিল্পই তেলনির্ভর। তেলকে শিল্পের ব্লাড বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এ তেলের মূল্য অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক বিশাল নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার গতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

৫. **বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি :** বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম একটি কারণ বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি। ২০০৭ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া এ মুদ্রাস্ফীতি ২০০৮ সালে ব্যাপক রূপ ধারণ করে। এ মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকার সমূহ নানা উদ্যোগ নিলেও তা রোধ করা সম্ভব হয়নি। আইএমএফের মতে, এ মুদ্রাস্ফীতির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো। কারণ এসব দেশসমূহে হঠাৎ করে বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষতার সঙ্গে মুদ্রা পরিচালনায় তারা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে তেল আমদানিকারক দেশগুলোতে তেল ও খাদ্যমূল্য বেড়ে যায়।

৬. **আর্থিক নীতির দুর্বলতা :** অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম প্রধান কারণ আর্থিক নীতি ও ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অব্যবস্থাপনা। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের ভাষায়, মানুষ সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাগাল ধরেছে। কিন্তু কেউ এ কথা কখনোই বলতে পারবে না যে, এটা সুদৃঢ় বা সহজে পরিবর্তনীয় নয়। বস্তুত গত ৩০ বছরে বাজার অর্থনীতি কমপক্ষে ১০০ বারের অধিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কাজেই বাজার অর্থনীতির নীতিগত দুর্বলতা পৃথিবীতে নানাবিধ সংকট সৃষ্টি করবে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা তারই একটি প্রতিফল।

মন্দাপরবর্তীতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে বেশ কয়েকটি সুখবর আসতে থাকে। যেমন ২২ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ড সরকার অবহিত করে তাদের ২০০৯ সালের শেষ তিন মাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ৫.৮ শতাংশ। ২৩ ফেব্রুয়ারি তাইওয়ান জানায় চতুর্থ প্রান্তিকে তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.২ শতাংশ। আর চতুর্থ প্রান্তিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে ফেরার ঐ মিছিলে ২৪ ফেব্রুয়ারি শামিল হয় হংকং ও মালয়েশিয়া। হংকংয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৪.৫ শতাংশ, তাছাড়া সিঙ্গাপুরের প্রবৃদ্ধি ৩.৮ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৪.৫ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ার ২.৮ শতাংশ, শ্রীলংকার ৬.৩ শতাংশ, পাকিস্তানের ৪.৭ শতাংশ, বাংলাদেশের ৫.৯ শতাংশ ও ভিয়েতনামের ৮.৩ শতাংশ। উপরের দেশগুলো ২০০৮ সালের পর (ভিয়েতনাম বাদে) প্রথমবারের মতো প্রবৃদ্ধিতে ফিরল।

বিশ্বব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ও সহসভাপতি জাস্টিল লিন বলেছেন, ২০১০ অর্থনৈতিক বিকাশের হার বড়জোর গিয়ে দাঁড়াবে ২.৭ শতাংশে। তবে এ ক্ষেত্রে চীন ব্যতিক্রম। চীন মন্দা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে গোটা দুনিয়াকে বিস্মিত করেছে। ২০০৯ সালে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৪৮ শতাংশ। ২০১০ সালে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় ১০.৪৬ শতাংশ। চীন বর্তমান বিশ্বের প্রথম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্সের মত প্রকাশ করেছিলেন ২০২০ সালের আগেই অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে চীন। কিন্তু ২০১৪ সালের শেষের দিকেই চীন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায় (পিপিপির ভিত্তিতে)। অপরদিকে এক সময়ের অন্যতম পরাশক্তি জাপানের অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। দেশটির প্রবৃদ্ধি এখনো ইতিবাচক ধারায় না ফিরলেও তৃতীয় প্রান্তিকের তুলনার চতুর্থ প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৬ শতাংশ। ২০০৯ সালে জাপানের মোট দেশজ উৎপাদন ছিল ৫.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। তবে মন্দা কাটিয়ে ওঠার লক্ষণ স্পষ্ট হলেও জাপানের দুর্বল অভ্যন্তরীণ চাহিদা এখনো চিন্তায় রেখেছে দেশটির বিশেষজ্ঞদের।

এশিয়ার অর্থনীতিতে যখন তরতর করে মন্দা কাটিয়ে ওঠার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে তখন পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতির অবস্থা মন্দায় ধুঁকছে। বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতির একটি হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি। কিন্তু মন্দার ধাক্কা, ঋণের বোঝা আর বেকারত্বের চাপে ইউরোপীয় অর্থনীতি যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। বিশ্বের নানা প্রান্তে মন্দা পরবর্তী অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরে আসার কথা শোনা গেলেও ইউরোপে সেটা যেন আসি আসি করেও আসছে না। তাই বিশ্বখ্যাত সাময়িকী ইকোনমিস্ট-এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ইউরোপের জন্য ঝুঁকির সতর্কসংকেত দিয়েছে। আইএমএফের প্রধান বলেছেন, এমন অবস্থা চলতে থাকলে অর্থনৈতিক শক্তির বিচারে ইউরোপ দ্বিতীয় শ্রেণিতে চলে যাবে।

ইউরোপের অর্থনীতিতে এখন খারাপ খবরের কোনো শেষ নেই। সর্বশেষ খারাপ সংবাদ হচ্ছে ইউরো অঞ্চলে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশে বেকারত্বের হার যদিও কিছুটা কম, ৯.৬ শতাংশ। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বলছে– বেকারত্বের চাপ আরো বেড়ে গড়ে ১০.৪ শতাংশ হার অব্যাহত রয়েছে ২০১৪ পর্যন্ত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮টি দেশে ২০১৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪০ লাখ ৫০ হাজার। এর মধ্যে বেকারত্বের সর্বোচ্চ হার স্পেনে ১৯ শতাংশ আর সর্বনিম্ন নেদারল্যান্ডসে ৪ শতাংশ।

এক মন্দার ধাক্কা পেরোতে না পেরোতেই নতুন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়তে বসেছে ইউরোপ। এখন ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো ডুবতে বসেছে দেনার ভারে। ইউরোপীয় সভ্যতা যে গ্রিস থেকে শুরু, অর্থনীতির এ নতুন সঙ্কটের উদ্ভবও সেখানেই। দেশটির এখন নিজের কোনো টাকা নেই। কৃচ্ছ সাধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির সরকার। পেনশনের টাকা যাতে না দিতে হয় সেজন্যও চাকরির বয়স সীমা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে দুই বছর। আয় বৃদ্ধি করতে গিয়ে তেল, তামাক, জমির ওপর আকাশচুম্বী কর বসানো হয়েছে। তবু বাজেট ঘাটতি বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গেছে ১৩ শতাংশের কাছাকাছি। ইউরোপের মানদণ্ডে এ ঘাটতি ৩ শতাংশের নিচে থাকলে তা স্বাভাবিক। ভূমধ্যসাগরের তীরের এ দেশ এক বছরে যত উৎপাদন করে সে জিডিপির চেয়েও ঋণের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বেশি। আপাত হিসেবে ৩০ হাজার কোটি ডলার তাদের দেনা। এত বড় বোঝা কিভাবে বহন করতে হয় গ্রিস জানে না। সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে শেষ পর্যন্ত এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন উদ্ধার পরিকল্পনা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে ইউরোপ। তবে এক ট্রিলিয়ন ডলারের এ পরিকল্পনা অনেকটা ঘায়ে মলম দেয়ার মতো। হয়তো কিছুটা স্বস্তি মিলবে, কিন্তু উপশম হবে না।

পর্তুগাল বা গ্রিস তুলনামূলক ছোট দেশ। ঋণের টাকা শোধ করতে টাকা দিয়ে তাদের আপাতত উদ্ধারও হয়ত করা সম্ভব। কিন্তু স্পেন? এ দেশটি গোটা ইউরোজোন অর্থনীতির প্রায় ১২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সঙ্কটের বিচারে অবস্থান অনেকটা গ্রিসের পরেই। এরপর সঙ্কটের এ তালিকায় আসছে উত্তর আয়ারল্যান্ড ও ইতালির নাম। এরপর তালিকায় আসছে ব্রিটেনের নাম। রিটেইল প্রাইস ইনডেক্সের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ব্রিটেনে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ২৫ লাখ, যা গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর সঙ্গে আরো আছে অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম আরো ৮০ লাখ মানুষ, যারা পুরোপুরি বেকার না হলেও আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় পার করছেন। এ অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই আইএমএফ তৎকালীন প্রধান ডমিনিক স্ট্রসকান বলেছিলেন, ইউরোপীয় অর্থনীতি এভাবে চলতে থাকলে আগামী দশক থেকে বিশ বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইউরোপের আর কোনো অবদান থাকবে না।

সরকারি হিসাবে মন্দা কাটিয়ে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেও ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত কর্মহীন যুক্তরাষ্ট্রের ৫.৫ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ। সংখ্যায় ৮৬ লাখ। তাছাড়া প্রায় দেড় কোটি মানুষ চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। বিশ্বব্যাংক বলছে, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ, বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক সঙ্কটের উৎকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশের হার ২০১৪ সালে এসে দাঁড়ায় ২.৪ শতাংশ।

প্রলম্বিত মন্দায় অবস্থানচ্যুতি ঘটেছে মার্কিন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। দুই সন্তানসহ চারজনের যেসব মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় ছিল বছরে ৫১ হাজার থেকে ১ লাখ ২৩ হাজার ডলার, তাদের আয় কমেছে ৫ থেকে ৭ শতাংশ। আবার মন্দার সময় দেনার দায়ে পড়েছেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন বা মেটাচ্ছেন অন্য

কোনো দায়, এমন মানুষের আয় কমেছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। আয় কমে গেলে মানুষের সঞ্চয়ও কমবে স্বাভাবিকভাবেই। মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ঐসব মানুষের সামনে ভবিষ্যতের কোনো নিরাপত্তা নেই। অবসরকালীন ব্যয়ের জন্য মার্কিন নাগরিকরা গড়ে বার্ষিক ৩.২ শতাংশ হারে সঞ্চয় করতেন। কিন্তু সেই দিন আর নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তার-হাসপাতাল এখন আতঙ্কের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নবিত্তের নাগালের বাইরে থাকা আকাশছোঁয়া চিকিৎসা ব্যয়ের কথা সবারই জানা আছে। দু সন্তানসহ মধ্যবিত্ত একটি পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাদে কেবল ইন্সুরেন্স বাবদই খরচ করতে হয় বছরে ৫১০০ ডলার। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে চিকিৎসা খরচ বেড়েছে ১৫৫ শতাংশ । অথচ একই সময়ে মার্কিন মধ্যবিত্তের আয় বেড়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ। মন্দার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যয় বেড়ে গেছে। শিক্ষার ব্যয় বেড়েছে গড়ে ৩০ শতাংশ হারে। কলেজ পড়ুয়া একটি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য বার্ষিক ন্যূনতম খরচ আগে ছিল ৪২০০ ডলার। মন্দার কারণে এখন হয়েছে ৪৮০০ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম খাত আবাসন। মন্দার আগে একটি বড় বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের এমন নাগরিকদের অধিকাংশই এখন খরচ সামলাতে ছোট বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। আর ছোট বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন এমন অনেকেই হারিয়েছেন নিজের বাড়ির ঠিকানা। গত চার বছরে বাড়ির দাম কমেছে অন্তত ৩০ শতাংশ। ২০১০ সালেই বাড়ির দাম কমেছে ১০ শতাংশ। কিন্তু তারপরও ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ক্রেতা পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন শিল্প। গত মন্দা মার্কিন গণমানুষের যাপিত জীবনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তাতে উন্নতির কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না, সেটা স্পষ্ট হয় দেশটির জরুরি খাদ্য বিভাগের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে। 'হাঙ্গার ইন আমেরিকা ২০১০' শিরোনামে এ রিপোর্টে ফুটে উঠেছে মার্কিন দরিদ্র মানুষের জীবনমানের ভয়াবহ চিত্র। রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬ শতাংশ মানুষেরই জরুরি খাদ্য সহায়তা দরকার। এই হার মন্দা পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রবীণদের ক্ষেত্রে এ সাহায্য দরকার ৬৫ শতাংশের। কিন্তু কিশোরদের ক্ষেত্রে এ হার ৫৫ শতাংশ। অথচ এ সহায়তা যাদের দেয়ার কথা সেই জরুরি ফুড সেন্টার বলছে– অর্থের অভাবে তাদের ৭০ শতাংশ কেন্দ্রই বন্ধ হয়েছে। তাই প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সামনে এখন সেটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ– নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি আর সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি।

আফ্রিকা বর্তমানে আরেক উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আইএমএফের সংশোধিত নতুন রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রেট লেকের পার্শ্ববর্তী বিশেষ করে কেনিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডায়, এমনকি 'হর্ন অব আফ্রিকা' নামে পরিচিত খরাপীড়িত অঞ্চলে তাক লাগানো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এসব দেশের প্রবৃদ্ধির হার ১.১ শতাংশ। তবে আইএমএফ বলছে ২০১০ ও ২০১১ সালে আফ্রিকার দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৪.৮ শতাংশ। গত চার বছরে আফ্রিকার দেশগুলোতে যে জিডিপি আর্জিত হয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশের মূলে ছিল ব্যক্তি পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন ও সেবা খাত। তাতে আফ্রিকার ১০০ কোটির মধ্যে ৩০ কোটি লোক ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে মধ্য আয়ের শ্রেণিতে। আর এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে চীনের বিনিয়োগ বান্ধব অবকাঠামো। ২০০৯ সালে আফ্রিকার দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে ১৭ শতাংশ। অঙ্কে যা দাঁড়ায় তা হলো ৬২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অক্সফোর্ডের

অর্থনীতিবিদ পল কোলিয়ারের রিপোর্টে বলা হয়েছে— ২০০৭ সালের শুরু থেকে ২০০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৯৬০টি আফ্রিকা কোম্পানির অর্জিত মুনাফা গড়ে ১১ শতাংশ। ঘানা, বোতসোয়ানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, বরুন্ডির মতো দেশগুলোতে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ শিল্প ও বাণিজ্যবান্ধব আফ্রিকা দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে বের হয়ে উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

বাংলাদেশে প্রতিবছর যত কাজের সুযোগ তৈরি হয়, চাকরিপ্রার্থী মানুষের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে মতে ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৮.৫ শতাংশ। এ সময় কর্মসংস্থান বেড়েছে ৭.৩৮ শতাংশ। ফলে প্রতিবছর গড়ে বেকার বাড়ছে তিন লাখ করে। বাংলাদেশে গত তিন বছরে শুধু শিল্পখাতেই প্রায় ১৭ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাই অকৃষি খাতে শ্রমশক্তির পরিমাণ ৫১ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১২ শতাংশ।

মন্দায় নিপতিত বিশ্ব অর্থনীতি দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে ২০১০ সালের শুরুতেই। যার প্রমাণ বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের হার বৃদ্ধি। তবে এক্ষেত্রে এশিয়া, আফ্রিকা যেভাবে এ দুরবস্থা থেকে মুক্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে, সেদিক থেকে আমেরিকা বা ইউরোপের গতি ততটা দ্রুত নয়। খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম স্থিতিশীল পর্যায়ে আসতে শুরু করেছে। শেয়ারবাজারে স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব হ্রাস পাচ্ছে। মন্দা থেকে উত্তরণে এগুলো ভালো লক্ষণ মনে হলেও এখনই বিশ্বসম্প্রদায়কে ভাবতে হবে ভবিষ্যতে যাতে এরূপ সংকটজনক পরিস্থিতি না দেখা দেয় তার জন্য কার্যকর ও সঠিক নীতি গ্রহণ করা। যদিও ২০১০ সালের শেষের দিকে এবং ২০১১ সালের শুরু থেকে দ্রব্য মূল্য পুনরায় বাড়তে শুরু করে। অতএব, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে এ সংকট মোকাবিলার অন্যতম হাতিয়ার।

১১ । তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার মতামত লিখুন।

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণে পরিবর্তন দেখা দেয়। যুদ্ধোত্তরকালে গোটা বিশ্ব দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর এক ভাগের নেতৃত্বে ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আর অন্য ভাগে ছিল অপ্রতিরোধ্য পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের পরে তার সমাজতান্ত্রিক থাবা পূর্ব ইউরোপের দরিদ্র দেশের দিকে বিস্তার করতে থাকে। এ থাবা এসে পশ্চিম ইউরোপের ধনী দেশগুলোর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র কৌশলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের এ আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য পশ্চিম ইউরোপের ধনী দেশগুলোকে নিজের দলে নিয়ে ১৯৪৯ সালে ৪ এপ্রিল গঠন করে NATO (North Atlantic Treaty Organization)। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশগুলো নিয়ে ১৯৫৪ সালে গঠন করে Warshaw Pact (ওয়ারস প্যাক্ট)। কিন্তু সেই সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কবল থেকে মুক্ত এ নব্য স্বাধীন দেশগুলো কোনো প্রকার জোটে না গিয়ে তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এ দেশগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তৃতীয় বিশ্ব।

তৃতীয় বিশ্ব কি : তৃতীয় বিশ্ব ধারণাটি খুব বেশি পুরনো নয়। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে এসে শব্দটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সে সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ প্রত্যয়টির ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। তবে শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন একজন আলজেরিয়ান পণ্ডিত। তৃতীয় বিশ্বের সংজ্ঞায় বলা হয়, 'Third world countries are those which are backword in term of social, cultural, economical and political from developed countries.' অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক দিক থেকে যেসব দেশ পিছিয়ে আছে তাদের তৃতীয় বিশ্ব বলা হয়। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো খুবই দুর্বল। পুঁজির স্বল্পতা, বিনিয়োগের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে এ দেশগুলো উন্নত বিশ্ব থেকে অনেক পিছিয়ে। বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে এ দেশগুলোই তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে পরিচিত। অনেকের মতে, LDC's ভুক্ত (Least Development Countries) দেশগুলোই একত্রে তৃতীয় বিশ্ব।

তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য :

১. **বিপর্যস্ত অর্থনীতি :** দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি খুবই বিপর্যস্ত। তাছাড়া শিল্পায়নের জন্য যে প্রযুক্তিবিদ্যা বা কৃৎকৌশল দরকার তা এদের নেই। এ দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ নেই।

২. **অনুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা :** ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের স্বার্থে এখানে সংকীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল। মূলত এ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল অধীন কর্মচারী তৈরি করা, দক্ষ জনশক্তি নয়। দীর্ঘদিনেও এ ঘুণে ধরা শিক্ষাব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৩. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিভিন্ন মতাদর্শের গোষ্ঠী, আঞ্চলিক শক্তির উত্থান, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে প্রতিপক্ষ দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে।

৪. **দুর্বল শাসনব্যবস্থা :** শাসনব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাশীলদের প্রভাব একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

৫. **গণতন্ত্রের মূল্যহীনতা :** অনেক দেশে সামরিক শাসন, পরিবারতন্ত্র, আঞ্চলিক শক্তির এবং বিচ্ছিন্নতা শক্তির উত্থান গণতন্ত্র চর্চার প্রধান বাধা। এছাড়াও এসব দেশের নেতৃত্বের মাঝে জবাবদিহিতার অভাব, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের চর্চা দেখা যায়।

৬. **সামরিক শক্তির প্রভাব :** তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো ঘন ঘন সরকার পতন, ঘন ঘন সামরিক শক্তির উত্থান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বা প্রশাসনিক যন্ত্রে সামরিক শক্তির প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ, যা স্থিতিশীল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।

৭. **সরকার ও জনগণের মাঝে দূরত্ব :** এসব দেশে সরকার জনগণের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ক্ষমতাসীন হয় না। ফলে তাদের দ্বারা জনকল্যাণমূলক কাজ খুবই কম হয়। ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় বসার পর থেকেই ব্যক্তি বা দলের প্রভাবে পরিচালিত হয়।

৮. **ঋণনির্ভর অর্থনীতি :** এসব দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয় দাতাদের সহযোগিতা এবং বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা থেকে অর্জিত ঋণের মাধ্যমে। ঋণনির্ভর অর্থনীতি হওয়ার কারণে উন্নয়ন ব্যবস্থায় বাহ্যিক হস্তক্ষেপ বিদ্যমান থাকে। এ ছাড়া সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং উচ্চ হারে সুদ প্রদানের কারণে এখানকার অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করতে পারছে না। ফলে একদিকে যেমন ঋণের বোঝা বেড়েই চলছে অন্যদিকে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাচ্ছে।

৯. **অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা :** তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান হাতিয়ার কৃষি। কিন্তু এ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক সনাতন পদ্ধতির প্রচলন। আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ, সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার এসব দেশের কৃষকদের মাঝে তেমন প্রসার ঘটেনি। ফলে উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত নয়।

১০. **খাদ্য সমস্যা :** এসব দেশের বেশিরভাগই ভয়াবহ খাদ্য সংকটে। প্রতিবছর খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলার জন্য উন্নত দেশ থেকে প্রচুর খাদ্য আমদানি করতে হয়। ফলে তাদের উন্নত দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়।

১১. **ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব :** এসব দেশে রাজনৈতিতে ধর্ম ও অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিদেশী শক্তিসমূহ তাদের প্রভাব কায়েম করতে স্থানীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

১২. **মূল্যবোধের অবক্ষয় :** শিক্ষা এবং আদর্শের অভাবের কারণে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ এবং দায়িত্ব বোধের অবক্ষয় ঘটেছে। ফলে সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করে সব সময়।

তৃতীয় বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা : তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক চিত্র সব দেশে প্রায় একই রকম। দেশগুলোর অর্থনৈতিক মূল সমস্যা হলো দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি, বিনিয়োগে অনুকূল পরিবেশের অভাব, অনুন্নত অবকাঠামো, পুঁজির অভাব, দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব ইত্যাদি। ফলে তৃতীয় বিশ্ব বর্তমানে উন্নত বিশ্ব থেকে অনেক পিছিয়ে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি (United Nations Development Programme (UNDP) প্রতিবছর মানব উন্নয়নসূচক রিপোর্ট প্রকাশ করে। ৪ জুলাই ২০১৪ এ সংস্থা 'মানব উন্নয়ন সূচক ২০১৪' প্রকাশ করেছে। এ সূচকে সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান নিচে দেখানো হলো :

মানব উন্নয়ন সূচক ২০১৪ : সার্কভুক্ত দেশগুলোর অবস্থান

অবস্থান ও দেশ	সূচক	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	দারিদ্র্য		সাক্ষরতার হার (১৫ বছর+)%	গড় আয়ু (বছর)	মাথাপিছু আয় (মা. ড.)
				বহুমাত্রিক	চরম			
৭৩. শ্রীলংকা	০.৭৫০	২.১৩ কোটি	০.৮	—	—	৯১.২	৭৪.৩	৯,২৫০
১০৩. মালদ্বীপ	০.৬৯৮	৩ লাখ	১.৯	৮.৫%	০.১%	৯৮.৪	৭৭.৯	১০,০৭৪
১৩৫. ভারত	০.৫৮৬	১২৫.২১ কোটি	১.২	১৮.২%	২৭.৮%	৬২.৮	৬৬.৪	৫,১৫০
১৩৬. ভুটান	০.৫৮৪	৮ লাখ	১.৬	১৮.৮%	৮.৮%	৫২.৮	৬৮.৩	৬,৭৭৫
১৪২. বাংলাদেশ	০.৫৫৮	১৫.১৬ কোটি	১.২	১৮.৮%	২১.০%	৫৭.৭	৭০.৭	২,৭১৩
১৪৫. নেপাল	০.৫৪০	২.৭৮ কোটি	১.২	১৮.১%	১৮.৬%	৫৭.৪	৬৮.৪	২,১৯৪
১৪৬. পাকিস্তান	০.৫৩৭	১৮.২১ কোটি	১.৭	১৪.৯%	২৬.৫%	৫৪.৯	৬৬.৬	৪,৬৫২
১৬৯. আফগানিস্তান	০.৪৬৮	৩.০৬ কোটি	২.৪	১৬.০%	২৯.৮%	—	৬০.৯	১,৯০৪

উপরের চিত্র থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর GDP এবং জীবনযাত্রার মানের দিকে তাকালে দেখা যায় খুবই নাজুক অবস্থানে রয়েছে এ দেশগুলো। এ অবস্থান শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একই রকম অবস্থা পরিলক্ষিত হবে।

এশিয়ার দারিদ্র্যের হারও অনেক বেশি এবং দরিদ্রতা দিন দিন বেড়েই চলছে। নিচে এশিয়ার দারিদ্র্যের রেখাচিত্র তুলে ধরা হলো :

এডিবির (ADB) দারিদ্র্যবিষয়ক প্রতিবেদন : ম্যানিলাভিত্তিক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের দারিদ্র্য বিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়, এ অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ১৯.৩ শতাংশ লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। তারা এক ডলারেরও কম অর্থে প্রতিদিন জীবনধারণ করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এ অঞ্চলে সার্বিক অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের নাটকীয় দারিদ্র্য হ্রাস। এডিবির প্রধান অর্থনীতিবিদ ইফজাল আলী এক বিবৃতিতে বলেন, 'দারিদ্র্য হ্রাসে এশীয় সরকাররা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি স্পষ্ট যে, হ্রাসমান দারিদ্র্য এখনো এ অঞ্চলের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, অঞ্চলভিত্তিতে দারিদ্র্য হ্রাস সন্তোসজনক হলেও এখনো এসব দেশে বড় ধরনের বৈষম্য বিরাজমান। এডিবির মতে, এ অঞ্চলে ৬২ কোটি ১০ লাখ লোকের মধ্যে যে ৯৩% লোক ১ ডলারেরও কম অর্থে জীবনধারণ করছে তাদের মধ্যে ভারতের রয়েছে ৩২ কোটি ৭০ লাখ, চীনের ১৭ কোটি ৩০ লাখ এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে রয়েছে ৭ কোটি ৭০ লাখ লোক।

দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্যের রেখাচিত্র : দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভূরাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভিন্নতা থাকলেও দরিদ্রতার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব মিল রয়েছে। আর এ দরিদ্রতাই এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সশস্ত্র সংঘাত, বৈষম্য ইত্যাদি সৃষ্টি করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়া (সার্কভুক্ত দেশ) প্রায় ১৬৭ কোটি মানুষের জনপদ। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৫% এ অঞ্চলে বাস করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। এ অঞ্চলে গড়ে প্রায় ৩২% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, যার সংখ্যা প্রায় ৪৬ কোটি। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি ৫ জন মানুষের ২ জনই দরিদ্র। একমাত্র মালদ্বীপ ছাড়া বাকি ছয়টি দেশের দরিদ্রতা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। নিচে এ অঞ্চলের দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **বাংলাদেশ :** বাংলাদেশ শুধু বিশ্বেরই নয়, সার্কভুক্ত দেশগুলোরও একটি দরিদ্র দেশ। UNDP মানব উন্নয়ন সূচক রিপোর্টে ২০১৪ অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। এখনো বাংলাদেশের ৩১.৫% শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। বাংলাদেশে রয়েছে অনেক সমস্যা, যা দেশের দরিদ্রতা দূরীকরণের পথে অন্তরায়। যেমন– অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকা, দুর্নীতি, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা প্রভৃতি।

২. **ভারত :** আয়তনে বিশাল এক দেশ ভারত। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার $\frac{১}{৬}$ ভাগ মানুষের বাস ভারতে। কিন্তু দেশটি দরিদ্রতার অভিশাপে জর্জরিত। বিশ্ব দারিদ্রের ৩৩ শতাংশের বাস ভারতে। মোট জনসংখ্যার ২৬.৮% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। UNDP-এর ২০১৪ সালের মানব উন্নয়নসূচকে দেশটির অবস্থান ১৩৫তম। সিংহভাগ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। দেশটিতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ছে। উদারীকরণের কারণে সরকারের ভূমিকা কমে আসছে এবং অতিদরিদ্র মানুষ সংস্কারের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩. **পাকিস্তান :** দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান মাঝামাঝিতে। দেশটির ৩২% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এ দেশের মোট আয়ের ৫০ ভাগ অর্জন করছে ২০ ভাগ

মানুষ। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন ২০ ভাগ লোকের অর্জন হচ্ছে জাতীয় আয়ের মাত্র ৬%। এ আয় বৈষম্যই পাকিস্তানের দরিদ্রতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। তাছাড়া দেশটি বেশির ভাগ সময়ই সামরিক শাসনের শিকার। ১৯৯০ সালের পর থেকে পাকিস্তানের দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। পাকিস্তান বর্তমানে বিপুল পরিমাণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জরিত। বর্তমান বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারে। এ ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ।

৪. **শ্রীলঙ্কা :** দেশটির ২৬.২% মানুষ আজও চরম দারিদ্র্যের গ্লানিতে ভুগছে। জাতিগত দাঙ্গা বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রীলংকাকে আর্থ-সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রতা একটি সাধারণ ব্যাপার। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মোট দরিদ্রের ৮৮% গ্রামাঞ্চলে বাস করছে, যেখানে শহরাঞ্চলে মাত্র ৮% লোক দরিদ্র। ১৯৭৭ সালে SAP (Structural Adjustment Policy) চালুর পর থেকেই দরিদ্রতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **নেপাল :** নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দরিদ্র দেশ। মানব উন্নয়ন সূচক ২০১৪ অনুসারে দেশটির অবস্থান ১৪৫তম। এখানকার ৩৮% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক কাঠামো ঐতিহাসিকভাবে নেপালে দরিদ্রতা সৃষ্টি করছে। বর্তমানে ৯০ লাখ মানুষ তীব্র দরিদ্রতার সাথে লড়াই করছে। এদের বেশিরভাগই পল্লী অঞ্চলে বসবাস করছে। দরিদ্রতার ফাঁদ থেকে মুক্তির কোনো উপায় না পেয়ে অসহায় গরিবদের মাঝে আত্মহত্যার হার বাড়ছে। নেপাল হলো দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ, যার জিএনপির (GNP) একটি বড় অংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসছে। কিন্তু তারপরও প্রকৃত দারিদ্র্যের হার কমছে না। গত বিশ বছরে সর্বাপেক্ষা গরিব ৪০% মানুষের আয় কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে সম্পদশালী ১০% লোকের আয় নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে নেপালে আয় বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে। নিম্নআয়ের মানুষ চরম বৈষম্যের শিকার।

৬. **ভুটান :** ভুটান একটি স্বল্পোন্নত দেশ। দেশটির ৩৬% লোক দরিদ্রতার যাতাকলে পিষ্ট। সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভুটানে মূলত আয়বিষয়ক দরিদ্রতা বিরাজ করছে, যার প্রধান শিকার পল্লী এলাকার জনগণ। দেশটির দরিদ্ররা মূলত কৃষক, যারা রিমোট এলাকায় বসবাস করছে। জনসংখ্যার ৩২% খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, ৩৩% প্রাইমারি স্কুলে যায় না এবং ৬৬% লোক বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রামীণ জনসংখ্যার ২৯% এবং শহুরে জনসংখ্যার ২.৪০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে।

৭. **মালদ্বীপ :** দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এ দ্বীপবেষ্টিত দেশটির অবস্থান অর্থনৈতিকভাবে শীর্ষে। দেশটির মাথাপিছু আয় ১০০৭৪ ডলার। আর মাত্র ১২% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। মাছ ধরা এবং পর্যটন হচ্ছে জীবনযাত্রা ও আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া মালদ্বীপে ঐতিহাসিকভাবে বাণিজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মালদ্বীপের রয়েছে অত্যন্ত উদার বাণিজ্যনীতি। ভৌগোলিকভাবেই মালদ্বীপকে অনেক পণ্য আমদানি করতে হয়। তবে রপ্তানির ভিত্তি অত্যন্ত সীমিত।

উপরে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর যে চিত্র দেখি তা তৃতীয় বিশ্বেরই চিত্র। কারণ দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের বাইরে নয়। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেরই অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এক।

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণসমূহ : তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার সৃষ্টি একদিনে হয়নি। দীর্ঘদিন এ দেশগুলো ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার। ফলে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশ এসব দেশ থেকে সব ধরনের সম্পদ কুক্ষিগত করেছে। কিন্তু বিনিময়ে এখানে কোনো শিল্পকারখানা তৈরি করেনি। বহুবিদ কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পশ্চাৎপদ। তবে মূল কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. ঔপনিবেশিকতা ও নয়া ঔপনিবেশিকতা;
২. স্বনির্ভরশীলতা অর্জনে দাতা দেশের বাধা সৃষ্টি;
৩. বৈদেশিক সাহায্যের নামে প্রচুর ঋণ গ্রহণ;
৪. উন্নত দেশের বেসরকারি বিনিয়োগ;
৫. বিভিন্ন ভ্রান্তিমূলক দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি;
৬. উন্নত দেশের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন;
৭. পুতুল সরকার গঠন;
৮. রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি;
৯. সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ;
১০. সামরিক অভ্যুত্থান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় : অর্থনৈতিক সমতাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রথমশর্ত হলো ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দূরীকরণ। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন কৃষি, শিল্পের উন্নয়ন। আর এজন্য দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন। তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, একুশ শতকে জাতিসংঘের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হলে জাতিসংঘকে গরিব দেশগুলোর সমস্যা সমাধানে শুধু আন্তরিক নয় বরং কার্যকর পদক্ষেপও নিতে হবে। স্বল্পোন্নত এবং উন্নত সবাই একত্রিত হয়ে বাস্তব সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। অর্থনৈতিক ভিত মজবুত থাকলেই সামাজিক, রাজনৈতিক সব অবস্থা স্থিতিশীল রাখা সম্ভব।

১. **অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুতকরণ :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে হবে। কারণ অর্থনীতি এমন একটা বিষয়, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা কমিয়ে আনতে পারে। সরকারকে এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে।

২. **দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে হলে দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধি পেলে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ এবং GDP বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় আয়ের ৮০-৮৫% এ খাত থেকে আসে। তাই কর ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. **পণ্যের গুণগত মান ঠিক রাখা :** কোনো দেশই তার নিজস্ব সম্পদ প্রত্যক্ষ কর। এর যথাযথ মানসম্পন্ন না করতে পারলে অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদিত পণ্য এবং সেবার মান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হতে হবে। কারণ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে পণ্যের মান ঠিক রাখা একান্ত আবশ্যক।

৪. **শিল্পায়ন ও নগরায়ন :** তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশই কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ন ঘটাতে হবে।

৫. **বৈদেশিক বিনিয়োগ :** তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পর্যাপ্ততা লক্ষ্য করা যায় সেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ অভ্যন্তরীণ বাজারে পুঁজি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. **শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার :** বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হলো কেরানি তৈরির কারখানা। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করতে হবে।

৭. **গণতন্ত্রের বিকাশ :** বেশিরভাগ দেশই স্বল্পসময় অথবা দীর্ঘসময় সামরিক শাসনের শিকার। ফলে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার অনেক দেশে নির্বাচিত সরকার স্বৈরাচারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ শাসন করছে। অনেক দেশে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্ক সুখকর নয়। এসব বাধা দূর করে গণতন্ত্র চর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৮. **কৃষিব্যবস্থার সংস্কার :** বেশিরভাগই দেশেই সনাতন কৃষিব্যবস্থা চালু রয়েছে। এখানে প্রযুক্তি, বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহার হয় না, ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

৯. **দুর্নীতি রোধ :** তৃতীয় বিশ্বে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা না থাকায় দুর্নীতি জাতীয় পর্যায়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের নিচের স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দুর্নীতি স্থায়ী আসন গেড়েছে। এ সর্বগ্রাসী দুর্নীতি রোধ করতে হবে।

১০. **ঋণনির্ভরতা কমাতে হবে :** অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক ঋণনির্ভরতা কমাতে হবে।

১১. **রপ্তানি বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করার জন্য রপ্তানিমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া আমাদানি নিরুৎসাহিত করতে হবে।

১২. **বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোট গঠন :** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বর্তমান অবস্থা থেকে দ্রুত মুক্তির একটি সহজ পন্থা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন এবং তা স্থায়ীকরণ। বর্তমান সার্ক, আসিয়ান-এর মতো আরো জোট গঠন করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের একদিকে যেমন নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করতে হবে তেমনি অন্যদিকে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশকে এগিয়ে আসতে হবে। সহযোগিতার দু বাহু প্রসারিত করতে হবে। তবে তৃতীয় বিশ্ব একদিন অর্থনৈতিকভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে ইতিহাসের নিয়মেই।

১২। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণের সপক্ষে আপনার যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করুন।

উত্তর : পৃথিবীতে কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা রাষ্ট্রগুলো দ্বারা ব্যাপকভাবে সমাদৃত এখন; সে সাথে উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নও রাষ্ট্রগুলোর কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। আর উন্নয়ন বাজেট তৈরি করতে গিয়ে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র যখন ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করতে লাগলো, তখন আমরা যারা 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' বলে সংজ্ঞায়িত তাদের বাধ্যতামূলক ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন এক ধরনের বৈধতা পেয়ে গেল। বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। জনবাহুল্যের সাথে সাথে অতি দারিদ্র্যও এখানকার অধিকাংশ মানুষের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। অতিদারিদ্র্য এসেছে এখানকার উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎপাদিত না হওয়ার ফলে, সে সাথে বণ্টনের অসমতা তো রয়েছেই। এক পা এগুলে দু পা পিছিয়ে দেয়ার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগতো এখানকার নিয়তিই।

বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ : আমাদের অর্থমন্ত্রী প্রতি বছর প্যারিসে দাতাগোষ্ঠীদের বৈঠকে যান। বৈঠকে দাতা দেশগুলো নানা ধরনের শর্ত আরোপ ও আলোচনার পর বাংলাদেশে তাদের নির্দেশিত উন্নয়ন প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার পরিস্থিতি আছে কি না তা বিবেচনা করে নানা মাত্রায় ঋণ প্রদান করে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী বলে সাম্প্রতিক পরিচিতি পাওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন– বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি থেকে বিভিন্ন সময়ে ঋণ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের বাজেট ঘাটতি পূরণের অন্যতম হাতিয়ার এ বৈদেশিক ঋণ।

বৈদেশিক ঋণের সপক্ষে এমনিতেই যেসব যুক্তি প্রচার করা হয় সেগুলো হলো দেশের বিনিয়োগ চাহিদা ও দেশজ সঞ্চয়ের মধ্যে পার্থক্য পুঁজি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য আমদানিকৃত পুঁজির অংশ হিসেবে প্রথমত বিনিয়োগের হার প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি করবে এবং দ্বিতীয়ত দেশজ সঞ্চয় হার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ, বিনিয়োগ হার প্রত্যক্ষভাবে বাড়িয়ে দেবে যার ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে, বর্ধিত আয় বর্ধিত সঞ্চয় হারের জন্ম দেবে। দ্বিতীয় ধাপে এ বর্ধিত সঞ্চয় হার বিনিয়োগ হারকে আরো বাড়িয়ে দেবে, যার ফলে উৎপাদন ও আয়ের প্রবৃদ্ধির হার আরো বেড়ে যাবে। এক কথায় ক্রম ...ান বৈদেশিক সাহায্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটি করছে সামরিক শক্তিধর দেশগুলোর সরকার, বহুজাতিক কর্পোরেশন, দেশীয় রাজনীতিবিদ, আমলা, পরামর্শক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বেসরকারি উন্নয়ন কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

বাস্তব পরিস্থিতি : বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অব্যাহত প্রবাহ একটি দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এমন ধারণা নিঃশর্ত নয়। কারণ ঋণ সাহায্যের উচ্চতর প্রবাহের সাথে বেসরকারি ভোগ, আমদানি ব্যয় (ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চলতি ভোগের সাথে সম্পর্কহীন), সামরিক ব্যয়, সরকারি ভোগ ও নিয়োগ ব্যয়— এসবের লাগামহীন বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। যার ফলে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির পরিবর্তে কমে যায়। ব্যাপক ঋণ অন্তঃপ্রবাহের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের কোনো উন্নয়ন নেই।

ঋণ সাহায্যের বিষয়টি দাতাদের পরার্থপরতা প্রসূত এমন দাবি দাতারা করে থাকে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঋণ সাহায্য প্রদান মূলত তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত। মানবতার নামে যে ঋণ অনুদান অনুন্নত বিশ্বে আসে তার চুক্তিপত্রে এমন সব শর্তের উল্লেখ থাকে যেগুলো দাতাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। যেমন– যুক্তরাজ্যের মোট দ্বিপাক্ষিক ঋণের ৮০ ভাগই ক্রয়বন্ধন শর্তসাপেক্ষ। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এসব বিদেশী পরামর্শকরা গ্রহীতা দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু এদেরকেই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে নিয়োগ করা হয়। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, অনুন্নত দেশে সাহায্য প্রদানে মূলত মার্কিন অর্থনীতি লাভবান হয়। কারণ সাহায্য দেয়া বন্ধ হলে প্রায় সত্তর হাজার মার্কিন নাগরিক কাজ হারাবে, সাহায্যের অর্থে প্রায় চার হাজার মার্কিন কোম্পানির পণ্য ও পরিসেবা ক্রয় করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ রাসায়নিক সার রপ্তানি করে তার শতকরা ২৫ ভাগই গ্রহীতা

দেশগুলো ঋণের টাকায় ক্রয় করে বা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। অন্য আরেক হিসাবে দেখা যায়, আমাদের অর্থনীতিতে প্রকৃত সাহায্য প্রবাহ হলো প্রদত্ত সাহায্য প্রবাহের মাত্র এক-চতুর্থাংশ এবং প্রদত্ত সাহায্যের তিন-চতুর্থাংশই আবার দাতা দেশগুলোতে ফিরে গেছে।

ঋণ অনুদান ছাড়াও সরাসরি বিনিয়োগ, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (শেয়ার মার্কেট), বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ (গ্রহীতা হলো উন্নয়নশীল দেশের সরকার এবং বেসরকারি খাত), রপ্তানি ঋণ ইত্যাদি নানা আকারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রতিনিয়ত শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে পুঁজি আমদানি করে থাকে। বৈদেশিক ঋণ সাহায্য মূলত এ আগন্তুক পুঁজির লাভজনক প্রবাহকে নিশ্চিত করার কাঠামোটিকে তৈরি করে। যেসব বহুপাক্ষিক উৎস থেকে বাংলাদেশ ঋণ সাহায্য পায় তার প্রধান যোগানদাতা বিশ্বব্যাংক (World Bank বা International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)। IBRD পুঁজিসমৃদ্ধ দেশগুলোর পুঁজিবাজার থেকে ঋণ নিয়ে কিছু উচ্চসুদে সে টাকা ধার দেয়। পুঁজিবাজারগুলো অপেক্ষাকৃত কম সুদে বিশ্বব্যাংককে টাকা ধার দেয়– তার কারণ পরার্থপরতা নয়, বরং তার কারণ বিশ্বব্যাংক এ পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম। ব্যাংকের অঙ্গসংস্থা International Development Association (IDA) বিভিন্ন দেশে যে অনুদান দিয়ে থাকে তার যোগানদাতা উন্নত দেশের করদাতারা। এসব দেশের মোট কর আয়ের প্রধান অংশটিই আসে কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে। কাজেই যেসব শর্তসাপেক্ষে IDA-এর অনুদান তৃতীয় বিশ্বে আসে তা মূলত বৃহৎ করদাতা বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থেই আরোপিত হয়। বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মাধ্যমেই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো তৃতীয় বিশ্বে তাদের কাঙ্ক্ষিত সংস্কার কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়ে মুনাফাযোগ্য বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করে থাকে (মাধ্যমগুলো হচ্ছে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনা, ভর্তুকি এবং মূল্য সহায়তা প্রত্যাহার, বিরাষ্ট্রীকরণ, মুদ্রার অবমূল্যায়নসহ দেশীয় শিল্প সংরক্ষণনীতি থেকে গ্রহীতা দেশের সরকারকে সরে আসতে বাধ্য করা)।

পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের ঋণ রাজনীতির মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী এক বিশেষ রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট থেকেছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রান্তে যুক্ত করা।

ঋণ অনুদানের ক্ষেত্রে দাতাদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি কখনোই গ্রহীতা দেশের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়নি, বরং এটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দাতাদেশগুলোর কৌশলগত ও রাজনৈতিক স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছে।

সুতরাং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠীর উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার প্রয়াস থাকাই স্বাভাবিক।

বৈদেশিক ঋণ অনুদানের ক্ষেত্রে প্রবাহের অভিঘাতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক সাহায্যদাতারা সাহায্য দেয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে যেসব সংস্কার কর্মসূচি গ্রহীতা দেশের ওপর বিভিন্ন সময়ে চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ জরুরি। এসব কর্মসূচির মধ্যে ব্যাংক তহবিল প্রস্তাবিত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি (Structural Adjustment Program—SAP) সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ আশির দশকের গোড়ার দিকে এ কর্মসূচি গ্রহণ করে। তবে মধ্য সত্তরে এখানে ব্যাংক তহবিলের যে প্যাকেজ চালু ছিল তাতে SAP-এর বেশিরভাগ মূল উপাদানই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কর্মসূচির মূলকথা হলো গ্রহীতা দেশের কিছু কাজ করতে হবে। যেমন— মুদ্রার অবমূল্যায়ন, সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, মজুরি হ্রাস ও শ্রমবাজার উদারীকরণ এবং

মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। বাংলাদেশ এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে প্রতিবছর বাজেট, আমদানি নীতি, শিল্পনীতি, মুদ্রানীতি, ভর্তুকি নীতিতে প্রতিফলিত হয়ে আসছে। SAP-এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশির দশকে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি গ্রহণ করার পর থেকে বাংলাদেশের বাজার উদারীকরণের নামে ক্রমান্বয়ে আমদানি শুল্কের হার কমানো হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে শুল্ক হার ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। ফলে বাংলাদেশ অন্য দেশের পণ্যে ছেয়ে যায়। বাংলাদেশের অনেক শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিনিয়োগকারীরা দেশীয় শিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে থাকে।

বাংলাদেশের Development Financing Institution-এর দেয়া বেশিরভাগ ঋণই খেলাপি ঋণে পরিণত হয়। বাংলাদেশের Development Financing Institution-এর অর্থের যোগান দাতারাই দিয়ে থাকে। তার মানে ঋণ সাহায্যের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে খরচ করার পথ দাতারাই বন্ধ করে দেয়। ফলে ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীনে বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল দাতাগোষ্ঠী তাকে প্রথম থেকেই নিরুৎসাহিত করে আসছে। ঋণ দেয়ার সুবাদে বাংলাদেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের জন্য দাতাগোষ্ঠী অব্যাহতভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। কারণ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পণ্য সরকারি মালিকানাধীন খাতের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। বাংলাদেশে ঋণ সাহায্য নেয়ার ফলে দাতাদের শর্তের চাপে বেসরকারিকরণের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে ঋণ অনুদানের ব্যাপক অন্তঃপ্রবাহ শহর ও গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের আর্থিক বৈষম্যকে প্রকট করে তুলেছে। ঋণ সাহায্যের তিন-চতুর্থাংশই দেশী-বিদেশী এলিট শ্রেণির ধনস্ফীতিতে সহায়তা করেছে, মাত্র এক-চতুর্থাংশ গরিব শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়েছে।

সীমিত সময়ের জন্য ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করে বিপণনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একই সাথে গ্রহীতা দেশগুলোকে চরমমাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলা হয় এ প্রক্রিয়ায়।

বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের সপক্ষে যুক্তিসমূহ : ঋণ প্রদান করা হয় শর্তসাপেক্ষ। শর্তগুলো গ্রহীতা দেশগুলোর জন্য সমস্যা তৈরি করে। ফলে ঋণের অর্থকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনার জন্য যে যুক্তি তাও শর্তহীন নয়। কারণ দাতাগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া শর্তসমূহের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ঋণের সুব্যবহারের যুক্তিও নির্ভর করবে শর্তের ওপর।

ঋণ সাহায্য তো পুঁজি– দক্ষ উপায়ে বিনিয়োজিত হলে পুঁজির মাধ্যমে মুনাফা লাভ সম্ভব, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশের মতো দেশে ঋণ সাহায্যকে কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, যদি বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত পুঁজি অর্থনীতিতে দক্ষভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়।

ঋণ সাহায্য সম্পর্কে যা বলা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থের যে পরিণতি হয় তার পার্থক্যের স্বরূপ ও কারণ উদ্‌ঘাটন করা হলে বৈদেশিক ঋণের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব। দাতাগোষ্ঠী যেসব শর্ত চাপিয়ে দেয় সেসব শর্ত অর্থনীতিতে কিরূপ প্রভাব ফেলবে তা নির্ণয় করা জরুরি। যেমন— একদিকে দাতাদের চাপিয়ে দেয়া শর্তের ভিত্তিতে বেসরকারিকরণের ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে

গেলে প্রবৃদ্ধি কমে যায়, উৎপাদনশীলতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও নষ্ট হয়, একই সাথে যদি ঋণ সাহায্য অবকাঠামো উন্নয়নের নামে শুধু অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ করা হয়, তাহলে অর্থনীতির উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সেক্ষেত্রে চাপিয়ে দেয়া শর্তের প্রভাবগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে ঋণ নেয়া হলে ঋণকে সঠিক খাতে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করা সম্ভব হয়।

দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে জাতীয় সুবিধা বিবেচনা করে ঋণের শর্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা ঋণ প্রাপ্তিকে সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা আত্মঘাতি হয়ে ওঠার আগেই ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট জাতীয় অবস্থান থাকা জরুরি।

যদি ঋণ সাহায্য সত্যিকারভাবেই সঞ্চয় বাড়ায় এবং বিনিয়োগ বাড়ায় তাহলে সেটি অবশ্যই স্বাগত জানানোর মতো ব্যাপার। কিন্তু যদি এমন কোনো পরিস্থিতি বা শর্ত থাকে, যা এ দুটো ঘটনা ঘটার পথে বাধাস্বরূপ, তবে সে শর্ত বাতিল, এবং পরিস্থিতি বদলে ফেলে ঋণ গ্রহণ করা ইতিবাচক।

ঋণ প্রবাহকে বেসরকারি ভোগ, আমদানি ব্যয়, সামরিক ব্যয় হিসেবে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা হলে মূলত উৎপাদনশীল পুঁজি গঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ঋণ প্রবাহকে যদি এভাবে ব্যয়িত হওয়ার প্রবণতা থেকে সরিয়ে এনে পুরো জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়, তবে বৈদেশিক ঋণ কাম্য।

দাতারা যেসব শর্ত আমাদের উন্নয়নের কথা বলে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়, সেগুলো তার দেশে কতখানি প্রয়োগ করা হয়, সেটা খতিয়ে দেখলে ঋণ প্রদানের সাথে তার কোনো আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা আছে কি না, তা বোঝা যায়। সুতরাং বাজার দখল হয়ে যাওয়ার কিংবা শিল্প ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকলে, দাতাদের সাথে শর্ত নিয়ে আলোপ-আলোচনা করে বোঝানো সম্ভব হলে, ঋণ সত্যিকার অর্থে পরার্থপ্রসূত হলে অবশ্যই ঋণ পাওয়া যাবে, যা আমাদের অর্থনীতিতে যেসব বিকাশমান প্রতিষ্ঠান আছে তার রক্ষাকবচ হতে পারে এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে।

যেসব পণ্য দেশের অভ্যন্তরেই পাওয়া যায়, যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়বন্ধন শর্ত সাপেক্ষে ঋণ নেয়া হলে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেক্ষেত্রে ক্রয়বন্ধন শর্তহীন ঋণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সত্যিকারে প্রয়োজনীয়।

দেশীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে পরিচিত দেশীয় জনগণের নিকট দায়বদ্ধ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হলে ঋণের একটি বড় অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। এ রোধকৃত অপচয় কর্মসংস্থান বাড়াবে, অর্থনীতিতে বেকার সমস্যার সমাধান হবে।

ঋণের অর্থ পুরোপুরিভাবে দেশীয় অভ্যন্তরে এনে তার পাচার রোধ করতে হবে। প্রাপ্ত ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে। যত বেশি ঋণের অর্থ ব্যবহার সম্ভব হবে অর্থনীতি তত লাভবান হবে।

প্রাপ্ত ঋণ ব্যবহারের জন্য আমলাতান্ত্রিকতা ও জটিলতা কমালেই ঋণের বণ্টনে জনগণের সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব। অভিজাতরা ঋণ সাহায্যের অধিকাংশই ভোগ করে, তাদের বাইরে নিয়ে আসার পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে ঋণের সাহায্য অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজে লাগানো উচিত। নব্য অভিজাত যারা মূলত ঐ ঋণের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে আছে তাদের বাইরের অপেক্ষাকৃত বেশি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে তা ভোগবিলাসের চেয়ে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগতে পারে। একমেরুকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী প্রান্তে সংযোজন করার পাঁয়তারা যদি

ঋণ সাহায্য দেয়ার মাধ্যমে করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক জোট বা বিশ্ব ভারসাম্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কৌশলগত ঐক্য বা জোট গঠনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। যেমন— কানকুন সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের জোটের প্রতিরোধের মুখে দাতাগোষ্ঠী অনেক শর্ত চাপাতে পারেনি।

সরকারগুলো যদি আন্তরিকভাবে জাতীয় উন্নয়নে ঋণের সদ্ব্যবহার করতে চায় তাহলে ঋণ সাহায্যকে সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা না করে বরং ঋণের মাধ্যমে দাতারা কি করতে চায়, সে সম্পর্কে জনগণকে সজাগ রাখা এবং ঋণ সাহায্যকে কি করে সবচেয়ে দক্ষ ব্যবহার করা সম্ভব তা জনগণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত।

বাংলাদেশের সমস্যা দাতাগোষ্ঠীর চোখ দিয়ে নয়, বরং আমাদের চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে তাদের পরামর্শের মধ্যে কোনগুলো গ্রহণযোগ্য বা কোনগুলো নয় তা নির্ণয় করা যায়। মোটকথা চাপিয়ে দেয়া শর্তকে যদি যৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান না করা যায়, তাহলে গলায় ফাঁসের মতো ঋণ নিয়ে আমাদের তেমন কোনো লাভ নেই। তবে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এখানে পুঁজির গতিশীলতা আনা যায়, যা এখনই অর্থনীতির জন্য হয়তো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। যদি সরকারের ও জনগণের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে বিকশিত করা সম্ভব হয় তবে অবকাঠামোগত এ উন্নয়নও দেশের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারবে।

ওপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের অর্থে কোনো সমস্যা নেই, বরং সমস্যা হলো স্বার্থসংঘাতে কিংবা আধিপত্যের কারণে। বিশ্বজনগণের প্রকৃত উন্নতির লক্ষ্যে শুধু পরার্থপরতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, যা অনুন্নত বিশ্বের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কাজে লাগতে পারে। যদি দাতাদের লক্ষ্য হয় ঋণের অপচয় কমানো আর গ্রহীতার লক্ষ্য হয় উন্নয়ন তবে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার অবকাশ এখনো আছে।

ঋণ সাহায্য বিনিয়োগযোগ্য, বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন করে অর্থনীতিকে অবশ্যই লাভবান করা সম্ভব। কিন্তু ঋণের থেকে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুফল আনয়নের জন্য ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মতামত সংগঠন জরুরি। ঋণ সাহায্যকে তো প্রত্যাখ্যান করার কিছু নেই, বরং প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় তা মোচনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। ভর্তুকি বন্ধের কারণে আমাদের কৃষি ও শিল্পের যে ক্ষতি হয়ে গেছে, সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়াও একই সাথে নীতি নির্ধারকদের কর্তব্য হওয়া উচিত।

১৩। ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কিরূপ প্রভাব রাখছে বলে আপনি মনে করেন? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতি উল্লেখ করুন।

উত্তর : বিশ্বক্ষমতার জ্যোতিকেন্দ্রের বিবর্তন ঘটছে অনেকটা নীরবেই। ক্ষমতাকাঠামোর কেন্দ্রে চলে আসছে ঐতিহাসিকভাবে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চল। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিশ্বযুদ্ধ নয়, প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প বিপ্লব নয়, একেবারেই শ্রমঘন বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে ভিত্তি করে বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রে চলে এসেছে চীন-ভারত-ব্রাজিল। ১৯৫০ সালে বিশ্ব জিডিপির ৬৮ শতাংশ ছিল ইউরোপ-আমেরিকার। ২০০৩ সালে তা নেমে যায় ৪৭ শতাংশে। আর বর্তমানে বিশ্ব জিডিপির ৪২ শতাংশের মালিক ইউরোপ-আমেরিকা, যা কি না ২০৫০ সাল নাগাদ ২০ শতাংশে নেমে আসবে। গত

পাঁচ দশকে শিল্পোন্নত 'G-7' ভুক্ত সাতটি রাষ্ট্রের বিশ্ব জিডিপিতে অংশীদারিত্ব ৩০ শতাংশ কমে গেছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ চীন-ভারত-ব্রাজিলের সম্মিলিত জিডিপি 'G-7'-এর থেকে বেশি হবে। চীন হবে যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে বিশ্বের পয়লা নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি। জাতিসংঘের 'world population prospects : the 2008 revision শিরোনামের রিপোর্টে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আশা জাগানিয়া এ রিপোর্ট দারিদ্র্যপীড়িত আফ্রিকা-দক্ষিণ এশিয়া-ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিপ্লবের হাতছানি দিচ্ছে।

ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট : ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপ্লবের মূল কারণ ছিল জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **তলোয়ারের ঝলকানি :** জনসংখ্যাই বদলে দেয় ইউরোপ-আমেরিকাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপনা কৌশলের আধিপত্য ছিল আমেরিকা-ইউরোপের। আর সামরিক ক্ষেত্রে আধিপত্য ছিল এশিয়ার। শুধু এতটুকু মনে রাখলেই চলবে, বলকান অঞ্চল, স্পেনসহ ইউরোপের এক বিশাল ভূখণ্ড আর আফ্রিকায় মুসলমানদের 'তলোয়ারের ঝলকানি' আজকের যুক্তরাষ্ট্রের মিসাইল বা ড্রোনের মতো অপ্রতিরোধ্য ছিল।

২. **রেনেসাঁ :** ইউরোপ-আমেরিকার অবস্থার প্রাথমিক পরিবর্তন ঘটে রেনেসাঁকে কেন্দ্র করে। প্রযুক্তির বিকাশ আর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মক্ষমতাকে পুঁজি করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথমে ইংল্যান্ডে, তারপর জার্মানি, ফ্রান্সসহ ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়। পণ্যের বাজার দখলের জন্য ইউরোপীয় বণিকরা ছুটেন ভারত-আরব-চীন-ব্রাজিল-আফ্রিকায়। ফলে ইউরোপ-আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিপ্লব দেখা দেয়।

৩. **সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পবিপ্লব :** ইউরোপীয় আধিপত্যবাদের প্রসারে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পবিপ্লব জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছে। আর এর প্রতিক্রিয়ার স্ফূরণ ঘটে অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

৪. **প্লেগ নিয়ন্ত্রণ :** ইউরোপের মহামরণ 'প্লেগ'-কে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ড-জার্মানি-ফ্রান্সে ঘটে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। বিস্ফোরিত জনসংখ্যার একটি বড় অংশ শ্রমিক হিসেবে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ ও কেন্দ্রীভবনে সহায়তা করেছে। আরেকটি অংশ বিশাল সেনাবাহিনীতে যোগদান করে বিশ্বব্যাপী ইউরোপের বাজার আর আধিপত্য নিশ্চিত করেছে।

৫. **পরিসংখ্যানে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও অর্থনৈতিক বিপ্লব :** অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ অ্যাংগাস মেডিসন (Angus Maddison) জানান, উনিশ শতক পর্যন্ত বিশ্ব জিডিপির ৩২ শতাংশ ছিল ইউরোপ-আমেরিকার। জনসংখ্যার বিস্ফোরণে ১৯৫০ সালে এ অংশীদারিত্ব দ্বিগুণ বেড়ে ৬৮ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯১৩ ইউরোপ-আমেরিকার জনসংখ্যা ছিল বিশ্ব জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ। আর জনসংখ্যা বিশেষত প্রাথমিক কর্মক্ষম জনসংখ্যার (১৫-৫৯ বছর) হার ক্রমেই কমে যাওয়ায় বিশ্ব জিডিপিতে ইউরোপ-আমেরিকার প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। জাতিসংঘের হিসাব মতে, ২০০৩ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ ছিল ইউরোপ-আমেরিকার। উনিশ শতক জুড়ে তা ছিল ২৫ শতাংশ। আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ এটি মাত্র ১২ শতাংশে দাঁড়াবে, যা কি না ১৭ শতকের চেয়েও কম। সংগত কারণেই তখনকার ৯০০ কোটি মানুষের বিশ্বে মাত্র ১২ শতাংশ অধিবাসী নিয়ে সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে না এ দুটি জনপদ। আবার ইউরোপের তখনকার জনগণের সিংহভাগ হবে বৃদ্ধ, অর্থনীতির ভাষায় যারা কি না spoil শ্রেণি।

বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রভাব : ক্রমবর্ধমান হারে বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **এশিয়ায় শিল্প বিপ্লবের যাত্রা :** বিশ্বে জনসংখ্যা এখন ৭০০ কোটির অধিক। ১৯৫০-এর দশকে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২০০ কোটি। গত ছয় দশকে কেবল চীন-ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে ২০০ কোটি। বিশাল এ জনসংখ্যা বদলে দিয়েছে চীন-ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো। সস্তা শ্রমকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র দুটি পুঁজির প্রাথমিক স্বল্পতা কাটিয়ে শিল্প বিপ্লবের পথে রয়েছে। আর ঠিক একই পথে রয়েছে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাসহ তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের ২৬টি রাষ্ট্র; যাদের গত দুই দশক গড় প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ বা তার বেশি।

২. **প্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্য হ্রাস :** জনসংখ্যা-কেন্দ্রিক পরিবর্তন প্রাচ্য আর পশ্চিমা বিশ্বে একই রকম নয়। শিল্পোন্নত ইউরোপ-আমেরিকায় জনসংখ্যা নেতিবাচক বৃদ্ধি লক্ষণীয়। মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার কমে যাওয়ায় ইউরোপ-আমেরিকা নির্মম হলেও সত্য, বৃদ্ধদের স্থবির আবাসভূমিতে পরিণত হতে পারে। ওয়াশিংটনভিত্তিক বিশ্বখ্যাত ফরেন অ্যাফেয়ার্স জার্নালে বলা হয়েছে, ২০৫০ সাল নাগাদ ৬০ বছর উর্ধ্ব লোকের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশ। আর জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ায় তা হবে ৪০ শতাংশ। পশ্চিমা কথিত বয়োবৃদ্ধ যন্ত্রণা (aging pains)'র সহজ অর্থ কর্মহীন বা অক্ষম ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষের ভারে বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য হারাবে নিদেনপক্ষে ৩০০ বছরের প্রবল পরাক্রমশালী নিউটন-আইনস্টাইন-রকফেলার-বিল।

৩. **বিশ্ব নির্মাণে নতুন নেতৃত্ব :** জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারুণ্যের নতুন শক্তি নিয়ে নতুন বিশ্ব নির্মাণে নেতৃত্ব দেবে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা। এ কেবল কল্পনা নয়, বাস্তবতা। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসই এ ঘটনার সাক্ষী এবং ধাত্রী।

৪. **ইউরোপের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা হ্রাস :** জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়া বাদে এশিয়ার সব রাষ্ট্রেই জনসংখ্যা ১ থেকে ২.৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। জন্মহার নেতিবাচক হওয়ায় ২০৫০ সাল নাগাদ ইউরোপ ২৪ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ হারাবে। আজকের তুলনায় বয়োবৃদ্ধের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে সেখানে।

৫. **যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস :** অভিবাসনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র কর্মক্ষম জনতার অভাব পূরণ করলেও ২০৫০ সাল নাগাদ সেখানে বৃদ্ধের সংখ্যা আজকের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। বিপুল এ বৃদ্ধদের ভরণপোষণ-নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্র গবেষণা, সামরিক খাত, বহির্বিশ্বে সাহায্যদানসহ প্রভাব বিস্তারের চলমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ হ্রাস করতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যে এ প্রবণতা শুরু হয়েছে।

৬. **ইউরোপ-আমেরিকায় অভিবাসন বৃদ্ধি :** কর্মক্ষম জনতার অভাব পূরণে ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়াসহ এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অভিবাসন ঘটবে ইউরোপ-আমেরিকায়।

৭. **চীন, ভারত ও লাতিন আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতা :** শ্রমিকের নিশ্চয়তা আর সহজলভ্যতার কারণে শিল্পের প্রধান কারখানাগুলো 'G-7' ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো স্থানান্তর করতে শুরু করছে এশিয়া আর লাতিন আমেরিকায়। জাপান ইতিমধ্যে হংকং ও থাইল্যান্ডে তার প্রধান শিল্প-কারখানাগুলো সরিয়ে ফেলেছে। লাতিন আমেরিকা আর চীন-ভারতের দিকে ঝুঁকছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত এটি স্পষ্ট বিশ্ব এক নতুন অর্থনৈতিক যুগ সন্ধিক্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রভাব : বাংলাদেশের সব সমস্যার 'জননী' ভাবা হয় জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে। এর পেছনে যে সত্যতা নেই তা নয়; তবে তা প্রথাগতভাবে বাড়িয়ে বলা হয়। উনিশ শতকে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিশাল 'বাংলা প্রদেশের' পূর্ব বাংলায় (আজকের বাংলাদেশ) জনসংখ্যা ছিল মাত্র এক কোটি। ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় তা ছিল চার কোটি। বাংলাদেশের উদ্ভবের সময় জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। চার দশক পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটিতে। অর্থাৎ এক শতাব্দীতে জনসংখ্যা বেড়েছে ১৬ গুণ। যখন জনসংখ্যা কম ছিল, সেই এক কোটি বাঙালির আবাসভূমিতেও 'নাখা-ভুখা' বাঙালি অপুষ্টি, অশিক্ষা, আশ্রয়হীনতা আর পাইকারি মৃত্যু জনপদ ছিল, অনেকটা আজকের মতোই। নিচে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রভাব আলোচনা করা হলো :

১. **খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন :** বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান দেশ। তাই বাংলাদেশের বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিতে মজুরি শ্রমের জোগান দিচ্ছে, যা দেশের খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করছে। এতে করে সহজেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।

২. **শিল্পের বিকাশ :** বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। এতে সহায়তা করছে বাংলাদেশের বিস্ফোরিত জনসংখ্যা। বাংলাদেশের শিল্প মালিকরা গার্মেন্টস শিল্পের জন্য সহজেই সস্তা শ্রমিক সরবরাহ করতে পারে। যা দেশের শিল্প বিকাশের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করছে।

৩. **পুঁজি গঠন :** কর্মক্ষম শ্রমিক অভিবাসনের মধ্য দিয়ে পুঁজির গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা ১১,৭২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রেরণ করেছে। বিশাল এ অর্থ ব্যয় হচ্ছে অবকাঠামো উন্নয়নসহ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন অন্বেষণের হিসাব মতে, ২০১০ সালে অভিবাসী শ্রমিকের ৭৩.৫৩ শতাংশ অদক্ষ, ২৩ শতাংশ দক্ষ, আধা দক্ষ ৩.১৯ শতাংশ। মাত্র ০.১ শতাংশ উচ্চতর পেশাজীবী শ্রেণি। প্রবাসী শ্রমিকের ৯৬ শতাংশ গমন করেছেন মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুরে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী ২০১৩ সালে প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের মধ্যে ৬৮৯ জন পেশাজীবী, ১,৩৩,৭৫৪ জন দক্ষ, ৬২,৫২৮ জন আধা-দক্ষ, ২,১২,২৮২ জন স্বল্পদক্ষ শ্রমিক রয়েছেন। এসব শ্রমিকের একটি বড় অংশ রাষ্ট্রগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছেন। বাংলাদেশ কার্যত ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমবাজার ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এ খাত থেকে ১,৮০০ কোটি ডলার প্রাপ্তির প্রাক্কলন করছে। এ আয় আরো বাড়ানো সম্ভব দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে।

৪. **নার্সের চাহিদা বৃদ্ধি :** বিশ্বে বিশেষত ইউরোপ-আমেরিকায় বৃদ্ধাশ্রমে নার্সের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে; যার বড় অংশটি ফিলিপাইন-থাইল্যান্ড-ইন্দোনেশিয়া জোগান দিচ্ছে। সরকার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে বাংলাদেশের নারীদের একটি বড় অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে এ সেবা খাতে, যার থেকে বাংলাদেশ ব্যাপক পরিমাণ রেমিট্যান্স অর্জন করতে পারবে।

৫. **রেমিট্যান্স অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতির সম্ভাবনা :** ফরেন অ্যাফেয়ার্স জার্নালের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে আগামী বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য নয়; উন্নত বিশ্বে শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা থাকবে। চীনে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে দেশটির জনগণের অভিবাসন কমে গেছে। তুরস্ক, মেক্সিকো ও ব্রাজিলের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয়দের অভিবাসনের মাত্রা যদিও এখনো উচ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে এ হার আগামী দশকেই কমতে থাকবে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। অর্থাৎ রেমিট্যান্স অর্জনের পঞ্চম স্থানে থাকা বাংলাদেশের সুযোগ রয়েছে প্রথম স্থান অধিকারের।

পরিশেষে বলা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যাকে যদি জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায় তবে এর উল্টোচিত্রও প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমনটা দেখা যায়, বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোতে। অতীতে যেমন ইউরোপ-আমেরিকা জনশক্তি কাজে লাগিয়ে বিশ্বে নিজেদেরকে 'সুপার পাওয়ার' হিসেবে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিল, বর্তমানে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়।

১৪ ॥ 'বিশ্ব বাণিজ্যে চীন একটি অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।'—এ উক্তির আলোকে আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন।

উত্তর : সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন ক্রমশই বিশ্ব অর্থনীতিতে হয়ে উঠছে এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিযোগী। বিশ্ব বাণিজ্যে গত দুই দশকে চীনের অবস্থান ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অভ্যন্তরীণ সমস্যা কাটিয়ে উঠে ৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে চীন যে বাণিজ্যমুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছিল তা আজ দেশটিকে বিশ্ব বাণিজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

দোং জাই পিং-এর সময়কালের শিল্পায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন জিয়াং জেমিনের সময়ে এসে চীনকে বিশ্ব বাণিজ্যের অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঐতিহাসিকভাবে সিল্ক রুটের উত্তরপুরুষ এ চীন বর্তমান বিশ্বে ও বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রাচীনকালে সিল্ক এবং চীনামাটির মাধ্যমে, পরবর্তীতে মধ্যযুগে পোর্সেলিন, আর আজকের বিশ্বে ভোগ্যপণ্য এবং যন্ত্রপাতি রপ্তানির মাধ্যমে চীন তার এ ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

চীনা অর্থনীতির বিকাশ : চীনের আজকের এ অবস্থান দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং ক্ষমতায় আসেন। তখনই চীনের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শিল্পসমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর ফলে তার চিন্তা সফল হয়নি। ১৯৭৮ সালে দোং জাই পিং ক্ষমতায় এসে অর্থনীতি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। দোং জাই পিং বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং যৌথ উদ্যোগে বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করেন। আর সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি ছিল সংরক্ষণমূলক। ফলে চীনে ক্ষুদ্রশিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। দীর্ঘ দিনের এককেন্দ্রিক অর্থনীতির ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বণ্টনব্যবস্থার সরলীকরণের ফলে শ্রমবাজারে তাদের একচেটিয়া সুবিধা গড়ে ওঠে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সস্তা শ্রম, পর্যাপ্ত কাঁচামালের প্রাপ্তি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা না থাকায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা চীনে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়। চীনের অর্থনীতি উদারিকরণের ফলে গত দু' দশকে চীনের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের অগ্রগতি তাকে পরাশক্তিতে পরিণত করেছে। আর বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যে চীন অর্থনৈতিক পরাশক্তি। ২০০২ সালে WTO-তে যোগদানের পর চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়েছে। আর গত দু' দশকে চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চারগুণ বেড়েছে। এ প্রবৃদ্ধির হার সত্যিই অবিশ্বাস্য।

চীনের উত্থানের কারণ : চীনের বর্তমান উত্থানের পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. **সংস্কার নীতি :** সমাজতন্ত্রের জাল ছিড়ে উদারনীতি গ্রহণের ফলে বর্তমানে চীন বিশ্বে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। বর্তমানে চীনে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। ফলে নিজেদের কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ হচ্ছে, অন্যদিকে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **সস্তা শ্রম :** বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১৩৯ কোটি ৩৮ লাখ। এ বিশাল জনসংখ্যাকে চীন জনশক্তিতে রূপান্তরিত করছে। কিন্তু চীনে শ্রমমূল্য অত্যন্ত কম। আর তাই বিদেশী বিনিয়োগকারীরা চীনে অধিক হারে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে। প্রায় ৯০ মিলিয়ন লোক প্রতিবছর কৃষি সেক্টর থেকে শিল্প সেক্টরে চলে আসছে।

৩. **বৈদেশিক বিনিয়োগ :** চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল কারণ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ। প্রতিবছর চীনে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬ সালে FDI-এর পরিমাণ ছিল যেখানে ১৩২ বিলিয়ন সেখানে ২০১০ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তবে চীনে যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হচ্ছে তা মূলত শ্রমনির্ভর সেক্টরে। চীনে যে পরিমাণ FDI হয় তার ৭০% পণ্যপ্রস্তুত খাতে এবং এ খাতের ৭০% আয় সরাসরি শ্রমনির্ভর খাতে হয়ে থাকে। এ ধরনের বিনিয়োগে চীন মূলত মধ্যস্থতা করছে এবং পণ্য তৃতীয় কোনো বাজারে চলে যাচ্ছে। শ্রমনির্ভর FDI আসার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো :

ক. চীনের ভৌগোলিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থান। চীন ভৌগোলিকভাবে এশিয়ার মূল অর্থনৈতিক কেন্দ্রে অবস্থিত। চীন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরের প্রতিবেশী। আর হংকং এবং বিতর্কিত তাইওয়ান তার নিজ ভূ-খণ্ড। এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক চালিকাশক্তি পীত সাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরের সুবিধা চীন পেয়ে থাকে।

খ. চীনের রয়েছে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক প্রভাব বলয়। জাপানসহ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্কৃতির মূল উৎস চীন। ফলে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং একই ধরনের আচারগত সাদৃশ্যের কারণে এ অঞ্চলের বিনিয়োগ মূলত চীনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

গ. বহির্বিশ্বে অবস্থানরত চীনাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ থেকে ৬০ মিলিয়ন। আর তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশাল অর্থনৈতিক সম্পদ। তারাও ব্যাপকহারে চীনে বিনিয়োগ করছে।

ঘ. চীনের ১৩৯ কোটি ৩৮ লাখ বিশাল জনসংখ্যা একটি বড় পণ্য বাজার। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৫ সালে চীনের গড় আয় যেখানে ছিল ২৮০ ডলার সেখানে বর্তমানে গড় আয় ৮,২১১ মার্কিন ডলার। ফলে বাজার বিস্তৃত হচ্ছে এবং গড়ে উঠছে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এ দ্রুত বেড়ে ওঠা বিশাল বাজার ধরতে চীনে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে।

৫. **অন্যান্য :** চীনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্থনীতির চাকাকে দ্রুত ঘোরাতে সাহায্য করছে। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফলে গড়ে ওঠা অবকাঠামো পরাশক্তি হওয়া ত্বরান্বিত করছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত কাঁচামাল এবং উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতি কম হওয়ায় চীনের উত্থান দ্রুত হচ্ছে।

বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের বর্তমান অবস্থানের কারণ : বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের পরাশক্তি হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সেগুলো হলো :

১. **বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগদান :** বিশ্ব বাণিজ্যে সুবিধা লাভের জন্য চীন WTO-তে যোগ দেয়। ২০০১ সালের ১০ নভেম্বর সদস্যপদ পাওয়ার পর থেকে কিছু যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়। চীন বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছু নতুন সেক্টর খুলে দেয়। এ সেক্টরগুলো হলো

টেলিকমিনিউকেশন, ব্যাংকিং ইনসুরেন্স এবং সেবামূলক খাত। তাছাড়া যে কোনো ফার্মকে পূর্ণ বাণিজ্য এবং বিতরণের সুবিধা দেয়া হয়। চীন TRIMs এবং TRIPS-এ যোগদানের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের আরো উৎকৃষ্ট স্থান বলে বিবেচিত হতে থাকে।

২. **উৎপাদন কাঠামোতে শীর্ষ অবস্থান :** বর্তমান বিশ্বে চীন কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে। যেমন– ধান, চা, গম, মৎস্য, প্রাকৃতিক জ্বালানি ব্যবহার, প্রাকৃতিক রাবার ব্যবহার, ইস্পাত, স্টিল, লোহা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম, স্বর্ণ, সিমেন্ট এসব উৎপাদনে চীন বর্তমানে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থান করছে। তাছাড়া চীন বর্তমান বিশ্বে শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অতএব এসব দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের বর্তমান অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জাপানকে টপকে চীন নিজেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

৩. **রপ্তানিনির্ভর বিনিয়োগ :** চীনে মূলত পণ্য প্রস্তুত এবং শ্রমিকনির্ভর খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাথে এখানেই চীনের পার্থক্য। এ বিনিয়োগের ফলে রপ্তানিনির্ভর বাণিজ্যব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ১৯৯৫ সালে রপ্তানিতে প্রক্রিয়াজাত বাণিজ্য ছিল ৫০%-এর বেশি। আর ২০০১ সালেও ৫০%-এর বেশি অংশ দখলে রাখে সে খাত। ১৯৯৬ সাল থেকে চীনে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর বৈদেশিক বিনিয়োগ হচ্ছে। যার ৯০%-এর বেশি পণ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে। ২০১৪ সালে রপ্তানি হয় ২.৩৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা রপ্তানি বিবেচনায় বিশ্বের শীর্ষ দেশ। সুতরাং রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **আমদানি বৃদ্ধি :** চীনের বৈদেশিক বিনিয়োগ যেহেতু রপ্তানিনির্ভর খাতে বেশি হচ্ছে সেহেতু আমদানিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ পণ্য প্রস্তুত এবং প্রক্রিয়াজাত করার কাঁচামাল চীন অভ্যন্তরীণ অংশ থেকে মেটাতে পারছে না। ১৯৮৫-২০০৩ সাল পর্যন্ত চীনে মোট বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৬১.৬৪%, যার ৬২.৪১% রপ্তানিতে এবং ৬০.৯০% আমদানিতে। চীনের এ আমদানি বাণিজ্য রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ সালে চীন আমদানি করে প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার, যা এশিয়ার সর্বোচ্চ আমদানি বাজার এবং ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৯৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে। অতএব চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নিজের জনগণেরও চাহিদা বাড়ছে। ফলে আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন— আয় বৃদ্ধির ফলে মোটরগাড়ির পরিমাণ বাড়ছে এবং তার সাথে তেলের চাহিদাও বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই প্রাকৃতিক জ্বালানি ক্রয়ে চীনের অবস্থান, যা বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

৫. **আঞ্চলিক বাণিজ্যে চীন :** চীন মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি করে থাকে। ফলে এশিয়ার সাথে উন্নত দেশগুলোর যে বাণিজ্য ঘাটতি তা পূরণের মাধ্যমে একদিকে এশিয়া এবং অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সেতুবন্ধন সৃষ্টির কাজ করছে। রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত থাকছে তা এশিয়ার নতুন শিল্পোন্নত দেশ জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং জার্মানির কাছ থেকে আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভারসাম্য স্থাপন করছে। তাছাড়া চীনের নন-প্রসেসিং বাণিজ্য বা সাধারণ বাণিজ্য তার অংশীদারদের সুযোগ করে দিচ্ছে। ২০০৪ সালের IMF-এর এক জরিপে দেখা যায়, চীনের সাধারণ বাণিজ্য তার ব্যবসায়ী অংশীদার বিশেষত এশিয়ার অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন— চীনের সাধারণ বাণিজ্য ১০% হ্রাস পেলে এশিয়ার GDP ০.৪% কমে যাবে।

৬. **চীনের বর্তমান প্রবৃদ্ধি :** চীনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯.৫% এবং এ ধারাবাহিকতা গত কয়েক বছর ধরে চলছে। তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩.৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একটি রেকর্ড এবং বিশ্বের প্রথম। চীনের অর্থনীতিতে যে প্রবৃদ্ধির হার তা ব্যতিক্রমী কিছু নয়। যদিও গত কয়েক বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে যে মন্দাভাব চলছে সেখানে চীনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত। বিশ্বে বৈদেশিক বিনিয়োগ যেখানে কমছে সেখানে চীনে এ বিনিয়োগ বাড়ছে। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্প অঞ্চলগুলোতে উৎপাদন খরচ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ সস্তা শ্রমভিত্তিক চীনে চলে যাচ্ছে। ফলে চীনের এ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রতিবছর ৯০ মিলিয়ন কৃষক শহরে কাজের জন্য আসছে এবং ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তাদের আয়ের অংশ হিসেবে দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের এ সচ্ছলতা এবং অর্থের সচ্ছলতা চীনকে অর্থনৈতিকভাব শক্তিশালী করছে।

সমস্যা : WTO-তে যোগদানের পর থেকে চীনে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলে চীনের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ যে কোনো সময়ে এ বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। তাছাড়া চীনে যে পরিমাণ FDI আসছে তা মূলত শ্রমনির্ভর এবং পণ্য তৈরি খাতে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর এ প্রবৃদ্ধির হার কমে আসবে। কারণ বাজার সীমিত। এছাড়া সংরক্ষণ নীতির ফলে চীন তার পণ্য সব দেশের বাজারে অবাধে নিতে পারছে না। এজন্য এক সময় তার উৎপাদন বেশি করেও লাভ হবে না।

তাছাড়া চীনের যে বাণিজ্য ঘাটতি আছে তা কমাতে হবে। চীন তার বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দ্বারা যে সেতুবন্ধনের কাজ করছে তার জন্য প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলোর সাথে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আর বর্তমান অবস্থায় চলতে গেলে চীনকে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে হবে। তাছাড়া এক দেশ দুই নীতি এ অভ্যন্তরীণ সংকট বলিষ্ঠভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে চীনে অভ্যন্তরীণ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে।

বিশ্বের ১৩% গরিব মানুষ শুধু চীনেই বসবাস করে। আর ১৫০ মিলিয়ন লোকের আয় দিনে ১ ডলারের নিচে। তাই চীনকে অনেক পথ এখনো পাড়ি দিতে হবে। যদিও গড় আয় বেড়ে ৮২১১ ডলার হয়েছে কিন্তু এর সুফল সবাই পাচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেশের মানুষ তা আশা করে। তাছাড়া যদিও দ্বৈত নীতি দ্বারা চালিত হচ্ছে চীন, তবুও তাকে পুঁজিবাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। অতীতের সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ভেঙে গেলে চীনের এ সফলতা আর সফলতা বলে পরিগণিত হবে না। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে বাণিজ্যিক পরাশক্তি হিসেবে তৈরি হতে এবং টিকে থাকতে চীনকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। পিছিয়ে থাকা অন্যান্য প্রদেশগুলোর সাথে আয় বৈষম্য কমাতে হবে এবং উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

১৫। 'চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে খর্ব করবে'– এ প্রসঙ্গে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

অথবা, **'চীন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির হুমকিস্বরূপ'– আলোচনা করুন।**

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর দেশটি বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ক্ষমতা ও প্রভাব সৃষ্টিতে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করেছে। সামরিক দিক দিয়ে যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী, তেমনি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম অবস্থানে

থাকলেও সে অবস্থানকে দিন দিন কেড়ে নিচ্ছে মাও সেতুং-এর গণচীন। ১৯৭৯ সালে চীন অর্থনৈতিক সংস্কার করার পরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে, যা সবাইকে বিস্মিত করে তোলে। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চললেও চীনের অর্থনৈতিক বিকাশের গড় হার ৮.৪৮ শতাংশে পৌঁছে। ২০০৯ সালে চীনের জিডিপির পরিমাণ ছিল ৪ দশমিক ৯৫ লাখ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১১ সালে চীনের জিডিপি বছরের প্রথমার্ধে ৯.৪% এবং দ্বিতীয়ার্ধে ৯.৫% বৃদ্ধি পায়। এভাবে চীনের মোট অর্থনৈতিক বিকাশের হার প্রায় ৮.৯%-এ পৌঁছোয়। যা ছাড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের অর্থনীতিকে। চীন বর্তমানে বিশ্বের প্রথম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

বিজনেস কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স বলেছিল, ২০২০ সালের আগেই অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাপিয়ে যাবে চীন। কিন্তু ২০১৪ সালের শেষের দিকেই যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায় চীন। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের খুচরা বিক্রি বাড়ে ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ। ঐ বছর চীনে ১ কোটি ৩০ লাখ মোটর গাড়ি বিক্রি হয়। ২০০৯ সালে চীনের শহর এলাকায় নতুন করে কর্মসংস্থান হয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯০ লাখ। ২০০৯ সালে কাজ ফিরে পেয়েছে লে অফ হওয়া ৫২.৫ লাখ শ্রমিক। এ সময় চীনের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকাঠামোগুলো শক্তিশালী করতে ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল। সে সময় চীন ৫৮ হাজার ৫০ কোটি ডলারের স্টিমুলাস প্যাকেজ রূপায়িত করেছিল। চীন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। গত এক দশক ধরে চীনের যে উদীয়মান অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ তা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে হুমকির সম্মুখীন করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

চীনের অর্থনৈতিক উত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ১৯৭৯ সালের আগে চীনে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ করা হতো। উৎপাদনের লক্ষ্য, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ প্রভৃতি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ১৯৫০-এর দশকে চীনের আবাসন শিল্পকে একত্রিত করা হয়। ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে চীনের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য ও মানবিক খাতে বিনিয়োগ করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭৮ সালে এসে দেখা যায় লক্ষ্যমাত্রার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অংশ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে চীনকে স্বাবলম্বী করা। আর এ জন্য চীন যেসব পণ্য উৎপাদন করে না সেসব পণ্যের আমদানি ছিল সীমাবদ্ধ, যাতে চীন ঐ সকল পণ্য উৎপাদন করে।

চীনে অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা হয় ১৯৭৯ সালের শুরুতেই। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করতে চীন সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, যাতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে সীমাবদ্ধ আকারে সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে। যাতে করে কৃষকরা তাদের শস্যের একটা অংশ মুক্তবাজারে বিক্রি করতে পারে। চীনে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে সরকার সমগ্র চীনকে চারটি জোনে ভাগ করে; রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করে এবং উৎপাদনের জন্য উচ্চ প্রযুক্তি আমদানিতে প্রলুব্ধ করে; অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভিন্ন খাতে। প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় সরকারকে মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করার এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণের পাশাপাশি উন্নয়নে উপকূলীয় অঞ্চল নগরকে মুক্ত ও নগর এবং উন্নত জোন হিসেবে চিহ্নিত করে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এসব অঞ্চলে মুক্তবাজার নীতি, কর প্রদানের উদারতা, বাণিজ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে সরকার।

এরূপ অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পূর্বের চেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চীন পরিণত হয় বিশ্বের দ্রুততম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রাষ্ট্রে। যেখানে সংস্কারনীতির পূর্বে ১৯৬০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত গড়ে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩ শতাংশ, তা সংস্কারের পরে ১৯৭৯ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে এসে দাঁড়ায় ৯.৭ শতাংশে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১০ সালে চীনের জিডিপি'র পরিমাণ ৫৮৭৮.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি বিশ্ব অর্থনীতির ৯.৪৮%-এর সমান। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৬০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চীনের জিডিপি গড়ে ৮৩৯.৩৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে প্রায় সকল সময়েই ৫৮৭৮.৬৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ড ধরে রেখেছে। একমাত্র ১৯৬২ সালে চীনের ৪৬.৪৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সর্বনিম্ন রেকর্ড রয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কার চীনকে পরিণত করেছে বিশ্বের শক্তিশালী বাণিজ্যিক দেশে।

চীনের গড় বার্ষিক প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার চিত্র

সময়	*গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)*
২০০৬	১০.৫
২০০৭	১২.০৮
২০০৮	৯.১৩
২০০৯	৮.৪৮
২০১০	১১.৯
২০১৪	৭.৪

এক সময়ে চীনের জনশক্তির সংখ্যা ছিল বেশি এবং তাদের মান ছিল নিম্ন। কিন্তু এখন চীনের শ্রমশক্তি কেবল সংখ্যায় বেশি বা সস্তাই নয়– শিক্ষিত, দক্ষ, উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক ও সুশৃঙ্খল। চীনে এখন দক্ষ শ্রমিক ও উদ্যোক্তার অভাব নেই। দেশে এখন বিপুলসংখ্যক তরুণ প্রকৌশলী তৈরি হয়েছে, যাদের নিয়োগ হচ্ছে বিদেশী কোম্পানিগুলোতে। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনের। এ সব ছাত্র লেখাপড়া শেষে অধিকাংশই দেশে ফিরে বিভিন্ন উচ্চপদে যোগ দেয় বা ব্যবসায়ে নিজেকে নিয়োজিত করে। সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত না হলেও চীন এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী নীতি গ্রহণ করেছে। সময়ের সাথে তাল মেলাতে বিশ্বে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চীন সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার অধিকার প্রদান করেছে। চীন তার রাজনৈতিক নীতিও পরিবর্তন করেছে। চীন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তনশীল, এ পরিবর্তনশীলতার সাথে তাল মেলাতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে, প্রতিবেশীর সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে নিয়ে আসতে হবে যাতে তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয় এবং ভবিষ্যতে চীনের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। এ লক্ষ্যে চীন পলিটব্যুরোতে নতুন প্রজন্মের সমাবেশ ঘটিয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টি রক্ষণশীলতা পরিহার করেছে। পুঁজিবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে না দিয়ে চীন নিজেকে পুঁজিবাদ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে তৈরি করছে। আর এজন্য সমাজতন্ত্রের বদ্ধ দুয়ার নীতি পরিহার করে বিদেশী পুঁজি সংগ্রহ, অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন, বিদেশী পর্যবেক্ষকদের জন্য চীনের বিখ্যাত

এলাকাগুলোকে পর্যবেক্ষণের জন্য খুলে দেয়াসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত দ্বার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে চীনে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার ব্যাপকতা খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। সব ধরনের গৃহস্থালি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যে কোনো লোক খোলা বাজার থেকে ক্রয় করতে পারছে।

চীন রক্ষণশীলতার গণ্ডি পেরিয়ে মুক্ত বাতাসের ছোঁয়ায় অভিষিক্ত হচ্ছে। চীন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি পরিবর্তিত ও যুগোপযোগী অর্থব্যবস্থার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। চীনের উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যে চীন এখন উদ্বৃত্ত দেশ। চীনের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। ১৯৮০ সালে চীনের রপ্তানি ছিল ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৯ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এবং ১৯৮০ সালের ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি, ২০০৯ সালে ৯২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারকে স্পর্শ করেছে। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এবং কার্যকর অর্থনৈতিক সফলতার ক্ষেত্রে বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিভিন্ন সময়ে চীনের আমদানি-রপ্তানি চিত্র (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

বছর	রপ্তানি	আমদানি	বাণিজ্য পরিমাপ/পার্থক্য
১৯৯০	৬২.৯	৫৩.৯	৯.০
১৯৯৫	১৪৮.৮	১৩২.১	১৬.৭
২০০০	২৪৯.২	২২৫.১	২৪.১
২০০৫	৭৬২.০	৬৬০.১	১০১.৯
২০০৬	৯৬৯.১	৭৯১.৫	১৭৭.৬
২০০৯	১,১৯৪	৯২১.৫	২৭২.৫
২০১৪	২৩৪০	১৯৬০	৩৮০

চীন-মার্কিন অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ তথ্য মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি ১৭.৭১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং চীনের হচ্ছে ১০.৩৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিডিপির তালিকায় শীর্ষে এবং চীন দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। তবে পিপিপির ভিত্তিতে চীনের অর্থনীতির আকার ২০১৪ সালে হলো ১৭.৬৩ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের বৃহত্তম। যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু জিডিপি ৫৪৭১০ মার্কিন ডলার (২০১৪), যা বিশ্বের ৯ম। শ্রমশক্তি রয়েছে ১৫৪.১ মিলিয়ন যা বিশ্বের চতুর্থ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারে বিশ্বের প্রথম স্থানে, ২০১৪ সালে ২.৩৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি করে বিশ্বের প্রথম অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন জিডিপির দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই অবস্থান দখল করেছে। পাশাপাশি এ দেশটি গত ত্রিশ বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতিপয় নীতি ও কৌশল পরিবর্তন করে খুব দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এ দেশটির মাথাপিছু জিডিপি ৮,২১১ মার্কিন ডলার (২০১৪), শ্রমশক্তি ৮১২.৭ মিলিয়ন যা বিশ্বে প্রথম, বিদ্যুৎ উৎপাদনও ব্যবহারে বিশ্বের দ্বিতীয় অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, চীন যে হারে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে চলেছে তাতে আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম স্থানে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। এর ফলে বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বিশ্বের একমাত্র একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকার তার ক্ষমতার হুমকি হয়ে দাঁড়াবে গণচীন।

চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক পার্থক্য

বিষয়	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		গণচীন	
	পরিমাণ	বিশ্বে অবস্থান	পরিমাণ	বিশ্বে অবস্থান
জিডিপি	১৭.৭১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৪)	১ম	১০.৩৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৪)	২য়
পিপিপি	১৭.৪১৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার	২য়	১৭.৬১৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার	১ম
জিডিপি (প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার)	-২.৪% (২০১৪)	১৫১তম	৭.৪% (২০১৪)	৪র্থ
জিডিপি (মাথাপিছু)	৫৪৭১০ মার্কিন ডলার (২০১১)	১১তম	৮২১১ মার্কিন ডলার (২০১৪)	১২৮ তম
শ্রমশক্তি	১৫৪.১ মিলিয়ন	৪র্থ	৮১২.৭ মিলিয়ন	১ম
বেকারত্বের হার	৯.৩% (২০০৯)	১০৮তম	৪.৩% (সেপ্টেম্বর ২০০৯)	৩৮তম
বিনিয়োগ (জিডিপির)	১২.৫%	১৪৩তম	৪২.৬%	৩য়
মুদ্রাস্ফীতি	(-) ০.৭%	১৩তম	(-) ০.৮%	৯ম
রিজার্ভ (সঞ্চিত অর্থ)	১৪৩ মার্কিন ডলার (২০১৪)	২৬	৩.৮৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৪)	১ম
শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার	(-) ৫.৫%	১১০তম	৮.১% (২০০৯)	৮ম
বিদ্যুৎ উৎপাদন	৪.১১ ট্রিলিয়ন (২০০৮) (কিলোওয়াট ঘণ্টা)	১ম	৩.৪৫১ ট্রিলিয়ন (কিলোওয়া ঘণ্টা)	২য়
বিদ্যুৎ ব্যবহার	৩.৪৭৩ ট্রিলিয়ন (কিলোওয়াট ঘণ্টা)	১ম	৩.৪৩৮ ট্রিলিয়ন (কিলোওয়াট ঘণ্টা)	২য়
তেল উৎপাদন	৮.৫১৪ মিলিয়ন	৩য়	৩.৭৯৫ মিলিয়ন	৪র্থ
তেল ব্যবহার	১৯.৫ মিলিয়ন	১ম	৭.৯৯৯ মিলিয়ন	৩য়
প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন	৫৮২.২ বিলিয়ন কিউবিক মিটার	২য়	৭৬.১ বিলিয়ন কিউবিক মিটার	১১তম
প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার	৬৫৭.২ বিলিয়ন কিউবিক মিটার	১ম	৮০.৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটার	১০ম
রপ্তানি	১.৬৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার	১২তম	২.৩৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার	১ম
আমদানি	২.৩৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার	১ম	১.৯৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার	২য়

এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপিতে কৃষিখাতের ১.২%, শিল্পের ২১.৯%, সেবা খাতের ৭৬.৯% অবদান; অপরদিকে চীনের জিডিপিতে কৃষিখাতের ১০.৯%, শিল্পের ৪৮.৬%, সেবা খাতের ৪০.৫% অবদান। চীনের শ্রমমক্তির ৩৯.৫% কৃষিতে, ২৭.২% শিল্পে ও ৩৩.২% সেবা খাতে নিয়োজিত। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমক্তির ০.৭% খামার, বন ও মৎস্য, ২০.৩% পোশাক, পরিবহন, ২৪.২% বিক্রয় ও অফিস এবং ১৭.৬% অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। সেখানে চীনের ৬% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বাজেট ১.৯১৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ব্যয় বাজেট ৩.৬১৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে চীনের রাজস্ব বাজেট ২.১১৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ব্যয় বাজেট ২.২৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কৃষি দ্রব্য হচ্ছে গম, ভুট্টা, ফলমূল, শাকসবজি, তুলা, গরুর মাংস, শূকর, হাঁস-মুরগি মাছ, বনজসম্পদ এবং প্রধান শিল্প হচ্ছে পেট্রোলিয়াম, স্টিল, মটর যন্ত্রাংশ, বিমান, কেমিক্যাল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রাংশ, কাঠ প্রভৃতি। চীনের কৃষিপণ্যের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, আলু, ভুট্টা, যব, চা, বাদাম, আপেল, তুলা, মাছ প্রভৃতি এবং প্রধান শিল্প হলো লোহা, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কয়লা, যন্ত্রাদি তৈরির যন্ত্র, পোশাক, পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট, কেমিক্যাল, সার, খেলনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র, পরিবহন, রেল, গাড়ি, জাহাজ, বিমান প্রভৃতি।

চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির কাছে হুমকি কি না

বিশেষজ্ঞরা চীন-মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এদের একপক্ষ মনে করেন চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনো হুমকি তো নয়ই, বরং বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মার্কিন অর্থনীতি দিন দিন ফুলেফেঁপে উঠছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরার মতো বা এর প্রতিদন্দ্বী হওয়ার মতো পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত এমন কোনো অর্থনৈতিক শক্তির আবির্ভাব হয়নি এবং ভবিষ্যতে হবে বলেও সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে তারা চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নেতিবাচক দিকগুলোকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন।

অন্যদিকে অপরপক্ষ মনে করেন চীন দিন দিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেভাবে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছে তাতে আগামী ২০-৩০ বছরে চীনের অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাবে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতি যেহেতু একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং একে অন্যের পরিপূরক, তাই চীন ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও প্রভাব ভোগ করে ভবিষ্যতে তাতে ভাগ বসাবে চীন। তারা চীনের সামরিক দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে চীনের অর্থনৈতিক সাফল্য এবং সম্ভাবনাসমূহকে জোরালোভাবে তুলে ধরেন। নিচে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও সমস্যাসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

প্রথমত, বিশ্ব অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখা যায় বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রভাব বা আধিপত্য বজায় রেখেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এক্ষেত্রে জিডিপি প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯ সালে −২.৪% থাকলেও ২০০৮ সালে ০.৪%, ২০১৪ সালে ২.৪% ছিল। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত ১০ বছরের জিডিপি হিসাব করলে দেখা যায় গড়ে প্রবৃদ্ধির হার ২% বা তার উপরে রয়েছে। তাছাড়া CIA (The World Factbook) পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, Stock of quasi-money, market value of publicly traded shares, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার, গবেষণায় বিশ্বে প্রথম অবস্থানে আছে। প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও গবেষণায় চীন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক এগিয়ে। প্রতিবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করে চলেছে। এদিক থেকে চীন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে চীন অনেক পিছিয়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

তৃতীয়ত, বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে ভবিষ্যতে জনসংখ্যাজনিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে চীনকে জনসংখ্যাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতে আরো অধিক হারে।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে গতিশীল সমাজব্যবস্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিত্যনতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করে চলেছে। এ দেশটির মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী। এ দেশের নাগরিকরা উন্নত সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সমাজে দুর্নীতি-সন্ত্রাস অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এদিক দিয়ে চীন সম্পূর্ণ ভিন্ন। চীনের সব মানুষই যেমন পরিশ্রমী নয়, তেমনি চীনের কিছু মানুষ আছে যারা দ্রুত ধনী হতে চায়– তার জন্য আশ্রয় নেয় দুর্নীতির।

পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী বাজার অর্থনীতির ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বাজার অর্থনীতির আর নিয়ন্ত্রণ নেই। বাজার অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে উন্নয়নশীল বিশ্ব সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করছে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে বিশ্বের বৃহত্তম জনবহুল রাষ্ট্র চীন। তার প্রমাণ চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। তাছাড়া গত দশ বছরে চীনে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০-এ চীনে বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৫ সালে ৩৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০৬ সালে এসে দাঁড়ায় ৭২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৪ সালে ১.৩৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে।

ষষ্ঠত, চীনে পূর্বের তুলনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হচ্ছে খুব দ্রুত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চীনের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে বিগত দিনগুলোর তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতি অনেক কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করছে। চীন ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে মোট রপ্তানির ১৭.৭%, হংকং ১৩.৩%, জাপান ৮.১%। অর্থাৎ রপ্তানির ক্ষেত্রে চীন সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি বেশি করে কানাডায় ২০.১% এবং আমদানি বেশি করে চীন থেকে। যেমন– চীন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সালে আমদানি করে মোট আমদানির ১৬.৪%, কানাডা থেকে ১৫.৭%, মেক্সিকো থেকে ১০.১%। অর্থাৎ আমদানির ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চীন প্রথম। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে চীনের সাথে। চীনের রয়েছে ১৩৯ কোটি ৩৮ লাখ জনসংখ্যার এক বিশাল বাজার। এ অবস্থায় চীন একটি সমূহ সম্ভাবনার দেশ।

সপ্তমত, প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও অন্যায়মূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে মার্কিনীদের প্রতি বিশ্ববাসীর মনোভাব নেতিবাচক হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এরূপ মনোভাব মার্কিন অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেবে। অনেক সময় দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে লাগলে তারা সংশ্লিষ্ট অপরাধী রাষ্ট্রের পণ্য গণহারে ব্যবহার বন্ধ করে দেয়, সংশ্লিষ্ট দেশের পতাকা পোড়ায়, নিন্দা করে। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীনের অবস্থান অনেক ভালো। মার্কিনীরা অন্য দেশের প্রতি সম্মান, সহানুভূতি দেখায় না। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে হুমকি দেয়, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে দ্বৈতনীতি গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধা করে না।

অষ্টমত, চীন ১৩৯ কোটি ৩৮ লাখ জনসংখ্যার এক বিশাল দেশ। কাজেই এখানে রয়েছে শ্রমশক্তির সহজ প্রাপ্যতাগত সুবিধা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ কোটি ২৬ লাখ জনসংখ্যা থাকলেও চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শ্রমশক্তির দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও আধিপত্য দীর্ঘদিনের, তবে এ কথাও ঠিক যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যত চীনের শক্তিমত্তার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর নতুন কোনো স্নায়ুযুদ্ধে অবতীর্ণ না হতেই বর্তমানে চীনের সাথে আপাতত রণকৌশলগত এবং একই সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে চীনও বর্তমান একমেরু বিশ্বব্যবস্থার ধারক মার্কিনীদের প্রতি যথেষ্ট সজাগ রয়েছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ের যেমন বহুবিধ সমস্যা রয়েছে তেমনি বহু সম্ভাবনাও রয়েছে। কাজেই চীন মার্কিন রাজনীতি ও অর্থনীতির হুমকি হয়ে দাঁড়াবে কি না তা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

১৫ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতিরেকে কিভাবে জাপান নিজেকে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছে—আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৬১ সালে প্রকাশিত Asian Survey-এর প্রথম সংখ্যায় 'Progress and Structural Change in Japanese Economy' শিরোনামে সিডনি ক্রকার (Sydny Crawcaur) পৃথিবী বিখ্যাত একটি নিবন্ধ রচনা করেন। নিবন্ধটিতে তিনি প্রমাণ করেন যে, 'বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি'ই জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। জনসংখ্যাধিক্য, অনুন্নত দেশসমূহ যাদের শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে উত্থান লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাদের জন্য জাপান আজ একটি 'ক্লাসিক্যাল মডেল'-এ পরিণত হয়েছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সত্তরের দশকের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই জাপানের ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৮০-এর দশকে জাপান পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে উত্থান লাভ করে এবং শিল্পপণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব দান করতে শুরু করে। জাপানের এই বিস্ময়কর উত্থানে বিস্মিত হয়ে অনেকেই দেশটিকে 'অর্থনৈতিক মিরাকল' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে জাপান সরকারের নীতিসমূহ এ অর্থনৈতিক মিরাকলের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া দেশটির জনগণ কৃষিপণ্যের উন্নয়নে যেমন আন্তরিকতার সাথে কাজ করে, তেমনি শিল্পপণ্য উৎপাদনে বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করে।

অর্থনৈতিক মিরাকল : জাপানের এক তরুণ অধ্যাপক Arisawa Hiromi ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাপানের শিল্পপণ্য উৎপাদনের হার ৮১.৫% বৃদ্ধিকে একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন হিসেবে বোঝানোর জন্য 'অর্থনৈতিক মিরাকল' শব্দটি ব্যবহার করেন। মূলত জাপানে মিরাকল শুরু হয় ১৯৬২ সাল থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে (১৯৪৬-১৯৭৬) জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি ৫৫ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীর সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ১০% জাপানই করতো। কিন্তু চার্লস কিন্ডলবারজার (Charles Kindleberger) জাপানের এ অর্থনৈতিক উত্থানকে মিরাকল বলতে আগ্রহী নন। তিনি এ উত্থানকে 'রিডল' (riddle) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি মনে করেন কেইনস ছাড়া জাপানের পক্ষে সম্ভব নয় কেইনসিয়ান নীতির জন্মদান করা। জাপানের এই অর্জনকে 'মিরাকল' হিসেবে স্বীকার করি আর না করি জাপান যে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে উত্থান লাভ করেছে এটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়।

অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপানের উত্থান : জাপান এক দিনেই অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে উত্থান লাভ করেনি। এটা ছিল একটা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। জাপানের এই উত্থানের পেছনে যেসব উপাদানের অবদান রয়েছে সে সমস্ত উপাদানের আলোচনা করতে হলে জাপানের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে হবে :

১. স্বৈরাচারী শাসনকাল (৬৬০ খ্রিস্টপূর্ব-১১৯২ খ্রিস্টাব্দ)
২. সামন্তবাদী শাসনকাল (১১৯২-১৮৬৮)
৩. মাইজি শাসনকাল
৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা এবং
৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা

১. **স্বৈরাচারী শাসনকাল :** এই সময়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও অন্যায় ছিল সাধারণ বিষয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' — এ নীতিই সবাই অনুসরণ করত। তাই অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না এবং তা ছিল সম্পূর্ণ আদিম।

২. **সামন্তবাদী শাসনকাল :** তকুগাওয়া শাসনামলে অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক এবং সামন্তবাদী চরিত্রের। এ সময়ে শিল্পকেন্দ্রিক শহরও বিকাশ লাভ করছিল। ঐ সময়ে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো জাপানের শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখে :
- সেচ ব্যবস্থাসহ নানা ধরনের খামার উন্নয়ন কৌশলের প্রবর্তন;
- সারের ব্যবহার;
- উত্তরাধিকারভিত্তিক দাসদের মজুরিভিত্তিক শ্রমিকে রূপান্তর;
- কাপড়, আসবাবপত্র, পদার্থ ও তরবারি শিল্পের বিকাশ এবং
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

এই উপাদানগুলোই সে সময়ে জাপানে কৃষিভিত্তিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

৩. **মাইজি শাসনকাল :** ১৯৬৮ সালে মেজি নামক এক মিলিটারি যুবক জাপানের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আর তখন থেকেই আধুনিক জাপানের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল :
- সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ;
- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বাধাসমূহ দূরীকরণ;
- শক্তিশালী সামরিক শক্তি;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণ এবং
- বিজাতীয়করণ।

এভাবে এ সময়ে জাপান আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিল্পভিত্তিক এক আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

৪. **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান বিস্ময়করভাবে তার অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলোর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম :
- মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি গ্রহণ থেকে বিরত থাকা;
- স্বর্ণমান পরিহার করা;
- প্রযুক্তিগত পূর্ণতা এবং
- শিল্পকারখানার দক্ষতা বৃদ্ধি।

এভাবে এ সময়ে জাপানের আমদানি ৩০% এবং রপ্তানি ৮৩% বৃদ্ধি পায়।

৫. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের অর্থনীতিতে এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় বয়ে আনে। কিন্তু নিম্নোক্ত উপায়ে জাপান তা পুনরুদ্ধার করে :

ক. **ম্যানুফেকচারিং ইন্ডাস্ট্রির দ্রুত বিকাশ :** ম্যানুফেকচারিং ইন্ডাস্ট্রির দ্রুত বিকাশ ছিল জাপানের অর্থনীতি উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ম্যানুফেকচারিং ইন্ডাস্ট্রির সূচক (১৯৬০ = ১০০) ৪৬ (১৯৫৫ সাল) থেকে ১৭১ (১৯৬৫ সাল)-এ বৃদ্ধি পায়।

খ. **বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে জাপান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য ২.০১ থেকে ৮.৪৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

গ. **দখলদার কর্তৃত্ব পরিচালিত বিভিন্ন সংস্কার :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দখলদার কর্তৃত্ব জাপানের অর্থনীতিতে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে। সেগুলো হলো :
- ভূমি সংস্কার;
- জায়বাটসু সিস্টেমের উচ্ছেদ এবং
- শ্রমিক আন্দোলনের প্রবর্তন।

এ সংস্কারগুলোও জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

ঘ. **প্রযুক্তি হস্তান্তর :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা জাপানে আধিপত্য বিস্তার করতে এসে নতুন নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর করে যা জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

ঙ. **বিনিয়োগ :** ব্যাপক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগও ছিল জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

চ. **রাষ্ট্রের ভূমিকা :** জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকাও ছিল ব্যাপক। রাষ্ট্র বাস্তবসম্মত শিল্পনীতি প্রণয়ন করে এবং ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এভাবে বিভিন্ন উপাদানের কারণে জাপানের উত্থান বর্তমানে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবেই নির্ণীত হয়েছে। জাপান সরকার, জাপানের জনগণের আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম জাপানকে আজকে পৃথিবীর বুকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মডেলে পরিণত করেছে। অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাপান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যদিও ২০১১ সালের মার্চের ১১ তারিখে সংঘটিত প্রলয়ংকরী সুনামিতে জাপানের বর্তমান অর্থনীতি কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন তথাপি জাপান সরকার তা কাটিয়ে ওঠার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের নিরাপত্তা নীতির প্রভাব : জাপানের এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জাপানকে এনে দিয়েছে অভাবনীয় সাফল্য ও ক্ষমতা। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর কোনো দেশ নেই, যার পক্ষে জাপানকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব। লর্ড একটনের ভাষায়, 'Power corrupts and absolute power corrupts absolutely'। যদি তাই হয় তাহলে জাপানের এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই প্রভাব ফেলতে পারে।

ইতিবাচক প্রভাব : জাপান তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে যদি এশিয়ার এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করে তাহলে তা হবে ইতিবাচক বিষয়। জাপান অর্থনৈতিক সাহায্য, প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য করে এসব দেশ ও তাদের জনগণকে অনর্থক অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রেখে এই অঞ্চলকে আরো নিরাপদ করতে পারে। আসিয়ানের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনৈতিক করিডোর সৃষ্টি করে এই অঞ্চলের দেশগুলোকে অস্ত্রের পরিবর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে আরো বেশি উৎসাহিত করতে পারে। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আসিয়ানকে শক্তিশালী করে তার অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা জোটও তৈরি করা সম্ভব।

নেতিবাচক প্রভাব : অন্যদিকে জাপান তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে যদি নিজের সামরিক শক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করে তৎকালীন জায়বাটসু গোষ্ঠীর মত তাহলে এই অঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হবে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে পড়বে।

আমরা জাপানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, অতীতে জাপান অনেক সময় আগ্রাসী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আজকের জাপান গণতান্ত্রিক জাপান। তাই যদি এই গণতান্ত্রিক জাপান তার আগ্রাসী নীতিকে সত্যিকার অর্থে পরিহার করে থাকে তবে জাপানের অর্থনৈতিক বিপ্লব হবে এই অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে। এর ব্যতিক্রম যদি হয় তাহলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ মুক্তবাজার অর্থনীতি কি?

উত্তর : মুক্তবাজার অর্থনীতি এমন এক অর্থনীতি যেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতি মূলত উদার গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এ ধরনের অর্থনীতিতে সিদ্ধান্তসমূহ প্রণীত হয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারীদের পরিবর্তে অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে কর্মরত গোষ্ঠীসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক। মুক্তবাজার অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য হয় অবাধ, মুক্ত ও হস্তক্ষেপবিহীন এবং কোনো রকম বিধি-নিষেধ থাকে না।

প্রশ্ন-০২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আদান-প্রদান বা আমদানি-রপ্তানিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। ভৌগোলিক বিশেষীকরণের ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি পার্থক্যের দরুন কোনো বিশেষ অঞ্চল বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা লাভ করে থাকে। যেসব দ্রব্য উৎপাদনে যে দেশের আপেক্ষিক সুবিধা রয়েছে সে দেশ সেসব দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং তা রপ্তানি করে তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করবে। এ ধরনের আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটে।

প্রশ্ন-০৩ অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) কি?

উত্তর : অবাধ বাণিজ্য বলতে এমন একটি বাণিজ্যিক নীতিকে বোঝায় যেখানে দেশীয় ও বৈদেশিক দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় না। ফলে বিদেশী দ্রব্যের ওপর অধিক শুল্কজনিত বাধা আরোপ করা হয় না এবং দেশীয় পণ্যসামগ্রীকে কোনোরূপ বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় না। অধ্যাপক জগদীশ ভগবতীর মতে, 'অবাধ বাণিজ্য বলতে এমন এক বাণিজ্যিক নীতিকে বোঝায় যেখানে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপাদান এবং ভোগের জন্য দ্রব্যের ওপর শুল্ক, কোটা, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, কর ও ভর্তুকি সংক্রান্ত কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় না।'

প্রশ্ন-০৪ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিগুলো কি কি?

উত্তর : অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যেসব যুক্তি রয়েছে সেগুলো হলো :

১. মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করতে।
২. স্বল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা লাভ করতে।
৩. উপাদানের আয় বৃদ্ধি করতে।
৪. উদ্বৃত্ত পণ্যের রপ্তানি সুবিধা লাভ করতে।
৫. একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিহত করতে।
৬. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে।

৭. উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বৃদ্ধি করতে।
৮. দ্রব্যমূল্যের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে।
৯. বিশ্বশান্তির সহায়ক হিসেবে।
১০. দেশীয় উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে।

প্রশ্ন-০৫ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কোনো একটি দেশের দুই বা ততোধিক অঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। পক্ষান্তরে, দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। উভয় বাণিজ্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য না থাকলেও মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যগুলো হলো :

১. প্রকৃতির সম্পদের ভিন্নতা,
২. ভিন্ন ধরনের বাজার,
৩. উপাদানের গতিশলিতায় বাধা,
৪. স্বতন্ত্র বাণিজ্য নীতি,
৫. বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা ও ব্যাংকব্যবস্থা এবং
৬. পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন-০৬ মুদ্রাস্ফীতি কি?

উত্তর : মুদ্রাস্ফীতি বলতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে বোঝায়। নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমবর্ধমানভাবে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাওয়াই মুদ্রাস্ফীতি। দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় বাজারে অর্থের যোগান বাড়লে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমূল্যর এরূপ বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। দেশে যে হারে উৎপাদন বাড়ছে তার তুলনায় অধিক হারে আর্থিক আয় ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যদি সাধারণ দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে সেরূপ অবস্থাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলে। অর্থনীতিবিদ 'ক্রাউথারের (Crowther) মতে, 'মুদ্রাস্ফীতি এমন একটি অবস্থা যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায়, অর্থাৎ দ্রব্যের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।' মুদ্রাস্ফীতি বলতে প্রায় সবাই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বৃদ্ধির অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। তবে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই যে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে এমন কোনো কথা নেই। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বা মানুষের অর্থ সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তবে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে না।

প্রশ্ন-০৭ মুদ্রাসংকোচন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : মুদ্রাসংকোচন কথাটির অর্থ মুদ্রার দাম বেশি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বিপরীতে স্বাভাবিক দামস্তরের তুলনায় প্রচলিত দামস্তর কম হওয়া।

দেশে যখন দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অর্থের যোগান বা আর্থিক ব্যয় প্রবাহ কম হয় তখন দামস্তর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নিম্নগামী হতে থাকে। সাধারণ দামস্তরের এ ক্রমাগত হ্রাসকে মুদ্রাসংকোচন বলে।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন বলেন, 'অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও ব্যয়ের হ্রাসকে মুদ্রাসংকোচন বলা হয়।' (By deflation we mean a time when most prices and costs are falling.)

অর্থনীতিবিদ পল এইনজিগ (Paul Einzig) বলেন, 'মুদ্রাসংকোচন হলো এমন একটি ভারসাম্যহীনতার অবস্থা যেখানে দামস্তরের নিম্নগতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্থনৈতিক শক্তি সংকুচিত হয়ে আসে।'

মুদ্রাসংকোচনের সময় দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের চেয়ে তার চাহিদা ও মোট ব্যয় হ্রাস পায় এবং মজুদ বাড়ে। ফলে দামস্তর কমে এবং অর্থের মূল্য বাড়ে। এ অবস্থায় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন হ্রাস পায় এবং আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ সংকুচিত হয়।

প্রশ্ন-০৮ ডাম্পিং কি?

উত্তর : অর্থনীতির পরিভাষায় দেশীয় বাজারের চেয়ে কম দামে কোনো দ্রব্য বিশ্ববাজারে বিক্রয়ের নাম হচ্ছে ডাম্পিং। বিভিন্ন দেশ নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডাম্পিং সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ভূমিকা না নিলেও এন্টি ডাম্পিং বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী কোনো দেশের সরকার যদি মনে করে তার নিজের দেশের শিল্পকারখানা হুমকির সম্মুখীন তাহলে ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিতে পারবে। তবে ঐ দেশের সরকারকে দেখাতে হবে যে, অভ্যন্তরীণ বাজারের চেয়ে কত কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে এবং তা কিভাবে অভ্যন্তরীণ শিল্প-বাণিজ্যকে ক্ষতি করছে। ডাম্পিং পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ শিল্পকারখানাকে বাঁচানোর জন্য আমদানিকারক দেশ প্রয়োজনে আমদানি দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবে। এ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ কোনো নির্দিষ্ট দেশের কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-০৯ ট্যারিফ কি?

উত্তর : কোনো আমদানি বা রপ্তানিজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি শুল্কই হচ্ছে ট্যারিফ। অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা, যাতে সরকার কর্তৃক আমদানি-রপ্তানির ওপর আরোপিত কর নির্দিষ্ট করা থাকে।

প্রশ্ন-১০ পণ্য বিনিময় চুক্তি কি?

উত্তর : পণ্য বিনিময় চুক্তি (Barter Agreement) হলো এমন এক চুক্তি, যেখানে কোনো দ্রব্য আমদানি করে তার বিনিময়ে কোনো দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, অথবা লেনদেনের কোনো প্রয়োজন ঘটে না। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ দু দেশের ব্যবসায়ীদেরকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের চুক্তি করার অধিকার প্রদান করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো অনেক সময় এরূপ চুক্তির সাহায্যে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাতো।

প্রশ্ন-১১ কার্টেল (Cartel) কি?

উত্তর : বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই ধরনের পণ্যে ও একই ধরনের ব্যবসায় একে অপরের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা না করার চুক্তিই হলো কার্টেল (cartel)। প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য, উৎপাদনসীমা, ক্রেতা নির্ধারণ, বাজার এলাকা নির্ধারণ ইত্যাদি যৌথভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয় এবং সাধারণত অবৈধভাবে ব্যবসায়িক গোপন চুক্তি করে থাকে। এরূপ সংঘবদ্ধ হয়ে চুক্তি করাকেই কার্টেল বলা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে একচেটিয়া স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই কার্টেল গঠন করা হয়।

প্রশ্ন-১২ 'রুলস অব অরিজিন' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : 'রুলস অব অরিজিন' হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনসহ অনান্য বিষয়ে নীতি নির্ধারিত হয়। ২০০৫ সালে সাফটা কার্যকর করতে নেপালে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের ১২তম বৈঠকেই 'রুলস অব অরিজিন' নিয়ে সার্কের অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ— ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা এবং স্বল্পোন্নত দেশ– বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভুটানের প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের জন্য যথেষ্ট দর-কষাকষি হয়

এবং এ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হন। এর আওতায় তারা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য রপ্তানি পণ্যে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা দানে সবাই একমত হয়। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে ১০ শতাংশ বাড়তি সুবিধা পায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলো এ ক্ষেত্রে আগে বাড়তি সুবিধা দাবি করলেও 'প্রডাক্ট স্পেসিফিক রুল' (পিএসআর) এবং 'রিজিওনাল কিউমুলেশন'-এর মাধ্যমে এ সুবিধা দানে ঐকমত্য হয়। সদস্য দেশগুলোর স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকায় থাকা প্রায় ২০০ পণ্যকে 'পিএসআর'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পিএসআর অনুসারে এসব পণ্যের বেলায় ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ রাখা হয়। সুতরাং দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য (সাফটা) কার্যকর করতে এই 'রুলস অব অরিজিন' যথাযথভাবে পালিত হলে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা গতিশীলতা লাভ করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন-১৩ অবমূল্যায়ন কি?

উত্তর : কোনো দেশের মুদ্রার মূল্য অন্য কোনো দেশের মুদ্রা বা মুদ্রা-ধাতুর (স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি) তুলনায় হ্রাস করাই হলো মুদ্রার অবমূল্যায়ন বা Devaluation. কোনো লেনদেনের ভারসাম্যের মুদ্রার বিরূপ অবস্থা দেখা দিলে রপ্তানিকে উৎসাহিত করা এবং আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবমূল্যায়ন সমস্যার কোনো স্বাভাবিক সমাধান নয়। কারণ অবমূল্যায়নের পুনরাবৃত্তি ঘটলে বিদেশের কাছে অবমূল্যায়নকারী দেশের মুদ্রা সম্পর্কে আস্থাহানি ঘটে। তাছাড়া অবমূল্যায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং আনুপাতিক হারে মানুষের আয় না বাড়লে মানুষের কষ্টও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের পণ্য বিদেশীরা কম দামে আমদানি করতে পারে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে উক্ত দেশে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেশি পড়ে। সুতরাং রপ্তানিকে উৎসাহিত, আমাদানিকে নিরুৎসাহিত এবং সে সাথে লেনদেনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণেই কেবল মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৪ ভূ-অর্থনীতি কি?

উত্তর : একটি দেশ বা অঞ্চলে অর্থনীতি তার ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিন্যাস মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার অনেকক্ষেত্রে এক একটা অঞ্চলের নদনদী, তেল-গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের আকর, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাগরের অবস্থান, বন্দর সুবিধা, কাঁচামাল ও শিল্পের অবস্থান ইত্যাদি এমনভাবে বিন্যস্ত যে, এরূপ অঞ্চলে সেক্টর বিশেষে বা কতিপয় সেক্টরে কোনো একক রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণের বদলে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্র কর্তৃক সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ সকলের জন্য অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শিল্পায়ন, আন্তঃকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সম্পদ ও সুবিধাদির প্রাপ্যতার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা উচিত বলে অনেকে ধারণা করেন। এ ভৌগোলিক অবস্থান, সুবিধাদি ও সম্পদভিত্তিক অর্থনীতিকেই বলা হয় ভূ-অর্থনীতি।

প্রশ্ন-০১ আঞ্চলিকতাবাদ কি?

উত্তর : আঞ্চলিকতাবাদ হলো কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার আন্তঃপ্রক্রিয়া তথা অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যবদ্ধতা। এর সাথে শুধু রাষ্ট্রসমূহের ভৌগোলিক নৈকট্যই জড়িত নয়, বরং এক ধরনের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাদৃশ্যও জড়িত।

টীকা

♦ Purchasing Power Parity *[২৩তম বিসিএস]*

ক্রয়ক্ষমতা সমতা বা পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (Purchasing Power Parity) আন্তঃদেশীয় মুদ্রার প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপের একটি জনপ্রিয় সূচক। এটি একটি তত্ত্বীয় পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুটি ভিন্ন মুদ্রা দীর্ঘমেয়াদে বিনিময় হারের সাহায্যে তাদের ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা সমতার তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী বিনিময় হার-ই মূলত ঐ দুই মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার হার। ১৯১৮ সালে সুইডেনের অর্থনীতিবিদ গুস্তাফ কাসেল এই তত্ত্বটি প্রচার করেন। এটি একটি পণ্যের একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ বাজারে, কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের একটিই মাত্র মূল্যমান থাকবে। পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি একটি জনপ্রিয় অর্থনৈতিক সূচক এবং যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা দেশসমূহের তুলনাযোগ্য জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই সূচকটি প্রায় ব্যবহার করে থাকে, তবু এর সমর্থনে গবেষণালব্ধ ফলাফল আদৌ নিরঙ্কুশ নয়। গত প্রায় ১০০ বছরে এ তত্ত্বটি নিয়ে শত শত গবেষণা হলেও নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে বাস্তবে এ তত্ত্বটি প্রমাণযোগ্য।

♦ জিএসপি (GSP) *[২২তম বিসিএস]*

GSP-এর পূর্ণরূপ Generalized System of Preference। জিএসপি একটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুবিধার নাম। এটি একটি অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা। GSP মূলত সাধারণীকৃত অগ্রাধিকার ব্যবস্থা। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশেষ অগ্রাধিকার পায় তাকেই বলে GSP। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের পোশাক আমদানির ক্ষেত্রে জিএসপি পদ্ধতি আরোপ করে, যার ফলে বাংলাদেশ ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইইউভুক্ত দেশসমূহতে শুল্কমুক্ত পোশাক রপ্তানি করতে পারতো। এ পরিস্থিতির আলোকে বলা যায় মূলত ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত কোটামুক্ত সুবিধা কাজে লাগাতে পেরেছে। কিন্তু এর পরবর্তী পোশাক শিল্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে কৌশলগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। উল্লেখ্য, জিএসপি পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত পায়। এসব সুযোগ-সুবিধা হারানোর কারণে বাংলাদেশ ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে পোশাক শিল্পের ব্যবসায় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে প্রয়োজন পণ্যের মান উন্নত করা এবং কৌশলগত বাণিজ্যিক পদ্ধতি অনুসরণ।

♦ জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) *[৩২তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal—MDG) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেট সহ সব ধরনের উন্নয়ন

কর্মসূচিতে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং সাফল্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন– CPD সহ অন্যান্যরা সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং চলমান পরিস্থিতিতে এ লক্ষ্য অর্জন আশানুরূপ নয় বলে মনে করেন। জাতিসংঘ গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ৮টি লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যসমূহ হলো :

লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।
লক্ষ্য-২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।
লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।
লক্ষ্য-৬ : এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

♦ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) *[৩২তম বিসিএস]*

১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য দেশভিত্তিক PRSP—Poverty Reduction Strategy Papers কার্যক্রম গ্রহণ করে, যার বাংলা করা হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। এখানে ২০০০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি' যেসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের টার্গেট নিয়েছে তার বাস্তবায়নের পথ সুগম করার কথা বলা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা, যা মূলত সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থায়ীকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোর দেয়। এটি মূলত ৮টি বিষয়ের ওপর জোর দেয়, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের বড় সমস্যা। এগুলো হলো : ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২. পুষ্টি, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৪. সুশাসন, ৫. মাতৃ স্বাস্থ্য, ৬. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৭. দুর্নীতি দমন, ৮. সবসময় তদারক করা (ওপরের বিষয়গুলো)। প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে ২৩ অক্টোবর ২০০৮ শিক্ষা ও কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুমোদন করে সরকার। এ পিআরএসপির মেয়াদ তিন বছর, অর্থাৎ ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত। তিন বছর মেয়াদি এ দলিলকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক জাতীয় পরিকল্পনার বা দারিদ্র্য বিমোচনের দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পর জুলাই ২০১২ থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

♦ আঙ্কটাড (UNCTAD)

UNCTAD-এর পূর্ণরূপ United Nations Conference on Trade and Development। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডে জেনেভায়। প্রধানের পদবি মহাসচিব। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করাই এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

♦ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)

UNDP-এর পূর্ণরূপ United Nations Developement Programme. এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়কে। সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সাহায্য করা।

♦ ভিওআইপি

ভিওআইপি'র পূর্ণরূপ হচ্ছে Voice-over-Internet Protocol. এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফোন বা মোবাইল দিয়ে বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশে কথা বলা এমনকি একই দেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কথা বলার একটি পদ্ধতিবিশেষ। তবে অবশ্যই ইন্টারনেট থাকতে হবে। এ পদ্ধতিতে দেশ থেকে বিদেশে কথা বললে অরিজিনেশন এবং বিদেশ থেকে বাংলাদেশে কথা বললে টারমিনেশন হয়। বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে (অরিজিনেশন) কল করলে ইন্টারনেটের খরচসহ ঐ দেশের লোকাল কল মূল্য বা কোনো দেশে যদি লোকাল কলের মূল্য না থাকে তবে ফ্রি কল করা যায়। এতে নামমাত্র ইন্টারনেট বিল আসে।

♦ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO) *[২৮তম; ২৩তম; ২২তম; ১৭তম বিসিএস]*

WTO-এর পূর্ণরূপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)। এর পূর্ববর্তী সংস্থার নাম ছিল গ্যাট (General Agreement on Tariffs and Trade সংক্ষেপে GATT)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। এই মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের পর বিশ্ব বাণিজ্যে ধস নামে। যুদ্ধদানবের দাপাদাপিতে অধিকাংশ দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ধস নামে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। এ প্রেক্ষিতে সুষম বাণিজ্য বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ সময়ে পুঁজিবাদী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্র রোধকল্পে এবং অর্থনৈতিক উপনিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শহর ব্রেটন উডসে মিলিত হয়। 'ব্রেটন উডস কনফারেন্সে' তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংস্থা তিনটি হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) ও আইটিও (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা)। ব্রেটন উডস সম্মেলনে প্রথম দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন না পাওয়াতে আইটিও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। আইটিও যখন প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না, তখন আইটিওর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালে জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্যনীতি নিয়ে বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাত্র ২৩টি দেশ তাতে প্রাথমিকভাবে স্বাক্ষর করে। এ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৩টি দেশে গ্যাট (GATT) কার্যকর হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী শুল্ক ও বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে গ্যাট চুক্তিতে ব্যাপক সংশোধনী আনয়ন করা হয়। একটি সর্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসার ও উদারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির আলোকে ধারাবাহিক ব্যাপক আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৫ এপ্রিল ১৯৯৫ মরক্কোতে ১২৪টি দেশের এবং ইউরোপিয়ান কমিউনিটির প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলনে মারকাস ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় বহুজাতিক এবং অনেক চুক্তির মূর্ত প্রকাশ হিসেবে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫৯।

♦ AIIB চীনের বিশ্বব্যাংক

এশিয়ার দেশগুলোর বিভিন্ন অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিকল্প হিসেবে গঠিত হয়েছে চীনের প্রস্তাবিত নতুন ব্যাংক 'এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক' (Asian Infrastructure Investment Bank–AIIB)। ২৪ অক্টোবর ২০১৪ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশসহ ২১টি দেশ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী দেশগুলো আনুষ্ঠানিক আর্টিকেলস অব এগ্রিমেন্টে (AOA) স্বাক্ষর ও অনুমোদন করার পর নতুন ব্যাংকটি ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে, যার মূলধন হবে ১০ বিলিয়ন ডলার।

AIIB-এর সদর দপ্তর হবে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে। ব্যাংকটির প্রধান পদের নাম প্রেসিডেন্ট। ব্যাংকটির কাঠামো ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে— ১. বোর্ড অব গভর্নর্স, ২. বোর্ড অব ডিরেক্টর্স ও ৩. ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা। ব্যাংকের সব ক্ষমতা থাকবে বোর্ড অব গভর্নর্সের কাছে। এ কমিটি যে কোনো দেশের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে। এছাড়া কোনো দেশকে ঋণ দেয়ার প্রস্তাবও পাস করবে এ কমিটি। একই সাথে যত ধরনের নীতিমালা করা হবে, তা এ বোর্ড অব গভর্নর্স তৈরি করবে। এশিয়া অঞ্চলের অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়ন করা হলো ব্যাংকটির গঠনের মূল লক্ষ্য।

১৫ এপ্রিল ২০১৫ AIIB-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসেবে ৫৭টি দেশের নাম প্রকাশ করা হয়। দেশগুলো হলো—

- **এশিয়া ➤** বাংলাদেশ। ভারত। মালদ্বীপ। নেপাল। পাকিস্তান। শ্রীলংকা। আজারবাইজান। ব্রুনেই। কম্বোডিয়া। চীন। ইন্দোনেশিয়া। ইরান। ইসরায়েল। জর্ডান। কাজাখস্তান। কুয়েত। কিরগিজস্তান। লাওস। মালয়েশিয়া। মঙ্গোলিয়া। মিয়ানমার। ওমান। ফিলিপাইনস। কাতার। দক্ষিণ কোরিয়া। সৌদি আরব। সিঙ্গাপুর। তাজিকিস্তান। থাইল্যান্ড। তুরস্ক। সংযুক্ত আরব আমিরাত। উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম।
- **ইউরোপ ➤** অস্ট্রিয়া। ডেনমার্ক। ফিনল্যান্ড। ফ্রান্স। জর্জিয়া। জার্মানি। আইসল্যান্ড। ইতালি। লুক্সেমবার্গ। মাল্টা। নেদারল্যান্ডস। নরওয়ে। পোল্যান্ড। পর্তুগাল। রাশিয়া। স্পেন। সুইডেন। সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য।
- **আফ্রিকা ➤** মিসর ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **দক্ষিণ আমেরিকা ➤** ব্রাজিল।
- **ওশেনিয়া ➤** অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

♦ নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB)

২৬-২৭ মার্চ ২০১৩ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত ৫ম BRICS শীর্ষ সম্মেলনে একটি ব্যাংক চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৫-১৬ জুলাই ২০১৪ ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শহরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ BRICS শীর্ষ সম্মেলনে BRICS ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আসে। ১৫ জুলাই ২০১৪ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রৌউসেফ নতুন এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন, যার নাম রাখা হয় New Development Bank (NDB)।

বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তহবিল জোগানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সংকটকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় NDB। নতুন এ ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরো বেশি ঋণ দেয়া, যাতে তারা অবকাঠামো উন্নয়ন এগিয়ে নিতে পারে।

প্রাথমিকভাবে NDB চালু হবে ৫০ বিলিয়ন ডলার মূলধন নিয়ে। আর জরুরি মুদ্রা তহবিলেও থাকবে ১০০ বিলিয়ন ডলার। উন্নয়নশীল দেশগুলো তারল্য সংকট কাটাতে স্বল্প মেয়াদে ঐ তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবে। ২০১৬ থেকে ঋণ দেয়া শুরু করবে এ ব্যাংক।

নবগঠিত এ উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর হবে চীনের সাংহাইয়ে। আর আফ্রিকা মহাদেশে ব্যাংকের আঞ্চলিক সদর দপ্তর থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট হবেন একজন ভারতীয়। আর বোর্ড অব গভর্নর্স-এর প্রথম চেয়ারপার্সন হবেন রাশিয়া থেকে এবং বোর্ড অব ডিরেক্টর্স প্রথম চেয়ারপার্সন হবেন ব্রাজিল থেকে।

♦ আঞ্চলিকতাবাদ

'আঞ্চলিকতাবাদ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Regionalism', আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি নতুন প্রপঞ্চ। আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান। বর্তমানে বিশ্বের সব প্রান্তেই আঞ্চলিকতাবাদের জোয়ার বইছে। বৃহৎ শক্তিবর্গ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোও আঞ্চলিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। আঞ্চলিকতাবাদের মূল কথা হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কতিপয় রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ অঞ্চলের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আঞ্চলিকতাবাদের শক্ত উদাহরণ। এছাড়াও রয়েছে– সার্ক, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরব লীগ, ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন, আসিয়ান, ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস (UNASUR) ইত্যাদি।

♦ বিশ্ব দারিদ্র্য

১০ এপ্রিল ২০১৪ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জি ইয়ং কিম ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বসন্তকালীন বৈঠকে দরিদ্র মানুষের প্রতিবেদন তুলে ধরেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের ১০০ কোটির বেশি মানুষ চরম দরিদ্র। দৈনিক ১ ডলার ২৫ সেন্টের নিচে উপার্জনকারী জনগোষ্ঠীকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ধরা হয়।

সর্বাধিক দরিদ্র মানুষের আবাসস্থল		দারিদ্র্যের ঘনত্বে শীর্ষ দেশ	
দেশ	শতকরা হার	দেশ	শতকরা হার (নিজ দেশে)
১. ভারত	৩৩%	১. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	৮৮%
২. চীন	১৩%	২. লিবিয়া	৮৪%
৩. নাইজেরিয়া	৭%	৩. বুরুন্ডি	৮১%
৪. বাংলাদেশ	৬%	৪. মাদাগাস্কার	৮১%
৫. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	৫%	৫. জাম্বিয়া	৭৫%

♦ গণমাধ্যম

সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন– এই তিনটি তথ্য ও বিনোদনমাধ্যম জনগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় বলে এই তিনটিকেই বলা হয় গণমাধ্যম। যেমন– ইউরোপের ৯৫% গৃহেই টেলিভিশন রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দু-দশকে আরও একটি মাধ্যমের উদ্ভব ঘটে। সেটি হলো কম্পিউটার মাধ্যম। এই মাধ্যমটি ইতিমধ্যেই অন্য সকল মাধ্যমকে সমৃদ্ধতার দিক থেকে অতিক্রম করে গেছে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথ্য প্রবাহের ধারাকে বলা হয় তথ্য মহাসড়ক (Information Superhight way)। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে কম্পিউটারও এখন অধিকাংশ গৃহে পৌঁছে গেছে এবং গণমধ্যমে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বেও এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম সৎ ও নিরপেক্ষ হলে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারে, পারে শাসকদের বিবেক হিসেবে কাজ করতে। স্বাধীন ও শক্তিশালী গণমাধ্যম যে কোনো সরকারের উত্থান-পতন ঘটাতে পারে। অর্থনীতিকে গড়তে পারে। পারে জাতিকে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করতে।

♦ বৈদেশিক বিনিয়োগ

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে যখন কোনো বিদেশী ব্যক্তি বা কোম্পানি বিনিয়োগ করে, তখন তাকে বলা হয় বৈদেশিক বিনিয়োগ। এ বিনিয়োগ যদি সরাসরি উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানে করা হয় তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা Foreign Direct Investment (FDI)। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বলতে বাইরের কোনো দেশ থেকে স্বাগতিক দেশে প্রকৃত মূলধন রপ্তানি বোঝায়। তবে এ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ঘটলেও মূলধনের স্থানান্তর নাও ঘটতে পারে। বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে নিয়োজিত কোম্পানিগুলোকে প্রায়শই বহুজাতিক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্দেশীয় করপোরেশন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বহুজাতিক কোম্পানি নিজ দেশে মূলধন বিনিয়োগ না করে বরং স্থানীয় মূলধন বা পরিসম্পদ অধিগ্রহণ করে বা তৃতীয় কোনো দেশ থেকে মূলধন এনে বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটাতে পারে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রবাহ বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রবাহ একটি দেশের বিনিয়োগের মাত্রাকে তার অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পরিমাণকে অতিক্রম করার সুযোগ করে দেয়। আর যেসব দেশের সঞ্চয়ের হার অতি উচ্চ, সেসব দেশকে অন্য দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজ দেশের চেয়ে অধিক হারে মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেয় বৈদেশিক বিনিয়োগ। উন্নত বিশ্ব থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বে পুঁজির প্রবাহ বিনিয়োগপ্রাপ্ত দেশের বিনিয়োগের মাত্রা বাড়ানোর সাথে সাথে দেশটির মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং দেশটিতে প্রযুক্তির প্রবাহে বৈদেশিক বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

♦ উত্তর-দক্ষিণ ফারাক

বর্তমান বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত দেশসমূহের অধিকাংশই বিষুবরেখার তো বটেই, কর্কটক্রান্তিরও উত্তরদিকে অবস্থিত এবং অনুন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই রেখার দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার উদ্যোক্তারা মনে করেন যে, উত্তরের (বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপীয় দেশসমূহের) অর্থনৈতিক উন্নতি ও সম্পদের ভিত্তি হচ্ছে দক্ষিণের অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশকে যুগোপযোগী প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত রাখার মাধ্যমে পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র করে রাখা এবং এসব দেশকে বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন উপায়ে শোষণ করা। সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ দক্ষিণকে উন্নত ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও প্রযুক্তির যোগান দিতে এবং শোষণমূলক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রক্রিয়া বন্ধ করতে উন্নত উত্তরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার বর্তমান বৈষম্য কমিয়ে আনা। এই আলোচনার উদ্যোক্তারা একথাও মনে করেন যে, উত্তরের বর্তমান শিল্পায়ন ও সমৃদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেও দক্ষিণের উন্নয়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য।

অধ্যায় ০৭

বৈশ্বিক পরিবেশ
Global Environment

Syllabus *Global Environment : Environmental issues challenges, climate change, global warning, climate adaptation, climate diplomacy.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *"বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"– আলোচনা করুন। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]*

০২. *'গ্রিন হাউজ ইফেক্ট' (Green House Effect) বলতে কি বোঝায়? এর ফলে পরিবেশ ও কৃষিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে? [২৮তম বিসিএস]*
অথবা, গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এর কি কি প্রভাব পড়তে পারে এবং তা প্রতিকারের উপায় কি বর্ণনা করুন।

০৩. *বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন। এগুলো মোকাবিলার জন্য কি কি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে? [২৫তম বিসিএস]*
অথবা, বিশ্বের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন। [২৩তম বিসিএস]

০৪. *'জলবায়ুর পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন। [২৯তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. *'জলবায়ুর পরিবর্তন ও উন্নয়নশীল বিশ্ব' শিরোনামে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।*

০৬. *ক. বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে অন্তরায়সমূহ কি কি?*
খ. আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফলাফল কি হতে পারে?

০৭. *ক. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ কি?*
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব আলোচনাপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তনে কিভাবে ধনী ও গরিব দেশগুলো পরস্পরের মুখোমুখি তা আলোচনা করুন।
গ. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনে কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কি?*

০২. *রিও (পরিবেশ) সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য নীতিগুলো তুলে ধরুন।*

০৩. পরিবেশগত শরণার্থী বলতে কি বোঝায়?
০৪. জলবায়ু কূটনীতি কি?
০৫. গ্রিন পিস কি?

টীকা

I The World Climate Conference-3 [২৯তম বিসিএস]
I প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি [২১তম বিসিএস]
I নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন
I COP18 ও কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ বৃদ্ধি
I রিও+২০ সম্মেলন
I ডারবান রোডম্যাপ
I প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন (রিও ঘোষণা)
I দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন)
I মন্ট্রিল প্রটোকল
I গ্রিন পিস
I জলবায়ু পরিবর্তন [৩২তম বিসিএস]
I গ্রিন হাউস ইফেক্ট [২২তম; ২০তম বিসিএস]
I আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহারসংক্রান্ত নীতিমালা
I ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন
I গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধে ঐতিহাসিক চুক্তি
I LIMA COP 20
I ইবোলা ভাইরাস

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০৩ I "বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"– আলোচনা করুন। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি— যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বিশ্ব নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির অধিকাংশই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণ এবং বনভূমি উজাড় করার ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এর ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা : বর্তমান বিশ্বে আলোচিত ও ভয়াবহ সমস্যাগুলোর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা অন্যতম। এর ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিশ্বজুড়ে। আর এ সমস্যার কাতারে শামিল হচ্ছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিশেষ উন্নয়নশীল দেশগুলো। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি :** জলবায়ু পরিবর্তনের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলছে। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রীনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূভাগের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলছে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর নিচু এলাকাসমূহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে। সাম্প্রতিককালে ভূ-পৃষ্ঠে পানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর ফলে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহতসহ তা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৩. **নিম্নভূমিতে প্লাবন :** জলবায়ু পরিবর্তনের হেতু সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ কিমি এলাকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এই শতাব্দীর শেষ দিকে ২০-৬০ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং নদ-নদীর পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীর উৎস দেশের বাইরে ভারত ও নেপালে। তাই একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপরদিকে ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট যুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করবে।

৪. **জীববৈচিত্র্য ধ্বংস :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে। পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭০ ভাগ তলিয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেলে তা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনবে। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

৫. **নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জমিতে সেচ ও নৌ-চলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের প্রায় ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এই লবণাক্ততার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৬. **আকস্মিক বন্যা :** পাহাড়ি ঢলের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষত মেঘনা অববাহিকায় প্রতিবছর আকস্মিক বন্যা দেখা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আকস্মিক বন্যার পৌনঃপুনিকতা, ক্ষতির পরিমাণ ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষত সিরাজগঞ্জ ও এর আশপাশের এলাকাসমূহে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

৭. **নদী ভাঙন :** বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূল বরাবর রয়েছে গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত অসংখ্য প্রশস্ত জোয়ার ভাটা সমভূমি এবং নদী মোহনায় রয়েছে বদ্বীপ। নদীসঙ্গমে অবস্থিত এসব বদ্বীপ ও সমুদ্র তটরেখা বরাবর ভূখণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এ পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের মাঝে এক বিশেষ ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নদী ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘনা ও পদ্মার তীরবর্তী এলাকাসমূহে নদী-ভাঙনের ফলে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে।

৮. **খরা :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শীতকালেও এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের হার বেশি। এর ফলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে খরার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানের মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুত এলাকা মারাত্মক খরা উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হবে।

৯. **সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস :** বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুন মাসে যে সামুদ্রিক ঝড় হয় তাতে উপকূলীয় জেলাসমূহে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'সিডর' বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন রেখে গেছে তা বর্ণনাতীত। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে এটা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আঘাত। মহাসেন, সিডর, সুনামি, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনেরই ফলাফল। মানব সৃষ্ট দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য তা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

১০. **বিপন্ন জনগোষ্ঠী :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের প্লাবনে দেশের ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং প্লাবন এলাকার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

১১. **অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি :** ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ ১৮০০০ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে ২৮০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের। জলবায়ু পরিবর্তন হেতু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবনের তীব্রতা যেমন বাড়ছে তেমনি অবকাঠামোগত। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্লাবনজনিত কারণে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ২৪২ মিলিয়ন টাকা।

১২. **পরিবেশ বিপর্যয় :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ অশনিসংকেত। জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন সম্পদের অপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত বিনষ্ট হওয়ার পথে। ইতোমধ্যে দেশের বৃহৎ বনভূমি সুন্দরবন ও হাওর অঞ্চলের পরিবেশীয় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ : ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়াগত কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ এক জনপদ। বিগত কয়েক দশকের জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগের এ ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৯০-২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে ২,১৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ১.৮ শতাংশ। একারণে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বাংলাদেশ বেশ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। নিচে জলবায়ু পরিবর্তনের বেশি ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ আলোচনা করা হলো :

১. **জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড :** বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP, 2009) প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব তহবিলে গঠন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড আইন ২০১০ প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে সর্বমোট ২৩৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ ফান্ডের আওতায় ১৯৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সহায়তায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP) গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ ফাণ্ডে প্রাপ্ত সহায়তার অঙ্ক ১৮৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২. **বনায়নের উপর গুরুত্বারোপ :** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার বনায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৭-৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭.০৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম আরো সামনে এগিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর।

৩. **শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম :** শিল্প বর্জ্য ও শহরের পয়ঃপ্রণালী হতে সৃষ্ট বর্জ্যের কারণে জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর পানিতে দূষণের মাত্রা এত বেশি যে অনেক নদীতে কোন জলজ প্রাণী পর্যন্ত বাঁচতে পারে না। বাংলাদেশ এ নদীগুলোকে দূষণ হতে রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদী-কে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করেছে খসড়া নির্দেশিকা। বাংলাদেশ সরকার তরল বর্জ্য নির্গমণকারী সকল কলকারখানায় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এর ফলে ইতোমধ্যে ৩৮১টি কলকারখানায় ইটিপি স্থাপিত হয়েছে এবং ৪২টি ইটিপি নির্মাণাধীন আছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণ রোধে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায়

অবস্থিত ট্যানারী শিল্পসমূহ সাভারে অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সেখানে কিছু জটিলতা থাকলেও যার সুরাহা করেছে সরকার। স্থানান্তরের জন্য কোম্পানিগুলোকে এখন চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে আগামী অর্থবছরের মধ্যে চামড়া শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। সর্বোপরি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠন করা হয়েছে ২০০ কোটি টাকার তহবিল।

৪. **জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ :** জীববৈচিত্র্য দেশের প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। সরকার দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২০ এবং জাতীয় জৈব নিরাপত্তা কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০১-২০২০ এর আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল (National Biodiversity Strategy & Action Plan) হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৫. **উপকূলীয় ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ :** উপকূল এবং জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে কক্সবাজার এলাকায় প্রায় ৬৫০ হেক্টর জলজ বন হাকালুকি হাওর এলাকায় প্রায় ৮৬০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ দুটো স্থানের পাশাপাশি সেন্টমার্টিনস দ্বীপ ও টাংগুয়ার হাওরে চলছে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম।

৬. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে হয়েছে, 'ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১' জারি করা হয়েছে, অনুমোদন করা হয়েছে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫'। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির আওতায় ৪৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারের অর্থায়নে বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙ্গন এলাকায় ৭৪টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এবং উপকূলীয় এলাকায় ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় ইতোমধ্যে ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা, দুর্যোগ পরবর্তী অবসস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য কন্টিনজেন্সি প্লান তৈরি, ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মানের কারিগরি তথ্য সন্নিবেশিত করে বিল্ডিং কোড (Building Code) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে, ঠিক তখনই এ মানবজাতি তার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে চরম বিপর্যয়ের দিকে। মানুষ তার প্রয়োজনে একদিকে যেমন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে অপরদিকে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। এ বিশ্ব আমাদেরই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাই এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আর এজন্য জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই।

০২। 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট' (Green House Effect) বলতে কি বোঝায়? এর ফলে পরিবেশ ও কৃষিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে? *[২৮তম বিসিএস]*

***অথবা,* গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এর কি কি প্রভাব পড়তে পারে এবং তা প্রতিকারের উপায় কি বর্ণনা করুন।**

উত্তর : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর অবদানে মানবজাতি একদিকে যেমন সভ্যতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে, অন্যদিকে তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া মানবজাতিকে ঠেলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে। প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ সাধনের ফলে পৃথিবী চরম দুর্দিনের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে বেড়ে যাচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্ট। মূলত গ্রিন হাউস ইফেক্ট পরিবেশ দূষণের এমন এক বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া যা বিশ্ববাসীকে এক নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে। প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছে তার ভারসাম্য ও স্বাভাবিক গতি।

গ্রিন হাউস কি : ইংরেজি 'Green House' শব্দের অর্থ 'সবুজ ঘর'। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ ও মেরু অঞ্চলে সূর্যালোকের স্বল্পতার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসবজির সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীগণ বিশেষ ধরনের কাচের ঘর উদ্ভাবন করেন যার ভেতরে চাষাবাদ সম্ভব। এ ঘরের ছাদ ও দেয়াল তাপ বিকিরণরোধী বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে তৈরি। গ্রীষ্মকালে এ ঘরে সূর্যালোক ও উত্তাপ প্রবেশ করে কিন্তু বিকিরণ না ঘটায় তাপ বের হতে পারে না এবং এর ভেতরের পরিবেশ উত্তপ্ত থাকে। তাই সঞ্চিত সূর্যতাপে বৈরী ও শীতার্ত পরিবেশেও শাকসবজি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা এ বিশেষ ঘরের নাম দিয়েছেন 'গ্রিন হাউস'।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি : পৃথিবীকে ঘিরে এর চারপাশে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিমি পর্যন্ত রয়েছে ওজোনস্তর। যার ঘনত্ব সব জায়গায় একরকম নয়। ২৩ কিমি উর্ধ্বে এর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এখানে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অপর কয়েকটি গ্যাসের বেষ্টনী। এ গ্যাসগুলোকে একত্রে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। এ গ্যাসের বেষ্টনী রাসায়নিক পর্দা হিসেবে কাজ করে। গ্রিন হাউসের কাচের দেয়াল যেভাবে তার ভেতরের উষ্ণতাকে বাইরে বিকিরণ হতে বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনিভাবে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট রাসায়নিক পর্দা বা গ্যাসের দেয়াল ভূ-পৃষ্ঠের শোষিত তাপের বিকিরণ ঘটাতে বাঁধা দেয়। গ্যাসের এ দেয়াল আছে বলেই কিছু পরিমাণ তাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে থেকে যায় এবং এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকে। ফলে পৃথিবীতে যে উষ্ণতা থাকে তা জীবের পক্ষে বাসযোগ্য হয়। জীবের বসবাসের অনুকূল এরূপ পরিস্থিতিকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট।

গ্রিন হাউস ইফেক্টের কারণ : পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের কারণে পৃথিবী বাসোপযোগী হয়েছে। মহাশূন্যের আবহাওয়ামণ্ডলে 'ওজোনস্তর' নামে অদৃশ্য এক বেষ্টনী বিদ্যমান। এ ওজোন স্তর পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশ রোধ করে এবং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবী থেকে আসা তাপ মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে সহায়তা করে। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দূষণের ফলে প্রকৃতির এ প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বেষ্টনি ওজোন স্তর প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। গৃহস্থালি পণ্য ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি গ্যাস। শিল্প কারখানাতেও এ ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহৃত হয়। অবমুক্ত সিএফসি মহাশূন্যের ওজোন স্তর ক্ষয়কারী অন্যতম উপাদান। তাছাড়া গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত

বৃদ্ধির ফলে তাপ বিকিরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং সূর্য থেকে আগত কিছু তাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখে। এভাবে একদিকে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গ্রিন হাউস ইফেক্টের আর একটি অন্যতম প্রধান কারণ বনভূমি উজাড়করণ। বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার ফলে বৃক্ষ কর্তৃক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের হারও আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রাও ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে যা গ্রিন হাউস ইফেক্টের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে।

বাংলাদেশে গ্রিন হাউস ইফেক্টের প্রভাব : গ্রিন হাউস ইফেক্ট শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনছে। এটা প্রকৃতির ওপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলছে যার ফলে বাস্তুসংস্থান হয়ে পড়ছে বিপর্যস্ত। পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১.৭৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৫ সেলসিয়াসে। পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করছেন আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা গ্রিন হাউস ইফেক্টের কারণে বাড়ার প্রভাবে ইতোমধ্যে মেরু অঞ্চলে কোটি কোটি বছর ধরে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে। সেই সাথে পর্বতশৃঙ্গে জমে থাকা বরফও গলতে শুরু করেছে। বরফ গলা এ পানি নদীপথে প্রবাহিত হয়ে নেমে আসছে সমুদ্রে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যা বাংলাদেশসহ অন্যান্য সমতল ভূমির দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশের মতো সমতল দেশগুলোর বিশাল অঞ্চল পানির নিচে চিরতরে তলিয়ে যাবে। এছাড়া সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ত্বক-ক্যান্সারসহ অন্ধত্ব ও বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হবে মানবজাতি। প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন বনাঞ্চলে দাবানল সৃষ্টি হবে। সমুদ্রের স্রোত পরিবর্তিত হবে। সবুজ-শ্যামল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। অতি বন্যা, খরা, এসিড বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস পৃথিবীবাসীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করে তুলবে। এভাবে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করবে। বাংলাদেশে গ্রিন হাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো নিচে চিহ্নিত করা হলো :

১. **বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে যার ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে পানির আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করবে, যা নদী পথে প্রবাহিত হয়ে সাগরের পানির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তুলবে। এছাড়া উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে, যা ক্রমাগতভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৭ মিমি কিন্তু এ তুলনায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। অর্থাৎ প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ১-২ মিমি/বছর। সমুদ্র থেকে ৯০ কিমি দূরে অবস্থিত বরিশাল জেলার সমুদ্রসীমা থেকে ৩ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি বছরে ৩ মিমি বৃদ্ধি পায় তবে এক হাজার বছর পরে বরিশাল শহর সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে। এছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য উপকূলবর্তী দ্বীপ ও এলাকাসমূহ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হবে।

২. **ভূ-পৃষ্ঠের নিচু এলাকায় প্লাবন :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বায়ুমণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। যার প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং উপকূলীয় দ্বীপ, শহর ও বনাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাবে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে অচিরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্লাবনজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের মোট ভূ-ভাগের ১৭ শতাংশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। যার ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. **অতিবৃষ্টি :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে জলবায়ুতে পরিবর্তন আসবে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। এতে বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতোমধ্যে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত প্রায় সব ঋতুতেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এভাবে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেবে।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধন :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাবে আমাদের অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের আধার সুন্দরবন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রের পানির উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের প্রায় ৭০ শতাংশ তলিয়ে যাবে। এর প্রভাব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশের বনজ সম্পদ বিনষ্ট হবে এবং বিভিন্ন দুর্লভ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। যার প্রভাব পড়বে বাস্তুসংস্থানে এবং বাস্তুসংস্থান তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মাত্রা আরও ঘনীভূত হবে।

৫. **লবণাক্ততার বিস্তৃতি :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। IPCCC-এর সমীক্ষানুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেমি বৃদ্ধি পেলে ২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় লোনা পানি অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমুদ্রস্ফীতির কারণে খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা প্রভৃতি জেলার কৃষি জমিতে সহজেই লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে এসব জেলার আবাদি কৃষি জমি কৃষি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। মানুষের ব্যবহার্য স্বাদু পানির উৎস বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এছাড়া স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদের বিলুপ্তি ঘটবে। এভাবে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর জন্য মারাত্মক হুমকি ডেকে আনবে।

৬. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, সেই সাথে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে। যার প্রভাবে মাটিতে প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ কমে যাবে এবং সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে শীত মৌসুমে প্রায় ৩৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা খরার কবলে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে এবং খরাকবলিত এলাকা ভবিষ্যতে ২২,০০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। তাছাড়া আমন মৌসুমে খরার প্রকোপ বাড়লে মাঝারি ধরনের খরাকবলিত এলাকা চরম খরাকবলিত এলাকায় পরিণত হবে।

৭. **এসিড বৃষ্টি :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ক্ষতিকর অক্সাইডসমূহ বৃষ্টির পানির সাথে এসিড বৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পড়বে। যার ফলে ভূপৃষ্ঠের উর্বরতা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে এবং বনাঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হলে বনাঞ্চল ধ্বংস হবে এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটবে। বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং পরিবেশ বিপর্যয় আরও ত্বরান্বিত হবে।

৮. **ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধি :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে সাগর উত্তাল হয়ে উঠছে। নিম্নচাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অতি বন্যা ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রাদুর্ভাব ঘন ঘন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর', 'আইলা' ও 'মহাসেন' আঘাতে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাসমূহের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর সলিল সমাধি ঘটেছে। সেই সাথে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদেরও বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। গত দেড় দশকে বাংলাদেশ ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৮৮ সালের দুমাসব্যাপী বন্যায় দেশের ৫৩টি জেলাই প্লাবিত হয়েছিল। ১৯৯১ সালে উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনেছিল ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি বন্যা যা প্রায় তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল।

৯. **আবহাওয়াগত বিপর্যয় :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে বিশাল এলাকা ভবিষ্যতে অনুর্বর, নিষ্ফলা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চিরাচরিত ঋতুচক্র ভেঙে যাচ্ছে। দেখা দিয়েছে অতি শীত ও গ্রীষ্মের দাপট। গ্রীষ্মকালে শীত ও শীতকালে অকাল বন্যার প্রাদুর্ভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ক্রমশ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের এ দেশটির আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠছে, যা কৃষিসহ আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্রতিকারের উপায় : গ্রিন হাউস ইফেক্ট শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য এক ভয়াবহ সংকট। এ বিপর্যয় রোধে আমাদের যেসব বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো–

১. বনায়ন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বনায়ন বাড়াতে হবে। উপকূলবর্তী জেলাসমূহে অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। কারণ একমাত্র বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে।

২. বৃক্ষ নিধন রোধ করতে হবে। বৃক্ষ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা কমিয়ে আনে এবং প্রকৃতিকে অক্সিজেন দিয়ে বিশুদ্ধ রাখে।

৩. যেসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায় তাদের নির্গমন রোধ করতে হবে।

৪. গ্যাসের চুলা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি অকারণে খোলা রাখা যাবে না। অপচয় রোধ করতে হবে।

৫. পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

৬. শিল্পকারখানায় জ্বালানির সাশ্রয় করতে হবে।

৭. পচা, ডোবা ও মজা পুকুরে মাছ চাষ করতে হবে। কারণ পচা পানিতে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

৮. চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে।

৯. শিল্পবর্জ্য পুনরায় বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. দূষণ রোধে সরকার ও দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রিন হাউস ইফেক্ট একটি বৈশ্বিক সংকট। বাংলাদেশ এ প্রতিক্রিয়ার অসহায় শিকার। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতখানি এ সংকটের কুফলভোগী করেছে, সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা তার চেয়ে নগণ্যই বটে। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশের জন্য এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য খুবই সীমিত। এ সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে অগ্রসর হতে হবে, যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা যায়।

০৩। বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন। এগুলো মোকাবিলার জন্য কি কি আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে? *[২৫তম বিসিএস]*

অথবা,* বিশ্বের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন। *[২৩তম বিসিএস]

উত্তর : সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ। পরিবেশের ভালোমন্দ দুটি দিকই মানুষসহ সমগ্র জীবজগতে অস্তিত্বের জন্য গুরুত্ব বহন করে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। শিল্পায়ন, জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে বৃক্ষনিধন ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর পরিবেশ আজ বিপন্ন। বিপন্ন পরিবেশকে মোকাবিলায় আন্তর্জাতিকভাবে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও স্মারক লিপি স্বাক্ষর, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফান্ড গঠনসহ বহুমুখী কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। তবুও রক্ষা করা যাচ্ছে না বিশ্বকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে।

পরিবেশ সমস্যাবিষয়ক ধারণা : পরিবেশ সমস্যা বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতাকে, যা পরিবেশকে হুমকির সম্মুখীন করে, পৃথিবীকে মনুষ্য বাসের অযোগ্য করে তোলে। সৃষ্টি করে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রাণীর জীবনধারণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরিবেশ সমস্যা বলতে বোঝায় বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, খাদ্য দূষণ, গ্রিন হাউস গ্যাস ও তার প্রভাব।

বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ : বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয় প্রতিভাত হয়। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **শিল্পবিপ্লব :** পরিবেশ সমস্যা নতুন কিছু নয়। আদিম যুগে পৃথিবীতে যখন থেকে আগুনের ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকেই প্রাণ প্রদায়ী অক্সিজেনের ধ্বংস শুরু হয়। আর এ অক্সিজেনের ধ্বংসের সাথে সাথে কেবল পরিবেশের ভারসাম্যই নষ্ট হয়নি বরং ধোঁয়া ও ভস্মকণায় পরিবেশকে করে তুলেছে কলুষিত। তবে এ সমস্যা তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের সূচনা থেকে। শিল্পের সমূহ বিকাশ বিশ্ব অর্থনীতিতে স্পন্দন জাগিয়েছে– এ কথা ঠিক। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্রিয়ার অবশ্যই আছে প্রতিক্রিয়া। যন্ত্র সভ্যতার বিকাশের যে গতি তার সাথে পাল্লা দিয়ে প্রকৃতি বিরূপ হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এসে দেখা যায়, পরিবেশ কেবল সমস্যাই নয় বরং এটি মারাত্মক সমস্যায় রূপ নিয়েছে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাচেল কারসন-এর বই 'The Silent Spring' প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পাশ্চাত্যের দেশে দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে গ্রিন হাউস প্রভাব সবার ধারণায় আসে। ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিকা সার্ভের আবহাওয়া বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন যে, অ্যান্টার্কটিকার আকাশে ওজোনের পরিমাণ কমছে, যার ফলে ওজোন স্তর ফুটো হয়ে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে এবং সমগ্র জীব জগতের প্রভূত ক্ষতি করছে।

২. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** সচেতন বা অচেতন যে করেই হোক প্রাচ্য-প্রতীচ্য সবখানেই পরিবেশ বিপর্যয় মানুষকে বিরূপ স্তরে নিয়ে গেছে, করে তুলেছে উৎকণ্ঠিত। মানবসভ্যতার অন্তরায় হিসেবে পৃথিবী আজ হয়েছে বিপন্ন। আদিকালে মানুষের সংখ্যা কম ছিল। তাই তাদের নির্গত বর্জ্য পদার্থও ছিল পরিমাণে কম। এছাড়াও তখনকার মানুষের নিত্য বর্জ্য পদার্থ হয়তোবা অন্য প্রাণীর খাবার হিসেবে

ব্যবহৃত হতো, নয়তো তা পরিবেশের অণুজীবদের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে অণু-পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে আবার পরিবেশে মিশে যেত। কিন্তু বর্তমানে তার উল্টো। মানুষ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তৈরি হচ্ছে এমন সব কৃত্রিম পদার্থ যা কেবল পরিবেশকে বিনষ্টই করে না, এমনকি এত বিষ বা রাসায়নিক দ্রব্য পরিবেশে ঢুকছে যা পরিবেশের শোষণ প্রক্রিয়াকে ক্রমশ ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ সমস্যা সমস্যা হিসেবেই থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু তৈরি করছে নতুন জটিল সমস্যা। এভাবেই পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে মানুষের বাস অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এর জন্য দায়ী মানুষই।

৩. **সবুজ বিপ্লব :** অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য জমিগুলোতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬০-এর দশকে সবুজ বিপ্লবের নামে উন্নয়নশীল বিশ্বে এ ব্যবস্থা শুরু হয়। চাষাবাদে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলারসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে কৃষিতে শ্রমের উদ্বৃত্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ কাঠামোগত পরিবর্তনে বহুসংখ্যক লোক বেকার হয়ে পড়ায় কাজের সন্ধানে শহর এলাকায় ভিড় করে। শহরের সামগ্রিক পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। সবুজ বিপ্লবের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জমির উর্বরতা হ্রাস পায়, কৃষি উপকরণের অবাধ ও অপরিকল্পিত ব্যবহার পরিবেশের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেখা দেয় আর্সেনিক, নানা ধরনের জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধি।

৪. **জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি :** সারা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও এর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কয়লা, গ্যাস, তেলের ব্যবহার শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং বন উজাড়ের ফলে প্রকৃতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, যা পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

৫. **নগরায়ন ও ভারসাম্যহীন উন্নয়ন :** 'God made the village and Man made the city.' উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতিবছর অধিক পরিমাণে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে নগরে। ফলে নগরে চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরজীবনে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। পরিবেশের অবনতির মূলে যতটা না দায়ী প্রযুক্তির বিকাশ, তার চেয়ে অনেক দায়ী পরিবেশের ভারসাম্যের দিকে না তাকিয়ে অনেকটা বলগাছাড়া গোছের উন্নয়ন।

পরিবেশগত সমস্যার কারণে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পৃথিবীর বাঘা বাঘা ৬২০ জন জলবায়ু বিজ্ঞানী সতর্ক বাণী করেন যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ঝড়, তুফান, খরা, দাবানল, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি বেড়ে যাবে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে ৩.২-৭.১ ফারেনহাইট, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে ৭-২৩ ইঞ্চি। একুশ শতকে আর্কটিক সাগরে জমে থাকা বরফ গলে যেতে পারে। ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে বাসযোগ্য পরিবেশ নাও থাকতে পারে, আফ্রিকা ও এশিয়ার খরা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। এলনিনোর প্রভাবে সাগর-মহাসাগরে তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলে নেতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। বন উজাড়ের ফলে আফ্রিকার মাদাগাস্কারের প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়েছে। আশঙ্কাজনক হারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বিশ্বের অনেক এলাকা মরুময় হয়ে যাচ্ছে। বনজ ও সামুদ্রিক প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে।

বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ : জ্বালানি উন্নয়নসহ সকল ধরনের উন্নয়ন সকলের কাছে কাম্য হলেও উন্নয়নের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লবের প্রায় ২০০ বছর পরে সারা বিশ্বের

মানুষ সার্বিকভাবে পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কনভেনশন ও প্রটোকলের মাধ্যমে, যার গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হিসেবে পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **প্রথম পরিবেশ সম্মেলন :** ১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ৪৫তম অধিবেশনে এবং ১৯৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের নাম ছিল জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment)।

২. **ধরিত্রী সম্মেলন :** প্রথম পরিবেশ সম্মেলনে দ্বিতীয় সম্মেলনের আহ্বানের প্রস্তাব গৃহীত হলেও এর অন্যতম শর্ত ছিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। ১৯৮৮ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং প্রথম সম্মেলনের দু'দশক পূর্তি উপলক্ষে ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (United Nations Conference on Environment and Development), যা ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit) বা রিও কনফারেন্স (Rio Conference) নামে পরিচিত।

৩. **বিশেষ পরিবেশ সম্মেলন :** ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলন পর্যালোচনার লক্ষ্যে পাঁচ বছর পর জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ সম্মেলন। এটি ধরিত্রী সম্মেলন + ৫ (Earth Summit + 5) বা রিও + ৫ (Rio + 5) নামে পরিচিত।

৪. **বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন :** ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলন পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (World Summit on Sustainable Development— WSSD) এ সম্মেলন রিও + ১০ (Rio + 10) বা ধরিত্রী সম্মেলন + ১০ (Earth Summit + 10) নামে পরিচিত।

৫. **কপ (COP) সম্মেলন :** জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ রূপরেখা কনভেনশন (UNFCCC) ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কনফারেন্সেস অব দ্য পার্টিস— কপ (Conferences of the Parties– COP) নামে পরিচিত এ সম্মেলনে UNFCCCভুক্ত দেশসমূহ অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৫ সালের ২৮ মার্চ–৭ এপ্রিল জার্মানির বার্লিনে প্রথম এবং ২০১২ সালে ১৮তম COP অনুষ্ঠিত হয় ২৬ নভেম্বর–৮ ডিসেম্বর, কাতারের দোহায়। বিশ্বে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে আয়োজিত এ অধিবেশনে বিশ্বের ২০০টি দেশের ১৭,০০০ প্রতিনিধি যোগ দেন।

৬. **রিও +২০ :** ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এ পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় গঠন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ইস্যুগুলো দেখভাল করার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গ-সংগঠন UNFCCC। ১৯৯২ সালের ঐ সম্মেলনের ঠিক ২০ বছর পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আবার এ পৃথিবীর টেকসই উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণের জন্য ব্রাজিলের সেই রিও নগরীতেই একত্রিত হয় ২০-২২ জুন ২০১২। এ সম্মেলনের মূল নাম হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, সংক্ষেপে বিশ্বব্যাপী যাকে 'রিও+২০' নামে অভিহিত করে। সম্মেলন শেষে 'কী ভবিষ্যৎ আমরা চাই' শীর্ষক ৪৯ পৃষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়, যাতে ২৮৩টি সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে।

৭. **ভিয়েনা কনভেনশন :** ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে ঐতিহাসিক ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় গৃহীত হয়, যা কার্যকর হয় ১৯৮৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট এটি সমর্থন করে। ভিয়েনা কনভেনশনের পূর্ণনাম Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer।

৮. **বাসেল কনভেনশন :** বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কনভেনশন 'বাসেল'। এ কনভেনশন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ তাদের দেশের সীমান্তের বাইরে পদার্থ জাহাজে বহন করে অন্যত্র নিক্ষেপ করা হ্রাস করতে, বর্জ্যের পরিমাণ ও বিষাক্ততা হ্রাস এবং বর্জ্য উৎপাদন স্থলের যত নিকটে সম্ভব এ সমস্ত বর্জ্যের নিক্ষেপ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৮৯ সালের ২২ মার্চ সুইজারল্যান্ডের বাসেলে এ কনভেনশনটি গৃহীত এবং কার্যকর হয় ৫ মে ১৯৯২।বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিল বাসেল কনভেনশন অধিগত বা সমর্থন করে।

৯. **UNFCCC :** বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি মোকাবিলায় ১৯৯২ সালের ৯ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ রূপরেখা কনভেনশন (UNFCCC) তৈরি করা হয় এবং ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে তা স্বাক্ষর করা হয়। ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের ৯ জুন এ কনভেনশন স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল তা অনুমোদন করে। UNFCC-এর পূর্ণনাম United Nations Framework Convention on Climate Change.

১০. **জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন :** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহারে সবাই যাতে সমভাবে উপকৃত হতে পারে, সে ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে গঠিত হয় জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on Biological Diversity—CBD)। এটি ১৯৯২ সালের ৫ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে স্বাক্ষরিত হয়, যা কার্যকর হয় ১৯৯৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের ৫ জুন স্বাক্ষর করে এবং অনুমোদন করে ১৯৯৪ সালের ৩ মে।

১১. **কার্টাগেনা প্রটোকল :** জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা পরিমার্জিত প্রাণের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত 'কার্টাগেনা প্রটোকল' ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারি কানাডার মন্ট্রিলে গৃহীত হয়, যা কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩। বাংলাদেশ ২০০০ সালের ২৪ মে এটি স্বাক্ষর করে এবং অনুমোদন করে ২০০৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। কার্টাগেনা প্রটোকলের পুরো নাম Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.

১২. **কিয়োটো প্রটোকল :** ১৯৯২ সালের ৯ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে UNFCCC কনভেনশনের সময় ভূমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি ও আবহমণ্ডলের পরিবর্তন রোধে উদ্যোগ নেয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনেও তা আলোচিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর UNFCCC অনুসমর্থনকারী দেশসমূহ জাপানের কিয়োটো (দেশটির প্রাচীন রাজধানী) নগরীতে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন একটি প্রটোকল গ্রহণে সম্মত হয়। এর আওতায় ১৯৯০ সালের স্তরকে ভিত্তিরূপে ধরে উন্নত দেশগুলো তাদের যৌথ নিঃসরণ ৬টি গ্রিনহাউস গ্যাস (Carbon di-oxide, Methane, Nitrous oxide, Sulphur hexafluoride, Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons) ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৫.২ শতাংশ হ্রাস করবে। ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কিয়োটো প্রটোকল কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ২০০১ সালের ২২ অক্টোবর এ প্রটোকল সমর্থন করে।

১৩. **মন্ট্রিল প্রটোকল :** ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থিত ওজোন স্তরকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ও বিজ্ঞানীদের সময়োচিত তৎপরতায় কানাডার মন্ট্রিল শহরে ওজোন ক্ষয়কারী বস্তু সামগ্রী ফেজ আউট করার লক্ষ্যে 'মন্ট্রিল প্রটোকল' (Montreal Protocol) স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল সমর্থন করে। প্রটোকলটির পূর্ণনাম Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer।

পরিবেশগত সমস্যা মানবসভ্যতার এক ভয়ঙ্কর বিপদ। মহান সৃষ্টিকর্তা চমৎকার সুন্দর এক স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য সৃষ্টি করে রেখেছেন আমাদের কল্যাণে। নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারছি, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ধ্বংস করে নিজেদের আজাব ডেকে আনছি। পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিকভাবে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও তা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া গৃহীত পদক্ষেপে বৃহৎ শক্তির নেতিবাচক অবস্থান, দরিদ্র দেশের ওপরে দোষারোপ চাপানো প্রভৃতি পরিবেশ সমস্যা দূর না করে নতুন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। কাজেই আমাদের সকলের উচিত উন্নত-অনুন্নত, ধনী-দরিদ্র সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে মানবসভ্যতার ভয়ংকর অভিশাপ পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে একযোগে কাজ করা।

০৪। জলবায়ুর পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। অতীতেও জলবায়ুর পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। তবে এ পরিবর্তনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। অতীতে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে অত্যন্ত ধীরগতিতে, যা পরিবেশের ওপর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করেনি। আর বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুতগতিতে— যা পরিবেশের ওপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত। 'জলবায়ু পরিবর্তন' তাই সারা বিশ্বে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি। আর বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ হলো গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ; যা বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ওজোন স্তরকে দিন দিন ফুটো করে চলেছে। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে বাধাহীনভাবে সরাসরি এসে পড়ছে। ফলে পরিবর্তন ঘটছে পৃথিবী নামক গ্রহের তাপমাত্রার। দেখা দিচ্ছে টর্নেডো, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, দাবানল, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, এসিড বৃষ্টি, খরা প্রভৃতি। যা পৃথিবী নামক এ ছোট গ্রহটিকে মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। জলবায়ুর এ পরিবর্তনে দায়ী উন্নত বিশ্ব হলেও এর প্রধান ক্ষতির সম্মুখীন হবে উন্নয়নশীল বিশ্ব বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া। যার প্রমাণ ইতোমধ্যে সিডর, আইলা, লায়লা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে এশিয়ার যে দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে সেগুলো হলো— বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, ভারত, ফিলিপাইন, চীন। দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়া সম্মুখীন হবে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির।

'জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে'– এ প্রশ্নের আলোকে নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ার ৭০% লোক গ্রামে বাস করে যার মধ্যে ৭৫% দরিদ্র। এ দরিদ্র জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিনির্ভর এবং এর মধ্যে ৬০% কৃষিশ্রমিক। জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে, আকস্মিক বন্যা, খরা দেখা

দিবে, ভূমির অবক্ষয় বৃদ্ধি পাবে– যা দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলবে। ADB প্রকাশিত রিপোর্ট ২০০৯-এ বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার ১.৬ বিলিয়ন লোক পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার হুমকির সম্মুখীন হবে। এ রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, "If current trends persist until 2050, the yields of irrigated crops in South Asia will decrease significantly— maize (-17%), wheat (-12%) and rice (-10%)— because of climate change induced heat and water stress. The resulting food scarcity will lead to higher prices and reduced calorie intake across the region.' জলবায়ু পরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তাকে যেভাবে হুমকির সম্মুখীন করে তুলবে–

১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ও আবাদী জমি প্লাবিত হবে :** জলবায়ু পরিবর্তন তথা বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে হিমালয়ের পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে দিন দিন সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি করে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বৃদ্ধি করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রই সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এবং নিম্নভূমি। সমুদ্রের পানি এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে মালদ্বীপ সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক আবাদি জমি প্লাবিত হবে, যা দক্ষিণ এশিয়ার কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ এবং কৃষি উৎপাদন অনেকাংশে কমিয়ে দেবে। ফলে এ অঞ্চলের জনগণ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়বে।

২. **নদনদীর প্রবাহ তারতম্য ও কৃষি সেচ সমস্যা :** দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশই কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান এসব দেশের জমিতে সেচ ও নৌ চলাচলের জন্য নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। এতে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরো পাবে। এরূপ অবস্থা বিরাজ করলে কৃষি সেচ-এর বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া মরুভূমিতে পরিণত হবে।

৩. **পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** জলবায়ুর পরিবর্তনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। এরূপ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি ও অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকি।

৪. **আকস্মিক বন্যা ও খরা :** পাহাড়ি বৃষ্টিপাতের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে প্রায় প্রতিবছরই আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে একদম বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে খরা দেখা দিবে এবং ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে। এরূপ আকস্মিক বন্যা ও খরা দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। যা দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিবে।

৫. **ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি :** বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধির ফলে দিন দিন ভূমিক্ষয় বেড়ে চলেছে। এরূপ ভূমিক্ষয়ের ফলে হাজার হাজার একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যা কৃষি উৎপাদন হ্রাস করে চলেছে। এভাবে দিন দিন কৃষি জমির হ্রাস, খাদ্য উৎপাদন মাত্রাকে কমিয়ে দিচ্ছে। যা দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তাকে দিন দিন হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে।

৬. **আবহাওয়াগত বিপর্যয় :** দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত ঋতুর উপস্থিতি ছিল। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ ঋতুচক্র ভেঙে যাচ্ছে। দেখা দিয়েছে অতি শীত ও গ্রীষ্মের দাপট। গ্রীষ্মকালে শীত ও শীতকালে অকাল বন্যার প্রাদুর্ভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে। নাতিশীতোষ্ণ এ অঞ্চলের আবহাওয়া দিন দিন চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সঙ্কট। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এ সংকট প্রতিক্রিয়ার অসহায় শিকার। ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো দক্ষিণ এশিয়াকে যতখানি হুমকির কুফলভোগী করেছে, সেই তুলনায় এ হুমকি সৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ার ভূমিকা অতি নগণ্য। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর এ হুমকি মোকাবিলা করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য খুবই সীমিত। এজন্য উন্নত বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করা যাবে না। যা করা যাবে তা হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া। আর এজন্য আরো দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই সম্ভব দক্ষিণ এশিয়াকে খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি থেকে রক্ষা করা।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫। 'জলবায়ুর পরিবর্তন ও উন্নয়নশীল বিশ্ব' শিরোনামে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ হলো গ্রিন হাউস গ্যাস অভিঘাত (Greenhouse effect)। সাধারণত সূর্য থেকে যে তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠে আসে তার কিছু অংশ পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে এবং অধিকাংশ বিকিরিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ব্যাপক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস জমা হওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপবিকিরণ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এসব গ্যাস তাপ শোষণ করে। ফলে দেখা যায়, ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ উত্তপ্ত হচ্ছে। গ্রিন হাউস অভিঘাতের জন্য দায়ী গ্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) এবং নাইট্রোজেন ও সালফারের অক্সাইডসমূহ। পূর্বে এ সকল গ্যাসের উপস্থিতি বায়ুমণ্ডলে লক্ষ্য করা গেলেও আধুনিককালে ব্যাপক জীবাশ্ম জ্বালানির দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস এবং বিশেষ ধরনের কৃষিব্যবস্থা গ্রিন হাউস অভিঘাতের মাত্রাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দেখা যায়, ১৮৫০-১৮৬০ সময়কালের তুলনায় বর্তমান পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় পাঁচগুণ। অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিনিয়তই দেখা দিচ্ছে নানা পরিবেশগত বিপর্যয় তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ দেশে দেশে দেখা দিচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড, ব্রিটেনসহ অনেক সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশই তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সাইক্লোন ও ঝড়ের কবলে পড়ে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের জনগণই সর্বস্বান্ত হচ্ছে। খরা ও মরুকরণের ফলে ভারত, পাকিস্তানসহ আফ্রিকার অনেক দেশ দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপনীত হয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : জলবায়ুর পরিবর্তন তথা বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিবর্তন হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায়—

প্রথমত, ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে।

দ্বিতীয়ত, উষ্ণায়নের ফলে পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পরিমাণ বাড়াবে। এতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বাড়বে।

তৃতীয়ত, উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গ্রিনল্যান্ড, এন্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূ-ভাগে জমা হয়ে থাকা বরফ গলে সমুদ্রে এসে মিশে যাবে। এতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থত, তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ভূ-পৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন দেখা দেবে। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর সমীক্ষায় বলা হয়, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মিলিমিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সালে তা ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১০০ সেন্টিমিটারে পৌঁছতে পারে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্ভাব্য অভিঘাতসমূহ : জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য ভৌত অভিঘাতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্লাবন, নদীপ্রবাহের ক্ষীণতা, পানিতে লবণাক্ততা, খরা, আকস্মিক বন্যা, সাইক্লোন ঝড়, নদীভাঙন প্রভৃতি।

ক. **প্লাবন :** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় ১২০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্লাবনজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের মোট ভূমির ১৭% তলিয়ে যাবে এবং জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে দেশে বৃষ্টিপাত বাড়বে। এতে বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, ফলে দেখা দেবে বন্যা। পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে 'ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট' (Back Water effect) যুক্ত হলে নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। সাধারণত উচ্চ ভূমি বলে পরিচিত এলাকা ব্যাপকভাবে তলিয়ে যাওয়ায় বন্যাকবলিত এলাকার পরিসরও বাড়বে।

খ. **নদ-নদীর ক্ষীণ প্রবাহ :** যে কোনো কৃষিপ্রধান দেশের জমিতে সেচ ও নৌচলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়ে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে। ফলে নদীর ক্ষীণ প্রবাহ হেতু সামুদ্রিক লোনা পানি সহজে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। তখন সামুদ্রিক লোনাপানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করায় কৃষিতে সেচের প্রয়োজনীয় মৃদু পানির অভাব দেখা দেবে এবং দেশের মৎস্যসম্পদও বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গ. **পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি দেশের কৃষি ও অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকি। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উপকূল এলাকায় লবণাক্ততা অনেক বেড়ে যাবে। বিশেষ করে নদ-নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অধিক পরিমাণ লোনা পানি প্রবেশ করবে। ভূগর্ভস্থ পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি উপকূলীয় পরিবেশকে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। লোনা পানির অনুপ্রবেশ দুভাবে হতে পারে :

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নদ-নদীতে অধিক হারে লোনা পানি ঢুকতে পারে;

২. নদ-নদীর ক্ষীণ প্রবাহের ফলেও সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করবে।

এ দুটি প্রক্রিয়া সম্মিলিত অভিঘাতে উপকূলীয় জীবনযাত্রা ব্যাপক ক্ষতির কবলে পড়বে।

ঘ. **আকস্মিক বন্যা :** বন্যার কারণ অনেক হতে পারে। সাধারণত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের কারণে আকস্মিক বন্যা হতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল, কিউবাসহ অনেক দেশই আকস্মিক বন্যার শিকার হতে পারে। ইতোমধ্যেই এ সকল দেশে এ ধরনের বন্যার প্রকোপও দেখা দিয়েছে।

ঙ. **খরা :** কোনো এলাকার মাটিতে আর্দ্রতার অভাব তথা বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে খরা দেখা দেয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে যদি উষ্ণতা বেড়ে যায় তাহলে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড খরায় অনেক দেশেরই চাষাবাদযোগ্য উর্বর ভূমি বিরানভূমিতে পরিণত হবে, মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুত এলাকা মারাত্মক খরা উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হবে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, ভারতের অনেক রাজ্যে, পাকিস্তানে, আফগানিস্তান এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই খরার ব্যাপকতা দেখা গেছে। এ সকল খরা উপদ্রুত এলাকায় কেবল প্রাকৃতিক ভারসাম্যই বিনষ্ট হয়েছে তা নয়, বরং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যুও মানববসতি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

চ. **সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস :** সাধারণত সামুদ্রিক ঝড়ের সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির একটি জটিল প্রক্রিয়া থাকলেও পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পানির উত্তাপও বৃদ্ধি পায়। তাতে স্বাভাবিকভাবেই ঘূর্ণিঝড়ের পৌনঃপুনিকতাও প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়।

জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা : জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) আর্থিক কার্যক্রম উদ্যোগের সদস্য বীমাকারকদের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, অনেক ঘন ঘন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের দরুন ক্ষয়ক্ষতি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হেতু ভূমি তলিয়ে যাওয়া এবং মৎস্যশিকার ক্ষেত্রে, কৃষি ও পানি সরবরাহে ক্ষতির পরিমাণ বছরে ৩০ হাজার ৪২০ কোটি ডলার হতে পারে।

এতে আরো বলা হয়, মালদ্বীপ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ও মাইক্রোনেশিয়া ফেডারেশনভুক্ত অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতির পরিমাণ এসব দেশের জাতীয় সম্পদ বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মিউনিখের ভূবিজ্ঞান গবেষণা গ্রুপের প্রধান ড. গারহার্ড বারজ ইউএনইপির আওয়ার প্লানেটকে বলেছেন, বিশ্বের কতিপয় দেশ, বিশেষ করে ছোট ছোট দ্বীপ দেশগুলোতে ক্ষতির পরিমাণ তাদের জিডিপির ১০ শতাংশ হতে পারে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

তবে সার্বিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে এ ব্যাপারে আরো গবেষণার প্রয়োজন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানের ধারণা সত্য হতে পারে। এক রিপোর্টে বলা হয়, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পানিশিল্পকে ২০৫০ সাল নাগাদ বার্ষিক অতিরিক্ত ৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলার গুনতে হবে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে ঘরবাড়ি, কলকারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র রক্ষার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে বছরে গড়ে ১০০ কোটি ডলার ব্যয় হতে পারে। এটাও ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের মতো বদ্বীপ ও ছোট ছোট নিচু দেশগুলোতে এ ধরনের ক্ষতির পরিমাণ হবে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

একই নিবন্ধে বলা হয়, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা প্রাক-শিল্প ঘনত্বের দ্বিগুণ হলে খরা, বন্যা ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিশ্বে কৃষি ও বনাঞ্চলের ক্ষতি হবে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ২০০ কোটি ডলার। তাছাড়া ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও হারিকেনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ক্ষতির পরিমাণ আরো ৩০০ কোটি ডলার বেশি হতে পারে।

ধারণা করা হয়, ইউরোপে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে মৃত্যুহার ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। এসব ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে বার্ষিক ২ হাজার ১৯০ কোটি ডলার। একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে পানি ব্যবস্থাপনার ১০০০ কোটি ডলার বাড়তি ব্যয় হতে পারে।

চীনের কৃষি খাতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতির পরিমাণ ৭৮০ কোটি ডলার হতে পারে।

ইউএনইপি দলের সদস্য দানিয়েল ক্লামেন বলেছেন, বন উজাড় হওয়ার ফলে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে ভূমিধস প্রবল হয়ে পড়ছে। এলনিনোর ফলে যে ধরনের মুষলধারার বৃষ্টি হয় সে ধরনের বৃষ্টিতে এসব জায়গা ভূমিধসের কবলে পড়তে পারে। ইউএনইপির সমীক্ষায় বলা হয়, জলবায়ুজনিত ক্ষতির পরিমাণ সাবেক সোভিয়েত জোটভুক্ত দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি হতে পারে, যা হতে পারে বার্ষিক ৬০০ কোটি ডলার।

বর্তমানে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেই দারিদ্র্য চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রচণ্ড খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির দরুন এ সকল এলাকায় জনজীবন আরো বেশি বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে কঙ্গো, সোমালিয়া, জায়ার, আফগানিস্তানসহ যুদ্ধবিধ্বস্ত ও মরুকরণের শিকার দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোতে মানব বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

করণীয় : জলবায়ুর পরিমাণজনিত যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে তা মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতীয় সরকারগুলো ইতোমধ্যেই পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনীয় উপায় খুঁজে বের করাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করেছে। ইউএনইপির নির্বাহী পরিচালক ক্লস টোরেপফার বলেন, 'এখনই ব্যবস্থা গ্রহণের সময়। গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাসে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির যে পরিণতি তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রধানত উন্নয়নশীল বিশ্বের নাজুক এলাকাগুলোতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। আমাদেরই মতো নর-নারী ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বিপর্যয়কর বন্যায় খাদ্যঘাটতি থেকে রক্ষা করার একটা নৈতিক দায়িত্ব আমাদের রয়েছে।'

সুতরাং জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্ভাব্য অভিঘাতসমূহকে মোকাবিলার জন্য আমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে :

ক. জ্বালানির ফলে পরিবেশের যে দূষণ হয় তা প্রতিরোধের জন্য দূষণমুক্ত জ্বালানি প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের আরো দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে হবে।

খ. ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত ও সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে মানুষকে অবহিতকরণের নিশ্চয়তা বিধানের নিমিত্তে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, সরকার, বিজ্ঞানী এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিবিড় সহযোগিতা আবশ্যক।

গ. দুর্যোগ লাঘবের জন্য সতর্ক পরিকল্পনা ও পরিবেশের প্রতি দরদ নিয়ে বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেজন্য পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কারণগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে বিশ্বকে নিস্তার দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঘ. দুর্যোগের সময় সরকারকে সংযত অথচ স্থিতিশীল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জন আবশ্যক।

জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমান বিশ্ব মানবতার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল, ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই মাশুল গুনতে হবে। তবে উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহকে যতটা সফলতার সাথে মোকাবিলা করতে পারবে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তা পারবে না। ফলে এরা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতির শিকার হবে। তাই উন্নয়নশীল বিশ্বকে উন্নত বিশ্বের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিক মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

০৬। ক. বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে অন্তরায়সমূহ কি কি?
খ. আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কি ফলাফল হতে পারে?

উত্তর : একদিকে যেমন ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প এবং খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনবরত ধেয়ে আসছে অন্যদিকে এরকম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে অমীমাংসিত বিতর্ক চলছে, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে হলে আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি অবশ্যই প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। যদিও সরকার ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে পদক্ষেপ গ্রহণে অন্তরায়সমূহ

অপপ্রচার : বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে প্রধান বাধা হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট তেল কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত জলবায়ু পরিবর্তনের অস্বীকার করে দেয়া কতিপয় রিপোর্ট, যা সাধারণ মানুষের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। এ সকল বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রতিরোধ করতে উষ্ণায়নের নতুন কারণ খুঁজে বের করছে, তারা আর্থিক সুবিধার জন্য নিজেদের ক্ষতিকর কার্যক্রমকে ঢেকে রাখতে চাচ্ছে। তারা কিছু কমন যুক্তি প্রদর্শন করেন যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে প্রাকৃতিক আবর্তনের একটি বিষয় যা প্রতিরোধ করতে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কর্পোরেট, নীতি নির্ধারকগণ এবং তাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীগণ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন। এসব দুর্যোগের কারণ হিসেবে মানুষকে দায়ী করতে রাজী নন ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে অনেক সভ্যতা বিলীন হওয়ার বিষয়টিও এসব স্বার্থবাদীরা বিশ্বাস করতে চান না। তদুপরি তারা সৃষ্টিকর্তার বাণীও অস্বীকার করেন যে মানবজাতির নিজেদের কর্মের ফলেই তার ধ্বংস আসবে। পবিত্র বাণী, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ইতিহাস কোনোকিছুই তাদেরকে বুঝাতে পারছে না যে মানবজাতির দুর্নীতি ও অসাবধানতার জন্যই তার ধ্বংস ধেয়ে আসছে।

জীবনযাত্রার ধরনের পরিবর্তন : জলবায়ু পরিবর্তনরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে আরেকটি বড় বাধা হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার দ্রুত পরিবর্তন। আমরা জানি যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিনোদন মানুষকে এমন শিক্ষা দিচ্ছে যার ফলে কেবল বাহ্যিক ভোগবিলাসে মানুষ মগ্ন হচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের পর মানুষের মনে এরকম পরিবর্তন ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়।

তদুপরি পুঁজিবাদী জীবন দর্শন, ভোগ সংস্কৃতি এবং বিশ্বায়ন এই উষ্ণায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। নির্মাণ, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। মানুষ এখন নানাভাবে প্রকৃতির উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজের উপরই তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

এর ফলে অপব্যয়ী জীবনযাত্রা প্রকৃতির উপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। তাই সবুজ আন্দোলন এবং পরিবেশবাদীদের বড় সমস্যা হলো মানুষকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক করতে না পারা।

বৈষম্য : ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকে কুক্ষিগত করেছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে নিরাপত্তাহীন মনে করছে। দরিদ্র এবং অভাবীগণ পরিবেশ বিপর্যয়ের দ্বারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন কিন্তু তারপরও তারা কোনো প্রতিকার বের করতে পারছেন না যেহেতু তারা সবসময়ই গ্রহণকারীর ভূমিকায় থাকেন। মধ্যবিত্তরা ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে নামতে ভয় পান কারণ তারা দিন আনে দিন খায় এবং তারা তাদের একমাত্র উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হওয়ার ভয় পান। নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তাবোধ পরিবর্তনের পথে একটা বড় বাধা। অতএব, এসব পরিবেশগত সমস্যা দূর করতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সরকারের উদাসীনতা : বেশি বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের চিন্তায় সরকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতিবাচক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করার সময় পান না। বড় ব্যবসায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার এসব প্রকল্প পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা চিন্তা করেন না। যা পরিবেশ দূষণকে ত্বরান্বিত করে। সরকার নানান কাজ যেমন বেকারত্ব দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু পরিবেশ নিয়ে ভাবার সময় পান না। এক্ষেত্রে সরকারকে এসব বিনিয়োগ এবং প্রকল্পসমূহকে পরিবেশ বান্ধবরূপে বাস্তবায়নের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

যুদ্ধ-বিগ্রহ : পরিবেশ দূষণে যুদ্ধের প্রভাব অনেক বেশি। পারমাণবিক অস্ত্র কিংবা হাইড্রোজেন বোমা সবই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে এর সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখতে পাই। তবে এসব যুদ্ধের মূল কারণ আমাদের মানসিক অবক্ষয় এবং আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা—এগুলো দূর করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোনো সীমানা নেই। সেগুলো অতিদ্রুত একদেশ থেকে আরেক দেশে ছড়ায়। তাই মানুষকে তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে জাতি, বর্ণ, দেশ ভুলে এক হতে হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে যেসব বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই দেখা দিচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই মূলত এ পরিবর্তিত জলবায়ুর জন্য দায়ী। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি :** বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রীনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূভাগের বরফ গলে যাবে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।
বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ, যেখানে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মিমি হারে বাড়ছে, যেখানে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১-২ মিমি/বছর। Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মিমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সাল লাগাদ তা ৩০ সেমি থেকে ১০০ সেমি এ পৌঁছাতে পারে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর নিচু এলাকাসমূহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভূপৃষ্ঠে পানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। এর ফলে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহতসহ তা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৩. **নিম্নভূমিতে প্লাবন :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য নিম্নভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং উপকূলীয় এলাকাসমূহ ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ কিমি এলাকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এই শতাব্দীর শেষ দিকে ২০-৬০ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং নদ-নদীর পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীর উৎস দেশের বাইরে ভারত ও নেপালে। তাই একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপরদিকে ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট যুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করবে।

৪. **জীববৈচিত্র্য ধ্বংস :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে। পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭০ ভাগ তলিয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেলে তা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনবে। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

৫. **নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জমিতে সেচ ও নৌ-চলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। এর ফলে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। ফলে সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করায় কৃষিতে প্রয়োজনীয় মৃদু পানির অভাব দেখা দেবে এবং দেশের সম্পদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের প্রায় ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এই লবণাক্ততার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৬. **আকস্মিক বন্যা :** পাহাড়ি ঢলের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষত মেঘনা অববাহিকায় প্রতিবছর আকস্মিক বন্যা দেখা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আকস্মিক বন্যার পৌনঃপুনিকতা, ক্ষতির পরিমাণ ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষত সিরাজগঞ্জ ও এর আশপাশের এলাকাসমূহে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

৭. **নদী ভাঙন :** বাংলাদেশে মোট সমুদ্র তটরেখার পরিমাণ ৭১১ কিলোমিটার। এর মধ্যে সুন্দরবন উপকূল ঘিরে রয়েছে ১২৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (সূত্র-বাংলাপিডিয়া)। এছাড়া সমুদ্র উপকূল বরাবর রয়েছে গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত অসংখ্য প্রশস্ত জোয়ার ভাটা সমভূমি এবং নদী মোহনায় রয়েছে বদ্বীপ। নদীসঙ্গমে অবস্থিত এসব বদ্বীপ ও সমুদ্র তটরেখা বরাবর ভূখণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এ পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের মাঝে এক বিশেষ ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে এ ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। বর্তমানে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নদী ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘনা ও পদ্মার তীরবর্তী এলাকাসমূহে নদী-ভাঙনের ফলে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে।

৮ **খরা :** মাটিতে আর্দ্রতার অভাব অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে খরা দেখা দেয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে যার প্রভাব বাংলাদেশেও দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শীতকালেও এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের হার বেশি। এর ফলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুত এলাকা মারাত্মক খরা উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হবে।

৯. **সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস :** সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে অন্যান্য প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকলেও পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই মূল কারণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুন মাসে যে সামুদ্রিক ঝড় হয় তাতে উপকূলীয় জেলাসমূহে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রাও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও বেড়ে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে 'সিডর' বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন রেখে গেছে তা বর্ণনাতীত। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে এটা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আঘাত। সিডর, সুনামি, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনেরই ফলাফল। আর পরিবেশ দূষণের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মানব সৃষ্ট দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য তা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। দূষণের জন্য বিশ্বের শিল্পায়িত দেশগুলোর দায়ভার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেক ধনী রাষ্ট্রই 'কিয়োটো প্রটোকল, ১৯৯৭' কার্যকর করেনি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা অত্যন্ত ব্যাপক হবে বলে পরিবেশ ও ভূ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের উচ্চতা কম থাকার কারণে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরোও ভয়াবহ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফলাফল। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে যে সকল ক্ষতি হতে পারে তা নিম্নরূপ :

১. **বিপন্ন জনগোষ্ঠী :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের প্লাবনে দেশের ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং প্লাবন এলাকার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

২. **অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি :** ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ ১৮০০০ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে ২৮০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবনের তীব্রতা বাড়বে এবং অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্লাবনজনিত কারণে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪২ মিলিয়ন টাকা।

৩. **বিপন্ন কৃষি :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের কৃষি খাত মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কৃষিখাতের ওপর এ বিপর্যয় দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্লাবনের কারণে দেশে আমন ধানের উৎপাদন ১৩.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাস পাবে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশের কৃষি উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৭০

শতাংশ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শীত মৌসুমে বাংলাদেশে প্রায় ৩৬০০ বর্গ কিমি এলাকা খরার কবলে পড়ে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার ব্যাপ্তি আরো বেড়ে তা ২২০০ কিমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে ফসলের ওপর খরার প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হলে দেশের মধ্য-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গমের আবাদ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং আলুর চাষও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সেচের অভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে চাষাবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৪. **লোনা পানির অনুপ্রবেশ :** দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেমি বৃদ্ধি পেলে ২৫,০০০ বর্গ কিমি এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া লোনা পানি প্রবেশের ফলে দেশের চিংড়ি শিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দেশের নদ-নদীতে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটলে স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হবে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন হবে।

৫. **পরিবেশ বিপর্যয় :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত অপ্রতুল। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুতে যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে সম্পদের অপ্রাপ্যতা আরো বেড়ে যাবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত বিনষ্ট হবে। ইতোমধ্যে দেশের বৃহৎ বনভূমি সুন্দরবন ও হাওর অঞ্চলের পরিবেশীয় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের করণীয় : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতটা কুফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য। এখনই সময় এ সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের সবচেয়ে যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে তা হলো–

১. ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এ ধারাবাহিকতায় দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ও নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে বনায়ন কর্মসূচি যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে। ফলে নদী ভাঙন ও সামুদ্রিক ঝড়ের তীব্রতা কমে যাবে।
২. বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং অক্সিজেন নির্গমন করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।
৩. বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায়, এমন ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন কমাতে হবে।
৪. পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৫. শিল্পকারখানার জ্বালানি সাশ্রয় করতে হবে এবং উৎপন্ন বর্জ্য বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. সর্বোপরি দেশের সবাইকে এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে, ঠিক তখনই এ মানবজাতি তার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে চরম বিপর্যয়ের দিকে। মানুষ তার প্রয়োজনে একদিকে যেমন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে অপরদিকে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। এ বিশ্ব আমাদেরই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাই এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

০৭ । ক. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ কি?

খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব আলোচনাপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তনে কিভাবে ধনী ও গরিব দেশগুলো পরস্পরের মুখোমুখি তা আলোচনা করুন।

গ. জলবায়ু পরিবর্তনে কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : বৈশ্বিক উষ্ণতা বা উষ্ণায়নের ইংরেজি প্রতিশব্দ Global Warming। এর সাথে আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হলো তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট কম সময়ে মানুষের কার্যক্রমের ফলে পৃথিবীর জলবায়ুর গড় তাপমাত্রার একটা লক্ষণীয় বৃদ্ধি। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায়, একশ থেকে দুইশ বছরের মধ্যে বিশ্বের জলবায়ুর উষ্ণতা ১ ডিগ্রি বা এর চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেলে এটাকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা যেতে পারে। অন্যদিকে, কোন জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন যার ব্যাপ্তি কয়েক যুগ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল; যেমন– জৈব প্রক্রিয়াসমূহ, পৃথিবী কর্তৃক গৃহীত সৌর বিকিরণের পরিবর্তন, প্লেট টেকটনিক, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। তবে বর্তমান কালে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, জলবায়ু পরিবর্তন বললে সারা পৃথিবীর ইদানীং সময়ের মানবিক কার্যকর্মের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন বোঝায় যা বৈশ্বিক উষ্ণতা নামেই বেশি পরিচিত।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ

পৃথিবীর উষ্ণতা মূলত দুটি কারণে বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রাকৃতিক কারণ ও মনুষ্যজনিত কারণে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে পৃথিবীর অক্ষরেখার পরিবর্তন, সূর্যরশ্মির পরিবর্তন, মহাসাগরীয় পরিবর্তন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত মূলত দায়ী। বিজ্ঞানীরা মনুষ্যজনিত কারণে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে বর্তমান কালের উষ্ণতা বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), জলীয়বাষ্প, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন (CFC) অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রিনহাউজ গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে কম্বলের মতো একটা আবরণ তৈরি করে, যা ভেদ করে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু বের হতে পারে না। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির পিছনে বহুলাংশে দায়ী কার্বন ডাই-অক্সাইড। এর পরিমাণ প্রাক্-শিল্পযুগ সময়ের (১৭৫০ সাল) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ১০০ ppmv (parts per million by volume) বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে বিগত ৩০-৪০ বছরেই প্রায় ৫০ ppmv বৃদ্ধি পেয়েছে। সভ্যতা বিকাশের জন্য আমরা বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি জীবাশ্ম জ্বালানির উপর, যা প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে। আবার দ্রুতহারে বন ধ্বংস ও ভূমি বিন্যাসের পরিবর্তন কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, কারণ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বন ধ্বংসের ফলে সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অবস্থায় থাকে।

পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ভূমি বিন্যাস ইত্যাদি তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন, একুশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ গ্রিন হাউজ গ্যাসের কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রাক্-শিল্পযুগের তুলনায় দুই গুণ থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন গড় উষ্ণতা প্রায় ১.১ থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও এ বৃদ্ধির পরিমাণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যাবে। নৈরাশ্যবাদী বৈজ্ঞানিকদের ধারণা অবশ্য অন্যরকম; তাদের মতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির এ ব্যাপারটি ঘটবে আরও দ্রুত, ২০৫০ সাল নাগাদ। গড়ে মাত্র ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি খোলা চোখে খুব সাধারণ বিষয় মনে হলেও সমগ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এর প্রভাব অনন্য।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে যে সকল বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো হলো–

প্রথমত, গোটা দুনিয়ায় যে ঋতু বৈচিত্র্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে আর কিছুটা পরিবর্তন ঘটলে এর সাথে আমাদের প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা এক সময় ঠিক মতো খাপ খাওয়াতে নাও পারে। ঋতু বৈচিত্র্যের কারণে, অসময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, খরা, অত্যধিক সংখ্যায় ঘূর্ণিঝড়, দাবানল খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যে। এসব ঘটনার কারণে শস্য উৎপাদন যে কোনো বছর হঠাৎ করে দারুণভাবে ব্যাহত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে স্বাদু পানির সবচেয়ে বড় উৎস হলো নদী-নালা, খাল-বিল, বৃষ্টির পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি। আবার নদী-নালাগুলোর পানির উৎস হলো পাহাড় পর্বতের ওপর অবস্থিত নানা হিমবাহ। এসব হিমবাহ দিন দিন গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ দিন দিন গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শুধু যে নদীর পানির পরিমাণ কমে যাচ্ছে তাই নয়, মাটির নিচের ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও নেমে যাচ্ছে। হিমবাহগুলো সম্পূর্ণ গলে গেলে নদীগুলো মরে যাবে। যা পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাবে।

তৃতীয়ত, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ইতোমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, নিচু অঞ্চল সাগরের পানির নিচে চলে যাবে। সাগর মহাসাগরের তীরে অবস্থিত সব দেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সত্য। বহু দ্বীপ, উপদ্বীপ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এর ফলে সৃষ্টি হবে ভয়াবহ এক মানবিক সমস্যা। কোটি কোটি মানুষ হারাবে তাদের ভিটে মাটি। হয়ে পড়বে উদ্বাস্তু।

চতুর্থত, বিশ্ব উষ্ণায়নে মরুকরণ শুরু হয়ে যেতে পারে ব্যাপকভাবে। সার্বিকভাবে গত তিরিশ বছরে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ০.৭৫ থেকে ১ ডিগ্রি বাড়লেও স্থানে স্থানে এ তাপমাত্রা কোথাও কোথাও সময়ে সময়ে ৫/৬ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ তাপমাত্রা এক সময় উদ্ভিদের সহনীয় মাত্রার বেশি হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, ভূমির আর্দ্রতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, মাটি হয়ে পড়ছে শুকনা খটখটে অনুর্বর। যেসব উদ্ভিদের শিকড় মাটির বেশি নিচে যায় না, পানির অভাবে তারা মারা যাচ্ছে, পানির স্তর আরও নিচে চলে যাওয়াতে বড় বড় গাছও মারা পড়বে পানির অভাবে। ফলে পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ব্যাপক মরুকরণ শুরু হয়ে যাবে, যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েও গেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে দেখা যাবে দুনিয়ার আবাদী জমি ও জঙ্গলের সিংহভাগই মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব উপরিউক্ত দিকগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর রয়েছে আরও বহুমুখী বিরূপ ফল।

মুখোমুখি গরিব দেশ বনাম ধনী দেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদন গরিব দেশগুলোতে কমই হয়। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই খুবই গরিব। যেসব দেশের ঝুঁকি কম সেগুলোর এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার মতো পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা আছে। এ ধরনের অধিকাংশ দেশই পৃথিবীর ধনী দেশ। মূলত গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রধান দায় সভ্যতার চালক উন্নত সব পুঁজিবাদী দেশগুলোর। সবচেয়ে বেশি চীন তারপর যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত, জাপান, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। চীন ও যুক্তরাষ্ট্র একাই প্রতিবছর ২০০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এর বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে, আর বাকি দেশগুলো করে ১০০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এর বেশি। কিন্তু এ কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমানোর জন্য উন্নত দেশগুলোর এক ধরনের অনীহা দেখা যায়। দায়ী দেশগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করলেও তা হাত কেটে হাতের মূল্য দেওয়ার মতো কিংবা নিজেকে দাতা দেশ সাজিয়ে ভুক্তভোগী দেশে প্রকল্প খাটিয়ে নিজেদের সুনাম বজায় রাখার মানসিকতার মতো। উন্নত দেশগুলো

একাই গ্রিনহাউজ গ্যাস বৃদ্ধির দায়ভার স্বীকার করছে না এবং তাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের শিল্প ও সংস্থা বজায় রাখার অপকৌশল হিসেবে দরিদ্র দেশকে তাদের দেশের কার্বন উৎপাদনকারী বিভিন্ন শিল্প বন্ধের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণা করছে যা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণেরই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বাংলাদেশের জলবায়ু বৈচিত্র্যময়। এখানে গ্রীষ্মকালে গরম, বর্ষাকালে বৃষ্টি এবং শীতকালে ঠাণ্ডা পরিবেশ এ জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখীন। ফলে বিদ্যমান ঋতু বৈচিত্র্যে এসেছে অস্বাভাবিক পরিবর্তন। ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিতি এ দেশটির ঋতুচক্রকে এখন চেনাই দুষ্কর। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, কিন্তু এর প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র পীড়িত দেশসমূহ। ভৌগোলিক অবস্থান, অত্যধিক জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতা খুবই ভয়াবহ। ইউরোপিয়ান এনজিও জার্মান ওয়াচের মতে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশ প্রকৃতির সবচেয়ে বেশি কোপানলে পড়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে, ২০৫০ সাল নাগাদ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ লোক ক্ষুধার করাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে যে দশটি দেশ খাদ্য স্বল্পতার হুমকির মুখে আছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে একটি। সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বাড়লে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৮ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও দেশের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ লোক সরাসরি ক্ষতির মধ্যে পড়বে। সমুদ্রের এ উচ্চতা বৃদ্ধির বিপরীতে ৪৮০০ কিমি এলাকাতে উপকূল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হলে খরচ পড়বে আনুমানিক ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। আর এতে জিডিপি'র পরিমাণ শতকরা ২৮ থেকে ৫৭ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের হেতু বাংলাদেশের উপর যে ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে তা হচ্ছে— সমুদ্র গর্ভে বিলীনের আশঙ্কা। মরুময়তা ও খরা বৃদ্ধি। কৃষি উৎপাদন হ্রাস। নদ-নদীর ক্ষীণপ্রবাহ। পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি। আকস্মিক বন্যা। জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস। সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। লোনা পানির অনুপ্রবেশ। পরিবেশ বিপর্যয়। সুপেয় পানির অভাব। ফসলি জমি হ্রাস। মৎস্য ও বনজ সম্পদ ধ্বংস। ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা বিপন্ন। নিম্নভূমিতে প্লাবন। অত্যধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু একটি আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়। তবে দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হিসেবে এর অবশ্যম্ভাবী বিরূপ ফলাফলের অন্যতম শিকার দুর্যোগ প্রবণ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতটা কুফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমিকা ঠিক ততটাই নগণ্যরূপে পরিগণিত। তথাপি অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকেই। যদিও বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের জন্য এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য দুই-ই সীমিত। তথাপি এ সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে অগ্রসর হতে হবে, যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করা যায়। সেজন্য বাংলাদেশের জন্য যেটি অত্যাবশ্যক সেটি হলো দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ গবেষক দল গঠন, যারা সার্বক্ষণিকভাবে বিষয়টির প্রতি নজর রাখবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও সরকারকে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। আপৎকালীন সময়ে জনগণকে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও সবুজ বেষ্টনী নির্মাণসহ অন্যান্য কর্মসূচিকে আরো ব্যাপক ও গতিশীল করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ **গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি?**

উত্তর : পৃথিবীকে ঘিরে এর চারপাশে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিমি পর্যন্ত রয়েছে ওজোনস্তর। যার ঘনত্ব সব জায়গায় একরকম নয়। ২৩ কিমি উর্ধ্বে এর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এখানে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অপর কয়েকটি গ্যাসের বেষ্টনী। এ গ্যাসগুলোকে একত্রে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। এ গ্যাসের বেষ্টনী রাসায়নিক পর্দা হিসেবে কাজ করে। গ্রিন হাউসের কাচের দেয়াল যেভাবে তার ভেতরের উষ্ণতাকে বাইরে বিকিরণ হতে বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনিভাবে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট রাসায়নিক পর্দা বা গ্যাসের দেয়াল ভূ-পৃষ্ঠের শোষিত তাপের বিকিরণ ঘটাতে বাঁধা দেয়। গ্যাসের এ দেয়াল আছে বলেই কিছু পরিমাণ তাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে থেকে যায় এবং এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকে। ফলে পৃথিবীতে যে উষ্ণতা থাকে তা জীবের পক্ষে বাসযোগ্য হয়। জীবের বসবাসের অনুকূল এরূপ পরিস্থিতিকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট।

প্রশ্ন-০২ **রিও (পরিবেশ) সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য নীতিগুলো তুলে ধরুন।**

উত্তর : জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এটি ১৯৭২ সালের ১৬ জুন স্টকহোমে জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের ঘোষণার প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করে। রিও ডি জেনিরোতে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। এ নীতিমালাসমূহ রিও ঘোষণা নামে অনুমোদন করা হয়। রিও ঘোষণায় ২৭টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। রিও ঘোষণার উল্লেখযোগ্য নীতিগুলো হলো : ১. টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব সম্পদ; ২. জাতিসংঘের ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব পরিবেশ ও উন্নয়নমূলক নীতির অনুবর্তী নিজস্ব সম্পদ উত্তোলন করার অধিকার রাখে; ৩. উন্নয়নের অধিকার অবশ্যই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নয়নমূলক ও পরিবেশগত চাহিদার মধ্যে পক্ষপাতহীন হতে হবে; ৪. টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ রক্ষণকে এর অত্যাবশ্যক অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং একে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে না; ৫. রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব অংশীদারিত্বের চেতনায় বিশ্বের আবহাওয়া ব্যবস্থা সংরক্ষণ, রক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ও পূর্ণতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে; ৬. রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর পরিবেশগত আইন প্রণয়ন করবে; ৭. পরিবেশের অবক্ষয় বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তু বা কার্যক্রম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা অন্য দেশে স্থানান্তরে নিরুৎসহিত বা প্রতিরোধে রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর সহায়তা প্রদান করবে; ৮. রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৯. কোনো প্রস্তাবিত কার্যক্রমে

একাই গ্রিনহাউজ গ্যাস বৃদ্ধির দায়ভার স্বীকার করছে না এবং তাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের শিল্প ও সংস্থা বজায় রাখার অপকৌশল হিসেবে দরিদ্র দেশকে তাদের দেশের কার্বন উৎপাদনকারী বিভিন্ন শিল্প বন্ধের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণা করছে যা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণেরই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বাংলাদেশের জলবায়ু বৈচিত্র্যময়। এখানে গ্রীষ্মকালে গরম, বর্ষাকালে বৃষ্টি এবং শীতকালে ঠাণ্ডা পরিবেশ এ জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখীন। ফলে বিদ্যমান ঋতু বৈচিত্র্যে এসেছে অস্বাভাবিক পরিবর্তন। ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিতি এ দেশটির ঋতুচক্রকে এখন চেনাই দুষ্কর। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, কিন্তু এর প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র পীড়িত দেশসমূহ। ভৌগোলিক অবস্থান, অত্যধিক জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতা খুবই ভয়াবহ। ইউরোপিয়ান এনজিও জার্মান ওয়াচের মতে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশ প্রকৃতির সবচেয়ে বেশি কোপানলে পড়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে, ২০৫০ সাল নাগাদ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ লোক ক্ষুধার করাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে যে দশটি দেশ খাদ্য স্বল্পতার হুমকির মুখে আছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে একটি। সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বাড়লে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৮ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও দেশের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ লোক সরাসরি ক্ষতির মধ্যে পড়বে। সমুদ্রের এ উচ্চতা বৃদ্ধির বিপরীতে ৪৮০০ কিমি এলাকাতে উপকূল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হলে খরচ পড়বে আনুমানিক ১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। আর এতে জিডিপি'র পরিমাণ শতকরা ২৮ থেকে ৫৭ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের হেতু বাংলাদেশের উপর যে ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে তা হচ্ছে— সমুদ্র গর্ভে বিলীনের আশঙ্কা। মরুময়তা ও খরা বৃদ্ধি। কৃষি উৎপাদন হ্রাস। নদ-নদীর ক্ষীণপ্রবাহ। পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি। আকস্মিক বন্যা। জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস। সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। লোনা পানির অনুপ্রবেশ। পরিবেশ বিপর্যয়। সুপেয় পানির অভাব। ফসলি জমি হ্রাস। মৎস্য ও বনজ সম্পদ ধ্বংস। ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা বিপন্ন। নিম্নভূমিতে প্লাবন। অত্যধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু একটি আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়। তবে দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হিসেবে এর অবশ্যম্ভাবী বিরূপ ফলাফলের অন্যতম শিকার দুর্যোগ প্রবণ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতটা কুফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমিকা ঠিক ততটাই নগণ্যরূপে পরিগণিত। তথাপি অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকেই। যদিও বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের জন্য এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য দুই-ই সীমিত। তথাপি এ সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে অগ্রসর হতে হবে, যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করা যায়। সেজন্য বাংলাদেশের জন্য যেটি অত্যাবশ্যক সেটি হলো দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ গবেষক দল গঠন, যারা সার্বক্ষণিকভাবে বিষয়টির প্রতি নজর রাখবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও সরকারকে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। আপৎকালীন সময়ে জনগণকে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও সবুজ বেষ্টনী নির্মাণসহ অন্যান্য কর্মসূচিকে আরো ব্যাপক ও গতিশীল করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ **গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি?**

উত্তর : পৃথিবীকে ঘিরে এর চারপাশে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিমি পর্যন্ত রয়েছে ওজোনস্তর। যার ঘনত্ব সব জায়গায় একরকম নয়। ২৩ কিমি উর্ধ্বে এর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এখানে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অপর কয়েকটি গ্যাসের বেষ্টনী। এ গ্যাসগুলোকে একত্রে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। এ গ্যাসের বেষ্টনী রাসায়নিক পর্দা হিসেবে কাজ করে। গ্রিন হাউসের কাচের দেয়াল যেভাবে তার ভেতরের উষ্ণতাকে বাইরে বিকিরণ হতে বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনিভাবে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট রাসায়নিক পর্দা বা গ্যাসের দেয়াল ভূ-পৃষ্ঠের শোষিত তাপের বিকিরণ ঘটাতে বাঁধা দেয়। গ্যাসের এ দেয়াল আছে বলেই কিছু পরিমাণ তাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে থেকে যায় এবং এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকে। ফলে পৃথিবীতে যে উষ্ণতা থাকে তা জীবের পক্ষে বাসযোগ্য হয়। জীবের বসবাসের অনুকূল এরূপ পরিস্থিতিকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট।

প্রশ্ন-০২ **রিও (পরিবেশ) সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য নীতিগুলো তুলে ধরুন।**

উত্তর : জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এটি ১৯৭২ সালের ১৬ জুন স্টকহোমে জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের ঘোষণার প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করে। রিও ডি জেনিরোতে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। এ নীতিমালাসমূহ রিও ঘোষণা নামে অনুমোদন করা হয়। রিও ঘোষণায় ২৭টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। রিও ঘোষণার উল্লেখযোগ্য নীতিগুলো হলো : ১. টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব সম্পদ; ২. জাতিসংঘের ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব পরিবেশ ও উন্নয়নমূলক নীতির অনুবর্তী নিজস্ব সম্পদ উত্তোলন করার অধিকার রাখে; ৩. উন্নয়নের অধিকার অবশ্যই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নয়নমূলক ও পরিবেশগত চাহিদার মধ্যে পক্ষপাতহীন হতে হবে; ৪. টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ রক্ষণকে এর অত্যাবশ্যক অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং একে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে না; ৫. রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব অংশীদারিত্বের চেতনায় বিশ্বের আবহাওয়া ব্যবস্থা সংরক্ষণ, রক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ও পূর্ণতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে; ৬. রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর পরিবেশগত আইন প্রণয়ন করবে; ৭. পরিবেশের অবক্ষয় বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তু বা কার্যক্রম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা অন্য দেশে স্থানান্তরে নিরুৎসহিত বা প্রতিরোধে রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর সহায়তা প্রদান করবে; ৮. রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৯. কোনো প্রস্তাবিত কার্যক্রমে

পরিবেশের প্রভাব নিরূপণ জাতীয় কৌশল হিসেবে নেয়া হবে এবং পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত আবশ্যক; ১০. পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সেজন্য টেকসই উন্নয়ন অর্জনে তাদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন-০৩ পরিবেশগত শরণার্থী বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : বনাঞ্চল ক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি, মরুকরণ, খরা, ভূমিক্ষয়, পানি এবং বায়ুদূষণের কারণে যেসব মানুষ বাস্তুহারা হয় তারাই পরিবেশগত শরণার্থী। তবে সবগুলো বিষয় যে একসাথে কাজ করে তা নয় বরং যে কোনো একটির কারণেও বাস্তুহারা হতে পারে। পরিবেশ বিশারদ ও গবেষক Myers এবং Kent পরিবেশগত শরণার্থীকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'যেসব লোক কোনো অস্বাভাবিক পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে তাদের ঐতিহ্যগত বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় এবং নিরাপদ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না তারাই পরিবেশগত শরণার্থী।'

প্রকৃতপক্ষে পরিবেশগত শরণার্থীর কোনো একক সংজ্ঞা নেই, যদিও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী একে বিচ্ছিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবে একে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হচ্ছে এবং গ্রহীতা রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তাগত দিক থেকে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তবে পরিবেশগত শরণার্থীর সংখ্যা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাতে বেশি।

প্রশ্ন-০৪ জলবায়ু কূটনীতি কি?

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মতৈক্যে পৌঁছানোর ধীরগতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ যে নীতি বা প্রক্রিয়া গ্রহণ করে তাকে বলা হয় জলবায়ু কূটনীতি। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন সুনামি, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি, খরার আঘাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান ফলাফল। জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর মতে, বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী না হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার। এই বাস্তবতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার লক্ষ্যে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোশিয়েশন টিম ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নেগোশিয়েশনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যা বাংলাদেশের সফল জলবায়ু কূটনীতির উদাহরণ।

প্রশ্ন-০৫ গ্রিন পিস কি?

গ্রিন পিস একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন। পরিবেশ বিষয়ে প্রথা বিরোধী এবং উচ্চকিত প্রতিবাদের জন্য আলোচিত। ১৯৭১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পারমাণবিক যুদ্ধ তথা পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর মধ্য দিয়ে এ সংস্থার পদচারণা শুরু হয়। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কা দ্বীপে অনেকগুলো পারমাণবিক পরীক্ষার ঘোষণা দেয়। এ পরিবেশবিরোধী ঘোষণার বিরুদ্ধে কিছুসংখ্যক মার্কিন ও কানাডীয় নাগরিক একটি জাহাজে করে আলাস্কা দ্বীপে যাত্রা করে। তাদের প্রতিবাদের কারণে একটি মাত্র পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ দ্বীপটিকে পরে পাখির অভয়ারণ্য করা হয়েছে। গ্রিন পিস সিল

নিধন, তিমি শিকার ও সমুদ্রে বর্জ্য অপসারণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ সংস্থার দাবির কারণেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিল দিয়ে তৈরি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরিণামে সিল নিধন আগের তুলনায় প্রায় এক-ষষ্ঠাংশে নেমে আসে। ১৯৮৭ সালে গ্রিন পিস এন্টার্কটিকায় ওয়ার্ল্ড পার্ক পতাকা উত্তোলন করে। এ সংগঠন বিশ্বের সর্বত্র রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন পরিচালনা করছে। ১৯৯৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে এ সংগঠন তাদের নিজস্ব জাহাজ 'রেইনবো ওয়ারিয়র'-এর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ সংগঠনের শাখা রয়েছে।

টীকা

♦ The World Climate Conference–3 *[২৯তম বিসিএস]*

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)-এর আয়োজনে ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে The World Climate Conference-3 বা তৃতীয় জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অনুন্নত দেশগুলো জলবায়ু সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার তথ্য, প্রকল্প সেবা আদান-প্রদান করবে, জলবায়ু সংক্রান্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে একত্রে কাজ করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সকল চ্যালেঞ্জ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করবে বলে জাতিসংঘের WMO-এর আওতায় 'Global Framework for Climate Services' নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির প্রধান ৪টি উপাদান হলো– ১. পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা অবলম্বন করা, ২. গবেষণা, কাঠামো ও পূর্বাভাস, ৩. জলবায়ু সংশ্লিষ্ট তথ্য, ৪. ব্যবহারকারীর কর্মসূচি সীমা নির্দিষ্টকরণ। এ চারটি উপাদানের প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে এবং শেষ দুটি উপাদান ঐক্যবদ্ধভাবে World Climate Service System-এর আওতায় অর্জন করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। 'Global Framework for Climate Services' চুক্তির উন্নতিতে পরবর্তীতে উচ্চ পর্যায়ের অস্থায়ী টাস্কফোর্স গঠন করা হবে বলে চুক্তিতে বলা হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। নীতিনির্ধারক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এনজিও নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বিশ্বের কমপক্ষে ১৫টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এ সম্মেলনে অংশ নেন।

♦ প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি *[২১তম বিসিএস]*

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত আন্তর্জাতিক দলিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে রিও সম্মেলনকে সামনে রেখে এ চুক্তি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিল জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি। পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের আগেই সেটি চূড়ান্ত করে স্বাক্ষরের জন্য ধরিত্রী সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৫৪টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত তা অনুমোদন বা অনুসমর্থন করেনি। বাংলাদেশও এতে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। এই কনভেনশন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার বলতে এই বোঝায় যে, এর ব্যবহার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিতভাবে করতে হবে যাতে দীর্ঘমেয়াদেও এর সম্পদ সঙ্কুচিত না হয়। সেই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার বলতে বংশগতির ধারা বহনকারী জিন সমেত কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের ব্যবহার বুঝায়। জীব ও জড় পরিবেশ নিয়ে গঠিত পরিবেশ ব্যবস্থাকেও আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। নিজ নিজ জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রতিটি দেশের পূর্ণ অধিকার আছে। এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বও আছে। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন সচিবালয় কানাডার মন্ট্রিলে অবস্থিত।

♦ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন *[১৮তম বিসিএস]*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সম্মেলন। বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) নামেও এটিকে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯২ সালে রিওডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে '৯৭-এর জুনের ২৪ থেকে ২৮ এই পাঁচদিনের সম্মেলনে সত্তরটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানেরা নিউইয়র্ক শহরে মিলিত হয়েছিলেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট রজালি ইসমাইল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনসহ ৬৮ জন শীর্ষনেতা বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ওপর জোর দেন। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন উন্নত ধনী রাষ্ট্রগুলোর জোট অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোর জোট, একাধিক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। শীর্ষ সম্মেলনের অন্যতম ইস্যু গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। সম্মেলনে অন্যতম আলোচ্য বিষয় গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো একমত হতে পারেনি। ধাপে ধাপে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ কমানোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমত হলেও কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কমানোর ব্যাপারে রাজি হয়নি। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এক বিলিয়ন সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

♦ COP18 ও কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ বৃদ্ধি

খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু। এর প্রতিক্রিয়া পড়তে শুরু করেছে সর্বত্রই। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ ও সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘ ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করে আসছে বিশ্ব সম্মেলন। এরই অংশ হিসেবে কাতারের রাজধানী দোহায় ২৬ নভেম্বর—৮ ডিসেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সংগঠন UNFCCC-এর ১৮তম সম্মেলন। বিশ্বে কার্বন নিঃসরন কমানোর লক্ষ্যে আয়োজিত এ অধিবেশনে বিশ্বের ২০০টি দেশে প্রায় ১৭,০০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। কার্বন নির্গমন হ্রাসে নতুন আইনগত চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বিদ্যমান একমাত্র আইনি বাধ্যবাধকতা কিয়োটো প্রোটোকলের মেয়াদ আট বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। নতুন আইনগত চুক্তি ডারবান প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারে তিন বছর মেয়াদি একটি 'ওয়ার্ক প্রোগ্রাম' চূড়ান্ত করা হয়। মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের ব্যাপারে খুব বেশি অগ্রগতি না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে ২০২০ সাল নাগাদ ১০০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের ব্যাপারে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। তবে ঐ রোডম্যাপে পর্যায়ক্রমে জলবায়ু সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। তবে এতে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা থাকছে না। দরিদ্র ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো আগামী তিন বছরের জন্য অর্থাৎ ২০১৫ সাল পর্যন্ত জলবায়ু তহবিলে মধ্যমেয়াদি আর্থিক সহায়তার জন্য ৬০ বিলিয়ন ডলার দাবি করলেও ধনী রাষ্ট্রগুলো এ পরিমাণ অর্থ দিতে এখন পর্যন্ত কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তবে তারা অলিখিতভাবে বলছে, আগামী তিন বছরের জন্য তারা জলবায়ু তহবিলে প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন করে মোট ৩০ বিলিয়ন ডলার দেবে। মূলত এটাই ছিল দোহা জলবায়ু সম্মেলনে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর প্রাপ্তি।

♦ রিও+২০ সম্মেলন

ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি ২০১২ সালের জুনে। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ২০১২ সালের ২০-২২ জুন অনুষ্ঠিত হয় 'রিও + ২০' (Rio + 20) বা 'আর্থ সামিট ২০১২' (Earth Summit 2012) সম্মেলন। এ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মূল্যায়ন করেন পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নে তারা কতটা এগিয়েছে, কোথায় কোথায় পিছিয়েছে। ধরিত্রী সম্মেলনে ১৯৯২ সালে গৃহীত একুশ শতকের এজেন্ডার মূল্যায়ন হয়।

রিও কনভেনশনত্রয়ী জলবায়ু সনদ, জীববৈচিত্র্য সনদ আর মরুময়তা সনদের হালনাগাদ অবস্থানেরও মূল্যায়ন হয়। দশ বছর আগে ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হয় 'রিও + ১০'-এ গৃহীত 'জোহানেসবার্গ প্ল্যান অব ইমপ্লিমেন্টেশন'। সেটির কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। সবুজ অর্থনীতি, সবুজ উন্নয়ন, সবুজ জিডিপি আর সবুজ মানব উন্নয়ন কী করে নিশ্চিত করা যায় তারও আলোচনা হয় 'রিও + ২০' শীর্ষ সম্মেলনে। সম্মেলনের ফোকাস থিম দুটি— ১. টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নির্মূল প্রেক্ষাপটে সবুজ অর্থনীতি ও ২. টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

♦ ডারবান রোডম্যাপ

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ২৮ নভেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর ২০১১ অনুষ্ঠিত ১৭তম জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাই ডারবান রোডম্যাপ। সম্মেলন শেষে নির্ধারিত সময়ের ৩৬ ঘণ্টা পর এ রোডম্যাপ গৃহীত হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্বে। রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০১২ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণ কমাবে ইইউ (EU)। শিল্পোন্নত দেশের জোট অ্যানেক্স-১, উদীয়মান অর্থনীতির জোট BASIC, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর জোট LDC, ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর জোট AOSIS এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের সম্মিলিত জোট অর্থাৎ সব পক্ষের সম্মতিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ঠেকাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের একটি রোডম্যাপ এসেছে এ সম্মেলনে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং পরিবর্তিত আবহাওয়ার প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তা করার লক্ষ্যে এতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডারবান রোডম্যাপের প্রধান প্রধান দিকগুলো হলো— ডারবান সম্মেলনের বড় সফলতা হল একটি বিশ্ব জলবায়ু চুক্তির রোডম্যাপ তৈরি। এতে এই প্রথমবারের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী বড় বড় দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১নং ও ৩নং কার্বন নিঃসরণকারী দেশ চীন ও ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কারণে যে কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ২নং কার্বন নিঃসরণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে কিয়োটো প্রটোকল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন এ চুক্তি ২০১৫ সাল নাগাদ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে এবং ২০২০ সাল থেকে তা কার্যকর হবে।

♦ প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন (রিও ঘোষণা)

জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৯৯২ সালের ৩–১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এটি ১৯৭২ সালের ১৬ জুন স্টকহোমে জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের ঘোষণার প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করে। রিও ডি জেনিরিওতে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। এ নীতিমালাসমূহ রিও ঘোষণা নামে অনুমোদন করা হয়। রিও ঘোষণায় ২৭টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। রিও ঘোষণার প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো : ১. টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব সম্পদ; ২. জাতিসংঘের ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব পরিবেশ ও উন্নয়নমূলক নীতির অনুবর্তী নিজস্ব সম্পদ উত্তোলন করার অধিকার রাখে; ৩. উন্নয়নের অধিকার অবশ্যই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নয়নমূলক ও পরিবেশগত চাহিদার মধ্যে পক্ষপাতহীন হতে হবে; ৪. টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ রক্ষণকে এর অত্যাবশ্যক অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং একে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে না; ৫. রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব অংশীদারিত্বের চেতনায় বিশ্বের আবহাওয়া ব্যবস্থা সংরক্ষণ, রক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ও পূর্ণতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে; ৬. রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর পরিবেশগত

আইন প্রণয়ন করবে; ৭. পরিবেশের অবক্ষয় বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তু বা কার্যক্রম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা অন্য দেশে স্থানান্তরে নিরুৎসাহিত বা প্রতিরোধে রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর সহায়তা প্রদান করবে; ৮. রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৯. কোনো প্রস্তাবিত কার্যক্রমে পরিবেশের প্রভাব নিরূপণ জাতীয় কৌশল হিসেবে নেয়া হবে এবং পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত আবশ্যক; ১০. পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সেজন্য টেকসই উন্নয়ন অর্জনে তাদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি।

♦ দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন)

২৬ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয় দশ দিনব্যাপী বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন বা দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন। দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল বিশ্ববাসীর দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে টেকসই উন্নয়ন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা। ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ সম্মেলনের চূড়ান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯১টি দেশ অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের চূড়ান্ত অধিবেশন উদ্বোধন করেন দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকি। সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ধরিত্রী সম্মেলনে মোট ৩৭টি অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. সম্মিলিত শক্তি ও টেকসই উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
২. মানবিক ঐক্য গঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করে সভ্যতা এবং জনগণের মধ্যে সংলাপ ও সহযোগিতায় অনুপ্রেরণা জানানো।
৩. জোহানেসবার্গের সম্মেলনে মানুষের সমান অধিকারের ওপর আলোকপাত এবং মৌলিক চাহিদা যেমন– বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, পর্যাপ্ত আশ্রয়, জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দ্রুত উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য, সময়সীমা এবং অংশীদারিত্বের বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে স্বাগত জানানো। একই সময়ে আর্থিক সংস্থানের প্রবৃদ্ধি ঘটাতে একে অন্যের সহযোগী হিসেবে একত্রে কাজ করা। মুক্তবাজারের সুফল পেতে এবং চিরদিনের জন্য অউন্নয়নকে বিতাড়িত করতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।
৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী কঠোর হুমকিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া। এসব হুমকি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বৈদেশিক আগ্রাসন, সশস্ত্র বিরোধ, অবৈধ মাদক সমস্যা, সংঘবদ্ধ অপরাধ, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অবৈধ অস্ত্র বেচাকেনা, সন্ত্রাসবাদ, অসহিষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতিভেদ, ছোঁয়াচে এবং স্থায়ী রোগ বিশেষ করে এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মা।
৫. মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস অ্যান্ড দি জোহানেসবার্গ প্লান অব ইমপ্লিমেনটেশন অনুযায়ী সব কার্যক্রমে মেয়েদের সমান অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী মুক্তি নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো।
৬. দারিদ্র্য দূরীকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং মানবজাতির টেকসই উন্নয়নের জন্য যে সংগ্রাম তার জন্য বিশ্বসম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন। একই সঙ্গে মানবিক সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেয়া।
৭. উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আবেদন জানানো।
৮. আঞ্চলিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় ভিত্তিতে আঞ্চলিক সংগঠন এবং জোটগুলোর যেমন নিউ পার্টনারশিপ ফর আফ্রিকাস ডেভেলপমেন্ট (এনইপিএডি)-এর অনিবার্যতাকে সমর্থন প্রদান।

৯. উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ অব্যাহত রাখা।
১০. টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘ সময় এবং বোর্ডভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সব স্তরে বাস্তবায়নের দাবি রাখে। সমাজের অংশীদার হিসেবে দৃঢ় বন্ধুত্বের জন্য সব বড় সংগঠন যারা এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তাদের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া।
১১. সাম্য এবং টেকসই জাতি ও সমাজের ক্রমবিকাশে বেসরকারি পর্যায়ে ছোটবড় সব সংস্থারই বৈধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের দায়িত্ব আছে।
১২. আইএলও (ILO)-র আইন অনুযায়ী চাকরি সুবিধাদির জন্য আয়মুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর ব্যাপারে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

♦ মন্ট্রিল প্রটোকল

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে কানাডার মন্ট্রিলে ওজোনস্তর রক্ষায় যে যুগান্তকারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই 'মন্ট্রিল প্রটোকল' নামে খ্যাত। বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী দ্রব্যসমূহের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করার জন্য ভিয়েনা কনভেনশনের আওতায় মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয় ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে সাথে নীতি নির্ধারণের বিষয়টি এ প্রটোকলের আওতায় প্রায় সমান তালে অগ্রসর হয়েছে। ওজোন স্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী হচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট রাসায়নিক। মন্ট্রিল প্রটোকলে এ ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার বন্ধ, সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করার সময়সূচি স্থির করা হয়। তার মধ্যে আছে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, হাইড্রোফ্লোরোকার্বন, মিথাইল ক্লোরোফর্ম ইত্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার কমানো। সিএফসির মাধ্যমে ক্ষতিকর যে ক্লোরিন অণু বাতাসে মিশেছে সেগুলো বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘদিন থেকে যায়। ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি ভূপৃষ্ঠে পৌছার ফলে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ৩২টি দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করে। এরপর কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শেষে ১৯৮৫ ভিয়েনা কনভেনশন গ্রহণের পর সমঝোতা হয়। এ কনভেনশনে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহকে চিহ্নিত করা হয়নি, যে কারণে সেগুলোর ব্যবহার সীমিত বা নিষিদ্ধ করার কোনো সময়সূচি স্থির করা হয়নি। ১৯৮৬ সালে তাই বাধ্যতামূলক লক্ষ্য নিয়ে পুনরায় আলোচনার সূত্রপাত হয়। তাতে সাফল্য আসে প্রটোকল গ্রহণের মাধ্যমে। প্রটোকলে সদস্যরা সিএফসির উৎপাদন ও ব্যবহার সীমিত করতে সম্মত হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য সেগুলোর ব্যবহার ও উৎপাদন পৃথকভাবে ১৯৯৯ সালের মধ্যে ১৯৮৬ সালের স্তর হিসাব করে তার ৫০ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। ১৯৮৯ সালে ফিনল্যান্ড-এর হেলসিংকিতে প্রটোকলের সদস্যদের প্রথম সভায় ২০০০ সালের মধ্যে সিএফসি উৎপাদন বন্ধ করার এবং হ্যালনের ব্যবহার সীমিত করার ব্যাপারে একমত হয়। প্রটোকলের সদস্যদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। সংশোধনীতে ১০টি নতুন দ্রব্য তালিকাভুক্তি সহ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ২০০০ সালের মধ্যে এবং মিথাইল ক্লোরোফর্ম ২০০৫ সালের মধ্যে বন্ধ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়। এ সভায় উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য মাল্টিল্যাটারাল ফান্ড গঠন করা হয়। এ সংশোধনী অনুমোদনকারী সদস্য দেশ। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে সদস্যদের তৃতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে। বাংলাদেশ এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী হিসেবে সমস্ত ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্ট্যান্স (ODS) বন্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ।

♦ গ্রিন পিস

গ্রিন পিস একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন। পরিবেশ বিষয়ে প্রথা বিরোধী এবং উচ্চকিত প্রতিবাদের জন্য আলোচিত। ১৯৭১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পারমাণবিক যুদ্ধ তথা পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর মধ্য দিয়ে এ সংস্থার পদচারণা শুরু হয়। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কা দ্বীপে অনেকগুলো পারমাণবিক পরীক্ষার ঘোষণা দেয়। এ পরিবেশবিরোধী ঘোষণার বিরুদ্ধে কিছুসংখ্যক মার্কিন ও কানাডীয় নাগরিক একটি জাহাজে করে আলাস্কা দ্বীপে যাত্রা করে। তাদের প্রতিবাদের কারণে একটি মাত্র পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ দ্বীপটিকে পরে পাখির অভয়ারণ্য করা হয়েছে। গ্রিন পিস সিল নিধন, তিমি শিকার ও সমুদ্রে বর্জ্য অপসারণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ সংস্থার দাবির কারণেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিল দিয়ে তৈরি পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরিণামে সিল নিধন আগের তুলনায় প্রায় এক-ষষ্ঠাংশে নেমে আসে। ১৯৮৭ সালে গ্রিন পিস এন্টার্কটিকায় ওয়ার্ল্ড পার্ক পতাকা উত্তোলন করে। এ সংগঠন বিশ্বের সর্বত্র রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন পরিচালনা করছে। ১৯৯৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে এ সংগঠন তাদের নিজস্ব জাহাজ 'রেইনবো ওয়ারিয়র'-এর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ সংগঠনের শাখা রয়েছে।

♦ জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) *[৩২তম বিসিএস]*

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি–যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বিশ্ব নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির অধিকাংশই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণ বিশেষ করে গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া এবং বনভূমি উজাড় করার ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এর ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আধুনিককালে ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস, শিল্পায়নের ফলে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এর ফলে ১৮৫০-১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

♦ 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট' (Green house effect) *[২২তম; ২০তম বিসিএস]*

গ্রিন হাউস শব্দের আক্ষরিক অর্থ সবুজ ঘর। আর গ্রিন হাউস ইফেক্ট অর্থ সবুজ ঘর প্রতিক্রিয়া। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবী নামের গ্রহটি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। দক্ষিণ গোলার্ধে ওজোন স্তরের ফাটল দিয়ে বিনা বাধায় ঢুকছে ক্ষতিকর বিভিন্ন রশ্মি। এখানে সেখানে হলুদ বৃষ্টি ও বাতাসে ক্লোরাফ্লোরো-কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সবুজ বনাঞ্চল, গলে যাচ্ছে ইউসেমিটি পর্বতের শুভ্র তুষার। কলকারখানার ধোঁয়া, জ্বালানি শক্তি দহন, অধিক জনবসতি ইত্যাদি কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। তাছাড়াও বিভিন্ন রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হচ্ছে ক্ষতিকর মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন গ্যাস ইত্যাদি। এসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে এবং সৃষ্টি করছে একটি দুর্বোধ্য স্তর, যার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপ ওপরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবার ফিরে আসছে পৃথিবীর দিকে। এ অবস্থাকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট।

♦ আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহারসংক্রান্ত নীতিমালা

হেলসিঙ্কি নীতিমালার (১৯৬৬) ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত দেশ, অভিন্ন নদীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন বিবেচনা করবে। এ জন্য অবশ্যই অন্য দেশের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ২৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এক অববাহিকাভুক্ত একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক অববাহিকায় প্রবাহিত পানির ব্যবহার সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অবহিত করবে। জাতিসংঘ নীতিমালার (১৯৯৭) ৭ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি দেশ আন্তর্জাতিক পানিপ্রবাহ থেকে পানি ব্যবহারের সময় পার্শ্ববর্তী একই অববাহিকার অন্যান্য দেশের যাতে কোনো বড় ধরনের ক্ষতি না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। UNEP Convention on Biological Diversities, ১৯৯২-এ বলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশ বিশ্বের পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। World Commission on Dams (WCD) 1998, Established by World Bank and IUCN-এ বলা হয়েছে, কোনো নদীতে বড় ড্যাম তৈরি করতে চাইলে সেই নদী বেসিনের মানুষের কাছে অবশ্যই এ ড্যামের গ্রহণযোগ্যতা (Peoples' Acceptance) নিশ্চিত করতে হবে। কোনো ড্যামের উচ্চতা ১৫ মিটারের বেশি হলে এবং জলাধারের ধারণক্ষমতা ৩ মিলিয়ন কিউবিক মিটারের বেশি হলে WCD একে বড় ড্যাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। টিপাইমুখ বাঁধ উপরে উল্লিখিত বড় বাঁধের সংজ্ঞার চেয়ে ১১ গুণ বেশি উঁচু এবং এর জলাধার ৫০০ গুণ বেশি বড়।

♦ ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে 'ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন' (Climate and Clean Air Coalition) নামে নতুন একটি জোট গঠন করা হচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ এ জোট গঠনের ঘোষণা দেন। এর সদস্য দেশ ছয়টি। দেশগুলো হলো— বাংলাদেশ, কানাডা, ঘানা, মেক্সিকো, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্র। ২০১২ সালের এপ্রিলে সুইডেনের স্টকহোমে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ, নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, রাজনৈতিক সমর্থন আদায়, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট দেশ, কোম্পানি, বেসরকারি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠায় নতুন এ জোট কাজ করবে। জোটের কার্যক্রম পরিচালনায় মার্কিন সরকার প্রাথমিকভাবে এক কোটি ২০ লাখ ডলার অনুদান দেয়।

♦ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধে ঐতিহাসিক চুক্তি

১২ নভেম্বর ২০১৪ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধে ঐতিহাসিক এক চুক্তি করে দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। এ চুক্তির আওতায় একটি কর্মপরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০২৫ সালের মধ্যে তার দেশের গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ২০০৫ সালের তুলনায় ২৬-২৮ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনার নতুন লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেন। চীন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঘোষণা না করলেও ২০৩০ সালের মধ্যে নিঃসরণ কমিয়ে আনার পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের কথা জানান।

২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী শীর্ষ দেশ ছিল দ্রুত শিল্পায়িত হয়ে ওঠা চীন। মোট নিঃসৃত গ্যাসের ২৯ শতাংশ নিঃসরণ করে দেশটি। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখন নিঃসৃত হয় ১৫ শতাংশ গ্যাস।

♦ LIMA COP 20

১-১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ পেরুর রাজধানী লিমায় অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের জলবায়ু সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন। এ সম্মেলনে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আরও ৪৮ ঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পর বিশ্বের ১৯৪টি দেশ একটি ন্যূনতম সমঝোতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। সব দেশের প্রতিনিধিরা সম্মতি দেয়ায় জলবায়ু ইস্যুতে প্রায় দুই দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো একটি বৈশ্বিক চুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সম্মেলনে যেসব বিষয় প্রাধান্য পায় সেগুলো হলো :

- ⊙ প্রতিটি জাতির দায় ও সামর্থ্যের পার্থক্যকে বিবেচনায় রেখে ২০১৫ সালে একটি উচ্চাভিলাষী জলবায়ু চুক্তির চেষ্টা করবে দেশগুলো।
- ⊙ সম্মত দেশগুলো ২০১৫ সালের প্রথম প্রান্তিকেই জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করবে।
- ⊙ নতুন পরিকল্পনায় এখন পর্যন্ত প্রতিশ্রুত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে প্রতিটি দেশকে।
- ⊙ ২০১৫ সালের নভেম্বরে দেশগুলোর প্রতিশ্রুতির ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে জাতিসংঘের জলবায়ু সংস্থা।

♦ ইবোলা ভাইরাস

ইবোলা মূলত একটি আরএনএ ভাইরাস। এটি একটি ফাইলো ভাইরাস, দেখতে আঁশ বা সুতার মতো। সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার একটি ভগ্নাংশের সমান আকারের ভাইরাসটি প্রায় আনুবীক্ষণিক। এর নামকরণ করা হয়েছে কঙ্গোর উপনদী 'ইবোলা'র নামানুসারে। ইবোলা ভাইরাস গোত্রের ৫টির মধ্যে ৩টি প্রজাতি মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়ে গুরুতর অসুস্থ করার ক্ষমতা রাখে। বাকি ২টি মানুষের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে *জায়ারে (Zaire) ইবোলা ভাইরাস* (জায়ারে, যার বর্তমান নাম গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র যেখানে সর্বপ্রথম এ ভাইরাসে কোনো মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল)। প্রথমবার এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৯০ শতাংশ।

সঠিকভাবে ইবোলা ভাইরাসজনিত রোগের উৎপত্তি কোথায় বা কিভাবে, তা জানা না গেলেও ধারণা করা হয় বাদুরের দেহ অভ্যন্তরে এ রোগের ভাইরাস বংশবিস্তার করে। পরবর্তীতে মানুষ বা অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী, যেমন— গরিলা, আফ্রিকান শিম্পাঞ্জি, সজারু ও মৃগ-এর মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭৬ সালে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (তৎকালীন জায়ারে) ও সুদানে প্রথম ইবোলা শনাক্ত করা হয়। সম্প্রতি মধ্য আফ্রিকার চারটি দেশ— গিনি, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও নাইজেরিয়ায় ইবোলা ভাইরাস রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। ইতোমধ্যে এ রোগে ১২ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৮২৬ লোক আক্রান্ত হয় এবং ১০৭০০ লোক মারা যায়। ফলে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত ও আতঙ্কিত ভাইরাস 'ইবোলা'। রোগটির ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকায় ৬-৭ আগস্ট ২০১৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সভা করে এ রোগের বর্তমান প্রাদুর্ভাবকে Public Health Emergency of International Concern হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে। প্রাণঘাতী এ ইবোলা ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশেও সতর্কতা জারি করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ১০ আগস্ট ২০১৪ সরকারিভাবে ৯০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করে মন্ত্রণালয়।

Section B

Empirical Issues

① জাতিসংঘ
The United Nations

② ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক সম্পর্ক
Foreign Relations of Major Powers

③ বৈশ্বিক উদ্যোগ ও সংস্থা
Global Initiatives & Institutions

④ আঞ্চলিক সংস্থা
Regional Institutions

⑤ বিশ্বের দ্বন্দ্ব ও বিবদমান বিষয়
Major Issues and Conflicts in the World

⑥ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি
Politics in South Asia

⑦ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ
Bangladesh in International Affairs

অধ্যায় ০১

জাতিসংঘ
The United Nations

Syllabus

The United Nations System : *The UN and its organs, importance and limitations of the UN, Reforms of the UN, Role of the Security Council, UN Peacekeeping and peace-building functions, Human rights agenda, Environmental agenda, International Court of Justice, and Women empowerment.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করুন। পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘের কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? [৩০তম বিসিএস]*

০২. *জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার মতামত প্রদান করুন। [২১তম বিসিএস]*

০৩. *জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার জন্য আপনি কি সংস্থাটির সনদের সংশোধন বাঞ্ছনীয় মনে করেন? আলোচনা করুন। [১৩তম বিসিএস]*

০৪. *"জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।"— আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করুন। [৩২তম বিসিএস]
অথবা, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মসূচিতে অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন। [২৯তম বিসিএস]

০৫. *জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডের সফলতা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করুন। [১৭তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. *ক. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।*
খ. নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর করতে আপনার সুপারিশমালা ব্যক্ত করুন।

০৭. *পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

০৮. *ক. ভেটো (Veto) ক্ষমতা কি?*
খ. আপনি কি মনে করেন একটি পুনর্গঠিত জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ নীতির বিলুপ্তি ঘটানো উচিত। যৌক্তিকতাসহ আলোচনা করুন।

০৯. *আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করুন।*

১০. *ক. আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও কার্যাবলী উল্লেখপূর্বক এর দুর্বলতা তুলে ধরুন।*
খ. আন্তর্জাতিক আদালতের সংস্কারে আপনার সুপারিশ ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ সৌদি আরব কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো আলোচনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]*
০২. *জেনেভা কনভেনশন কি? এর মূল উদ্দেশ্য কি?*
০৩. *CEDAW (সিডও)-এর পূর্ণরূপ কি? এটি কোন ধরনের দলিল বা চুক্তি?*
০৪. *শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব বা The Uniting for Peace Resolution বলতে কি বোঝায়?*
০৫. *জাতিসংঘ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?*
০৬. *জাতিসংঘের সরকারি ভাষা কয়টি ও কি কি? এর দাপ্তরিক ভাষা কি?*
০৭. *জাতিসংঘ সনদ কত সালে এবং কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?*
০৮. *জাতিসংঘের প্রথম ও বর্তমান মহাসচিবের নাম কি এবং তারা কোন দেশের অধিবাসী?*
০৯. *জাতিসংঘে এ পর্যন্ত কতজন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন? এর মধ্যে একমাত্র এশীয় মহাসচিব কে ছিলেন?*
১০. *জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা কত? নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়?*
১১. *জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্রের নাম কি? এটি জাতিসংঘের কততম সদস্যপদ লাভ করে?*
১২. *জাতিসংঘ ব্যতীত এর কোন কোন অঙ্গসংস্থা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে?*
১৩. *জাতিসংঘের মূল সংস্থা কয়টি ও কি কি?*
১৪. *জাতিসংঘের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত এবং কত সালে স্থাপিত হয়?*
১৫. *আটলান্টিক সনদ (Atlantic Treaty) কি?*
১৬. *নিষেধাজ্ঞা (Embargo) এবং বয়কট (Boycott) কি?*
১৭. *ভেটো ক্ষমতা কি?*
১৮. *বেইজিং নারী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা কি কি?*

জাতিসংঘ : গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

টীকা

- *জাতিসংঘ*
- *সাধারণ পরিষদ*
- *নিরাপত্তা পরিষদ*
- *অছি পরিষদ (Trusteeship Council)*
- *সচিবালয় (Secretariat)*
- *জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ [৩৩তম বিসিএস]*
- *আন্তর্জাতিক বিচার আদালত [৩১তম; ২৪তম বিসিএস]*
- *আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)*
- *খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)*
- *বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)*
- *UNESCO*
- *বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)*
- *আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)*
- *জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)*
- *বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)*
- *বিশ্ব বুদ্ধি সম্পদ সংস্থা (WIPO)*
- *আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)*
- *আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO)*
- *জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)*
- *জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)*
- *জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU)*
- *UNFPA*
- *শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ*
- *এসকাপ (ESCAP)*
- *সর্বজনীন মানবাধিকার [২১তম বিসিএস]*
- *প্লাটফরম ফর অ্যাকশন*
- *বেইজিং নারী সম্মেলন*
- *ইয়াল্টা সম্মেলন*
- *জাতিসংঘ নারীবিষয়ক সম্মেলন বেইজিং + ৫*
- *শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯*
- *সিডও সনদ*
- *মানবাধিকার চুক্তি*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। **সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করুন। পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘের কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[৩০তম বিসিএস]***

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সঙ্গত কারণেই এ প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার ছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। তাই জাতিসংঘ সনদের মুখবন্ধে উল্লেখ করা হয়, 'এই সংগঠন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করবে।' জাতিসংঘ বর্তমানে সাত দশকে পা রেখেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পটভূমিতে এই দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডে সফলতা এবং ব্যর্থতা দুটোই রয়েছে। তবে সার্বিক পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে ব্যর্থতার চিত্রই প্রকট হয়ে দেখা দেবে। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘের কর্মকাণ্ড এখন বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্রীড়নক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুর্যোগময় সন্ধিক্ষণে জাতিসংঘের জন্ম। বিশ্বের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়। তবে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘের সাফল্য

বহু হতাশা-ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ এখনও যুদ্ধ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নির্যাতনও দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। নিচে জাতিসংঘের সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. **শান্তি প্রতিষ্ঠা :** ১৯৪৫ সাল থেকে জাতিসংঘ দু শতাধিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছে। এতে অবসান হয়েছে অনেক আঞ্চলিক সংঘাতের। এছাড়া নীরব কূটনীতির মাধ্যমে ৮০টি আসন্ন যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হয়েছে।

২. **গণতন্ত্রের উন্নয়ন :** জাতিসংঘ কম্বোডিয়া, নামিবিয়া, এল সালভাদার, ইরিত্রিয়া, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব তিমুরসহ ৪৫টি দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে সক্ষম হয়েছে। এতে গণতন্ত্রের পথ সুগম হয়েছে।

৩. **উন্নয়ন বিকাশ :** জাতিসংঘ বহিঃসাহায্যের চেষ্টার পরিবর্তে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সম্পদ নিয়োজিত করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছে। বিগত প্রায় সাড়ে ছয় দশকের প্রতি বছরে এ সংস্থা ঋণ ও মঞ্জুরি হিসেবে ১ হাজার কোটি ডলার প্রদান করেছে।

৪. **মানবাধিকার উন্নয়ন :** ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ গ্রহণের পর থেকে জাতিসংঘ রাজনৈতিক, নাগরিক ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত ৮০টি চুক্তি স্বাক্ষরে সাহায্য করেছে।

৫. **পরিবেশ সংরক্ষণ :** জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘের উদ্যোগে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট সকল দেশসমূহের সুষম উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই উন্নয়নের ওপর জাতিসংঘ ধরিত্রী সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল বিশ্ববাসীর দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে টেকসই উন্নয়ন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা। ১৯১টি দেশ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

৬. **পরমাণু বিস্তার রোধ :** আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘ ৯০টি দেশে পরমাণু চুল্লি পরিদর্শন করেছে। এতে পরমাণু সরঞ্জামের ব্যবহার যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা এ পদক্ষেপ নেয়।

৭. **আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বনির্ভরতা :** জাতিসংঘ ৮০টি সদস্য দেশের স্বনির্ভরতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৮. **আন্তর্জাতিক আইন জোরদার :** জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় তিন শতাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনে পরিণত হয়েছে। এতে মানবাধিকার সনদ থেকে মহাকাশ ও সমুদ্র তলদেশে পরমাণু সরঞ্জাম ব্যবহারের চুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৯. **আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি :** আন্তর্জাতিক আদালত বিশ্বব্যাপী বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাহায্য করেছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে ভূখণ্ড বিরোধ, একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি, জিম্মি হিসেবে আটক ও অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত।

১০. **বর্ণবৈষম্যের অবসান :** জাতিসংঘ বর্ণবাদী প্রথার অবসানে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বর্ণবাদী প্রথাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

উপর্যুক্ত সফলতা থাকা সত্ত্বেও নতুন বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক চলছে জোরেশোরে। প্রশ্ন উঠেছে, জাতিসংঘ আসলে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করতে পারবে কিনা। নিচে জাতিসংঘের ব্যর্থতা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক আলোচিত হলো :

১. **মধ্যপ্রাচ্য :** ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং অধিকৃত ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়া। জাতিসংঘের চাপ থাকা সত্ত্বেও ইসরাইল আজও সে এলাকা ছাড়েনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের স্বার্থরক্ষার জন্য অসংখ্যবার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি নাসের আল কিদওয়া বলেন, 'The bitter reality is that veto has been cast to shield Israel from the will of the international Community and to except Israel from the provisions of international.'

২. **ইরাক :** উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ইরাকের ওপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে। ইরাকের সাথে জাতিসংঘের সংমান্য বিরোধিতার নাম করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময় ব্যাপক বোমা হামলা চালায়। অতঃপর ২০০৩ সালে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ইরাকে ব্যাপক হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দেশটি প্রায় দখল করে নেয়।

৩. **বসনিয়া :** জাতিসংঘ বসনিয়ার গণহত্যার বিষয়টিকে কোন দৃষ্টিতে দেখছে তা বলা মুশকিল। এখানে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তাই ইউরোপীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক কূটনৈতিক বসনিয়ায় জাতিসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন, 'What we have in Yugoslavia isn't peacekeeping, peace making or peace inforcing.'

৪. **কসোভো :** কসোভোর জাতিগত আলবেনীয় সমস্যার সমাধানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

৫. **জীবাণু অস্ত্র বিলোপ ও অসম আচরণ :** জীবাণু অস্ত্র বিলোপ এবং পরমাণু অস্ত্রের বিস্তৃতি রোধ করাসহ জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ সব দেশের প্রতি সমান আচরণ করতে পারেনি।

৬. **পশ্চিমা স্বার্থ :** দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জাতিসংঘের অধিকাংশ সাফল্যের সাথে পশ্চিমা স্বার্থের বিষয়টি জড়িয়ে যাচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জাতিসংঘ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

জাতিসংঘের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা, কার্যপ্রণালী ও নিয়মনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটভূমি বিবেচনা করলে এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়। যেমন–

১. **নিরাপত্তা পরিষদের গঠনগত ত্রুটি :** নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমানে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। এ দেশ পাঁচটির মধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং রাশিয়া এ তিনটি দেশ হলো ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় ইউরোপ পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের মধ্যে ৬.৬ শতাংশ অথচ নিরাপত্তা পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্বের হার হলো ৬০ শতাংশ। অন্যদিকে পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের ২০ শতাংশের অধিকারী আফ্রিকা, প্রায় ১২ শতাংশের অধিকারী দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রায় ৬ শতাংশের অধিকারী ওশেনিয়া অঞ্চলের কোনো প্রতিনিধিত্বই নেই। অন্যদিকে এশিয়া মহাদেশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬১ শতাংশেরও বেশি বাস করলেও নিরাপত্তা পরিষদে এশিয়ার প্রতিনিধিত্বের হার মাত্র ২০%, অর্থাৎ একমাত্র চীন এ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছে। এমতাবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিত্বের বৈষম্য দূরীকরণকে অনেক বিশেষজ্ঞই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

২. **সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা :** জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ হলো সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সকলের অংশগ্রহণের একমাত্র ক্ষেত্র। একমাত্র সাধারণ পরিষদেই সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সর্বজনীনভাবে অংশ নিতে পারে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও ভেটো ক্ষমতার ফলে সাধারণ পরিষদ তেমন কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না। তাই অনেকেই আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে আরো কার্যকর করতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩. **নিরাপত্তা পরিষদের অত্যধিক ক্ষমতা :** জাতিসংঘকে অনেকে আন্তর্জাতিক সংগঠন না বলে পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের বিশেষায়িত সংগঠন বলার পক্ষপাতি। কারণ জাতিসংঘের গঠন কাঠামো অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ যে ক্ষমতা চর্চা করে তাতে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের তেমন কোনো ভূমিকাই থাকে না। এমনকি এ পাঁচটি রাষ্ট্রের সামষ্টিক কর্তৃত্বের মাঝেও কোনো কোনো দেশ একক কর্তৃত্ব ভোগ করে। এমতাবস্থায় অনেকেই নিরাপত্তা পরিষদকে সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে আনার পক্ষপাতি।

৪. **নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ :** নিরাপত্তা পরিষদকে আরো প্রতিনিধিত্বশীল ও বৃহৎ শক্তির কবল থেকে মুক্ত করার জন্য এর সম্প্রসারণ প্রয়োজন বলে অনেক বিশেষজ্ঞই অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাদের মতে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বৃহৎ শক্তির একাধিপত্য রোধ করতে জাতিসংঘের সম্প্রসারণ আবশ্যক।

৫. **মহাসচিবের সীমিত ক্ষমতা :** জাতিসংঘের মহাসচিব সংস্থাটির সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি হিসেবে যেরূপ ক্ষমতা থাকার কথা সেরূপ ক্ষমতা তার হাতে নেই। নিরাপত্তা পরিষদের চূড়ান্ত ক্ষমতা বা সিদ্ধান্তকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তাছাড়া বৃহৎ শক্তিগুলোর বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার মোকাবিলায় তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

৬. **শান্তিরক্ষায় ব্যর্থতা :** শান্তি, নিরাপত্তা আর সমৃদ্ধির মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘের জন্ম হলেও সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী অশান্তি আর আধিপত্যবাদ তা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। বিশেষ করে ১৯৪৫ সালে যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল বর্তমান কালে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা তখন ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো পৃথিবীকে তাদের আপন আপন স্বার্থে নতুন রূপ দিতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তারপর বিশেষত সত্তর কিংবা আশির দশকের পর হতে দেশে দেশে জাতিগত দ্বন্দ্ব ও নতুন শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের যে উত্থান তা মোকাবিলায় জাতিসংঘের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো যথোপযুক্ত নয়। কেননা এটি পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে অক্ষম।

৭. **অর্থনৈতিক দৈন্যদশা :** অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ও নির্ভরশীলতা জাতিসংঘের একটি বিরাট সীমাবদ্ধতা। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় দেশের চাঁদার ওপর নির্ভরশীলতা হেতু সংস্থাটি এদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া সদস্য রাষ্ট্রগুলো রীতিমতো চাঁদা পরিশোধ না করায় অনেক কর্মসূচিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। কেননা বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন বিলিয়ন লোকের ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করা এবং শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে বিশাল অর্থের প্রয়োজন তার যোগান দেয়া জাতিসংঘের জন্য একটি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতিসংঘের সংস্কারের সম্ভাব্য রূপরেখা

জাতিসংঘের সংস্কারের যে সব দিক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সংস্থাটির কাঠামোগত সংস্কার। তবে কার্যপ্রণালী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকার ক্ষেত্রে সংস্কার আবশ্যক। যেমন–

১. **নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ :** নিরাপত্তা পরিষদকে সম্প্রসারণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে জার্মানি, জাপান, ব্রাজিল এবং ভারত নিরাপত্তা পরিষদে তাদের স্থায়ী সদস্যপদ দাবি করে বিভিন্ন মহলে লবিং শুরু করলেও এক্ষেত্রে কিছু নীতিমালার অনুসরণ জরুরি। যেমন– প্রথমত, জাপানের অর্থনৈতিক শক্তি ও জাতিসংঘে তাদের ভূমিকাকে বিবেচনায় এনে দেশটির নিরাপত্তা পরিষদে সদস্যপদ প্রদান অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অবস্থান এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা বিবেচনায় এনে আফ্রিকা মহাদেশ হতে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকা হতে ব্রাজিলের স্থায়ী সদস্যপদের বিষয় বিবেচনা করা যায়। তৃতীয়ত, নতুন করে ইউরোপের কোনো দেশকে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ প্রদানের কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২. **ভেটো ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ :** জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে ভেটো ক্ষমতার বিষয়টিকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আনা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে ভেটো ক্ষমতার বিপরীতে জাতিসংঘ মহাসচিবের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে তিনি কোনো একটি মাত্র দেশের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে অচলাবস্থার অবসান করতে পারবেন।

৩. **সাধারণ পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবস্থা প্রবর্তন :** বর্তমান অবস্থা হতে উন্নত করে সাধারণ পরিষদকে কার্যকর করতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় কোনো আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৪. **মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি :** জাতিসংঘ মহাসচিবকে আরো বেশি করে কার্যকর ক্ষমতা প্রদান জরুরি। এক্ষেত্রে মহাসচিবকে কেবল নিন্দা করা, আহ্বান জানানো বা পদত্যাগের ন্যায় গতানুগতিক বিষয়ের বাইরে যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৫. **আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ :** দারিদ্র্য, বেকারত্ব আর অশিক্ষা বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস কিংবা যুদ্ধের চেয়েও বেশি মারাত্মক সমস্যা। আফ্রিকার দেশগুলোতে এইডসের মহামারী সে অঞ্চলের দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ-বিগ্রহের চেয়েও করুণ ইতিহাস রচনা করে চলেছে। এমতাবস্থায় জাতিসংঘকে সম-অংশীদার ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া উচিত। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাসের ব্যাপারে মনোযোগী না হলে এ বৈষম্য বিশ্ব ব্যবস্থাকে চরম সংকটের দিকে নিয়ে যাবে।

৬. **জাতিসংঘ সনদ পরিবর্তন :** জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি কোনো সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে জড়িত পক্ষগুলোর সম্মতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারে না এমতাবস্থায় সনদে কিছুটা পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

৭. **চাঁদার ব্যাপারে কঠোরতা :** জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দেয় চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে আরো বেশি কঠোরতা জরুরি। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ গোঁড়ামি করে দীর্ঘদিনের চাঁদা দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় এরূপ দেশের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। অন্যদিকে চাঁদা হতে প্রাপ্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তার মনিটরিং ব্যবস্থা আরো সঠিক ও স্বচ্ছ হওয়া অতীব জরুরি।

৮. **শান্তিরক্ষা :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে আরো বেশি শান্তিমুখী করা উচিত। কেননা সোমালিয়া, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক ও উপসাগরীয় অঞ্চল প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা দেখে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন যে, এসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার নামে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। তাছাড়া অস্ত্র পরিদর্শনের নামে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাগিরি, জাতিসংঘকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ইরাকের মতোএকটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশকে দখল করে নেয়া, যেনতেনভাবে ইরান, সিরিয়াসহ অন্যান্য দেশকে হুমকি প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের একটি যৌক্তিক কাঠামো দাঁড় করানো উচিত।

সর্বোপরি, জাতিসংঘ ব্যবস্থাকে আরো বেশি গণমুখি করা উচিত। কেবল বৃহৎ শক্তির স্বার্থ নয়; বরং ৭০০ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একুশ শতকের উপযোগী একটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো জরুরি। সাম্প্রতিক কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতার আলোকে অনেকে জাতিসংঘের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রকৃতার্থে তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা যত কমই হোক, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোর পুনর্গঠনে এবং সর্বোপরি আর একটি বিশ্বযুদ্ধ না হওয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা একেবারে কম নয়।

০২ । জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার মতামত প্রদান করুন। *[২১তম বিসিএস]*

উত্তর : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ শাসক মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দেয়া উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দর্শনসম্বলিত ভাষণে বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানান, তারা যেন জাপান, জার্মানি ও ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সেই থেকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বজুড়ে এক ধরনের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেসব দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পদ লাভের প্রত্যাশী তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জাপান, জার্মানি, ভারত, ব্রাজিল ও নাইজেরিয়া। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করলে নিরাপত্তা পরিষদের দু স্থায়ী সদস্য যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স অনেক ক্ষেত্রেই উক্ত দেশ কয়টির চেয়ে কম শক্তিশালী ও কম গুরুত্বপূর্ণ।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতা : প্রায় তিন দশক ধরে নিরাপত্তা পরিষদের গণতন্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিকীকরণ এবং তার ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এ ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। এ কারণে ব্রাজিল, জার্মানি, জাপান ও ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দানের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মহাসচিব বুট্রোস ঘালি জার্মানির হামবুর্গে নিরাপত্তা পরিষদের নতুন স্থায়ী সদস্যরূপে ভারত, জার্মানি, জাপান, নাইজেরিয়া ও ব্রাজিলের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৯৯১ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত সাধারণ পরিষদে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব পেশ করে। সর্বসম্মতভাবে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, ১৯৯২ সালে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে এ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মতামত অবগত হবার জন্য ১৯৯৩-এর ৩০ জুন পর্যন্ত মহাসচিবকে সময় দেয়া হবে। প্রস্তাব উত্থাপন করে ভারতীয় প্রতিনিধি দল বলেন যে, ঠাণ্ডাযুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। জাতিসংঘের বাড়তি সদস্য সংখ্যার প্রতিফলন ঘটাতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। জার্মানি, জাপান ও ব্রাজিল এর আগেই স্থায়ী সদস্যপদের দাবি জানিয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের নতুন সদস্যপদ দেবার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ও আয়তন যেমন বিবেচ্য বিষয়, তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দেশটির অবস্থান ও ভূমিকা নতুন করে বিবেচনা করা উচিত। ১৯৯২ সালের ৭ নভেম্বর তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন জাপান ও জার্মানিকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দেবার জন্য সুপারিশ করেন।

ম্যাডেলিন অলব্রাইট ও বুট্রোস ঘালির মতামত : ১৯৯৪-এর ১৪ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি ম্যাডেলিন অলব্রাইট জার্মানির বিদেশমন্ত্রী ক্লাউস কিংকেলকে বলেন যে, ভারতকে নয়, জাপান ও জার্মানিকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী। তার মতে, জাপান ও জার্মানির অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং জাতিসংঘের তহবিলে তাদের দেয় অর্থের পরিমাণ ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীনের তুলনায় অনেক বেশি। এ কারণেই তাদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া উচিত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে জানানো হয় যে, একমাত্র বর্তমান স্থায়ী সদস্যদেরই ভেটো দানের ক্ষমতা থাকবে। নতুন সদস্যদের এ ক্ষমতা থাকবে না। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মহাসচিব বুট্রোস ঘালি স্থায়ী সদস্যপদের বিষয়ে জাপান ও জার্মানির মত জানার জন্য ঐ দুটি দেশ সফর করেন। স্থায়ী সদস্যপদ দেবার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান ও জার্মানির নাম প্রায় পাকা করে ফেলে। অন্যদের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করেনি।

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব : ১৯৯৩ সালে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর সম্মেলনে এ অঞ্চলের একটি রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দেবার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ১৯৯২ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দশম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠন এবং ভারতের মতো দেশকে স্থায়ী সদস্যপদ দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এখন আমরা দেখি ব্রাজিল, ভারত, জার্মানি ও জাপান—এ চারটি দেশের মধ্যে কার সবার আগে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন পাওয়া উচিত।

আফ্রিকা অঞ্চলের সদস্যপদ প্রাপ্তির যৌক্তিকতা : ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা থেকেও নিরাপত্তা পরিষদের অন্তত একটা স্থায়ী সদস্য থাকা উচিত ছিল। জাতিসংঘের সূচনাপর্বে প্রায় পুরো আফ্রিকা মহাদেশই কোনো না কোনো ইউরোপীয় দেশের উপনিবেশ ছিল। কিন্তু বর্তমানে গোটা আফ্রিকা মহাদেশই স্বাধীন। পশ্চিম আফ্রিকার বড় দেশ নাইজেরিয়া বিশ্বের সপ্তম বৃহৎ জনবহুল দেশ। আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় নাইজেরিয়াকেও নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দেয়ার পক্ষে অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশি যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আফ্রিকার সেরা শক্তি দক্ষিণ আফ্রিকাও নিরাপত্তা পরিষদে সদস্যপদ পাওয়ার জোর দাবিদার।

ব্রাজিলের সদস্যপদ পাওয়ার যৌক্তিকতা : ব্রাজিল ল্যাটিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ। আয়তন এবং জনসংখ্যা উভয় দিক থেকেই এটি বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ দেশ। ব্রাজিল অনেকবারই নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন পাবার ক্ষেত্রে ব্রাজিলের দাবি অনেক জোরালো হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আফ্রিকার মতো গোটা ল্যাটিন আমেরিকা থেকেও পরিষদে কোনো স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব নেই। আর এ এলাকা থেকে পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাতে হলে গুরুত্বের বিচারে সবার আগে ব্রাজিলের নামই আসে।

এশিয়ার দুটি দেশের সদস্যপদ : ভারতীয় নেতারা নিরাপত্তা পরিষদে একটি স্থায়ী আসন পাবার ক্ষেত্রে নিজেদের দাবিকে সবচেয়ে জোরালো এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করেন। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ আর আয়তনের দিক থেকে সপ্তম বৃহৎ। ভারত মনে করে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা পরিষদে না বসতে পারা খুবই হাস্যকর। ভারত যদি নিরাপত্তা পরিষদে আসন গ্রহণ করে, তবে পরিষদে একই সাথে তৃতীয় বিশ্ব এবং জোট নিরপেক্ষ বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। অনেকে মনে করেন, কয়েক বছর আগে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা পরিষদে তার স্থায়ী আসন পাবার যুক্তিকে জোরালো করা। তখন অনেক ভারতীয় নেতাও জোরের সাথে বলেছিলেন যে, এবার আমাদেরও আণবিক বোমা রয়েছে। কারণ কাকতালীয়ভাবে হলেও সত্যি যে, তখন পর্যন্ত বিশ্বের স্বীকৃত পাঁচ পারমাণবিক শক্তি ছিল ঐ দেশগুলোই, যারা নিরাপত্তা পরিষদেরও স্থায়ী পাঁচ সদস্য।

প্রতি চার বছরে একবার করে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে জাপান পরিষদের একরকম আধা-স্থায়ী সদস্যে পরিণত হয়েছে। অস্থায়ী আসনের আইন চালু হওয়ার পর থেকে একবার কি দুবার জাপান সুযোগ পায়নি। তাছাড়া প্রতি চার বছরেই দু বছরের জন্য সে একবার করে পরিষদে যাচ্ছে। যদি প্রতি দু বছর অন্তত কোনো দেশের জন্য পরিষদে যাবার বাধা না থাকতো, তবে জাপান আরো বেশিবার নির্বাচিত হয়ে নিরাপত্তা পরিষদে আসন গ্রহণ করতো। নিরাপত্তা পরিষদে জাপানের স্থায়ী আসন

লাভ করাকে যুক্তরাষ্ট্র জোরালোভাবে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই জাতিসংঘের খরচ সবচেয়ে বেশি বহন করে জাপান। জাপান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে জাপান। তাই জাপানের গরিব দেশগুলোর ওপর অনেক রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন পাবার ক্ষেত্রে জাপান ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের চেয়েও অনেক বেশি যোগ্য। মূলত বুট্রোস ঘালির রিপোর্টে যে পাঁচটি দেশকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন দানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে জাপানই সবার আগে সে সম্মান লাভের আশা করতে পারে। নিচে আমরা তার সপক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরছি :

জার্মানির সদস্যপদ : অর্থ-বিত্ত-সম্পদ-প্রযুক্তিতে জার্মানি বর্তমান বিশ্বের এক অতি প্রভাবশালী সদস্য। তারা জাতিসংঘের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থ সরবরাহকারী। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই জার্মানির একটি স্থায়ী আসন পাওয়াকে সমর্থন করবে, কারণ ঐসব দেশ জার্মানি থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়ে থাকে। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ইউরোপের বৃহত্তম দেশ। বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গত কারণেই যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সব সময় স্থায়ী সদস্য হিসেবে জার্মানিকে সমর্থন করে এসেছে।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ প্রেক্ষিত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা : জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি তার সুপারিশমালায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ প্রদানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য রক্ষা, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিবেচনা করেই নাইজেরিয়া, ব্রাজিল, ভারত, জার্মানি ও জাপানকে পরিষদে স্থায়ী আসন প্রদানের প্রস্তাব করেছিলেন। আমাদের জানা দরকার যে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে জাতিসংঘ সনদের সংশোধন করতে হবে। এতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের অনুমোদন ছাড়াও সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সমর্থন প্রয়োজন হবে। মোট কথা, বিশ্বব্যাপী কোনো দেশ সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে সে দেশের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন লাভ করা সম্ভব হবে না।

আফ্রিকান দেশ নাইজেরিয়ায় যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও এর জনগণ অতি দরিদ্র। তাছাড়া কয়েকশ নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ নাইজেরিয়ায় নানা অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এবং মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় সহিংসতা সব সময় লেগেই আছে। আফ্রিকান এ দেশটি বড় বড় বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলোর আগ্রহের বিষয় হলেও বিশ্বরাজনীতিতে এর তেমন কোনো প্রভাব নেই। কাজেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে নাইজেরিয়ার বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তৃতীয় বিশ্বের দেশ ব্রাজিল অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটামুটি সমৃদ্ধ। কিন্তু বিশ্বের দূরতম প্রান্তে অবস্থিত এ দেশটিরও বিশ্বরাজনীতিতে তেমন কোনো ভূমিকা নেই এবং নিরাপত্তা পরিষদে এর স্থায়ী আসন লাভ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বিশ্বসম্প্রদায় কদাচিৎ সময় পায়।

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের যুক্তিগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারতো। কিন্তু দেশটি নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত। কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যায় আক্রান্ত ভারত সবসময়ই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে বিশ্ববাসীর কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন। মূলত এরূপ অভ্যন্তরীণ সমস্যায় পীড়িত কোনো দেশই বিশ্ববাসীর কাছে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন পাওয়ার মতো একটি আদর্শ দেশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া আলোচিত পাঁচটি দেশের মধ্যে অন্য কোনো দেশের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পূর্বে ভারতকে অবশ্যই একজন সুপ্রতিবেশী হিসেবে বিশ্বসম্প্রদায়ের নিকট নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মানদণ্ডে এসব দেশের মধ্যে জার্মানি এবং জাপানেরই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। জার্মানির জন্য এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো জার্মানি একটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ। পশ্চিম ইউরোপ থেকে অন্য দুটি দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোড়া থেকেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। তাই আঞ্চলিকতার বিচারে জার্মানি পরিষদের আসন লাভের জন্য নিজের পক্ষে কোনো যুক্তি দেখাতে পারে না। তাছাড়া ব্রিটেন এবং ফ্রান্স অত্যন্ত কড়াভাবেই জার্মানির আসন লাভের বিপক্ষে।

কাজেই সবকিছুর বিচারে জাপানেরই পরিষদের স্থায়ী আসন পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে জাপানের নিজের যেমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তেমনি আসন লাভের ক্ষেত্রে তার কতিপয় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র বিশ্বেরই সমর্থন পাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে জাপানের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো জাপান থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে। জাপানের ভারত, নাইজেরিয়া ইত্যাদি দেশের মতো কোনো অভ্যন্তরীণ সমস্যা নেই। সমগ্র বিশ্বে একটি আধুনিক এবং গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে জাপানের ভাবমূর্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল। কাজেই এখন যদি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন লাভের ব্যাপারে কেবল একটি দেশের কথা আসে তবে সেটি হবে জাপান।

০৩। জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার জন্য আপনি কি সংস্থাটির সনদের সংশোধন বাঞ্ছনীয় মনে করেন? আলোচনা করুন। *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘ হলো একটি ঐতিহাসিক সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই এ ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে রদ ও রহিত করে ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৎকালীন বিশ্বনেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা করে এবং এ লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ হিসেবে জাতিপুঞ্জ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এর ভিত্তিতে ১৯১৯ সালের ২৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থ হলে যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সংস্থাটির মূল সনদ বিশ্ব স্বার্থ রক্ষা করতে না পারার জন্য এর সংশোধন জরুরি হয়ে পড়েছে।

জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট

আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হলেও এ সংস্থার সাফল্য ও স্থায়িত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বরং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই এ সংস্থাটির তাবৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৩৯ সালে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশনস তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ফলে বিশ্বের মাটিতে সর্বপ্রথম জন্মলাভ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনের অকাল মৃত্যু ঘটে। অতঃপর লীগ অব নেশনসের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নব উদ্যম এবং উৎসাহে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি দেশের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল সংগঠন জাতিসংঘ (United Nations) গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর

স্থাপন করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। জাতিসংঘ ৭০ বছরের ইতিহাস অতিক্রম করছে এবং এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩-এ পৌঁছেছে। একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব জাতিসংঘের লক্ষ্য হলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায়নি। এ সময়ে বিশ্বের অনেক এলাকায় ছোট বড় অনেক যুদ্ধ হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে জীবন ও সভ্যতা। এখনো বড় দেশগুলো ছোট দেশগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করছে। জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বড় দেশগুলো ছোট দেশগুলোর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হলো :

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা

বহু হতাশা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ এখনও যুদ্ধ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নির্যাতন ও দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে বিরাজ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি ও বিরামহীন আঞ্চলিক সংঘাতের মধ্যে শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন কার্যক্রম প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘ শুধু শান্তিরক্ষা ও সংঘাত নিরসনেই কাজ করছে না, সাথে সাথে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো বিশ্বের মানুষের সেবার জন্যও নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ, মার্কিনিদের একচেটিয়া প্রভাব নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্র জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন।

জাতিসংঘ সনদ

জাতিসংঘের মূল সনদে ১৯টি অধ্যায় এবং ১১১টি ধারা রয়েছে। নিচে ধারাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম অধ্যায় : ধারা-১,২ : জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধারা-৩ থেকে ৬ : সদস্যপদ

তৃতীয় অধ্যায় : ধারা-৭, ৮ : অঙ্গ সংস্থাসমূহ

চতুর্থ অধ্যায় : ধারা-৯ থেকে ১৭ : সাধারণ পরিষদ
ধারা-১৮, ১৯ : ভোটদান নীতি
ধারা-২০, ২১, ২২ : কার্যপ্রণালী

পঞ্চম অধ্যায় : ধারা-২৩, নিরাপত্তা পরিষদ গঠন
ধারা-২৪-৩২ : কার্যক্রম ও ক্ষমতাবলী

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধারা-৩৩ থেকে ৩৮ : বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

সপ্তম অধ্যায় : ধারা-৩৯ থেকে ৫১ : শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভঙ্গ, আক্রমণ ইত্যাদির আলোচনা

অষ্টম অধ্যায় : ধারা-৫২ থেকে ৫৪ : আঞ্চলিক ব্যবস্থাসমূহ

নবম অধ্যায় : ধারা-৫৫ থেকে ৬০ : আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা

দশম অধ্যায় : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
ধারা-৬১ : গঠন
ধারা-৬২ থেকে ৬৬ : কার্যাদি ও ক্ষমতাবলী
ধারা-৬৭ থেকে ৭২ : ভোটদান ব্যবস্থা

একাদশ অধ্যায় : ধারা-৭৩, ৭৪ : অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ঘোষণা

দ্বাদশ অধ্যায় : ধারা-৭৫ থেকে ৮৫ : আন্তর্জাতিক অছি পরিষদ

ত্রয়োদশ অধ্যায় : অছি পরিষদ
ধারা-৮৬ : গঠন প্রণালী
ধারা-৮৭, ৮৮ : কার্যবলী ও ক্ষমতাবলী
ধারা ৮৯ : ভোটদানের নিয়মাবলী
ধারা-৯০, ৯১ : কার্যপদ্ধতি

চতুর্দশ অধ্যায় : ধারা-৯২ থেকে ৯৬ : আন্তর্জাতিক আদালত

পঞ্চদশ অধ্যায় : ধারা : ৯৭ থেকে ১০১ : সেক্রেটারিয়েট

ষোড়শ অধ্যায় : ধারা ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫ : বিবিধ ধারাসমূহ

সপ্তদশ অধ্যায় : ধারা ১০৬, ১০৭ : অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি

অষ্টাদশ অধ্যায় : ধারা-১০৮,১০৯ : সংশোধনের নিয়মাবলী

ঊনবিংশ অধ্যায় : ধারা-১১০,১১১ : অনুমোদন ও স্বাক্ষর দান।

জাতিসংঘ সনদের সংস্কার

১৯৪৫ থেকে ২০১৫ এ দীর্ঘ ৭০ বছরে বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। এ ৭০ বছরের ইতিহাসে জাতিসংঘের যেমন বহু সাফল্য রয়েছে তেমনি ব্যর্থতাও কম নয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি আজকের জাতিসংঘ। বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে জাতিসংঘকে ব্যবহার করছে। জাতিসংঘের ৭০ বছরের পরিণত জীবনে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলো হলো :

১. মধ্যপ্রাচ্য তথা ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় টালবাহানা এবং ইসরাইলের ঔদ্ধত্য না দেখার ভান করা।
২. বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলিম নিধনে নির্লিপ্ততা।
৩. সোমালিয়ায় বিতর্কিত ভূমিকা।
৪. নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকেই মার্কিন মিত্র বাহিনীর আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ বাধা প্রদানে ব্যর্থতা।

যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে পাঁচটি রাষ্ট্রকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে সনদের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেল এ বৃহৎ শক্তিবর্গের 'ভেটো' নামক এক বিশেষ ক্ষমতার বলে অনেক অকার্যকর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তাই ৭০ বছর আগে গঠিত জাতিসংঘকে আধুনিক যুগোপযোগী, গতিশীল ও কার্যকরী করে এর মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটানো একান্ত জরুরি। আর তাই পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে জাতিসংঘকে সংস্কারের মাধ্যমে ঢেলে সাজানো উচিত।

১৯৯৫ সালের ২৫ জুন সান ফ্রান্সিসকোতে একটি সভায় মিলিত হয়ে জাতিসংঘের তৎকালীন ১৮৫ (বর্তমানে ১৯৩) সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের পুনর্গঠনের আবশ্যকতা জরুরি বলে মত পোষণ করেছেন।

সার্বিকভাবে জাতিসংঘের সংস্কারের লক্ষ্যে সাবেক মহাসচিব কফি আনান প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দশ দফা কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাজেটের ব্যয় হ্রাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রয়াসকে জোরদারকরণ। এছাড়াও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাসচিব নিয়োগ ইত্যাদি।

জাতিসংঘের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজন। জাতিসংঘ মার্কিন-সোভিয়েত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর ঠাণ্ডা লড়াই তুঙ্গে ওঠে। আবার দুই পরাশক্তিকে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব কারণে জাতিসংঘকে সংস্কারের মাধ্যমে এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আমি মনে করি নিম্নলিখিত কারণে জাতিসংঘ সনদের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন :

১. **স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি করা :** ১৯৪৫ সালে ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী সদস্যসহ মোট ১১টি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়। তখন জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৯৩টিতে পৌঁছেছে। যদিও ১৯৬৩ সালে সনদের ২৩ ধারার সংশোধন করে অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ১০-এ উন্নীত করা হয়। ১৯৬৫ সালে সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দাঁড়ায় ১৫। ১৯৪৫ সালে যে পাঁচটি দেশকে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দেয়া হয়, তখনকার প্রেক্ষাপটে তা বাস্তবসম্মত হলেও ২০১৫ সালের পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তা বাস্তব নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অবাস্তব ও একনায়কতান্ত্রিক মনে হয়। সে কারণে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

২. **শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা :** ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠনের সময় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চীন এই পাঁচটি দেশকে স্থায়ী সদস্য এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের মুঠোয় ছিল বিধায় উক্ত সিদ্ধান্তকে বাস্তব সম্মত বলা যেতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং গণতন্ত্রের উত্তরণ বিশ্ব ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতিসংঘ সংস্কারের মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. **ভেটো ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা :** জাতিসংঘ সনদে স্থায়ী পাঁচটি সদস্যকে শুধুমাত্র ভেটো ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। ভেটো ক্ষমতা চরম অগণতান্ত্রিক। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একমত থাকলেও যে কোনো একটি স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতার ব্যবহারে যে কোনো প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। তাই মনে করি, জাতিসংঘের সংস্কার করে স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে গণতন্ত্রের স্বার্থে ভেটো ক্ষমতার পরিবর্তনে জাতিসংঘ সংস্কার প্রয়োজন।

৪. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য :** জাতিসংঘের বাজেটের এক-চতুর্থাংশই দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া অর্থের পরিমাণ মোট খরচের এক-চতুর্থাংশ। এতে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি জাতিসংঘকে এসব আর্থিক সুবিধা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে জাতিসংঘ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। ফলে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য সংস্কার একান্ত জরুরি।

৫. **জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব :** বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৭১৬ কোটি ২১ লাখ, যা ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ের চেয়ে চারগুণ বেশি। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত। এখানে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের বৈষম্যও বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ইউরোপ মহাদেশ থেকে রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স তিনটি, উত্তর আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার অধিকারী এশিয়া মহাদেশ থেকে শুধুমাত্র চীন এবং আফ্রিকা মহাদেশে একটিও স্থায়ী সদস্য নেই। তাই নিরাপত্তা পরিষদে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে নতুন সদস্য নিয়ে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন ঘটানো উচিত। আর তাই জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজন।

৬. **মহাসচিবের ক্ষমতা :** জাতিসংঘ মহাসচিব সংস্থার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য মহাসচিব অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হন। এ জন্য সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সার্বিক কাজকর্মে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সংস্কারের ব্যাপারে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সাবেক মহাসচিব কফি আনানও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দশ দফা কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছেন। তার এ প্রস্তাব থেকে একথা সুস্পষ্ট যে জাতিসংঘের অন্যান্য বিভাগেরও সংস্কার জরুরি। বর্তমান একুশ শতকের পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান শতকের উপযোগী করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি। সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে জাতিসংঘের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রকৃত অর্থেই প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে ব্যর্থতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে নতুন প্রজন্মকে একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় বিশ্ব উপহার দিতে হলে জাতিসংঘের কিছু মৌলিক সংস্কার জরুরি। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যুদ্ধ, মানবাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘের যে ব্যাপক সফলতা আমরা দেখতে পেয়েছি তা জাতিসংঘকে নতুন করে এগিয়ে যেতে সাহস যোগাবে। তাই অপেক্ষাকৃত কম সফলতার ক্ষেত্রগুলোতে সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আপন মহিমায়, হাসি ফোটাতে পারে আগামী প্রজন্মের প্রতিটি মানুষের মুখে।

০৪ । **"জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।"– আলোচনা করুন।** *[৩৩তম বিসিএস]*
***অথবা,* জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন করুন।** *[৩২তম বিসিএস]*
***অথবা,* জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মসূচিতে অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।** *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্যপীড়িত স্বল্পোন্নত দেশ। এ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক শক্তি কাঠামোতে অবস্থান বিবেচনা করলে দেশটির মোটের ওপর দুর্বল অবস্থান সুস্পষ্ট। তথাপি বাংলাদেশ তার জন্মের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শান্তি ও সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচিতে সমর্থনদান এবং বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আবেদন করলে চীন নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়। চীনের যুক্তি ছিল উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে না আসায় বাংলাদেশ সদস্যপদ পেতে পারে না। ১৯৭৩ সালেও চীন আরেকবার ভেটো প্রদান করে। অতঃপর পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র : বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এ সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ এ সংস্থার সক্রিয় অংশীদার। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষণ (UNIIMOG) মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে তার পদযাত্রা শুরু। সেই থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সাহস ও শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে গৌরবময় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ভূমিকার দরুন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে বিবেচিত। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **নিরস্ত্রীকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদবিরোধী ভূমিকা :** বাংলাদেশ 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' নীতিতে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির কথা এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। ৬০ নং ধারায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নিরস্ত্রীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৬ সালে পারমাণবিক নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে ঢাকায় একটি শান্তি সম্মেলন আয়োজন করে এবং একই বছর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনেও ভূমিকা রাখে। উভয় সম্মেলনেই বাংলাদেশ নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানায়।

২. **স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ভূমিকা :** বাণিজ্য ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সম্মেলন বা আঙ্কটাডের চারটি অঙ্গের একটি হচ্ছে গ্রুপ-৭৭। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ক্ষমতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ এই গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। বাংলাদেশ গ্রুপ ৭৭-এর পক্ষে বরাবরই বক্তব্য রেখেছে। ৩০ নভেম্বর, ১৯৯৯ যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে এবং ২০০৩ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে তাদের সমস্যা তুলে ধরে। বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ২০০৪ সালের পর আরো পাঁচ বছর অব্যাহত রাখার দাবি জানায়।

৩. **পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা :** জাতিসংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। ১৯৯২ সালের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯৭ সালের কিয়োটো সম্মেলন এবং ২০০২ সালের বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনসহ প্রতিটিতে যোগ দেয় বাংলাদেশ। রিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে স্বাক্ষরিত আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন এবং জীববৈচিত্র্য কনভেনশন উভয় চুক্তি কার্যকর করে বাংলাদেশ এবং ১৯৯৪ সালে তা অনুমোদন করে। এছাড়া এজেন্ডা ২১-এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। ১৯৮৭ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রোটোকলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। কিয়োটো সম্মেলনে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় তাতে গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাসের ব্যাপারে একটি ঐকমত্য হয়। বাংলাদেশ এতেও স্বাক্ষর করে।

৪. **সমুদ্র সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে :** সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনে অংশগ্রহণ এবং সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে বাংলাদেশের স্পষ্ট ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ ১২ নটিক্যাল মাইলের নিজস্ব সীমানার ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং সমুদ্র সংক্রান্ত সম্মেলনে ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ও স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। কনভেনশনে সমুদ্র বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক আইন গৃহীত হয় তা অনেকাংশ বাংলাদেশের দাবির প্রতিফলন। উল্লেখ্য, এই কনভেনশন আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারিত হওয়ার পাশাপাশি উপকূলবর্তী দেশসমূহ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত 'একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে' বিদ্যমান সম্পদের ওপর অধিকার ভোগ করবে এবং মহাদেশীয় সোপানে বিদ্যমান সম্পদের ক্ষেত্রে ২০০ নটিক্যাল মাইল আওতার বাইরেও রাষ্ট্রসমূহের অধিকার বজায় থাকবে।

৫. **অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসনে :** মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয়দান এবং মিয়ানমারে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি জাতিসংঘের সহায়তায় ও দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিনের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ভারতে অবস্থানরত প্রায় ৫০ হাজার চাকমা শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনে। এছাড়া দীর্ঘদিনের গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে উক্ত সমস্যাটি উত্থাপন করে। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ ৩০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং জাতিসংঘের মহাসচিব তা সমর্থন করেন।

৬. **আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনে :** ২০ আগস্ট, ১৯৮৮ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত জাতিসংঘের ৬৬টি শান্তিরক্ষা মিশনের ৫৪টিতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ। জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের পাঠানো সেনাবাহিনীর সংখ্যা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি। কুয়েতে স্থল মাইন অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যথেষ্ট প্রশংসিত। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তানের আগ্রাসন এবং ১৯৭৮ সালে ভিয়েতনাম কর্তৃক কম্পুচিয়া দখলের পর বাংলাদেশ জাতিসংঘে এই আগ্রাসনের নিন্দা জানায়। জাতিসংঘে বরাবরই বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি স্বার্থের পক্ষে মত দিয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন, পিএলওতে ফিলিস্তিনিদের একমাত্র প্রতিনিধি ইয়াসির আরাফাতকে প্রেসিডেন্টের মর্যাদা দান ইত্যাদি বক্তব্য আরব বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং এ কারণে ফিলিস্তিন সংক্রান্ত কমিটিতে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘে ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা অপরিবর্তিত রয়েছে।

৭. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমিকা :** জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও তহবিলে বাংলাদেশের অবদান খুবই নগণ্য। বাংলাদেশের এক্ষেত্রে অবদান মাত্র মোট বাজেটের ০.০১ শতাংশ। তবে বাংলাদেশ মনে করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ধনী দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ বাড়ানো উচিত এবং ধনী দেশগুলো তাদের জিএনপির ৭ শতাংশ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য হিসেবে দেয়া উচিত। জাতিসংঘের উদ্যোগে এ ব্যাপারে সম্মেলন করারও আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। অত্যন্ত গরিব দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ এবং কিস্তি পুনর্নির্ধারণেরও দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমের অবাধ যাতায়াত, উন্নত দেশগুলোর বাজারে গরিব ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার, উন্নত দেশগুলোর কৃষিতে ভর্তুকি হ্রাসসহ নানা ইস্যুতে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা রাখছে।

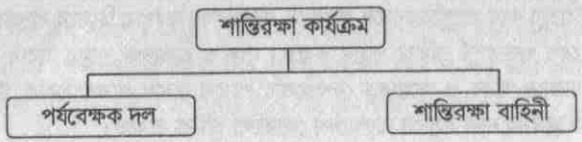
পরিশেষে বলা যায় যে, জাতিসংঘের বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশ যে ভূমিকা রেখেছে তার স্বীকৃতিও পেয়েছে দেশটি। ১৯৭৯-৮০ এবং ২০০০-২০০১ সময়ের জন্য বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচিত হয়। এছাড়া গত ১ জুন ২০০১ বাংলাদেশ এক মাসের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী এ পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বশান্তি রক্ষা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ, বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করে আসছে।

০৫ ▌ জাতিসংঘের বর্তমান শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডের সফলতা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করুন। *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার অংশ হিসেবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত কিংবা বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে ভারসাম্য আনয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের নিজস্ব পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী নেই। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত সহায়তা দান এবং সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের দায়-দায়িত্ব সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলো বহন করে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সদস্য দেশগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সরবরাহ করে। শান্তিরক্ষা বাহিনী যে অস্ত্র ব্যবহার করে তাও সরবরাহ করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শান্তিরক্ষা মিশনগুলো কাজ করে। জাতিসংঘ সনদের ৪৩ ও ৪৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হয়ে থাকে। বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর করা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন পরিচালনা করা, বিবদমান পক্ষগুলোর মাঝে সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রভৃতি উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি চূড়ান্ত অস্ত্র। শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধীনে বহুজাতিক বাহিনীর অংশগ্রহণকে প্রচলিত অর্থে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বলা হয়ে থাকে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ যুদ্ধবিরতির সূচনা ও তা বজায় রাখতে এবং যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে একটি বিরোধ নিবারক অঞ্চল বা Buffer Zone গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি কূটনৈতিক পর্যায়ে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় অনুসন্ধানের পথ সহজতর করে। জাতিসংঘ দুটি উপায়ে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিচে ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো :



বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েনের পূর্বশর্ত : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী বিরোধপূর্ণ যে অঞ্চলে মোতায়েন করা হয় তার পূর্বে তিনটি শর্ত বিবেচনা করা হয়। শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

প্রথমত, যে দেশে শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা হবে সে দেশের সম্মতি থাকবে।

দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব পাস হতে হবে।

তৃতীয়ত, জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলো শান্তিরক্ষা বাহিনীতে স্বেচ্ছামূলকভাবে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবে।

বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম

১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে মূলত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। এর পর থেকে ৬৯টি রাষ্ট্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর ৮ লক্ষাধিক সদস্য কাজ করেছে। সম্প্রতিকালেও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শান্তিরক্ষা মিশন কাজ করে যাচ্ছে। নিচে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য মিশন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধান সংগঠন :** United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষা বাহিনী।
মিশন : ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ফিলিস্তিনে আহূত যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধান করা। বর্তমানে UNTSO যথাক্রমে UNDOF এবং UNIFIL-এর কাজে সহায়তা করে। মধ্যপ্রাচ্য তথা লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, ইসরাইল প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই বাহিনী যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

২. **কঙ্গো মিশন :** United Nations Operation in the Congo (ONUC)
মিশন : জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় শান্তিরক্ষা এই মিশনটি ১৯৬০ সালে কঙ্গোতে প্রেরণ করা হয়। এই বাহিনী কঙ্গোর স্বাধীনতা অর্জন ও জাতিগত বিরোধ নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা ও শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে ONUC বিবদমান গ্রুপগুলোর মাঝে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

৩. **অ্যাঙ্গোলার শান্তি মিশন :** United Nations Verification Mission in Angola. (UNAVEM)
মিশন : ১৯৭৫ সালের পর থেকে অ্যাঙ্গোলার সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহী গ্রুপ UNITA (National Union for the Total Independence of Angola)-এর মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল। এ অবস্থা নিরসনকল্পে জাতিসংঘ ১৯৮৯ সাল থেকে পরপর ৪টি মিশন অ্যাঙ্গোলায় প্রেরণ করে।

৪. **মোজাম্বিক জাতিসংঘ মিশন :** United Nations Operation in Mozambic (UNOMOZ)
নামে ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ মোজাম্বিকে একটি শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করে।
মিশন : ১৯৭৫ সালে পর্তুগালের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সরকার ও REAMO নামক গ্রুপের মাঝে দীর্ঘদিন যাবত গৃহযুদ্ধ চলে আসছিল। এ অবস্থার নিরসনে UNOMOZ মোজাম্বিকে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশসহ ২৪টি রাষ্ট্রের বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা ছিল।

৫. **ইরাক-কুয়েত পরিদর্শন মিশন :** United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission (UNIKOM)
মিশন : ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইরাক-কুয়েত সীমান্ত বরাবর একটি নিরাপদ এলাকা গঠনের জন্য UNIKOM প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশসহ ৩৭টি রাষ্ট্র এই বাহিনীতে যোগদান করে।

৬. **রুয়ান্ডা সাহায্য মিশন :** United Nations Assistance Mission for Ruanda (UNAMIR) ১৯৯৩ সালে রুয়ান্ডা সরকার ও বিদ্রোহী 'প্যাট্রিয়টিক' গ্রুপের সুপারিশে এই বাহিনী রুয়ান্ডাতে প্রেরণ করা হয়।

মিশন : ১৯৯০ সাল থেকে রুয়ান্ডায় 'হুতু' প্রধান সরকার এবং 'তুতসি'দের সংগঠন প্যাট্রিয়টিক ফোর্সের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এই জাতিগত দ্বন্দ্ব পার্শ্ববর্তী উগান্ডা ও বুরুন্ডিতে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালে UNAMIR রুয়ান্ডাতে মোতায়েন করা হয়। পরবর্তীতে ব্যাপক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে সেখানে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে এলে জাতিসংঘ তার বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৩টি রাষ্ট্রের সৈন্য সেখানে মোতায়েন ছিল।

৭. **সোমালিয়া অপারেশন :** ১৯৯২ সালে সোমালিয়াতে UNOSOM (United Nations Operation in Somalia) প্রেরণ করা হয়।
মিশন : ১৯৯১ সালে সোমালিয়ার অস্থায়ী সরকার প্রধান আলী মাহাদি মোহাম্মদ এবং বিদ্রোহী ফারাহ্ আইদিদ-এর সৈন্যদের মাঝে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থা প্রশমনে ১৯৯২ সালে নিরাপত্তা পরিষদ ৭৩৩ নং প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং UNOSOM-I কে সেখানে প্রেরণ করে। সকল প্রকার অস্ত্র আক্রমণ বন্ধ করা এই বাহিনীর দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এ মিশন ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে UNITAF (United Task Force) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ৮১৪ নং প্রস্তাব অনুযায়ী UNOSOM-II কে দায়িত্ব দেয়া হয় UNITAF-এর স্থলে। বাংলাদেশসহ ২৯টি দেশের সৈন্য সেখানে মোতায়েন ছিল। ১৯৯৫ সালে সোমালিয়া থেকে UNOSOM প্রত্যাহার করা হয়।

৮. **ইরিত্রিয়া পর্যবেক্ষণ মিশন :** United Nations Observer Mission to Verify the Referendum in Eritrea (UNOMVRE) ১৯৯১ সালে ইথিওপিয়ায় মোতায়েন করা হয়।
মিশন : ১৯৯১ সালে ইথিওপিয়ায় সামরিক সরকার পতনের সাথে সাথে ইরিত্রিয়ার PLF (Peoples Liberation Front)-এর নেতৃত্বে সে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় নিরাপত্তা পরিষদ সেখানে UNOMVRE প্রেরণ করে। এ মিশনের তত্ত্বাবধানে সেখানে ১৯৯৩ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ১৪ মে ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

৯. **হাইতি মিশন :** United Nations Misson in Haity (UNMIH) ১৯৯৩ সালে হাইতিতে প্রেরণ করা হয়।
মিশন : ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সাধারণ পরিষদ হাইতির প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করে এবং সেখানে সন্ত্রাস, সামরিক বলপ্রয়োগ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করা হয়। এ মিশন হাইতির উপর তেল ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে।

১০. **ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়া-হারজেগোভিনা শান্তি মিশন :** United Nations Protection Force (UNPROFOR) ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ সেখানে প্রেরণ করে।
মিশন : ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ার অঙ্গরাজ্য ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়াসহ বসনিয়া-হারজেগোভিনা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে যুগোশ্লাভিয়ার সাথে বসনিয়া-হারজেগোভিনার যুদ্ধ শুরু হয়। এই অবস্থার প্রশমনে জাতিসংঘ সেখানে এই বাহিনী প্রেরণ করে।

১১. **পূর্ব তিমুর জাতিসংঘ মিশন** : United Nations Transition Assistance in East Timour (UNITAET). জাতিসংঘ পূর্ব তিমুরে এই বাহিনী প্রেরণ করে ১৯৯৯ সালে।

মিশন : ১৯৭৫ সালে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হলে এখানে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সামরিক অভিযানের ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠে। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সেখানে স্বাধীনতার পক্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পরবর্তীতে সেখানে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন তৈরি করা হয়। বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশের বাহিনী এ প্রশাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। UNITAET এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগে ২০০২ সালের ২০ মে বিশ্বের ১৯২তম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে।

১২. **মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র মিশন :** ২০১৪ সালে MINUSCA নামক জাতিসংঘের সর্বশেষ মিশন পরিচালিত হচ্ছে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের জাতিগত দাঙ্গাকে প্রশমিত করার জন্য।

উপরিউক্ত মিশনগুলোসহ ১৯৪৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৬৯টি শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনা করেছে।

শান্তিরক্ষা বাহিনী সংশ্লিষ্ট দেশে সাধারণত আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত কোনো সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বাহিনী পর্যবেক্ষক ও নিরস্ত্রীকরণের ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ প্রেরিত এসব বাহিনীর মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- যুদ্ধ ও অস্ত্রবিরতি নিশ্চিত করা।
- বিবদমান গ্রুপগুলোর মাঝে অবস্থান করে শান্তি পরিস্থিতি বলবৎ করা।
- নিবৃত্তিমূলক সেনা মোতায়নের (Preventive Deployment) মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের পরিবেশ তৈরি করা।
- যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিবদমান গ্রুপগুলোকে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করা।
- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তরণের জন্য নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা।
- যুদ্ধবিরতি শেষে একটি চূড়ান্ত সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দেশে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন গঠন ও পরিচালনা করা।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সাহায্য প্রদান।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ভূমি মাইন (Land mine) অপসারণ ও অন্যান্য স্থাপনা পুনর্গঠন করা।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম : আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার উপায় হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি চূড়ান্ত অস্ত্র। শান্তিরক্ষা মিশন বিভাগের সহযোগিতায় পরিচালিত একটি রাজনৈতিক মিশন ধরলে বর্তমানে চালু শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ১৭টি। রাজনৈতিক মিশনটি হচ্ছে— UNAMA; আফগানিস্তান, ২০০২।

- মোট নিয়োজিত শান্তিরক্ষা (বর্তমানে)— ১,১০,০০০ এর অধিক।
- শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত দেশ (বর্তমানে)— ১২০টি।
- শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ (বর্তমানে)— বাংলাদেশ।
- সর্ববৃহৎ মিশন (UNAMID ব্যতীত)— UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)— কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র; নভেম্বর ১৯৯৯–বর্তমান; কর্মরত শান্তিরক্ষা ১৮,৩৮৪ জন।

- সর্বাধিক ব্যয় বহনকারী দেশ— যুক্তরাষ্ট্র; মোট ব্যয়ের ২৬ শতাংশ।
- বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে ১৯৮৮ সালে।
- সর্বাধিক শান্তিরক্ষা নিহত হয় যে মিশনে— UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL); মার্চ ১৯৭৮-বর্তমান; ২৬৭ জন।
- জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে প্রস্তাব ৫৭/১২৯-এর মাধ্যমে ২৯ মে দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সফলতার মূল্যায়ন : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম পুরোপুরি সফল বলেই বিবেচনা করা হয়। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে এই বাহিনী অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বের বিরোধ এবং সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে ভারসাম্য আনয়নে এই বাহিনী এখনো কাজ করে যাচ্ছে। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা লাভের নেপথ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী UNITAET-এর কার্যক্রম মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। ঠিক তেমনি হাইতিতে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং নতুন বৈধ রাষ্ট্রপতি নিয়োগ (UNMIH), ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা লাভ (UNOMVRE), সোমালিয়ার গৃহযুদ্ধ বন্ধসহ একাধিক কার্যক্রমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা ব্যাপক। রুয়ান্ডায় হুতু ও তুতসি বিদ্রোহীদের সমঝোতায় UNAMIR-এর অবদান স্বীকৃত। মোটকথা কিছু বিক্ষিপ্ত মিশনের কার্যাবলী ব্যতীত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সফল হিসেবে বিশ্বব্যাপী আজও কাজ করে যাচ্ছে। ইরাক-কুয়েত সীমান্তে No-fly zone সৃষ্টিতেও এই শান্তিরক্ষা মিশন ভূমিকা রেখেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জাতিসংঘ বিগত দিনগুলোতে বহু দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন থেকে শুরু করে জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, যুদ্ধের মুখোমুখি অবস্থা থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থা আনয়ন, মানবিক ত্রাণ তৎপরতা, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর, গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনা, বাফার জোন Buffer Zone তৈরি, তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনসহ অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৮ সালে এই বাহিনী শান্তিতে 'নোবেল পুরস্কার' অর্জন করে। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে বিশেষ করে আফ্রিকার সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় জাতিসংঘের সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও স্বীকৃত হয়েছে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬। ক. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
খ. নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর করতে আপনার সুপারিশমালা ব্যক্ত করুন।

উত্তর : স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে একক বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গসংস্থার মধ্যে সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরে এ দুটি পরিষদের গুরুত্ব ও ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সংস্থা দুটি বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ কারণে অনেকে এ দুটি পরিষদকে আইনসভা ও নির্বাহী পরিষদ বলেও অভিহিত করেছেন। নিচে এ দুটি পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো।

সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ

সাধারণ পরিষদের গঠন : জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়েই সাধারণ পরিষদ গঠিত। ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ সভায় ৫ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। তবে তাদের ভোটের অধিকার মাত্র ১টি। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। তবে জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধক্রমে বা জাতিসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে কোনো রাষ্ট্রের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। ১৯৪৭ ও '৪৮ সালে ফিলিস্তিন সমস্যা, ১৯৭৮ সালে নামিবিয়া এবং ১৯৭৮ ও '৮২ সালে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ বিষয় নিয়ে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। সাধারণ সভার অধিবেশন পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি ও ২১ জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সভাপতি প্রতি বছর এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে পালাক্রমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সভাপতি সভার কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকেন।

জাতিসংঘ সনদের ১৮ (১) ধারায় ভোট দানের পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এ ধারামতে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র ১টি করে ভোট দিতে পারে। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন— আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন, জাতিসংঘের বাজেট, নতুন সদস্য নিয়োগ বা বহিষ্কারকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা : জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক সাধারণ পরিষদ নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী :

প্রথমত, সাধারণ পরিষদ তার যাবতীয় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে নতুন সদস্যভুক্তি, মহাসচিব নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারক নিয়োগ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ সংস্থা গঠন করে থাকে।

তৃতীয়ত, জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরস্ত্রীকরণের বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

চতুর্থত, এছাড়া জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক সাধারণ পরিষদ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারে সেগুলো হলো :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কিত।
২. জাতিসংঘের নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ বা বহিষ্কারকরণ সম্পর্কিত।
৩. জাতিসংঘের বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা।
৪. অছি ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করা।
৫. যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা।

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলী : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নানাবিধ কার্যসম্পাদন করে থাকে। জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক সাধারণ পরিষদ যে সমস্ত কার্যাবলী করে থাকে সেগুলো নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায় :

১. **নির্বাচনমূলক কাজ :** সাধারণ পরিষদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নির্বাচন পরিচালনা করা। নির্বাচন সংক্রান্ত এ পরিষদ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে :

ক. নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করা। ভৌগোলিক ভিত্তিতে আফ্রো-এশিয়া এলাকা থেকে ৫ জন, পূর্ব ইউরোপ থেকে ১ জন, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ২ জন এবং পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে ২ জন সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) ৫৪ সদস্যের নির্বাচন করা।

গ. জাতিসংঘ সনদের ৯৭ ধারা মোতাবেক নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচন করা। সাধারণ পরিষদ প্রতি ৫ বছরের জন্য মহাসচিব নির্বাচন করে থাকে।

ঘ. এ পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালতের ১৫ জন বিচারকের নির্বাচন করে থাকে। তবে এ নির্বাচনে সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে ভোট প্রদান করে থাকে।

ঙ. অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। অবশ্য বর্তমানে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা হিসেবে অছি পরিষদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

২. **অর্থ-সম্পর্কিত কার্যাবলী :** সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আয়-ব্যয়ের বাজেট পাস করে থাকে। সদস্যের চাঁদার সাথে সঙ্গতি রেখে জাতিসংঘের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন ছাড়াও এই পরিষদ ILOসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন করে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের দেয় চাঁদার পরিমাণও নির্ধারণ করে থাকে।

৩. **তত্ত্বাবধায়কের কাজ :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদ সর্বতোভাবে সাধারণ পরিষদের অধীনে থাকায় এদের কার্যক্রম ও প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করে থাকে। এছাড়া প্রতি বছর মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন নিয়েও আলোচনা করে।

৪. **সুপারিশমূলক :** সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ, যে কোনো আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনার জন্য সুপারিশ করতে পারে। তাছাড়া ১২ (১) ধারা অনুযায়ী সনদের মধ্যে যে কোনো বিষয় বা প্রশ্ন নিয়ে সাধারণ পরিষদ আলোচনা করতে পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদে যে সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় সে সকল বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে না।

৫. **সনদ সংশোধনমূলক :** সাধারণ পরিষদকে সনদ সংশোধনের ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা সমর্থিত এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসহ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সনদের সংশোধনী আনয়ন করতে পারে।

৬. **সহযোগী সংস্থা গঠন :** জাতিসংঘের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সাধারণ পরিষদকে সহযোগী সংস্থা গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আণবিক শক্তি কমিশন, যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণবিষয়ক কমিটি, শান্তি পর্যবেক্ষণ কমিশন প্রভৃতি এ সংস্থা কর্তৃকই গঠিত হয়েছে। এছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে এ সভা যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৭. **আইনবিষয়ক কাজ :** আইনবিষয়ক কাজের জন্য সাধারণ পরিষদকে আন্তর্জাতিক আইনসভাও বলা হয়। আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন এবং মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে আইনের বিকাশ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত। এজন্য একটি আন্তর্জাতিক আইন কমিশনও রয়েছে। পরিষদ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আইনের মূলনীতি প্রণয়ন করে থাকে।

৮. **উদ্যোগ গ্রহণ :** সাধারণ পরিষদ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যগত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ পরিষদের উদ্যোগেই ১৯৮২ সালে সমুদ্র আইন কনভেনশন, ১৯৪৮ সালে গণহত্যা কনভেনশন, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর 'Human Rights Convention' প্রভৃতি গৃহীত হয়।

৯. **রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা :** সাধারণ পরিষদের কাছে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে। পরিষদ উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং ৬টি কমিটির মাধ্যমে তা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করে।

১০. **নির্বাহী সংক্রান্ত কাজ :** কোনো গুরুতর বিষয় নিরাপত্তা পরিষদ সমাধান করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ সর্বতোভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

এছাড়া জাতিসংঘের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাধারণ পরিষদ নতুন কোনো বিশেষ সংস্থা গঠন করতে পারে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা চালাতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন : ১৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় একটি কার্যনির্বাহক সংস্থা হিসেবে এই পরিষদ সার্বক্ষণিক কর্মরত থাকে।

জাতিসংঘ সনদের ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদ ১৫টি সদস্যরাষ্ট্র সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রথমে ১১ জন সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য, যাদের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে এবং ৬ জন অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্যগণ হলো : ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২. ব্রিটেন, ৩. চীন, ৪. ফ্রান্স এবং ৫. সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে অস্থায়ী সদস্য ৬ থেকে ১০-এ উন্নীত করা হয়। ফলে এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫। অস্থায়ী সদস্যরা দু বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দু-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং বিদায়ী সদস্য পুনরায় নির্বাচিত হতে পারে না। ১৯৭১ সালে তাইওয়ানের পরিবর্তে চীন এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে রাশিয়া স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা পেয়েছে। প্রতি মাসে সদস্যের মধ্য থেকে রাষ্ট্রের ইংরেজি নামের বর্ণনানুক্রমে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১০ জন অস্থায়ী সদস্য ৪টি ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়।

প্রতি বছর ৫ জন নতুন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় এবং ৫ জন অস্থায়ী সদস্য বিদায় নেয়।

নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব জাতিসংঘ সনদের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২তম অধ্যায় তথা ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৪০-৫৪ অনুচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলী নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :

১. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা :** আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত নিরাপত্তা পরিষদের। এ দায়িত্বের অধীনে নিরাপত্তা পরিষদ তার কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সকল সদস্যের পক্ষে কাজ করবে। কোথাও আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে নিরাপত্তা

পরিষদ তা প্রতিরোধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সাধারণত আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপস ও সালিশির মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। তা ব্যর্থ হলে সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে অথবা অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

২. **শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ :** আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমে শান্তিপূর্ণ পথে সমাধানের আহ্বান জানায়। এ সিদ্ধান্ত অমান্য করলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবরোধ আরোপ করতে পারে। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি এবং অবরোধ ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধও পরিচালনা করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধক্রমে সদস্যরাষ্ট্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করে।

৩. **শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন :** বর্তমান বিশ্বে নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান ও সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হলো শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন। সদস্যরাষ্ট্রের যে কোনো অঞ্চলে জাতিগত দাঙ্গা, হামলা, রাজনৈতিক অচলাবস্থা, অন্য দেশ কর্তৃক আক্রমণ, আন্তঃবিদ্রোহ প্রভৃতির মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা হলে পরিষদ সেখানে পূর্বেই শান্তিরক্ষা বাহিনী নিয়োগ করে। এ বাহিনী সেসব অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করে না, তবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ মধ্যস্থতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে ভূমিকা পালন করে।

৪. **অনুসন্ধান ও আইনগত ব্যবস্থা :** আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নিরাপত্তা পরিষদ সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে পারে এবং আইনগত কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে পরিষদ তা আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরণের সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

৫. **আঞ্চলিক সংস্থার ব্যবহার :** জাতিসংঘ সনদের ২৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক নিরাপত্তা পরিষদ তার কাজের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। এমনকি প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন সহায়ক অঙ্গসংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জাতিসংঘ কার্যালয় ব্যতীত যে কোনো স্থানে বৈঠক অনুষ্ঠান করতে পারে।

৬. **প্রশাসনিক কার্যাবলী :** নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক জাতিসংঘের যে কোনো রাষ্ট্রের সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারে। এছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ সম্পন্ন হয় নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে। জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষমতাও নিরাপত্তা পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

৭. **নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলী :** নিরাপত্তা পরিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নির্বাচন সংক্রান্ত। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক নির্বাচিত করে। জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন কোনো রাষ্ট্র বিচারপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৮. **মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠন :** জাতিসংঘ সনদের ৪৭ ধারা মোতাবেক নিরাপত্তা পরিষদ মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠন করতে পারে। এ কমিটির দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের প্রয়োজন পূরণ, তার নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনী নিয়োগ, পরিচালনা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য ও পরামর্শ দান। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের চিফ অফ স্টাফদের নিয়ে মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠিত হয়।

৯. **অন্যান্য কার্যাবলী :** জাতিসংঘ সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদের অংশগ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ পরিষদ মহাসচিবকে সাধারণ সভার বিশেষ বা জরুরি অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ করতে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য অধীনস্থ সংস্থা বা কমিটি গঠন করতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি : সাধারণভাবে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রম হয় নির্ধারিত ৫ জন স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯ জনের সম্মতিক্রমে। তবে স্থায়ী সদস্যগণের ভেটো ক্ষমতা এ পরিষদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্থায়ী সদস্যগণের যে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধিতা করলে বা ভেটো প্রয়োগ করলে তা নাকচ হয়ে যায়। জাতিসংঘের দুর্বলতার মধ্যে এটি একটি অন্যতম দুর্বলতা ও বিতর্কিত বিষয়।

নিরাপত্তা পরিষদকে কিভাবে কার্যকরী করা যায় : যে প্রত্যাশা নিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তা পরিষদের ওপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল, সে প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের বিন্যাসের মধ্যেই সে দুর্বলতা নিহিত। তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদকে আরো অধিকতর কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. নিরাপত্তা পরিষদকে আরো বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন হতে হবে।

২. কেবল প্রস্তাব পাসের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলীকে সীমিত না রেখে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিতে হবে।

৩. নিরাপত্তা পরিষদকে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ ও সংঘর্ষের বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা ও ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৪. নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক আচরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ। এ দুটি সভাকে অধিকতর কার্যকরী ও শক্তিশালী করা সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ এর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলে আশা করা যায়।

০৭ ▮ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছয় দশক পেরিয়ে গেছে। সময়প্রবাহের সঙ্গে সমাজ বদলায়, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় নতুনত্ব আসে। পরিবর্তিত সমাজের মানুষ সমাজের বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন কামনা করে। সেই পরিবর্তন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি দরকার। জাতিসংঘ একটি রাজনৈতিক সংগঠন। তার ব্যাপক কর্মক্রিয়া প্রধানত রাজনীতির বৃত্তেই প্রস্ফুটিত। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার দরুন জাতিসংঘের গঠন কাঠামোতে, কর্মপদ্ধতিতে এবং নিয়মাবলীতে কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব নানা মহল থেকেই উঠেছে। আমরা এখানে পরিবর্তিত বিশ্বে জাতিসংঘের নতুন ভূমিকার রূপরেখা সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

১. **শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অধিকতর বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে :** যুদ্ধ এবং অন্যান্য কঠোর পথ অনুসরণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ যে কাম্য নয় এ কথা ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকেই বুঝতে হবে। বস্তুত, আজ এ কথা উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় অবদান রাখবার পথ হচ্ছে অবিচল ধৈর্যশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং নিঃশব্দ কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় মীমাংসায় উপনীত হওয়ার কাজে এগিয়ে যাওয়া। বৈঠকে-অধিবেশনে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দান, ভোট সংখ্যায় জয়লাভ প্রচেষ্টার মধ্যে জাতিসংঘকে আবদ্ধ

করে রাখার চিরাচরিত অভ্যাস পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। জাতিসংঘের পাশাপাশি আঞ্চলিক সংগঠনগুলোও যেহেতু শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা নিয়ে থাকে, সেহেতু জাতিসংঘের মহাসচিব ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গের উচিত হবে নিয়মিত সম্মিলিত আলোচনা বৈঠকে বসা। কোনো সমস্যা বিবেচনার আগে নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই সুনিশ্চিত হতে হবে, আঞ্চলিক পর্যায়ে সমস্যাটি সমাধানের কোনো চেষ্টা করা হয়েছে কিনা।

২. **অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করতে হবে :** যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে জাতিসংঘ বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে এবং কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপও নিয়েছে। কিন্তু এখন দরকার, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে যে সকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় অথবা নিরাপত্তা পরিষদ যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ সেগুলোর ফলাফল কি দাঁড়ালো সেই বিষয়ে খবরাখবর জানানোর জন্য এবং তত্ত্বাবধানমূলক ভূমিকা নেয়ার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন এক একটি বহুজাতীয় পরিদর্শক দল গঠন করা। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। তারই জের ধরে পরে তারা নিজেদের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি 'স্থায়ী পরামর্শমূলক কমিশন' গঠন করে। নিরাপত্তা পরিষদও তার ক্ষমতাবলে ঐ ধরনের একটি কমিশন গঠন করে নিতে পারে, যেখানে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক এক একটি কর্মীগোষ্ঠী কর্মরত থাকবে। তাদের কাজ হবে সময়ে সময়ে মিলিত হয়ে অস্ত্র সংবরণ সংক্রান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখা, বহুদলীয় পরিদর্শক দল থেকে রিপোর্ট গ্রহণ করা এবং ঐ সকল রিপোর্টের মারফত চুক্তিভঙ্গের অন্যায় আচরণ দেখতে পেলে পর্যায়ক্রমিক গোপন শলাপরামর্শ চালানো অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো ইত্যাদি।

৩. **মানবিক নিরাপত্তা ও মানবিক কল্যাণের জন্য সাংগঠনিক সংযোজন ও পুনর্বিন্যাস :** জাতিসংঘ গোড়ার দিকে এবং প্রথম কয়েক বছর যাবৎ রাজনৈতিক, তথা শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও কালক্রমে এই উপলব্ধিতে গিয়ে স্থিতিলাভ করে যে, বিশ্বজোড়া মানবজাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও ব্যাধিপীড়িত তথাকথিত অনগ্রসর মানবগোষ্ঠীর দ্রুত উন্নয়নই হচ্ছে মৌল সমস্যা। এই কর্মদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দু রকম সাংগঠনিক সংস্কার প্রয়োজন।

এক. জাতিসংঘের অধীনস্থ ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী বোর্ড গঠন। এতে সর্বাধিক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর থাকবে স্থায়ী সদস্যপদ আর অন্যান্য সদস্যপদ পূরণ করা হবে পালাক্রমে, যাতে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হতে পারে।

দুই. জাতিসংঘের মহাসচিব দ্বারা গঠিত ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটা উপদেষ্টা কমিশন গঠন, যাতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্মকেন্দ্রে কর্মরত যে সকল কর্মী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এই কমিশনে তাদের নিযুক্ত করা হবে। আবার কার্যনির্বাহী বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রহরা ব্যুরো (Bureau of Global Watch) নামে একটি সচিবালয় থাকবে। এটি স্থাপিত হবে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের (UN Department for International Economic and Social Affairs, DIESA) মধ্যে। বোর্ডকে বৃহত্তর মানবিক নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বাধুনিক খবরাখবর ও পরামর্শ দেয়াই হচ্ছে এই ব্যুরোর প্রধান কাজ।

একবিংশ শতাব্দীতে জাতিসংঘ তার নতুন কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে চাইলে আরো কিছু পুনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC : Economic and Social Council) এবং সাধারণ পরিষদের বিভিন্ন কমিটির কর্মসূচিতে, আলোচনা-বিতর্কে কোনো নির্ধারিত সমন্বয় না থাকায় একই আলোচ্য বিষয়, একই কর্মপদ্ধতি উভয় পর্যায়েই অনুসৃত হয়। একই কাজের এই একাধিকবার নির্বাহপর্ব কাম্য হতে পারে না। সে কারণে সাধারণ পরিষদের অর্থনৈতিক-সামাজিক বিষয়ক দ্বিতীয় ও তৃতীয় কমিটি দুটিকে তুলে দিয়ে কমিটি দুটির কাজগুলো ECOSOC-এর হাতেই ন্যস্ত করা উচিত। এতে ECOSOC একটা সমগ্র বা সম্পূর্ণরূপ পাবে। ECOSOC-কে এমনভাবে সম্প্রসারণ করা দরকার যাতে এর মধ্যে জাতিসংঘের সকল সদস্যই আসন নিতে পারে।

৪. **নতুন কোনো শীতল যুদ্ধ ঠেকানো :** এ যাবৎ জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় অবদান নিঃসন্দেহে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন শত্রুদ্বয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পৃথিবী বিধ্বংসী একটি যুদ্ধ ঠেকানো। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, এই জন্য জাতিসংঘের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। এ কথা সত্যি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সামাল দেয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘের পাশাপাশি আরো অনেক কিছু ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সেসবের মধ্যে জাতিসংঘের ভূমিকা এবং কূটনীতিই ছিল এককভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গত এক দশক পৃথিবীতে কোনো শীতল যুদ্ধ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে একটি শীতলযুদ্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটি শুরু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে। এদের একটি হলো TMD বা Theatre Missile Defence, যার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র তার এশীয় মিত্র জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদিকে ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করেছে এবং আর একটি হলো NMD বা National Missile Defence, যার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের ভূমি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা থেকে রক্ষা করতে চায়। এ দুটি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীন এবং রাশিয়ার সম্পর্ক ইতিমধ্যেই বেশ টানাপোড়েনের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, NMD কার্যকর করলে তিনি রাশিয়া এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পাদিত অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ এবং নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির সব কাগজ ছিঁড়ে ফেলবেন। চীনের পত্রপত্রিকাগুলো বারবার হুমকি দিয়ে আসছে, যদি তাইওয়ানকে TMD-এর আওতায় আনা হয় তবে তাইওয়ান প্রণালীতে রক্তারক্তি কাণ্ড বেঁধে যাবে। নানা মহলের এসব উত্তপ্ত কথাবার্তা যদি কার্যকর হয়, তবে তা হবে আর একটি জটিল এবং তীব্র শীতল যুদ্ধেরই নামান্তর। একবিংশ শতাব্দীতে জাতিসংঘের জন্য এই ধরনের শীতল যুদ্ধ মোকাবিলা করাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য জাতিসংঘকে এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫. **আঞ্চলিক যুদ্ধের ব্যাপারে ভূমিকা :** আফ্রিকা, বলকান প্রভৃতি অঞ্চলের আঞ্চলিক যুদ্ধগুলো বন্ধ বা এসব যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতা ও মানবিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ যাবৎ জাতিসংঘ সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে এবং সুনাম কুড়িয়েছে। জাতিসংঘের এ সাফল্য আরো বৃদ্ধি পেত যদি ইতিমধ্যে এর কিছু সংস্কার সাধন করা যেত। সাবেক মহাসচিব কফি আনানের রিপোর্টে সংস্কারের যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা

পরিষদের পরিসর বৃদ্ধি, Development Operations Group নামে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকের জন্য একটা সংস্থার সৃষ্টি এবং UNDP, UNFPA, UNICEF ইত্যাদি সংস্থাগুলো ভেঙ্গে একটা সংস্থায় রূপান্তরকরণ। এসব সংস্কার সাধন করা হলে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের বর্তমান মানবিক ত্রাণতৎপরতা ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আরো সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

যারা বিশ্ব শান্তি নিয়ে কমবেশি ভাবনাচিন্তা করেন তাদের কাছে এখনো জাতিসংঘের বিকল্প কিছু নেই এবং এর কাছে তাদের প্রত্যাশা অনেক। জাতিসংঘ তার এই সম্মান ও গুরুত্বকে ধরে রাখতে চাইলে তার শান্তিরক্ষা ও মানবিক তৎপরতা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

০৮। ক. ভেটো (Veto) ক্ষমতা কি?

খ. আপনি কি মনে করেন একটি পুনর্গঠিত জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ নীতির বিলুপ্তি ঘটানো উচিত। যৌক্তিকতাসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : জাতিসংঘ সনদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে (ধারা ৩৩-৫১) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদকে। যে কোনো আন্তর্জাতিক বিষয়ের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিবর্তনমূলক বা শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সনদ সংস্কারেরও অধিকার রাখে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫ সদস্য শক্তির বিচারে বিশ্বের মূল নিয়ন্ত্রক। মূলত যে কোনো আন্তর্জাতিক বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে এদের সংশ্লিষ্টতা থাকে। যে কারণে এদের কাউকে অসম্মত রেখে অধিকাংশ রাষ্ট্র কোনো সিদ্ধান্ত নিলে যে কোনো সময়ে আন্তর্জাতিক বিভেদের সৃষ্টি হতে পারে। কোনো অবস্থাতেই যেন এ ধরনের কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়, সে জন্য জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতা। এ ভেটো ক্ষমতার ফলে যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রধান পাঁচটি দেশ ঐক্যবদ্ধ না হলে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ফলে সংঘাত এড়িয়ে চলার পথ সহজ হয়। জাতিসংঘের এ ভেটো ক্ষমতা নানাভাবে সমালোচিত হলেও এ ব্যবস্থা বিশ্বকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভেটো কি?

প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, জাতিসংঘ সনদের কোথাও 'ভেটো'(Veto) শব্দটির উল্লেখ নেই। মূলত পদ্ধতিমূলক বিষয় ছাড়া মৌলিক ও অন্যান্য বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্যের যে কোনো একজন যদি নেতিবাচক ভোট দেয় তবে তাকে ভেটো বলা হয়। 'ভেটো' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ 'I forbid'। সুতরাং ভেটো হলো আন্তর্জাতিক কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের নেতিবাচক ভোট।

দ্বৈত ভেটো : নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা যখন কোনো একটি বিষয়ে দু বার Veto ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তখন তাকে দ্বৈত ভেটো বলা হয়ে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত কোনো বিষয় পদ্ধতিমূলক বিষয় হবে না মৌলিক বিষয় হবে—যখন এ রকম কোনো বিতর্ক দেখা দেয় তখন দ্বৈত ভেটো প্রক্রিয়াটির আগমন ঘটে। যদি স্থায়ী কোনো সদস্য পদ্ধতিগত বিষয়ের বিপক্ষে ভোট দেয়, বাকি ৪টি সদস্য পক্ষে ভোট দিলেও বিষয়টি মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। মৌলিক বিষয় বিবেচিত হওয়ার পর যদি আবার ভোটাভুটিতে কোনো দেশ নেতিবাচক ভোট দেয় তথা ভেটো দেয় তবে বিষয়টি বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে দুবার ভেটো দিতে হয় বলে একে দ্বৈত ভেটো বলা হয়ে থাকে।

ভেটো ক্ষমতার বিকাশ

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইয়াল্টা সম্মেলনেই মূলত ভেটো ক্ষমতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্টালিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা প্রধানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তাদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই জাতিসংঘ সনদের ২৭ নং ধারায় এ নেতিবাচক ভোট সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পায়। কিন্তু পরবর্তীতে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ভেটো ক্ষমতা ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়। কিন্তু ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো ক্ষমতার পক্ষে ব্যাপক চাপের ফলে সম্মেলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পরে এ সমস্যা নিরসনে নানা ধরনের কমিটি ও সাব কমিটি গঠিত হয়। নানা বিতর্কের পর সর্বমহল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা পদ্ধতিমূলক বিষয়ে কোনো ভেটো প্রয়োগ করতে পারবে না, মৌলিক ও অন্যান্য বিষয়েই ভেটো প্রয়োগ করতে পারবে।

বৃহৎ শক্তিবর্গের মতামত : সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের পর বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের এ ভেটো ক্ষমতার পক্ষে প্রধানত যে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করে, তা হলো :

১. ভেটো ক্ষমতা কোনো আইনগত জটিলতা নয়, বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভেটো ক্ষমতা থাকলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হবে।

২. পদ্ধতিমূলক ব্যবস্থা বাদ দিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বিলে যে কোনো একটি শক্তিধর রাষ্ট্র অসম্মত হলে, আরো বড় সমস্যার সৃষ্টি হবে— সেক্ষেত্রে ভেটো ক্ষমতা অনেক সমস্যাকেই জটিলতা থেকে রক্ষা করবে।

৩. প্রধান শক্তিবর্গ এও বলে যে, তারা দায়িত্বহীনভাবে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না, যদিও তাদের এ দায়িত্ববোধ ও দায়িত্বহীনতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

বাস্তবতা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে কোনো বিষয় পাস হলেও, শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্র সেটাকে বাধা দিতে চাইলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর ভেটো ক্ষমতার ফলে কোনো বিতর্ক মূলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভেটোর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি : ভেটো ক্ষমতার পক্ষে এবং বিপক্ষে দুদিকেই বিভিন্ন যুক্তি আছে। পক্ষের যুক্তিগুলো প্রধানত নিম্নরূপ :

ক. **ভেটো বাস্তবসম্মত ক্ষমতা :** ভেটো ক্ষমতা না থাকলে আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ যে কোনো সময়ই বড় ধরনের বিবাদে জড়িয়ে পড়ত। ভেটো ক্ষমতার ফলে সে দিকটা রহিত হলো। সুতরাং ভেটো একটি বাস্তবসম্মত ক্ষমতা।

খ. **জাতিসংঘের অস্তিত্বের জন্য :** ভেটো ক্ষমতা না থাকলে নিরাপত্তা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যা পাস করতো, লঘিষ্ঠরা তা হয়ত মানতো না এবং না মানার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে জাতিসংঘের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখিন হয়ে উঠতো।

গ. **বৃহৎ শক্তির ঐক্য :** ভেটো ক্ষমতার ফলে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ভেটোর ফলে পূর্বেই তারা নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো দূর করতে চেষ্টা করে।

ঘ. **ভেটো কোনো বাধা নয় :** অনেকে বলতে চান ভেটোর ফলে বিশ্ব শান্তির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া জটিল হয়। বাস্তবত এ যুক্তি সঠিক নয়, কারণ বিশ্বে এ পর্যন্ত যত ভেটো প্রয়োগ হয়েছে তা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়, বিশ্বশান্তির বিপক্ষে নয়। সেক্ষেত্রে ভেটো বিশ্বশান্তির জন্য বাধা নয়, বরং বিশ্বশান্তির জন্য আবশ্যক একটি বিষয়।

ঙ. **ভেটো বিবেচনার সুযোগ দেয় :** ভেটো ক্ষমতার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রকে নানা বিষয়ে বিবেচনা করতে হয় এবং অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।

চ. **আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ভেটো অত্যাবশ্যক একটি বিষয় সর্বশক্তির সম্মতি ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ার ফলে গোটা বিশ্বে এক ধরনের স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

ভেটোর বিপক্ষে যুক্তি : যারা ভেটো ক্ষমতা বিলোপের পক্ষে যুক্তি দেন তারা ভেটোর কিছু দোষ তুলে ধরেছেন। যা নিম্নরূপ :

ক. **সার্বভৌম মানবাধিকার নীতির বিরোধী :** জাতিসংঘ সনদের ২ (১) ধারায় সকল সদস্যের জন্য যে 'সার্বভৌম মানবাধিকার নীতি'র কথা বলা হয়েছে, তা ভেটো ক্ষমতার ফলে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। শুধু শক্তির জোরে আধিপত্য বিস্তারে উদ্বুদ্ধ করে এ ভেটো ক্ষমতা।

খ. **আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ :** এই ক্ষমতা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহিত করবে—কারণ তা জাতিসংঘে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।

গ. **জাতীয় স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে :** ভেটো ক্ষমতার ফলে যেহেতু একটি স্থায়ী দেশ ভেটো দিলেই সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়, সে কারণে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হবে।

ঘ. **অপপ্রয়োগ বেশি হচ্ছে :** বিগত দিনের ভেটো ক্ষমতার উদাহরণের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভেটো ক্ষমতার অপপ্রয়োগই বেশি হচ্ছে। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থেই এটিকে ব্যবহার করছে, বিশ্ব শান্তির জন্য নয়।

ঙ. **আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রতিবন্ধক :** অনেক সমস্যার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভেটোজনিত বাধার কারণে বিশ্ব সম্প্রদায় বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে আলোচনা করতে চাইলেও তা বন্ধ হয়ে যায় যা শান্তিপূর্ণ সমাধানকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

চ. **শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর জবাবদিহিতা নেই :** ভেটো ক্ষমতার ফলে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যত বড় অন্যায়ই করুক তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

এভাবে দেখা যায়, ভেটো ক্ষমতার ফলে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোই সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া সম্ভব হয় না।

ভেটো প্রয়োগের অভিজ্ঞতা : ভেটো প্রয়োগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শীতল যুদ্ধকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি ভেটো প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বার্থেই এ ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করছে।

ভেটো প্রথার বিলুপ্তি : ভেটো প্রথার নানাবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থার যে বেশ কিছু উপকারিতা তথা অনেক সময় বিশ্বকে বড় ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে, সেটাও মোটামুটি সর্বজনবিদিত। যে কারণে বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার যেমন প্রয়োজন, তেমনি এর ভেটো প্রয়োগ পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করা উচিত। তবে, বিশ্ব বাস্তবতায় ভেটো প্রথার বিলুপ্তি সাধন বাস্তবসম্মত হবে না।

ভেটো ক্ষমতা যেমন বিশ্বের অনেক সমস্যা সমাধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তদ্রূপ বিশ্বকে অনেক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষাও করেছে এ ভেটো ক্ষমতা। যে কারণে ভেটো ক্ষমতার বিলুপ্তি এক ধরনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই ভেটো প্রথার পূর্ণ বিলুপ্তি নয়, বরং এর সংস্কারই সময়ের দাবি। যাতে এটি বিশ্বশান্তির জন্য মঙ্গলকর এবং একই সাথে বিশ্বকে বিপর্যয়ের হাত থেকেও রক্ষা করতে পারে।

০৯। আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি অদ্বিতীয় সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক হিসেবে জাতিসংঘকে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘকে সরকারগুলোর রাষ্ট্র এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জাতিসংঘ কোনো বিশেষ সরকার বা কোনো একক জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একটি সমিতির মতো যা কেবল সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

জাতিসংঘের উৎপত্তি : League of Nationas-এর ব্যর্থতার প্রেক্ষিতেই ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর মূলত বিশ্বশান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ বা United Nations-এর আবির্ভাব ঘটে। তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইন্সটন চার্চিলের উদ্যোগেই এ সংস্থাটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী বিরোধ প্রশমনে কাজ করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ গৃহীত অনেক পদক্ষেপ সফলতা লাভ করলেও কিছু পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যেহেতু 'বিশ্বশান্তি'কে মূল উদ্দেশ্য রেখে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল। ফলে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১৯৪৫ সালে স্বাক্ষরিত জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এ সংস্থাটির চারটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্যগুলো হলো :

ক. বিশ্বব্যাপী শান্তি রক্ষা করা।

খ. জাতিসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা।

গ. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা।

গ. জাতিসমূহকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাকল্পে একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করা।

বিরোধ প্রশমনে জাতিসংঘের ভূমিকা : জাতিসংঘ সনদের ২৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার সাথে সম্পর্ক রেখে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা চালায়। বিরোধ নিরসনে নিরাপত্তা পরিষদ দুই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। পদক্ষেপসমূহ :

ক. জাতিসংঘ সনদের ৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিরোধের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপোস, মীমাংসা এবং বিচার বিভাগীয় পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি।

খ. শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা ব্যর্থ হলে পক্ষগুলোকে ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষার মূলনীতিসমূহ : ১৯৪৫ সালে স্বাক্ষরিত জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ সনদের ২৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মূলনীতিগুলো হলো :

ক. বিশ্বের কোথাও যদি উত্তেজনা দেখা দেয় এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জাতিসংঘ অবশ্যই বলপূর্বক উপায়ে কোনো রাষ্ট্রকে মীমাংসায় আসার জন্য বাধ্য করবে না।

খ. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতির উপর নির্ভরশীল।

গ. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভিন্ন বিবদমান রাষ্ট্র বা পক্ষের মধ্যে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে।

আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘ কার্যক্রম : জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। জাতিসংঘের বহু কার্যক্রম সফলতা লাভ করেছে পক্ষান্তরে আবার অনেকগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

ক. জাতিসংঘ গৃহীত সফল কার্যক্রমসমূহ : বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে জাতিসংঘের যে সকল কার্যক্রম সফল হয়েছিল। সেগুলো নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

১. **সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরান সমস্যা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এক চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত সৈন্য ইরানে মোতায়েন ছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বাহিনী অপসারণ না করায় ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে অভিযোগ আনে। ইরানের অভিযোগের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ এ বিরোধের আলোচনা কিছুদিনের জন্য মূলতবী রাখে। এর মধ্যে ইরান থেকে সোভিয়েত বাহিনী অপসারিত হলে বিরোধের অবসান ঘটে।

২. **সিরিয়া ও লেবানন :** ১৯৪৬ সালে সিরিয়া ও লেবানন নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সিরিয়া ও লেবাননে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য মোতায়েন ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স সৈন্য সরিয়ে নেয়নি। নিরাপত্তা পরিষদে ব্যাপক আলোচনার পর ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাদের সৈন্য বাহিনী অপসারণ করে।

৩. **ইন্দোনেশিয়া :** ডাচ (নেদারল্যান্ডস) উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অক্ষশক্তি জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। যুদ্ধের পর জাপানি বাহিনী ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করলে ডাচ শাসক গোষ্ঠী ও ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীরা বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত এক কমিটির মাধ্যমে নেদারল্যান্ড (ডাচ) এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক অভিযান চালায়। নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টি পুনরায় হস্তক্ষেপ করে। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত দি হেগ সম্মেলনে ডাচরা ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

৪. **কঙ্গো সমস্যা :** ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে কঙ্গোর রাজধানী লিওপোলভাইলে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দিলে ঔপনিবেশিক শাসক বেলজিয়াম কঙ্গো ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন উপদলীয় নেতাদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। বেলজিয়ামের প্ররোচনায় কঙ্গোর 'কাতাঙ্গা' প্রদেশ বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কঙ্গো সরকার তখন জাতিসংঘের সৈন্যবাহিনী অপসারণের অনুরোধ জানায়। জাতিসংঘ কঙ্গোতে নিরপেক্ষ সৈন্য মোতায়েন করে এবং 'কাতাঙ্গা'র বিরুদ্ধে জাতিসংঘের প্রেরিত সেনাবাহিনীকে কঙ্গো সরকারকে সহায়তা করতে বলা হয়। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে 'কাতাঙ্গা'র নেতা জর্জ শোম্বে নিরপেক্ষ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে 'কঙ্গো-কাতাঙ্গা' সমস্যার সমাধান হয়। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৫. **হাইতি :** ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সাধারণ পরিষদ হাইতির স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট এরিস্টিডকে অপসারণ করে। হাইতিতে সন্ত্রাস, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামরিক বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করা হয়। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সেখানে একটি বেসামরিক

মিশন প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে কূটনৈতিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য United Nations Mission in Haity (UNMIH) প্রেরণ করা হয়। UNMIH হাইতির উপর তেল ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে।

৬. **পূর্ব তিমুর :** পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭৫ সাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক অভিযানের ফলে সমস্যা আরো প্রকট হয়। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্ব তিমুরে স্বাধীনতার পক্ষে যে সাধারণ নির্বাচন হয় এর রায় স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো সক্রিয় করে। নির্বাচন পরবর্তীতে জাতিসংঘ সেখানে বিরোধ প্রশমনে ১৩টি দেশের বাহিনী নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন গড়ে তোলে। যার নাম United Nations Transition Assistance in East Timour (UNITAET)। অবশেষে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ২০ মে ২০০২ পূর্ব তিমুর বিশ্বের ১৯২তম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

খ. জাতিসংঘের বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ কার্যক্রমসমূহ : প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য নিয়ে 'বিশ্ব শান্তি' বজায় রাখতে জাতিসংঘের গৃহীত একাধিক কার্যক্রম সফল হলেও অনেকগুলো পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১. **ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকট :** ১৯৪৮ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর কর্তৃক ঘোষণায় ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে এ বিরোধের সূত্রপাত। ১৯৪৮, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩-এর মধ্যে তিনবার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সম্প্রতি কট্টরপন্থী ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের কারণে সংকট আরো জটিল আকার ধারণ করছে। পিএলওর সদর দপ্তরে হামলা, হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে ফিলিস্তিনের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে। ২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ দিনের উপর্যুপুরি ইসরাইলি বিমান হামলায় কয়েক হাজার লোক নিহত হয়। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে। কিন্তু সংকট নিরসনে জাতিসংঘের ভূমিকা একেবারে গৌণ।

   ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিন-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি, ২০০৩ সালের প্রস্তাবিত 'রোডম্যাপ' প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপরও জাতিসংঘের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি ১৯৭৬ সালে ইসরাইল লেবাননের ওপর হামলা চালালে জাতিসংঘ এ হামলা বন্ধে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

২. **ইরাক প্রসঙ্গ :** নিষিদ্ধ পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্রের মজুদ ইরাকে রয়েছে, অভিযোগ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশ, তার দোসর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার ও স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মারিয়া আযনার ইরাকের উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেন তা আন্তর্জাতিক আইন তো বটেই জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী। জাতিসংঘের ১৪৪১ নং প্রস্তাবে অস্ত্র পরিদর্শনের রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে। পরবর্তীতে ইরাকি জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ইরাকি জনগণের প্রাধান্য সংক্রান্ত ১৪৮৫ নং প্রস্তাবের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। আজ আক্রান্ত ইরাকে লজ্জিত হচ্ছে মানবাধিকার, পদদলিত হয়েছে ইরাকি সার্বভৌমত্ব। জাতিসংঘের ভূমিকা এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ।

৩. **কাশ্মীর সংকট :** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের উত্তরে ৮৪,৪৭১ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত বিরোধের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর সমস্যাটি প্রথম নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদ একটি কমিশন গঠন করে যার নাম United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP)। ১৯৪৮ সালের ৭ জুলাই পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আজও কাশ্মীর নিয়ে সংঘাত চলছেই। জাতিসংঘ কাশ্মীর বিরোধ নিষ্পত্তিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

৪. **ফকল্যান্ড সংকট :** ফকল্যান্ড আটলান্টিক মহাসাগরের একটি দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রিটেনের তথাকথিত উপনিবেশ। এটা আর্জেন্টিনার দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব দিকে অবস্থিত। আর্জেন্টিনা সরকার ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। ব্রিটেন নিরাপত্তা পরিষদে দাবি করে আর্জেন্টিনার সৈন্য ফিরিয়ে নেবার জন্য। ব্রিটেন পুনরায় সামরিক শক্তি প্রয়োগে ফকল্যান্ড দখল করে নেয় জাতিসংঘের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব উপেক্ষো করে। আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ডের উপর এখনো সার্বভৌমত্ব দাবি করে। জাতিসংঘের ভূমিকা এখানেও ব্যর্থ।

৫. **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা :** ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের জন্য হতাশাজনক। বিশেষ করে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্টের ভূমিকা। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সামরিক বর্বরোচিত অভিযান শুরু হয় জাতিসংঘ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে। অবশ্য জাতিসংঘ উদ্বাস্তু শিবিরে ত্রাণ পাঠিয়েছিল। অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার এই বর্বরোচিত, ঘৃণ্য সামরিক অভিযান বন্ধে জাতিসংঘের প্রতি আবেদন জানায়। এই গণহত্যা বন্ধে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, পোল্যান্ড জাতিসংঘের প্রতি আবেদন জানালেও কোনো সাড়া মেলেনি। বরঞ্চ স্বাধীনতাযুদ্ধে যখন বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় তখন নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির একাধিক প্রস্তাব করা হয় যাতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারে। কিন্তু প্রতিবারেই তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন উক্ত প্রস্তাবে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে। জাতিসংঘ সর্ববৃহৎ শক্তিগুলোর পুতুল হিসেবে কাজ করেছিল। জাতিসংঘের এই ভূমিকায় বিশ্ববাসী হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়।

বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের অভিভাবক হিসেবে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হলে বিশ্বব্যাপী অনেক আশার সঞ্চার হয়, কেননা League of Nations-এর ব্যর্থতায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এমন একটি কার্যকরী সংস্থাই খুঁজছিল। প্রথম দিকে জাতিসংঘের পদক্ষেপগুলো সফল হলেও বর্তমান ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘের কার্যকারিতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় ভারসাম্য থাকলেও এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। তথাপি জাতিসংঘ দৃঢ় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। প্রয়োজন জাতিসংঘের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের। এর মাধ্যমেই জাতিসংঘ আবার স্ব-মহিমায় বিশ্বব্যাপী শাসন করবে যেমনটি ছিল বিগত বছরগুলোতে। নেতিবাচক, কিংবা ব্যর্থ ভূমিকা থাকলেও আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রসঙ্গে রয়েছে জাতিসংঘের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

১০। ক. আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও কার্যাবলী উল্লেখপূর্বক এর দুর্বলতা তুলে ধরুন।
খ. আন্তর্জাতিক আদালত সংস্কারে আপনার সুপারিশ ব্যক্ত করুন।

উত্তর : কার্ল মার্কস বলেছিলেন, 'The history of all hetherto existing society is the history of class struggle.' এসব 'class struggle'-এর মূলই হলো ন্যায়-অন্যায়। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই সর্বযুগে এবং সকল সভ্যতায় এ ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত বিদ্যমান ছিল। তবে এ সংঘাত নিরসনে পৃথিবীর মানুষও বসে নেই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সকল সমস্যা ও সংঘাতের ন্যায়ভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক এ সভ্যতায়ও মানুষ সমস্যার ন্যায়ভিত্তিক সমাধানের জন্য গড়ে তুলেছে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সংঘাতের ন্যায়ভিত্তিক বিচারকে বাস্তবায়ন করার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় আন্তর্জাতিক আদালত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি দীর্ঘ সময় অতিক্রম করেছে। এ পথ পরিক্রমায় এ আদালতের কার্যক্রমে ব্যাপক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এর সাফল্যও কম নয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস : আন্তর্জাতিক আদালতের ইতিহাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়েছে। ১৯২০ সালে তৎকালীন জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের সংবিধি গৃহীত হয়। প্রায় ২১টি রাষ্ট্রের সমর্থনে ১৯২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এ সংবিধি কার্যকর হয় এবং একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে এ স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত ভেঙ্গে দেয়া হয়। অবশ্য পরবর্তীতে জাতিসংঘ সনদের একাদশ অধ্যায় অনুসারে আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আদালতের রূপ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯২০ সালের আন্তর্জাতিক আদালত থেকে ১৯৪৬ সালের আন্তর্জাতিক আদালত গঠন ও কার্যাবলীর দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নতর।

আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও কাযাবলী

আদালতের গঠন : ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত। বিচারকদের কার্যকাল ৯ বছর। বিচারকদের প্রত্যেকের মধ্যেই জাতিগত ভিন্নতা থাকবে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ উভয়েরই সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণ নিয়োজিত হন। একটি ন্যাশনাল প্যানেলের (National Panel) মাধ্যমে বিচারক হিসেবে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনীত করা হয়। এ আদালতের বিচারকগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কোনো বিচারক পুনর্নির্বাচিতও হতে পারেন। প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর পাঁচটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আদালতই তার সভাপতি এবং সহ-সভাপতিকে তিন বছরের জন্য নির্বাচিত করে। এ আদালতের সদস্যবৃন্দ অন্য কোনো রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও পেশাগত দায়িত্বে থাকতে পারে না। আদালতের বিচারক হওয়ার কারণ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যদি কোনো বিচারক কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাহলে তিনি ঐ বিষয়ে বিচার করা থেকে বিরত থাকবেন।

এমন কোনো অভিযোগ যদি থাকে যে অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো দেশের বিচারক আন্তর্জাতিক আদালতে পূর্বেই নিয়োজিত রয়েছেন, তবে সেক্ষেত্রে সে দেশের বিচারকের পরিবর্তে অন্য কোনো বিচারক প্রতিস্থাপন করে বিচার কাজ আরম্ভ করতে হবে। আর ১৫ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত ৯ জন সদস্যের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আদালতে রায় গৃহীত হয়।

আদালতের কার্যাবলী : আন্তর্জাতিক আদালতকে জাতিসংঘ সনদ অনুসরণ করেই কাজ করতে হয়। যে কোনো অভিযোগে শুধু রাষ্ট্রই বাদী হতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে :

১. বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে উভয়পক্ষ যৌথভাবে যেসব অভিযোগ আদালতের নিকট উপস্থাপন করে;

২. কনভেনশন অথবা ট্রিটি সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় আদালতের নিকট রেফারেন্স হিসেবে প্রেরিত হয়; প্রায় ৭০০ দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক চুক্তি এ ধরনের প্রভিশন তৈরি করে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় : a. Treaty of Peace with Japan (1951), b. European Convention for Peaceful Settlement of Disputes (1957), c. Single Convention on Narcotic Drugs (1961), d. Protocal Relating to the Status of Refugees (1967), e. Hague Convention on the Suppression of the Unlawful Seizure of Aircraft (1970).

৩. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনগত সমস্যাকে Compulsory for specified classes of disputes হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৬২টি দেশ Compulsory Jurisdiction of the Court কে গ্রহণ করে ঘোষণা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের ওপর কোনো আপিল করা যায় না। যেসব পক্ষ কোর্টে অভিযোগ দায়ের করবে, তারা অবশ্যই কোর্টের রায় মানতে বাধ্য থাকবে। কোনো একটি অভিযোগে যদি কোনো একটি পক্ষ রায় কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করা যায় এবং নিরাপত্তা পরিষদ ঐ দেশের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করতে পারে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ অথবা জাতিসংঘের অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠনের অনুরোধে আইনগত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আদালত advisory opinion দিতে পারে।

বিবেচ্য অভিযোগসমূহ (Considered Cases)

ক. বিচারসমূহ (Judgement) : ১৯৪৬ সালের পর থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রায় ৮০টি অভিযোগ আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট দায়ের করা হয়। এর মধ্যে কতিপয় অভিযোগ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। কারণ কিছু অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়ে যায়, কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে বাদী পক্ষ ধারাবাহিকতা বজায় রাখেনি। আবার কিছু অভিযোগের আইনগত ভিত্তিই ছিল না। যা হোক, যেসব অভিযোগ আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের তালিকায় ছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy V. France, United Kingdom and USA); Sovereignty Over Certain Frontier Land (Belgium, Netherlands); Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 December 1906 (Hondurus V. Nicaragua).

খ. অ্যাডভাইজরি অপিনিয়ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, জাতিসংঘের অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠন অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠনের অনুরোধে আইনগত প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আদালত বিভিন্ন অ্যাডভাইজরি অপিনিয়ন দিয়েছে। এর মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো ছিল : জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে কোনো রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় শর্ত; বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি এবং রোমানিয়ার মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন; দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আন্তর্জাতিক মর্যাদা; পশ্চিম সাহারার বিষয় এবং applicability of the obligation to Arbitrate under Section 21 on the United Nations Headquarters Agreement on 26 June 1947 (২৬ জুন ১৯৪৭ সালে সম্পাদিত জাতিসংঘ হেডকোয়ার্টার অ্যাগ্রিমেন্টের ২১ অনুচ্ছেদ অনুসারে সমস্যা নিষ্পত্তি করায় বাধ্যবাধকতার প্রয়োগযোগ্যতা।)

আন্তর্জাতিক আদালতের সীমাবদ্ধতা

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক আদালত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক আদালতের এ ইতিহাস যেভাবে সমালোচিত হয়েছে, তেমনিভাবে প্রশংসিত হয়নি। সংগঠনটির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাই এর জন্য দায়ী। এসব সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র তার কাঠামো ও কার্যাবলী কেন্দ্রিকই নয়, আন্তর্জাতিক কূটকৌশল, বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাংগঠনিক কাঠামোও এর জন্য দায়ী। নিচে আন্তর্জাতিক আদালতের সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরা হলো :

ক. অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি : আন্তর্জাতিক আদালতের অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতিই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এ আদালতে রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন অভিযোগ দায়ের করতে পারে না। অভিযোগ দায়ের করতে হলে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া অভিযোগের বিবাদী পক্ষও রাষ্ট্র হতে হবে। রাষ্ট্র কর্তৃক বিবেচ্য সমস্যা ব্যতীত অন্য কোনো সমস্যা এ আদালত গ্রহণ করে না।

খ. বাদী ও বিবাদী পক্ষ : যে কোনো অভিযোগেরই দুটি পক্ষ থাকে। একটি হলো বাদী পক্ষ এবং অপরটি বিবাদী পক্ষ। আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে হলে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকেই অভিযোগ দায়ের করার বিষয়ে একমত হতে হবে। বিবাদী পক্ষ আদালতে অভিযোগ দায়েরের বিষয়ে বাদী পক্ষকে আপত্তি জানালে সে অভিযোগ আদালতে শুনানির জন্য গৃহীত হবে না। সুতরাং বিবাদী পক্ষকে রাজি করে আদালতে অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। এভাবে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যাবে না, অভিযোগের নিষ্পত্তিও হবে না এবং আদালত ধীরে ধীরে এর কার্যকারিতাও হারাবে।

গ. বিচারক নিয়োগ : আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াটিরও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিচারকদেরকে প্রথমে national panel-এর মাধ্যমে মনোনয়ন করা হয়। অতঃপর মনোনীত প্রতিনিধিদের থেকে প্রথমে সাধারণ পরিষদের চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে সাধারণ পরিষদে নির্বাচিত বিচারকদেরকে নিরাপত্তা পরিষদেও চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হতে হয়। এভাবে বিচারক নিয়োগের চূড়ান্ত দায়িত্বটি নিরাপত্তা পরিষদের হাতেই রয়ে যায়। ফলে নিরাপত্তা পরিষদ পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আদালতের স্বচ্ছতার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ওপর আদালতের এ নির্ভরশীলতা হ্রাস করা প্রয়োজন। অন্যথায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়।

ঘ. রায় বাস্তবায়ন : আন্তর্জাতিক আদালতের রায় যদি কোনো পক্ষ বাস্তবায়ন করতে অনীহা প্রকাশ করে তাহলে সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ দায়ের করা যায়। এ অভিযোগের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায়ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিরাপত্তা পরিষদের ওপর নির্ভরশীল। একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে এ রায় বাস্তবায়নের জন্য নিরপেক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ফলে আদালতের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়।

আন্তর্জাতিক আদালতের সংস্কার ও সুপারিশ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপরই গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকভাবেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে আন্তর্জাতিক আদালতের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। ১৯৪৬ সালে

আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হওয়ার পর থেকে এর কাঠামো ও কার্যক্রম নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠেছে। কারণ আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে এখনো নিজেকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রমাণ করতে পারেনি। তাই এর সংস্কার অপরিহার্য। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

১. **বিচারক নিয়োগ :** বিচারকদের 'national panel'-এর হাতেই বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব থাকবে। চূড়ান্তভাবে এ নিয়োগ বাস্তবায়িত হবে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে। নিরাপত্তা পরিষদ বিচারক নিয়োগে কোনো প্রকার প্রভাব খাটাতে পারবে না।

২. **রায় বাস্তবায়ন :** রায় বাস্তবায়নেরও দায়িত্ব থাকবে জাতিসংঘের 'national panel'-এর ওপর। এক্ষেত্রে কোনো পক্ষ যদি রায় বাস্তবায়ন করতে অনীহা প্রকাশ করে, তাহলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ওপর ভিত্তি করে ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. **পুনর্নির্বাচন :** বিচারক পুনর্নির্বাচনের ধারা বাতিল করতে হবে। এর ফলে কোনো কোনো বিচারক পুনর্নির্বাচিত হওয়ার প্রলোভনে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করতে পারে।

৪. **বিবাদী পক্ষ :** আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়েরের জন্য বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকেই একমত হতে হয়। এর ফলে অনেক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যায় না। অভিযোগ দায়েরের এ পদ্ধতিও বাতিল করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক আদালতের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে সত্য কিন্তু বিচারের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে আন্তর্জাতিক আদালতের সংস্কার সাধন করা হলে প্রতিষ্ঠানটি গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কাজ করতে পারবে। তবে আদালতের স্বচ্ছতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘকে আরও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ সৌদি আরব কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো আলোচনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গসংস্থার অন্যতম একটি নিরাপত্তা পরিষদ, যার অপর নাম স্বস্তি পরিষদ। ১৯৪৬ সালে ১১টি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হলেও ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ সনদ সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১১টি থেকে বাড়িয়ে ১৫টি করা হয়। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছর মেয়াদে নির্বাচিত হয়।

১৭ অক্টোবর ২০১৩ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় সৌদি আরব। নির্বাচিত হওয়ার পরদিন ১৮ অক্টোবর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করে এক নজিরবিহীন ঘটনার জন্ম দেয় দেশটি। বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, সবার আগে প্রয়োজন জাতিসংঘের সংস্কার।

দীর্ঘদিনের ফিলিস্তিন সমস্যা, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত করাসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা এবং দ্বিমুখী নীতির কারণে সৌদি কর্তৃপক্ষ এমন ঘোষণা দেয়। নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানায়, এর জন্য বিশ্বসভার সর্বোচ্চ এ পরিষদের অসম নীতি দায়ী।

তবে সৌদ আরবের এমন হতাশা নতুন বা আকস্মিক নয়। বরং বহু বছর ধরে পুঞ্জিভূত হতাশার দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ। এর আগে একই ধরনের হতাশা ব্যক্ত করে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিতে অস্বীকৃতি জানান সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সৌদি আল ফয়সাল। সৌদি আরবের এ হতাশা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কারণে।

শিয়া অধ্যুষিত দেশ ইরান ও সিরিয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন মোটেই পছন্দ নয় সৌদি আরবের। ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের জের ধরেই হয়তো কথা ছিল ইরানকে যেভাবেই হোক কোণঠাসা করে রাখার।

ইরান ও ইসরাইলকে ইঙ্গিত করে সৌদি আরবের অভিযোগ, মধ্যপ্রাচ্যকে পরমাণু অস্ত্রসহ গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত করার ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ। একই সাথে বিগত ৬৭ বছর ধরে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে একাধিকবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অমীমাংসিত ও স্পর্শকাতর এ বিষয় এখনও বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে জাতিসংঘ।

মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ ব্যর্থতার কারণ হিসেবে সৌদি আরব দায়ী করছে 'ইন্টারন্যাশনাল ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস' বা আন্তর্জাতিক বৈষম্য নীতিকে। ফিলিস্তিনিদের তাড়িয়ে ইসরাইল সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও অবহেলিত থেকে গেছে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৈষম্য নীতির কারণে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ ইস্যুতে সীমাহীন দীর্ঘ শান্তি

আলোচনা। জাতিসংঘের এমন ব্যর্থতায় ক্ষোভ যেন শেষ সীমায় পৌঁছেছে সৌদি আরবসহ গোটা আরব বিশ্বের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, সৌদি আরবের অভিযোগ মূলত যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে। কারণ বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের জন্য তাদের মায়াকান্না দেখা গেলেও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের প্রতিশ্রুতির কোনো বাস্তবায়ন নেই।

ফিলিস্তিন সমস্যার সাথে জড়িত আছে ইরান ও সিরিয়া ইস্যু। ঐ অঞ্চলে ইরানের উত্থান স্বাভাবিকভাবেই সৌদি আরবের জন্য মাথাব্যথার কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের গানে ঠোঁট মেলোনো ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। তাই ইরানই ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে মূল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

একদিকে লেবাননের শিয়া গেরিলা গোষ্ঠী হিজবুল্লার সাথে ইরানের সখ্যতা, অন্যদিকে সিরিয়ার শিয়া একনায়ক বাশার আল আসাদের সাথে দহরম মহরম সম্পর্কের কারণে অস্বস্তিতে সৌদি আরব। অনেকে মনে করছেন, পরমাণু ইস্যুতে ইরানকে শায়েস্তা না করে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনায় যাওয়ার পদ্ধতিটা সম্ভবত সৌদি কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি। সৌদি আরব সিরিয়ার বিদ্রোহীদের পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে আসলেও শেষ মুহূর্তে যেন দামেস্ক ও তেহরানকে কোণঠাসা করার সে উপায়টাও যেন হাতছাড়া হয়ে যায়। লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করলেও আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ নিরাপত্তা পরিষদ। বরং রাসায়নিক অস্ত্র সমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে সব কিছুই যেন ভন্ডুল হয়ে গেলো। রাতারাতি খলনায়ক থেকে নায়কে পরিণত হলেন প্রেসিডেন্ট আসাদ।

এসব কারণে সৌদি কর্তৃপক্ষ মনে করছে, সবার আগে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। মূলত জাতিসংঘের এ সংস্কার চায় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ছাড়া অনেকেই। স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনের আশঙ্কা, বহু আকাঙ্ক্ষিত সংস্কার হলে বিশ্ব ক্ষমতার ভারসাম্য ও ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। তার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন খেলোয়াড়ের আমদানি ঘটবে। আর এর ফলে জাতিসংঘ নিজেই তার বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

সৌদি আরবের রাজনৈতিক ঐতিহ্য হলো ঘটনার পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়ানো। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে এভাবেই নিজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিল করে থাকে দেশটি। বিশেষ করে জি-টুয়েন্টির সদস্য হিসেবে গত কয়েক বছরে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের অবস্থান আরো জোরদার করতে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র রাষ্ট্র সৌদি আরব।

প্রশ্ন-০২ জেনেভা কনভেনশন কি? এর মূল উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : জেনেভা কনভেনশন একটি মানবাধিকার চুক্তি। ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট জেনেভায় পৃথিবীর ৫৮টি দেশের মধ্যে যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সাথে আচরণবিধির ওপর ৪টি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চারটি চুক্তিই 'জেনেভা কনভেনশন' নামে পরিচিত। জেনেভা কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধাহত ও যুদ্ধবন্দিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

প্রশ্ন-০৩ CEDAW (সিডও)-এর পূর্ণরূপ কি? এটি কোন ধরনের দলিল বা চুক্তি?

উত্তর : CEDAW-এর পূর্ণরূপ হলো Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. সিডও হচ্ছে নারী অধিকারের দলিল। দীর্ঘকাল থেকে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দূর করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক দলিল বা কনভেনশন। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ৬ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে এ দলিলে স্বাক্ষর করে।

প্রশ্ন-০৪ শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব বা The Uniting for Peace Resolution বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' বা 'The Uniting for Peace Resolution' হলো বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব। ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ এটি অনুমোদন করে। জাতিসংঘ সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী কোনো সদস্য পরিষদে আলোচিত কোনো প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করলে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় না। তাই নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের মতানৈক্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং তার প্রতি ভীতি প্রদর্শন বা আগ্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে এ প্রস্তাবের ক্ষমতা বলে সাধারণ পরিষদ ২৪ ঘন্টার মধ্যে জরুরি সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মতবিরোধ দেখা দিলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাধারণ পরিষদ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। সুতরাং বিশ্বশান্তি রক্ষায় এ প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

প্রশ্ন-০৫ জাতিসংঘ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : জাতিসংঘ হলো বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের সর্ববৃহৎ এক বিশ্ব সংগঠন। ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

প্রশ্ন-০৬ জাতিসংঘের সরকারি ভাষা কয়টি ও কি কি? এর দাপ্তরিক ভাষা কি?

উত্তর : জাতিসংঘের সরকারি ভাষা ৬টি। যথা : আরবি, চাইনিজ, ইংরেজি, ফরাসি, রাশিয়ান এবং স্পেনীয়। এ ছয়টি ভাষার মধ্যে ইংরেজি ও ফরাসি এ দুটি ভাষা দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-০৭ জাতিসংঘ সনদ কত সালে এবং কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন ও স্বাক্ষরিত হয়। ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এ সনদে স্বাক্ষর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে এ স্বাক্ষর দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, পোল্যান্ড এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত হয়।

প্রশ্ন-০৮ জাতিসংঘের প্রথম ও বর্তমান মহাসচিবের নাম কি এবং তারা কোন দেশের অধিবাসী?

উত্তর : জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন ট্রিগভেলি। তিনি নরওয়ের অধিবাসী। ১৯৪৫-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম বান কি মুন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী। বান কি মুন ১ জানুয়ারি ২০০৭ অষ্টম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে দায়িত্বরত আছেন।

প্রশ্ন-০৯ জাতিসংঘে এ পর্যন্ত কতজন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন? এর মধ্যে সর্বশেষ এশীয় মহাসচিব কে?

উত্তর : ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ জন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। যথা : ট্রিগভেলি (১৯৪৫-৫৩), দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (১৯৫৩-৬১), উ থান্ট (১৯৬১-৭১), কুর্ট ওয়াল্ডহেইম (১৯৭২-৮১), জ্যাভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার (১৯৮২-৯১), বুট্রোস বুট্রোস ঘালি (১৯৯২-৯৬), কফি আনান (১৯৯৭- ২০০৬) বান কি মুন (২০০৭-বর্তমান)। এ পর্যন্ত নির্বাচিত মহাসচিবদের মধ্যে সর্বশেষ এশীয় মহাসচিব হলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বান কি মুন। প্রথম এশীয় মহাসচিব হলেন উ থান্ট (মিয়ানমার)।

প্রশ্ন-১০ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা কত? নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়?

উত্তর : জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) মোট সদস্য ১৫টি। এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য ৫টি (চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য) এবং অস্থায়ী সদস্য হলো ১০টি। অস্থায়ী দশ সদস্য দু বছরের জন্য সাধারণ সভার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে নির্বাচিত হন। ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী প্রতিটি সদস্যদেশ এক মাসের জন্য পরিষদের সভাপতি হয়।

প্রশ্ন-১১ জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্রের নাম কি? এটি জাতিসংঘের কততম সদস্যপদ লাভ করে?

উত্তর : জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য দেশের নাম দক্ষিণ সুদান। দক্ষিণ সুদান ১৪ জুলাই ২০১১ জাতিসংঘের ১৯৩তম সদস্যপদ লাভ করে।

প্রশ্ন-১২ জাতিসংঘ ব্যতীত এর কোন কোন অঙ্গসংস্থা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে?

উত্তর : ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR), ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ১৯৬৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী ১৯৮৮ সালে এবং জাতিসংঘ নিজে ২০০১ সালে, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) ২০০৫ সালে এবং ২০০৭ সালে আইপিসিসি (IPCC) শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

প্রশ্ন-১৩ জাতিসংঘের মূল সংস্থা কয়টি ও কি কি?

উত্তর : জাতিসংঘের মূল সংস্থা ৬টি। সংস্থাগুলো হলো সাধারণ পরিষদ (General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), সচিবালয়, আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice) এবং অছি পরিষদ (Trusteeship Council)। বর্তমানে অছি পরিষদ বিলুপ্ত রয়েছে।

প্রশ্ন-১৪ জাতিসংঘের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত এবং কত সালে স্থাপিত হয়?

উত্তর : জাতিসংঘের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের টোকিওতে অবস্থিত। ১৯৭৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-১৫ আটলান্টিক সনদ (Atlantic Treaty) কি?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রিটিশ রণতরী প্রিন্সেস অব ওয়েলসে ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিই আটলান্টিক সনদ নামে পরিচিত। ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টিন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এ সনদে স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন-১৬ নিষেধাজ্ঞা (Embargo) এবং বয়কট (Boycott) কি?

উত্তর : সাধারণত এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজের বন্দর ত্যাগ বা বন্দরে প্রবেশের ওপর সরকারি আদেশ বা আইন জারিকেই নিষেধাজ্ঞা বা নিষিদ্ধকরণ (Embargo) বলা হয়। যুদ্ধ বা উত্তেজনা চলাকালীন সময়ে সাধারণত এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা অনির্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট কালের জন্য হতে পারে। কখনও কখনও সংবাদপত্রে কোনো সংবাদবিশেষ বিকৃতি বা বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রেও সরকারি কর্তৃপক্ষ স্থায়ী বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বা Embargo আরোপ করে থাকেন।

অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কর্তৃপক্ষ, দেশ বা বস্তুর সাথে সমবেতভাবে সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন বা বর্জন করাকেই বয়কট (Boycott) বলা হয়। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে

'বয়কট' শব্দটির প্রচলন শুরু হয়। ১৮৮০ সালে সমগ্র আয়ারল্যান্ড জুড়ে ত্রি-এফ আন্দোলন (জমির ওপর প্রজার সত্ত্ব নির্ধারণ, প্রজার জমি বিক্রির অবাধ অধিকার এবং ইচ্ছামতো খাজনাবৃদ্ধির বদলে ন্যায়সঙ্গত হারে জমির খাজনা স্থিরকরণ) শুরু হলে 'আইরিশ ল্যান্ড লীগ' নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়; যারা সিদ্ধান্ত নেয়, যেসব জমিদার বা কর্মকর্তা এই থ্রি-এফ দাবি স্বীকার করবে না তাদেরকে সমবেতভাবে বর্জন বা একঘরে করা হবে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে জমিদারপক্ষ বয়কট এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। সে থেকে বয়কট কথাটি একঘরে করা বা সমবেত বর্জন অর্থে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে শব্দটি দেশ, বস্তু, গোষ্ঠী ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারে বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে।

প্রশ্ন-১৭ ভেটো ক্ষমতা কি?

উত্তর : ভেটো (Veto) একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ হলো 'আমি মানি না'। এটা কোনো বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা। সাধারণত বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন-এর মধ্যে যে কোনো এক সদস্যের কোনো প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়ার ক্ষমতাই 'ভেটো' নামে পরিচিত। কোনো প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী সদস্য অনুপস্থিত থাকলে বা ভোটদানে বিরত থাকলে তাও ভেটো বলে গণ্য হয়। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত ইয়াল্টা সম্মেলনে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যকে এ ভেটো ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালে মূল চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সত্তর দশকের শেষার্ধে নয়া চীনকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না এবং তৎপরিবর্তে চিয়ং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন তাইওয়ানই ভেটো ক্ষমতাও লাভ করে। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী সকল সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা সমান হলেও ভেটো ক্ষমতার দরুন উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি দেশ অন্যদের তুলনায় অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে আসছে।

প্রশ্ন-১৮ বেইজিং নারী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা কি কি?

উত্তর : ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ১৮৫ দেশের প্রায় ৩০ হাজার প্রতিনিধি অংশ নেন। সৌদি আরব ও গ্রানাডা এ সম্মেলনে যোগ দেয়নি এবং সোমালিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানসহ বেশ কিছু এনজিও কর্মকর্তাও এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনের স্লোগান ছিল 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'। জাতিসংঘের উদ্যোগে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহাসচিবের পক্ষে ইসমত কিটানি এবং সভাপতিত্ব করেন চীনের চেন মহুয়া। সম্মেলনে ব্যাপক মতবিরোধের সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত 'প্লাটফরম ফর অ্যাকশন' গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা

□ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ নারী □ সামাজিক বৈষম্য, দৈহিক পার্থক্য এবং সেবার সুযোগের অভাবে নারীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। অশিক্ষা এবং গর্ভধারণজনিত কারণে বিশ্বে প্রায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মহিলা মারা যায় □ উন্নত শিক্ষা, প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে এবং নিরক্ষতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই নারী □ আইনগত সাহায্য ও নিরাপত্তা লাভের সুযোগের অভাবই নারী নির্যাতনের প্রধান সমস্যা □ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের গণ্য করা হয় না □ আইনগতভাবে নারী অধিকার আদায় হলেও বাস্তবে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

জাতিসংঘ : গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি

জাতিপুঞ্জ (League of Nations)

প্রশ্ন : কোন চুক্তির মাধ্যমে 'লীগ অব নেশনস-এর গোড়াপত্তন হয়?
উত্তর : Treaty of Versailles.
প্রশ্ন : 'Treaty of Versailles' স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ২৮ জুন ১৯১৯ [কার্যকর ১০ জানুয়ারি ১৯২০]
প্রশ্ন : 'লীগ অব নেশনস' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯১৯ সালে।
প্রশ্ন : 'লীগ অব নেশনস'-এর বিভাগ বা অঙ্গ ছিল কতটি?
উত্তর : ৩টি (অ্যাসেম্বলি, কাউন্সিল ও সচিবালয়)।
প্রশ্ন : লীগ অব নেশনস-এর প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৬ জানুয়ারি ১৯২০।
প্রশ্ন : লীগ অব নেশনস-এর প্রথম অ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৫ নভেম্বর ১৯২০।
প্রশ্ন : জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাবক ছিলেন কে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
প্রশ্ন : জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর কোথায় ছিল?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড [প্রথমে ছিল যুক্তরাজ্যের লন্ডন (১০ জুন ১৯১৯-১ নভেম্বর ১৯২০)]।
প্রশ্ন : জাতিপুঞ্জের প্রথম মহাসচিব ছিলেন কে?
উত্তর : স্যার এরিক ড্রামন্ড (যুক্তরাজ্য)।
প্রশ্ন : লীগ অব নেশনস কবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়?
উত্তর : ২০ এপ্রিল ১৯৪৬।

জাতিসংঘ (United Nations)

প্রশ্ন : জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত লন্ডন ঘোষণা কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১২ জুন ১৯৪১।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের খসড়া সনদ কবে প্রণয়ন করা হয়?
উত্তর : ১৯৪৪ সালে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালে কোথায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ইরানের রাজধানী তেহরানে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাব কবে ও কোথায় গৃহীত হয়?
উত্তর : ১৯৪৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওকসে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণকারী দেশসমূহ কি কি?
উত্তর : চীন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ চার্টার কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
উত্তর : ২৫ এপ্রিল-২৬ জুন ১৯৪৫, সানফ্রান্সিসকোতে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ নামটি উদ্ভাবক বা গঠনের প্রস্তাবক কে ছিলেন?
উত্তর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সদর দপ্তরের স্থপতি কে?
উত্তর : ডব্লিউ হ্যারিসন।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সদর দপ্তরের জমি কে দান করেন?
উত্তর : জন ডি রকফেলার জুনিয়র।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত আটলান্টিক ঘোষণা কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১৪ আগস্ট ১৯৪১।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের নামকরণ করেন কে?
উত্তর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (১ জানুয়ারি ১৯৪২)।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ২৬ জুন ১৯৪৫।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সনদের রচয়িতা কে?
উত্তর : Archibald Macleish (যুক্তরাষ্ট্র)।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫।
প্রশ্ন : প্রতিবছর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয় কবে?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের পতাকা কিরূপ?
উত্তর : হালকা নীল রঙের মাঝে একটি সাদা বৃত্ত এবং বৃত্তের মাঝখানে জাতিসংঘের প্রতীক।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের ইউরোপীয় কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা কয়টি ও কি কি?
উত্তর : ৬টি। ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, রুশ, স্প্যানিশ ও আরবি।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের আয়ের উৎস কি?
উত্তর : সদস্য দেশসমূহের চাঁদা।
প্রশ্ন : সদস্য দেশ সর্বোচ্চ কি পরিমাণ চাঁদা জাতিসংঘকে প্রদান করতে পারে?
উত্তর : মোট বাজেটের ২৫%।
প্রশ্ন : সদস্য দেশ সর্বনিম্ন কি পরিমাণ চাঁদা জাতিসংঘকে দিতে বাধ্য?
উত্তর : মোট বাজেটের ০.০১%।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের বাজেট কত বছরে একবার ঘোষিত হয়?
উত্তর : দু'বছরে একবার।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের ওয়েস্ট কোর্ট গার্ডেনের নাম কি?
উত্তর : শান্তি ঘণ্টা।
প্রশ্ন : 'শান্তি ঘণ্টা'য় কি লেখা আছে?
উত্তর : নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তি দীর্ঘজীবী হোক।

দেশ বৈশিষ্ট্যে জাতিসংঘ

ক্ষুদ্রতম দেশ ➤ আয়তনে : মোনাকো; জনসংখ্যায় : টুভালু
বৃহত্তম দেশ ➤ আয়তনে : রাশিয়া; জনসংখ্যায় : চীন
পর্যবেক্ষক দেশ ➤ ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন
সদস্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে নেই ➤ তাইওয়ান
সদস্যপদ ত্যাগ করে পুনরায় যোগদান ➤ ইন্দোনেশিয়া

জাতিসংঘের সদস্য

প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত রাষ্ট্রের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১৯৫।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯৩।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের ১৯৩তম বা সর্বশেষ সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই ২০১১)।
প্রশ্ন : বর্তমানে জাতিসংঘের অসদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র কতটি?
উত্তর : ২টি। ভ্যাটিকান সিটি এবং ফিলিস্তিন।
প্রশ্ন : তাইওয়ান কবে চীনের নিকট জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায়?
উত্তর : ১৯৭১ সালে।
প্রশ্ন : ইন্দোনেশিয়া কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিল?
উত্তর : ২০ জানুয়ারি ১৯৬৫ (পুনরায় যোগদান ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬)।
প্রশ্ন : কোন দেশ জাতিসংঘের চার্টারে স্বাক্ষর না করেও প্রতিষ্ঠার সময় জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয়?
উত্তর : পোল্যান্ড।

জাতিসংঘের সর্বশেষ ৫ সদস্য

তম	দেশ	সদস্যপদ লাভ
১৮৯	সার্বিয়া	১ নভেম্বর ২০০০
১৯০	সুইজারল্যান্ড	১০ সেপ্টেম্বর ২০০২
১৯১	পূর্ব তিমুর	২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২
১৯২	মন্টিনিগ্রো	২৮ জুন ২০০৬
১৯৩	দক্ষিণ সুদান	১৪ জুলাই ২০১১

জাতিসংঘে বাংলাদেশ

প্রশ্ন : বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?
উত্তর : ১৩৬তম।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাথে অন্য কোন দুটি দেশ সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ।
প্রশ্ন : জাতিসংঘে প্রথম কে, কততম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪); ২৯তম।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র বাংলাদেশী কে?
উত্তর : হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
প্রশ্ন : হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী কততম অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন?
উত্তর : ৪১তম অধিবেশনে।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ কতবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে?
উত্তর : ২ বার (১৯৭৯-৮০ সালে এবং ২০০০-২০০১ সালে)।

জাতিসংঘের মূল অঙ্গ সংগঠন

প্রশ্ন : জাতিসংঘের মূল অঙ্গসংগঠন কতটি?
উত্তর : ৬টি।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের মূল অঙ্গসংগঠনগুলো কি কি?
উত্তর : সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং সচিবালয়।

সাধারণ পরিষদ

প্রশ্ন : জাতিসংঘের আলাপ-আলোচনার মূল সভা কোনটি?
উত্তর : সাধারণ পরিষদ।
প্রশ্ন : সাধারণ পরিষদের প্রধানকে কি বলে?
উত্তর : সভাপতি।
প্রশ্ন : সাধারণ পরিষদের সহ-সভাপতি কতজন?
উত্তর : ২১ জন।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের প্রত্যেক দেশ কোন পরিষদের সদস্য?
উত্তর : সাধারণ পরিষদের।
প্রশ্ন : সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২৩ অক্টোবর-১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মূল কমিটির সংখ্যা কত?
উত্তর : ৭টি।
প্রশ্ন : সাধারণ পরিষদের সভাপতি কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন?
উত্তর : এক বছর।
প্রশ্ন : সাধারণ পরিষদের সভাপতি কিভাবে নির্বাচিত হন?
উত্তর : সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে।
প্রশ্ন : নিয়মিত অধিবেশন ছাড়া সাধারণ পরিষদ আর কি কি অধিবেশনে মিলিত হয়ে থাকে?
উত্তর : বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনে।
প্রশ্ন : সাধারণ পরিষদের সভাপতি যে পাঁচটি আঞ্চলিক এলাকা থেকে পালাক্রমে নির্বাচিত হন সেগুলো কি কি?
উত্তর : এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, এবং পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ওয়েস্ট মিনস্টার হল, লন্ডন।
প্রশ্ন : সাধারণ পরিষদের নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন কবে শুরু হয়?
উত্তর : সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম সভাপতি কে?
উত্তর : পল হেনরি স্পাক (বেলজিয়াম)।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি কে?
উত্তর : বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (ভারত)।

প্রশ্ন : বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কবে, কোন অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন?
উত্তর : ১৯৫৩ সালে, অষ্টম অধিবেশনের।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম মুসলিম নারী সভাপতি কে?
উত্তর : সায়খা হায়া বিনতে রশিদ আল খলিফা (বাহরাইন)।
প্রশ্ন : সায়খা হায়া বিনতে রশিদ আল খলিফা কবে, কোন অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন?
উত্তর : ২০০৬ সালে, ৬১তম অধিবেশনের।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দায়িত্ব পালনকারী নারী সভাপতি কতজন?
উত্তর : ৩ জন। ভারতের বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (১৯৫৩), লাইবেরিয়ার অ্যাজি বুক (১৯৬৯) ও বাহরাইনের সায়খা হায়া বিনতে রশিদ আল খলিফা (২০০৬)।

নিরাপত্তা পরিষদ

প্রশ্ন : জাতিসংঘের কার্যকরী সভা কোনটি?
উত্তর : নিরাপত্তা পরিষদ।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদের সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১৫টি (স্থায়ী ৫ এবং অস্থায়ী ১০)।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী (P-5) সদস্য কয়টি ও কি কি?
উত্তর : ৫টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন)।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো কি কি?
উত্তর : শাদ, চিলি, জর্ডান, লিথুয়ানিয়া ও নাইজেরিয়া (মেয়াদকাল ২০১৪-২০১৫) এবং ভেনিজুয়েলা, অ্যাঙ্গোলা, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড ও স্পেন (মেয়াদকাল ২০১৫-২০১৬)।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কত সময়ের জন্য নির্বাচিত হন?
উত্তর : এক মাসের জন্য।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কত সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়?
উত্তর : ২ বছরের জন্য।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা পরিষদে সর্বোচ্চবার অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে কোন দেশ?
উত্তর : জাপান ও ব্রাজিল।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে কতটি সদস্য দেশের সম্মতি প্রয়োজন?
উত্তর : ৯টি (৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রসহ অতিরিক্ত ৪টি সদস্য রাষ্ট্রের)।
প্রশ্ন : নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন কতবার জাতিসংঘের সদর দপ্তর ছাড়া অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : দু'বার (১৯৭১ সালে আদ্দিস আবাবায় এবং ১৯৭৩ সালে পানামা সিটিতে)।
প্রশ্ন : কোন দেশটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে নেই?
উত্তর : তাইওয়ান।
প্রশ্ন : Veto কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর : ল্যাটিন।
প্রশ্ন : Veto অর্থ কি?
উত্তর : আমি ইহা মানি না।
প্রশ্ন : ১৯৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ কতটি ছিল?
উত্তর : ১১টি।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের কতটি দেশের Veto Power রয়েছে?
উত্তর : ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশের।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

প্রশ্ন : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন?
উত্তর : ৩ বছরের জন্য।
প্রশ্ন : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশন বছরে কতবার অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : দু'বার। (প্রতিটি অধিবেশন ১ মাস স্থায়ী হয়)
প্রশ্ন : অধিবেশন দুটি কোথায় বসে?
উত্তর : একটি জেনেভায়, অপরটি নিউইয়র্কে।
প্রশ্ন : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য কয়টি?
উত্তর : ৫৪ (১৯৬৫ সালে পূর্বে ১৮ এবং ১৯৭৩ সালের পূর্বে ছিল ২৭)।
প্রশ্ন : প্রতিবছর কতটি রাষ্ট্র তিন বছর মেয়াদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়?
উত্তর : ১৮টি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫টি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন

কমিশন	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	সদস্য সংখ্যা
আফ্রিকা অর্থনৈতিক কমিশন (ECA)	১৯৫৮	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া	৫৪
ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE)	২৮ মার্চ ১৯৪৭	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	৫৬
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারেবীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECLAC)	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮	সানটিয়াগো, চিলি	৪৪ (সহযোগী ৮)
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)	২৮ মার্চ ১৯৪৭	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	৫৩ (সহযোগী ৯)
পশ্চিম এশীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCWA)	৯ আগস্ট ১৯৭৩	বৈরুত, লেবানন	১৭

অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

প্রশ্ন : অছি পরিষদের মূল কাজ কি ছিল?
উত্তর : উপনিবেশের অধীন দেশ বা অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন করে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত করা।
প্রশ্ন : অছি পরিষদ গঠন করা হয় কখন?
উত্তর : ১৯৪৫ সালে।
প্রশ্ন : অছি পরিষদের কর্মকাণ্ডের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে কবে?
উত্তর : ১৯৯৪ সালে।

আন্তর্জাতিক আদালত

প্রশ্ন : জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় অঙ্গসংস্থা কোনটি?
উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (ICJ) বা আন্তর্জাতিক আদালত।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : দি হেগ, নেদারল্যান্ডস।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ (কার্যক্রম শুরু ১৮ এপ্রিল ১৯৪৬)।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকের সংখ্যা কতজন?
উত্তর : ১৫ জন (বিচারকদের মেয়াদকাল ৯ বছর)।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন?
উত্তর : ৩ বছর।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আদালতের প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : পিটার টোমকা, স্লোভাকিয়া (৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২-বর্তমান)।

সচিবালয় ও মহাসচিব

প্রশ্ন : জাতিসংঘ সচিবালয় কাদের নিয়ে গঠিত?
উত্তর : জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও বাইরে কর্মরত আন্তর্জাতিক কর্মচারীদের নিয়ে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রধান কে?
উত্তর : মহাসচিব (সেক্রেটারি জেনারেল)।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ মহাসচিবের মেয়াদকাল কত বছর?
উত্তর : ৫ বছর।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের মহাসচিব কিভাবে নিযুক্ত হন?
উত্তর : নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের কোন মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান?
উত্তর : দ্যাগ হ্যামারশোল্ড।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের কোন মহাসচিব পরবর্তীতে সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন?
উত্তর : কুর্ট ওয়াল্ডহেইম, অস্ট্রিয়া (১৯৮৬ সালে)।
প্রশ্ন : এশিয়া থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন কতজন?
উত্তর : দুই জন। মিয়ানমারের উ থান্ট, দক্ষিণ কোরিয়ার বান কি মুন।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের অষ্টম ও বর্তমান মহাসচিব কে?
উত্তর : বান কি মুন (দক্ষিণ কোরিয়া), ১ জানুয়ারি ২০০৭-বর্তমান।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের কোন মহাসচিব শান্তিতে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার পান?
উত্তর : দ্যাগ হেমারশোল্ড (১৯৬১ সালে)।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের মহাসচিবদের মধ্যে কতজন নোবেল শান্তি পুরস্কার পান?
উত্তর : ২ জন। দ্যাগ হেমারশোল্ড (১৯৬১ সালে) ও কফি আনান (২০০১ সালে)।

জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ

নাম	দেশ	মেয়াদ
১. ট্রাইগভে লাই	নরওয়ে	০২.০২.১৯৪৬-১০.১০.১৯৫২
২. দ্যাগ হ্যামারশোল্ড	সুইডেন	১০.০৪.১৯৫৩-১৮.০৯.১৯৬১
৩. উ থান্ট	মিয়ানমার	৩০.১১.১৯৬১-৩১.১২.১৯৭১
৪. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	০১.০১.১৯৭২-৩১.১২.১৯৮১
৫. জাভিয়ের পেরেজ দা কুয়েলার	পেরু	০১.০১.১৯৮২-৩১.১২.১৯৯১
৬. ড. বুট্রোস বুট্রোস ঘালি	মিশর	০১.০১.১৯৯২-৩১.১২.১৯৯৬
৭. কফি আনান	ঘানা	০১.০১.১৯৯৭-৩১.১২.২০০৬
৮. বান কি মুন	দ. কোরিয়া	০১.০১.২০০৭-বর্তমান

জাতিসংঘের উপমহাসচিব

নাম	দেশ	সময়কাল
১. লুইসি ফ্রেশেট	কানাডা	২ মার্চ ১৯৯৮-৩১ মার্চ ২০০৬
২. মার্ক ম্যালোচ ব্রাউন	ব্রিটেন	১ এপ্রিল-৩১ ডিসেম্বর ২০০৬
৩. মিস আশা রোজি মিগিরো	তাঞ্জানিয়া	৫ জানুয়ারি ২০০৭-৩০ জুন ২০১২
৪. জন ইলিয়াসন	সুইডেন	১ জুলাই ২০১২-বর্তমান

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা

বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী (World Bank Group)

প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ১৯৪৪ সালে।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের স্বপ্নদ্রষ্টা (Founding Fathers) কে?
উত্তর : জন মেনার্ড কেইনস, যুক্তরাজ্য ও হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : বিশ্ব ব্যাংক প্রথম কোন দেশকে ঋণ দেয়?
উত্তর : ফ্রান্স (১৯৪৭ সালে, ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
প্রশ্ন : বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় কোন সম্মেলনের মাধ্যমে?
উত্তর : ১-২২ জুলাই ১৯৪৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ৪৫টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়। এ চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫।
প্রশ্ন : প্রথম কবে, কতটি দেশ ব্রেটন উডস চুক্তি স্বাক্ষর করে?
উত্তর : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫; ২৯টি দেশ।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংক কবে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে?
উত্তর : ২৫ জুন ১৯৪৬ (সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র)।

প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ হয় কোন দেশ থেকে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল কত বছর?
উত্তর : ৫ বছর।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী কত সদস্যবিশিষ্ট?
উত্তর : ২৪ সদস্যবিশিষ্ট।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী দেশ কোনগুলো?
উত্তর : যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি ও ফ্রান্স।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের শীর্ষ অংশীদারী দেশ কোনগুলো?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও ভারত।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গসংস্থা কয়টি ও কি কি?
উত্তর : ৫টি। সেগুলো হলো : IBRD, IDA, IFC, ICSID ও MIGA।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংক ইনস্টিটিউট (WBI) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৫৫ সালে।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংক ইনস্টিটিউট (WBI)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম কি?
উত্তর : ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। ২০০২ সালে WBI নামকরণ করা হয়।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতি বিরোধী ইউনিটের নাম কি?
উত্তর : ইন্টিগ্রিটি ভাইস প্রেসিডেন্সি (প্রতিষ্ঠা ২০০১ সালে)।
প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের বর্তমান ও দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : জিম ইয়ং কিম (১ জুলাই ২০১২-বর্তমান)।

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টবৃন্দ

নাম	সময়কাল
১. ইগুনে মেয়ার	১৮ জুন ১৯৪৬-১৭ মার্চ ১৯৪৭
২. জন জে. ম্যাককোলে	১৭ মার্চ ১৯৪৭-১ জুলাই ১৯৪৯
৩. ইগুনে আর. ব্ল্যাক	১ জুলাই ১৯৪৯-১ জানু. ১৯৬৩
৪. জর্জ ডি. উডস্	১ জানু. ১৯৬৩-১ এপ্রিল ১৯৬৮
৫. রবার্ট ম্যাকনামারা	১ এপ্রিল ১৯৬৮-১ জুলাই ১৯৮১
৬. আলডেন ডব্লিউ ক্লাউসেন	১ জুলাই ১৯৮১-১ জুলাই ১৯৮৬
৭. বারবার কনবেল	১ জুলাই ১৯৮৬-১ সেপ্টে. ১৯৯১
৮. লুইস টি. প্রেসটন	১ সেপ্টে. ১৯৯১-৪ মে ১৯৯৫
৯. জেমস উলফেনসন	৪ মে ১৯৯৫-১ জুন ২০০৫
১০. পল উলফোভিস্স	১ জুন ২০০৫-১ জুলাই ২০০৭
১১. রবার্ট জোয়েলিক	১ জুলাই ২০০৭-৩০ জুন ২০১২
১২. জিম ইয়ং কিম	১ জুলাই ২০১২-বর্তমান

আইবিআরডি (IBRD)

প্রশ্ন : IBRD-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Bank for Reconstruction and Development.
প্রশ্ন : পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD) প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?
উত্তর : ১৯৪৪ সালে (কার্যক্রম শুরু ১৯৪৬ সালে)।
প্রশ্ন : IBRD-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : IBRD কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৫ নভেম্বর ১৯৪৭।
প্রশ্ন : IBRD-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮৮।
প্রশ্ন : IBRD-এর ১৮৮তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ সুদান (১৮ এপ্রিল ২০১২)।

আইডিএ (IDA)

প্রশ্ন : IDA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Development Association.
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA) প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০।
প্রশ্ন : IDA অন্য কি নামে পরিচিত?
উত্তর : Soft Loan Window।
প্রশ্ন : IDA-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : IDA-এর সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৭৩।
প্রশ্ন : IDA-এর ১৭৩তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : রোমানিয়া (১২ এপ্রিল ২০১৪)।

আইএফসি (IFC)

প্রশ্ন : IFC-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Finance Corporation.
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২০ জুলাই ১৯৫৬ ।
প্রশ্ন : IFC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮৪।
প্রশ্ন : IFC-এর ১৮৪তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ সুদান (১৮ এপ্রিল ২০১২)।

আইসিএসআইডি (ICSID)

প্রশ্ন : ICSID-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Center for Settlement of Investment Disputes.
প্রশ্ন : পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID) কবে জন্মলাভ করে?
উত্তর : ১৪ অক্টোবর ১৯৬৬।
প্রশ্ন : ICSID-এর বর্তমান সদস্য দেশ কত?
উত্তর : ১৫০।
প্রশ্ন : ICSID-এর ১৫০তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : কানাডা (১ ডিসেম্বর ২০১৩)।

মিগা (MIGA)

প্রশ্ন : MIGA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Multilateral Investment Guarantee Agency.
প্রশ্ন : বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA) প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১২ এপ্রিল ১৯৮৮।
প্রশ্ন : MIGA-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : MIGA-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : উন্নয়নশীল দেশসমূহকে বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।
প্রশ্ন : MIGA-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮১।
প্রশ্ন : MIGA-এর ১৮১তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : ভুটান (২১ অক্টোবর ২০১৪)।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

প্রশ্ন : IMF-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Monetary Fund.
প্রশ্ন : IMF-এর প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ১৯৪৪ সালে।
প্রশ্ন : IMF প্রতিষ্ঠা করা হয় কোন সম্মেলনের মাধ্যমে?
উত্তর : ১-২২ জুলাই ১৯৪৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ৪৫টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠা হয়। এ চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫।
প্রশ্ন : IMF কার্যক্রম শুরু করে কবে?
উত্তর : ১ মার্চ ১৯৪৭।
প্রশ্ন : IMF কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৫ নভেম্বর ১৯৪৭।
প্রশ্ন : এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : IMF-এর প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে?
উত্তর : ক্যামিল গাট, বেলজিয়াম (৬ মে ১৯৪৬-৫ মে ১৯৫১)।
প্রশ্ন : IMF-এর প্রথম নারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে?
উত্তর : ক্রিস্তিন লাগার্দ (ফ্রান্স)।
প্রশ্ন : IMF-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় কোন সংস্থাভুক্ত দেশ থেকে?
উত্তর : ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
প্রশ্ন : IMF-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য কত?
উত্তর : ২৪ জন।
প্রশ্ন : IMF-এর সাংগঠনিক কাঠামো কি নিয়ে গঠিত?
উত্তর : পরিচালক পর্ষদ, কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী, প্রধান পরিচালক ও সচিবালয় নিয়ে।
প্রশ্ন : আইএমএফ (IMF) কবে ফ্যাসিলিটি (Extended Credit Facility–ECF) কর্মসূচি চালু করে?
উত্তর : ২০০৬ সালে।
প্রশ্ন : IMF কবে দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়তা (PRGF) কর্মসূচি চালু করে?
উত্তর : ১৯৯৯ সালে।
প্রশ্ন : IMF-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮৮।
প্রশ্ন : IMF-এর ১৮৮তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ সুদান (১৮ এপ্রিল ২০১২)।

IMF-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নাম	দেশ	সময়কাল
১. ক্যামিলি গুট	বেলজিয়াম	৬ মে ১৯৪৬-৫ মে ১৯৫১
২. ইভার রুথ	সুইডেন	৩ আগস্ট ১৯৫১-৩ অক্টো. ১৯৫৬
৩. পার জ্যাকব সন	সুইডেন	২১ নভে. ১৯৫৬-৫ মে ১৯৬৩
৪. পিআরএ-পল সুইজার	ফ্রান্স	১ সেপ্টে. ১৯৬৩-৩১ আগস্ট ১৯৭৩
৫. জোয়ানেস ওটিভেন	নেদারল্যান্ডস	১ সেপ্টে. ১৯৭৩-১৬ জুন ১৯৭৮
৬. জেকুয়াস ডি লারোসিয়েরে	ফ্রান্স	১৭ জুন ১৯৭৮-১৫ জানু. ১৯৮৭
৭. মাইকেল ক্যামেডেসাস	ফ্রান্স	১৬ জানু. ১৯৮৭-১৪ ফেব্রু. ২০০০
৮. হর্স্ট কোয়েলার	জার্মানি	১ মে ২০০০-৪ মার্চ ২০০৪
৯. রডরিগো রেটো	স্পেন	৭ জুন ২০০৪-৩১ অক্টো. ২০০৭
১০. ডোমিনিক স্ট্রস-কান	ফ্রান্স	১ নভেম্বর ২০০৭-১৮ মে ২০১১
১১. ক্রিস্টিন লাগার্দ	ফ্রান্স	৫ জুলাই ২০১১-বর্তমান

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

প্রশ্ন : ILO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Labour Organization.
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯ এপ্রিল ১৯১৯।
প্রশ্ন : কোন চুক্তির আওতায় ILO প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ভার্সাই চুক্তি।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা কোনটি?
উত্তর : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)।
প্রশ্ন : ILO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
প্রশ্ন : ILO-এর গভর্নিং বডি কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত?
উত্তর : ৫৬ জন।
প্রশ্ন : ILO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : ILO-এর বর্তমান মহাপরিচালকের নাম কি?
উত্তর : গাই রাইডার, যুক্তরাজ্য (১ অক্টোবর ২০১২-বর্তমান)।
প্রশ্ন : ILO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮৫।
প্রশ্ন : ILO-এর ১৮৫তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : পালাউ (২৯ মে ২০১২)।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

প্রশ্ন : FAO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Food and Agriculture Organization.
প্রশ্ন : FAO কত সালে গঠিত হয়?
উত্তর : ১৬ অক্টোবর ১৯৪৫।
প্রশ্ন : FAO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
প্রশ্ন : FAO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : রোম, ইতালি।
প্রশ্ন : FAO-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাপরিচালক।
প্রশ্ন : FAO-এর বর্তমান মহাপরিচালক কে?
উত্তর : জোসে গ্রাজিয়ানো দ্য সিলভা, ব্রাজিল (১ জানুয়া ২০১২-বর্তমান)।
প্রশ্ন : FAO-এর মহাপরিচালকের মেয়াদকাল কত বছর?
উত্তর : ৪ বছর।
প্রশ্ন : FAO-এর গভর্নিং বডির সদস্য কত?
উত্তর : ৪৯ জন।
প্রশ্ন : FAO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯৫টি (এর মধ্যে ১টি সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ২টি সহযোগী সদস্য)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

প্রশ্ন : WHO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : World Health Organization.
প্রশ্ন : WHO কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৭ এপ্রিল ১৯৪৮।
প্রশ্ন : WHO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১০ জুলাই ১৯৪৮।
প্রশ্ন : WHO কিভাবে পরিচালিত হয়?
উত্তর : ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী বোর্ডের মাধ্যমে।
প্রশ্ন : WHO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্স অন ক্যান্সার (IARC) কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : লিঁও, ফ্রান্স।
প্রশ্ন : WHO-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাপরিচালক।
প্রশ্ন : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বর্তমান ও সপ্তম মহাপরিচালক কে?
উত্তর : মার্গারেট চ্যান, হংকং (৪ জানুয়ারি ২০০৭-বর্তমান)।
প্রশ্ন : WHO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯৪ (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১)।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

প্রশ্ন : UNESCO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
প্রশ্ন : UNESCO প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ (কার্যকর হয় ৪ নভেম্বর ১৯৪৬)।
প্রশ্ন : UNESCO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
প্রশ্ন : UNESCO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : প্যারিস, ফ্রান্স।
প্রশ্ন : UNESCO-এর কার্যনির্বাহী বোর্ড কত সদস্যবিশিষ্ট?
উত্তর : ৫৮ সদস্যবিশিষ্ট (মেয়াদকাল ৪ বছর)।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে কবে?
উত্তর : ২৭ অক্টোবর ১৯৭২।
প্রশ্ন : UNESCO-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাপরিচালক।
প্রশ্ন : UNESCO-এর বর্তমান ও প্রথম নারী মহাপরিচালক কে?
উত্তর : ইরিনা বোকোভা, বুলগেরিয়া (১৫ নভেম্বর ২০০৯-বর্তমান)।
প্রশ্ন : ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার প্রবর্তন করে কবে?
উত্তর : ১৯৫২ সালে।
প্রশ্ন : কলিঙ্গ পুরস্কারের মূল নাম কি?
উত্তর : কলিঙ্গ প্রাইজ ফর দ্য পপুলারাইজেশন অব সায়েন্স।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে একমাত্র কোন ব্যক্তি কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন, ১৯৮৩ সালে।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র UNESCO ত্যাগ করেছিল কবে?
উত্তর : ১৯৮৫ সালে (পুনরায় যোগদান করে ১ অক্টোবর ২০০৩)।
প্রশ্ন : UNESCO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯৫ (এছাড়া ৮টি অ্যাসোসিয়েট সদস্য রয়েছে)।
প্রশ্ন : ইউনেস্কোর ১৯৫তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : ফিলিস্তিন (২৩ নভেম্বর ২০১১)।

ইউনেস্কোর মহাপরিচালকবৃন্দ

নাম	দেশ	সময়কাল
১. জুলিয়ান হুক্সলে	ব্রিটেন	৬ ডিসে. ১৯৪৬-৯ ডিসে. ১৯৪৮
২. জাইমে টোরেস বোডেট	মেক্সিকো	১০ ডিসে. ১৯৪৮-১ ডিসে. ১৯৫২
৩. জন উইলিয়ামস টেইলর (তারপ্রাপ্ত)	যুক্তরাষ্ট্র	২ ডিসে. ১৯৫২-৩ জুলাই ১৯৫৩
৪. লুথার ইভান্স	যুক্তরাষ্ট্র	৪ জুলাই ১৯৫৩-৪ ডিসে. ১৯৫৮
৫. ভিটোরিনো ভেরোনেস	ইতালি	৫ ডিসে. ১৯৫৮-২ নভে. ১৯৬১
৬. রেনে মাহেয়ু	ফ্রান্স	২ নভে. ১৯৬১-১৪ নভে. ১৯৭৪
৭. আমাদু মাথার এম'বো	সেনেগাল	১৫ নভে. ১৯৭৪-১৪ নভে. ১৯৮৭
৮. ফেদেরিকো মেয়র জারাগোজা	স্পেন	১৫ নভে. ১৯৮৭-১৪ নভে. ১৯৯৯
৯. কোইচিরো মাতসুরা	জাপান	১৫ নভে. ১৯৯৯-১৪ নভে. ২০০৯
১০. ইরিনা বোকোভা	বুলগেরিয়া	১৫ নভে. ২০০৯-বর্তমান

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)

প্রশ্ন : ICAO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Civil Aviation Organization.
প্রশ্ন : ICAO কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৪৪ সালে।
প্রশ্ন : ICAO-এর পূর্বনাম কি?
উত্তর : Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO)।
প্রশ্ন : PICAO-এর নাম ICAO করা হয় কবে?
উত্তর : ৪ এপ্রিল ১৯৪৭।
প্রশ্ন : ICAO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৩ মে ১৯৪৭।
প্রশ্ন : ICAO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মন্ট্রিল, কানাডা।
প্রশ্ন : ICAO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯১ (সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান, ১০ নভেম্বর ২০১১)।

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)

প্রশ্ন : UPU-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Universal Postal Union.
প্রশ্ন : UPU কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৯ অক্টোবর ১৮৭৪।
প্রশ্ন : কোন চুক্তির মাধ্যমে UPU প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : বার্ন চুক্তির মাধ্যমে।
প্রশ্ন : UPU কবে কার্যক্রম শুরু করে?
উত্তর : ৫ জুলাই ১৮৭৫।
প্রশ্ন : UPU-এর পূর্ব নাম কি?
উত্তর : General Postal Union (GPU).
প্রশ্ন : GPU-এর নাম UPU করা হয় কবে?
উত্তর : ১ জুন ১৮৭৮।
প্রশ্ন : UPU জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯৪৮।
প্রশ্ন : UPU-এর উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
প্রশ্ন : UPU কিভাবে পরিচালিত হয়?
উত্তর : ৪০ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ দ্বারা।
প্রশ্ন : UPU সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বার্ন, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : UPU-এর বর্তমান মহাপরিচালক কে?
উত্তর : বিশার আবদিরহমান হুসেইন (কেনিয়া)।
প্রশ্ন : UPU-এর সদস্য সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১৯২টি (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান, ৪ অক্টোবর ২০১১)।
প্রশ্ন : UPU-এর সদস্য ১৯২তম সংখ্যা কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ সুদান, ৪ অক্টোবর ২০১১।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)

প্রশ্ন : ITU-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Telecommunication Union.
প্রশ্ন : ITU কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৭ মে ১৮৬৫, প্যারিসে।
প্রশ্ন : ITU-এর পূর্বনাম কি?
উত্তর : International Telegraph Union.
প্রশ্ন : ITU-এর বর্তমান নামকরণ করা হয় কবে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৩৪।
প্রশ্ন : ITU জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা পায় কবে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৪৯।
প্রশ্ন : ITU-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড (পূর্বে ছিল বার্ন, ১৮৬৫-১৯৪৮)।
প্রশ্ন : ITU-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাসচিব।
প্রশ্ন : ITU-এর সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯৩ (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান, ৩ অক্টোবর ২০১১)।
প্রশ্ন : ITU-এর সাংগঠনিক কাঠামো কি?
উত্তর : ITU পরিচালিত হয় ৪৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি Administrative Council কর্তৃক। ITU-এর প্রধান চারটি অঙ্গ হলো : ক. সাধারণ সচিবালয়, খ. আন্তর্জাতিক ফ্রিকোয়েন্সি নিবন্ধীকরণ বোর্ড, গ. আন্তর্জাতিক বেতার উপদেষ্টা কমিটি এবং ঘ. আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটি।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)

প্রশ্ন : WMO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : World Meteorological Organization.
প্রশ্ন : WMO কত সালে আত্মপ্রকাশ লাভ করে?
উত্তর : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।
প্রশ্ন : WMO-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম কি ছিল?
উত্তর : International Meteorological Organization (IMO).
প্রশ্ন : IMO-এর নাম WMO করা হয় কবে?
উত্তর : ২৩ মার্চ ১৯৫০।
প্রশ্ন : WMO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ২০ ডিসেম্বর ১৯৫১।
প্রশ্ন : WMO-এর উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের উন্নতি বিধান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ।
প্রশ্ন : WMO-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাসচিব।
প্রশ্ন : WMO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : WMO-এর বর্তমান সদস্য দেশ কত?
উত্তর : ১৮৫ (এছাড়া ৬টি আঞ্চলিক সদস্য রয়েছে)।
প্রশ্ন : WMO-এর ১৮৫তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ সুদান (১৪ ডিসেম্বর ২০১২)।

জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)

প্রশ্ন : UNIDO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Industrial Development Organisation.
প্রশ্ন : UNIDO কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৭ নভেম্বর ১৯৬৬।
প্রশ্ন : UNIDO-এর পূর্ব নাম কি?
উত্তর : United Nations Industrial Development Program (UNIDP).
প্রশ্ন : UNIDP-এর নাম UNIDO করা হয় কবে?
উত্তর : ২১ জুন ১৯৮৫।
প্রশ্ন : UNIDO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৮৬।
প্রশ্ন : UNIDO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
প্রশ্ন : UNIDO-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাপরিচালক।
প্রশ্ন : UNIDO-এর উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও শিল্পোন্নয়নে জাতিসংঘ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)

প্রশ্ন : IFAD-এ পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Fund for Agricultural Development.
প্রশ্ন : IFAD কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৩০ নভেম্বর ১৯৭৭।
প্রশ্ন : IFAD কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ৬ এপ্রিল ১৯৭৮।
প্রশ্ন : IFAD-এর লক্ষ্য কি?
উত্তর : উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো ও পুষ্টি বিকাশের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করা।
প্রশ্ন : IFAD-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : রোম, ইতালি।
প্রশ্ন : IFAD-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : প্রেসিডেন্ট।
প্রশ্ন : IFAD-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৭৬ (সর্বশেষ পালাউ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO)

প্রশ্ন : IMO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Maritime Organization.
প্রশ্ন : IMO কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৭ মার্চ ১৯৪৮।
প্রশ্ন : IMO এর পূর্ব নাম কি?
উত্তর : Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO).
প্রশ্ন : IMCO-এর নাম IMO করা হয় কবে?
উত্তর : ১৯৮২ সালে।
প্রশ্ন : IMO কবে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৯।
প্রশ্ন : IMO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
প্রশ্ন : IMO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৭১ (এছাড়া ৩টি সহযোগী সদস্য রয়েছে)।
প্রশ্ন : IMO-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাসচিব।
প্রশ্ন : IMO-এর উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিতকরণ এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।
প্রশ্ন : IMO-এর সাংগঠনিক কাঠামো কি?
উত্তর : সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলো অ্যাসেম্বলি, যা প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত। অ্যাসেম্বলি দুই বছরের জন্য ৩২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করে। এছাড়া IMO-এর চারটি প্রধান কমিটি রয়েছে। এগুলো হলো : ক. সামুদ্রিক নিরাপত্তা কমিটি, খ. আইন সংক্রান্ত কমিটি, গ. সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটি এবং ঘ. কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত কমিটি।

বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা (WIPO)

প্রশ্ন : WIPO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : World Intellectual Property Organization.
প্রশ্ন : WIPO কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭০।
প্রশ্ন : WIPO জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় কবে?
উত্তর : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪।
প্রশ্ন : WIPO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮৮ (সর্বশেষ নিউ; ৮ জানুয়ারি ২০১৫)।
প্রশ্ন : WIPO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : WIPO-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাপরিচালক।
প্রশ্ন : WIPO-এর উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : ক. বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল বা বুদ্ধি সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করা ও শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানো।
খ. সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন।
গ. শিল্প ও সাহিত্য কর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটানো।

প্রশ্ন : WIPO বুদ্ধি সম্পদকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছে?
উত্তর : দুটি ভাগে। যথা :
১. শিল্প সম্পদ : শিল্প ডিজাইন, ট্রেড মার্ক ও বিভিন্ন আবিষ্কার।
২. কপিরাইট/স্বত্বাধিকার : সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদির কপিরাইট।
প্রশ্ন : WIPO-এর সাংগঠনিক কাঠামো কি?
উত্তর : সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মেলন হচ্ছে WIPO-এর নীতি নির্ধারণী অঙ্গ। তাছাড়া একটি সাধারণ পরিষদ রয়েছে, যা প্যারিস ও বার্ন ইউনিয়ন সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO)

প্রশ্ন : UNWTO আত্মপ্রকাশ করে কবে?
উত্তর : ১৯২৫ সালে।
প্রশ্ন : WTO-এর সংক্ষিপ্ত রূপ UNWTO করা হয় কবে?
উত্তর : ১ ডিসেম্বর ২০০৫।
প্রশ্ন : UNWTO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : World Tourism Organization.
প্রশ্ন : UNWTO জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে?
উত্তর : ১১ মার্চ ২০০৪।
প্রশ্ন : UNWTO-এর বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি?
উত্তর : ১৫৬টি।
প্রশ্ন : UNWTO-এর সহযোগী সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ৭।
প্রশ্ন : UNWTO সংস্থার প্রধানকে কি বলে?
উত্তর : মহাসচিব।
প্রশ্ন : UNWTO-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : মাদ্রিদ, স্পেন।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ UNWTO-এর সদস্যপদ লাভ করে কবে?
উত্তর : ১৯৭৫ সালে।

জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA)

প্রশ্ন : IAEA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Atomic Energy Agency.
প্রশ্ন : IAEA কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২৯ জুলাই ১৯৫৭।
প্রশ্ন : IAEA জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয় কত সালে?
উত্তর : ১৪ নভেম্বর ১৯৫৭।
প্রশ্ন : IAEA-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
প্রশ্ন : IAEA-এর গঠনতন্ত্র কবে অনুমোদিত হয়?
উত্তর : ২৬ অক্টোবর ১৯৫৬।
প্রশ্ন : IAEA-এর প্রধান কে?
উত্তর : মহাপরিচালক।
প্রশ্ন : IAEA-এর উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : ক. বিশ্বের সকল দেশের আণবিক শক্তিকে শান্তি ও প্রগতির কাজে লাগানো।
খ. এই সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য কোনো সদস্য রাষ্ট্র যেন তার সামরিক খাতে ব্যবহার করতে না পারে এ ব্যাপারে খেয়াল রাখা।
প্রশ্ন : IAEA-এর সাংগঠনিক কাঠামো কি?
উত্তর : সকল সদস্য রাষ্ট্রের সাধারণ সম্মেলন হচ্ছে সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর একবার এর বৈঠক হয়। ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে।
প্রশ্ন : IAEA-এর বোর্ড অব গভর্নর্সের সদস্য কয়টি?
উত্তর : ৩৫।
প্রশ্ন : IAEA-এর মহাপরিচালক কিভাবে নির্বাচিত হন?
উত্তর : বোর্ড অব গভর্নর্সের দু-তৃতীয়াংশ ভোটে।
প্রশ্ন : IAEA-এর মহাপরিচালকের মেয়াদকাল কত?
উত্তর : ৪ বছর।
প্রশ্ন : IAEA-এর পঞ্চম ও বর্তমান মহাপরিচালক কে?
উত্তর : ইউকিয়া আমানো (জাপান)।
প্রশ্ন : IAEA-এর বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি?
উত্তর : ১৬৪।
প্রশ্ন : IAEA-এর ১৬৪তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : জিবুতি (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)।

IAEA-এর মহাপরিচালক

নাম	দেশ	সময়কাল
১. ডব্লিউ. স্টার্লিং কোলে	যুক্তরাষ্ট্র	৭ অক্টোবর ১৯৫৭-৬ অক্টোবর ১৯৬১
২. সিকভার্ড ইকলুন্ড	সুইডেন	৬ অক্টোবর ১৯৬১-৩০ নভেম্বর ১৯৮১
৩. হ্যান্স ব্লিক্স	সুইডেন	১ ডিসেম্বর ১৯৮১-৩০ নভেম্বর ১৯৯৭
৪. মোহাম্মদ এল বারাদি	মিশর	১ ডিসেম্বর ১৯৯৭-৩০ নভেম্বর ২০০৯
৫. ইউকিয়া আমানো	জাপান	১ ডিসেম্বর ২০০৯-বর্তমান

সিটিবিটিও (CTBTO)

প্রশ্ন : CTBTO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization.
প্রশ্ন : CTBTO প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬।
প্রশ্ন : CTBTO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
প্রশ্ন : CTBTO-এর সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮৩।
প্রশ্ন : CTBTO-এর ১৮৩তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : নিউ (৯ এপ্রিল ২০১২)।

রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW)

প্রশ্ন : OPCW-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
প্রশ্ন : OPCW প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯৯৭ সালে (সদর দপ্তর হেগ, নেদারল্যান্ডস)।
প্রশ্ন : OPCW-এর সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৮৯।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)

প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট কোনটি?
উত্তর : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)।
প্রশ্ন : WTO-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : World Trade Organization.
প্রশ্ন : WTO স্থাপিত হয় কবে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৯৫।
প্রশ্ন : WTO-এর পূর্ব নাম কি ছিল?
উত্তর : GATT (প্রতিষ্ঠা ১ জানুয়ারি ১৯৪৮)।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে কবে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৯৫।
প্রশ্ন : WTO-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : WTO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৬০।
প্রশ্ন : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৬০তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : ইয়েমেন (২৬ জুন ২০১৪)।

WTO-এর মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

কততম	সময়কাল	স্থান
প্রথম	৯-১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬	সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর
দ্বিতীয়	১৮-২০ মে ১৯৯৮	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
তৃতীয়	৩০ নভেম্বর-৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯	সিয়াটল, যুক্তরাষ্ট্র
চতুর্থ	৯-১৩ নভেম্বর ২০০১	দোহা, কাতার
পঞ্চম	১০-১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩	কানকুন, মেক্সিকো
ষষ্ঠ	১৩-১৮ ডিসেম্বর ২০০৫	হংকং, চীন
সপ্তম	৩০ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর ২০০৯	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
অষ্টম	১৫-১৭ ডিসেম্বর ২০১১	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
নবম	৩-৬ ডিসেম্বর ২০১৩	বালি, ইন্দোনেশিয়া
দশম	১৫-১৮ ডিসেম্বর ২০১৫	নাইরোবি, কেনিয়া

WTO-এর মহাপরিচালক

নাম	দেশ	সময়কাল
১. পিটার সুদারল্যান্ড	আয়ারল্যান্ড	১ জুলাই ১৯৯৩-১ মে ১৯৯৫
২. রেনেটো রোজারিও	ইতালি	১ মে ১৯৯৫-১ সেপ্টে. ১৯৯৯
৩. মাইক মুর	নিউজিল্যান্ড	১ সেপ্টে. ১৯৯৯-১ সেপ্টে. ২০০২
৪. সুপাচাই পানিচপাকদি	থাইল্যান্ড	১ সেপ্টে. ২০০২-১ সেপ্টে. ২০০৫
৫. প্যাসকল লেমি	ফ্রান্স	১ সেপ্টে. ২০০৫-৩১ আগস্ট ২০১৩
৬. রবার্তো আজেভেদো	ব্রাজিল	১ সেপ্টেম্বর ২০১৩-বর্তমান

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)

প্রশ্ন : UNICEF-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Children's Fund.
প্রশ্ন : এটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
প্রশ্ন : UNICEF কবে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়?
উত্তর : ৬ অক্টোবর, ১৯৫৩। জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির পর 'International' ও 'Emergency' শব্দ দুটি বাদ দেয়া হয়। বর্তমানে এটির পূর্ণ নাম United Nations Children's Fund হলেও সংক্ষিপ্ত নাম UNICEF অপরিবর্তিত থাকে।
প্রশ্ন : UNICEF-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)

প্রশ্ন : UNHCR-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations High Commissioner for Refugees.
প্রশ্ন : UNHCR কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫০।
প্রশ্ন : UNHCR-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : UNHCR-এর প্রধানকে কি বলা হয়?
উত্তর : হাইকমিশনার।

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD)

প্রশ্ন : UNCTAD-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Conference on Trade and Development.
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৬৪ সালে।
প্রশ্ন : UNCTAD-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
প্রশ্ন : UNCTAD-এর প্রধানের পদবি কি?
উত্তর : মহাসচিব।
প্রশ্ন : বর্তমানে UNCTAD-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কত বছর পর পর?
উত্তর : ৪ বছর।
প্রশ্ন : ১৩তম UNCTAD সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২১-২৬ এপ্রিল ২০১২; দোহা, কাতার।
প্রশ্ন : UNCTAD-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৯৪।
প্রশ্ন : UNCTAD-এর ১৯৪তম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ সুদান; ১৪ জুলাই ২০১১।

UNCTAD সম্মেলন

তম	সময়কাল	স্থান
প্রথম	২৩ মার্চ-১৬ জুন ১৯৬৪	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
দ্বিতীয়	১ ফেব্রুয়ারি-২৯ মার্চ ১৯৬৮	নয়াদিল্লি, ভারত
তৃতীয়	১৩ এপ্রিল-২১ মে ১৯৭২	সান্তিয়াগো, চিলি
চতুর্থ	৫-৩১ মে ১৯৭৬	নাইরোবি, কেনিয়া
পঞ্চম	৭ মে-৩ জুন ১৯৭৯	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
ষষ্ঠ	৬-৩০ জুন ১৯৮৩	বেলগ্রেড, সার্বিয়া
সপ্তম	৯ জুলাই-৩ আগস্ট ১৯৮৭	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
অষ্টম	৮-২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২	কার্টেগানা, কলাম্বিয়া
নবম	২৭ এপ্রিল-১১ মে ১৯৯৬	মিডরান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা
দশম	১২-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
একাদশ	১৩-১৮ জুন ২০০৪	সাও পাওলো, ব্রাজিল
দ্বাদশ	২০-২৫ এপ্রিল ২০০৮	আক্রা, ঘানা
ত্রয়োদশ	২১-২৬ এপ্রিল ২০১২	দোহা, কাতার
চতুর্দশ	২০১৬	পেরু

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র (ITC)

প্রশ্ন : ITC-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : International Trade Centre.
প্রশ্ন : ITC-এর প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ১৯৬৪ সালে (সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ড)।

মাদক নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ নিরোধ দপ্তর (UNODC)

প্রশ্ন : UNODC-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Office on Drugs and Crime.
প্রশ্ন : UNODC প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯৯৭ সালে।
প্রশ্ন : UNODC-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

প্রশ্ন : WFP-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : World Food Programme.
প্রশ্ন : বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এর প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ১৯৬১ সালে (জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৬৫ সালে)।
প্রশ্ন : WFP-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : রোম, ইতালি।

মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয়

প্রশ্ন : OHCHR-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Office of the High Commissioner for Human Rights.
প্রশ্ন : OHCHR প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩।
প্রশ্ন : OHCHR-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)

প্রশ্ন : UNDP-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Developement Programme.
প্রশ্ন : UNDP কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৬৫ সালে।
প্রশ্ন : UNDP-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)

প্রশ্ন : UNFPA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Population Fund.
প্রশ্ন : UNFPA কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৬৯ সালে।
প্রশ্ন : UNFPA-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করে জাতিসংঘের কোন সংগঠন?
উত্তর : UNFPA.
প্রশ্ন : UNFPA-এর আগের পূর্ণরূপ কি ছিল?
উত্তর : United Nations Fund for Population Activities. উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে এটি পরিবর্তন করে United Nations Population Fund করা হয়।

জাতিসংঘ ও আন্তঃ আঞ্চলিক অপরাধ ও বিচার গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNICRI)

প্রশ্ন : UNICRI-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.
প্রশ্ন : এটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৮ আগস্ট ১৯৬৭ সালে।
প্রশ্ন : UNICRI-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : তুরিন, ইতালি।

জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক দল (UNV)

প্রশ্ন : UNV-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Volunteers.
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭১ সালে।
প্রশ্ন : UNV-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বন, জার্মানি।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)

প্রশ্ন : UNEP-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Environment Programme.
প্রশ্ন : UNEP কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭২ সালে (সদর দপ্তর নাইরোবি, কেনিয়া)।

ইউএন উইমেন (UN Women)

প্রশ্ন : জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থার নাম কি?
উত্তর : ইউএন উইমেন।
প্রশ্ন : ইউএন উইমেন-এর অফিসিয়াল নাম কি?
উত্তর : United Nations Entiti for Gender Equality and the Empowerment of Women।
প্রশ্ন : ইউএন উইমেন কবে কার্যক্রম শুরু করে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ২০১১ (সদর দপ্তর নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)।
প্রশ্ন : কোন চারটি কর্মসূচিকে ইউএন উইমেন এর আওতায় আনা হয়?
উত্তর : জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল (UNIFEM), নারী অগ্রগতি ডিভিশন (DAW), লিঙ্গবিষয়ক উপদেষ্টার বিশেষ কার্যালয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (INSTRAW)।
প্রশ্ন : ইউএন উইমেন-এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য কত?
উত্তর : ৪১।
প্রশ্ন : ইউএন উইমেন-এর প্রধানের পদমর্যাদা কি?
উত্তর : উপ-মহাসচিব।
প্রশ্ন : ইউএন উইমেন-এর প্রথম প্রধান কে?
উত্তর : মিশেল বাশেলেট, চিলি (১৪ সেপ্টেম্বর ২০১০-১৫ মার্চ ২০১৩)।

নারীর জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (UNIFEM)

প্রশ্ন : UNIFEM-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Development Fund for Women.
প্রশ্ন : UNIFEM প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর : ১৯৭৬ সালে।
প্রশ্ন : UNIFEM-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNITAR)

প্রশ্ন : UNITAR-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Institute for Training and Research.
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৬৫ সালে।
প্রশ্ন : UNITAR-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

জাতিসংঘ সমাজ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNRISD)

প্রশ্ন : UNRISD-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Research Institute for Social Development.
প্রশ্ন : UNRISD-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল

প্রশ্ন : মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা লাভ করে কবে?
উত্তর : ১৫ মার্চ ২০০৬।
প্রশ্ন : মানবাধিকার কাউন্সিলের বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি?
উত্তর : ৪৭।
প্রশ্ন : মানবাধিকার কাউন্সিলের পূর্ব নাম কি?
উত্তর : মানবাধিকার কমিশন।
প্রশ্ন : মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে কবে?
উত্তর : ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৬।
প্রশ্ন : মানবাধিকার কমিশনের সদস্য কত ছিল?
উত্তর : ৫৩।
প্রশ্ন : মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য বিন্যাস কিরূপ ছিল?
উত্তর : এশিয়া ১৩, আফ্রিকা ১৩, পূর্ব ইউরোপ ৬, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ৮, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য ৭টি।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

জাতিসংঘ মানব বসতি কেন্দ্র

প্রশ্ন : UN-HABITAT-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Human Settlement.
প্রশ্ন : জাতিসংঘ মানববসতি কেন্দ্র (UN-HABITAT) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৮ সালে।
প্রশ্ন : UN-HABITAT-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নাইরোবি, কেনিয়া।

UNOCHA

প্রশ্ন : UNOCHA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
প্রশ্ন : UNOCHA কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৯১ সালে।

CEDAW

প্রশ্ন : সিডও (CEDAW) কি?
উত্তর : নারী অধিকারের একটি দলিল।
প্রশ্ন : সিডও সনদ-এর ধারা কয়টি?
উত্তর : ৩০টি।
প্রশ্ন : এ ধারাগুলো কতভাগে বিভক্ত?
উত্তর : ৩টি। প্রথম ভাগ : ধারা ১-১৬-নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ : ধারা ১৭-২২-সিডও কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক। তৃতীয় ভাগ : ধারা ২৩-৩০-সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত।
প্রশ্ন : সিডও কমিটি'র প্রথম অধিবেশন বসে কবে?
উত্তর : ১৮-২২ অক্টোবর ১৯৮২।

প্রশ্ন : CEDAW (সিডও)-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
প্রশ্ন : সিডও সনদ গৃহীত হয় কবে?
উত্তর : ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে; জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক সিডও কমিটির সদস্য কত?
উত্তর : ২৩।
প্রশ্ন : সিডও সনদ কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ সিডও সনদ অনুমোদন করে কত তারিখে?
উত্তর : ৬ নভেম্বর ১৯৮৪।
প্রশ্ন : সিডও দিবস কবে পালিত হয়?
উত্তর : ৩ সেপ্টেম্বর।

CEDAW-তে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

নাম	মেয়াদকাল
১. সালমা খান	১৯৯৩-২০০০ ও ২০০৩-২০০৬
২. ফেরদৌস আরা	২০০৭-২০১০
৩. ইসমাত জাহান	২০১১-২০১৪ ও ২০১৫-২০১৮

সালমা খান ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে CEDAW-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (UNINSTRAW)

প্রশ্ন : UNINSTRAW-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women.
প্রশ্ন : এটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৭৫ সালে।

আইপিসিসি (IPCC)

প্রশ্ন : IPCC-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Intergovernmental Panel on Climate Change.
প্রশ্ন : IPCC প্রতিষ্ঠা লাভ করে কবে?
উত্তর : ১৯৮৮ সালে।
প্রশ্ন : IPCC নোবেল শান্তি পুরস্কার পায় কবে?
উত্তর : ২০০৭ সালে।

ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC)

প্রশ্ন : UNFCCC-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations Framework Convention on Climate Change.
প্রশ্ন : জাতিসংঘ আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (UNFCCC) স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯৯২ সালে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (UNFCCC) কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ২১ মার্চ ১৯৯৪।
প্রশ্ন : UNFCCC-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : বন, জার্মানি
প্রশ্ন : UNFCCC-এর সদস্য কত?
উত্তর : ১৯২ (পর্যবেক্ষক দেশ ৪)।

UNFCCC-এর নির্বাহী সচিব

নাম	সময়কাল
১. মাইকেল জামিট কুটাজার (মাল্টা)	১৯৯১-২০০২
২. জন ওয়েলার হাস্টার (নেদারল্যান্ডস)	১ মে ২০০২-১৪ অক্টোবর ২০০৫
৩. ইভো দা বোয়ের (নেদারল্যান্ডস)	৩০ আগস্ট ২০০৬-১ জুলাই ২০১০
৪. ক্রিস্টিয়ানা ফিগুয়েরেস (কোস্টারিকা)	১ জুলাই ২০১০-বর্তমান

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)

প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কার্যক্রম শুরু হয় কবে?
উত্তর : ৯ নভেম্বর ২০০৬ (সদর দপ্তর দি হেগ, নেদারল্যান্ডস)।
প্রশ্ন : কোন অপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে এ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়?
উত্তর : যুদ্ধাপরাধী।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কোন ধরনের সংস্থা?
উত্তর : স্বাধীন, কিন্তু জাতিসংঘের কোনো অঙ্গসংগঠন নয়।
প্রশ্ন : ICC প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কবে, কোথায় চুক্তি গৃহীত হয়?
উত্তর : ১৭ জুলাই ১৯৯৮; ইতালির রোমে।
প্রশ্ন : আইসিসির যাত্রা শুরু হয় কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ২০০২ (প্রয়োজনীয় ৬০টি দেশের চুক্তিটি অনুমোদনের পর)।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার হয় কোন ধরনের অপরাধের?
উত্তর : ক. গণহত্যা অপরাধ, খ. মানবতাবিরোধী অপরাধ, গ. যুদ্ধাপরাধ ও ঘ. আগ্রাসন অপরাধের।
প্রশ্ন : আদালতের বিচারক সংখ্যা কতজন?
উত্তর : ১৮ জন (৭ জন নারী, ১১ জন পুরুষ)।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : স্যায় হিয়ুন সং (দ কোরিয়া); ১১ মার্চ ২০০৯-বর্তমান)।
প্রশ্ন : আইসিসির বিচারব্যবস্থা কত ভাগে বিভক্ত?
উত্তর : ৩টি (প্রাক-বিচার বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আপিল বিভাগ)।

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU)

প্রশ্ন : UNU-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : United Nations University.
প্রশ্ন : UNU-এর প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ (কার্যক্রম শুরু ১৯৭৬ সালে)।
প্রশ্ন : UNU-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : টোকিও, জাপান।

UNU-এর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা
ইউএনইউ বিশ্ব উন্নয়ন অর্থনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট	হেলসিংকি, ফিনল্যান্ড	১৯৮৫
নব প্রযুক্তির জন্য ইউএনইউ ইনস্টিটিউট	ম্যাসট্রিক্ট, নেদারল্যান্ডস	১৯৯০
আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক ইউএনইউ ইনস্টিটিউট	আক্রা, ঘানা	১৯৯০
সফ্টওয়্যার প্রযুক্তির ইউএনইউ ইনস্টিটিউট	ম্যাকাও, চীন	১৯৯২
উচ্চতর শিক্ষার ইউএনইউ ইনস্টিটিউট	টোকিও, জাপান	১৯৯৫
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ইউএনইউ জৈবপ্রযুক্তি কর্মসূচি	কারাকাস, ভেনিজুয়েলা	১৯৮৮
ইউএনইউ আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব একাডেমি	আম্মান, জর্ডান	১৯৯৫
পানি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ইউএনইউ আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক	হ্যামিলটন, অনটারিও, কানাডা	১৯৯৬
মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ইউএনইউ খাদ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি	ইথাকা, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	১৯৭৫
ইউএনইউ ভূ-তাপমাত্রা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	রিকজাভিক, আইসল্যান্ড	১৯৭৯
ইউএনইউ মৎস্য সম্পদ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	রিকজাভিক, আইসল্যান্ড	১৯৯৮
সংঘর্ষ নিরোধ ও জাতিসঙ্গগত উদ্যোগ	আলস্টার, উত্তর আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য	১৯৯৩
ইউএনইউ শাসন কর্মসূচি	বার্সেলোনা, স্পেন	১৯৯২

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী

প্রশ্ন : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয় কবে?
উত্তর : ১৯৪৮ সালে।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বাধিক ব্যয় বহনকারী দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র; মোট ব্যয়ের ২৬ শতাংশ।

প্রশ্ন : শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ (DPKO) কবে সৃষ্টি করা হয়?
উত্তর : ১৯৯২ সালে।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী কবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে?
উত্তর : ১৯৮৮ সালে।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম কবে, কোথায় নারী শান্তিরক্ষী নিযুক্ত হয়?
উত্তর : ২০০৭ সালে, লাইবেরিয়ায়।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস কবে?
উত্তর : ২৯ মে।

প্রশ্ন : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিহতদের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের দেয়া পদকের নাম কি?
উত্তর : 'দ্যাগ হ্যামারশেল্ড মেডেল', যা কার্যকর হয় ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ব বিদ্যালয় (University for Peace) প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ডিসেম্বর ১৯৮০ (সদর দপ্তর কোস্টারিকা)।

প্রশ্ন : জাতিসংঘের মোট শান্তিরক্ষা মিশন (১৯৪৮-বর্তমান) কতটি?
উত্তর : ৬৯টি।

প্রশ্ন : বর্তমানে জাতিসংঘের কতটি শান্তি রক্ষা মিশন চলছে?
উত্তর : ১৬টি। এছাড়া আফগানিস্তানে বিশেষ রাজনৈতিক মিশন চলছে, যার নাম United Nations Assistance Mission in Afghanistan—UNAMA।

জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী মোতায়েনের সময়কাল

মিশনের কোড	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের পূর্ণনাম	মেয়াদ	স্থান
UNTSO	United Nations Truce Supervision Organization	১৯৪৮-বর্তমান	ফিলিস্তিন
UNMOGIP	United Nations Military Observer Group in India and Pakistan	১৯৪৯-বর্তমান	ভারত-পাকিস্তান
UNEF I	First United Nations Emergency Force	১৯৫৬-১৯৬৭	ফিলিস্তিন
UNOGIL	United Nations Observation Group in Lebanon	১৯৫৮-১৯৫৮	লেবানন
ONUC	United Nations Operation in the Congo	১৯৬০-১৯৬৪	কঙ্গো
UNSF	United Nations Security Force in West New Guinea	১৯৬২-১৯৬৩	গিনি
UNYOM	United Nations Yemen Observation Mission	১৯৬৩-১৯৬৪	ইয়েমেন
UNFICYP	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus	১৯৬৪-বর্তমান	সাইপ্রাস
DOMREP	Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic	১৯৬৫-১৯৬৬	ডোমিনিকান রিপাবলিক
UNIPOM	United Nations India-Pakistan Observation Mission	১৯৬৫-১৯৬৬	ভারত-পাকিস্তান

মিশনের কোড	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের পূর্ণনাম	মেয়াদ	স্থান
UNEF II	Second United Nations Emergency Force	১৯৭৩-১৯৭৯	মিশর
UNDOF	United Nations Disengagement Observer Force	১৯৭৪-বর্তমান	গোলান, সিরিয়া
UNIFIL	United Nations Interim Force in Lebanon	১৯৭৮-বর্তমান	লেবানন
UNGOMAP	United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan	১৯৮৮-১৯৯০	আফগানিস্তান ও পাকিস্তান
UNIIMOG	United Nations Iran-Iraq Military Observer Group	১৯৮৮-১৯৯১	ইরান ও ইরাক
UNAVEM I	United Nations Angola Verification Mission I	১৯৮৯-১৯৯১	অ্যাঙ্গোলা
UNTAG	United Nations Transition Assistance Group	১৯৮৯-১৯৯০	নামিবিয়া ও অ্যাঙ্গোলা
ONUCA	United Nations Observer Group in Central America	১৯৮৯-১৯৯২	মধ্য আমেরিকা
UNIKOM	United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission	১৯৯১-২০০৩	ইরাক ও কুয়েত
MINURSO	United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara	১৯৯১-বর্তমান	পশ্চিম সাহারা
UNAVEM II	United Nations Angola Verification Mission II	১৯৯১-১৯৯৫	অ্যাঙ্গোলা
ONUSAL	United Nations Observer Mission in El Salvador	১৯৯১-১৯৯৫	এল-সালভেদর
UNAMIC	United Nations Advance Mission in Cambodia	১৯৯১-১৯৯২	কম্বোডিয়া
UNPROFOR	United Nations Protection Force	১৯৯২-১৯৯৫	সাবেক যুগোস্লাভিয়া
UNTAC	United Nations Transitional Authority in Cambodia	১৯৯২-১৯৯৩	কম্বোডিয়া
UNOSOM I	United Nations Operation in Somalia I	১৯৯২-১৯৯৩	সোমালিয়া
ONUMOZ	United Nations Operation in Mozambique	১৯৯২-১৯৯৪	মোজাম্বিক
UNOSOM II	United Nations Operation in Somalia II	১৯৯৩-১৯৯৫	সোমালিয়া
UNOMUR	United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda	১৯৯৩-১৯৯৪	উগান্ডা-রুয়ান্ডা
UNOMIG	United Nations Observer Mission in Georgia	১৯৯৩-২০০৯	জর্জিয়া
UNOMIL	United Nations Observer Mission in Liberia	১৯৯৩-১৯৯৭	লাইবেরিয়া
UNMIH	United Nations Mission in Haiti	১৯৯৩-১৯৯৬	হাইতি
UNAMIR	United Nations Assistance Mission for Rwanda	১৯৯৩-১৯৯৬	রুয়ান্ডা
UNASOG	United Nations Aouzou Strip Observer Group	১৯৯৪-১৯৯৪	শাদ ও লিবিয়া
UNMOT	United Nations Mission of Observers in Tajikistan	১৯৯৪-২০০০	তাজিকিস্তান
UNAVEM III	United Nations Angola Verification Mission III	১৯৯৫-১৯৯৭	অ্যাঙ্গোলা
UNCRO	United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia	১৯৯৫-১৯৯৬	ক্রোয়েশিয়া
UNPREDEP	United Nations Preventive Deployment Force	১৯৯৫-১৯৯৯	মেসিডোনিয়া
UNMIBH	United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina	১৯৯৫-২০০২	বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
UNTAES	United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium	১৯৯৬-১৯৯৮	ক্রোয়েশিয়া
UNMOP	United Nations Mission of Observers in Prevlaka	১৯৯৬-২০০২	ক্রোয়েশিয়া ও যুগোস্লাভিয়া
UNSMIH	United Nations Support Mission in Haiti	১৯৯৬-১৯৯৭	হাইতি
MINUGUA	United Nations Verification Mission in Guatemala	১৯৯৭-১৯৯৭	গুয়াতেমালা
MONUA	United Nations Observer Mission in Angola	১৯৯৭-১৯৯৯	অ্যাঙ্গোলা
UNTMIH	United Nations Transition Mission in Haiti	১৯৯৭-১৯৯৭	হাইতি
MIPONUH	United Nations Civilian Police Mission in Haiti	১৯৯৭-২০০০	হাইতি
UNPSG	UN Civilian Police Support Group	১৯৯৮-১৯৯৮	ক্রোয়েশিয়া
MINURCA	United Nations Mission in the Central African Republic	১৯৯৮-২০০০	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
UNOMSIL	United Nations Observer Mission in Sierra Leone	১৯৯৮-১৯৯৯	সিয়েরা লিওন
UNMIK	United Nations Interim Administration Mission in Kosovo	১৯৯৯-বর্তমান	কসোভো
UNAMSIL	United Nations Mission in Sierra Leone	১৯৯৯-২০০৫	সিয়েরা লিওন

মিশনের কোড	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের পূর্ণনাম	মেয়াদ	স্থান
UNTAET	United Nations Transitional Administration in East Timor	১৯৯৯-২০০২	পূর্ব তিমুর
MONUSCO	UN Organization Stabilization Mission of the Democratic Republic of the Congo	১৯৯৯-বর্তমান	কঙ্গো
UNMEE	United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea	২০০০-২০০৮	ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া
UNMISET	United Nations Mission of Support in East Timor	২০০২-২০০৫	পূর্ব তিমুর
UNMIL	United Nations Mission in Liberia	২০০৩-বর্তমান	লাইবেরিয়া
UNOCI	United Nations Operation in Côte d'Ivoire	২০০৪-বর্তমান	আইভোরি কোস্ট
MINUSTAH	United Nations Stabilization Mission in Haiti	২০০৪-বর্তমান	হাইতি
ONUB	United Nations Operation in Burundi	২০০৪-২০০৬	বুরুন্ডি
UNMIS	United Nations Mission in the Sudan	২০০৫-বর্তমান	সুদান
UNMIT	United Nations Integrated Mission in Timor-Leste	২০০৬-২০১২	পূর্ব তিমুর
UNAMID	African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur	২০০৭-বর্তমান	সুদান
MINURCAT	United Nations Mission in the Central African Republic and Chad	২০০৭-২০১১	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও চাদ
MOUCSCO	United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo	২০১০-বর্তমান	ডিআর কঙ্গো
UNISFA	United Nations Organization Interrim Security Force for Abyei	২০১১-বর্তমান	সুদান
UNMISS	United Nations Mission in the Republic of South Sudan	২০১১-বর্তমান	সুদান
UNSMIS	United Nations Supervision Mission in Syria	২০১২	সিরিয়া
MINUSMA	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali	২০১৩-বর্তমান	মালি
MINUSCA	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic	২০১৪	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র

টীকা

♦ জাতিসংঘ

জাতিসংঘ হলো বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের সর্ববৃহৎ বিশ্ব সংগঠন। বিশ্ব শান্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৫১টি এবং বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর ১৯১৯ সালে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে লীগ অব নেশনস গঠিত হয়েছিল, তার ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 'আটলান্টিক সনদ' নামে একটি পরিকল্পনার অবতারণা করেন। এই ঐতিহাসিক উদ্যোগই ছিল জাতিসংঘ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট জাতিসংঘ নামটি প্রস্তাব করেন।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো– ক. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা; খ. জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা; গ. আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধান এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সাহায্য করা; ঘ. উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট জাতিসমূহের প্রচেষ্টা সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দুরূপে কাজ করা।

হালকা নীল পটভূমিতে মাঝখানে জাতিসংঘের সাদা প্রতীক। প্রতীকটিতে জলপাই শাখা জড়ানো একটি বিশ্ব মানচিত্র, যা বিশ্ব শান্তির নিদর্শন। প্রতীকটি পতাকার প্রস্থের অর্ধেক এবং একেবারে কেন্দ্রে। ১৯৪৭ সালের ২০ অক্টোবর সাধারণ পরিষদে পতাকাটির নকশা অনুমোদিত হয়। সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সরকারি ভাষা হলো চাইনিজ, ইংরেজি, ফরাসি, রাশিয়ান এবং স্পেনীয়। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে আরবিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হয় ইংরেজি ও ফরাসি। জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য দেশ পাঁচটি। সেগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। এ পাঁচটি দেশের রয়েছে ভেটো ক্ষমতা। জাতিসংঘের সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সহায়তায় মহাসচিবের নেতৃত্বে জাতিসংঘের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

♦ সাধারণ পরিষদ (General Assembly)

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র এতে অনধিক পাঁচজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে। তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোট থাকে। সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের এবং অন্যান্য বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনের দরকার হয়। বছরে অন্তত একবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে হয়। অবশ্য জরুরি অবস্থায় ও প্রয়োজনে একাধিক অধিবেশনে বসতে পারে। এ পরিষদের কোনো প্রস্তাব কার্যকরী করার ক্ষমতা নেই। অতি জরুরি বিষয়গুলো নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ করা হয়। এ পরিষদ বিভিন্ন সমস্যা ও বিশেষত আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করে। এ পরিষদ জাতিসংঘ সনদে অন্তর্ভুক্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে শুধু আলোচনা করতে পারে। এ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের দশজন অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫৪ জন সদস্য, আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক এবং অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ নতুন সদস্য এবং মহাসচিব নিয়োগ করে থাকে। এ পরিষদ জাতিসংঘের আয় ব্যয়ের ওপর কর্তৃত্ব এবং সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার হার নির্ধারণ করে দেয়। বিভিন্ন শাখার কার্যবিবরণী এ পরিষদ গ্রহণ ও বিবেচনা করে।

♦ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ *[৩১তম বিসিএস]*

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫ এবং প্রত্যেকে একটি করে ভোটের অধিকারী। পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য। দেশগুলো হলো চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। স্থায়ী সদস্যদের 'ভেটো' (আমি মানি না) দেয়ার অধিকার রয়েছে। অস্থায়ী দশ সদস্য দুবছরের জন্য সাধারণ সভার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে নির্বাচিত হন। এশিয়া থেকে ২টি, আফ্রিকা থেকে ৩টি, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ২টি, পূর্ব ইউরোপ থেকে ১টি, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ২টি করে মোট ১০টি দেশ অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের মেয়াদ শেষ হলে তখনই কোনো সদস্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারে না। সদস্য না হলেও একটি দেশ আলোচনায় উপস্থিত থাকতে পারে, বিশেষত যদি বিষয়টি তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়। ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী প্রতিটি সদস্যদেশ এক মাসের জন্য পরিষদের সভাপতি হয়। সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হচ্ছে– জাতিসংঘের নীতিমালা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমন সকল বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা, এসব বিবাদ মেটানোর পদ্ধতি অথবা মীমাংসার শর্তাবলী সুপারিশ করা, সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তৈরি করা, শান্তির প্রতি হুমকির বাস্তবতা বা আগ্রাসনের ঘটনা চিহ্নিত করা এবং এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা সুপারিশ করা, আগ্রাসন বন্ধ বা প্রতিরোধ করতে শক্তি প্রয়োগ না করে অর্থনৈতিক অবরোধ বা আর কী পদক্ষেপ প্রয়োজন সে ব্যাপারে সদস্যদের আহ্বান জানানো, কোনো আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেয়া, নতুন কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা, রণকৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে অছির দায়িত্ব পালন করা, জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগের জন্য সাধারণ পরিষদে সুপারিশ করা এবং সাধারণ পরিষদের সাথে একযোগে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নির্বাচন করা।

♦ অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

যেসব অঞ্চলের মানুষ এখনো পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি এবং যারা ব্যক্তিগত অছির নিয়ন্ত্রণাধীন তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য সনদে আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ অঞ্চলগুলোকে অছি

অঞ্চল বলা হতো। এ পরিষদের কাজ হচ্ছে অছি বা ট্রাস্টভুক্ত অঞ্চলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা। ১৯৯৪ সাল নাগাদ অঞ্চলগুলো পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে বা প্রতিবেশী দেশের সাথে যুক্ত হয়ে হয় নিজস্ব সরকার গঠন করেছে অথবা স্বাধীনতা লাভ করেছে। ফলে অছি পরিষদের কর্মকাণ্ডের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্য নিয়ে গঠিত অছি পরিষদ এর বিধান সংশোধন করেছে, যার ফলে এটি প্রয়োজনে যে কোনো স্থানে অধিবেশনে মিলিত হতে পারে।

♦ সচিবালয় (Secretariat)

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও বাইরে কর্মরত আন্তর্জাতিক কর্মচারীদলকে নিয়ে সচিবালয় গঠিত। সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু জাতিসংঘ সচিবালয় সনদের ৯৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত। সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধান জাতিসংঘের মহাসচিব। তিনি হলেন জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হন। মহাসচিবকে তার কার্যে সহায়তা করে ১২ জন অধস্তন সচিব (Under Secretary) এবং ১২ জনেরও অধিক সহকারী সচিব (Assistant Secretary)। সম্প্রতি একটি উপ মহাসচিব পদও তৈরি করা হয়েছে। মেয়াদ শেষে একজন মহাসচিব পুনরায় পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন। বর্তমানে জাতিসংঘ সচিবালয়ে প্রায় ২৯ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত। এর মধ্যে ৭ হাজার নিউইয়র্কস্থ সদর দপ্তর এবং অন্যরা কাজ করছেন বিশ্বব্যাপী ছড়ানো শাখা-অফিস, তথ্যকেন্দ্র ও মিশনগুলোতে।

জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ

নাম	দেশ	মেয়াদ
১. ট্রাইগভে লাই	নরওয়ে	০২.০২.১৯৪৬ -১০.১০.১৯৫২
২. দ্যাগ হ্যামারশোল্ড	সুইডেন	১০.০৪.১৯৫৩ -১৮.০৯.১৯৬১
৩. উ থান্ট	মায়ানমার	৩০.১১.১৯৬১ -৩১.১২.১৯৭১
৪. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	০১.০১.১৯৭২ -৩১.১২.১৯৮১
৫. হাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	০১.০১.১৯৮২ -৩১.১২.১৯৯১
৬. ড. বুট্রোস বুট্রোস ঘালি	মিশর	০১.০১.১৯৯২ -৩১.১২.১৯৯৬
৭. কফি আনান	ঘানা	০১.০১.১৯৯৭ -৩১.১২.২০০৬
৮. বান কি মুন	দ. কোরিয়া	০১.০১.২০০৭- বর্তমান

উল্লেখ্য : ট্রাইগভে লাই জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব হলেও তার পূর্বে যুক্তরাজ্যের স্যার গ্লাডউইন জেব ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে ১৯৪৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

♦ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ *[৩৩তম বিসিএস]*

'জাতিসংঘ পরিবার' নামে পরিচিত বিশেষ বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের জন্যে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী মূল অঙ্গসংস্থা হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council– ECOSOC) গঠিত হয়। প্রথমে এ পরিষদের সদস্য ১৮ থাকলেও ১৯৬৫ সালে ২৭ এবং ১৯৭৩ সালে ২৭ থেকে ৫৪ করা হয়। পরিষদের সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে; প্রতিটি সদস্যের রয়েছে একটি করে ভোট এবং একজন প্রতিনিধি। প্রতিবছর ১৮টি সদস্য পদ শূন্য হলে সেই আসনগুলোতে নির্বাচন হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও নীতি-নির্ধারণী প্রস্তাবাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ উন্নয়নের জন্যে সহযোগিতা ও কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণত সংস্থার কাজ নিয়ে আলোচনার জন্যে বছরে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে মিলিত হয়। প্রতিবছর একমাস স্থায়ী দুটি অধিবেশনে মিলিত হয় একবার নিউইয়র্কে, আরেকবার জেনেভায়। অধিবেশনে মন্ত্রীসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা যোগ দেয় যাতে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। পরিষদের গোটা বছরের কাজকর্ম পরিচালিত হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে। ১৯৪৬ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ECOSOC-এর প্রথম সভাপতি ভারতের রাম সোয়ামি মুদালিয়ার। সভাপতির মেয়াদকাল ১ বছর। অঞ্চলভিত্তিক সদস্য দেশ– আফ্রিকা ১৪, এশিয়া ১১, পূর্ব ইউরোপ ৬, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ১০, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য ১৩টি।

♦ আন্তর্জাতিক বিচার আদালত *[৩১তম; ২৪তম বিসিএস]*

জাতিসংঘ সনদের অবিচ্ছেদ্য অংশ এক আন্তর্জাতিক চুক্তি 'স্ট্যাটিউট অফ দি কোর্ট'-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। জাতিসংঘের সদস্য মাত্রই স্ট্যাটিউট অফ দি কোর্টের শরীক। আদালতের দপ্তর নেদারল্যান্ডের দি হেগ-এ অবস্থিত। তবে প্রয়োজন মনে করলে আদালত অন্যত্রও বসতে পারে। আদালতের খরচ বহন করে জাতিসংঘ। International Court of Justice হলো জাতিসংঘের প্রধান বিচার প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র আবশ্যকীয়ভাবেই এর আওতাধীন এবং এর বিচারের রায় মানতে বাধ্য। নেদারল্যান্ডের হেগে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। সর্বমোট ১৫ জন বিচারপতির সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। কোনো বিচারক এক মেয়াদের বেশি নির্বাচিত হতে পারেন, তবে একই সাথে এক দেশ থেকে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। আদালতে বিচারপতিগণের কার্যকাল নয় বছর। দায়িত্ব পালনকালে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণ কূটনৈতিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ আদালতের একজন সভাপতি থাকেন যিনি তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে এবং তারা নিজেদের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট যে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ পেশ করতে পারে। আদালত তখন এ সংক্রান্ত আইনগত দিক বিবেচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। তবে কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালত হস্তক্ষেপ করে না। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে আন্তর্জাতিক আদালত আইনগত উপদেশমূলক মতামত প্রদান করতে পারে। তবে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে অনায়াসেই এ আদালতের ব্যর্থতা ফুটে ওঠে।

♦ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা International Labour Organization (ILO)-প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে। তখন এটি লীগ অব নেশনস-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ভার্সাই চুক্তির আওতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর এটি জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ক. শ্রমের অবস্থার উন্নয়ন সাধন, খ. শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, গ.

সরকার মালিক শ্রমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, ঘ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। আইএলও'র প্রধানের পদবি ডাইরেক্টর জেনারেল। ২৮ জন সরকারি প্রতিনিধি, ১৪ জন শ্রমিক ও ১৪ জন বিনিয়োগ প্রতিনিধি অর্থাৎ ৫৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে এর গভর্নিং বডি গঠিত। বর্তমানে ১৮৫টি দেশ এর সদস্য।

♦ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) Food and Agricultural Organization-গঠিত হয় ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৫। এর সদর দপ্তর অবস্থিত ইতালির রোমে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৫। গভর্নিং বডির সদস্য ৪৯ জন। প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। তার মেয়াদকাল ৬ বছর। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ক. বিশ্বের খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করা, খ. উন্নত জাতের বীজ সরবরাহকরণ, গ. খাদ্য ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ঘ. পোকার আক্রমণ থেকে শস্যকে রক্ষা করা, ঙ. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

♦ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম WHO। এর পূর্ণরূপ World Health Organization। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে সকল মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা। WHO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৪। ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী বোর্ডের মাধ্যমে এ সংস্থাটি পরিচালিত হয়। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। WHO-এর প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। বর্তমান ও সপ্তম মহাপরিচালক হংকংয়ের মার্গারেট চ্যান।

♦ জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, যাকে সংক্ষেপে ইউনেস্কো বলা হয়। UNESCO-এর পূর্ণরূপ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৬। সদর দপ্তর প্যারিস, ফ্রান্স। কার্যনির্বাহী বোর্ড ৫৮ সদস্যবিশিষ্ট। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৫ এবং অ্যাসোসিয়েট সদস্য ৮টি। প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ক. শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, খ. নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

♦ বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)

UPU-এর পূর্ণরূপ Universal Postal Union। ১৮৭৪ সালের ৯ অক্টোবর বার্ন চুক্তির মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কার্যক্রম শুরু হয় ৫ জুলাই, ১৮৭৫। এটি জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। সংস্থাটি পরিচালিত হয় ৪০ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ দ্বারা। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের বার্নে অবস্থিত। এর সদস্য সংখ্যা ১৯২। UPU-এর প্রধানের পদবি ডিরেক্টর জেনারেল। সংস্থাটির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলো বিশ্ব ডাক কংগ্রেস। এ কংগ্রেস প্রতি পাঁচ বছরে একবার বৈঠকে মিলিত হয়। কংগ্রেস কর্তৃক UPU-এর নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হয়। এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪০। নির্বাহী পরিষদ বছরে একবার বৈঠকে মিলিত হয়। এছাড়া কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে।

♦ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)

ITU-এর পূর্ণরূপ International Telecommunication Union। ১৮৬৫ সালে প্যারিসে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৬ মে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। প্রধানের পদবি মহাসচিব। সদস্য সংখ্যা ১৯৩। ITU পরিচালিত হয় ৪৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি Administrative Council দ্বারা। এর প্রধান চারটি অঙ্গ হলো : ক. সাধারণ সচিবালয়, খ. আন্তর্জাতিক ফ্রিকোয়েন্সি নিবন্ধীকরণ বোর্ড, গ. আন্তর্জাতিক বেতার উপদেষ্টা কমিটি এবং ঘ. আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটি। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্বে টেলিফোন, রেডিও ও টেলিগ্রাফ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস করা ও নির্বিঘ্নতা নিশ্চিতকরণ।

♦ জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)

UNIDO-এর পূর্ণরূপ United Nations Industrial Development Organisation। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি। সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। সংস্থার প্রধানের পদবি মহাপরিচালক। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও শিল্পোন্নয়নে জাতিসংঘ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। UNIDO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৭২।

♦ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)

WMO-এর পূর্ণরূপ World Meteorological Organiaztion। এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৭৩ সালে এবং জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৫১ সালে। WMO-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের উন্নতি বিধান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৫। প্রধানের পদবি মহাসচিব। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এছাড়া ৬টি আঞ্চলিক সংগঠন আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর ও কেন্দ্রীয় আমেরিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ অঙ্গ হলো বিশ্ব আবহাওয়া কংগ্রেস। সাধারণত সকল সদস্য রাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগের প্রধানগণের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। প্রতি চার বছরে একবার এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬ জন পরিচালক সমন্বয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিষদ গঠিত। এই পরিষদ বিশ্ব আবহাওয়া কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন তদারক করার লক্ষ্যে বছরে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হয়। এছাড়া এর ৮টি কারিগরি কমিশন রয়েছে।

♦ বিশ্ব বুদ্ধি সম্পদ সংস্থা (WIPO)

WIPO-এর পূর্ণরূপ World Intellectual Property Organization। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। এ সংস্থাটি জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে ১৯৭৪ সালের ১৩ মার্চ। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। প্রধানের পদবি মহাপরিচালক। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ক. বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল বা বুদ্ধি সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করা ও শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানো। খ. সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন। গ. শিল্প ও সাহিত্য কর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটানো। WIPO বুদ্ধি সম্পদকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে ১. শিল্প সম্পদ : শিল্প ডিজাইন, ট্রেড মার্ক ও বিভিন্ন আবিষ্কার। ২. কপিরাইট/স্বত্বাধিকার : সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদির কপিরাইট। সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মেলন হচ্ছে WIPO-এর নীতি নির্ধারণী অঙ্গ। তাছাড়া একটি সাধারণ পরিষদ রয়েছে, যা প্যারিস ও বার্ন ইউনিয়ন সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

♦ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)

IFAD-এর পূর্ণরূপ International Fund for Agricultural Development। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ নভেম্বর। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো ও পুষ্টি বিকাশের জন্য সম্পদ সংগ্রহ। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৭৬। সদর দপ্তর ইতালির রোমে। প্রধানের পদবি প্রেসিডেন্ট। একটি পরিচালনা পরিষদ এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এ পরিষদ গঠিত হয়। আর্থিক অবস্থার ওপর IFAD-এর সদস্যসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ক. উন্নত দেশ, খ. তেল রপ্তানিকারক উন্নয়নশীল দেশ, গ. উন্নয়নশীল দেশ। এ তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে ৬ জন করে মোট ১৮ জন নির্বাহী পরিচালক এবং ১৮ জন বিকল্প পরিচালক নিয়ে মোট ৩৬ জনের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

♦ আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO)

IMO-এর পূর্ণরূপ International Maritime Organization. এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭ মার্চ ১৯৪৮। সদর দপ্তর যুক্তরাজ্যের লন্ডন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৭১ ও তিনটি সহযোগী সদস্য। প্রধানের পদবি মহাসচিব। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিতকরণ এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলো অ্যাসেম্বলি, যা প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত। অ্যাসেম্বলি দুই বছরের জন্য ৩২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করে। এছাড়া IMO-এর চারটি প্রধান কমিটি রয়েছে। এগুলো হলো ক. সামুদ্রিক নিরাপত্তা কমিটি, খ. আইন সংক্রান্ত কমিটি, গ. সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটি এবং ঘ. কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত কমিটি।

♦ জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)

UNICE-এর পূর্ণরূপ United Nations International Childrens Emergency Fund। প্রতিষ্ঠিত হয় ১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। এটি জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয় ৬ অক্টোবর, ১৯৫৩। জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির পর 'আন্তর্জাতিক' ও 'জরুরি' শব্দ দুটি বাদ দেয়া হয়। বর্তমানে এটির পূর্ণ নাম United Nations Children Fund হলেও সংক্ষিপ্ত নাম UNICEF অপরিবর্তিত থাকে। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের স্থায়ীভাবে শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও তাদের কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা প্রদান এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

♦ জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)

UNHCR-এর পূর্ণরূপ United Nations High Commissioner for Refugees। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫০। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এ সংস্থার প্রধানকে বলা হয় হাইকমিশনার।

♦ জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU)

UNU-এর পূর্ণরূপ United Nations University। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে এবং কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭৬ সালে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কর্মসূচি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি জাপানের টোকিওতে অবস্থিত। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে এবং বছরে একবার এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

♦ UNFPA

UNFPA-এর পূর্ণরূপ ছিল United Nations Fund for Population Activities। ১৯৮৭ সালে এর নামকরণ করা হয় United Nations Population Fund। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

♦ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে। আর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগ হচ্ছে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের শাখা। এ বিভাগের ওপর শান্তিরক্ষা কার্যক্রম তদারকি করা, দিক নির্দেশনা দেয়া, সুপারিশ করা, পরিকল্পনা করাসহ নানাবিধ দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এ বিভাগটি জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এর সাংগঠনিক কাঠামো Office of Operations এবং Office of Mission Support এ দু ভাগে বিভক্ত। Office of Mission Support এর অন্তর্ভুক্ত প্রশাসনিক বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ, লোকবল বিভাগ প্রভৃতি। বিভাগীয় প্রধান মহাসচিবের পক্ষে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করেন; কার্যক্রমের নীতিমালা ও নির্দেশনা তৈরি করে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মহাসচিবকে পরামর্শ দেন।

♦ এসকাপ (ESCAP)

এসকাপ (ESCAP) এর পূর্ণরূপ হচ্ছে United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific অর্থাৎ জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন। এটি জাতিসংঘভুক্ত একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা। এ আঞ্চলিক সংস্থাটির পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রয়েছে তুরস্ক, পূর্বে রয়েছে কিরিবাতি, উত্তরে রয়েছে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড। এসকাপ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। এর সদরদপ্তর থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে। এসকাপ সচিবালয় প্রাধনকে বলা হয় নির্বাহী মহাসচিব। এর অধীনে ৭টি বিভাগ রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা- জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রাধান্য দেয়া। এর অধীনে ৮টি কমিটি রয়েছে। যে কমিটিগুলো আঞ্চলিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ করে, চিহ্নিত করে কোন কোন স্থানে কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার; আঞ্চলিক সংলাপের আয়োজন করে, পর্যবেক্ষণ করে কমিশনের কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা প্রভৃতি।

♦ সর্বজনীন মানবাধিকার *[২১তম বিসিএস]*

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। এ ঘোষণার মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হচ্ছে : ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নির্যাতন থেকে অন্য দেশে আশ্রয় চাওয়া ও আশ্রয় লাভ, ভয়, অভাব, নির্যাতন ও দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার। নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ঘোষণা প্রযোজ্য। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার দিনটি উপলক্ষে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রে মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৬৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৯৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী পালিত হয়। পঞ্চাশতম বার্ষিকীর মূল বক্তব্য ছিল 'সবার জন্য সকল মানবাধিকার'। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা খসড়া প্রণয়নে মূল অবদান রেখেছেন ইলিনর রুজভেল্ট

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), রেনে কাসিন (ফ্রান্স), চার্লস মালিক (লেবানন), পেং চুন চ্যাং (চীন), হারনাম সান্তক্রুজ (চিলি), আলেকজান্দ্রে বোগোসোলভ, আলেক্সি পাভলভ (সোভিয়েত ইউনিয়ন), লর্ড ডুকেসতন, জিওফ্রে উইলসন (যুক্তরাজ্য), উইলিয়াম হজসন (অস্ট্রেলিয়া) এবং জন হামফ্রে (কানাডা)।

♦ প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন

প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীল নকশা। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে অনুমোদন গ্রহণের জন্য এটিই হচ্ছে প্রধান দলিল। বেইজিং সম্মেলনে পেশ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালের মার্চে জাতিসংঘ নারী মর্যাদা কমিশনের ৪৯তম অধিবেশনে ৩৬১ অনুচ্ছেদের এ খসড়া দলিলটি অনুমোদন করা হয়। নাইরোবিতে ৩য় জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে গৃহীত ২০০০ সাল পর্যন্ত নারী সমাজের অগ্রগতি বিষয়ক ভবিষ্যৎমুখী কর্মকৌশল অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল থেকে নারী সমাজের অর্জিত অগ্রগতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এতে তুলে ধরা হয়েছে। খসড়ায় জরুরি কর্মপন্থায় ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এসব বিষয় নারী সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত। বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের জন্য সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও বেসরকারি খাতের কি কি করণীয় এবং যথাযথ কর্মকৌশলগত লক্ষ্য কি কি তার সবই এ কর্মপন্থায় স্থান পেয়েছে।

PFA-এর আলোকে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় : ১. দারিদ্র্য, ২. শিক্ষা, ৩. স্বাস্থ্য, ৪. নির্যাতন, ৫. সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাত, ৬. অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, ৭. ক্ষমতা বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেশিনারি, ৯. মানবাধিকার, ১০. গণমাধ্যম, ১১. পরিবেশ ও উন্নয়ন এবং ১২. কন্যা-শিশু।

♦ বেইজিং নারী সম্মেলন

১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ১৮৫ দেশের প্রায় ৩০ হাজার প্রতিনিধি অংশ নেন। সৌদি আরব ও গ্রানাডা এ সম্মেলনে যোগ দেয়নি এবং সোমালিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানসহ বেশ কিছু এনজিও কর্মকর্তাও এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনের স্লোগান ছিল 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'। জাতিসংঘের উদ্যোগে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহাসচিবের পক্ষে ইসমত কিটানি এবং সভাপতিত্ব করেন চীনের চেন মহুয়া। সম্মেলনে ব্যাপক মতবিরোধের সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত 'প্লাটফরম ফর অ্যাকশন' গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা : বিশ্বের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ নারী। সামাজিক বৈষম্য, দৈহিক পার্থক্য এবং সেবার সুযোগের অভাবে নারীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। অশিক্ষা এবং গর্ভধারণজনিত কারণে বিশ্বে প্রায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মহিলা মারা যায়। উন্নত শিক্ষা, প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে এবং নিরক্ষতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই নারী, আইনগত সাহায্য ও নিরাপত্তা লাভের সুযোগের অভাবই নারী নির্যাতনের প্রধান সমস্যা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের গণ্য করা হয় না, আইনগতভাবে নারী অধিকার আদায় হলেও বাস্তবে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

♦ ইয়াল্টা সম্মেলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ৪-১১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়ার সাগর তীরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাস ইয়াল্টায় অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপক্ষের তিন প্রধান শীর্ষ সম্মেলন। রাশিয়ার জোসেফ স্তালিন, ব্রিটেনের উইনস্টন চার্চিল এবং আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এই

সম্মেলনে জার্মানির আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেন। ইয়াল্টা সম্মেলনের অনেক সিদ্ধান্তেরই ছিল সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য। সম্মেলনে জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, জার্মান ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধশক্তি সমূলে উৎপাটন করতে হবে। অধিকৃত নাৎসি জার্মানিকে ভাগ করা হবে চারটি এলাকায়—সোভিয়েত, ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান অধিকৃত এলাকা। তেমনিভাবে বৃহত্তর বার্লিনকেও চারটি অঞ্চলে ভাগ করে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কাউন্সিলের অধীনে রাখা হবে এবং মিত্রশক্তির হাই কমান্ডের সদর দপ্তর হবে বার্লিন।

ইয়াল্টা সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল 'মুক্ত ইউরোপ সংক্রান্ত ঘোষণা'। এতে সদ্যমুক্ত দেশসমূহের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তাদের আর্থিক সহায়তা দানের কথা বলা হয়। মুক্ত পোল্যান্ডের ভবিষ্যৎ, পোল্যান্ডের সরকার এবং সীমানা কিভাবে হবে এসব নিয়ে ছিল মতপার্থক্য। কেননা লন্ডনে স্থাপিত প্রবাসী পোলিশ সরকারের প্রতি রাশিয়ার ছিল প্রবল অনাস্থা, অপরদিকে পোল্যান্ডের এক বিরাট অঞ্চল যুদ্ধের সূচনাতেই দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া।

জাতিসমূহের সংঘ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ইয়াল্টা সম্মেলনের অত্যন্ত তাৎপর্যময় সিদ্ধান্ত ছিল। জাতিসংঘ সনদের একটি রূপরেখা ইয়াল্টায় স্বীকৃত হয়। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের সাত সদস্যের ভোটদানের পদ্ধতি ও ক্ষমতা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ সংস্থার ভূমিকার ওপর সম্মেলনে বিশেষ জোর দেয়া হয়। মিত্রপক্ষের অপরাপর শক্তির অনুরোধে ইউরোপে যুদ্ধ অবসানের তিন মাসের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইয়াল্টা ছিল মিত্রশক্তির দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন। এর আগে ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে তারা মিলিত হয়েছিলেন তেহরানে। দুঃখের বিষয়, ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্রশক্তির মধ্যে যে সমঝোতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যুদ্ধাবসানের পর তা স্থায়ী হয়নি।

♦ জাতিসংঘ নারীবিষয়ক সম্মেলন বেইজিং + ৫

২০০০ সালের ৫-৯ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩তম বিশেষ অধিবেশন বেইজিং + ৫ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ১৮৮টি দেশের ১০ হাজারেরও বেশি নারী ও পুরুষ প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'Gender Equality Development and Peace in the Twenty First Century'—একুশ শতকে নারী-পুরুষ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে নারীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে জাতিসংঘ নতুন যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, তাতে নারীকে গর্ভপাতের অধিকার প্রদান; স্ত্রী ধর্ষণ, পারিবারিক জীবনে নারীর ওপর নির্যাতন ও নারী পাচারের জন্য শাস্তির বিধানসহ নারীর স্বাস্থ্যসেবার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সম্মেলন শেষে ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধি ও নারী আন্দোলন কর্মীরা 'বেইজিং + ৫' নামের দলিলে নারী উন্নয়নের বিস্তারিত কর্মসূচি লিপিবদ্ধ করেন। সম্মেলনে গৃহীত দলিলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নারীর উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বালক ও বালিকাদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে।

♦ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। সনদটিতে ৫৪টি ধারা রয়েছে। সনদে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সনদে বলা হয় গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়-গোষ্ঠীগত, সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ্য, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলিন্য নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য করা

যাবে না। সনদে শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থে সকল কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেসব শিশু শরণার্থী, প্রতিবন্ধী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। শিশুদের বেঁচে থাকা, বিকাশ, সুরক্ষা ও অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দিতে হবে পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে। ১৯১টি পক্ষভুক্ত রাষ্ট্র নিয়ে এ কনভেনশন ব্যাপকভাবে অনুসমর্থিত। কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি এত অনুসমর্থন লাভে সমর্থ হয়নি। ইতিহাসে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। সনদের আওতায় গঠিত শিশু অধিকার কমিটি এর বাস্তবায়ন দেখাশুনা করে এবং পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ প্রদত্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে। এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ও অনুমোদনকারী প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

♦ সিডও সনদ

সিডও সনদ হচ্ছে নারী অধিকারের একটি দলিল। দীর্ঘকাল থেকে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দূর করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশন। ইংরেজিতে এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women যা সংক্ষেপে সিডও (CEDAW) নামে পরিচিত। সিডও সনদ হলো নারীর সকল প্রকার মানবিক অধিকার সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক বিল। সিডও সনদ ৩০টি ধারা সংবলিত। এ ধারাগুলো আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ, ধারা ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ, ধারা ১৭ থেকে ২২ পর্যন্ত সিডও কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক। তৃতীয় ভাগ, ধারা ২৩ থেকে ৩০ পর্যন্ত সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত।

♦ মানবাধিকার চুক্তি

মানবাধিকার চুক্তি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণের একটি দলিল। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ চুক্তি গৃহীত হয়। নোবেল পুরস্কারজয়ী ওরেন ক্যাসিনের করা খসড়া সনদের মাধ্যমে মানুষের সহজাত মর্যাদা, সমতা এবং সমান অধিকার এ চুক্তিতে স্বীকৃত হয়।

অধ্যায় ০২

ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক সম্পর্ক
Foreign Relations of Major Powers

Syllabus *Foreign Relations of Major Powers : USA, Russia, UK, China, France, Germany, Japan etc.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করুন।*
অথবা, দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও প্রভাব কি? ওবামা প্রশাসনের আফগান নীতি পর্যালোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

০২. *যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট Barak Obama-র প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]*

০৩. *যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে রাজনৈতিক ও সামরিক উপাদান কি ভূমিকা পালন করে? [২৫তম বিসিএস]*
অথবা, চীন-মার্কিন সম্পর্কের প্রকৃতি পরীক্ষা করুন। [২৩তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. *সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির গতিধারা পর্যালোচনা করুন।*

০৫. *সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে রাশিয়ার বৈদেশিক সম্পর্কের একটা বাস্তব চিত্র বর্ণনা করুন।*

০৬. *সুয়েজ সংকটের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক সম্পর্ক কেমন তা আলোচনা করুন।*

০৭. *গণচীনের পররাষ্ট্রনীতির অতীত ও বর্তমান এবং এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।*

০৮. *অর্থনৈতিক ও সামরিক পরশক্তি হিসেবে সাম্প্রতিক চীনের আবির্ভাব পশ্চিমা বিশ্ব ও এশীয় অঞ্চলে পশ্চিমাদের দালাল রাষ্ট্রগুলোর যে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

০৯. *ভারত ও চীন এ দু'দেশের কোনটি সকল দিক বিবেচনায় একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অধিকতর শক্তিশালী দেশরূপে আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতি প্রভাবিত করতে পারে তা যুক্তিসহ আলোচনা করুন।*

১০. *পঞ্চম প্রজাতন্ত্র বা ১৯৫৮ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ফ্রান্সের বৈদেশিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।*

১১. *জাপানের সামরিক আকাঙ্ক্ষা, চীনের অর্থনৈতিক উত্থান এবং ভারতের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতির ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প অঙ্কন করুন।*

১২. *ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ক্রমবিকাশ আলোচনাপূর্বক একুশ শতকে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান নির্ণয় করুন।*

১৩. বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কতটা দ্বন্দ্বমূলক ও কতটা সহযোগিতামূলক হবে বলে আপনি মনে করেন?
অথবা, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী'।– যুক্তিসহ আপনার মতামত দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম ও তাদের পদবি কি?
০২. সংক্ষেপে চীনের পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখ করুন।
০৩. 'এক দেশ দুই নীতি' বলতে কি বোঝায়? কোন দেশে এ নীতি চালু রয়েছে?
০৪. PL-480 কি?
০৫. ভারতে মুক্তবাজার অর্থনীতির জনক কে?
০৬. যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
০৭. যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য কি কি?
০৮. ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
০৯. চীনের বিচ্ছিন্নতাবিরোধী আইন ও তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখুন।

☐ **ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র পরিচিতি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রাশিয়া, চীন, জাপান, ফ্রান্স**

টীকা

- মার্কিন অর্থনৈতিক সুনামি
- প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি
- এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি [২২তম বিসিএস]
- ফরাসি বিপ্লব [৩০তম বিসিএস]
- ম্যাগনাকার্টা [৩০তম বিসিএস]
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
- আফিম যুদ্ধ
- ফকল্যান্ড যুদ্ধ
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
- রুশ বিপ্লব
- শিল্প বিপ্লব
- চীনা বিপ্লব
- আমেরিকার বিপ্লব/স্বাধীনতা যুদ্ধ
- হিরোশিমা
- হংকং [১১তম বিসিএস]
- পেন্টাগন [১৩তম বিসিএস]
- বাস্তিল দুর্গ
- বারাক ওবামার দ্বিতীয় মেয়াদ
- হংকংয়ে ছাতা বিপ্লব
- ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি [১১তম বিসিএস]
- সিআইএস (CIS) [২৮তম বিসিএস]
- আনজুস (ANZUS)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করুন।
অথবা, দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও প্রভাব কি? ওবামা প্রশাসনের আফগান নীতি পর্যালোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

উত্তর : আন্তর্জাতিক বিশ্বের চলতি পরিক্রমায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীতে এশিয়ায় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত পরাশক্তি হিসেবে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র এশিয়াতে তার নীতি আরও কার্যকরী করতে চাইছে। সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র মূলত ১৯৪৫ সাল থেকে বর্তমান সময়

পর্যন্ত বিশ্বে পরাশক্তি হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়ান নীতি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এশিয়ায় চীনকে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রধান হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। যে কারণে চীনের উপর নজরদারিসহ অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, কৌশলগত কারণ সর্বোপরি আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র একাধিক কৌশলগত নীতি গ্রহণ করেছে। মূলত ১৯৪৫ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মাঝে একটি নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য প্রত্যক্ষ করা যায়। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তনের কিছু ত্রুটি ব্যতীত একক পরাশক্তি হিসেবে সব উপাদানই দেশটি প্রয়োগ করেছে এবং বর্তমানেও সে অবস্থান অব্যাহত রয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার নীতি (Policy of Isolation) বেশি প্রাধান্য পেয়ে আসছে। এ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্বের যে কোনো সংঘাত ও বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি হতে মুক্ত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন বেশি জোরদার করা। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী পররাষ্ট্র নীতি ও ২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পররাষ্ট্রনীতি।

১. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী পররাষ্ট্রনীতি :** ১৮২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট মনেরো যে তত্ত্ব ঘোষণা করেন তার ভিত্তিতেই রচিত হয় 'Monero doctrine'। Monero বলেছিলেন, 'The American continents are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European power.' অর্থাৎ, ইউরোপকে আমেরিকার রাজনীতিতে নাক গলাতে না দেয়া এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা। এ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে যায়। ক্যারিবীয় অঞ্চলে এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র একক আধিপত্য বিস্তার করে পানামা খালের কর্তৃত্ব ব্রিটেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং ১৯০১ সালে কিউবার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। চীনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরজা (Open door) নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে জার্মান চ্যান্সেলর এডলফ হিটলারের আবির্ভাব ও ১৯৩৮ সালে জার্মানির নেতৃত্বে 'জাপান, ইতালি ও জার্মানি' অক্ষশক্তির উত্থানে বিশ্ব শক্তি কাঠামোর হুমকির মুখে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপে যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় বিচ্ছিন্নতার নীতি গ্রহণ করে।

২. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পররাষ্ট্রনীতি :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হয়ে ওঠে জোট গঠন ও হস্তক্ষেপকেন্দ্রিক। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, 'Viewed in historical Perspective, American's foreign policy after 1945 has been truly revolutionary.' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এগুলো হলো :

ক. **Truman Doctrine :** ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান ঘোষণা করেন, 'পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। অতএব সেখানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

খ. **Marshall Plan :** ১৯৪৮ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল-এর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য কাজ করে অর্থনৈতিক সাহায্য মিশন। এ পরিকল্পনার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে ১২ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে। মার্শাল পরিকল্পনার মূল কথা ছিল : 'It was designed to bring about the economic recovery of the western Europe in order to forestall a communist electoral victory arising from the economic chaos prevailing there.'

গ. **NATO :** ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য রোধ করতে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে NATO গঠন করে।

দূরপ্রাচ্যে চীন, জাপান, কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ৪ ধরনের পররাষ্ট্রনীতি পরিলক্ষিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি হলো ইসরাইলকে রক্ষার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করা। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যতা আনয়নে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

এশিয়ায় মার্কিন নীতি

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর তুলনায় এশিয়ায় নিজের আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থ সংরক্ষণে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গবেষণা দফতরের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব উইলসন লর্ড-এর মতে, 'There is no region in the world more importance for the USA than Asia-Pacific.'

পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করা : বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তৃতি ঘটেছে। এসব দেশের মধ্যে এশিয়ার রাষ্ট্রের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উত্তর কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় যে কোনো সময়ে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ অস্ত্র উৎপাদন ও আমদানির ক্ষেত্রেও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করেছে যা এশিয়ায় সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সিরিয়ার বর্তমান ভূমিকাতে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়ার পরমাণু ও সামরিক অস্ত্র সীমিতকরণ ও নির্মূলে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য নীতি : যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া বিষয়ক নীতিতে মধ্যপ্রাচ্য সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এর কারণ একদিকে মূল্যবান তেলসম্পদ এবং অন্যদিকে ইসরাইলের সমর্থন। তাই দেখা যায়, ইরাককে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্রীকরণ চেষ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেলের প্রতি আগ্রহ। তাই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের বহুদিনের প্রতীক্ষা। ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। ফলে জাতিসংঘের বহুজাতিক বাহিনীর সহযোগিতায় উপসাগরীয় যুদ্ধের পরেই যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সাথে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে স্থায়ীভাবে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সুযোগ পায়। ২০০৩ সালে ইরাকে পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্র আছে এ অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক দখল করে নেয়।

সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো–

- ইরান-সিরিয়াকে এক ঘরে করে রাখা।
- মিসরের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখা।
- যেসব রাজতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত সেসব দেশের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করা।
- আরবরা যাতে ইসরাইলকে আক্রমণ না করে সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
- মধ্যপ্রাচ্যের মূল্যবান সম্পদ জ্বালানি তেলের বিশ্ব বাজারে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা।
- সর্বোপরি ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

যুক্তরাষ্ট্রের চীন নীতি : যদিও বর্তমানে চীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার তা সত্ত্বেও ১৯৮৯ সালে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের হত্যা এবং মানবাধিকার লংঘনের

অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র চীনের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকে মিসাইল হামলা থেকে রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন একটি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Anti Ballistic Missile—ABM) গড়ে তোলে। যার ফলে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরো অবনতি হবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। চীন বর্তমানে বৃহৎ সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। দেশটিতে রয়েছে ১৩৯.৩৮ কোটি লোকের বিশাল বাজার। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও আপোসমূলক বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে।

ভারত ও পাকিস্তান নীতি : পাকিস্তান ও ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বসহ বিবেচনা করে। কাশ্মীর প্রশ্নে এ দুটি রাষ্ট্রের মাঝে বিবদমান বিরোধ নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিল। যদিও পাক-ভারত উভয়ই নিজেরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। চীনের হুমকি মোকাবিলা কৌশলগত কারণও এ অঞ্চলের বিশাল বাজারে আধিপত্য বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা : সুষ্ঠু গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা করাই এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও কৌশলের অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, মানবাধিকার ও পরিবেশগত উন্নয়নে সহযোগিতা করার পাশাপাশি মানবিক সংকটাপন্ন ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায় গণতান্ত্রিক পরিবেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা জোট গঠন করা : ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় ১৮টি দেশ নিয়ে অর্থনৈতিক জোট APEC (Aisa-Pacific Economic Co-operation) গড়ে তোলে। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত APEC-এর বাৎসরিক সম্মেলনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আগামী ২০২০ সালের মধ্যে চীন-জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাইয়ের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম এশিয়ান নীতি (Asian Policy)।

এশিয়ান মুসলিম রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতি : পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র যে সমস্যাটির বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তা হলো মৌলবাদ। ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তানসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের মৌলবাদ প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র জোটবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে যতদিন রুশ বাহিনী ছিল ততদিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামপন্থি গেরিলা দলগুলোকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছিল। পাকিস্তানের প্রতিও মার্কিন নীতি ছিল অনমনীয়। ১৯৮৯ সালে রুশ সৈন্য আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহারের পর যুক্তরাষ্ট্র ভিন্নীতি গ্রহণ করে। এমনকি উপদলীয় কোন্দল থামানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে দ্বৈতনীতির প্রতিফলন ঘটে। তাছাড়া বর্তমানে পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি সন্ত্রাস দমনের যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াস এবং ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তি এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা পরিবর্তনের আভাস।

এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ : স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় :

- সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামী মৌলবাদের হুমকি মোকাবিলা করা।
- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানসহ দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা।
- মধ্যপ্রাচ্যের তেল প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখা এবং এই অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা।

– গণচীনের সাথে স্থিতিশীল সম্পর্ক নিশ্চিত করা।
– আফগানিস্তানে নতজানু সরকার প্রতিষ্ঠার পর এখান থেকে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর উপর নজরদারি করা।
– পাকিস্তান-ভারতের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং
– ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোনো পরাশক্তির অস্তিত্ব ও সংশ্লিষ্টতার জন্য বেশি স্নায়ুচাপের সম্মুখীন। চীন ও জাপানের সাথে বাণিজ্য বিরোধ, এশিয়ায় নতুন অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান, পাক-ভারত অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অবস্থানজনিত কারণে জনসাধারণের মধ্যে মার্কিন বিরোধী মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তির কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র অতিমাত্রায় অস্ত্র উৎপাদন, অস্ত্র আমদানি ও পারমাণবিক অস্ত্রের দ্রুত প্রসার এশিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করেছে যা এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-কৌশল ও স্বার্থকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলছে। তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম (২০০৯-বর্তমান) প্রেসিডেন্ট হিসাবে বারাক ওবামার বিদেশনীতি এক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তনের আশা প্রতীয়মান হচ্ছে। সুতরাং এশিয়ার সুস্থ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রকে যেমন এ অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে সমঝোতার নীতি অনুসরণ করতে হবে তেমনি সামরিক নীতি ও কৌশলকে পুনর্বিন্যাস করার সাথে সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

০২। যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা'র প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : ত্রিশের দশকের 'Great Depression'-এর পর বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিন আইন নীতিতে যে মহামন্দা দেখা দিয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পুরো মার্কিন জনগণ নতুন এক আলোর দিশারী বারাক ওবামাকে তাদের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী হিসেবে নির্বাচিত করে। 'Change we need' প্রত্যয়ের ঝাঁঝালো মোহে আবদ্ধ হয় বিভিন্ন মুসলিম সমাজসহ পুরো বিশ্ববাসী। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের 'I have a dream' নামক বর্ণবাদ, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দ্রোহের ন্যায় আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে সকল জরাজীর্ণতা, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট যুদ্ধের ঘোষণা দেন। ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষেরা ওবামা-ম্যানিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সুন্দর ও প্রশান্তিময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো— ওবামা কি সত্যিই পারছেন তার পূর্বসূরি যুদ্ধবাজ ক্ষুদে হিটলার জুনিয়র বুশের সৃষ্টি করা সকল হানাহানি, রক্তপাত নির্মূল করে বিধ্বস্ত মার্কিন অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে? সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ তাই বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে এখনো তাকিয়ে আছে স্বপ্ন দেখানো ওবামার দিকে।

ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি : বারাক ওবামার পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি মূল্যায়ন করে দেখা উচিত। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জর্জ ওয়াকার বুশ যখন শপথ নিচ্ছিলেন তখন অনেক বিশ্লেষকগণই ধারণা করেছিলেন বুশ তার পিতা সিনিয়র জর্জ বুশের পররাষ্ট্রনীতিকেই মডেল হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বুশ জুনিয়র তার পিতার চেয়েও চরম উগ্রনীতি গ্রহণ করেন এবং তার প্রশাসনের উগ্র ডানপন্থি যুদ্ধবাজ ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ও প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড-এর শক্তি প্রয়োগ

নীতি অনুসরণ করেন। যার ফলে নতুন সহস্রাব্দের একজন নব্য হিটলার হিসেবে বুশ জুনিয়র পুরো বিশ্বের 'ক্রুসেডের ন্যায় জঙ্গি উন্মাদনা' সৃষ্টি করেছেন।

'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ'-এর এক নিবন্ধে (২০০৭ : ৫৮) বলা হয়েছে– যদিও বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি অতি সাধারণ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে চরম আনাড়িপনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ 'বুশ ডকট্রিন' মূলত National Interest ও National Security এ দুটো প্রত্যয়ের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। মোদ্দাকথা জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয় দুটোকে এমনভাবে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে যে, নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তা নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা।
২. যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী দেশগুলোর নিকট আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখা।
৩. 'বুশ ডকট্রিন' দ্বারা যেসব অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনার দ্বারা নিরসন করে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা।
৪. সন্ত্রাসবাদ দমন করা বিশেষত আফগানিস্তানের তালেবান ও পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চলের সকল সন্ত্রাস ও জঙ্গি-তৎপরতা দমনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।
৫. যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখা, বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের সাথে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া ও বিশ্বে সামরিকভাবে কৌশলগত অবস্থান বজায় রাখা।
৬. ইসরাইলকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সামরিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার ঘোষণা এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলভাণ্ডারকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করার অতীত নীতি অনুসরণ করা।
৭. ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে কোনোক্রমেই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে মেনে না নেয়া।
৮. চীন ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ এবং ভারতের সাথে কৌশলগত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৯. মার্কিন বিরোধী দেশ ও সরকারগুলোর সাথে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন ও যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা।

মূলত 'বুশ ডকট্রিন'-এর বিরুদ্ধে ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারণায় সোচ্চার থাকলেও বর্তমান নতুন বিশ্বব্যবস্থায় তাকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কেননা হিটলারের গেস্টাপোর কায়দায় একইভাবে বুশের সিআইএ বিগত বছরগুলোতে সারা বিশ্বে যে ন্যাক্কারজনক তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে সে ক্ষত সারাতে বারাক ওবামাকে এক সুকঠিন রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। ৫৩ বছর বয়স্ক এ কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট দরিদ্র, বঞ্চিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত আমেরিকান সমাজের পাশে আর তাই ক্ষমতাধর মার্কিন রক্ষণশীল, পুঁজিবাদী ও কট্টরপন্থি গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হচ্ছে বৈকি। অবাধ পুঁজির একটি নিষ্ঠুর ও নৃশংস দিক রয়েছে, আর সেটা কোনো ব্যাপকভিত্তিক জনকল্যাণ ও শুভকামনাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও জনকল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় কঠিন অবস্থায় পড়তে হচ্ছে বারাক ওবামাকে।

কেনীয় বংশোদ্ভূত এ কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্টকে হয়ত রাজনৈতিক সমীকরণের গোলক ধাঁধায় পড়তে হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে তার ডেমোক্র্যাটে ঘরানার তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটনকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বা 'Secretary of State' করতে হয়েছিল। ওবামার এ সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে এটা যেমন সত্য, তেমনি একজন কট্টর, গোঁড়া খ্রিস্টান ও ইহুদিবাদের দোসর হিসেবে পরিচিত হিলারি

ক্লিনটন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে কতটা আশীর্বাদপুষ্ট তা নিয়ে বিশ্লেষকগণ অনেকটাই সন্দিহান। দ্বিতীয়বারের মতো (সেপ্টেম্বর ২০১২) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ওবামা প্রশাসনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ দেন প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জন কেরিকে, যা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ।

ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্রমবিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের তুলনামূলক আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল তিনটি পর্যায় বিদ্যমান–

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি;
খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও
গ. স্নায়ুযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি।

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব মার্কিন বিদেশনীতিকে প্রধানত প্রেসিডেন্ট 'মনরো ডকট্রিন' বলে উল্লেখ করা যায় যেটা 'Policy of Isolation' বা 'বিচ্ছিন্নতার নীতি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র নিজ গণ্ডির বাইরের কোনো বিষয় নিয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন তার বিজয়ী ভাষণে বলেছিলেন– 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও রাজনৈতিক সম্পর্ক সর্বদা এড়িয়ে চলা। ইউরোপের পারস্পরিক সমস্যা ও সেসব সমস্যা থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ আমাদের জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় নয় এবং এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ (Policy of neutrality) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রেসিডেন্ট মনরো (১৮২৩) জর্জ ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতির অনুকরণে ঘোষণা করেন— 'ইউরোপীয় রাজনীতির গতিপ্রবাহ থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং আমেরিকার কোন অংশ ইউরোপীয় কিংবা অন্য কোনো দেশীয় স্বার্থ উদ্ধার বা উপনিবেশ না হতে দেয়াই হবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র।'

Bennis S. F. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব মার্কিন বিদেশনীতির কিছু মৌলিক বিষয় তুলে ধরেছেন। যেমন—

১. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা।
২. ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা।
৩. উপনিবেশবাদ নীতি সর্বাগ্রে পরিত্যাগ।
৪. যে কোনো দেশীয় আগ্রাসনের বিরোধিতা করা।
৫. সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ।
৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন ও
৭. মহাদেশীয় প্রভাব বিস্তার করা।

বর্তমান ওবামা প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হলে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতির সকল বিষয়ই ইতিবাচক, শুধু বিচ্ছিন্নতার নীতি বাদ দেয়া হলে। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ 'Policy of Isolation'-কে সবচেয়ে দুর্বল দিক বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সদ্ভাবের বিকল্প নেই।

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে 'Truman Doctrine' শুধু মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই নয়, বরং সারা বিশ্বের রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে এবং বিশ্ব দরবারে যুক্তরাষ্ট্রকে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়কার 'ট্রুম্যান ডকট্রিন'-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিস্তার সর্বাগ্রে রোধ করা ও পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোর সার্বিক সম্প্রসারণ করা।
২. সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব খর্ব করতে পশ্চিম ইউরোপসহ দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব বজায় রাখা।
৩. স্নায়ুযুদ্ধ মোকাবিলায় বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করা।
৪. নিজের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার্থে পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও মহাকাশ অভিযানে সাফল্য লাভ করা।
৫. বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থনদান ও অনুন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা।

গ. স্নায়ুযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি : স্নায়ুযুদ্ধোত্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি অনেকটা একচেটিয়াভাবে বিশ্বে মোড়লীপনার ন্যায় প্রভাব বিস্তার করলেও শেষদিকে এসে তা অনেকটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এ সময়ে বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসারণ ঘটানো, রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট ধারার দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের বিস্তার ও তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে মার্কিন স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ইসলামী মৌলবাদের উত্থান বন্ধ করে বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি যে কোনো হুমকি মোকাবিলা করা।

একবিংশ শতাব্দীর নতুন পথপরিক্রমায় নয়া বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে যেসব বিষয় প্রাধান্য পাওয়া উচিত সেগুলো হলো–

১. ভারসাম্যপূর্ণ সুষম বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা;
২. বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মওকুফের উদ্যোগ গ্রহণ;
৩. বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে অনুন্নত দেশের স্বার্থে পরিণত করা;
৪. বিশ্বব্যাংকের খবরদারি বন্ধ ও আর্থিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ;
৫. বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ;
৬. সন্ত্রাসবাদের সঠিক সংজ্ঞায়ন ও এর যথার্থতা যাচাই;
৭. বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষার অঙ্গীকার এবং
৮. একরোখা ইসরাইল ঘেঁষা মধ্যপ্রাচ্য নীতির পরিবর্তন।

ওবামার পররাষ্ট্রনীতি– প্রেক্ষাপট মুসলিম বিশ্ব : আজ থেকে মাত্র ১৪৩ বছর পূর্বে আফ্রো-আমেরিকান ওবামার পূর্বপুরুষগণ যারা আফ্রিকার দাস হিসেবে পরিচিত ছিলেন, এমনকি মাত্র ৪৩ বছর পূর্বে আমেরিকায় যাদের ভোটাধিকারের ন্যূনতম অধিকারটুকুও ছিল না, সেই কেনিয়ার বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামা আজ প্রতিষ্ঠিত পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইবারের নির্বাচিত (২০০৯-বর্তমান) প্রেসিডেন্ট। ৫৩ বছর বয়স্ক মানবসভ্যতার সেরা নিদর্শন বারাক ওবামা বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে চিরকুটে লিখেছেন– 'ঈশ্বর যেন তাকে তাঁর ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র বানান'। যেমন করে শতবর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন প্রভুকে উদ্দেশ্য করে– 'তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ, আমার জীবন মাঝে'।

ওবামা তার অনন্য গ্রন্থ 'The Audacity of Hope' গ্রন্থে তার শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রজ্ঞা, মেধা ও দূরদর্শিতার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের অর্ধশতাধিক মুসলিম দেশগুলোর কোটি কোটি মুসলমানেরা আজও প্রবলভাবে ওবামা-ম্যানিয়ায় আক্রান্ত। তারা সকলেই এখনো ওবামাকে আলোর পথের দিশারী হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, যদিও তারা 'ওবামা পলিসি'তে এখনো বেশ অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। ওবামার পররাষ্ট্রনীতি মুসলিম বিশ্বের জন্য অনুকূল কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের প্রথমেই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি, উদ্দেশ্য ও কৌশলের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে চরম ও জটিল গিরিখাত হচ্ছে 'Middle-East Crisis' যা গত অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে মুসলমানদেরকে অশান্তির আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। ইসরাইল রাষ্ট্রটি হলো মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার যেটি ১৯১৭ সালের ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ড বলপূর্বক গ্রাস করে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে। সেই থেকে এ যাবৎ পরপর চারবার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইঙ্গ-মার্কিন মদদপুষ্ট ইসরাইল প্রতিবারই আরবদের যুদ্ধে হারায়। আর পশ্চিমা বিশ্বও ইসরাইলকে এমনভাবে সহায়তা করে চলছে যাতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে তাদের অনুগত ও বশে আনা যায়। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বের মোট তেল মজুদের ৬৬ শতাংশ রয়েছে যা পশ্চিমা শিল্পায়ন ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং এ পেট্রোলিয়াম শক্তিই পশ্চিমা সভ্যতাকে দীর্ঘস্থায়ী ও চালকের আসনে বসিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো ওবামার নীতিও কি ইসরাইল ঘেঁষা হচ্ছে কি না? এর উত্তরে খুব সহজেই আমরা বলতে পারি, বারাক ওবামা AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee)-এর বার্ষিক সম্মেলনে ইসরাইলের অস্তিত্ব রক্ষায় বিলিয়ে দেয়াসহ নিজেকে একজন গোঁড়া ইহুদীবাদের রক্ষক বলে অভিহিত করেছেন। এভাবে ওবামা তার ভাষণে শক্তিশালী ইহুদীদের তোষণে নিজেকে এতটাই ব্যাপৃত রেখেছেন যে ইসরাইলের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ইউরি অ্যাভনারিও পর্যন্ত ওবামার হীনম্মন্যতা প্রকাশের জন্য তার ভাষণটিকে আজ্ঞানুবর্তিতার নিকৃষ্ট উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাবেক অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Clash of Civilisation : The Next Pattern of Conflict'-এ তিনি সভ্যতার দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং বিশ্বব্যবস্থায় ৮টি সভ্যতার উল্লেখ করে মূল সংঘাত বলতে পাশ্চাত্য ও ইসলামের সভ্যতাকে নির্দেশ করেছেন।

[তথ্যসূত্র : Foreign Affairs, Vol.72 ঃ 3, 1993, P. 28]

হান্টিংটনের এ তত্ত্ব ফলতে ১০ বছরও লাগেনি। কারণ এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ ও তা দখল করেছে এবং তাদের দখলদারিত্ব জিইয়ে রেখে ইরাকের তেল সম্পদ লুটপাট করে চলেছে। হান্টিংটন তার তত্ত্বে 'Nation-State' বা জাতি রাষ্ট্রের ধারণা গৌণ করে 'ইউরো-আমেরিকান খ্রিস্টান গণতন্ত্রী' সভ্যতার সাথে 'ইসলামী সভ্যতার' সংঘাতকে অবশ্যম্ভাবী বলে উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ মার্কিনীদের মনে ধর্মীয় আবেগ এখনো অনেক কার্যকরী। নব্য ক্রুসেড ও তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে হলিউডের রং-বেরংয়ের চলচ্চিত্র ও মিডিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবাধ ও অসংযত প্রচারণা পুরো বিশ্বের খ্রিস্টানদের মনে মুসলিম বিদ্বেষী আবেগ সৃষ্টিতে বেশ সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে (সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী) হিলারি ক্লিনটনও একজন গোঁড়া খ্রিস্টান। পাশ্চাত্যে ইসলামের প্রবল প্রসারের কারণে তিনিও যে শঙ্কিত ছিলেন না তা কিন্তু নয়। কেননা তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ইরানকে কোনোক্রমেই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে দেয়া যাবে না এবং তিনি

আরো বলেছেন যে, ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধানে তিনি প্রয়োজনীয় সবকিছুই করবেন এমনকি প্রয়োজন হলে ইরানকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করবেন না (তথ্যসূত্র : Newsweek, 20 August 2008)। সে হিসেবে হিলারি নিশ্চয়ই হান্টিংটনের তত্ত্ব মেনে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছিলেন, এটাই স্বাভাবিক।

চতুর্থত, বারাক ওবামা'র 'Change we need' ধারণাটি আপাতদৃষ্টিতে যতটা সুসংহত মনে হয়েছে, এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটাকে অনেকটা বিতর্কিতই বলা যায়। কারণ তার 'ড্রিম টিম' (Dream Team)-এ পূর্বসূরি যুদ্ধবাজ বুশের লোকজনই রয়েছেন। যতটা পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল ঠিক সেরকম কিছু হয়নি। বিশেষত প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে বুশ আমলের রবার্ট গেটস্ই ছিলেন যিনি ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। নোয়াম চমস্কি উল্লেখ করেছেন যে, বুশের হেঁয়ালি ও বিদ্বেষপূর্ণ নীতিগুলোই বিশ্বে চরমপন্থা বিস্তারের মূল কারণ। যদি তার উগ্রপন্থার নীতিগুলোই বহাল থাকে, তবে বিশ্বে অসহিষ্ণুতা ও অশান্তি বিরাজ করবেই। বুশের ইরাক নীতি যে কত মারাত্মক ভুল ছিল তা তার নিজের বক্তব্যেই বোঝা যায়, বুশ বলেন– 'I think I was unprepared for war.'

[২০০৮ সালের ১০ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে]।

পঞ্চমত, স্নায়ুযুদ্ধ যুগের (Age of Cold War) সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের ভীতি বারাক ওবামার নেই, তার মনে দানা বেঁধেছে 'জঙ্গিবাদ ও ইসলাম ভীতি'। তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরপরই ঘোষণা করেন। ইরাক হতে ১৭ হাজারেরও বেশি মার্কিন সৈন্যকে তিনি সরিয়ে এনে আফগানিস্তানে তালেবান দমনে নিয়োজিত করবেন। উপরন্তু তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, 'তালেবান ও আল কায়েদার শিকড় উপড়ে ফেলতে তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও প্রয়োজনে হামলা চালাতে দ্বিধা করবেন না। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে আল কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে মার্কিন সুদক্ষ নেভি সিল বাহিনী। পাশাপাশি ড্রোন হামলা চালিয়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের জঙ্গিদের দমনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। ফলে এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিরবিচ্ছিন্নভাবে দিনের পর দিন ধরে চলছেই। অন্যদিকে, ওবামা যদিও ইরানের সাথে আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করেননি, তথাপি তিনি তার 'চিফ অব স্টাফ' নিয়োগ করেছেন এমন একজন বিতর্কিত ইহুদিকে যিনি ইসরাইলের দোসর হিসেবে পরিচিত সেই 'রাহেম ইমান্যুয়েল'কে। এই ইমান্যুয়েল একজন কট্টর জিয়নিস্ট যিনি প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে ইসরাইলের হয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আর এই ইমান্যুয়েলের বাবা চল্লিশের দশকে কুখ্যাত ইহুদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'ইরগুনের' সদস্য ছিল।

ষষ্ঠত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্র ইসরাইল ও কলম্বিয়া প্রেসিডেন্ট বুশের কুখ্যাত 'প্রি এম্পটিভ অ্যাটাক' নীতির অনুশীলন করে চলেছে। বুশ যেমন সকল আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে এবং জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে 'প্রি এম্পটিভ এ্যাটাকে'র নামে বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে হামলা চালিয়েছেন, তেমনি ইসরাইল ২০০৭ সালে সিরিয়ায় বোমাবর্ষণ করেছে, তার আগে লেবাননেও হামলা চালিয়েছে আর কলম্বিয়া 'রেভ্যুলুশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়া' (FARC) গেরিলাদের হত্যা করতে ইকুয়েডরের অভ্যন্তরেও ২০০৭ সালে হামলা চালিয়েছে। আর গত ২৬ অক্টোবর ২০০৮ যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় কমান্ডো হামলা চালায় যাতে ৪ শিশুসহ ৮ বেসামরিক লোক নিহত হয়। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তাদের টার্গেট ছিল 'আবু গাদিয়া' নামক আল কায়েদা সংগঠনের চোরাচালানি এক সংগঠন। 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় আয়ান ব্ল্যাক লিখেছেন–

'This American attack is a final vengeful lunge against the country.' । তিনি সিরিয়ায় মার্কিনের এ 'প্রি এম্পটিভ অ্যাটাক'কে অন্যায় ও সার্বভৌম দেশের ওপর অবৈধ হামলা বলে উল্লেখ করেছেন।

নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক রিচার্ড ফক সিরিয়ায় মার্কিন এ হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন।

মার্কিন বিশ্লেষকগণও উল্লেখ করেছেন– 'আত্মরক্ষার আইনগুলো ব্যবহার করে সামরিক হামলার কর্তৃত্ব অনুমোদন করে USA অন্তর্নিহিত ভুলগুলোই শুধু করে চলেছে।' তারা আরো বলেন– 'ইরাক ও আফগানিস্তান এ দুই দেশেই আমেরিকা একটি আগ্রাসী দেশ, প্রতিরক্ষাকারী নয় মোটেই।'

সপ্তমত, মার্কিন মুসলমানগণ জন ম্যাককেইনকে বুশের কালো অধ্যায়ের পুনরুজ্জীবন মনে করে ওবামাকে নিরঙ্কুশভাবে ভোট প্রদান করেন। অথচ ওবামা মাতার খ্রিস্টধর্মকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরলেন আর পৈতৃক ধর্ম ইসলামকে এমনভাবে পরিত্যাগ করলেন যেন মনে হলো, কৃষ্ণাঙ্গের প্রেসিডেন্ট হওয়ার অভিলাষ কোনো অপরাধই নয়; বরং মুসলমানের জন্যই তা মারাত্মক অপরাধ।

শুধু কি তাই? মধ্যপ্রাচ্য সফরে ওবামা ফিলিস্তিন অঞ্চলে মাত্র পনেরো মিনিট অবস্থান করেন আর ইসরাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করে ফিলিস্তিনিদের রকেট হামলার নিন্দা করতেও কুণ্ঠিত হননি। এমনকি ২০০৯ সালে রমজান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি মার্কিন মুসলিম সমাজের নিমন্ত্রণও এড়িয়ে গেছেন, অন্যদিকে দিনের পর দিন তিনি বিভিন্ন গির্জা ও সিনাগগে বহু প্রার্থনাসভায় সাগ্রহে মিলিত হয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় এটা অনেকটাই সত্য যে, ওবামা তার পূর্বসূরি বুশের পররাষ্ট্রনীতিই সর্বাগ্রে অনুসরণ করছেন যা কখনোই মুসলিম দেশগুলোর জন্য অনুকূল হতে পারে না। যদিও মুসলমানগণ ওবামা-ম্যানিয়ায় মোহবিষ্ট ছিলেন কিন্তু আজ তাদের সেই মোহ অনেকটাই ভঙ্গ হয়েছে। যদিও ৪ নভেম্বর ২০০৮ নির্বাচনে বিজয়ের পরদিন শিকাগোতে বিশাল সংবর্ধনায় ওবামা বলেছিলন–

'It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.'

BARACK OBAMA
5.11.2008 Chicago, USA

বাস্তবিকই তার এ পরিবর্তনের স্বপ্ন মুসলিম দেশগুলোর জন্য নয়, কেননা গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ হতে গাজায় ইসরাইলি বর্বর হামলায় শত শত শিশুসহ সহস্রাধিক নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হলেও ওবামা কেবল মুখে ইসরাইলকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলে ক্ষান্ত রয়েছেন। সম্প্রতি ৮ জুলাই ২০১৪ গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিন রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাসকে বিনাশের লক্ষ্যে ঐ অঞ্চলে বর্বরোচিত হামলা চালায় ইসরাইল, যাতে অনেক নিরীহ নারী ও শিশু নিহত হয়। গাজা ইস্যুতে ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিমন্ত্রী সাইয়েদ হুসেন (৮ আগস্ট ২০১৪) পদত্যাগ করেন। কিন্তু ওবামা প্রশাসনের টনক নড়েনি। তাই বলা যায় ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার এ সংঘাত চিরন্তন। কোনো মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিই ইসলাম কিংবা মুসলিম দেশগুলোর জন্য সহায়ক হবে, এটা বাস্তবতা বিবর্জিত কল্পনামাত্রই হয়তো-বা!

০৩। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে রাজনৈতিক ও সামরিক উপাদান কি ভূমিকা পালন করে? *[২৫তম বিসিএস]*

অথবা, **চীন-মার্কিন সম্পর্কের প্রকৃতি পরীক্ষা করুন।** *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : রাষ্ট্র ও সমাজের মতো বিশ্বসমাজও গড়ে উঠেছে অসংখ্য স্বাধীন জাতি বা রাষ্ট্রের সমন্বয়ে। আর এ স্বাধীন জাতি বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে মূলত গড়ে উঠেছে বিশ্ব রাজনীতির মূল কাঠামো। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষা ও বিস্তারে সব জাতি ও রাষ্ট্র পারস্পরিক ভৌগোলিক সীমারেখায় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভূমিকা পালন করে। আর এ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা সংশ্লিষ্ট নীতি কাঠামোর সমন্বয়ই বিশ্ব রাজনীতি। এ বিশ্ব রাজনীতি বর্তমান আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থায় গতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্ব সমাজের রীতিনীতি এবং সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষ পথনির্দেশক হিসেবে গড়ে উঠেছে। দৃশ্যত বর্তমান ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল বিষয়টি অনেকটা ব্যাপক ও মিশ্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে এক শীতল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কখনো কখনো ঘটে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকাশ। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির এক প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতির চালিকাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে গণচীন। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে গণচীনই হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ।

বিশ্ব রাজনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ : প্রাচীন গ্রিসের নগরভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছিল তার উপর ভিত্তি করেই মূলত আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রাথমিক ধারণার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৬৪৮ সালে সম্পাদিত 'ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি' এবং ১৮১৫ সালে 'Concept of Europe' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি গতিশীল হয়েছিল। ১৮৮২ সালে জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির নেতৃত্বে Triple Alliance এবং একই সাথে ১৯০৭ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সমন্বয়ে Triple Entente গড়ে উঠেছিল। আর এ পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক জোটের বাস্তবরূপ ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর গড়ে ওঠে 'লীগ অব নেশন্স'। বিশ শতকের '৩০-এর দশকে পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান এবং ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির উত্থান বিশ্ব রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয়। ১৯৩৮ সালে জার্মানি, জাপান ও ইতালির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ, যা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে যে 'United Nations' সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ্ব রাজনীতিতে নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আর এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া দুটি পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল 'উত্তর আটলান্টিক সামরিক চুক্তি সংস্থা' সংক্ষেপে 'ন্যাটো'। সেই থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করে আছে। আর একবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে চীন।

বিশ্ব রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু : বিশ্ব রাজনীতি মূলত গোটা বিশ্ব সমাজের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু অনেকটা বিস্তৃত। পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু ও পরিধি ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এ গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন ও প্রসারে নতুন নতুন জাতি বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত প্যারিস সম্মেলনে বিশ্ব রাজনীতির উপাদান হিসেবে আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, বিশ্ব সংগঠন, প্রশাসনের কর্মকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক আইনকে মূল বিষয় বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া ১৯৫৪ সালে বিশিষ্ট সমীক্ষক ভিনসেন্ট সামরিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহকে বিশ্ব রাজনীতির উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল নীতি হিসেবে আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং কূটনৈতিক বিষয়ের সংযোজনকে অত্যন্ত গভীরভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। 'একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে চীন পারে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে'– এ বিষয়ের আলোকে, চীনকে উপরিউক্ত বিশ্ব রাজনীতির বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। আর সঠিক বাস্তবায়ন হলেই প্রমাণিত হবে উপরিউক্ত উক্তির যথার্থ প্রমাণ।

বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন দেশসমূহ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রভাব বলয় বিস্তারকে কেন্দ্র করে পৃথিবী দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী বিশ্ব। পরস্পর বিরোধী এ জোট বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে এবং তৃতীয় বিশ্বে তাদের প্রভাব খাটাতে উদ্যোগী হয়।

দ্বি-মেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। সাময়িকভাবে হয়ত এর পেছনে সত্যতা আছে, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আর এককভাবে বিশ্ব নিয়ন্ত্রক নয়। মার্কিন প্রভাবের সাথে সাথে ইইউ, জাপান ও চীন বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। জাপান বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি। তাছাড়া ১৯৯২ সালে জাপানের সংবিধান সংশোধন করার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শান্তিরক্ষায় জাপান সৈন্য পাঠাতে পারবে। এর ফলে বিশ্বে জাপানের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তিন মেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু 'সাব-সিস্টেমের' জন্ম হয়, যা বিশ্ব রাজনীতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এ ধরনের সাব-সিস্টেমের মাঝে রয়েছে চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ। চীন একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এখন অনেক বেশি। যদিও বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের অভিজ্ঞতা কম তবুও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীন শীঘ্রই নেতৃত্ব দেবে এ কথা সহজেই অনুমেয়। চীনের পরে আসে ভারতের কথা। ভারত একটি বড় আঞ্চলিক শক্তি। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শক্তিশালী সেনাবাহিনী ভারতের। শিল্প ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে ভারত এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মধ্য এশিয়ার মুসলিম রিপাবলিকগুলোর উত্থান বিশ্ব রাজনীতিতে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।

সর্বোপরি বলা যায়, বিশ্ব রাজনীতি এখন একটি হাতে কুক্ষিগত থাকবে না। সময়ের পরিক্রমায় তার হাত বদল নিশ্চিত। যুক্তরাষ্ট্র তার সব শক্তি দিয়ে ধরে রাখতে চাইবে তাদের নেতৃত্ব আর তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে চীন-জাপান।

বিশ্ব রাজনীতির এক সময়ের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র : বর্তমান বিশ্বকে অনেকে বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক পতন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মার্কিন-সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের অবসান ঘটায়। ফলে বর্তমান বিশ্বে মার্কিন নেতৃত্বে একমেরু বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের বহু সমস্যা ও সঙ্কটে মার্কিন ভূমিকা প্রত্যক্ষ করলে মার্কিন নেতৃত্বে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা প্রতিভাত হয়। তবে অনেকে বিশ্বকে এখনো বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে বিগত চার দশকে বিশ্ব যে মার্কিন ও সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে বিভক্ত ছিল, সোভিয়েত

ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর বিশ্ব এ পূর্ব-পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েছে। ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে বেশ কিছু শক্তিজোট নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছে। আর এসব শক্তিজোটেরই মাঝে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত ব্রিটেন, ফ্রান্সের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শক্তিজোট, যা বর্তমানে ন্যাটোর শীর্ষে অবস্থান নিয়েছে। রাশিয়া, চীন ও ভারতের সমন্বয়ে গঠিত শক্তিজোট, তুর্কি ও পাকিস্তানের শক্তিজোট, জার্মান, জাপান ও ইতালির নেতৃত্বে গঠিত শক্তিজোট প্রভৃতি ইতিমধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজস্ব প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে। তাই, বিশ্বে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের একমেরুকেন্দ্রিক প্রভাব এখন আর নেই।

বর্তমান বিশ্বে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন—এ চারটি নেতৃস্থানীয় শক্তির স্বতন্ত্র আবির্ভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে অনেকাংশে দমিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া জাপান, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশ স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাচ্ছে। এসব বৃহৎ শক্তি ছাড়াও বিশ্বে কতিপয় মধ্যবর্তী শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এ শক্তি আঞ্চলিক পর্যায়ে শক্তিবলয় গড়ে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, ইসরাইল, ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশও বর্তমানে শক্তি মেরুতে রূপ নিচ্ছে। আর এসব দেশের অধিকাংশই আণবিক শক্তির অধিকারী এবং বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে উৎসাহী।

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের যে নেতৃত্বের অবস্থান, তা আর আগের মতো নেই। ইরাক ও আফগানিস্তানে হামলার পর বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ইরাকের উপর এ হামলা নতুন নয়। উপসাগরীয় যুদ্ধবিরতির চুক্তি ইরাক লঙ্ঘন করায় প্রতিশোধ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা চালিয়েছিল। বর্তমানে ইরাককে নিরস্ত্রীকরণের নামে হামলা চালিয়ে লাখ লাখ বেসামরিক লোক হত্যার দায় যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাবে, যা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে ম্লান করে দিচ্ছে।

এসব ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে আরব বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাজতন্ত্র শাসিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন পেলেও র‍্যাডিকেল আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা বাড়ছে। পিএলও, সুদান, লিবিয়া, ইরান, এমনকি জর্ডানও সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত। এতে করে স্পষ্টতই মুসলিম বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন বিরোধী একটি শিবিরের জন্ম হবে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বলেছেন যে, মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আরো একটি কারণে আলোচনার দাবি রাখে। সেটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাতিসংঘকে ব্যবহার করার প্রবণতা। যুক্তরাষ্ট্রের এ ভূমিকা উন্নয়নশীল বিশ্বে আজ বিতর্কিত। উপসাগরীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থে জাতিসংঘকে ব্যবহার করেছিল। সোমালিয়ায়ও ঘটেছে একই ঘটনা কিংবা ইরাকে 'নো ফ্লাইং জোন' গঠন, সৈন্য মোতায়েন, আফগানিস্তানে হামলা এসব ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে ব্যবহার করেছে। মার্কিন বিরোধিতার কারণে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো বৃহৎ শক্তির আক্রমণের শিকার হতে পারে। ইরাক ও আফগানিস্তান তার বড় প্রমাণ। এসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয়, কারণ তারা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ শক্তির বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। জাতিসংঘকে একতরফাভাবে ব্যবহার করাকে বহু রাষ্ট্র সমর্থন করে না। ফলে বহির্বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে গড়ে উঠেছিল একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্র ছিল সেই একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনীতির নেতা। কিন্তু যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট রিগ্যান থেকে শুরু করে সদ্য সাবেক জর্জ বুশ পর্যন্ত সকলেই আলোচিত হয়েছেন নানা প্রশ্নে। মার্কিন সেনাবাহিনী ১৯৮৩ সালে গ্রানাডায় ও ১৯৮৯ সালে পানামায় আক্রমণ চালিয়ে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার মধ্য

দিয়ে যে সমালোচনার ঝড় তুলে ছিল তার অবসান এখনো হয়নি। ফলে মার্কিন বিরোধীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে বিশ্ব রাজনীতির আলোচনায় চলে এসেছে জাপান-চীন-ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতির চাবি কার হাতে থাকবে তা এখন সময়ের প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্রকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছুড়ে দিবে চীন। কারণ তাদের রয়েছে বিপুল জনশক্তি। চীন বিশ্বের বৃহৎ বাজারের অন্যতম। সুতরাং চীনকেই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ভাবাটাই স্বাভাবিক।

চীন বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ : প্রখ্যাত সমীক্ষক Johan Gultung স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশ্বকে বহুমেরুকেন্দ্রিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতার দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের অপর শক্তিসমূহ তার প্রতিপক্ষ হিসেবে গড়ে উঠছে। কালের আবর্তে হয়ত বা কোনো দিন নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে হাজির হবে কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সর্বদা পরিবর্তনশীল।'

Johan Gultung -এর সমীক্ষা আজ বাস্তবতার দোরগোড়ায়। ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশ ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে 'চীন'। গণচীনই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম প্রতিপক্ষ।

'চীন' একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যদিও তা অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করছে। সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতির সাথে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে চীন দেশের অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। যার ফলস্বরূপ চীন আজ বিশ্ব রাজনীতির একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। চীনের রয়েছে ১৩৫ কোটি ৩৬ লাখ (UNFPA-2012) জনশক্তি, বিশ্বের সর্ববৃহত্তম বাজার। আর এ কারণেই চীন বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান অবস্থানে আসতে পেরেছে। চীন সমাজতান্ত্রিক আধুনিকায়নে রাজনৈতিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। দেং জিয়াও পিং চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের জনক। চীন এখন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ ও সস্তায় পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে ইউরোপ ও আমেরিকায় বাজারজাত করছে। চীন তার অর্থনীতিকে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চীনকে এখন 'পঞ্চম ড্রাগন' বলা হয়। বিশ্বব্যাংকের সাবেক এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'অর্থনীতির ক্রমবিকাশে বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের প্রভাব ও ভূমিকা ক্রমেই বাড়ছে। চীন এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে ধীরে ধীরে শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করছে।'

চীনের বর্তমান অবস্থানে আসার প্রধান হাতিয়ার তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। অর্থনৈতিক শক্তি জাতীয় শক্তির অন্যতম উপাদান। অর্থনৈতিক শক্তিকে সামরিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না। বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের সামরিক শক্তি হয়ত অন্য কোনো দেশের চেয়ে এতটা বৃহৎ নয়, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও শক্তিশালী হওয়াতে বিশ্ব রাজনীতিতে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য শক্তিশালী দেশের পাশাপাশি ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ক্ষমতা সামরিক ক্ষমতার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ সামরিক উৎকর্ষ সাধনে অর্থনৈতিক ক্ষমতার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক সামরিক মারণাস্ত্র বিনির্মাণে অর্থনৈতিক উৎকর্ষ প্রয়োজন। তাছাড়া অর্থনৈতিক উৎকর্ষ বিশ্ব রাজনৈতিক উৎকর্ষ সম্ভবপর উপাদান। চীন সামরিক দিক দিয়ে কম শক্তিশালী একটি দেশ কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাশক্তি হওয়াতে বিশ্ব রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তির সমানে

অবস্থান করে। চীন তার সামরিক উপস্থিতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে চলেছে।

চীনের সাথে অন্য দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনেক দেশের যেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তেমনি চীনের সাথে অন্যান্য দেশের বেশ ভালো সম্পর্ক বজায় রয়েছে। পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্ক অনেক দিনের। আন্তর্জাতিক আসরে চীনকে সব সময় পাকিস্তান সমর্থন জানায়। আবার, বর্তমানে চীনের সাথে ভারতের সম্পর্কও ভালো। যদিও পূর্বে ভারতের সাথে চীনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে চীন তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। চীন ভারতের সাথে তার দীর্ঘদিনের বৈরিভাব পরিহার করে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করছে। চীন বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হলেও ব্যাপক অর্থে চীনকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা যায়। চীন কূটনৈতিকভাবে সব সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে অবস্থান করে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে চীনের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির সভায় চীন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে এক অবস্থান গ্রহণ করে। কিছু কিছু দেশ মানবাধিকারের নামে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করে এ অবস্থান সে প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে। ১৯৯৩ সালের জুনে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার সম্মেলনে, ১৯৯২ সালের জুনে রিও ডি জেনিরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে এবং জি-৭৭-এর স্বার্থ সম্বলিত ঘোষণা প্রণয়নে চীন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অবিচলভাবে সমর্থন করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অভিন্ন সাধারণ স্বার্থগুলো চীনকে উন্নয়নশীল দেশের সাথে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে সহযোগিতা প্রদান চীনের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি। ফলে বিশ্বের অনেক দেশের সমর্থন আছে চীনের প্রতি। তাই বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের অবস্থান শক্ত হয়েছে।

চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে কিছুটা হলেও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। চীনের ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের ভূমিকা স্পষ্ট নয়। চীনকে 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত' দেশের মর্যাদা দান সম্পর্কিত চুক্তি কিছুদিনের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। অবশ্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন চীনা নেতৃবৃন্দকে অত্যাচারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সত্তর দশকে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ছিল বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম আলোচিত বিষয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ বিনিয়োগ চীনের বাজারে। মোট বিনিয়োগের প্রায় ৩০% চীনের বাজারে বিনিয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। তাছাড়া চীনের রয়েছে বিপুল জনশক্তি। রয়েছে বিশাল সেনাবাহিনী, যা বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদেরকে স্থায়ী আসন লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

চীন একটা বৃহৎ শক্তি। অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে চীন ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে চীনের প্রভাব বলয়ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীন তার দক্ষিণ সহযোগিতার মডেলের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি তার ভূমিকাকে প্রসারিত করেছে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পূর্বে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে চীন সীমিত ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু বর্তমানে চীন শুধু দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির প্রতিনিধিত্বই করে না, আস্তে আস্তে চীন সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর চীন এ অঞ্চলের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাশিয়ার পক্ষে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি অনুসরণ সম্ভব নয়। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আগামীতে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাবে না। এমতাবস্থায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র চীনই তা পূরণ করতে পারে। চীন তার ভূমিকার

প্রতি সচেতন থেকে ক্রমশ এগুচ্ছে বলে বিশ্ব রাজনীতিতে অবস্থান করে নিচ্ছে। আর সেজন্যই বিশ্ব রাজনীতিতে চীন তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একের পর এক কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের অবস্থানকে মজবুত করতে সহায়তা করছে তাদের সমৃদ্ধ অর্থনীতি। সাথে সাথে রয়েছে বিপুল জনশক্তি, বিশাল বাজার। রয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এসব কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের গ্রহণযোগ্যতা আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে এবং একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতির শীর্ষে অবস্থানের জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিবে, এটা সময়ের ব্যাপার। বর্তমানে কেবল চীনই পারে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিপক্ষ ভাবতে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বর্তমান বিশ্ব মার্কিন নেতৃত্বে এক মেরুকরণ বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠেছে এ কথা যেমন সত্য তেমনি অনেকে আবার নতুন বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে অনেকটা ভঙ্গুর হিসেবে অভিহিত করেছেন। বর্তমান স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, যা অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন অবস্থানকে শক্তিশালীভাবে চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে। আর এ প্রতিপক্ষ হিসেবে সবার আগে যে নামটি আসবে তা হলো 'চীন'। চীন তার অর্থনৈতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে সামরিক শক্তি অর্জন করছে, যা বিশ্ব রাজনীতিতে চীনকে নতুন রূপ দান করেছে। যেহেতু সামরিক উৎকর্ষ সাধনে অর্থনৈতিক ক্ষমতার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন এবং আধুনিক সামরিক মারণাস্ত্র বিনির্মাণে অর্থনৈতিক উৎকর্ষ প্রয়োজন; সেদিক দিয়ে চীন বিশ্বে শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি করবে। কারণ চীনের অর্থনৈতিক ভিত্তি অনেক মজবুত। আর চীনের এ অবস্থা বিশ্বব্যাপী– এ শক্তি প্রয়োগ করে তাদের অবস্থানকে আরো মজবুত করে যাচ্ছে। বর্তমান বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনীতিকে যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন তার অস্তিত্ব পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের ধারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলমান রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে হাজির করছে চীন। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে চীন, হ্যাঁ, একমাত্র চীনই হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪ । সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির গতিধারা পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : ঐতিহাসিকভাবেই মধ্যপ্রাচ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাই বৃহৎ শক্তিগুলো সবসময়ই মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। এর কারণ মূলত, মধ্যপ্রাচ্যের অঢেল তেল সম্পদ, অঞ্চলটির ভূকৌশলগত অবস্থান ও ধর্মীয় গুরুত্ব। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু পূর্বেকার যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব তথা মধ্যপ্রাচ্য বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছে। এর কারণ বহুবিধ হলেও মূল কারণ হলো ক্রমাগত মার্কিন স্বার্থের ওপর সন্ত্রাসীদের আঘাতের প্রেক্ষিতে মার্কিন শাসক গোষ্ঠী ধরেই নিয়েছে যে, এ মুহূর্তে তাদের একমাত্র শত্রু মুসলমানরা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেও মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিবর্তন : উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য ও মিশনারী তৎপরতার মাঝেই সীমিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই

মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক প্রশ্নের সাথে জড়িত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশসমূহের ভাগ্য নির্ধারণ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়ায় প্রেসিডেন্ট উইলসন প্রস্তাব করেন যে, নিরপেক্ষ দেশগুলোর অথবা মিত্র শক্তিবর্গের সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করে সিরিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা উচিত। সিরিয়া, ফ্রান্স এবং ইতালি কোন কমিশনে অংশগ্রহণে অসম্মতিজ্ঞাপন করলে শুধু মার্কিন সদস্য দ্বারা কিং-ক্রেন কমিশন গঠন করা হয়। অবশ্য এ কমিশনের রিপোর্ট তেমন গুরুত্ব পায়নি। তারপর প্রায় দুই যুগ ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার দেশের তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণেই ব্যস্ত ছিল।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে জায়নবাদীরা ব্রিটেন থেকে তাদের সদর দপ্তর আমেরিকাতে স্থানান্তরের পর থেকেই আমেরিকার রাজনীতিতে জায়নবাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে জায়নবাদীরা হ্যারী ট্রুম্যানকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয় তখন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। এ সময় একদিকে সোভিয়েত প্রভাব রোধ ও অন্যদিকে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ এ দুই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়। এ সময় গ্রীসে বামপন্থী সন্ত্রাসীদের তৎপরতা ও এ অঞ্চলে পশ্চিমা স্বার্থ সংরক্ষণে ব্রিটেনের অক্ষমতার প্রেক্ষিতেই ঘোষিত হয় 'ট্রুম্যান নীতি'। এ নীতিতে বলা হয়, অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ অঞ্চলের কোনো সরকার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের আবেদন করলে মার্কিন সরকার তা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে দেখবে। এ নীতির অধীনে গ্রীস ও তুরস্কে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান শুরু হয়।

এরই মাঝে ফিলিস্তিন প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উঠে আসে। এক্ষেত্রে ইসরাইলিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ ও পাশের ক্ষেত্রে ট্রুমান সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের পূর্ণ ব্যবহার করে।

মধ্যপ্রাচ্যের স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মার্কিন সরকার এই এলাকায় স্বীয় প্রভাব রক্ষা ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে 'আইজেন হাওয়ার নীতি' ঘোষণা করে। সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং সম্ভাব্য সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে এ অঞ্চলকে নিরাপদ রাখাই এ সময়কার মার্কিন নীতির মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর এ নীতির সফল বাস্তবায়নে ঐ এলাকায় মার্কিন 'বন্ধু ভাবাপন্ন' কিছু তাবেদার সরকার আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তারা শেখ শাসিত সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্দান ও মরক্কোকে সহজেই হাত করতে সমর্থ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ সকল নীতি ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য এই এলাকায় সামরিক উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে ভূ-মধ্যসাগরে ষষ্ঠ নৌবহর এবং ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা ছাড়াও ওমানের নিকটবর্তী মার্সিয়া দ্বীপে একটি ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতি : ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এতদিন যেখানে যে কোনো নীতিতে মূল বিবেচ্য বিষয় থাকত সোভিয়েত প্রাধান্য মোকাবিলায় তা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। কিন্তু নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত পররাষ্ট্রনীতিতে তখনো মধ্যপ্রাচ্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংকট' তত্ত্বসহ পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে Green Peril -এর পরিবর্তে Red Menance-কে

বিবেচনায় এনে মার্কিনীরা এগুতে থাকে। ফলে মুসলিম বিশ্ব তথা সারা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ও দখলদারিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরই মাঝে মার্কিনীদের পাতা ফাঁদে পা রাখে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। তিনি মার্কিনীদের কুটচালে ২ আগস্ট, ১৯৯০ কুয়েত আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়ে যায়। কেননা আরব দেশগুলোর সাথে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের প্রেক্ষিতে ইসরাইলের অস্তিত্ব ছিল বিপন্নের পথে। অন্যদিকে ইরানের বিপ্লবী সরকার আর ইরাকের সামরিক শক্তির উত্থান এ অঞ্চলে ইসরাইলী ও মার্কিনী স্বার্থের অনুকূলে ছিল না। তাই কাল বিলম্ব না করে মার্কিন-ব্রিটিশচক্র কুয়েত উদ্ধারের মহতী মিশনে সৈন্য সামন্ত ও রণতরী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুয়েত থেকে ইরাক বিতাড়িত হয় কিন্তু কুয়েত তথা গোটা মধ্যপ্রাচ্য চলে যায় মার্কিনী সামরিক তদারকির অধীনে। এভাবেই নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একটি বিরাট পটপরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে—

প্রথমত, সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতারে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য পরাশক্তিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে গৌণ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ইরাকের মতো সেনাশক্তির দেশ মার্কিন আক্রমণে পর্যদুস্ত এবং তার প্রভাবে অন্যান্য দেশগুলো থমকে গেলে ইসরাইলিরা অদম্য স্পৃহায় তাদের মুসলিম নিধন কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে থাকে।

তৃতীয়ত, কৌশলে যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদিনার মতো জায়গায় তাদের সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করে এবং আরেকটি সফল ক্রুসেডের পথ রচনা করতে থাকে। তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্যে।

চতুর্থত, উপসাগরীয় যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। অনেক দেশই মার্কিন ধমকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এদিকে ইরাকের নিষ্ক্রিয়তায় সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা মার্কিন ছত্রছায়ায় একদিকে সৌদি আরব শক্তি সঞ্চয় করে আর অন্যদিকে ইরান মার্কিন বিরোধিতার গতানুগতিক ধারা অব্যাহত রাখে।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির বিশ্লেষণ : সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি ও সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সাম্প্রতিক কালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো সন্ত্রাসবাদ। আর এ সন্ত্রাসবাদের বহিঃপ্রকাশ হলো ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের ঘটনা। এ ঘটনা মার্কিন নীতি নির্ধারক ও রাজনীতিবিদদের মানসকে নানা দিকে চালিত করে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বাদ দিলেও সামরিক বিচারে এটি মার্কিন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও সক্ষমতার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ। তাই এ ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ঘটনার জন্য প্রথমেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে সৌদি বংশোদ্ভূত ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন ও আফগানিস্তানের তৎকালীন তালেবান শাসক গোষ্ঠীর দিকে। এ প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি ও ধারণায় বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

১. যে তালেবান সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে সে তালেবান সরকারের বিরুদ্ধেই তাদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে মার্কিন সুর পাল্টে যায়। ফলে তালেবান সরকারকে হটিয়ে সেখানে হামিদ কারজাইর মতো মার্কিন তল্পীবাহকের নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২. সৌদি আরবসহ বন্ধুভাবাপন্ন মুসলিম দেশগুলো সম্পর্কেও মার্কিনীরা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে। কেননা যে সৌদি আরবে মার্কিনীদের এত সৈন্যসামন্ত রয়েছে, যে সৌদি সরকার মার্কিনীদের

কথায় ওঠে এবং বসে সে সৌদির সন্তান ওসামা বিন লাদেন যদি তাদের এত বড় শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে তাহলে তাদের নীতি ও কৌশল পরিবর্তন সম্পর্কে না ভেবেইবা উপায় কি? যদিও ২ মে ২০১১ মার্কিন হামলায় ওসামা বিন লাদের নিহত হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যেমন মুসলিম দেশগুলোকে চাপ দিচ্ছে অন্যদিকে এ সকল দেশে যেন কোনোভাবেই মার্কিন বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড নাগরিক পর্যায়েও সংগঠিত হতে না পারে সে বিষয়েও নজর রাখছে।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার স্বার্থের প্রধান রক্ষক ইসরাইলের অস্তিত্ব ও পথচলাকে নির্বিঘ্ন করার যতরকম কৌশল আছে সবই প্রয়োগ করছে। এ ক্ষেত্রে ইরাক যুদ্ধে সাদ্দাম সরকারকে উৎখাত ও দেশটি দখল করার ক্ষেত্রে ইসরাইলের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এটা ইসরাইলীদের দীর্ঘদিনের দাবিরই বাস্তবায়ন। শুধু তাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখল সম্পন্ন করার পর পরই ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী সিরিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। আর এমনিতেই মার্কিন সুরে এ দুটি দেশের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির অভিযোগের সুর বেজে ওঠে।

৪. ফিলিস্তিন সমস্যাটিতে মার্কিনীরা শান্তিপূর্ণভাবে দ্রুত সমাধান করতে চাচ্ছে না। ডেটন চুক্তি, রোড ম্যাপ ইত্যাকার ভণ্ডামীর মাধ্যমে বিষয়টিকে জিইয়ে রেখে এ অঞ্চলে তাদের ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত রাখছে। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের সকল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুই হলো ফিলিস্তিন সমস্যা।

৫. সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রতিবাদ ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইসরাইলি আগ্রাসী বাহিনী ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ হতে ২২ দিন ধরে গণহত্যা চালায় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায়। ৮ জুলাই ২০১৪ ইসরাইল Operation Protective Edge নামের সাংকেতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা চালায়। বিশ্ববিবেকের সব আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করে বর্বর ইসরাইলি হামলায় কোনোকিছুই অক্ষত থাকেনি। ফিলিস্তিনের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হাঁমাসের সদস্যদের 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে তাদের নির্মূলের অভিযানে নিরস্ত্র নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করে গাজা উপত্যকাকে ইসরাইল পরিণত করে মৃত্যুপুরীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ঘটনায় উল্টা হামাসকে একচেটিয়াভাবে দোষারোপ করে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যায়, যা তাদের পূর্ববর্তী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়,

প্রথমত, মার্কিনিরা বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের বন্ধুদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছে না। কেননা বন্ধুদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও ক্রমবর্ধমান গণঅসন্তোষ জনগণের মাঝ থেকেই মার্কিন স্বার্থবিরোধী গোষ্ঠীর উদ্ভব হচ্ছে যা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও মার্কিনীদের আঘাত করছে।

দ্বিতীয়ত, ইরান, সিরিয়াসহ কিছু দেশ যখন মার্কিন সামরিক উপস্থিতি সত্ত্বেও মার্কিনী অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে না তখন সামরিক উপস্থিতিকে আর যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। তাই নানা ছুঁতায় এ অঞ্চলে সরাসরি ঔপনিবেশিক মডেলে দেশ দখলের প্রক্রিয়া অনুমোদন করছে। এ প্রক্রিয়ায় আফগানিস্তান ও ইরাকে দুটি অভিযানও ইতিমধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, বৃহৎ শক্তিবর্গ যখন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের কারণে প্রান্তীকরণ (Marginalijation)-এর শিকার তখন তারা মার্কিন আবদারে সাড়া না দেয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়েই বিকল্প পথ অনুসরণ করে। আর তাই তারা নিরাপত্তা পরিষদে কাঙ্ক্ষিত প্রস্তাব পাস করাতে ব্যর্থ হয়ে জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়েই ইরাক আক্রমণ করে বসে।

অবশ্য অনেকের আশঙ্কা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন অবস্থান কোনো মতেই তাদের জন্য সুখকর হবে না।

০৫ ॥ সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে রাশিয়ার বৈদেশিক সম্পর্কের একটি বাস্তব চিত্র বর্ণনা করুন।

অথবা, **ইউক্রেন সংকটের প্রেক্ষিতে রাশিয়ার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক আলোচনা করুন।**

উত্তর : সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত ঘটনাবলির মধ্যে ইউক্রেন সংকট অন্যতম। রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ ইউক্রেন। ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ক্রিমিয়া। ১৭৮৩ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়া রাশিয়ারই অংশ ছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চও রুশ ভাষাভাষী ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে। কিন্তু সাম্প্রতিক নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্রিমিয়া দখলে নেয় রুশ সেনারা। ক্রিমিয়া যুক্ত করে নেওয়াসহ ইউক্রেনে রাশিয়ার কথিত হস্তক্ষেপের কারণে বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে রাশিয়ার বৈদেশিক সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে।

সাম্প্রতিক ইউক্রেন সংকট ও রাশিয়া : ইউক্রেনের রুশভাষী পূর্বাঞ্চলের শহরগুলো রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দখল করে নেওয়ার পর ইউক্রেন সরকার তাদের হঠাতে সামরিক অভিযান শুরু করলে ইউক্রেনে সংকটের সূত্রপাত ঘটে। নিচে সাম্প্রতিক ইউক্রেন সংকট ও রাশিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত :** ব্যাপক দুর্নীতিতে পতিত সরকার পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মস্কোর সাথে অযাচিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ক্ষমতা হারান ভিক্টর ইয়ুশ্চেনকো। এরপর ২০১০ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হন ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ। ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত। তাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইয়ানুকোভিচের জয়ে রাশিয়া খুশি হলেও পশ্চিমা বিশ্ব খুশি হতে পারেনি।

২. **রুশ নৌঘাঁটির ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি :** ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিজয়ী হওয়ার পর ২৭ এপ্রিল ২০১০ সেভাস্তোপোলে রুশ নৌঘাঁটির ইজারার মেয়াদকাল বৃদ্ধি করেন ২০৪২ সাল পর্যন্ত। এতে করে মস্কো-কিয়েভ সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উপনীত হয়। যা পশ্চিমা বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. **ইইউ এর সাথে বাণিজ্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান :** দীর্ঘ দিনের বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ইউক্রেনের। কিন্তু ২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়ার কাছ থেকে দেড় হাজার কোটি ডলার ঋণ নেওয়ার চুক্তিতে উপনীত হয় ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ। ফলে চুক্তি বিরোধীদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে।

৪. **চুক্তি বাতিলের দাবি :** প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের বাণিজ্য চুক্তির সিদ্ধান্ত পশ্চিমাপন্থীরা মেনে নিতে পারেনি। ফলে তারা রাশিয়ার সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে চুক্তি পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে। আর এ আন্দোলনে মদত যোগায় পশ্চিমা দেশগুলো।

৫. **ইয়ানুকোভিচের পতন :** ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ছেড়ে রাশিয়ায় চলে যান। গণঅভ্যুত্থানে রাশিয়াপন্থী প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচের পতনের পর দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যা শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

৬. **ক্রিমিয়া রাশিয়াভুক্ত :** ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত ছোট দ্বীপ ক্রিমিয়া। রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ রাশিয়া পালিয়ে গেলে ক্রিমিয়া দখলে নেয় রুশ সেনারা। রাশিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নে ক্রিমিয়ায় ২০১৪ সালের মার্চ মাসে গণভোট হয়। গণভোটে ৯৬ দশমিক ৬ শতাংশ ভোটার রাশিয়ার সাথে ক্রিমিয়া যুক্ত হওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। ফলে রাশিয়ার সাথে যুক্ত হয় ক্রিমিয়া। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব এ গণভোট মেনে নেয়নি।

৭. **পেরোশেঙ্কোর নতুন চুক্তি :** ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের পতনের পর ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন পশ্চিমাপন্থী পেত্রো পেরোশেঙ্কো। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর পেরেশেঙ্কো ২৭ জুন ২০১৪ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে মুক্তবাণিজ্য ও রাজনৈতিক সহযোগিতাবিষয়ক এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে রাশিয়া ইউক্রেনের উপর নাখোশ হয় এবং ইউক্রেন নতুন করে সংকটের মুখে পতিত হয়।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলির (ইউক্রেন সংকট) প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে রাশিয়ার বৈদেশিক সম্পর্ক : রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া দখলের প্রেক্ষিতে পশ্চিমা দেশগুলোর উস্কানিতে ইউক্রেন সরকার ও রুশপন্থী বিদ্রোহীদের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং ১০ লাখ লোক বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই পরিস্থিতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়াকে দায়ী করে রাশিয়ার সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্ধত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :** ইউক্রেন সংকটে রাশিয়ার সাথে বৈদেশিক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি চিড় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

i. **বিমান মহড়া বাতিল :** ইউক্রেন সংকটকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত একটি বিমান মহড়া বাতিল করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির নর্থ আমেরিকান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (নোরাড) এর তথ্য মতে, ইউক্রেনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের কারণে ঐ মহড়া বাতিল করা হয়েছে। আলাস্কার কাছে অনুষ্ঠেয় এ বিমান মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও রাশিয়ার অংশগ্রহণের কথা ছিল। নোরাডের মুখপাত্র সার্জেন্ট চার্লস মার্শের মতে, ইউক্রেন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার এ মহড়া বাতিলের সিদ্ধান্ত দেন।

ii. **দ্বিপাক্ষিক সামরিক সম্পর্ক স্থগিত :** রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি অবস্থান নেয় ইউক্রেন সংকটকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন থেকে সেনা প্রত্যাহারের আবেদন জানায় রাশিয়াকে। কিন্তু রাশিয়া সেনা প্রত্যাহারের এ আবেদন নাকচ করে দেয়। ফলে রাশিয়ার সাথে সামরিক পরিকল্পনা, সেনা ঘাঁটি পরিদর্শন, দ্বিপাক্ষিক সামরিক সম্পর্কের বিষয়গুলোসহ সব ধরনের সামরিক সম্পর্ক স্থগিত করে যুক্তরাষ্ট্র।

iii. **ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর হুমকি :** ক্রিমিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করে ক্রিমিয়া দ্বীপটি ইউক্রেনের নিকট ফিরিয়ে দিতে রাশিয়াকে আহ্বান জানায়। এ আহ্বানে সাড়া না দিলে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর হুমকি দেয়। কিন্তু এ হুমকি উপেক্ষা করে রাশিয়া ইউক্রেন থেকে সেনা প্রত্যাহারের আবেদন নাকচ করে দেয়।

iv. **অবরোধ আরোপ :** রাশিয়ার সাথে ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্তি এবং ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়ার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। ফলে ২০১৪ সালে রাশিয়ায় তেলের দরপতন ঘটে। এতে করে ডলারের বিপরীতে রুবলের মূল্যমান প্রায় ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

২. **ফ্রান্স :** পূর্ব ইউক্রেনে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার কারণে ফ্রান্স তার নিজের তৈরি দুইটি মিস্ট্রাল ক্লাস যুদ্ধ জাহাজ রাশিয়ার নিকট সরবরাহ করতে সংকটে পড়ে। তাই নিজের অর্থনীতি সামাল দিতে ফ্রান্স ইউক্রেন সংকট নিরসনে অগ্রসর হয়। একদিকে দেড় বিলিয়ন ডলারের চুক্তি, অন্যদিকে বিশ্ব মিত্রদের এড়িয়ে রাশিয়ার নিকট অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সরবরাহের জন্য ফ্রান্স মরিয়া হয়ে রাশিয়ার পক্ষ নেয়।

৩. **বেলজিয়াম :** বেলারুসের রাজধানী মিনস্কে অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ইউক্রেন স্বাক্ষর করে। আর চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই বেলজিয়াম রাশিয়ার উপর নতুন অবরোধ আরোপ করে।

৪. **যুক্তরাজ্য :** ইউক্রেন সংকটের প্রেক্ষিতে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা খাত, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি খাত এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সহযোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এতে রাশিয়া নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

৫. **ন্যাটোভুক্ত দেশ :** ইউক্রেনের সংঘাত পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সাথে রাশিয়ার সম্পর্কে চিড় ধরিয়েছে। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর অভিযোগ, রাশিয়া ইউক্রেনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতা করার জন্য তার সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে। কেউ কেউ এটাকে গোপন আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছে। রাশিয়া এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ইউক্রেনের পশ্চিমাপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে উল্টা আগ্রাসনের অভিযোগ আনে।

পরিশেষে বলা যায়, ইউক্রেন সংকটের প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালের শেষদিকে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু উভয়পক্ষ এ চুক্তি ভঙ্গ করলে ইউক্রেনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে ও রাশিয়ার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বৈদেশিক সম্পর্ক ভালো করতে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ নতুন করে শান্তি সম্মেলনে বসে রাশিয়া, ইউক্রেন, জার্মানি ও ফ্রান্স। ইউরোপের জটিলতম এ সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ইউক্রেনের সরকারি বাহিনী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় যুদ্ধ বিরিত চুক্তি, যা কার্যকর হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে। মিনস্কের এ শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘর্ষিত এলাকা থেকে ভারী অস্ত্র-সস্ত্র সরিয়ে নেয় উভয়পক্ষ। এছাড়া সব বন্দীকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারেও দুপক্ষ সম্মত হয়। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে আশা করা হচ্ছে, রাশিয়ার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বৈদেশিক সম্পর্কও ভাল দিকেই যাবে।

০৬ ▮ সুয়েজ সংকটের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : ঔপনিবেশিক শাসনের চরম মাত্রায় আরোহনকারী যে দেশটি এক সময় সারা পৃথিবীতে তাদের প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করেছিল, যে দেশটি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিক থেকে পরাক্রমশালী ছিল, সেই দেশটির মধ্যপ্রাচ্যে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে রচিত হয় এক বিরাট পরিবর্তনের ইতিহাস। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় দেশটির সমৃদ্ধ রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির এবং বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কে আসে পরিবর্তন। সুয়েজ সংকটে নীতিগতভাবে পরাজয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী যুক্তরাজ্য পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত তার উপনিবেশগুলোতে শাসনক্ষমতা হারিয়ে দুটি দ্বীপের মধ্যে তার শাসন সীমাবদ্ধ থাকলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যুক্তরাজ্য আজও পরাশক্তিদের একটি এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ সদস্যের একটি। এ ছাড়াও দেশটি জি-৭, জি-২০, ন্যাটো, ওইসিডি, ডব্লিউ. টি. ও, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল এবং কমনওয়েলথ এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে।

যুক্তরাজ্যের পরিচিতি : দুটি দ্বীপের চারটি রাজ্য নিয়ে যুক্তরাজ্য গঠিত। গ্রেট ব্রিটেনের ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস আর আইরিশ দ্বীপের নর্দান আয়ারল্যান্ড এ চারটি রাজ্যকেই একত্রে যুক্তরাজ্য বলা হয়। ২,৪৪,৮২০ বর্গকিমি ক্ষেত্রফলের এ দেশটিতে বর্তমানে ৬ কোটি ৩৫ লাখ লোকের বাস। যাদের প্রায় ৭০ শতাংশ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের। দেশটির উত্তরে উত্তর সাগর, পূর্ব-দক্ষিণে উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেল এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে যুক্তরাজ্য একটি অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঐ সময়ে ইউরোপে একক কোনো সুপার পাওয়ার ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল, যা চতুর্দশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর ইতিহাস পড়লে খুব ভালোভাবে জানা যায়। তারপর ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরাজয় পর্যন্ত ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের ইউরোপে কেমন সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময়ের মধ্যে একক শক্তি হিসেবে যুক্তরাজ্যের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। একমাত্র ১৭৭৫-১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংঘটিত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়া যুক্তরাজ্য কোনো ইউরোপীয় দেশের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়নি। ইউরোপের কোনো দেশের সাথে যুক্তরাজ্যের কোনো প্রকার মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল না, আর তা না থাকার কারণ হলো বহির্বিশ্বে কলোনি স্থাপন করতে গিয়ে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, স্পেনের সাথে তার ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্ক থাকার কারণে উপর্যুক্ত দেশগুলো আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করে ব্রিটেনকে পরাজিত করে। ঐ সময়ে দেশটির নিরাপত্তার প্রধান শক্তি ছিল তার রাজকীয় নৌবাহিনী। তার রাজকীয় নৌবাহিনী দেশকে বহিশত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার সাথে সাথে বহির্বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে লর্ড স্যালিসবেরি নামে একজন বিখ্যাত পররাষ্ট্র ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যার যোগ্য নেতৃত্বে ব্রিটেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল যা ১৯২০-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। ঐ ১৯০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বৈশ্বিক রাজনীতিতে যুক্তরাজ্য ছিল সুপার পাওয়ার।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতেই ব্রিটেন তার চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতাবাদকে ইতি ঘোষণা করে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। বিংশ শতাব্দী শুরুতে এসে জার্মানি যেভাবে তার সামরিক শক্তি জোরদার করেছিল এবং বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়েছিল তাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী তিনটি দেশ নিজেদের মধ্যে বিরাজমান যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভুলে তারা একটি আঁতাত গঠন করে। এটি 'ত্রিশক্তি আঁতাত' নামে পরিচিত। যুক্তরাজ্যে এজন্য চিরশত্রু ফ্রান্সের সাথে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এবং রাশিয়ার সাথে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আঁতাত সম্পর্কিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। জার্মানবিরোধী জোট হিসেবে এ ত্রিশক্তির আঁতাত দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যায়, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক সাথে লড়াই করে জার্মানদের পতন ঘটায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্যের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একটি 'বিশেষ সম্পর্ক' স্থাপিত হয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্নায়ুযুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

১৯৫৬ পরবর্তী যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটায় যুক্তরাজ্য শাসিত বিশ্বব্যাপী উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হতে থাকলে দেশটি কলোনিগুলোতে তার ক্ষমতা হ্রাস করে। ফলশ্রুতিতে উপনিবেশগুলো আস্তে আস্তে স্বাধীন হয়ে যায়। তবে ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয় সেখানে মিশরের প্রেসিডেন্ট

গামাল আবদেল নাসের এর নিকট যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মৈত্রী জোট অপমানজনকভাবে পরাজিত হয়। যদিও এ পরাজয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষত মার্কিন সরকারের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। আর এ পরাজয়ের মাধ্যমেই বিশ্ব পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাজ্যের স্থায়ীভাবে পতন হয় এবং তার অধিকৃত কলোনিগুলোর প্রায় সবগুলোই স্বাধীন হয়ে যায়। তারপরেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইরাকে এবং ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত পারস্য উপসাগরীয় ও আরব সাগরীয় এলাকার শেখশাসিত অঞ্চলগুলোতে ব্রিটিশ প্রভাব স্মর্তব্য।

বর্তমান সময়েও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের সাথে কয়েকটি দেশের সাথে বিদেশে অবস্থিত দেশটির অধিকৃত টেরিটরি নিয়ে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। যেমন— জিব্রাল্টার টেরিটরি (জিবাল্টার প্রণালী নয়) নিয়ে স্পেনের সাথে, ভারত মহাসাগরে অবস্থিত চাগোজ দ্বীপপুঞ্জ ও দিয়াগো দ্বীপ নিয়ে মৌরিশাসের সাথে, ফকল্যান্ড, সাউথ জর্জিয়া ও সাউথ স্যান্ডউইস দ্বীপগুলো নিয়ে আর্জেন্টিনার সাথে ব্রিটিশ সরকারের তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পরাশক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান খোয়ানোর পর ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্সের সাথে যৌথভাবে শক্তিশালী সামরিক জোট গঠন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তার উপস্থিতিকে টিকিয়ে রেখেছে। দীর্ঘ বিতর্কের পর দেশটি ১৯৭৩ সালে ইউরোপিয়ান সাধারণ মার্কেট বর্তমান সময়ের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগদান করলে ১৯৯৯ সাল থেকে চালু হওয়া ইউরো মুদ্রা তারা গ্রহণ করেনি, ফল হিসেবে ২০১১ সালে ইউরোপিয়ান-ইউনিয়নে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলেও দেশটি নিজেদেরকে তা থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

২০০৮ এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় টনি ব্লেয়ার সরকারের ১০ বছরের শাসনামলে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় ছিল মুখ্য। যথা—

i. সক্রিয় হস্তক্ষেপবাদী দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা।

ii. যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি শক্তিশালী মৈত্রী গড়ে তোলা এবং

iii. ব্রিটেনকে ইউরোপের কেন্দ্রে স্থান করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

আমেরিকার সাথে শক্তিশালী মৈত্রী জোট গঠন ও ইউরোপের কেন্দ্রে নিজের অবস্থানকে সমুন্নত রাখার ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী হলেও হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত যে নীতি তা একেবারেই নতুন।

আর নতুন এ হস্তক্ষেপ নীতির ধারাবাহিকতায় দেশটি যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে একাট্টা হয়ে ২০০১ সালে আফগানিস্তান, ২০০৩ সালে ইরাকে হামলা চালায়, ২০০৯ সাল থেকে ইরানের পরমাণু ইস্যু নিয়ে ব্যাপকভাবে বাড়াবাড়ি, আরব বসন্তের সময় ২০১১-এ লিবিয়ায় হস্তক্ষেপ এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইরাক-সিরিয়ায় আইএসকে কেন্দ্র করে সংকট সমাধানে আমেরিকার সাথে জোট বেধে হস্তক্ষেপ ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন রূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, এককালের পরাশক্তি ব্রিটেন চুনো পুঁটিতে পরিণত হয়। কিন্তু বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে অবগত থাকা এবং এককালে সারা পৃথিবীকে শাসন করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তারা আর চুনো পুঁটি হয়ে থাকেনি। প্রয়োজনের তাগিদে সাম্প্রতিক পরাশক্তিসহ অন্যান্য দেশের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বে তারা তাদের একটি সম্মানজনক অবস্থা টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের কারণে বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পুরাতন উপনিবেশবাদের বদলে বিশ্বায়নের নামে নতুন উপনিবেশবাদের জন্ম হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্র এর বদলে স্থান করে নিয়েছে পুঁজি। উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক জোট ও মুক্তবাজার কৌশলের মাধ্যমে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর আধিপত্যে চেপে বসছে। এ আধিপত্যবাদী দেশগুলোর একটি হিসেবে ব্রিটেনের পরিচিতি আজ আর কারো কাছে লুকানো নয়।

০৭। গণচীনের পররাষ্ট্রনীতির অতীত ও বর্তমান এবং এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর থেকে গণচীন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পেয়ে আসছে। বর্তমানে চীন যেমন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সদস্য, তেমনি চীনের অর্থনীতিও যথেষ্ট শক্তিশালী। চীনের শক্তিশালী কমিউনিস্ট সরকার, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ অবস্থান, বহির্বিশ্বের গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক ও সংঘাত ইত্যাদি কারণে এর পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

মাও সে তুং-এর ভাবধারার অনুসৃতি : দীর্ঘদিন চীনের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপক প্রভাব বজায় রাখার পর ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে মাও সে তুং পরলোকগমন করেন। এবং ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চীনের বিদেশনীতি মাও উদ্ভাবিত ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়।

মাও তার জীবনের শেষ দিকে 'তিনটি বিশ্বের কৌশলগত পৃথকীকরণ' (Strategic Differentiation of the Three World) শিরোনামের একটি নীতি ব্যাখ্যা করেন। এতে তিনি গোটা বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তার মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই সাম্রাজ্যবাদী এবং পররাজ্যলোভী অত্যাচারী রাষ্ট্র, যারা বিশ্বব্যাপী নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিরন্তর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ দেশ দুটিকে মাও প্রথম বিশ্বরূপে চিহ্নিত করেন। দ্বিতীয়ত, চীন হচ্ছে সে সকল অনুন্নত ও শোষিত জাতির অন্তর্ভুক্ত যারা 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে পরিচিত। তৃতীয়ত, জাপান, পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মধ্য পর্যায়ের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো মিলে গঠন করেছে মধ্যবর্তী স্তরের দ্বিতীয় বিশ্ব। এ ধরনের রাষ্ট্রগুলো একদিকে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে শোষিত ও নিপীড়িত করার ব্যাপারে অংশ নিচ্ছে, অন্যদিকে নিজেরা প্রথম বিশ্বের পররাজ্যপ্রয়াসী মহাশক্তিধর রাষ্ট্র দুটি দ্বারা শোষিত হচ্ছে। মাও-এর উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে জগৎসভায় জাতি হিসেবে চীনকে এক অনবদ্য শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বা তৃতীয় মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

মাও পরবর্তী যুগ : পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোনো দেশই কোনোকালে দৃঢ় রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়নি। মাও-পরবর্তী চীনের নতুন নেতাদের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি এ সত্যটিকে প্রকট করেছে। মাও সে তুং-এর পর হুয়া গুফেং, দেং জিয়াও পিং নেতৃদ্বয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে কোনো রাজনৈতিক আদর্শের (কমিউনিস্ট বা পুঁজিবাদী) ভিত্তিতে বিভক্ত করার যুক্তি খুঁজে পাননি। বরং ঐ বিশ্বের সকল দেশকেই 'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার' (New International Economic Order) দাবিতে এবং অনুরূপ অন্যান্য আরো বৈষয়িক উন্নতির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলে মনে করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বের প্রসঙ্গে বলা হলো যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপ থেকে সাহায্য নেওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। প্রথম বিশ্বের ব্যাখ্যায় প্রথমে মার্কিন-সোভিয়েত উভয়কেই সাম্রাজ্যবাদী ও পররাজ্যগ্রাসী নামক একই বন্ধনীতে রাখা হলেও ক্রমশ এ তত্ত্ব পরিবেশিত হতে লাগলো যে পুরনো, জরাজীর্ণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় নতুন এবং উদীয়মান সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আরো বেশি বিপজ্জনক।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীনের এ বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পেছনে মূল কারণ ছিল চীন-সোভিয়েত সীমান্ত দ্বন্দ্ব। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত তা নিয়ে কয়েকশ বছর ধরে বিরোধ

চলছিল। ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এ বিরোধ হিমাগারে চলে যায়। কারণ তখন দেশ দুটি আদর্শগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। নতুন করে বিরোধ শুরু হয় মাও কর্তৃক নতুন সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের সমালোচনা করার পর থেকে। এ সময় মানচুরিয়া-জিন জিয়াং সীমানা বরাবর বিপুলসংখ্যক সোভিয়েত সৈন্য সমাবেশ করার ফলে সোভিয়েত ও চীন সেনাবাহিনীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংঘর্ষও ঘটে।

আশির দশকের শেষ দিক থেকে অনুসৃত নীতি : ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াং গর্বাচেভ প্রদত্ত একটি শীর্ষ বৈঠক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী লি পেং গর্বাচেভ প্রবর্তিত উদারনৈতিক পন্থার ও সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদির প্রশংসা করেন। তারপর ১৯৮৯ সালের মে মাসের গর্বাচেভ চীনে শুভেচ্ছা সফরে গিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলার কথা বলেন।

১৯৮৮-এর শেষ দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক উদারনৈতিক ও খোলানীতির কর্মসূচি অনুসরণ করার পর সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্ট দেশগুলোতে সংকট দেখা দিতে শুরু করে। পূর্ব ইউরোপের সব কয়টি কমিউনিস্ট দেশ থেকে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সকল ঘটনা এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চীনের গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে গণবিক্ষোভ, এ উভয়বিধ ঘটনা চীনের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতিতে আশির দশকের শেষ দিক থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সে পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ :

১. ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের আমন্ত্রণে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চীনে গিয়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী লি পেং ও অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং অন্যান্য পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার আদান-প্রদান সুষ্ঠু ও সুগম করে তোলাই ছিল ঐ বৈঠকের উদ্দেশ্য। ১৯৫৪ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শেষবারের মতো চীন সফরে গিয়েছিলেন। তার দীর্ঘ ৩৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাজীব গান্ধীর চীনে পদার্পণ ঘটে।

২. ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর চীন ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৩. ১৯৯১ সালের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে এক-একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর রুশ ফেডারেশনসহ প্রতিটি রাষ্ট্রকে চীন স্বীকৃতি দান করে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে চীন ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আয়োজিত মস্কোতে অনুষ্ঠিত ইসরাইল ও পশ্চিম এশিয়ার ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর শান্তি বৈঠকে যোগদান করে। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে দীর্ঘ ৪৭ বছর পর দক্ষিণ কোরিয়াকে চীন স্বীকৃতি প্রদান করে এবং সে রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৪. জাতিসংঘের মানবহিতকর ও সেবামূলক কাজেও চীন এগিয়ে আসে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাস থেকে কম্বোডিয়ার বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থামিয়ে দিয়ে শান্তিরক্ষাকল্পে সেখানে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষীবাহিনী পাঠানো হয়। চীন তাতে অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘের কোনো শান্তিরক্ষী বাহিনীতে গণচীনের অংশগ্রহণ এটিই প্রথম।

৫. আন্তর্জাতিক স্তরে পূর্বোক্ত পরিবর্তনসূচক নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চীন তার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালের ৪ জুন তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রকামী ছাত্র বিক্ষোভের উপর ট্যাংক উঠিয়ে দিয়ে এক অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। পরে চীন ঐ ধরনের ঘটনার কোনো পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে বরং খানিকটা গণতন্ত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে চীন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক চীনা আইনসভা জাতীয় গণকংগ্রেসের এক অধিবেশনে এ মর্মে অভিমত দেন যে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে ঠিকই, কিন্তু প্রধানত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে। তিনি আরো মন্তব্য করেন, নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন রাজনীতি, নতুন বিষয় প্রভৃতি আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে যে সকল ধ্যান-ধারণা বাধার সৃষ্টি করছে, সে সকল ধ্যান-ধারণা থেকে মনকে মুক্ত করে সেগুলোকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

চীনের পররাষ্ট্রনীতির বর্তমান অবস্থা এবং এর কিছু সীমাবদ্ধতা : বিশ্বের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী, যার প্রায় সবটাই ন্যূনতম শিক্ষিত, চতুর্থ বৃহত্তম ভূখণ্ড এবং দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীন। এর রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক বাহিনী এবং অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এতগুলো সুবিধা থাকলে যে কোনো দেশের পক্ষেই একটি কর্তৃত্ববাদী পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করা কঠিন নয়। বিশ্বের শক্তিসমূহ চীনের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ফলে যে কোনো ক্ষেত্রে চীনের সাথে আলাপ-আলোচনায় তার গুরুত্ব দিয়েই তা করতে হয়। বর্তমান চীনের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীর সমর্থন নিয়ে তাইওয়ানকে চীনের অঙ্গীভূত করা। এ পথে চীন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় পাঁচ ডজন দেশ তাইওয়ানকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশরূপে স্বীকার করতো। বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার কিছু অংশ ছাড়া বাকি বিশ্ব তাইওয়ানকে চীনের অংশ মনে করে।

চীনের পররাষ্ট্রনীতির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, তিব্বত নিয়ে দুনিয়ার কোথাও যেন হৈ চৈ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এ বিষয়ে চীন সম্পূর্ণ সফল। ১৯৫১ সালে তিব্বত দখলের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘদিন যাবৎ তিব্বতে চীনাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে তীব্র অভিযোগ করে আসছিল। আজকাল আর তিব্বত নিয়ে কাউকে আলাদা করে কিছু বলতে শোনা যায় না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশের চীনের বহুদিনের ইচ্ছা পূরণের পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্বীকৃতি দূর হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে চীনকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে Most Favoured Nation-এর মর্যাদা স্থায়ীভাবে দেয়া হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশকে দিয়ে থাকে।

চীনের এশিয়ান নীতিতে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, মিয়ানমার—এ তিনটি দেশের সাথে চীনের উষ্ণ সম্পর্ক পশ্চিমা বিশ্বে বিভিন্ন রকম প্রশ্নের সম্মুখীন। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক চীন এবং বাংলাদেশ উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমালোচনামুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, চীনের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা তার অভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ। তা না হলে আধুনিক চীনের যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ঘনিষ্ঠ মিত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে এতো মতবিরোধ ঘটতো না। বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের তীব্র মতবিরোধ আগামীতে দুটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ চীন কিভাবে মোকাবিলা করে তাই এখন দেখার বিষয়।

০৮ ▌ অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি হিসেবে সাম্প্রতিক চীনের আবির্ভাব পশ্চিমা বিশ্ব ও এশীয় অঞ্চলে পশ্চিমাদের দালাল রাষ্ট্রগুলোর যে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : চীনা জাতির একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফসল হিসেবে দেশটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি। গত এক দশকে বিশ্ব অর্থনীতির চেহারা অনেকটাই পাল্টে গেছে। বিশ্ববাজারে যেমন একদিকে চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যদিকে দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়িয়ে গেছে ইউরোপ, আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ দেশগুলোকে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় দেশটি ২০১০ সালে জাপানকে পিছনে ফেলে বিশ্ব অর্থনীতির দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। গত পাঁচ বছরে দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১০% এর মধ্যে অবস্থান করেছে যেখানে আমেরিকার ৩% এর মধ্যে ছিল। যার ফল হিসেবে ২০১৪ এর শেষের দিকে আইএমএফ এক জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে Parchasing Power Parity বা জীবন মানের খরচের ভিত্তিতে চীনকে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশটি সামরিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। যা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ পশ্চিমাদেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যালেন্স অব পাওয়ার বা শক্তির ভারসাম্য বিরাজ করছিল তা ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চীনের এ রকম উত্থান আমেরিকার একক পরাশক্তির খেতাবকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। একই সাথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাবশালী দেশগুলোর সাথে সমুদ্রসীমা, স্থলসীমা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামরিক শক্তিসহ অন্যান্য স্বার্থ নিয়ে দেশটির সাথে দ্বন্দ্বমুখর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

চীনের পরাশক্তি হিসেবে উত্থানের ইতিহাস : চীনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে গত কয়েক দশকে। আশির দশকের আগেও বিশ্ব অর্থনীতিতে দেশটির প্রভাব ছিল খুবই নগণ্য। জিডিপি প্রবৃদ্ধিও যেমন খুব কম ছিল তেমনি দারিদ্র্যের হারও অনেক বেশি ছিল। বিশাল আকারের জনসংখ্যার ভার সামলানো দেশটির জন্য ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তবে ১৯৭৮ সালে গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কারনীতির পর থেকেই অবস্থা পাল্টে যেতে থাকে। নীতিটি সম্পর্কে তখন সমালোচনাও ছিল প্রচুর। বিশেষ করে চীনের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের হঠাৎ করে পুঁজিবাদী নীতির দিকে ঝুঁকে পড়াকে দেশটির অর্থনীতিবিদেরা ভালো চোখে দেখেনি। ঐ নীতির মাধ্যমে চীনের সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দেশটি বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট বরাদ্দ রেখেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এসব ছাড়াও কৃষকদের জন্য জমির মালিকানা এবং ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুফল বুঝিয়ে দেওয়া, দেশের উপকূলবর্তী ৪টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অর্থনৈতিক জোন স্থাপন করা হয়েছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা, প্রযুক্তিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা। সাধারণ নাগরিকদেরকে তাদের নিজ নিজ ব্যবসা পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছে মোটা অঙ্কের প্রণোদনা। ফলাফল হিসেবে চীনের অর্থনীতিই যে শুধু লাভে লাভে এগিয়েছে তা নয়, দারিদ্র্যের হারও কমেছে অভাবিত হারে, বেড়েছে জীবনযাত্রার মান। দেশটির সরকারি হিসাব মতে, ১৯৮১ সালে যে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৩% সেটি ২০০৫ সালে এসে দাঁড়ায় ২.৫%। দেশটির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে ২০০৯ সালের পর থেকে। ঐ সময়ে এসে চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মতো বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর সাথে দাঁড় করিয়ে দেয়। ইউরোপকে অনেক আগে ছাড়িয়ে গেলেও বিশ্ব অর্থনৈতিক পরাশক্তি আমেরিকাকে অতিক্রম করে ২০১৪ সালের শেষের দিকে।

চীনের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির কারণ : চীনের অর্থনীতির সাম্প্রতিক যে অগ্রগতি সেটার জন্য দেশটিকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি যে ১৯৬২ সালে ভারতের অরুনাচল রাজ্যের দাবি নিয়ে চীন-ভারত যুদ্ধ ছাড়া আর বড় ধরনের কোনো যুদ্ধে নিজেদেরকে জড়ায়নি। আমেরিকার সাথে স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে রাশিয়ার অর্থনীতি, সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন ভেঙে খান খান হয়ে যায় তেমনি একক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ২০০০ সালের পর থেকে আজও বিশ্বে সংঘটিত যুদ্ধের ৮০% সরাসরি নিজেদের জড়িত রাখার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি দেউলিয়াপনার পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু সামরিক শক্তির ফাঁপরের কারণে হয়তো বিশ্ববাসীর কাছে সঠিক চিত্রটি প্রতীয়মান হয় না। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রসঙ্গটি এখানে এ কারণেই আনা হলো যে দেশ দুটোর উপর্যুক্ত কাজের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে সুপার পাওয়ার হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। উপর্যুক্ত পরোক্ষ কারণ ছাড়া প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা চীনের এই দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির জন্য মূলত দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন।

প্রথমত, উৎপাদনক্ষেত্রে বৃহৎ অঙ্কের পুঁজির বিনিয়োগ। যেটা সম্ভব হয়েছে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের সাহায্যে এবং **দ্বিতীয়ত,** দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি।

এ দুটো উপাদানের মিলিত প্রয়াসই চীনকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। তবে ১৯৭৯ সালে গৃহীত সংস্কারনীতি দেশটির অর্থনীতিতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। দেশটি তার জিডিপির প্রায় ৪৮ শতাংশ ব্যয় করে কারখানা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির পেছনে। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সঙ্কুচিত হচ্ছে নানামুখী দুর্বলতার কারণে। বিপরীতে চীনের অর্থনীতি গড়ে দুই অঙ্কে বিকশিত হচ্ছে গত এক দশক ধরে। ২০০৭ সালের বৈশ্বিক মন্দার পর থেকে খারাপ অবস্থা বিরাজ করছে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। ২০১৩ সালের প্রান্তিকে এসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি যেখানে ১.৫% এবং জাপানের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় শূন্য, সে সময় চীনের এ বিকাশ ছিল ৯.১%। চীনের অর্থনৈতিক বিকাশের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো সস্তায় পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা ও বিক্রি। বিশেষ করে কম মূল্যে ইলেকট্রনিক্স পণ্য সরবরাহ করে বিশ্ববাজারে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে দেশটি। চীনের অর্থনৈতিক নীতির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ২০১১ সালের মার্চে দেশটির জাতীয় কংগ্রেস ১২তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যেখানে তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যথা— অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, ব্যাপক সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ।

আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের মোকাবিলায় চীনা পরিকল্পনা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পর টিকে থাকার তাগিদে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দালালি ও খবরদারি করার জন্য বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো ঋণের জালে আবদ্ধ থেকে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত ও টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যকলাপ বিশ্বের কারো কাছেই আর অজানা নয়। তাদের অর্থায়নে যে এশিয়া অঞ্চলের স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয় তা এ অঞ্চলের দেশগুলো নিজে থেকে বুঝার পাশাপাশি এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মোড়ল চীনও বুঝাতে সক্ষম হয়েছে। একবিংশ শতাব্দী যে এশিয়ার বিশ্ব এ বিষয়টি মাথায় রেখে নতুন সিল্ক রোড প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দেশটি ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এরই মধ্যে দেশটি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা এআইআইবি ব্রিকস গঠন করেছে এবং নতুন সিলক রোডের

জন্য ইতোমধ্যে দেশটি ৬২ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। ইউরোপীয় অর্থনীতির জায়ান্টরাসহ জাতিসংঘের চারটি স্থায়ী সদস্যদেশও চীনের নেতৃত্বে গঠিত এআইআইবিতে যোগ দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দাঁড়িয়েছে ৫৭-তে। আমেরিকার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য শর্তেও শেষ পর্যন্ত এআইআইবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি চীনা এ উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছে। তারা এআইআইবি-এর পাশে সহযোগী হিসেবে থাকার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে।

এশিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রহসন এবং চীন কর্তৃক তার সুযোগ গ্রহণ : যুক্তরাষ্ট্র গোপনে বিশ্বের অনেক দেশকেই বিশেষ করে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে চীন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে এবং তাদের উন্নয়নে যথাযথ বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও পালন করেছে খুবই সামান্য। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এআইআইবি-এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বৈরিতা এশিয়ায় তাদের ঘোষিত অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের পরিপন্থী। দুঃখজনক হলেও এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রভাব হারানোর ভয়েরই প্রকাশ। এর মাধ্যমে তারা সম্ভবত এশিয়ার উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার সুযোগকেই অবহেলা করেছে। অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ কী অবদান রাখতে পারে, চীন নিজেই তার বড় প্রমাণ। চীনের অনেক অনুন্নত অঞ্চল সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে স্রেফ যোগাযোগ বাড়ার কারণে। এতে সেখানে মানুষ, পণ্য ও চিন্তা-ভাবনা আগের চেয়ে অনেক মুক্তভাবে চলাচল করছে। এটা সম্ভব করেছে অবকাঠামো বিনিয়োগ। এআইআইবি এশিয়ার অন্যান্য অংশে এ ধরনের সুবিধা এনে দিতে পারে যা এশিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রহসনকে আরো গভীর করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চীনের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও এশিয়ার প্রভাবশালী দেশগুলোর উদ্বেগ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চীন সামরিক দিক থেকে বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিবেচিত। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চীন যখন পরিচিত ছিল তখনও তার আলোচিত হওয়ার মতো সামরিক শক্তি ছিল। চীনের সামরিক শক্তি আমরা কোরিয়ান যুদ্ধে দেখেছি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় চীনের সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। সামরিক শক্তি হিসেবে যে চীনের উত্থান তাও অবশ্যম্ভাবী ছিল। সামরিক শক্তির সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক শক্তি যখন যোগ হলো তখন স্বাভাবিক কারণেই চীনের সামরিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। চীনকে বলা হয় ব্লু ওয়াটার নেভি। ব্লু ওয়াটার নেভি বলা হয় সেই দেশকে যার ব্যাপক নৌ-শক্তি আছে এবং সে তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে। বিশ্বের কম রাষ্ট্রের এরকম নৌ-শক্তি আছে এবং তারা তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। চীন তার দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের সমুদ্র পথকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরে যে পর্যন্ত তার সীমারেখা চিহ্নিত করেছে সেটাকে কেন্দ্র করে ঐ অঞ্চলের অপরাপর দেশের সাথে তার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বচীন সাগরে দিয়াওউ বা সেনকাকু দ্বীপ ও তার আশেপাশের জলসীমা নিয়ে জাপানের সাথে গত কয়েক বছর যাবত যুদ্ধাংদেহি অবস্থা বিরাজ করছে। দক্ষিণ চীন সাগরের জলসীমা ও সেখানে অবস্থিত স্পার্টলি, প্যারাসেল ও প্রাটাস দ্বীপপুঞ্জের দাবি নিয়ে তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস ও ব্রুনেই-এর সাথে নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। শুধু এ অঞ্চলেই নয় আফ্রিকাতেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রভাব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে চীন, ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নানা কারণেই সে সম্পর্কটি সৃষ্টি হয়নি। এটা না হবার পিছনে মার্কিন কূটনীতি একটি বড় ভূমিকা রাখছে। যুক্তরাষ্ট্র যতই ভারতের ঘনিষ্ট হচ্ছে চীনের সঙ্গে ভারতের ততই দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, চীন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি। সামরিক শক্তিতেও চীনকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। কেননা দেশটির প্রথমবারের মতো সামরিক ব্যয় ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চীনের এই সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি বিশ্বের সেসব দেশের জন্য উদ্বেগের যারা নিজেদের বৃহৎ সামরিক শক্তি বলে বিবেচনা করে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ যখন তাদের সামারিক ব্যয় হ্রাস করার চিন্তা করছে তখন চীন তার সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করছে। আর এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, চীন অর্থনৈতিক শক্তির ব্যাপারে কতটা আত্মপ্রত্যায়ী।

০৯। ভারত ও চীন এ দু'দেশের কোনটি সকল দিক বিবেচনায় একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অধিকতর শক্তিশালী দেশরূপে আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতি প্রভাবিত করতে পারে তা যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিক ইতিহাসবিদ থুকিদিদিস (Thucydides) বলেছেন, যার শক্তি আছে সে যা খুশি তা করতে পারে এবং দুর্বলকে অবশ্যই দুর্ভোগ পোহাতে হবে। শক্তির সকল অভিব্যক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক প্রভাব বিস্তার করা। আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের রাজনীতি যেমন অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবে। ইতিহাস এ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে, আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে সবল রাষ্ট্রগুলো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নিজের সুবিধামতো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে যথেচ্ছা ব্যবহার করেছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিশ্বের দুটি বৃহৎ জনবহুল রাষ্ট্র ভারত ও চীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামরিক শক্তি অর্জনে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ দুটি দেশের কোনটি আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। এ প্রশ্নের আলোকে ভারত ও চীনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক অবস্থা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনার দাবি রাখে।

চীন ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি : চীনের সাথে তাইওয়ান সম্পর্ক সবসময়ই খারাপ। চীন চায় তাইওয়ানকে মূল ভূখণ্ডের সাথে পুনঃএকত্রীকরণ। আর এক্ষেত্রে চীন প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করার পথ থেকে সরে আসবে না। তাইওয়ানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থিয়েটার মিসাইল ডিফেন্স (TMD) ব্যবস্থা দিয়ে সাহায্য করছে। ফলে চীন তার অস্ত্র ভাণ্ডারকে আরো শক্তিশালী করে তুলছে। এভাবে ভারতের সাথে পাকিস্তানের কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে রয়েছে জটিলতা। রয়েছে সেভেন সিস্টারস-এর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমস্যা। এক্ষেত্রে কাশ্মীর ইস্যু দিন দিন যতটা জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করছে চীনে মুসলিম অধ্যুষিত জিয়াংজেমিন বিচ্ছিন্নতা ততটা জটিল নয়। ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দিন দিন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। এর উদাহরণ হিসেবে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ উগ্রবাদী হিন্দুদের দ্বারা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস, ডিসেম্বর ১৯৯৮, জানুয়ারি ১৯৯৯ হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টানদের বেশ কয়েকটি গির্জা জ্বালিয়ে দেয়া, তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা, গির্জায় কর্মরত যাজিকাদের ধর্ষণ করা, ২০০২ সালে গুজরাটের ভয়াবহতম মুসলমান নিধনযজ্ঞ, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীকে হত্যা, রাজনীতিতে দুর্নীতি, রাজনীতিবিদদের প্রতি জনগণের আস্থা হারানো দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিক দিয়ে চীন যথেষ্ট মুক্ত। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা অনুসারী থাকলেও তা জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকিস্বরূপ নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লি হংঝি নেতৃত্বে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে চীনে আধ্যাত্মিক আন্দোলনবাদী গোষ্ঠী ফালুন গং (Falun Gong)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এরা ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে রাজধানী বেইজিং-এ সরকারবিরোধী বিক্ষোভ করায় চীন সরকার ২২

জুলাই এ আন্দোলকে নিষিদ্ধ করে কঠোর হস্তে দমন করে। ভারত এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া চীনে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী হত্যার মতো কোনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস নেই। চীনের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তেমন নেই। কিন্তু ভারতের বফর্স কেলেঙ্কারি (১৯৮৭), শেয়ার কেলেঙ্কারি (১৯৯২), হাওয়ালা কেলেঙ্কারি (১৯৯৬), ভোট ক্রয় কেলেঙ্কারি (১৯৯৩), ইউরিয়া কেলেঙ্কারি (১৯৯৬) ইত্যাদি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। চীনে কোনো মন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে তা ফাঁস হয়ে গেলে শাস্তির ভয়ে মন্ত্রীরা আগেই আত্মহত্যা করে বসে। সেখানে ভারতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা কেবল পদত্যাগ করেই বিরত থাকেন এবং এর রহস্য আর উদ্‌ঘাটন করা হয় না। ভারতে কংগ্রেস সরকার দুর্বল হলেও বার বার ক্ষমতায় আসে এবং উত্তরাধিকার রাজনীতির যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এক্ষেত্রে চীনে মাও সেতুং প্রবর্তিত কমিউনিস্ট পার্টি বার বার ক্ষমতায় আসে। তবে এক্ষেত্রে পার্টির প্রধান প্রধানমন্ত্রী হলেও তাকে যথেষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে পার্টির প্রধান হতে হয়। চীনের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা রয়েছে। উভয়েই ভাগাভাগির ভিত্তিতে ক্ষমতা চর্চা করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যতটা ক্ষমতা ভোগ করেন, রাষ্ট্রপতি সে তুলনায় খুবই নগণ্য ক্ষমতা চর্চা করতে পারেন। ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। চীনে সমাজতন্ত্রের আড়ালে গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায়। চীন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেছে, গণতান্ত্রিক পার্টি গঠনের অনুমতি দিয়েছে। যা ভারতে পূর্বেই রয়েছে।

চীন-ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : বিগত এক দশকে চীন ও ভারত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিক থেকে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চীনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ১০ ভাগ এবং ভারতের গড় প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮ ভাগ। আঞ্চলিক ও বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন ও ভারত এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এ ঊর্ধ্বগতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে চীন-ভারত সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনের সাথে হংকং একীভূত হওয়ায় 'একদেশ, দুই নীতি' ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে– যা ২০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সমাজতান্ত্রিক চীন বাজার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে এসেছে। তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে ধীরে ধীরে সংস্কার করে বাজার অর্থনীতির সাথে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। চীন যাকে বলছে সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি। এ সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের কিছু উপাদান সন্নিবেশ করা হয়েছে। তাই একে প্রয়াত দেং জিয়াও পিং-এর ভাষায় 'আধা-পুঁজিবাদী' ব্যবস্থা বলা যায়। চীন ও ভারতের তুলনামূলক অর্থনৈতিক পার্থক্য চিত্র নিম্নরূপ :

	চীন	*ভারত*
জিডিপি	*১০.৩৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার*	*২.৩০৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার*
জিডিপি (পিপিপি)	*১৭.৬৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার*	*৭.৯৯৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার*
জিডিপি (প্রবৃদ্ধি হার)	*৭.৪%*	*৭.৪*
মাথাপিছু জিডিপি (পিপিপি)	*১৩,৯৯২মার্কিন ডলার*	*৬,২৬৫ মার্কিন ডলার*
সেক্টরভিত্তিক জিডিপি		
কৃষি	*৯.২%*	*১৩.২%*
শিল্প	*৪২.৬%*	*২১.৫%*
সেবা	*৪৮.২%*	*৬৪.৮%*

অন্যদিকে, ভারতে একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যে অর্থব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বা পুরোপুরি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলা যায় না। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় পুঁজি ও পণ্য প্রবাহে অবাধ চলাচলের নীতি স্বীকৃত থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষ প্রয়োজনে সরকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। এ ধরনের ব্যবস্থায় অবাধ আমদানি নীতির কথা থাকলেও ক্ষতিকারক দ্রব্য আমদানি নিষিদ্ধ করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার কথা বলা হলেও দেশীয় শিল্প রক্ষার্থে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত চীনের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চীনকে শিশু হিসেবে গণ্য করলে ভারত এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক বলা যায়। চীনে স্টক এক্সচেঞ্জ, বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্প্রতি গড়ে তোলা হলেও ভারত এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে চীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হ্রাস করছে সাম্প্রতিক সময়ে। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের একটা অংশ রাষ্ট্রকে দিয়ে বাকিটা চীন খোলা বাজারে বিক্রির অনুমতি দিয়েছে এবং বাড়তি আয় অন্যত্র ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। গণমাধ্যমের ওপর চীন ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনছে, যেখানে ভারতে গণমাধ্যম সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

চীন-ভারতের সামরিক শক্তি : অতীত পারমাণবিক ক্ষমতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চীন বিশ্ব রাজনীতি ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে; যেখানে ভারত আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। সামরিক দিক বিবেচনায়ও রয়েছে চীন-ভারত পার্থক্য। নিম্নে চীন-ভারতের সামরিক শক্তিচিত্র গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (GFP) ২০১৫ এর তথ্যমতে, উপস্থাপন করা হলো :

দেশ	*সৈন্য সংখ্যা*	*সামরিক বিমান*	*যুদ্ধবিমান*	*ট্যাঙ্ক*	*সাবমেরিন*	*বিশ্ব অবস্থান*
চীন	*২৩,৩৩,০০০*	*২,৮৬০*	*১,০৬৬*	*৯,১৫০*	*৬৭*	*তৃতীয়*
ভারত	*১৩,২৫,০০০*	*১,৯০৫*	*৬২৯*	*৬,৪৬৪*	*১৫*	*দ্বিতীয়*

কৌশলগত দিক দিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে চীন-ভারতের লক্ষ্যসমূহের তুলনামূলক পার্থক্য :

ক. চীন এর লক্ষ্য হলো একমেরুভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বহুমেরু পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে ভারতের লক্ষ্য একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা।

খ. চীনের লক্ষ্য হলো মার্কিন কর্তৃত্বের বহির্ভূত থেকে শক্তিশালী চীনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে ভারত বৃহৎ শক্তির সাথে একত্রিত হয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা চালিয়ে যেতে চায়।

গ. চীনের লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহকে ঋণ প্রদান, সাহায্য প্রদান করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন চালিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অপুষ্টি, শিক্ষা সমস্যার সমাধানে তৎপর।

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি চীন প্রতিবেশী ভারতসহ বৃহৎ শক্তির মোকাবেলায় সামরিক আধুনিকীকরণের প্রতি জোর দেয়। অন্যদিকে, ভারত প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের মোকাবেলায় সামরিক আধুনিকীকরণের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে–

আঞ্চলিক ক্ষেত্রে চীন কৌশলগত প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং অব্যাহত সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। চীন WMD-এর বিস্তার রোধের কথা বলে এবং মানবাধিকার ইস্যুসমূহ পর্যবেক্ষণ করে। অপরদিকে, ভারত আঞ্চলিক ক্ষেত্রে চীনের হুমকি প্রতিরোধ, সীমান্ত উত্তেজনা হ্রাসে গুরুত্বারোপ করে এবং পাকিস্তানের প্রভাব ক্ষুণ্নকরণে সর্বদা তৎপর।

চীন-ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়ার সম্পর্ক একটি বহুল আলোচিত বিষয়। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর চীনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিনের ওয়াশিংটন সফর ও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বেইজিং সফরের পরও বিভিন্ন ইস্যুতে দুই সরকারের মধ্যে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশ দুটোর সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। চীনে মানবাধিকার পরিস্থিতি, তাইওয়ানের প্রশ্নে চীনের শক্ত ও অনড় অবস্থান, চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও চীনা বাজার এখনও পুরোপুরিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত করে না দেয়া, চীনের পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রয়ের সম্ভাবনা দেশ দুটোর সম্পর্কের অবনতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের ঘটনা চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে উষ্ণ করে তোলে যা এখনও বিদ্যমান। চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিনের সেই সময়ের জাপান ও রাশিয়া সফর বিশ্ব রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। চীনের রাশিয়া সফরের লক্ষ্য কৌশলগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি গঠনমূলক অংশীদারিত্বকে আরো জোরদার করা। চীনের এ লক্ষ্য সফল হলেও চীন-জাপান তাদের অতীতের বৈরী ও শত্রু মনোভাব হ্রাসে চীনের জাপান সফর তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। অমীমাংসিত রয়ে গেছে জাপান-যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জোটের প্রশ্ন, শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক কোন নীতিতে এগিয়ে যাবে তা অস্পষ্ট। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া তিনটি শক্তি। এ তিন শক্তির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কের উত্থান-পতন আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে। একমাত্র চীনই এ অঞ্চলে মার্কিনী উপস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক। পরবর্তীতে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৯৫ পরবর্তী ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালে মার্কিন প্রশাসনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেরী ও বাণিজ্যমন্ত্রী রোনাল্ড ব্রাউনের ভারত সফর ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া, প্রশিক্ষণ, দু'দেশের সামরিক বাহিনী মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা ও আলোচনা, পরামর্শ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় সহযোগিতা, সমরাস্ত্র উৎপাদনে যৌথ উদ্যোগ, বাণিজ্য জোট গঠন, সাম্প্রতিক সময়ে পারমাণবিক চুল্লি গঠনে চুক্তি ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে আরো বেগবান করেছে।

আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে চীন ও ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভাবের তুলনামূলক আলোচনা : স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বে ক্রমশ দ্বিমেরুকরণ ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটলেও এখন পর্যন্ত মার্কিন একমেরুকরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান। তবে চীন একটি নতুন অর্থনৈতিক পরাশক্তির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং একইভাবে পাশাপাশি সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আসছে ভারত। এ দেশ দুটি সামরিক দিক দিয়েও শক্তিশালী হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। চীন প্রযুক্তিগত অগ্রাধিকার দিয়ে তার স্বার্থকে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে রাশিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান (ASEAN) জোটের সাথে সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করে চলেছে। চীন মধ্য এশিয়াকে নিয়ে গঠন করেছে SCO সংগঠন। এক্ষেত্রে ভারত নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের আশায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষায় সার্ককে ব্যবহার করতে চাইছে।

হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, শক্তির রাজনীতির চর্চার ক্ষেত্রে চীন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। চীন তাদের মধ্যযুগের শাসনামলের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের স্মৃতিকে নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আবার ফিরে আসতে পারে। গত ৩০ বছরের ইতিহাসে চীন যে কোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি পরিবর্তন সাধন করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চীনকে দরিদ্রতা হ্রাসে সাহায্যে করেছে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চীনকে নতুন করে গণ্য করতে শুরু

করেছে। এক্ষেত্রে ভারত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বারা তার দারিদ্র্যকে ঘোচাতে পারেনি। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্বকে আকর্ষণীয় করে তুললেও ভারত সম্পর্কে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হিসেবে কেউ দেখছে না, যেমন চীনকে দেখছে। চীনকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ হুমকি মনে করা হয়, ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা এখনও এরূপ ভাবছেন না।

চীনের নিরাপত্তা বলতে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়, বিশেষ করে সামরিক শক্তি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় ঐক্য, সমৃদ্ধি, অর্থনীতি এবং বিশ্বশান্তিকে বোঝায়। চীনের বিশ্বাস, একটি শক্তিশালী চীনের ওপর বিশ্বশান্তি নির্ভর করে। এ মুহূর্তে চীন তার শান্তিকামী প্রতিবেশীর অন্বেষণ করছে এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বলয় গড়ে তুলছে। চীনের দুটি কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দ্বীপ তাইওয়ানের সাথে চীনের মূল ভূখণ্ডকে একত্রিত করা, দক্ষিণ চীন সাগরে স্পার্টলি ও পারসেন দ্বীপের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। চীনের জ্বালানি হুমকি রোধ করা ও দুর্বল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করা। পাশাপাশি এশীয় প্রশান্ত ও মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব বলয় হ্রাসে ভবিষ্যৎ শক্তি হিসেবে জাপানকে সামরিক দিক দিয়ে সাহায্য দেয়ার কথা ভাবছে চীন। অন্যদিকে চীনের, চিরশত্রু জাপানকে আমেরিকা তাইওয়ান রক্ষার্থে জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপে সামরিক শক্তি মোতায়ন পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন করতে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপ্রিয় জাপানকে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইছে। চীন মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) গঠন করে আমেরিকাকে মধ্য এশিয়ায় কোণঠাসা করতে সফল হয়েছে। এক্ষেত্রে রাশিয়া চীনকে সামরিক প্রযুক্তি সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে।

আঞ্চলিক শক্তির ক্ষেত্রে ভারতও ভূ-রাজনীতির চর্চার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী ভূমিকা পালন করছে। ভারত বিরোধপূর্ণ চীন ও পাকিস্তানের সাথে তার কৌশল পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যদিও তা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে ভারতের অবস্থান। ভারতের এ মনোভাব রাজনীতির প্রভাবের বেলায় সুফলের পরিপন্থি। কেননা পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্কে তারতম্য ঘটে। রাশিয়ার সাথে ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রয়েছে। তবে বর্তমানে অস্ত্র সংগ্রহ, যৌথবাহিনীর মহড়া এবং বেসামরিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার নিয়ে আমেরিকার সাথে চুক্তি ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে চীন-ভারত ও পাকিস্তান-ভারত সম্পর্ক স্পর্শকাতর হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। চীন, পাকিস্তান মোকাবিলায় ভারত ও আমেরিকা উভয়েই কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তবে রাশিয়া, চীন ও ভারতের মধ্যকার ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক খুবই অস্পষ্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন মিয়ারসায়ার বলেন, ভবিষ্যতে চীন আমেরিকাকে এশিয়া থেকে বিতাড়িত করবে। কেননা চীন অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে চলেছে। এ অবস্থায় চীনের নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে মনরো মতবাদের অংশ হিসেবে পশ্চিম গোলার্ধের ন্যায় নিজেকে সরিয়ে নেবে।

চীন তাদের বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট করেছে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো সাম্রাজ্যবাদী বা নেতৃত্বের মনোভাব পোষণ করবে না। তবে তারা দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের দাবিকৃত এলাকার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা তাইওয়ানের পুনঃএকত্রীকরণের জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করার পথ থেকে সরে আসবে না। ভারতের সাথে চীনের সীমানা চিহ্নিতকরণ দ্বন্দ্ব ও অরুনাচল প্রদেশের মালিকানা বিষয়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। ১৯৬২'র ভারত-চীন যুদ্ধে চীন অরুনাচল দখল করলেও পরবর্তীতে যদি ছেড়ে দেয়, তবে এক্ষেত্রে চীনের বর্তমান অবস্থান স্পষ্ট নয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের (Charles Darwin) বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origin of Species'-এ বিবর্তন মতবাদ তত্ত্বের একটি মত প্রণিধানযোগ্য। যে মতবাদে বলা হয়, জীবনের উচ্চতর রূপ বিবর্তিত হয়েছে নিম্নতর রূপ থেকে এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্যই প্রজাতির টিকে থাকা নিশ্চিত করতে পারে। কাজেই ভারত ও চীন এ দু দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, সুবিধা, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অধিকতর শক্তিশালী দেশরূপে আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতিতে কোন দেশ প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ভর করে সেদেশের পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্যের ওপর।

১০। পঞ্চম প্রজাতন্ত্র বা ১৯৫৮ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ফ্রান্সের বৈদেশিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।

উত্তর : ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপের সর্ববৃহৎ ও অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রতিবেশী চিরশত্রু ও অন্যতম পরাশক্তি জার্মানির পরপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ফ্রান্সের কূটনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ত্রিশক্তির আঁতাত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৈত্রী জোটে থেকে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে আপাত ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে দেশটির কোনো দ্বন্দ্ব না থাকায় অর্থনীতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যতে দেশটি যেমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে তেমনি কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বহির্বিশ্বের দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে নিজের শক্তিশালী অবস্থানের জানান দিতে পেরেছে। প্রেসিডেন্ট গল থেকে আজকের ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ পর্যন্ত দেশটি অর্থনৈতিক জায়ান্ট, রাজনৈতিক-কূটনৈতিকভাবে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য, সামরিকভাবে ন্যাটোর অন্যতম সদস্য এবং আরো অন্যান্য আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাম্প্রতিক সময়ের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রেসিডেন্ট ডি গল-এর শাসনকাল : ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের শক্তিশালী সেনাবাহিনী আলজেরিয়ার শাসনক্ষমতা হাতে নেয় এবং ফল হিসেবে আরব দেশগুলোর বিদ্রোহের কারণে ফ্রান্সের ফোর্থ রিপাবলিক এক বিরাট সংকটের মুখে পতিত হয়। ঐ সংকটময় সময়ে জাতীয় পরিষদ চার্লস ডি গলকে শাসনক্ষমতায় আনে। গল ক্ষমতায় এসে ফিফথ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর প্রেসিডেন্টের পদকে শক্তিশালী করেন। গল আরব বিশ্বের সাথে যুদ্ধ শেষ করার জন্য কতকগুলো পদক্ষেপ নিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কলোনিগুলোকে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হন এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬২-তে আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেন।

প্রেসিডেন্ট গলের একটি দাবি ছিল আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা। যাতে তার দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপক্ষে ন্যাটো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ অন্যান্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো বিরুদ্ধবাদ না করতে পারে। দেশটি এ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায় ব্রিটেন যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে প্রবেশ করতে চাইলে তাতে ভেটো দিয়ে। এ কারণে যে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের উপর ছায়াশক্তি হিসেবে কাজ করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও দেশটি ন্যাটো থেকে তার সমন্বিত সামরিক কমান্ড প্রত্যাহার করে নেয় এই ভয়ে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর উপর খুব বেশি রকমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে দেশটি পারমাণবিক কর্মসূচি উন্নয়নে হাত দেয় এবং চতুর্থ পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে।

প্রেসিডেন্ট গল তাঁর সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত প্রভাব বলয়ে ভীত হয়ে শক্তির ভারসাম্য আনয়নের জন্য নতুন করে জার্মান, ফ্রাঙ্কো সম্পর্ককে জোরদার করেন। ডি গল খোলাখুলিভাবে ভিয়েতনামে

আমেরিকার হস্তক্ষেপকে সমালোচনা করেছেন। গল আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তিতেও ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর অর্থমন্ত্রী আমেরিকার ঐ অর্থনৈতিক অবস্থাকে আখ্যায়িত করেছিলেন মার্কিন ডলারের 'মাত্রাতিরিক্ত সুবিধা প্রাপ্তি'কে। এছাড়াও তিনি ঐ সময়ে কানাডা থেকে কুইবেককে স্বাধীন হওয়ার জন্য ইন্ধন জোগান।

নিকোলাস সারকোজির শাসনকাল : নিকোলাস সারকোজি ক্ষমতা গ্রহণের পর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কলাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলভারো ইউরিব এবং বামপন্থী গেরিলা সংগঠন ফার্কের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিদ্রোহীদের নিকট জিম্মি ফ্রাঙ্কো-কলম্বিয়ান রাজনীতিবিদ ইনগ্রিড বেটানকোর্ট এবং সরকারি বাহিনীর নিকট আটক ফার্ক নেতা রদ্রিগো গ্রানডা-র মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং এর ফলে সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সদ্ভাব বিরাজ করে। এছাড়া ২০০৭ এ লিবিয়ায় ধৃত বুলগেরিয়ান নার্সদের প্রত্যার্পণের ব্যাপারে ফ্রান্স ও ইউরোপিয়ান দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৭ এ জি-এইট এর ৩৩তম সম্মেলনে সারকোজি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলার জন্য ২০৫০ এর মধ্যে কার্বন-অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন ৫০% কমানোর জন্য লক্ষ্য স্থির করেন। ন্যাটোর সাথে ফ্রান্সের সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছিল তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ২০০৯ থেকে দেশটি আবার পুরোপুরিভাবে ন্যাটোর সদস্য হয়। যা ২০১৫ পর্যন্তও টিকে আছে।

ফ্রাসোয়াঁ ওঁলাদের শাসনকাল : সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ফ্রাসোয়াঁ ওঁলাদ ২০১২ তে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার সরকার স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধংদেহী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছে। ক্রিমিয়াসহ ইউক্রেনের দোনেস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চলে রাশিয়াপন্থি যোদ্ধাদের পক্ষে রাশিয়ার উসকানিমূলক অবস্থানে ফ্রান্স-জার্মানিসহ পশ্চিমা বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর সাথে একাট্টা হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে রাশিয়াকে জি-এইট থেকে বহিষ্কার করাসহ দেশটির উপর নানামুখী অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। ফ্রান্স জার্মানির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামপন্থী মিলিশিয়াদের দমনে বিবদমান দেশগুলোতে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মিলিশিয়া গোষ্ঠী আইএসকে দমন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ যে আন্তর্জাতিক জোট গঠনের ঘোষণা দেয় তাতে প্রথম নয়টি দেশের মধ্যে ফ্রান্স অন্যতম। এছাড়াও ফ্রান্স সিরিয়ায় সংঘটিত গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহীদের ব্যাপকভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আর ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে দেশটি যুদ্ধ সৃষ্টিকারী ইস্যু হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টেরিটরি নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বে : বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সাগর-মহাসাগরে অবস্থিত ফ্রান্সের অধীন কলোনিগুলোকে নিজেদের বলে বিভিন্ন দেশ দাবি করছে। যেমন মাদাগাস্কার বাসাস ডা দ্বীপ, ইউরোপ দ্বীপ, জোয়ান ডি নোভা দ্বীপ নিয়ে; কমোরোস সায়োট্টি দ্বীপ নিয়ে; মরিশাস ট্রোমলিন সুরিনাম ও ফ্রেঞ্চ গায়ানার মধ্যে দ্বন্দ্ব। উপর্যুক্ত দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ফরাসি সরকার এখনো তেমন কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। সামনের দিনগুলোতে এসব টেরিটরিতে ফ্রান্সের শাসন থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করবে পরিবর্তনশীল বিশ্বে ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি ও বিশ্ব পরিস্থিতির উপর।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পশ্চিমা নীতি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পশ্চিমা আর সব দেশের সাথে একাট্টা হয়ে কাজ করার নীতিতেই বর্তমানে দেশটি আছে। স্বার্থের কারণে দেশটি এককালের চিরশত্রু জার্মানির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার প্রভাববলয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্ধু আমেরিকার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ফ্রান্স ন্যাটো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেও ২০০৯ এ আবার সৈন্য সরবরাহ করে। এক সময় সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির ভয়ে ভীত হয়ে ব্রিটেন, রাশিয়ার সাথে আঁতাত করলেও ক্রিমিয়া ইস্যুকে নিয়ে রাশিয়ার সাথে উষ্ণ সম্পর্কের ঘাটতি এবং ইসলামপন্থী মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধপরিকর।

১১। জাপানের সামরিক আকাঙ্ক্ষা, চীনের অর্থনৈতিক উত্থান এবং ভারতের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতির ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প অঙ্কন করুন।

উত্তর : মানবজাতির ইতিহাস দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে আজকের এ অবস্থানে পৌঁছেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় শক্তিধরেরা বিলিন হয় নতুন শক্তির জন্ম দিয়ে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এশিয়া। কিন্তু আধুনিককালে তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব অনেক কম থাকলেও ভবিষ্যতে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রকের আসনে আবার এশিয়ার শক্তিগুলো ফিরে আসছে। জাপানের অর্থনৈতিক পরাশক্তির পাশাপাশি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, চীনের অপ্রতিরোধ্যভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক অগ্রগতি এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে এশিয়া তৈরি হচ্ছে। তবে ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি, কর্মচেষ্টা এবং সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। তাই এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এ দেশগুলোর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ওপর নির্ভর করবে তাদের সম্ভাবনাময় আগামী। এ আগামীর কল্পনা করার পূর্বে জাপান, চীন ও ভারতের বর্তমান অবস্থা জানা দরকার।

জাপানের সামরিক আকাঙ্ক্ষা

জাপানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাপান এ অঞ্চলের পরাশক্তি হিসেবে সর্বদা নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা কর্তৃক পারমাণবিক বোমার আক্রমণের আগ পর্যন্ত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলার ভয়াবহতায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছিল। আর জাপান নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। জাপানের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব এবং ক্ষতিপূরণ নেয় মিত্র শক্তিরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং পরাজিত এ দেশ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে ফিরে আসে। শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে জাপান সরকারের নীতিসমূহ এবং জনগণের কঠোর পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা 'অর্থনৈতিক মিরাকলের' মাধ্যমে আজ এ অবস্থানে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে (১৯৪৬-১৯৭৬) জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি ৫৫ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীর সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ১০% জাপানই করতো। ১৯৮০-এর দশকে জাপান পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে উত্থান লাভ করে। এক সময়ের সমর শক্তি নির্ভর জাপান বর্তমানে অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা বিশ্বে নিজের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। জাপান জাতিসংঘের বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ দিয়ে থাকে। তাছাড়া অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য দিয়ে থাকে।

কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জাপান নতুন করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের যথেচ্ছাচার, গণচীনের অর্থনৈতিক এবং সামরিক উত্থান ও তাইওয়ান সমস্যা, সম্ভাব্য পারমাণবিক শক্তিধর উত্তর কোরিয়া সমস্যা এবং নিজেকে অর্থনৈতিক পরাশক্তির পাশাপাশি সামরিক পরাশক্তিতে পরিণত করতেই জাপানের এ উদ্যোগ। সাধারণভাবেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরাশক্তি হিসেবে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির চরম শিখরে থেকেও নিরাপত্তাহীনতা জাপানের চিন্তার কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকা কর্তৃক প্রণীত 'Peace Constitution' এর বাধা থাকা সত্ত্বেও জাপান গত দু দশক ধরে তার সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করছে এবং তার নিরাপত্তা বাজেট বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান হুমকি। কিন্তু জাপানের সাথে তার চুক্তি থাকায় আমেরিকা জাপানকে সামরিক সহায়তা প্রদান করবে। কিন্তু দ্রুত উঠে আসা চীন এর সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্র কতটা এগিয়ে আসবে তা দেখার বিষয়। তাছাড়া চীন পারমাণবিক শক্তিধর এবং বিশ্বের বৃহৎ

সেনাদলের অধিকারী। তাই শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে জাপানকে পারমাণবিক অস্ত্র এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে প্রবৃত্ত করছে। তাছাড়া উত্তর কোরিয়া দ্বারা জাপান বিশাল হুমকির সম্মুখীন। উত্তর কোরিয়া একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। তাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকগণ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। জাপান যদি ইচ্ছে করে তবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারে। জাপানের পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরে পর্যাপ্ত প্লুটোনিয়াম আছে। এগুলো দিয়ে সে হাজার হাজার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারে। আর রকেট তৈরি করতে পারায় আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা খুব কঠিন কাজ নয়। আর রাজনৈতিক মহল এ বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। রাজনৈতিক নেতা এবং কেবিনেট সেক্রেটারি Fulcuda Yasuo বলেছেন পারমাণবিক অস্ত্রায়নের প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করা হবে। এতে পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত থাকলেও এতে সমর্থন বাড়ছে।

জাপান সরকার এরই মাঝে পারমাণবিক গবেষণার প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। সূচনামূলক কাজের জন্য বাজেটে এ বিষয়টা রাখা হয়েছে। এ জটিল পদ্ধতি যৌথভাবে জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় শুরু হয়েছে। আর এ পথ সুগম করতে জাপানের অপারমাণবিক মূলনীতিগুলো পরিবর্তনের জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধনের কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে। জাপানি নেতৃবৃন্দের মতে, জাপানের পারমাণবিক অস্ত্রে দখল থাকার ব্যাপারে জাপানের শান্তিবাদী শাসনতন্ত্র ও যুদ্ধের দাবি পরিত্যাগকারী এবং ৯ নম্বর ধারা কোনো প্রতিবন্ধক হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া আইনের তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জাপানের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও আণবিক বোমা থাকতে বাধা নেই। তাই জাপান তার সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চীন-এর অর্থনৈতিক উত্থান

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন ক্রমশই বিশ্ব অর্থনীতিতে হয়ে উঠছে এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিযোগী। বিশ্ব বাণিজ্যে গত দু দশকে চীনের অবস্থান ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আভ্যন্তরীণ সমস্যা কাটিয়ে উঠে ৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে চীন যে বাণিজ্যমুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছিল তা আজ দেশটিকে বিশ্ব বাণিজ্যের শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। চীনের বর্তমান এ অবস্থান দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনার ফসল। ১৯৪৯ সালে মাও সে তুং এসে চীনের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শিল্প সমৃদ্ধশালী করে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর ফলে তার চিন্তা সফল হয়নি। ১৯৭৮ সালে দোংজাই পিং ক্ষমতায় এসে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করেন। এরই ফলশ্রুতিতে জিয়াং জেমিনের সময় চীন বিশ্ব বাণিজ্যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যে চীন এশিয়ার আরেক অর্থনৈতিক পরাশক্তি জাপানকে হটিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। যা যুক্তরাষ্ট্রের পরের অবস্থান। ২০০২ সালে WTO-তে যোগদানের পর চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়েছে। আর গত দু দশকে চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চারগুণ বেড়েছে। এ প্রবৃদ্ধির হার সত্যিই অবিশ্বাস্য। চীনের এ অর্থনৈতিক পরাশক্তি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। সেগুলো হলো :

১. **সংস্কার নীতি :** চীনের অর্থনীতি মূলত দ্বৈত নীতি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও চীনের অর্থনীতি উদার।

২. **সস্তা শ্রম :** বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা ১৩৯ কোটি ৩৮ লাখ (UNFPA 2014)। এ বিশাল জনসংখ্যা জনশক্তিতে পরিণত হওয়াতে শ্রম অনেক সস্তা।

৪. **বৈদেশিক বিনিয়োগ :** চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল কারণ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮ সালে FDI ছিল ৭০.৬৩ বিলিয়ন এবং ২০১৪ সালে তা বেড়ে ১১৯.৬ বিলিয়নে দাঁড়ায়।

৫. **বিশাল বাজার :** বিশাল জনসংখ্যার কারণে চীন একটি বড় পণ্য বাজার। আর জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে এ বাজার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. অন্যান্য : এছাড়া চীনের ভৌগোলিক অবস্থান, পর্যাপ্ত কাঁচামালের প্রাপ্তি, দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেক কম হওয়াতে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি খুব দ্রুত হচ্ছে।

২০০০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চীন ধারাবাহিকভাবে গড়ে ৯ শতাংশেরও বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে আসছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা থাকলেও চীনকে তা প্রভাবিত করতে পারছে না। আর তাই চীনের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। প্রতিবছর ৯০ মিলিয়ন কৃষক শহরে কাজ করতে আসছে এবং ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তাদের আয়ের অংশ হিসেবে দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর ১৯৮৫ সালে চীনের গড় আয় যেখানে ছিল ২৮০ ডলার সেখানে ২০১৪ সালে গড় আয় প্রায় ৮,২১১ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ অর্থনৈতিক উত্থানের ফলে আশা করা হচ্ছে আগামীতে বিশ্ব রাজনীতিতে চীন হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ। আর সামরিক দিক থেকে যেহেতু চীন পারমাণবিক অস্ত্র এবং বৃহত্তর সেনাবাহিনীর অধিকারী ফলে বর্তমান একমেরুকরণ বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হবে। কিন্তু চীনের অর্থনীতি যেহেতু রপ্তানি নির্ভর তাই এক সময় এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির হার কমতে থাকবে। চীনে যে পরিমাণ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) হয় তার অধিকাংশই থাকে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে। ফলে চীনের অর্থনীতিকে এ অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে নিজস্ব পণ্য প্রস্তুত এবং দেশীয় কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে হবে। আঞ্চলিক এবং বিশ্ব রাজনীতিতে উদীয়মান এ পরাশক্তি যদিও এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পরিবর্তে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের দিকেই বেশি মনোযোগী। তবে ভবিষ্যতে চীনের ভূমিকা যে অনেক শক্তিশালী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারত নতুন পরাশক্তি

ভারত বিশ্ব রাজনীতিতে আর এক উদীয়মান পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত এখনও পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের সাথে বৈরিতার কারণে সামরিক দিকে বেশ এগিয়ে গেছে। পরমাণু শক্তিধর এ দেশটি একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর বর্তমানে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরপরই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে চীনের সাথে যুদ্ধের ফলে ভারত নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৭৪ সালে এবং নিজেকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। বর্তমানে ইসরাইল থেকে সামরিক সুবিধা পাচ্ছে ভারত। ভারত ১৯৯২ সালে ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। গত ৫০ বছর রাশিয়া ভারতের অস্ত্রের সরবরাহ করলেও বর্তমানে সে স্থানটি ইসরাইল দখল করেছে। অস্ত্র বিক্রয়ের পরিমাণ প্রতিবছরে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া ভারত ইসরাইলের কাছ থেকে বারাক নৌ-মিসাইল সিস্টেম নিয়েছে।

প্রচলিত অস্ত্রের পাশাপাশি ভারত তার মিসাইল প্রযুক্তি উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পর্যন্ত ভারত তার স্বল্প, মধ্যম ও দূরপাল্লার মিসাইল টেস্ট করে দেখেছে সেগুলো সব ধরনের ভার বহনে সমর্থ। অগ্নি-২ এর পাল্লা ২৫০০ কিলোমিটার যা কিনা পুরো পাকিস্তানের যে কোনো স্থানে পৌছাতে সক্ষম। অন্যদিকে অগ্নি-৩ এর পাল্লা ৩৫০০ কিমি যা বেইজিং পর্যন্ত পৌছাতে সমর্থ। এগুলো পারমাণবিক শক্তি বহনে সক্ষম। ভারত ইতোমধ্যে AWACS সিস্টেম এবং Arrow-2 মিসাইল এর জন্য তোড়জোড় করছে। এগুলো ইসরাইল লাইসেন্সের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বলে ওয়াশিংটনের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছে। আর যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু ভারতের কৌশলগত মিত্র হিসেবে সম্পর্ক গড়ছে তাতে সামরিক সহযোগী হিসেবে অনেক অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ভারতের তালিকায় যোগ হবে।

কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতকে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনবহুল এ দেশে এখনও খাবার পানি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না যদিও ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এখন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া IT খাতে তাদের সাফল্য উল্লেখ করার মতো। কিন্তু এ বিশাল জনসংখ্যাকে আজও তারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেনি। শিল্পখাতে অগ্রগতি থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। আর আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে পাকিস্তানের সাথে দ্বন্দ্ব অর্থনীতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে।

সেভেন সিস্টার্স এর ULFA, এটিপিএলও, টিইউজেএস, অরুণাচল লিবারেশন ফ্রন্ট, এইচপিসি, পিএলএ, এনএসসিএন-এর মতো বিদ্রোহী সংগঠনগুলো লড়াই করছে। তাছাড়া পাকিস্তানের সাথে কাশ্মির সমস্যা দু দেশের একটি বড় সমসা। এসব মোকাবিলার জন্য সামরিক বরাদ্দ বাড়াতে হচ্ছে। অথচ দেশটির মোট জনসংখ্যার ২৭.৮ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ছে। উদারিকরণের ফলে সরকারের ভূমিকা কমে আসছে এবং অতি দরিদ্র মানুষ সংস্কারের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে ৩৫ কোটি অতি দরিদ্র লোকের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কৃষি নির্ভর দেশটিতে কৃষিতে ভর্তুকি কমাতে হয়েছে কিন্তু কৃষি উপকরণের দাম বেড়েছে। আর প্রান্তিক চাষীদের অবস্থা নাজুক।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ : পরিবর্তনশীল বিশ্বে আগামীতে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে পরাশক্তি নির্ধারিত হবে। কারণ ভবিষ্যতে অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই সামরিক শক্তি থেকে কার্যকর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবে। বাজার দখলের পুরো কাজই নতুন আঙ্গিকে হবে। আর এক্ষেত্রে এশিয়াতেই যেহেতু অধিকাংশ মানুষের বাস, তাই এ অঞ্চলের বাজার দখল করার প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে। এশিয়াতে জনসংখ্যার বেশির ভাগ যেহেতু গরীব তাই তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার বাড়াতে হবে।

এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি জাপান এবং চীন মুখ্য ভূমিকাতে থাকবে। অর্থনৈতিক পরাশক্তি জাপান যেহেতু অন্যান্য পরাশক্তিগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের তাই জাপান শক্তির ভারসাম্য রক্ষা এবং নিজের নিরাপত্তার তাগিদে সামরিক ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তা করছে। কারণ বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রই এখন একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ওপরেই অনেকটা নির্ভর করবে চীন এবং জাপানের ভবিষ্যৎ অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন কেউই চায় না জাপান সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করুক। কারণ জাপানের অতীত ইতিহাস। আবার আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হওয়ার মতো একমাত্র সম্ভাবনাময় চীনকে মোকাবিলা করতে হলে জাপানকে সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করা দরকার বলে মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

জাপানও চাচ্ছে উত্তর কোরিয়া এবং চীনের হুমকি থেকে বাঁচতে হলে তাকে পারমাণবিক শক্তি এবং সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন। যেহেতু জাপান অর্থনৈতিকভাবে পরাশক্তি তাই তার মূল প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাপানের প্রতিরক্ষা চুক্তির দরুন বর্তমান জাপানের নিরাপত্তা রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করছে এবং করবে। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ এ দু পরাশক্তির ওপর অনেকখানি নির্ভর করবে।

এ অঞ্চলে বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জোয়ার কাজ করছে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে এ অঞ্চলে রপ্তানি নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। এ কাঠামো টিকিয়ে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাসসহ এ দু পরাশক্তিকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে দেয়া যাবে না। অর্থনৈতিক স্বার্থে এ অঞ্চলে ASEAN কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং নিজের প্রভাব বিস্তার করতে

APEC এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে যাচ্ছে। পরাশক্তি হওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা একান্ত জরুরি। চীনের তাইওয়ান, তিব্বত এবং জিং জিয়াংয়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া একদেশ দু নীতির প্রবক্তা চীন ভবিষ্যতে তার সমাজতান্ত্রিক নীতি এবং উদারিকরণ নীতির সমস্যা কতটা মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে তার ওপর অখণ্ডতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভর করবে। তাছাড়া এ অঞ্চলে উত্তর কোরিয়া সমস্যার অর্থবহ সমাধান জরুরি। কেননা যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার অজুহাতে এ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশের মাধ্যমে চীন এবং জাপানকে প্রভাবিত করতে চাইবে। যদিও উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী এবং যুক্তরাষ্ট্র সহজে যুদ্ধের মতো ঝুঁকিতে মাথা দিতে চাইবে না। কিন্তু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য উত্তর কোরিয়া সমস্যার সমাধান অপরিহার্য।

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার নব্য উত্থিত পরাশক্তি ভারত এ অঞ্চলের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হবে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে তার কৌশলগত অংশীদার হিসেবে নিয়েছে। ভারতকে এ অঞ্চলে পরাশক্তি বানানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য করছে। চীনকে প্রতিহত করতেই মূলত যুক্তরাষ্ট্রের এ ভূমিকা ভারতের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র থাকলেও ৯/১১ এর পরবর্তী পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতকে সমর্থন করছে। ভারত-পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা কাশ্মির ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের ফলে পাকিস্তান অনেকটা নমনীয় ভাব দেখাচ্ছে। ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আস্তে আস্তে উন্নতির পথে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের সংগঠন SAARC এর সাফল্যের মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সম্ভব এবং উদীয়মান বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারতের আগ্রহ এবং সদিচ্ছা এ অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করতে পারে।

কিন্তু, পরাশক্তি হওয়ার পেছনে রাষ্ট্রের যে অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাতে ভারতের খুব একটা সাফল্য নেই। বিভিন্ন রাজ্যের স্বাধীনতাকামীদের আক্রমণ এবং ধর্মীয় উত্তেজনা ভারতের জন্য প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। তাছাড়া বিশাল জনসংখ্যার জীবন মানের উন্নয়ন না ঘটিয়ে শুধু সামরিক দিকের অগ্রগতি ভারতের অখণ্ডতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। যেমনটি হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। আর এজন্য ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে আরো অনেক শক্তিশালী হতে হবে। তাছাড়া চীনের প্রতিপক্ষ হওয়ার মতো যোগ্যতা এখন পর্যন্ত ভারত অর্জন করেনি। যদি যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধাগুলো নিয়ে ভারত এগিয়ে যেতে পারে এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ পেতে পারে তবে ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত পরাশক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে। তাছাড়া ভারত শুধু আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। চীনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ভারত তার নিজের অবস্থানকে পোক্ত করতে পারে। SAARC-এ চীনের অন্তর্ভুক্তি এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

অতীতের ইতিহাস থেকে বিশ্লেষকরা এটাই শিক্ষা লাভ করেছেন যে, ভবিষ্যৎ সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে চীন এবং ভারত যদি ভেঙে না যায় এবং জাপান যদি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় না নামে তবে এশিয়া আগামীতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় থাকবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা তাকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত একক পরাশক্তির ভূমিকায় রাখবে বলে আশা করা যায়। সন্ত্রাসবাদ ও মুসলিম সন্ত্রাসবাদ এর বিরুদ্ধে বর্তমান যে যুদ্ধ তাতে এশিয়াই প্রভাবিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এশিয়ার এ পরাশক্তিদেরও সন্ত্রাসবাদ প্রধান সমস্যা হিসেবে সামনে আসবে। অথচ এসব সমস্যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর তৈরি। তাই সুন্দর, সুখী এবং সমৃদ্ধশালী বিশ্ব গড়তে হলে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সহযোগিতার মাধ্যমে চীন জাপান ও ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য শক্তিগুলোকে এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ক্রমবিকাশ আলোচনাপূর্বক একুশ শতকে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান নির্ণয় করুন।

উত্তর : স্বাধীন ভারতের প্রথম শাসক জওহরলাল নেহেরু দেশটির জন্মের দিন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৬৪ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত শাসন করেন। নেহেরু ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী এবং দক্ষ শাসক। তিনি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিরূপে ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) এবং পররাষ্ট্রনীতিরূপে জোট নিরপেক্ষতা অর্থাৎ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের ঝগড়া-বিবাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বহু জাতি-গোত্র-ধর্ম-বর্ণের ভারতকে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রোধ করে আর জোট নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের মর্যাদা বাড়ায়। আর একটি কারণে ভারত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মান কুড়ায়। তা হলো জন্মের পর থেকেই দেশটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে, যা দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের খুব কম দেশের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

পণ্ডিত নেহেরুর পররাষ্ট্রনীতি ভারতকে বহু বিপদ থেকে রক্ষা করে। সোভিয়েত-মার্কিন বিবাদ থেকে দূরে সরে থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে দু পক্ষ থেকেই লাভবান হয়েছেন। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর বিরোধের জের ধরে প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধে কাশ্মীর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হয় এবং কথা ছিল ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে একটি গণভোটের মাধ্যমে ঠিক করা হবে কাশ্মীরের ঐ অংশের মুসলিম জনগণ কোন পক্ষে যাবে। নেহেরু ঐ গণভোটের আয়োজনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমা শক্তির নানা চাপের মুখেও নেহেরু কখনো তা কার্যকর করেননি। কারণ তিনি জানতেন, পশ্চিমাদের যে কোনো চাপ তিনি সোভিয়েতদের নীরব সমর্থনের কারণে এড়িয়ে যেতে পারবেন। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে এর পূর্ব সীমান্ত ধরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড় পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ড দখল করে নেয়। ঐ সময় নেহেরু মার্কিনিদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য পেয়েছিলেন। চীন যদিও একতরফাভাবে কোনো ভারতীয় চাপ ছাড়াই দখলকৃত অংশ ছেড়ে দেয়, তবুও মনে করা হয় চীনাদের এই পিছু হটার পেছনে ভারতীয়দের প্রতি মার্কিন সাহায্যের একটা ভূমিকা ছিল।

শীতল যুদ্ধকালীন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন সোভিয়েত ব্লক ও মার্কিন ব্লকের কোনো না কোনো পক্ষে চলে যাচ্ছিল, সে সময়ে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে জওহরলাল নেহেরু তার আবিষ্কৃত ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির পাঁচটি নীতি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ নীতিগুলো বিখ্যাত 'পঞ্চশীলা' নামে তৃতীয় বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। নীতি পাঁচটি হচ্ছে :

১. প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রসমূহের শ্রদ্ধাবোধ।
২. প্রত্যেক রাষ্ট্র কর্তৃক অনাক্রমণ পন্থায় আস্থা স্থাপন।
৩. এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
৪. সাম্যনীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় পূর্ণ বিশ্বাস পরিপোষণ।
৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

এ পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে নেহেরু এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ সুকর্ন প্রমুখ নির্জোট আন্দোলন (Non-Aligned Movement) নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬, বর্তমানে ১২০। তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপক সংখ্যক রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কাগজে-কলমে হলেও নেহেরু আবিষ্কৃত এ পাঁচটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর ভারতকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জোট নিরপেক্ষতার মোহমুক্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য নিতে দেখা যায়। ১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে। সুযোগ বুঝে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী মার্কিনিদের থেকে দূরে সরে গিয়ে সোভিয়েত ব্লকে নিজের জায়গা করে নেয়। সে থেকে মুখে নির্জোটবাদ প্রচার করলেও ১৯৯১ সালে সোভিয়েত শক্তির ভাঙ্গন পর্যন্ত ভারত তার বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল এবং তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েত উত্তরাধিকারী রাশিয়ার সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করতে গেলে যে জিনিসটি এসে পড়ে তা হলো ভারতীয় ফরেন সার্ভিস। ভারতের রয়েছে অত্যন্ত সুগঠিত, দক্ষ এবং শিক্ষিত ফরেন সার্ভিস, যার কর্মীরা জটিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ভারতের সাথে আরব দেশগুলোর বিশেষ সম্পর্ক। ১৯৯০-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত সব ধরনের আরব-ইসরাইল সংঘর্ষে ভারত আরবদের সমর্থন দিয়েছে। এজন্য অবশ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির সাথে একাত্মতার একটা ব্যাপার রয়েছে। তবুও এ কথা সত্য যে, আরবদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত অত্যন্ত সফলতার সাথে পাক-ভারত বৈরিতার ব্যাপারটিকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সোভিয়েতের সাথে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ভারত কখনোই জোট নিরপেক্ষতার নীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়নি। এ ব্যাপারে ভারতের সহায়ক শক্তি ছিল জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর দারিদ্র্য। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর দারিদ্র্যকে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের সৃষ্টি বলে প্রচার করতো। নির্জোট আন্দোলনের অনেক নেতাই, যাদের মধ্যে নেহেরুসহ অন্যান্য ভারতীয় নেতারাও ছিলেন, এ প্রপাগান্ডাটি বিশ্বাস করতে পছন্দ করতেন। ফলে নির্জোট রাষ্ট্রগুলো অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শীতল যুদ্ধকালীন সময়ে নীতিগতভাবে সোভিয়েত মতাদর্শের কাছাকাছি অবস্থান করতো।

নেহেরুর মৃত্যুর পর থেকে ১৯৯০-এর দশকের গোড়া অবধি বেশির ভাগ সময়ই ভারত শাসন করেছেন তার মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী এবং নাতি রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরও নেহেরুর দল আরো পাঁচ বছর ভারত শাসন করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার নেতাদের দ্বারা বেশির ভাগ সময় পরিচালিত হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারত বেশ সম্মান এবং সমীহ অর্জনে সমর্থ হয়। ঔপনিবেশিকতা ও বর্ণবৈষম্য বা জাতিবিদ্বেষের বিরোধিতা করেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারত তার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলে।

বিশাল ভূখণ্ড, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতকে তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ও তা বাস্তবায়ন করতে সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। ১৯৬২ সালে চীনাদের হাতে মার খাওয়ার পর ভারত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নসহ আধুনিকীকরণ করতে থাকে। এসবই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির উজ্জ্বল দিক।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক অর্জনে ব্যর্থতা। তিন দিক ভারত দ্বারা ঘেরা বাংলাদেশ ভারতকে ভালো প্রতিবেশী মনে করে না। চীন-ভারত সীমান্ত চীন স্বীকার করে না এবং ভারত মনে করে চীন জোর করে ভারতের অনেক জায়গা (প্রায় ১৪ হাজার বর্গমাইল) দখল করে রেখেছে। চীন ভারতের অরুণাচল রাজ্যকে নিজের অংশ মনে করে। চীন-ভারতের মধ্যবর্তী বাফার স্টেট নেপালকে মাঝে মাঝেই ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। ভারত সীমান্তের দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ভুটানের সাথে ভারতের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তবে অভিযোগ আছে যে, সে সম্পর্কও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী সমতার ভিত্তিতে রচিত নয়। আর ভারত-পাকিস্তানের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এতটাই প্রবল যে, একজন আর একজনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতে চায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুটি অভ্যন্তরীণ ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের ভাবমূর্তির যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। এর একটি হলো ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির উত্থান আর অপরটি ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারত তার জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেছে। সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও ভারতীয় হিন্দুদের একটা অংশ কট্টর মৌলবাদী ভাবধারার অনুসারী। জাতীয় রাজনীতিতে ভারতীয় কংগ্রেসের ক্রমক্ষীয়মাণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে হিন্দু মৌলবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার শাখা-প্রশাখা ও মাতৃসংগঠন শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল প্রভৃতি কট্টর ডানপন্থী সংগঠন বর্তমান ভারতীয় সরকারের মূল চালিকাশক্তি। এরা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ত্যাগ করে ভারতকে একটি আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। সংখ্যালঘু মুসলিম এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর উগ্র হিন্দুদের আক্রমণ মাঝে মধ্যেই আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোর শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হতে দেখা যায়।

১৯৯৮ সালের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ভারতকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানাভাবে হাসিঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করেছে। কারণ দরিদ্র ভারত যেখানে কোটি কোটি মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে ব্যর্থ, সেখানে বিশ্বশক্তি হওয়ার বাসনায় চীনের সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে সে এ কাজটি করে। পারমাণবিক বোমার অধিকারী ভারত এখন সরাসরি চীনের পারমাণবিক বোমা ও শক্তিশালী মিসাইলের হুমকির সম্মুখীন। পারমাণবিক শক্তির অধিকারী বিশ্বের অন্য পাঁচ শক্তি (পাকিস্তান ছাড়া) রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, আমেরিকা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে বিশেষ সুযোগ ও মর্যাদা লাভ করে তার ছিটেফোঁটাও ভারতের কপালে জোটেনি।

এখন দেখা যাক, একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে উচ্চাভিলাষী ভারতের অবস্থান কি হবে? ভারত পৃথিবীতে একটি বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব দেখতে আগ্রহী, যেখানে সে নিজেই হবে একটা সুপার পাওয়ার। ইতিমধ্যে ভারত একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে এবং তার সফল প্রয়োগে ভারতের সুনাম বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে।

ভারতের মতো এত ধর্ম, এত বর্ণ, এত ভাষা, এত জাতি দুনিয়ার আর কোনো দেশে দেখা যায় না। অবশ্য এদের সবার একটা সাধারণ পরিচিতির কথা দেশটির ডানপন্থী নেতারা প্রকাশ করে থাকেন, আর তা হলো হিন্দুত্ব। এতগুলো ধর্ম-ভাষা-বর্ণের জায়গা করে দেয়ার লক্ষ্যে ভারতের নির্মাতারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু যেভাবে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী ধীরে ধীরে ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিটি জায়গা দখল করে নিচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারত একটি রাজনৈতিক হিন্দুসমাজে পরিণত হতে পারে। আর তা হলে বিশ্বশক্তির মর্যাদা লাভের প্রত্যাশী ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে।

সামরিক শক্তিতে ভারত অনেক উন্নতি সাধন করেছে এ কথা সত্য, তবুও তা পার্শ্ববর্তী বৃহৎ শক্তি গণচীনের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি। চীনের মিসাইলের রেঞ্জ ১১০০০ কিমি, অথচ এখনো ৩৫০০ কিমির বেশি যেতে পারে এমন কোনো ভারতীয় মিসাইল নেই। অস্ত্রশক্তির ক্ষেত্রে ভারতকে চীন মোটেই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না এবং চীনের এ মনোভাব খুবই যুক্তিসঙ্গত। ভারতের আচরণও চীনের এ মনোভাবের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। নানা ছোটখাট সীমান্ত বিষয়ে বৃহৎ ভারত তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের সাথে মারামারিতে ব্যস্ত। এত অনুদার মনোভাব নিয়ে কখনো বিশ্বশক্তি হবার মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। ভারতের বড় প্রত্যাশা, নিরাপত্তা পরিষদে একটি স্থায়ী আসন লাভ করা। কিন্তু দূর ভবিষ্যতেও তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

১৩। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কতটা দ্বন্দ্বমূলক ও কতটা সহযোগিতামূলক হবে বলে আপনি মনে করেন?

অথবা, **'ইউরোপীয় ইউনিয়ন সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী'।— যুক্তিসহ আপনার মতামত দিন।**

উত্তর : পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনগণ ধীরে ধীরে আমেরিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে গিয়ে বসবাস শুরু করে। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ ইংরেজ, জার্মান, আইরিশ, ফিন, সুইডিশ প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ফলে ঐতিহাসিক কারণেই কেবল রক্তের সম্পর্কের জন্যই ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকবে এমন ধারণা অমূলক নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিম ইউরোপ তথা আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একজোট হয়ে কাজ করে আসছে। তখন তাদের একমাত্র নিরাপত্তা উদ্বেগ ছিল তখনকার দ্বিমেরু বিশ্বের একমেরু সোভিয়েত ইউনিয়ন। অধিকাংশ পূর্ব ইউরোপীয় দেশে কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোরও কমিউনিস্ট প্রভাবাধীনে চলে আসার আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করতো, বিশ্ব পুঁজিবাদের অভিশাপ উচ্ছেদের পরিবর্তিত কাজ হওয়া উচিত পশ্চিম ইউরোপকে পুঁজিবাদমুক্ত করা। সোভিয়েতদের এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে বড় বাধা ছিল তাদের শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলো তখন নিজেদের অস্তিত্বের খাতিরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের আদর্শগত শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নকে মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে জোট বাঁধে। এভাবেই তৈরি হয় পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক জোট ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organization)।

গত শতকের নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের পতন পর্যন্ত ন্যাটো জোটের সব দেশেরই সাধারণ লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিহত করা। কিন্তু সোভিয়েত শক্তির যখন পতন হলো তখনও ন্যাটো জোট ভেঙ্গে গেল না। ইতিমধ্যে দ্বিমেরু বিশ্বব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। পৃথিবীতে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এমন কোনো শক্তিশালী দেশের আবির্ভাব ঘটেনি, শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হতে পারে। যদিও এখন পর্যন্ত শীতল যুদ্ধোত্তর কোনো নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেনি, তবুও অন্তর্বর্তীকালীন এ সময়ে সমগ্র বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় সাবেক শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব না থাকায় সামরিক জোট ন্যাটো তার উদ্দেশ্য ঠিক করতে হিমশিম খাচ্ছে।

এ পটভূমিতে ন্যাটো জোট তার নতুন এজেন্ডা তৈরি করেছে কতকগুলো গৌণ বিষয় যেমন— মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ইসলামী সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা ইত্যাদি। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়ায় তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে চায়, তাই এসব বিষয়ে তার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে একক কোনো দেশ নেই, যে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভূমিকা রাখতে চায়। এ দেশগুলো মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের সাথে সংঘাতে যেতে চায় না। আর ইসলামী জঙ্গীবাদ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যতটা হুমকি বহন করে, এসব

দেশের জন্য ততোটা করে না। কাজেই পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোভুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একটা চাপা মতবিরোধ দেখা দেয়। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যে সব বিষয়ে একই অবস্থান থাকবে না এটা তারই ইঙ্গিত বহন করে।

গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যানারে নিজেদের মধ্যে এক ধরনের কনফেডারেশন ব্যবস্থা সফলতার সাথে গড়ে তুলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ জোট অত্যন্ত সফল। এখন এ জোট রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে। যদিও অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা কম, তবুও এর অর্থনৈতিক সাফল্য একে একটি রাজনৈতিক সত্তার ভাবমূর্তি দান করেছে এবং এ জোটের সম্মিলিত অর্থনৈতিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি। ফলে সম্মিলিত ইউরোপীয় জোট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক বা সামরিক যে কোনো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবার ক্ষমতা রাখে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতেই একদিকে ইউরোপীয়দের জোটবদ্ধতা, অন্যদিকে নতুন বিশ্বব্যবস্থা এবং উভয় পক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ভিন্নতা ভবিষ্যতে এ দু পক্ষের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটাবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একমাত্র ব্রিটেনই যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত মিত্র। ফ্রান্স কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের মতামত বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়নি। গত কয়েক বছর ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই বৃহত্তম শক্তি জার্মানি ও ফ্রান্স আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফলে ন্যাটো জোটে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয়দের মতের অমিল ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় দেশগুলোর মতবিরোধ ক্রমেই বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ-উপরোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত তথাকথিত শত্রুদেশ বা দুষ্টুদেশ (Rogue Country) ইরান, লিবিয়া, কিউবা ইত্যাদি দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে। ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য, চীন প্রভৃতি দেশ সম্পর্কেও ইউরোপীয় আর আমেরিকানদের মধ্যে মতবিরোধ দিন দিন বাড়ছে। এ দু পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক শীতলীকরণের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় আলামত হলো একটি সম্মিলিত ইউরোপীয় রিজার্ভ ফোর্স গঠন। বলা হচ্ছে, এ ফোর্স ভবিষ্যতে ইউরোপের নিরাপত্তা বিধান করবে। অনেকের মতে, এ ফোর্স ভবিষ্যতে ন্যাটোর ভাঙ্গনের কারণ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন তাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এ ব্যবস্থা হলো কোনো শত্রু দেশের মিসাইলগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আঘাত হানার পূর্বেই তাদের আকাশে ধ্বংস করে দেয়া। চীন, রাশিয়া এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সব সময়ই জানিয়ে আসছে। ইউরোপীয়রাও এ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচির বিরোধী। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক জেনারেল কলিন পাওয়েল বলেছেন, ইউরোপীয়রা চাক বা না চাক, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচি এগিয়ে চলবে। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে মার্কিনি আর ইউরোপীয়দের গত পাঁচ দশকের উষ্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে অম্লমধুর সম্পর্কে রূপ নিতে পারে।

ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাঁক শিরাক স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচি নতুন করে বিশ্বজুড়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করবে। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় এহেন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয়রা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তাদেরও অস্ত্রাগারগুলো নতুন করে সজ্জিত করতে হবে। এমন একটি কাজ হবে শান্তিকামী ইউরোপীয়দের স্বার্থের পরিপন্থী। এজন্য ব্রিটেন ছাড়া পশ্চিম

ইউরোপের প্রায় সব দেশ খোলাখুলিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এ জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির সমালোচনা করছে। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র তার ইউরোপীয় মিত্রদের এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হয়নি।

আর একটি বিষয় নিয়ে অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। কসোভোয় ন্যাটোর বোমাবর্ষণের পর থেকে ইউরোপীয়রা ভবিষ্যতে বলকান বা অন্য কোনো অঞ্চলে অনুরূপ কোনো সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তা চিন্তা করে দেখছে। এরই ফলস্বরূপ তারা Rapid Reaction Force নামে দ্রুত মোতায়েনযোগ্য একটি ইউরোপীয় Military Force তৈরি করার চিন্তা করছে। ইউরোপীয়রা তাদের এই পরিকল্পনা নিয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। মার্কিনিরা এ Rapid Reaction Force-কে ন্যাটোর মধ্যে আর একটি ন্যাটো হিসেবে দেখছে, যেখানে মার্কিনিদের কোনো রকম ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটা বড় আঘাত এবং এটা সে পাচ্ছে দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশগুলোর কাছ থেকে। শীতল যুদ্ধকালীন ইউরোপীয়দের আমেরিকানদের পাশ কাটিয়ে কোনো প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়নের সাহস কল্পনাও করা যেত না। অনেক আমেরিকানই মনে করে এই Rapid Reaction Force হলো বিপদ কেটে যাবার পর ইউরোপীয়দের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

এসব ছোট-বড় ঘটনা মিলিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কল্পনা করতে পারি। প্রতিটি ঘটনাই এক ধরনের সম্পর্ক শীতলীকরণের ইঙ্গিত বহন করছে। এসব ছাড়াও বিগত বছরগুলোতে বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে মার্কিনিদের সাথে ইউরোপীয়দের অনেক ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে। এসব ছোট-খাট দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত হয়তো সাবেক এ দুই ঘনিষ্ঠ মিত্র ইউরোপ ও আমেরিকাকে শত্রুতে পরিণত করবে না। তবে এসব ঘটনা তাদের মৈত্রী বন্ধন যে অটুট থাকবে না, তারও ইঙ্গিত বহন করছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ **যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম ও তাদের পদবি কি?**

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম জন ফরবেস কেরি (১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩-) এবং তার পদবি সেক্রেটারি অব স্টেটস এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম সুষমা স্বরাজ (২৮ অক্টোবর ২০১২-) এবং তার পদবি মিনিস্টার অব এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স।

প্রশ্ন-০২ **সংক্ষেপে চীনের পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখ করুন।**

উত্তর : বর্তমানে চীনের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীর সমর্থন নিয়ে তাইওয়ানকে চীনের অঙ্গীভূত করা; দ্বিতীয়ত চীনের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, তিব্বত নিয়ে দুনিয়ার কোথাও যেন হৈ চৈ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা; তৃতীয়ত এশিয়ার বাংলাদেশ, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া ও মিয়ানমারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তবে চীনের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা তার অভ্যন্তরীণ কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ।

প্রশ্ন-০৩ **'এক দেশ দুই নীতি' বলতে কি বোঝায়? কোন দেশে এ নীতি চালু রয়েছে?**

উত্তর : ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন মধ্য রাতে হংকং চীনের শাসনাধীন হওয়ার পর 'এক দেশ দুই নীতি' কার্যকর করা হয়। 'এক দেশ দুই নীতি' বলতে বোঝায় হংকংয়ের ওপর চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও হংকং তার আগের সুবিধাদি ভোগ করবে। বিশেষ করে অর্থনীতিতে অবাধমুক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বত্রই হংকং পূর্বের মতো সুযোগ-সুবিধা পাবে। অর্থাৎ দেশ একটি কিন্তু নীতিতে দুই। এ নীতি চালু রয়েছে চীনে।

প্রশ্ন-০৪ **PL-480 কি?**

উত্তর : PL-480 হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইন, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে খাদ্য সাহায্য প্রদান করে। এর অন্য নাম Food for Peace। PL-480 এর পূর্ণরূপ হলো Public Law-480। PL-480-এর ক্ষেত্রসমূহ হলো ১. দুর্যোগপূর্ণ ও জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা, ২. যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোনো অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে অথবা কোনো ব্যক্তিগত সংস্থাকে সাহায্য প্রদান করা এবং ৩. মার্কিন সরকারের সাথে বৈদেশিক সরকারসমূহ অথবা কোনো বৈদেশিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চুক্তির মাধ্যমে খাদ্য প্রদান করা।

প্রশ্ন-০৫ **ভারতে মুক্তবাজার অর্থনীতির জনক কে?**

উত্তর : ভারতের মুক্তবাজার অর্থনীতির জনক ড. মনমোহন সিং। ১৯৯১-৯৬ সালে নরসীমা রাওয়ের আমলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হিসেবে ড. মনমোহন সিং ভারতের অর্থনীতিকে উদারীকরণের মাধ্যমে বিশ্বায়নের পথে নিয়ে আসেন। তিনি ২০০৪ সালের ২২ মে নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহাসিক অশোক হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ভারতের চতুর্দশ প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের ইতিহাসে প্রথম সংখ্যালঘু (প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-০৬ **যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?**

উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সবসময়েই তথ্য এবং বাস্তবের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করলেও অন্যান্য দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্বৈরাচারী সরকার গঠন করে সংশ্লিষ্ট দেশের জনসাধারণের

গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করতে কখনোই কুণ্ঠাবোধ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একটি সংগঠিত রূপ লাভ করেছে। এ সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শগত বিচার-বিবেচনার দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে নিজের সম্পদ এবং শক্তিকে প্রয়োগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. কমিউনিজমের প্রসার রোধ এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সার্বিকভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে পরিবেষ্টন (encirclement)-এর নীতি অনুকরণ।
২. সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতার নীতি প্রতিষ্ঠা।
৩. আণবিক মারণাস্ত্র উৎপাদন এবং মহাকাশ অভিযান প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত করা।
৪. পশ্চিম ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও ইন্দোচীনে আঞ্চলিক যুদ্ধ এবং অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা।
৫. আমেরিকার বিভিন্ন দেশে নিজের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
৬. অর্থনৈতিক জোট গঠন ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০৭ যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতি বা বৈশিষ্ট্য কি কি?

উত্তর : গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করেছে। ঐ নীতিগুলোই হলো আন্তর্জাতিক সমস্যা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটেনের দিক নির্দেশিকা। ঐ নীতিসমূহ হলো :

১. নিজের ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ। এজন্য সহজে নিজের প্রাক্তন উপনিবেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। প্রত্যক্ষভাবে উপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও গ্রেট ব্রিটেন পরোক্ষভাবে নিজের উপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করেছে।
২. যুক্তরাজ্য নিজের অর্থনৈতিক দুর্বলতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিষয়ক পরিকল্পনা, মার্শাল পরিকল্পনার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছে। গ্রেট ব্রিটেন অর্গানাইজেশন ফর ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কো-অপারেশন (OEEC)-এর সাথে সহযোগিতা করেছে। ষাটের দশকে গ্রেট ব্রিটেন কমন মার্কেট বা ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটিতে যোগ দেয়।
৩. যুক্তরাজ্য কমনওয়েলথের মাধ্যমে নিজের আন্তর্জাতিক স্বার্থ এবং প্রভাব বজার রাখা চেষ্টা করছে।
৪. যুক্তরাজ্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও নব্য উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সব আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। এ কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়াসহ সর্বত্রই চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী, বর্ণবিদ্বেষী এবং নব্য উপনিবেশিক শাসকদের পক্ষ অবলম্বন করেছে।
৫. যুক্তরাজ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সামরিক জোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের জাতীয় নিরাপত্তাকে সংরক্ষিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। ন্যাটো, বাগদাদ চুক্তি জোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেছে। ন্যাটোকে জঙ্গি মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত করাই যুক্তরাজ্যের স্বীকৃত নীতিতে পরিণত হয়েছে।
৬. যুক্তরাজ্য সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। প্রথাগত সামরিক শক্তি এবং আণবিক মারণাস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করেছে। সাম্প্রতিককালে ন্যাটোর সামরিক সম্ভারে আধুনিকীকরণের অন্যতম উদ্যোগী অংশীদার হলো গ্রেট ব্রিটেন।
৭. যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রনীতির মতাদর্শগত ভিত্তি হলো সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা। এ কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন সমাজতান্ত্রিক শিবিরবিরোধী জোটের অন্যতম প্রধান প্রবক্তায় পরিণত হয়েছে। গ্রিস, সাইপ্রাস, মধ্যপ্রাচ্য সর্বত্রই বামপন্থী শক্তির অগ্রগতিরোধে ব্রিটেন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন-০৮ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

উত্তর : জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম নেতা হিসেবে ভারত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তার স্বীকৃত রাজনৈতিক মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন। ভারতের সংবিধানেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা-নির্দেশক নীতির মধ্যে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বিরোধের অবসানে ভারত শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পথে সব বিরোধের মীমাংসা করা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সব সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধানের ওপর ভিত্তি করেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্রোতধারা প্রবাহিত।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো, জোট নিরপেক্ষতা, পঞ্চশীল, উপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধের মীমাংসা, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সাধন, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরোধিতা, নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য নিরন্তর প্রয়াস, জাতি ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মানবকল্যাণে আণবিক শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদি।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুই ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির জনক। তিনিই নির্জোট আন্দোলন ও জোট নিরপেক্ষতার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, ভারত কোনো শক্তিজোটে অংশগ্রহণ করবে না। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতা থেকে ভারত দূরে থাকবে। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

জোটনিরপেক্ষতা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির স্তম্ভবিশেষ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই ভারত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ নীতি অনুসরণ করেছে। বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত সর্বদাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামরিকীকরণ, সামরিক জোট গঠন, বিদেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির বিরোধিতা করেছে। নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিনা শর্তে সামরিক সাহায্য গ্রহণ এবং অস্ত্র ক্রয় করেছে। নিছক আত্মরক্ষার জন্যই ঐ অস্ত্র সংগ্রহ। ভারত ন্যাটো, সিয়াটো বা সেন্টো সামরিক জোটসমূহের বিরোধিতা করেছে। কারণ, ঐ জোটসমূহ ছিল আক্রমণাত্মক, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যম ও হাতিয়ার। ঐ সব সামরিক জোট আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

প্রশ্ন-০৯ চীনের বিচ্ছিন্নতাবিরোধী আইন ও তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : চীন হলো অর্থনীতিতে বিশ্বের দ্বিতীয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানধারী একটি দেশ। অন্যদিকে তাইওয়ান এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতি এবং পশ্চিমা গণতান্ত্রিক চর্চার 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত স্বাধীনতাকামী দেশ। চীনের সাথে স্বাধীনতা প্রশ্নে সৃষ্ট অসমাপ্ত সমস্যাই দেশ দুটোর মধ্যে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টির মূল কারণ। বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাশক্তি চীন তাইওয়ানকে মূল ভূখণ্ডের একটি বিচ্ছিন্ন প্রদেশ হিসেবে মনে করে, যা 'পুনরায় একত্রীকরণ'-এর মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। চীন এজন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে আগ্রহী। যার সূত্র ধরেই ২০০৫ সালের ১৪ মার্চ চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসে পাস হয় 'বিচ্ছিন্নতাবিরোধী আইন'। যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান ও তাইওয়ানের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে চীন এ আইনটি পাস করে। আইনটির মোট ১০টি অনুচ্ছেদের প্রথমটিতে বলা হয়, চীন 'স্বাধীন তাইওয়ান' তত্ত্বের বিরোধী এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌম চীন যে কোনো মূল্যে রক্ষা করবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'অনুচ্ছেদ-৮', যেখানে বলা হয়, তাইওয়ান স্বাধীন মর্যাদা ঘোষণা করলে চীনের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশন তৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবে। জাতীয় অক্ষণ্ডতা বজায় রাখতে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের জরুরি বৈঠক ছাড়াই স্ট্যান্ডিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সর্বশেষ ১৯৯৯ সালে চীন এবং তাইওয়ান সম্পর্কের অতি অবনতির পর এ আইন পাস আবার সম্পর্কে ফটলের সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় তাইওয়ান চীনের সাথে একীভূত থাকবে, নাকি স্বাধীনতা ঘোষণা করবে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল।

ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র পরিচিতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

প্রশ্ন : প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদর দপ্তর হচ্ছে—
উত্তর : ইউকোসুক।
প্রশ্ন : 'কলম্বাস' আমেরিকা আবিষ্কার করেন কত সালে?
উত্তর : ১৪৯২ সালে।
প্রশ্ন : আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক কে?
উত্তর : জর্জ ওয়াশিংটন (প্রথম প্রেসিডেন্ট)।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলারা কবে ভোটাধিকার লাভ করে?
উত্তর : ১৯২০ সালে (সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে)।
প্রশ্ন : মার্কিন সিনেটে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিল পাস হয় কবে?
উত্তর : ৯ অক্টোবর ১৯৯৮।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ১৭৮৯ সালে।
প্রশ্ন : কবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হয়?
উত্তর : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুমোদিত হয় কত সালে?
উত্তর : ২১ জুন ১৭৮৮।
প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ 'রক্সি' যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহরে অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্কে।
প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম পার্কের নাম কি এবং কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ইয়েলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পরিচালিত সন্ত্রাস নিরোধ কর্মসূচির নাম কি?
উত্তর : Terrorist Interdiction Program (TIP)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের ভোটিং সিস্টেমের উদ্ভাবক কে?
উত্তর : উইলিয়াম রওভেবল।
প্রশ্ন : বারাক ওবামার রাজনৈতিক দলের নাম কি?
উত্তর : ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।
প্রশ্ন : ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতীক কি?
উত্তর : গাধা।
প্রশ্ন : রিপাবলিকান পার্টির প্রতীক কি?
উত্তর : হাতি।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাধারণত কি হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : রানিংমেট।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ 'সিনেটে'র প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : ভাইস প্রেসিডেন্ট।
প্রশ্ন : বারাক ওবামা কোন রাজ্যের সিনেটর ছিলেন?
উত্তর : ইলিনয়।
প্রশ্ন : 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার' ও 'দ্য অডাসিটি অব হোপ' গ্রন্থের লেখক কে?
উত্তর : বারাক ওবামা।
প্রশ্ন : 'লিভিং হিস্টোরি' গ্রন্থের লেখক কে?
উত্তর : হিলারি ক্লিনটন।
প্রশ্ন : 'মাই লাইফ' গ্রন্থের লেখক কে?
উত্তর : বিল ক্লিনটন।
প্রশ্ন : হিলারি ক্লিনটন কোন রাজ্যের সিনেটর ছিলেন?
উত্তর : নিউইয়র্ক।
প্রশ্ন : ওয়াটার গেট কি?
উত্তর : ওয়াশিংটনের একটি বাণিজ্যিক ভবন। এখানে ডেমোক্র্যাট দলের রাজনৈতিক অফিস ছিল।
প্রশ্ন : ফ্রান্স কত সালে যুক্তরাষ্ট্রকে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উপহার দেয়?
উত্তর : ১৮৮৬ সালে।
প্রশ্ন : হোয়াইট হাউসের স্থপতি কে?
উত্তর : আইরিশ স্থপতি জেমস হোবান।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করা হয় কবে?
উত্তর : ১৮৬৩ সালে।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে?
উত্তর : ১৮৬১-১৮৬৫ সাল পর্যন্ত।
প্রশ্ন : আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ করেন কে?
উত্তর : আমেরিগো ভেসপুচি (১৪৯৭ সালে)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর কোনটি?
উত্তর : পেন্টাগন (ওয়াশিংটন)।
প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন কোনটি?
উত্তর : পেন্টাগন।
প্রশ্ন : 'ফেয়ার ফ্যাক্স' কি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা।
প্রশ্ন : 'ব্লাক ওয়াটার' কি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা।
প্রশ্ন : 'লস অ্যাঞ্জেলস' কেন বিখ্যাত?
উত্তর : চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য (যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে অবস্থিত)।
প্রশ্ন : 'মাদার অব অল বোম্বস' কোন দেশের?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে প্রথম নারী ফোর স্টার (চার তারকা) জেনারেলের নাম কি?
উত্তর : লে. জে. অ্যান ই ডানউডি।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় মুসলিম কংগ্রেসম্যান কে?
উত্তর : ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত আন্দ্রে কারসন।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় প্রথম মুসলিম কংগ্রেসম্যান কে?
উত্তর : কিথ এলিসন।
প্রশ্ন : 'নেশন অব ইসলাম' পার্টির নেতা কে?
উত্তর : লুই ফারাহ খান।
প্রশ্ন : আমেরিকার বিখ্যাত মূর্তি স্ট্যাচু অব লিবার্টির স্থপতি কে?
উত্তর : ফ্রেডারিক অগাস্তে বার্থেওয়ালদি।
প্রশ্ন : প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য কতটি ইলেক্টোরাল ভোট পেতে হয়?
উত্তর : ২৭০টি।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের মোট ইলেক্টোরাল ভোট কতটি?
উত্তর : ৫৩৮টি।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যের ইলেক্টোরাল ভোট সবচেয়ে বেশি?
উত্তর : ক্যালিফোর্নিয়া (৫৫টি)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মোট সিনেট-এর আসন সংখ্যা কত?
উত্তর : ১০০টি (প্রতি রাজ্যে ২টি করে)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের সংখ্যা কত?
উত্তর : ৪৩৫টি।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করেন কে?
উত্তর : জেমস মেডিসন।
প্রশ্ন : 'ইলেক্টোরাল কলেজ' কি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলী।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় কতটি তারকা রয়েছে?
উত্তর : ৫০টি।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় প্রথম কতটি তারকা ছিল?
উত্তর : ১৩টি।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা কত সালে ভোটাধিকার পায়?
উত্তর : ১৯৫৭ সালে।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হিস্পানিক ও তৃতীয় নারী বিচারপতি কে?
উত্তর : সোনিয়া সোটোমেয়র।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী বিচারপতি কে?
উত্তর : সান্দ্রা ডে ও'কনোর।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম নারী স্পিকারের নাম কি?
উত্তর : ন্যান্সি পেলোসিও।
প্রশ্ন : কোন দেশ এসডিআই প্রতিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপ অঞ্চলটি এখন কি নামে পরিচিত?
উত্তর : গ্রাউন্ড জিরো।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : পেন্টাগনে।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রে কোন তারিখ থেকে অর্থবছর শুরু হয়?
উত্তর : ১ অক্টোবর।
প্রশ্ন : ওয়াল স্ট্রিট কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্ক।
প্রশ্ন : NASDAQ কোন দেশের পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : কোন দেশটির পারমাণবিক কার্যক্রমের ওপর নজর রাখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?
উত্তর : ইরান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা

১৯ এপ্রিল ১৭৭৫ উত্তর আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ একসাথে যুক্তরাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। এরপর ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই ১৩টি উপনিবেশ যুক্তরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৭৮ ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় এবং দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে এবং উপনিবেশসমূহকে সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে থাকে।

১৯ অক্টোবর ১৭৮১ ব্রিটিশ সেনাপ্রধান লর্ড কর্নওয়ালিস মার্কিন সেনাপ্রধান জর্জ ওয়াশিংটনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ২০ মার্চ ১৭৮২ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মার্কিন বিজয়ের দুই বছর পর অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৪ জানুয়ারি ১৭৮৪ মার্কিন কংগ্রেস যুক্তরাজ্যের সাথে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তি অনুমোদন করে, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়। এ যুদ্ধ ছিল ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে প্রথম সফল স্বাধীনতা যুদ্ধ।

প্রশ্ন : ওয়েস্ট পয়েন্টে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত?
উত্তর : সামরিক একাডেমী।
প্রশ্ন : ৯/১১ ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করে?
উত্তর : ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি।
প্রশ্ন : মার্কিন প্রেসিডেন্টের সহধর্মিনীকে কি বলা হয়?
উত্তর : ফার্স্ট লেডি।
প্রশ্ন : বর্তমান ফার্স্ট লেডির নাম কি?
উত্তর : মিশেল ওবামা।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ফার্স্ট লেডি কে?
উত্তর : মিশেল ওবামা।
প্রশ্ন : জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রদূত কে?
উত্তর : জালমে খলিলজাদ (আফগান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ এটর্নি জেনারেলের নাম কি?
উত্তর : এরিক হোল্ডার।
প্রশ্ন : জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় নারী রাষ্ট্রদূতের নাম কি?
উত্তর : সুসান রাইস।

প্রশ্ন : এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি কি?
উত্তর : 'আসিয়ান' জোটকে সমর্থন করা।
প্রশ্ন : ব্রডওয়ে কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্কে।
প্রশ্ন : গ্রানাডাতে যুক্তরাষ্ট্র কত সালে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছিল?
উত্তর : ১৯৮৩ সালে।
প্রশ্ন : প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রটির উদ্ভাবক কোন দেশ?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি রাজ্যের মধ্যে কোন রাজ্য দুটি মূল ভূখণ্ডের বাইরে?
উত্তর : হাওয়াই ও আলাস্কা।
প্রশ্ন : প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়?
উত্তর : ১৩টি।
প্রশ্ন : আলাস্কা রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশের কাছ থেকে ক্রয় করে?
উত্তর : রাশিয়ার কাছ থেকে (১৮৬৭ সালে ৭২ লাখ ডলার মূল্যে)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র লুইজিয়ানা রাজ্যটি কোন দেশের কাছ থেকে কিনে নেয়?
উত্তর : ফ্রান্স (১৮০৩ সালে)।
প্রশ্ন : আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অঙ্গরাজ্য কোনটি?
উত্তর : আলাস্কা।
প্রশ্ন : আয়তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ছোট অঙ্গরাজ্য কোনটি?
উত্তর : রোডস আইল্যান্ড।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের মোট অঙ্গরাজ্য কতটি?
উত্তর : ৫০টি (এছাড়া একটি স্বাধীন জেলা ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া)।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় ৫০তম তারকা হিসেবে যুক্ত হয় কোন অঙ্গরাজ্য?
উত্তর : হাওয়াই (৪ জুলাই ১৯৬০)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নে কোন স্টেট সর্বশেষে যোগ দেয়?
উত্তর : হাওয়াই।
প্রশ্ন : ব্রিটেনের বণিক সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্রের কতটি অঙ্গরাজ্যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল?
উত্তর : ১৩টি।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যে ইউরোপীয় নাগরিকরা প্রথমে বসতি স্থাপন করে?
উত্তর : মেরিল্যান্ড।
প্রশ্ন : ক্যাম্প ডেভিড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত?
উত্তর : মেরিল্যান্ড।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে কি বলা হয়?
উত্তর : Secretary of State.
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : মেডেলিন অলব্রাইট।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : কলিন পাওয়েল।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : কন্ডোলিৎসা রাইস।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ও ৬৮তম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : জন ফরবেস কেরি (তিনি ম্যাসাচুসেটসের সিনেটর ছিলেন)।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল কত?
উত্তর : ৪ বছর।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কততম প্রেসিডেন্ট?
উত্তর : ৪৪তম।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : বারাক ওবামা।
প্রশ্ন : বারাক ওবামার বাবা বারাক ওবামা সিনিয়র কোন দেশী বংশোদ্ভূত?
উত্তর : কেনিয়া।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আফ্রো-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : বারাক ওবামা।
প্রশ্ন : সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কোন নাগরিক হতে হবে?
উত্তর : জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে হলে কত বছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের প্রমাণ থাকতে হবে?
উত্তর : ১৪ বছর।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স কত?
উত্তর : ৩৫ বছর।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করেন কে?
উত্তর : আব্রাহাম লিংকন।
প্রশ্ন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন কবে ক্রীতদাসদের স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা দান করেন?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৮৬৩।
প্রশ্ন : আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের কততম প্রেসিডেন্ট ছিলেন?
উত্তর : ১৬তম।
প্রশ্ন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
উত্তর : উড্রো উইলসন (২৮তম প্রেসিডেন্ট)।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
উত্তর : রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় কে প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন?
উত্তর : বিল ক্লিনটন।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট হলিউডের অভিনেতা ছিলেন?
উত্তর : রোনাল্ড রিগ্যান (৪০তম প্রেসিডেন্ট)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র কোন প্রেসিডেন্ট পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : জন এফ কেনেডি (৩৫তম প্রেসিডেন্ট)।
প্রশ্ন : জন এফ কেনেডি কোন বইটির জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান?
উত্তর : প্রোফাইল ইন ক্যারেজ (১৯৫৫ সালে)।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট 'ওয়াটার গেট' কেলেংকারীর সাথে জড়িত ছিল?
উত্তর : রিচার্ড নিক্সন (৩৭তম প্রেসিডেন্ট)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যে এ পর্যন্ত কতজন শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান?
উত্তর : ৪ জন। (১) থিওডোর রুজভেল্ট (১৯০৬ সালে), (২) উড্রো উইলসন (১৯১৮ সালে), (৩) জিমি কার্টার (২০০২ সালে) ও ৪. বারাক ওবামা (২০০৯)।
প্রশ্ন : প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান কে?
উত্তর : থিওডোর রুজভেল্ট (১৯০৬ সালে)।
প্রশ্ন : ২০০২ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের কততম প্রেসিডেন্ট?
উত্তর : ৩৯তম।
প্রশ্ন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট ৩ মেয়াদকালের জন্য (১২ বছর) ক্ষমতায় ছিলেন?
উত্তর : ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (১৯৩৩-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : থিওডোর রুজভেল্ট; ক্ষমতা গ্রহণের সময় বয়স ৪২ বছর ৩২২ দিন (২৬তম প্রেসিডেন্ট)।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : জন এফ কেনেডি; ক্ষমতা গ্রহণের সময় ৪৩ বছর ২৩৬ দিন (৩৫তম প্রেসিডেন্ট)।
প্রশ্ন : বসনিয়ায় যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরের মধ্যস্থতাকারী কে?
উত্তর : জিমি কার্টার।
প্রশ্ন : কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
উত্তর : জন এফ কেনেডি।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : রিচার্ড নিক্সন।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ও প্রধান প্রশাসনিক দপ্তরের নাম কি?
উত্তর : হোয়াইট হাউস।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অফিস কি নামে পরিচিত?
উত্তর : ওভাল অফিস।
প্রশ্ন : কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কখনো হোয়াইট হাউসে বসবাস করেননি?
উত্তর : জর্জ ওয়াশিংটন।
প্রশ্ন : হোয়াইট হাউসে বসবাসকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : জন এডামস।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমানের নাম কি?
উত্তর : এয়ারফোর্স ওয়ান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণের তালিকা

রাষ্ট্রপতির নাম	দল	মেয়াদকাল	সংশ্লিষ্ট রাজ্য
১. জর্জ ওয়াশিংটন	–	৩০.০৪.১৭৮৯-০৩.০৩.১৭৯৭	ভার্জিনিয়া
২. জন এডামস	ফেডারালিস্ট	০৪.০৩.১৭৯৭-০৩.০৩.১৮০১	ম্যাসাচুসেটস
৩. টমাস জেফারসন	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮০১-০৩.০৩.১৮০৯	ভার্জিনিয়া
৪. জেমস মেডিসন	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮০৯-০৩.০৩.১৮১৭	ভার্জিনিয়া
৫. জেমস মনরো	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮১৭-০৩.০৩.১৮২৫	ভার্জিনিয়া
৬. জন কুইন্সি এডামস	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮২৫-০৩.০৩.১৮২৯	ম্যাসাচুসেটস
৭. এন্ড্রু জ্যাকসন	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৮২৯-০৩.০৩.১৮৩৭	সাউথ ক্যারোলিনা
৮. মার্টিন ভান বুরেন	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৮৩৭-০৩.০৩.১৮৪১	নিউইয়র্ক
৯. উইলিয়াম হেনরি হেরিসন	উয়িং	০৪.০৩.১৮৪১-০৪.০৪.১৮৪১	ভার্জিনিয়া
১০. জন টেলার	–	০৬.০৪.১৮৪১-০৩.০৩.১৮৪৫	ভার্জিনিয়া
১১. জেমস নক্স পল্ক	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৮৪৫-০৩.০৩.১৮৪৯	নর্থ ক্যারোলিনা
১২. জেচারি টেলর	উয়িং	০৫.০৩.১৮৪৯-০৯.০৭.১৮৫০	ভার্জিনিয়া
১৩. মিলার্ড ফিলমোর	উয়িং	১০.০৭.১৮৫০-০৩.০৩.১৮৫৩	নিউইয়র্ক
১৪. ফ্রাঙ্কলিন পেয়ারসি	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৮৫৩-০৩.০৩.১৮৫৭	নিউ হ্যাম্পশায়ার
১৫. জেমস বুকানন	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৮৫৭-০৩.০৩.১৮৬১	পেনসিলভেনিয়া
১৬. আব্রাহাম লিঙ্কন	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮৬১-১৫.০৪.১৮৬৫	কেনটাকি

রাষ্ট্রপতির নাম	দল	মেয়াদকাল	সংশ্লিষ্ট রাজ্য
১৭. এন্ড্রু জনসন	ডেমোক্রেটিক	১৫.০৪.১৮৬৫-০৩.০৩.১৮৬৯	নর্থ ক্যারোলিনা
১৮. ইউলিসেস সিম্পসন গ্রান্ট	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮৬৯-০৩.০৩.১৮৭৭	ওহিও
১৯. রাদারফোর্ড রিচার্ড হেইস	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮৭৭-০৩.০৩.১৮৮১	ওহিও
২০. জেমস এবরাম গারফিল্ড	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮৮১-১৯.০৯.১৮৮১	ওহিও
২১. চেস্টার এলান আর্থার	রিপাবলিকান	২০.০৯.১৮৮১-০৩.০৩.১৮৮৫	ভারমন্ট
২২. গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৮৮৫-০৩.০৩.১৮৮৯	নিউজার্সি
২৩. বেনজামিন হ্যারিসন	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮৮৯-০৩.০৩.১৮৯৩	ওহিও
২৪. গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৮৯৩-০৩.০৩.১৮৯৭	নিউজার্সি
২৫. উইলিয়াম ম্যাকেনলি	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৮৯৭-১৪.০৯.১৯০১	ওহিও
২৬. থিওডোর রুজভেল্ট	রিপাবলিকান	১৪.০৯.১৯০১-০৩.০৩.১৯০৯	নিউইয়র্ক
২৭. উইলিয়াম হোয়ার্ড ট্যাফ্ট	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৯০৯-০৩.০৩.১৯১৩	ওহিও
২৮. উড্রো উইলসন	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৯১৩-০৩.০৩.১৯২১	ভার্জিনিয়া
২৯. ওয়ারেন গামালিয়েল হার্ডিং	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৯২১-০২.০৮.১৯২৩	ওহিও
৩০. ক্যালভিন কোলিজ	রিপাবলিকান	১৩.০৮.১৯২৩-০৩.০৩.১৯২৯	ভারমন্ট
৩১. হার্বার্ট ক্লার্ক হোভার	রিপাবলিকান	০৪.০৩.১৯২৯-০৩.০৩.১৯৩৩	আইওয়া
৩২. ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট	ডেমোক্রেটিক	০৪.০৩.১৯৩৩-১২.০৪.১৯৪৫	নিউইয়র্ক
৩৩. হ্যারি এস. ট্রুম্যান	ডেমোক্রেটিক	১২.০৪.১৯৪৫-২০.০১.১৯৫৩	মিসৌরি
৩৪. ডেভিড আইসেনহাওয়ার	রিপাবলিকান	২০.০১.১৯৫৩-২০.০১.১৯৬১	টেক্সাস
৩৫. জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি	ডেমোক্রেটিক	২০.০১.১৯৬১-২২.১১.১৯৬৩	ম্যাসাচুসেটস
৩৬. লিন্ডন বি জনসন	ডেমোক্রেটিক	২২.১১.১৯৬৩-২০.০১.১৯৬৯	টেক্সাস
৩৭. রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন	রিপাবলিকান	২০.০১.১৯৬৯-০৯.০৮.১৯৭৪	ক্যালিফোর্নিয়া
৩৮.জেরাল্ড আর ফোর্ড	রিপাবলিকান	০৯.০৮.১৯৭৪-২০.০১.১৯৭৭	নেব্রাস্কা
৩৯. জিমি কার্টার	ডেমোক্রেটিক	২০.০১.১৯৭৭-২০.০১.১৯৮১	জর্জিয়া
৪০. রোনাল্ড উইলসন রিগ্যান	রিপাবলিকান	২০.০১.১৯৮১-২০.০১.১৯৮৯	ইলিনয়
৪১. জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ	রিপাবলিকান	২০.০১.১৯৮৯-২০.০১.১৯৯৩	ম্যাসাচুসেটস
৪২. বিল ক্লিনটন	ডেমোক্রেটিক	২০.০১.১৯৯৩-২০.০১.২০০১	আরাকানসাস
৪৩. জর্জ ওয়াকার বুশ	রিপাবলিকান	২০.০১.২০০১-২০.০১.২০০৯	ম্যাসাচুসেটস
৪৪. বারাক হোসেন ওবামা	ডেমোক্রেটিক	২০.০১.২০০৯-বর্তমান	ইলিনয়

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ

অঙ্গরাজ্য	অঙ্গরাজ্য হওয়ার তারিখ	রাজধানী	আয়তন (বর্গ কিমি)	ইলেকটোরাল ভোট
০১. নিউজার্সি	১৮.১২.১৭৮৭	ট্রিটন	২০,১৬৮	১৪
০২. ডেলাওয়ের	০৭.১২.১৭৮৭	ডোভার	৫,২৯৪	৩
০৩. পেনসিলভেনিয়া	১২.১২.১৭৮৭	হ্যারিসবার্গ	১,১৭,৩৪৮	২০
০৪. জর্জিয়া	০২.০১.১৭৮৮	আটলান্টা	১,৫২,৫৭৭	১৬
০৫. কানেকটিকাট	০৯.০১.১৭৮৮	হার্টফোর্ড	১২,৯৯৭	৭
০৬. ম্যাসাচুসেটস	০৬.০২.১৭৮৮	বোস্টন	২৭,৩৩৬	১১
০৭. মেরিল্যান্ড	২৮.০৪.১৭৮৮	অ্যান্নাপোলিস	২৭,০৯১	১০
০৮. সাউথ ক্যারোলিনা	২৩.০৫.১৭৮৮	কলাম্বিয়া	৮০,৫৮৩	৯
০৯. ভার্জিনিয়া	২৫.০৬.১৭৮৮	রিচমন্ড	১,০৫,৫৮৭	১৩
১০. নিউ হ্যাম্পশায়ার	২১.০৬.১৭৮৮	কনকর্ড	২৪,০৩৩	৪

অঙ্গরাজ্য	অঙ্গরাজ্য হওয়ার তারিখ	রাজধানী	আয়তন (বর্গ কিমি)	ইলেকটোরাল ভোট
১১. নিউইয়র্ক	২৬.০৭.১৭৮৮	আলবেনি	১,২৭,১৯০	২৯
১২. নর্থ ক্যারোলিনা	২১.১১.১৭৮৯	র‍্যালে	১,৩৬,৪১৩	১৫
১৩. রোডস আইল্যান্ড	২৯.০৫.১৭৯০	প্রভিডেন্স	৩,১৩৯	৪
১৪. ভারমন্ট	০৩.০৪.১৭৯১	মন্টপেলিয়ার	২৪,৯০০	৩
১৫. কেনটাকি	০১.০৬.১৭৯২	ফ্র্যাঙ্কফুর্ট	১,০৪,৬৫৯	৮
১৬. টেনিসি	০১.০৬.১৭৯৬	ন্যাসভিল	১,০৯,১৫৩	১১
১৭. ওহিও	০১.০৩.১৮০৩	কলম্বাস	১,০৭,০৪৫	১৮
১৮. লুইজিয়ানা	৩০.০৪.১৮১২	ব্যাটন রোজ	১,২৩,৬৭৮	৮
১৯. ইন্ডিয়ানা	১১.১২.১৮১৬	ইন্ডিয়ানাপোলিস	৯৩,৭১৯	১১
২০. ইলিনয়	০৩.১২.১৮১৮	স্প্রিংফিল্ড	১,৪৫,৯৩৪	২০
২১. আলাবামা	১৪.১২.১৮১৯	মন্টেগোমারি	১,৩৩,৯১৬	৯
২২. মেইন	১৫.০৩.১৮২০	অগাস্টা	৮৬,১৫৬	৪
২৩. মিসৌরি	১০.০৮.১৮২১	জেফারসন সিটি	১,৮০,৫১৫	১০
২৪. আরাকানসাস	১৫.০৬.১৮৩৬	লিটলরক	১,৩৭,৭৫৪	৬
২৫. মিশিগান	২৬.০১.১৮৩৭	ল্যানসিং	১,৫১,৫৮৫	১৬
২৬. ফ্লোরিডা	০৩.০৩.১৮৪৫	টালাহাসি	১,৫১,৯৪০	২৯
২৭. টেক্সাস	২৯.১২.১৮৪৫	অস্টিন	৬,৯১,০৩০	৩৮
২৮. আইওয়া	২৮.১২.১৮৪৬	ডেস মোইনিস	১,৪৫,৭৫২	৬
২৯. উইসকনসিন	২৯.০৫.১৮৪৮	ম্যাডিসন	১,৪৫,৪৩৬	১০
৩০. ক্যালিফোর্নিয়া	০৯.০৯.১৮৫০	স্যাক্রামেন্টো	৪,১১,০৪৯	৫৫
৩১. মিনিসোটা	১১.০৫.১৮৫৮	সেন্টপল	২,১৮,৬০১	১০
৩২. ওরিগন	১৪.০২.১৮৫৯	সালেম	২,৫৪,৭৯৯	৭
৩৩. কেনসাস	২৯.০১.১৮৬১	টোপেকা	২,১৩,০৯৭	৬
৩৪. ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া	২০.০৬.১৮৬৩	চার্লসটন	৬২,৭৫৮	৫
৩৫. নেভাডা	৩১.১০.১৮৬৪	কারসান সিটি	২,৮৬,৩৫৩	৬
৩৬. নেব্রাস্কা	০১.০৩.১৮৬৭	লিঙ্কন	২,০০,৩৪৯	৫
৩৭. কলোরাডো	০১.০৮.১৮৭৬	ডেনভার	২,৬৯,৫৯৬	৯
৩৮. আলাস্কা	১৭.০৫.১৮৮৪	জুনেউ	১৫,৩০,৭০০	৩
৩৯. মিসিসিপি	১০.১২.১৮৮৭	জ্যাকসন	১,২৩,৫১৫	৬
৪০. নর্থ ড্যাকোটা	০২.১১.১৮৮৯	বিসমার্ক	১,৮৩,১১৮	৩
৪১. সাউথ ড্যাকোটা	০২.১১.১৮৮৯	পিয়েরে	১,৯৯,৭৩০	৩
৪২. মন্টানা	০৮.১১.১৮৮৯	হেলেনা	৩,৮০,৮৪৯	৩
৪৩. ওয়াশিংটন	১১.১১.১৮৮৯	অলিম্পিয়া	১,৭৬,৪৮০	১২
৪৪. ইডাহো	০৩.০৭.১৮৯০	বয়েস	২,১৬,৪৩১	৪
৪৫. উওমিং	১০.০৭.১৮৯০	চেন্নে	২,৫৩,৩২৫	৩
৪৬. উটাহ	০৪.০১.১৮৯৬	সল্টলেক সিটি	২,১৯,৮৮৮	৬
৪৭. নিউ মেক্সিকো	০৬.০১.১৯১২	সান্টাফে	৩,১৪,৯২৩	৫
৪৮. অ্যারিজোনা	১৪.০২.১৯১২	ফনিক্স	২,৯৫,২৬০	১১
৪৯. ওকলাহোমা	১৬.১১.১৯০৭	ওকলাহোমা সিটি	১,৮১,১৮৬	৭
৫০. হাওয়াই	২১.০৮.১৯৫৯	হনলুলু	১৬,৭৬০	৪
ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া	স্বতন্ত্র জেলা	ওয়াশিংটন ডিসি	১৭৯	৩

যুক্তরাজ্য

প্রশ্ন : কোন কোন অঞ্চল নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্য গঠিত?
উত্তর : ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড নিয়ে।
প্রশ্ন : আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় কোন দেশকে?
উত্তর : যুক্তরাজ্যকে।
প্রশ্ন : সংসদীয় গণতন্ত্রের উৎপত্তি কোন দেশে?
উত্তর : যুক্তরাজ্য।
প্রশ্ন : কোন দেশের অধিকাংশ আইন প্রথার উপর গড়ে উঠেছে?
উত্তর : ব্রিটেন।
প্রশ্ন : কোন দেশের কোনো লিখিত সংবিধান নেই?
উত্তর : যুক্তরাজ্যের।
প্রশ্ন : ম্যাগনাকার্টা কি?
উত্তর : ম্যাগনাকার্টা ইংল্যান্ডের একটি চুক্তি, যা ১৫ জুন ১২১৫ স্বাক্ষরিত হয়।
প্রশ্ন : ইংরেজিকে কবে ইংল্যান্ডের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়?
উত্তর : ১৩৬২ সালে।

যুক্তরাজ্যের নামকরণ



ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড চারটি আলাদা দেশ ছিল এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। ১৫৩৬ সালে কিংডম অফ ইংল্যান্ডের সাথে যুক্ত হয় প্রিন্সিপালিটি অফ ওয়েলস। ১ মে ১৭০৭ কিংডম অফ স্কটল্যান্ড যুক্ত হয় কিংডম অফ ইংল্যান্ডের সাথে। তখন ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের সম্মিলিত নাম হয় কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন। এরপর ১ জানুয়ারি ১৮০১ কিংডম অব আয়ারল্যান্ড সংযুক্ত হলে এ চারটি দেশের সম্মিলিত নাম হয় ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড। ৬ ডিসেম্বর ১৯২১ অ্যাংলো-আইরিশ চুক্তি (Anglo-Irish Treaty)'র মাধ্যমে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ (৫/৬) নিয়ে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন আয়ারল্যান্ড নামে আত্মপ্রকাশ করে। আয়ারল্যান্ডের বাকি এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) নিয়ে উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে যায় ইউনাইটেড কিংডমের সাথে। ইউনাইটেড কিংডমের নতুন নাম হয়, ইউনাইটেড কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। এই পূর্ণ নামেই এখন ইউকে জাতিসংঘের সদস্য দেশ। বর্তমান যুক্তরাজ্যের অধীনে রয়েছে ইংল্যান্ডসহ মোট ৪টি দেশ- স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েলস। এ দেশগুলোর আলাদা সরকারব্যবস্থা থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যমেই তারা প্রভাবিত।

প্রশ্ন : ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় কখন?
উত্তর : অষ্টাদশ শতাব্দীতে।
প্রশ্ন : 'ইউনিয়ন জ্যাক' কোন দেশের পতাকার নাম?
উত্তর : যুক্তরাজ্য।
প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম স্থায়ী ব্রিটিশ কলোনির নাম কি?
উত্তর : জেমস টাউন।
প্রশ্ন : সেন্ট হেলেনা দ্বীপ কোন দেশের অধীনে?
উত্তর : যুক্তরাজ্য।
প্রশ্ন : ইউনেস্কো কবে, কোন শহরকে 'City of Film' ঘোষণা করে?
উত্তর : ২০০৯ সালে; ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ড শহরকে।
প্রশ্ন : 'City of Literature' বলা হয় কোন শহরকে?
উত্তর : এডিনবার্গ (ইংল্যান্ড)।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী মন্ত্রী কে?
উত্তর : মার্গারেট বন্ডফিল্ড (১৯২৪ সালে)।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম নারী মন্ত্রী কে?
উত্তর : পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সৈয়দা হুসাইন ওয়ারসি।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির প্রথম মুসলমান চেয়ারম্যান কে?
উত্তর : পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সৈয়দা হুসাইন ওয়ারসি (দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১২ মে ২০১০)।
প্রশ্ন : ব্রিটেনের প্রশাসনিক দপ্তরকে কি বলা হয়?
উত্তর : হোয়াইট হল।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন এবং কার্যালয়-এর নাম কি?
উত্তর : ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট।
প্রশ্ন : ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট কবে থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে?
উত্তর : ১৭৩০ সাল।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের আইনসভার চিফ হুইপের কার্যালয়-এর নাম কি?
উত্তর : ৯ নং ডাউনিং স্ট্রিট।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রীর উপাধি কি?
উত্তর : চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী)-এর কার্যালয় কোনটি?
উত্তর : ১১ নং ডাউনিং স্ট্রিট।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপাধি কি?
উত্তর : সেক্রেটারি অব স্টেট ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অ্যাফেয়ার্স।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস অফিস-এর নাম কি?
উত্তর : ১২ নং ডাউনিং স্ট্রিট।
প্রশ্ন : নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : দেশটির রীতি অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ১৯৩১ সালে মঙ্গলবারে নির্বাচন হয়েছিল। ভোট গ্রহণের পরদিনই অর্থাৎ শুক্রবার সকালে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়।

প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার লাভ করে কবে?
উত্তর : ১৯১৮ সালে।

আইনসভা

প্রশ্ন : আইনসভার নাম কি?
উত্তর : পার্লামেন্ট।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের আইনসভা কত কক্ষ বিশিষ্ট?
উত্তর : দুই কক্ষবিশিষ্ট (উচ্চকক্ষের নাম হাউস অব লর্ডস এবং নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্স)।
প্রশ্ন : আইনসভার মেয়াদকাল কত?
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। তবে পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন আহ্বান করতে হয়।
প্রশ্ন : হাউস অব কমন্সের সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ৬৫০ জন।
প্রশ্ন : হাউস অব লর্ডসের সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : ৭৮০ জন (এরা কেহই নির্বাচিত নন। তাদের বেশির ভাগ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রানীর অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বাকিরা রাজপরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে এ কক্ষের আজীবন সদস্য)।
প্রশ্ন : হাউস অব কমন্সের আসন বিন্যাস কিরূপ?
উত্তর : ইংল্যান্ডে ৫৩৩, স্কটল্যান্ডে ৫৯, ওয়েলসে ৪০ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে ১৮টি আসন রয়েছে।
প্রশ্ন : হাউস অব কমন্সে প্রথম মুসলিম নারী সদস্য কে কে?
উত্তর : রুশনারা আলী (বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত), শাবানা মাহমুদ (পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত) এবং ইয়াসমিন কোরেশি (পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত)।
প্রশ্ন : হাউস অব কমন্সে প্রথম মুসলিম পুরুষ সদস্য কে?
উত্তর : মোহাম্মদ সারওয়ার (পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত)।
প্রশ্ন : হাউস অব কমন্সে নির্বাচিত প্রথম উপমহাদেশীয় নারী কে?
উত্তর : পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত শাবানা মাহমুদ ও ইয়াসমিন কোরেশি, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রুশনারা আলী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রীতি প্যাটেল ও ভ্যালেরি ভাজ।

রাজা-রানী

প্রশ্ন : প্রথম রানী কে?
উত্তর : অ্যান (ক্ষমতাসীন কাল ১ মে ১৭০৭-১ আগস্ট ১৭১৪)।
প্রশ্ন : প্রথম রানি এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের রানী হন কখন?
উত্তর : ১৭ নভেম্বর ১৫৫৮-২৪ মার্চ ১৬০৩।
প্রশ্ন : ইংল্যান্ডের কোন রানীকে 'চিরকুমারী' অর্থাৎ 'ভার্জিন কুইন' বলা হতো?
উত্তর : রানী প্রথম এলিজাবেথকে।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের কনিষ্ঠতম রাজা কে?
উত্তর : ষষ্ঠ হেনরি; তার জন্ম ৬ ডিসেম্বর ১৪২১ (ক্ষমতাসীনকাল ৩১ আগস্ট ১৪২২-৪ মার্চ ১৪৬১)।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের কোন রাজা সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করার জন্য রাজ সিংহাসন হারান?
উত্তর : অষ্টম এডওয়ার্ড (ক্ষমতাসীন কাল ২০ জানুয়ারি-১১ ডিসেম্বর ১৯৩৬)।
প্রশ্ন : জার্মানির কোন রাজা ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন?
উত্তর : প্রথম জর্জ (তিনি ১ আগস্ট ১৭১৪-১১ জুন ১৭২৭ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন)।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের রানী কতটি দেশের সরকার প্রধান (অর্থাৎ রানী)?
উত্তর : ১৬টি; যুক্তরাজ্য এবং কমনওয়েলথভুক্ত ১৫টি দেশ। অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, অস্ট্রেলিয়া, বাহামাস, বার্বাডোস, বেলিজ, কানাডা, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং টুভ্যালু।

প্রধানমন্ত্রী

প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের তথা বিশ্বের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : রবার্ট ওয়ালপোল (৪ এপ্রিল ১৭২১-১৭ ফেব্রুয়ারি ১৭৪২)।
প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : মার্গারেট থ্যাচার (৪ মে ১৯৭৯-২৮ নভেম্বর ১৯৯০)।
প্রশ্ন : বিশ্বের লৌহমানবী হিসেবে পরিচিত কে?
উত্তর : মার্গারেট থ্যাচার।
প্রশ্ন : চার মেয়াদে দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : উইলিয়াম গ্লাডস্টোন। [৩ ডিসেম্বর ১৮৬৮-১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, ২৩ এপ্রিল ১৮৮০-৯ জুন ১৮৮৫, ১ ফেব্রুয়ারি-২০ জুলাই ১৮৮৬ এবং ১৫ আগস্ট ১৮৯২-২ মার্চ ১৮৯৪]।
প্রশ্ন : সবচেয়ে কম বয়সে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে?
উত্তর : উইলিয়াম পিট (১৯ ডিসেম্বর ১৭৮৩ দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ২৪ বছর ৬ মাস ২১ দিন)।
প্রশ্ন : সবচেয়ে বেশি বয়সে প্রধানমন্ত্রী হন কে?
উত্তর : হেনরি জন টেম্পল (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫ দায়িত্ব গ্রহণে সময় বয়স ছিল ৭১ বছর ৩ মাস ১৭ দিন)।
প্রশ্ন : ডিউক অব ওয়েলিংটন কে?
উত্তর : ১৮ জুন ১৮১৫ ওয়াটারলু জয়ী ইংরেজ সেনাপতি ও যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী।
প্রশ্ন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : হার্বার্ট হেনরি এসকুইথ (৫ এপ্রিল ১৯০৮-৫ ডিসেম্বর ১৯১৬)।
প্রশ্ন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সময় প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : ডেভিড লয়েড জর্জ (৭ ডিসেম্বর ১৯১৬-২২ অক্টোবর ১৯২২)।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : নেভিন চেম্বর লেন (২৮ মে ১৯৩৭-১০ মে ১৯৪০)।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির সময় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : উইনস্টন চার্চিল [১০ মে ১৯৪০-২৬ জুলাই ১৯৪৫]।
প্রশ্ন : ব্রিটেনের কোন প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উত্তর : উইনস্টন চার্চিল (১০ মে ১৯৪০-২৬ জুলাই ১৯৪৫)।

স্কটল্যান্ড

প্রশ্ন : রাজধানীর নাম কি?
উত্তর : এডিনবার্গ।
প্রশ্ন : জাতীয় পতাকা কি?
উত্তর : সেইন্ট অ্যান্ড্রু'র ক্রস (নীলের মধ্যে সাদা ক্রস চিহ্ন)।
প্রশ্ন : স্কটল্যান্ড কবে যুক্তরাজ্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়?
উত্তর : ১ মে ১৭০৭।
প্রশ্ন : স্কটিশ পার্লামেন্ট গঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯৯৮ সালে।
প্রশ্ন : স্কটিশ আইনসভার আসনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১২৯টি।
প্রশ্ন : স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (SNP) গঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯৩৪ সালে।
প্রশ্ন : স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতাপন্থী দল কোনটি?
উত্তর : স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (SNP)।
প্রশ্ন : স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতাপন্থী নেতা কে?
উত্তর : আলেক্স স্যালমন্ড।
প্রশ্ন : স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে গণভোট হয় কবে?
উত্তর : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ (গণভোট স্বাধীনতা বিপক্ষে রায় দেয়)।

ওয়েলস

প্রশ্ন : ওয়েলসের রাজধানীর নাম কি?
উত্তর : কার্ডিফ।
প্রশ্ন : ফার্স্ট মিনিস্টার পদ সৃষ্টি করা হয় কবে?
উত্তর : ১২ মে ১৯৯৯।
প্রশ্ন : আইনসভার নাম কি?
উত্তর : ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ফর ওয়েলস (সৃষ্টি ১৯৯৮ সালে)।
প্রশ্ন : আইনসভার আসন সংখ্যা কত?
উত্তর : ৬০।

উত্তর আয়ারল্যান্ড

প্রশ্ন : রাজধানীর নাম কি?
উত্তর : বেলফাস্ট।
প্রশ্ন : ফার্স্ট মিনিস্টার পদ সৃষ্টি করা হয় কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯৯৮।
প্রশ্ন : আইনসভার নাম কি?
উত্তর : নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড অ্যাসেম্বলি (সৃষ্টি ১৯৯৮ সালে)।
প্রশ্ন : আইনসভার আসন সংখ্যা কত?
উত্তর : ১০৮।

জার্মানি

প্রশ্ন : জার্মানি বিভক্ত হয় কখন?
উত্তর : ১৯৪৫ সালে।
প্রশ্ন : পশ্চিম জার্মানির রাজধানীর নাম কি ছিল?
উত্তর : বন।
প্রশ্ন : পূর্ব জার্মানির রাজধানীর নাম কি ছিল?
উত্তর : বার্লিন।
প্রশ্ন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজয় স্বীকার করে কবে?
উত্তর : ১১ নভেম্বর ১৯১৮।
প্রশ্ন : বিশ্বে দীর্ঘতম সময়ের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন কে?
উত্তর : জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যান্স ডিয়েট্রিক গেসনার (সর্বমোট ১৮ বছর)।
প্রশ্ন : আধুনিক জার্মানির জনক কে?
উত্তর : বিসমার্ক।
প্রশ্ন : হিটলারের রাজনৈতিক দলের নাম কি?
উত্তর : নাৎসি।
প্রশ্ন : হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হন কবে?
উত্তর : ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৩।
প্রশ্ন : হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম কি?
উত্তর : গেস্টাপো।
প্রশ্ন : নুরেমবার্গে জার্মানির বিচার শুরু হয় কবে?
উত্তর : ২০ নভেম্বর ১৯৪৫।
প্রশ্ন : জার্মানির জাতীয় দিবস কবে?
উত্তর : ৩ অক্টোবর (পুনর্মিলনের দিন)।
প্রশ্ন : জার্মান সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজাদের উপাধি কি ছিল?
উত্তর : কাইজার।
প্রশ্ন : মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্র মতবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের জন্ম কোথায়?
উত্তর : জার্মানিতে।
প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম আইটি মেলা সিবিট (CeBIT) অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
উত্তর : জার্মানির হ্যানোভারে।
প্রশ্ন : সিবিট (CeBIT) মেলা প্রথম কবে শুরু হয়?
উত্তর : ১৯৭০ সালে।
প্রশ্ন : জার্মানির স্টেট (রাজ্য) সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৬টি।
প্রশ্ন : নাৎসি আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু হয় কোন শহর থেকে?
উত্তর : মিউনিখ শহর থেকে।
প্রশ্ন : জার্মানির আন্তর্জাতিক বেতার ও টিভি সম্প্রচার সংস্থার নাম কি?
উত্তর : ডয়েচে ভেলে (Deutsche Welle–DW)।
প্রশ্ন : DW প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ৩ মে ১৯৫৩।
প্রশ্ন : জার্মানির প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন পদের নাম কি?
উত্তর : চ্যান্সেলর।

প্রশ্ন : জার্মানির প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল কত?
উত্তর : ৫ বছর।
প্রশ্ন : জার্মানির প্রথম নারী চ্যান্সেলর কে?
উত্তর : অ্যাঞ্জেলা মার্কেল।
প্রশ্ন : ২০১১ সালে ইউরোপের সবুজ রাজধানী কোনটি?
উত্তর : হামবুর্গ (জার্মানি)।
প্রশ্ন : ব্ল্যাক ফরেস্ট কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : জার্মানিতে।
প্রশ্ন : জার্মানির কোন রাজা ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন?
উত্তর : তৃতীয় জর্জ।
প্রশ্ন : কোন দেশের সরকার প্রধানকে 'চ্যান্সেলর' বলা হয়?
উত্তর : জার্মানি।
প্রশ্ন : যুক্ত জার্মানির প্রথম নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর : ৩০ জানুয়ারি ১৯৯১।
প্রশ্ন : জার্মানি ব্যতিরেকে কোন দেশের প্রায় সকল নাগরিক জার্মান ভাষায় কথা বলে?
উত্তর : অস্ট্রিয়া।
প্রশ্ন : বার্লিনের দেওয়াল নির্মাণ শুরু হয় কখন?
উত্তর : ১৩ আগস্ট ১৯৬১।
প্রশ্ন : বার্লিনের দেওয়ালের পতন হয় কবে?
উত্তর : ৯ নভেম্বর ১৯৮৯।
প্রশ্ন : আনুষ্ঠানিকভাবে দুই জার্মানি একত্রিত হয় কবে?
উত্তর : ৩ অক্টোবর ১৯৯০।
প্রশ্ন : বার্লিন প্রাচীরের দৈর্ঘ্য কত ছিল?
উত্তর : ১৬১ কিমি।
প্রশ্ন : বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ শুরু হয়েছিল কোন স্থান থেকে?
উত্তর : বারনউয়া।

রাশিয়া

প্রশ্ন : আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দেশ কোনটি?
উত্তর : রাশিয়া।
প্রশ্ন : ভৌগোলিকভাবে রাশিয়া কোন কোন মহাদেশ জুড়ে অবস্থিত?
উত্তর : এশিয়া ও ইউরোপ।
প্রশ্ন : কবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ পদত্যাগ করেন?
উত্তর : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১।
প্রশ্ন : রাশিয়ার ইতিহাসে কবে সর্বপ্রথম বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৩।
প্রশ্ন : রাশিয়ার সর্বশেষ রাজা দ্বিতীয় নিকোলাস জারের রাজবংশ কোনটি?
উত্তর : রোমানভ।
প্রশ্ন : USSR নামটি গৃহীত হয় কবে?
উত্তর : ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২।
প্রশ্ন : USSR-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Union of Soviet Socialist Republics.
প্রশ্ন : USSR বিলুপ্ত হয় কবে?
উত্তর : ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১।
প্রশ্ন : বলশেভিক ও মনশেভিক দ্বিধাবিভক্ত হয় কবে?
উত্তর : ১৭ নভেম্বর ১৯০৩।
প্রশ্ন : রাশিয়ান গণতন্ত্রী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ।
প্রশ্ন : সর্বপ্রথম বলকান রাজ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় কবে?
উত্তর : ৩০ আগস্ট ১৯১২।
প্রশ্ন : বলকান যুদ্ধের অবসান হয় কখন?
উত্তর : ৩০ মে ১৯১৩।
প্রশ্ন : রুশ-জাপান শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে?
উত্তর : ২৩ জুন ১৯১৬।
প্রশ্ন : লেনিন 'এপ্রিল থিসিস' পেশ করে কবে?
উত্তর : ১৭ এপ্রিল ১৯১৭।
প্রশ্ন : লেনিন মৃত্যুবরণ করেন কবে?
উত্তর : ২২ জানুয়ারি ১৯২৪।
প্রশ্ন : পেট্রোগ্রাদকে লেনিনগ্রাদে নামকরণ করা হয় কবে?
উত্তর : ২৬ জানুয়ারি ১৯২৫।
প্রশ্ন : রাশিয়া প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় কবে?
উত্তর : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৭।
প্রশ্ন : লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল ক্ষমতা দখল করে কবে?
উত্তর : ৭ নভেম্বর ১৯১৭।
প্রশ্ন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কবে?
উত্তর : ১৫ আগস্ট ১৯১৮।
প্রশ্ন : লীগ অব নেশনস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বহিষ্কার করা হয় কবে?
উত্তর : ১৯৩৯ সালে।
প্রশ্ন : ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে মস্কো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ৫ মার্চ ১৯৫৩।
প্রশ্ন : স্ট্যালিনের দেহ কবর থেকে সরিয়ে নেয়া হয় কবে?
উত্তর : ৩০ অক্টোবর ১৯৬১।
প্রশ্ন : বার্ট্রান্ড রাসেলকে পরমাণু পরীক্ষা বিরোধিতার জন্য রাশিয়ান সরকার গ্রেপ্তার করে কবে?
উত্তর : ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬১।
প্রশ্ন : চেরনো বিল বিদ্যুৎকেন্দ্রে আণবিক দুর্ঘটনা ঘটে কবে?
উত্তর : ২৯ এপ্রিল ১৯৮৬।
প্রশ্ন : রাশিয়া ফেডারেশনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অবাধ নির্বাচন হয় কবে?
উত্তর : ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৩।
প্রশ্ন : উন্নয়নে 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার' প্রবর্তক দেশ কোনটি?
উত্তর : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)।
প্রশ্ন : পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নীতির প্রবর্তক কে?
উত্তর : জোসেফ স্ট্যালিন।

প্রশ্ন : ১৯১৭ সালে সংগঠিত রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর : লেনিন।
প্রশ্ন : 'গ্লাসনস্ত' কী?
উত্তর : খোলামেলা আলোচনা।
প্রশ্ন : 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রইকা' নীতির প্রবর্তক কে?
উত্তর : মিখাইল গর্বাচেভ।
প্রশ্ন : 'পেরেস্ত্রইকা' কি?
উত্তর : সংস্কারমূলক বা উন্নয়নমূলক আলোচনা।
প্রশ্ন : 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রইকা' নীতি ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর : যথাক্রমে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে।
প্রশ্ন : সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট পার্টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর : ২১ আগস্ট ১৯৯১।
প্রশ্ন : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে কয়টি রাষ্ট্র গঠিত হয়?
উত্তর : ১৫টি।
প্রশ্ন : ইন্টারফ্যাক্স (Interfax) কি?
উত্তর : রাশিয়ার বার্তা সংস্থা।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
উত্তর : স্ট্যালিন।
প্রশ্ন : রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল কত?
উত্তর : ছয় বছর (পূর্বে ছিল ৪ বছর)।
প্রশ্ন : রাশিয়ার রাষ্ট্রধর্ম কয়টি?
উত্তর : ৪টি (ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও ইহুদি)।
প্রশ্ন : রাশিয়া ফেডারেশনের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : বরিস ইয়েলৎসিন (১০ জুলাই ১৯৯১-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯)
প্রশ্ন : রাশিয়া সকল ধর্মকে সংসদে স্বীকৃতি দেয় কবে?
উত্তর : ১৯৯৭ সালে।
প্রশ্ন : রাশিয়া হাজার রুবলকে এককে পরিণত করে কবে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৯৮।
প্রশ্ন : অখণ্ড ইউরোপের প্রবক্তা কে?
উত্তর : মিখাইল গর্বাচেভ।
প্রশ্ন : ১৯৩৯ সালে 'মলোটভ রিবেন ট্রোপ' নামক চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন কে?
উত্তর : স্ট্যালিন ও মুসোলিনি।
প্রশ্ন : ট্রটস্কি কে ছিলেন?
উত্তর : রাশিয়ার নেতা।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয় কোন দেশকে?
উত্তর : রাশিয়াকে।
প্রশ্ন : অত্যাধুনিক বিমান বিধ্বংসী 'হক'-এর নির্মাতা কোন দেশ?
উত্তর : রাশিয়া।
প্রশ্ন : দাঁড়ির ওপর কর বসানো রাশিয়ান শাসক কে?
উত্তর : পিটার দি গ্রেট।
প্রশ্ন : রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গে স্থানান্তর করে কে, কবে?
উত্তর : সম্রাট পিটার দি গ্রেট; ১৭১০ সালে।
প্রশ্ন : সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় স্থানান্তর করেন কে?
উত্তর : লেনিন (১৯১৭ সালে)।
প্রশ্ন : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯১৭ সালে।
প্রশ্ন : সাড়া জাগানো রুশ বিপ্লবের মেয়াদকাল কত দিন ছিল?
উত্তর : ১০ দিন।
প্রশ্ন : রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম কি?
উত্তর : ক্রেমলিন।
প্রশ্ন : রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ কয়টি?
উত্তর : ১৪টি (আবখাজিয়া ও দক্ষিণ ওশেটিয়াসহ ১৬টি)।
প্রশ্ন : রাশিয়ার কোন প্রেসিডেন্ট দেশে অবাধে জমি কেনা-বেচার অনুমোদন দিয়ে ফরমান জারি করেছিলেন?
উত্তর : গর্বাচেভ।
প্রশ্ন : চেরনোবিল দুর্ঘটনা কোথায় হয়েছিল?
উত্তর : রাশিয়া।
প্রশ্ন : রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শহর কোনটি?
উত্তর : ভ্লাদিভস্টক।
প্রশ্ন : সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গরবাচেভ ক্ষমতাসীন হয়েছিল কবে?
উত্তর : ১৯৮৫ সালে।
প্রশ্ন : রাশিয়ার কুরস্ক নামক পারমাণবিক সাবমেরিনটি কোন সাগরের তলদেশে ডুবেছিল?
উত্তর : উত্তর মহাসাগর।

রাশিয়া ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টবৃন্দ

নাম	সময়কাল
১. বরিস ইয়েলৎসিন	২০ ডিসেম্বর ১৯৯১-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯
২. ভ্লাদিমির পুতিন	৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯-৭ মে ২০০৮
৩. দিমিত্রি মেদভেদেভ	৭ মে ২০০৮-৭ মে ২০১২
৪. ভ্লাদিমির পুতিন	৭ মে ২০১২-বর্তমান

চীন

প্রশ্ন : চীনের সর্বশেষ সম্রাটের নাম কি?
উত্তর : সম্রাট লুই।
প্রশ্ন : চীনের প্রথম রাজা কে?
উত্তর : ফুসিসি।
প্রশ্ন : হান রাজবংশের প্রথম রাজা কে?
উত্তর : লিউপান।
প্রশ্ন : তাও মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : লাও তান।
প্রশ্ন : চীনের ছিং রাজবংশের প্রথম রাজা কে?
উত্তর : ছিং সিহুয়ান।

প্রশ্ন : কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : ছিং সিহুয়ান।
প্রশ্ন : শিয়া বংশ কি?
উত্তর : চীনের প্রথম রাজবংশ।
প্রশ্ন : চীনের রাজাকে কি বলা হত?
উত্তর : Son of God.
প্রশ্ন : শিং বংশ কি?
উত্তর : প্রাচীন চীনের দ্বিতীয় রাজবংশ।
প্রশ্ন : চীনের প্রথম সামন্ততান্ত্রিক রাজবংশের নাম কি?
উত্তর : ছিন রাজবংশ।
প্রশ্ন : চীনের কনফুসিয়ান তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : কনফুসিয়াস।
প্রশ্ন : চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক কে ছিলেন?
উত্তর : কনফুসিয়াস।
প্রশ্ন : কে প্রথম চীন দেশের প্রধান বিচারপতি এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হন?
উত্তর : কনফুসিয়াস।
প্রশ্ন : কনফুসিয়াসের দর্শন কত খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনে ধর্মে পরিণত হয়?
উত্তর : ২০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
প্রশ্ন : চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটে কবে?
উত্তর : ১ অক্টোবর ১৯৪৯।
প্রশ্ন : ব্রিটেন চীনের কাছে হংকংকে হস্তান্তর করে কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ১৯৯৭।
প্রশ্ন : পর্তুগাল চীনের কাছে ম্যাকাও হস্তান্তর করে কবে?
উত্তর : ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর।
প্রশ্ন : চীনের বিখ্যাত 'তিয়েন আনমেন' স্কোয়ারে তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ৪ জুন ১৯৮৯।
প্রশ্ন : তিয়েন আনমেন স্কোয়ার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বেইজিং, চীন।
প্রশ্ন : পূর্বে চীন কি নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর : ক্যাথে।
প্রশ্ন : ফালুন গং কি?
উত্তর : চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন।
প্রশ্ন : ফালুন গং-এর উত্থান ঘটে কোন সালে?
উত্তর : ১৯৯২ সালে।
প্রশ্ন : ফালুন গং আন্দোলনের নেতা ছিলেন কে?
উত্তর : লী হং ঝি।
প্রশ্ন : এশিয়া মহাদেশে ইউরোপের সর্বশেষ উপনিবেশ কোনটি?
উত্তর : ম্যাকাও।
প্রশ্ন : চীন সরকার ফালুন গং আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কবে?
উত্তর : ২২ জুলাই ১৯৯৯।
প্রশ্ন : চীনের কাছে রাশিয়া কবে মাঞ্চুরিয়া হস্তান্তর করে?
উত্তর : ১৮ জুলাই ১৯০২।
প্রশ্ন : কবে ব্রিটেন হংকং-এর সর্বশেষ নৌ ঘাঁটিটি বন্ধ করে দেয়?
উত্তর : ১১ এপ্রিল ১৯৯৭।
প্রশ্ন : হংকং ব্রিটেনের অধীনে ছিল কত বছর?
উত্তর : ১৫৬ বছর।
প্রশ্ন : হংকং-এর শেষ ব্রিটিশ গর্ভনর কে ছিলেন?
উত্তর : ক্রীস প্যাটেন।
প্রশ্ন : পর্তুগাল ম্যাকাও শাসন করে কত বছর?
উত্তর : ৪৪২ বছর।
প্রশ্ন : চীন কবে সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে?
উত্তর : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫।
প্রশ্ন : চীন কবে তিব্বতকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে?
উত্তর : ২৭ মে ১৯৫১।
প্রশ্ন : চীনে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয় কখন?
উত্তর : ১০ মার্চ ১৯১০।
প্রশ্ন : চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : সান ইয়াৎ সেন।
প্রশ্ন : চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ৩০ জুন ১৯২১।
প্রশ্ন : চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : মাও সে তুং।
প্রশ্ন : চীন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে কখন?
উত্তর : ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ চীনের সদস্যপদ খারিজ করে কবে?
উত্তর : ১ আগস্ট ১৯৫০।
প্রশ্ন : চীন পুনরায় জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয় কখন?
উত্তর : ১৯ নভেম্বর ১৯৭১।
প্রশ্ন : মাও সে তুং চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দেন কখন?
উত্তর : ১১ জানুয়ারি ১৯৬৬।
প্রশ্ন : মাও সে তুং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ঘোষণা দেন কখন?
উত্তর : ১ অক্টোবর ১৯৪৯।
প্রশ্ন : চীনের জাতীয় দিবস কবে?
উত্তর : ১ অক্টোবর।
প্রশ্ন : ১৯৯৭ সালে কোথায় 'এক দেশ দুই নীতি' চালু হয়?
উত্তর : চীনে।
প্রশ্ন : হংকং ও চীনের মধ্যে 'এক দেশ দুই নীতি' চালু থাকবে কত সাল পর্যন্ত?
উত্তর : ২০৪৭ সাল পর্যন্ত।
প্রশ্ন : চীনে 'এক দেশ দুইনীতি' চালু রয়েছে কেন?
উত্তর : হংকং-এর অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য।
প্রশ্ন : চীনের বাণিজ্যিক রাজধানীর নাম কি?
উত্তর : সাংহাই।
প্রশ্ন : তিব্বতের ধর্মীয় নেতাকে কি বলা হয়?
উত্তর : দালাইলামা।
প্রশ্ন : চীনের প্রধান উপজাতি কোনটি?
উত্তর : হান।

প্রশ্ন : চীনের সাথে কতটি দেশের স্থলসীমা রয়েছে?
উত্তর : ১৪টি।
প্রশ্ন : চীনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার সংস্থা কোনটি?
উত্তর : জাতীয় গণকংগ্রেস (কার্যমেয়াদ পাঁচ বছর)।
প্রশ্ন : জাতীয় কংগ্রেস কিভাবে গঠিত হয়?
উত্তর : বিভিন্ন প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রশাসিত মহানগর, বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল আর সৈন্যবাহিনীর গণকংগ্রেস-প্রতিনিধিদের নিয়ে।
প্রশ্ন : চীনের আইনসভা 'ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস'-এর বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয় কোন ভবনটিতে?
উত্তর : 'গ্রেট হল অব দ্য পিপলস' ভবনে (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯ সালে)।
প্রশ্ন : বিশ্বের উচ্চতম রেলপথের নাম কি?
উত্তর : কিংহাই-তিব্বত রেলপথ।
প্রশ্ন : পিপলস স্কোয়ার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : চীনের সাংহাই।
প্রশ্ন : চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় কবে?
উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৭৯।
প্রশ্ন : চীনের কোন শহরকে প্রাচ্যের ভেনিস (Venice of the East) বলা হয়েছে?
উত্তর : সুজো শহর।
প্রশ্ন : চীনের কোন প্রদেশকে 'চীনের ধানভাণ্ডার' বলা হয়?
উত্তর : হুনান প্রদেশ।
প্রশ্ন : হাইব্রিড ধানের জনক কে?
উত্তর : চীনের অধ্যাপক ইউয়ান লিং পিং।
প্রশ্ন : চীনের মোট প্রদেশ পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিট কতটি?
উত্তর : ৩৪টি (২৩টি প্রদেশ, ৫টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ৪টি কেন্দ্রশাসিত মহানগর আর ২টি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল)।
প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী কোন দেশের?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : গ্রেট হল কোথায় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : 'চীনের প্রাচীর' চীন দেশের কোন সীমান্তে অবস্থিত?
উত্তর : উত্তর।
প্রশ্ন : গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : মাও সে তুং।
প্রশ্ন : Ping Pong Diplomacy-র সাথে কোন দেশটি সংশ্লিষ্ট?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : 'উইঘুর' হলো—
উত্তর : চীনের মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম।
প্রশ্ন : 'উইঘুর' মুসলিম সম্প্রদায় কোথায় বাস করে?
উত্তর : চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে।
প্রশ্ন : চীনের উইঘুরদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীর নাম কি?
উত্তর : রেবিয়া কাদির।

সিল্করোড

প্রশ্ন : সিল্ক রোড কি?
উত্তর : 'সিল্ক রোড' হলো চীনের চালু করা বাণিজ্য পথ। প্রাচীনকালে চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া তথা ইউরোপে আর উত্তর আফ্রিকায় চীনের রেশম আর রেশমী কাপড় পাঠানো হয়েছিল বলে এ পথ 'সিল্ক রোড' নামে সুপরিচিত।
প্রশ্ন : সিল্ক রোড' কবে, কার আমলে গড়ে উঠেছিল?
উত্তর : খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে চীনের হান রাজবংশের আমলে।
প্রশ্ন : 'সিল্ক রোড' বাণিজ্যের মাল পরিবহনের পথ হিসেবে কবে ব্যবহার বন্ধ হয়?
উত্তর : দশম শতাব্দীতে চীনের সং রাজবংশের আমলে।
প্রশ্ন : সিল্করোড নতুন করে চালুর উদ্যোগ নেয় কোন দেশ?
উত্তর : চীন; ২০১৪ সালে।

বৈচিত্র্যময় রেকর্ডে চীন

প্রশ্ন : বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নাম কি?
উত্তর : চীনা কমিউনিস্ট পার্টি।
প্রশ্ন : আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন (বিশ্বে তৃতীয়)।
প্রশ্ন : বিশ্বে ভাষার জগতে মান্দারিনের অবস্থান কত?
উত্তর : প্রথম।
প্রশ্ন : এশিয়ার বৃহত্তম সাগর কোনটি?
উত্তর : দক্ষিণ চীন সাগর।
প্রশ্ন : এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি?
উত্তর : ইয়াংসিকিয়াং।
প্রশ্ন : পৃথিবীর দীর্ঘতম কৃত্রিম জলপথের নাম কি?
উত্তর : চীনের গ্র্যান্ড ক্যানেল।
প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গমনকারী দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা ভাণ্ডার কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : চীন।
প্রশ্ন : বিশ্বে টিন উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

জাপান

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের কোন দেশটির সংবিধানকে 'শান্তি সংবিধান' বলা হয়?
উত্তর : জাপান।
প্রশ্ন : সংবাদ সংস্থার নাম কি?
উত্তর : Kyodo (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫)।

প্রশ্ন : 'Corner Stone of Peace' স্মৃতিসৌধটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ওকিনাওয়া, জাপান।
প্রশ্ন : জাপান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে?
উত্তর : সম্রাট জিম্মু (খ্রিষ্টপূর্ব ৬৬০ অব্দে)।
প্রশ্ন : রুশ ও জাপান যুদ্ধ হয় কখন?
উত্তর : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫।
প্রশ্ন : জাপানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : ইতো হিরোবুমি (১৯ অক্টোবর ১৯০০-১০ মে ১৯০১)।
প্রশ্ন : জাপানের প্রথম সম্রাটের নাম কি?
উত্তর : জিম্মু (Jimmu)।
প্রশ্ন : জাপানের বর্তমান সম্রাট কে?
উত্তর : আকিহিতো (১২৫তম)।
প্রশ্ন : লোকসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম শহর কোনটি?
উত্তর : টোকিও (জাপান)।
প্রশ্ন : কিয়োটো কোন দেশের প্রাচীন শহর?
উত্তর : জাপানের।
প্রশ্ন : জাপানের কোন শহর প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার হিসেবে খ্যাত?
উত্তর : ওসাকা।
প্রশ্ন : ওসাকাকে জাপানের ম্যানচেস্টার বলা হয় কেন?
উত্তর : বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র বলে।
প্রশ্ন : প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন বলা হয় কাকে?
উত্তর : জাপানকে।
প্রশ্ন : জাপানের জাতীয় খেলার নাম কি?
উত্তর : সুমো এবং জুডো।
প্রশ্ন : জাপানের জাতীয় প্রতীক কি?
উত্তর : চন্দ্রমল্লিকা (Chrysanthemum)।
প্রশ্ন : জাপানের জাতীয় ফুল কি?
উত্তর : ক্রিসেনথিমাম (বাংলায় চন্দ্রমল্লিকা)।
প্রশ্ন : প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে কোন দেশে প্রথম সূর্য উদিত হয়?
উত্তর : জাপানে।
প্রশ্ন : সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় কাকে?
উত্তর : জাপানকে।
প্রশ্ন : ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত কোন দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য?
উত্তর : জাপান।
প্রশ্ন : জাপানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি?
উত্তর : ফুজিয়ামা।
প্রশ্ন : জাপানের জাতীয় পোশাক কি?
উত্তর : কিমানো।
প্রশ্ন : এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম জাপানি মহিলা কে?
উত্তর : জুনকো তাবেই (১৬ মে ১৯৭৫)।
প্রশ্ন : জাপানের প্রধান চারটি দ্বীপ কি কি?
উত্তর : হোক্কাইডো, হনসু, শিকোকু ও কিউসু।
প্রশ্ন : জাপানের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
উত্তর : হনসু (২,৩১,০০০ বর্গ কিমি)।
প্রশ্ন : কোন প্রণালী জাপান থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথক করেছে?
উত্তর : কোরিয়া প্রণালী।
প্রশ্ন : জাপানি ভাষায় জাপানের নাম কি?
উত্তর : নিপ্পন বা নিহোন (যার অর্থ সূর্যের উৎস)।
প্রশ্ন : জাপানের প্রধান শহরগুলো কি কি?
উত্তর : টোকিও, ইয়োকোহামা, ওসাকা, নাগোয়া, সাপ্পোরো, কোবে, কিয়োটো, নারা, নিক্কো, ফুকুকা, সেন্দাই প্রভৃতি।
প্রশ্ন : জাপানের একমাত্র গণসম্প্রচার সংস্থার নাম কি?
উত্তর : নিপ্পন হোসো কিয়োকোই (Nippon Hoso Kyokai- NHK)।
প্রশ্ন : প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয় কবে?
উত্তর : ১ আগস্ট ১৮৯৪ থেকে ১৭ এপ্রিল ১৯৮৫।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয় কবে?
উত্তর : ৭ জুলাই ১৯৩৭ থেকে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫।
প্রশ্ন : জাপানের বর্তমান সংবিধান ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর : ৩ নভেম্বর ১৯৪৬ (কার্যকর হয় ৩ মে ১৯৪৭)।
প্রশ্ন : কোন দ্বীপ নিয়ে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে?
উত্তর : কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ।
প্রশ্ন : জাপান কবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করে?
উত্তর : ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১।
প্রশ্ন : কোন দেশে প্রথম আণবিক বোমা ফেলা হয়?
উত্তর : জাপান।
প্রশ্ন : পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ কোনটি?
উত্তর : জাপান।

ফ্রান্স

প্রশ্ন : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল কত?
উত্তর : ৫ বছর (পূর্বে ছিল ৭ বছর)।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের প্রথম অভিবাসীর সন্তান হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কে?
উত্তর : নিকোলাস সার্কোজি।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কে?
উত্তর : সেগোলিন রয়াল (২০০৭ সালে)।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম কি?
উত্তর : এলিসি প্রাসাদ।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের জাতীয় খেলার নাম কি?
উত্তর : বৌলস।
প্রশ্ন : ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় কখন?
উত্তর : ১৪ জুলাই ১৭৮৯।
প্রশ্ন : ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে কবে?
উত্তর : ১৭৯২ সালে।
প্রশ্ন : কোন দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়?
উত্তর : বাস্তিল দুর্গ।
প্রশ্ন : নেপোলিয়ন কখন ফ্রান্সের সম্রাট নিযুক্ত হন?
উত্তর : ১৮ মে ১৮০৪-১১ এপ্রিল ১৮১৪ এবং ২০ মার্চ-২২ জুন ১৮১৫।
প্রশ্ন : নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : কর্সিকা দ্বীপে।

প্রশ্ন : ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় কাকে?
উত্তর : নেপোলিয়নকে।
প্রশ্ন : নেপোলিয়নকে কোন দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল?
উত্তর : সেন্ট হেলেনা (১৮১৫ সালে)।
প্রশ্ন : ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন কে?
উত্তর : ষোড়শ লুই।
প্রশ্ন : ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রেরণা দান করেছিল কোন দুজন দার্শনিকের লেখনীর মাধ্যমে?
উত্তর : রুশো ও ভলতেয়ার।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের লৌহমানবী নামে পরিচিত কে?
উত্তর : মিসেল আলিওমারি।
প্রশ্ন : ফ্রান্সে সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে ফারসি ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় কবে?
উত্তর : ৩০ জুন ১৯৯৪।
প্রশ্ন : বিখ্যাত ল্যুভর যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : প্যারিসে (ফ্রান্স)।
প্রশ্ন : প্রথম লিফট আবিষ্কার করা হয় কোন রাজার জন্য?
উত্তর : ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের আদি মুদ্রা ফ্রাঁ'র বিলুপ্তি হয় কবে?
উত্তর : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২।
প্রশ্ন : কোন শহরকে City of Culture বলা হয়?
উত্তর : প্যারিস।
প্রশ্ন : ভার্সাই নগরীটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ফ্রান্স।
প্রশ্ন : কিসের নামানুসারে ফ্রান্সের নাম হয়?
উত্তর : ফ্রাঙ্ক জাতির।
প্রশ্ন : ফরাসি বিপ্লবের মতবাদ/স্লোগানের প্রবক্তা ছিলেন কে?
উত্তর : দার্শনিক রুশো।
প্রশ্ন : বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটেছিল কবে?
উত্তর : ১৪ জুলাই ১৭৮৯।
প্রশ্ন : কোন রাষ্ট্র Statue of Liberty আমেরিকাকে উপহার দেয়?
উত্তর : ফ্রান্স।
প্রশ্ন : ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান কি ছিল?
উত্তর : স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব (Liberty, Equality and Fraternity).
প্রশ্ন : ফ্রান্সের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব কে দেন?
উত্তর : চার্লস ডি গ্যালে।
প্রশ্ন : রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটে কবে?
উত্তর : ২১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের সময়কাল কত?
উত্তর : ৮৪৩-১৭৯২ সাল।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের প্রথম রাজা কে?
উত্তর : চার্লস দ্য বল্ড (৮৪৩-৮৭৭ সাল)।
প্রশ্ন : ফ্রান্সের সর্বশেষ রাজা কে?
উত্তর : ষোড়শ লুই (১০ মে ১৭৭৪-২১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২)।
প্রশ্ন : প্রিন্সেস ডায়না সড়ক দুর্ঘটনায় কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : প্যারিস।

টীকা

♦ মার্কিন অর্থনৈতিক সুনামি

অর্থনৈতিক খাত (ফিসক্যাল ক্লিফ) বা অর্থনৈতিক মহাসঙ্কট এড়াতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে এ সংক্রান্ত একটি বিল পাস হয়। ২৫৭-১৬৭ ভোটে বিলটি পাস হয়। ১৭২ জন ডেমোক্র্যাট ও ৮৫ জন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা এর পক্ষে ভোট দেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ মধ্যরাতে ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সিনেট রিপাবলিকানদের মধ্যে দীর্ঘ আট ঘন্টাব্যাপী বৈঠকের পর ৮৯-৮ ভোটে সিনেটে বিলটি পাস হয়। ২ জানুয়ারি ২০১৩ 'যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সংকট' বলে পরিচিত 'ফিসক্যাল ক্লিফ' এড়াতে কংগ্রেসে পাস হওয়া 'আমেরিকান ট্যাক্সপেয়ার রিলিফ অ্যাক্ট অব ২০১২' স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এর মধ্য দিয়ে নতুন আইন কার্যকর হয়। বিল অনুসারে, বার্ষিক চার লাখ ডলারের বেশি আয়ের মার্কিনিদের কর বৃদ্ধি পাবে। এর কম আয়ের মার্কিনিদের জন্য আগের কর হারই বহাল থাকবে। তাছাড়া ১০,৯০০ কোটি ডলারের বাজেট কাটছাঁট কার্যকরের মেয়াদ আরও দুই মাস বাড়ানো হয়।

♦ প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি

প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ কর্মসূচি, যার মূল প্রণয়নকারী হলো 'নিউ কনজারভেটিভ থিংক ট্যাংক'। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো নতুন শতাব্দীতে আমেরিকার নেতৃত্বের আসনকে আরো শক্তিশালী ও সুসংহত করা। এ পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়গুলো হলো উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, শিল্পোন্নত দেশগুলোকে নানাভাবে দমিয়ে রাখা

যেন তারা আমেরিকার নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে না পারে, দুনিয়া জুড়ে আমেরিকার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি মিশনের নামে কাজ করা। এ পরিকল্পনায় বলা হয়, দৃশ্যপট থেকে সাদ্দাম হোসেন বিলুপ্ত হলেও কুয়েত এবং সৌদি আরবে মার্কিনীদের স্থায়ী ঘাঁটি থাকতে হবে। কেননা এ এলাকায় যে কোনো সময় আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। তাছাড়া উদীয়মান চীনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পায়। এ পরিকল্পনা প্রণয়কারীরা হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, রামসফেল্ডের সহকারী পল উলফ উইজ, বুশের ভাই জেফ বুশ এবং চেনির সহকারী লুই লেবি।

♦ 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থা' নীতি *[২২তম বিসিএস]*

এক দেশ দুই নীতি বা 'ওয়ান কান্ট্রি টু পলিসি'র দেশ চীন। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন মধ্যরাতে হংকং চীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে চীন সরকার এই নীতি প্রণয়ন করে। চীনের শাসনাধীনে যাওয়ার পূর্বে হংকংয়ের অর্থনীতি ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। অন্যদিকে চীনের অর্থব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সমাজতান্ত্রিক। এ অবস্থায় চীন সরকার হংকংয়ের পূর্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উক্ত নীতি প্রবর্তন করে।

♦ ম্যাগনাকার্টা *[৩০তম বিসিএস]*

ম্যাগনাকার্টা-এর বাংলা অর্থ হলো 'স্বাধীনতা সনদ'। ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসে এই চুক্তি 'ম্যাগনাকার্টা' নামে পরিচিত। সেই সময়ে রাজা ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, রাজা যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। ব্যাপক আন্দোলনের পরিণতিতে ইংল্যান্ডের জনগণ রাজার নিকট থেকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত এই সনদ আদায় করে নিয়েছিল। এই সনদের মৌল বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. রাজা প্রজাদের নিকট থেকে নিজের জন্য কোনো অর্থ আদায় করতে পারবেন না।
২. পার্লামেন্টের মত না নিয়ে রাজা প্রথম পুত্রকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত বা প্রথমা কন্যার বিয়ে সাব্যস্ত করতে পারবেন না।
৩. বিচার ছাড়া কাউকে কারারুদ্ধ করা, শাস্তি প্রদান করা বা আইনের আশ্রয়চ্যুত করা চলবে না।
৪. কোনো আইনগত অধিকার বা বিচার বিলম্বিত করা বা তা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না।
৫. স্থায়ী দেওয়ানি আদালত বা Civil Court প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই চুক্তির সুপ্রভাব শুধু ইংল্যান্ডে নয় অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতালিপ্সু রাজা সহজে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাননি। কিন্তু সকল সামন্ত মিলে রাজা জনকে লন্ডনের কাছে এক দ্বীপে বন্দি করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি বিচার বিভাগকেও অনেকটা নিরপেক্ষ করেছিল।

♦ ফরাসি বিপ্লব *[৩০তম বিসিএস]*

১৭৭৮ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের নানা উত্তাল ঘটনাধারা 'ফরাসি বিপ্লব' নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সামন্ত যুগের পুরনো বিধি-বিধান পাল্টে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে এবং রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সম্মিলিত সামাজিক আধিপত্যের অবসান হয়। ইতিহাসবিদগণ সাধারণভাবে ফরাসি বিপ্লবের যেসব কারণ নির্দেশ করে থাকেন সেগুলো হলো– ১. গোটা ইউরোপে তৎকালীন ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ছিল না, ২. ধনী ও নতুন বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় কোনো ধরনের অংশ ছিল না, ৩. চাষীরা ছিল সচেতন এবং সামন্তব্যবস্থায় তাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না, ৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা যেসব দার্শনিক বলতেন তাদের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল, ৫. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসি সহায়তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য করে তুলেছিল।

সব মিলিয়ে সংকট ঘনিয়ে আসছিল এবং পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছিল সবাই। ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় চাচ্ছিল তাদের ক্ষমতা জোরদার করে নিতে। পক্ষান্তরে রাজা যখন এস্টেটস জেনারেল বা অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন, তখন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করলো। ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ ফরাসি দার্শনিক লেখকবৃন্দ (যেমন–ভলতেয়ার, রুশো) পুরনো বিধানকে বাতিল করে ব্যক্তি অধিকার ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পক্ষে জোরালো মত প্রচার করেছিলেন। ত্রিমুখী এই টানাপোড়েনে শেষ থার্ড এস্টেটস বা জনগণের পক্ষের শক্তি নিজেদেরকে জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ হিসেবে ঘোষণা করে এবং একটি লিখিত ফরাসি সংবিধান প্রণয়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয় এবং আজও এই তারিখটি বিশ্বব্যাপী ফরাসি বিপ্লবের দিন হিসেবে পালিত হয়।

নতুন জাতীয় পরিষদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল সামন্তবাদের অবসান সংক্রান্ত ডিক্রি এবং মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণকারী ফরাসি বিপ্লব নানা জটিলতার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে নেপোলিয়নের অভ্যুদয় আবার একনায়কী ব্যবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর কোনো কিছুই আর আগের মতো ছিল না। বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলার শক্তি নেপোলিয়নেরও ছিল না। অভিজাতশ্রেণী ও ধর্মগুরুরা বিপ্লবের পূর্বের ক্ষমতা আর ফিরে পায়নি। মধ্যশ্রেণী ও কৃষকদের বর্ধিত অধিকার ও অর্জনকে সমীহ করে চলতে হয়েছিল সবাইকে। বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুগ যুগ ধরে প্রেরণাসঞ্চারী হয়ে আছে ফরাসি বিপ্লব।

♦ আফিম যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে দশকের পর দশক ধরে ব্রিটেন চীনে ক্রমবর্ধমান হারে বিপুল পরিমাণে আফিম রপ্তানি করার মাধ্যমে একদিকে বহু চীনা জনগণকে আফিমখোরে পরিণত করে এবং বিনিময়ে বিশাল পরিমাণ রৌপ্য নিজেদের দেশে পাচার করে আনে। ফলে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ব্রিটেন চীনে সামরিক হামলা শুরু করে। লিন সে সুর নেতৃত্বে চীনের সিপাহীরা এ হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ক্যান্টন, বর্তমান গোয়াংজৌ-এর জনগণের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ব্রিটিশদের ধ্বংস করো বাহিনী' গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্রিটিশরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৪২ সালে দুর্নীতিবাজ চীন সরকার ব্রিটেনের সঙ্গে 'নানকিনের চুক্তি' স্বাক্ষর করলে আফিমের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

♦ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধ। ইউরোপসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিধর দেশগুলো এই যুদ্ধে জড়িত ছিল বলে একে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া এবং অপরপক্ষে ছিল সার্বিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, ইতালি ও আমেরিকা। প্রথম পক্ষকে বলা হতো কেন্দ্রীয় শক্তি বা সেন্ট্রাল পাওয়ারস (Central Powers) এবং দ্বিতীয় পক্ষকে মিত্রশক্তি বা অ্যালাইড পাওয়ারস (Allied Powers)। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রানৎস ফার্ডিনান্ড এক সার্বিয়াবাসীর গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এক পর্যায়ে দুদেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। তবে অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লবের

ফলে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা, পূর্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঈর্ষা, সন্দেহ ইত্যাদিও ইউরোপের দেশগুলোকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ইন্ধন যোগায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল একই সঙ্গে জল, স্থল ও আকাশে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হয়। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানির শান্তি প্রার্থনার পর ১৯১৯ সালের ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে ৮৫ লক্ষ লোক নিহত ও ২ কোটি ১০ লক্ষ লোক আহত হয়। যুদ্ধে ব্যয় হয়েছিল ৮ হাজার কোটি ডলার।

♦ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সংঘটিত যুদ্ধকে 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাও ইউরোপ থেকে ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি। এই চুক্তির শর্তগুলো ছিল খুবই একপেশে ও প্রতিহিংসামূলক। এর ফলে পরাজিত দেশগুলোর মনে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দাও কারণ হিসেবে যুক্ত হয়। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধস্পৃহার সঙ্গে জার্মানির রাজনৈতিক উচ্চাশাও বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ আর্যরক্তসম্পন্ন জার্মান জাতি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ হিটলারের এই প্রচার জার্মানদের অভিভূত করে। এছাড়াও তাদের ছিল প্রচণ্ড ইহুদি বিদ্বেষ। সব মিলিয়ে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। কূটকৌশলে অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের পর ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার হঠাৎ পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসে। এর দুদিন পর জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে বিশ্বের বড় ও শক্তিশালী দেশগুলো ক্রমশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত জার্মানি ও তার সহযোগীদের বলা হতো অ্যাকসিস পাওয়ারস (Axis Powers) বা অক্ষশক্তি। এর বিরোধী পক্ষের নাম অ্যালাইজ (Allies) বা মিত্রশক্তি। অক্ষশক্তির দেশগুলো ছিল জার্মানি, ইতালি, জাপান, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি। আর মিত্রশক্তির দেশগুলো ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি। যুদ্ধের শুরুতে হিটলার বাহিনীর প্রাথমিক বিজয় সত্ত্বেও ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ তাদের সর্বনাশের সূচনা করে। ক্রমে জার্মান বাহিনী পিছু হটতে থাকে। এক এক করে মুক্ত হয় যুগোস্লাভিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো। ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে মিত্রশক্তির সৈন্যরা চারদিক থেকে জার্মানিকে ঘিরে ফেলে। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন। এর চারদিন পর জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। এতে ইউরোপের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলেও এশিয়ায় জাপান আত্মসমর্পণ বা সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে ৬ ও ৯ আগস্ট পরমাণু-বোমা নিক্ষিপ্ত হবার পর জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরপর সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এতে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল ব্যাপক ও প্রচণ্ড।

♦ ফকল্যান্ড যুদ্ধ

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ফকল্যান্ড ব্রিটেন থেকে আর্জেন্টিনার বেশি কাছে অবস্থিত। কিন্তু ব্রিটেন ফকল্যান্ডকে নিজেদের উপনিবেশ বলে দাবি করে এবং এখানকার তেলভাণ্ডার থেকে কোটি কোটি পাউন্ড মুনাফা লাভ করে। অপরদিকে আর্জেন্টিনা এ দ্বীপসমষ্টিকে নিজেদের বলে দাবি করে। আর্জেন্টিনা থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত এখানে প্রায় ২০০ দ্বীপ আছে। দেড় শতাধিক বছর ধরে আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেনের মধ্যে এ দ্বীপসমূহের প্রভুত্ব করার অধিকার নিয়ে বিবাদ চলে আসছে। ১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল আর্জেন্টিনা ৪০০০ নৌসেনার সাহায্যে ফকল্যান্ড ও সেন্ট জর্জিয়া ইত্যাদি দ্বীপে

নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্রিটিশ গভর্নর রেকস হন্টকে স্ট্যানলি বন্দর থেকে বহিষ্কার করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণকারী বিমান ফকল্যান্ডে অবস্থিত আর্জেন্টিনার সৈন্যশিবিরে আক্রমণ করে। প্রত্যুত্তরে আর্জেন্টিনা পারমাণবিক অস্ত্রবিশিষ্ট ব্রিটিশ রণপোত 'শেফিল্ড'কে টর্পেডো দ্বারা ধ্বংস করে। আর্জেন্টিনার বিশাল পোত 'জেনারেল বেলগ্রানো' ও ৩৬৮ জন নৌসৈন্যসমেত ডুবে যায়। শেষ পর্যন্ত মে মাসের শেষে আর্জেন্টিনার জেনারেল গ্যালতিয়েরি যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে ১৪ জুন ফকল্যান্ডে ব্রিটিশ মেজর জেনারেল জে জে মুর-এর সামনে আর্জেন্টিনার ব্রিগেডিয়ার সৈন্যসমেত আত্মসমর্পণ করে। এভাবে ৭২ দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এ যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটনকে পদত্যাগ করতে হয় এবং জেনারেল গ্যালতিয়েরিরও একই অবস্থা হয়। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে পুনরায় ব্রিটেনের অধিকার স্থাপিত হয়। এখনো বিষয়টি অমীমাংসিত।

♦ শিল্প বিপ্লব

নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে শিল্প-কারখানায় যে গুণগত পরিবর্তন দেশের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির পথ খুলে দেয় তার নাম শিল্প বিপ্লব। আঠারো শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। পরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী জন কে উদ্ভাবিত মাকু, জেমস হারগ্রিভসের 'স্পিনিংজেনি' নামের চরকা, রিচার্ড আর্করাইটের ওয়াটার ফ্রেম, স্যামুয়েল ক্রম্পটনের মিউল, এডমান্ড কার্টরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত, হামফ্রি ডেভির সেফটি ল্যাম্প, জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং জর্জ স্টিফেন্সনের রকেট নামের রেলগাড়ি এই বিপ্লবের ভিত্তি গড়ে তোলে। এর ফলে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তেমনি সমুদ্রপথের আবিষ্কারে বিশ্বজোড়া বাজার গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে এর প্রভাবে গ্রামীণ কুটিরশিল্প পিছু হটায় গ্রামের মানুষ দলে দলে শহরের কলকারখানায় এসে ভিড় করতে শুরু করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে দেখা দেয় কারখানা-শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শ্রমিক-মালিকের নতুন সম্পর্ক, জমিকে ঘিরে গড়ে ওঠা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ভাঙন। বিশ্বের অগ্রগতির ইতিহাসে এই বিপ্লবকে সবচেয়ে বড় মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

♦ রুশ বিপ্লব

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রাশিয়ার পেত্রগ্রাৎ শহরে শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে আছে। তৎকালে রাশিয়ায় অনুসৃত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিনটি ছিল ২৫ অক্টোবর। তাই একে অক্টোবরের বিপ্লবও বলা হয়ে থাকে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু 'বলশেভিক' অংশ। এই বিপ্লব বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী ও সামন্ত জমিদারদের শাসন উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক-কৃষকের রাজ। সাম্যবাদের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এই বিপ্লব সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৭ ও ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় শান্তির ডিক্রি ও জমির ডিক্রি। এতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং খোদ কৃষকদের হাতে জমি তুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত ও ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের মনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। জারশাসিত রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিদের স্বশাসনের অধিকার প্রদান, গোটা জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার অভিযান, সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি মহৎ আদর্শের বাস্তবায়নে সোভিয়েত রাষ্ট্র সচেষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও এই নবীন রাষ্ট্রের

সমর্থনে এগিয়ে আসেন দৃঢ়ভাবে। বিপ্লবপরবর্তী সময়কাল ছিল নানা দিক দিয়ে জটিল। যে ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তা দেশের ভেতর ও বাইর থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। গৃহযুদ্ধ বহিঃরাক্রমণ—এই দুই দিকে লড়াই করে নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯২০ সাল নাগাদ সশস্ত্র প্রতিরোধ ও আক্রমণের মাত্রা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯২১ সালে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য লেনিন নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচি বা নেপ (NEP = New Economic Policy) প্রবর্তন করেন। ১৯২৯ সাল থেকে প্রবর্তিত হয় পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রীতি। কিন্তু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এইসব পরিবর্তনের মধ্যে নানা অসঙ্গতিও ছিল। সোভিয়েত সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্বে পরিণত হয়। অর্থনীতি হয়ে পড়ে স্থবির, চিন্তার স্বাধীন বিকাশ হয় রুদ্ধ। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে মহৎ প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল নানা পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি ও জটিলতার কারণে নব্বইয়ের দশকে এসে তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

♦ আমেরিকার বিপ্লব/স্বাধীনতা যুদ্ধ

গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে আটলান্টিক উপকূলের ১৩টি উপনিবেশ বা কলোনির স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংঘটিত যুদ্ধই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত চলে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেন এই নতুন মহাদেশের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু মহাদেশের উত্তরভাগে অর্থাৎ আটলান্টিক উপকূলবর্তী এলাকায় ইংরেজদের ১৩টি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ সরকারের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপনিবেশগুলোর সকল দলিলপত্রে সরকারি নতুন স্ট্যাম্প লাগানোর আইন জারি করা হলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাত বাধে। জনসাধারণের প্রবল আপত্তির মুখেও ইংরেজ সরকার বাণিজ্য ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ওপর নতুন নতুন শুল্ক আরোপ করতে থাকে। এর প্রতিবাদে ১৭৭৩ সালে একদল লোক বোস্টন বন্দরে জাহাজ থেকে চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই অবাধ্যতা দমনের জন্য সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিয়ে সেখানে ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। এভাবে ১৭৭৫ সালে 'লেক্সিংটন কংকর্ড'-এ সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই উপনিবেশগুলোর মিলিত প্রতিনিধিসভায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন সৈন্যদল গঠন করেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের আহ্বান জানান। অবশেষে ১৭৮৩ সালে প্যারিস সন্ধির মধ্য দিয়ে গ্রেট ব্রিটেন উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। ফলে আটলান্টিক থেকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডটি আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

♦ চীনা বিপ্লব

বিশ শতকের শুরুর দিকে ১৯১২ সালে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক হানাহানি ও নিজস্ব সেনাবাহিনীসমেত বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রধানদের মধ্যে বিরোধ প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য বিপর্যস্ত করে তোলে। জাতীয় ঐক্য গড়ে এই সঙ্কট মোচনের লক্ষ্যে সান ইয়াৎ সেনের কুওমিন্টাং দল উদারবাদী নীতি গ্রহণ করে দেশের অপর প্রধান দল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। কিন্তু পরবর্তীতে কুওমিন্টাং নেতা চিয়াং কাই শেক ১৯২৬ সালে ক্ষমতা হাতে নিয়ে আঞ্চলিক যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে কমিউনিস্টদের দমনে জোর তৎপরতা শুরু করেন। তার নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী সরকার দেশের বেশিরভাগ এলাকা দখল করে নিলেও দূর গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বজায় থাকে। এদিকে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয় এবং চীনের উত্তর ভূখণ্ড আক্রমণ করে। চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো প্রয়াস না নিয়ে বরং

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে লিপ্ত থাকে। জিয়াংসি অঞ্চলে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সামরিক বাহিনীকে তারা ঘেরাও করে ফেলে। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে এই অবরোধ ভেঙ্গে মাও সেতুংয়ের বাহিনী ঐতিহাসিক লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করে। এক বছর পর বিপ্লবী গণবাহিনী ৬০০০ মাইল হেটে উত্তর-পশ্চিম চীনের দূরবর্তী পাহাড়ি শাংক্সি অঞ্চলে পৌছে নতুন করে ঘাঁটি গড়ে তোলে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিন্টাং সরকার ও জাপানি বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলে। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে মিত্রশক্তির কাছে জাপান আত্মসমর্পণ করলে চীনে ক্ষমতার লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। কুওমিন্টাং সরকারের অধীনে দেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা থাকলেও তাদের দুর্নীতি, শোষণ, অকর্মণ্যতা ও অসাধুতার কারণে জনমনে ছিল তীব্র ক্ষোভ। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট আয়ত্তাধীন এলাকায় জমির ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের তৎপরতা ইত্যাদি কারণে তাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়ছিল। মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সংহত করে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে নতুন আক্রমণ অভিযান শুরু করে। কুওমিন্টাং সরকার পিছু হটতে হটতে রাজধানী নানজিং থেকে ক্যান্টনে ও পরে চোংকিং-এ সরিয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাইওয়ানে গিয়ে আশ্রয় নেন। গোটা চীনা মূল ভূখণ্ডের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন জনযুদ্ধের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৯ অক্টোবর পিকিংয়ের (বর্তমান বেইজিং) বিশাল সমাবেশে মাও সেতুং বিপ্লবের বিজয় ঘোষণা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয় নয়া চীনের অভিযাত্রা।

♦ হংকং *[১১তম বিসিএস]*

হংকং চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায় কতগুলো দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। হংকং ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল পরে ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই চীনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চীনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলের স্বীকৃতি পায়। আয়তন ১০০০ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি। জনসংখ্যা ৭০ লক্ষাধিক। ৯৫ শতাংশ হংকংবাসী জাতিগতভাবে চীনা। ব্রিটিশ উপনিবেশ হলেও হংকং যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। হংকং-এর মুখ্য প্রশাসক হচ্ছেন গভর্নর। তাকে সাহায্য করেন একটি স্থানীয় নির্বাহী পরিষদ। গভর্নর নিজেই ঐ পরিষদ সদস্যদের নিযুক্ত করেন। তিনি একটি নিরপেক্ষ ও দক্ষ আমলাগোষ্ঠীও নিয়োগ করেন। আমলাদের বেশির ভাগ সিনিয়র পদে চীনারা নিয়োজিত। হংকং-এ একটি ৬০ সদস্যের নির্বাচিত আইন পরিষদও আছে। প্রশাসন আইন পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সরকারি ব্যয়ও নির্ধারণ করে আইন পরিষদ। হংকং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক ও সার্ভিস সেন্টার। বিগত ৩৫ বছরের অধিককাল যাবৎ হংকং-এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। হংকং-এর মাথাপিছু জিডিপি অধিকাংশ পশ্চিমা দেশের তুলনায় বেশি। হংকং বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দিক থেকে হংকং বিশ্বের সপ্তম স্থানে। চীনের বৈদেশিক বিনিয়োগের ৬০ শতাংশই হংকং-এর।

♦ হিরোশিমা

হিরোশিমা জাপানের হোনশু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে উপসাগরের তীরবর্তী ব-দ্বীপ আকৃতির একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে প্রথম পরমাণু বোমা ফেলা হয়। হিরোশিমার আয়তন ২৫৩ বর্গমাইল বা ৬৫৬ বর্গ কিলোমিটার। ওসাকা থেকে এটি ১৭৫ মাইল বা ২৮০ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে জাপানের অন্যতম সুন্দর প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় কুরে। হিরোশিমা ষোড়শ শতকের শেষভাগে দুর্গ শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ সালে মেইজি রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটলে হিরোশিমাকে জাপানের সামরিক ঘাঁটি

হিসেবে গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হিরোশিমা তা-ই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিনাশর্তে জাপানকে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমায় পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে। এতে শহরের ৬০ ভাগ এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ৭৫ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং এর দ্বিগুণ লোক আহত হয়। নিহতদের কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ এখানকার মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই নজিরবিহীন মানবতাবিরোধী ঘটনা স্মরণে এখানে একটি পীস মেমোরিয়াল পার্ক নির্মিত হয়েছে। প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের করুণ পরিণতির জন্য হিরোশিমা বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমে পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সাল থেকে এখানে পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী একটি বার্ষিক বিশ্ব সম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৫০ সাল থেকে বিধ্বস্ত হিরোশিমাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়। হিরোশিমা এখন জাপানের অন্যতম প্রধান আধুনিক শিল্পকেন্দ্র। যাবতীয় ভারি লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীসহ এখানে প্রচুর বস্ত্র ও রাবারজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

♦ বাস্তিল দুর্গ

বাস্তিল ফ্রান্সের প্যারিস শহরের ভেতরে কুখ্যাত এক দুর্গ-কারাগার। ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়েছিল বাস্তিল দুর্গ-কারাগার দখল করে বন্দিদের মুক্ত করে দেয়ার মধ্য দিয়ে (১৪ জুলাই ১৭৮৯)। প্যারিস শহরকে রক্ষা করার জন্য এই দুর্গের পত্তন হয়েছিল ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দে, পরে সপ্তদশ শতকে একটি জেলখানায় পরিণত হয় এবং প্রধানত রাজবন্দিদেরই এখানে রাখা হতো। মনীষী ভল্টেয়ারকে এই কারাগারে রাখা হয়েছিল। ফরাসিরা এখনো এই দুর্গ পতনের দিন ১৪ জুলাই তারিখটি 'বাস্তিল দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। দিনটি ফ্রান্সে সরকারি ছুটির দিন।

♦ পেন্টাগন *[১৩তম বিসিএস]*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির অদূরে অবস্থিত একটি পাঁচ কোণবিশিষ্ট দালান। পাঁচটি দিক বা কোণবিশিষ্ট বলেই এর নাম পেন্টাগন। এ দালানেই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে পেন্টাগন (Pantagon) বলতে শুধু এ ভবনটিকেই বোঝায় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষকেও বোঝায়।

♦ হংকংয়ে ছাতা বিপ্লব

অধিকতর গণতন্ত্রের দাবিতে চীনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকংয়ের সাম্প্রতিক গণআন্দোলন বিশ্ব মিডিয়ার সর্বাধিক আলোচনার বিষয়গুলোর অন্যতম। ১৯৯৭ সালে ব্রিটেন থেকে চীনের কাছে হংকং হস্তান্তর হওয়ার পর এ বন্দর শহরে কোনো বড় ধরনের আন্দোলন হয়নি। ১৭ বছর ধরে চীন হংকংকে 'এক দেশ, দুই ব্যবস্থার' ভিত্তিতে শাসন করে আসছে। পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয় ছাড়া হংকং-এ সর্বোচ্চ মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন বহাল থাকলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য সেখানে ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে ৩১ আগস্ট ২০১৪ চীন শর্তসাপেক্ষে ২০১৭ সালে প্রধান নির্বাহী নির্বাচন করার ঘোষণা দেয়। যাতে বলা হয়, নির্বাচনে চীন তাদের পছন্দের প্রার্থীদের মানোনয়ন দিবে। হংকংবাসীকে তাদের মধ্যে থেকেই নেতা নির্বাচন করতে হবে। চীনের এমনতর ঘোষণার প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ছাত্ররা সপ্তাহব্যাপী-ক্লাস বর্জন কর্মসূচি শুরু করে, ২৬ সেপ্টেম্বর এ আন্দোলন গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। এরপর ২৮ সেপ্টেম্বর 'অকুপাই সেন্ট্রাল' আন্দোলনকারী এবং ছাত্ররা যৌথভাবে হংকংয়ের কেন্দ্রস্থল দখল করে নেয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই হংকংয়ের পরবর্তী নেতা নির্বাচিত করতে হবে। এছাড়া ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনে যে কোনো নাগরিককে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয়ার দাবি জানায়। বিক্ষোভকারীদের রাজপথ অবস্থান কর্মসূচির ফলে অনেকটাই অচল হয়ে পড়ে হংকংয়ের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড। পশ্চিমা

গণমাধ্যমগুলো এ আন্দোলনকে Umbrella Revolution বা ছাতা বিপ্লব নামে অভিহিত করেছে। ২৫ বছর আগে ১৯৮৯ সালে চীনের মূল ভূখণ্ড তিয়েন আনমেন স্কয়ারে ছাত্র আন্দোলনের পর সাম্প্রতিক হংকং আন্দোলনের মতো এতবড় বিক্ষোভ আর হয়নি।

♦ বারাক ওবামার দ্বিতীয় মেয়াদ

দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। একই সাথে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ওবামার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসনের নতুন নেতারা। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২০তম সংশোধনী অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর থেকে প্রেসিডেন্টের চার বছরের মেয়াদ শুরু হয়। কিন্তু শপথের দিন অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি ২০১৩ রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় নিয়ম রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করলেও পরদিন ২১ জানুয়ারি ২০১৩ পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্যাপিটল হিলে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ গ্রহণ করেন ওবামা। এর আগে আরো পাঁচবার এমন ঘটনা ঘটেছে— ১৮২১, ১৮৪৯, ১৯১৭, ১৯৫৭ ও ১৯৮৫ সালে। ২০১৩ সালে ওবামার শপথ অনুষ্ঠানের স্লোগান 'আমেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা'। বারাক ওবামা মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দ্বিতীয় মেয়াদকালে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে যাদেরকে মনোনয়ন দেন তারা হলেন– ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী চাক হেগেল, অর্থমন্ত্রী জ্যাক লিউ এবং সিআইএ প্রধান জন ব্রেসনান।

♦ সিআইএস (CIS) *[২৮তম বিসিএস]*

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সংস্থা CIS। এর পূর্ণরূপ Commonwealth of Independent States. এটি গঠিত হয় ৮ ডিসেম্বর ১৯৯১। এটির সদস্য সংখ্যা ১১। এর সদস্য দেশগুলো হলো রাশিয়া, আজারবাইজান, ইউক্রেন, বেলারুশ, মেলদাভিয়া, আর্মেনিয়া, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান। সংস্থাটির সদর দপ্তর বেলারুশের রাজধানী মিনস্কে অবস্থিত।

♦ ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি *[১১তম বিসিএস]*

স্নায়ুযুদ্ধের লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত জোট ওয়ারশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্যকে সুসংহত করতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিল ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা। এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৫ সালের ১৪ মে। পূর্ব ইউরোপে একের পর এক অকমিউনিস্ট সরকার গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালের ১ জুলাই প্রাগে প্রটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেই সামরিক জোটের পরিসমাপ্তি ঘটে। অল্প কথায়, ওয়ারশ জোটের অবলুপ্তি পূর্ব ইউরোপে নাটকীয় পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। এ ঘটনা একদিকে যেমন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে, অপরদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে ন্যাটো জোট তথা পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

♦ আনজুস (ANZUS)

ANZUS-এর পূর্ণরূপ Australia, New Zealand and United States. সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫১। সদস্য সংখ্যা ৩। সদস্যগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। সদর দপ্তর অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করা এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া যৌথ সামরিক মহড়া, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও এ সংস্থা ভূমিকা রাখে।



বৈশ্বিক উদ্যোগ ও সংস্থা
Global Initiatives & Institutions

Syllabus *Global Initiative and Institutions : World Bank, IMF, ADB, G8, G-77, WTO, Kyoto Protocol, COP etc..*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. 'বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।' আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]

০২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর পটভূমি ও কার্যসম্পাদন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন। [২৫তম বিসিএস]

০৩. অনুন্নত দেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ভূমিকা আলোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গ্রুপ-৭৭ এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

০৫. 'স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ভূমিকা অনেক সময় সমালোচনার উর্ধ্বে নয়'— যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

০৬. ক. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি?
খ. দারিদ্র্য হ্রাসে বিশ্বব্যাংকের সাফল্য উল্লেখ করুন।

০৭. ক. WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সম্পর্কে কি জানেন?
খ. WTO সম্পর্কে উন্নত ও স্বল্পোন্নত বিশ্বের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট' বলতে কি বোঝেন?

০২. কিয়োটো প্রটোকল কোন ধরনের চুক্তি এবং এর মূল উদ্দেশ্য কি?

০৩. জি-৮ বলতে কি বোঝায়? এটি কি উদ্দেশ্য গঠিত হয়?

০৪. G-77 বলতে কি বোঝায়? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

০৫. ADB কি? এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?

০৬. বিশ্বব্যাংক কি? এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?

০৭. আইএমএফ (IMF) কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

০৮. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

টীকা

I বিশ্বব্যাংক
I আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) [৩৩তম ও ৩০তম বিসিএস]
I দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা [৩১তম বিসিএস]
I কিয়োটো প্রটোকল [৩১তম বিসিএস]
I পিএসআই
I ব্রেটন উডস চুক্তি
I জি-৮ (G-8)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ I বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।' আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশই তার নিজস্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সর্বনিম্ন বা সবচেয়ে লাভজনক উপায়ে উৎপাদন করতে পারে না। এজন্যই ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো দ্রব্য নিজ দেশে উৎপাদন করা অপেক্ষা বিদেশ থেকে আমদানি করা অধিক লাভজনক। তাই কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে। GATT-এর উত্তরসূরি হিসেবে WTO তার কার্যক্রম শুরু করে।

GATT-এর কার্যক্রম : GATT-এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ সংকট উত্তরণ, নতুন নতুন বাজার দখল এবং সর্বোপরি বিশ্ব অর্থনীতির ওপর একটি প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে GATT-এর জন্ম হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী বিশ্বের ২৩টি পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৯৪৮ সালে ১ জানুয়ারি কিউবার রাজধানী হাভানাতে বহুজাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ঐকমত্যে পৌঁছার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে GATT-এর কার্যক্রম শুরু হয়।

GATT প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব অর্থনীতির পণ্ডিতবর্গ বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। GATT-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

১. বিশ্বব্যাপী বিরাজমান বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য কিছু মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা সমাধান করা।
২. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা।
৩. অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক যুক্ত বাণিজ্য নিশ্চিত করা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা : GATT-এর সর্বশেষ উরুগুয়ে Round আলোচনা চলে ১৯৮৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত, যা GATT-এর উরুগুয়ে Round নামে পরিচিত। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকেশে মন্ত্রী পর্যায়ের এক সম্মেলনে GATT-এর

একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির উত্তরসূরি হিসেবে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি WTO আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। WTO বিশ্বের সবচেয়ে নবীন সংস্থা হলেও এটা GATT-এর উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিগত ৫০ বছরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বিগত বছরগুলোতে বিশ্ব বাণিজ্য গড়ে ৬% হারে বৃদ্ধি পায়। বিশ্বে ১৯৪৭ সালে যে পরিমাণ বাণিজ্য হয় ১৯৯৭ সালে তার চেয়ে ১৪ গুণ বেশি হয়।

WTO একটি উন্নততর ও শক্তিশালী বাণিজ্যিক পদ্ধতি সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে, যার ফলে বিশ্ব বাণিজ্য বেশ সহজ হয় এবং এক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

GATT-এর প্রথম Round আলোচনা শুল্ক হ্রাসকরণের মধ্যে সীমিত থাকে। পরবর্তী Round-গুলোতে Anti dumping, non-tariff barriers প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হয়।

WTO-এর প্রধান কার্যাবলী

১. উরুগুয়ে রাউন্ডের চুক্তিসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা।
২. বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, পরিচালনা করা।
৩. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার একটি কোরাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।
৪. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা।
৫. কারিগরি সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে সহায়তা করা।
৬. অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

উন্নত বিশ্ব এবং WTO : উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞ সাধারণভাবে এটা ধারণা করে থাকেন যে, পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশ্ব বাজার দখলের একটা হীন কৌশল হিসেবে মুক্ত বাজার অর্থনীতির তত্ত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে WTO প্রতিষ্ঠা করেছে। উন্নত বা পুঁজিবাদী দেশগুলো আধুনিক প্রযুক্তিগত উপায়ে উৎপাদন করে বলে তাদের পণ্যের গুণগত মান বেশ উন্নত এবং দামও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সমাজতান্ত্রিক দেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করেছিল। কিন্তু উন্নত দেশসমূহ World Bank-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাজার উন্মুক্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্প ডুবতে বসেছে এবং এসব দেশের বাজার ছেয়ে গেছে উন্নত দেশসমূহের শিল্পজাত দ্রব্যে। এর আওতায় যে TRIPS চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাও ধনী দেশসমূহের পক্ষে পক্ষপাতমূলক। এটি ছিল উন্নয়নশীল দেশসমূহের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে।

WTO এবং তৃতীয় বিশ্ব : LDC হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম অংশ। ভয়াবহ দারিদ্র্য, দুর্বল অর্থনীতি, অনুন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং মানবসম্পদের অপ্রতুলতা তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ চিত্র হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭১ সালে যখন প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের ধারণা স্বীকার করা হয়, তখন এর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪; বর্তমানে তা ৪৮-এ উন্নীত হয়েছে। ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের প্রত্যেকেই GATT-এর উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফলে তারা চুক্তি অনুযায়ী উদারীকরণের প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন করেছে। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উপকার, লাভের সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। WTO-পরবর্তী বিশ্ব সংস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য খুবই কষ্টকর।

বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে— এ প্রসঙ্গে মতামত : WTO বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ WTO-র অন্তর্ভুক্তিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন–

১. **বিদেশী বাজারে প্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যা :** অবাধ বাণিজ্য এবং অবাধ বাজার সকলের জন্যই উপকারী এমন কথা সহাস্যে প্রচার করে বেড়ায় WTO। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। WTO-এর উদার রাজনীতির ফলে দরিদ্র দেশগুলো শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় বিদেশি বাজারে টিকে থাকা বেশ কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন বিদেশী বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার। উন্নত দেশগুলো বাণিজ্য উদারীকরণের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের বাজারে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পণ্যের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত। এভাবে শক্তিশালী অর্থনীতির সাথে দুর্বল অর্থনীতির মধ্যকার প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বল পক্ষ অবধারিতভাবে পরাভূত হচ্ছে। এ অসম প্রতিযোগিতার ফলে ৯০-এর দশকে ধনী দেশগুলোর সাথে দরিদ্র দেশগুলোর জীবন মান ও সমৃদ্ধির ব্যবধান আরও বেড়েছে। এমনকি UNCTAD-এর Trade and development report (1999)-এ বলা হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ৭০-এর দশকের চেয়েও কম হয়েছে ৯০-এর দশকে। যেখানে WTO-এর কাজ হচ্ছে দেশে দেশে বাণিজ্য সংঘাত মেটানো সেখানে তাদের প্রণয়নকৃত নীতির ফলে এর সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **উন্নয়নশীল দেশের মতামত অগ্রাহ্য :** WTO সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত মুক্ত আলোচনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নয়নশীল দেশের সুবিধা সংরক্ষণ ও মতামত বরাবরই উপেক্ষিত হয়ে আসছে। WTO-তে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতামত প্রাধান্য বিস্তার করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এসব দেশের গ্রিনরুমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতামত হয় উপেক্ষিত।

সিয়াটল বৈঠকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ WTO-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, WTO কর্তৃক প্রণয়নকৃত নীতি তৃতীয় বিশ্বের মৌলিক অধিকারই কেবল হরণ করছে না বরং তার সার্বভৌমত্বেও হস্তক্ষেপ করছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেয়া বা নীতি নির্ধারণের অধিকার থাকছে না এসব দেশের।

৩. **পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ :** WTO-এর প্রথম প্রথম দুটি সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির কোনো বাস্তবায়ন হয়নি। মৌলিক দৃষ্টি না দিয়ে WTO গতানুগতিকভাবে সিয়াটল বৈঠকে অগ্রসর হয়। তাই উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, যা সিয়াটল সম্মেলনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪. **অবাধ শ্রমিক যাতায়াত নীতি :** WTO মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত মূলধন বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রণহীন কারেন্সি ইত্যাদি প্রলোভন দেখাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। কিন্তু অবাধে শ্রমিক যাতায়াতের কথা বলছে না। তাই WTO তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

৫. **অপরাধের সুযোগ বৃদ্ধি :** WTO-এর বিশ্বায়নের ফলে অপরাধের দ্রুত বিশ্বায়ন ঘটেছে। UNDP-এর ১৯৯৯ সালের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বায়ন অপরাধের বহু সুযোগ খুলে দিয়েছে।

১৯৯৬ সালে বেআইনী মাদক ব্যবসা হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কোটি ডলারের। এ পরিমাণ অর্থ বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৮ শতাংশ যা লোহা ও ইস্পাত বা মোটরগাড়ি ব্যবসার অর্থের চেয়েও বেশি। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিয়াটল সম্মেলনের পর WTO চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

৬. **পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী :** WTO-এর বিরুদ্ধে অপর চ্যালেঞ্জ হলো এর বাণিজ্য নীতি পরিবেশের ওপর বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরিবেশবাদী Greenpeace-এর অভিযোগ ছিল WTO গাছ কেটে বনাঞ্চল উজাড় করতে সাহায্য করছে, টিম্বার কোম্পানিকে বাণিজ্যের নামে সামুদ্রিক কচ্ছপ নিধনে সাহায্য করছে। তাই বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো তাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য উন্নত বিশ্বকে দায়ী করে এ বিষয়ে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবি তোলে।

৭. **কৃষি ভর্তুকি প্রশ্ন ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ :** ধনী দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও ধনী দেশগুলো কৃষিতে অধিক হারে ভর্তুকি প্রদান করছে। অথচ দরিদ্র দেশগুলোকে কৃষিতে ভর্তুকি দিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। কৃষি ভর্তুকি নিয়ে ধনী-দরিদ্র মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় WTO বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতেও WTO সমঝোতায় আসতে পারেনি, যা WTO-কে তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে।

৮. **অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতা ও বাজার দখল :** WTO তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অনেক অঙ্গীকার করেছে, কিন্তু এ অঙ্গীকারের কোনোটি তারা পালন করতে পারেনি। অন্যদিকে, WTO বিশ্বায়নের নামে যে উন্মুক্ত বাণিজ্য তৈরি করেছে তা দরিদ্র দেশগুলোর বাজার দখল করে নিয়েছে, ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৯. **উন্নয়নশীল দেশের দাবি এবং শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা :** WTO গঠনের পর থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো কিছু দাবি করে আসছিল। যেমন– শ্রমের অবাধ যাতায়াত এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি। কিছু উন্নয়নশীল দেশের কোনো দাবি আজও গ্রহণ করা হয়নি।
LDC দেশগুলোর পক্ষ থেকে কানকুন সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সব ধরনের পণ্যে শুল্ক কোটামুক্ত সুবিধা প্রদানের দাবি জানানো হচ্ছিল। কিন্তু এর প্রতি কোনো কর্ণপাতই করা হয়নি।

১০. **মার্কিন কঠোর নীতি ও সিদ্ধান্তহীনতা :** WTO ধনী-দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক মতবিরোধের অবসান ঘটাতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবার জন্য বাজার উন্মুক্ত করার কথা বললেও তাদের বাজার উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বন করে। যা দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোতে WTO সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে WTO-এর প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর ধারণা নেতিবাচক।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে– WTO আর কিছুই নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শোষণ করার হাতিয়ার মাত্র। WTO-এর নেতৃত্ব দানকারী দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর টিকে থাকা খুবই কঠিন। যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমৃদ্ধির জন্য নানা প্রলোভন দেখাচ্ছে WTO। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যত কিছুই বলা হোক না কেন WTO হচ্ছে উন্নত দেশ কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে শোষণ করার একটি আইনানুগ বৈধ প্রতিষ্ঠান। কাজেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিশ্বায়নের এ যুগে WTO তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

০২। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)-এর পটভূমি ও কার্যসম্পাদন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন। *[২৫তম বিসিএস]*

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস শহরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন International Trade Organization, (ITO) গঠন সম্পর্কিত কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বাণিজ্য সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন সম্মেলনের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হাভানা সনদ স্বাক্ষরিত হয়, যা শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত অভিন্ন চুক্তি (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT)-এর জন্ম দেয়। পরবর্তীতে GATT-এর অধীনে ৮টি রাউন্ডে বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ উরুগুয়ে রাউন্ড (১৯৮৬-৯৩)-এর ভিত্তিতে ১৯৯৫, ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) আত্মপ্রকাশ করে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পটভূমি : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা পরিচালনাকারী একমাত্র সংস্থা। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস সম্মেলনে ৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ প্রথম দুটি সংস্থা কার্যকর হয়। মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি না পাওয়াতে আইটিও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে আইটিও-এর পরিবর্তে মাত্র ২৩টি দেশের স্বাক্ষরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি গ্যাট (GATT) কার্যকর হয়। GATT-এর অধীনে ১৯৪৭-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৮ রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা চলে।

গ্যাটের অষ্টম সম্মেলন (১৯৮৬-১৯৯৩) উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার ভিত্তিতে গ্যাটকে WTO- তে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখে মরক্কোর মারাকেশ (Marrakesh)-এ ১২৩টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি। মূল চুক্তিটি ৪০০ পৃষ্ঠার এক দলিল যার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে প্রায় ২২,০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এক বিরাট তালিকা। এ চুক্তির মাধ্যমে যে বিষয়গুলো সম্পাদিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত, অনেকগুলো খাতে শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত অন্যান্য বাধা কমিয়ে বিদেশে পণ্যসমূহের বাজারজাতকরণের অধিক সুযোগ সৃষ্টি। এ চুক্তিটি শিল্পোৎপাদিত পণ্যের ওপর থেকে এক-তৃতীয়াংশ শুল্ক কমিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয়ত, বস্ত্রখাতে মাল্টি-ফাইবার ব্যবস্থা (Multi-Fiber Agreement-MFA)-এর অধীনে দ্বি-পাক্ষিক কোটা ১০ বছরের মধ্যে তুলে দেয়ার সময়সীমা বেঁধে দেয়ার ফলে অনেক উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত, চুক্তিটি প্রথমবারের মতো কৃষিজাত পণ্যের ওপর অর্থবহভাবে বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়মকানুন প্রবর্তন করে। যদিও কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর অনেকগুলো প্রতিবন্ধক অব্যাহত থাকে, তবু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষিজাত দ্রব্যের বিদেশের বাজারে প্রবেশের ব্যাপারে চুক্তিটি পূর্বে বিরাজমান অবস্থার উন্নতি ঘটায়। এটা কোটা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তদস্থলে শুল্কের প্রবর্তন করে যা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সরাসরি কমানোর ব্যবস্থা রাখা হয়। মোট রপ্তানি ও কৃষিজাত পণ্যের ওপর সরকারি ভর্তুকি প্রদানের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের মাধ্যমে চুক্তিটি বাণিজ্যিক বিকৃতি রোধ করার প্রচেষ্টা নেয়।

চতুর্থত, উরুগুয়ে রাউন্ড নতুন তিনটি বিষয় যথা–সেবা, বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ ও বিনিয়োগের ওপর বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের নামে উন্নত বিশ্বের স্বার্থসিদ্ধির

সহায়ক হয়। চুক্তিটি সেবার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সনাতন বিধিমালার অন্যতম মূলনীতি–কোনো বিশেষ জাতির প্রতি আনুকূল্য প্রদান সংক্রান্ত জাতীয় নীতি (Most Favoured Nation treatment, সংক্ষেপে MFN status) প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার ফলে বিজ্ঞাপন, হিসাবরক্ষণ, প্রকৌশল, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও কম্পিউটার সেবা এবং পর্যটন বিদেশের বাজারে প্রবেশাধিকার পায়। বাণিজ্য সংক্রান্ত বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ (Trade Related Intellectual Property-TRIP)-এর আলোচনা কপিরাইট, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক ও শিল্পগত নকশা সংরক্ষণে সর্বাধিক বাণিজ্যিক বিধিমালা প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করে। চুক্তিটির বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ (Trade Related Investment Measures-TRIM)-এর ধারণাটি প্রথমবারের মত বিনিয়োগের ওপর আন্তর্জাতিক নীতিমালা উন্নয়নের প্রয়াস পায়। এটা স্থানীয় উপাদান, বাণিজ্য সুষমকরণ ও বিদেশী মুদ্রায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণকে নিষিদ্ধ করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বাধিকারকে শুধু ক্ষুণ্নই করেনি, তাদের স্বার্থবিরোধী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি গ্যাটের কার্যপ্রণালীর আধুনিকীকরণের কাজ সম্পাদন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এটা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ মেটানোর কার্যাবলীকে দ্রুততর ও অধিক নিষ্পত্তিমূলক করে তুলেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো– এ চুক্তির মাধ্যমে গ্যাট একটি সন্ধি থেকে স্থায়ী সংগঠনের আকৃতি ধারণ করে। এ সংগঠনের নাম বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা World Trade Organization-(WTO), যেটিকে বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা ও সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা খবরদারি করার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল পর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তার নতুন অবকাঠামো, নীতিমালা ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে। এর সদর দপ্তর প্রাক্তন গ্যাটের সচিবালয়ে, যেটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬০। সর্বশেষ সদস্য ইয়েমেন, ২৬ জুন ২০১৪। এ সংস্থার প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক। বর্তমান মহাপরিচালক ব্রাজিলের রবার্তো কার্ভালহো দ্যা আজেভিদো।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যসম্পাদন সম্পর্কে আলোচনা : WTO এ পর্যন্ত ৯টি সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর প্রথম তিনটি সম্মেলনে কিছু সাফল্য অর্জিত হলেও বাকিগুলো সফলতার মুখ দেখেনি। WTO বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করে সদস্য দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা। এ সংস্থার দু'বছরে অন্তত একবার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিচে WTO-এর সম্মেলনসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

এক নজরে WTO-এর সম্মেলন

ক্রম	স্থান	সময়কাল	সিদ্ধান্তসমূহ
১ম	সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর	৯-১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬	বাণিজ্য উদারীকরণ, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন, তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ও বিনিয়োগ, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি।
২য়	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	১৮-২০ মে, ১৯৯৮	মুক্ত বাণিজ্য বিকাশে সমন্বিত উদ্যোগ, নন ট্যারিফ বাধা ও কোটা ব্যবস্থার অপসারণ।
৩য়	সিয়াটল, যুক্তরাষ্ট্র	৩০ নভেম্বর-৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	কোনোরকম ঘোষণা ছাড়াই সমাপ্ত।
৪র্থ	দোহা, কাতার	৯-১৩ নভেম্বর, ২০০১	বাণিজ্য উদারীকরণ, দোহা উন্নয়ন রাউন্ড চালু, ঔষধ শিল্পের প্যাটেন্ট আইনের শিথিলতা।

ক্রম	স্থান	সময়কাল	সিদ্ধান্তসমূহ
৫ম	কানকুন, মেক্সিকো	১০-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩	কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত।
৬ষ্ঠ	হংকং, চীন	১৩-১৮ ডিসেম্বর ২০০৫	ধনী দেশগুলো কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার ও বাণিজ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে সীমিত ছাড় দিতে সম্মত হয়
৭ম	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	৩০ নভে.-২ ডিসে. ২০০৯	কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত।
৮ম	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	১৫-১৭ ডিসে. ২০১১	নতুন কোনো সম্ভাবনা ও পথনির্দেশনা না দেখিয়েই সমাপ্ত
৯ম	বালি, ইন্দোনেশিয়া	৩-৬ ডিসেম্বর ২০১৩	বাণিজ্য সহজীকরণ চুক্তি, উন্নয়নশীল বিশ্বে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা এবং তুলা রপ্তানি বিষয়ক প্রস্তাবনা।
১০ম	নাইরোবি, কেনিয়া	১৫-১৮ ডিসেম্বর ২০১৫	

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চুক্তি (WTO Agreement)-কে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির সনদ বলা যেতে পারে। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাণিজ্য আলোচনাসমূহের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তিকে দূরীভূত করে। এটা নামে নতুন সংগঠন হলেও GATT যেভাবে কার্য পরিচালনা করতো সেভাবেই কার্যনির্বাহের ব্যবস্থা রেখেছে। এর কোনো ধারা সংশোধন, কোনো দেশকে বাণিজ্য সংক্রান্ত ছাড় দেয়া অথবা মওকুফ করা, সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তসমূহ পালন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক সেগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়।

কোনো সদস্য দেশ ইচ্ছা করলে ৬ মাসের নোটিশ দিয়ে এ সংস্থাটি থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে এটা করতে উদ্যোগ নেবে না, কারণ এর ফলে অন্যান্য সদস্য দেশের নিকট থেকে বিনিময়ে প্রদেয় কম শুল্ক ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে সেই দেশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্দশা ভোগ করতে হবে। কোনো দেশ যদি অন্য একটি দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক নিয়মকানুন ভঙ্গ করার অভিযোগ আনে, তবে সংস্থাটির অধীনে ৩ জন বিচারকের একটি প্যানেল সে অভিযোগ শ্রবণ করে। যদি প্যানেল দেখতে পায় যে, অভিযুক্ত দেশটি আসলেই আইন ভঙ্গ করেছে তবে সংস্থাটি তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। সংস্থাটিতে প্রত্যেক সদস্য দেশের একটি করে ভোট আছে এবং অবরোধ আরোপ করতে দরকার হয় মোট ভোটের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট। এভাবে যুক্তির দিক থেকে বিবেচনা করলে এ নিয়মটি সঠিক হলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, অপরাধী দেশটি যদি অধিক শক্তিধর হয় তবে দুর্বল দেশসমূহ তার বিরুদ্ধে অবরোধের পক্ষে ভোট দিয়ে তাকে চটাতে চাইবে না, কারণ এর ফলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ক্ষমতাশালী দেশটি তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ার মূল স্তম্ভ হলো বিরোধ নিরসনের ন্যায্য ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য সম্পর্কিত আপত্তি নিরসনে WTO উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ডব্লিউটিওর বিরোধ নিরসন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভেদহীনভাবে সকল পক্ষের জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয়। বিরোধ নিরসন কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক সমঝোতা এবং পরামর্শের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর পক্ষ থেকে উত্থাপিত বাণিজ্য সম্পর্কিত জটিলতাসমূহ সমাধানে আগ্রহী। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩১৫টি বিরোধের ঘটনার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ঘটনা পূর্ণাঙ্গ ডব্লিউটিও প্যানেল প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বাকি সবকটি মামলার সমাধান হয় আউট অব কোর্ট-এর মাধ্যমে, পরামর্শ তথা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে।

ডব্লিউটিও-র বিরোধ নিরসন প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো বৈষম্যহীন, তড়িৎ এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা উভয়পক্ষের কাছে সমভাবে বাঞ্ছনীয়। যে কোনো বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে বিরোধ

নিরসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত প্যানেলের রায়কে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়। তবে বিরোধ নিরসন কর্তৃপক্ষ এ প্যানেলের যে কোনো রায় বাতিল করার ক্ষমতাও রাখে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে কোনো স্বাধীন দেশ অথবা শুল্ক নিয়ন্ত্রিত এলাকা WTO-এর সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ৪টি পদক্ষেপ সম্পন্ন করতে হয়। যথা–

ক. সদস্য প্রার্থী দেশ নিজ দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক নীতির বিশদ বিবরণ জানিয়ে WTO মহাপরিচালকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে, যা ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা বিস্তারিত তদন্ত করা হয়।

খ. সদস্য প্রার্থী দেশের শুল্ক, বাজার সুবিধা, পণ্য ও সেবানীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা হয়। দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সদস্য দেশগুলো নির্ণয় করে আবেদনকারী দেশের সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্যতা।

গ. ওয়ার্কিং পার্টির সম্পূর্ণ তদন্ত এবং দ্বি-পাক্ষিক বাজার সুবিধা সংশ্লিষ্ট আলোচনা চূড়ান্ত হওয়ার পর আবেদন প্রার্থী দেশটির WTO-তে অনুমোদন পাওয়ার শর্তসমূহ নির্ধারণ করা হয়।

ঘ. আবেদনের সর্বশেষ পর্যায়ে অনুমোদন প্রার্থী দেশের প্রটোকল এবং তালিকাসহ একটি পূর্ণ প্রতিবেদন WTO সাধারণ পরিষদে অথবা মন্ত্রী সম্মেলনে পেশ করা হয়। WTO-এর $\frac{২}{৩}$ অংশ সদস্য উক্ত প্রার্থী দেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির অনুমোদনে সম্মতি প্রদান করলে আবেদনকারী দেশটি WTO-এর সদস্যপদ লাভ করতে পারে।

এছাড়াও বর্তমানে যেসব দেশ সদস্যপদের জন্য আলোচনা প্রক্রিয়ায় রয়েছে তাদেরকে WTO পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাধারণত পর্যবেক্ষক পদ লাভ করার ৫ বছরের মধ্যেই যে কোনো দেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির আলোচনা শুরু করতে হয়।

WTO যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক মুক্তিতে WTO-এর ভূমিকা হতাশাজনক। যার প্রমাণ ১৯৭১ সালে বিশ্বে LDCs-এর সংখ্যা ছিল ২৪টি দেশ। ২০১১-এ এসে হয়েছে ৪৮টি দেশ। ৮০-এর দশকে গোটা বিশ্বের GDP-এর ০.৬ শতাংশ ছিল স্বল্পোন্নত দেশসমূহের, যা ৯০-এর দশকে বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ০.৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা LDC ভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য সুবিধা সম্প্রসারণকে ব্যর্থ করেছে।

পরিবেশে বলা যায়, WTO হলো বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার বৈধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। এ প্রতিষ্ঠান সদস্য দেশসমূহের সরকারকে তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত বাধ্যবাধকতা ও চুক্তিসমূহের মূল নীতিমালা নির্ধারণ করে। এটা এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে যৌথভাবে যুক্তি, তর্ক, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বিকশিত করার লক্ষ্যে, এবং বিশ্বকে একই ছাতার নিচে এনে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে অবাধ বাণিজ্য স্থাপনের জন্য এটি সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ শুরু থেকেই সংস্থার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত একে বিতর্কিত করে তুলেছে। সদস্য দেশের অনেকেই WTO-কে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখন সত্যিকার অর্থে অলীক-ই ভাবতে শুরু করেছে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে WTO-এর বৈষম্যমূলক নীতির ফলে অনেকে প্রতিষ্ঠানটিকে পুলিশি আচরণের সাথেও তুলনা করছে। WTO স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক মুক্তিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং উন্নত বিশ্ব WTO-কে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে।

০৩। অনুন্নত দেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ভূমিকা আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের অর্থনৈতিক অবক্ষয়, অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে জটিল ও ভয়াবহ করে তোলে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন, অর্থসাহায্য ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পরিচালনার নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব হেনরি মর্গেনথ্যু-এর আহ্বানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস-এর মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সারাবিশ্বের ৪৪টি দেশের প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ সম্মেলনে মিত্রশক্তির দেশগুলো এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। যে চুক্তি মোতাবেক দুটি মুখ্য অর্থনৈতিক সংগঠন ও একটি গ্যাট (GATT) নামে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। উক্ত মুখ্য অর্থনৈতিক সংগঠন দুটি হলো– (ক) পুনর্গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development বা IBRD) যা সংক্ষেপে বিশ্বব্যাংক নামে সমধিক পরিচিত ও (খ) আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund বা IMF)। বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ জুন ১৯৪৬। অপরদিকে, আইএমএফ ১ মার্চ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের উদ্দেশ্য হলো– বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও সুষম উন্নয়নে সাহায্য করা, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করা, উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা, মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, বহুমুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজতর করা, বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রার মূল্য হ্রাস প্রতিরোধ ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা দূর করা, সদস্য দেশের মধ্যে সর্বমুখী লেনদেনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করা প্রভৃতি।

অনুন্নত দেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা : বিশ্বব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর পুনর্গঠনে সহায়তা করা এবং দরিদ্র-অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য করা। আর এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক অনুন্নত দেশগুলোকে ঋণ প্রদান করে স্বল্প মেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে। এ ঋণ প্রদান ছাড়াও বিশ্বব্যাংক তার সদস্য অনুন্নত দেশগুলোকে শলা-পরামর্শ এবং বিভিন্ন রকম কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিশ্বব্যাংক অনুন্নত দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে অনুন্নত দেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা উপস্থাপন করা হলো :

১. **দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা :** দারিদ্র্যকে বিশ্বব্যাংক একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর এ আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে বিশ্বব্যাংক সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করছে। এ উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক ১০টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। অনুন্নত দেশগুলোর আর্থিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাকে শক্তিশালী করতে পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এ পর্যন্ত ২৪টি দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে পাইলট কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে ২০.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদান করেছে তার সদস্য দেশগুলোকে।

২. **শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা :** বিশ্বব্যাংক শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে শিক্ষাখাতে অনুন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে সেনেগালের ডাকারে বিশ্বব্যাংক ইউনেস্কো, ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফকে সাথে নিয়ে বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম (World Education Forum) গঠন করে। এ ফোরাম গঠনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক সদস্য দেশগুলোর শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য গবেষণার ভিত্তিতে দেশগুলোকে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। বিশ্বব্যাংকের এ উদ্যোগের ফলে অনুন্নত দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা ৫০% থেকে ৭৫%-এ উন্নীত হয়েছে। আগামী ১০ বছরে 'সবার জন্য শিক্ষা' এ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে।

৩. **পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা :** সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানবসৃষ্ট কার্যক্রম পরিবেশকে বৈরী করে তুলেছে। বাসযোগ্য এ পৃথিবী ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবীকে মনুষ্য বসবাসের যোগ্য করতে বিশ্বব্যাংক নব্বই এর দশক থেকে এগিয়ে এসেছে। পরিবেশকে রক্ষায় বিশ্বব্যাংক বনায়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি প্রকল্পে সাহায্য করতে সচেষ্ট রয়েছে। এ পর্যন্ত পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাংক ১.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করেছে। বিশ্বব্যাংক উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশে আবহাওয়া প্রযুক্তি প্রেরণে 'Proto type Carbon Fund' চালু করেছে।

৪. **টেকসই উন্নয়নে সহায়তা :** বিশ্বব্যাংক অনুন্নত দেশের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করে টেকসই উন্নয়নের প্রতি। টেকসই উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ব্যাপক ভিত্তিক নীতিমালায় সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আরো বেশি দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে জোর দেয়। বিশ্বের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের অগ্রগতিতে নারীর অধিকতর উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অনুন্নত দেশগুলো নিজস্ব উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধিতে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিশ্বব্যাংক তাগিদ প্রদান করে। আর্থিক খাতকে শক্তিশালীকরণে IBRD ১.৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করেছে। বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে।

৫. **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা :** স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিশ্বব্যাংক ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করেছে। আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোতে এইডস রোগের প্রতিরোধ খাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। এ পর্যন্ত এইডস আক্রান্ত ৩৩ মিলিয়ন লোকের মধ্যে ৯০%ই হলো দরিদ্র দেশগুলোতে। আর এ ৯০%-এর ভেতর ৬০% হলো সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের। IDA ১ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করে ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধ করার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ কার্যক্রমে IDA, UNAIDS, GAVI ইত্যাদি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক কাজ করছে।

৬. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি :** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশ্বের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক নানাবিধ আর্থিক সহায়তা ছাড়াও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠানে (The World Bank Institute) ১৮৫টি দেশ থেকে প্রায় ৩০,০০০ প্রশিক্ষণার্থী ৫০০টি কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। সম্প্রতি এ কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাংক আরো প্রসারিত করেছে। দূর শিক্ষণ, গ্লোবাল নলেজ নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাংক শক্তিশালী করেছে।

৭. **প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা :** প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য বিশ্বব্যাংক অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাসগৃহে জ্বালানি হিসেবে কাঠ-এর বিকল্প গ্রহণে অনুন্নত দেশের জনগণকে উৎসাহিত করছে। নদী খনন এবং অন্যান্য উপায়ে পানি দূষণের মাত্রা হ্রাসের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করছে। মৎস্য মজুদ, বনায়ন, বন উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রতিরোধ করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে। যানবাহনের দ্বারা বায়ু দূষণ রোধে সহযোগিতা করছে।

৮. **কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন :** বিশ্বের অধিকাংশ অনুন্নত দেশই কৃষি ও পল্লী প্রধান। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং নগর উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদান করে দরিদ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। কৃষিখাতের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক সেচ, সার, উন্নত বীজ, বাজার উদারীকরণ, সেবার মান সম্প্রসারণ, গবেষণা প্রকল্প, মূল্য নির্ধারণ নীতি, কৃষকদের ভালো উৎপাদনের জন্য পুরস্কার প্রদান বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করে থাকে।

অনুন্নত দেশের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ভূমিকা : আইএমএফ বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল কোনো দাতা সংস্থা বা উন্নয়ন ব্যাংক নয় অথবা কোনো বিশ্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকও নয়, এটা একটি বহুদেশীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। এর মূল উদ্দেশ্য হলো– আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং সুসংহত করা এবং মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক অবমূল্যায়নের প্রবণতা রোধ করা। সদস্যদের মধ্যে বহুজাতিভিত্তিক লেনদেন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য সহায়তা প্রদান এবং বিশ্ববাণিজ্য প্রসারের পথে অন্তরায় দূর করার লক্ষ্যে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা। সদস্য দেশগুলোর সাময়িক লেনদেন ভারসাম্য ঘাটতি মোকাবিলায় আস্থা প্রদানের জন্য সম্পদ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকে। এ উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে আইএমএফ অনুন্নত দেশের উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করে তা নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো–

১. **কারিগরি সহযোগিতা :** আফ্রিকা ও এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য ১৯৬৪ থেকে আইএমএফ কারিগরি ও কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। আর এ লক্ষ্যে আইএমএফ উপদেষ্টা মিশন, প্রশিক্ষণ, সেমিনার প্রভৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। আইএমএফ-এর কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্র তিনটি হলো– মুদ্রানীতি তৈরি ও কার্যকর করা; কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ট্রেজারি, কর, শুল্ক বিভাগের মতো প্রতিষ্ঠান তৈরি, পরিসংখ্যানগত কাজে সহায়তা করা; আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আইন কানুন তৈরি এবং পর্যালোচনা করা। আইএমএফ প্রশিক্ষণের জন্য ফিজি, সিঙ্গাপুর-এ টেকনিক্যাল সহযোগিতা কেন্দ্র চালু করেছে। আইএমএফ সুইজারল্যান্ডের সহযোগিতায় বলিভিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণ করেছে। মোজাম্বিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুনর্গঠন করেছে। আজারবাইজান, কিরগিজস্থান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তানে কারিগরি সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।

২. **দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি সহযোগিতা :** ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আইএমএফ দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি সহযোগিতা কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এ সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় যা ১৯৯৯-এ এসে মুখ্য কাজে পরিণত হয়। দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি সহযোগিতায় বর্তমানে আইএমএফ ৮০টি সদস্য রাষ্ট্রের PRGF-এর আওতায় ০.৫% হারে ১০ বছর মেয়াদে ঋণ সুবিধা গ্রহণে সহযোগিতা করছে।

৩. **কৃষি সংস্কার :** অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হওয়ায় আইএমএফ এসব দেশের কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আইএমএফ এক্ষেত্রে অনুন্নত দেশসমূহে কৃষি উপকরণের যোগান দেয়, সার ও অন্যান্য উপকরণ থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করে, ব্যক্তিখাতে উন্নয়নে সাহায্য করে। কৃষি উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাপক বেসরকারিকরণে উৎসাহিত করে।

৪. **বাণিজ্য সংস্কার :** প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইএমএফ-এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যা বা অন্তরায় দূর করা। সদস্য দেশগুলোর সাময়িক লেনদেন, ভারসাম্য ঘাটতি মোকাবিলায় আস্থা প্রদানের জন্য সম্পদ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকে। আইএমএফ অনুন্নত দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে যেসব বাণিজ্য সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে তা হলো– বিনিয়োগ সহায়তাসহ ব্যাপক আমদানি উদারীকরণ, শুল্ক যুক্তিসঙ্গত করা, রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের দিকে ধাবিত করা, বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি করা, অনুকূল লেনদেন ও ভারসাম্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক বিনিময় হারের সংস্কার এবং রপ্তানি নীতি সংস্কার।

৫. **ঋণের বোঝা লাঘব :** আইএমএফ অধিক ঋণগ্রস্ত অনুন্নত দেশগুলোকে ঋণের বোঝা গ্রহণযোগ্য মাত্রার ভেতর নিয়ে আসতে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তার কার্যক্রম শুরু করে। ঋণের বোঝা লাঘবে অনুন্নত বিশ্বের ৩৬টি দেশ আইএমএফ-এর এ সহযোগিতার আওতায় এসেছে। আশা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে ঋণের ভারে জর্জরিত অনুন্নত দেশসমূহ ঋণের বোঝা থেকে অব্যাহতি পাবে।

৬. **কাঠামোগত ও বর্ধিত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সুবিধা :** আইএমএফ অনুন্নত দেশগুলোকে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সুবিধা (SAF) এবং বর্ধিত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সুবিধা (ESAF)গুলো বেশি দেয়। ১৯৮৬-তে সৃষ্ট কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সুবিধায় অনুন্নত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধাগ্রস্ত দেশগুলো বিশেষ ছাড়পত্রসহ ঋণ পেয়ে থাকে। মোট কোটায় ৭০% ঋণ দেয়া হয়। তবে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সুবিধা খাতে ঋণ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশকে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী সে দেশকে কাঠামোগত সংস্কারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিতে হবে। বর্ধিত কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সুবিধা ১৯৮৭ সালে শুরু হয়। এর ঋণের পরিমাণ মোট কোটায় ২৫০%–৩৫০%। এ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে হলে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস সুবিধার মতোই একটি পরিকল্পনা আইএমএফ-এর কাছে পেশ করতে হয়।

৭. **জরুরি তহবিল গঠন :** আইএমএফ-এর তৎকালীন প্রধান ডোমিনিক স্ট্রাউস কান নভেম্বর ২০০৮ ওয়াশিংটনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিশ্বব্যাপী চলতি সংকট মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিশ্ব সংকটে যেসব দেশের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে, তাদের সহায়তা দেয়া হবে। আর এজন্য প্রয়োজনমতো সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে একটি জরুরি তহবিল সক্রিয় রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৬৯ বছর পর আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছিল, পশ্চিমা দুনিয়ার বিভ্রান্তি, সংকীর্ণ ও অপরিণামদর্শী নীতির ফলে তা মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং এ সংগঠন দুটির অস্তিত্বই আজ প্রশ্নের

সম্মুখীন। একদিকে যেমন বৈদেশিক ঋণের জালে অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী উন্নত বিশ্ব তাদের পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলছে। বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এ দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলেও এরা ভোটদানে অর্থের অংশীদারিত্ব প্রবর্তন করে বৈষম্যের নতুন কলা সৃষ্টি করেছে। আর তাই এখন বিশ্ব জুড়ে এদের বিরুদ্ধে সচেতন গরীব মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। করছে বিক্ষোভ, ভাংচুর, পুত্তলিকা দাহ। প্রেসক্রিপশননির্ভর ঋণ সুবিধা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহ, যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণ না নিয়ে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৬৯ বছর পর আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের অনুন্নত দেশের উন্নয়নে অর্জন কেবল গড় আয়ু ৫৫ বছর থেকে ৬৫ বছরে উন্নীতকরণ, মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা ০.৫% থেকে ০.৭৫%-এ নিয়ে আসা। সময়ের দীর্ঘসূত্রিতায় এ অর্জন যথেষ্ট নয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গঠিত হয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আর এর জন্য দায়ী পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ। এ দুটো অর্থনৈতিক সংগঠন পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশের তল্পিবাহকে পরিণত হয়েছে। কাজেই এ অর্থনৈতিক সংগঠনদ্বয়কে অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে পরনির্ভরতা দূর করে তাদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গ্রুপ-৭৭ এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : গ্রুপ-৭৭ একটি স্বল্পোন্নত বা তৃতীয় বিশ্বের জোট। ১৯৬৪ সালের ১৫ জুন জেনেভাতে অনুষ্ঠিত আঙ্কটাডের প্রথম বৈঠকের শেষে ৭৭টি উন্নয়নশীল দেশ একটি যৌথ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে গ্রুপ-৭৭ প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে গ্রুপ-৭৭ এর সদস্য সংখ্যা ১৩৩। এর মূল উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করা। এর কোনো সাংগঠনিক কাঠামো বা সদর দপ্তর নেই। গ্রুপ-৭৭ এর সদস্যরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও টেকসই উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে গ্রুপ-৭৭ সদস্য দেশগুলোর যাবতীয় সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও উন্নত বিশ্ব কিভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছাকাছি আসতে পারে, কিভাবে জাতিসংঘকে আরও সক্রিয় এবং কল্যাণমুখী করা যায় তার ক্ষেত্রে সংগঠনটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা রয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে জি-৭৭ এর গুরুত্ব

১. **সর্বজনীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :** বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। তাই বর্তমানে বিশ্বে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে জি-৭৭ কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণের দেশগুলো বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলোর মতো যাতে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশ যেন বিশ্বায়ন থেকে বঞ্চিত না হয় সেক্ষেত্রে জি-৭৭ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।

২. **পুঁজি সরবরাহের সুষ্ঠু সমন্বয় :** উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি ও লাগসই উন্নয়নের জন্য উন্নত বিশ্বের সহযোগিতা সবসময় প্রয়োজন। তাই উন্নয়নশীল বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, মুদ্রা ও বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের কোনো নেতিবাচক প্রভাব যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর না পড়ে সেক্ষেত্রে জি-৭৭ কাজ করে যাচ্ছে।

৩. **GSP সুবিধা :** উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য GSP সুবিধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জি-৭৭ উন্নয়নশীল দেশগুলোর GSP সুবিধা বহাল রাখার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও উন্নত দেশগুলোর সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

৪. **আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি :** উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তাই সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে জোটবদ্ধ করে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে জি-৭৭ সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

৫. **তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি :** তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি কারিগরি ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী বিপ্লব ঘটিয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজির উন্নয়ন অতি আবশ্যক বলে মনে করে জি-৭৭।

৬. **দুর্নীতি রোধে :** যেকোনো দেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো দুর্নীতি। উন্নয়নশীল দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে প্রথমেই দুর্নীতি রোধ করতে হবে। জি-৭৭ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৪তম অধিবেশনে দুর্নীতি রোধ ও অবৈধ টাকা পাচার বন্ধ করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জি-৭৭ তাকে পুরোপুরি সমর্থন করে।

৭. **দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নে :** বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে আছে। দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব বাজারে তাদের পণ্যের প্রবেশাধিকারের অভাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দ্রুত অর্থনীতি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাল মিলাতে পারছে না। তাই ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে জি-৭৭ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৮. **টেকসই উন্নয়নে :** একটি দেশের যথাযথ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার বিষয়টি নির্ভর করে বিশ্বায়নের কলাকৌশলের উপর। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও অধিক লাভের বিষয় দুটিই প্রাধান্য পায়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই এ অবস্থা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই 'জি-৭৭' আঙ্কটাড এবং আইএলওকে সাথে নিয়ে আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

৯. **WTO ও G-77 :** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বর্তমান চুক্তিতে কিছু অসমতা রয়েছে বলে জি-৭৭ মনে করে। LDCs ভুক্ত রাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর রপ্তানি বাণিজ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যাতে আরও সুবিধা প্রদান করতে পারে তার উপর জি-৭৭ গুরুত্ব দেয়।

১০. **আফ্রিকার ঋণ লাঘবে :** জি-৭৭ আফ্রিকার অধিক ঋণের বোঝার বিষয় নিয়েও তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলাবস্থা নিয়ে চিন্তিত। আফ্রিকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ৩-৪ এপ্রিল ২০০০ কায়রোতে আফ্রিকা-ইউরোপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জি-৭৭ আফ্রিকা অঞ্চলে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য পরিস্থিতি ৫০ শতাংশ উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।

জি-৭৭ এর রাজনৈতিক গুরুত্ব

১. **আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে :** জি-৭৭ জাতিসংঘের চার্টার এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আস্থাশীল থেকে যে কোনো দ্বন্দ্ব বা সমস্যা সমাধানে বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে। এক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে যাতে অন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করে সেদিকেও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে জি-৭৭।

২. **গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে :** বর্তমান বিশ্বে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের খুব অভাব। বিশেষ করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উন্নয়নে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। আর এই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জি-৭৭ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. **শান্তি স্থাপনে :** জি-৭৭ মনে করে শান্তি স্থাপনের জন্য উন্নয়নের প্রয়োজন। উন্নয়ন ও শান্তি এ দুটি বিষয় পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে শান্তির জন্য উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এর জন্য দূর করতে হবে ক্ষুধা, অশিক্ষা, অসুস্থতা ও দারিদ্র্য।

৪. **স্থলমাইন অপসারণে :** স্থলমাইন অপসারণের ক্ষেত্রে সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করার জন্য জি-৭৭ প্রস্তুত। স্থলমাইন অপসারণ ছাড়াও এ মাইনের বিস্ফোরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সামাজিক ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য জি-৭৭ আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানায়।

৫. **মানব সম্পদ উন্নয়নে :** উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের একটি অন্যতম সম্পদ হলো মানব সম্পদ। বিশ্বব্যাপী মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নের নতুন মাত্রায় দরিদ্র এবং ধনীর মাঝে পার্থক্য দূর করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে জি-৭৭ কাজ করে যাচ্ছে।

৬. **সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে :** বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে জি-৭৭ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে গুরুত্বের সাথে কাজ করার অনুরোধ করে।

৭. **জাতিসংঘের বাজেট সংকট দূরীকরণে :** যে কোনো দেশের দুর্যোগ পরিস্থিতিতে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় জাতিসংঘ। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘের বাজেট সংকট দূরীকরণের জন্য জাতিসংঘের চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করার উপর জি-৭৭ গুরুত্ব আরোপ করে।

৮. **উত্তর-দক্ষিণ ব্যবধানে হ্রাস :** জি-৭৭ বিশ্বে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাসে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এর প্রেক্ষিতে জি-৭৭ এর প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দূরীকরণে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৯. **মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে :** মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানের জন্য জি-৭৭ পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলোকে জি-৭৭ সমর্থন করে।

১০. **অপরাধ নিয়ন্ত্রণে :** বিশ্বের সব ধরনের অপরাধমূলক কাজ-কর্মের বিরোধিতা করে আসছে জি-৭৭। জি-৭৭ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবৈধ অস্ত্র পাচার, মাদক পাচার এবং নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে গুরুত্বসহকারে কাজ করে যাচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, গ্রুপ-৭৭ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উন্নত দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করছে। এক্ষেত্রে জি-৭৭ একটি নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে দক্ষতার সাথে। জি-৭৭ ক্রমবর্ধমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবক।

০৫। 'স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ভূমিকা অনেক সময় সমালোচনার উর্ধ্বে নয়'— যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : 'জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না যে, বিশ্বব্যাংক কিংবা আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটছে ... এটাও তারা বিশ্বাস করে না যে, এসব প্রতিষ্ঠান জবাবদিহিমূলক।' *[সূত্র : ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০২; পৃ. ১১২]*

ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এ কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে নানা তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নিঃস্বার্থভাবে বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য গড়ে ওঠেনি বরং সরাসরি উপনিবেশবাদের অবসান ঘটতে শুরু হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোর বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বজায় রাখা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার দখল করে রাখার জন্যই এসব প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গড়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরিচয় : গত শতকের চতুর্থ দশকে স্বর্ণমানের চূড়ান্ত পতনের পর আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চরম সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সময় বিভিন্ন দেশে সংরক্ষণনীতি অনুসরণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের পরিমাণ খুবই সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তন আসে বড়ভাবেই। সকল দেশেই বিশ্বশান্তির ও সমৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। এর ফলে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডসে মিত্রশক্তির অন্তর্গত দেশগুলো একটি সম্মেলনে একত্রিত হয়ে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সূচনা ঘটে। বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা ৫টি। এগুলো হলো :

1. IBRD— International Bank for Reconstruction and Development.
2. IDA— International Development Association.
3. IFC— International Finance Corporation.
4. MIGA— Multilateral Investment Guarantee Agency.
5. ICSID—International Centre for Settlement of Investment Disputes.

IBRD, IDA এবং IFC—এ ৩টি সংস্থাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

বহু রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্য হয়।

স্বল্পোন্নত বিশ্বে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র

'বিদেশী সাহায্য' আসলে কি এবং কাদের প্রতিনিধিত্ব করে, তার প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব চেহারা কি তা আমাদের নিকট ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে পুঁজি প্রবাহের পরিমাণ সবসময়ই নিম্নগামী ছিল। এখানে যা কার্যকর রয়েছে তা হলো 'বিদেশী সাহায্য' নামে পুঁজির প্রবাহ। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে বহুজাতিক বিভিন্ন সংস্থা আর বিদেশী সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক লগ্নি সংস্থাসমূহ।

বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত : 'বিদেশী সাহায্য' নামের অর্থসংস্থানে শেষ পর্যন্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিনিয়োগ ক্ষেত্রই প্রস্তুত হয়। কারণ, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থা ঋণ অনুদানের নামে যে অর্থ যোগান দেয় তা দিয়ে মূলত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বাজার প্রস্তুত ও বিস্তৃত হয়, বাড়ে বিনিয়োগ ক্ষমতা। যেমন– 'সবুজ বিপ্লব' নামের আড়ালে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যত বিদেশী সাহায্য এসেছে, তা গভীর-অগভীর নলকূপ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির বাজার তৈরি করেছে। PL 480 নামের আড়ালে যত খাদ্য সাহায্য এসেছে তা মার্কিন বৃহৎ খামারগুলোর উদ্বৃত্ত খাবার বিক্রির ব্যবস্থাই করেছে।

বিশ্বব্যাংকের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় যদি আমরা বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের নামে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প, সুপারিশ এবং বিভিন্ন কোম্পানির (বিশেষত মার্কিনি) বিনিয়োগের ধরন ও চুক্তির শর্তাবলীর দিকে লক্ষ্য করি। আমরা একদিকে গ্যাস খাতে কর্মরত বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানি থেকে গ্যাস কিনছি যখন ১২০ টাকারও বেশি দামে, তখন বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত কোম্পানিগুলো সরকার থেকে গ্যাস কিনছে ৫৪-৫৮ টাকা দরে। চুক্তি অনুযায়ী ২২ বছরের মধ্যে বিদেশী কোম্পানিগুলো বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারবে না বলে এ চুক্তিগুলোকে মহৎ করে তোলা হয়। কিন্তু এ চুক্তির অন্যান্য বিধানগুলো উহ্য রাখা হয় যেখানে বলা আছে যদি গ্যাসের দাম বাড়ে, যদি টাকার অবমূল্যায়ন হয় অথবা যদি সরকারি নীতির পরিবর্তন হয় তাহলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো যাবে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন বিনিয়োগকারী সংস্থার সম্পর্ক পুরনো। ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে বিভিন্ন সংস্থার গঠন, ভাঙন, বিনিয়োগ, নীতি, বিভিন্ন বিভাগ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বা বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ১৯৯০ সালে ডেসা, ১৯৯৬ সালে ডেসকো, ১৯৯৫ সালে পাওয়ার সেল, ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ এর পর রুরাল পাওয়ার কোম্পানি গঠন এ প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ আওতায় আসছে। এ প্রক্রিয়াতেই গ্যাস খাতের মতো এখানেও ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সংস্থা লোকসানি হয়ে যাচ্ছে। পিডিবিকে ভেঙে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারি কোম্পানিতে পরিণত করার সরকারি চিন্তা-ভাবনা এরই অংশ।

কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব : বাংলাদেশের কৃষিকে রপ্তানিমুখী উৎপাদনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বিশ্বব্যাংক কৃষি উন্নয়ন কৌশল নিয়ে বিস্তৃত কাজ শুরু করে ১৯৯৭ সালে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক, ADB ও USAID 'সামাজিক বনায়ন', 'চিংড়ি প্রকল্প' ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে, তা একদিকে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে। অন্যদিকে, কৃষি ভূমিকে সংকুচিত করেছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের সবুজ বিপ্লবীয় ধারা এমনিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে বটে তবে তা হয়েছে কৃষির বৈচিত্র্যময় ফসলের বিকাশ সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমাদের দেশের নিজস্ব বীজ, যেগুলোর পুষ্টি, স্বাদ বেশি এবং উৎপাদনের খরচের দিক দিয়েও কম সেগুলোকে ধ্বংস করে তাকে একক ফসল নির্ভর ব্যবস্থায় পরিণত করে। সার ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার ফসল পানি ও মাটি সবই বিষাক্ত করেছে।

বাংলাদেশে বন্যা বা ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান ছিল এসব পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনারই সম্প্রসারিত রূপ যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃত্বাধীন পরিকল্পনা। এদের নানা বক্তব্যই সরকারের 'কৃষি নীতি', 'পানি নীতি' নামে বাজারে আছে।

অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনের ফলে 'সবুজ বিপ্লবের ধারা', বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ বিস্তার করেছে। এর ফলে দু কোটি মানুষ এখন বিপদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। এ আর্সেনিক দূষণের কারণেও বিশ্বব্যাংক বড় আকারের বিনিয়োগের সুযোগ নিচ্ছে। মার্কিন বিভিন্ন সংস্থাও এর সাথে জড়িত।

সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ : বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শ তো বটেই, ক্ষেত্র বিশেষে এদের হুকুম অনুযায়ী সরকারকে চলতে হয়। তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলতে হয় বলেই আমরা দেখি ২০০১ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের অন্যতম নীতি নির্ধারক রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত 'মেরি অ্যান পিটার্স' বলেন, 'মাটির নিচে গ্যাস রেখে কোনো লাভ নেই।

অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর চাপের ফলেই যে প্রতিটি সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণে বাধ্য হন তা বোঝা যায়। এসব দাতা গোষ্ঠীর হুমকির মুখে পড়তে হয় যদি তাদের প্রেসক্রিপশন সরকার মানতে না চায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি বন্ধ করতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ করতে এবং ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে পরামর্শ দেয় বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এখন একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলকারখানা, বেড়ে যাচ্ছে বেকারত্ব। মন্দা থেকে মন্দাতর হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি কমিয়ে দিতে বলার কারণে বেড়ে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যয়। ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করাই হয়ে পড়ছে কষ্টসাধ্য, বেড়ে যাচ্ছে কৃষি পণ্যের দাম, কৃষক হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বদলে তৈরি হচ্ছে বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে ধনী-গরিবের ব্যবধান। তাই মাথাপিছু আয় বাড়লেও দরিদ্র ও ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তার : বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করে। একটু খেয়াল করলে দেখবো পেট্রোল ও ফার্নেস ওয়েল উভয়ের দাম বৃদ্ধি করা হলেও দাম বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে পেট্রোলের চেয়ে ফার্নেস অয়েলের দাম বৃদ্ধি পায় অনেক বেশি। পেট্রোল ব্যবহার করে পুঁজিপতি শ্রেণী, যাদের এই দাম বৃদ্ধিতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। অথচ ফার্নেস তেল ব্যবহৃত হয় শিল্পকারখানাগুলোতে। ফলে সেই শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের দামের সাথে তেলের বর্ধিত মূল্য যোগ হয়ে পণ্যের দাম আরও বৃদ্ধি পায়, যা সাধারণ জনগণকেই কিনতে হয়।

আদমজী জুট মিল ও নানা শিল্প-কারখানা এই দাতা মুখোশধারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। ফলে ছাটাই হয়েছে শ্রমিক, বেড়েছে অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, সর্বোপরি অর্থনৈতিক দুর্দশা।

শোষণের নতুন কৌশল প্রয়োগ : বিশ্বব্যাংক ও দাতা গোষ্ঠী বাজার অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অসম প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিয়েছে। আমরা দেখি এর ফলে আমাদের শিল্প ও পণ্যের বাজার দখল করে নিয়েছে ভারত ও অন্যান্য দেশ। ভারত থেকে প্রতিবছর ১০০ কোটি ডলারের পণ্য সামগ্রী অফিসিয়ালি আমদানি করে বাংলাদেশ, বিপরীতে ভারত মাত্র ৬ কোটি ডলারের পণ্য সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে। তাই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ যে মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলছে সেখানে বাণিজ্যে সমতা নেই উল্টা বাণিজ্য প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

NGO-এর মাধ্যমে শোষণ : অভিযোগ আছে দারিদ্র্যের বাণিজ্যিকীকরণের (Commercialization of Poverty) লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী সরকারকে বাদ দিয়ে এনজিওর মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে। এনজিওগুলোর সরকারের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই। বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম জুন, ২০০০ সালে অভিযোগ আকারে একটি তথ্য পত্রিকায় প্রকাশ করে, এনজিওরা বিদেশ থেকে অর্থ এনে ব্যবসায়-বাণিজ্য করছে

অথচ সেই অর্থের জন্য কোনো সুদ, রাজস্ব শুল্ক ও আয়কর দেয় না। বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের সুবাদে প্রতিবছর বিদেশ থেকে আসা ১০ হাজার কোটি টাকা এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমে কিভাবে জাতীয় উন্নয়নে ব্যয় হয় তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার নামে এনজিওগুলো ব্যাপক হারে সুদ নিয়ে তাদেরকে প্রচণ্ড শোষণ ও নির্যাতন করছে। ১৯৯৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একটি গবেষণা রিপোর্টে দেখা যায়, গ্রামীণ ব্যাংকের ঘোষিত সুদের হার ২২%। অথচ এর বিভিন্ন শাখাগুলো সুদ নিচ্ছে ৩৩.৮৭%। সুদের এ হার অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অনেক বেশি।

আমরা বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাছ থেকে যে ঋণ সাহায্য পাই তাতে আমরা স্বনির্ভর তো হচ্ছিই না বরং দিনকে দিন বাড়ছে ঋণের পরিমাণ। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬০০০ টাকা, যা প্রতিবছর সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। আমরা দেখি বিভিন্ন দাতা রাষ্ট্র ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সাহায্য অনুদান সাহায্যের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব আলোচনা ও তথ্য প্রমাণ থেকে আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ভূমিকা মোটেও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বরং এসব প্রতিষ্ঠানের কারণেও স্বল্পোন্নত দেশগুলো এখনও তাদের নিজস্ব সম্পদ ও জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য দূর করতে পারছে না।

শেষ কথা : বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নিজেরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা বলে, অথচ এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই তা মানে না । যেমন–

- ঋণগ্রহীতা দেশগুলোতে কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার খসড়া পরিকল্পনা বিশ্বব্যাংক কখনো প্রকাশ করে না। এমনকি জি-৮ ভুক্ত দেশগুলোর আবেদনকেও বিশ্বব্যাংক আমলে আনেনি।
- কাঠামোগত দলিল-দস্তাবেজ ও এর খসড়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কোথাও প্রকাশ করেনি।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করে সেগুলো বিশ্বব্যাংক কাউকে দেখাতে চায় না।
- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ যে নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্ম নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং তাদের কাজ যে ন্যায়ভিত্তিক নয় এটা জানে এবং সেজন্যই তারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের সকল কাজের 'দায়মুক্তি' চায় সরকারের কাছে।

সুতরাং আমাদের এখন আর সবকিছু জেনে-বুঝে চুপ করে থাকলে চলবে না। নিজেদের উন্নতির পথ নিজেদের করে নিতে হবে। দেশীয় সম্পদ ও জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য বিমোচনের পথ খুঁজে নিতে হবে।

০৬ । ক. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?
খ. দারিদ্র্য হ্রাসে বিশ্বব্যাংকের সাফল্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বুঝতে পারে যে, আগের মতো আর উপনিবেশ রাখা যাবে না। ব্রিটেনের মুদ্রা পাউন্ড স্টার্লিং দুর্বল হয়ে পড়লে, মার্কিন মুদ্রা ডলার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। এর ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন, অর্থ সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পরিচালনার নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব হেনরি মর্গেনথ্যু-এর

আহ্বানে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মিত্রশক্তির দেশগুলো এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সারা বিশ্বের ৪৪টি দেশের প্রায় ৭০০ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের নামকরণ করা হয় জাতিসংঘ আয়োজিত মুদ্রা ও অর্থনীতি বিষয়ক সম্মেলন। সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন মদদে International Bank for Reconstruction and Development তথা বিশ্বব্যাংক এবং International Monetary fund (IMF) বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল নামক দুটি অর্থনৈতিক সংস্থা এবং গ্যাট নামে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পদক্ষেপ গৃহীত হয় এবং চুক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন থেকে বিশ্বব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে এবং আইএমএফ তার আর্থিক কাজকর্ম শুরু করে ১ মার্চ ১৯৪৭। অপরদিকে, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ম্যানিলায় এশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর বৈঠক বসে। এতে ইকাফ (ECAFE) সদস্যের মন্ত্রীবর্গ যোগ দেন। এ সম্মেলনের সূত্র ধরে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটনে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠকের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার সম্মেলনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে লেনদেনের মাধ্যমে এডিবি তার যাত্রা শুরু করে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবি-এ তিনটি প্রতিষ্ঠানই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতেই এদের প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

নিচে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এবং এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হলো–

ক. বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য : বিশ্বব্যাংকের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হলো–

(i) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করা।

(ii) পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করা।

এ জন্য ব্যাংক, অনুন্নত ও অনগ্রসর সদস্য দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষম গতি বৃদ্ধিতে এবং কোনো দেশে যাতে বৈদেশিক দেনা-পাওনার হিসাবে অসামঞ্জস্যতা না ঘটে তার ব্যবস্থা করা।

খ. আইএমএফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য :

(i) মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

(ii) আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং মুদ্রা সম্পর্কীয় অসুবিধা দূর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত করা এবং সুষম উন্নয়নের চেষ্টা করা।

(iii) বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বিধান, প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রার মূল্য প্রতিরোধ ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা দূর করা।

(iv) সদস্য দেশের মধ্যে সর্বমুখী লেনদেনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করা; এবং

(v) সদস্য দেশগুলোর আয়ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতার স্থায়িত্ব ও তীব্রতা হ্রাস করা।

গ. এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য :

(i) অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সরকারি মূলধনকে কার্যকরভাবে বিনিয়োগে ব্যবহার করা।

(ii) এসক্যাপের অন্তর্ভুক্ত স্বল্পোন্নত অঞ্চলের প্রকল্প ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(iii) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রবৃদ্ধিগত বৈষম্য দূরীকরণ।
(iv) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
(v) নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সাহায্য প্রদান করা এবং
(vi) জাতিসংঘের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা ও সম্পর্ক বজায় রাখা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলী আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, এ তিনটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই হলো আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

দারিদ্র্য হ্রাসে বিশ্বব্যাংকের সাফল্য

বিশ্বব্যাংকের মূল লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন, বিশ্বব্যাংক বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার জন্য ঋণ প্রদান করে বিভিন্ন মেয়াদে। দারিদ্র্য আধুনিক সভ্যতার একটি ভয়াবহ অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাংক তার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ও প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে। বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য হ্রাসে প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে— বড় বড় হাইড্রোলিক জাম, সেতু, রাস্তা, পরিবহন, শিল্প, নগরায়ন। তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল ঋণভারে জর্জরিত দেশগুলোকে বিশ্বব্যাংক খাতওয়ারি সমন্বয় ঋণ প্রদান করে, যা ব্যয় করা হয় গ্রহণকারী দেশের সরকারের কাঠামো বিন্যাস, নীতি নির্ধারণের কাজে। নিচে দারিদ্র্য হ্রাসে বিশ্বব্যাংকের সাফল্য উপস্থাপন করা হলো–

১. **গড় আয়ু বৃদ্ধি :** বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে দারিদ্র্য হ্রাসে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১০টি দেশে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ ১০টি দেশের আর্থিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ১০টি দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে 'পাইলট' কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের এরূপ প্রকল্পের কারণে একটি বড় সাফল্য এসেছে। এ সাফল্যটি হলো দরিদ্র দেশের জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে ঐসব দেশের জনগণের গড় আয়ু ৫৫ বছর পর্যন্ত ছিল, যা বর্তমানে উন্নীত হয়ে ৬৫ বছরে এসেছে।

২. **মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি :** বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য হ্রাসে অপর একটি সফলতা হলো মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। বিশ্বব্যাংক গঠনের উদ্দেশ্যই ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। আর এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিশ্বব্যাংক নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক দরিদ্র দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ঐসব দরিদ্র দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে বর্তমানে। বিশ্বব্যাংকের উপলব্ধি অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক মুক্তির প্রচেষ্টায় বিশ্বব্যাংক তার কর্মসূচিগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

৩. **শিশুশিক্ষার হার বৃদ্ধি :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে না দিতে পারলে মানুষের মুক্তি অসম্ভব। কারণ অজ্ঞতা মানুষকে অসচেতন রাখে। মূল্যবোধ, চেতনা সৃষ্টি হয় না। তাই বিশ্বব্যাংক শিক্ষার উন্নয়নে নানাবিধ সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা ০.৫% থেকে ০.৭৫% এ উন্নীত হয়েছে।

৪. **জনসংখ্যা হ্রাস :** দরিদ্র দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা একদিকে যেমন সম্পদ হতে পারে অন্যদিকে তা বিপদ বলে পরিগণিত হতে পারে। দরিদ্র দেশের

জন্য জনসংখ্যা সম্পদ না হয়ে আপদ বলেই বিবেচিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে জনসংখ্যা হ্রাসে বিশ্বব্যাংক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বিস্তার লাভে নানারূপ কর্মসূচি গ্রহণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে দরিদ্র দেশগুলোকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক অনেকটা সফলতাও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. **নারী উন্নয়ন :** বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ নারী সমাজ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে অবহেলিত, প্রবঞ্চিত। এরূপ বঞ্চনা, প্রতারণা, শোষণের হাত থেকে নারী সমাজের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন কর্মসূচি ও নীতি নির্ধারণে সদস্য দেশগুলোকে নানাভাবে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক নারীর ক্ষমতায়নের ওপর অধিক জোর দিয়ে যাচ্ছে। যাতে নারী সমাজ পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার লাভের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সরকার :** স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে যে কোনো দেশের সরকার হয়ে ওঠে দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী। এরূপ প্রশাসন দেশ, জাতি তথা গোটা বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ প্রশাসনে জনগণের উন্নতি না হয়ে উন্নতি হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর, যা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাংক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর গুরুত্বারোপ করছে। দরিদ্র দেশগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় জোর তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। যা দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়।

৭. **কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন :** বিশ্বব্যাংক কৃষিপ্রধান দেশসমূহের কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতায় উৎসাহিত করে। পল্লী এলাকার উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন কালভার্ট, সেতু, রাস্তাঘাট নির্মাণে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এভাবে বিশ্বব্যাংক কৃষি উন্নয়নে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে এবং পল্লী অবকাঠামো নির্মাণে সাহায্য প্রদান করে।

৮. **স্বাস্থ্য :** চীনে প্রতিবছর ১৩ লাখ মানুষ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ছিল যা বিশ্বের মোট যক্ষ্মা রোগীর ১৬ শতাংশ। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বব্যাংক চীন সরকারকে ৫০ মিলিয়ন ডলার দেয়। এ কর্মসূচির ফলে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১২ লাখ সংক্রামিত যক্ষ্মা রোগীর রোগ নির্ণয় এবং তাদের সুস্থ করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে চীন ৯৫% সফলতা অর্জন করে। বৃহৎ পরিসরে যেসব দেশ জাতীয় যক্ষ্মা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রকল্প এটি।

৯. **এইডস :** নব্বই দশকে এইডস রোগীর দিক থেকে ব্রাজিল ছিল চতুর্থ অবস্থানে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে এইডস রোগ বিস্তার রোধে ব্রাজিলকে ১৬০ মিলিয়ন ডলার দেয় বিশ্বব্যাংক। ১৭৫টি এনজিও-কে এ কাজে লাগানো হয় যারা প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এরপর বিশ্বব্যাংক ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আবার ১৬৫ মিলিয়ন ডলার দেয় ব্রাজিলকে। এ কর্মসূচির ইতিবাচক ফলাফল হচ্ছে ব্রাজিলে এইডস রোগীর মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। এছাড়াও এইডসের ঝুঁকিসম্পন্ন গরীব দেশগুলোতে বিশ্বব্যাংক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে এইডস রোগ হ্রাসের জন্য বিভিন্ন দেশ ও এনজিও-এর কাছে অর্থ প্রদান করে বিশ্বব্যাংক অনেকটা সফলতা অর্জন করেছে।

১০. **রাস্তাঘাট :** বিশ্বব্যাংক আন্তঃআমেরিকান উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে পেরু পল্লী সড়ক কর্মসূচি হাতে নেয়। নতুন বাস সার্ভিস এবং উন্নততর রাস্তার ফলে পেরুর মধ্যাঞ্চলে আন্দিজ পর্বতের ওপরে অবস্থিত প্রায় সবগুলো গ্রাম থেকে শহরে আসতে যেখানে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগতো সেখানে ঐ একই পথ অতিক্রম করতে এখন লাগে মাত্র এক ঘণ্টা। বর্তমানে আন্দিজ এলাকার প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ১৩ হাজার কিলোমিটার পল্লী সড়ক ও জনপথের সুবিধা ভোগ করছে। এমনি করেই বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে অর্থ প্রদান করে চলেছে।

১১. **সুশাসন :** ১৯৯১-৯৫ সময়কালে বিদ্যালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ তহবিলের গড়ে ৩০ ভাগের কম উদ্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছানো। বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও-র তত্ত্বাবধানের ফলে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিদ্যালয়গুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৯০ ভাগ বিদ্যালয়গুলোতেই যাচ্ছে।

১২. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :** গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ মোজাম্বিক ১৯৯০-এর দশকে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ও নানাভাবে জর্জরিত দেশগুলোর একটি। দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন সেখানকার কল-কারখানার উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনকে আবার ৪০ মিলিয়ন ডলারের গ্যারান্টি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক অঙ্গসংস্থা মিগা (MIGA)। মোজাম্বিক সেসব প্রকল্পে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এমনিভাবে মোজাম্বিক নিয়মিতভাবে রপ্তানি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে চলছে।

১৩. **পরিবেশ :** তুরস্কের মোট ভূমির ৭০ ভাগেরও বেশি জমি উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষকরা। বিশ্বব্যাংক সহায়তা করছে ইস্টার্ন আনাতোলিয়া ওয়াটার শেড-রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট বাস্তবায়নে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের নতুন অর্থকরী ফসল দিয়ে এবং চাষাবাদের নতুন কলা-কৌশল শিখিয়ে ফসল উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে তিনশ' পাহাড়ি গ্রামের কৃষকদের জীবনে উন্নতি হয়েছে।

১৪. **ঋণের বোঝা লাঘব :** ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ চালু করেছে ঋণ লাঘব কর্মসূচি যা Heavily Indebted Poor Country Initiative (HIPCI) নামে পরিচিত। এ উদ্যোগ অতি দারিদ্র দেশগুলোর ঋণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করার অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। নিম্ন আয়ের বিশাল অঙ্কের ঋণগ্রহণকারী এবং নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে বদ্ধ পরিকর দেশগুলোই ঋণ লাঘবের সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। বর্তমানে ২৬টিরও বেশি দেশ ঋণ লাঘবের সুযোগ পাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে এ লাঘবকৃত ঋণের পরিমাণ হবে ৪০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

পরিশেষে বিশ্বব্যাংকের সবচেয়ে বেশি সাফল্য হলো ব্যাংক সমর্থিত প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতে গরিব শিশুদের মাঝে শিক্ষা বৃদ্ধিতে, চীনে যক্ষ্মা সংক্রামক হ্রাসে, ব্রাজিলে এইডসের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলায়, পেরুর প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায়, বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে, তুর্কির পল্লীতে নিম্ন আয়ের মানুষের গড় আয় দ্বিগুণ করায় এবং নারী উন্নয়নে। পাশাপাশি এর বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যর্থতাও কম নয়। তবুও বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক এজন্য দায়ী নয়, দায়ী এর পরিচালনাপর্ষদ।

০৭। ক. WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সম্পর্কে কি জানেন?
খ. WTO সম্পর্কে উন্নত ও স্বল্পোন্নত বিশ্বের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব (Comparative Advantage) অনুযায়ী কোনো দেশই তার নিজস্ব প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্যাদি সর্বনিম্ন বা সবচেয়ে লাভজনক উপায়ে উৎপাদন করতে পারে না। এজন্যই দেখা যায়, ক্ষেত্রবিশেষে দ্রব্যসামগ্রী নিজ দেশে উৎপাদন অপেক্ষা বিদেশ থেকে আমদানি অধিক লাভজনক। এজন্যই এ কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। GATT (General Agreement on Tariffs & Trade)-এর উত্তরসূরি হিসেবে WTO তার কার্যক্রম শুরু করে।

WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা WTO প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে। মূলত GATT চুক্তি বাস্তবায়নের Mandate নিয়ে এ সংস্থার জন্ম হয়। WTO বিশ্বের সবচেয়ে নবীন আন্তর্জাতিক সংস্থা হলেও এটা GATT-এর উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নতুন সংগঠন হলেও GATT-এর আওতায় বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় ৬০ বছরের পুরাতন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠানিক পরিচয় : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু, সুন্দর ও বাধাহীনভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। নিম্নলিখিত উপায়ে WTO এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে :

- বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন পরিচালনা (Administering trade agreements)
- বাণিজ্য আলোচনার একটা ফোরাম হিসেবে দায়িত্ব পালন (Acting as a forum for trade negotiation)
- বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ (Settling trade disputes)
- কারিগরি সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্যনীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে সহায়তা করা (Assisting developing countries in trade policy issues through technical assistance and training programs)
- অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা (Co-operating with other international organization)

অবকাঠামো : WTO-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬০। বিশ্ব বাণিজ্যের ৯০ ভাগের বেশি বাণিজ্য এই ১৬০টি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আরো ৩০টির মতো দেশ সদস্যপদ লাভের জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের ঐকমত্যের প্রয়োজন হয়।

WTO-এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনের (Council of Ministers) ওপর ন্যস্ত। Council of Ministers অন্তত দু' বছরে একবার মিলিত হয়। এর পরের স্তরে রয়েছে General Council, যা জেনেভায় নিযুক্ত সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। তবে কখনো সদস্য দেশসমূহের রাজধানী থেকে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে থাকে।

এর পরের পর্যায়ে আছে Goods Council, Services Council এবং Intellectual Property (TRIPS) Council, যেগুলো Genenal Council-এর কাছে রিপোর্ট পেশ করে থাকে। এগুলো ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য বিশেষায়িত কমিটি, ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং ওয়ার্কিং পার্টি, যেগুলো বিভিন্ন চুক্তি এবং নানাবিধ বিষয়াবলী নিয়ে কাজ করে যেমন—পরিবেশ, উন্নয়ন, সদস্যপদের আবেদন এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাণিজ্য চুক্তি সাধন। মন্ত্রীপর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে সিঙ্গাপুরে, দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৯৮ সালে জেনেভায়, তৃতীয় সম্মেলন ১৯৯৯ সালে আমেরিকার সিয়াটলে, চতুর্থ সম্মেলন ২০০১ সালে কাতারের দোহায়, পঞ্চম সম্মেলন ২০০৩ সালে মেক্সিকোর কানকুনে, ষষ্ঠ সম্মেলন ২০০৫ সালে হংকং-এ, সপ্তম সম্মেলন ২০০৯ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অষ্টম সম্মেলন ২০১১ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এবং নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালের ৩-৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে।

সচিবালয় : WTO-এর সচিবালয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত এবং এর প্রধান একজন মহাপরিচালক (Director General)। এর কোনো শাখা অফিস নেই। যেহেতু সদস্যদের সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেহেতু সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো ক্ষমতা নেই। সচিবালয়ের মূল দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন পরিষদ, কমিটি এবং মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তিতেও WTO সচিবালয় সহায়তা করে থাকে।

WTO চুক্তিসমূহ : সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে যে চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়, তা-ই হচ্ছে WTO-এর আইন। এখনো পর্যন্ত GATT-ই হচ্ছে WTO-এর মৌলিক নীতিগ্রন্থ। GATT-এর পরিধি প্রায় ৩০ হাজার পৃষ্ঠাজুড়ে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৬০টি চুক্তি এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, যার মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালিয়ে থাকে। এ বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদান করে থাকে।

বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি : বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি WTO-এর অন্যতম একটি দায়িত্ব, যার মাধ্যমে WTO-এর আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করা হয়। যদি কোনো দেশ মনে করে যে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তানুযায়ী তার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, তখন সে WTO-এর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে। সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিশ্রুতি এবং WTO চুক্তির ধারাসমূহ ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞবৃন্দ বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। WTO কেবল ১৯৯৯ সালেই ১৬৭টি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। GATT ১৯৪৭-৯৪ সাল পর্যন্ত ৩০০-এর মতো বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে।

উন্নত বিশ্ব এবং WTO

উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞ সাধারণভাবে এটা ধারণা করে থাকেন যে, পুঁজিবাদী বিশ্ব তথা পশ্চিমা বিশ্ব গোটা বিশ্ববাজার দখলের একটা হীন কৌশল হিসেবে মুক্তবাজার অর্থনীতির তত্ত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে GATT বা WTO প্রতিষ্ঠা করেছে। উন্নত দেশসমূহ আধুনিক প্রযুক্তিতে উৎপাদন করে থাকে বলে তাদের দ্রব্যের গুণগত মান যেমন ভালো, তেমনি মূল্যও প্রতিযোগিতামূলক। তা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ সংরক্ষণমূলক নীতি (Protective Policy) অবলম্বন করে কোনো রকম উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে ছিল। কিন্তু উন্নত দেশসমূহ বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নানা দিক দিয়ে সমাজতান্ত্রিক এবং সংরক্ষণ

নীতি অবলম্বনকারী উন্নয়নশীল দেশসমূহের ওপর বাজার উন্মুক্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এভাবে অনেক দেশ বলা চলে বাধ্য হয়ে তাদের বাজার উন্মুক্ত করে। ফলে সে দেশসমূহে স্থানীয় শিল্পসমূহ ডুবতে বসেছে এবং দেশের বাজার বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় যে TRIPS (Trade Related Intellctual Property Rights) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা-ও ধনী দেশসমূহের পক্ষে পক্ষপাতমূলক। এ চুক্তি দরিদ্রদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই রাখেনি। TRIPS-এর আওতায় প্যাটেন্ট করা দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী অহেতুক অতিমাত্রায় মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তা-ও সম্পূর্ণ উন্নয়নশীল দেশসমূহের ভোক্তাদের প্রতিকূলে।

১৩-১৮ ডিসেম্বর ২০০৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হংকংয়ে। সম্মেলনকে ঘিরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু বাস্তবে সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য তেমন কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি। অবশ্য বলা যায়, ২০০৩ সালের কানকুন সম্মেলন যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, হংকং সম্মেলন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। ৫৯ দফা ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ১৮ ডিসেম্বর শেষ হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ৭ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩০ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর ২০০৯। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল : The WTO, The Multilateral Trading System and the current Global Economic Environment.

এছাড়া ২০১১ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ে অষ্টম বৈঠক সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নতুন তিনটি দেশের অনুমোদন দেয়া হয়। দেশগুলো হচ্ছে রাশিয়া, সামোয়া ও মন্টিনিগ্রো। দীর্ঘ ১৮ বছরের আলোচনা শেষে WTO-এর সদস্যরা রাশিয়ার সদস্যপদ অনুমোদন করে। ২০১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়াসহ তিন দেশ WTO-এর আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভ করে। ২৬ জুন ২০১৪ ইয়েমেন WTO-এর ১৬০তম সদস্যপদ লাভ করে।

WTO এবং স্বল্পোন্নত বিশ্ব

স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (Least Developed Countries) হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ। ভয়াবহ দারিদ্র্য, দুর্বল অর্থনীতি, অনুন্নত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদের অপ্রতুলতা স্বল্পোন্নত দেশের সাধারণ চিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৭১ সালে বিশ্ব যখন প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের ধারণা স্বীকার করে, তখন এর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪, যা এখন ৪৮-এ উন্নীত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া ক্রমাগত অব্যাহত রয়েছে। '৮০-র দশকে গোটা বিশ্বের GDP-র ০.৬ শতাংশ ছিল স্বল্পোন্নত দেশসমূহের, যা '৯০-র দশকে ০.৪ শতাংশের কাছাকাছি উপনীত হয়েছে।

৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের প্রত্যেকেই GATT-এর Urugua Round Agreement চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফলে তারা চুক্তি অনুযায়ী উদারীকরণের প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন করেছে। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উপকার লাভের সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। WTO পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে প্রতিযোগিতা করাও স্বল্পোন্নত দেশের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

WTO চুক্তিসমূহের প্রত্যেকটিতে অবশ্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ সুবিধা রাখা হয়েছে। বিশেষ সুবিধাসমূহ হলো :

১. চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের সুবিধা প্রদান (Longer time periods for implementing agreements)

২. এসব দেশের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. এসব দেশের WTO সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরিতে সাহায্য করা।

৪. কতিপয় বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দান প্রভৃতি।

১৯৯৭ সালে Trade Initiatives and technical assistance for least developed countries সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে একটি সমন্বিত কাঠামো (Integrated framework) তৈরি করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ৬টি আন্তঃসরকার সংস্থাকে (Intergovernmental Agencies)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সংক্রান্ত সাব-কমিটির সহায়তায় Trade and Development সংক্রান্ত কমিটি স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রয়োজনসমূহ তদারক করে থাকে। এ কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন, কৌশলগত সহযোগিতা এবং বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সমস্যা : WTO-এ অন্তর্ভুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি হচ্ছে :

১. **বিদেশী বাজারে প্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যা :** স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা এসব দেশের জন্য বেশ কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন বিদেশী বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার। কতিপয় দেশ অবশ্য ইতিমধ্যে LDCs-কে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার কতিপয় দেশ বিশেষ বিশেষ দেশসমূহকে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিলেও সবার জন্য সমানভাবে দিচ্ছে না। যেমন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় ও সাব-সাহারান দেশসমূহকে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিলেও বাংলাদেশসহ এতদঞ্চলের দেশসমূহকে সে সুযোগ দেয়নি। উন্নত দেশসমূহ বাণিজ্য উদারীকরণের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের বাজারে উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পণ্যের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত। কারণ ঐসব দেশ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে খুবই ধীরগতিসম্পন্ন।

২. **সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা (Supply-side problems) :** GATT-এর Urugua Round Agreement-এর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বাণিজ্য সুবিধা সম্প্রসারণের যে সম্ভাবনা ছিল, সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা তাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছে। মূলত অবকাঠামোগত দুর্বলতা, প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থা এবং দক্ষ মানবসম্পদের অভাবে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সেসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে না। বাণিজ্যনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নানাবিধ সমস্যা আছে। বাণিজ্যনীতি প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তাছাড়া WTO আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় খুবই শ্লথগতি বিরাজমান। এটা রপ্তানির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে। দ্রব্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নানাবিধ সমস্যা রয়েছে।

WTO স্বল্পোন্নত দেশসমূহের 'Supply-side problem'সমূহ বিবেচনায় এনে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত দেশ কর্তৃক বাণিজ্য সংক্রান্ত কৌশলগত সাহায্য (Trade related technical Assistance) প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশসহ ৬টি

স্বল্পোন্নত দেশ ইতোমধ্যে এ সুবিধার আওতায় সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে। সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে উন্নত বিশ্ব এগিয়ে এলেও তার পরিমাণ খুবই সীমিত। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে উন্নত বিশ্বকে আরো সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য উন্নত বিশ্ব কর্তৃক প্রতিশ্রুত GNP-এর ০.১৫ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য প্রদান করতে হবে। আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, উন্নত বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত ODA-এর পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য একটা অশনি সংকেত।

৩. **WTO চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা :** স্বল্পোন্নত দেশসমূহ WTO চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি রয়েছে। যেমন—TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ১১ বছর সময় দেয়া হয়েছে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য। বাহ্যত এটা বেশ সহজ শর্ত মনে হলেও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য এটা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া WTO-এর অধীন স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ অনেক ক্ষেত্রে বেশ জটিল, যার মর্মার্থ উদ্ধার করে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা বেশ কঠিন কাজ।

সবশেষে বলা যায়, WTO-এর নীতিমালা মূলত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা তদারকির জন্য প্রণীত হয়েছে। WTO বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ওপর তার একটা প্রতিকূল বা অনুকূল প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে GATT-এর প্রতিকূল প্রভাবই বেশি পড়বে। অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশ উন্নত বিশ্বের চাপে তাদের বাজারসমূহকে পূর্ণমাত্রায় উদার করে দিয়েছে কিন্তু সে অনুযায়ী যথাযথ বিনিময় তারা পায়নি। বিদেশী পণ্যসামগ্রী অবাধে প্রবেশ করায় এ দেশগুলোর শিল্প-কারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য অনেক অর্থনীতিবিদ বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন বলছেন। সুসান জর্জ বলেন, বিশ্বায়ন ধনী ও গরিবের মধ্যে ব্যবধান অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে। সে সাথে গণতন্ত্রের ভূমিকাও খর্ব করবে। কারণ সরকারগুলো বহুজাতিক কর্পোরেশন ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের কাছে অনেক ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উন্নত দেশসমূহের সাহায্য-সহযোগিতার পাশাপাশি স্বল্পোন্নত দেশসমূহকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দ্রব্যের গুণগত মান বাড়াতে হবে, মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি পণ্যসামগ্রী বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এসব ব্যবস্থা গ্রহণের উপরই নির্ভর করছে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট' বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : ব্রেটন উডস যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তিগুলো এখানে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং এ সম্মেলনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'ব্রেটন উডস' চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তিতে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এ দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর এ প্রতিষ্ঠান দুটিকে একত্রে 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন-০২ কিয়োটো প্রটোকল কোন ধরনের চুক্তি এবং এর মূল উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : কিয়োটো প্রটোকল বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউজ গ্যাস হ্রাসকরণ বিষয়ক একটি চুক্তি। বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনাই কিয়োটো প্রটোকলের মূল উদ্দেশ্য। সম্প্রতি রাশিয়া এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এখনো এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

প্রশ্ন-০৩ জি-৮ বলতে কি বোঝায়? এটি কি উদ্দেশ্য গঠিত হয়?

উত্তর : G-8-এর পূর্ণরূপ হলো Group of 8 বা ৮ জাতি গোষ্ঠী। ১৫ নভেম্বর ১৯৭৫ এটি গঠিত হয়। এর পূর্বনাম G-7 বা ৭ জাতি গোষ্ঠী। তবে তারও আগে ১৯৭৫ সালে এটির নাম ছিল G-6। জি-৮ জোট প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরি জিসকার দেস্তাঁ। ১৯৭৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যু বিশেষ করে তেল সঙ্কট নিয়ে প্রথম অনানুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য ভ্যালেরি প্যারিসের রামবুঁইলেতে আমন্ত্রণ জানান জার্মানি, জাপান, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইতালির নেতাদের। এরপরই আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নেতারা এ সম্মেলনকে বার্ষিক করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৬ সালে কানাডা যোগদান করে। রাশিয়া এ সময় শুধু পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৮ সালের ১৫ মে রাশিয়া অষ্টম সদস্য হিসেবে যোগ দেয় এবং পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে ২০০২ সালের ২৬ জুন। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮টি দেশ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন ও রাশিয়া। জি-৮ এর ৪০তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন ৪-৫ জুন ২০১৪ বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-০৪ G-77 বলতে কি বোঝায়? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : G-77 হলো ৭৭ জাতি গ্রুপ। এটি একটি স্বল্পোন্নত বা তৃতীয় বিশ্বের জোট। এর মূল উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করা। G-77 গঠিত হয় ১৫ জুন ১৯৬৪ সালে এবং এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৩৩। এর কোনো সাংগঠনিক কাঠামো বা সদর দপ্তর নেই।

প্রশ্ন-০৫ ADB কি? এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?

উত্তর : ADB হলো Asian Development Bank বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালের ২২ আগস্ট। ADB-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৭ এবং সদর দপ্তর ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত। সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সূত্র থেকে অর্থসংগ্রহ করে সদস্য দেশসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে কারিগরি সাহায্য প্রদান। ADB-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাকিহিকো নাকাও।

প্রশ্ন-০৬ বিশ্বব্যাংক কি? এর বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?

উত্তর : বিশ্বব্যাংক (World Bank) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালে। এটি জন্মলাভ করে ১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস সম্মেলনে এবং আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু ২৫ জুন ১৯৪৬। এর সদস্য সংখ্যা ১৮৮টি দেশ। বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে এর প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম।

প্রশ্ন-০৭ আইএমএফ (IMF) কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর পূর্ণরূপ International Monetary Fund. এটি প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয় ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু ১ মার্চ ১৯৪৭। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮টি দেশ এবং সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।

IMF-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর্থিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা এবং কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন।

প্রশ্ন-০৮ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক IDB-এর পূর্ণরূপ Islamic Development Bank. এটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর ওআইসির অর্থ মন্ত্রিগণের সম্মেলনে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয় ২০ অক্টোবর ১৯৭৫। যদিও এর আর্থিক লেনদেন শুরু হয় জানুয়ারি ১৯৭৬। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৬টি। সৌদি আরবের জেদ্দায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত। IDB-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মুসলিম দেশসমূহের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত করা।

টীকা

♦ বিশ্বব্যাংক (World Bank)

বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৪। এটি জন্মলাভ করে ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই ব্রেটন উডস সম্মেলনে। আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ২৫ জুন। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। সংস্থাটির নির্বাহী প্রধান হলেন প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৫ বছর। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করা এবং অনুন্নত অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করা। কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী ২৪ সদস্যবিশিষ্ট। ৫ জন নিযুক্ত হন সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী পাঁচটি দেশ থেকে এবং বাকি ১৯ জন নিয়োগ দেয় সদস্য রাষ্ট্রসমূহ। বিশ্বব্যাংকে সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী পাঁচটি দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি ও ফ্রান্স। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ পরিচালক পর্ষদ। পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয় প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন করে পরিচালক এবং একজন বিকল্প পরিচালক নিয়ে। বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গসংস্থা ৫টি। সেগুলো হলো IBRD, IDA, IFC, ICSID ও MIGA।

ক. **আইবিআরডি (IBRD) :** IBRD-এর পূর্ণরূপ International Bank for Reconstruction and Development। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮। এর সদর

দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। এটি বিশ্বব্যাংকের প্রধান ঋণ অর্থ প্রদানকারী সংস্থা। যেসব উন্নয়নশীল দেশে মাথাপিছু আয় তুলনামূলকভাবে বেশি সেসব দেশকে এটি ঋণদান করে থাকে। IBRD প্রধানত উন্নয়ন প্রকল্প যেমন— রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি বাস্তবায়নে অর্থায়ন করে থাকে।

খ. **আইডিএ (IDA)** : IDA-এর পূর্ণরূপ International Development Association। এটি 'Softloan-window' নামেও পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০। এর সদস্য সংখ্যা ১৭৩টি দেশ। সদর দপ্তর অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে। যেসব দরিদ্র দেশ IBRD থেকে ঋণ পায় না IDA তাদের ঋণদান করে। এছাড়া যেসব দেশের মাথাপিছু আয় ৮০০ মার্কিন ডলারের কম সেসব দেশকে এটি ঋণ প্রদান করে।

গ. **আইএফসি (IFC)** : IFC-এর পূর্ণরূপ International Finance Corporation। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ জুলাই, ১৯৫৬। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৪টি দেশ। এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের বেসরকারি খাতকে অর্থ সাহায্য করা।

ঘ. **আইসিএসআইডি (ICSID)** : ICSID-এর পূর্ণরূপ International Centre for Settlement of Investment Disputes। ১৯৬৬ সালে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০টি দেশ। এটি বৈদেশিক ঋণের গতি ত্বরান্বিত করে এবং সরকারি ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে।

ঙ. **মিগা (MIGA)** : MIGA-এর পূর্ণরূপ Multilateral Investment Guarantee Agency। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮১টি দেশ। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১২ এপ্রিল ১৯৮৮ সালে। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করাই এর প্রধান কাজ।

♦ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) *[৩৩তম; ৩০তম বিসিএস]*

IMF-এর পূর্ণরূপ International Monetary Fund। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮টি দেশ। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। এ সংস্থার নির্বাহী প্রধানের পদবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক। আর্থিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা এবং কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন করা এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত পরিচালক পর্ষদ, কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী, প্রধান পরিচালক ও সচিবালয় নিয়ে।

♦ দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা *[৩১তম বিসিএস]*

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্যোগে এ পর্যন্ত যে সকল বাণিজ্য আলোচনা সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত একটি বাণিজ্য আলোচনা। এটি ২০০১ সালের নভেম্বরে শুরু হলেও সমন্বয়হীনতা এবং মতৈক্যের অভাবে আজও কোনো সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি। কাজেই এখনো এ বাণিজ্য আলোচনাটি সমাপ্ত হয়নি। এ বাণিজ্য আলোচনায় যে সকল বিষয়

আলোচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– কৃষি বিষয়ক আলোচনা। কৃষির বিষয়ে উন্নত বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী ভারত, চীন, ব্রাজিল, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝে ব্যাপক আলোচনা হলেও অগ্রগতি হয়েছে সামান্য। যুক্তরাষ্ট্রকে কৃষির ব্যাপারে আরো বেশি বাজার উন্মুক্ত করার আহ্বান করা হয়েছে। এ রাউন্ডে 'বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধা স্বত্ব' বা Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর নবায়নকৃত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দোহা সম্মেলনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র TRIPS এর আগের শর্তগুলোকে নমনীয় বললেও অন্যান্য দেশের চাপের মুখে ২০০৩ সালে নতুন TRIPS চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দোহা মন্ত্রীপর্যায়ের ঘোষণায় বাণিজ্য মন্ত্রীগণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষ এবং পার্থক্যকারী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ঐকমত্য হন। তারা এ ধরনের চুক্তিকে আরো সুস্পষ্ট কার্যকরী এবং বাস্তবায়নযোগ্য করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলো পূর্ববর্তী উরুগুয়ে রাউন্ডে আলোচিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে কম ধারণক্ষমতা বা কম কারিগরী সহায়তার কথা তুলে ধরেন। তারা আরো অভিযোগ করেন যে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা যেমন উন্নত বিশ্বে টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানিতে সুযোগ দেয়ার সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারছেন না। দোহা রাউন্ডটি ২০০১ সালে কাতারের মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে শুরু হলেও ২০০৩ সালে কানকুনে ও ২০০৫ সালে হংকংয়ে এ ধরনের সম্মেলন আবার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জেনেভা, প্যারিস ও পটসডামেও এ রাউন্ড সম্পর্কিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সর্বশেষ জুলাই ২০০৮ সালে কৃষি পণ্য আমদানি নিয়মনীতি সম্পর্কিত আলোচনাটি মতৈক্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। ২০১১ সালে জেনেভার দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ২০১১ সালের শেষ নাগাদ দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনা শেষ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দ্রুত এ রাউন্ড শেষ করার জন্য দরকার হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তন তথা নমনীয়তা। আর তা হলেই এ রাউন্ড আলোচনার সুফল সারা বিশ্ব বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্ব ভোগ করতে পারবে।

♦ কিয়োটো প্রটোকল *[৩১তম বিসিএস]*

বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য বিশ্ব উষ্ণতা রোধে জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর করা হয়। প্রটোকলটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালে। এর মেয়াদ শেষ হবে ২০২০ সালে। প্রটোকলটি কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে। প্রটোকলে বলা হয় যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন ২০০৮-২০২০ সাল নাগাদ ১৯৯০ সালের পর্যায়ে নিয়ে আসবে তথা গড়ে ৫ শতাংশ হারে হ্রাস করবে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক দেশকে নিজ দেশে উৎপন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ অনুযায়ী হ্রাস করতে হবে। প্রটোকলে ৮ শতাংশ হারে সুইজারল্যান্ড, মধ্য ও পূর্ব-ইউরোপ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন; ৭ শতাংশ হারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ৬ শতাংশ হারে কানাডা, হাঙ্গেরি, জাপান, পোল্যান্ড, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউক্রেনকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করতে বলা হয় ২০২০ সালের মধ্যে।

♦ পিএসআই

পিএসআই-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Policy Support Instrument বা নীতি সহায়তা কৌশল। এটা এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে কোনো একটি দেশ আইএমএফ থেকে কোনো ঋণ পাবে না, কিন্তু তাদের শর্ত ও পরামর্শ মেনে চলতে হবে এবং তাদের সার্টিফাইর ওপর নির্ভর করবে চুক্তিবদ্ধ দেশটি কোনো

দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ কিংবা সাহায্য পাবে কি না। এ চুক্তিটি করা হয় মূলত কোনো দেশের ওপর আইএমএফ'র আধিপত্য ধরে রাখার জন্য। যে দেশটি আইএমএফ'র কাছে ঋণী নয় এবং আর ঋণ নেয়ারও প্রয়োজন নেই, সেসব দেশের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্যই মূলত আইএমএফ এ চুক্তি করে থাকে।

♦ ব্রেটন উডস চুক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর পুনর্গঠন, আর্থিক সহযোগিতা এবং বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনার নীতি নির্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন বাণিজ্য সচিব হেনরি মর্গেন-এর আহ্বানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের 'ব্রেটন উডস'-এর মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি দেশগুলো যোগ দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সম্মেলনের স্থানের নাম অনুসারে চুক্তিটি 'ব্রেটন উডস চুক্তি' নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশ্বের ৪৪টি দেশের প্রায় ৭০০ জন প্রতিনিধির ঐ সম্মেলনের নামকরণ করা হয় জাতিসংঘ আয়োজিত মুদ্রা ও অর্থনীতি বিষয়ক সম্মেলন। এ সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশ্বব্যাংক (IBRD) এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) নামক দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৪৬ সালে ২৫ জুন থেকে ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সাথে বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রার সাথে স্বর্ণের বিনিময় হারের পুনঃস্থাপন হয় এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বিদেশের সরকারগুলোকে সোনা প্রদান বন্ধ করে দিলে তখন থেকে সরকারি রিজার্ভ বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব শুরু হয়।

♦ জি-৮ (G-8)

G 8 বা Group of 8 বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের জোট। সংস্থাটি গঠিত হয় ১৫ নভেম্বর ১৯৭৫। এর পূর্ব নাম G-7 বা ৭ জাতি গোষ্ঠী। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮টি দেশ। সদস্যগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন ও রাশিয়া। অষ্টম সদস্য হিসেবে রাশিয়া যোগ দেয় ১৫ মে ১৯৯৮। অবশ্য ২৪ মার্চ ২০১৪ রাশিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করা হয়। সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা।



আঞ্চলিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান
Regional Institutions

Syllabus | *Regional Institutions : SAARC, BIMSTEC, EU, ASEAN, NATO, APEC, OIC, AU, GCC.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে SAARC-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতার ফোরাম হিসেবে সার্ক (SAARC)-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
অথবা, সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সার্ক (SAARC) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছে? আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]
অথবা, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে SAARC-এর ভূমিকা কতটুকু উজ্জ্বল? [২৩তম বিসিএস]

০২. *ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে লিখুন। [২৪তম বিসিএস]*

০৩. *বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা কেন? এর সাথে রাশিয়া কেন ও কিভাবে সম্পৃক্ত হতে চায়? [১৮তম বিসিএস]*

০৪. *APEC কি? APEC শীর্ষ সম্মেলনের আলোকে বিশ্ব রাজনীতিতে APEC-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]*

০৫. *সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে OIC'র ভূমিকা নিরূপণ করুন। [১৮তম বিসিএস]*
অথবা, মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষায় ওআইসি (OIC)-এর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন। [২৮তম বিসিএস]

০৬. *OPEC তার সদস্যদেশগুলোর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষণ করতে পেরেছে? বিশ্লেষণ করুন। [২৪তম বিসিএস]*
অথবা, 'ওপেক' (OPEC) কি? সদস্য দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে এই সংগঠন সাধারণত কি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে? জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি একটি তেল আমদানিকারী স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? [২২তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. *তিন দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে সার্কের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

০৮. *'পাক-ভারত রাজনৈতিক বৈরিতা সার্ক ও সাপটার সফলতার পথে প্রধান অন্তরায়।'—আলোচনা করুন।*

০৯. *ক. SAPTA ও SAFTA সম্বন্ধে ধারণা দিন।*
খ. এগুলো থেকে বাংলাদেশ যেসব সুবিধা পেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
অথবা, 'সাফটা' (SAFTA) কি? এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১০. সার্ক (SAARC) কি একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছে? এ ব্যাপারে আপনার মতামত দিন। অথবা, দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যাশা পূরণে SAARC-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।

১১. ক. বিমসটেক (BIMSTEC) কি?
খ. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন হিসেবে বিমসটেকের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করুন।

১২. ক. পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ন্যাটো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
খ. এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিয়ে ন্যাটোর একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরুন।

১৩. আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় আফ্রিকান ইউনিয়নের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. ISAF কি?
০২. SAFTA কি? এটি কখন থেকে কার্যকর হবে?
০৩. ASEAN-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত এবং এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
০৪. SAARC কখন গঠিত হয়? এর পরবর্তী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
০৫. বিমসটেক (BIMSTEC) কি? এর নামের বর্তমান পূর্ণরূপ কি?
০৬. বিমসটেকের (BIMSTEC) প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
০৭. ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) কখন আত্মপ্রকাশ করে? এটি কোন চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়?
০৮. ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU)-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত এবং EU ভুক্ত নতুন ২টি দেশের নাম লিখুন।
০৯. সাফটা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত Trade Liberalization Program (TLP) সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
১০. ভারতের ইতিবাচক নেতৃত্ব সার্ককে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে?
১১. ন্যাটো (NATO) কি? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
১২. ন্যাটোর (NATO) বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
১৩. ন্যাটোর (NATO) সর্বশেষ যোগ দেয়া দুটি দেশের নাম লিখুন।
১৪. ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কয়টি ও কি কি?
১৫. ন্যাটোর পূর্ববর্তী সদর দপ্তর কোথায় ছিল এবং কত সালে এটি স্থানান্তরিত হয়?
১৬. ন্যাটো-২০ কি?
১৭. এনআরএফ (ন্যাটো রেসপন্স ফোর্স) কি?
১৮. ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্যগুলো কি কি?
১৯. APEC কি? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
২০. NAFTA ও AFTA কি?
২১. ওআইসি (OIC) কি? এর সদর দপ্তর কোথায়?
২২. ওআইসি (OIC) কখন গঠিত হয় এবং এর প্রেক্ষাপট কি?
২৩. ওআইসি (OIC)-এর মহাসচিব কিভাবে নির্বাচিত হয়?
২৪. ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলো কি কি?
২৫. ওআইসির প্রথম এবং সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
২৬. ওআইসি (OIC)-এর বর্তমান সদস্য কত ও কি কি?
২৭. GCC-এর পূর্ণরূপ কি? এর সদস্য কয়টি?
২৮. আফ্রিকান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?
২৯. আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য দেশ কতটি ও কি কি?

☐ আঞ্চলিক সংস্থা সংগঠন পরিচিতি

টীকা

- সাপটা এবং সাফটা [৩০তম; ২৭তম বিসিএস]
- আফটা (AFTA)
- এপেক (APEC)
- SAIC [২৩তম বিসিএস]
- আসিয়ান [২১তম বিসিএস]
- ন্যাটোর পুনর্গঠন [১৭তম বিসিএস]
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক [১৩তম বিসিএস]
- ডি-৮ (D-8)
- আরব লীগ (League of Arab States)
- আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)
- উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)
- ন্যাটো (NATO)
- ওআইসি [২৯তম বিসিএস]
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। **আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে SAARC-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন।** [৩৩তম বিসিএস]
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতার ফোরাম হিসেবে সার্ক (SAARC)-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
অথবা, সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সার্ক (SAARC) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছে? আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]
অথবা, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে (SAARC)-এর ভূমিকা কতটুকু উজ্জ্বল? [২৩তম বিসিএস]

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়া একটি প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় জনপদ। এ অঞ্চল সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আটটি দেশের জনসমষ্টি একত্রে সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যে এ অঞ্চলের অংশ মাত্র ১ শতাংশ এবং বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র দেড় শতাংশ অবদান এ অঞ্চলের। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তেমন সুবিধাজনক না হওয়ায় জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহৎ এ আঞ্চলিক সংস্থাটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ।

সার্ক গঠনের প্রেক্ষাপট : ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৮১ সালে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে মিলিত হয়। পরবর্তীতে কাঠমান্ডু, ইসলামাবাদ, ঢাকা ও সর্বশেষ নয়াদিল্লিতে সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর ১৯৮৫ সালে সাতটি দেশের সরকারপ্রধানদের ঢাকায় এক শীর্ষ সম্মেলনে এটি গঠিত হয়। সার্কের বর্তমান সদস্য দেশ ৮টি। দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা ৯টি; এগুলো হচ্ছে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মিয়ানমার, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এর সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডু। সার্কের বর্তমান ও দ্বাদশ মহাসচিব অর্জুন বাহাদুর থাপা (নেপাল, ১ মার্চ ২০১৪-বর্তমান)।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ : ১৯৮৫ সালের জন্মলগ্ন থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সার্কের ১৮টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৪ নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০১৬ সালে ১৯তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানে। বিগত শীর্ষ সম্মেলনে সহযোগিতার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারিত হয়েছে—১. কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, ২. জৈব প্রযুক্তি

৩. যোগাযোগ তথ্য এবং গণমাধ্যম, ৪. অর্থনীতি, ৫. সার্ক জ্বালানি, ৬. পরিবেশ, ৭. তহবিল গঠন, ৮. মানব সম্পদ উন্নয়ন, ৯. আইন সংক্রান্ত, ১০. জনগণের সাথে যোগাযোগ উন্নয়ন, ১১. দারিদ্র্য বিমোচন, ১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ১৩. সার্ক আলোচ্যসূচি, ১৪. সার্ক বহু ধরনের আঞ্চলিক পরিবহন পর্যবেক্ষণ করা, ১৫. সার্ক পর্যটন।

সার্কের সাফল্য/আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্কের সাফল্য

দীর্ঘ আড়াই দশকে সার্ক সীমিত কিন্তু প্রশংসনীয় কিছু কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ— সন্ত্রাস দমনে সমঝোতা দলিলে স্বাক্ষর; আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি; পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা; জৈব প্রযুক্তি, পরিবেশ, আবহাওয়া, বনজসম্পদ এবং গণমাধ্যম সেক্টরে পারস্পরিক সহযোগিতা; আঞ্চলিক দারিদ্র্য প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ; সাপটা (SAPTA) ও সাফটা (SAFTA) গঠন ইত্যাদি। তাছাড়া সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র, সার্ক যক্ষ্মা সেন্টার, সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, সার্ক জ্বালানি কেন্দ্র ইত্যাদি সার্কের সাফল্যের প্রতীক। সার্কের ইতিবাচক দিকের মধ্যে আরো আছে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হওয়া (যদিও বিভিন্ন কারণে কয়েক বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি), মন্ত্রিপর্যায়ের বিভিন্ন নিয়মিত সভা, সদস্য দেশসমূহের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পারস্পরিক অভিমত বিনিময়ও সহযোগিতার নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এরূপ উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন, বৃহত্তর সমঝোতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচন : দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে বিধায় সার্ক দেশসমূহ সব শীর্ষ সম্মেলনেই দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে আলোচনা করে। এসব সম্মেলনে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আনুকূল্যে প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এখন যদি জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়া এবং সার্ক কাঠামোগত আঞ্চলিক দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহলে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত সকল দেশের দারিদ্র্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। তবে দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক ধারণা। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন অনেকগুলো কর্মপরিকল্পনার মধ্যেও নিবিড়ভাবে লুক্কায়িত। তারপরও দক্ষিণ এশীয় সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ দারিদ্র্য বিমোচনে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অঙ্গীকারসমূহকে সামনে রেখে সার্ক কর্মকাণ্ডকে জোরালো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সার্ক মহাসচিব কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র্য সূচকের ভিত্তিতে সার্ক অঞ্চলে দারিদ্র্যের অবস্থা মনিটর ও পর্যবেক্ষণের জন্য মন্ত্রিপর্যায়ের কাউন্সিলকে নির্দেশ দিয়েছে এবং নেপালকে আহ্বায়ক ও বাংলাদেশকে সহ-আহ্বায়ক করে দারিদ্র্য বিমোচন কমিশন গঠন করেছে, যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন : ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলনে সামাজিক সনদ সই একটি যুগান্তকারী অর্জন। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনে এই সনদের বিভিন্ন দিকের বাস্তবায়ন যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা স্থিতিশীলকরণ, নারীদের সক্ষমতা দান, যুব সঞ্চালন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুষ্টি এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সনদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামাজিক সনদ এ প্রসঙ্গে এইডস, যক্ষ্মা এবং অন্যান্য বহনযোগ্য ব্যাধি নিরোধে ডাক্তারি দক্ষতা, ফার্মাসিউটিক্যাল ও সনাতনী ওষুধ সম্পদ উন্নয়নের ওপর জোর দেয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় নেতারা সনাতনী দক্ষতা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ওপর জোর দিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন এক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সার্কের ব্যর্থতা ও এর কারণ

জনসংখ্যায় সার্ক বিশ্বের বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগঠন আসিয়ানের (ASEAN) মতো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, সার্কের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ সদস্য দেশগুলোর নেতৃবর্গের আঞ্চলিক মতানৈক্য দূর করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে অনীহা বা তা করার ব্যাপারে তাদের অযোগ্যতা এবং পাক-ভারত রাজনৈতিক বিরোধ। বিশেষজ্ঞরা সার্কের ব্যর্থতার ৩টি কারণ চিহ্নিত করেছেন— ১. রাজনৈতিক সমস্যা, ২. নেতৃত্বের সমস্যা এবং ৩. কাঠামোগত সমস্যা। তবে সার্কের ব্যর্থতার মূল কারণ পাক-ভারত রাজনৈতিক বিরোধ। কাশ্মীর ও পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে সার্কের সামগ্রিক গতিধারা। অপরদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার বৈশিষ্ট্যগত বাধাও সার্কের সফলতার অন্যতম অন্তরায়। সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার কারণে এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিরোধ, অবিশ্বাস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমনকি প্রকাশ্য বৈরিতাও মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দক্ষিণ এশিয়ার এসব বৈশিষ্ট্যগত বাধার কারণেও সার্ক অনেকাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। সার্কের ব্যর্থতার আরো একটি বড় কারণ ভারতের প্রভুসুলভ মানসিকতা। দক্ষিণ এশিয়ার এ আটটি দেশের বিরোধ অনেকাংশেই ভারতকেন্দ্রিক। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যায় ভারত সর্ববৃহৎ ও সুবিশাল হওয়ার কারণে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ভারত অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ছাড় দিতেও রাজি হয় না। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাব সার্কের সফলতার পথে বিরাট অন্তরায়।

সার্কের ভবিষ্যৎ সংগঠন : সার্কের কার্যাবলীর মধ্যে নতুন সংগঠন হিসেবে দক্ষিণ এশীয় শুল্ক সংস্থা (SACU) এবং দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠন প্রধান। এ লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিস্তর সমীক্ষা ও প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ কাজ চলছে। যেমন– সংবেদনশীল তালিকা, উৎপত্তির নীতিসমূহ, সেবা খাতে বাণিজ্য, শ্রমিক আন্দোলন, মান নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নির্ধারণ কৌশল, সাধারণ এক্সটারনাল ট্যারিফ প্রস্তুতকরণ এবং আরো আনুষঙ্গিক বিষয়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সম্ভাব্য সমাধান অনুসন্ধান ইত্যাদি।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান— এ ৮টি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের গুরুত্ব ও আকর্ষণ পর্যায়ক্রমে বাড়ছে বিশ্বের উন্নত দেশ ও আঞ্চলিক ফোরামগুলোর কাছে। বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এই সার্ক। যদিও এ বিরাট জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, তবুও আমাদের সকলের প্রত্যাশা সার্ক ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে পিছনের সকল গ্লানি, দৈন্য ধুয়ে মুছে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। বাস্তবসম্মত ও অঙ্গীকারবদ্ধ পদক্ষেপের মাধ্যমে সংগঠনটির পুনরুজ্জীবনে অগ্রদূত হিসেবে কাজ করবে এবং এমন এক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সৃষ্টি করবে, যা অনুসরণ করে এ সংগঠনটি আগামী দিনগুলোতে আরো সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

০২ ॥ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে লিখুন। *[২৪তম বিসিএস]*

উত্তর : পঞ্চাশের দশকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ে ভীত ইউরোপীয় দেশগুলো একটি জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল প্যারিসে এক চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত পরিষদ (European Coal and Steel Community, ECSE) গঠিত হয়। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সূত্রপাত ঘটে আরও পরে। ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ,

নেদারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানি এ ছয়টি রাষ্ট্রের মধ্যে রোমে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ১৭ জানুয়ারি ইইসি (EEC) আত্মপ্রকাশ করে। ইইসি'র রূপান্তরিত জোট হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৮।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য : পারস্পরিক স্বার্থে শুল্ক হার হ্রাসের মাধ্যমে দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের সুলভ ও সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপ ও পরামর্শ এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আত্মরক্ষার কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে।

অঙ্গসংস্থা : ইউরোপীয় ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থা হলো— ১. ইউরোপীয় কাউন্সিল, ২. ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ৩. ইউরোপীয় কমিশন, ৪. কাউন্সিল অব ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ৫. কোর্ট অব জাস্টিস অব দ্য ইউরোপিয়ান, ৬. ইউরোপীয় কোর্ট অব এডিটরস ও ৭. ইউরোপোল।

অর্থবিষয়ক সহযোগী সংস্থা : ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ও ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড।

একনজরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

নাম : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)।

প্রতিষ্ঠা : ১ নভেম্বর ১৯৯৩।

সদর দপ্তর : ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।

অফিসিয়াল ভাষা : ২৩।

বর্তমান সদস্য : ২৮। সদস্য দেশগুলো হলো : বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি (বর্তমানে জার্মানি), ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সাইপ্রাস, চেকপ্রজাতন্ত্র, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, মাল্টা, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ও ক্রোয়েশিয়া (১ জুলাই ২০১৩)।

সদস্য প্রার্থী দেশ ও আবেদনের সময় : তুরস্ক, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৭; মেসিডোনিয়া, ২২ মার্চ ২০০৪, আইসল্যান্ড, ১৬ জুলাই ২০০৯; মন্টিনিগ্রো, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮; আলবেনিয়া, ২৮ এপ্রিল ২০০৯ ও সার্বিয়া, ২২ ডিসেম্বর ২০০৯।

সদস্য প্রত্যাশী দেশ : বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা ও কসোভো।

ইউরো মুদ্রা : 'ইউরো' হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের একক মুদ্রা। এ মুদ্রার জনক রবার্ট মুন্ডেল। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরো চালু হয়। তখন ১১টি দেশ– বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করে। ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি সাইপ্রাস ও মাল্টায় ইউরো মুদ্রা চালু হয়। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি স্লোভাকিয়ায়; ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি এস্তোনিয়ায়; ১ জানুয়ারি ২০১৪ লাটভিয়ায় এবং সর্বশেষ ১ জানুয়ারি ২০১৫ লিথুয়ানিয়ায় ইউরো মুদ্রা চালু হয়। এ নিয়ে ইউরো মুদ্রা চালুকৃত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৯।

ইইউ'র নতুন সদস্য হবার শর্তাবলী : ইইউ'র নতুন সদস্য হতে হলে একটি রাষ্ট্রের যে বিষয়গুলো থাকতে দেখা হয় সেগুলো হলো :

১. গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা প্রদানকারী প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা,
২. আইনের শাসন,
৩. মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার,
৪. গ্রহণযোগ্য বাজার অর্থনীতি বা প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাপ গ্রহণে সক্ষম,
৫. অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা মেনে নেয়া।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপ তার অর্থনীতিকে গড়ে তোলার কাজে উঠে পড়ে লাগে। ইইউ'র ব্যানারে ইউরোপের দেশগুলো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা এর সুফল পায়। বর্তমান ইউরোপ সত্যিকার অর্থেই পরিণত হয়েছে এক অর্থনৈতিক দৈত্যে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু আঞ্চলিক নয় বরং ইউরোপ এখন এক বিশ্বশক্তি। বিশেষ করে ইউরো চালু হবার পর থেকে ইউরোপের অর্থনীতি আরো গতিশীল হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ২০% ইইউ'র দখলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইইউ'র কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছিল এবং ইইউও এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছিল। আর এসব করতে গিয়ে ইইউ রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে এসেছে সযত্নে। এ কারণেই ইইউকে বলা হতো 'অর্থনৈতিক দৈত্য, রাজনৈতিক বামন'। কিন্তু বর্তমানে ইইউ তার এ বদনাম ঘোচাতে চাচ্ছে। তারা বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। মার্কিন কিছু শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার ধারণা, ইইউ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনায় রত। এ ধারণার মূল কারণ বিশ্বে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের মন্তব্য প্রদান এবং বলকান অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

ইইউ'র নতুন এ ভূমিকাকে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে ইইউ'র বিশ্ব রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অর্থ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাজনৈতিক সহযোগী তৈরি হওয়া। এতদিন যেমন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো যৌথভাবে নেয়া হতো এখন তেমনি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ইইউ'র পরামর্শ নেয়া যাবে। একজন কংগ্রেস সদস্যের মতে, এর ফলে একটি স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি হিসেবে ইইউকে পাওয়া যাবে। এ কারণেই বলকান অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র ইইউকে সঙ্গী করেছে। এ প্রচেষ্টাকে দেখা হচ্ছে Test Case হিসেবে, অর্থাৎ এ প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তবে যুক্তরাষ্ট্র ইইউকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে আরো কর্মসূচি হাতে নেবে। যেমন—বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি। অনেকের মতে, এ সখ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখনই মন্তব্য করা যাবে যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের আসল চোহারা বেরিয়ে আসবে।

আবার অনেকে মনে করছেন, বর্তমান বিশ্বে চীন, রাশিয়া বা অন্য কোনো দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থা আছে। অপরদিকে ইইউও হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ইইউ তার নিজস্ব সামরিক বাহিনীও গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জোরেশোরে। আর তা যদি গঠিত হয় তবে শক্তিসাম্যের প্রতিযোগিতায় আবার মেরুকরণের সূত্রপাত হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।

ইইউ ও তৃতীয় বিশ্ব

ইইউ'র সাথে তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক। ইইউ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে তাকালে এ বক্তব্যের সুস্পষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে মোট ৫৭৫ কোটি ২২ লাখ মার্কিন ডলারের সমমূল্যের ২৮ হাজার ৮১৮ কোটি ৫২ লাখ টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়। এর মধ্যে ৪৬ শতাংশ পণ্য রপ্তানি করা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নে। বিগত বছরগুলোতে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও একক অঞ্চল হিসেবে ইইউ বাংলাদেশী পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে রয়েছে। সম্প্রতি ইইউ বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছে। ফলে এ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের সব ধরনের পণ্য বিনা শুল্কে ইইউভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানি করছে। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ইইউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এতদিন মনে করা হতো অর্থনৈতিক দৈত্য হিসেবে। সে অভিধা অটুট রাখার অভিপ্রায়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ব অর্থনীতির মারাত্মক মন্দার সময়ও ইইউ তার অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে। শুধু রক্ষাই নয় সঙ্গে সঙ্গে কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইউরোপকে করে তুলেছে আরো শক্তিশালী। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কোনো নজির এতদিন ছিল না। সম্প্রতি সামরিক ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা একে নতুনভাবে আলোচিত করেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সম্প্রতি রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু কার্যকলাপে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইইউ রাজনৈতিক মহীরুহে পরিণত হতে যাচ্ছে। অন্তত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পর্যবেক্ষকের এটাই ধারণা।

০৩। বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা কেন? এর সাথে রাশিয়া কেন ও কিভাবে সম্পৃক্ত হতে চায়? *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ জোটবদ্ধভাবে আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করে। তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতিতে পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে যে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তার সামরিক কৌশল হিসেবে ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে NATO ও ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সামরিক জোট Warshaw গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ১৯৯২ সালে ভেঙ্গে যায় Warshaw জোট। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে রুশ বাহিনীর আধিপত্যে শংকিত হয়ে NATO গঠন করে। আর সে কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নও তার মিত্র দেশগুলো পশ্চিমা শক্তির আতংকের কারণে Warshaw জোট গঠন করে। বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা চলছে। ফলে আঞ্চলিক শক্তি, মৌলবাদী শক্তির উত্থান ও সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী 'ক্ষমতার ভারসাম্য' বজায় রাখার জন্যই NATO'র গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ NATO'র গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এদের কেউ কেউ NATO'র গুরুত্বকে স্বীকার করলেও আবার অনেকে একে গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে NATO'র ব্যবহারই এর গুরুত্ব বহন করে।

NATO'র উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ ও সমাজতন্ত্রের আক্রমণকে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মোট ১২টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল NATO গঠন করে। এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

- সমাজতন্ত্রের প্রসার রোধের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রসারে সহায়তা করা।
- আঞ্চলিক শক্তি, যা পশ্চিমা শক্তির জন্য হুমকিস্বরূপ তা প্রতিহত করা।
- বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মাধ্যমে NATO-কে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা। ১৯৮১ সালে গ্রানাডায় সামরিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ, ১৯৮৭ সালে ফিলিপাইনে গণতান্ত্রিক সরকারকে সামরিক সহযোগিতা দান এবং ১৯৯০ সালে কুয়েতকে ইরাকি আগ্রাসন মুক্ত করা NATO'র উদ্দেশ্যাবলীর যথার্থ প্রয়োগ বলে বিবেচনা করা হয়।

১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত Berlin Press Club সম্মেলনে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী James Baker স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে NATO'র প্রধান দুটি নীতির কথা উল্লেখ করেন। যথা—

- নতুন নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করা, যাতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সামরিক প্রক্রিয়া অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনের জন্য আলোচনা ও পরামর্শ করা।

NATO'র প্রয়োজনীয়তা

গত ৬৬ বছরে NATO অনেক দূর এগিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর ধারণা করা হয়েছিল NATO'র প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্লেষক মনে করেন, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে NATO'র গুরুত্ব এখনো অপরিসীম। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নে NATO'র ভূমিকা অপরিহার্য। নিচে বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো :

প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলেও রাশিয়া এখনো বৃহৎ শক্তি হিসেবেই বিবেচিত। বিশাল সামরিক বহর, পারমাণবিক অস্ত্রসহ নানা শক্তিশালী অস্ত্রে দেশটি সজ্জিত। ফলে সীমান্ত সমস্যা, জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়, উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদ ও পূর্বমুখী রুশ সম্প্রসারণ স্পৃহা ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ। NATO'র ভূমিকার মাধ্যমে এ হুমকি মোকাবিলা সহজতর হবে বলে ধারণা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তন এসেছে দ্রুতগতিতে। এ পরিবর্তনের পথ ধরে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও জাতিগত দাঙ্গা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কসোভো সংকট, বসনিয়া যুদ্ধ, চেচনিয়া যুদ্ধ এর প্রমাণ। এসব সমস্যা যে কোনো সময় পশ্চিমা বিশ্ব ও NATO সদস্যদের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। এসব অস্থিতিশীলতার জন্য NATO'কে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ইউরোপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে NATO'র সফল ভূমিকা এর প্রয়োজনীয়তা টিকে থাকার যৌক্তিকতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কসোভোতে সামরিক অভিযান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বসনিয়া শান্তি Dayton চুক্তি স্বাক্ষরে NATO অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় NATO'র প্রয়োজনীয়তাকে আরও গভীরতর করেছে।

চতুর্থত, NATO সদস্যভুক্ত দেশসমূহ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এর মধ্যে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব, বেকারত্ব, মাদক ব্যবসা, সন্ত্রাস, পারমাণবিক বিস্তৃতি অন্যতম। NATO এসব হুমকি মোকাবিলা ও সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। জাতিসংঘ যেখানে ব্যর্থ সেখানে NATO গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কাঠামো আরও শক্তিশালী করে তুলতে চায়।

পঞ্চমত, দুই জার্মানির একত্রীকরণের ফলে বর্তমান বিশ্বে জার্মানি অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশটি গণতন্ত্রের পথ ধরে সামরিক দিক দিয়ে পরাশক্তির ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবে বলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে, যা অবশ্যই পশ্চিমা শক্তির জন্য হুমকির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ কারণে জার্মানির অগ্রগতিকে একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখতে NATO'র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ষষ্ঠত, বিশ্বে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপসহ অন্যান্য অঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অনস্বীকার্য, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে সেতুবন্ধন হলো NATO। NATO টিকে না থাকলে ইউরোপে মার্কিন আধিপত্য হ্রাস পাবে। ফলে ইউরোপের সমস্যা সমাধানে NATO'র কোনো ভূমিকা থাকবে না।

রাশিয়ার সাথে NATO'র সম্পর্ক স্থাপন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক জোট এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শীতল যুদ্ধের সূচনা হয়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সামরিক জোটের সৃষ্টি হয়। পরিবর্তিত বিশ্বরাজনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে গিয়ে Warshaw Pact সামরিক জোটের স্রষ্টা রাশিয়া, NATO সামরিক জোটের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ১৯৯৪ সালের ২২ জুন রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন NATO'র সাথে সংযুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হন। পূর্ব ইউরোপে NATO'র সম্প্রসারণ অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। ১৯৯৭ সালের ২০ ও ২১ মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। ইউরোপীয় নিরাপত্তা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক আলোচনা ছাড়াও এ শীর্ষ বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল পূর্ব ইউরোপে NATO'র সম্প্রসারণ। যুক্তরাষ্ট্র চাইলেও রাশিয়া সম্প্রসারণ চায়নি। রাশিয়া তার নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পূর্ব ইউরোপের সাবেক কমিউনিস্ট দেশসমূহে NATO'র সম্প্রসারণের আপত্তি করে। ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার সাথে পশ্চিমা সামরিক জোটের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া তার পূর্বের অবস্থান পরিবর্তন করে, রাশিয়ার দাবি ছিল NATO সম্প্রসারণের চুক্তি হবে আইনগত। তবে রাশিয়া এ দাবি থেকে সরে আসে। হেলসিংকি শীর্ষ বৈঠকের মাধ্যমে বিল ক্লিনটন বরিস ইয়েলেৎসিনকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে NATO'র সম্প্রসারণ রাশিয়ার জন্য হুমকির সৃষ্টি করবে না।

সর্বশেষ ইতালির রাজধানী রোমে ২০০২ সালের ২৮ মে ন্যাটো-রাশিয়া সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির উদ্দেশ্য বিরোধ নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এ চুক্তির ফলে রাশিয়া ন্যাটোর 'জুনিয়র পার্টনার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। রাশিয়া এ চুক্তির মাধ্যমে ন্যাটোর সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। চুক্তি অনুযায়ী ন্যাটো-রাশিয়া একটি কাউন্সিল গঠন করে। যেটি সন্ত্রাস প্রতিরোধ, শান্তিরক্ষা ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান স্থির করে। কিন্তু এসব সম্পর্কের পরও রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই বর্তমান।

০৪। APEC কি? APEC শীর্ষ সম্মেলনের আলোকে বিশ্ব রাজনীতিতে APEC-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ্বব্যাপী যে কয়টি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরামের সৃষ্টি হয়েছে Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে ১২টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে অ্যাপেক গঠিত হয়। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রায় ২১০ (বর্তমানে ২১টি সদস্য দেশের জনসংখ্যা ২৮৫.৭৯ কোটি) কোটি জনসংখ্যার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটি গঠিত। বর্তমানে অ্যাপেকের সদস্য সংখ্যা ২১ এবং এর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অ্যাপেক কাজ করে যাচ্ছে।

APEC শীর্ষ সম্মেলনসমূহ : APEC গড়ে উঠার পর প্রতিবছর সংস্থাটির শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালের ৬-৭ নভেম্বর এবং সে বছরই অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিচে APEC-এর উল্লেখযোগ্য শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ করা হলো :

সিয়াটল (যুক্তরাষ্ট্র) সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, ১৯৯৩

- পরস্পরকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে বিশাল বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলা।
- পারস্পরিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতা।
- বিকাশমান এই সংস্থাটির প্রতিবছর শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠান।

বোগোরে (ইন্দোনেশিয়া) সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, ১৯৯৪

- ২০২০ সাল নাগাদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে অবাধ বাণিজ্য চালু করা।
- GATT-এর (বর্তমান WTO) সিদ্ধান্ত মেনে চলা।
- উন্নয়ন সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

ওসাকা (জাপান) সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, ১৯৯৫

- সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে হ্রাসকৃত ট্যারিফসহ Down Payment নিশ্চিত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- প্রতিবছর APEC-এর চেয়ারম্যান পরিবর্তন।
- APEC সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মুক্তবাণিজ্য এলাকা চালু করার পূর্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তিগত বিন্যাসের প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

১৯৯৬ সালে ফিলিপাইনের ম্যানিলায়, ১৯৯৭ সালে কানাডা, ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়া ও ১৯৯৯ সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো এজেন্ডা ছিল না।

সাংহাই (চীন) সম্মেলন, ২০০১ : ২০০১ সালের ২১-২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় দুদিনব্যাপী APEC শীর্ষ সম্মেলন। APEC-এর বর্তমান ২১ টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে ২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। তাইওয়ানের প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়ে চীনের প্রবল আপত্তির কারণে তারা সম্মেলনে যোগ দেয়নি। সম্মেলন শেষে যে ইশতেহার প্রকাশ করা হয় তাতে উল্লেখ ছিল :

- আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।
- সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার কারণে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করারও আহবান।

ব্যাংকক (থাইল্যান্ড) সম্মেলন, ২০০৩ : ২০-২১ অক্টোবর ২০০৩ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অ্যাপেকের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইতিপূর্বে APEC সম্মেলনে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চালু করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তা অর্জিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট হ্রাস পাওয়ায় APEC সম্মেলনে স্বস্তি প্রকাশ করা হয়।

সান্টিয়াগো (চিলি) সম্মেলন, ২০০৪ : ২০-২১ নভেম্বর চিলির রাজধানী সান্টিয়াগোতে ১৬তম অ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুমোদন করে। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মুক্তবাণিজ্য আলোচনার প্রতিও তারা জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।

বুসান (দক্ষিণ কোরিয়া) সম্মেলন, ২০০৫ : দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অ্যাপেকের সপ্তদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ জাতির এ সংস্থার নেতৃবৃন্দ গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো নির্মূল এবং বার্ড ফ্লু মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি, অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

হ্যানয় (ভিয়েতনাম) সম্মেলন, ২০০৬ : ভিয়েতনামের হ্যানয়ে ১৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিডনি (অস্ট্রেলিয়া) সম্মেলন, ২০০৭ : 'টেকসই ভবিষ্যতের জন্য জোটকে শক্তিশালীকরণ' স্লোগানকে সামনে রেখে ২১ দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ১৯তম অ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধে ঐকমত্য প্রকাশ এবং ৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণের দোহা রাউন্ড আলোচনার অচলাবস্থা নিরসনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। শীর্ষ সম্মেলন শেষে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ২৪ দফা 'সিডনি ঘোষণা' প্রদান করে। ঘোষণায় ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ২৫ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ভারতসহ দক্ষিণ আমেরিকার অন্য প্রায় ১১টি দেশ অ্যাপেকের সদস্য হওয়ার আবেদন করে কিন্তু ২০১০ সাল পর্যন্ত সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ২১ রাখার ব্যাপারে সম্মত হন নেতারা। ভারতের সদস্য হওয়ার আবেদন নাকচ করে দেন তারা।

লিমা (পেরু) সম্মেলন, ২০০৮ : ২০তম সম্মেলন পেরু লিমায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্বখাদ্য সঙ্কট, জলবায়ু ও বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার অঙ্গীকার করা হয়।

সিঙ্গাপুর সম্মেলন, ২০০৯ : এপেক-এর ২১তম সম্মেলন সিঙ্গাপুরে ২০০৯ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে এপেক অঞ্চলের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সহযোগিতা, ব্যবসায় ও বিনিয়োগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

ইয়োকোহামা (জাপান) সম্মেলন, ২০১০ : ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১০ জাপানের ইয়োকোহামায় এপেক-এর ২২তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মুক্ত বাণিজ্যের বিষয়ে স্লোগান তোলা হয়।

হনুলুলু (যুক্তরাষ্ট্র) সম্মেলন, ২০১১ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্যের হনুলুলুতে ১২-১৩ নভেম্বর ২০১১ অনুষ্ঠিত হয় এপেক-এর ২৩তম সম্মেলন। এ সম্মেলনে ১৯ সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়।

ভ্লাদিভোস্টক (রাশিয়া) সম্মেলন, ২০১২ : ২৪তম সম্মেলন রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্টকে ৭-৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়।

বালি (ইন্দোনেশিয়া) সম্মেলন ২০১৩ : ২৫তম সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার ম্যানাদো/বালিতে ২০১৩ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

বেইজিং (চীন) সম্মেলন ২০১৪ : APEC-এর ২৬তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১০-১১ নভেম্বর ২০১৪; বেইজিং, চীন।

বিশ্ব ব্যবস্থায় APEC-এর ভূমিকা

APEC পৃথিবীর বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত। এই ফোরামে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর জি ৮-এর সদস্যভুক্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি রয়েছে উন্নয়নশীল দেশ ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ফিলিপাইন। একই সাথে রয়েছে হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উঠতি অর্থনৈতিক শক্তির দেশও। পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি জোটের একটি হচ্ছে APEC. প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে উত্তর এশিয়ার দেশগুলোর একটা সম্মেলন ঘটেছে এই ফোরামে। APEC জোটভুক্ত সদস্যগুলোর লোকসংখ্যা ২৮৫.৭৯ কোটি। সমগ্র বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৫৫% APEC ভুক্ত দেশসমূহে উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলে জিডিপির পরিমাণ ১৬.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আর মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী প্রতিটি দেশ এই জোটের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে Pacific Rim হচ্ছে এখন ১ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের বাণিজ্য বাজার। Bowing Project গুলোর মধ্যে ২০১০ সালের মধ্যে শুধু চীনেরই প্রয়োজন হবে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ৮০০টি নতুন বিমান। Microsoft জানিয়েছে APEC-এর এশীয় সদস্যগুলোর কাছ থেকে পাওয়া তার রাজস্বের পরিমাণ প্রতিবছর শতকরা ৬০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা দ্বিগুণ। চীন দ্রুত অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপানের সাথে যোগ দিচ্ছে। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাপানের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৪ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ বিলিয়ন ডলারে। আর চীনের দ্বি-পাক্ষিক উদ্বৃত্ত ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার, প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯২ সালে এ অঞ্চলে রপ্তানি করেছে ১৩ হাজার কোটি ডলার, ১৯৯৮ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯ হাজার কোটি ডলার।

অ্যাপেকভুক্ত দেশগুলোর অবস্থান

দেশ	*জনসংখ্যা (কোটি)*	*মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)*
অস্ট্রেলিয়া	২.৩৬	৪১,৫২৪
নিউজিল্যান্ড	.৪৬	৩২,৫৬৯
পাপুয়া নিউগিনি	.৭৫	২,৪৫৩
যুক্তরাষ্ট্র	৩২.২৬	৫২,৩০৮
কানাডা	৩.৫৫	৪১,৮৮৭
মেক্সিকো	১২.৩৮	১৫,৮৫৪
চিলি	১.৭৮	২০,৮০৪
ব্রুনাই	.০৪	৭০,৮৮৩
চীন	১৩৯.৩৮	১১,৪৭০
হংকং	.৭১	৩৮,১২৩
ইন্দোনেশিয়া	২৫.২৮	৮,৯৭০
জাপান	১২.৭০	৩৬,৭৪৭
মালয়েশিয়া	৩.০২	২১,৮২৪
ফিলিপাইন	১০.০১	৬,৩৮১
সিঙ্গাপুর	.৫৫	৭২,৩৭১
দ. কোরিয়া	৪.৯৫	৩০,৩৪৫
তাইওয়ান	২.৩১	১৮,৩০৩

দেশ	জনসংখ্যা (কোটি)	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)
থাইল্যান্ড	৬.৭২	১৩,৩৬৪
রাশিয়া	১৪.২৫	২২,৬১৭
ভিয়েতনাম	৯.২৫	৪,৮৯২
পেরু	৩.০৮	১১,২৮০

সূত্র : UNFPA & UNDP Report 2014

এ কারণেই এ অঞ্চল সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা শক্তিগুলোর আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে অ্যাপেক এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা বিশ্ব বাণিজ্য তথা শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১৯৯৬ সালে ফিলিপাইনের সুবিকবেতে যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে 'ম্যানিলা অ্যাকশন প্ল্যান' গৃহীত হয়েছিল। এতে ২০২০ সালের মধ্যে APEC অঞ্চলে মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। তবে জোটমুক্ত উন্নত দেশগুলোর জন্য এই সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০১০ আর অনুন্নত দেশগুলোর জন্য ধরা হয়েছে ২০২০। যদিও এই সময় সীমার বিষয়ে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ আপত্তি জানিয়েছিলেন।

APEC ফোরামে অংশ নিয়ে চীন ইতোমধ্যে বেশকিছু পণ্যের উপর ১৫%-২৩% হারে ট্যারিফ হ্রাস করেছে। কেননা যুক্তরাষ্ট্র বার বার বলে আসছিল চীন যদি শুল্ক হ্রাস না করে তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (World Trade Organization) অন্তর্ভুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে সমর্থন করবে না।

APEC-এর সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা অ্যাপেক রাজনীতিতেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ২০০১ সালে সাংহাই শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলা, WTO-এর উপর আক্রমণ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে। যার প্রভাব আজও বিশ্বব্যাপী বিরাজমান। ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে APEC নেতৃবৃন্দ যখন কানাডার ভ্যাংকুবারে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন, তখন এশিয়াতে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। কিন্তু APEC নেতৃবৃন্দ ওই সম্মেলনে কোনো কর্মসূচি নেননি। এমনকি কি উপায়ে এশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়েও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। শীর্ষ সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে তখন বলা হয়েছিল APEC এ মুহূর্তে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেবে না বরং তারা IMF-এর প্রচেষ্টা জোরদার করার সুপারিশ করেছিল। অন্য বিষয়গুলো ২০০১ সালে সাংহাইতে খুব একটা আলোচিত হয়নি। তবে APEC দেশগুলো যাতে মুক্ত বাণিজ্যের পথ থেকে সরে না দাঁড়ায়, তেমন আহ্বানও জানানো হয়েছে। সম্মেলনে এশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট পুনরুদ্ধারে জাপান নতুন একটি কর্মসূচি উপস্থাপন করে। জাপানের অর্থমন্ত্রী এশীয় সঙ্কট উত্তরণে যে তিন হাজার কোটি ডলার ব্যয়ের কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন, জাপানি প্রধানমন্ত্রীর নয়া পরিকল্পনা মূলত সেই কর্মসূচির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া ২০০৩ সালের শীর্ষ সম্মেলনে ২০২০ সালের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চালুর ব্যাপারে পুনরায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। ২০০৮ এবং ২০০৯ সালের সম্মেলনে বিশ্ব খাদ্য সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ঐকমত্য হয়। ১০-১২ নভেম্বর ২০১৪ চীনের বেইজিংএ সর্বশেষ ২৬তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মূল্যায়ন : ১৯৮৯ সালের ক্যানবেরা সম্মেলনে মাত্র ১২টি দেশ নিয়ে APEC যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২১-এ দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের দেশ এই APEC ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যে নেই, তা নয়। এশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য মুক্তবাজার নীতি দায়ী বলে অভিযোগ উঠেছে যা প্রমাণিত সত্য। এ এলাকায় একটি অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে উঠবে কি না, তা নিয়েও রয়েছে সন্দেহের অবকাশ। এ অঞ্চলে প্রবল মার্কিন বিরোধিতাকেও অস্বীকার করা যায় না বরং এ অঞ্চলে যেসব অর্থনৈতিক জোট রয়েছে বিশেষ করে AFTA (ASEAN Free Trade Area) কিংবা NAFTA (North American Free Trade Agreement)-এর সাথে APEC-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হবে তা স্পষ্ট নয়। মার্কিন নীতি হয়তো এ অঞ্চলের জোটগুলোকে বিপন্ন করতে পারে।

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ Fred Bergstain-এর নেতৃত্বাধীন 'প্রখ্যাত ব্যক্তিদের' একটি কমিটি 'একটি উন্মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' গড়ার পরামর্শ দিয়েছিল। সে লক্ষ্যে APEC এগিয়ে যাচ্ছে। শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের যে কথা বলা হয়েছে তাতে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হবে এর দিক-নির্দেশনা নেই। রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট সমাধানেও APEC দেশগুলো থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি।

APEC ভুক্ত এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও বেকারত্বের হার কমেনি। প্রকৃত আয় আর আগের জায়গায় ফিরে আসেনি। এমনকি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিক্ষা প্রসারে যে অগ্রগতি হয়েছিল তার গতিও মন্থর হয়ে পড়ছে। অস্থিরতা এখনো রয়ে গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহৎ অর্থনৈতিক জোট হিসেবে APEC-এর বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। এটা না করে APEC যদি প্রতিবছর শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য।

০৫। সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে OIC'র ভূমিকা নিরূপণ করুন। *[১৮তম বিসিএস]*

অথবা,* মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষায় ওআইসি (OIC)-এর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন। *[২৮তম বিসিএস]

উত্তর : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য আর সৌহার্দ্যের যে মহান শিক্ষা রাসূল (স) আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত অবিকৃত থাকলেও পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওসমানীয় খিলাফত পেরিয়ে বর্তমানে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যা রাসূলের (স) সে আদর্শ আর শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। মদিনাভিত্তিক যে মুসলিম উম্মাহর প্রতিষ্ঠা রাসূল (স) করেছিলেন তার তেমন কিছু আর বাকি নেই। বিশেষ করে ১৯২৩ সালে ওসমানীয় খিলাফতের বিলুপ্তি পর্যন্ত মুসলিম জাতিসত্তার যে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর থেকে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার প্রবল তোড়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে এবং ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি আর ইতিহাস-ঐতিহ্য ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার চেতনাকে ছাপিয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের কাছ থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই হয়নি বরং তারা পরস্পর নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং এ সুযোগে ইহুদি-খ্রিস্টান চক্র মুসলমানদের ওপর তাদের আধিপত্যকে ক্রমশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু অনেক পরে হলেও ১৯৬৯ সালে বায়তুল মোকাদ্দাসে ইহুদিরা অগ্নিসংযোগ করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সম্বিত ফিরে পায়। তখনই তারা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ওআইসি মূলত তাদের সে অনুভূতি থেকেই জাত।

ওআইসি প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের পর ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এর তড়িৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় গোটা মুসলিম বিশ্বে। ২৫ আগস্ট ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা কায়রোতে আলোচনায় বসেন। ঐ বৈঠকে সৌদি আরব প্রস্তাব করে যে, বিষয়টি যেহেতু গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য স্পর্শকাতর তাই এটি নিয়ে আলোচনার জন্য সকল মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি শীর্ষ বৈঠক আয়োজন করা জরুরি। মরক্কো, সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মালয়েশিয়া ও নাইজারকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে সে বছরই ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাবাতে। এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে ২৫টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা যোগদান করে।

সম্মেলন শেষে যুক্ত ঘোষণায় আরো অনেক বিষয়ের সাথে বলা হয় ইসরাইলকে অবিলম্বে ১৯৬৭ সালের পূর্ব সীমানায় ফিরে যেতে হবে। তাছাড়া সম্মেলনে একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পিএলওকে তার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন প্রদান।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭০ সালের ২২ থেকে ২৭ মার্চ প্রথমবারের মতো মুসলিম মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে একটি স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং জেদ্দায় এ সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও তখনই গৃহীত হয়। এমনকি একই সাথে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান এই সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন।

ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ওআইসির ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে হলো :

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতি বৃদ্ধি করা।
২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা সংহত করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করা।
৩. সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ এবং সব রকমের উপনিবেশবাদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা।
৪. সুবিচারভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান।
৫. পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত সুসংহত করা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং তাদের অধিকার আদায় ও দেশ মুক্ত করার কাজে সাহায্য প্রদান।
৬. মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো।
৭. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ওআইসির সাংগঠনিক কাঠামো : ওআইসির চার্টারের তৃতীয় অধ্যায়ে ওআইসির সাংগঠনিক কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ইসলামিক কনফারেন্স তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত হয়ে কাজ করবে।

এক. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের কনফারেন্স (The Conference of the Kings and Heads of States and Government)।

দুই. মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কনফারেন্স (The Conference of Foreign Ministers)।

তিন. ইসলামী সেক্রেটারিয়েট ও পার্শ্ব সংগঠনসমূহ (The General Secretariat and Subsidiary Organisation)।

রাষ্ট্রপ্রধানদের কনফারেন্সই ওআইসির সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল সংস্থা। মুসলিম বিশ্বের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা এবং ওআইসির নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করাই এর প্রধান কাজ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কনফারেন্সই প্রতিবছর একবার বৈঠকে মিলিত হয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কনফারেন্সে কোরাম সংখ্যাও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য।

অন্যদিকে সেক্রেটারিয়েট হলো ইসলামী কনফারেন্সের প্রধান কার্যনির্বাহী সংস্থা। এ সেক্রেটারিয়েট একজন সেক্রেটারি জেনারেল ও তিনজন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলসহ প্রয়োজনীয় স্টাফদের নিয়ে গঠিত। সেক্রেটারিয়েটের কাজ হলো কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং কনফারেন্সের কাছে কাজের রিপোর্ট প্রদান। তাছাড়া কনফারেন্স পার্শ্ব সংগঠনসমূহের কার্যাবলীও দেখাশুনা করে।

মুসলিম বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ওআইসির ভূমিকা

ওআইসির একটি বিশেষত্ব হলো এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংগঠন, যা একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। ধর্ম বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এত বড় সংগঠন আর নেই। কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর এ সংগঠনটি মুসলমানদের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কতটুকু কি করতে পেরেছে তাই নিয়ে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানরা যখন পশ্চিমাদের হাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরমভাবে মার খেতে শুরু করেছে ঠিক তখনই ওআইসির ভূমিকা মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ওআইসির অর্জন : ওআইসির অর্জন তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওআইসি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। যেমন—

ক. **জাতিগত ও ধর্মীয় ঐক্য :** ওআইসিতে মুসলমানদের যে জাতিগত ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনা করে। ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের শত বিভক্তি সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও বিশিষ্ট অস্তিত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে।

খ. **নির্যাতনের প্রতিবাদ :** এ সংগঠনটি বিভিন্ন সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোনো নির্যাতনের প্রতিবাদ করে আসছে। এ প্রতিবাদ কার্যকর প্রমাণিত না হলেও মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে।

গ. **ওআইসি এর প্রতিবাদ :** বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য ওআইসি বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ, প্রস্তাব, কমিটি গঠনসহ নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ সকল প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা যাবে না।

ব্যর্থতাসমূহ : ওআইসির বিভিন্নক্ষেত্রে সফলতার কথা বলা হলেও মূলত ওআইসির সফলতার চেয়ে ব্যর্থতাই বেশি। যেমন—

ক. **মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা :** ১৯৬৭ সালে মুসলিম নেতৃবৃন্দ যে মূল উদ্দেশ্যটি সামনে রেখে ওআইসির প্রতিষ্ঠা করেছিল সে উদ্দেশ্য সাধনে ওআইসি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কেননা ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চেচনিয়া, মিন্দানাওসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয় ওআইসি তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি।

খ. **ফিলিস্তিন সঙ্কট :** ওআইসির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসরাইলকে দখলকৃত আরব ভূখণ্ড ত্যাগ, ফিলিস্তিন জনগোষ্ঠীর অধিকার দান, জেরুজালেমে আরব শাসন প্রতিষ্ঠাসহ আরবদের অধিকারের কথা বলে আসছে। কিন্তু ওআইসি এক্ষেত্রে কতিপয় রেজুলেশন পাস ব্যতীত তেমন কিছুই করতে পারেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করলেও তা কোনো কাজেই আসেনি।

গ. **আফগান সঙ্কট :** সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় ওআইসি আফগানিস্তানকে বস্তুগত ও নীতিগত সমর্থন দানের মাধ্যমে ন্যূনতম ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ভূয়া অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন নিরস্ত্র, নিরপরাধ আফগান জনগণের ওপর নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপ করে দেশটিকে জ্বালায় তখন ওআইসি কিছুই করতে পারেনি।

ঘ. **উপসাগরীয় সঙ্কট :** ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণ ছিল ওআইসির নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। তথাপি ওআইসি ইরাককে এ জাতীয় আগ্রাসন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে যৌথ বাহিনীর পাশবিক হত্যাযজ্ঞের হাত থেকেও ইরাকি জনগণকে রক্ষা করতে পারেনি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, সারা দুনিয়ার মানুষের বিবেক আর মানবিক চেতনাকে আহত করে মার্কিন-ব্রিটিশ হানাদাররা যখন ইরাকের সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিল তখনও ওআইসি মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে তেমন কিছু করতে পারেনি।

ঙ. **বলকান সঙ্কট :** মুসলিম বিশ্বের আপামর জনতা বসনিয়ার নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আর্তনাদে ব্যথিত ও পীড়িত হলেও ওআইসি তাদের এ বেদনার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। বিশ্ববাসীর কাছে কোনো জোরালো প্রতিবাদ নিয়ে মুসলিম বিশ্বের হয়ে ওআইসি উপস্থিত হতে পারেনি। সার্বিয়ার স্বৈরশাসক মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে যতটুকু করতে পেরেছে তা হলো জাতিসংঘের কাছে আবেদন রেখে ন্যূনতম চাপ সৃষ্টি করা।

চ. **অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সম্পর্কোন্নয়ন :** ওআইসি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মাণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো আইডিবির (IDB) প্রতিষ্ঠা। তবে এক্ষেত্রে ওআইসির সফলতার হার খুবই কম। কেননা অনেক সম্ভাবনা এবং জনগণের ব্যাপক প্রত্যাশা সত্ত্বেও ওআইসি একটি ইসলামী কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

ওআইসির সম্ভাব্যতা : এখনও পর্যন্ত ওআইসি তার প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্যকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারলেও ওআইসির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

প্রথমত, দীর্ঘদিন কার্যকর থাকায় ওআইসির বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশি কার্যকর করতে পারলে ওআইসি একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের যে মৌলিক ঐক্য চেতনা তাকে কাজে লাগাতে পারলেই ওআইসি তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে।

তৃতীয়ত, মুসলিম বিশ্ব পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের মালিক। এমতাবস্থায় ওআইসি তার সদস্য দেশগুলোকে পুঁজি করে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেই মুসলমানরা শক্ত অবস্থান রচনা করতে পারবে।

সুপারিশসমূহ : ওআইসিকে আরো বেশি কার্যকর করতে হলে :

- ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে অবশ্যই এর বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কার্যক্রমকে জোরালোভাবে সমর্থন করতে হবে।
- সদস্য দেশগুলো তাদের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে আরো আন্তরিক হতে হবে।
- মুসলিম নেতৃবৃন্দকে তাদের অতীত গৌরব এবং বর্তমান দুর্দশাজনক অবস্থার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।
- বৃহৎ শক্তিগুলোর নির্লজ্জ মুসলিম বিরোধিতার বিপরীতে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে।

সর্বোপরি, ওআইসিকে মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানের ব্যাপারে আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে পশ্চিমারা নাক গলানোর সুযোগ না পায়।

০৬। OPEC তার সদস্যদেশগুলোর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষণ করতে পেরেছে? বিশ্লেষণ করুন। *[২৪তম বিসিএস]*

অথবা,* 'ওপেক' (OPEC) কি? সদস্য দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে এই সংগঠন সাধারণত কি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে? জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি একটি তেল আমদানিকারী স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? *[২২তম বিসিএস]

উত্তর : বিশ্বের তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের সংগঠন হলো ওপেক (OPEC বা Organisation of the Petrolium Exporting Countries)। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর ভেনিজুয়েলার উদ্যোগে ৫টি দেশের (ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা) সমন্বয়ে ওপেক গঠন করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত এবং সংবিধির ভিত্তিতে একে একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা হিসেবে গঠন করা হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তেলনীতির সমন্বয় সাধন, নিজেদের স্বার্থে সদস্যদেশগুলোতে তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, অপরিশোধিত তেলের মূল্য নির্ধারণ করা, আন্তঃসংহতি বৃদ্ধি করা ও উন্নয়নশীল দেশসমূহকে মঞ্জুরি তহবিল গঠন করতে সাহায্য করা ওপেকের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ওপেকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২। এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। ওপেকভুক্ত দেশগুলো বিশ্বের মোট তেল চাহিদার ৪০% সরবরাহ করে থাকে। সদস্য দেশগুলোর তিন-চতুর্থাংশ ভোটে ওপেক-এর সদস্যপদ প্রদান করা হয়। ওপেক সাংগঠনিক কাঠামো সম্মেলন, বোর্ড অব গভর্নরস এবং সচিবালয় এ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

ওপেক (OPEC) ভুক্ত দেশগুলো এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থকতা : এ বিষয়ের আলোকে প্রথমেই আলোচনা করতে হয় ওপেক তার সদস্য দেশগুলো এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আলোচনায় দেখা যায় এক্ষেত্রে ওপেক নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে–

১. বিশ্বে তেলের চাহিদা অনুযায়ী এর সদস্য দেশগুলোর রিজার্ভের ওপর নির্ভর করে উৎপাদন ও বণ্টন নির্ধারণ করা।

২. তেল উৎপাদনকারীরা যাতে তেল বিক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য তেলের মূল্য নির্ধারণ করা।

বিশ্বের বড় তেল কোম্পানিগুলো অতিরিক্ত তেল উৎপাদন করে তেলের মূল্য কমিয়ে আনায় বিপাকে পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে রপ্তানিকারক দেশগুলো এ অনাচার ঠেকানোর জন্য গঠন করে ওপেক। পশ্চিমা বিশ্ব তেল আমদানির ওপর অধিকতর নির্ভরশীল বিধায় তেলের গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ওপেকের গুরুত্ব ও প্রভাব তেমন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তেল সংকটের সময় ওপেক তেলের দর কষাকষি ও পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে তেল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে সক্ষম হয়। তবে পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান নানা দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য, ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায় এর ঐক্য-সংহতি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

ওপেক গঠনের পর প্রথমদিকে তেলের মূল্য নির্ধারণে সক্ষম হলেও পরবর্তী সময়ে তেলের মূল্য নির্ধারণে তেমন সক্ষম হয়নি। সভ্যতার অগ্রগতিতে তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তেলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০-৭৩ সময়ের মধ্যে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায় ৪৫%। ৩.২২ ডলার থেকে এক লাফে বেড়ে হয় ১০.৮৯ ডলার। এ সময় দাম বৃদ্ধি পেতে পেতে ৩৮ ডলার পর্যন্ত পৌঁছায়। পরে আবার দাম কমে আসে। যে রকম ঘটে ২০০৬ থেকে ২০০৮ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত। এ সময় তেলের ব্যারেল প্রতি ৪৪ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪ ডলার (২০০৮ জুলাই) পর্যন্ত হয়। পরবর্তীতে এ দাম কমতে কমতে (২০১০ আগস্ট) ৪০

ডলারে এসে পৌঁছেছে। ওপেকভুক্ত দেশগুলো বিশ্বের মোট তেল চাহিদার ৪০ ভাগ সরবরাহ করে থাকে। এর সদস্য দেশগুলোতে বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেলের এক-তৃতীয়াংশ মজুদ রয়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনের কারণে তেলের মূল্য নির্ধারণে সদস্যদেশগুলো ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে ওপেক তেমন সফল হতে পারেনি।

তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা : ওপেক সদস্যসমূহের মুদ্রা ও মাথাপিছু জিডিপি থেকে সদস্যসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করা যায়। নিচে ছকে ওপেক সদস্যদের মুদ্রার নাম ও মাথাপিছু জিডিপি তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

সদস্য দেশ	*মুদ্রার নাম*	*মাথাপিছু জিডিপি (ডলারে)*
১. আলজেরিয়া	*দিনার*	*১২,৫৫৫*
২. নাইজেরিয়া	*নাইরা*	*৫,৩৫৩*
৩. ভেনিজুয়েলা	*বলিভার*	*১৭,০৬৭*
৪. সংযুক্ত আরব আমিরাত	*দিরহাম*	*৫৮,০৬৮*
৫. সৌদি আরব	*রিয়াল*	*৫২,১০৯*
৬. কুয়েত	*দিনার*	*৮৫,৮২০*
৭. ইরাক	*ইরাকি দিনার*	*১৪,০০৭*
৮. ইরান	*রিয়াল*	*১৩,৪৫১*
৯. কাতার	*রিয়াল*	*১,১৯,০২৯*
১০. লিবিয়া	*দিনার*	*২১,৬৬৬*
১১. অ্যাঙ্গোলা	*কোয়ানজা*	*৬,৩২৩*
১২. ইকুয়েডর	*মার্কিন ডলার*	*৯,৯৯৮*

উপরিউক্ত ছক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওপেক সদস্যগুলোর মুদ্রার মান ও জিডিপি (GDP)'র মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কাজেই ওপেক তার সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহয়তা না করে, বরং বৈষম্যই বৃদ্ধি করেছে।

তেলের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য উৎপাদন বণ্টন এবং বাজারজাতকরণের জন্য সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা : তেল এমন একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যার প্রয়োজনীয়তা ধনী-দরিদ্র সকল দেশের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শিল্প নির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেলের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পপ্রধান দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ধরে রাখতে অনেকটা তেলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই তেলের ব্যবহার প্রতিটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত হওয়ায় তেলের মূল্যের এদিক-ওদিক হলে সরাসরি তার প্রভাব পড়ে সকল ক্ষেত্রে। বিশ্বের সীমিত কিছু দেশের কাছে এ সম্পদ গচ্ছিত আছে। বিশ্বের বেশির ভাগ তেলই ওপেকভুক্ত দেশগুলোর রয়েছে। নিচে ছকের মাধ্যমে তেল উৎপাদনকারী শীর্ষ ১০ দেশ হলো :

দেশের নাম	*উৎপাদনের পরিমাণ (%)*
রাশিয়া	*১৪.০৫*
সৌদি আরব	*১৩.০৯*
যুক্তরাষ্ট্র	*১২.২৩*
চীন	*৫.১৫*

দেশের নাম	*উৎপাদনের পরিমাণ (%)*
কানাডা	*৪.৫৪*
ইরাক	*৪.৪৫*
ইরান	*৪.১৪*
মেক্সিকো	*৩.৫৬*
সংযুক্ত আরব আমিরাত	*৩.৩২*
কুয়েত	*২.৯৬*

উপরিউক্ত ছকে পরিদৃষ্ট হয় তেল উৎপাদনে ওপেকভুক্ত দেশসমূহের প্রাধান্য থাকলেও ওপেকভুক্ত দেশসমূহ তেলকে অস্ত্র হিসেবে-ব্যবহার করতে পারছে না। বরং উন্নত বিশ্বের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। পরাশক্তিসমূহ তাদের নিজেদের স্বার্থে তেল উৎপাদন ও সরবরাহ করছে। বিভিন্ন সময়ে ওপেক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন উপনিবেশের অধীনে সময় অতিবাহিত করেছে।

তেলসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান করা এবং এর প্রেক্ষিতে যে কোনো সঙ্কট মুহূর্তে পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা : সদস্যদেশের তেল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আদান-প্রদানের কথা ওপেক নীতিমালায় রয়েছে। অথচ দেখা যায় যে তেলের মূল্য ব্যাপক হারে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে তেলের মূল্য দুই, তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে আবার তা হ্রাস পেয়ে পূর্বের অবস্থানে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওপেকভুক্ত দেশসমূহের মূল্যবান সম্পদ তেলের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। যদি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ থাকতো তাহলে এরূপ বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। ওপেকভুক্ত দেশসমূহকে তেল উৎপাদনে নির্ভর করতে হয় উন্নত বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানির ওপর। কারণ তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি না থাকায় তাদেরকে তেল উৎপাদনে চড়া মূল্য দিতে হয়। বহুজাতিক কোম্পানির নীতিমালার ভিত্তিতে সদস্য দেশসমূহকে তেলের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। কাজেই ওপেক তার সদস্য দেশগুলো এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে।

তেলের কালোবাজার নিয়ন্ত্রণ করা : সদস্য দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তেলের মূল্য নির্ধারণে ওপেক নীতিমালায় তেলের কালোবাজার নিয়ন্ত্রণে অধিক জোর দেয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওপেক কি তেলের কালোবাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে আদৌ? এর উত্তরে বলা যায় না। কারণ ওপেক-এর সম্পদ তেল। অথচ এ সম্পদ তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নেই। বহুজাতিক কোম্পানি এ সম্পদকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা নাইজেরিয়াকে দেখতে পাই। নাইজেরিয়ার জনগণকে বড় বড় স্বপ্ন দেখিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে তেল উৎপাদন করে নাইজেরিয়াকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে নাইজেরিয়ার জনগণের মাথাপিছু আয় সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে অর্থনীতিতে ব্যাপক ধস নামে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, মুদ্রাস্ফীতি প্রকট আকারে দেখা দিলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো শোষণ প্রক্রিয়ার ষোলকলা পূর্ণ করে নাইজেরিয়া ছেড়ে পালায়।

সদস্য দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া, যাতে কম মজুদসম্পন্ন দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় : ওপেক গঠনের প্রথমদিকে সদস্য দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে তা বজায় রাখতে পারেনি। ফলে ক্ষতির হাত থেকে কম মজুদসম্পন্ন সদস্য দেশগুলোকে রক্ষা করতে পারেনি।

তহবিল গঠন ও তেল উৎপাদন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ : ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওপেক একটি বিশেষ তহবিল গঠন করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এ তহবিল থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ৫.৭ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করা হয়। এর পাশাপাশি এ দেশগুলোকে ২১০ মিলিয়ন ডলার ঋণও দেয়া হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ৪ বিলিয়ন ডলার পুঁজিসহ ওপেকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল পুনর্গঠন করা হয়। ২০০৪ সালের ৩ জুন বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে ওপেকভুক্ত দেশগুলো তেল উৎপাদন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দৈনিক ২ কোটি ৩৫ লাখ ব্যারেলের পরিবর্তে ২ কোটি ৬০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ২০০৭-০৮ সালের মাঝামাঝি তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের ওপরে উঠলে ওপেক ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের সম্মেলনে তেল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দৈনিক ২ কোটি ৯০ লাখ ব্যারেল উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ইন্দোনেশিয়া তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত শিল্প, সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখতে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আর এক্ষেত্রে তেল সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠা সচিব Harold Brown তেল সম্পদকে আধুনিক শিল্পের 'Life blood' বলে অভিহিত করেছেন। ওপেকের তেল সম্পদ সরবরাহ ঠিকমতো না হলে বিশ্বসহ বৃহৎ পরাশক্তির ভারী ও হালকা শিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তেলের ওপর ওপেক পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে তেল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় বিশ্বে তেলের মূল্য হু হু করে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য, দ্বন্দ্ব ও ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায় ওপেকভুক্ত দেশসমূহের সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৫৫ বছরে ওপেক দু একটি ব্যতীত কোনো সক্রিয় কার্যক্রম দেখাতে পারেনি। তারপরও ওপেক বিভিন্ন সময় নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য নিরসনে আলোচনায় বসেছে। সদস্যদেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় যথাসাধ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭ ▌ তিন দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে সার্কের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গঠিত হয় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক। উন্নয়ন আঞ্চলিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে সার্ক স্থাপিত। এটি মূলত একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার আঞ্চলিক সংগঠন। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাকে সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপদানে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে এ মর্মে বাংলাদেশের একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। অতঃপর নানা সম্মেলনে বহুমুখী আলোচনার প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকা সম্মেলনের মাধ্যমে সার্ক আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ৭টি দেশ নিয়ে সার্ক যাত্রা করলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৮। সার্কের সর্বশেষ অর্থাৎ ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৪-তে নেপালের কাঠমান্ডুতে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিন, শ্রীলংকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহেন্দ রাজাপাকসে, ভারতের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোহাম্মদ নওয়াজ শরীফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালা এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগায়ে এবং পর্যবেক্ষক সংস্থা ও দেশের প্রতিনিধিগণ।

১৮তম সার্ক সম্মেলন

৩৬ দফা কাঠমান্ডু ঘোষণার প্রথম দফা আঞ্চলিক সহযোগিতাবিষয়ক। এতে সরকারপ্রধানরা দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নতির জন্য আরও গভীর পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে জোরালো আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থ, জ্বালানি, নিরাপত্তা, অবকাঠামো, সংযোগ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে একমত সার্ক শীর্ষ নেতারা। এছাড়াও কৃষি ও খাদ্য ও নিরাপত্তা, পরিবেশ, সমুদ্র অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ও শিশু, সামাজিক নিরাপত্তা, টেলিযোগাযোগ, পর্যটন, সংস্কৃতি, সার্ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরালকরণ এবং সার্ক পর্যবেক্ষক দেশের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

সার্কের অন্যান্য কার্যক্রম

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃবাণিজ্য বাড়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়াতে ২০১০-২০ দশককে 'সার্ক কানেক্টিভিটি দশক' (Decade of Intra-regional Connectivity in SAARC) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

থিম্পু ঘোষণার ৩৭ অনুচ্ছেদের ৬ অনুচ্ছেদেই জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ১৬ দফা বিশেষ বিবৃতি তো রয়েছেই। ঘোষণায় বলা হয়, শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ COP16 সম্পর্কে এবং পরবর্তীতে অভিযোজন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব লাঘবে ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য পৃথক অর্থায়নের মতো ইস্যুগুলোর ব্যাপারে একটি অভিন্ন সার্ক অবস্থান গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার সূচনা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২৮ এপ্রিল ২০১০ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সার্ক উন্নয়ন তহবিলের (SAARC Development Fund-SDF) সচিবালয়ের সদর দপ্তর উদ্বোধন করেন। এতে ৩০০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল নিয়ে এ অঞ্চলের উন্নয়ন তহবিলের যাত্রা শুরু হয়। SDF-এর সদর দপ্তর ভুটানের থিম্পুতে অবস্থিত।

সার্কের সমস্যাসমূহ : সার্কের সমস্যাসমূহকে তিনটি দিক থেকে চিহ্নিত করা যায়। যথা–

ক. রাজনৈতিক সমস্যা
খ. নেতৃত্বে সমস্যা
গ. কাঠামোগত সমস্যা

নিচে ধারাবাহিকভাবে সার্কের সমস্যাসমূহকে উপস্থাপনের দাবি রাখে–

১. **পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব :** ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও লোভ দানা বাঁধতে থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে এসব সংঘাতগুলো বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে এবং মাঝে মাঝে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমঝোতা হলেও একেবারে নিরসন হয়নি।

২. **দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা :** SAARC দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক সমস্যা SAARC ব্যর্থ করে দিয়েছে, যার সদস্য ৮টির মধ্যে ৫টির সাথে বড় রাষ্ট্র ভারতের একাধিক ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা এবং কোনো কোনো দেশের সাথে তা বাড়ছেই। ফলে ভারত যতক্ষণ না সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং এ সমস্যার সমাধানে আন্তরিক না হবে ততক্ষণে এর ব্যর্থতাই শুধু বাড়বে। কারণ সমস্যা জিইয়ে রেখে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক হওয়া সম্ভব নয়।

৩. **বৈশিষ্ট্যগত বাধা :** সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিরোধ, বৈরিতা, অবিশ্বাস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে SAARC আশানুরূপভাবে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না।

৪. **আঞ্চলিক বাণিজ্যে ব্যর্থতা :** আঞ্চলিক বাণিজ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়–

সংগঠন	*আঞ্চলিক বাণিজ্য হার*
NAFTA	৩৫%
EU	৬৬%
ASEAN	১১%
SAARC	৫%

অথচ বিশ্বের ১৬৯ কোটি ৩০ লাখ মানুষের সংগঠন সার্ক বিশ্বের আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জন-অধ্যুষিত।

৫. **দারিদ্র্য মুক্তির ব্যর্থতা :** সার্ক সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই দারিদ্র্য মুক্তির কথা বলা হয়েছিল। অথচ আজ ২৮ বছর পরও এ অঞ্চলের ৪০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। দক্ষিণ এশিয়া বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম অঞ্চল।

৬. **সাক্ষরায়নে ব্যর্থতা :** বলা হয়েছিল প্রতিটি মানুষকে সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হবে ২০০০ সালের মধ্যে। কিন্তু তা ২০১৫ সালে এসেও সফল হয়নি।

৭. **শিশুকন্যা অধিকারের ব্যর্থতা :** ১৯৮৮ সালে ইসলামাবাদে বেনজীর ভুট্টোর প্রস্তাবনায় ১৯৮৯ সালকে 'শিশু কন্যা বর্ষ' ঘোষণা করা হয়। অথচ সদস্য দেশগুলোর সবকটিতেই শিশু কন্যারা আজও অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার। শ্রমিক হিসেবেই তাদের অনেকে জীবন শুরু করে। শিশু কন্যাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও SAARC দেশগুলো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি।

৮. **নিরাপত্তা সমস্যা :** বিশ্বের অস্ত্র আমদানির ১৮ ভাগ কেনে ভারত ও পাকিস্তান। অঙ্কের হিসাবে ১৯ হাজার মিলিয়ন ডলার। ভারতের ১৯৭৪, '৯৮ এবং পাকিস্তানের ১৯৯৮ সালের পারমাণবিক বিস্ফোরণ SAARC ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

৯. **রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব :** রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব SAARC এর সফলতার পথে অন্তরায়। যখনই কোনো যোগ্য নেতৃত্বের আবির্ভাব হয় তখনই তাকে সন্ত্রাসবাদের কোনো এক অদৃশ্য থাবা গ্রাস করে ফেলে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এ অঞ্চলের দেশগুলো প্রায়ই একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে বিরাজ করে।

১০. **সন্ত্রাসবাদ রোধে ব্যর্থতা :** সন্ত্রাসবাদ সার্কের সদস্য দেশগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০২ সালের কাঠমান্ডু সম্মেলনে যে কোনো মূল্যে এর মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। SAARC নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ বলেও উল্লেখ করেন। এমনকি সদস্য দেশগুলো সন্ত্রাসীদের সহায়তা না করায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কিন্তু আজও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি সার্ক সদস্য দেশগুলোর পক্ষে।

১১. **নারী ও শিশু পাচার রোধে ব্যর্থতা :** ১১তম SAARC সম্মেলনে এজন্য দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নেতৃবৃন্দ সদস্য দেশগুলোকে নারী ও শিশু পাচার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং প্রতিবিধান করার জন্য সদস্য দেশের প্রতি আহ্বান জানান, যা সার্কের দুর্বলতার প্রকাশ্য রূপ।

১২. **আধিপত্য মনোভাব :** SAARC-এর মতো সহযোগিতা সংস্থার মূল ভিত্তি হলো 'আমরা চেতনা' কেবল আমিত্ব বা আমার ধারণা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতের 'আমিই' প্রধান এবং সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে বড় ভাই সুলভ আচরণ SAARC চেতনাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

১৩. **উপ-আঞ্চলিক জোট :** ভারত কর্তৃক উন্নয়ন চতুর্ভুজ জোট গঠন করে ১৯৯৭ সালে কাঠমান্ডুতে ভারত তার স্বার্থকে পাকাপোক্ত করার প্রয়াস চালায় যা SAARC চেতনাকে ব্যাহত করেছে।

১৪. **ত্রুটিপূর্ণ সনদ :** সার্কের ত্রুটিপূর্ণ সনদ সার্কের অচল অবস্থার আরেকটি অন্যতম কারণ। রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রত্যেকের উপস্থিতির ক্ষেত্রে অপারগতা, দ্বি-পাক্ষিক বিষয় আলোচনা না করা ইত্যাদি যেসব বিধিবিধান সনদে রয়েছে তা অনেকাংশে অচলাবস্থার জন্য দায়ী।

সার্কের সম্ভাবনা : সার্ক সম্ভাবনাকে দু'দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। যথা–

ক. ইতিবাচক

খ. নেতিবাচক

ইতিবাচক : কোনো সংগঠনের সফলতা নির্ভর করে সে সংগঠনভুক্ত সদস্যসমূহের মাঝে বিদ্যমান অভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। এক্ষেত্রে সার্কভুক্ত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য নেই বললেই চলে। এটি সার্কভুক্ত দেশসমূহের বন্ধনের একটি ইতিবাচক দিক। সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রনীতিতে আঞ্চলিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন চিন্তা এবং আদর্শ প্রয়োজন, সফলতার ক্ষেত্রে। এদিক থেকে সার্কভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রনীতিতে মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়।

নেতিবাচক দিক : সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান। অথচ বাস্তবে এর উল্টো ঘটনা ঘটছে। সহযোগিতা নয় বাড়ছে বরঞ্চ বিরোধ। তামিল প্রশ্নে ভীষণ বিরূপতা ছিল ভারতের সাথে শ্রীলংকার। কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব। সীমান্ত এলাকা নির্ধারণে বাংলাদেশ-ভারত দ্বন্দ্ব। নেপাল-ভারত বিভিন্ন দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বগুলো কমছে না বরং তীব্রতর হচ্ছে, যা সার্ক সম্ভাবনাকে নেতিবাচক দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর রাজনৈতিক ও আদর্শিক মত ভিন্ন হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে সফলতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সদস্য দেশসমূহের রাজনৈতিক বৈচিত্র্যময়তা। গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতি নীতি ও আদর্শের প্রতিপালন।

সার্ক সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণেও বিভিন্নতা সার্ক সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। সার্কের অন্য রাষ্ট্রগুলো ভারতের তুলনায় অর্থনীতি, আয়তন, জনসংখ্যা, সেনাবাহিনী, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে দুর্বল। ফলে ভারতের প্রভাব এ অঞ্চলে বহুদিন ধরে কাজ করছে। এরূপ নেতিবাচক প্রভাব সার্কের সমূহ সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কোনো সংগঠন বা আঞ্চলিক সংস্থার সফলতা অনেকাংশে নিরাপত্তা হুমকির একই রকম দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল হলেও সার্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা লক্ষণীয়। ভারতের হুমকি চীন এবং সার্কের অন্যান্য দেশ ভারতের কাছ থেকে হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একই রকম হুমকিও বিদ্যমান নেই।

রাজনৈতিক সমস্যা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব সার্কের নানা উদ্যোগও তার সম্ভাবনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। সার্কের কাঠামোর নানা ত্রুটি সার্ককে কার্যকর করার পথে অন্তরায়।

সার্ক সনদের দুই ধারায় বলা হয়েছে দ্বি-পাক্ষিক বিষয় সার্কের আওতায় আলোচনা করা যাবে না। সনদের এ নীতি সার্ক সম্ভাবনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে।

যে প্রত্যাশা নিয়ে SAARC তার অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল সেক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এর মূল কারণ দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা, যা সার্কের চেতনা বাস্তবায়নের পথে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাই সার্ক সনদের বর্তমান এ ধারার কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন আনা সম্ভব কি-না তা সার্কভুক্ত দেশগুলোর নেতৃবৃন্দকে ভেবে দেখতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটি মানুষের অভিন্ন কল্যাণের স্বার্থে সার্ককে আরও গতিশীল করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকেই নিতে হবে। তাহলে সার্ক তার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে এবং সম্ভাবনার দিগন্ত বা দ্বার খুলে যাবে বলে আশা করা যায়।

০৮ ▌ 'পাক-ভারত রাজনৈতিক বৈরিতা সার্ক ও সাপটার সফলতার পথে প্রধান অন্তরায়।'— আলোচনা করুন।

উত্তর : পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার রাজনৈতিক বৈরিতা উভয় রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই। ১৯৪৭ সালের যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই কিছু অমীমাংসিত ইস্যু, বিশেষত কাশ্মীর প্রশ্ন রাষ্ট্র দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেয়। এই সঙ্কটকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র দুটির মধ্যে এ পর্যন্ত কয়েকটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাষ্ট্র দুটিসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ। কিন্তু মূল সঙ্কট অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। এই সঙ্কটকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পাক-ভারত রাজনৈতিক বৈরিতা এ অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা 'সার্ক' এবং এর অঙ্গ সংস্থা 'সাপটা'র সফল বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলছে।

পাক-ভারত রাজনৈতিক বৈরিতার পটভূমি : অবিভক্ত উপমহাদেশের স্বাধীনতাকালীন পরিকল্পনায় বলা হয়, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং হিন্দু এলাকাগুলো ভারতে থেকে যাবে। আর কাশ্মীর সম্পর্কে বলা হয়, কাশ্মীর পাকিস্তান বা ভারতের সাথে একীভূত হতে পারবে অথবা নিজেরাই স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কাশ্মীরের তৎকালীন শাসককে ভূখণ্ডের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক উপাদান ও জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা করার জন্য বলা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাশ্মীরের তৎকালীন হিন্দু মহারাজা হরি সিংহ একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করার চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু তার এই পরিকল্পনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। তাই মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পাকিস্তান কাশ্মীরের ওপর নৈতিক দাবি উপস্থাপন করতে থাকে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরের মুসলিম গোষ্ঠীগুলো হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। তাদের সাথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম অধিবাসী (উপজাতি) গোষ্ঠীগুলোও যোগ দেয়। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হিন্দু মহারাজা বিদ্রোহ দমনের জন্য ভারতের সামরিক সাহায্য কামনা করে। ভারত কাশ্মীরকে ভারতের সাথে একীভূত হওয়ার শর্তসাপেক্ষে রাজাকে সামরিক সাহায্য দিতে রাজি হয়। বাধ্য হয়ে রাজা ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর ভারতের সাথে কাশ্মীরকে একীভূত করার প্রস্তাব দেন। পরের দিন ২৭ অক্টোবর ভারত তা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। ফলে ভারতীয় সামরিক বাহিনী কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিরাট অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আর এই হস্তক্ষেপে পাকিস্তানের সাথে

ভারতের যুদ্ধ শুরু হয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ভারত জম্মু ও কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে নেয় এবং পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আসে বাকি এক ভাগ যা 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পরিচিত।

১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিশন UNCIP প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই রাজি হয়, মুক্ত ও অবাধ গণভোটে কাশ্মীরে জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করেই এর ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারত কাশ্মীরী জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে একে তার নিজস্ব ভূমি বলে ব্যবহার শুরু করে। ভারতের সংবিধানের ১ নং ধারায় সন্নিবেশ করা হয়, 'কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।' ৩৭০ নং ধারায় কাশ্মীরকে 'বিশেষ মর্যাদা' দেয়া হয় এবং কেন্দ্রের হাতে নিরাপত্তা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগের বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সঙ্গত কারণে ভারতের এই অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে পারেনি। ফলে বিষয়টি তাদের মধ্যে অমীমাংসিত থেকে যায়। এ নিয়ে ১৯৬৫ সালে তাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও কাশ্মীর সীমান্তে পাক-ভারতের মধ্যে তৃতীয় যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে এই বিরোধ সমাধানের জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সংক্রান্ত কাঠামো গৃহীত হয়। ১৯৯৮ সালে উভয় দেশ একই ইস্যুকে কেন্দ্র করে পরীক্ষামূলকভাবে উপমহাদেশের স্মরণাতীত কালের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৯৯৯ সালে উভয় দেশ কারগিল সীমান্তে চতুর্থ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভারত কর্তৃক জাতিসংঘ প্রস্তাব মেনে না নেয়ায় বিষয়টি অমীমাংসিত থাকায় অদ্যাবধি দেশ দুটির মধ্যে বাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে, যা এ উপমহাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে।

সার্ক এবং সাপটার সফলতার পথে অন্তরায় : দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ক (SAARC-South Asian Association for Regional Cooperation)। সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল :

১. দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা;
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা।
৩. দেশসমূহের জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৫. অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা।

এ কারণে এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষরিত হয় সাপটা (SAPTA—SAARC Preferential Trading Arrangement)। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাধা অপসারণ করে আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি করাই ছিল সাপটা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য, যা ১৯৯৫ সাল থেকে কার্যকর হয়।

সাপটা চুক্তির আওতায় বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য যেসব ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে : ১. ট্যারিফ, ২. প্যারাট্যারিফ, ৩. ননট্যারিফ, ৪. ডাইরেক্ট ট্রেড মেজার্স। এর মধ্যে প্রথম অবস্থায় ট্যারিফ হ্রাস, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য বাধাসমূহ দূরীকরণ এবং চতুর্থ ক্ষেত্রে বাণিজ্য

ব্যবস্থা গ্রহণ চুক্তির আওতাভুক্ত। বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে সমস্ত কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে চুক্তিতে আলোকপাত করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. পণ্যভিত্তিক শুল্ক সুবিধা বিবেচনা, ২. সমষ্টিক হারে শুল্ক হ্রাস, ৩. খাতভিত্তিক এবং ৪. প্রত্যক্ষ বাণিজ্য কর্মসূচি।

সাপটা চুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে (বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান) কতিপয় বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এতে বলা হয়েছে, আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সাথে 'বিশেষ ও অধিক অনুকূল আচরণ' করা হবে। এ চুক্তিতে অবিনিময়তার নীতি সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতের বাজারে বিশেষ পণ্যে বাণিজ্য সুবিধা পেলেও তাতে ভারতকে একই রকম সুবিধা দিতে হবে না।

ভারত-পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সর্বসম্মতিক্রমে সার্কের আওতায় সাপটায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহে সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর প্রতিপাদ্যে উল্লেখ করা হয় :

১. এলডিসির রপ্তানি বাজারে সহায়তার জন্য রপ্তানি ঋণবীমা প্রবর্তনের মাধ্যমে সুযোগ বৃদ্ধি করা।
২. এলডিসির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের সহায়ক প্রবর্তনের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের সহায়ক নীতি গ্রহণ করা।
৩. অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের কাছ থেকে এলডিসি তাদের রপ্তানিকৃত সামগ্রীর জন্য সুদমুক্ত প্রবেশাধিকার, বিশেষ ট্যারিফ অগ্রাধিকারের সুবিধা পাবে। এছাড়াও ভারতের ননট্যারিফ এবং প্যারাট্যারিফ বাধাসমূহ যে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেখান থেকে অপসারণের সুযোগ ভোগ করবে।

সুতরাং সার্ক সাপটার মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহসহ সদস্যভুক্ত সকল দেশেরই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন সদস্যভুক্ত সকল দেশেরই সর্বসম্মত ঐকমত্য। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সার্ক প্রতিষ্ঠার দু দশক পার হওয়া সত্ত্বেও পাক-ভারত রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে অদ্যাবধি সার্ক সর্বজনীন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। পাকিস্তান ও ভারতের নিজস্ব স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বৈরিতা সার্ক এবং সাপটার সফল বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। ফলে এতদঞ্চলের সাতটি দেশের উন্নয়ন প্রবাহ হচ্ছে বিঘ্নিত।

সার্বিক মূল্যায়ন : সার্ক একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা। সম্ভবত রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ে আলোচনা অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করবে বিবেচনা করেই রাজনৈতিক বিষয়কে সার্কের বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধ জিইয়ে রেখে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্ভব নয়। অনেক বিশ্লেষক এজন্য সার্কের অধীন রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য এর কাঠামোগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই সার্কের অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য রাখঢাক না করে সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সার্কের কাঠামোর মধ্যেই উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পাক-ভারত ছাড়া সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক বিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতকেন্দ্রিক।

তাই পাক-ভারত, ভারত-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ-পাকিস্তান কিংবা ভারত-শ্রীলংকা এরকম দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে আলোচনায় বাকি সদস্য দেশগুলোকে একযোগে মধ্যস্থতা করে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া তৈরি করতে হবে। তাহলে সার্কের মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজনৈতিক বৈরিতাসমূহের অবসান হবে এবং সার্ক ও সাপটার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

০৯। ক. SAPTA ও SAFTA সম্বন্ধে ধারণা দিন।
খ. এগুলো থেকে বাংলাদেশ যেসব সুবিধা পেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
অথবা, **'সাফটা' (SAFTA) কি? এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।**

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটিরও অধিক মানুষ, যাদের অধিকাংশের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'সার্ক' (South Asian Association for Regional Co-operation—SAARC)। বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষের ভবিষ্যতের সাথে জড়িত এই সংগঠন। একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আটটি দেশ— বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ এবং আফগানিস্তানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC)। সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এবং সার্কের সতেরতম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (১০-১১ নভেম্বর ২০১১) মালদ্বীপের আদ্দু সিটিতে। এ সম্মেলনে আটটি দেশের বাণিজ্য বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণে দক্ষিণ এশীয় বিশেষ সুবিধাভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা 'সাপটা' (SAPTA—SAARC Preferential Trading Arrangement) অধিকতর গতিশীল হবে বলে আসা করা যায়।

সাপটা ও সাফটা

সাপটা (SAPTA) : ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশসমূহ 'মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে' (Core economic areas) সহযোগিতার কিছু পদক্ষেপ নেয়। এদের মধ্যে সাপটা (SAPTA—SAARC Preferential Trading Arrangement) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি ১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর হয়। সাপটা (SAPTA) বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি কাঠামো-সমঝোতা, যার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলো পণ্যের পর পণ্যের (Product by product) ভিত্তিতে শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে রেয়াত দেয়ার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে আলোচনা করবে। সার্ক কিছু বাধ্যবাধকতার মুখে এ ধরনের আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আন্তঃবাণিজ্যের চিত্র খুবই করুণ। ২০০০ সালে সার্কের আন্তঃবাণিজ্যে রপ্তানি হয় জিডিপির ১৩.১% এবং আমদানি হয় ১৭.০ ভাগ। অথচ একই সময়ে আসিয়ান (ASEAN) দেশসমূহে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০.২ ভাগ এবং আমদানি হয় ১৭.৮ ভাগ। সার্ক নেতারা দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন, আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি ব্যতীত অর্থবহ আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্ভব নয়। তাছাড়া বর্তমানে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সংরক্ষণবাদ বৃদ্ধি ও ট্রেডিং ব্লক গড়ে উঠার ফলে সার্ক দেশসমূহের বৈদেশিক বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সাপটা (SAPTA) এ লক্ষ্য অর্জনেরই একটি পদক্ষেপ। তবে অনেকে আশঙ্কা করেন, এর ফলে এ অঞ্চলের বৃহৎ শক্তি ভারতের পণ্যে অন্যান্য দেশসমূহের বাজার সয়লাব হয়ে যাবে। কিন্তু সাপটা চুক্তি একটি সমঝোতা চুক্তি, এর কোনো অনমনীয় শর্ত নেই। যদি কোনো দেশের চুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় তার 'Balance of Payment'-এ অসুবিধা হয় অথবা তার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে এই ব্যবস্থা থেকে সরে আসতে পারবে। সার্ক নেতৃবৃন্দ মনে করেন, 'সাপটা' এই অঞ্চলের বাণিজ্য ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ষষ্ঠ সার্ক সম্মেলনের চেয়ারম্যান এবং শ্রীলঙ্কার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসা ছিলেন 'সাপটার' প্রবক্তা।

সাফটা (SAFTA) : ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক জন্মের প্রথম দশকেই সংস্থার দেশগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা বা সাপটা (SAPTA) চালু হয়। পরবর্তী সময়ে সার্কভুক্ত বাণিজ্য এলাকা বা সাফটা (SAFTA—South Asian Free Trade Area) গঠনের উদ্যোগ নেয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে সার্কের দ্বিতীয় দশক। এটাকে দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহত্তম আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সার্ক সদস্য দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান আগ্রহের আশাব্যঞ্জক লক্ষণ বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। সাফটায় ২০০১ সাল নাগাদ দক্ষিণ এশিয়াকে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলে পরিণত করার অঙ্গীকার করা হয়। এ অঙ্গীকারের অর্থ হলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সার্কের আটটি দেশ বিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী আঞ্চলিক জোট যেমন 'আসিয়ান', ইউরোপীয় কমন মার্কেট বা নাফটার (NAFTA) মতো বাণিজ্যিক লেনদেন, পুঁজি বিনিয়োগ, কাঁচামাল আদান-প্রদান, মুদ্রা ঘাটতি মোকাবিলা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা করবে একে অপরকে। সাফটা বা দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত ছিল সার্ক দেশসমূহের জন্য বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী। কারণ বিশ্বজনীন বাস্তবতাকে গ্রহণ না করে এতদিন এ অঞ্চলের দেশসমূহকে খেসারত দিয়ে চলতে হয়েছে। এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে বৃহৎ দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। বৃহৎ দেশগুলো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র দেশসমূহ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করেনি। শিল্প পুঁজির বিকাশে মৌখিক আশ্বাস দিলেও কার্যকর সহযোগিতা দিয়েছে নামমাত্র। তাই সার্ক আন্তঃসরকার বিশেষজ্ঞ গ্রুপ (IGEG) একটি সর্বাঙ্গীণ সাফটা চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করে এবং ২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি সার্কের সদস্য দেশগুলো সাফটা চুক্তি স্বাক্ষর করে। সাফটা চুক্তি ১ জুলাই ২০০৬ কার্যকর হয়। এ চুক্তির লক্ষ্যসমূহ হলো :

১. এ অঞ্চলের মধ্যে ট্যারিফ, প্যারা-ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ ও বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার মতো অন্যান্য বাধা দূর করা;
২. সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন স্পর্শকাতর পণ্য ও লেনদেন বহির্ভূত রাখার তালিকা শনাক্ত করা;
৩. অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাপটার প্রতিপাদ্য বিষয় : সাপটার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সার্কের স্বল্পোন্নত সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কারিগরি সহায়তা এবং তাদের বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে।

সাপটা মূলত এলডিসিদের (Least Developed Countries) সুবিধা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে সহায়তা প্রদানে এতে অঙ্গীকার করা হয়েছে—

১. আন্তঃআঞ্চলিক সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার চাহিদা পূরণের নিমিত্তে উৎপাদনশীল অন্যান্য সুবিধা প্রদান এবং গ্রহণের সহায়তা।
২. কোনো সদস্য দেশ Balance of Trade-এর প্রতিকূলতার কারণে আর্থিক দিক থেকে খারাপ অবস্থায় পতিত হলে চুক্তি অনুসারে সাপটার সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ অকার্যকর রাখতে পারবে।
৩. আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সফলতার জন্য চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, যোগাযোগ অবকাঠামো এবং ট্রানজিট সুবিধা পরিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. Periodical Review-র মাধ্যমে প্রতি স্তরে সমঝোতা আনয়ন, মানোন্নয়ন এবং সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫. সামগ্রী ও খাতভিত্তিক ব্যাপক ট্যারিফ হ্রাসের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমঝোতার পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬. প্রাথমিক সমঝোতার কার্যক্রম উৎপাদন সামগ্রীভিত্তিক হবে।
৭. এলডিসির রপ্তানি বাজারে সহায়তার জন্য রপ্তানি ঋণ বীমার প্রবর্তনের মাধ্যমে সুযোগ বৃদ্ধিকরণ।
৮. এলডিসির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের সহায়ক নীতি গ্রহণ।
৯. এলডিসি এবং অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের মধ্যে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ, জাহাজের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার সুযোগ দান।
১০. অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের কাছ থেকে এলডিসি তাদের রপ্তানিকৃত সামগ্রীর জন্য সুদমুক্ত প্রবেশাধিকার, বিশেষ ট্যারিফ অগ্রাধিকার অথবা ট্যারিফ বাধাসমূহ যে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেখান থেকে অপসারণের সুযোগ ভোগ করবে।
১১. রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌছানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য সদস্য দেশের সাথে সমঝোতা আনয়নে সক্ষম হবে।
১২. চরম প্রতিকূল অবস্থায় অন্যান্য দেশসমূহের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর ওপর আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনে সক্ষম হবে।

'সাপটা' এবং 'সাফটা' থেকে বাংলাদেশ যেভাবে সুবিধা পেতে পারে

সাপটা (SAPTA) চুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে (বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান) কতিপয় বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এতে বলা হয়েছে, আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সাথে 'বিশেষ ও অধিক অনুকূল আচরণ' করা হবে। এ চুক্তিতে অবিনিময়তার (Non-reciprocity) নীতি সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতের বাজারে বিশেষ পণ্যে বাণিজ্য সুবিধা পেলেও তাতে ভারতকে একই রকম সুবিধা দিতে হবে না। তাই আন্তঃবাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ 'সাপটা' থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। যেমন—

১. **বাণিজ্য ঘাটতি দূরীভূত :** সাফটায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলোর ঘাটতি দূর করার একটা দৃঢ় আশ্বাস বহন করছে। 'সাফটা' তথা মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলার মাধ্যমে সে আশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে। এতে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে।
২. **আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি :** সার্ক পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল আঞ্চলিক জোট। পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি জনগোষ্ঠী বাস করে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে। অথচ সার্কভুক্ত দেশগুলোতে আন্তঃবাণিজ্য হয় মাত্র ৩.৪ শতাংশ, তারও সিংহভাগ হয় চারটি স্বল্পোন্নত দেশে। যেখানে ইইউর আন্তঃজোট বাণিজ্য ৬৪ শতাংশ, নাফটার ৪৭ শতাংশ, আসিয়ানের ৪৩ শতাংশ ও এপেকের ৫৪ শতাংশ। তাই সাফটা হলে সার্কভুক্ত দেশসমূহের আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির পথও উন্মুক্ত হবে, যা দ্বারা বাংলাদেশ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।
৩. **বাণিজ্য বহুমুখীকরণ :** মুক্তবাণিজ্য এলাকা নব নব বাণিজ্য সৃষ্টি করে এবং বাণিজ্যকে বহুমুখী করে তোলে। সাফটা হলে বাংলাদেশে বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অধিক মাত্রায় অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ঘটাবে। এতে উৎপাদন খরচ কমানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে, ফলে দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসবে।

৪. **প্রযুক্তি হস্তান্তর ও টেকসই উন্নয়ন :** সাফটা পুরোপুরি কার্যকরী হলে সদস্যভুক্ত সকল দেশ অভিন্ন বাজারে পরিণত হবে। এতে সহজেই এক দেশের প্রযুক্তি অন্য দেশে হস্তান্তরিত হবে। ফলে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হবে।

৫. **দারিদ্র্য বিমোচন :** সাফটা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে কতিপয় বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশসহ এসব দেশ এসব সুবিধা যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অর্থনীতির চেহারার ইতিবাচক রূপান্তরের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়নের কারণে বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতায় দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্কের আওতায় 'সাপটা' এবং 'সাপটা' থেকে 'সাফটা' গঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী। ইতোমধ্যে এ অঞ্চলে সাফটা থেকে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সৃষ্টির একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা অদূর ভবিষ্যতে এ অঞ্চলকে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলে পরিণত করবে। বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহ 'সাপটা' ও 'সাফটা' থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। তবে সেজন্য বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কূটনৈতিক আরো জোরদারকরণ এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থান নিতে হবে।

১০। সার্ক (SAARC) কি একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছে? এ ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।

অথবা, **দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যাশা পূরণে SAARC-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।**

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার দেড়শ' কোটি মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নয়নের ফোরাম সার্ক। ১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেও সার্ক যে খুব একটা গ্রহণযোগ্য সংগঠন হয়ে উঠেছে সে কথা এখনো বলা যাবে না। সার্ক প্রতিষ্ঠার পঁচিশটা বছর অতিক্রান্ত, সার্কের এখন পুরো যৌবন হওয়ার কথা, কিন্তু সার্ক যেভাবে চলছে তাতে মনে হয় এখনই সে অশীতিপর, জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ। সার্কের কাজের গতি যেমন মন্থর, তেমনি চলার গতিও ঢিলেঢালা। পৃথিবীতে আরো বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সংগঠন রয়েছে সেগুলো বেশ প্রাণবন্ত, অনেক কাজ হচ্ছে সেগুলো দিয়ে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষ অনেক সুবিধা পাচ্ছে। সার্কের ব্যাপারটা ঠিক যেন বিপরীত।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যাশা পূরণে সার্কের ভূমিকা : রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিশ্বের আঞ্চলিক কাঠামোতে সবচেয়ে সম্ভাবনার জায়গাটি হলো দক্ষিণ এশিয়া। যার মাঝখানে ভবিষ্যতের পরাশক্তি ভারত আর চারপাশে উন্নয়নশীল শ্রীলংকা ও পাকিস্তান। আছে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ আর নেপাল, ভুটান আর মালদ্বীপের মতো বাজার, যাদের সম্ভাবনা এখনো যাচাই করা হয়ে ওঠেনি ঠিকমতো। এই অঞ্চলে বিশ্বের ২৩ শতাংশ মানুষের বসবাস। হোক পণ্য বা সেবা, যে কোনো বিচারেই বাজার হিসেবে লোভনীয়। প্রতিটি দেশেরই ইউরোপ ও আমেরিকার সাথে রয়েছে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ দক্ষিণ এশিয়া নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে বিশ্বের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। সার্কের দেশগুলো ২০০৮ সালে নিজেদের মধ্যে ব্যবসা করেছে ১ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। সার্ক চেম্বারের হিসাবে, এ দেশগুলোর মধ্যে সত্যিকার অর্থে বাণিজ্য হতে পারে এর চারগুণ, অর্থাৎ ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের। সে হিসাবে এ অঞ্চল তার বাণিজ্য সম্ভাবনার শতকরা

৭৩ ভাগই কাজে লাগাতে পারছে না। আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে অনেক আগেই সাফটা নামে একটি চুক্তি হয়েছিল সার্কদেশগুলোর মধ্যে, যা কার্যকর হয় ২০০৬ সাল থেকে। এর আওতায় দেশগুলো নিজেদের মধ্যে পণ্য বেচাকেনায় শুল্ক হার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনার কথা, লক্ষ্য ছিল নিজেদের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানো। সেই সাফটা রুলস অব অরিজিনের আওতায় দেশগুলো নিজেদের মধ্যে মাত্র ৬৭ কোটি ডলারের ব্যবসা করে। পৃথিবীতে যতগুলো আঞ্চলিক সংগঠন রয়েছে, এর মধ্যে সার্ক অঞ্চলে আন্তঃবাণিজ্য সবচেয়ে কম। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক সংগঠন নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য সম্পাদন করে থাকে। অথচ সার্ক আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠিত হলেও এ অঞ্চলে আন্তঃবাণিজ্যের হার এখনো মাত্র ৪.৮ শতাংশ, অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। SAARC একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হওয়ার অন্তরালে যে সকল কারণগুলো বিদ্যমান তা আলোচনা করা হলো :

১. **ভারসাম্যহীন বাণিজ্য :** দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার ভারত। ঘাটতি যতই হোক বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি রপ্তানি করে থাকে এ দেশটির সাথেই। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও বাস্তবতা একই। অর্থাৎ ভারতের সাথে সবার যত ব্যবসা হয়, এ অঞ্চলের আর কারো সাথেই ততটা হয় না। ভারতের কেন্দ্রীয় অবস্থান ও বিশালত্বের কারণে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আয়তন, বাজারের আকার আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাপকাঠিতে বিচার করলে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তান, নেপাল বা শ্রীলঙ্কার যত বাণিজ্য হওয়ার কথা— হচ্ছে তার চেয়েও কম। এ অঞ্চলে বাণিজ্য সম্প্রসারণে একেও একটি বড় সমস্যা হিসেবে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

২. **রাজনৈতিক অনীহা :** দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে ধরা হয় রাজনীতিকে। বরাবরই রাজনৈতিক দূরত্ব এ অঞ্চলে সমস্যা সমাধানের পেছনে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। আর বাণিজ্যে এ অচলাবস্থার জন্য দায়ী রাজনৈতিক মানসিকতা, বছরের পর বছর ধরে একে অপরকে ছাড় না দেয়ার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তাকে বদলাতে হবে সবার আগে। তাহলেই কেবল এ অঞ্চলের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের সব বাধা দূর হবে। সার্ক একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

৩. **যোগাযোগ সমস্যা :** শুধু পারস্পরিক অবিশ্বাস বা মানসিক দূরত্ব নয়, এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো আন্তঃযোগাযোগ কাঠামো। বাংলাদেশের সাথে ভারতের যোগাযোগ যতটা সহজ বা উন্নত, আর কোনো দেশের সাথে ততটা নয়। আবার যোগাযোগ ভালো হলেও এক দেশের নাগরিককে আরেক দেশের ভিসা পেতে হলে যতটা বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় এমন নজির বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই নেই।

৪. **পারস্পরিক সংঘাত :** সার্ক গঠন করা হয়েছিল আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার জন্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো আঞ্চলিক সহযোগিতা উপেক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে– যৌথ উদ্যোগ, অথচ এক দেশ অপর দেশের ক্ষতি করে চলেছে। যেমন ১৯৯১ সালে ভারত ও নেপালের সাথে পানিসম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক নেপালে ৪টি নদীতে স্টোরেজ ড্যাম নির্মাণ করা হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। কেননা এসব নদী শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় গঙ্গায় মোট প্রবাহের ৫৬ শতাংশ প্রদান করে। ভুটানের বিভিন্ন নদীতে ভারত চুক্তি মোতাবেক ড্যাম নির্মাণ করেছে। এসব ড্যাম বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়া ভারত গঙ্গার পানি চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশকে তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করছে।

৫. **আঞ্চলিক সহযোগিতা উপেক্ষিত :** সার্ক গঠিত হয় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার জন্য। সার্ক সম্মেলনেও আঞ্চলিক সহযোগিতার ভালো ভালো কথা বলা হয়। কিন্তু সার্ক সদস্যসমূহ তার বৈদেশিক নীতিতে দ্বিপাক্ষিকতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। যে কারণে আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি শক্তিশালী হচ্ছে না। ভারতকে বাংলাদেশ ট্রানজিট সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছে। আগরতলা পোর্ট এখন ভারত ব্যবহার করবে। কিন্তু নেপাল ও ভুটানকে ভারত ট্রানজিট সুবিধা দেবে না।

৬. **সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা :** ২০০৬ সালকে সার্ক পর্যটন বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভিসা প্রথা তুলে দেয়ার যে দাবি, তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এ অঞ্চলে পর্যটন শিল্পেরও বিকাশ হয় নি। ২০০৭ সালকে সবুজ দক্ষিণ এশিয়া বছর তথা বনায়ন তৎপরতার সাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বনায়নে খুব যে অগ্রগতি হয়েছে, তা বলা যাবে না। ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে সার্ক দারিদ্র্য বিমোচন দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের দারিদ্র্য কমেনি, বরং বেড়েছে। ভারতে ৪১ কোটি দরিদ্র লোক রয়েছে। ২০০৪ সালে জনসংখ্যার ২৭.৫ শতাংশ ছিল দরিদ্র। ২০১০ সালে এ সংখ্যা ৩৭.০২ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আকার বড় হচ্ছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৩০ লাখ। খাদ্য কিনতে পারে না, এমন হতদরিদ্র ও গরীবের সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে ১০ লাখ করে। সার্ক ঘোষিত দারিদ্র্য বিমোচন দশক ব্যর্থ হয়েছে। এর মূলে রয়েছে সার্কের এ ব্যাপারে উদ্যোগহীনতা। একটা সার্ক ডেভেলপমেন্ট গোলস এর কথা বলা হলেও তা কাগজে কলমেই রয়ে গেছে।

২০০২ সালে ১১তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন বা এসএইউ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোনো রোডম্যাপ উপস্থাপন করা হয়নি। কেটে গেছে আরো ৮ বছর। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আসিয়ান ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিট এখন আফ্রিকান ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। সুতরাং দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন কোনো অমূলক ধারণা নয়। এটা বাস্তব। কিন্তু সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যদি বিরোধ অবস্থার অভাব কিংবা কোনো একটি বড় দেশের কর্তৃত্ব করার প্রবণতা থাকে, তাহলে জোট ঠিকমতো বিকশিত হয় না। সার্কের ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে।

সার্কের কলম্বো সম্মেলনে একটি ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু তা কাগজে-কলমেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ অঞ্চল, বিশেষ করে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত এলাকা। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো সুযোগ সার্কে নেই। বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের হার কমানোর ব্যাপারে একটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ কার্বন নিঃসরণ বেড়ে যাওয়ায়। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ যার একটা অংশ আগামীতে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। থিম্পু সম্মেলনে কার্বন নিঃসরণের হার কমানোর ব্যাপারে আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা সংবলিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

৭. **আস্থার সঙ্কট :** আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি কখনোই একতরফাভাবে দেখা ঠিক নয়। কিন্তু সার্কের ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে। এখানে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও আস্থার সংকট এত বেশি যে সংস্থাটি গেল ২৮ বছরেও একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। শুধু সম্মেলন এলেই ভালো ভালো কথা বলা হয়। ভালো ভালো সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেসব সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্যকর হয়েছে কিংবা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, তা কখনোই দেখা হয় না। তাছাড়া পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র ভারতের রয়েছে মোড়লিপনা করার শখ, যা সার্কের ব্যর্থতার ষোলকলা পূর্ণ করে দিচ্ছে।

১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ২০১১ : সেতুবন্ধ রচনা

২০১১ সালের ১০-১১ নভেম্বর ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মালদ্বীপের আদ্দু শহরে। এ সম্মেলনে ৪টি চুক্তিসহ ২০ দফা আদ্দু ঘোষণা করা হয়।

এক সার্ক এক ভিসা : ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি দৃঢ়করণের লক্ষ্যে সার্কের দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ভিসা পদ্ধতি তুলে নিয়ে 'এক সার্ক এক ভিসা' নামের একটি পরিকল্পনা পেশ করে পাকিস্তান।

৪ চুক্তি স্বাক্ষর : ১১ নভেম্বর ২০১১ আটটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এগুলো হলো—সার্ক এগ্রিমেন্ট অন র‍্যাপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিজাস্টারস ⊙ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন মাল্টিল্যাটেরাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিকগনিশন অব কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট ⊙ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ইমপ্লিমেনটেশন অব রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস ⊙ সার্ক সিড ব্যাংক এগ্রিমেন্ট।

১৮তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৪ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর সার্কের ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের শেষ দিনে ২৭ নভেম্বর ২০১৪ 'সার্ক ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ফর এনার্জি কো-অপরারেশন (ইলেকট্রিসিটি)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে ৩৬ দফা কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী ১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০১৬ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে।

সার্ককে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে। সার্ক শীর্ষ সম্মেলন যেন এক ধরনের উৎসব। সেখানকার জমকালো আয়োজনে যোগদেন নেতারা। তাদের বক্তব্যগুলো দেশী-বিদেশী মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হয়। এতে নেতাদের ইমেজ বাড়ে। ফলে এ আয়োজন এতদিন শুধু অকার্যকরই হয়নি, কখনো কখনো উল্টো ফলও বয়ে এনেছে। নেপালে সার্ক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ দেয়া হয়নি, নেই জনবলও। নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সার্ককে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃঢ় প্রত্যয় এবং অব্যাহত চেষ্টাই কেবল পারে সার্ককে গ্রহণযোগ্য, কার্যকর সংস্থায় পরিণত করতে। আমরা আশাকরি, সার্ক এ এলাকার জনগণের জন্য আশা ও শক্তির বাণী নিয়ে আসবে।

১১। ক. বিমসটেক (BIMSTEC) কি?

খ. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন হিসেবে বিমসটেকের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর থেকে বিশ্ব রাজনীতি মূলত আমেরিকা নির্ভর হয়ে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে এটা আরও সহজ হয়ে পড়ে। ফলে আমেরিকা ছোটখাটো অনেক বিষয়ে যেমন হস্তক্ষেপ করা শুরু করে, তেমনি বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিগুলোর Check and Balanceও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য আমেরিকা নির্দেশিত 'গাইডলাইন' অনুসরণ করা অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নিজস্ব স্বার্থরক্ষা এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এছাড়াও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা এবং প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য আঞ্চলিক জোটগুলোই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই বিভিন্ন সময়ে গঠিত আসিয়ান, অ্যাপেক, সার্ক প্রভৃতি আঞ্চলিক সংস্থার মতোই ৬ জুন ১৯৯৭ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে BIMSTEC।

BIMSTEC

বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় বিমসটেকের। তখন চারটি দেশের নামের ইংরেজি বানানের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা Economic Cooperation (EC) যোগ করে সংস্থার নামকরণ করা হয় বিসটেক বা BISTEC (Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation)। পরে ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর মিয়ানমার এ সংস্থায় যোগদান করায় নামকরণ করা হয় বিমসটেক বা BIMST-EC অর্থাৎ Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation. ২০০৩ সালে নেপাল ও ভুটান যোগদান করলে ২০০৪ সালের ৩১ জুলাই বিমসটেকের নামকরণ করা হয় Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation.

সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা : বিমসটেকের সদস্যপদ লাভ করতে হলে কতিপয় যোগ্যতা বা সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. আঞ্চলিক অবস্থানগত সুবিধা থাকতে হবে,
খ. বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ও পরিবহনের যোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে;
গ. চেয়ারম্যানের বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে।
ঘ. সদস্যদের অনুমোদনক্রমে নতুন কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

বিমসটেকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : বিমসটেকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

১. জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য, পর্যটন, বিনিয়োগ, শিল্প, প্রযুক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, জ্বালানি ও অবকাঠামো নির্মাণে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষা করবে।

২. সার্বভৌমত্ব, সমতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (Reciprocal co-existence) ও পারস্পরিক কল্যাণ নীতির প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে জোটভুক্ত দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করবে।

৩. এছাড়াও সাম্প্রতিক সম্মেলনে সাত জাতির নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস, এইচআইভি/এইডস, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

সহযোগিতার ক্ষেত্র : ১৪টি। এগুলো হচ্ছে : বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, জ্বালানি, জলবায়ু, পরিবহন ও যোগাযোগ, পর্যটন, মৎস্য, কৃষি, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সন্ত্রাসবাদ দমন ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ।

৩১ জুলাই ২০০৪ সরকারপ্রধানদের নিয়ে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে বিমসটেকের সহযোগিতার ক্ষেত্র ৬টি খাতে বিভক্ত করে ৩ বছরের জন্য বিভিন্ন দেশকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ— বাংলাদেশ, টেকনোলজি— শ্রীলঙ্কা, পরিবহন ও যোগাযোগ— ভারত, এনার্জি— মিয়ানমার, পর্যটন— ভারত, ফিশারিজ— থাইল্যান্ড। ২০০৪ সালের শীর্ষ সম্মেলনে বার বার আলোচিত হয়েছে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Area বা FTA), Visit BIMSTEC Year 2004 প্রভৃতি বিষয়ে। বিমসটেক সামিট ডিক্লারেশনেও দেশগুলোর ঐক্যের কথা বলা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৩ নভেম্বর ২০০৮ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিমসটেক শীর্ষ

সম্মেলন। সম্মেলনে বাংলাদেশ বিমসটেকের স্থায়ী সদর দপ্তর ঢাকায় স্থাপন এবং ১৪তম ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১-৪ মার্চ ২০১৪ মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে অনুষ্ঠিত হয় চারদিনব্যাপী বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট বা বিমসটেক সম্মেলন। প্রথম তিনদিন জোটভুক্ত দেশসমূহের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে ৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বিমসটেকভুক্ত দেশসমূহে উন্নয়নের নব দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। নাইপিদোতে অনুষ্ঠিত বিমসটেক সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি বিমসটেক গঠনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে এ আয়োজনে।

তৃতীয় বিমসটেক সম্মেলনের শেষ দিনে ৪ মার্চ ২০১৪ তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ— ১. ঢাকায় বিমসটেকের সদর দপ্তর স্থাপন, ২. ভারতে বিমসটেক আবহাওয়া ও জলবায়ু কেন্দ্র চালু এবং ৩. ভুটানে সংস্কৃতি কমিশন ও সংস্কৃতিবিষয়ক মানমন্দির চালু।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে BIMSTEC

BIMSTEC একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। নিচে অর্থনৈতিক উন্নয়নে BIMSTEC-এর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনীতি :** BIMSTEC গত সাত বছর ধরে চলছে ধীর গতিতে। কিন্তু আসিয়ানের চিত্র আলাদা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আসিয়ান জোটের প্রতিটি সদস্য দেশ প্রতিনিয়ত উন্নতি লাভ করছে। ১৯৯৫ সালে ভিয়েতনামকে আসিয়ানের সদস্যপদ দেয়া হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসিত এ দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে জোটের অপর দেশগুলোর কোনো মিলই নেই। অর্থনীতিকে তারা রাজনৈতিক ইস্যুর সাথে মিলাতে চায় না বলেই সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে। বিমসটেককে শক্তিশালী করতে আসিয়ানের এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। বিমসটেকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে তৎকালীন থাই প্রধানমন্ত্রী ড. থাকসিন সিনাওয়াত্রা বলেন, ১৯৯৭ সালে যখন সংস্থাটি গঠিত হয় তখন এশিয়ায় চলছিল বড় ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্কট, যা সারা বিশ্বকেই আন্দোলিত করেছিল। এ সময়টাকে উত্তরণের জন্য তথাকথিত ওয়াশিংটনভিত্তিক ব্লুপ্রিন্ট চাপিয়ে দেয়া হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এবং পাশাপাশি যেসব দেশ অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাতে চেষ্টা করবে তাদের উপর। ছয় বছর পর এই অবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। অর্থনীতির গতি পরিবর্তিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তার অর্থনৈতিক সঙ্কট এখন প্রায় কাটিয়ে উঠেছে। কঠিন পথে চলে আমরা শিখেছি Common Economic System সবসময় সঠিক নয়। এর বদলে স্ব সাহায্য এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমঝোতাপূর্ণ সহযোগিতা এ অস্থির সময়েও গুরুত্বপূর্ণ। এ সহযোগিতার জন্যই বিমসটেক বিভিন্ন উপখাত চিহ্নিত করেছে এবং এসব উপখাতের জন্য বিভিন্ন দেশকে দায়িত্ব প্রদান করেছে।

উপখাত	দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশ
বস্ত্র ও পোশাক	*বাংলাদেশ*
ওষুধ ও ওষুধ শিল্প	*ভারত*
রত্ন ও অলংকার	*শ্রীলঙ্কা*
উদ্যান	*থাইল্যান্ড*
প্রক্রিয়াজাত খাদ্য	*শ্রীলঙ্কা*
স্বয়ংক্রিয় শিল্প কারখানা ও যন্ত্রাংশ	*থাইল্যান্ড*
নারকেল ও মসলা	*ভারত*

২. **বাণিজ্য ও বিনিয়োগ :** বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ বা ১৪০ কোটি জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়, সম্পদগুলোকে একত্রিত করা এবং প্রচেষ্টাগুলোকে সমন্বিত করা প্রয়োজন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্যিক এলাকা চুক্তি (সাফটা) এবং বিমসটেক অবাধ বাণিজ্য এলাকা সংক্রান্ত কাঠামোগত চুক্তি সম্পাদনের ফলে উক্ত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের গুরুত্ব বাড়বে। বিমসটেক জোটে সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশ ছাড়াও রয়েছে থাইল্যান্ড, মিয়ানমারের মতো দেশ, যা বিমসটেকের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মিয়ানমারে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার ভালো। এই নিকট প্রতিবেশী দেশে আমাদের বাণিজ্য বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। তাছাড়া বিমসটেকভুক্ত সাতটি দেশের মিলিত আয়তন ৫০ লাখ বর্গ কি.মি. এবং এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা ১৪০ কোটি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পরিমাণ মাত্র ৭৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা তাদের মোট বাণিজ্যের চারভাগ। গত বছরের শেষার্ধে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ছিল ৭.৮ শতাংশ। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩ শতাংশ স্থির করা হয়েছে। যে দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি আমাদের চেয়ে মজবুত তাদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আমরাও আমাদের দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারি।

বিমসটেকের ১২ বছরের ইতিহাসে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের উপস্থিতিতে দুটি শীর্ষ সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হয়। এ উভয় সম্মেলনেই বাণিজ্যের পরেই সদস্য দেশগুলোর প্রতি বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে থাইল্যান্ডের বিনিয়োগ ও কারিগরি সহযোগিতা এখন অনেক বেড়েছে। ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের জন্য থাইল্যান্ডের নির্মাণ সহযোগিতা ও বিনিয়োগ প্রস্তাবটির কথাও এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। এ দুটি দেশের সঙ্গে মৈত্রীর বন্দন সুদৃঢ় করে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর উন্নয়ন করাও সম্ভব। এ কথা কারও অজানা নয় যে, আসিয়ানভুক্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করছে। তারা বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বিমসটেক জোটের পথ ধরে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশও গড়ে তুলতে পারে বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা, বাণিজ্য সম্পর্কসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ফলদায়ক সম্পর্ক। বিমসটেক হয়ে উঠতে পারে সার্ক ও আসিয়ানের মধ্যে সেতুবন্ধন।

৩. **প্রযুক্তি খাত :** বিমসটেকের ১৪টি সহযোগিতা খাতের মধ্যে প্রযুক্তি খাতটি অন্যতম। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র যথেষ্ট অগ্রসর। এর ফলে তাদের বৈষয়িক অগ্রগতিও আশাতীত। বাংলাদেশসহ বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করে সবেমাত্র প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদচারণা শুরু করেছে। আজ পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ রুগ্নশিল্প রূপে চিহ্নিত হচ্ছে। কারণ পুরাতন শিল্প যদি প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তবে প্রতিটি সদস্য দেশের রুগ্নশিল্পের তালিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে সন্দেহ নেই। এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে BIMSTEC প্রযুক্তিকে দুটি উপখাতে ভাগ করেছে এবং এ উপখাত দুটির দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। উপখাত দুটি হলো : ক. প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং খ. তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী ও পরিসেবা।

৪. **শক্তি (Energy) :** BIMSTEC ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যথেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পাথর প্রভৃতি যথেষ্ট রয়েছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি, গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ১৫.৩৩ বিলিয়ন কিলোওয়াট। ভারতেও গ্যাস, কয়লা, লোহা, তেল, পাথর প্রভৃতি সম্পদ রয়েছে এবং বৈদ্যুতিক উৎপাদন ৫৩৩.৩৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট। শ্রীলঙ্কায় উন্নতমানের চুনাপাথর রয়েছে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ৬.৩৬ বিলিয়ন কিলোওয়াট। নেপালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.৭৬ বিলিয়ন কিলোওয়াট এবং ভুটানে প্রাকৃতিক সম্পদ হলো কাঠ, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.৯ বিলিয়ন কিলোওয়াট। মিয়ানমারের প্রাকৃতিক সম্পদ তেল, কয়লা, সিসা, টিন, জিংক ইত্যাদি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৬.১৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট। থাইল্যান্ডে রাবার, গ্যাস, কাঠ, সিসা, তেল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.৭৬ বিলিয়ন কিলোওয়াট। তাই বলা যায়, বিমসটেক সদস্যভুক্ত দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এদিকে ইঙ্গিত করে বিমসটেক শক্তিকে চারটি উপখাতে ভাগ করেছে : ক. প্রাকৃতিক গ্যাস, খ. বায়ু, গ. সৌর এবং ঘ. পানি/স্রোত তরঙ্গ। শক্তিখাতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য Action Plan তৈরির দায়িত্ব পায় মিয়ানমার। শক্তিখাতে অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব পায় থাইল্যান্ড এবং শক্তিখাতে প্রজেক্টগুলো নবায়নের উৎস বের করা ও স্থাপনের দায়িত্ব পায় ভারত। মূলত এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করে এবং প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য আঞ্চলিক জোটগুলোই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক জোট গড়ে উঠেছে এবং প্রত্যাশিত সাফল্যও অর্জন করেছে। আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো কাটিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে দেখা যায় বিমসটেকভুক্ত পাঁচটি দেশের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। এ কারণেই বিমসটেকের নতুন অর্থ Bay of Bengal করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যদিও নেপাল ও ভুটান বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে অবস্থানগত দিক দিয়ে সম্পৃক্ত নয় তবুও সমুদ্র বাণিজ্য এবং বন্দরের সুষ্ঠু ব্যবহার বিমসটেকের সামনে নতুন দিক খুলে দিতে পারে। আর এভাবেই আমরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতা পাওয়ার আশা করতে পারি।

১২। ক. পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ন্যাটো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
খ. এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিয়ে ন্যাটোর একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরুন।

উত্তর : বর্তমান দ্রুত বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তনের যুগে ন্যাটো (NATO) একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক জোট হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতিসংঘের পর পূর্ব ইউরোপে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ধর্মীয় ও জাতিগত দাঙ্গার মোকাবিলায় ন্যাটো অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বসনিয়া, আলবেনিয়া, কসোভো প্রভৃতি দেশে ন্যাটোর উপস্থিতি সে কথাই প্রমাণ করে। এ প্রেক্ষাপটে ন্যাটোকে শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে এর সম্প্রসারণও ঘটানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। ন্যাটোর সদস্য এখন ১২ থেকে ২৮-এ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পরিবর্তিত বিশ্বে ন্যাটোকে আজ একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ জোট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ব্রাসেলস চুক্তি স্বাক্ষর করে। তারই ফল হিসেবে গড়ে ওঠে NATO (North Atlantic Treaty Organization) বা উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা। NATO মূলত সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক আগ্রাসন মোকাবিলার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা একটি সামরিক জোট। ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ব্রাসেলসে পশ্চিম ইউরোপীয় ১০টি দেশ তথা ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ২টি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা (১২টি দেশ) ১৪টি শর্ত সম্বলিত একটি যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার ভিত্তিতে ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন বছর পর ১৯৫২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি গ্রিস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৫ সালের ৯ মে পশ্চিম জার্মানি (বর্তমান জার্মানি), ১৯৮২ সালের ৩০ মে স্পেন এ সংস্থায় যোগদান করে। ১৯৬৬ সালে জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্স ন্যাটোর সামরিক সংগঠন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও ২ এপ্রিল ২০০৯ আবার ফিরে আসে। সদস্য সংখ্যা ১৬-তে উন্নীত হওয়ার পর এ সংস্থার সম্প্রসারণ দীর্ঘ সাড়ে চার দশক কাল বন্ধ ছিল। এরপর ১৯৯৯ সালের ১২ মার্চ সাবেক ওয়ারশভুক্ত চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড সদস্যপদ লাভ করায় ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা ১৯-এ উন্নীত হয়। ২০০৪ সালের ২৯ মার্চ পূর্ব ইউরোপের সাতটি সাবেক কমিউনিস্ট দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাটোতে যোগদান করায় এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টিতে। ৭টি দেশ হলো বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়া। ২০০৯ সালে আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া সদস্যপদ লাভ করে। ১ এপ্রিল ২০০৯ আলবেনিয়া (২৭তম) ও ক্রোয়েশিয়া (২৮তম) সদস্য হিসেবে যোগদান করে। সদস্য প্রত্যাশী দেশ মেসিডোনিয়া, জর্জিয়া, মন্টিনিগ্রো, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ইউক্রেন প্রভৃতি। ন্যাটোর পূর্বমুখীনতাকে রোধ করতে না পেরে ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল অংশ রাশিয়া প্রথমে পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ২০০২ সালের ২৮ মে ন্যাটো-রাশিয়া সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এর সহযোগী সদস্য দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে এ সংস্থার সদর দপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ছিল। অতঃপর ১৯৬৬-তে প্যারিস থেকে ব্রাসেলসে স্থানান্তরিত হয়। ন্যাটোর বর্তমান মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ (নরওয়ে) ১ অক্টোবর ২০১৪-বর্তমান।

ন্যাটোর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা : NATO-তে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ১৪টি শর্তের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে। এ শর্তগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাদের ৫টি নীতিমালা হচ্ছে :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করা।

২. জোটের সদস্য রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা দ্বারা সকলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যত্নবান হবেন।

৩. সদস্য দেশসমূহের কোনো একটি দেশ যদি অন্য কোনো দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে অপরাপর সকল দেশ নিজ রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে এবং যৌথভাবে তা প্রতিহত করার চেষ্টা চালাবে।

৪. সদস্য দেশসমূহ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সকল ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করবে এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করবে।

৫. যে কোনো রাষ্ট্র সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে এ সংস্থায় যোগদান করতে পারবে এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : ন্যাটোর রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বেশ জটিল ও বহুমুখী। এটি একটি পরিষদ, তিনটি কম্যান্ড এবং একটি প্ল্যানিং গ্রুপ নিয়ে গঠিত। জোটের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলো সকল সদস্য সমন্বয়ে গঠিত North Atlantic Council. এরা মন্ত্রী বা স্থায়ী প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠকে মিলিত হন। ন্যাটোর মহাসচিব কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। সদস্য দেশের মধ্য থেকে ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া রয়েছে রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটি, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কমিটি, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কমিটি ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা কমিটি। এছাড়া সকল সদস্য দেশের Chief of Staff বা তাদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছে ন্যাটোর সর্বোচ্চ সামরিক সংস্থা। এর প্রধান হচ্ছেন ইউরোপীয় সামরিক কমিটির সর্বাধিনায়ক। তারা বছরে দু বার মিলিত হন এবং কাউন্সিল ও প্লানিং কমিটিতে সামরিক সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকেন। এ সংস্থার অধীনেই বিভিন্ন দেশে ন্যাটো বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে এ সংস্থার পরিচালনাধীনে পশ্চিম ইউরোপে ১৪টি ডিভিশন রাখা হয়েছে। এ সংস্থার মোট খরচের প্রায় ৮০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র বহন করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র যেসব সুবিধা ভোগ করছে :

ক. ইউরোপের ওপর তার সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে প্রয়াস পাচ্ছে।

খ. পূর্ব ইউরোপে NATO সম্প্রসারিত হওয়ায় রাশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পাচ্ছে।

গ. ভবিষ্যতে জার্মানির সামরিক উত্থান NATO-র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মোকাবিলা করতে পারবে।

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র NATO-র মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ন্যাটো টিকে থাকার যৌক্তিকতা

প্রথমত, সমাজতন্ত্রের পতন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া সামরিক দিক দিয়ে এখনো বেশ শক্তিশালী। বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য মরণাস্ত্র এখনো রাশিয়ার কাছে মজুদ রয়েছে। তাছাড়া পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার আধিপত্যও কম নয়। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে যে কোনো সময়ে রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। আর ন্যাটো এ ভবিষ্যৎ হুমকির মোকাবিলায় একটি নিবারক শক্তি।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইউরোপে খুব দ্রুত পরিবর্তনের সুযোগে বিভিন্ন দেশে ধর্মীয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী, জাতিগত ও আঞ্চলিক কারণে নানা বিবাদ, ঝুঁকি ও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙন, বসনিয়ায় আগ্রাসন, কসোভোয় মুসলিম নিধন, আলবেনিয়ায় রাজনৈতিক দাঙ্গা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এ সকল ক্ষুদ্র ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা যে কোনো সময় পশ্চিমা সমাজ তথা বিশ্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। ন্যাটোর মাধ্যমে এসব অস্থিরতার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দিতে পারে।

তৃতীয়ত, দুই জার্মানির একত্রীকরণের ফলে বর্তমান বিশ্বে জার্মানি অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর ফলে অচিরেই সামরিক দিক দিয়েও দেশটি পরাশক্তির পর্যায়ে চলে আসতে পারে। অথচ দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধের হোতা এ জার্মানি। তাই স্বাভাবিকভাবে জার্মানির অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এখন পশ্চিমাদের কাছে ভীতির কারণ। তাই জার্মানির শক্তিকে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে ন্যাটো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চতুর্থত, ন্যাটোর বাইরের এলাকায়ও বর্তমানে নতুন নতুন হুমকির আবির্ভাব হচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য মারণাস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব, মাদক ব্যবসা, পরিবেশগত সমস্যা, তৃতীয় বিশ্বের হাতে অস্ত্রপ্রযুক্তি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কাঠামোর প্রতি এক বিরাট ভবিষ্যৎ হুমকি। এসব ভবিষ্যৎ হুমকি মোকাবিলা করার জন্য ন্যাটো বিশেষ সহায়ক হতে পারে। যেমন– ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনী (ISAF)-এর অধীনে ন্যাটো আফগানিস্তানে নেতৃত্ব দিয়েছে।

পঞ্চমত, ন্যাটো গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে একে একটি ক্ষমতার জোট হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে সদস্য দেশগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারে। এটি একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া। আর বর্তমান স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে ন্যাটোর সম্প্রসারণ সে কথারই প্রমাণ বহন করে। Michal Howara-এর মতে, আটলান্টিক জোট অস্থায়ী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়নি, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী Super-National Community হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য সদস্য নিয়ন্ত্রণ নয়, সদস্য বৃদ্ধি। ন্যাটোর এ উদ্দেশ্যের মধ্যেই ন্যাটো টিকে থাকার যৌক্তিকতা পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, বিশ্বে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য অঞ্চলে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার অনস্বীকার্য। আর ইউরোপের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে ন্যাটো। এ জোটের মাধ্যমে ইউরোপে মার্কিনের পক্ষে সৈন্য মোতায়েন ও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে। ন্যাটো টিকে না থাকলে ইউরোপে মার্কিন প্রভাব খর্ব হবে এবং সেক্ষেত্রে ইউরোপ বিশ্বে মার্কিন নেতৃত্ব মোকাবিলা করতে পারে।

সপ্তমত, বর্তমান বিশ্বে ইউরোপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে ন্যাটোর ভূমিকা এর টিকে থাকার যৌক্তিকতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। বসনিয়ায় শান্তি চুক্তি ও কসোভোতে সামরিক আগ্রাসন মোকাবিলায় ন্যাটোর উপস্থিতি ও ভূমিকা এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছে। সে কারণে রাশিয়ার অব্যাহত বিরোধিতাও এখন আর এত তীব্র নয়। সুতরাং ন্যাটো এখনো টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে বলে আশা করা যায়।

ন্যাটোর সম্প্রসারণ : বিগত ছয় দশকে ন্যাটো অনেক দূর এগিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর কেউ কেউ বলেছিলেন যে, এখন কোনো হুমকি নেই, তবু আমাদের ন্যাটোর দরকার কেন? ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কেন প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা উচিত? কিন্তু এখনো ন্যাটোর দরকার। কারণ ন্যাটো ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। বিগত ছয় দশক ধরে ন্যাটো একটি বিভক্ত ও স্থিতিহীন বিশ্বে স্থিতিশীলতার পক্ষে সমন্বয়কারী শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র এখনো ন্যাটোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিপন্ন। যখন ইউরোপ নিরাপদ, তখন যুক্তরাষ্ট্রও নিরাপদ। সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী মিত্র ও সহযোগীদের সঙ্গে বসনিয়ায় শান্তি টিকে থাকার একটি সুযোগ দেয়ার জন্য কাজ করছে। সে কারণেই আমেরিকা একবিংশ শতাব্দীর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় একটি নতুন ন্যাটো গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ন্যাটোর সম্প্রসারণ কেন প্রয়োজন?

প্রথমত, ন্যাটোর সম্প্রসারণ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোটকে শক্তিশালী করবে। এককভাবে প্রতিরক্ষার চেয়ে যৌথ প্রতিরক্ষা ভালো। ন্যাটোর সম্প্রসারণের অর্থ সমমনা রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতার সম্প্রসারণ, যারা জাতিগত সংঘাত, আঞ্চলিক আগ্রাসন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের প্রসারসহ নতুন বিশ্বে হুমকি থেকে একে অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ন্যাটোর সামরিক ক্ষমতাকে খর্ব করবে কিনা কেউ কেউ এ প্রশ্ন তুললেও ন্যাটোর প্রত্যেকটি নতুন সদস্য কেবল নিরাপত্তা ভোগ করবে না, এক্ষেত্রে অবদানও রাখবে। এর অর্থ হলো তাদের বাহিনীগুলো ন্যাটোর বাহিনীগুলোর পাশাপাশি যুদ্ধ করতে এবং ন্যাটোর ভূখণ্ড রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত, ন্যাটোর সম্প্রসারণ ইউরোপে গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক সুফলগুলো রক্ষায় সহায়ক হবে। ন্যাটোর সদস্যপদ নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে একবিংশ শতাব্দীতে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার ব্যাপারে নিরাপত্তা দেবে, যেমন অতীতে ন্যাটোর সদস্য পদ জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের মতো পশ্চিম ইউরোপীয় দেশকে তাদের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ও সুসংহত করার ব্যাপারে নিরাপত্তা যুগিয়েছিল।

তৃতীয়ত, ন্যাটোর সম্প্রসারণ সম্ভাব্য দেশগুলোকে তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণ নিরসনে উৎসাহিত করবে। অতীতে ন্যাটোর সদস্যপদ ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে এবং গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে সহায়তা করেছে। বর্তমানে ন্যাটোর খোলা দুয়ার নীতি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে তাদের বিগত দিনের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে, স্থিতিশীল সীমান্ত নিশ্চিত করতে, সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে, জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে তাদের অভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে কয়েকটি নজিরবিহীন চুক্তি সম্পাদনে জোরালো প্রেরণা যুগিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৪ সালের পোল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া চুক্তি, ১৯৯৬ সালের হাঙ্গেরি-স্লোভাকিয়া চুক্তি, পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি এবং ১৯৯৬ সালের হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার মধ্যকার চুক্তি।

চতুর্থত, স্নায়ুযুদ্ধের সময় যে কৃত্রিম রেখা ইউরোপ মহাদেশকে বিভক্ত করে রেখেছিল, ন্যাটোর সম্প্রসারণ সেটাকে মুছে দেবে। ন্যাটোর সদস্যপদের সম্ভাবনা হচ্ছে একটি চুম্বকের মতো যেটা দেশগুলোকে আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলবে। পার্টনারশিপ ফর পিস, ইউরোপ-আটলান্টিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল এবং ন্যাটো-রাশিয়া ফাউন্ডিং অ্যাক্ট-এর সাথে ন্যাটোর সম্প্রসারণ রাজধানীগুলোর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা, সামরিক বাহিনীগুলোর একত্রে মিলিত হওয়া এবং পার্থক্য ঘুচিয়ে আনার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখছে। কেবল ইউরোপীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা, পরামর্শ এবং দরকষাকষির মাধ্যমেই মানসিক বিভক্তি রেখা মুছে গেছে আর ক্রমবর্ধমান আস্থা, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বিভক্তি রেখার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

ন্যাটোর ভবিষ্যৎ : মধ্য ইউরোপের দেশগুলোকে ন্যাটোভুক্ত করে নেয়ার পরবর্তী পর্যায়ে আরো পূর্বের শ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, স্লোভেনিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া, ও লাটভিয়াকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ সম্প্রসারিত সামরিক জোটের লক্ষ্য কি হবে? এ প্রসঙ্গে তিনটি সম্ভাব্য জবাবের কথা বলা হয়। এক. রাশিয়া যদি আবার কখনো সম্প্রসারণবাদী রূপ ধারণ করে তবে তাকে প্রতিহত করা, দুই. ইউরোপীয় অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করা, তিন. আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরণের জন্য শান্তিরক্ষী মিশন সংগঠিত করা। কিন্তু সম্ভাব্য এ লক্ষ্যগুলো নিয়ে ন্যাটোর বর্তমান সদস্যপদের মধ্যেই মতৈক্য নেই। এখন পর্যন্ত এটুকু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, শিগগিরই এমন কিছু দেশ ন্যাটোর সদস্য হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যই এ জোটের জন্ম হয়েছিল। তবে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বাস্তব হয়ে ওঠার পরেও ইউরোপে এমনকি খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও সম্প্রসারণ প্রশ্নে পূর্বের মতো বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রসারণের বিরোধীদের মতে, এর ফলে রাশিয়ার কট্টর জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে এবং এরা শক্তিশালী হলে ইউরোপ পুনরায় প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় নিপাতিত হতে পারে। অপরদিকে ন্যাটো সম্প্রসারণের পক্ষে যারা, তারা এরূপ আশঙ্কা অমূলক বলেছেন। কেননা ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি এবং ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী পরিস্থিতি কোনোক্রমেই এক নয়। ঠাণ্ডা লড়াইকালে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ ছিল আদর্শগত। এখন এ আদর্শগত দ্বন্দ্বের বিলুপ্তির পর স্বভাবতই প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যকার ঐতিহ্যগত বা জাতিগত দ্বন্দ্ব-বিরোধসমূহ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে পারে। ন্যাটো সম্প্রাসারণের পক্ষে যারা, তাদের মতে, নতুন নতুন দেশ ন্যাটোতে যোগ দিলে এসব বিরোধ চাপা পড়ে যাবে। তারা এমনও ভাবেন যে, একদিন রাশিয়ার এমন রূপান্তর ঘটবে যে, দেশটিকে নির্দ্বিধায় ন্যাটোর অংশ করে নেয়া যাবে। এ বিতর্ক সত্ত্বেও ন্যাটোর সম্প্রসারণ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ফল ইউরোপের জন্য শুভ হবে, না অশুভ হবে তা কেবল সময়ই বলতে পারে।

১৩ । আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় আফ্রিকান ইউনিয়নের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। প্রধানত উন্নত ও অনুন্নত। তৃতীয় বিশ্বের দেশ অর্থনীতির দিক দিয়ে উন্নত বিশ্ব থেকে পশ্চাৎপদ। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ও মোট ভূখণ্ডের অর্ধেকেরও বেশি তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল, সমস্ত আফ্রিকা, চীন ও জাপান ছাড়া গোটা এশিয়া মহাদেশ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ছাড়া গোটা ওশেনিয়া মহাদেশ নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত। যেহেতু পুরো আফ্রিকা মহাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মহাদেশের দেশগুলো অনুন্নত এবং তাদের জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও নয়া উপনিবেশবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির সাহায্যে তাদের উপর ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আফ্রিকার দেশগুলো সাধারণত কৃষি নির্ভর। তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য, কৃষি ও খনিজদ্রব্য রপ্তানির উপর নির্ভরশীল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অজ্ঞাত মহাদেশ আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। ৫৪টি স্বাধীন দেশ যার আয়তন প্রায় ৩ কোটি ৬৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার যা পৃথিবীর মোট আয়তনের ২০ শতাংশ। বিশাল আয়তনের এ আফ্রিকা মহাদেশ বিপুল খনিজ সম্পদে ভরপুর। মানব সভ্যতার বিকাশপর্বে এই মহাদেশের বিস্ময়কর উন্নতির চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু সেই আফ্রিকানরাই আজ সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাদের অগ্রসরতার পথ রোধ করে আছে। গোত্রে গোত্রে নিষ্ঠুর লড়াই, অনৈক্য, সন্ত্রাস পুরো আফ্রিকা মহাদেশে দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করেছে। এ মহাদেশের পশ্চাৎপদতার আরেকটি বড় কারণ বিভিন্ন দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন এবং গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি।

আফ্রিকান ইউনিয়ন

২০০২ সালের ৯ জুলাই ৫৩টি দেশ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আফ্রিকান ইউনিয়ন। পূর্বের আফ্রিকান অর্থনৈতিক সমাজ এবং আফ্রিকান জোট সংস্থা মিলিত হয়ে আফ্রিকান ইউনিয়ন গঠিত হয়। অফিসিয়াল ভাষা আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ, স্পেনিশ, সোহালি এবং অন্যান্য আফ্রিকান ভাষা।

আফ্রিকান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : আফ্রিকার উপনিবেশবাদ খতম করা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটানো এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি যুগ্ম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আফ্রিকান ইউনিয়নের নীতিবাক্য হচ্ছে— a united and strong Africa. সংগীত—Let us all unite and celebrate together.

আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য : আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য ৫৪টি। সদস্য দেশগুলো হচ্ছে— আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বতসোয়ানা, বারকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন কেপভার্দে, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, কমোরোস, কঙ্গো, আইভরি কোস্ট, জিবুতি, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, ঘানা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো, গিনি বিসাউ, কেনিয়া, লেসেথো, মরিশাস, লিবিয়া, লাইবেরিয়া, মালাগাছি, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নাইজার, গিনি, গাম্বিয়া, মালি, ইকুটরিয়েল গিনি, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা,সাওটোম অ্যান্ড প্রিন্সিপে, সেনেগাল, সিচেলেস, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সোয়াজিল্যান্ড,

মালাবি, তাঞ্জানিয়া, মৌরিতানিয়া, পশ্চিম সাহারা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ সুদান। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মরক্কো ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে আফ্রিকান ইউনিয়ন ত্যাগ করে পশ্চিম সাহারা সদস্যপদ লাভের কারণে। তাই আফ্রিকান দেশ হয়েও মরক্কো আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য নয়। AU মিশরের স্থগিতকৃত সদস্যপদ ফিরিয়ে দেয় ১৭ জুন ২০১৪ সালে। সর্বশেষ সদস্যপ্রাপ্ত দক্ষিণ সুদান সদস্যপদ কার্যকর হয় ১৫ আগস্ট ২০১১ সালে।

আফ্রিকান ইউনিয়নের জন্ম প্রেক্ষাপট : অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্য আফ্রিকা মহাদেশের মানুষগুলোকে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে পরিগণিত করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকার মানুষগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Africa for Africans এই স্লোগানটি জোরালো হতে থাকে ফলশ্রুতিতে প্যান আফ্রিকান আন্দোলনের জন্ম হয়। ১৯৬০ সালে আফ্রিকা মহাদেশের ২৫টি দেশ স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ করে। আফ্রিকা মহাদেশ তখনও বিদেশি শাসনের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে ২৫ মে প্যান আফ্রিকান কংগ্রেসের বৈঠক থেকে নতুন একটি সংস্থা আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা বা Organization of African unity (OAU) আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের আন্দোলনকে আফ্রিকার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চায়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সদস্য ছিল ৩২টি। জন্মলগ্ন থেকেই সংস্থাটি বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

i. ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটানো।
ii. আফ্রিকার প্রতিটি দেশে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
iii. আফ্রিকার জনগণের জীবনমান উন্নত করা।
iv. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে স্বীকৃতি জানানো।
v. আফ্রিকার ঐক্য আন্দোলন জোরদার করা।
vi. আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

শ্বেতাঙ্গরা শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যেত কৃষ্ণাঙ্গদের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকার কালো মানুষগুলোকে সৈনিকের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউরোপ আমেরিকা যৌথভাবে আফ্রিকার ওপর দমনপীড়ন চালাতে থাকে। শুধু বর্ণ-বৈষম্যের কারণে আফ্রিকার জনগণকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে এমন কি তাদের নিজেদের দেশেও বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে আন্তঃআফ্রিকার ঐক্যের ভিত্তিতে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার জন্ম। আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা দীর্ঘদিন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করলেও আফ্রিকার প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। তাই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা একত্রিত হয়ে পূর্বের সংস্থাগুলোকে বিলুপ্ত করে আফ্রিকান ইউনিয়নের সৃষ্টি করেন। নতুন উদ্যমে আফ্রিকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় বর্তমান আফ্রিকান ইউনিয়নের। আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া। সংস্থার প্রধান মহাসচিব। বর্তমান ১৩তম মহাসচিব রবার্ট মুগাবে ৩০ জানুয়ারি ২০১৫ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। লিবিয়ার নিহত নেতা গাদ্দাফি এবং ল্যাটিন আমেরিকার পরলোকগত একনায়ক হুগো শাভেজের মতো মুগাবেও সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী, তাই তার চিন্তার প্রতিফলন যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় তবে আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় আফ্রিকান ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আফ্রিকান ইউনিয়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ

২০০১ সালে অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটির বিলুপ্তি সাধানের মধ্য দিয়ে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আফ্রিকান ইউনিয়ন। আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি। অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি সক্রিয় ছিলো পঞ্চাশ বছর। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ইতোমধ্যে আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটির অকার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়ন। অনেকটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে তারা আফ্রিকান ইউনিয়ন পরিচালনা করতে চান। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতোই তারা অ্যাসেম্বলি বা পার্লামেন্ট গঠন করে। তাছাড়া অভিন্ন মুদ্রা চালুর চিন্তাভাবনাও তারা করছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন জিম্বাবুয়ের কর্তৃত্ববাদী প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে। আফ্রিকান ইউনিয়নের আদ্দিস আবাবা সম্মেলনে মৌরিতানিয়ার প্রেসিডেন্ট ওলুদ আবদুল আজিজের স্থলাভিষিক্ত হলেন রবার্ট মুগাবে। লিবিয়ার নিহত নেতা গাদ্দাফি এবং ল্যাটিন আমেরিকার পরলোকগত একনায়ক হুগো শাভেজের মত মুগাবেও সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী। তিনি কোন কিছুতেই ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে আপস করতে চান-না। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বে অবশ্যই আমাদের মিত্র। থাকবে কিন্তু সাম্রজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদী শক্তি কখনই আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আফ্রিকার সম্পদ কেবল আফ্রিকার এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ চলবে না। জিম্বুয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধের গেরিলা নেতা রবার্ট মুগাবে ১৯৮০ সালে দেশটির ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর ৩৪ বছর কেটে গেলেও তিনি দেশটির ক্ষমতায় রয়েছেন বহাল তবিয়তে। অপরদিকে তার অনুসারীরা দেশের ধন-সম্পদ জাতীয়করণের নামে কুক্ষিগত করেছেন। খনিজ সম্পদ, কৃষি খামার ও অন্যান্য সম্পদ দলীয় লোকেরা দখল করে নিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে জিম্বাবুয়ের কৃষি উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান। তাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আফ্রিকান ইউনিয়ন কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো সফল হবে নাকি এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ হবে।

Organizasion of African Union (AU) যাত্রা শুরু করে ৯ জুলাই ২০০২ সালে। তখন থেকে আফ্রিকান ইউনিয়ন নাম নিয়ে অদ্যাবধি চলে আসছে। এ সংস্থাটি আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে বিবর্তন (Evolution) আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিপ্লব (Revolution) চলছে। অস্থির আফ্রিকাকে শান্ত করে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সমুন্নত রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে আফ্রিকান ইউনিয়ন। স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে এইউ এর প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় আফ্রিকান ইউনিয়ন

এইউ এর শীর্ষ বৈঠক এক বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃআফ্রিকার ঐক্যের কথা মাথায় রেখে। আফ্রিকার সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন মাত্রা হলো পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আফ্রিকার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। এখনো বিভিন্ন দেশের গৃহযুদ্ধ, সামরিক শাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জাতি-উপজাতি দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। রোয়ান্ডা, বুরিন্ডির জাতি-উপজাতি দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা স্মরণযোগ্য। সোমালিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ এখনও অশান্ত। কঙ্গো, সুদান গৃহযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিধ্বস্ত। আফ্রিকার প্রায় প্রতিটি দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের দেখা পাওয়া যায়। ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়াতে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে ইবো-হাউসা উপজাতিদের দাঙ্গা আফ্রিকার ইতিহাসে

কালো অধ্যায় (Black Event) হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া জিম্বাবুয়ে, ঘানা, সোমালিয়া, গায়েনা, চাঁদ, লিবিয়া ও মিশরে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে গৃহযুদ্ধ ও জাতিগত ব্যাপক দাঙ্গা হয়েছে। নাইজেরিয়ার ইবো-হাউসা, জিম্বাবুয়ের সোহানা-নিদেবেল এবং রোয়ান্ডা-বুরুন্ডিতে টুটসি-হুটুর উপজাতিদের দাঙ্গায় পাশ্চাত্য দুই বৃহৎ শক্তি রসদ জুগিয়েছে। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ স্বাধীনতার পরও অভ্যন্তরীণ কান্দলে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে, লিবিয়া, মিশর ও অ্যাঙ্গোলা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আফ্রিকান ইউনিয়ন বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের পুনর্গঠন কাজে হাত দিয়েছে। কোনো দেশে যদি অসাংবিধানিক উপায়ে কেউ ক্ষমতা দখল করলে সে দেশের সদস্যপদ বাতিল করা হয়। মাদাগাস্কর ও মালির সদস্যপদও স্থগিত করেছিল আফ্রিকান ইউনিয়ন। শান্তি ও নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান সামিল চেরগুই নাইজেরিয়ার জঙ্গি সংগঠন বোকো হারামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাড়ে সাত হাজার সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। নাইজেরিয়াসহ পাঁচটি (নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, নাইজার চাদ ও বেনিন) দেশে সেনা মোতায়েন আহ্বান করেন তিনি। প্রত্যেকে একটি ব্যাটালিয়ন করে সেনা সহায়তা করবে এবং সমন্বয় হবে চাদের রাজধানী এনজামিনা থেকে। এভাবে দুটি দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তিসহ নানাবিধ জনকল্যাণকর কাজ আফ্রিকান ইউনিয়ন করে থাকে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ পুনর্গঠনেও এ সংস্থা সাহায্য করে, যেমন দক্ষিণ সুদান। সংস্থাটি একক মুদ্রা পরিচালনা করার চিন্তা ভাবনাও করছে। বিভিন্ন দেশকে অর্থ দিয়েও সাহায্যে করে সংস্থাটি। তাই বলা যায় যে, আফ্রিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় এককভাবে কাজ করে আফ্রিকান ইউনিয়ন। এ প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষক হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়নের এই যুগে কোনো দেশ, মহাদেশ কিংবা অঞ্চল বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। অর্থ-সম্পদ স্থানান্তর, রূপান্তর এবং বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা ঘোরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কল্যাণে। কাজেই উগ্র রক্ষণশীলতা নয় বরং গণতন্ত্র ও বিশ্বায়নের ঔদার্য ধারণ করতে পারলে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। এইউ (AU) এর কল্যাণে আফ্রিকার দেশগুলো সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ ISAF কি?

উত্তর : ISAF-এর পূর্ণরূপ International Security Assistance Force. ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ISAF প্রতিষ্ঠা করে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনী (ISAF)-এর অধীনে ন্যাটো ২০০৬ সালের ৫ অক্টোবর থেকে আফগানিস্তানে ৩৭টি দেশের ৩২ হাজার সেনা নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন-০২ SAFTA কি? এটি কখন থেকে কার্যকর হবে?

উত্তর : SAFTA হলো দক্ষিণ এশিয়াকে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলে পরিণত করার একটি চুক্তি। SAFTA-এর পুরো অর্থ South Asian Free Trade Area. ২০০৪ সালের ৪-৬ জানুয়ারি ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনে দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সাফটা (SAFTA) চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিটি ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

প্রশ্ন-০৩ ASEAN-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত এবং এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ASEAN-এর পূর্ণরূপ Association of South-East Asian Nations বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্র সংস্থা। এটি ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ASEAN-এর সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। ASEAN-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০। সদস্য দেশগুলো হলো মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া। আসিয়ানের সর্বশেষ সদস্য কম্বোডিয়া।

প্রশ্ন-০৪ SAARC কখন গঠিত হয়? এর পরবর্তী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর : SAARC বা South Asian Association for Regional Co-operation-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর। সার্কের বর্তমান সদস্য বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। সার্কের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। সার্কের বর্তমান মহাসচিব অর্জুন বাহাদুর থাপা (নেপাল)। এর পরবর্তী ১৯তম সম্মেলন ২০১৬ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন-০৫ বিমসটেক (BIMSTEC) কি? এর নামের বর্তমান পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : বিমসটেক হলো একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় বিমসটেকের। তখন চারটি দেশের নামের ইংরেজি বানানের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা Economic Co-operation

(EC) যোগ করে সংস্থার নামকরণ করা হয় বিসটেক বা BISTEC (Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Co-operation)। পরে ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বর মিয়ানমার এ সংস্থায় যোগদান করায় নামকরণ করা হয় বিমসটেক বা BIMSTEC অর্থাৎ Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Co-operation. ২০০৩ সালে নেপাল ও ভুটান যোগদান করলে ২০০৪ সালের ৩১ জুলাই বিমসটেকের নামকরণ করা হয় Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation.

প্রশ্ন-০৬ বিমসটেকের (BIMSTEC) প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : বিমসটেকের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ২০০৪ সালের ৩১ জুলাই। উল্লেখ্য, সংস্থাটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১-৪ মার্চ ২০১৪ মিয়ানমারের নাইপিদো।

প্রশ্ন-০৭ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) কখন আত্মপ্রকাশ করে? এটি কোন চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৫০ সালের ৯ মে তৎকালীন ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট শুম্যান এক ইউরোপ গঠনের ঘোষণা দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চের রোম চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের ১৭ জানুয়ারি ইউরোপীয় ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপীয় কমিশনের (EC)-এর নতুন নামকরণ করা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)। এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত।

প্রশ্ন-০৮ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU)-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত এবং EU ভুক্ত নতুন দেশের নাম লিখুন।

উত্তর : ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮। ইইউভুক্ত নতুন দেশ ক্রোয়েশিয়া (১ জুলাই ২০১৩)।

প্রশ্ন-০৯ সাফটা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত Trade Liberalization Program (TLP) সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর : দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (সাফটা) নিয়ে আলোচনায় নানা জটিলতা দেখা দিলেও সার্ক দেশগুলোর বিশেষজ্ঞরা শেষ পর্যন্ত মতৈক্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলে প্রবেশ করে দক্ষিণ এশিয়ার সাত দেশ। চুক্তিটির গুরুত্বপূর্ণ যে দিক ছিল তা হলো Trade Liberalization Programme বা সংক্ষেপে 'টিএলপি', যার আওতায় নন-এলডিসি দেশ— ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা আগামী ২০০৭ সালের মধ্যে শুল্কহার শতকরা ২০ ভাগ কমিয়ে ফেলবে। ২০১০ সালের মধ্যে তাদের আমদানি শুল্ক হার শতকরা পাঁচ থেকে শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনবে, কেবল শ্রীলংকার ক্ষেত্রে ২০১১ সাল । অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো ২০০৭ সালের মধ্যে আমদানি শুল্ক হার শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়ে ফেলবে এবং ২০১৩ সালের মধ্যে শুল্ক হার পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্যতে নামিয়ে আনবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভুটান) জন্য রপ্তানি পণ্যে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করা হবে। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে ১০ শতাংশ বাড়তি সুবিধা পাবে। এভাবে ২০১৬ সালের মধ্যে Trade Liberalization Program-এর সবদিক পুরোপুরিভাবে পালিত হলে বহুল প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাফটা তার মূল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় পৌঁছাতে পারবে।

প্রশ্ন-১০ ভারতের ইতিবাচক নেতৃত্ব সার্ককে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে?

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক জোরদার এবং উন্নয়নকে সন্নিহিত করার নিমিত্তে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্লাটফর্ম হিসেবে সার্ক ১৯৮৫ সালের ৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা

শুরু করে। সার্কের মতো সহযোগিতামূলক সংস্থার মূল ভিত্তি হলো 'আমরা চেতনা' (We feeling), কেবল আমিত্ব বা আমার ধারণা (I feeling) নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতের 'আমিত্ব'-ই প্রাধান্য পাওয়ায় সার্ককে কার্যকর করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যেহেতু সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত সর্ববৃহৎ ও সুবিশাল এবং সাতটি দেশের মধ্যকার বিরোধ অধিকাংশই ভারতকেন্দ্রিক, সেহেতু ভারতের ইতিবাচক নেতৃত্বই এক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজন। তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অবস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের ওপরই নির্ভরশীল। সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রেও ভারতের পক্ষ থেকে নানা সময় গড়িমসি ভাব লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যন্ত সাতবার স্থগিত হওয়া সার্ক সম্মেলনের ছয় বারই হয়েছে ভারতের কারণে। সুতরাং বাস্তবতার নিরিখে সার্ককে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারতের বড় ভাই সুলভ আচরণ নয়, বন্ধু সুলভ আচরণ তথা ইতিবাচক নেতৃত্বই অধিক কাম্য।

প্রশ্ন-১১ **ন্যাটো (NATO) কি? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?**

উত্তর : ন্যাটো একটি সামরিক জোট। এর পূর্ণরূপ— North Atlantic Treaty Organization. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ব্রাসেলস চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং এর ভিত্তিতে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাটোর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত।

প্রশ্ন-১২ **ন্যাটোর (NATO) বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?**

উত্তর : ন্যাটোর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮। দেশগুলো হলো— বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিস, তুরস্ক, জার্মানি, স্পেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, এস্তোনিয়া, আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া।

প্রশ্ন-১৩ **ন্যাটোর (NATO) সর্বশেষ যোগ দেয়া দুটি দেশের নাম লিখুন।**

১ এপ্রিল ২০০৯ আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া NATO-এর ২৭ ও ২৮তম সদস্য হিসেবে যোগ দেয়।

প্রশ্ন-১৪ **ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কয়টি ও কি কি?**

উত্তর : ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ব্রাসেলসে পশ্চিম ইউরোপের ১০টি দেশ; যথা– ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস এবং উত্তর আমেরিকার দুটি দেশ; যথা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ মোট ১২টি দেশ ন্যাটো চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যারা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন-১৫ **ন্যাটোর পূর্ববর্তী সদর দপ্তর কোথায় ছিল এবং কত সালে এটি স্থানান্তরিত হয়?**

উত্তর : ন্যাটোর পূর্ববর্তী সদর দপ্তর ছিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। ১৯৬৭ সালে এটি লন্ডন থেকে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে স্থানান্তরিত হয়।

প্রশ্ন-১৬ **ন্যাটো-২০ কি?**

উত্তর : ২০০২ সালের ২৮ মে ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া ন্যাটোর জুনিয়র পার্টনার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যার অর্থ দাঁড়ায় রাশিয়া ন্যাটোর সদস্য নয়, সহযোগী। এজন্য রাশিয়াকে 'ন্যাটো-২০' বলা হয়।

প্রশ্ন-১৭ **এনআরএফ NATO Response Force কি?**

উত্তর : NATO Response Force বা সংক্ষেপে এনআরএফ হলো সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য গঠিত ন্যাটোর একটি বাহিনী। ২০০৩ সালের ১৫ অক্টোবর নেদারল্যান্ডের ব্রুনসাম সামরিক ঘাঁটিতে এ বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বিশ্বের যে কোনো জায়গায় পাঁচ দিনের মধ্যে এ বাহিনীকে মোতায়েন করা যাবে।

প্রশ্ন-১৮ **ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্যগুলো কি কি?**

উত্তর : পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক সংগঠন ন্যাটো তার গঠন ও বৈচিত্র্যের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ন্যাটোর মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো হলো :

ক. বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোনো সমস্যা সমাধানে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা;

খ. সদস্য রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা;

গ. এ সংস্থার কোনো এক রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে অন্য সদস্যদের দ্বারা এককভাবে বা যৌথভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা এরূপ আক্রমণের ক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ না করবে ততদিন পর্যন্ত এ সংস্থা কর্তৃক শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করা;

ঘ. এ সংস্থার সদস্যগুলো নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বপ্রকার সহায়তা দান করবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সম্ভাব্য রিপোর্ট পেশ করবে এবং

ঙ. সংস্থার সদস্যগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে নতুন সদস্য গ্রহণ করা এবং নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-১৯ **APEC কি? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?**

উত্তর : APEC বা Asia Pacific Economic Co-operation হলো একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২১টি দেশ নিয়ে এ জোট গঠিত। এ জোট ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলা। APEC-এর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত। উল্লেখ্য, APEC-এর প্রধান উদ্যোক্তা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক।

প্রশ্ন-২০ **NAFTA ও AFTA কি?**

উত্তর : উত্তর আমেরিকা অবাধ বাণিজ্য চুক্তির নামই NAFTA (North American Free Trade Agreement). এ চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর মধ্যে সম্পাদিত হয়। ১৯৯১ সালের ১৭ নভেম্বর দেশ তিনটির মধ্যে নাফটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। অন্যদিকে AFTA হলো ASEAN Free Trade Area বা আসিয়ান মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল। এটি গঠিত হয় ১৯৯২ সালের ২৮ জানুয়ারি। এর সদস্য দেশ ১০টি। দেশগুলো হলো ব্রুনাই, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস ও থাইল্যান্ড।

প্রশ্ন-২১ **ওআইসি (OIC) কি? এর সদর দপ্তর কোথায়?**

উত্তর : ওআইসি (Organisation of Islamic Co-operation) বা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগঠন। এ সংস্থার জন্ম হয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে। ওআইসি (OIC)-এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত।

প্রশ্ন-২২ **ওআইসি (OIC) কখন গঠিত হয় এবং এর প্রেক্ষাপট কি?**

উত্তর : ওআইসি বা Organisation of Islamic Co-operation গঠিত হয় ১৯৬৯ সালে । ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় মুসলিম বিশ্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ২৫ আগস্ট কায়রোতে ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এ বৈঠকে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দরা মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ঐ বছরের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর রাবাতে আরো একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-২৩ **ওআইসি (OIC)-এর মহাসচিব কিভাবে নির্বাচিত হয়?**

উত্তর : ওআইসির (OIC) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর মহাসচিব নির্বাচন ঐকমত্যের এবং সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়ে আসছিল। কিন্তু এ সংস্থার ৩১তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে নবম ওআইসি মহাসচিব পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গোপন ভোটের মাধ্যমে। উক্ত নির্বাচনে তুরস্কের একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু ৩২ ভোট পেয়ে মহাসচিব নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ (সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী) এবং অপর প্রতিদ্বন্দ্বী মালয়েশিয়া (হাশমি আগাম) পেয়েছে ১২টি করে ভোট। উল্লেখ্য, OIC (ওআইসি)-এর বর্তমান মহাসচিব আইয়াদ বিন আমীন মাদানী (১ জানুয়ারি ২০১৪-বর্তমান)।

প্রশ্ন-২৪ **ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলো কি কি?**

উত্তর : অঙ্গসংগঠন ১১টি। ১. ইসলামিক সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্সিল, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. নির্বাহী কমিটি, ৫. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিচার আদালত, ৬. মানবাধিকার বিষয়ক স্বাধীন স্থায়ী কমিশন, ৭. স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটি, ৮. সাধারণ সচিবালয়, ৯. সাবসিডিয়ারি অর্গানস, ১০. বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট এবং ১১. অনুমোদিত ইনস্টিটিউট।

প্রশ্ন-২৫ **ওআইসির প্রথম এবং সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ওআইসির (OIC) প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাবাতে। সংস্থার দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩; কায়রো, মিশর ।

প্রশ্ন-২৬ **ওআইসি (OIC)-এর বর্তমান সদস্য কত ও কি কি?**

উত্তর : বর্তমান সদস্য : ৫৭। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য : ২৫; আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, শাদ, মিশর, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সেনেগাল, সোমালিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন এবং ফিলিস্তিন। অন্যান্য সদস্য ও সদস্যপদ লাভের সময় : বাহরাইন (১৯৭০), ওমান (১৯৭০), কাতার (১৯৭০), সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৯৭০), সিরিয়া (১৯৭০), সিয়েরা লিওন (১৯৭২), বাংলাদেশ (১৯৭৪), গ্যাবন (১৯৭৪), গাম্বিয়া (১৯৭৪), গিনি বিসাউ (১৯৭৪), উগান্ডা (১৯৭৪), বারকিনা ফাসো (১৯৭৫), ক্যামেরুন (১৯৭৫), ইরাক (১৯৭৬), কমোরোস (১৯৭৬), মালদ্বীপ (১৯৭৬), জিবুতি (১৯৭৮), বেনিন (১৯৮২), ব্রুনেই (১৯৮৪), নাইজেরিয়া (১৯৮৬), আলবেনিয়া (১৯৯২), আজারবাইজান (১৯৯১), কিরগিজিস্তান (১৯৯২), তাজিকিস্তান (১৯৯২), তুর্কমেনিস্তান (১৯৯২), মোজাম্বিক (১৯৯৪), কাজাখস্তান (১৯৯৫), উজবেকিস্তান (১৯৯৫), সুরিনাম (১৯৯৬), টোগো (১৯৯৭), গায়ানা (১৯৯৮) এবং আইভরি কোস্ট (২০০১)।

প্রশ্ন-২৭ **GCC-এর পূর্ণরূপ কি? এর সদস্য কয়টি?**

উত্তর : GCC-এর পূর্ণরূপ Gulf Co-operation Council বা উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা। GCC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালের ২৫ মে এবং এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের রিয়াদে। GCC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬। সদস্য দেশগুলো হলো সৌদি আরব, আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত ও ওমান।

প্রশ্ন-২৮ **আফ্রিকান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?**

উত্তর : আফ্রিকার উপনিবেশবাদ খতম করা, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটানো এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি যুগ্ম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রশ্ন-২৯ **আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য দেশ কতটি ও কি কি?**

উত্তর : ৫৪টি। আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বতসোয়ানা, বারকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, কমোরোস, কঙ্গো, আইভরি কোস্ট, জিবুতি, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, ঘানা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো, গিনি বিসাউ, কেনিয়া, লেসেথো, মরিশাস, লিবিয়া, লাইবেরিয়া, মালাগাছি, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নাইজার, গিনি, গাম্বিয়া, মালি, ইকুটরিয়েল গিনি, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা, সাওটোম অ্যান্ড প্রিন্সিপে, সেনেগাল, সিচেলেস, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, মালাবি, তাঞ্জানিয়া, মৌরিতানিয়া, পশ্চিম সাহারা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ সুদান।

আঞ্চলিক সংস্থা-সংগঠন পরিচিতি

ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (OIC)

প্রশ্ন : OIC-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Organisation of Islamic Co-operation.

প্রশ্ন : OIC-এর প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Organisation of the Islamic Conference. (বর্তমান নামকরণ করা হয় ২৮ জুন ২০১১)।

প্রশ্ন : ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) কবে গঠিত হয়?

উত্তর : ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ (মরক্কোর রাজধানী রাবাতে)।

প্রশ্ন : কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কেবলা পবিত্র মসজিদ আল-আকসাতে ইসরাইল কর্তৃক অগ্নিসংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রশ্ন : ওআইসির সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা কি?

উত্তর : জাতিসংঘভুক্ত যে কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

প্রশ্ন : ওআইসির সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : জেদ্দা, সৌদি আরব। উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের আল কুদস শহর অর্থাৎ জেরুজালেম দখলদার ইসরাইলের হাত থেকে মুক্ত হলে ওআইসি'র সদর দপ্তর সেখানে স্থানান্তর করা হবে।

প্রশ্ন : ওআইসির প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন?

উত্তর : মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান।

প্রশ্ন : ওআইসির সদস্য দেশগুলোর ভোটে নির্বাচিত প্রথম মহাসচিব কে?

উত্তর : একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, তুরস্ক।

প্রশ্ন : OIC-এর বর্তমান মহাসচিব কে ছিলেন?

উত্তর : আইয়াদ বিন আমীন মাদানী, সৌদি আরব।

প্রশ্ন : ওআইসির মহাসচিবের মেয়াদ কাল কত বছর?

উত্তর : পাঁচ বছর। উল্লেখ্য, পূর্বে ছিল চার বছর।

প্রশ্ন : ওআইসিতে নিযুক্ত প্রথম মার্কিন বিশেষ দূতের নাম কি?

উত্তর : সাডা কাম্বার (৩ মার্চ ২০০৮ থেকে বর্তমান)।

প্রশ্ন : OIC-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?

উত্তর : আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি (মিসর); (৮ জুন ২০১৪- বর্তমান)।

প্রশ্ন : OIC-এর অঙ্গসংগঠন কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ১১টি। ১. ইসলামিক সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্সিল, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি, ৪. নির্বাহী কমিটি, ৫. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিচার আদালত, ৬. মানবাধিকার বিষয়ক স্বাধীন স্থায়ী কমিশন, ৭. স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটি, ৮. সাধারণ সবিচালয়, ৯. সাবসিডিয়ারি অর্গান, ১০. বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট এবং ১১. অনুমোদিত ইনস্টিটিউট।

প্রশ্ন : OIC-এর মূল লক্ষ্য কি?

উত্তর : মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা মোকাবিলা করাসহ মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ করা এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করা।

প্রশ্ন : ওআইসির বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ৫৭।

প্রশ্ন : ওআইসির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য কতটি ও কি কি?

উত্তর : ২৫। দেশগুলো হচ্ছে– আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, শাদ, মিশর, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সেনেগাল, সোমালিয়া, সুদান, তিউনেশিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন, ফিলিস্তিন।

প্রশ্ন : ওআইসির সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি?

উত্তর : আইভরি কোস্ট (২০০১)।

প্রশ্ন : মুসলমান প্রধান না হয়েও ওআইসির সদস্য দেশ কোনগুলো?

উত্তর : উগান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, গায়ানা ও সুরিনাম।

প্রশ্ন : ওআইসির পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা কি কি?

উত্তর : বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা (১৯৯৪), মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (১৯৯৭), তুর্কী সাইপ্রাস (১৯৭৯), থাইল্যান্ড (১৯৯৮), রাশিয়া (২০০৫), আরব লীগ (১৯৭৫), ইকো (১৯৭৫), জাতিসংঘ (১৯৭৬), মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (১৯৭৭), ন্যাম (১৯৭৭), আফ্রিকান ইউনিয়ন সংস্থা (১৯৭৭), ওআইসির পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (২০০০), ইসলামিক কনফারেন্স ইয়ুথ ফোরাম ফর ডায়ালগ অ্যান্ড কো-অপারেশন (২০০৫)।

প্রশ্ন : আল কুদস কমিটির সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ১৬। সদস্য দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, মরক্কো (চেয়ারম্যান), সৌদি আরব, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন, মৌরিতানিয়া, মিশর, পাকিস্তান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, সেনেগাল, নাইজার ও গিনি।

প্রশ্ন : আল কুদস কমিটির সদর দপ্তর কোথায়?

উত্তর : মরক্কোর রাবাতে ।

প্রশ্ন : ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কত বছর পর পর?

উত্তর : তিন বছর।

প্রশ্ন : ওআইসির অফিসিয়াল ভাষা কি কি?

উত্তর : আরবি, ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ।

আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)

প্রশ্ন : AU-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : African Union.

প্রশ্ন : আফ্রিকান ইউনিয়নের পূর্ববর্তী নাম কি?

উত্তর : আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (Organisation of African Unity)।

প্রশ্ন : আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

উত্তর : ২৫ মে ১৯৬৩।

প্রশ্ন : আফ্রিকান ইউনিয়ন নামকরণ করা হয় কবে?

উত্তর : ৯ জুলাই ২০০২।

প্রশ্ন : প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : ৩২।

প্রশ্ন : আফ্রিকান ইউনিয়নের সর্বশেষ দেশ কোনটি?

উত্তর : দক্ষিণ সুদান (সদস্য পদ কার্যকর ১৫ আগস্ট ২০১১)।

প্রশ্ন : আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া।

প্রশ্ন : প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মরক্কো কবে আফ্রিকান ইউনিয়ন ত্যাগ করে?

উত্তর : ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

প্রশ্ন : মরক্কো কি কারণে আফ্রিকান ইউনিয়ন ত্যাগ করে?

উত্তর : পশ্চিম সাহারা সদস্যপদ লাভের কারণে।

উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)

প্রশ্ন : GCC-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Gulf Cooperation Council.

প্রশ্ন : জিসিসি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৮১ সালের ২৫ মে।

প্রশ্ন : জিসিসি'র সদস্য দেশ কয়টি এবং কি কি?

উত্তর : ৬টি। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

প্রশ্ন : জিসিসি'র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে।

প্রশ্ন : GCC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : ১. আরব দেশগুলোর মধ্যে বর্তমান ঐক্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করা, ২. সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, ৩. আন্তঃবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা নিশ্চিত করা, ৪. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, ভৌগোলিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভূমিকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ৫. অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতি সংহতি প্রকাশ করা।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা কবে?

উত্তর : ১ নভেম্বর ১৯৯৩।

প্রশ্ন : কোন চুক্তি অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ঘটে?

উত্তর : ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্বনাম কি?

উত্তর : ইউরোপিয়ান কমিউনিটি (European Community)।

প্রশ্ন : ইউরোপিয়ান কমিউনিটি কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

উত্তর : ১ জানুয়ারি ১৯৫৮ (১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ রোম চুক্তির মাধ্যমে European Economic Community-EEC গঠনের প্রস্তাব করা হলেও প্রতিষ্ঠার সময় European Community নামকরণ করা হয়)।

প্রশ্ন : ইইউ'র অফিসিয়াল ভাষা কতটি?

উত্তর : ২৩টি।

প্রশ্ন : ইইউ'র পতাকায় তারকার সংখ্যা কত?

উত্তর : ১২।

প্রশ্ন : ইইউভুক্ত কোন দেশ 'ইউরো' মুদ্রাকে 'ইভরো' নামে ডাকার অনুমতি পেয়েছে?

উত্তর : বুলগেরিয়া।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ২৮।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলো কি কি?

উত্তর : বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, গ্রিস, স্পেন, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, এস্তোনিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, সাইপ্রাস, স্লোভেনিয়া, স্লোভাকিয়া, মাল্টা, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও ক্রোয়েশিয়া।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বশেষ সদস্য দেশ কোনটি?

উত্তর : ক্রোয়েশিয়া (১ জুলাই ২০১৩)।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভের জন্য কোন কোন দেশ আবেদন করেছে?

উত্তর : তুরস্ক, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৭; মেসিডোনিয়া, ২২ মার্চ ২০০৪, আলবেনিয়া (২৮ এপ্রিল ২০০৯), আইসল্যান্ড (১৬ জুলাই ২০০৯), মন্টিনিগ্রো (১৫ ডিসেম্বর ২০০৮) ও সার্বিয়া (২২ ডিসেম্বর ২০০৯)।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য প্রত্যাশী অন্য দেশ কি কি?

উত্তর : বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা ও কসোভো।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : পারস্পরিক স্বার্থে শুল্ক হার হ্রাসের মাধ্যমে দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের সুলভ ও সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন : EU-এর কয়েকটি অঙ্গসংগঠনের নাম কি?

উত্তর : ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, কাউন্সিল অব ইউরোপীয় ইউনিয়ন, দি কোর্ট অব জাস্টিস অব দ্য ইউরোপিয়ান, ইউরোপিয়ান কোর্ট অব এডিটরস, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইউরোপোল প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : পার্লামেন্ট (অফিসিয়াল) : স্ট্রাসবার্গ, পার্লামেন্ট (সচিবালয়) : লুক্সেমবার্গ, পার্লামেন্ট (২য়) : ব্রাসেলস।

প্রশ্ন : ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ৭৩৬ জন। দেশভিত্তিক সদস্য : জার্মানি-৯৯, ইতালি-৭২, ফ্রান্স-৭২, যুক্তরাজ্য-৭২, স্পেন-৫০, পোল্যান্ড-৫০,রোমানিয়া-৩৩, নেদারল্যান্ড-২৫, বেলজিয়াম-২২, চেক প্রজাতন্ত্র-২২, গ্রিস-২২, হাঙ্গেরি-২২, পর্তুগাল-২২, সুইডেন-১৮, অস্ট্রিয়া-১৭, বুলগেরিয়া-১৭, ফিনল্যান্ড-১৩, ডেনমার্ক-১৩, স্লাভাকিয়া-১৩, আয়ারল্যান্ড-১২, লিথুয়ানিয়া-১২ লাটভিয়া-৮, স্লোভেনিয়া-৭, সাইপ্রাস-৬, এস্তোনিয়া-৬, লুক্সেমবার্গ-৬, মাল্টা-৫।

এপেক (APEC)

প্রশ্ন : APEC-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Asia-Pacific Economic Co-operation.

প্রশ্ন : এটি প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

উত্তর : ৬ নভেম্বর ১৯৮৯।

প্রশ্ন : APEC-এর উদ্যোক্তা কে?

উত্তর : অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক।

প্রশ্ন : APEC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের এক বিশাল এলাকা গড়ে তোলা।

প্রশ্ন : APEC-এর সদস্য সংখ্যা কতটি ও কি কি?

উত্তর : ২১টি। চীন, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও পেরু।

প্রশ্ন : APEC-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর।

প্রশ্ন : APEC-এর প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?

উত্তর : অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায়।

প্রশ্ন : APEC-এর ২৬তম সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১০-১১ নভেম্বর ২০১৪; বেইজিং, চীন।

ওপেক (OPEC)

প্রশ্ন : OPEC-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Organisation of the Petroleum Exporting Countries.

প্রশ্ন : ওপেক কবে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

প্রশ্ন : সর্বপ্রথম কতটি দেশ নিয়ে ওপেক গঠিত হয়?

উত্তর : ৫টি।

প্রশ্ন : ওপেকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ১২।

প্রশ্ন : ওপেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলো কি কি?

উত্তর : আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, ইরান, ইরাক, কুয়েত, কাতার, নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, লিবিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইকুয়েডর।

প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে কোন দেশ ওপেক-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে?

উত্তর : ইকুয়েডর (উল্লখ্য, ১৭ নভেম্বর ২০০৭ পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করে)।

প্রশ্ন : OPEC-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

প্রশ্ন : OPEC-এর অ-আরব দেশগুলো কি কি?

উত্তর : ইরান, নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, অ্যাঙ্গোলা ও ইকুয়েডর।

প্রশ্ন : OPEC-ভুক্ত একমাত্র অ-আরব এশীয় দেশ কোনটি?

উত্তর : ইরান।

প্রশ্ন : OPEC-ভুক্ত আরব দেশ কি কি ?

উত্তর : আলজেরিয়া, ইরাক, কুয়েত, কাতার, লিবিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

প্রশ্ন : ওপেক ত্যাগকারী সদস্য দেশ কতটি?

উত্তর : ২টি। ইন্দোনেশিয়া ও গ্যাবন।

আসিয়ান (ASEAN)

প্রশ্ন : ASEAN-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Association of South East Asian Nations.

প্রশ্ন : ASEAN কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ৮ আগস্ট ১৯৬৭।

প্রশ্ন : আসিয়ানের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।

প্রশ্ন : আসিয়ানের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : ১০।

প্রশ্ন : ASEAN-এর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

প্রশ্ন : ASEAN-এর বর্তমান সদস্য দেশগুলো কি কি?

উত্তর : মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া।

প্রশ্ন : ASEAN-এর মূল লক্ষ্য কি?

উত্তর : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

প্রশ্ন : ASEAN-এর বর্তমান মহাসচিব কে?

উত্তর : লি লং মিন, ভিয়েতনাম (১ জানুয়ারি ২০১৩-বর্তমান)।

প্রশ্ন : আসিয়ানের সর্বশেষ সদস্য দেশ কোনটি?

উত্তর : কম্বোডিয়া (৩০ এপ্রিল ১৯৯৯)।

সার্ক (SAARC)

প্রশ্ন : SAARC-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : South Asian Association for Regional Co-operation.

প্রশ্ন : সার্ক গঠনের প্রস্তাব নিয়ে সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা সর্বপ্রথম কোথায় মিলিত হয়?

উত্তর : ১৯৮১ সালে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে।

প্রশ্ন : কোন বৈঠকের ফলাফল স্বরূপ সার্ক জন্মলাভ করে?

উত্তর : ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লি বৈঠক।

প্রশ্ন : সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় কবে?

উত্তর : ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

প্রশ্ন : সার্কের রূপকার কে ছিলেন?

উত্তর : বাংলাদেশের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

প্রশ্ন : সার্কভুক্ত দেশ কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ৮টি। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান।

প্রশ্ন : সার্কের সর্বশেষ বা অষ্টম সদস্য দেশ কোনটি?

উত্তর : আফগানিস্তান (৩ এপ্রিল ২০০৭)।

প্রশ্ন : সার্কের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন?

উত্তর : আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।

প্রশ্ন : সার্কের বর্তমান মহাসচিবের নাম কি?

উত্তর : অর্জুন বাহাদুর থাপা (নেপাল)।

প্রশ্ন : সার্কের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে কোন কোন দেশ ও সংস্থাকে?

উত্তর : চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দ. কোরিয়া, ইরান, মরিশাস, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে।

প্রশ্ন : সার্ক সচিবালয় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে।
প্রশ্ন : সার্কের মৌলিক উদ্দেশ্য কতটি?
উত্তর : ৭টি।
প্রশ্ন : সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নির্বাচিত ক্ষেত্র কতটি?
উত্তর : ১৩টি।
প্রশ্ন : ২০০৪ সালে প্রথম সার্ক পদক লাভ করেন কে?
উত্তর : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।
প্রশ্ন : সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAARC Agricultural Information Centre) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৮৯ সালে। সদর দপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশ।
প্রশ্ন : সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SAARC Meteorological Research Centre) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২ জানুয়ারি ১৯৯৫। সদর দপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশ।
প্রশ্ন : সার্ক যক্ষ্মা কেন্দ্র (SAARC Tuberculosis Centre) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৯২ সালে। সদর দপ্তর কাঠমান্ডু, নেপাল।
প্রশ্ন : সার্ক তথ্যকেন্দ্র (SAARC Information Centre)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কাঠমান্ডু, নেপাল।
প্রশ্ন : মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (SAARC Human Resources Development Centre)-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
প্রশ্ন : সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (SAARC Cultural Centre)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কলম্বো, শ্রীলঙ্কা।
প্রশ্ন : সার্ক উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (SAARC Coastal Zone Management Centre)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মালদ্বীপের মালেতে।
প্রশ্ন : সার্ক বন কেন্দ্র (SAARC Forestry Centre)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভুটানে।
প্রশ্ন : সার্ক জ্বালানি কেন্দ্র (SAARC Energy Centre)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : পাকিস্তানে।
প্রশ্ন : সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নয়াদিল্লি, ভারত।

বিমসটেক (BIMSTEC)

প্রশ্ন : BIMSTEC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation.
প্রশ্ন : পূর্বে BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ কি ছিল?
উত্তর : Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Co-operation.
প্রশ্ন : এরও পূর্বে BIMSTEC-এর নাম কি ছিল?
উত্তর : BISTEC।
প্রশ্ন : BISTEC গঠনের লক্ষ্যে প্রথম বৈঠক কবে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৬ জুন ১৯৯৭।
প্রশ্ন : BISTEC গঠনের লক্ষ্যে প্রথম বৈঠকটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
প্রশ্ন : BIMSTEC কোন ধরনের সংগঠন?
উত্তর : অর্থনৈতিক।
প্রশ্ন : BIMSTEC-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ৭টি। দেশগুলো হলো–বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান।
প্রশ্ন : BIMSTEC-এর সর্বশেষ সদস্য কোনটি এবং কবে সদস্য পদ পায়?
উত্তর : নেপাল ও ভুটান (২০০৩)।
প্রশ্ন : BIMSTEC-এর সহযোগিতার ক্ষেত্র কতটি?
উত্তর : ১৪টি।
প্রশ্ন : BIMSTEC-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৩১ জুলাই ২০০৪, থাইল্যান্ডে।
প্রশ্ন : BIMSTEC-এর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৩ নভেম্বর ২০০৮, নয়াদিল্লি (ভারত)।

প্রশ্ন : BIMSTEC-এর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২০১২ সালে, নাইপিদো, মিয়ানমার।

সাফটা (SAFTA)

প্রশ্ন : SAFTA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : South Asian Free Trade Area.
প্রশ্ন : SAFTA চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
উত্তর : ৬ জানুয়ারি ২০০৪ (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান)।
প্রশ্ন : SAFTA কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ২০০৬ থেকে।
প্রশ্ন : SAFTA-এর সদস্য দেশগুলো কি কি?
উত্তর : বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভুটান, ভারত ও নেপাল।

নাফটা (NAFTA)

প্রশ্ন : NAFTA-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : North American Free Trade Agreement.
প্রশ্ন : কবে মার্কিন কংগ্রেসে নাফটা চুক্তি পাস হয়?
উত্তর : ১৭ নভেম্বর ১৯৯১ (কার্যকর ১ জানুয়ারি ১৯৯৪)।
প্রশ্ন : নাফটার সদস্য দেশগুলো কি কি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।

টীকা

♦ সাপটা এবং সাফটা *[৩০তম; ২৭তম বিসিএস]*

সাপটার (SAPTA) : সাপটা (SAPTA-SAARC Preferential Trading Arrangement) হচ্ছে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার সম্পাদিত একটি বাণিজ্য চুক্তি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান এবং আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সাপটা স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের শেষ দিন ১১ এপ্রিল সার্ক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে SAPTA কার্যকর হয়।

সাপটার (SAPTA) গুরুত্ব :

১. সার্কের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে সাপটা চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সংরক্ষণবাদী নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাপটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
৩. প্রাথমিকভাবে সার্কভুক্ত দেশগুলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে ১০% হারে শুল্ক হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্যকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
৪. সাপটা চুক্তির ফলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে শিপিং, সার, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

সাফটা (SAFTA) : এটি SAFTA-এর পূর্ণরূপ South Asian Free Trade Area। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৬ জানুয়ারি ২০০৪ (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান) এবং কার্যকর হয় ১ জুলাই ২০০৬ থেকে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। চুক্তিটিতে ছয়টি বিষয় বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে– ক. বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি, খ. রুলস অব অরিজিন, গ. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, ঘ. সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, ঙ. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ ও পার্থক্য নির্দেশকারী সুবিধা, চ. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি। সাফটাভুক্ত দেশ বাংলাদেশ,

পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভুটান, ভারত, নেপাল ও আফগানিস্তান। এ চুক্তির লক্ষ্যসমূহ হলো :

১. এ অঞ্চলের মধ্যে ট্যারিফ, প্যারা-ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ ও বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার মতো অন্যান্য বাধা দূর করা;
২. সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন স্পর্শকাতর পণ্য ও লেনদেন বহির্ভূত রাখার তালিকা শনাক্ত করা;
৩. অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

♦ আফটা (AFTA)

AFTA-এর পূর্ণরূপ ASEAN Free Trade Area. আসিয়ান সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন বাজার সৃষ্টি, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় ও সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আফটা স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত হয় ২৮ জানুয়ারি ১৯৯২ (সিঙ্গাপুর) এবং কার্যকর ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে। আফটাভুক্ত দেশগুলো হলো মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া।

♦ এপেক (APEC)

APEC বা Asia Pacific Economic Co-operation হলো একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২১টি দেশ নিয়ে এ জোট গঠিত। এ জোট ১৯৮৯ সালের ৬ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলা। APEC-এর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত। উল্লেখ্য, APEC-এর প্রধান উদ্যোক্তা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক।

♦ SAIC *[২৩তম বিসিএস]*

সার্কভুক্ত দেশসমূহের কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের আধুনিক কলা-কৌশল আদান প্রদান করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAARC Argicultural Information Centre বা SAIC)। সার্কের ৮ সদস্য বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান এর সদস্য। এর সদর দপ্তর ঢাকায় (ফার্মগেটস্থ খামারবাড়ি সংলগ্ন) অবস্থিত। সার্ক কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান লক্ষ্য হলো :

১. সদস্যভুক্ত দেশসমূহের কৃষি তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ।
২. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম, লাগসই প্রযুক্তি ও উন্নত কৃষি কৌশল সম্পর্কীয় বই-পুস্তক প্রকাশনা।
৩. কৃষি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক পত্রপত্রিকা, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা।
৪. কৃষকদের নিকট তথ্যাদি পৌছাবার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা।

♦ আসিয়ান *[২১তম বিসিএস]*

ASEAN-এর পূর্ণরূপ Association of South-East Asian Nations (দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্র সংস্থা)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৮ আগস্ট ১৯৬৭। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০। সদস্য দেশগুলো হলো : মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া। সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৫। সেগুলো হলো : ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড। ষষ্ঠ সদস্য ব্রুনাই (১৯৮৪)। সপ্তম সদস্য ভিয়েতনাম

(১৯৯৫)। অষ্টম ও নবম সদস্য মিয়ানমার ও লাওস (১৯৯৭) এবং সর্বশেষ সদস্য কম্বোডিয়া (৩০ এপ্রিল ১৯৯৯)। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি।

♦ ন্যাটোর পুনর্গঠন *[১৭তম বিসিএস]*

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ন্যাটোকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর সামরিক জোট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল উত্তর আটলান্টিক চুক্তির মাধ্যমে এ সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য, ন্যাটের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঘটে। সেই সাথে গোটা বিশ্ব প্রধানত দুটি (যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনি প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে পশ্চিমা দেশগুলো স্ব স্ব দেশের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশ কর্তৃক এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সামরিক মৈত্রী জোট গঠনের পরিকল্পনা করতে থাকে। ইতিমধ্যে জার্মানির সমস্যা নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিরোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করে। এ বিরোধ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক বার্লিন শহর অবরোধে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের হুমকি থেকে রক্ষার লক্ষ্যে একটি সামরিক জোট গঠনের প্রস্তাব করে। মার্কিন এ প্রস্তাবকে কমিউনিস্টবিরোধী ইউরোপীয় দেশগুলো স্বাগত জানায়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল 'উত্তর আটলান্টিক চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে North Atlantic Treaty Organization সংক্ষেপে NATO গঠিত হয়। প্রথমে ১২টি দেশ ন্যাটো ভুক্ত হয়। ১৯৫২ সালে এ সংস্থায় যোগ দেয় গ্রিস ও তুরস্ক। ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানি এবং পরে স্পেন সদস্যপদ লাভ করায় ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা ১৬তে উন্নীত হয়। ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা ১৬ তে উন্নীত হওয়ার পর এ সংস্থার সম্প্রসারণ দীর্ঘ সাড়ে চার দশককাল বন্ধ ছিল। সবশেষে ২০০৪ সালের ২৯ মার্চ পূর্ব ইউরোপের সাতটি সাবেক কমিউনিস্ট দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাটোতে যোগদান করায় NATO'র মোট সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৬টিতে। সর্বশেষ ১ এপ্রিল ২০০৯ আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া যোগদান করার বর্তমানে এ সংস্থার সদস্য সংখ্যা ২৮টিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সদর দপ্তর ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।

♦ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক *[১৩তম বিসিএস]*

ADB-এর পূর্ণরূপ Asian Development Bank। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২২ আগস্ট ১৯৬৬। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৩১ এবং বর্তমান সদস্য ৬৭টি দেশ। এর সদর দপ্তর ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সদস্য দেশসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে কারিগরি সাহায্য প্রদান। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী প্রধান প্রেসিডেন্ট। তার মেয়াদকাল ৫ বছর। এডিবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য :

i. অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সরকারি মূলধনকে কার্যকরভাবে বিনিয়োগে ব্যবহার করা।

ii. এসক্যাপের অন্তর্ভুক্ত স্বল্পোন্নত অঞ্চলের প্রকল্প ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।
iii. বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রবৃদ্ধিগত বৈষম্য দূরীকরণ।
iv. বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
v. নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সাহায্য প্রদান করা এবং
vi. জাতিসংঘের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা ও সম্পর্ক বজায় রাখা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলী আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, এ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হলো আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

♦ ডি-৮ (D-8)

ডি-৮ বা Developing-8 হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগঠন। ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডি-৮ এর প্রস্তাবক তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাসুদ আসতামাস। ডি-৮ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর জনগণের শান্তি, সংলাপ, সহযোগিতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক উন্নয়ন সাধন। এর সদর দপ্তর ইস্তানবুল, তুরস্ক। ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন প্রতি দুই বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। ডি-৮ সদস্যভুক্ত ৮টি দেশ হলো তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া এবং বাংলাদেশ। ২২ নভেম্বর ২০১২ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ডি-৮ অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক, সামাজিক ও ভাষাগত মিল নেই তবে এদের মধ্যে ধর্মীয় সাদৃশ্য ও মূল্যবোধ বিদ্যমান।

♦ আরব লীগ (League of Arab States)

আরব বিশ্বের দেশগুলোর সম্মিলিত সংস্থা। গঠিত হয় ২২ মার্চ ১৯৪৫। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা ৭। সদস্যগুলো হলো ইরাক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, জর্ডান, ইয়েমেন ও সৌদি আরব। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২। বর্তমান সদস্য দেশগুলো হলো আলজেরিয়া, বাহরাইন, কমরোস, জিবুতি, মিশর, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, ফিলিস্তিন, কাতার, সৌদি আরব, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, তিউনিশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন। প্রথম সদর দপ্তর ছিল মিশরের রাজধানী কায়রোতে। মিশর-ইসরাইল চুক্তির পর ১৯৭৯ সালে মিশর এ সংস্থা থেকে বহিষ্কৃত হয়। মিশরকে বহিষ্কারের পর সদর দপ্তর তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে স্থানান্তর করা হয়। মিশর পুনরায় আরব লীগে যোগদান করে ১৯৯০ সালে। এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরব জাতিসমূহের মধ্যে একতা ও শক্তি বৃদ্ধি। সংস্থার প্রধানের পদবি মহাসচিব।

♦ আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)

আফ্রিকা মহাদেশের সবগুলো দেশ নিয়ে গঠিত সংস্থা আফ্রিকার ইউনিয়ন। পূর্বনাম Organization of African Unity (OAU). নতুন নামকরণ করা হয় ৯ জুলাই ২০০২। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫ মে, ১৯৬৩। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৩২। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪। সদস্য দেশসমূহ আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বতসোয়ানা, বারকিনা ফাসো, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, কেপভার্দে, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, কঙ্গো, আইভরিকোস্ট, জিবুতি, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, ঘানা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো, গিনি বিসাউ, কেনিয়া, লেসোথো, মরিশাস, লিবিয়া, লাইবেরিয়া, মালাগাছি, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নাইজার, গিনি, গাম্বিয়া, মালি, নিরক্ষীয় গিনি, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা, সাওটোম

অ্যান্ড প্রিন্সিপি, সেনেগাল, সিসিলি, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, মালাবি, তানজানিয়া, মৌরিতানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, পশ্চিম সাহারা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে। সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ আফ্রিকা (২৬ জুন ১৯৯৪)। সদর দপ্তর অবস্থিত ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায়। সংস্থার প্রধান মহাসচিব। আফ্রিকার উপনিবেশবাদ খতম করা, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটানো এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি যুগ্ম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

♦ উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)

GCC-এর পূর্ণরূপ Gulf Co-operation Council. সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫ মে ১৯৮১। এর সদস্য সংখ্যা ৬। সদস্য দেশগুলো হলো সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত ও ওমান। সদর দপ্তর রিয়াদ, সৌদি আরব। সংস্থার প্রধান মহাসচিব। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ১. আরব দেশগুলোর মধ্যে বর্তমান ঐক্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করা, ২. সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, ৩. আন্তঃবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা নিশ্চিত করা, ৪. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক, ভৌগোলিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভূমিকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ৫. অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতি সংহতি প্রকাশ করা।

♦ ন্যাটো (NATO)

NATO-এর পূর্ণরূপ North Atlantic Treaty Organization. এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮। সদস্য দেশগুলো হলো : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, গ্রিস, তুরস্ক, জার্মানি, স্পেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়া। পূর্ববর্তী সদর দপ্তর প্যারিস (ফ্রান্স)। বর্তমান সদর দপ্তর ১৯৬৬ সালে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে স্থানান্তর করা হয়। ২৮ মে ২০০২ ন্যাটো-রাশিয়া সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া 'ন্যাটোর জুনিয়র পার্টনার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে রাশিয়া ন্যাটোর সদস্য নয়, সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ জন্য রাশিয়াকে 'ন্যাটো-২০' বলা হয়।

♦ ওআইসি *[২৯তম বিসিএস]*

OIC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ (২৮ জুন ২০১১ থেকে) Organisation of Islamic Cooperation (প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ণরূপ Organisation of the Islamic Conference)। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে সংস্থাটি গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কেবলা পবিত্র মসজিদুল আল-আকসাতে ইসরাইল কর্তৃক সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংস্থাটির জন্ম। OIC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭। সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। প্রথম মহাসচিব মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান। বর্তমান মহাসচিব সৌদি আরবের আইয়াদ বিন আমীন মাদানী। OIC-এর মূল লক্ষ্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা মোকাবিলা করাসহ মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ করা এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করা। OIC-এর অঙ্গ-সংগঠন ১১টি। ১. ইসলামিক সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্সিল, ৩. স্ট্যান্ডিং

কমিটি, ৪. নির্বাহী কমিটি, ৫. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিচার আদালত, ৬. মানবাধিকার বিষয়ক স্বাধীন স্থায়ী কমিশন, ৭. স্থায়ী প্রতিনিধি কমিটি, ৮. সাধারণ সচিবালয়, ৯. সাবসিডিয়ারি অর্গান, ১০. বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট এবং ১১. অনুমোদিত ইনস্টিটিউট। সংস্থাটির ৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটি হলো ১. আল কুদস কমিটি (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৫; সদর দপ্তর রাবাত, মরক্কো), ২. স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স–OMIAC (প্রতিষ্ঠা ১৯৮১; সদর দপ্তর ডাকার, সেনেগাল), ৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইকোনোমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল কো-অপারেশন–COMCEC (প্রতিষ্ঠা ১৯৮১; সদর দপ্তর আঙ্কারা, তুরস্ক) ও ৪. স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলোজিক্যাল কো-অপারেশন–COMSTECH (প্রতিষ্ঠা ১৯৮১; সদর দপ্তর ইসলামাবাদ, পাকিস্তান)।

♦ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

ইউরোপীয় ইউনিয়ন হলো ইউরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। এর বর্তমান সদস্য ২৮টি দেশ। আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এটি গঠিত হয়েছে। ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে ম্যাসট্রিষ্ট চুক্তি (Maastrict Treaty) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটির নতুন নামকরণ করা হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ৫০ কোটি লোক। এটি বিশ্ব অর্থনীতির ৩০% এর অংশীদার। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মানুষ, পণ্য সেবা এবং মূলধনের অবাধ চলাচলের জন্য একক বাজারব্যবস্থা চালু করেছে। কৃষি, মৎস্য, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য একই বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একক মুদ্রার নাম ইউরো, যা এর সদস্যভুক্ত ১৯টি দেশ ব্যবহার করছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অফিসিয়াল ভাষা ২৩টি, পতাকায় তারকার সংখ্যা ১২টি, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক স্বার্থে শুল্ক হার হ্রাসের মাধ্যমে দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের সুলভ ও সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছয় মাসের জন্য নির্বাচিত হয়।



বিশ্বের দ্বন্দ্ব ও বিবদমান বিষয়
Major Issues and Conflicts in the World

Syllabus

Major Issues and Conflicts in the World : *The Palestine Problem, the Arab Spring, the Kashmir Issue, the Syrian Crisis, Persian Gulf Conflict, nuclear issue and Iran, the North Korean issue, territorial disputes in Southeast and and East Asia, Nuclear proliferation and other contemporary issues.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের দাবিতে গণঅসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণসমূহ বর্ণনা করে বিস্তারিত লিখুন। [৩১তম বিসিএস]

০২. কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। [১৩তম বিসিএস]

০৩. ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে কি কি ধরনের সঙ্কট আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন? জ্বালানি বাজারে এর কি প্রভাব পড়তে পারে? [৩৩তম বিসিএস]

০৪. আপনি কি অদূর ভবিষ্যতে দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণের কোনো সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। যদি করেন তবে এই পুনরেকত্রীকরণের সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প কি হতে পারে? [২১তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. 'আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে'— ফিলিস্তিন সমস্যার আলোকে এ উক্তির যথার্থতা বিচার করুন।

০৬. 'মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন।'— পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিন।

০৭. ক. ইয়েমেন সংকট কি?
খ. ইয়েমেনের বর্তমান অবস্থা বর্ণনাপূর্বক মধ্যপ্রাচ্যে এর কিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন?

০৮. ক. সিরিয়ায় সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের কারণ ও গৃহযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করুন।
খ. সিরিয়ায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

০৯. পারস্য উপসাগরের জলভাগ ও দ্বীপগুলো নিয়ে উপকূলবর্তী দেশগুলোর দ্বন্দ্বের বর্ণনা দিন।

১০. ইরানে পারমাণবিক সংকটের প্রেক্ষাপট ও উক্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হ্রাসকল্পে যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা আলোচনা করেন।

১১. পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি ব্যাখ্যা করুন এবং এর আলোকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর অবস্থান ব্যক্ত করুন।

১২. ক. কিউবা সংকট কি?
খ. যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা কতটুকু? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. দারফুর কোথায় অবস্থিত? কোন দুটি জাতি নিয়ে দারফুর সংকট সৃষ্টি হয়েছে?
০২. শয়তানের অক্ষশক্তি (Axis of evil) বলতে কোন কোন দেশকে বোঝানো হয়?
০৩. 'গ্রিন লাইন' কি?
০৪. বাফার স্টেট (Buffer State) কি?
০৫. নো ম্যান্স ল্যান্ড (No Man's Land) কি?
০৬. Jewish Protocol বা ইহুদি প্রোটোকল কি?
০৭. পিএলও'র (PLO) সদর দপ্তরের নাম কি?
০৮. ৩৮° অক্ষরেখা কি?
০৯. Sunshine পলিসি কি?
১০. জাপানের চারটি প্রধান দ্বীপের নাম লিখুন।
১১. PLO কি? এর অবিসংবাদিত নেতার নাম কি?
১২. বেলফোর কে ছিলেন? তার ঘোষণা কেন বিখ্যাত?
১৩. জেরুজালেম কেন বিখ্যাত?
১৪. রোডম্যাপ কি?
১৫. গ্রিন লাইন ও সিম লাইন কি?

টীকা

আইএস	ম্যাকাও
উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা [১১তম বিসিএস]	মিন্দানাও
সিরিয়া সংকট	গোলান মালভূমি
কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধাবস্থা	মসুল
উপসাগরীয় যুদ্ধ	কুর্দিস্তান
সানশাইন পলিসি	ইয়াসির আরাফাত ও পলোনিয়াম বিতর্ক
'Wye River' চুক্তি [২১তম বিসিএস]	সার্বভৌম রাষ্ট্র ফিলিস্তিন
কোরিয়ার যুদ্ধ	বেলফোর ঘোষণা
ইরাক যুদ্ধের সমাপ্তি	পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি
উপসাগরীয় যুদ্ধ	ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি
ইরাক-ইরান যুদ্ধ	ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা [৩০তম বিসিএস]
ইরানের ইসলামী বিপ্লব	হামাস-ফাতাহ ঐতিহাসিক ঐক্যচুক্তি
হরমুজ প্রণালী [১১তম বিসিএস]	হামাস
শাত-ইল-আরব	ফাতাহ
সুয়েজ খাল	ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি
আবু মুসা	ইউক্রেন সংকট
পশ্চিম তীর	ইয়াজিদি সম্প্রদায়
গাজা	যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণগত উত্তেজনা

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের দাবিতে গণঅসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণসমূহ বর্ণনা করে বিস্তারিত লিখুন। [৩১তম বিসিএস]

উত্তর : বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলমান রয়েছে তার জন্য বেশকিছু কারণ বিদ্যমান। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে জনগণের চাহিদা মাফিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন না করার ফলে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ জমাট বাঁধতে থাকে। আর এ ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটে ২০১১ সালে তিউনিশিয়া ও মিসরের সফল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে সেই উত্তাপের আঁচ লাগে লিবিয়া, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, জর্ডান, মরক্কো, বাহরাইন, সিরিয়া, ইরান এমনকি সৌদি আরবেও।

আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের দাবিতে গণ-অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণসমূহ : বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যেখানে গণতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে, সেখানে আরব বিশ্বে এখনো বিদ্যমান রয়েছে পুরনো ধাচের রাজতান্ত্রিক এবং একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা। পুরনো ধাঁচের এই রাজতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার খোলস থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে আরব বিশ্বের জনগণের খাপ খাওয়ানোর আকাঙ্ক্ষাই আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক গণজাগরণের মূল কারণ। নিম্নে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের দাবিতে গণ-অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **দীর্ঘদিনের অপশাসন :** আরব বিশ্বে অধিকাংশ দেশে ঐতিহ্যগতভাবে এখনও রাজতন্ত্র প্রচলিত। যেসব দেশে রাজতন্ত্র নেই সেখানে দীর্ঘদিন ধরে চলছে স্বৈরশাসন। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জোয়ার অনুসরণ করে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী শাসনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। এ অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের জমে থাকা দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই হলো সাম্প্রতিক সময়ের গণআন্দোলন।

২. **বেকারত্ব ও আয় বৈষম্য :** গত তিন দশকে আরব বিশ্বের দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। একদিকে তেলের রাজস্ব হ্রাস ও অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মাথাপিছু আয় কমে যাওয়ায় এই অঞ্চলের দেশগুলোর জনগণের আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। আরব বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথাযথ উদ্যোগও গৃহীত হয়নি। সরকারগুলো অর্থনীতির বহুমুখীকরণে ব্যর্থ হয়। নতুন বিনিয়োগের পাশাপাশি সামাজিক খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়নি। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলের তরুণ সমাজের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষোভের জন্ম নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে আরব উপদ্বীপ ও পারস্য উপসাগরের সন্নিকটবর্তী যেসব এলাকা অত্যন্ত জনবহুল সেখানে গণবিক্ষোভ সহজেই সংক্রমিত হচ্ছে।

৩. **তেল বাণিজ্য :** ১৯৭১ সালে আরব বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর তেলভিত্তিক আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপনে চেষ্টা স্বরূপ ইউরোপে রাতারাতি তেলের মূল্য ৩৫ ভাগ বেড়ে যায়। একই সময় ওপেক (অরগানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ) তেল কোম্পানির ওপর ৫০ থেকে ৮০ ভাগ ট্যাক্স বৃদ্ধি করে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র তেল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটন উডস পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটে। অর্থাৎ ওপেক সদস্য রাষ্ট্রগুলো তেলের দাম বাড়িয়েও ক্ষতির শিকার হয়। এই প্রেক্ষিতে লিবিয়া তার তেল অস্ত্রকে পশ্চিমা বিশ্বের

বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবে তেল বাণিজ্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। একইসঙ্গে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথও। ওপেক রাষ্ট্রগুলো একের পর এক তেলশিল্প জাতীয়করণের উদ্যোগ নিলে তেল কোম্পানিগুলোর মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। ফলে তেলের মূল্য বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রমূলে চলে আসে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশ আরব বিশ্বের তেল সম্পদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই অঞ্চলের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ মদদ যুগিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তি রাজতন্ত্র বা সামরিক শাসনকে সমর্থন জানিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। অধিকার বঞ্চিত এই অঞ্চলের জনগণ তাই অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে।

৪. **দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি :** আরব বিশ্বের শাসকশ্রেণীর মধ্যে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার প্রবণতা ছিল খুবই কম। শিল্পায়নের অগ্রগতি না হওয়ায় এ অঞ্চলের দেশগুলো আমদানি নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হবার ফলে আরব বিশ্বের দেশগুলোতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। জনগণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে তাল মিলাতে না পেরে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৫. **মানবাধিকার উপেক্ষিত :** সুদীর্ঘকাল থেকেই আরব বিশ্বে মানবাধিকার উপেক্ষিত হয়ে আসছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আরব বিশ্বের মানুষও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলে পরিবর্তিত হয়নি পুরনো সেই রীতি। অথচ শিক্ষিত এই জনগোষ্ঠী মানবাধিকারের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, সাম্য ও ন্যায়ের প্রতি বেশ আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল। আর শাসকগোষ্ঠীর ভাবধারা এর ঠিক উল্টো। তাই যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারগুলো এতকাল অবজ্ঞা করে এসেছে। ধীরে ধীরে কালো মেঘ ভারি হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। তাই আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে গোটা আরব বিশ্বেই।

আরব বিশ্বের দেশে দেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা : আরব বিশ্ব বা মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের অভাব ও স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর কারণে বহু বছর ধরেই অসন্তোষ বিরাজমান। বিশ শতকের পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের আফ্রিকা বা দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের হাওয়া লাগলেও আরব বিশ্বে তা ছিল অনুপস্থিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নির্যাতিত, শোষিত এবং বঞ্চিত আরব জনগণ এবার জেগে ওঠেছে। তিউনিসিয়া ও মিশরে গণবিপ্লবের মাধ্যমে তারা ক্ষমতাচ্যুত করেছে বহুবছর ধরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা লৌহ মানবদের। প্রথমে তিউনিসিয়া, পরে মিশর। তারপর সে বিক্ষোভ-আন্দোলন অনুরণন সৃষ্টি করেছে পুরো আরব বিশ্বে। আনোয়ার সা'দত, হোসনি মোবারক, বাদশা হোসেন, বাশার আল আসাদ এবং সৌদি আরবের বাদশাদের পুতুল নাচের ইতিকথা এখন শেষ হবার পথে। আরব বিশ্বে যে রাজনৈতিক সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়েছে তার দেশওয়ারী বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

লিবিয়া : ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ায় মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি চারদশক ধরে ক্ষমতাসীন ছিলেন। রাজা ইদ্রিসের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন ২৭ বছর বয়সী কর্নেল মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি। এরপর লিবিয়ার লৌহমানব হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি। ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকেই লিবিয়াকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করে আসছিলেন তিনি। এতে করে অভ্যন্তরীণ দুঃশাসন, মানবাধিকার হরণ ও বিপুল বণ্টন বৈষম্য দেখা

দেয় দেশটিতে। তিউনিসিয়া ও মিসরের গণবিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহী হয়ে লিবীয় জনগণ বিশ্বের দীর্ঘকালীন স্বৈরশাসক গাদ্দাফিকে উৎখাত করতে আন্দোলন শুরু করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে। গণবিস্ফোরণ ও সশস্ত্র অভিযানের মুখে ২২ আগস্ট ২০১১ লিবিয়ায় কর্ণেল মুয়াম্মার গাদ্দাফির ৪২ বছরের শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটলে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ২০ অক্টোবর ২০১১ সালে। এর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত লিবিয়ায় আর স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। সেখানে এখন দুটি গ্রুপ রাষ্ট্র ক্ষমতার দখলে সক্রিয় রয়েছে।

আলজেরিয়া : উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী রাষ্ট্র আলজেরিয়ায় ১৯৯৯ সাল থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন ন্যাশনাল সালভেশন ফ্রন্ট নেতা আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকা। ২৮ ডিসেম্বর ২০১০ তার পদত্যাগের দাবিতে আলজেরিয়া জুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। বেকারত্ব, আবাসন সঙ্কট, খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দুর্নীতি, বাকস্বাধীনতার অভাব এবং জীবনযাত্রার মানের ক্রম নিম্নমুখিতার কারণে ক্ষুব্ধ জনগণ এখন আন্দোলনরত। এ আন্দোলনের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ দেশটির সরকার দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে দেশ জুড়ে চলা জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়।

সিরিয়া : ১৯৬৩ সাল থেকে সিরিয়া শাসন করছে বাথ পার্টি। ঐ সময় হতে দেশটিতে সব বিরোধী দল নিষিদ্ধ করে জারি করা জরুরি অবস্থা বর্তমানেও বহাল। ১৭ জুলাই ২০০০ হতে দেশটির ক্ষমতায় আছেন হাফেজ আল আসাদের সুযোগ্য পুত্র বাশার আল আসাদ। দেশটিতে আরব বিপ্লবের ঢেউ আঘাত হানে ২৬ জানুয়ারি ২০১১। ২০১১ সালের নভেম্বরে আরব লীগ দেশটিকে বহিষ্কার করে, অন্যদিকে সিরিয়ার সরকার বিরোধী প্রধান জোট ন্যাশনাল কোয়ালিশন ১৮ মার্চ ২০১৩ দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘাসান হিত্তোকে নির্বাচিত করে। আরব বসন্তের জোয়ারে সিরিয়ায় বিদ্রোহীরা একের পর এক শহর দখল করে বাশার আল আসাদকে চ্যালেঞ্জ জানায়। পরবর্তীতে বিদ্রোহীরা দুর্বল হয়ে পড়লে আইএস সিরিয়ার বড় একটি এলাকা দখল করে সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

ইয়েমেন : মিশর ও তিউনিসিয়ার গণবিক্ষোভ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়েমেনেও হাজার হাজার লোক প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের এ বিক্ষোভ ৩১ বছর ধরে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট সালেহর নিপীড়ন, জুলুম আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের এদেশের অধিবাসীরা বর্তমানে সংকটাপন্ন। ইয়েমেনের গণজোয়ারে প্রেসিডেন্ট সালেহ পদত্যাগ করলে আবেদরাব্বু মানসুর হাদি ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ায় আল কায়েদা ও হুতিদের মতো বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সর্বশেষ হুতিরা প্রেসিডেন্টকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে প্রেসিডেন্ট হাদির অনুরোধে সে দেশের সরকারকে রক্ষায় সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন আরব জোট ইয়েমেনে বিমান হামলা শুরু করে। বর্তমানে ইয়েমের অবস্থা খুবই অস্থিতিশীল।

সুদান : পৃথিবীর সবচেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল দেশগুলোর অন্যতম আফ্রিকার বৃহত্তম রাষ্ট্র সুদানেও আরব বিশ্বের রাজনৈতিক সুনামি আঘাত হানে। ১৯৮৯ সাল থেকে দেশটির ক্ষমতায় রয়েছেন ওমর হাসান আল বশির। তার বিরুদ্ধে জারি রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা।

জর্ডান : খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বেতন-ভাতাদি নিয়ে জর্ডানে ৭ জানুয়ারি ২০১১ থেকে শুরু হয় সরকার বিরোধী আন্দোলন। বর্তমানে জর্ডানের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় আন্দোলনের মুখে বাদশা আবদুল্লাহ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সামির রিফাইর সরকারকে বরখাস্ত করে নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করে।

মরক্কো : আফ্রিকান ইউনিয়নের একমাত্র অসদস্য দেশ পশ্চিমের রাজ্য মরক্কোতে রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ এর ক্ষমতা খর্ব, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ আন্দোলন শুরু হয়।

বাহরাইন : পারস্য উপসাগরীয় ক্ষুদ্র কিন্তু তেলসমৃদ্ধ দেশ বাহরাইনের জনগণ সাংবিধানিক সংস্কার, রাজবন্দিদের মুক্তি ও নাগরিক অধিকারের দাবিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে ফুঁসে উঠেছে। আন্দোলনের শুরুটা হয় শিয়া মুসলমানদের নেতৃত্বে। বিক্ষোভকারীরা রাজধানী মানামার কেন্দ্রস্থল পার্ল স্কয়ার দখল করে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

সৌদি আরব : ২১ জানুয়ারি ২০১১ সৌদি আরবের সামতাই শহরে ৬৫ বছর বয়স্ক এক অজ্ঞাত ব্যক্তি নিজ গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেয়। সৌদির জানা ইতিহাসে আত্মাহুতির ঘটনা এটাই প্রথম। এরপর দেশজুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। সৌদি আরবের নয় মানবাধিকার কর্মী সম্প্রতি 'ইসলামিক উম্মাহ পার্টি' নামে প্রথম রাজনৈতিক দল গঠন করার ঘোষণা দেয়। নির্বাচিত শাসক, আরো বেশি নারী স্বাধীনতা এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি নিয়ে ১১ মার্চ ২০১১ সৌদি আরব জুড়ে পালিত হয় Day of Rage বা ক্ষোভের দিন। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ২৫ মার্চ ইয়েমেনে সৌদি আরব বিমান হামলার মাধ্যমে ইয়েমেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

উপসংহার : আরব বিশ্বে সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতা বা গণআন্দোলন এই অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীরই সৃষ্টি। নিজেদের স্বার্থে বা বিদেশী প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার জন্যই এ সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। যেসব দেশে আন্দোলন এখনও দানা বাধেনি সেসব দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের দ্রুত শাসন পদ্ধতি বা পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে রাষ্ট্র পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে গণআন্দোলনের মুখে নিজেদের পতন ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে।

০২ ▌ কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : কাশ্মীর মূলত একটি রাজনৈতিক সমস্যা। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভারত আর পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। অথচ মুসলিমপ্রধান কাশ্মীর ভারতের দখলে চলে যায়। কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি দুটি দেশের জন্যই দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। স্বাধীনতার জন্মলগ্নেই ভারত আর পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। সে যুদ্ধে পাকিস্তান কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ এবং ভারত অবশিষ্টাংশ লাভ করে। এরপর ১৯৬৫ সালে আবার কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে লড়াই হয়। এ যুদ্ধও জয়-পরাজয় ছাড়া অমীমাংসিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় শেষ হয়। এরপরও অব্যাহতভাবে দেশ দুটির সাথে কাশ্মীর দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে যখন কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী জনগণ পাকিস্তানের ক্ষমতার ওপর আস্থা হারিয়ে স্বাধীনতার জন্য নিজেরাই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে, তখন পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকে। পাকিস্তান গেরিলাদের অর্থ, অস্ত্র আর আশ্রয় দিতে থাকে। গৃহযুদ্ধ মোকাবিলার জন্য ভারত কাশ্মীরে লক্ষাধিক সৈন্য ও আধা-সামরিক বাহিনী পাঠায়। এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কাশ্মীরের সাধারণ জনগণ অসহায়ভাবে প্রতিদিনই তাদের স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে। কাশ্মীর সমস্যা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে ঘৃণার বীজ বপন করে, তার অর্থনৈতিক মূল্য দুটি দেশের কোটি কোটি মানুষকে অশিক্ষা আর অনাহারের অভিশাপের মধ্যে রেখেছে। একই সমস্যা পরোক্ষভাবে উপমহাদেশের তৃতীয় দেশ বাংলাদেশের ওপরও বিরূপ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে চলেছে।

কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে ভারত আর পাকিস্তানের হঠকারী শাসকগোষ্ঠীর এক পক্ষ কাশ্মীরকে নিজের দখলে রাখার জন্য এবং অন্য পক্ষ তা দখল করার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে গত পাঁচ দশক ধরে। শীতল যুদ্ধের অবসানের পর দুনিয়ার তাবৎ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় নিম্নমুখী হলেও উপমহাদেশের দেশগুলো অব্যাহতভাবে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েই চলছে। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এতই প্রবল যে, এরা পরস্পরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য শ'খানেক পারমাণবিক বোমা তৈরি করে রেখেছে। এক-একটি বোমা তৈরি আর সংরক্ষণের যে খরচ তা দিয়ে দেশ দুটি তাদের অসংখ্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচাতে পারতো। বর্তমান বিশ্বে ফিলিস্তিন আর ইসরাইল ছাড়া আর কোনো দেশ পাওয়া যাবে না, যারা ভারত আর পাকিস্তানের মতো পরস্পরকে এত ঘৃণা করে। অথচ কাশ্মীর সমস্যা যদি না থাকত তবে এ দুটি দেশ হতো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বন্ধুভাবাপন্ন। বিপদে-আপদে এরা পরস্পরকে সাহায্যে করতো। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য যৌথভাবে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। ট্যাংক, বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন আর পারমাণবিক বোমার জন্য যে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হচ্ছে তা দিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদি দূর করতে পারতো। কাজেই কাশ্মীর সমস্যাই যে উপমহাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার সবচেয়ে বড় কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হলো এ জটিল সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে? এ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করতে গিয়ে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক।

ব্রিটিশ-ভারতে অনেক স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র ছিল, যেগুলোকে তাদের নিজস্ব রাজা বা রানী ব্রিটিশ সরকারকে কর দেয়ার বিনিময়ে শাসন করতো। এই রাজ্যগুলোকে বলা হতো Princely State। ব্রিটিশ সরকার নিয়ম করে যে, Princely Stateগুলো তাদের ইচ্ছামতো ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে। কাশ্মীর মুসলিমপ্রধান রাজ্য ছিল। সঙ্গত কারণেই তার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। কিন্তু কাশ্মীরের শাসক ছিলেন এক হিন্দু রাজা এবং এর জনগণের নেতৃস্থানীয় অংশ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান। এ হিন্দু রাজার আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মৌন সম্মতি কাশ্মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে এবং এ প্রেক্ষাপটে ভারত আর পাকিস্তান যুদ্ধ করে কাশ্মীরকে ভাগাভাগি করে নেয়। ঐ যুদ্ধ শেষ হয় জাতিসংঘের মধ্যস্থতায়। কথা ছিল ভারত একটি গণভোটের আয়োজন করবে, যাতে কাশ্মীরের জনগণ ঠিক করবে তারা স্বাধীন হবে নাকি ভারত বা পাকিস্তানের অংশ হবে। কিন্তু ভারত তার এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে গড়িমসি শুরু করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি গেরিলা আর ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় বসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সিমলা চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বিবদমান সমস্যাগুলো তারা দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করবে। সিমলা চুক্তির এ ধারাটি পরবর্তীতে কাশ্মীর প্রশ্নে কোনো আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা বা গণভোটের আয়োজনের দায়িত্ব থেকে ভারতকে অব্যাহতি দিয়েছে বলে ভারত ক্রমাগত দাবি করে আসছে। দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যে কিছুতেই সম্ভব নয়, গত পাঁচ দশকের ঘটনাপ্রবাহ তার প্রমাণ। এর পরে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বছর কয়েক পূর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় পাকিস্তানের লাহোরে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দিল্লী থেকে লাহোরগামী একটি বাসে চড়ে লাহোর যান। সেখানে তিনি তাঁর পাকিস্তানি প্রতিপক্ষ প্রধানমন্ত্রী নওরাজ শরীফকে উষ্ণ আলিঙ্গন করেন এবং কাশ্মীর সমস্যা

সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রণীত কিছু শ্রুতিমধুর কথা সম্বলিত একটি কাগজে দুই নেতা স্বাক্ষর করেন। তখন এ নিয়ে সারা বিশ্বে বেশ আশাবাদ দেখা দেয় যে, এবার বুঝি বরফ গলতে শুরু করেছে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই '৯৮-এর শীতে পাকিস্তানের কিছু সৈনিক কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের ছদ্মবেশে ভারতীয় কাশ্মীরের কারগিলের বরফচূড়ায় ভারতীয় সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে দেয়। লাহোরে স্বাক্ষর করা কাগজটির মূল্য সেখানেই শেষ। অতঃপর ভারত-পাকিস্তানের বিদ্যমান ঘৃণা-বিদ্বেষ আরো তীব্র হতে থাকে। এভাবে এ যাবৎ গৃহীত কাশ্মীরবিষয়ক জটিলতা অবসানের সকল ব্যবস্থা, দলিলপত্র, প্রতিশ্রুতি, উদ্যোগ ভেস্তে গেছে।

বর্তমান পাকিস্তান ও ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের বিভাজন রেখাকে (Line of Control) আন্তর্জাতিক সীমারেখা বলে মেনে নিতে ভারত রাজি। কিন্তু কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী জনগণ আর পাকিস্তান এতে রাজি নয়। পাকিস্তান এতে রাজি না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয় কাশ্মীরের গৃহযুদ্ধ ভারত কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। ভারতীয় কাশ্মীরের জনগণকে ভারতীয় সরকার যদি খুশি করতে পারতো এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারতো তবে পাকিস্তানের ইচ্ছা থাক বা না থাক কাশ্মীর সমস্যার এক রকম সমাধান হয়ে যেত। কাশ্মীরকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের অবসান সম্ভব। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী তাদের দেশের নানা অভ্যন্তরীণ জটিলতার কারণে এবং নিজেদের উদারতার অভাবে তা করতে অক্ষম। তবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের যতগুলো পথ আছে তার মধ্যে পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনই ভারতীয় শাসকদের জন্য সবচেয়ে সহনীয়।

ভারতীয় কাশ্মীর তিনটি অংশে বিভক্ত : জম্মু, কাশ্মীর আর লাদাখ। জম্মু হিন্দুপ্রধান, লাদাখ বৌদ্ধপ্রধান আর কাশ্মীর মুসলিমপ্রধান অঞ্চল। জম্মু আর লাদাখের স্থানীয় জনগণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকার পক্ষপাতী। কাশ্মীরের মুসলিম জনতার একপক্ষ চায় স্বাধীনতা, অন্যপক্ষ চায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি। বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলারা নানা উপদলে বিভক্ত। এক ডজনের বেশি দল নিয়ে তারা গঠন করেছে হুরিয়াত কনফারেন্স। ভারত সরকার যদি মুসলিমপ্রধান অঞ্চল কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান সরকার এবং হুরিয়াতের সাথে সমঝোতায় আসতে পারে তবে সেক্ষেত্রে ছয় দশকের এ আন্তর্জাতিক সমস্যাটির দারুণ মীমাংসা হয়। এক্ষেত্রে পথ হলো বেশ কিছু জায়গা পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়া।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান অন্যভাবেও সম্ভব। ভারত ও পাকিস্তানের দখলিকৃত অংশ সংযুক্ত করে যদি স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় তবে তা হবে কাশ্মীরের জনগণের সবচেয়ে বেশি মনঃপূত। আন্তর্জাতিক শ্রেণীও বোধহয় এ ধরনের একটা মীমাংসা দেখতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র স্বাধীন কাশ্মীর দু বৃহৎ শক্তি ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে বাফার (Buffer State) হিসেবে কাজ করতে পারবে।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব তা নয়। দোষ হলো দেশ দুটির রাজনীতির অপরিপক্বতা। পাকিস্তান আবার ফিরে গেছে সেনা শাসনের পর পূর্বের অবস্থায়। যদিও ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়, কিন্তু এ গণতন্ত্রও কেবল নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশটির গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। কাশ্মীর ছাড়াও নানা বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যায় আক্রান্ত ভারতের পক্ষে তাই কাশ্মীরের ওপর বড় রকম ছাড় দেয়া খুব কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে পুরো দেশটি বিশ-পঁচিশ টুকরো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই বিশ্ববাসীকে করে দিতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব-ইসরাইল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তার মনোযোগ কাশ্মীরের ওপর আরো বাড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা অমীমাংসিত কাশ্মীর মানেই শ'খানেক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ভীতিকর সম্ভাবনা।

০৩। ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে কি কি ধরনের সঙ্কট আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন? জ্বালানি বাজারে এর কি প্রভাব পড়তে পারে? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার কেবল যুদ্ধের সম্ভাবনাই সৃষ্টি করে না, যুদ্ধের ধ্বংস সাধনের ব্যাপকতাও অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি করে। সে কারণেই পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার বিভীষিকা সকলের কাছে এখনো ভয়ানক ত্রাস। এ ধরনের বিভীষিকাপূর্ণ মারণাস্ত্রের কবল থেকে পৃথিবী তথা অনাগত ভবিষ্যতদেরকে রক্ষা করার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ করা একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চুক্তি এবং আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আইন ও নীতি অনুযায়ী ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির যৌক্তিকতা আছে কিনা সেটি এখন বিশ্বে প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে যে ধরনের সংকট আসতে পারে : তেল মজুদে বিশ্বে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরান অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক বিবেচনায় মধ্যপ্রাচ্যের একটি অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং এর দু'পাশে ইরাক, তুরস্ক, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, আর্মেনিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তবেষ্টিত দেশটিকে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত অবস্থান এনে দিয়েছে। কৌশলগত অবস্থানে থাকা ইরানের সাম্প্রতিক পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে ইরানের এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী নানা সংকট দেখা দিবে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সংঘাত :** ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক ক্রমেই সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোর অভিযোগ ইরান বেসামরিক ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির আড়ালে পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমাদের দাবি মতে, ইরান যদি পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ না করে এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পরমাণু সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তবে ইরানকে হামলার মুখোমুখি হতে হবে। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, ইরানের পারমাণবিক সংকটের যদি সহসা কোনো সুরাহা না হয়, তবে ইরানের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের যে সংঘাত ঘটবে তা মোটামুটি নিশ্চিত।

২. **ইরান-ইসরাইল সংঘর্ষ :** আলোচনার মাধ্যমে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সমস্যার সমাধান না হলে ইসরাইল ইরানে হামলা চালানোর হুমকি দিয়ে আসছে। অন্যদিকে ইরানও ইসরাইলকে পাল্টা হুমকি দিয়ে আসছে। যেমন– ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সিনিয়র কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ বলেন, ইসরাইল ইরানে হামলা চালালে সেটি হবে তাদের মারাত্মক ভুল। ইসরাইল যদি ইরানে হামলা করেই বসে তাহলে অবৈধ এ রাষ্ট্রকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা ইরানের জন্য সুযোগ বলে গণ্য হবে। জেনারেল হাজিজাদেহ আরো বলেন, ইসরাইল যেখানে লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো ছোট একটি সংগঠনের কাছে ৩৩ দিনের যুদ্ধে হেরে গেছে সেখানে ইরানের মতো একটি শক্তিশালী দেশের ওপর হামলা

চালানোর সাহস দেখায় কিভাবে? যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করবে না। কারণ তারা জানে এ অঞ্চলে তাদের সব সামরিক ঘাঁটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায়। সুতরাং হুমকি-পাল্টা হুমকি এক সময় এ দু'দেশকে যে সংঘর্ষে জড়াবে এ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

৩. **ইরানের ওপর অবরোধ আরোপ ও সংকট :** ইরানের বিতর্কিত পরমাণু ইস্যু নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব ইরানের বিরুদ্ধে একের পর এক অবরোধ আরোপ করে আসছে। ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে এমন সন্দেহে ২০০৬ সালে দেশটি আন্তর্জাতিক অবরোধের মুখে পড়ে। এরপর ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালেও নতুন করে ইরানের ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়। এসব অবরোধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সকল প্রকার অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ, সকল প্রকার ইউরেনিয়াম গবেষণা ও উন্নয়ন থেকে ইরানকে বিরত থাকতে বলা হয়। ইরানের ওপর একের পর এক অবরোধ অব্যাহত থাকলে ইরান খুব সহজেই যে অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পতিত হবে তা পরিষ্কার। তবে আশার কথা হলো ২ এপ্রিল ২০১৫ ইরানের পরমাণু বিষয়ে ইরান ও বিশ্বের ছয় শক্তির মধ্যে একটি খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩০ জুন ২০১৫ এর মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তির কথা রয়েছে। চুক্তি কার্যকর হলে ইরানের সংকট দূর হবে বলে আশা করা যায়।

৪. **ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও সংকট :** ইরানের দাবি, তাদের পরমাণু কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি তৈরি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইলসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিযোগ জ্বালানির আড়ালে পরমাণু বোমা তৈরি করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। তাদের এ অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে ইরানের তেল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ২৫ জুন ২০১২ ইইউভুক্ত দেশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যা ১ জুলাই ২০১২ থেকে কার্যকর হয়। ইরানের তেল খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে চীন বিরোধিতা করে এবং ইরান থেকে তেল আমদানি করা বেইজিংয়ের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে চীনের সাথে মার্কিন সম্পর্কের অবনতিসহ তেল আমদানিকারক দেশগুলো মারাত্মক জ্বালানি সংকটে পতিত হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল আশঙ্কা করছে।

৫. **ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি :** ইরানের পরমাণু সংকটকে কেন্দ্র করে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ইতোমধ্যে পরমাণু ইস্যুতে পশ্চিমা বিশ্বের অবরোধ আরোপের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ওপর সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলার জন্য ইরান দূরপাল্লায় ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। শাবাহ-৩ নামের এ ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি ২ হাজার কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম। যা দিয়ে ইরান ইসরাইলের মূল ভূখণ্ডে আঘাত করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এর আগে ইরান শাবাহ-১ ও শাবাহ-২ নামের স্বল্পমাত্রার ২টি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালায়। এ ২টি ক্ষেপণাস্ত্র ৩০০ ও ৫০০ কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম। অতএব, ইরানের পরমাণু ইস্যু সংকট দীর্ঘদিন জিইয়ে থাকলে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলায় ইরান যে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে তা খুবই স্বাভাবিক। আর এ প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দামামা বয়ে আনবে অনায়াসেই। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে বিশ্বশান্তিকে বিনষ্ট করবে।

৬. **হরমুজ প্রণালী ব্যবহার সংকট :** ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে হরমুজ প্রণালী ব্যবহার নিয়ে ভবিষ্যতে চরম সংকট তথা যুদ্ধাবস্থা দেখা দিবে। ইতোমধ্যে এর কিছু নমুনাও লক্ষ্য করা

গেছে। যেমন– ইরানের ওপর তেল বিক্রির নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী ইউরোপীয় দেশগুলো যাতে হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে তেল পরিবহন করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে ইরান তাদের পার্লামেন্টে একটি খসড়া আইন স্বাক্ষর করেছে। অন্যদিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে ইউরোপীয় জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে ইরানের এমন সম্ভাব্য হুমকির প্রেক্ষিতে পারস্য উপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাতে ইরান হরমুজ প্রণালীতে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মার্কিন যুদ্ধ বিমান থেকে ইরানের গভীরে হামলা চালাতে পারে।

৭. **ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি :** ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ধ্বংস করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি করে পরমাণু কর্মসূচির অনেকাংশে ঘায়েল করতে বদ্ধ পরিকর। ইরানের অভ্যন্তরীণ স্থিতি নষ্ট হওয়ার মত অনেক কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইরানের চারপাশে তৈরি করে রেখেছে। ইরাক, পারস্য উপসাগর, আফগানিস্তান, আজারবাইজান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ন্যাটো সেনা অর্থাৎ এক্সট্রা রিজিওনাল ফোর্সের (ইআরএফ) উপস্থিতি ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

৮. **ইরাক-আফগানিস্তান মিশন বাধাগ্রস্ত :** ইরানের অবস্থান এশিয়া-ইউরোপের মাঝখানে। এ কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে ইরানের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া ইরান বিশ্বের অন্যতম খনিজ জ্বালানি ও তেল সরবরাহকারী দেশ। আঞ্চলিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ইরানের তেল রাজনীতির একটা প্রভাব রয়েছে। তাই ইরান চাইলে ইরাক-আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশন বাধাগ্রস্ত করতে পারে। মোটকথা ইরানের স্বার্থে আঘাত লাগলে ইরান মার্কিন স্বার্থেরও ব্যাঘাত ঘটাতে চাইবে এটাই বাস্তবতা।

৯. **ইরান-সৌদি নেতিবাচক সম্পর্ক :** সৌদি আরবের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গলায় গলায় খাতির। ভূ-রাজনৈতিক, কৌশলগত ও স্বার্থ বিবেচনায় সৌদি আরব ইরানকে ঘোরতর শত্রু মনে করে। ধর্মীয় দিক থেকেও দূরত্ব আছে বিস্তর। ইরানে বিপ্লব হওয়ার পর আরব নেতাদের মনে ভয় ঢুকে যায়। ইরানের বিপ্লবী চেতনা ও শিয়া মত তাদের দেশে না আবার আমদানি হয়। ইরান সৌদির এ পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালালে সৌদি আরব যে মার্কিন সমর্থন দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তা হলে একদিকে ইরান-সৌদি ঘোরতর নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হবে এবং আরব বিশ্ব হয়ে পড়বে দ্বিধাবিভক্ত। সর্বশেষ ইয়েমেন যুদ্ধ নিয়ে ইরান ও সৌদি আরব ছায়াযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১০. **ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত :** ইরান নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের বিরোধের কারণে ইরানের এ প্রকল্প সফল হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। আর যদি তা হয় তাহলে ইরান ভবিষ্যতে গভীর বিদ্যুৎ সংকটে পতিত হবে।

ইরানের পারমাণবিক ইস্যু সংকটের দরুন জ্বালানি বাজারে প্রভাব : ইরানের পারমাণবিক ইস্যু সংকটের দরুন জ্বালানি বাজারে এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি :** ইরানের ওপর পশ্চিমা বিশ্বের তেল নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য শতকরা ৯ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ জুলাই ২০১২ এর আগেই লাইট সুইট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯ দশমিক ৪ ভাগ বেড়ে ৮৪

দশমিক ৯৬ এ দাঁড়িয়েছে। ২০০৯ সালের পর থেকে মাত্র একদিনে তেলের দাম বাড়ার এমন উচ্চ হার আগে দেখা যায়নি। তবে বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের দাম সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

২. **ইরানের নতুন গ্রাহক সন্ধান :** পশ্চিমা বিশ্ব ইরানের তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ফলে ইরান পশ্চিমা বিশ্বের বিকল্প দেশ অনুসন্ধান করছে। অর্থাৎ ইরান তার উৎপাদিত তেল বিক্রির জন্য নতুন গ্রাহকের অনুসন্ধান করছে।

৩. **পেট্রোলিয়াম ও তেল রপ্তানি হ্রাস :** পেট্রোলিয়াম ও তেল রপ্তানির ওপর ইরানের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইরানের পেট্রোলিয়াম ও তেল রপ্তানি হ্রাস পাবে। এতে করে ইরান যেমন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি ইরানের উপর তেলনির্ভর দেশগুলো জ্বালানি সংকটে পতিত হবে।

৪. **ইরান ব্যতীত অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশ লাভবান :** ইরানের পরমাণু ইস্যু সংকটে ইরান ব্যতীত অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। অর্থাৎ আলজেরিয়া, এঙ্গোলা, ইরাক, ভেনিজুয়েলা, লিবিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নাইজেরিয়া, কুয়েত, কাতার প্রভৃতি দেশগুলো তেল বিক্রি করে লাভবান হবে খুব সহজেই।

৫. **ইরান-পাকিস্তান গ্যাস সংযোগ ও মার্কিন উদ্বেগ :** ২০১২ সালে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী ইরান-পাকিস্তান গ্যাস লাইন সংযোগের উদ্বোধন করেন। পাকিস্তান তার দীর্ঘস্থায়ী জ্বালানি সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য এই মাল্টি বিলিয়ন ডলারের প্রকল্পে হাত দেন। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ হলো এই পাইপলাইনের মাধ্যমে যদি ইরানকে আরো গ্যাস বিক্রির সুযোগ করে দেওয়া হয়, তবে ইরানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের চেষ্টাকে হেয় করা হবে।

শেষকথা : পারমাণবিক ইস্যুতে এ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি এবং আইনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরমাণু কর্মসূচি চালানোর অধিকার প্রতিটি দেশের আছে। সেক্ষেত্রে ইরান শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরমাণু কর্মসূচি চালাতেই পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পিছনে পরমাণু ইস্যুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ইরান ইসলামী দেশ হিসেবে। উত্তর কোরিয়াও পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু উত্তর কোরিয়ার ওপর কোনো চাপ নেই। এদিকে নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ক্ষমতা গ্রহণ করে ঘোষণা দেন ইরানের রকেট প্রযুক্তিতে সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হবে। তিনি আরো বলেন ইরান যদি পারমাণবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখে তাহলে দেশটি আরো একা হয়ে যাবে। পরবর্তীতে ওবামা মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন এবং মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে নানা আশ্বাস দিলেও কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করেননি।

০৪ । আপনি কি অদূর ভবিষ্যতে দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণের কোনো সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। যদি করেন তবে এই পুনরেকত্রীকরণের সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প কি হতে পারে? *[২১তম বিসিএস]*

উত্তর : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ কোরিয়া উপদ্বীপ নামে বিশ্বে পরিচিত ছিল। দেশ দুটো দীর্ঘদিন যাবৎ এক ভাষা, এক সংস্কৃতি এবং অখণ্ড জাতিসত্তার চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্ব দুই পরাশক্তির অধীনে দুটো ব্লকে বিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে দুই কোরিয়া বিভক্ত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দুই কোরিয়া এক সময় চীন ও জাপানের করদরাজ্য ছিল। ১৯০৪-০৫ সালে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে এক যুদ্ধে কোরিয়া জাপানের করদরাজ্যে পরিণত হয়।

কোরিয়ার স্বাধীনতা ও বিভক্তি : ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের সুযোগে কোরিয়া ৩৫ বছর পর জাপানের উপনিবেশমুক্ত হয়। স্বাধীন হলেও কোরিয়ার দক্ষিণাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে, অপরদিকে উত্তর কোরিয়া দখল করে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৫০ সালে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করার পর দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তিন বছর যাবত তা চলতে থাকে। ১৯৫০ সালের ২৫ জুন সীমান্ত উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়া ৩৮° অক্ষরেখা অতিক্রম করলে দক্ষিণ কোরিয়া সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে চীন উত্তর কোরিয়ার পক্ষ নেয়, অপরদিকে জাতিসংঘ দক্ষিণ কোরিয়াকে সহায়তা করার জন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানায়। উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই। যুদ্ধবিরতির পরপরই দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিশ্চয়তা প্রদান করে। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর থেকেই উভয় দেশের মধ্যে একটা বৈরীভাব বিরাজ করছে।

৫০-এর দশকে দেশ দুটো বিভক্তির পর অনেক পরিবার তাদের আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালে বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলোর পুনর্মিলনের ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হয় এবং এ ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়। তবে দেশ দুটোর মধ্যে শত্রুতা ও সন্দেহ বিরাজ করায় চুক্তিটি কার্যকর হয়নি।

দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়ার সাথে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগে Sunshine পলিসি গ্রহণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংঘাতের পথ পরিহার করে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা। এছাড়া উত্তর কোরিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তিশালী করাও এ পলিসির মূল উদ্দেশ্য।

দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ : পুনরেকত্রীকরণের প্রচেষ্টায় অতীতে দুই কোরিয়ার মধ্যে বেশ কয়েকবার আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সেগুলো কখনোই বাস্তবতার মুখ দেখেনি। কারণ উত্তর কোরিয়া বরাবরই একটি Confederation গঠনের ব্যাপারে আগ্রহী, অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়া দু দেশের পরিপূর্ণ একত্রীকরণে আগ্রহী।

কোরীয় শীর্ষ সম্মেলন : ২০০০ সালের ১৩-১৫ জুন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং ইল-এর সাথে পিয়ং ইয়ং-এ প্রথমবারের মতো শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। এ শীর্ষ সম্মেলন গোটা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয় নেতা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল :

ক. ১৯৪৫ সালের বিভক্তির পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোর সফর বিনিময় এবং একত্রীকরণের ব্যবস্থা করা।

খ. একত্রীকরণের লক্ষ্যে সহযোগিতা ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ. উত্তর-দক্ষিণ উভয়ে যৌথভাবে নিজেদের অর্থনীতি, আন্তঃকোরিয়া বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

ঘ. যে কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে দু দেশের সেনাপ্রধানরা হটলাইনের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ মার্চ ২০০৫ উত্তর কোরিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। ঐ বছর ২৫ মার্চ স্বাক্ষরিত হয় দু'দেশের মধ্যে টেলিযোগাযোগ চুক্তি। ২০০৬ সালের ৯ অক্টোবর উত্তর

কোরিয়া প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালালে কোরীয় উপদ্বীপে নেমে আসে শীতল অবস্থা। এরপর ২০০৭ সালে দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের ক্ষেত্রে আরেক মাইলফলক ঘটনা ঘটে যখন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট রোহ মু হিউন দু'দেশের সীমান্তরেখা বরাবর হেঁটে উত্তর কোরিয়ায় পৌঁছান। অনুষ্ঠিত হয় ৫৯ বছরের মধ্যে দুই কোরিয়ার মধ্যে এ দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক। ২-৪ অক্টোবর ২০০৭ অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে দু কোরিয়ার নেতারা কোরীয় যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘোষণা এবং কোরীয় উপদ্বীপে স্থায়ী শান্তি আহ্বান জানিয়ে ৮ দফার যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর ১৬ নভেম্বর ২০০৭ দুই কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১১ ডিসেম্বর ২০০৭ দুই কোরিয়ার মধ্যে প্রথমবারের মতো নিয়মিতভাবে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। ২০০৮ সালে তেমন কোনো অগ্রগতি না ঘটলেও শেষদিকে এসে দুই কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। এরপর কমিটি ফর দি পিসফুল রি-ইউনিফিকেশন অব কোরিয়া যে বিবৃতি প্রদান করে, যার ফলে দু দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এরই ফলশ্রুতিতে উত্তর কোরিয়া ৩০ জানুয়ারি ২০০৯ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সব ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি বাতিল করে। এর পাশাপাশি ১৯৯৯ ও ২০০২ সালের মধ্যে রক্তক্ষয়ী চুক্তিসহ সংঘাত অবসানের সব চুক্তি অকার্যকর করারও ঘোষণা দেয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ উত্তর কোরিয়া তৃতীয়বারের মতো সফল পরমাণু পরীক্ষা চালালে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ অবস্থায় জাতিসংঘ নতুন করে পিয়ংইয়ং-এর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা কঠোরতর হওয়ার জবাবে উত্তর কোরিয়া ১১ মার্চ ২০১৩ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে হটলাইন ও অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং শত্রুকে নিধন করার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তার সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানায়। এরপরই শুরু হয় দু পক্ষের মধ্যে বাগযুদ্ধ। প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়ার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পার্ক জিউন হাই উত্তর কোরিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরমাণু বোমা, দূরপাল্লার মিসাইল এবং যুদ্ধের উসকানি পরিহার করতে বলেন। এর জবাবে ২৬ মার্চ ২০১৩ উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে দেয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, পিপলস আর্মির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাদের দূরপাল্লার রকেট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ সব ধরনের গোলন্দাজ বাহিনীকে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় আরেক দ্বীপ গুয়ামে অবস্থিত এর অন্য সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়। এমতাবস্থায় কোরিয়ার একত্রীকরণ প্রক্রিয়া আবারও অন্ধকারে নিপতিত হলো।

দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ কি সম্ভব : দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ সম্ভব কিনা তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং সেই সুবাদে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের প্রেক্ষাপটে নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনালগ্নে বিভক্ত কয়েকটি দেশ একীভূত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় জার্মানি, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেনের একত্রীকরণের ঘটনাসমূহ। তবে আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে কোরিয়ার অবস্থা তুলনামূলকভাবে একটু ভিন্ন হিসেবে বিবেচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই কোরিয়ার মধ্যকার শীর্ষ সম্মেলনকে স্বাগত জানালেও তার মধ্যে একটা সংশয় বা উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা থাকতে পারে যে, দুই কোরিয়ার পুনরেত্রীকরণের ফলে কোরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাব'দী চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে। দুই কোরিয়া একীভূত হলে এ অঞ্চলে কোরিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে যার ফলে ইন্দো-চীনের প্রভাব সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এ মুহূর্তে কোরিয়ান ঐক্যের ব্যাপারে চীনের প্রতিক্রিয়া জানাটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে বিতর্কের সীমা নেই। দুই কোরিয়ার মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে, যা পুনরেকত্রীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন—

১. **অর্থনৈতিক বৈষম্য :** দুই কোরিয়ার মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান। এ মুহূর্তে দুই কোরিয়া এক হলে দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর বিরাট একটা অর্থনৈতিক চাপ পড়বে। যেমনটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল দুই জার্মানির একত্রীকরণের সময়। কাজেই দক্ষিণ কোরিয়ার নীতি হচ্ছে উত্তর কোরিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে মোটামুটি শক্তিশালী করার পর পুনরেকত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হওয়া।

২. **সামাজিক বৈষম্য :** দীর্ঘ ৬৩ বছর যাবৎ দুই কোরিয়া দুই ধরনের সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত। দক্ষিণ কোরিয়া শক্তিশালী উন্মুক্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অভ্যস্ত, অপরদিকে উত্তর কোরিয়া সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় অভ্যস্ত। জার্মানিতেও একই অবস্থা বিরাজ করলেও মূলত তৎকালীন চার পরাশক্তির (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন) উদ্যোগের ফলে একীভূত প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। কোরিয়ার ক্ষেত্রে পরাশক্তিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন। এজন্য ঠিক এ মুহূর্তে একীভূতকরণ হয়তো সম্ভব নয়।

৩. **মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব :** দুই কোরিয়া একীভূত হলে সরকারে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরিতেও উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে সঙ্গত কারণেই উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে আছে। ফলে মুক্ত প্রতিযোগিতা হলে উত্তর কোরিয়ার পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। যেমনটা জার্মানিতে ঘটছে। এ আশঙ্কা থেকে অনেক উত্তর কোরিয়ান একীভূত প্রক্রিয়ার বিরোধী।

এত কিছুর পরও দুই কোরিয়ার জনগণ পুনরেকত্রীকরণের পক্ষে। জার্মান, ইয়েমেনের একত্রীকরণের পর দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। ছোটখাট সমস্যা এবং কিছু কিছু সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারলে দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ সময়ের দাবি।

বিশ্ব রাজনীতিতে একত্রীকরণের প্রভাব : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দীর্ঘ ছয় দশক যাবৎ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বিরাজ করছে। এই সুদীর্ঘ সময় ধরে উভয় দেশ বিশ্বব্যবস্থার দীর্ঘদিনের বিবদমান দুই পরাশক্তির অধীনে থাকায় উভয় দেশের মধ্যে চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, দর্শন এবং আবেগ-অনুভূতিতে স্পষ্ট একটা প্রভেদ লক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও উভয় দেশের ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও অবস্থান বিদ্যমান। ফলে দুই কোরিয়ার একত্র হওয়ার বিষয়টি যেমন একটু জটিল, তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও এর একটা ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দুই কোরিয়ার একত্র হওয়ার বিষয় এখন কেবল উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও একটা প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। একত্রীকরণের সাথে কোরিয়ার প্রতিবেশী চীন ও জাপানের স্বার্থ যেমন জড়িত, ঠিক তেমনি বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টিও উল্লেখ করার মতো।

দীর্ঘ ৬৩ বছর যাবৎ বিভক্ত দুই কোরিয়া দুই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অভ্যস্ত। এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী (Capitalist) ব্যবস্থা অনুশীলন করায় স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার সখ্য বেশি। পক্ষান্তরে উত্তর কোরিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসরণ করায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহের সাথে এর সখ্য গড়ে ওঠে। দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণের সাথে প্রতিবেশী দেশসমূহ, বিশেষ করে চীন ও জাপানের দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা প্রত্যক্ষ তাৎপর্য রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বব্যবস্থায় দারুণ একটা পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন দেশের রাজনীতির সাথে পরাশক্তিদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্বার্থের যে একটা সংশ্লেষণ ছিল, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর সেটার সমাপ্তি ঘটেছে। কাজেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পরাশক্তিদ্বয়ের ইন্ধনের ফলে আঞ্চলিক যে বৈরিতা ছিল তারও অবসান ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে একক পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৫০-এর দশকে কোরিয়া যুদ্ধের পর থেকে উত্তর কোরিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে চরম বৈরিতায় নিমজ্জিত ছিল। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে ছিল। অর্থনৈতিকভাবে দেশটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় দেশটি পারমাণবিক অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র (Weapons of Mass Destruction) তৈরির গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন পশ্চিমা বিশ্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশটি এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকলে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় নতুন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে উত্তর কোরিয়াকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড় থেকে বিরত রেখে এতদঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

উভয় কোরিয়ার একত্রীকরণের ফলে এতদঞ্চলের অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে ৫০-এর দশকে উভয় কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সূত্র ধরে দক্ষিণ কোরিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। মার্কিন সৈন্য অবস্থানের ফলে উত্তর কোরিয়াকে বেশ চাপের মধ্যে থাকতে হয়। তবে মার্কিন সৈন্যের অবস্থান কেবল উত্তর কোরিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়ার ওপরই প্রভাব সৃষ্টিকারী নয়, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। এতদঞ্চলের সামরিক ও কৌশলগত বিষয়াবলীর প্রতি তদারকি ও নজরদারির জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সামরিক শক্তির উপস্থিতির পেছনে একটি ভিন্নধর্মী কারণ রয়েছে। কোরিয়া উপদ্বীপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এলে এতদঞ্চলে মার্কিন শক্তির উপস্থিতি অনেকটা যুক্তিহীন হয়ে পড়বে আর এ অঞ্চল থেকে মার্কিন সামরিক শক্তি প্রত্যাহার করা হলে এখানকার মার্কিন তদারকি বেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের উত্তর কোরিয়া সফরকে স্বাগত জানালেও উভয় কোরিয়ার একত্রীকরণের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটা আগ্রহী তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ মুহূর্তে উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র এবং মিসাইল গবেষণা থেকে বিরত রাখতে পারাটাই পশ্চিমাদের মূল লক্ষ্য, তবে একত্রীকরণের বিষয়টা আরো অনেক কৌশলগত ফ্যাক্টরের (Strategic factors) ওপর নির্ভরশীল। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ বৈঠকে পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের State Department-এর মুখপাত্র মি. ফিলিপ রিকার-এর বিবৃতির মাধ্যমে এ অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। তিনি বলেন, আমরা আশাবাদী যে, এ শীর্ষ সম্মেলন এমন একটা প্রতিক্রিয়ার সূচনা করবে, যা উত্তেজনা মৌলিকভাবে হ্রাসকরণের দিকে নিয়ে যাবে (We are hopeful that this summit will represent the beginning of a process which will lead to fundamental reduction of tensions.)

সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এবং অনেক পর্যবেক্ষকও মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মুহূর্তে দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের ব্যাপারে যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী এতদঞ্চলের অস্ত্র প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও পরীক্ষা থেকে নিবৃত্ত রাখা।

এর আওতায় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সহযোগিতার বিনিময়ে উত্তর কোরিয়া পরমাণু কর্মসূচি বন্ধে সক্ষম হয় এবং সে মোতাবেক ২৭ জুন ২০০৮ উত্তর কোরিয়া তার প্রধান পরমাণু স্থাপনা ধ্বংস করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১১ অক্টোবর ২০০৮ যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী দেশের তালিকা থেকে বাদ দেয় উভয় কোরিয়াকে।

জাপান : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো জাপানও দক্ষিণ কোরিয়ার মিত্র দেশ হিসেবে পরিচিত। জাপান কোরিয়ার প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় এ দুটো দেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয়ের সাথে জাপানের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুই কোরিয়ার ব্যাপারে জাপানের নিজস্ব পলিসির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ক. কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

খ. চীন ও জাপানের মধ্যে কোরিয়াকে buffer state (দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ রোধে তাদের মধ্যস্থলে স্থাপিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র) হিসেবে বিদ্যমান রাখা।

গ. নিরাপত্তা ও অস্ত্র বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত হিসেবে নিশ্চিত করা।

ঘ. উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র কর্মসূচি বন্ধ করা ইত্যাদি।

বর্তমানে কোরিয়ান ইস্যুতে জাপানের খুব সীমিত অংশগ্রহণ রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে উত্তর কোরিয়ায় যে কোনো ধরনের পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অবশ্যই জাপানের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, জাপান তার নিরাপত্তার স্বার্থে সে দেশে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি সমর্থন করে। বর্তমানে জাপান উত্তর কোরিয়াকে এতদঞ্চলে এক নম্বর শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে। দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ জাপানের এই হুমকি (Threat perception) অনেকাংশে হ্রাস করবে। এক শ্রেণীর লোকজন যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, একত্রীকরণের পর এতদঞ্চল থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। তবে অন্য শ্রেণীর লোকজন মনে করেন যে, এ অঞ্চল থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করলে জাপান অস্ত্র উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা কোরিয়া কারোরই পছন্দনীয় নয়।

চীন : চীনও উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়ার একটি নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক উন্নত হলে মূলত কূটনৈতিকভাবে চীনই সবচেয়ে লাভবান হবে। কারণ এ অঞ্চলে কোনো সংঘর্ষ বাঁধলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চীনও তাতে জড়িয়ে পড়বে। আর উত্তর কোরিয়া হচ্ছে চীনের মিত্ররাষ্ট্র। বর্তমানে উত্তর কোরিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা দারুণভাবে সঙ্কটাপন্ন। সেখানে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে চীন কোনোভাবেই উত্তর কোরিয়ার এ দুরবস্থাকে সমর্থন করতে পারে না। অনেকে মনে করেছেন, উত্তর কোরিয়ার বর্তমান অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে দেশটির আকস্মিক পতন (Collapse) ঘটতে পারে। চীন দেশটির পতন ঠেকাতে আগ্রহী।

চীন মনে করে, দেশ দুটোর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন ঘটলে এর ফলে উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, যা কেবল উত্তর কোরিয়ার পতনই ঠেকাবে না, বরং সে দেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দূর করবে। চীন কখনোই চায় না যে, তার মিত্ররাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' (Rogue state) হিসেবে বিরাজ করুক। তাছাড়া উত্তর কোরিয়ার নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে সে দেশের উত্তর সীমান্ত থেকে লোকজন পালিয়ে চীনে আশ্রয় নিতে পারে। সেক্ষেত্রে চীনে শরণার্থী সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা চীনের জন্য কোনোভাবেই কাম্য নয়। এজন্যই চীন সব সময়ই কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়।

আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ কারণে চীন অত্র এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। তা হলো :

বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে যে মার্কিন সৈন্য রয়েছে তা চীনের জন্য অনেকটা অস্বস্তিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত। তাইওয়ান প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত মনোভাবের কারণে এতদঞ্চলে বিরাজমান

মার্কিন সৈন্যকে চীন তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে মনে করে। দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের ফলে এতদঞ্চলে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতির যৌক্তিকতার অবসান ঘটবে। ফলে স্বভাবতই চীন দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ তথা এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে সমর্থন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রসমূহ (Rogue state) যেমন—উত্তর কোরিয়া, ইরান ও ইরাক থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় Theatre Missile Defence (TMD) কর্মসূচির আওতায় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের এ গবেষণার ঘোর বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৬০ বিলিয়ন ডলার বাজেট নির্ধারণ করেছে। দুই কোরিয়া একত্র হলে যুক্তরাষ্ট্রের 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের হুমকির' যুক্তির অবসান ঘটবে এবং TMD-র বিরুদ্ধে চীনের প্রচারণা জোরদার হবে। এজন্য চীন দুই কোরিয়ার একত্রীকরণকে সমর্থন করে।

উপসংহার : পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের পেছনে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও কতিপয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তা এ মুহূর্তে বেশ কঠিন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ আঞ্চলিক পরাশক্তিসমূহের আন্তরিক ইচ্ছা ও বাস্তব উদ্যোগ না থাকলে তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কৌশলগত রাজনীতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে, দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ এ মুহূর্তে সম্ভব নয়; তবে উভয় দেশের জনগণ ও নেতৃত্ব পর্যায়ে যদি শক্তিশালী ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি থাকে তাহলে একত্রীকরণ সময়ের ব্যাপার মাত্র। দুই কোরিয়া একত্র হলে উত্তর কোরিয়ার সমরশক্তি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক শক্তির সমন্বিত রূপ দেশটিকে একটি আঞ্চলিক পরাশক্তিতে রূপান্তর করবে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫। 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে'— ফিলিস্তিন সমস্যার আলোকে এ উক্তির যথার্থতা বিচার করুন।

উত্তর : স্নায়ুযুদ্ধ শেষে যেহেতু রাশিয়া নখ-দাঁতহীন হয়ে পড়েছে, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বে মুরুব্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের একক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি তার মুরুব্বীয়ানার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিইয়ে রেখেছে জাতিগত সংঘাত এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বৈরি সম্পর্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোষানলে পড়েছে মুসলিম দেশগুলো। তাদের এ নগ্ন চেহারা প্রকাশ করেছেন ১৯৯৩ সালে পুঁজিবাদী সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোগী বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Samuel P. Huntington (স্যামুয়েল পি হান্টিংটন) তার সভ্যতার সংঘাত বা The Clash of Civilization নামক থিসিসে। এ থিসিসের মূল বক্তব্য হলো— সভ্যতাসমূহের মধ্যকার সংঘাত হবে আধুনিক বিশ্বের বিরোধের ক্রমবিকাশের সর্বশেষ পর্যায়। এ থিসিসে তিনি মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টান জগতের ১৩০০ বছরব্যাপী ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের উল্লেখ করে ইসলামকে মার্কিনিদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তার এ থিসিসের কড়া সমালোচনা করেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত প্রয়াত অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদ (Edward W. Said) এবং ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামী। খাতামী হান্টিংটন থিসিসের সমালোচনা করে বলেন, এটা পাশ্চাত্য দুনিয়ার উগ্র জাতীয়তাবাদী কিছু পণ্ডিতের ইসলামের প্রতি বিরোধকে দীর্ঘায়িত, উত্যক্ত ও গভীরতর করার একটি অপপ্রয়াস। এ প্রেক্ষিতে তিনি 'Dialogue Among Civilization' শীর্ষক একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, নেতিবাচক অমানবিক দ্বন্দ্বের স্থলে সভ্যতাসমূহের মধ্যে ইতিবাচক ও সুফল প্রদানকারী আলাপ-

আলোচনায় আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘ ২০০১ সালকে Year of Dialogue Among Civilization বা সভ্যতাসমূহের মধ্যে মতবিনিময় বছর বলে ঘোষণা করে। তাই শক্তির মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। এ যাবত বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান হয়েছে সংলাপের মাধ্যমে। আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ফিলিস্তিন সমস্যা : ফিলিস্তিন সমস্যা বিশ্বের জটিলতম সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীব্র এবং প্রাচীন। এটি বিগত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে রেখেছে, যার প্রভাব গোটা বিশ্বে নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে। এর ফলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক যেমন খারাপ হয়েছে তেমনি বৃহৎ শক্তিগুলো এ সমস্যার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত এ প্রাচীন জনপদের অধিকাংশ আধুনিক ইসরাইল, কিছুটা জর্ডান এবং কিছুটা মিশরের দখলে। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে কারণে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এ এলাকা তিনটি মহাদেশের সংযোগ স্থল, সমগ্র বিশ্বের প্রায় ৭৫% তেল উৎপাদন এবং এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সমুদ্র ও আকাশ পথের যোগাযোগ। ফলে বৃহৎ শক্তিগুলো এ এলাকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। মূলত বৃহৎ শক্তিগুলোর 'ধরি মাছ না ছুই পানি' নীতির কারণেই ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান আজও সম্ভব হয়নি।

সমস্যার কারণ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ইহুদিরা মনে করে, আজকের ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলসহ আশেপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাজা ছিলেন বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নবী হযরত দাউদ (আ) এবং তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মান (আ)। এখন থেকে দুই হাজার নয়শ বছর আগেকার সেই ঘটনা। আধা ইতিহাস, আধা পৌরাণিক কাহিনী মিলে গড়ে উঠেছে সেই রাজত্বের ইতিহাস। স্মৃতি ও শ্রুতি গাঁথার নিরিখে আজকের ইহুদিরা দখল করে বসছে প্রাচীন ফিলিস্তিনের জমিন। এখানে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই হারানো Kingdom of David। প্রাচীন সাম, কেনান, বাবেল জুড়ে গড়ে উঠবে আগামী দিনের সেই রাষ্ট্র—ভূমধ্যসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহুদিরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে তিন হাজার বছর ধরে দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়েছে। এখন তারা সেই হারানো রাজ্য দখল করে কায়েম করতে চায় নতুন রাজত্ব। আর এজন্যই প্রয়োজন ফিলিস্তিন ভূখণ্ড। ইহুদিদের এ আজব খায়েশের মাশুল দিতে হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের। তারা ধ্বংস ও উৎখাত হচ্ছে শত প্রজন্মের ভিটামাটি থেকে। আর ইহুদিদের—এ অন্যায় আকাঙ্ক্ষার মূল মদদদাতা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ফিলিস্তিন ইসলাম, ইহুদি এবং খ্রিস্টান এ তিন ধর্মের মানুষের নিকট পবিত্র বলে বিবেচিত। মুসলমানগণ একে পবিত্র মনে করে কারণ তাদের প্রথম কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস, যা জেরুজালেমে অবস্থিত। খ্রিস্টানরা একে পবিত্র মনে করে কারণ যিশুখ্রিস্ট বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানে ধর্মপ্রচার করেন। আর ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে তাদের আদি বাসভূমি বলে দাবি করে। এর অধিকারের প্রশ্নে অতীতে অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে এবং অনেক বার এর হাত বদল হয়েছে। ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে মন্দির ধ্বংস করে দেয়ার পর ইহুদিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানদের বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটে। কারণ তৎকালীন ফিলিস্তিনের শাসক তুরস্ক এ যুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধে জার্মান পরাজিত হলে তুরস্ক এর কর্তৃত্ব হারায় এবং ১৯১৭ সালে ব্রিটিশরা তুর্কি সাম্রাজ্যের কাছ থেকে ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। এ বছর তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর ইহুদি সংগঠনের সভাপতির কাছে এক পত্রে অঙ্গীকার করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি

সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এটি 'বেলফোর ঘোষণা' নামে পরিচিত। এ ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদি রাষ্ট্র তথা আজকের ইসরাইল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে এবং এরই প্রেক্ষিতে ইসরাইল ১৯৪৮ সালে 'ইহুদি রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা দেয়। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরাইল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আরব সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে এবং প্রথম ফিলিস্তিন যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মূলত ১৯৪৮ সাল থেকে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা অদ্যাবধি চলছে। ১৯৫৬ সালে মিশর সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করলে দ্বিতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধের শুরু হয়। এরপর ১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল মিশর, সিরিয়া, জর্ডান আক্রমণ এবং সিনাই, পশ্চিম তীর, গাজা ও গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। ইসরাইলের এ হামলা সীমিত পরিসরে এখনো অব্যাহত।

ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে শান্তি আলোচনা : মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় মিশর ও ইসরাইলের মধ্যকার ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। তবে শান্তি আলোচনার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে নিচের বিষয়গুলো– ১. জেরুজালেমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ২. মার্কিন স্বার্থ, ৩. মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব, ৪. ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থন, ৫. ফিলিস্তিনের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন, ৬. জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, ৭. আরব দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব, ৮. ইসরাইলের কট্টরপন্থী লিকুদ পার্টি, ৯. ধর্মীয় গুরুত্ব, ১০. ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু সমস্যা। তবে এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা অব্যাহত রয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটনে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। ১০ সেপ্টেম্বর পিএলও ও ইসরাইল পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও পিএলও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনের অদূরে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ও ইসরাইলের মধ্যে 'ওয়াই রিভার' বা 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। ২০০৩ সালের ৩০ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে প্রণীত একটি শান্তি পরিকল্পনা 'রোডম্যাপ' আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জাতিসংঘ এবং রাশিয়ার সমন্বিতভাবে প্রস্তাবিত এ রোডম্যাপের খসড়া প্রস্তুত ও অনুমোদন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বছর দুই ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত কিছুটা হ্রাস পায়। ২০০৫ সালে গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে ইহুদি বসতি প্রত্যাহার করে নেয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়। কিন্তু ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনে আবারও শুরু হয় সংঘাত ও ইসরাইলি হত্যাযজ্ঞ। ফিলিস্তিনের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধীনতাকামী ও ইসলামপন্থী দল হিসেবে পরিচিত হামাসের বিজয় লাভের পরই শুরু হয় এ ধ্বংসযজ্ঞ। ২০০৭ সালে হামাস সরকার পদত্যাগ করলে ফাতাহ গ্রুপের সাথে আবারও শুরু হয় তথাকথিত শান্তি আলোচনা। দীর্ঘ ১০ বছর পর ২৭ নভেম্বর ২০০৭ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের অ্যানাপোলিসে বৈঠকে বসেন ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের শীর্ষ দুই নেতা। একদিন ঐ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলনে ২০০৮ সালের মধ্যেই একটি ব্যাপকভিত্তিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে সংলাপ শুরু করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের উপস্থিতিতে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন নেতারা সম্মত হয়। কিন্তু এরপর সম্পর্কোন্নয়নের কোনো লক্ষণ নেই। এর মধ্যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ফিলিস্তিনিরাই দু'ভাগ করে দু'অংশে কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। একদিকে ফাতাহ শাসনে পশ্চিম তীর এবং অন্যদিকে হামাস শাসিত গাজা এলাকা। পশ্চিম তীরে ইসরাইলের সমর্থকগোষ্ঠী ফাতাহ ক্ষমতায় থাকায় মোটামুটি মুক্ত থাকলেও হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজাকে তারা অবরুদ্ধ করে রেখেছে গত প্রায় দু'বছর যাবৎ। এমতাবস্থায় ২০০৮ সালের শেষদিক থেকে গাজায় শুরু হয়েছে ইসরাইলি বর্বরতা। হামাস নির্মূলের নামে গাজায় চালানো

হয় নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ৮ জুলাই ইসরাইল আবারো গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। প্রায় ২২০০ ফিলিস্তিনি হত্যার মধ্য দিয়ে ইসরাইল টানা দেড় মাসের হামলা বন্ধ করে। কিন্তু ফিলিস্তিনে ইসরাইলি নিপীড়ন এখনো থেমে নেই। ইসরাইল বিনা উস্কানিতে নিরীহ নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের ওপর যে হত্যাযজ্ঞ গত ৬৭ বছর ধরে চালিয়ে আসছে তার সুরাহা করতে হবে আলাপ-আলোচনা এবং সম্মানজনক সমঝোতার মাধ্যমে। ইসরাইলিরা ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে আলোক প্রদর্শনী করে। আর একই দিন ফিলিস্তিনের জনগণ পালন করে 'আল নাকবা' বা 'বিপর্যয় দিবস' হিসেবে। বিশ্ব ইতিহাসে এমন ঘটনা বুঝি এই একটাই যেখানে একটি দেশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অন্য একটি দেশ বিপর্যয় দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। নিজ ভূমিতে পরবাসী করে গড়ে তোলা আজকের ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান না করলে আগামীর বিশ্ব হবে আরও ভয়াবহ।

সার্বভৌম রাষ্ট্র ফিলিস্তিন : ২৯ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘে অসদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের (Non-member state) মর্যাদা লাভ করে ফিলিস্তিন। জাতিসংঘে মর্যাদা বৃদ্ধির পরপরই ফিলিস্তিনের নাম পরিবর্তন করার কাজ শুরু হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাদের দাপ্তরিক নাম বদলে করেছে 'ফিলিস্তিন'। ৩০ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ থেকে State of Palestine রাষ্ট্রের নামফলক পায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। ফিলিস্তিন এতদিন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে 'পর্যবেক্ষক ভূখণ্ড' হিসেবে যোগ দিত। এখন তারা সদস্য নয় এমন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পাবে। এটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ব সংস্থার পরোক্ষ স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে পূর্ণ সদস্য হওয়ার পথে বহুদূর এগিয়ে গেল ফিলিস্তিন।

উপসংহার : পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সমস্যা। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পৃথিবীর কোনো সমস্যাই দীর্ঘদিন সমস্যা হিসেবে থাকেনি। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, পারস্পরিক বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে এর সমাধান হয়েছে। তাই সমস্যা আঁকড়ে ধরে না থেকে নিজেদের পারস্পরিক আলোচনার পরিবেশ তৈরি করে। উভয় পক্ষকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করে নিয়ে হলেও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। তাই উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব।

০৬। 'মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন।'— পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তর : মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন সমস্যা হচ্ছে বিশ্বের একটি অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক মানবিক সমস্যা। যা গত ছয় দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যে তথা গোটা বিশ্ব পরিস্থিতিকে বিস্ফোরণোন্মুখ করে রেখেছে। এ সমস্যার সূত্রপাত ঘটে পবিত্র জেরুজালেমের ওপর ইসরাইল নামক একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত মধ্যপ্রাচ্য সমস্যাটি নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের কৌশলগত বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ সমস্যাকে নিয়ে এত বেশি আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যা বিশ্বের অন্য কোনো সমস্যাকে নিয়ে হয়নি। সেখানে আজ পর্যন্ত অনেক রক্তস্রোত বয়ে গেলেও সমস্যার কোনো সুষ্ঠু সমাধান হয়নি।

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে গৃহীত ঐতিহাসিক পদক্ষেপসমূহ

১. **জাতিসংঘ বিভক্তিকরণ পরিকল্পনা :** মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে একটি বিভক্তিকরণ প্রস্তাব পেশ করেন যাতে ৩০% ইহুদিদের জন্য, ৭০% আরবদের জন্য এলাকা ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়। জেরুজালেম ও বেথেলহাম জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলা হয়। এ প্রস্তাবে ইহুদি এলাকার স্বায়ত্তশাসনসহ একটি ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।

২. **ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি :** ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের শোচনীয় পরাজয়ের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের নেতৃত্বে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হোয়াইট হাউজের অদূরে ক্যাম্প ডেভিড নামক স্থানে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সা'দাত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় দুটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যাতে ফিলিস্তিন জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং ইসরাইল সিনাই হতে ৩ বছরের মধ্যে সৈন্য সরিয়ে নেয়ার উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইসরাইল সিনাই-এ নতুন বসতি স্থাপন করে চুক্তি লঙ্ঘন করে।

৩. **ব্রেজনেভ ও রিগ্যান পরিকল্পনা :** ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট সমাধানে ইসরাইলসহ এ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান-এর শান্তি পরিকল্পনায় বলা হয় ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি আরবদের স্বীকৃতির বিনিময়ে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহার এবং জর্ডানের সাথে মিলে ইসরাইল অধিকৃত গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব। ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের সকল নেতাই এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন।

৪. **আরব লীগের পরিকল্পনা :** ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর ফেজ নগরীতে আরব শীর্ষ সম্মেলনে আরবলীগ একটি যৌথ আরব শান্তি পরিকল্পনা পেশ করে, যাতে বলা হয় অধিকৃত আরব ভূমি থেকে ইসরাইলি প্রত্যর্পণ, ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি আরবদের স্বীকৃতি, ফিলিস্তিন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ একটি স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার কথা।

৫. **জর্ডানের শান্তি প্রস্তাব :** ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে জর্ডান-মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে বাদশাহ হোসেন চার দফা শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেন যা খুবই অপমানজনক। তিনি আরবদের এলাকাগুলো ফেরত পাওয়ার কোনো শর্ত ছাড়াই ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব পেশ করেন। যদিও এ প্রস্তাব কোনো পক্ষই গ্রহণ করেনি।

৬. **জামিল হামাদের প্রস্তাব :** জামিল হামাদ নামে এক ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী 'Newsweek' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে একটি মধ্যপন্থি সমাধান পেশ করেন। এ প্রস্তাব ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যাখ্যান করে।

৭. **বেগিন প্রস্তাব ও PNC's সিদ্ধান্ত :** মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেগিন দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যতীত জুদা ও সামারিয়া অঞ্চলের প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দেন। প্যালেস্টাইন নেতা ইয়াসির আরাফাত যুদ্ধনীতি পরিহার করে ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত প্যালেস্টাইন জাতীয় পরিষদ (PNC)-এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ ২৪২ নং প্রস্তাব অনুমোদন করে ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়ার পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন। একই সাথে তিনি সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদেরও নিন্দা করেন।

৮. **অসলো শান্তি প্রক্রিয়া :** প্যালেস্টাইনের ওপর আরব ও ইসরাইলি দাবির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে উভয়পক্ষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সমমর্যাদার ভিত্তিতে অর্থবহ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্যালেস্টাইন সংকট নিরসনে ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক PLO-ইসরাইল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে PLO গাজা ও জেরিকো শহরের অন্তর্বর্তীকালীন স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ইসরাইল PLO-এর কাছ থেকে

কমান্ডো আক্রমণের পরিবর্তে শান্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করে। সীমিত আকারে দুর্বল এ চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৯৪ সালে ইসরাইলে লেবার পার্টির পরাজয়ে এ চুক্তিটি হতাশা ও বৈরিতা সৃষ্টি করে এবং আইজ্যাক রবীনের নিহত হওয়ার ফলে হুমকির সম্মুখীন হয়।

৯. **মার্শাল পরিকল্পনা :** মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ মার্শাল প্লান প্রদান করেন।

১০. **রোডম্যাপ :** মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে UN, USA, EU রাশিয়া তিন ধাপে এ পরিকল্পনাটি প্রদান করেন যাতে ২০০৫ সালের মধ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমানা জেরুজালেম, উদ্বাস্তু সমস্যা, ইসরাইল ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে রোডম্যাপ প্লানের প্রবর্তক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ব্যতীত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তথা মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **ফিলিস্তিন ঐক্য ও ত্রিমুখী কার্যক্রম :** মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে ফিলিস্তিনিদের আগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বারবার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হলেও আরবগণ ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র স্বার্থে, অন্তঃদ্বন্দ্বে, জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নেতৃত্ব সংকট, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। এরূপ দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে হবে। ফিলিস্তিনিদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মুখ মোকাবিলা, চাপ সৃষ্টি ও অর্থবহ সংলাপ– এ ত্রিমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২. **সামরিক শক্তির ভারসাম্য ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি :** মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিরসনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন করে প্রতিরক্ষা খাতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তির পক্ষে জনমত সুসংগঠিত করে শক্তিশালী লবি সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী বিশ্বের পারস্পরিক বৈরিতা দূর করে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। OIC-উদ্যোগে শক্তিশালী কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠা করে আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিরাজমান মতবিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. **নির্ভরশীলতা নীতি পরিহার ও কূটনৈতিক দক্ষতা :** মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে অতীতের ন্যায় দুর্বার ও দুর্ভেদ্য শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ইসরাইল দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কাজেই ফিলিস্তিন সঙ্কট নিরসনে আরবদেরকে আরও বেশি কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে।

৪. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি :** মুসলিম দেশগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনীহা ও গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসের কারণে পিছিয়ে পড়েছে। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে স্বনির্ভর না হতে পারবে ততদিন পর্যন্ত তারা পরাশক্তিগুলোর ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য থাকবে। এমতাবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করা সম্ভব নয়। কাজেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন ঘটিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। আর স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে বৃহৎ শক্তি বর্গ মুসলিম বিশ্বকে সমীহ করতে বাধ্য হবে। মধ্যপ্রাচ্য কারো ক্রীড়নক বা খেলার পুতুল হবে না।

৫. **আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন :** প্যালেস্টাইন যেহেতু তিনটি প্রধান ধর্মের কেন্দ্রভূমি। তাই এ তিন ধর্মের ধর্মগুরুদের নিয়ে প্যালেস্টাইনের পুণ্যভূমিতে হানাহানি ও রক্তপাত বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে এ জটিল সমস্যার ন্যায় ও যুক্তিসম্মত সমাধানের চেষ্টা চালানো যেতে পারে। ইয়াসির আরাফাত মনে করেন মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন পারে এ সমস্যার সমাধান করতে।

৬. **আপোস-আলোচনা :** আরব, ইসরাইল উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলিস্তিন সমস্যাটিকে বিচার বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিবদমান পক্ষগুলোর পারস্পরিক অধিকার ও অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে প্যালেস্টাইন সংকট নিরসন করে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

৭. **বৃহৎ শক্তিগুলোর দায়িত্ব :** বৃহৎ শক্তিবর্গের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে নিরসন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই বৃহৎ শক্তিবর্গের 'Veto' প্রদান নীতি, একচোখা নীতি, দ্বৈত ভূমিকা প্রত্যাহার করতে হবে। স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করে আন্তর্জাতিক স্বার্থকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। বৃহৎ শক্তিবর্গ ফিলিস্তিনি জনগণের ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘ চার দশক ছিনিমিনি খেলছে।

৮. **জাতিসংঘের সংক্রিয় ভূমিকা :** যদিও বলা যায় যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ না চাইলে UN এর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তবুও UN মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে সবসময়ই বৃহৎ শক্তির তাবেদার নির্দেশ বা মধ্যস্থতাই প্রাধান্য দিচ্ছে। UN মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ইসরাইলের অন্যান্য স্বার্থরক্ষায় USA-এর Veto-কেও প্রতিহত করতে পারেনি। কাজেই মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে UN কে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

৯. **ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার :** জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের মতে, ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার পথে বিরাজমান বড় ধরনের বাধা অপসারিত হবে। ১৯৮২ সালে লেবানন যুদ্ধের পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতায় জর্জ শুলজ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে আরব-ইসরাইল সরাসরি আলোচনা করে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইসরাইলের স্বীকৃতি, স্থায়ী শান্তি– একটি অপরটির পরিপূরক। কাজেই উভয়ের অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের ওপরই নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার সমাধান। একমাত্র একটি বস্তুনিষ্ঠ ক্ষেত্র প্রস্তুতের মাধ্যমে এবং দান-প্রতিদানের ভিত্তিতেই এ সঙ্কটের অবসান ঘটানো যেতে পারে।

১০. **সামরিক পন্থা ত্যাগ :** কেবল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হলে অনেক আগেই তা হয়ে যেত। ১৯৪৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগের ফলে বহু রক্তক্ষয় হয়েছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে বরং সমস্যাটি ক্রমেই জটিল থেকে আরো জটিলতর হয়ে চলছে। কাজেই সামরিক পন্থা ত্যাগ করে বিকল্প হিসেবে বিশ্বজনমত ও অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতার দিকেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

উপসংহার : মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে আরবদের রোমান্টিক বিপ্লবের হঠকারিতা অথবা কাপুরুষতা এবং ইসরাইলের দাম্ভিকতা, শক্তিমত্তা কোনোটার মধ্য দিয়েই এ জটিল মানবিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সব দিক চিন্তা করে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আবেগমুক্ত মনে এ সমস্যার সমাধানে একটা যুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। এক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে। ইসরাইল ও ফিলিস্তিন উভয় কর্তৃপক্ষকেই সমঝোতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

০৭। ক. ইয়েমেন সংকট কি?
খ. ইয়েমেনের বর্তমান অবস্থা বর্ণনাপূর্বক মধ্যপ্রাচ্যে এর কিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : অস্থিরতা, অশান্তি এবং অস্থিতিশীলতা সারা পৃথিবী জুড়ে। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত দেশে গৃহযুদ্ধ অথবা ছায়াযুদ্ধ বিরাজ করছে। এমনিতেই অশান্তির প্রতিযোগিতায় আরব বিশ্ব এগিয়ে আছে। অটোমান তুর্কিস্তান তথা উসমানীয় সালতানাতের কেন্দ্রানুগ শাসনের অবসান (১৯১৯)-এর পর সালতানাতভুক্ত আরব রাজ্যসমূহ পেনডোরার বাক্সে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, আজকের গোটা বিশ্বে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর বড় কারণ মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য আরোপিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা'। ইরাক-সিরিয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে সর্বশেষ অস্থিরতা দেখা দিয়েছে ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ, হুতিদের বিদ্রোহ এবং পরিশেষে সেখানে সৌদি নেতৃত্বাধীন আরব রাষ্ট্রগুলোর বিমান আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

ইয়েমেন সংকটের সূত্রপাত

ইয়েমেন সংকটের পটভূমি বর্ণনা করতে হলে 'আরব বসন্ত'-এ ফিরে যেতে হয়। সচেতন মানুষ সবাই জানেন যে, ২০১১ সালে তিউনিশিয়া থেকে উত্থিত গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরব বিশ্বে আঘাত হানে। সামন্তবাদ, গোত্রবাদ এবং একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের জনগণও জেগে উঠে। দীর্ঘ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহ, অবশেষে ক্ষমতা ছাড়েন প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ সালেহ। দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা স্বৈরাচার বলে কথিত সালেহ-এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সূচিত হয়। প্রেসিডেন্ট সালেহ তার জাত ভাই মিসরীয় হুসনি মোবারকের মতো অনেক টালবাহানা এবং সময়ক্ষেপণ শেষে পদত্যাগ করেন। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী মানসুর হাদি একক প্রার্থী হিসেবে জাতির ম্যান্ডেড লাভ করেন। ইয়েমেনের মোট জনসংখ্যার শতকরা ষাট ভাগ দক্ষিণাঞ্চলীয় সুন্নি এবং উত্তরাঞ্চলীয় চল্লিশ ভাগ শিয়া। এছাড়া পূর্বে লালিত উত্তর-দক্ষিণ বিরোধ তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া গোত্রগত শতধা বিভক্তি তো রয়েছেই। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো চেপে বসে আল-কায়েদা। নির্বাচন পরবর্তী আল-কায়েদার গাড়ি বোমা হামলায় ৭৮ জন সেনা এবং ২৫ জন আল-কায়েদা সদস্যের মৃত্যু দেশটিকে অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিক্ষেপ করে।

নতুন সংকটের সূত্রপাত হয় যখন উত্তরাঞ্চলের শিয়া মতাবলম্বী হুতি গোষ্ঠী উত্তরের শহরগুলোতে সামরিক আস্ফালন চালানো শুরু করে। হুতিরা শহরগুলোতে সরকারি বাহিনীকে পরাজিত করে যখন ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানী সানার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তখন ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ এই রাজনৈতিক গোলযোগটি বিশ্ববাসীর নজরে নতুন করে আসে। বিশ্বনেতারা বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরবের টনক নড়ে বসে। কেননা দীর্ঘদিন যাবত সৌদি আরব তার প্রতিবেশী দেশটির উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছিল। হুতিরা সানার নিয়ন্ত্রণ নিলে প্রেসিডেন্ট আবদুরাব্বু সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বন্দর নগর এডেনে চলে আসেন। হুতিরা সানা থেকে এডনের দিকে অগ্রসর হলে প্রেসিডেন্ট সৌদি আরবে আশ্রয়গ্রহণ করেন। সানার পর এডেনে সরকারি বাহিনী এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকলে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী ইয়েমেনে বিমান হামলা শুরু করলে ইয়েমেনের সংকট নতুন দিকে মোড় নেয়। একদিকে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টকে রক্ষায় সৌদি জোট ও পশ্চিমা বিশ্বসহ অনেক দেশ এবং অন্যদিকে হুতিদের সমর্থনে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী ইরানসহ কয়েকটি দেশ ইয়েমেন নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়াতে সংকট যে দ্রুতই কাটছে না সে কথা সহজেই বলা যায়।

ইয়েমেনের বর্তমান অবস্থা

হুতি বিদ্রোহীদের রাজধানী সানা দখল এবং পরে তারা এডেনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সৌদি আরব ও তার মিত্র দেশগুলো ইয়েমেনের বৈধ সরকারকে রক্ষায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। চলতি বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ থেকে সৌদি মিত্র জোট ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের উপর বিমান হামলা শুরু করে। এতে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সাতশ'র বেশি মানুষ নিহত এবং সহস্রাধিক লোক আহত হয়। দেড় লক্ষাধিক লোক নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঘরছাড়া হয়। স্পষ্টত ইয়েমেনে দুটি গ্রুপ বর্তমানে সংঘর্ষে বিদ্যমান। একটি বিদ্রোহীদের সমর্থনে এবং অন্যটি প্রেসিডেন্ট আবদুরাব্বু মনসুর হাদির সমর্থনে। আবার এটিকে সুন্নি ও শিয়া সংঘাতও বলা যেতে পারে। হুতি বিদ্রোহীদের সবাই শিয়া সম্প্রদায়ের এবং প্রেসিডেন্ট সুন্নি সম্প্রদায়ের। ইয়েমেনের মোট জনসংখ্যার ৪০-৪৫ শতাংশ হুতি তথা শিয়া সম্প্রদায়ের লোক এবং বাকিরা সবাই সুন্নি সম্প্রদায়ের। কাজেই হুতিদের বিদ্রোহে ইয়েমেনি জনগণের বিরাট একটি অংশ খুশি হতে পারেনি। এ দুটি গ্রুপ ছাড়াও ইয়েমেনে আল-কায়েদা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ সালেহের অনুসারীদের ভালো তৎপরতা রয়েছে। বর্তমানে আব্দুল্লাহ সালেহের অনুসারীরা হুতি বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

হুতিদের উত্থান ঠেকাতে ও প্রেসিডেন্ট মানসুর হাদিকে রক্ষায় সৌদির নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, জর্ডান, মরক্কো, সুদান ও মিসর। এছাড়া এ জোটকে সমর্থন করেছে ফ্রান্স, ব্রিটেন, তুরস্ক ও বেলজিয়াম। যুক্তরাষ্ট্র দ্বৈত ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে হুতিদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়ে ইরান অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। চীন ও রাশিয়া ইরানকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে। অন্যদিকে বিমান আক্রমণের ফলে ইয়েমেনে হাজার হাজার বিদেশি নাগরিক আটকা পড়েছে। দুর্বিষহ জীবনযাপন ইরাক, সিরিয়া কিংবা আফগানিস্তানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইতোমধ্যেই সৌদি হামলায় ইয়েমেনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছে। অনেক বেসামরিক নারী ও শিশু নিহত হওয়ায় সৌদি হামলা বন্ধের দাবি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে জোড়ালো হচ্ছে। জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবে সৌদি জোট ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও ইয়েমেন সরকার আশংকা করছে সৌদি হামলা বন্ধ হলে পুরো ইয়েমেন হুতিদের দখলে চলে যাবে। যার ফলে সৌদি জোটের বিমান হামলা এখন পর্যন্ত থামছে না। এমনকি জোটের কোনো কোনো শরীক রাষ্ট্র স্থল হামলার কথাও ভাবছে।

অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হলে এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলো ইয়েমেন বিষয়ে সমাধানে পৌঁছাতে না পারলে ইয়েমেনে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেবে। ইতোমধ্যেই জাতিসংঘ বলেছে ইয়েমেনে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইয়েমেন সংকটের প্রভাব

ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে সৌদি জোট ইয়েমেনে হামলা চালালেও ইয়েমেনে সৌদি আরবের অনেক স্বার্থও রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইয়েমেনে সৌদি হামলা বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী দেশের সমর্থনও পায়নি। বিশেষ করে ইরান, সিরিয়া, ইরাক, রাশিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশের চরম আপত্তি রয়েছে। সৌদি হামলায় এ পর্যন্ত যারা হতাহত হয়েছে তারা যে সবাই হুতি বিদ্রোহী বা হুতি সম্প্রদায়ের তা কিন্তু নয়। হতাহতের মধ্যে অনেকেই বেসামরিক এমনকি সুন্নি সম্প্রদায়েরও। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ নারী ও শিশুও রয়েছে। যার ফলে খোদ ইয়েমেনের অনেক জনগণই চায় সৌদি আরব এ হামলা বন্ধ করুক

এবং এর রাজনৈতিক সমাধান। যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে সৌদি জোটকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্যের কথা বললেও মধ্যপ্রাচ্যে আইএস দমনে ইরাক ও ইরানের ভূমিকার কথা ভেবে এখন নীরব ভূমিকা পালন করছে। আরব বিশ্বের এই গরিব রাষ্ট্রটির অভ্যন্তরীণ সংকট নতুন কিছু নয়। এর আগেও ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ বিরাজ ছিল। এর অন্যতম কারণ ইয়েমেনে জাতিগত বিভক্তি।

বর্তমান ইয়েমেনের সংকট মধ্যপ্রাচ্যকে অনেকটাই কাঁপিয়ে দেবে। কেননা মধ্যপ্রাচ্যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি রয়েছে। আর দুটি শক্তিই ইয়েমেনে সক্রিয় রয়েছে। বিভিন্ন কারণে ইয়েমেন রাষ্ট্রটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শক্তি সৌদি আরবের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েমেনে রয়েছে সৌদি আরবের বেশ কিছু তেল ক্ষেত্র। সৌদি নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে যারা কোনো না কোনোভাবে ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত। তাছাড়া বাবেল মান্দেব ও এডেন সাগরে পৌঁছার জন্য ভৌগোলিকভাবে ইয়েমেন সৌদি আরবের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে দীর্ঘদিন যাবত ইয়েমেন সৌদি আরবের অনুকম্পায় থাকলেও শাসকদের প্রতি ইয়েমেনি জনগণ ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। আরব বসন্তের জোয়ারে ইয়েমেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ সালেহের পতন ঘটলেও ইয়েমেনবাসীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত শাসক পাননি। দেশ পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতা, আল কায়দা দমনে সরকারের পরাজয়, দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপশাসন জনগণ বিশেষ করে হুতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ভালোভাবে নিতে পারেনি। ফলে তারা বিদ্রোহ করলে অনেক ইয়েমেনি তাদের সমর্থন করে। কিন্তু হুতিরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হওয়ায় সমগ্র ইয়েমেনের শাসনভার পরিচালনা তাদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। ফলে অভ্যন্তরীণ গোলযোগে বহিঃশক্তিও বিশেষ করে সৌদি আরব জড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে অন্যটি হলো ইরান। পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন নিয়ে এমনিতেই ইরানের সাথে সৌদি আরবের সাপে–নেউলে সম্পর্ক ছিল। এতদিন যাবত সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় আরব দেশগুলো অভিযোগ করে আসছিল ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি রক্ষায় হুমকিস্বরূপ। যে কোনো মূল্যে আরবরা চায় মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব কম পড়ুক। অথচ ইরানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। সবশেষে ইয়েমেনে হুতিদের উত্থানে ইরানের হাত রয়েছে এমন অভিযোগ এনেই সৌদি জোট হুতিদের উপর বিমান হামলা চালায়। কেননা ইরান হলো একটি শিয়া রাষ্ট্র এবং ইমেয়েনের হুতিরাও শিয়া মতাবলম্বী। তাই হুতিদের উত্থানে সৌদি আরব ভয় পেয়ে রাতারাতি ইয়েমেনের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। ফলে এটি মূলত সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে এক ধরনের ছায়াযুদ্ধ তৈরি করেছে। যা দীর্ঘস্থায়ী হলে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশ দুটি সরাসরি প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও অংশ নিতে পারে।

সৌদি আরবের ভয়ের আরেকটি কারণ হলো হুতিরা ইয়েমেনের ক্ষমতায় থাকলে চিরশত্রু ইরান ইয়েমেনে ঝেঁকে বসবে। এতে সৌদি আরবের জন্য নিজের প্রভাব বিস্তার করতে বাধা এমনকি রাজতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। যা সৌদি শাসকদের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ।

এছাড়া অত্র অঞ্চলে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকায় ইয়েমেন নিয়ে সৌদি আরব ও অপরাপর সুন্নি রাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে পূর্ববিরোধ রয়েছে। এমতাবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ইয়েমেনে রাজনৈতিক সংলাপের কোনো বিকল্প নেই। মধ্যপ্রাচ্যের এই শক্তি দুটির মধ্যে বিরোধ থাকবে তবে তা যদি সংঘাতে রূপ নেয় তাহলে ইরাক-সিরিয়ার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা এখানে তৈরি হবে। এমনিতেই ইয়েমেন সংকটের কারণে বিশ্বে জ্বালানি তেলের দাম ৬ শতাংশ বেড়ে গেছে। এটি

দীর্ঘস্থায়ী হলে আঞ্চলিক যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দকে এর চড়া মূল্য দিতে হবে। কাজেই ইয়েমেনের সংকট যতটা না অভ্যন্তরীণ তার চেয়ে বেশি আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ইয়েমেন নিয়ে খেলা। অবিলম্বে ইয়েমেনে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশ্বনেতাদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইয়েমেন সংকট মধ্যপ্রাচ্যের নতুন কোনো ঘটনা নয় বরং এটি মধ্যপ্রাচ্যের চলমান অস্থিরতারই একটি অংশ। আর মধ্যপ্রাচ্যের ধাবমান অস্থিতিশীলতার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব যতটা না দায়ী তারচেয়ে বেশি দায়ী মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশের নেতৃবৃন্দ। পশ্চিমা বিশ্ব সুকৌশলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ তৈরি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। আরব নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণের কারণে আজ সিরিয়া, ইরাক ও ইমেয়েনসহ মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। ইয়েমেনে বিমান হামলা করে সৌদি আরব সফল হবে নাকি দীর্ঘস্থায়ী একটা সংঘাতের দিকে গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে ঠেলে দেবে সময়ই তা বলে দেবে। আঞ্চলিকভাবে শান্তি বজায় রাখতে অঞ্চল পর্যায়ের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি এবং পারস্পরিক সমঝোতার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই পুরনো বিরোধ ভুলে গিয়ে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে আরব দেশগুলোর সাথে ইরানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই কেবল ইয়েমেন সংকট সমাধান তথা মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

০৮ । ক. সিরিয়ায় সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের কারণ ও গৃহযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করুন।
খ. সিরিয়ায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ১৯৬৩ সাল থেকে সিরিয়া শাসন করছে বাথ পার্টি। ঐ সময় হতে দেশটিতে সব বিরোধী দল নিষিদ্ধ করে জারি করা জরুরি অবস্থা বর্তমানেও বহাল। ১৭ জুলাই ২০০০ হতে দেশটির ক্ষমতায় আছেন হাফেজ আল আসাদের পুত্র বাশার আল আসাদ। দেশটিতে আরব বিপ্লবের ঢেউ আঘাত হানে ২৬ জানুয়ারি ২০১১। ঐ বছরের নভেম্বরেই আরব লীগ দেশটিকে বহিষ্কার করে, অন্যদিকে সিরিয়ার সরকার বিরোধী প্রধান জোট ন্যাশনাল কোয়ালিশন ১৮ মার্চ ২০১৩ দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘাসান হিত্তোকে নির্বাচিত করে।

সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের কারণ

আড়াই বছর ধরে চলা স্বৈরতন্ত্রী বনাম জঙ্গিবাদী গৃহযুদ্ধে সিরিয়ায় এক লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। ধ্বংস হচ্ছে দেশটির অর্থনীতি, জননিরপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা। নিচে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **ঐতিহাসিক কারণ :** সাম্রাজ্যবাদ ঠেকাতে বিশ্বব্যাপী যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল, যার গোপন ঠিকানা ছিল 'ওয়ারশ' জোট, তা আর এখন নেই। ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হওয়ার পরপরই ঐ কারণে যারা বিশেষ সুবিধাভোগী তাদের উচিত ছিল বিকল্প সামরিক জোট তৈরি করা। কিন্তু সুবিধাভোগী এবং তথাকথিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যদের দূরদৃষ্টির অভাবের কারণেই তা সম্ভব হয়নি। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরপরই বড় একা হয়ে যায় তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলো, বিশেষ করে মুসলমান মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রদের 'ঠাণ্ডা' করার উদ্যোগ নেয় সাম্রাজ্যবাদ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিশোধও নিতে থাকে একের পর এক। যেসব মুসলিম দেশ আধুনিক হতে চেয়েছে, সেসব দেশে 'মৌলবাদ' উসকে দিয়ে আবার 'সনাতন'-এ প্রেরণ করেছে। যারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের সম্পদ লুটপাট করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. **চীন ও রাশিয়ার সাথে সিরিয়ার সুসম্পর্ক :** চীন-রাশিয়াকে যারা গুরু মেনেছে, তাদের সবাইকেই হয়তো সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ করবে। আজ না হয় কাল। রাশিয়ার উদ্দেশ্য অস্ত্র ব্যবসায়, আর চীনের উদ্দেশ্য তেল। রাশিয়া এ যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্রসহ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র দেদারছে সিরিয়া সরকারের কাছে পাঠাচ্ছে। বাজার অর্থনীতিকে আঁকড়ে ধরে চীন বিশ্ববাজার দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সামরিক যুদ্ধ না করে কেবল বাজার যুদ্ধ করে চীন বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এবং পণ্য আগ্রাসন চালানোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ স্টাগফ্রেশনের ঝুঁকি নিতে চায় তার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জ্বালানি। সাম্রাজ্যবাদ চীনকে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে চায় না। তারা এখনো চীনকে অপ্রত্যক্ষ শত্রু করে রেখেছে। সিরিয়ার জ্বালানির প্রতি চীনের লক্ষ্য এখন সর্বজনবিদিত, সিরিয়াকে হস্তগত করাই একমাত্র উপায় সাম্রাজ্যবাদের। নতুবা জ্বালানির গতি আটকানো যাবে না। সিরিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি মূলত সেই লক্ষ্যেই।

৩. **গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অপপ্রচার :** সিরিয়ার বিরুদ্ধে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অপপ্রচার করছে সাম্রাজ্যবাদ। এসব অস্ত্র পশ্চিমা বিশ্ব তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে। তাদের ধারণা বাশার এসব অস্ত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে না। তবে এখন তারা ধরেই নিয়েছে সিরিয়ার পতন হওয়ার আগেই তাদের গণবিধ্বংসী অস্ত্র মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা হস্তগত করবে। তাই বাশারের প্রতি তাদের ক্ষোভ আরো বেড়ে গেছে। কেননা বাশার রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে পালাচ্ছে না এটি ভেবে তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। যত দেরি হবে মরণাস্ত্র হাতছাড়া হওয়ার ভয় ততই বাড়বে। কিন্তু এটি আসলে অপপ্রচার।

৪. **সিরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পশ্চিমাদের লোলুপ দৃষ্টি :** মুসলিম দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সাম্রাজ্যবাদীদেরই সম্পদ। অনেকটা এরকমই মনে করে পশ্চিমারা। বিশেষ করে যেসব মুসলিম দেশ কোনো এক সময় ব্রিটিশ বা মার্কিন উপনিবেশ ছিল, সেসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তি সম্পদের উপর তারা কাল্পনিক হকদার হয়ে বসে আছে। যে কারণে কোনো নৈতিকতার বালাই তাদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বিগত ৫০-৬০ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক কূটনীতি ও সামরিক আগ্রাসন থেকে এটি সম্যক উপলব্ধি করা যায়। পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ শোষণ তারা চালিয়ে যাচ্ছে নিরবধি। সিরিয়াকে শায়েস্তা করা এখন রাজনৈতিক বিষয়ের অভ্যন্তরে নেই। সিরিয়ার রাজনীতি এবং গৃহযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে বাজার অর্থনীতির কূটকৌশলের অংশ।

৫. **গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা :** সিরিয়ার জনগণ দীর্ঘদিনের একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চায়। বিশ্বব্যাপী যখন গণতন্ত্রের জয়জয়কার তখন এ দেশে চলছে স্বৈরশাসন। এ অপশাসনের ফলে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এ দেশ শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে গেলেও বদলায়নি শাসনব্যবস্থা। জনগণ মনে করে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসলে তাদের ভাগ্য আরো পরিবর্তিত হবে। এসব ধারণার সাথে যুক্ত হয়েছে ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব। তাই এ গৃহযুদ্ধ মূলত আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারার বহিঃপ্রকাশ।

৬. **অর্থনৈতিক বৈষম্য :** একদিকে তেলের রাজস্ব হ্রাস অন্যদিকে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে মাথাপিছু আয় কমে গেছে সিরিয়ার। দ্রব্যমূল্যের গতির লাগাম টেনে ধরে রাখতে পারছে না স্বৈরশাসক। এ ব্যাপারে সরকার তেমন কোনো উদ্যোগও নেয়নি। অন্যদিকে বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্ব। কমেছে নতুন বিনিয়োগ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়। এর ফলে দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষোভের জন্ম নিয়েছে। তারা এরূপ শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি চেয়েছে।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি

আড়াই বছর ধরে চলা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এ পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি মানুষ মারা গেছে বলে বিভিন্ন সূত্র হতে জানা গেছে। একই সাথে ১৫ লাখ মানুষ প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে এবং বেশির ভাগ মানুষ তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছে। দুই বছরের অধিক সময়ব্যাপী এ সংকট বিশ্বে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জটিল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। একদিকে বাশার আল আসাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে বিদ্রোহীরা তার সরকারকে উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, পরোক্ষভাবে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

সমস্যায় জর্জরিত প্রেসিডেন্ট আসাদের সমর্থনে রয়েছে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে মূলত রাশিয়া। মস্কো এ সরকারকে সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে ব্যাপক সমর্থন করে যাচ্ছে। অন্য একটি বৃহৎ শক্তি চীন রাজনৈতিকভাবে আসাদের সমর্থনেই কাজ করে যাচ্ছে। মস্কো এবং বেইজিং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার কারণে পশ্চিমা বিশ্বের বেশ কয়েকটি সিরিয়াবিরোধী প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে 'ভেটো' প্রয়োগের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়া ইরান পুরোপুরিভাবে সিরিয়ার সরকারের পক্ষে রয়েছে। লেবাননের 'হিজবুল্লাহ' এবং ফিলিস্তিনের 'হামাস' সংগঠনও বাশার সরকারের সাথে রয়েছে।

পক্ষান্তরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার বিদ্রোহীদের বড় সমর্থক। এছাড়া ইসরায়েল, তুরস্ক, সৌদি আরব ও কাতার বিদ্রোহীদের সাথে বলিষ্ঠভাবে রয়েছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সরকার এবং বিদ্রোহীরা ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সত্য কিন্তু কোনো পক্ষই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার মতো অবস্থায় আসতে সক্ষম হয়নি। সে কারণে উভয়পক্ষই দাবি করে আসছে, তাদের যোদ্ধারাই সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো আসাদ সরকার কঠিন সময় পার করছে এবং কোনোভাবেই বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে পারছে না। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন শহর দখল করেছে এবং খোদ রাজধানীতেই বড় ধরনের কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। এমনি এক দুঃসাহসিক অপারেশনে বিদ্রোহীরা সরকারের দেশরক্ষা মন্ত্রীসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হত্যা করে। ফলে সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিদ্রোহীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তবে সরকার হার মানতে নারাজ। প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক মাসে সরকারি সৈন্যরা যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে এবং বিদ্রোহীদের অগ্রযাত্রা দারুণভাবে ব্যাহত করতে সমর্থ হয়েছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে বিদ্রোহীদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তোলা এবং সেই লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ পটভূমিকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরা সিরিয়ার বিদ্রোহীদের অস্ত্র দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করেনি। অথচ আগে তারা ও আমেরিকা এ মনে করে বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ করতে নারাজ ছিল যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে আল-কায়েদার মতো গোষ্ঠীও রয়েছে। পরিস্থিতি এরূপ জটিল আকার ধারণ করেছে যে, সাম্প্রতিক সিরিয়া চিত্র সমাধানের কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না।

এদিকে আগস্টের শেষ দিকে সিরিয়ার নিরীহ জনগণের ওপর রাসায়নিক অস্ত্রের হামলা চালানো হয়। সরকার এবং সরকারবিরোধী গোষ্ঠী একে অপরকে এই হামলার জন্য দায়ী করতে থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এই রাসায়নিক হামলাকে কেন্দ্র করে সিরিয়ায় সামরিক আগ্রাসনের পাঁয়তারা শুরু করে। কিন্তু ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সিরিয়ায় সামরিক হামলার বিপক্ষে রায় দেয়। শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রও সিরিয়াতে সামরিক হামলার

পরিকল্পনা থেকে পিছু হটে। এ ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির মন্তব্য ছিল সামরিক হামলা নয়, রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই সিরিয়া সংকটের সমাধান সম্ভব।

সিরীয় সংকট সমাধানের উপায়

সিরিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে যুদ্ধের মাধ্যমে এ সংকটের যে সমাধান হবে না সে ব্যাপারে সব পক্ষই একমত। তবে সমাধান সূত্রটাই হয়ে উঠেছে জটিল। সরকার পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান চাইলেও বাশার আল আসাদকে ক্ষমতা থেকে বাদ দিয়ে সমাধানে তারা সম্মত হবে না। এ সমাধানের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে ইরান ও রাশিয়ার সমর্থন বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হয়েছে। অন্যদিকে দু বছর ধরে বাশার সরকারের পতন ঘটাতে সর্বাত্মক যুদ্ধে যে ১ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে তাদের স্বজনেরা কোনোভাবেই বাশারকে ক্ষমতায় রেখে সমাধান কামনা করেন না। কিছু স্পর্শকাতর প্রশ্নও সমাধান সূত্র তৈরিতে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। এসব ইস্যুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক রয়েছে। কার্যত এখন সিরিয়া দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। রাজধানী দামেস্কসহ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ শহরের উপর সরকারি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অন্যদিকে, বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছাড়াও রয়েছে বেশিরভাগ গ্রাম এলাকা। বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। এসব জটিলতার পরও মধ্যবর্তী একটি উপায় নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাশার আল আসাদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০১৪ সালের নভেম্বর। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রাসাদ ও নিরাপত্তা সুবিধা এ মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। বাশার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে এবং পরবর্তী নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। সরকার ও বিদ্রোহী যে যে অবস্থানে আছেন সে অনুসারে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। এলাকার ওপর কর্তৃত্ব যে পক্ষের যেমন আছে তেমনই থাকবে, অবাধ ভোটের মাধ্যমে জনগণ নতুন সরকার নির্বাচন করবে। এ সরকারের হাতে পুরো কর্তৃত্ব চলে যাবে। সরকার ও বিরোধী বাহিনীর সমন্বয়ে দেশটির সেনা ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করা হবে। বিদ্রোহী প্রশাসনের কর্মকর্তারাও মূল প্রশাসনে আত্তীকরণ হবেন।

এ ধরনের একটি প্রস্তাবে ইরান সম্মত হবে এ কারণে যে ইরান সর্বাত্মক সাহায্য দিয়েও বাশারকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্যদিকে সিরিয়ায় রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু বাশারকে স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় রাখা যাবে তারা এখন আর এমনটি মনে করে না। বিশেষত যেভাবে প্রাণহানি ও মানবিক বিপর্যয় বেড়ে চলেছে। তাতে তারাও সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী। ইতোমধ্যে সিরীয় সংকটের প্রভাব ইরাক, ইরান, তুরস্কসহ বেশ কয়েকটি দেশের উপর পড়েছে। তদুপরি সিরিয়ায় ইসরাইল বিমান হামলা চালিয়ে সংকটে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এত জটিলতার পরও সার্বিকভাবে মনে হয় সামরিক সমাধানের পরিবর্তে যার যার অবস্থান থেকে ছাড় দিয়ে হলেও সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে বিশ্বসম্প্রদায়কে উদারতার পরিচয় দিতে হবে।

যেহেতু আগামী বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের 'শান্তি' একটি শর্ত, তাই পশ্চিমা বিশ্বসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আরব বসন্ত, আরব গণজাগরণ যে নামেই হোক না কেন, এই গণজোয়ার যেন মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্ব এবং পরিণামে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে না আনে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। মিসরের মতো পরিস্থিতি যাতে সিরিয়ায়ও না হয় সেদিকে সিরিয়াবাসীকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সে দেশের জনগণকেই আগে ঠিক করতে হবে তারা কি চায়।

০৯ ▌ পারস্য উপসাগরের জলভাগ ও দ্বীপগুলো নিয়ে উপকূলবর্তী দেশগুলোর দ্বন্দ্বের বর্ণনা করুন।

উত্তর : বিশ্বের জ্বালানি তেলের ৪০ শতাংশের বেশি পারস্য উপসাগরীয় এলাকা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। তেল বাণিজ্যের সাথে এই উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর জীবিকার সম্পর্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের ঘন ঘন নৌমহড়া, দ্বীপগুলোর মালিকানা নিয়ে বির্তক, জলসীমা নির্ধারণ, জলপথ নিয়ন্ত্রণসহ পারস্য উপসাগরের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক ইস্যুতে খুবই আলোচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। মাঝে মধ্যেই এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পরস্পর হুশিয়ারী, আরব দেশগুলোর সাথে ইরানের পরস্পর হুশিয়ারী, আরব দেশগুলোর সাথে ইরানের দ্বন্দ্ব বিশ্বগণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রচার হয়। উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে ইরানের মধ্যকার বিরোধের অন্যতম কারণ হলো পারস্য উপসাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলোর মালিকানা বিতর্ক, জলসীমা নির্ধারণ ও উপসাগর থেকে বের হওয়ার একমাত্র জলপথ হরমুজ প্রণালী ব্যবহারের অধিকারের লড়াই।

পারস্য উপসাগরের পরিচিতি : ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে পারস্য উপসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত এই উপসাগর বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর একটি লালন ক্ষেত্র। প্রাচীন গ্রীকদের মতে বিশ্বের চারটি সাগরের মধ্যে পারস্য উপসাগর হলো অন্যতম। ৯৩ হাজার বর্গমাইল (২ লাখ ৪১ হাজার বর্গ কি. মি.) আয়তনবিশিষ্ট এই উপসাগরটি লম্বায় প্রায় ৯৯০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে সর্বোচ্চ ৩৪০ কিলোমিটার (প্রায়) ও সর্বনিম্ন ৫৫ কিলোমিটার (হরমুজ প্রণালীর নিকট)। এর উত্তরে, উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে ইরান; পূর্বে ওমান পূর্ব-দক্ষিণে ও দক্ষিণে সংযুক্ত আরব আমিরাত; দক্ষিণে বাহরাইন ও কাতার; দক্ষিণে ও দক্ষিণ পশ্চিমে সৌদি আরব, পশ্চিমে কুয়েত ও উত্তর পশ্চিমে ইরাক অবস্থিত। ইরাক-ইরান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাকের উপর মার্কিন আগ্রাসন, দ্বীপদেশ বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌ-বহর ঘাঁটি, হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির কারণেও বিগত কয়েক দশক ধরে পারস্য উপসাগর নামটি বিশ্বে অধিক পরিচিত। এছাড়া এই উপসাগরের তীরবর্তী প্রতিটি দেশ খনিজ সম্পদ তথা জ্বালানী তেলে সমৃদ্ধ হওয়ায় পারস্য উপসাগরের গুরুত্ব বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে অনন্য।

পারস্য উপসাগরের বিতর্কিত দ্বীপ, উপদ্বীপ ও জলরাশি : উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর মধ্যে কিছু দ্বীপ, উপদ্বীপ ও জলরাশি নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া পারস্য উপসাগরে অবস্থিত কিছু দ্বীপ, উপদ্বীপ ও জলরাশির ব্যবহার নিয়ে আরব দেশগুলোর সাথে ইরানের দীর্ঘকাল যাবত বিরোধ রয়েছে। বিশেষ করে আবু মুসা দ্বীপ হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্ট বিতর্ক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। নিম্নে বিতর্কের বিষয় ও পক্ষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **ইরান-বাহরাইন বিতর্ক :** পারস্য উপসাগরের একমাত্র দ্বীপরাষ্ট্র হলো বাহরাইন। ১৯৭১ সালে বাহরাইন ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করলেও এর আগ পর্যন্ত ইরান বাহরাইনকে তার অধীনস্ত একটি রাজ্য হিসেবেই গণ্য করত। ইরান ১৯০০ সালের শুরুতে নিজেদের পার্লামেন্টে বাহরাইনের জন্য একটি সংরক্ষিত আসন ও বাহরাইনকে ইরানের ১৪তম প্রদেশ ঘোষণা করে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করার মাধ্যমে ইরান বাহরাইনের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেও ১৭৮৩ সালে আরবের আল খলিফা পরিবার বাহরাইনের শাসনভার গ্রহণ করলে ইরানের প্রভাব সেখানে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। যদিও বিভিন্ন সময়ে খলিফা পরিবার ইরানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তবু ১৮৩০ এর দশকে ব্রিটিশদের সাথে খলিফা পরিবারের একটি চুক্তির মাধ্যমে কার্যত বাহরাইন ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়।

২. **ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাত বিরোধ :** পারস্য উপসাগরের তিনটি দ্বীপ ও আবু মুসা, গ্রেটার টাম্ব এবং লেসার টাম্ব এখনো ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ১৯৭১ সালে ব্রিটিশরা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলে আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, বাহরাইনের মত রাষ্ট্রগুলোর সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশদের দখলকৃত এ অঞ্চলের বিভিন্ন দ্বীপগুলোও নিকটবর্তী নব রাষ্ট্রগুলোর অধীনে চলে যায়। সে হিসেবে আবু মুসা, গ্রেটার টাম্ব ও লেসার টাম্ব দ্বীপগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের অধীনে আসার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে ব্রিটিশরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পরই ইরানি নৌবাহিনী এই দ্বীপগুলো দখল করে নেয়। তখন থেকেই ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ শুরু হয়েছিল। এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাত আন্তর্জাতিক আদালতে মামলাও করেছিল কিন্তু সেটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দ্বীপগুলোর উপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এর আগে ১৯২১ সালে ইরানের দখল থেকেই ব্রিটিশরা এর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। তারপর ইরানের অনুগত রাজ্য বাহরাইনের উপর থেকে ইরানের দাবি-দাওয়া তুলে নেয়ার শর্তে ব্রিটিশ সরকার আবু মুসা দ্বীপ, লেজার টাম্ব ও গ্রেটার টাম্ব ইরানকে আবার ফিরিয়ে দিবে এমন ঐতিহাসিক সমঝোতার ভিত্তিতেই ১৯৭১ সালের পরে ইরান এগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

৩. **বাহরাইন ও কাতার দ্বন্দ্ব :** পারস্য উপসাগরের অন্যতম বিতর্কমূলক বিষয়টি হলো কিছু কিছু এলাকা এ দ্বীপ নিয়ে বাহরাইনে ও কাতারের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। কাতারের মূল ভূখণ্ড ঘেষা হাওয়ার দ্বীপ এবং কাতারের উত্তর-পশ্চিমে উপকূল জুবারা নামক স্থানটির মালিকানা নিয়েই দু'দেশের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাহরাইন হতে ইরানিরা বিতাড়িত হওয়ার পূর্বেই আল খলিফা পরিবার জুবারাতে বসতি স্থাপন করে এবং হাওয়ার দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নেয়। পরবর্তীতে বাহরাইনের শাসনভার আল খলিফা পরিবারের হাতে আসলে বাহরাইন হয় খলিফা পরিবারের শাসনকার্যের মূল কেন্দ্রভূমি। তখন পর্যন্ত জুবারা ও হাওয়ার দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ খলিফা পরিবারের হাতেই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কাতারের শাসক আল তানি পরিবার জুবারা ও হাওয়ার দ্বীপের উপর খলিফা পরিবারের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করলে এবং ১৯৮৬ সালে কাতারের উপকূলে বাহরাইন কোস্টগার্ড স্টেশন নির্মাণ করতে বাধা দিলে উপসাগরের এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় বাহরাইন নির্মাণ কাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ১৯৯১ সালে কাতার হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ করলে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আদালত উভয় দেশের অভিযোগ-দাবি শোনে ২০০১ সালে একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। এতে হাওয়ার দ্বীপসমূহ যারাদারের একটি অংশ বাহরাইনের এবং জুবারা জেনান দ্বীপসহ বিরাট সমুদ্রসীমা কাতার অর্জন করে।

৪. **ইরাক-কুয়েত বিরোধ :** ১৯৯০ সালে সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত আক্রমণ এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল কুয়েতকে ইরাকের একটি প্রদেশে পরিণত করা। কেননা দীর্ঘদিন ধরেই ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন দাবি করে আসছিল যে কুয়েত আলাদা কোনো রাষ্ট্র নয় বরং এটি ইরাকের বসরার-ই একটি অংশ। কেননা উসমানীয় শাসনামলে কুয়েত এলাকাটি বসরার অধীনে ছিল। মূলত ১৮৯৯ সালে কুয়েতে উসমানীয় শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশদের আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তখন থেকেই কুয়েতের শাসকবর্গ ব্রিটেনের অনুগত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের কাছ থেকেই ১৯৬১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা কুয়েত ত্যাগ করলে ইরাক সরকার আবারো কুয়েতকে বসরার একটি অংশ বলে দাবি করে। পরে ব্রিটিশ সৈন্য কুয়েতে আসলে এবং সৌদির নেতৃত্বে মৈত্রী বাহিনী কুয়েতের সাহায্যে এগিয়ে আসলে ইরাকী বাহিনী পিছু হটে।

৫. **হরমুজ প্রণালী বিতর্ক :** হরমুজ প্রণালী হলো একটি সরু জলপথ যা পশ্চিমের পারস্য উপসাগরকে পূর্বে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। এটি আরব উপদ্বীপকে ইরান থেকে পৃথককারীও বটে। এ জলপথ নিয়ে বিতর্কের কারণ হলো, এটি আন্তর্জাতিক মহলের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রপথে তেলবাণিজ্যের ৪০ শতাংশ এই প্রণালী ব্যবহার করে এশিয়া, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পৌঁছে। ভৌগোলিকভাবে ইরানের অনুকূলে এই প্রণালীটি অবস্থিত হওয়ায় এবং ইরানের সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করায় হরমুজ প্রণালীটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৌবহরের ঘাঁটি রয়েছে এবং প্রায় সময়ই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আরবদেশগুলোকে নিয়ে পারস্য উপসাগরে নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হলে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা দেশ ও আরব জোট এবং ইরানের মধ্যে হরমুজ প্রণালী নিয়ে এখনো যথেষ্ট বিতর্ক শোনা যায়।

৬. **অন্যান্য :** এছাড়াও আরো যে সকল বিষয় নিয়ে পারস্য উপসাগরকে আরব উপসাগরে নামকরণের চেষ্টা, আল বুরাইমি মরূদ্যান নিয়ে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানের মধ্যকার বিরোধ, বুবিয়ান ও ওয়ারবা দ্বীপ নিয়ে ইরাক-কুয়েত বিতর্ক, জলসীমানা নির্ধারণে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার অমীমাংসা, বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নৌ ঘাটি প্রভৃতি পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় প্রায় সময়ই রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করছে।

ভৌগোলিক অবস্থান, উপকূলে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো ও মধ্যপ্রাচ্যের এই অংশে পশ্চিমা বিশ্বের তীক্ষ্ণ নজর পারস্য উপসাগরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। রাজনীতি, ভৌগোলিক ও আদর্শিক কারণে এখানে দুটি শক্তির উপস্থিতি রয়েছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট উপসাগরীয় আরবদেশগুলো ও অন্যদিকে ইসলামি বিপ্লবে উদ্ভাসিত দেশ ইরান। ইরানের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বিরোধ থাকায় পারস্য উপসাগরীয় বিতর্ক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বিশেষ গুরুত্ব পায়। উপসাগরের দু-পাড়ে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকায় এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের বিরোধ থাকায় পারস্য উপসাগরীয় বিতর্ক অবসানের আশু সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

১০। ইরানে পারমাণবিক সংকটের প্রেক্ষাপট ও উক্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হ্রাসকল্পে যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : পারস্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইরান। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত একটি বিষয়। এই পারমাণবিক কর্মসূচির কারণেই ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। সুনিশ্চিত কোনো প্রমাণ ছাড়াই পাশ্চাত্যের অভিযোগ, ইরান গোপনে পারমাণবিক বোমা তৈরির চেষ্টায় লিপ্ত। জবাবে ইরান বার বার এ অভিযোগ দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। তেহরানের সুস্পষ্ট ঘোষণা, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ এবং এর লক্ষ্য জ্বালানী চাহিদা পূরণ। এতদসত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হ্রাসকল্পে যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলো মরিয়া।

ইরানে পারমাণবিক সংকটের প্রেক্ষাপট : ইরানে পারমাণবিক সংকটের পিছনে এক সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **রেজা শাহ'র পারমাণবিক কর্মসূচি :** যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে অর্থাৎ ৫ মার্চ ১৯৫৭ তৎকালীন শাসক মোহাম্মদ রেজা শাহ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু

করেছিলেন, যার নাম ছিল 'অ্যাটমস ফর পিস প্রোগ্রাম (Atoms for Peace program)। তার শাসনামলেই দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচিতে গতির সঞ্চার হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে তেহরান পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র (Tehran Nuclear Research Center-TNRC) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে রেজা শাহ ইরানে অ্যাটমিক এনার্জি অর্গানাইজেশন অব ইরান (Atomic Energy Organization of Iran-AEOI) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০ বছরের মধ্যে ইরানে ২৩টি পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন শাহ সরকার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে বুশহরে একটি পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণের ব্যাপারে জার্মানির জিমেন্স কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

২. **চুল্লি নির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জার্মানির অস্বীকার :** ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হলে মোহাম্মদ রেজা শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশটিতে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' গঠিত হয়। জার্মানরা ঐ চুল্লি নির্মাণের ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তাও এ সময় স্থবির হয়ে যায়।

৩. **ইরানের নিজ উদ্যোগে পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু :** চুল্লি নির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জার্মানির অস্বীকারের প্রেক্ষিতে ইরান নিজ উদ্যোগে পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু করে। কিন্তু এ সময় মোহাম্মদ রেজা শাহের মিত্র দেশগুলোর বাধার কারণে এ তৎপরতা বেশিদূর এগোতে পারেনি। ১৯৮৭-৮৮ সালে নতুন মিত্র হিসেবে আর্জেন্টিনার সাথে ইরানের তিনটি পারমাণবিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৪. **ইরানের পারমাণবিক যুগে প্রবেশ :** ইরাক-ইরান যুদ্ধের পর মস্কো-তেহরান সম্পর্কের উন্নতি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতির সুযোগে রাশিয়া ইরানকে পারমাণবিক সহযোগিতা দিতে সম্মত হলে ইরান নতুন এক পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করে। ইরানে গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাজ চলছে– ১৯৯২ সালে মিডিয়ায় এমন অভিযোগে ইরান আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) প্রতিনিধিদের পরমাণু কর্মসূচি পরিদর্শনের আহ্বান জানায়। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলটি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে শান্তিপূর্ণ বলে ঘোষণা করে।

৫. **ইরান-রাশিয়া চুক্তি ও নিষেধাজ্ঞা :** ১৯৯৫ সালে ইরান রাশিয়ার সাথে ইরানের 'বুশেহর' প্ল্যান্টকে এগিয়ে নিতে চুক্তি করে। এরপর ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি জোরালোভাবে শুরু করেন। ২০০৬ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যারা ইরানের পরমাণু প্রকল্পের সাথে জড়িত, তাদের সম্পদ জব্দ এবং ভ্রমণের ওপর নিষধাজ্ঞা জারি করা হয়।

৬. **পারমাণবিক স্থাপনা চালু ও সমঝোতার উদ্যোগ :** ইরান ২০০৮ সালে পারস্য উপকূলে বুশেহরে প্রথম পারমাণবিক স্থাপনা চালু করে। বারাক ওবামা ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ বুশেহর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়। ২০১৩ সালের গোড়ার দিকে বুশেহর পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়। ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমাদের সাথে সম্পর্ক সহজ করার বার্তা দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেন। ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো টেলিফোনে দুই নেতা কথা বলেন। ইরানে ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর দুই দেশের প্রেসিডেন্টের মধ্যে ওটাই ছিল প্রথম সরাসরি আলাপের ঘটনা। এর ধারাবাহিকতায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে সমঝোতার বিষয়টি উঠে আসে।

৭. **ছয় বিশ্বশক্তির আলোচনা :** ২০১৩ সালেই ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে তেহরানের সাথে ছয় বিশ্বশক্তির (জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য ও জার্মানি) আলোচনা শুরু হয়। ইরানের কর্মসূচি সীমিত করার বিনিময়ে দেশটির ওপর থেকে অবরোধ শিথিল করার প্রস্তাব ওঠে। বিষয়টি নিয়ে সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়ে আগে কয়েক দফা সময়সীমা ঘোষণা করা হলেও তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে একটি রূপরেখা চুক্তি হওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হ্রাসকল্পে পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা : ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব হওয়ার পর থেকে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে তেহরানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, বিপ্লবের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ ইরানে পরমাণু চুল্লি নির্মাণে সহযোগিতা করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হ্রাসকল্পে পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পাশ্চাত্য-ইরান পরমাণু চুক্তি ও নিষেধাজ্ঞা :** ১৯৭১ সালে ইরানের শাহ সরকার পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশের সঙ্গে পরমাণু বিষয়ে বেশ কটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইরানের বুশেহরে পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণের জন্য জার্মানির সঙ্গে চুক্তি, দারখুইনে আরেকটি পরমাণু চুল্লি নির্মাণের জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি, পারমাণবিক চুল্লিগুলোর জন্যে জ্বালানি সরবরাহ করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এবং অর্ডিফ কোম্পানির শেয়ার কেনার ঘটনা ছিল এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, ১৯৭৯ সালে ইরানে শাহ সরকারের পতনের পর পশ্চিমা সরকার ও পশ্চিমা কোম্পানিগুলো পরমাণু বিষয়ে ইরানের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য গত তেত্রিশ বছরে মার্কিন সরকার ইরানের ওপর ৩৩ বার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে মার্কিন সরকার তাদের কোনো কোনো একতরফা নিষেধাজ্ঞাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতেও সক্ষম হয়েছে।

২. **সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা :** পাশ্চাত্যের হুমকি, চাপ ও অবরোধ সত্ত্বেও ইরান তার শান্তিপূর্ণ বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচি অব্যাহত রাখায় মার্কিন সরকার এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কঠোর করেছে। শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচি বন্ধে ইরানকে বাধ্য করার জন্যই তারা এ পদক্ষেপ নেয়। পাশ্চাত্য ও মার্কিন সরকারের দাবি, ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। অথচ, ইরান পরমাণু অস্ত্র অর্জনকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ বলে মনে করে এবং রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকেও পরমাণু অস্ত্রকে ক্ষমতা বৃদ্ধির কোনো উপায় বলে মনে করে না। ইরানের পরমাণু তৎপরতা যে শান্তিপূর্ণ তা স্পষ্ট করার জন্য দেশটির সরকার তার সমস্ত পরমাণু স্থাপনার নজরদারি করার সুযোগ দিয়েছে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা, বা আইএইএ-কে। তাছাড়া, ইরান পরমাণু অস্ত্র-বিস্তার রোধ চুক্তি বা এনপিটি-তে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ। তেহরান এ পর্যন্ত কখনও ওই চুক্তির কোনো ধারা লঙ্ঘন করেনি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও মার্কিন সরকার জাতিসংঘের পরমাণু তদারকি সংস্থা বা আইএইএ'র মধ্যে নিজের প্রভাব খাটিয়ে এবং কিছু বানোয়াট দলিল-প্রমাণ দেখিয়ে ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে সামরিক বলে দাবি করে। আর এ ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মার্কিন সরকার ও তার মিত্ররা ইরানের পরমাণু প্রসঙ্গটিকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠাতে সক্ষম হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন সরকার এ পরিষদে ইরানের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রস্তাব পাস করে এবং তেহরানের ওপর চাপিয়ে দেয় বেশ কিছু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা।

৩. **জ্বালানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা :** পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইরানের পরমাণু তৎপরতাকে বন্ধ তো করতে পারেইনি বরং দেশটি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে পরমাণু কর্মসূচি জোরদার করে। এ অবস্থায় পশ্চিমা কয়েকটি দেশ জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করলেও নিরাপত্তা পরিষদের অন্য সদস্য দেশগুলোর সাড়া পেতে ব্যর্থ হয়। জাতিসংঘকে দিয়ে নতুন ও আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর মার্কিন সরকার এবং ইউরোপীয় জোট তেহরানের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পাশ্চাত্য এটা জানে যে, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে ইরানের সবচেয়ে বড় উৎসটি হলো জ্বালানি তেল এবং দেশটির বাণিজ্য লেনদেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফলে, ইরানের জ্বালানি তেল ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ঘোষণা করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য। তারা ভেবেছিল এবারের এই নিষেধাজ্ঞার প্রবল চাপে ইরান কাহিল হয়ে পড়বে এবং পাশ্চাত্যের অন্যায় আবদার মেনে নিয়ে তেহরান শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি বন্ধ করবে। কিন্তু, বাস্তবে ঘটেছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা।

৪. **নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়া :** ইরানের জ্বালানি তেলের ওপর ইউরোপের নিষেধাজ্ঞা আরোপের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই বিশ্ব বাজারে তেলের দর বাড়তে থাকে; বিশেষ করে ইউরোপের কয়েকটি দেশে জ্বালানী তেলের দাম নজিরবিহীন মাত্রায় বেড়ে যায়। এ অবস্থায় ইউরোপের আটটি দেশের ৬৯ শতাংশ মানুষ ইরানের তেল আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরোধিতা করেছে। জার্মানির মার্শাল ফান্ড পরিচালিত জনমত জরিপে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া, স্পেন, পোল্যান্ড ও সুইডেনের তিন হাজারের বেশি মানুষের ওপর ওই জরিপ পরিচালিত হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়—ইরানের ওপর অবরোধ আরোপের ফলে বিশ্বমন্দা দেখা দিতে পারে। ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে— ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা অবরোধ আরোপের ফলে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাতে বিশ্বমন্দার ঝুঁকি বাড়ছে।

৫. **পাশ্চাত্যের পিছু হটা :** ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ঘোষণা করলেও তা জুলাই মাসে কার্যকর করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু, নিষেধাজ্ঞার কারণে তেলের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউরোপের দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির সংকট আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে এবং ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে সরকারবিরোধী ক্ষোভ আরো চাঙ্গা হয়। এ অবস্থায় মার্কিন সরকার ইউরোপের ১০টি দেশের জন্য ইরানের তেল বয়কট করা বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু, ইরান পাশ্চাত্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগে-ভাগেই ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। ইউরোপে ইরানের তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তেল সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং অন্য কোনো দেশ ইরানের জ্বালানি তেলের বিকল্প হতে ব্যর্থ হওয়ায় ইউরোপ নিজের সৃষ্ট সংকটের শাস্তি নিজেই ভোগ করতে বাধ্য হয়।

৬. **ইরান-ছয় জাতিগোষ্ঠী সমঝোতা চুক্তি :** সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে আট দিন অহর্নিশ সংলাপের পর ২ এপ্রিল ২০১৫ ইরান ও পি৫+১ (জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য-চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এবং এর বাইরে জার্মানি) এর মধ্যে ইরানের পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা চলতি বছরের ৩০ জুনের মধ্যে শেষ করতে হবে। এ সমঝোতা চুক্তিতে পরিণত হলে যা হবে—

ক. ১০ থেকে ১৫ বছরে ইরানে পারমাণবিক কাজকর্ম অনেকটা কমে আসবে। ফলে ইরানের পারমাণবিক বোমা তৈরির আশঙ্কা অনেক কমে আসবে। অন্য দিকে, ইরানের উপরে নিষেধাজ্ঞাগুলো ধাপে ধাপে উঠে যাবে।

খ. আরাক, ফোরদো ও নাতান- ইরানের এ তিনটি পরমাণু কেন্দ্র নিয়ে সমঝোতা হবে।

গ. আরাকের পরমাণু চুল্লি ঢেলে সাজানো হবে। এতে আর পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়াম তৈরি হবে না। ফেরদোয় শুধু গবেষণার কাজ চলবে। সব সেন্ট্রিফিউজ এবং পারমাণবিক জ্বালানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

ঘ. ইউরেনিয়াম এনরিচ করার একমাত্র সেন্ট্রিফিউজগুলো থাকবে নাতানে।

ঙ. নতুন কোনো পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরি করবে না ইরান।

চ. সেন্ট্রিফিউজের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনবে ইরান। এখন প্রায় ১৯ হাজার সেন্ট্রিফিউজ কাজ করছে। তা কমে দাঁড়াবে ৬১০৮এ। এর মধ্যে ৫০৬০টি সেন্ট্রিফিউজে ১০ বছর ধরে ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট-এর কাজ চলবে। এ সেন্ট্রিফিউজগুলোও প্রথম প্রজন্মের। নতুন প্রজন্মের উন্নতমানের সেন্ট্রিফিউজগুলো কড়া পরিদর্শনে থাকবে।

ছ. ইরান এনরিচ ইউরেনিয়ামের পরিমাণ ১০ হাজার কিলোগ্রাম থেকে ৩০০ কিলোগ্রামে নামিয়ে আনবে। প্রায় ৯৭ শতাংশ হ্রাস করবে। ১৫ বছর ধরে ইরান ইউরেনিয়ামকে ৩.৭ শতাংশ এনরিচ করবে যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগবে। বোমা তৈরির জন্য ইউরেনিয়ামকে ৯০ শতাংশ এনরিচ করতে হয়।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি-র (আইএইএ) পরিদর্শনে থাকবে—

ক. ফেরদোসহ সব পারমাণবিক কেন্দ্র।

খ. কোনো সন্দেহজনক কেন্দ্র।

গ. ইউরেনিয়ামের খনি এবং সরবরাহ প্রাণালী।

ঘ. সেন্ট্রিফিউজের গুদাম।

ঙ. পারমাণবিক কর্মসূচির সাথে জড়িত যে কোনো লেনদেন।

ইরান নিয়মগুলো মেনে চললে ধাপে ধাপে নানা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে আমেরিকা, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান। তবে ইরান নিয়ম না মানলে আবার নিষেধাজ্ঞা ফিরে আসবে।

উপসংহার : ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ইরানের বিরোধ দীর্ঘদিনের। এ বিরোধ যতটা পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে তার চেয়ে বেশি মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হ্রাস এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পেশিশক্তির দাপট প্রদর্শন। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইরানের উপর নানাবিধ অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ অন্যায় ও অযৌক্তিক হুমকির মহড়া চালিয়েছে। কিন্তু এতেই যখন ইরান দমে যায়নি, তখন বাধ্য হয়েই তারা ইরানের সাথে ঐতিহাসিক পারমাণবিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১১। পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি ব্যাখ্যা করুন এবং এর আলোকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর অবস্থান ব্যক্ত করুন।

উত্তর : বিশ শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার কেবল যুদ্ধের সম্ভাবনাই সৃষ্টি করে না, যুদ্ধের ধ্বংস সাধনের ব্যাপকতাও অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি করে। সে কারণেই পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার বিভীষিকা

সকলের কাছে এখনো ভয়ানক ত্রাস। এ ধরনের বিভীষিকাপূর্ণ মারণাস্ত্রের কবল থেকে পৃথিবী তথা অনাগত ভবিষ্যতদেরকে রক্ষা করার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ করা একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চুক্তি এবং আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আইন ও নীতি অনুযায়ী ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির যৌক্তিকতা আছে কিনা সে প্রশ্ন এখন বিশ্বে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি : বিশ্ব পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠার সাথে সাথে কিভাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমানো যায় সে সম্পর্কেও বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র সীমিত করার বা নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি। জাতিসংঘ এ পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্রের ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম SALT-1, SALT-2, মস্কো চুক্তি, মহাকাশ চুক্তি, জেনেভা আলোচনা ইত্যাদি। তবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে NPT এবং CTBT চুক্তি।

NPT চুক্তি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রসমূহের চেষ্টার ফলে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) বা পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাথমিকভাবে ২৫ বছরের মেয়াদি এ চুক্তিতে ৪০টি দেশ স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। ২৫ বছর মেয়াদ শেষে ১৭ এপ্রিল ১৯৯৫ চুক্তিটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য নবায়ন করা হয়। ১৮৯টি দেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও ভারত, পাকিস্তান ও ইসরাইল এ চুক্তির বিরোধিতা করে এতে স্বাক্ষর করতে অপারগতা প্রকাশ করে। তাদের যুক্তি ছিল, এ চুক্তি পারমাণবিক অস্ত্রচর্চা বন্ধের কথা বললেও ইতোমধ্যে যারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে এবং যেসব দেশে মজুদ রয়েছে তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। পাঁচ বছর পর পর NPT-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

NPT-র বৈশিষ্ট্য

- পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী নয় এমন দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলো পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে না এবং এ ব্যাপারে কোনো সাহায্যও করবে না।
- যেসব দেশের পারমাণবিক অস্ত্র নেই তারা পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে না বা এ লক্ষ্যে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা বা প্রযুক্তি গ্রহণ করবে না।
- এ চুক্তির উপধারাগুলোতে বলা হয়েছে যাতে ক্রমান্বয়ে অস্ত্র হ্রাসকরণ, ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, নতুন অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির ওপর কড়াকড়ি আরোপ এবং শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

চুক্তির বৈষম্যমূলক দিক

- এ চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশসমূহের অস্ত্র হ্রাস ও নির্মূলের ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।
- পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশসমূহের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করে অপারমাণবিক দেশসমূহের অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করতে বলা হয়েছে।
- পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর কর্তৃত্বকে পাকাপোক্ত করেছে।
- অপারমাণবিক দেশগুলোর নিরাপত্তা পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

– চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তিহীন দেশগুলো অস্ত্র উৎপাদন করছে কিনা তা যাচাই ও মনিটরিংয়ের কথা বলা হলেও পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর ক্ষেত্রে এরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।

CTBT : Comprehensive Test Ban Treaty বা CTBT'র উদ্ভব হয় বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার প্রসার রোধকল্পে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর সময়ে পারমাণবিক শক্তির বিস্তৃতি বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ নিরাপত্তার লক্ষ্যেই বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পারমাণবিক অস্ত্রনির্মাণ রোধ এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রতি উদ্যোগী হয়। ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়া জাতিসংঘে CTBT চুক্তি তুলে ধরে বিশ্বকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে। চুক্তিটি ঐ বছরেই জাতিসংঘে ১৫৮-৩ ভোটের ব্যবধানে গৃহীত হয়। ভারত, লিবিয়া ও ভুটান চুক্তিটির বিরোধিতা করে এবং ২৪টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে এ পর্যন্ত ১৮৩টি দেশ। কিন্তু চুক্তিটির অ্যানেক্স-২ (ANNEX-2) অনুমোদন করেছে মাত্র ৩৭টি দেশ। চুক্তিটি কার্যকর হতে অ্যানেক্স-২ (ANNEX-2) অনুমোদনকারী ৪৪টি দেশের প্রয়োজন। তাই চুক্তিটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

CTBT'র গুরুত্বপূর্ণ দিক

– চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো সদস্য রাষ্ট্রই কোনো ধরনের পারমাণবিক পরীক্ষা, বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোনো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না এবং তার অধীন কোনো এলাকাতেও এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।
– সকল রাষ্ট্র যে কোনো ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কোনো ক্ষেত্রে জড়িত, উৎসাহ বা কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকবে।
– চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্য এ সংক্রান্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
– এ চুক্তির আওতায় চুক্তির শর্তাবলী সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মেনে নিয়েছে।
– চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একটি ফোরাম গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
– কোনো রাষ্ট্র চুক্তির কোনো শর্তাবলী ভঙ্গ করলে ঐ রাষ্ট্রের অনুরূপ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের অনুমতি চাওয়ার আইনগত বিধান সংরক্ষিত হয়েছে।
– চুক্তিটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম ও ফলাফল মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য চুক্তিটি বাস্তবায়নের ১০ বছর পর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একত্রিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

CTBT-র বৈষম্যমূলক দিক

– ভারত, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি।
– চুক্তিটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে শুধু ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য অনুমোদন করলেও যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া অনুমোদন করেনি।
– CTBT-তে ৮টি পরমাণু শক্তিধর দেশের পরমাণু অস্ত্রের মজুদ ধ্বংসের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। কেবল পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
– চুক্তিটি কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করেনি। ফলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমেই তাদের অস্ত্রের গুণগত মান পরীক্ষা করতে পারে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহকে চাপ প্রয়োগ করছে, অন্যদিকে পরাশক্তিটি নিজেই এগুলো অগ্রাহ্য করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে যখন জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defence, সংক্ষেপে NMD) ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করে তখন তার উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্পর্কে সকলের মনে সন্দেহ উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে শক্তিধর দেশগুলোর অবস্থান : তেল মজুদে বিশ্বে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরান অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক বিবেচনায় মধ্যপ্রাচ্যের একটি অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং এর দু'পাশে ইরাক, তুরস্ক, আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, আর্মেনিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তবেষ্টিত দেশটিকে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত অবস্থান এনে দিয়েছে। অধিকন্তু দেশটির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরাইলবিরোধী কঠোর মনোভাব গ্রহণ করায় দেশটি পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষত আমেরিকার রোষানলে পড়েছে। আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকে।

১৯৯৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংস্কারপন্থিদের বিপুল ভোটে মোহাম্মদ খাতামি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে পশ্চিমা দেশসমূহ বিশেষত আমেরিকার সাথে ইরানের সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। কিন্তু খাতামি দ্বিতীয় দফা (২০০১) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ইরানের দীর্ঘ দুই দশকের গোপন পারমাণবিক কর্মসূচি ২০০৩ সালে ফাঁস হয়ে যায়। অব্যাহত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপে ২০০৩-এর নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)-কে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাসমূহ পরিদর্শনের অনুমতি দেয়া হয় এবং ২০০৪ সালের নভেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে এক সমঝোতার আলোকে ইরান এ আশ্বাস দেয় যে, তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম বন্ধ রাখবে।

২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল কট্টরপন্থিদের বিজয় হলে ২০০৫ সালের জুন মাসে তেহরানের মেয়র, আলী খামেনির কট্টর সমর্থক মাহমুদ আহমেদিনেজাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি পশ্চিমাবিরোধী বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং ইসরাইলকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা উচিত বলে মন্তব্য করেন। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে ইরান ইস্পাহান প্ল্যান্টে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে এই ঘোষণা দেয় যে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বেসামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য নয়। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইরান IAEA'র সিল ভেঙে নাতাঞ্জ পারমাণবিক গবেষণা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করলে IAEA জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করে। নিরাপত্তা পরিষদ ইরানকে সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম বন্ধের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়, অন্যথায় কঠোর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সতর্ক করে।

শর্তপূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ২০০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ১৭৩৭ নং প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ নিষেধাজ্ঞার আলোকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কাজে সহায়তা করে এমন পণ্য ও প্রযুক্তির আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়।

ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ না করায় নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৭ সালের ২৪ মার্চ ১৭৪৭ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে ইরানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফা কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় ইরানে সকল প্রকার অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সাথে ইরানকে আবারো ৬০ দিনের সময় বেঁধে দেয়া হয়, অন্যথায় আরো কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানানো হয়।

ইরানের বর্তমান অবস্থানকে গুটিকয়েক দেশ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ইইউসহ অধিকাংশ দেশই মেনে নিতে পারছে না। চীন, রাশিয়া ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান না নিলেও দেশটি পারমাণবিক অস্ত্রে শক্তিশালী হোক তা চায় না। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির যৌক্তিকতা নিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলো কোন অবস্থানে রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলেই এর যৌক্তিকতা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. **যুক্তরাষ্ট্র :** ইরান দীর্ঘ দুই দশক ধরে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে বলে IAEA'র যে রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির লক্ষ্যেই ইরান এ কর্মসূচি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু ইরান বলছে শুধু জ্বালানি কাজে ব্যবহারের জন্যই দেশটি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কর্মসূচি চালাচ্ছে।

২. **ব্রিটেন :** ইরানের পরমাণু আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ইইউভুক্ত তিন দেশের অন্যতম দেশ হলো ব্রিটেন। অন্য দুটি দেশ হলো ফ্রান্স এবং জার্মানি। আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্রিটেনও ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টায় শামিল হয়।

৩. **ফ্রান্স :** ব্রিটেনের মতো ফ্রান্সও ইরানকে আলোচনায় ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে দেশটির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে।

৪. **জার্মানি :** শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী অন্যতম দেশ জার্মানি। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টায় জার্মানি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। কারণ দেশটির রপ্তানি আয়ের বিরাট একটি অংশ আসে ইরান থেকে। কিন্তু ইরানের কঠোর মনোভাবের কারণে দেশটির সমর্থন হারায়।

৫. **রাশিয়া :** ইরান যে দেশটির ভরসায় পরমাণু কর্মসূচি শুরু করে সেটি হলো রাশিয়া। এ কর্মসূচির আদি-অন্ত রাশিয়ার নখদর্পণে রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এছাড়া ইরানের পক্ষে রাশিয়া যে ধরনের বক্তব্য বিবৃতি দিয়েছে, তাতেই মনে হয়েছে রাশিয়া দেশটির প্রেরণাদাতা। তবে সামরিক হামলার পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের পক্ষে রাশিয়া।

৬. **চীন :** ইরান ইস্যুতে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। চীন ইতোমধ্যে জোর দিয়ে বলেছে, নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে চীন ভেটো দিবে। ভেটো দেয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ইরানের গ্যাস ও তেলের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আগামী কয়েক বছর ধরে ইরান চীনে তেল ও গ্যাস সরবরাহের অঙ্গীকার করেছে। ২০০৪ সালে এরকম একটি চুক্তিতে উভয় দেশ স্বাক্ষর করেছে। ইরানের এ দুর্দিনে একমাত্র চীনই হয়তো সক্রিয়ভাবে পাশে দাঁড়াবে।

৭. **ভারত :** ইরান ইস্যুতে ভারতের বর্তমান অবস্থান হলো 'কুল রাখি না শ্যাম রাখি'। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত অসামরিক পরমাণু অস্ত্র সহযোগিতা চুক্তি, অন্যদিকে ইউপিএ জোটের শরিক বাম দলের বিরোধিতা। তাছাড়া দেশটির জ্বালানির এক বিরাট অংশ আসে ইরান থেকে। তবে ভারত IAEA'র দুটি বৈঠকে ইরানের বিপক্ষে ছিল।

উপসংহার : পারমাণবিক ইস্যুতে এ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি এবং আইনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরমাণু কর্মসূচি চালানোর অধিকার প্রতিটি দেশের আছে। সেক্ষেত্রে ইরান শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরমাণু কর্মসূচি চালাতেই পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পিছনে পরমাণু ইস্যুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ইরান ইসলামী দেশ হিসেবে। উত্তর কোরিয়াও পরমাণু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু উত্তর কোরিয়ার ওপর কোনো চাপ নেই। এদিকে নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ক্ষমতা গ্রহণ করে ঘোষণা দেন ইরানের রকেট প্রযুক্তিতে সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হবে। তিনি আরো বলেন ইরান যদি পারমাণবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখে তাহলে দেশটি আরো একা হয়ে যাবে। পরবর্তীতে ওবামা মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন এবং মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে নানা আশ্বাস দিলেও ইরানের প্রতি নমনীয় কথা মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটাননি।

১১। ক. কিউবা সংকট কি?

খ. যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা কতটুকু? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অসীম শক্তিধর পরাশক্তি। গত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে সেই পরাশক্তি সোয়াকোটি মানুষের একারত্তি দ্বীপ কিউবাকে গলা টিপে বসে আছে। উদ্দেশ্য হলো দেশটিকে পদানত করা ও আমেরিকা বলয়ে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নতি করতে না দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিউবা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সকল নীতিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে কিউবায় যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় হয়েছিল শত ঝড়ঝাপ্টা পেরিয়ে আজো তা স্বগৌরবে বহাল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তার সকল ব্যর্থতা স্বীকার করে বৈরিতা অবসানের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনার উদ্যোগ নিলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এটি বড় ধরনের আগ্রহের সৃষ্টি করে। ১৯৫৬ সালের পর প্রথমবারের মতো দুই দেশের প্রেসিডেন্টের মধ্যে সাক্ষাত ও বৈঠক হয় গত ১০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে পানামা সিটিতে। নতুন সম্পর্ক সূচনায় দুই দেশের প্রেসিডেন্ট আগ্রহ প্রকাশ করায় বিশ্বনেতাদের দৃষ্টি এখন দেশ দুটির দিকে। কিউবা কি তার বৈপ্লবী চেতনা বজায় রেখে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করবে নাকি তা বিসর্জন দিয়ে বিশ্বের চলমান রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ধারায় মিলিত হবে, তাই এখন দেখার বিষয়। তেমনি যুক্তরাষ্ট্র তার নীতিতে কি পরিবর্তন ঘটাবে কিংবা বারাক ওবামার কিউবা নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতা বা জনগণের কিরূপ সম্পৃক্ততা রয়েছে সময়েই তা বলে দেবে।

কিউবা সংকট

১৯৫৯ সালে কিউবায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় হলে যুক্তরাষ্ট্র সে বিপ্লবকে স্বীকৃতি দেয়নি। বিপ্লবের পর কিউবা সরকার যখন লাতিন আমেরিকা জুড়ে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে চাইল, চে গুয়েভারা যখন বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য কিউবা সরকারের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে বলিভিয়ায় গেলেন, তখনই তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এক নতুন বার্তা প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চায়নি তার প্রভাবাধীন এলাকায় অন্য কোনো শক্তি কর্তৃত্ব করুক। কেননা তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও এর বলয়ের সম্প্রসারণ ঘটলে বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী অঞ্চল ল্যাটিন আমেরিকায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল 'মনরো ডকট্রিনের' আদলে লাতিন আমেরিকায় তার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকুক। কিন্তু কিউবার বিপ্লব যুক্তরাষ্ট্রের এই হিসাব-

নিকাশকে পাল্টে দেয়। তাই যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে থামাতেও কিউবার বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে বিপ্লবের ২ বছর পর ১৯৬১ সালে ভাড়াটে কিউবানদের দ্বারা কিউবার সরকারকে উৎখাতের প্রচেষ্টা চালায়। সিআইয়ের অর্থে পরিচালিত 'বে অব পিগস' নামক ঐ অভিযানটি সফল হয়নি। ঠিক এর পরের বছর ১৯৬২ সালে ঐ অঞ্চলে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে সংকট আরো ঘনিভূত হলে সেখান থেকেই কিউবা সংকটের শুরু। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ছিল কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছে, যা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এই বিবেচনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি নৌ-অবরোধ আরোপ করে, যাতে করে কিউবায় কোনো ধরনের সামরিক মরণাস্ত্র সরবরাহ না করা হয়। এই নৌ অবরোধ অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন দাবি করে, যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্ক থেকে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র প্রত্যাহার করতে হবে। দীর্ঘ ১৩ দিন ঐ অবরোধ বহাল ছিল। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে মিসাইল প্রত্যাহার করে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরিয়ে নেয়। এর মধ্য দিয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা কমে গেলেও সংকট কমেনি। এর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র কিউবাতে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে গত ৫৪ বৎসরে কিউবার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১১ শত বিলিয়ন ডলার এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বছরের ক্ষতির পরিমাণ ছিল সোয়া বিলিয়ন ডলার। এছাড়া কিউবাকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। এমন কি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যেই ফিদেল কাস্ত্রোকে মারার জন্য অন্তত আটবার চেষ্টা করে। অন্যান্য দেশ যাতে কিউবার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক না রাখে সে জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সাহায্য পাঠাতে অস্বীকৃতির কারণ ছিল কিউবাতে বাংলাদেশের পাট রপ্তানি।

নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা

বিবাদমান এই দুই দেশের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ২০০৮ সালে তিনি প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে কিউবার সাথে সম্পর্কোন্নয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, ২০০৯ সালেই ওবামা স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূত মিগেল আঙ্গেল মোরাতিনসের মাধ্যমে কাস্ত্রো প্রশাসনের কাছে এক গোপন বার্তায় কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। রাতারাতি পরিবর্তন হয়তো আসে না, কিন্তু এখন আমরা এমন এক সময়ে বাস করি যখন পরিবর্তনের সূচনা সম্ভব এ বার্তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে স্পেনিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে কিউবা কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে জবাবে রাউল কাস্ত্রো দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য একটি 'গোপন চ্যানেল' খোলার পরামর্শ দেন। ঠিক তখন থেকেই সম্পর্কোন্নয়নে অতি গোপনে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে অতি গোপনীয়তার সাথে দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে আলাপ-আলোচনা চলে। ঐ সময়ে কোনো পক্ষ থেকেই মুখ ফুটে কিছু বের না হওয়ায় আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বরে কিউবার বিষয়ে ইতিবাচক বক্তব্য পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'কিউবায় বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ অবস্থায় আমেরিকার উচিত হবে কিউবার সঙ্গে তার সম্পর্ক নতুনভাবে মূল্যায়ন করা।' পরের মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিয়ে এই দুই দেশের কোনো প্রেসিডেন্টের মধ্যে দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় পর করমর্দন ও ফোনালাপ নতুন সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত

দিয়েছিল। সবশেষে ২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল আমেরিকার দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলন (এস ও এস-সামিট অব দি আমেরিকাস) যোগ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও কিউবার নেতা রাউল কাস্ত্রোর মধ্যে ঐতিহাসিক বৈঠক হয়। যা গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর চিরবৈরী দুই দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠক। বিশ্লেষকদের মতে, ঐ বৈঠক ও বৈঠক পরবর্তী আলোচনায় সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো– কিউবাকে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং হাভানা ও ওয়াশিংটনে দু দেশের বন্ধ হওয়া দূতাবাস পুনরায় চালু করা। দূতাবাস চালু করলে কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে এবং পর্যায়ক্রমে কিউবার উপর থেকে মার্কিন অবরোধ তুলে নেওয়া যাবে। কাস্ত্রো ও ওবামার এই উদ্যোগ বিশ্বমহলে প্রশংসিত হলেও খোদ যুক্তরাষ্ট্রে কিউবান আমেরিকানরা এর নিন্দা করেছে। ওবামার উদ্যোগ কিউবা-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় নতুন আশা দেখালেও চূড়ান্ত সম্পর্ক নির্ভর করছে মার্কিন কংগ্রেসের উপর। ডেমোক্রেটিক ও লিবারেল পার্টির অনেক আইনপ্রণেতা রয়েছেন, যারা ওবামার এই উদ্যোগের বিরোধীতা করছেন। তাদের ভাষ্য কিউবার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার সময় এখনো আসেনি। কাজেই সময়ই বলে দেবে যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ হবে। তবে বরফ গলা যখন শুরু হয়েছে তখন কিছুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার : মাত্র ১৪৫ কিলোমিটার দূরত্বের প্রতিবেশী এই দুই দেশের বৈরিতার সম্পর্ক ৫৪ বছরের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক অর্থনৈতিক অবরোধ ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে কিউবা হয়তো মচকেছে, কিন্তু তার বিপ্লবী চেতনা নুয়ে পড়েনি। বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় এসে এই বাস্তবতা বুঝে হয়তো উপলব্ধি করেছেন চিরশত্রু বলে কিছু নেই, এবং তা থাকতেও নেই। তাই কিউবার বিষয়ে নিজ দেশে শত বিরোধীতা থাকা সত্ত্বেও ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে কিউবার সাথে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। বিশ্বায়নের এই যুগে কিউবাও একা চলতে পারবে না। অর্থনৈতিক মন্দা দূর করতে প্রয়োজন নতুন সংস্কার কর্মসূচি। অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে বৈরিতা কাটিয়ে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দেখা যাবে।

নিকাশকে পাল্টে দেয়। তাই যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে থামাতেও কিউবার বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে বিপ্লবের ২ বছর পর ১৯৬১ সালে ভাড়াটে কিউবানদের দ্বারা কিউবার সরকারকে উৎখাতের প্রচেষ্টা চালায়। সিআইয়ের অর্থে পরিচালিত 'বে অব পিগস' নামক ঐ অভিযানটি সফল হয়নি। ঠিক এর পরের বছর ১৯৬২ সালে ঐ অঞ্চলে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে সংকট আরো ঘনিভূত হলে সেখান থেকেই কিউবা সংকটের শুরু। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ছিল কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছে, যা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এই বিবেচনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি নৌ-অবরোধ আরোপ করে, যাতে করে কিউবায় কোনো ধরনের সামরিক মরণাস্ত্র সরবরাহ না করা হয়। এই নৌ অবরোধ অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন দাবি করে, যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্ক থেকে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র প্রত্যাহার করতে হবে। দীর্ঘ ১৩ দিন ঐ অবরোধ বহাল ছিল। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে মিসাইল প্রত্যাহার করে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরিয়ে নেয়। এর মধ্য দিয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা কমে গেলেও সংকট কমেনি। এর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র কিউবাতে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে গত ৫৪ বৎসরে কিউবার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১১ শত বিলিয়ন ডলার এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বছরের ক্ষতির পরিমাণ ছিল সোয়া বিলিয়ন ডলার। এছাড়া কিউবাকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। এমন কি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যেই ফিদেল কাস্ত্রোকে মারার জন্য অন্তত আটবার চেষ্টা করে। অন্যান্য দেশ যাতে কিউবার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক না রাখে সে জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সাহায্য পাঠাতে অস্বীকৃতির কারণ ছিল কিউবাতে বাংলাদেশের পাট রপ্তানি।

নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা

বিবাদমান এই দুই দেশের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ২০০৮ সালে তিনি প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে কিউবার সাথে সম্পর্কোন্নয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, ২০০৯ সালেই ওবামা স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূত মিগেল আঙ্গেল মোরাতিনসের মাধ্যমে কাস্ত্রো প্রশাসনের কাছে এক গোপন বার্তায় কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। রাতারাতি পরিবর্তন হয়তো আসে না, কিন্তু এখন আমরা এমন এক সময়ে বাস করি যখন পরিবর্তনের সূচনা সম্ভব এ বার্তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে স্পেনিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে কিউবা কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে জবাবে রাউল কাস্ত্রো দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য একটি 'গোপন চ্যানেল' খোলার পরামর্শ দেন। ঠিক তখন থেকেই সম্পর্কোন্নয়নে অতি গোপনে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে অতি গোপনীয়তার সাথে দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে আলাপ-আলোচনা চলে। ঐ সময়ে কোনো পক্ষ থেকেই মুখ ফুটে কিছু বের না হওয়ায় আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বরে কিউবার বিষয়ে ইতিবাচক বক্তব্য পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'কিউবায় বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ অবস্থায় আমেরিকার উচিত হবে কিউবার সঙ্গে তার সম্পর্ক নতুনভাবে মূল্যায়ন করা।' পরের মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিয়ে এই দুই দেশের কোনো প্রেসিডেন্টের মধ্যে দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় পর করমর্দন ও ফোনালাপ নতুন সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত

দিয়েছিল। সবশেষে ২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল আমেরিকার দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলন (এস ও এস-সামিট অব দি আমেরিকাস) যোগ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও কিউবার নেতা রাউল কাস্ত্রোর মধ্যে ঐতিহাসিক বৈঠক হয়। যা গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর চিরবৈরী দুই দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠক। বিশ্লেষকদের মতে, ঐ বৈঠক ও বৈঠক পরবর্তী আলোচনায় সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো–

কিউবাকে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং হাভানা ও ওয়াশিংটনে দু দেশের বন্ধ হওয়া দূতাবাস পুনরায় চালু করা। দূতাবাস চালু করলে কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে এবং পর্যায়ক্রমে কিউবার উপর থেকে মার্কিন অবরোধ তুলে নেওয়া যাবে। কাস্ত্রো ও ওবামার এই উদ্যোগ বিশ্বমহলে প্রশংসিত হলেও খোদ যুক্তরাষ্ট্রে কিউবান আমেরিকানরা এর নিন্দা করেছে। ওবামার উদ্যোগ কিউবা-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় নতুন আশা দেখালেও চূড়ান্ত সম্পর্ক নির্ভর করছে মার্কিন কংগ্রেসের উপর। ডেমোক্রেটিক ও লিবারেল পার্টির অনেক আইনপ্রণেতা রয়েছেন, যারা ওবামার এই উদ্যোগের বিরোধীতা করছেন। তাদের ভাষ্য কিউবার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার সময় এখনো আসেনি। কাজেই সময়ই বলে দেবে যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ হবে। তবে বরফ গলা যখন শুরু হয়েছে তখন কিছুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার : মাত্র ১৪৫ কিলোমিটার দূরত্বের প্রতিবেশী এই দুই দেশের বৈরিতার সম্পর্ক ৫৪ বছরের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক অর্থনৈতিক অবরোধ ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে কিউবা হয়তো মচকেছে, কিন্তু তার বিপ্লবী চেতনা নুয়ে পড়েনি। বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় এসে এই বাস্তবতা বুঝে হয়তো উপলব্ধি করেছেন চিরশত্রু বলে কিছু নেই, এবং তা থাকতেও নেই। তাই কিউবার বিষয়ে নিজ দেশে শত বিরোধীতা থাকা সত্ত্বেও ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে কিউবার সাথে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। বিশ্বায়নের এই যুগে কিউবাও একা চলতে পারবে না। অর্থনৈতিক মন্দা দূর করতে প্রয়োজন নতুন সংস্কার কর্মসূচি। অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে বৈরিতা কাটিয়ে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দেখা যাবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ দারফুর কোথায় অবস্থিত? কোন দুটি জাতি নিয়ে দারফুর সংকট সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর : আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ হলো দারফুর। চাদ ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সীমান্তে অবস্থিত এ প্রদেশটি। আরব এবং কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে দারফুর সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এ দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। জাতিগত সংঘাতে দারফুরে এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছে প্রায় ১০ লাখ লোক।

প্রশ্ন-০২ শয়তানের অক্ষশক্তি (Axis of evil) বলতে কোন কোন দেশকে বোঝানো হয়?

উত্তর : মার্কিন প্রশাসন বিশেষত মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ-এর দৃষ্টিতে ইরান, ইরাক ও উত্তর কোরিয়া হচ্ছে শয়তানের অক্ষশক্তি। আমেরিকা মনে করে এ তিনটি দেশ বিশ্বে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয় এবং তারা নিজেরা মারণাস্ত্র তৈরিতে বেশি মনোযোগী। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের জানুয়ারিতে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ তার State of Union বক্তৃতায় শয়তানের অক্ষশক্তি বা Axis of evil তত্ত্বটি প্রদান করেন।

প্রশ্ন-০৩ 'গ্রিন লাইন' কি?

উত্তর : তুর্কি সাইপ্রাস এবং গ্রিক সাইপ্রাসের মধ্যে বিভক্তকারী সীমারেখার নাম হলো 'গ্রিন লাইন'। ১৯৬০ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে সাইপ্রাসের স্বাধীনতার পর গ্রিক সাইপ্রিয়টগণ তুর্কি সাইপ্রিয়টদের মাত্র ৫৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে। যে কারণে সাইপ্রাস হয়ে ওঠে অশান্ত। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালের ১৫ নভেম্বর তুর্কি সাইপ্রিয়টগণ 'তুর্কি সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করে এবং তুরস্ক স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে গ্রিক সাইপ্রিয়টগণও 'গ্রিক সাইপ্রিয়ট প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করে যাকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয়। আর এ দু'প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি হয় সেটিই 'গ্রিন লাইন' হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন-০৪ বাফার স্টেট (Buffer State) কি?

উত্তর : বিবদমান দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বাফার স্টেট (Buffer state) বলা হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে এ ধরনের রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী দেশ বেলজিয়াম বাফার স্টেট হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন-০৫ নো ম্যান্স ল্যান্ড (No Man's Land) কি?

উত্তর : 'নো ম্যান্স ল্যান্ড' হলো দুটি পাশাপাশি রাষ্ট্রের মাঝখানে অবস্থিত একটি স্থান, যে স্থানটি উভয় রাষ্ট্রই তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রই উক্ত স্থানের মালিকানা বা একচ্ছত্র অধিকার দাবি করতে পারে না। যেমন— কুয়েত ও সৌদি আরবের মাঝখানে ৫,৭০০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে একটি নো ম্যান্স ল্যান্ড রয়েছে, যার অধিকার দু দেশেরই রয়েছে।

প্রশ্ন-০৬ Jewish Protocol বা ইহুদি প্রোটোকল কি?

উত্তর : ইহুদি আগ্রাসনের অংশরূপে মিসরের নীলনদ থেকে শুরু করে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে জায়নবাদী ইহুদিরা তাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের সহযোগিতায় ইহুদি রাষ্ট্র সম্প্রসারণের যে নীলনকশা নিয়ে কাজ করছে, ইতিহাসে সেটাই ইহুদি প্রোটোকল বা 'Jewish Protocol' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-০৭ পিএলও'র (PLO) সদর দপ্তরের নাম কি?

উত্তর : পিএলও'র (PLO) সদর দপ্তরের নাম ওরিয়েন্ট হাউজ। এর অবস্থান ফিলিস্তিনের রামাল্লায়।

প্রশ্ন-০৮ ৩৮° অক্ষরেখা কি?

উত্তর : উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিভক্তিসূচক সীমারেখার নাম ৩৮° অক্ষরেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত বাহিনী কোরীয় দ্বীপ দখল করে নেয়। পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড আর্মিরা উত্তর কোরিয়ার অংশ এবং মার্কিন বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার অংশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং আধিপত্য নিয়ে দু দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আর এ বিরোধ নিরসনে কোরিয়াকে সমান্তরাল করে বিভক্ত করা হয়। এ বিভক্তিসূচক রেখাই ৩৮° অক্ষরেখা হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন-০৯ Sunshine পলিসি কি?

উত্তর : দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়ার সাথে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাই sun-shine পলিসি হিসেবে পরিচিত। এ পলিসির মূল উদ্দেশ্য সংঘাতের পথ পরিহার করে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা। এ ছাড়া উত্তর কোরিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তিশালী করাও এ পলিসির অন্যতম উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালের ২৫ জুন সীমান্ত উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়া ৩৮° অক্ষরেখা অতিক্রম করলে দক্ষিণ কোরিয়া সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই।

প্রশ্ন-১০ জাপানের চারটি প্রধান দ্বীপের নাম লিখুন।

উত্তর : জাপানের ৪টি প্রধান দ্বীপ হলো : ১. শিকোকু; ২. কিউসু; ৩. হনসু এবং ৪. হোক্কাইডো।

প্রশ্ন-১১ PLO কি? এর অবিসংবাদিত নেতার নাম কি?

উত্তর : PLO-এর পূর্ণরূপ Palestine Liberation Organization বা ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা। বর্তমানে PLO-এর সদর দপ্তর রামাল্লায় অবস্থিত। এ সংস্থাটি গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক, ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ইয়াসির আরাফাত PLO-এর অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালে PLO চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক ইয়াসির আরাফাত ১১ নভেম্বর ২০০৪ ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন-১২ বেলফোর কে ছিলেন? তার ঘোষণা কেন বিখ্যাত?

উত্তর : আর্থার বেলফোর ছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯১৭ সালে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে ঘোষণা দেন তা 'বেলফোর ঘোষণা' নামে পরিচিত। ইহুদি রাষ্ট্রের পত্তনের মূল ভিত্তি হিসেবে এ ঘোষণা এত বিখ্যাত।

প্রশ্ন-১৩ জেরুজালেম কেন বিখ্যাত?

উত্তর : জেরুজালেম মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি— এ তিন ধর্মাবলম্বীদের নিকটই পবিত্র স্থান। ফিলিস্তিন এবং ইসরাইল দু দেশই জেরুজালেমকে তাদের দেশের রাজধানী করতে চায়। ইসরাইল ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জেরুজালেম দখল করে নেয় এবং ১৯৮০ সালে একে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করে।

প্রশ্ন-১৪ রোডম্যাপ কি?

উত্তর : ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে প্রণীত একটি শান্তি পরিকল্পনাই রোডম্যাপ হিসেবে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ এপ্রিল ২০০৩ আনুষ্ঠানিকভাবে বহু প্রতীক্ষিত এ শান্তি পরিকল্পনা পেশ করে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং রাশিয়া সমন্বিতভাবে প্রস্তাবিত এ রোডম্যাপের খসড়া প্রস্তুত ও অনুমোদন করে। রোডম্যাপে ১ মে ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশ্ন-১৫ গ্রিন লাইন ও সিম লাইন কি?

উত্তর : ইসরাইল ও ফিলিস্তিন সীমানা চিহ্নিত রেখা গ্রিন লাইন বা সবুজ রেখা নামে পরিচিত। অন্যদিকে সিম লাইন হলো ইসরাইলের 'নিরাপত্তা বেষ্টনী'। ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মঘাতী বোমা আক্রমণ ঠেকানো এবং ভৌগোলিকভাবে ফিলিস্তিন থেকে নিজেদের পৃথক করার জন্য ইসরাইল যে প্রাচীর নির্মাণ করেছে তাই 'নিরাপত্তা বেষ্টনী' হিসেবে পরিচিত। এ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৮৭ মাইল এবং এ প্রাচীরকে দুর্ভেদ্য করার জন্য প্রথমে ৬ ফুট কাঁটাতারের বেড়া, তারপর ৮ ফুট গভীর পরিখা, এরপর সেনাবাহিনীর টহলপথ এবং তারপর এ প্রাচীর।

টীকা

♦ আইএস

২৯ জুন ২০১৪ ইসলামী ওয়েবসাইটগুলোতে এবং টুইটারে প্রকাশিত এক বিবৃতির মাধ্যমে সিরিয়া ও ইরাকের বিশাল অংশ দখল করে নেয়া ইরাকের সুন্নী বিদ্রোহীদের সংগঠন 'দি ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ত' (ISIL) নিজেদের দখলকৃত এলাকাকে 'ইসলামি খিলাফত' বলে ঘোষণা দেয় এবং স্বীকৃতির জন্য বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়। পাশাপাশি ISIL বা ISIS নামে পরিচিত এ গোষ্ঠীটি নিজেদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামি রাষ্ট্র' (IS) রাখে। তারা নিজেদের নেতা আবু বকর আল বাগদাদি'কে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেয়, যিনি পরিচিতি পাবেন 'খলিফা ইব্রাহিম' নামে। বিবৃতিতে ঘোষিত ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা উত্তরে সিরিয়ার আলেপ্পো থেকে পূর্ব ইরাকের দিয়ালা প্রদেশ পর্যন্ত বলে ঘোষণা করা হয়। এ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বিশ্বের সব মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং 'গণতন্ত্রসহ পশ্চিম থেকে আগত অন্যান্য আবর্জনা প্রত্যাখ্যান' করার জন্য বলা হয়।

♦ উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুনঃএকত্রীকরণের সম্ভাবনা *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ কোরিয়া উপদ্বীপ নামে বিশ্বে পরিচিত ছিল। দেশ দুটো দীর্ঘদিন যাবৎ এক ভাষা, এক সংস্কৃতি এবং অখণ্ড জাতিসত্তার চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্ব দুই পরাশক্তির অধীনে দুটো ব্লকে বিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে দুই কোরিয়া বিভক্ত হয়। কোরিয়ার দক্ষিণাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে, অপরদিকে উত্তর কোরিয়া দখল করে কমিউনিস্ট রাশিয়া। ১৯৫০ সালের ২৫ জুন সীমান্ত উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়া ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করলে দক্ষিণ কোরিয়া সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে চীন উত্তর কোরিয়ার পক্ষ নেয়, অপরদিকে জাতিসংঘ দক্ষিণ কোরিয়াকে সহায়তা করার জন্য সব রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানায়। উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই। যুদ্ধবিরতির পরপরই দক্ষিণ কোরিয়া

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিশ্চয়তা প্রদান করে। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর থেকেই উভয় দেশের মধ্যে একটা বৈরীভাব বিরাজ করছে। দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ সম্ভব কিনা তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৯০-এর দশকের প্রথমদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং সেই সুবাদে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের প্রেক্ষাপটে নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনালগ্নে বিভক্ত কয়েকটি দেশ একীভূত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় জার্মানি, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেনের একত্রীকরণের ঘটনাসমূহ। তবে আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে কোরিয়ার অবস্থা তুলনামূলকভাবে একটু ভিন্ন হিসেবে বিবেচিত। দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের পেছনে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও কতিপয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তা এ মুহূর্তে বেশ কঠিন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ আঞ্চলিক পরাশক্তিসমূহের আন্তরিক ইচ্ছা ও বাস্তব উদ্যোগ না থাকলে তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কৌশলগত রাজনীতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে, দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।

♦ সিরিয়া সংকট

সিরিয়ার সরকারবিরোধী প্রধান জোট ন্যাশনাল কোয়ালিশন বা National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces ১৮ মার্চ ২০১৩ দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘাসান হিত্তোকে নির্বাচিত করে। অন্যদিকে ২৩ মার্চ ২০১৩ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি 'নিষ্ফল বৈঠকের' পর কোয়ালিশনের প্রেসিডেন্ট মোয়াজ আল খতিব পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২৪ মার্চ ২০১৩ তিনি নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তার পদত্যাগের কথা নিশ্চিত করেন। তবে বিরোধী জোট তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেনি। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর ২০১১ সালের নভেম্বরে আরব লীগ দেশটিকে বহিষ্কার করে। পরে বিভিন্ন পশ্চিমা ও আরব দেশগুলো সিরিয়ার বিরোধী জোটকে স্বীকৃতি দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬-২৭ মার্চ ২০১৩ কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত আরব লিগের শীর্ষ সম্মেলনে তারা সিরিয়ার আসনে প্রতিনিধিত্ব করে। একই সাথে সিরিয়ার আসনের সামনে সরকারি পতাকার বদলে বিরোধীদের ব্যবহৃত পতাকা রাখা হয়।

♦ কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধাবস্থা

কোরীয় উপদ্বীপ এক কঠিন ও অতি বিপজ্জনক অধ্যায়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ উত্তর কোরিয়া তৃতীয়বারের মতো সফল পরমাণু পরীক্ষা চালালে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ অবস্থায় জাতিসংঘ নতুন করে পিয়ংইয়ং-এর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা কঠোরতর হওয়ার জবাবে উত্তর কোরিয়া ১১ মার্চ ২০১৩ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে হটলাইন ও অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং শত্রুকে নিধন করার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তার সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানায়। এরপরই শুরু হয় দু পক্ষের মধ্যে বাগযুদ্ধ। প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়ার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পার্ক জিউন হাই উত্তর কোরিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরমাণু বোমা, দূরপাল্লার মিসাইল এবং যুদ্ধের উস্কানি পরিহার করতে বলেন। এর জবাবে ২৬ মার্চ ২০১৩ উত্তর

কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে দেয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, পিপলস আর্মির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাদের দূরপাল্লার রকেট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ সব ধরনের গোলন্দাজ বাহিনীকে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় আরেক দ্বীপ গুয়ামে অবস্থিত এর অন্য সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কোরিয়া যুদ্ধের পর দুই কোরিয়ার মধ্যে কোনো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। ঐ সময় তাদের মধ্যে একটি সামরিক অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়, যা ১১ মার্চ ২০১৩ উত্তর কোরিয়া বাতিল করে। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম রেডক্রসের হটলাইন সংযোগ। ১৯৭১ সালে দু'দেশের মধ্যে এ হটলাইন স্থাপিত হয়। সম্প্রতি জাতিসংঘ উত্তর কোরিয়ার ওপর নতুন করে অবরোধ আরোপ করায় ১১ মার্চ ২০১৩ এটিও বিচ্ছিন্ন করে দেয় পিয়ংইয়ং। ১৯৫৩ সালে স্বাক্ষরিত অস্ত্রবিরতি চুক্তি বাতিল হয় সাতবার এবং ১৯৭১ সালে স্থাপিত হটলাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় পাঁচবার। উত্তর কোরিয়ার উস্কানির জবাব দিতে ২২ মার্চ ২০১৩ দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি নতুন সামরিক পরিকল্পনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়ার দিক থেকে সৃষ্ট যে কোনো আঞ্চলিক উস্কানির জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া থাকবে নেতৃত্বে এবং যুক্তরাষ্ট্র থাকবে সহযোগী ভূমিকায়। 'উস্কানি' বলতে সীমান্তে আকস্মিক বিমান হামলা এবং সীমান্ত এলাকায় যে কোনো হামলাকে বোঝানো হয়েছে।

♦ উপসাগরীয় যুদ্ধ

কুয়েতকে ইরাকের দখলমুক্ত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৩২টি দেশের ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে ইরাকি বাহিনী কুয়েত দখল করে এবং কুয়েতকে ইরাকের ১৯তম প্রদেশ বলে ঘোষণা করে। ৭ আগস্ট সৌদি আরবের তেলখনিগুলো রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, মিসর প্রভৃতি দেশের যৌথ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় উপসাগরে। এর নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ডেজার্ট শিল্ড'। ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি বলে ঘোষণা করে। ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন এই ডাকে সাড়া না দিলে জেনারেল নরম্যান সোয়াজকদ-এর নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' শুরু করে। বহুজাতিক বাহিনী ১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি ইরাকে বিমান হামলা শুরু করে। আক্রমণের লক্ষ্য থেকে বেসামরিক স্থানও বাদ যায়নি। ইরাক অন্যান্য আরব দেশগুলোর সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে ইসরাইল ও সৌদি আরবে স্কাড মিসাইল হামলা চালায়। ২৪ ফেব্রুয়ারি বহুজাহিক বাহিনী ইরাকের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধ শুরু করে। দীর্ঘ ৪৩ দিন বিমান ও স্থল আক্রমণের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি ইরাক কুয়েত থেকে সেনা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। উপসাগরে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদ ঘোষিত শর্তগুলো ইরাক মেনে নেয়। শর্তগুলো হলো : ইরাকের সব ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক, জীবাণু ও পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। ইরাক যাতে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নির্মাণ করতে না পারে সেজন্য ইরাকের ভবিষ্যৎ গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে। কুয়েতের স্বাধীনতার পর ১৯৬৩ সালে ইরাকের সঙ্গে বিতর্কিত সীমান্ত ইরাককে মেনে নিতে হবে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ইরাককে তার তেল বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ তহবিলে জমা রাখতে হবে। উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর ২৩৪ জন, ৮৫,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ ইরাকি সৈন্য এবং প্রায় ৩৩,০০০ কুয়েতি জনগণ প্রাণ হারায়।

♦ সানশাইন পলিসি

দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক প্রতিবেশী উত্তর কোরিয়ার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নীতিকে 'সানশাইন পলিসি' (Sunshine) বলা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং এ নীতির প্রবক্তা। তিনি তার পূর্ববর্তী শাসকদের চেয়ে উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। কিম দায়ে জং-এর এই পলিসির ফলে শত্রুভাবাপন্ন দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০১ সালের ১৩ জুন দু দেশের প্রেসিডেন্টের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

♦ Wye River চুক্তি *[২১তম বিসিএস]*

২৪ অক্টোবর ১৯৯৮ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডের ওয়েইরিভার সম্মেলন কেন্দ্রে একটানা নয় দিনের আলোচনার পর হোয়াইট হাউসে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে নতুন 'অন্তর্বর্তীকালীন সমঝোতা স্মারক' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একে 'ওয়েই রিভার চুক্তি' বা 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি' চুক্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতা করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জর্ডানের বাদশাহ হোসেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বর্ধিত ইহুদি জনসংখ্যার আবাসনের নামে জেরুজালেমের ইহুদি ছিটমহল 'হারহোমাতে' আবাসিক প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। জেরুজালেমকে রাজধানী করার ঘোষণাও তিনি দেন। ফিলিস্তিনি সরকার ও স্বাধীনতাপন্থী ইসলামী গ্রুপগুলো এর বিপক্ষে অবস্থান নিলে ফিলিস্তিনি-ইসরাইল সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করে। অতঃপর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডলিন অলব্রাইট একটি আপোস ফর্মুলা পেশ করেন। এ ফর্মুলায় ১৩ শতাংশের মধ্যে ৩ শতাংশকে প্রাকৃতিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা এবং ইহুদি বসতি স্থাপনাকারীরাও সেখানে বসবাস করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব মানতে রাজি হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরে ইসরাইল রাজি না হলেও ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ঘোষণা দেন তিনি ৪ মে ১৯৯৯ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবেন। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র উভয় কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করে। এ চুক্তিকে ১৯৯৯ সালের ৪ মের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে অনুমান করা হয়।

চুক্তির শর্ত ছিল ইসরাইল ১৯৬৭ সালে দখলকৃত পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূ-খণ্ড ফিলিস্তিনিদের হাতে হস্তান্তর করবে। এছাড়া ইসরাইল কারাগারে আটক ৩০০০ ফিলিস্তিনি বন্দিদের মধ্যে ৭৫০ জনকে মুক্তি দেবে এবং পশ্চিম তীর ও গাজার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদের যাতায়াতের জন্য নিরাপদ করিডোর বা সংযোগ পথ স্থাপন করার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে এ চুক্তিতে। অপরদিকে পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরাইলি সেন্য প্রত্যাহার শুরুর দু মাসের মধ্যে পিএলও কেন্দ্রীয় পরিষদ ১৯৬৪ সালের পিএলও সনদে অন্তর্ভুক্ত ইসরাইল রাষ্ট্র উচ্ছেদের ঘোষণা বিলুপ্ত করবে। এ ছাড়া ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ইহুদি বিরোধী সশস্ত্র চরমপন্থী গ্রুপের অবকাঠামো ধ্বংস, চরমপন্থীদের গ্রেপ্তার এবং ইসরাইলবিরোধী হামলার অভিযুক্ত চরমপন্থীদের বিচারসহ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত সন্ত্রাস বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করবে। ইসরাইলের কয়েকজন মন্ত্রীসহ অনেকে এবং ফিলিস্তিনি চরমপন্থী দলগুলো এ চুক্তির বিরোধিতা করে। চমরপন্থী দলগুলোর বিরোধিতার মাঝেও ৩০ অক্টোবর ১৯৯৮ ফিলিস্তিনি মন্ত্রিসভায় চুক্তিটি অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু ৬ নভেম্বর '৯৮ জেরুজালেমের ইহুদা নামক স্থানে চরমপন্থী ফিলিস্তিনিদের বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হলে ইসরাইল একতরফাভাবে চুক্তিটিকে স্থগিত ঘোষণা করে।

♦ কোরিয়ার যুদ্ধ

কোরিয়া ১৯১০ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪৫) পর্যন্ত জাপানের অধীনে ছিল। ১৯৪৫ সালে উত্তর কোরিয়ায় রুশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল ঢুকে পড়ে এবং ৩৮তম অক্ষরেখা বরাবর কোরিয়াকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বিভক্ত করে। ১৯৫০ সালের ২৫ জুন উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট সেনা কোরিয়া আক্রমণ করে। জাতিসংঘ ২৭ জুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সদস্যদের দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করার জন্য আবেদন করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদের এ বৈঠক বয়কট করে। জুনে উত্তর কোরিয়া সিউল দখল করে নেয়। ৮ জুলাই জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার জাতিসংঘ বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন। জাতিসংঘ বাহিনী প্রতি আক্রমণে (আগস্ট-সেপ্টেম্বরে) সিউল দখল করে এবং অক্টোবরে উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়ং পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ২৬ অক্টোবর চীন যুদ্ধে যোগ দেয় এবং জাতিসংঘ বাহিনী ৩৮তম অক্ষরেখা বরাবর পশ্চাদপসরণ করে। জাতিসংঘ বাহিনী চীনের হাতে পর্যুদস্ত হতে থাকলে জেনারেল ম্যাথিউ বিজওয়েকে জেনারেল ম্যাক আর্থারের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ২৬ জুন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ২৬ অক্টোবর ১৯৫৮ উত্তর কোরিয়া থেকে চীনা সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। যুদ্ধে মোট ৪০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।

♦ ইরাক যুদ্ধের সমাপ্তি

১৫ ডিসেম্বর ২০১১ ইরাক যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মার্কিন সামরিক পতাকা নামানোর মাধ্যমে মার্কিনিদের ইরাক অভিযান শেষ হয়। এরপর ১৮ ডিসেম্বর মার্কিন বাহিনীর সর্বশেষ দল কুয়েত সীমান্ত দিয়ে ইরাক ত্যাগ করে। সমাপ্তি ঘটে দীর্ঘ ৯ বছরব্যাপী একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাকে হামলা চালায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট। তৎকালীন ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের হাতে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র আছে, এ অভিযোগে দেশটিতে হামলা চালানো হয়। যদিও পরে সেই অস্ত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২০০৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মার্কিন সেনাদের ইরাক ছাড়ার কথা ছিল। ১৯ আগস্ট ২০১০ ইরাক থেকে বিদায় নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষ কমব্যাট বাহিনী। এর ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ঘোষিত ৩১ আগস্ট ২০১১ সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাহার করা হয় কমব্যাট সেনাদের। আর এর মধ্য দিয়েই কার্যত ইরাক যুদ্ধের ইতি টানে যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য এরপরও প্রশাসনিক এবং কারিগরি সহায়তার জন্য ৫৬ হাজার মার্কিন সেনা সদস্য ইরাকে ছিল। আর তারাও দেশে ফিরে গেছে ২০১২ সালের মধ্যে। কমব্যাট সেনা প্রত্যাহারের আগে ৬ আগস্ট ২০১১ ইরাকের নিজস্ব বাহিনীর কাছে সব সামরিক দায়িত্ব হস্তান্তর করে যুক্তরাষ্ট্র। এখন ইরাকি বাহিনী দেশটির যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে। ইরাকে অবস্থান করা মার্কিন সেনারা কোনো যুদ্ধে অংশ নেবে না। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এক লাখ ৫০ হাজার সেনা ছিল। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর জানায়, ২০০৩ সালে ইরাকে সামরিক অভিযানের পর ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সহিংসতায় যুক্তরাষ্ট্রের ৪,৪১৯ জন সেনা মারা গেছে। চলতি সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন নাম হবে 'অপারেশন নিউ ডন'। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম' নামে ইরাকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে ইরাক যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। স্বাধীন পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'ইরাক বডি কাউন্ট'-এর তথ্যানুযায়ী ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে গত ১০ বছরে প্রায় দুই লাখ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে।

♦ ইরাক-ইরান যুদ্ধ

ইরাক-ইরান উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৮০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। শাতিল-আরব জলপথের অধিকার নিয়ে এই দুটি উপসাগরীয় দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত। তৃতীয় বিশ্বের দুটি দেশের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেবল এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিই নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটে। শুরুতে এই যুদ্ধ কেবলমাত্র ইরান-ইরাকের মধ্যে সীমিত থাকলেও পরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বহিরাগত শক্তি—বিশেষত আরব দেশ এবং বৃহৎ শক্তিসমূহ। জর্ডান ও মিশর—এ দুটি আরব দেশ শুরু থেকেই ইরাককে এবং সিরিয়া ও লিবিয়া ইরানকে যুদ্ধে মদদ জুগিয়েছে। বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে ফ্রান্স ইরাকের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী হয়ে ওঠে। মস্কোও দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকার পর এই যুদ্ধে বাগদাদকেই সমর্থন জানায়। ১৯৮০-৮৮ পর্যন্ত যুদ্ধে দু পক্ষের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারায়। মার্কিন হিসাব অনুসারে ইরানের কমপক্ষে এক লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়। ব্রিটিশ যুদ্ধবিশারদরা অবশ্য এ সংখ্যা আরো বেশি বলে দাবি করেন। অন্যদিকে ইরাকের ক্ষয়ক্ষতিও বিশাল। আন্তর্জাতিকভাবে এ যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হলেও কোনোটাই সফল হয়নি। ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন শান্তি ও যুদ্ধবিরতির কথা বার বার বললেও ইরান তাতে কর্ণপাত করেনি। এই যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা ইরানি শাসকদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ছিল। যুদ্ধের নামে দেশের অগণিত সমস্যা ধামাচাপা দিতে শাসকরা সচেষ্ট ছিলেন। জাতিসংঘের আহ্বানে ২৯ আগস্ট ১৯৮৮ ইরাক-ইরান যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়।

♦ ইরানের ইসলামী বিপ্লব

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। পতন অনিবার্য হয়ে ওঠায় ইরানের শাহ আগেই দেশ ছেড়ে বাহামায় পালিয়ে যান। রেজা শাহ পাহলভী ১৯৫২ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বস্ত মার্কিন মিত্র। যুক্তরাষ্ট্র তাকে টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের তোড়ে সকল মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পরই মার্কিন দূতাবাসে জিম্মি সংকট দেখা দেয়। ইরানি ছাত্ররা মার্কিন দূতাবাস অবরোধ করে। প্রায় এক বছর এই অবরোধ স্থায়ী হয়। জিম্মিদের উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্র একটি ব্যর্থ সামরিক অভিযান চালায়। ইরানের ইসলামী বিপ্লব সমসাময়িক পৃথিবীতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। অনেকেই ভাবতেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ইরানের ইসলামী বিপ্লব এ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। ইসলাম যে এখনো বিপ্লব সাধনে সক্ষম, ইরানের ইসলামী বিপ্লবই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

♦ হরমুজ প্রণালী *[১১তম বিসিএস]*

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীর নাম হরমুজ প্রণালী (Hormuz Straits)। এটি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের (ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি) উপসাগর পার হয়ে সমুদ্রে পৌঁছার একমাত্র পথ। তাছাড়াও বিদেশী জাহাজগুলোকে তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আসতে হলে আরব সাগর থেকে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করতে হয়। হরমুজ প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান যুগে যুগে বহু যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে। এসব যুদ্ধে বিশ্বের পরাশক্তি ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। এর কারণ এ প্রণালীটি ৬০ কিমি-এর বেশি চওড়া না হলেও এ পথ দিয়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি তেলবাহী ট্যাংকার বের হয়ে আসে। হরমুজ প্রণালীর মাধ্যমে সরবরাহকৃত তেল পাশ্চাত্য দেশসমূহের উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। অন্যদিকে হরমুজ

প্রণালীর প্রবেশ পথে আবু মুসা, বড় টাম্ব ও ছোট টাম্ব দ্বীপগুলোর অবস্থানের কারণে প্রণালীর গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে গেছে। এই দ্বীপগুলো হরমুজ প্রণালীর একেবারে কাছাকাছি বলে এদের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ পথ জিব্রাল্টার অথবা লোহিত সাগরের প্রবেশপথ এডেনের গুরুত্বের। হরমুজ প্রণালীসহ এই দ্বীপগুলো যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে, যে শক্তির কাছে এই অঞ্চলটি রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাভজনক হবে। সব দিক থেকে এই তিনটি দ্বীপ এবং হরমুজ প্রণালী পরস্পরের পরিপূরক। হরমুজ প্রণালীর এই গুরুত্বের কারণে ইরানের শাহ এ প্রণালীর তীরে বিশেষ করে ওমানের সমুদ্র উপকূলে কোনো বিদেশী শক্তিকে ঘাঁটি করতে দেয়নি। ইরান-ইরাক যুদ্ধের মূল রয়েছে এই প্রণালীর ওপর কে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে সে কারণটি। ইরান হরমুজ প্রণালীর ওপর দিয়ে বিদেশী জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে পারস্য উপসাগরীয় কিছু দেশের সাথে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়।

♦ শাত-ইল-আরব

প্রায় তিন দশক পর শাত-ইল-আরবের নৌপথ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে খুলে দেয়া হয়েছে। অ্যাংলো-ডাচ তেল কোম্পানি শেলের একটি বন্দর চালুর জন্যই এ জলপথ খুলে দেয়া হয় ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রায় ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাত আল আরব নদীর একটি অংশ ইরাক ও ইরানকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এর জলসীমা ভাগাভাগি নিয়ে দেশ দুটির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইরান-ইরাক যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ বিবেচনা করা হয় এ বিরোধকে। যুদ্ধের কারণে নৌপথটি ১৯৮০ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় মাজনুন তেলক্ষেত্র আবার চালুর উদ্দেশ্যে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে শেল ও মালয়েশীয় কোম্পানি পেট্রোনাসের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তেলক্ষেত্র চালুর জন্য নতুন বন্দর খোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে আবিষ্কৃত মাজনুন তেল ক্ষেত্রের তেল উত্তোলনের কাজও ১৯৮০ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এ নদীতে আরো অনেক পোতাশ্রয় আছে। কিন্তু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই প্রথমবারের মতো শাত ইল-আরবকে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে পরিণত করা হলো।

♦ সুয়েজ খাল

সুয়েজ পৃথিবীর দীর্ঘতম সামুদ্রিক খাল। এটি উত্তরে ভূমধ্যসাগরের সাথে দক্ষিণে লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে। খালটি মিশরের পোর্ট সৈয়দ থেকে পোর্ট তওফিক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই খালের পশ্চিম তীরে মিশরের মূল ভূখণ্ড এবং পূর্ব তীরে সিনাই উপদ্বীপ। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭২.২০ কিলোমিটার, প্রস্থ ৬০ মিটার এবং গভীরতা ১৩ মিটার। খালটি অতিক্রম করতে প্রতিটি জাহাজের ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এই খালের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন গড়ে শতাধিক জাহাজ চলাচল করে। খালটির প্রবেশ পথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পোর্ট সৈয়দ এবং সুয়েজ উপসাগরের প্রবেশ পথে পোর্ট সুয়েজ অবস্থিত। ১৮৫৯ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যান্ড ডি-লিসেপ্স খালটি খননের পরিকল্পনা করেন। ১৮৬৯ সালে এর খননকার্য শেষ হয়। ১৯৫৬ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের খালটি জাতীয়করণ করলে ইঙ্গ-মার্কিন ও ইসরাইলের সাথে মিশরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরে ১৯৭৫ সালের ৫ জুন পর্যন্ত এই খালটির পথ বন্ধ ছিল। বর্তমানে খালটি সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ নামক একটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই খাল বোম্বে ও লন্ডনের মধ্যে ৭,০০০ কি.মি. পথ কমিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও খালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দেশগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। সুয়েজ খাল কৌশলগত দিক দিয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই খাল বন্ধ থাকলে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার কোনো অঞ্চলে সামরিক বা বাণিজ্য জাহাজগুলোকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসতে হবে।

♦ আবু মুসা

আবু মুসা হরমুজ প্রণালীর নিকট একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান উভয়েই এ দ্বীপের মালিকানা দাবি করে। ১৯৭১ সালে সারজায় আমিরাতের সাথে সমঝোতা হলে ইরান দ্বীপের অর্ধেকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু পরবর্তীতে ইরান পার্শ্ববর্তী 'লেসার টম্ব' এবং 'গ্রেটার টম্ব' দখল করে এবং ঘোষণা দেয়, ইরানই হচ্ছে আবু মুসা দ্বীপের একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী। এর ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো ইরানকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। দ্বীপটি কৌশলগত দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা হরমুজ প্রণালীর ঠিক সন্নিকটেই এর অবস্থান। এই দ্বীপ হচ্ছে ধনী উপসাগরীয় কয়েকটি দেশের প্রবেশদ্বার। ইরান এই দ্বীপকে একটি সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে হরমুজ প্রণালীর ওপর নজর রাখে।

♦ পশ্চিম তীর

পশ্চিম তীর জর্ডান নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত পার্বত্য সমভূমি অঞ্চল । ১৯৬৭ সালে জর্ডানের কাছ থেকে দখল করার পর থেকে এটি ইসরাইলের অধিকারে ছিল। বর্তমানে এটি ফিলিস্তিন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ১৯৯৪ সালের ২৯ আগস্ট ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ইসরাইল জেরিকো শহরসহ পশ্চিম তীর ফিলিস্তিনি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এবং ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম তীরের জনস্বাস্থ্য, আয়কর, শিক্ষা, পর্যটন ইত্যাদি থাকবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে এবং প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়সমূহ থাকবে যৌথ বাহিনীর হাতে। তবে এই চুক্তি সত্ত্বেও পশ্চিম তীরের ওপর এখনো সম্পূর্ণ প্যালেস্টাইনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

♦ গাজা

ইসরাইলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় ভূমধ্যসাগর ঘেঁষে এক চিলতে জায়গা গাজা উপত্যকা। এর আয়তন ১৩৯ বর্গমাইল বা ৩৬০ বর্গকিলোমিটার। এর দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার আর প্রস্থ স্থানবিশেষে ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার। গাজার লোকসংখ্যা ১৮ লাখ ১৬ হাজার ৩৭৯ জন। এটি মূলত একটি বড় মাপের শরণার্থী শিবির, যার ৮০ ভাগ মানুষ দরিদ্র। গাজাকে 'পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতি জনপদ' (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫,০৪৬ জন) বলা হয়ে থাকে। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের মূল ভূখণ্ডের সাথে গাজার দূরত্ব ৩০ মাইল। এ দূরত্বের পুরোটাই ইসরাইলের মরুভূমি এলাকা। বর্তমান ফিলিস্তিন মূলত দু'ভাগে বিভক্ত– পশ্চিম তীর ও গাজা। গাজা হচ্ছে হামাস নিয়ন্ত্রিত জনপদ। আর পশ্চিম তীরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ মুভমেন্ট। পশ্চিম তীরের মতো গাজাকেও ইসরাইলিরা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখল করে নেয়। ফিলিস্তিনিদের অবিরাম প্রতিরোধ আন্দোলনে অপদস্থ ইসরাইলিরা ২০০৫ সালে গাজা ছেড়ে গেলেও গত ১৮ মাস তারা গাজায় ঢোকার ও বেরোনোর পথগুলো বন্ধ রেখেছে। দক্ষিণে মিসরের সিনাইয়ের দিকে একটা প্রবেশপথ আছে, কিন্তু ইসরাইলি-মার্কিন চাপের ফলে মিসর সে পথটিও বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। গাজার যৎসামান্য কৃষি

উৎপাদন রফতানি হতে পারছে না এ অবরোধের কারণে। অন্য দিকে খাদ্য, ওষুধপত্র, জ্বালানী ইত্যাদি সব কিছুরই আমদানি নির্ভর করে ইসরাইলের মর্জির ওপর। গাজার সাড়ে ৭ লাখ অধিবাসী সম্পূর্ণরূপে জাতিসংঘের খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ ইসরাইল কোনো প্রকার উস্কানি ছাড়াই গাজার ১৫ লাখ অধিবাসীর ওপর শুরু করে আক্রমণ। ২২ দিনের উপর্যুপরি ইসরাইলি বিমান হামলায় পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় গাজা। ৮ জুলাই ২০১৪ হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ইসরাইল 'Opertion Protective Edge' নামের সাংকেতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা চালায়। এ হামলায় বর্বর ইসরাইলি বাহিনী কোনো কিছুই অক্ষত রাখেনি, হত্যা করে নিরীহ নারী ও শিশুদের বিশ্ববিবেকের সকল আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করে তারা এ হামলায়।

♦ ম্যাকাও

চীনের দক্ষিণে অবস্থিত এ ক্ষুদ্র উপনিবেশটি প্রায় সাড়ে ৪০০ বছর ধরে পর্তুগালের অধীনে ছিল। ১৯৮৭ সালের ১৩ এপ্রিল চীন ও পর্তুগালের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের জুন মাসে ম্যাকাও চীনের অধিভুক্ত হয়। হংকং থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ম্যাকাওয়ের আয়তন ৬.৮৭ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত ম্যাকওয়ের অধিবাসীদের প্রায় ৯৫ শতাংশই চীনা ও বাকি ৫ ভাগ পর্তুগিজ। অফিসিয়াল ভাষা পর্তুগিজ ও চীনা। ম্যাকাওয়ের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৫১৩ সালে জর্জ আলভরিস নামক এক পর্তুগিজ নাবিক প্রথম এখানে অবতরণ করেন এবং ১৫৫৭ সালে সরকারিভাবে পর্তুগিজ শাসনাধীনে আসে। ১৮৪৬ সালে ম্যাকাওয়ের গভর্নর জোয়াও ফেরেরা দ্য আমারাল ম্যাকাওকে শুল্কমুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ম্যাকাও সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত। ১৯৫১ সাল থেকে ম্যাকাও পর্তুগালের একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

♦ মিন্দানাও

মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপের নাম মিন্দানাও। দীর্ঘদিন এটি ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ছিল। দ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসীই মরো মুসলিম। ১৯৭২ সালে ফিলিপাইনের স্বৈরশাসক ফার্ডিনান্ড মার্কোস ক্ষমতায় এসেই এখানকার মুসলমানদের ওপর ব্যাপক দমন-নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। সেই থেকে মিন্দানাও-এর মুসলিম গেরিলা নেতা নূর মিসৌরির নেতৃত্বে মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা আন্দোলন শুরু করে। উভয় পক্ষে সংঘর্ষে প্রায় ৫০,০০০ লোক হতাহত হয়েছে। অবশেষে দীর্ঘ ২৪ বছর পর কেন্দ্রীয় সরকার মিন্দানাওকে স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজি হয় এবং ২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ এক চুক্তি করে। চুক্তি মোতাবেক ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় সরকার সেখান থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং নূর মিসৌরিকে মিন্দানাওয়ের গভর্নর নিযুক্ত করে। পরে নূর মিসৌরির সাথে সরকারের বিরোধের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় মিন্দানাওয়ে সৈন্য মোতয়েন করে এবং নূর মিসৌরিকে কারারুদ্ধ করে। বর্তমানে মিন্দানাও একটি স্বায়ত্তশাসিত উপদ্বীপ।

♦ গোলান মালভূমি

গোলান মালভূমি অবস্থানগত দিক থেকে ইসরাইল, জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। ১৯৬৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ মালভূমির মালিকানা ছিল সিরিয়ার। ১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব-ইসরাইল

যুদ্ধে গোলান মালভূমি ইসরাইলের দখলে চলে যায়। জর্ডান নদীর তীরে অবস্থিত গোলান মালভূমি সিরিয়াকে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সিরিয়া ও ইসরাইলের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এখনো এ ব্যাপারে কোনো চুক্তি না হওয়ায় গোলান মালভূমি সিরিয়া ফেরত পায়নি। আশা করা যায় শীঘ্রই এ ব্যাপারে একটা মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব হবে এবং আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইসরাইল গোলানকে সিরিয়াকে ফেরত দানে বাধ্য হবে।

♦ মসুল

উত্তর ইরাকে টাইগ্রিস নদীর তীরে প্রাচীন নিনাভা নগরের ধ্বংসাবশেষের বিপরীত দিকে অবস্থিত নগরীর নাম মসুল। নগরের অধিবাসীরা প্রধানত আরব, কিন্তু আশেপাশে কুর্দি উপজাতীয়রা খাদ্যশস্য ও লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন এবং গবাদি পশুপালন করে। আনুমানিক ৭৫০ সালে এটা উত্তর মেসোপটেমিয়ার প্রধান নগরে পরিণত হয়। দশম-একাদশ শতকে স্বাধীন সুলতানদের রাজধানী ছিল। নগরের চারপাশে সুদৃঢ় প্রাচীর থাকায় সালাহউদ্দিন ও নাদির শাহ এটা অধিকার করতে পারেননি। তৈমুর লং নগরীটি ধ্বংস না করে বরং টাইগ্রিস নদীর সুদর্শন নৌকার সেতুটি পুনর্নির্মাণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মসুল ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯২৬ সালে লীগ অব নেশন তুরস্কের দাবি অগ্রাহ্য করে নগরীটি ইরাকের অধিকারে ছেড়ে দেয়। এখানে অসংখ্য মসজিদ ও আসিরীয়দের কতিপয় গির্জা আছে। এককালে নগরের নামানুসারে আখ্যায়িত 'মসলিন' বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে উৎকৃষ্ট ধাতব দ্রব্য উৎপাদিত হয়। মসুলের উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ এলাকায় তেল খনি আছে। এর আয়তন ৫০,৮৮১ বর্গ কিলোমিটার।

♦ কুর্দিস্তান

পূর্ব তুরস্ক, আর্মেনিয়া, উত্তর-পূর্ব ইরাক ও উত্তর-পশ্চিম ইরানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুর্দি উপজাতি অধ্যুষিত মালভূমি ও পর্বতসঙ্কুল এলাকা কুর্দিস্তান নামে পরিচিত। এর আয়তন ৭৪,০০০ বর্গমাইল। ইরানিদের সাথে আচার-আচরণে কুর্দিদের মিল রয়েছে। কুর্দিরা যাযাবর জাতি, প্রধানত পশুপালন ও কৃষিকাজ করে জীবন-যাপন করে। এদের প্রধান শিল্প কার্পেট তৈরি করা। কুর্দিদের অধিকাংশই নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। এরা যুদ্ধপ্রিয় জাতি, দীর্ঘকাল ধরে কোনো বৈদেশিক শাসনে শান্তভাবে থাকে না। সপ্তম শতকে কুর্দিগণ ইসলাম কবুল করে। একাদশ শতকে সেলজুক তুর্কিদের ও পরে উসমানী সাম্রাজ্যের অধীনে এরা বাস করে। উসমানী সাম্রাজ্য থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য এরা কয়েক শতাব্দী ধরে আন্দোলন চালায়। ১৯৩৯ সালে প্যারিস সম্মেলনে কুর্দি প্রতিনিধিগণ তাদের স্বাধীনতার দাবি পুনঃপেশ করেন। ১৯২১ সালের সেভরা সন্ধিচুক্তি একটি কুর্দি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু পরবর্তীতে ১৯২৩ সালের লোযান সন্ধি দ্বারা তা অবলোহিত হয়। পরে ১৯২৫ ও ১৯৩০ সালে তুরস্কের কুর্দিগণ বিদ্রোহী হলে সরকারি সেনাবাহিনী কর্তৃক দ্রুত বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকদ্বয়ে ইরাক ও ইরানের কুর্দিগণ একটি সংযুক্ত স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান দাবি করে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সফল হয়নি। ক্রুসেডের আমলের মহাবীর যোদ্ধা সুলতান গাজী সালাউদ্দীন সর্বাধিক খ্যাত কুর্দিদের অন্যতম।

♦ ইয়াসির আরাফাত ও পলোনিয়াম বিতর্ক

পলোনিয়াম একটি বিষাক্ত উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় উপাদান। লন্ডনে এক সাবেক কেজিবি গোয়েন্দাকে মারতে ব্যবহৃত হওয়ায় ২০০৬ সালে পলোনিয়াম নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনার ঝড় ওঠে। পরবর্তীতে

পলোনিয়ামের আলোচনা তুঙ্গে ওঠে সম্পতি ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের কাপড়ে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ায়। এরপর আরাফাতের বিধবা স্ত্রী সুহা আরাফাত তার স্বামীর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে তা পরীক্ষার দাবি জানান। কারণ ২০০৪ সালে ১১ নভেম্বর মারা যাওয়ার আগে তিনি যে কাপড় পরেছিলেন, সেই কাপড়ে পাওয়া গেছে পলোনিয়াম ২১০ নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব। সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা আরাফাতের কাপড়ে এ বিষাক্ত পদার্থের খোঁজ পান। ২৭ নভেম্বর ২০১২ রামাল্লার মুকতাতা থেকে ইয়াসির আরাফাতের দেহাবশেষ উত্তোলন করে ৬০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তার মৃত্যু 'পলোনিয়াম-২১০' নামের তেজস্ক্রিয় উপাদানের বিষক্রিয়ায় হয়েছে কি-না, তা এসব নমুনা থেকে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

♦ সার্বভৌম রাষ্ট্র ফিলিস্তিন

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে অটোমান এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনের বিভক্তির মধ্য দিয়ে ইসরাইল নামে যে দানবের সৃষ্টি হয় তা এখন পর্যন্ত এ ভূখণ্ডকে বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক বিস্ফোরণোন্মুখ ইস্যু করে রেখেছে, যা যে কোনো মুহূর্তে ঘটাতে পারে এক প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের সূচনা। এমন অবস্থায় ২৯ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘে অসদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের (Non-member state) মর্যাদা লাভ করে ফিলিস্তিন। জাতিসংঘে মর্যাদা বৃদ্ধির পরপরই ফিলিস্তিনের নাম পরিবর্তন করার কাজ শুরু হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাদের দাপ্তরিক নাম বদলে করেছে 'ফিলিস্তিন'। ৩০ নভেম্বর ২০১২ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ থেকে State of Palestine রাষ্ট্রের নামফলক পায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। ফিলিস্তিন এতদিন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে 'পর্যবেক্ষক ভূখণ্ড' হিসেবে যোগ দিত। এখন তারা সদস্য নয় এমন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পাবে। এটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি পৃথিবীর বৃহত্তম বিশ্ব সংস্থার পরোক্ষ স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে পূর্ণ সদস্য হওয়ার পথে বহুদূর এগিয়ে গেল ফিলিস্তিন। ২০০২ সালে পূর্ণ সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার আগে সুইজারল্যান্ডও সদস্য নয় এমন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘে ছিল। বর্তমানে ফিলিস্তিনের সাথে এমন মর্যাদা ভোগ করছে ভ্যাটিকান সিটি। ফিলিস্তিনের এ নবলব্ধ মর্যাদা অনাগত দেশটিকে নিচের সুবিধাগুলো দেবে—

১. পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা এবং পূর্ব জেরুজালেমকে নিয়ে গঠিত ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের পরোক্ষ স্বীকৃতি।
২. দ্বিরাষ্ট্রীয় সমঝোতা আলোচনায় ইসরাইলের বিপরীতে ফিলিস্তিনের শক্ত অবস্থান।
৩. এখন থেকে ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি জাতিসংঘের অধিবেশন বিতর্কে অংশ নিতে পারবেন।
৪. জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (ICC) যোগ দেয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।
৫. এ স্বীকৃতির কারণে ফিলিস্তিন বেশ কয়েকটি অঙ্গ-সংগঠন যেমন : আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত, সেখানে ফিলিস্তিন-ইসরাইলি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে।

♦ বেলফোর ঘোষণা

ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার বেলফোর ১৯১৭ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নীতি হিসেবে ব্রিটিশ ইহুদি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির নিকট যে পত্র লেখেন, ইতিহাসে তা বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত। উক্ত পত্রে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে এবং এ ঘোষণা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা থেকে অনুমোদিত। প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্রিটেনের পূর্ণ

সমর্থন আছে। তবে এক্ষেত্রে প্যালেস্টাইনে বসবাসরত অইহুদি নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকারকে খর্ব করা যাবে না। এ ঘোষণা ইহুদিদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। এ ঘোষণার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন ইহুদিরা ধীরে ধীরে প্যালেস্টাইনে জড়ো হতে থাকে। এভাবে একত্রিত হয়ে প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা একটি শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করার পর ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ঘোষণা করে, যা বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত। তাই বেলফোর ঘোষণাকেই ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ বলা হয়।

♦ পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি

১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজ ও পিএলওর পররাষ্ট্র বিষয়ক দপ্তরের প্রধান মাহমুদ আব্বাস। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ও পিএলওর চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর, সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও জর্জ বুশ, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিস্টোফার, রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে কজিরেভসহ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী—

১. ইসরাইল অধিকৃত গাজা উপত্যকা এবং জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরকে পাঁচ বছরের জন্য স্বায়ত্তশাসন দেয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।
২. ইসরাইল দুটি ভূখণ্ড থেকে তার সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।
৩. সৈন্য প্রত্যাহার চুক্তি স্বাক্ষর হবার পর চার মাস অর্থাৎ ১৯৯৪ সালের ১৩ এপ্রিলের মধ্যে জেরিকো ও গাজা ভূখণ্ড থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সম্পন্ন করা হবে।
৪. ফিলিস্তিনিরা দশ সদস্যের মধ্যে একটি কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করবে এবং এই কর্তৃপক্ষই স্বায়ত্তশাসিত ভূখণ্ড দুটির প্রশাসন পরিচালনা করবে।
৫. ২০ হাজার ফিলিস্তিনি পুলিশের একটি বাহিনী গাজা ও জেরিকোর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করবে।
৬. ইসরাইলের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের পাঁচটি ক্ষেত্র যথা— শিক্ষা ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, প্রত্যক্ষ কর এবং পর্যটন ফিলিস্তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।
৭. পিএলও-ইসরাইল লিয়াজোঁ কমিটি ও অর্থনৈতিক কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই কমিটি পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গাজা সমুদ্র বন্দরসহ পরিবহন ও যোগাযোগ, বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম সম্পর্ক, প্রশিক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, মিডিয়া, পশ্চিম তীর ও গাজার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং একটি আঞ্চলিক কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।
৮. এই চুক্তি অনুযায়ী ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আলোচনা করার শেষ সময় ১৯৯৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর।
৯. ফিলিস্তিন সংক্রান্ত স্থায়ী সমাধান কার্যকর হবে ১৯৯৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর।

♦ ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি

২৪ অক্টোবর ১৯৯৮ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডের ওয়েইরিভার সম্মেলন কেন্দ্রে একটানা নয় দিনের আলোচনার পর হোয়াইট হাউসে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে নতুন 'অন্তর্বর্তীকালীন সমঝোতা স্মারক' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একে 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি' চুক্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জর্ডানের বাদশাহ হোসেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বর্ধিত ইহুদি জনসংখ্যার আবাসনের নামে জেরুজালেমের ইহুদি ছিটমহল 'হারহোমাতে' আবাসিক প্রকল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। জেরুজালেমকে রাজধানী করার ঘোষণাও তিনি দেন। ফিলিস্তিনি সরকার ও স্বাধীনতাপন্থী ইসলামী গ্রুপগুলো এর বিপক্ষে অবস্থান নিলে ফিলিস্তিনি-ইসরাইল সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইসরাইলের দখলীকৃত ১৩ শতাংশ ভূমি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিতে বললে ইসরাইল তা অস্বীকার করে। ইসরাইল প্রথমে নয় শতাংশের বেশি ভূমি ছাড়তে নারাজ ছিল। ইসরাইলের এ অনমনীয়তার কারণে চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্বিত হয়। অতঃপর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডলিন অলব্রাইট একটি আপোস ফর্মুলা পেশ করেন। এ ফর্মুলায় ১৩ শতাংশের মধ্যে ৩ শতাংশকে প্রাকৃতিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা এবং ইহুদি বসতি স্থাপনাকারীরাও সেখানে বসবাস করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব মানতে রাজি হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরে ইসরাইল রাজি না হলেও ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ঘোষণা দেন তিনি ৪ মে ১৯৯৯ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবেন। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র উভয় কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করে। এ চুক্তিকে ১৯৯৯ সালের ৪ মের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে অনুমান করা হয়। চুক্তির শর্ত ছিল ইসরাইল ১৯৬৭ সালে দখলকৃত পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূ-খণ্ড ফিলিস্তিনিদের হাতে হস্তান্তর করবে। এছাড়া ইসরাইল কারাগারে আটক ৩০০০ ফিলিস্তিনি বন্দিদের মধ্যে ৭৫০ জনকে মুক্তি দেবে এবং পশ্চিম তীর ও গাজার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদের যাতায়াতের জন্য নিরাপদ করিডোর বা সংযোগ পথ স্থাপন করার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে এ চুক্তিতে। অপরদিকে পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরাইলি সেন্য প্রত্যাহার শুরুর দু মাসের মধ্যে পিএলও কেন্দ্রীয় পরিষদ ১৯৬৪ সালের পিএলও সনদে অন্তর্ভুক্ত ইসরাইল রাষ্ট্র উচ্ছেদের ঘোষণা বিলুপ্ত করবে। এ ছাড়া ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ইহুদি বিরোধী সশস্ত্র চরমপন্থী গ্রুপের অবকাঠামো ধ্বংস, চরমপন্থীদের গ্রেপ্তার এবং ইসরাইলবিরোধী হামলার অভিযুক্ত চরমপন্থীদের বিচারসহ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত সন্ত্রাস বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করবে। ইসরাইলের কয়েকজন মন্ত্রীসহ অনেকে এবং ফিলিস্তিনি চরমপন্থী দলগুলো এ চুক্তির বিরোধিতা করে। চমরপন্থী দলগুলোর বিরোধিতার মাঝেও ৩০ অক্টোবর '৯৮ ফিলিস্তিনি মন্ত্রিসভায় চুক্তিটি অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু ৬ নভেম্বর '৯৮ জেরুজালেমের ইহুদা নামক স্থানে চরমপন্থী ফিলিস্তিনিদের বোমা বিস্ফোরণে ২ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হলে ইসরাইল একতরফাভাবে চুক্তিটিকে স্থগিত ঘোষণা করে।

♦ ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা *[৩০তম বিসিএস]*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পবিত্র স্থান ফিলিস্তিন তুরস্কের সুলতানের শাসনাধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন ব্রিটিশদের দখলে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ইহুদিদের পক্ষে ফিলিস্তিন ত্যাগ করলে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদিরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৮ সালে মিশর অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সাথে একজোট হয়ে ইসরাইল আক্রমণ করে

এবং পরাজিত হয়। অতঃপর ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৭৩ সালে আরবদের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকবারই আরবরা পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় স্বদেশভূমি উদ্ধারের জন্য ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (PLO) গড়ে তোলেন। ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য ইয়াসির আরাফাত বিশাল যোদ্ধাবাহিনী গঠন করেন। ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় এবং ইয়াসির আরাফাত প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। জাতিসংঘ পিএলও-কে স্বীকার করে নেয়। ইসরাইল সরকার ফিলিস্তিনি তাদের ভয়ে ভীত হয়ে তাদের অবস্থানের ওপর বারবার আঘাত হানে। স্বাধীনতাকামীদের প্রধান অবস্থান লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বারবার হামলা করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের সহায়তায় বর্তমানে ইসরাইল, আরব দেশসমূহ এবং পিএলওর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পিএলও-ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

♦ হামাস-ফাতাহ ঐতিহাসিক ঐক্যচুক্তি

গাজায় নিয়ন্ত্রণকারী হামাস ও পশ্চিম তীরের ক্ষমতাসীন ফাতাহ আন্দোলনসহ ফিলিস্তিনের ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১৩টি রাজনৈতিক দল ৩ মে ২০১১ এক সমঝোতা চুক্তি করে। হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে চলা ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে হামাস ও ফাতাহ'র বিরোধ মেটানো ছাড়াও আগামী এক বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মিসরের রাজধানী কায়রোতে এ চুক্তি হয়। ৪ মে এক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হয়। আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মার্কিন বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা এবং গোটা আরব বিশ্বে রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝে স্বাক্ষরিত এ সমঝোতা চুক্তিতে ফিলিস্তিন জুড়ে বয়ে যায় হলুদ-সবুজের ঢেউ। চুক্তির খুশিতে হামাসের সবুজ আর ফাতাহর হলুদ পতাকা উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করে ফিলিস্তিনিরা। চুক্তিতে ফাতাহ'র পক্ষে স্বাক্ষর করেন ফিলিস্তিন সুশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ও ফাতাহ নেতা মাহমুদ আব্বাস এবং হামাসের পক্ষে সংগঠনটির নেতা খালেদ মেশাল। উল্লেখ্য, হামাস ২০০৭ সাল থেকে দেশটির একাংশ 'গাজা ভূখণ্ড' নিয়ন্ত্রণ করছে। অপর অংশ 'পশ্চিম তীর' নিয়ন্ত্রণ করছে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ।

চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক ➢ বিবদমান দুটি পক্ষই একটি স্বাধীন সরকার গঠনে রাজি হয়েছে। এক বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টারি নির্বাচন সম্পন্ন করাই হবে এ সরকারের প্রধান কাজ। দুই পক্ষের নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়েই এ সরকার গঠন করা হবে □ প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিরোধ নিরসনে ১২ জন বিচারকের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে।

♦ হামাস

'হামাস' ফিলিস্তিনের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন। 'হামাস' শব্দের অর্থ সজীবতা ও উদ্দীপনা। সংগঠনটির পূর্ণনাম 'হরকাতুল মুকাওয়ামা আল ইসলামিয়া'। ১৯৮৭ সালে ইসরাইলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রথম ইন্তেফাদা বা গণঅভ্যুত্থানের সময় ১৪ ডিসেম্বর শেখ আহমদ ইয়াসিন 'হামাস' প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৬ সালের ২৯ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে প্রকাশ্যে চলে আসে। সংগঠনটির রাজনৈতিক প্রধান সিরিয়ায় নির্বাসিত নেতা খালেদ মেশাল।

♦ ফাতাহ

'ফাতাহ' আরবি শব্দ। এর অর্থ 'বিজয়'। ১৯৫০ সালের দিকে ইসরাইলি নিপীড়নে সর্বহারা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনি যুবক এবং ছাত্রদের নিয়ে ১৯৫৯ সালের ১০ অক্টোবর 'ফাতাহ' সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন ইয়াসির আরাফাত, সালাহ খালাফ এবং খলিল আল ওয়াজির। তখন ফাতাহ একটি সাময়িকী প্রকাশ করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে আরফাত বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য কুয়েত ত্যাগ করে জর্দানে চলে আসেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে 'ফাতাহ' আন্দোলন জোরদার করে তোলেন। সংগঠনটির সদর দপ্তর তখন জর্দানে হওয়ায় সেখানে বিমান হামলা চালায়। 'ফাতাহ'র বর্তমান প্রধান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

♦ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

ক্যাম্প ডেভিড হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে ৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। এ স্থানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য বার্চ লজ ও ডগউড লজ নামে দুটি অবকাশযাপন প্রাসাদ রয়েছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন ও মিশরের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আনোয়ার আল সাদত-এর মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার-এর মধ্যস্থতায় ১৯৭৮ সালে দীর্ঘ ৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর এ স্থানে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ গোপন বৈঠকের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউজ-এ দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর প্রথম চুক্তিটি ছিল সিনাই ও মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার রূপরেখা সম্বলিত এবং দ্বিতীয় চুক্তিটি ছিল মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে পশ্চিম তীর ও গাজার স্বায়ত্তশাসন নিয়ে। চুক্তি দুটি স্বাক্ষরিত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে। কিন্তু ইসরাইল এ চুক্তি মোতাবেক সিনাই ফিরিয়ে দিলেও স্বায়ত্তশাসন দেয়নি। ফলে চুক্তির কার্যকারিতাও ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, ইসরাইলের সাথে মিশরের শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে মিশরকে আরব বিশ্ব বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করে এবং আরবলীগ থেকে মিশরকে বহিষ্কার করা হয়।

♦ ইউক্রেন সংকট

ইউক্রেন সংকটের উৎস ২০০৪ সালে। সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল নিজের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করেন। ২০০৪ সালে নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতায় অরেঞ্জ বিপ্লব (Orange Revolution) সংঘটিত হলে ফলাফল হিসেবে ক্ষমতায় আসেন অরেঞ্জ বিপ্লবের মূল নায়ক ভিক্টর ইয়ুশ্চেনকো। ২০০৭ সালে 'অরেঞ্জ বিপ্লবে'র সাথী ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো হন প্রধানমন্ত্রী। এরপর পশ্চিমের দ্বার অবারিত হয়ে যায়। ব্যাপক দুর্নীতিতে পতিত সরকার পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মস্কোর সাথে অযাচিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ক্ষমতা হারান ভিক্টর ইয়ুশ্চেনকো। ২০১০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হন রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ। তিনি বিজয়ী হয়ে ২৭ এপ্রিল ২০১০ সেভাস্তোপোলে রুশ নৌঘাঁটির ইজারার মেয়াদ ২০৪২ সাল পর্যন্ত বাড়ালে মস্কো-কিয়েভ সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উপনীত হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়ার কাছ থেকে দেড় হাজার কোটি ডলার ঋণ নেয়া চুক্তিতে উপনীত হয় ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ।

প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের এ সিদ্ধান্ত ইউক্রেনের পাশ্চাত্যপন্থীরা মেনে নিতে পারেনি। তখন থেকেই তারা রাশিয়ার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে চুক্তি

পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ রাজধানী কিয়েভ ছেড়ে যান। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইউক্রেনের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ওলেক্সান্দর তুর্কিনোভ।

ইউক্রেনের রুশপন্থী প্রেসিডেন্টের দেশত্যাগ এবং পশ্চিমাপন্থীদের ক্ষমতা গ্রহণের কারণে ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ক্রিমিয়ায় সেনা মোতায়েন করে রাশিয়া। তারপর ১৬ মার্চ ২০১৪ ক্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত এক গণভোটে ক্রিমিয়ার জনগণ রাশিয়ার সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেন। ১৭ মার্চ ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং রুশ ফেডারেশনের যোগ দেয়ার আনুষ্ঠানিক আবেদন জানায়। সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২১ মার্চ ২০১৪ ইতিহাসের সবচেয়ে স্বল্পায়ু রাষ্ট্র ক্রিমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রিমিয়ার রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ইউক্রেন সংকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ক্রিমিয়া রাশিয়ার সাথে একীভূত হওয়ার পরপর-ই ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি রুশজাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা নিজেদেরকে স্বাধীন 'সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করলে ইউক্রেন সংকটে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ক্রিমিয়াতে ইউক্রেন সেনাবাহিনী প্রেরণ না করলেও দোনেস্ক অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। ফলশ্রুতিতে সেখানকার রুশপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের সরকারি হিসাব অনুযায়ী সেখানে ৫৩০০ লোক নিহত এবং ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনের সাহায্যে এগিয়ে আসলে শুরু হয় রাশিয়ার সাথে পশ্চিমাদের দ্বন্দ্ব। অভিযোগ রয়েছে রাশিয়াই ইউক্রেনের রুশপন্থিদের বিভিন্নভাবে মদদ যোগাচ্ছে। যার ফলে ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার উপর কয়েক দফা অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। কয়েকবার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা শোনা গেলেও প্রকৃত অর্থে সেখানে যুদ্ধ থেমে নেই। কাজেই অচিরেই যে ইউক্রেন সংকট দূর হচ্ছেনা তা সহজেই বলা যায়।

♦ ইয়াজিদি সম্প্রদায়

প্রাচীন এক ধর্মবিশ্বাসীদের নাম ইয়াজিদি সম্প্রদায়। পারস্যের জরাথ্রুস্ত্রের অগ্নি উপাসনার ধারণা থেকে একাদশ শতকে উন্মায়েদ শেখ এ ধর্মবিশ্বাসের গোড়াপত্তন করেন। জরাথ্রুস্ত্র, খ্রিস্টান ও ইসলাম— এ তিন ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণে ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাদান সমৃদ্ধ হয়েছে। সব মিলিয়ে পৃথিবীতে এটি অ-আব্রাহামিক ধর্ম বলে পরিচিত। পৃথিবীতে ইয়াজিদি ধর্মবিশ্বাসের প্রায় সাত লাখ মানুষ রয়েছে। তবে এদের সিংহভাগের বসবাস উত্তর ইরাকের নিনেভাহ প্রদেশে।

ইরাকে সুন্নীপন্থী বিদ্রোহী সংগঠন ইসলামিক স্টেট-এর অন্যতম আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো ইয়াজিদি সম্প্রদায়। আর এর কারণ হলো ইয়াজিদিদের ধর্ম বিশ্বাস। আইএসের ধারণা, ইয়াজিদিরা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার (৬৪৭-৬৮৩) বংশধর। ইয়াজিদ উমাইয়াদের কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি। এছাড়া ইয়াজিদিরা দৈনিক পাঁচবার যে মালেক তাউসের প্রার্থনা করে সেই মালেক তাউসের অন্য নাম শয়তান। আরবিতে যার অর্থ 'অশুভ আত্মা'। তাই আইএসের ধারণা, ইয়াজিদিরা শয়তানের আনুগত্য করে। তবে আধুনিক গবেষকরা বলছেন, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে ইয়াজিদিদের সম্পর্ক নেই। এ শব্দটি এসেছে ফারসি শব্দ ইজিদিস থেকে। যার অর্থ 'ঈশ্বরের পূজারি'। ইরাক ছাড়াও ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের লোকরা সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় বসবাস করে।

♦ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণগত উত্তেজনা

বর্ণবাদের আগুনে পুড়ছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক মোড়ল ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের তিন শহরের তিনটি ঘটনায় দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বর্ণগত উত্তেজনা। ঘটনা তিনটি হলো–

১. ৯ আগস্ট ২০১৪ যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের ফার্গুসন শহরে ১৮ বছর বয়সী নিরস্ত্র এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর মাইকেল ব্রাউনকে গুলি করে হত্যা করে ডারেন উইলসন নামের এ পুলিশ অফিসার। হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গ পুলিশকে ২৪ নভেম্বর ২০১৪ মার্কিন গ্রান্ড জুরি দায়মুক্তি দিলে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের বর্ণবাদী দাঙ্গায় বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, লুটপাট, হাঙ্গামায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ফার্গুসন।

২. মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ মাইকেল ব্রাউনকে নিয়ে প্রতিবাদের রেশ কাটতে না কাটতেই নিউইয়র্কে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে এরিক গার্নার নামের ৪৩ বছর বয়সী আরেক কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। ১৭ জুলাই ২০১৪ নিউইয়র্কের স্টেট অ্যান্ড আইল্যান্ডের রাস্তায় অবৈধভাবে সিগারেট বিক্রির অভিযোগে আটক করার সময় 'চোকহোল্ড' প্রক্রিয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান গার্নার। তবে ঘটনা তদন্তে গঠিত গ্র্যান্ড জুরি অভিযুক্ত শ্বেতাঙ্গ পুলিশ প্যান্টালিওকে ৩ ডিসেম্বর ২০১৪ অভিযুক্ত না করার সিদ্ধান্ত দেন। ঐ সিদ্ধান্তের পর পরই দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়।

৩. ওহিও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে টামির রাইস নামের ১২ বছরের এক কৃষ্ণাঙ্গ শিশুকে নভেম্বরে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। পুলিশ যখন টামিরকে গুলি করে তখন তার হাতে ছিল খেলনা বন্দুক।



অধ্যায় ০৬

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি
Politics in South Asia

Syllabus | *Politics in South Asia : India-Pakistan relations, Bangladesh-India relations, regional integration, water dispute, border problems and terrorism.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]*

০২. *কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। [১৩তম বিসিএস]*

০৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উপর একটি রচনা লিখুন। [৩০তম বিসিএস]*

০৪. *বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার উপর আলোচনা করুন। পানি বণ্টন ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে আপনার মতামত উল্লেখ করুন। [৩৩তম বিসিএস]*

০৫. *বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে? উভয় দেশের পানি বণ্টন সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হতে পারে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]*

০৬. *বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণজনিত সমস্যা ও এর সমাধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করুন। [৩১তম বিসিএস]*

০৭. *মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন পর্যালোচনা করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য করণীয় আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]*

০৮. *দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট রয়েছে। এ সঙ্কট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো ভূমিকা আছে কি? আলোচনা করুন। [৩১তম বিসিএস]*

০৯. *দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক ব্যবসা ও তার নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]*

১০. *২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর শেষে ঘোষিত যৌথ ইশতেহার-এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এরপর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? [৩১তম বিসিএস]*

অথবা, ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ও ভারতের অর্থমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে দু দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১১. *'ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি' দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক প্রতিযোগিতাকে কোন দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?*

১২. পাকিস্তান ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এবং বাংলাদেশের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১৩. ক. ট্রানজিট বলতে কি বোঝায়?

খ. ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের কি কি লাভ হতে পারে এবং কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে?

গ. ভারত এই ট্রানজিটের ব্যাপারে এত আগ্রহ প্রকাশ করছে কেন?

১৪. বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিন এবং এ মামলার রায় বিশ্লেষণ করুন।

১৫. দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান ও আল-কায়েদার উত্থানকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের নিরাপত্তার বিষয়টা আলোচনা করুন।

১৬. পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরুন।

১৭. ক. আঞ্চলিকতাবাদ কি?

খ. এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতার সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. 'লাইন অব কন্ট্রোল' কি?

০২. সেভেন সিস্টার্স (Seven Sisters) কি?

০৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?

০৪. র‍্যাডক্লিফ লাইন কি?

০৫. পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত কতবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?

০৬. 'পঞ্চশীল' বলতে কি বোঝায়?

০৭. ২৪তম অক্ষরেখা কি?

০৮. টিপাইমুখ বাঁধ এবং বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

০৯. গোল্ডেন ওয়েজ, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলতে কি বোঝায়?

টীকা

- ভারত-চীন যুদ্ধ
- জাফনা দ্বীপ
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্পর্ক
- বন্দি প্রত্যর্পণ ও ভিসা সহজীকরণ চুক্তি
- অপারেশন পুশ ব্যাক
- কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা
- ফারাক্কা বাধ
- পাক-ভারত যুদ্ধ
- বাংলাদেশ-ভারত নদী সম্পর্ক
- এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক
- ট্রানজিট, করিডোর, ছিটমহল
- জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট
- সিমলা চুক্তি

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০৭। ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]

উত্তর : পাক-ভারত বিরোধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন কোনো বিষয় নয়। ১৯৪৭ সালে এ দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত বিরোধের সূত্রপাত, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের ২৭ অক্টোবর রাষ্ট্র দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটে। কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ নতুন কোনো ঘটনা নয়। ১৯৪৭ সালের

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে কাশ্মীরকে ভারত বা পাকিস্তান যে কোনো একটিতে যুক্ত হবার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং হঠাৎ করেই সেনা সাহায্য ও গণভোটের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভারত সরকারের হাতে কাশ্মীরের কর্তৃত্ব তুলে দেন। এই সিদ্ধান্তের পরই ১৯৪৭-৪৮ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান মনে করে এই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ হতে পারতো। এরপর কাশ্মীর নিয়ে দ্বিতীয়বার ১৯৬৫ সালে যুদ্ধে লিপ্ত হয় রাষ্ট্র দুটি। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘটে। ১৯৭১ সালে পুনরায় পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৯৯৯ সালে কাশ্মীর নিয়ে চতুর্থ বারের মতো যুদ্ধে জড়ায় পাক-ভারত। এভাবেই চলছে প্রতিবেশী এ দুটি রাষ্ট্রের বৈরী সম্পর্ক। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের অবনতি, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সীমান্ত সন্ত্রাস প্রভৃতি কারণে পাক-ভারত সম্পর্ক কখনোই স্থিতিশীল হয়নি। উপমহাদেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় এ দুটি রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উভয় দেশের সরকারপ্রধানগণ একাধিকবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও আন্তরিকতার অভাবে সফলতা আসেনি এখনো। একথা প্রমাণিত যে, উভয় রাষ্ট্রের এই তিক্ত সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু কাশ্মীর, যে কারণে সমঝোতার ভিত্তিতেই কাশ্মীরের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে ভারত ও পাকিস্তানকে। তবেই ফিরে আসবে এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা।

পাক-ভারত সম্পর্ক কোন পথে যাচ্ছে : ১৩ ডিসেম্বর ২০০১ ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবনে আত্মঘাতী হামলার পর পাক-ভারত সম্পর্ক সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। হামলায় ৫ জন হামলাকারীসহ ১৩ জন নিহত হয়। ভারত ঐ হামলার জন্য কাশ্মিরী জঙ্গি গ্রুপ 'লস্কর-ই-তৈয়বা' ও 'জয়স-ই-মোহাম্মদ' কে দায়ী করে ঐ দুটি গ্রুপকে মদদদানের জন্য পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেছে। ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবনে হামলার পর ভারত ইসলামাবাদ থেকে তার হাইকমিশনারকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং পাকিস্তানের সাথে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। ঐ হামলার পর দু'দেশের সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং উভয় দেশই সীমান্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।

কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়কে গুরুত্ব দিতে চায় না। সেটা পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের কথায় প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন 'কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সাথে বৈঠক করার চেয়ে বরং ছোটবেলার বাড়িটি কিনে দিল্লীতে থেকে যাওয়াই ভালো।' উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে জেনারেল মোশাররফের পরিবার দিল্লীতে বসবাস করতো।

২০০১ সালে বাজপেয়ি-মোশাররফ শীর্ষ বৈঠকে তিনি মন্তব্য করেন, কাশ্মীর প্রশ্নে কোনো সমঝোতা ছাড়া তিনি ইসলামাবাদে ফিরে যেতে চান না। তখন প্রতীয়মান হয় যে, জেনারেল মোশাররফ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন আর বিষয়টি ছিল কাশ্মীর।

শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ থেকে গেল আর বিরোধ থেকে যাওয়ায় কোনো যৌথ ঘোষণাও প্রকাশিত হয়নি। যদিও কাশ্মীর ব্যতীত বাণিজ্য বিষয়ক আরও কিছু বিষয় নিয়ে বাজপেয়ি-মোশাররফ আলাপ করেছেন। বাণিজ্যের প্রশ্নে দুটি দেশই পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। ভিসা প্রদানের ব্যাপারে শিথিলতা বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, কাশ্মীর প্রশ্নে বিরোধ থেকে যায়।

১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি তার Bus diplomacy নিয়ে লাহোর গিয়েছিলেন, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নওয়াজ শরীফ। Bus-diplomacy বা বাস

কূটনীতির উদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু সফরের কয়েক মাসের মধ্যেই পাক-ভারত কারগিল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আর কারগিল যুদ্ধের কারণেই নওয়াজ শরীফ ক্ষমতাচ্যুত হন। ক্ষমতায় আসেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ, যিনি ছিলেন কারগিল যুদ্ধের প্রণেতা। কারগিল যুদ্ধ এবং পাকিস্তানে পুনরায় সেনাশাসন পরিস্থিতি বদলে দেয়। সৃষ্টি হয় উত্তেজনার। ভারত তখন অস্বীকৃতি জানায় মোশাররফের নেতৃত্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দানে। ফলে ২৮ ও ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯ কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পিছিয়ে যায়। ২০০২ সালের জানুয়ারিতে উক্ত শীর্ষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

এটা মানতেই হবে যে, কাশ্মীর প্রশ্নটি আজ শুধু জেনারেল মোশাররফের জন্যই একটি সমস্যা নয় বরং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের জন্যও একটা সমস্যা। পাকিস্তানে কাশ্মীর প্রশ্নটি একটি রাজনৈতিক ইস্যু। কাশ্মীর প্রশ্নে যে কোনো ছাড় জেনারেল মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে; একই কথা ভারতের নেতৃত্বের বেলায়ও প্রযোজ্য।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে উভয় দেশই ব্যাপক সামরিক শক্তি অর্জনে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে উভয় দেশই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশ দুটিতে জনগণের মৌলিক চাহিদা যেখানে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না সেখানে পাক-ভারত উভয় দেশই তাদের জাতীয় বাজেটের সর্বোচ্চ ব্যয় করে প্রতিরক্ষা খাতে। এটা এখন স্পষ্ট, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ছাড়া পাক-ভারত সম্পর্ক উন্নয়ন অসম্ভব। অতীতে কাশ্মীর নিয়ে তিনটি যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। কাশ্মীর কার্যত ভাগ হয়ে আছে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পাক-ভারত শীর্ষ পর্যায়ে যেসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল যুদ্ধের পর বিরোধ মিটিয়ে ফেলা, বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানো, কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ইত্যাদি বিষয়। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সিমলায় ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলী ভুট্টো শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন এবং সিমলা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। উল্লেখ্য, তাসখন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং আইয়ুব খান। সিমলা চুক্তিতে কাশ্মীর প্রসঙ্গে স্থিতাবস্থা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়গুলো মীমাংসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল। এরপর ১৯৯৯ সালে দেশ দুটি লাহোর চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এতে দু'পক্ষের নেতৃত্ব দেন নওয়াজ শরীফ ও বাজপেয়ি। লাহোর ঘোষণায় বলা হয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীরসহ সকল ইস্যু সমাধানে উভয় পক্ষ তাদের চেষ্টা আরও জোরদার করবে। এই ধারাবাহিকতায় আগ্রা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও কোনো যৌথ ঘোষণা আসেনি।

আগ্রা বৈঠকে যেখানে কোনো সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে ভবিষ্যতে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে সেই সাথে এটাও সত্যি যে, আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। আলোচনায় এখনো কোনো ফল পাওয়া যায়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে যে ফল পাওয়া যাবে না এর নিশ্চয়তা নেই। ভারতে যেমন কট্টরপন্থী রয়েছে ঠিক তেমনি পাকিস্তানেও রয়েছে কট্টরপন্থী যারা কখনোই চায় না দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হোক।

এ সময় রাজনৈতিক কারণকে কেন্দ্র করে ভারত তার ক্রিকেট দলকে পাকিস্তান সফরের অনুমতি দেয়নি, যে কারণে পরিস্থিতি আরো প্রকট আকার ধারণ করে। অবশেষে ২০০৪ সালের প্রথম দিকে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির হস্তক্ষেপে এবং পাক রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশাররফের নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তান সফর করে, যা ক্রিকেট কূটনীতি (Cricket diplomacy) হিসেবে খ্যাতি লাভ করে এবং এই সফরের মধ্য দিয়েই পাক-ভারত স্থিতিশীল সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম হয়।

২০০৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনে বিজয় লাভের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস (আই), যারা বিগত কট্টরপন্থী বিজেপি সরকারের তুলনায় অনেক সংস্কারপন্থী। প্রথা অনুযায়ী কংগ্রেস (আই) সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়েও তা থেকে বিরত থাকেন। তিনি ড. মনমোহন সিংকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ড. মনমোহন ও জেনারেল মোশারফের মধ্যে আলোচনা, দু'দেশের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক এবং সর্বোপরি উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদের আলোচনা পাক-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে আসবে বলে প্রতীয়মান হয়।

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর রাতে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ে তাঁজ হোটেলসহ ১১টি স্থানে সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র তাণ্ডবে ৩০০ জনের বেশি নিহত হয়। পাকিস্তানের সাথে ক্রমবর্ধমান সুসম্পর্কে এতে ফাটল ধরে। ভারত এর জন্য পাকিস্তানকে দোষারোপ করলে আবার শীতল সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে।

উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় পাক-ভারতের ভূমিকা : চলমান বিবাদ নিরসনে উভয় রাষ্ট্রের সরকারপ্রধানদের আন্তরিকতা প্রধান শর্ত। খোলামেলা আলোচনা, সহযোগিতার মানসিকতার মাধ্যমেই স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উভয় রাষ্ট্রের করণীয় কিছু প্রস্তাব নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. **যুদ্ধবিরতি ঘোষণা :** উভয় রাষ্ট্রের মাঝে বিরোধ নিরসন এবং উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় উভয় রাষ্ট্রেরই উচিত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা। মূলত যুদ্ধবিরতি বলতে কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতিকে বুঝানো হয়েছে। আগ্রা বৈঠকের প্রাক্কালে যুদ্ধবিরতি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল, যে কারণে মোশাররফের দিল্লি উপস্থিতির সময়েও কাশ্মীরে সহিংস ঘটনা ঘটেছিল যা এখনো চলছে, ফলে হতাহত হচ্ছে অনেক মানুষ। এই সহিংসতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর এ কারণেই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা জরুরি।

২. **অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর :** পাক-ভারতের অস্ত্র প্রতিযোগিতা উপমহাদেশের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। পাক-ভারত আলোচনায় অস্ত্র সীমিতকরণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনা উচিত। উভয় দেশই NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty) ও CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)-তে স্বাক্ষর না করায় ও ১৯৯৮ সালে দুটো দেশই একাধিক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উপমহাদেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। এই ধরনের প্রতিযোগিতা শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বড় ধরনের অন্তরায়।

৩. **অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর :** উপমহাদেশের অস্থিতিশীলতার জন্য পাক-ভারতের ভূমিকাই প্রধান। উত্তেজনা প্রশমনে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করা প্রয়োজন। ১৯৯৯ সালের লাহোর ঘোষণায় বলা হয়েছিল উভয় দেশ ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পূর্বে পরস্পরকে অবহিত করবে এবং এ সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে কিন্তু সেই চুক্তি আজও স্বাক্ষরিত হয়নি।

৪. **কূটনৈতিক প্রচেষ্টা :** আলোচনার মাধ্যমে এ দুটি দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেই উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে পারে। কেননা সমঝোতা একমাত্র সম্ভব কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই। অতীতে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সুফল বয়ে আনতে না পারলেও ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া সফল হতেও পারে।

৫. **সরকারপ্রধানদের আন্তরিকতা :** পাক-ভারত বিরোধ প্রশমন এবং উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে উভয় দেশের সরকারপ্রধানের আগ্রহই প্রধান শর্ত। কেননা তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশ দুটির মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান সম্ভব।

পাক-ভারত বিরোধের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো কাশ্মীর, যা উভয় রাষ্ট্র তো বটেই সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া তথা উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। যে কোনো উপায়েই কাশ্মীর প্রশ্নে একটা সমাধান হোক এটা সবাই চায়। এ সমস্যায় তিনটি পক্ষ রয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীরা। তাই এমন একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যাতে তিন পক্ষই সন্তুষ্ট থাকে। তবে সেটি খুব দুষ্কর। উভয় দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কট্টরপন্থীদের সংশ্লিষ্টতা, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, অস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতা উপমহাদেশের পরিস্থিতিকে ক্রমশ অস্থিতিশীল করে তুলছে। জটিল হচ্ছে রাজনৈতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য, যার প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতেও। যা হোক আলোচনার মধ্য দিয়েই একটা সমাধানে পৌঁছতে হবে। উভয় রাষ্ট্রকেই স্মরণ রাখতে হবে যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়। অতীতে যুদ্ধ হয়েছে, ভবিষ্যতেও যুদ্ধ হতে পারে কিন্তু কোনো সমাধান আসবে না। কাজেই উভয় রাষ্ট্রের আগ্রহের ভিত্তিতেই আন্তরিক আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব সমাধান, যা উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

০২ ▌ কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : কাশ্মীর মূলত একটি রাজনৈতিক সমস্যা। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভারত আর পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। অথচ মুসলিমপ্রধান কাশ্মীর ভারতের দখলে চলে যায়। কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তি দুটি দেশের জন্যই দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। স্বাধীনতার জন্মলগ্নেই ভারত আর পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। সে যুদ্ধে পাকিস্তান কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ এবং ভারত অবশিষ্টাংশ লাভ করে। এরপর ১৯৬৫ সালে আবার কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে লড়াই হয়। এ যুদ্ধও জয়-পরাজয় ছাড়া অমীমাংসিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় শেষ হয়। এরপরও অব্যাহতভাবে দেশ দুটির সাথে কাশ্মীর দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে যখন কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী জনগণ পাকিস্তানের ক্ষমতার ওপর আস্থা হারিয়ে স্বাধীনতার জন্য নিজেরাই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে, তখন পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকে। পাকিস্তান গেরিলাদের অর্থ, অস্ত্র আর আশ্রয় দিতে থাকে। গৃহযুদ্ধ মোকাবিলার জন্য ভারত কাশ্মীরে লক্ষাধিক সৈন্য ও আধা-সামরিক বাহিনী পাঠায়। এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কাশ্মীরের সাধারণ জনগণ অসহায়ভাবে প্রতিদিনই তাদের স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে। কাশ্মীর সমস্যা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে ঘৃণার বীজ বপন করে, তার অর্থনৈতিক মূল্য দুটি দেশের কোটি কোটি মানুষকে অশিক্ষা আর অনাহারের অভিশাপের মধ্যে রেখেছে। একই সমস্যা পরোক্ষভাবে উপমহাদেশের তৃতীয় দেশ বাংলাদেশের ওপরও বিরূপ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে চলেছে।

কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে ভারত আর পাকিস্তানের হঠকারী শাসকগোষ্ঠীর এক পক্ষ কাশ্মীরকে নিজের দখলে রাখার জন্য এবং অন্য পক্ষ তা দখল করার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে গত পাঁচ দশক ধরে। শীতল যুদ্ধের অবসানের পর দুনিয়ার তাবৎ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় নিম্নমুখী হলেও উপমহাদেশের দেশগুলো অব্যাহতভাবে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েই চলছে। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এতই প্রবল যে, এরা পরস্পরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য শ'খানেক পারমাণবিক বোমা তৈরি করে রেখেছে। এক-একটি বোমা তৈরি আর সংরক্ষণের যে খরচ তা দিয়ে দেশ দুটি তাদের অসংখ্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচাতে পারতো। বর্তমান বিশ্বে ফিলিস্তিন আর ইসরাইল ছাড়া আর কোনো দেশ পাওয়া যাবে না, যারা ভারত আর পাকিস্তানের

মতো পরস্পরকে এত ঘৃণা করে। অথচ কাশ্মীর সমস্যা যদি না থাকত তবে এ দুটি দেশ হতো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বন্ধুভাবাপন্ন। বিপদে-আপদে এরা পরস্পরকে সাহায্যে করতো। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য যৌথভাবে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। ট্যাংক, বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন আর পারমাণবিক বোমার জন্য যে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হচ্ছে তা দিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদি দূর করতে পারতো। কাজেই কাশ্মীর সমস্যাই যে উপমহাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার সবচেয়ে বড় কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হলো এ জটিল সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে? এ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করতে গিয়ে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক।

ব্রিটিশ-ভারতে অনেক স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র ছিল, যেগুলোকে তাদের নিজস্ব রাজা বা রানী ব্রিটিশ সরকারকে কর দেয়ার বিনিময়ে শাসন করতো। এই রাজ্যগুলোকে বলা হতো Princely State। ব্রিটিশ সরকার নিয়ম করে যে, Princely Stateগুলো তাদের ইচ্ছামতো ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে। কাশ্মীর মুসলিমপ্রধান রাজ্য ছিল। সঙ্গত কারণেই তার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। কিন্তু কাশ্মীরের শাসক ছিলেন এক হিন্দু রাজা এবং এর জনগণের নেতৃস্থানীয় অংশ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান। এ হিন্দু রাজার আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মৌন সম্মতি কাশ্মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে এবং এ প্রেক্ষাপটে ভারত আর পাকিস্তান যুদ্ধ করে কাশ্মীরকে ভাগাভাগি করে নেয়। ঐ যুদ্ধ শেষ হয় জাতিসংঘের মধ্যস্থতায়। কথা ছিল ভারত একটি গণভোটের আয়োজন করবে, যাতে কাশ্মীরের জনগণ ঠিক করবে তারা স্বাধীন হবে নাকি ভারত বা পাকিস্তানের অংশ হবে। কিন্তু ভারত তার এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে গড়িমসি শুরু করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি গেরিলা আর ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় বসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সিমলা চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বিবদমান সমস্যাগুলো তারা দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করবে। সিমলা চুক্তির এ ধারাটি পরবর্তীতে কাশ্মীর প্রশ্নে কোনো আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা বা গণভোটের আয়োজনের দায়িত্ব থেকে ভারতকে অব্যাহতি দিয়েছে বলে ভারত ক্রমাগত দাবি করে আসছে। দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যে কিছুতেই সম্ভব নয়, গত পাঁচ দশকের ঘটনাপ্রবাহ তার প্রমাণ। এর পরে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বছর কয়েক পূর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় পাকিস্তানের লাহোরে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দিল্লী থেকে লাহোরগামী একটি বাসে চড়ে লাহোর যান। সেখানে তিনি তাঁর পাকিস্তানি প্রতিপক্ষ প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে উষ্ণ আলিঙ্গন করেন এবং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রণীত কিছু শ্রুতিমধুর কথা সম্বলিত একটি কাগজে দুই নেতা স্বাক্ষর করেন। তখন এ নিয়ে সারা বিশ্বে বেশ আশাবাদ দেখা দেয় যে, এবার বুঝি বরফ গলতে শুরু করেছে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই '৯৮-এর শীতে পাকিস্তানের কিছু সৈনিক কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের ছদ্মবেশে ভারতীয় কাশ্মীরের কারগিলের বরফচূড়ায় ভারতীয় সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে দেয়। লাহোরে স্বাক্ষর করা কাগজটির মূল্য সেখানেই শেষ। অতঃপর ভারত-পাকিস্তানের বিদ্যমান ঘৃণা-বিদ্বেষ আরো তীব্র হতে থাকে। এভাবে এ যাবৎ গৃহীত কাশ্মীরবিষয়ক জটিলতা অবসানের সকল ব্যবস্থা, দলিলপত্র, প্রতিশ্রুতি, উদ্যোগ ভেস্তে গেছে।

বর্তমান পাকিস্তান ও ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের বিভাজন রেখাকে (Line of Control) আন্তর্জাতিক সীমারেখা বলে মেনে নিতে ভারত রাজি। কিন্তু কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী জনগণ আর পাকিস্তান এতে রাজি নয়। পাকিস্তান এতে রাজি না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয় কাশ্মীরের গৃহযুদ্ধ ভারত কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। ভারতীয় কাশ্মীরের জনগণকে ভারতীয় সরকার যদি খুশি করতে পারতো এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারতো তবে পাকিস্তানের ইচ্ছা থাক বা না থাক কাশ্মীর সমস্যার এক রকম সমাধান হয়ে যেত। কাশ্মীরকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের অবসান সম্ভব। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী তাদের দেশের নানা অভ্যন্তরীণ জটিলতার কারণে এবং নিজেদের উদারতার অভাবে তা করতে অক্ষম। তবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের যতগুলো পথ আছে তার মধ্যে পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনই ভারতীয় শাসকদের জন্য সবচেয়ে সহনীয়।

ভারতীয় কাশ্মীর তিনটি অংশে বিভক্ত : জম্মু, কাশ্মীর আর লাদাখ। জম্মু হিন্দুপ্রধান, লাদাখ বৌদ্ধপ্রধান আর কাশ্মীর মুসলিমপ্রধান অঞ্চল। জম্মু আর লাদাখের স্থানীয় জনগণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকার পক্ষপাতী। কাশ্মীরের মুসলিম জনতার একপক্ষ চায় স্বাধীনতা, অন্যপক্ষ চায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি। বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলারা নানা উপদলে বিভক্ত। এক ডজনের বেশি দল নিয়ে তারা গঠন করেছে হুরিয়াত কনফারেন্স। ভারত সরকার যদি মুসলিমপ্রধান অঞ্চল কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তান সরকার এবং হুরিয়াতের সাথে সমঝোতায় আসতে পারে তবে সেক্ষেত্রে ছয় দশকের এ আন্তর্জাতিক সমস্যাটির দারুণ মীমাংসা হয়। এক্ষেত্রে পথ হলো বেশ কিছু জায়গা পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়া।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান অন্যভাবেও সম্ভব। ভারত ও পাকিস্তানের দখলিকৃত অংশ সংযুক্ত করে যদি স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় তবে তা হবে কাশ্মীরের জনগণের সবচেয়ে বেশি মনঃপূত। আন্তর্জাতিক শ্রেণীও বোধহয় এ ধরনের একটা মীমাংসা দেখতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র স্বাধীন কাশ্মীর দু বৃহৎ শক্তি ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে বাফার (Buffer State) হিসেবে কাজ করতে পারবে।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব তা নয়। দোষ হলো দেশ দুটির রাজনীতির অপরিপক্বতা। যদিও ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়, কিন্তু এ গণতন্ত্রও কেবল নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশটির গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। কাশ্মীর ছাড়াও নানা বিচ্ছিন্নতাবাদ সমস্যায় আক্রান্ত ভারতের পক্ষে তাই কাশ্মীরের ওপর বড় রকম ছাড় দেয়া খুব কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে পুরো দেশটি বিশ-পঁচিশ টুকরো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই বিশ্ববাসীকে করে দিতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব-ইসরাইল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তার মনোযোগ কাশ্মীরের ওপর আরো বাড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা অমীমাংসিত কাশ্মীর মানেই শ'খানেক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ভীতিকর সম্ভাবনা।

০৩ ▌ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উপর একটি রচনা লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সহজ ছিল না। স্বাধীনতার সময় ভারত বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়ার জন্য অসংখ্য বাঙালি যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এমনকি আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তার ঐ সফর বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। তাছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর

সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এর ফলে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের বিজয় সূচিত হওয়ার আগেই অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ভারতের দিল্লিতে কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠা করে। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই অত্যন্ত দ্রততম সময়ে ভারত তাদের সেনাবাহিনী নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়, যা ইতিহাসে বিরল।

বিভিন্ন শাসনামল ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক (১৯৭১-২০১২) : নিকট প্রতিবেশী হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ পরস্পর সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম চুক্তি, প্রটোকল, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নিচে বিভিন্ন শাসনামলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো :

১. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-১৯৭৫)-এর শাসনামল :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। এ সময়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বেশ কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের সাথে বাংলাদেশের প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯ মার্চ ১৯৭২, যা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং শান্তি বিষয়ক চুক্তি নামে পরিচিত। এর মেয়াদ ছিল ২৫ বছর। মেয়াদ শেষে এ চুক্তি আর নবায়ন করা হয়নি। দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৭২। এ চুক্তিটি ছিল বাণিজ্য সংক্রান্ত। এরপর অভ্যন্তরীণ নৌপথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি, ছিটমহল সমস্যা সমাধানকল্পে শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ১৯৭৪ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা মূলত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তিটিতে বলা হয়, বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো অতি সত্বর বিনিময় করতে হবে। চুক্তিতে আরো বলা হয়, ভারত দক্ষিণ বেরুবাড়ি (ইউনিয়ন নং ১২)-এর দক্ষিণ দিকের অর্ধাংশ ও পার্শ্ববর্তী ছিটমহলগুলোর অধিকারী হবে, যে এলাকার পরিমাণ ২৬৪ বর্গমাইল। বিনিময়ে বাংলাদেশ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহলের অধিকারী হবে। বাংলাদেশের পানাবাড়ি মৌজার সঙ্গে দহগ্রামকে সংযুক্ত করার জন্য ভারত বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডোর এলাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেবে। এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ বেরুবাড়ি দিয়ে দিলেও ভারত আজও চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী কথা রাখেনি।

২. **জিয়াউর রহমান (১৯৭৮-১৯৮০)-এর শাসনামল :** জিয়াউর রহমান ক্ষমতা লাভের পর পরই পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশ নতুন রাষ্ট্র হিসেবে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের আশেপাশে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিশেষ করে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি গভীরভাবে অনুভব করেন। যেহেতু ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের তিন দিক ঘিরেই। অথচ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক নেই। অনুন্নত দরিদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ কাছাকাছি অবস্থিত সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। এ বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমান জোট-নিরপেক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অনুভব করেন বাংলাদেশের জোট নিরপেক্ষ অবস্থা অনেক সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানের পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্কে ফাটল ধরে। সুতরাং ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করাই ছিল জিয়াউর রহমানের প্রধান দায়িত্ব। যদিও তিনি ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যর্থ হন। ফলে জিয়াউর রহমান মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ঝুঁকে পরেন এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

৩. **হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-৯০)-এর শাসনামল :** জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদ জিয়াউর রহমানের নীতি অনুসরণ করলেও গঙ্গার পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হন। সংক্ষিপ্ত সময়ে এ চুক্তি স্বাক্ষর এরশাদ শাসনামলের একটি বড় সাফল্য। এ পদক্ষেপকে ভিত্তি করে এরশাদ সরকারের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। যদিও কূটনৈতিক ও কৌশলগত এ সম্ভাবনাকে এরশাদ তার সামরিক শাসনামলে ব্যবহার করতে পারেনি। ভারতের সাথে ১৯৭৫ পরবর্তী ১৯৯৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের সম্পর্কের তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি । ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পূর্ব পর্যন্ত কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার ক্ষমতার ৮ বছরেরও অধিক সময় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যর্থ হন।

৪. **বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-৯৬, ২০০১-০৬)-এর শাসনামল :** ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডোর এলাকা হস্তান্তর করেনি এমনকি চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশের পার্লামেন্টে চুক্তিটি অনুমোদন করে নেয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশ অনুমোদন করলেও ভারত তা করেনি। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তিনবিঘা বাংলাদেশকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। যার ফলে ১৯৯২ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও আবার একটি চুক্তি করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল সমস্যার একটি সাময়িক সমাধান হয়। ১৯৯২ সালের জুন মাস থেকে তিনবিঘা করিডোর ২৪ ঘন্টার ৬ ঘন্টা খোলা রাখা হয়। ২০০১ সালে সংঘটিত সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক ২০০৬ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দিল্লি সফরের পর ঐ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিষ্পত্তিহীন সীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বদল, অপদখলীয় সম্পত্তি হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে কোনো অগ্রগতি ছাড়াই সেই বৈঠক শেষ হয়। খালেদা জিয়া শাসনামলের দ্বিতীয় মেয়াদে সংশোধিত ভ্রমণ ব্যবস্থা, যাত্রীবাহী রেল সার্ভিস চুক্তি, ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিসের ওপর প্রটোকল, ২০০৫-২০০৮ সালের জন্য বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির জন্য সাধারণ এবং অর্থ সংক্রান্ত বিধি-বিধান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা বর্তমানেও বলবৎ আছে।

৬. **শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-বর্তমান)-এর শাসনামল :** ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের ফলে উভয় দেশ বৈঠকে বসলেও তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফলে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ এটাকে ভারতীয় হঠকারিতা এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এটাকে আইনি জটিলতা বলে ব্যক্ত করেন। ২০০৯ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দিল্লিতে শুরু হয় বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট বাউন্ডারি ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক। সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল হস্তান্তর, অপদখলীয় সম্পত্তিসহ বিভিন্ন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সবচেয়ে বড় সফলতা ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি। এ চুক্তিটি ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে মোট তিনটি ভাষায়। এছাড়াও শেখ হাসিনা শাসনামলে ১৭ জুন ১৯৯৯ মোটরযান যাত্রী পরিবহন চুক্তি, ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস প্রটোকল, বেনাপোল-পেট্রাপোল

রেল ট্রাফিক পুনঃস্থাপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনামলে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি, সীমান্ত হাট চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তিসহ নানাবিধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। ১৯৯৯ সালের পর এটিই ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। মনমোহনের সফরকালে একটি চুক্তি, দু'টি প্রটোকল ও সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৪ সালের কাঠমান্ডু শীর্ষ সম্মেলনে স্থল সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৫-এর ৬ ও ৭ মে যথাক্রমে ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভায় সর্বসম্মতভাবে স্থল সীমান্ত বিলটি পাস হয়। যা শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যের মুকুটে আরেকটি পালক যুক্ত করে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা

১. **অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন :** বাংলাদেশের ৫৪টি নদী ভারতীয় উৎস বা ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এসব নদীর পানির ন্যায্য ভাগ পেতে বাংলাদেশ আগ্রহী। কিন্তু নদীর পানি নিয়ে বিরোধ দেশের নিরাপত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকি তৈরি করে। পানি বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিরোধ শুরু হয় সেই ১৯৫১ সালের ফারাক্কা ব্যারেজের পরিকল্পনা প্রকাশের পর থেকে। ১৯৭৬ সালে ঐতিহাসিক লং মার্চ, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরাসরি আলোচনা ও কূটনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসেনি। বরং ফারাক্কা সমস্যা সমাধান চাইলে ভারত আন্তঃনদী-সংযোগ প্রকল্পের দাবি করে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ জোর দিয়ে কিছু বলতে পারে না। আন্তর্জাতিক নদী সংক্রান্ত আইনের দাবি বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও ভারত তাতে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ৪৫ বছর শেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা-চুক্তির মাধ্যমে আপাত সমাপ্তি ঘটে এই তর্ক-বিতর্কের। চুক্তিটি ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে কার্যকর হয়। ১৯৯৬-এর গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তিটিতে মূল যে বিষয়গুলো ছিল তা হলো– এ পানি বণ্টন নির্ভর করবে ফারাক্কায় পানির প্রবাহের ওপর। অর্থাৎ ফারাক্কায় পানির প্রবাহ যদি কমে যায় তাহলে বাংলাদেশ চুক্তি মেনেই পানি কম পাবে। এ চুক্তি বলবৎ থাকবে শুধু শুষ্ক মৌসুমে, পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত। বছরের বাকি সময়ের জন্য অর্থাৎ আর্দ্র মৌসুম এ চুক্তির অধীনে থাকবে না। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ যখন সবচেয়ে কম থাকে তখন ভারত প্রায় সম্পূর্ণ পানি প্রত্যাহার করে নেয়। এ নীতি শুধু ফারাক্কায়ই নয়, বরং ভারত যেসব নদীতে বাঁধ দিয়েছে তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই এরূপ করে থাকে। এ নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সমাবেশ, সভা, সমিতি গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের দোহাই দিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন কলাম ও প্রতিবেদন লেখা হলেও কোনো কাজে আসেনি।

অপরদিকে, বাংলাদেশ সীমান্তের ১০০ কিলোমিটার দূরে বরাক নদীর পানি প্রত্যাহার করার জন্য ২০০৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং টিপাইমুখ নামক স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলে সেখানে বাঁধ নির্মাণ করছে। এ বাঁধ চালু হলে বাংলাদেশের সুরমা নদী, কানাই ঘাট ও সিলেট স্টেশনে পানির গড় উচ্চতা হ্রাস পাবে। ফলে নদীতে যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজারের ১০ হাজার হেক্টর জলাভূমি একেবারে শুকিয়ে যাবে। হাওরগুলো তার অতীত ঐতিহ্য হারাবে।

৩. **হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-৯০)-এর শাসনামল :** জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদ জিয়াউর রহমানের নীতি অনুসরণ করলেও গঙ্গার পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হন। সংক্ষিপ্ত সময়ে এ চুক্তি স্বাক্ষর এরশাদ শাসনামলের একটি বড় সাফল্য। এ পদক্ষেপকে ভিত্তি করে এরশাদ সরকারের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। যদিও কূটনৈতিক ও কৌশলগত এ সম্ভাবনাকে এরশাদ তার সামরিক শাসনামলে ব্যবহার করতে পারেনি। ভারতের সাথে ১৯৭৫ পরবর্তী ১৯৯৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের সম্পর্কের তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি । ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পূর্ব পর্যন্ত কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তার ক্ষমতার ৮ বছরেরও অধিক সময় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যর্থ হন।

৪. **বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-৯৬, ২০০১-০৬)-এর শাসনামল :** ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডোর এলাকা হস্তান্তর করেনি এমনকি চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশের পার্লামেন্টে চুক্তিটি অনুমোদন করে নেয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশ অনুমোদন করলেও ভারত তা করেনি। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তিনবিঘা বাংলাদেশকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। যার ফলে ১৯৯২ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও আবার একটি চুক্তি করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল সমস্যার একটি সাময়িক সমাধান হয়। ১৯৯২ সালের জুন মাস থেকে তিনবিঘা করিডোর ২৪ ঘন্টার ৬ ঘন্টা খোলা রাখা হয়। ২০০১ সালে সংঘটিত সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক ২০০৬ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দিল্লি সফরের পর ঐ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিষ্পত্তিহীন সীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বদল, অপদখলীয় সম্পত্তি হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে কোনো অগ্রগতি ছাড়াই সেই বৈঠক শেষ হয়। খালেদা জিয়া শাসনামলের দ্বিতীয় মেয়াদে সংশোধিত ভ্রমণ ব্যবস্থা, যাত্রীবাহী রেল সার্ভিস চুক্তি, ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিসের ওপর প্রটোকল, ২০০৫-২০০৮ সালের জন্য বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির জন্য সাধারণ এবং অর্থ সংক্রান্ত বিধি-বিধান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা বর্তমানেও বলবৎ আছে।

৬. **শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-বর্তমান)-এর শাসনামল :** ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের ফলে উভয় দেশ বৈঠকে বসলেও তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফলে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ এটাকে ভারতীয় হঠকারিতা এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এটাকে আইনি জটিলতা বলে ব্যক্ত করেন। ২০০৯ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দিল্লিতে শুরু হয় বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট বাউন্ডারি ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক। সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল হস্তান্তর, অপদখলীয় সম্পত্তিসহ বিভিন্ন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সবচেয়ে বড় সফলতা ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি। এ চুক্তিটি ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে মোট তিনটি ভাষায়। এছাড়াও শেখ হাসিনা শাসনামলে ১৭ জুন ১৯৯৯ মোটরযান যাত্রী পরিবহন চুক্তি, ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস প্রটোকল, বেনাপোল-পেট্রাপোল

রেল ট্রাফিক পুনঃস্থাপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনামলে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি, সীমান্ত হাট চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তিসহ নানাবিধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। ১৯৯৯ সালের পর এটিই ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। মনমোহনের সফরকালে একটি চুক্তি, দু'টি প্রটোকল ও সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৪ সালের কাঠমান্ডু শীর্ষ সম্মেলনে স্থল সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৫-এর ৬ ও ৭ মে যথাক্রমে ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভায় সর্বসম্মতভাবে স্থল সীমান্ত বিলটি পাস হয়। যা শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যের মুকুটে আরেকটি পালক যুক্ত করে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা

১. **অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন :** বাংলাদেশের ৫৪টি নদী ভারতীয় উৎস বা ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এসব নদীর পানির ন্যায্য ভাগ পেতে বাংলাদেশ আগ্রহী। কিন্তু নদীর পানি নিয়ে বিরোধ দেশের নিরাপত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকি তৈরি করে। পানি বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিরোধ শুরু হয় সেই ১৯৫১ সালের ফারাক্কা ব্যারেজের পরিকল্পনা প্রকাশের পর থেকে। ১৯৭৬ সালে ঐতিহাসিক লং মার্চ, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরাসরি আলোচনা ও কূটনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসেনি। বরং ফারাক্কা সমস্যা সমাধান চাইলে ভারত আন্তঃনদী-সংযোগ প্রকল্পের দাবি করে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ জোর দিয়ে কিছু বলতে পারে না। আন্তর্জাতিক নদী সংক্রান্ত আইনের দাবি বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও ভারত তাতে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ৪৫ বছর শেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা-চুক্তির মাধ্যমে আপাত সমাপ্তি ঘটে এই তর্ক-বিতর্কের। চুক্তিটি ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে কার্যকর হয়। ১৯৯৬-এর গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তিটিতে মূল যে বিষয়গুলো ছিল তা হলো– এ পানি বণ্টন নির্ভর করবে ফারাক্কায় পানির প্রবাহের ওপর। অর্থাৎ ফারাক্কায় পানির প্রবাহ যদি কমে যায় তাহলে বাংলাদেশ চুক্তি মেনেই পানি কম পাবে। এ চুক্তি বলবৎ থাকবে শুধু শুষ্ক মৌসুমে, পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত। বছরের বাকি সময়ের জন্য অর্থাৎ আর্দ্র মৌসুম এ চুক্তির অধীনে থাকবে না। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ যখন সবচেয়ে কম থাকে তখন ভারত প্রায় সম্পূর্ণ পানি প্রত্যাহার করে নেয়। এ নীতি শুধু ফারাক্কায়ই নয়, বরং ভারত যেসব নদীতে বাঁধ দিয়েছে তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই এরূপ করে থাকে। এ নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সমাবেশ, সভা, সমিতি গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের দোহাই দিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন কলাম ও প্রতিবেদন লেখা হলেও কোনো কাজে আসেনি।

অপরদিকে, বাংলাদেশ সীমান্তের ১০০ কিলোমিটার দূরে বরাক নদীর পানি প্রত্যাহার করার জন্য ২০০৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং টিপাইমুখ নামক স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলে সেখানে বাঁধ নির্মাণ করছে। এ বাঁধ চালু হলে বাংলাদেশের সুরমা নদী, কানাই ঘাট ও সিলেট স্টেশনে পানির গড় উচ্চতা হ্রাস পাবে। ফলে নদীতে যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজারের ১০ হাজার হেক্টর জলাভূমি একেবারে শুকিয়ে যাবে। হাওরগুলো তার অতীত ঐতিহ্য হারাবে।

নদীভিত্তিক কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের চাষাবাদের সুবিধার্থে তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তিস্তায় পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এ প্রকল্পের সুবিধা থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে যৌথ নদী কমিশনের ২৫তম বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারত তিস্তার পানি বণ্টনের জন্য একটি এডহক চুক্তি করার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল বলে জানা যায়। সে সময় তিস্তার ৭৫% পানি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বণ্টন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ নিয়ে ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত অজস্রবার বৈঠক হয়। এ বিষয়ে দুই দেশ কোনো ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি। ৫ জানুয়ারি ২০১০ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের দু'দিনব্যাপী সচিব পর্যায়ে বৈঠক শেষেও তিস্তার বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। সর্বশেষ ২০১১ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তা ও ফেনী নদীর পানিবণ্টন চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও ভারতের অনীহার কারণে তা হয়নি।

২. **নদী ও সমুদ্রসীমা নির্ধারণ :** স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও দুই দেশের নদী ও সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এখনো দুই দেশের মধ্যে ১০০ কিলোমিটার নদী চিহ্নিতকরণ বাকি রয়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নিয়মিত নদীভাঙন প্রভৃতি কারণে এ সমস্যা আরো বেড়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ এখনো সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে সমুদ্রসীমা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে মাত্র কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। তাই উভয় দেশ তাদের সমুদ্রসীমার দাবি এরই মধ্যে জাতিসংঘে উপস্থাপন করেছে। উভয়দেশ জাতিসংঘের সালিসের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করতে পারলে দু'দেশের জন্যই মঙ্গলজনক হতো।

৩. **সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বিনিময় ও অপদখলকৃত জমি হস্তান্তর :** দুই দেশের মধ্যকার সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বিনিময় ও অপদখলীয় জমি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই চুক্তিটি দুই দেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চুক্তিটি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্ট চুক্তিটি অনুমোদন না করায় তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমানা ৪,১৫৬ কি. মি.। মাত্র ৬.৫ কিলোমিটার বাদে পুরো সীমানা চিহ্নিত করা হয়ে গেছে। ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত না হওয়ায় ছিটমহল বিনিময় এবং অপদখলীয় জমি হস্তান্তর করা যাচ্ছে না। এ কারণে দুই দেশের সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে। কখনো কখনো সম্পর্ক হয়ে উঠছে বিরোধপূর্ণ। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলের তালিকা চূড়ান্ত করে উভয় দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে একটি স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। দুই দেশের সম্মত তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতের ছিটমহলের সংখ্যা ১১১টি এবং এগুলোর জমির পরিমাণ ১৭,১৫৮.৩ একর। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা ৫১টি এবং এগুলোর জমির পরিমাণ ৭,১১০.০২ একর। ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী এগুলো দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের কথা রয়েছে। ১৯৭৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে অপদখলীয় জমি পরস্পরকে ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে। সর্বশেষ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে করিডরের গেট ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্তে ১৯৪৭ সাল থেকে দীর্ঘ অবরুদ্ধ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলবাসীর। দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের ৬ ও ৭ মে যথাক্রমে ভারতের রাজ্যসভায় ও লোকসভায় ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুমোদনের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের নাগরিকত্বহীনতার বিষয়টি লাঘব হয় এবং সীমানা চিহ্নিতকরণ ও অপদখলীয় ভূমি বিষয়ে স্থায়ী সমাধান হয়।

৪. **অর্থনৈতিক সম্পর্ক :** দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে ঐ চুক্তির ভিত্তিতে পুনরায় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮০ সালে। ঐ চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে 'ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড প্রটোকল' স্বাক্ষরিত হয়। এরপর থেকে নৌপথে দু'দেশের পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে। রেলযোগেও চারটি রুটে পণ্য পরিবহন হচ্ছে। রুটগুলো হচ্ছে— বাংলাদেশের দর্শনা থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার গেদে, রুহনপুর থেকে মালদহের সিনহাবাদ, শাহজাদপুর থেকে আসামের মহিশাসন এবং মংলা থেকে রুহনপুর–সিনহাবাদ। এছাড়া ১৯৯৮ ও ২০০৬ সালেও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৮২ সালে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠনসংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ কমিশনের আওতায় দুই দেশের পারস্পরিক সব বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়। দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ভারত একতরফাভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। তৈরি পোশাকে দিয়েছে কোটা সুবিধা— তারপরও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। ভারত বাংলাদেশকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য, সহযোগিতা করে আসছে। প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা দিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১০০ কোটি ডলারের একটি ঋণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘ দিন ধরে চলছে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ভারসাম্যহীন বাণিজ্য ঘাটতি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য ঘাটতি ২৯১ কোটি মার্কিন ডলার ছিল। কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না এ বাণিজ্য বৈষম্য। বরং ক্রমাগত বেড়েই চলছে এ ঘাটতির পরিমাণ।

৫. **বিএসএফ-এর কর্মকাণ্ড :** ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী গুলি করে প্রায়ই বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা করছে। এসব হত্যায় যারা জড়িত তাদের কারো কোনো বিচার করা হয় না। ভারত তার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে। এক সময় যেখানে দুই দেশ বৃহত্তর বঙ্গের অংশ ছিল, সেখানে ভারত এখন অনুপ্রবেশ, পাচার, সরকারবিরোধী সন্ত্রাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে দূরে থাকুন চিহ্ন ব্যবহার করছে। যেখানে অভিবাসনের প্রশ্নে বৈরিতা বাড়ছে সেখানে এমন ঘটনা অবশ্য ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু সীমান্তে মোতায়ন করা পুলিশ, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ নিরাপরাধ স্থানীয় গ্রামবাসীদের গুলি করে হত্যা করছে। ১ জানুয়ারি ২০০০ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে বিএসএফ-এর গুলিতে সহস্রাধিক নিরীহ বাংলাদেশী নিহত ও আহত হয়। এছাড়া অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয় বহু নিরীহ নরনারীকে, যা সম্পূর্ণ মানবাধিকারের পরিপন্থী। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সীমান্তের কাছাকাছি বসবাসকারী লোকজন দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তের এপার-ওপার যাওয়া-আসা করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের দেশবিভাগের সময় যে সীমান্তরেখা টেনে দেয়া হয়েছে তাতে অনেকের বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সীমান্তরেখার কারণে আলাদা হয়ে পড়েছে। তারাই এপার-ওপার হয়ে থাকেন। সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের অধিকার ভারতের আছে। তবে প্রাণ রক্ষার প্রয়োজন ছাড়া ভারতের মারণাস্ত্র ব্যবহারের কোনো অধিকার নেই। এমনকি ভারতীয় অনেক কর্মকর্তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২০১১ সালে কুচবিহারের হিনহাটায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ফেলানিকে গুলি করে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রতিনিয়ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য ও পুলিশ

নদীভিত্তিক কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের চাষাবাদের সুবিধার্থে তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তিস্তায় পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এ প্রকল্পের সুবিধা থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে যৌথ নদী কমিশনের ২৫তম বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারত তিস্তার পানি বণ্টনের জন্য একটি এডহক চুক্তি করার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল বলে জানা যায়। সে সময় তিস্তার ৭৫% পানি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বণ্টন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ নিয়ে ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত অজস্রবার বৈঠক হয়। এ বিষয়ে দুই দেশ কোনো ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি। ৫ জানুয়ারি ২০১০ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের দু'দিনব্যাপী সচিব পর্যায়ে বৈঠক শেষেও তিস্তার বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। সর্বশেষ ২০১১ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তা ও ফেনী নদীর পানিবণ্টন চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও ভারতের অনীহার কারণে তা হয়নি।

২. **নদী ও সমুদ্রসীমা নির্ধারণ :** স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও দুই দেশের নদী ও সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এখনো দুই দেশের মধ্যে ১০০ কিলোমিটার নদী চিহ্নিতকরণ বাকি রয়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নিয়মিত নদীভাঙন প্রভৃতি কারণে এ সমস্যা আরো বেড়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ এখনো সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে সমুদ্রসীমা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে মাত্র কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। তাই উভয় দেশ তাদের সমুদ্রসীমার দাবি এরই মধ্যে জাতিসংঘে উপস্থাপন করেছে। উভয়দেশ জাতিসংঘের সালিসের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করতে পারলে দু'দেশের জন্যই মঙ্গলজনক হতো।

৩. **সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বিনিময় ও অপদখলকৃত জমি হস্তান্তর :** দুই দেশের মধ্যকার সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বিনিময় ও অপদখলীয় জমি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই চুক্তিটি দুই দেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চুক্তিটি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্ট চুক্তিটি অনুমোদন না করায় তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমানা ৪,১৫৬ কি. মি.। মাত্র ৬.৫ কিলোমিটার বাদে পুরো সীমানা চিহ্নিত করা হয়ে গেছে। ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত না হওয়ায় ছিটমহল বিনিময় এবং অপদখলীয় জমি হস্তান্তর করা যাচ্ছে না। এ কারণে দুই দেশের সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে। কখনো কখনো সম্পর্ক হয়ে উঠছে বিরোধপূর্ণ। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলের তালিকা চূড়ান্ত করে উভয় দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে একটি স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। দুই দেশের সম্মত তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতের ছিটমহলের সংখ্যা ১১১টি এবং এগুলোর জমির পরিমাণ ১৭,১৫৮.৩ একর। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা ৫১টি এবং এগুলোর জমির পরিমাণ ৭,১১০.০২ একর। ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী এগুলো দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের কথা রয়েছে। ১৯৭৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে অপদখলীয় জমি পরস্পরকে ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে। সর্বশেষ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে করিডরের গেট ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্তে ১৯৪৭ সাল থেকে দীর্ঘ অবরুদ্ধ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলবাসীর। দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের ৬ ও ৭ মে যথাক্রমে ভারতের রাজ্যসভায় ও লোকসভায় ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুমোদনের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের নাগরিকত্বহীনতার বিষয়টি লাঘব হয় এবং সীমানা চিহ্নিতকরণ ও অপদখলীয় ভূমি বিষয়ে স্থায়ী সমাধান হয়।

৪. **অর্থনৈতিক সম্পর্ক :** দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে ঐ চুক্তির ভিত্তিতে পুনরায় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮০ সালে। ঐ চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে 'ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড প্রটোকল' স্বাক্ষরিত হয়। এরপর থেকে নৌপথে দু'দেশের পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে। রেলযোগেও চারটি রুটে পণ্য পরিবহন হচ্ছে। রুটগুলো হচ্ছে— বাংলাদেশের দর্শনা থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার গেদে, রুহনপুর থেকে মালদহের সিনহাবাদ, শাহজাদপুর থেকে আসামের মহিশাসন এবং মংলা থেকে রুহনপুর–সিনহাবাদ। এছাড়া ১৯৯৮ ও ২০০৬ সালেও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৮২ সালে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠনসংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ কমিশনের আওতায় দুই দেশের পারস্পরিক সব বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়। দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ভারত একতরফাভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। তৈরি পোশাকে দিয়েছে কোটা সুবিধা— তারপরও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। ভারত বাংলাদেশকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য, সহযোগিতা করে আসছে। প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা দিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১০০ কোটি ডলারের একটি ঋণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘ দিন ধরে চলছে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ভারসাম্যহীন বাণিজ্য ঘাটতি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য ঘাটতি ২৯১ কোটি মার্কিন ডলার ছিল। কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না এ বাণিজ্য বৈষম্য। বরং ক্রমাগত বেড়েই চলছে এ ঘাটতির পরিমাণ।

৫. **বিএসএফ-এর কর্মকাণ্ড :** ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী গুলি করে প্রায়ই বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা করছে। এসব হত্যায় যারা জড়িত তাদের কারো কোনো বিচার করা হয় না। ভারত তার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে। এক সময় যেখানে দুই দেশ বৃহত্তর বঙ্গের অংশ ছিল, সেখানে ভারত এখন অনুপ্রবেশ, পাচার, সরকারবিরোধী সন্ত্রাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে দূরে থাকুন চিহ্ন ব্যবহার করছে। যেখানে অভিবাসনের প্রশ্নে বৈরিতা বাড়ছে সেখানে এমন ঘটনা অবশ্য ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু সীমান্তে মোতায়ন করা পুলিশ, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ নিরাপরাধ স্থানীয় গ্রামবাসীদের গুলি করে হত্যা করছে। ১ জানুয়ারি ২০০০ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে বিএসএফ-এর গুলিতে সহস্রাধিক নিরীহ বাংলাদেশী নিহত ও আহত হয়। এছাড়া অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয় বহু নিরীহ নরনারীকে, যা সম্পূর্ণ মানবাধিকারের পরিপন্থী। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সীমান্তের কাছাকাছি বসবাসকারী লোকজন দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তের এপার-ওপার যাওয়া-আসা করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের দেশবিভাগের সময় যে সীমান্তরেখা টেনে দেয়া হয়েছে তাতে অনেকের বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সীমান্তরেখার কারণে আলাদা হয়ে পড়েছে। তারাই এপার-ওপার হয়ে থাকেন। সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের অধিকার ভারতের আছে। তবে প্রাণ রক্ষার প্রয়োজন ছাড়া ভারতের মারণাস্ত্র ব্যবহারের কোনো অধিকার নেই। এমনকি ভারতীয় অনেক কর্মকর্তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২০১১ সালে কুচবিহারের হিনহাটায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ফেলানিকে গুলি করে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রতিনিয়ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য ও পুলিশ

মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। কিন্তু তাদের বিচার হচ্ছে না। বিএসএফ-এর মতো নিরাপত্তা রক্ষাকারী কোনো বাহিনীর সদস্যের দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্তের জন্য ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনুমোদন লাগে। কিন্তু সে অনুমোদনের ব্যাপারটা সচরাচর দেখা যায় না। ফলে বিএসএফ কারণে-অকারণে নিরীহ বাঙালি হত্যা করে চলেছে।

৬. **যোগাযোগ সম্পর্ক :** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে যে দিকটি গুরুত্ব পাচ্ছে তা হলো বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পণ্য চলাচলের জন্য ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট বিষয়টি। ভারতের পাশে বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের জন্য দারুণ গুরুত্ব বহন করে থাকে। বাংলাদেশের জল-স্থলপথ ব্যবহার করে ভারত তার মূল ভূখণ্ড থেকে এসব রাজ্যে কম সময়ে ও খরচে পণ্য পরিবহন করে লাভবান হতে চায়। ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট সুযোগের পাশাপাশি ভারত চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর সুবিধাও চায়। জানুয়ারি ২০১১-এ ভারত সফর করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতকে এসব সুবিধা দেয়ার জন্য নানা ধরনের সমঝোতা করে আসার পর এখন তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত এক বিলিয়ন ডলারের এক ঋণচুক্তি করেছে যার অর্থ দিয়ে অন্যান্য কাজের মধ্যে ট্রানজিট দেয়ার নানা অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সমঝোতা অনুযায়ী নতুন রেললাইন ও রেলসেতু নির্মাণ, ভারত থেকে রেল কোচ সংগ্রহ, আখাউড়া-আগরতলার মধ্যে ১৪ কিলোমিটার মিটারগেজ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে কলকাতা ও আখাউড়ার ভেতর দ্রুত ও সহজ যোগাযোগ সুবিধা তৈরি করা, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করে সড়ক ও রেলপথে ভারতের পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করা এর অন্তর্ভুক্ত। এসব সমঝোতা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জাতিগত বিদ্রোহীদের বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার না করতে দেয়ার ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ সংক্রান্ত এক চুক্তি হয় এবং চুক্তি করার আগে থেকেই আসামের উলফা নেতাদের ভারতের হাতে সমর্পণ করা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারত যে ট্রানজিট নেবে তার জন্য কোনো টোল বা মূল্য ভারত দেবে না বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং ট্রানজিট ফি নেয়ার ব্যাপারে কর্মকর্তা পর্যায়ে আগ্রহ থাকলেও সরকারের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পর্যায়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে ফি না নেয়ার যৌক্তিকতা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, বাংলাদেশ তার সড়ক বা জলপথ কোনো আর্থিক লাভ ছাড়াই ভারতকে ব্যবহার করতে দেবে? এসব অবকাঠামো নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণে ভারতের ঋণের টাকা বাংলাদেশ স্বাভাবিক নিয়মে শোধ করবে কিন্তু তা থেকে কোনো ভাড়া পাবে না-কী জাতীয় সম্পর্কের উদাহরণ তৈরি হচ্ছে তাহলে!

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পারস্পরিকতার নীতি দ্বারা চালিত না হলে তা একপক্ষীয় ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে যেসব বিষয়ের মীমাংসা করতে পারেনি সেগুলোর প্রতি ভারতের ঔদাসীন্য দুই দেশের সম্পর্কে ভারসাম্য স্থাপন করে না। ভারত তার নিকট প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে যদিও বলা আছে অহিংস নীতির কথা। কিন্তু বাস্তবে ভারত কৌটিল্য কূটনীতিকের আলোকে তার স্বার্থের জন্য সকল প্রকার কর্মকাণ্ড ঘটাতে দ্বিধাবোধ করে না। ভারতের এ ধরনের নীতির নগ্ন শিকার হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো। ভারতের এরূপ আগ্রাসী মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। তার প্রমাণ আফগানিস্তান, ইরাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালেবান হঠানোর নামে আর ভুয়া আণবিক অস্ত্রের

গজুত আছে বলে ঝাণ্ডা তুলে আফগানিস্তান-ইরাকে বেপরোয়া অভিযান চালিয়েও এখন পদে পদে মার খাচ্ছে। ভারতকে এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকেও ভারতের অতীত সাহায্য সহযোগিতার কথা মনে রেখে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ভারতের সাথে বিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মিটিয়ে ফেলতে প্রয়োজনীয় সকল কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আরো বেশি অগ্রসর হতে হবে। কারণ ভারত ও চীন দুটি উদীয়মান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নিজ নিজ প্রভাব বজায় রাখতে চাইবে। বাংলাদেশে ভারতের সীমাহীন প্রভাব চীনের কাছে কাম্য না হওয়ারই কথা। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের যে সংঘাতের দিকটি আছে চীনের সঙ্গে সম্পর্কে সে দিকটি নেই। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনাদের সম্পর্কের তাৎপর্য রয়েছে।

০৪। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার উপর আলোচনা করুন। পানি বণ্টন ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে আপনার মতামত উল্লেখ করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে দেশ দুটোর সম্পর্কের ভিত্তি ঐতিহাসিক। বাংলাদেশ ও ভারত দুটি পৃথক রাষ্ট্র হলেও উভয় দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপূর্ব মিল রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবস্থান দেশ দুটোকে আরো কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এ সময় ভারতের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে অপরিসীম ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিল তা স্মরণযোগ্য। কিন্তু বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশকে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের অসহিষ্ণু কার্যকলাপ এবং বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক সমস্যা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে অনেকটা ফাটল ধরিয়েছে। এর ফলে বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের সামগ্রিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যা : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যেসকল ইস্যুকে ঘিরে তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান, সেসবের মধ্যে পানিবণ্টন ইস্যু অন্যতম। নিচে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানিবণ্টন সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **ভারতের ভিতর নদীপ্রবাহ :** স্বাধীনতা লাভের পরই বাংলাদেশ প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো পানিবণ্টন সমস্যা। বাংলাদেশের সব নদীর প্রবাহই ভারতের ভেতর দিয়ে এসেছে বলে পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে ভারতের ওপর এ দেশ নির্ভরশীল। ভারত ইচ্ছা করলেই বিভিন্ন নদীর প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বাংলাদেশের জন্য নদীর পানি কৃষিকাজ, শিল্প-কারখানা, নদীপথে যাতায়াত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের এই প্রয়োজনীয়তাকে মোটেই পাত্তা দেয় নি।

২. **ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ :** ১৯৬৯ সালে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার ফলে পদ্মার প্রবাহ স্থবির হয়ে পড়ে। অথচ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশের মধ্য দিয়ে নদী অন্য দেশে প্রবাহিত হলে তার নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ নয়। ভারত এই নিয়ম মান্য করে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়নি। যে ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে এত বিতর্ক, বর্তমানে তা স্তিমিত হয়ে পড়লেও সম্প্রতি ভারত তার অভ্যন্তরস্থ নদীগুলোর প্রবাহ খাল কেটে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়ার পর বাংলাদেশ আরো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের এ সম্পর্কিত প্রতিবাদ ভারতের মনঃপুত হয়নি।

৩. **আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব :** আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকার সকল নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরি নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ভারত যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা-ই River Inter-linking Project বা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নামে পরিচিত। এ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের উপর। ফলে বাংলাদেশের সাথে ভারতের পানিবণ্টন সমস্যা জিইয়ে রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **জলাধারে পানি সংরক্ষণ :** আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি ছোট-বড় নদীকে ৩০টি খালের মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে ৭৪টি জলাধারে পানি সংরক্ষণ করবে ভারত। এতে করে বাংলাদেশ নদীগুলো থেকে ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে বঞ্চিত হবে।

খ. **পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তন :** আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তন করবে। এর মাধ্যমে ভারত উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের খরাপ্রবণ রাজ্যগুলোতে পানি বণ্টন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করবে। ফলশ্রুতিতে কৃষি মৌসুমে বাংলাদেশে নদী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোতে খরা দেখা দিবে। সর্বোপরি বিপন্ন হবে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা।

গ. **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পানি অপসারণ :** আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পানি অপসারণ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক দিয়ে তালিমনাড়ুতে নিয়ে যাওয়া হবে। আর গঙ্গার পানি পৌঁছবে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে। ১২০০ কিমি দীর্ঘ কৃত্রিম নদী সম্বলিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের এক-তৃতীয়াংশ পানি তথা ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

৪. **ভাটিতে বাংলাদেশের অবস্থান :** ছোট-বড় মিলে বাংলাদেশে রয়েছে ২৩০টির মতো নদ-নদী। এগুলোর মধ্যে ৫৭টি হলো আন্তর্জাতিক—এর মধ্যে ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং বাকি তিনটি মিয়ানমার থেকে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটিতে হওয়ায় উজানে যে কোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়ে।

৫. **যৌথ নদী কমিশনের ব্যর্থতা :** পানি সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৭২ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন। এ কমিশনের মাধ্যমে ভারতীয় নীতির প্রতিবাদ করেও বাংলাদেশের কোনো লাভ হয়নি।

৬. **গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি অমান্য :** আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই চুক্তিতে কোনো গ্যারান্টি ক্লোজ না থাকায় বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। অধিকন্তু ভারত তার সাম্প্রতিক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভারত সিলেট সীমান্তবর্তী বরাক নদীর ওপর পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের পূর্বাঞ্চলকেও শুকিয়ে মারার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

পানি বণ্টন ও ছিটমহল সমস্যার সমাধানে পরামর্শ : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বণ্টন ও ছিটমহল সমস্যার সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। নিচে এসব পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো :

ক. **পানি বণ্টন সমস্যার সমাধানে পরামর্শ :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন সমস্যা দীর্ঘদিনের পুরনো ও জটিল সমস্যা। এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে অনেকটা স্নায়ুযুদ্ধমূলক পরিস্থিতি বিদ্যমান। তাই উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের নজির হিসেবে পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি। নিচে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন সমস্যা যেভাবে সমাধান হতে পারে :

১. **গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির বাস্তবায়ন :** ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর একই বছর ১২ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে নির্ধারিত হয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে গৃহীত ফর্মুলা মোতাবেক ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে দুদেশের মাঝে গঙ্গার পানি ভাগাভাগি হবে এবং ভারত নদীটির জলপ্রবাহের মাত্রা গত ৪০ বছরের গড় মাত্রায় বজায় রাখার চেষ্টা করবে। যে কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ৩৫ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা পাবে। কিন্তু ভারত এ চুক্তি মানেনি। ফলে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে প্রতি বছর বঞ্চিত হচ্ছে। তাই গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

২. **আন্তর্জাতিক নদী আইন মান্য :** আন্তর্জাতিক নদী আইন মান্য করার মাধ্যমেও বাংলাদেশ ভারত পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কেননা ভারত আন্তর্জাতিক নদী আইনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে বাংলাদেশের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অবমাননা করেছে। তাই ভারতের উচিত এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আইন মান্য করা।

৩. **জনমত গঠন :** বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনমত গঠন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিভেদ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ভুলে জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশ ও ভারতকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

৪. **আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন :** বাংলাদেশের জীবন-মরণ এই সমস্যাটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি বণ্টন ও প্রত্যাহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে জানাতে হবে। পানি বণ্টন সমাধান না বলে বাংলাদেশে যেসব সম্ভাব্য ক্ষতি হবে তার প্রামাণ্য দলিল তথ্য-উপাত্তসহ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাতিসংঘ যেহেতু সুন্দরবনকে World Heritage হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, সেহেতু বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে পানি প্রত্যাহারের ফলে সুন্দরবনের কি কি ক্ষতি হবে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব থাকবে কি না তাও জানাতে হবে। সেই সাথে আগামী সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এই সমস্যাটি জোরালোভাবে উত্থাপন করতে হবে।

৫. **কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার :** ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। এই সমস্যার বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তসহ বিভিন্ন দেশে বিশেষ দূত প্রেরণ করতে হবে। সেই সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ও সফর আয়োজন করা যেতে পারে। বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেনসহ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা জানিয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. **অর্থনৈতিক কূটনীতি :** বাংলাদেশের সাথে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান না করে ভারত উল্টো আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে। সরকারি পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছে আমাদের যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরতে হবে যেন তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন না করে। পাশাপাশি বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শক্ত অবস্থান নিতে হবে।

৭ **গণমাধ্যম ও ই-মিডিয়ার ভূমিকা :** পানি বণ্টন সমস্যাকে ব্যাপকভাবে প্রচার, জনমত গঠন ও জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে গণমাধ্যমকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পানি বণ্টন না হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর সচিত্র প্রতিবেদন সংবাদপত্র, বিটিভি ও অন্যান্য মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করতে হবে। বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। বাংলাদেশকে পানি বণ্টন সমস্যার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে ওয়েব সাইট তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে ই-মেইলের মাধ্যমে মত বিনিময়, বিশ্ব জনমত গঠন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে ই-বার্তা পাঠাতে হবে।

৮. **পরিবেশবাদী আন্দোলন :** পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান না হওয়ার দরুন বাংলাদেশের পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বিশ্ব পরিবেশবাদী আন্দোলনে আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক International Rivers Network, হল্যান্ডভিত্তিক International Water Tribunal, Third World Water Forum ইত্যাদি সংগঠন নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ রোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার আর তাই তাদের কাছে এই বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে মানবাধিকার কর্মী, পরিবেশবাদী নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে ই-মেইল করে উক্ত বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।

৯. **জোট গঠন ও লবিং :** পানি বণ্টন সমস্যার সাথে শুধু বাংলাদেশের স্বার্থই জড়িত নয়, এর সাথে জড়িত নেপাল, ভুটান ও চীনের স্বার্থ। তাই এই তিন রাষ্ট্রকে নিয়ে জোট গঠন করতে হবে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সাথে পানি বণ্টন সমস্যা নিয়ে খোদ ভারতেই বিতর্ক চলছে। সুতরাং পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করতে হবে। সর্বোপরি শক্তিশালী ভারতীয় লবির বিরুদ্ধে আমাদেরকেও লবিস্ট নিয়োগ করতে হবে।

১০. **প্রবাসীদের ভূমিকা :** বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যার ব্যাপারে প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ তারা যেভাবে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা দেশে থেকে সেভাবে পারি না। প্রবাসীদের প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তদ্রূপ তাদের দ্বারাই এই ষড়যন্ত্রও প্রতিহত করা সম্ভব। এজন্য এই সমস্যা সম্বন্ধে জানাতে হবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার স্মরণাপন্ন হতে হবে।

১১. **সরকারের ভূমিকা :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরকারকে সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ কেবল সরকারের জোরালো উপস্থাপনাই বিশ্ব সংস্থার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। উপরোল্লিখিত কাজগুলো সরকার যদি নিজেই করে তাহলেই কেবল বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যার সম্ভব হতে পারে। সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে।

খ. **ছিটমহল সমস্যার সমাধান :** ছিটমহল সমস্যা সমাধান বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের জন্যই অত্যন্ত জরুরি। কেননা এর ফলে উভয় দেশই বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে কাশ্মীর সমস্যা বাদে ভূমি বা সীমান্ত নামে ছিটমহল সমস্যা প্রকট আকারে থাকলেও পাকিস্তান আমলে কোনো সমাধান হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পর ছিটমহলজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৭ সালে ইন্দিরা-মুজিব স্থল সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হলে চার দশকে তা কার্যকর না হলেও ২০১৫ সালের ৪, ৬ ও ৭ মে যথাক্রমে ভারতের মন্ত্রিপরিষদ, রাজ্যসভা ও লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাস হলে সমস্যাটির স্থায়ী সমাধানের পথ সুগম হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে কয়টি বিবাদমান ইস্যু রয়েছে সেগুলো খুবই জটিল। এ বিষয়গুলোর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা এমনকি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। বিশেষ করে নদীর পানি বণ্টন, গ্যাস রপ্তানিসহ মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের মতো বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে। বহিরাগত কোনো পরামর্শ বা চাপের কাছে অবনত হওয়ার অর্থ হবে জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়ার নামান্তর। মোটকথা নিজ দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখেই ভারতের সাথে সম্পর্কের অগ্রগতির কথা ভাবতে হবে।

০৫। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে? উভয় দেশের পানি বণ্টন সমস্যাটির সমাধান কিভাবে হতে পারে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলকথা হলো 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব' কারো সাথে শত্রুতা নয়'–এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ সকল দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু ভারত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রতিবেশীসুলভ ও সহায়তামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এর উল্টো চিত্র বাংলাদেশের সামনে উন্মোচন করেছে। ফলে বাংলাদেশ-ভারত বৈরী সম্পর্ক স্বাধীনতার পর থেকে নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে জিইয়ে আছে। এসব ইস্যুর মধ্যে পানি বণ্টন ইস্যু অন্যতম।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে কয়টি অভিন্ন নদী রয়েছে : যৌথ নদী কমিশন প্রদত্ত তথ্যমতে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী ৫৪টি। তবে বাংলাপিডিয়ার সূত্রমতে আন্তঃসীমান্ত নদী ৫৫টি। এর মধ্যে যশোর, পঞ্চগড় ও নীলফামারি, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ১টি করে, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ও নওগাঁ, শুধু দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, শেরপুর, কুমিল্লা ও ফেনীতে ২টি করে। নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩টি করে, পঞ্চগড়, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে ৪টি করে এবং সিলেটে ৬টি নদী আছে।

আন্তঃসীমান্ত নদী

নদী	সীমান্তবর্তী জেলা
১. রায়মঙ্গল, ২. ইছামতি-কালিন্দী	সাতক্ষীরা
৩. বেতনা-কোদালিয়া	যশোর
৪. ভৈরব-কোবাদাক	মেহেরপুর
৫. মাথাভাঙা	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর
৬. গঙ্গা, ৭. পাগলা	নবাবগঞ্জ
৮. আত্রাই, ৯. পুনর্ভবা	দিনাজপুর ও নওগাঁ
১০. তেঁতুলিয়া, ১১. টাঙন	দিনাজপুর
১২. কুলিখ, ১৩. নাগর	ঠাকুরগাঁও
১৪. মহানন্দা, ১৫. ডাহুক, ১৬. করতোয়া, ১৭. তলমা	পঞ্চগড়
১৮. ঘোড়ামারা	পঞ্চগড় ও নীলফামারী
১৯. দেওনাই-চড়ালকাটা-যমুনেশ্বরী, ২০. বুড়ি-তিস্তা, ২১. তিস্তা	নীলফামারী
২২. ধরলা	লালমনিরহাট
২৩. দুধকুমার, ২৪. ব্রহ্মপুত্র নদ, ২৫. জিঞ্জিরাম	কুড়িগ্রাম
২৬. চিতলখালী, ২৭. ভোগাই	শেরপুর
২৮. নিতাই	ময়মনসিংহ
২৯. সোমেশ্বরী	নেত্রকোনা
৩০. যাদুকাটা, ৩১. জালুখালী-ধামালিয়া, ৩২. নয়াগাঙ, ৩৩. উমিয়াম	সুনামগঞ্জ
৩৪. ধরলা, ৩৫. পিয়াইন, ৩৬. শারি-গোয়াইন, ৩৭. সুরমা, ৩৮. কুশিয়ারা, ৩৯. সোনাই-বরদল	সিলেট
৪০. জুরি, ৪১. মনু, ৪২. ধলাই, ৪৩. গোপাল-লংলা	মৌলভীবাজার
৪৪. খোয়াই, ৪৫. সুতাং, ৪৬. সোনাই	হবিগঞ্জ
৪৭. হাওড়া, ৪৮. বিজনী, ৪৯. সালদা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫০. গোমতী, ৫১. কাকরী-ডাকাতিয়া	কুমিল্লা
৫২. সিলোনিয়া, ৫৩. মুহুরী	ফেনী
৫৪. ফেনী	খাগড়াছড়ি
৫৫. কর্ণফুলী	রাঙামাটি

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন সমস্যা যেভাবে সমাধান হতে পারে : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন সমস্যা দীর্ঘদিনের পুরনো ও জটিল সমস্যা। এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে অনেকটা স্নায়ুযুদ্ধমূলক পরিস্থিতি বিদ্যমান। তাই উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের নজির হিসেবে পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি। নিচে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন সমস্যা যেভাবে সমাধান হতে পারে তার একটি রূপরেখা উল্লেখ করা হলো :

১. **গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির বাস্তবায়ন :** ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর একই বছর ১২ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি

বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে নির্ধারিত হয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে গৃহীত ফর্মুলা মোতাবেক ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে দুদেশের মাঝে গঙ্গার পানি ভাগাভাগি হবে এবং ভারত নদীটির জলপ্রবাহের মাত্রা গত ৪০ বছরের গড় মাত্রায় বজায় রাখার চেষ্টা করবে। যে কোনো সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ৩৫ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা পাবে। কিন্তু ভারত এ চুক্তি মানেনি। ফলে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে প্রতি বছর বঞ্চিত হচ্ছে। তাই গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

২. **আন্তর্জাতিক নদী আইন মান্য :** আন্তর্জাতিক নদী আইন মান্য করার মাধ্যমেও বাংলাদেশ ভারত পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কেননা ভারত আন্তর্জাতিক নদী আইনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে বাংলাদেশের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অবমাননা করেছে। তাই ভারতের উচিত এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আইন মান্য করা।

৩. **জনমত গঠন :** বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনমত গঠন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিভেদ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ভুলে জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশ ও ভারতকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

৪. **আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন :** বাংলাদেশের জীবন-মরণ এই সমস্যাটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি বণ্টন ও প্রত্যাহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে জানাতে হবে। পানি বণ্টন সমাধান না হলে বাংলাদেশে যেসব সম্ভাব্য ক্ষতি হবে তার প্রামাণ্য দলিল তথ্য-উপাত্তসহ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাতিসংঘ যেহেতু সুন্দরবনকে World Heritage হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, সেহেতু বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে পানি প্রত্যাহারের ফলে সুন্দরবনের কি কি ক্ষতি হবে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব থাকবে কি না তাও জানাতে হবে।

৫. **কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার :** ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। এই সমস্যার বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তসহ বিভিন্ন দেশে বিশেষ দূত প্রেরণ করতে হবে। সেই সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ও সফর আয়োজন করা যেতে পারে। বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেনসহ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা জানিয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. **অর্থনৈতিক কূটনীতি :** বাংলাদেশের সাথে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান না করে ভারত উল্টো আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে। সরকারি পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছে আমাদের যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরতে হবে যেন তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন না করে। পাশাপাশি বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শক্ত অবস্থান নিতে হবে।

৭ **গণমাধ্যম ও ই-মিডিয়ার ভূমিকা :** পানি বণ্টন সমস্যাকে ব্যাপকভাবে প্রচার, জনমত গঠন ও জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে গণমাধ্যমকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পানি বণ্টন না হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর সচিত্র প্রতিবেদন সংবাদপত্র, বিটিভি ও অন্যান্য মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করতে হবে। বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। বাংলাদেশকে পানি বণ্টন সমস্যার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে ওয়েব সাইট তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে ই-মেইলের মাধ্যমে মত বিনিময়, বিশ্ব জনমত গঠন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে ই-বার্তা পাঠাতে হবে।

৮. **পরিবেশবাদী আন্দোলন :** পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান না হওয়ার দরুন বাংলাদেশের পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বিশ্ব পরিবেশবাদী আন্দোলনে আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক International Rivers Network, হল্যান্ডভিত্তিক International Water Tribunal, Third World Water Forum ইত্যাদি সংগঠন নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ রোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার আর তাই তাদের কাছে এই বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে মানবাধিকার কর্মী, পরিবেশবাদী নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে ই-মেইল করে উক্ত বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।

৯. **জোট গঠন ও লবিং :** পানি বণ্টন সমস্যার সাথে শুধু বাংলাদেশের স্বার্থই জড়িত নয়, এর সাথে জড়িত নেপাল, ভুটান ও চীনের স্বার্থ। তাই এই তিন রাষ্ট্রকে নিয়ে জোট গঠন করতে হবে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সাথে পানি বণ্টন সমস্যা নিয়ে খোদ ভারতেই বিতর্ক চলছে। সুতরাং পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করতে হবে। সর্বোপরি শক্তিশালী ভারতীয় লবির বিরুদ্ধে আমাদেরকেও লবিস্ট নিয়োগ করতে হবে।

১০. **প্রবাসীদের ভূমিকা :** বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যার ব্যাপারে প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ তারা যেভাবে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা দেশে থেকে সেভাবে পারি না। প্রবাসীদের প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তদ্রূপ তাদের দ্বারাই এই ষড়যন্ত্রও প্রতিহত করা সম্ভব। এজন্য এই সমস্যা সম্বন্ধে জানাতে হবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তাদেরকে স্মরণাপন্ন হতে হবে।

১১. **সরকারের ভূমিকা :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরকারকে সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র সরকারের জোরালো উপস্থাপনাই বিশ্ব সংস্থার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। উপরোল্লিখিত কাজগুলো সরকার যদি নিজেই করে তাহলেই কেবল বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যার সম্ভব হতে পারে। সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে।

ফারাক্কা চালু হয়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যকার অনৈক্যের কারণে আমরা তা প্রতিহত করতে পারিনি। এখন যদি ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলকে বাংলাদেশ-ভারত পানি বণ্টন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে।

০৬। বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণজনিত সমস্যা ও এর সমাধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ-মিয়ানমার-ভারত বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা তিন প্রতিবেশী দেশ। প্রতিবেশী দুই দেশের সাথেই রয়েছে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ। এ সমুদ্রসীমা বিরোধের সূত্রপাত ১৯৭৪ সাল থেকে। পরবর্তী সময়ে ভারত ও মিয়ানমার এমনভাবে সমুদ্রের উপর তাদের দাবি পেশ করে যাতে বাংলাদেশ একরকম কল্পিত সমুদ্র বেড়া দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরপর থেকে প্রতিবেশী এ দুই দেশের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ কখনো কখনো জটিল আকার ধারণ করে। অতঃপর ১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS) সমুদ্রসীমা নিরসনে মিয়ানমারের দাবি 'সমদূরত্ব পদ্ধতি' ও বাংলাদেশের দাবি 'ন্যায্যতা পদ্ধতি-কে বিচার-বিশ্লেষণ করে ন্যায্যতা পদ্ধতি (Equitable Principle) অনুযায়ী রায় ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ৭ জুলাই ২০১৪ নিষ্পত্তি হয় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ। এ রায়ের মাধ্যমে তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা : বাংলাদেশের সার্বভৌম সমুদ্রসীমা UNCLOS III এর ৩, ১৫ ধারা অনুযায়ী পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মধ্যস্রোত ধরে ভারত ও বাংলাদেশের তটরেখা থেকে সমদূরত্ব ধরে এগুবে। এ রেখা ৩৩ ধারা অনুযায়ী সন্নিহিত অঞ্চলসহ ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যাবে, তবে Swatch of No Ground বা অতল সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে যাবে না। অতল সমুদ্র স্পর্শ করলে এ রেখা ৭৬.৩, ৭৬.৪ ও ৭৬.৫ ধারা অনুযায়ী বাঁক নিয়ে দুই দেশের নদীসমূহের বাহিত পলির বিভাজন রেখা Swatch of No Ground বা অতল সমুদ্রের খাড়ি ধরে এগিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যাবে। বাংলাদেশের সার্বভৌম সমুদ্রসীমা UNCLOS III এর ৩, ১৫ ধারা অনুযায়ী পূর্বে বাংলাদেশের ছেঁড়া দ্বীপ ও মিয়ানমারের ওয়েস্টার দ্বীপের মাঝামাঝি তটরেখা থেকে সমদূরত্ব ধরে এগুবে। এ রেখা ৩৩ ধারা অনুযায়ী সন্নিহিত অঞ্চলসহ ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হবে, তবে দুই দেশের নদীসমূহের বাহিত পলির বিভাজন রেখা অতিক্রম করবে না। অতএব এ রেখা ৭৬.৩, ৭৬.৪ ও ৭৬.৫ ধারা অনুযায়ী দুই দেশের নদীসমূহের বাহিত পলির বিভাজন রেখা বা ৯২°১৫´ দ্রাঘিমা বরাবর বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণমুখী যে খাড়ি আছে সেই খাড়ি ধরে এগিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে যাবে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা পশ্চিম ও পূর্বদিকে উপরে বর্ণিত দুই রেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে কুয়াকাটা অথবা কক্সবাজার তটরেখা থেকে সরাসরি ৩৫০ নটিক্যাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত হবে, অথবা দূর সমুদ্রে ২৫০০ মিটার গভীরতা থেকে বাহিরের দিকে ১০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত হবে। তবে এ রেখা পাশ্ববর্তী দেশের নদীসমূহের পলির দ্বারা গঠিত প্রাকৃতিকভাবে প্রসারমান সমুদ্রতলকে অন্তর্ভুক্ত করবে না, বা বিভাজন রেখা অতিক্রম করবে না।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ : 'সমুদ্রসীমা নির্ধারণ পদ্ধতি' ছিল বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধের মূল দিক। বাংলাদেশের দাবি ছিল 'ন্যায্যতা' বা Equity পদ্ধতিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হবে। অন্যদিকে মিয়ানমারের দাবি ছিল সমদূরত্ব বা Equidistance পদ্ধতিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হবে। পদ্ধতিগত এ জটিলতায় সমুদ্রসীমা নিয়ে দুই দেশের দুই রকম দাবি পরিলক্ষিত হতো। যেমন—

মিয়ানমারের দাবি ছিল বাংলাদেশ সাগর এলাকা পাবে ১৩০ নটিক্যাল মাইল। তাই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমুদ্র এলাকা (ইইজেড) পাবে না, সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চলে বাংলাদেশের কোনো অংশ থাকবে না, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র সাগর এলাকা হবে ৬ নটিক্যাল মাইল।

অন্যদিকে বাংলাদেশের দাবি ছিল যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র এলাকা (ইইজেড) থাকবে এবং সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চলে নিরঙ্কুশ অধিকার থাকবে এছাড়া রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সাগর এলাকা হবে ১২ নটিক্যাল মাইল।

ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা বিরোধ : ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে পুরনো বিরোধ রয়েছে। একটি বিরোধের সূত্রপাত ঘটে দক্ষিণ তালপট্টি বা নিউমুর বা পূর্বাশা দ্বীপের অধিকার নিয়ে। ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসের পর হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় এ দ্বীপের জাগরণ ঘটে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত কতিপয় ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে দুটি ব্লক আমাদের সুন্দরবনের খুবই কাছে এবং ভারতীয় ব্লক ডি-২২ ও ডি-২৩ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে পড়ে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মিয়ানমারের মতো ভারতও 'লো ওয়াটার' বেসলাইনকে মানদণ্ড হিসেবে ধরতে চায়। আর বাংলাদেশ এক্ষেত্রে 'স্টেইট বেসলাইন'কে মানদণ্ড ধরতে চায়, কারণ যেহেতু ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা একটি জটিল অঞ্চল সেখানে লো ওয়াটার বেসলাইনে সমস্যা সমাধান অনেকটাই অসম্ভব। অনেকগুলো নদী সীমান্ত এলাকা হয়ে সাগরে পড়েছে সেক্ষেত্রে লো ওয়াটার বেসলাইন হিসাব করে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সম্ভব নয়।

ভারত ও মিয়ানমারের মতোই 'সমদূরত্ব' পদ্ধতিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করতে চায় যেখানে বাংলাদেশ সমতার ভিত্তিতে এ সীমা চিহ্নিত করতে চায়। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীর হিসেবে যদি ভারত-বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সীমারেখা চিহ্নিত হয় তাহলে বাংলাদেশ অনেকটাই ভারত ও মিয়ানমারের সমুদ্রাঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে। তবে সম্প্রতি মিয়ানমারের সাথে সমতার ভিত্তিতেই ITLOS এ সংক্রান্ত মামলার রায় দিয়েছে। বাংলাদেশের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ মীমাংসা না করেই ভারত গভীর সমুদ্রাঞ্চলে তার তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণক্ষেত্র ব্লকের নাম ঘোষণা দিয়েছে।

মিয়ানমারের মতো ভারতও বিতর্কিত অঞ্চলে খনিজ অনুসন্ধান শুরু করে, যার জবাবে বাংলাদেশও বিতর্কিত অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের ব্যাপারে কনকোফিলিপসের সাথে একটি চুক্তি করে। পরে এ দুটি দেশই তাদের এ ধরনের উদ্যোগ প্রত্যাহারে একমত হয়। অবশেষে বাংলাদেশ বিরোধ নিরসনে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়।

বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার মহীসোপান সমস্যা : বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার-এর বর্ধিত মহীসোপান সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি জাতিসংঘ মহীসোপান কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। মিয়ানমার ২০০৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ভারত ২০০৯ সালের ১১ মে এবং বাংলাদেশ ২০১১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তাদের স্ব স্ব দাবিনামা জমা দিয়েছে। বাংলাদেশের দাবিনামায় সাগরের সীমানা নির্ধারণের সূচনাবিন্দু থেকে ৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকায় বাংলাদেশের মালিকানা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ঐ অবস্থানপত্রে বলা হয়, মহীসোপানে বাংলাদেশের মালিকানা সাগরের ২১ লাখ ৭২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার সমান। কিন্তু ২০১১ সালের ৩১ মার্চ জাতিসংঘে এক আপত্তিপত্রে মিয়ানমার দাবি করে, ২০০ নটিক্যাল মাইলের পর মহীসোপানে বাংলাদেশের কোনো অধিকার নেই। ভারতও ২০ জুন ২০১১ এ বিষয়ে জাতিসংঘে আপত্তিপত্র দেয়। মহীসোপানে বাংলাদেশের সীমানার এ দাবি নিয়ে জাতিসংঘে ২০১১ সালের আগস্ট মাসে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি : ভারত ও মিয়ানমারের সাথে ৩৫ বছরে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করেও সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে না পেরে ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর বাংলাদেশ বিষয়টি আন্তর্জাতিক সালিশে নিয়ে যায়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারত ও

মিয়ানমারকে সালিশের নোটিশ দেয়া হয়। সালিশে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির নোটিশ পাওয়ার পর ভারত ও মিয়ানমার তা গ্রহণ করে নোটিশের জবাবও দেয়। কিন্তু তারপর বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমার সালিশ থেকে বিষয়টি প্রত্যাহার করে ITLOS-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রস্তাব করে। সে অনুযায়ী ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর সমঝোতার ভিত্তিতে ITLOS-এ মামলা করে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ। এরপর ২০১০ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশ এবং ঐ বছরই ১ ডিসেম্বর মিয়ানমার নিজেদের দাবির পক্ষে নথিপত্র জমা দেয়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুই দফায় শুনানি হয়। প্রথম দফায় বাংলাদেশের মৌখিক শুনানি ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। আর ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মিয়ানমারের বক্তব্য শোনে ট্রাইব্যুনাল। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় আবারো বাংলাদেশ তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে। মিয়ানমার ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় তার বক্তব্য তুলে ধরে। এরপর আদালত ২০১২ সালের ১৪ মার্চ চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ সংক্রান্ত মামলার রায় : মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে ১৯৭৪ সালে আলোচনায় একটা অগ্রগতি ঘটে। সে সময় ১২ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার মতৈক্যে পৌঁছে। তবে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি হয়নি। এরপর ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে সাত-আটবার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯৮৬ সালের পর ২২ বছর সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমারের সাথে আর কোনো আলোচনা হয়নি। এরপর নতুন করে আলোচনা শুরু হয় ২০০৮ সালে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। সমুদ্রসীমা নিয়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ঢাকায় এবং ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ইয়াঙ্গুনে দুই দেশের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক হয়। এসব বৈঠকে নাফ নদী ও তার মোহনা সীমানা নির্বিশেষে বিঘ্নহীনভাবে ব্যবহারে সম্মত হয় বাংলাদেশ ও মিয়ানমার। এছাড়া উভয় দেশ ১৯৭৪ সালের এডহক সম্মতিপত্র অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌসীমানা সংক্রান্ত দুদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা স্পষ্টকরণে সক্ষম হয়। তবে সামুদ্রিক সীমারেখার ব্যাপারে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে মতবিরোধ থেকেই যায়। মিয়ানমার সমদূরত্ব (equidistance) পদ্ধতিতে পূর্ব-পশ্চিমে এবং বাংলাদেশ সমতা (equity) ভিত্তিতে উত্তর-দক্ষিণে এ রেখা টানতে চায়। উপকূলের কোন পয়েন্ট থেকে সীমা নির্ধারণের কাজ শুরু হবে তা নিয়ে মিয়ানমারের বাংলাদেশের সাথে আলোচনা চলতে থাকে। একই বিষয় নিয়ে ভারতের সাথেও ২০০৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বৈঠক শুরু হয় বাংলাদেশের। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি।

১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS) সমুদ্রসীমা নিরসনে মিয়ানমারের দাবি 'সমদূরত্ব পদ্ধতি' ও বাংলাদেশের দাবি 'ন্যায্যতা পদ্ধতি-কে বিচার-বিশ্লেষণ করে ন্যায্যতা পদ্ধতি (Equitable Principle) অনুযায়ী রায় ঘোষণা করেন। ফলে বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা দাবিতে জয়ী হয়। এ রায়ের মাধ্যমে তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ পেল—

- ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ);
- ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea);
- EEZ-এর পরে বর্ধিত মহীসোপানে নিরঙ্কুশ অধিকারের বৈধতা;
- সমুদ্রবক্ষে তেল গ্যাসসহ সম্পদ আহরণের অধিকারসহ;
- গভীর সাগরে ও সমুদ্র তলদেশের সম্পদে অধিকার।

ইটলস-এর রায়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৪১৩ কিমি এবং মিয়ানমারের ৫৮৭ কিমি, যার আনুপাতিক হার ১ ঃ ১.৪২। সে অনুযায়ী সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের প্রাপ্য ১,১১,৬৩১ বর্গকিমি এবং মিয়ানমার পাবে ১,৭১,৮৩২ বর্গকিমি। বাংলাদেশের প্রাপ্য এ সমুদ্রসীমা যেন আরেকটি বাংলাদেশ। কেননা বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি। এছাড়াও সমুদ্রে অবস্থিত ২৮ ব্লকের ১৮টির মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের।

বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ সংক্রান্ত মামলার রায় : ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আলোচনা শুরু হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হলেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় ৮ অক্টোবর ২০০৯ সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তিতে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের স্থায়ী সালিশি আদালতে (Permanent Court of Arbitration-PCA) আবেদন করে বাংলাদেশ। ৯-১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ স্থায়ী সালিশি আদালতে মামলার চূড়ান্ত শুনানি হয়। শুনানি শেষ হওয়ার পর ৬ মাসের মধ্যে রায় ঘোষণার কথা জানায় PCA। ৭ জুলাই ২০১৪ নিষ্পত্তি হয় বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ। ১৪ মার্চ ২০১২ মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছিল। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রায়ের ফলে বাংলাদেশ এক বিপুল অঞ্চলে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। রায় অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ পাবে ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার আর ভারত পাবে ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এ রায়ের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ১৪ মার্চ ২০১২ মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির পর ৭ জুলাই ২০১৪ নিষ্পত্তি হয় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ। বঙ্গোপসাগরে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে চলা সমুদ্রসীমা নিয়ে এ বিরোধের অবসান ঘটায় বাংলাদেশ এখন লাভ করেছে একটি স্থায়ী সমুদ্রসীমা, যার আয়তন ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রায়ের ফলে বাংলাদেশ এক বিপুল অঞ্চলে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। রায় অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ পায় ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার আর ভারত পায় ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এ রায়ের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পায়।

০৭। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন পর্যালোচনা করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য করণীয় আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দুটি দেশ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার। দুটি দেশই এক সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। মিয়ানমার ও বাংলাদেশ যথাক্রমে ১৯৪৮ ও ১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশ দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক সরকারের অধীনে থাকলেও তারা তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিরবন্ধু বা চিরশত্রু বলে কোনো কথা নেই; এ নীতির অনুসরণেই বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে কিছু কিছু বিষয়ে সম্পর্কের টানাপোড়েন বর্তমান, যা উভয় দেশের জন্য জাতীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমার : বাংলাদেশের সাথে যে দুটি দেশের সীমানা রয়েছে তার মধ্যে মিয়ানমার অন্যতম। যেদিন থেকে মিয়ানমার বাংলাদেশকে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় (১৩ জানুয়ারি ১৯৭২) সেদিন থেকেই বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্কের সূচনা হয়। একচল্লিশ বছরের ইতিহাসে নিকটতম অন্যতম প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এ পর্যন্ত বিনিয়োগ, সমুদ্র ও আকাশ, পর্যটন, যোগাযোগ, মুদ্রা বিনিময় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। বাংলাদেশ মিয়ানমার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক গড়ে না ওঠার অন্যতম কারণ হলো মিয়ানমারের চীন ঘেঁসা পররাষ্ট্রনীতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত ও চীনের সাথে মিয়ানমারের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠাতে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক গড়ে না ওঠা বা সম্পর্কের টানাপোড়েনের মূলে যে ইস্যুগুলো কার্যকর সেগুলো নিচে আলোচিত হলো :

১. **রোহিঙ্গা সমস্যা :** রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। পরবাসেও আশ্রয়দাতার গলার কাঁটা। বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় দমনাভিযানের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। রোহিঙ্গারা পূর্বতন বার্মা, অধুনা মিয়ানমারের রাখাইন (আরাকান) মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আরাকানি মুসলিমরা সেখানে হাজার বছর ধরে বসবাস করে এলেও বাংলাভাষী ও মুসলিম হওয়ার কারণে তারা (রোহিঙ্গারা) মিয়ানমার সরকার ও নাগরিকের কাছে 'বিদেশি', 'বাঙালি' বা 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত।

   ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার জাপানিদের দখলে ছিল এবং সে সময় কমপক্ষে ২০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে তৎকালীন বাংলায় চলে আসে, তাদের এ যাত্রা এখনো থামেনি। ১৯৭৮ সালের মে মাসের মধ্যে কমপক্ষে ২,০০,০০০ রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

   সর্বশেষ ৩ জুন ২০১২ মিয়ানমারে পুনরায় রোহিঙ্গা নিধন শুরু হয়। প্রাণভয়ে রোহিঙ্গারা নাফ নদী দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশের কক্সবাজার সীমান্তে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী পুনরায় রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠায়। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। এদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন লোকের বাস; তার উপর যদি রোহিঙ্গারা এদেশে এভাবে আসতেই থাকে তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাপ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দেখা দিবে অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংকট, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, চোরাচালান সর্বোপরি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হবে। এ রোহিঙ্গা সমস্যাই বাংলাদেশ ও মিয়ামনার সম্পর্কের টানাপোড়েনের অন্যতম কারণ।

২. **স্থলসীমা বিরোধ ও সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসন :** বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থল সীমানা রয়েছে এবং সমুদ্রসীমা নিয়ে ছিল দীর্ঘ দিনের বিরোধ। ১৯৯১ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার রেজুপাড়া সীমান্ত এলাকায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে তিন জোয়ানকে হত্যা করে এবং বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে নেয়। এ বিরোধ আরও তুঙ্গে ওঠে যখন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দুই দেশের সংরক্ষিত এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ শুরু করে এবং সীমান্তের সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে থাকে। সতর্কতাস্বরূপ বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীও তাদের সীমানায় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংযতনীতি অবলম্বনের ফলে তখন বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশ মিয়ানমার স্থল সীমানায় যে ধরনের অনৈতিক কার্যক্রম প্রতিনিয়তই সংঘটিত হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমানা মাদক চোরাচালানের অন্যতম রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ অস্ত্রের কেনা-বেচা হয়, যার অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়ে।
- কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এই দুই দেশের সীমানা ব্যবহৃত হয়।
- মিয়ানমার থেকে অবৈধভাবে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সহজেই সীমানা পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

এসব বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নিয়েও ছিল দীর্ঘ দিনের বিরোধ। বাংলাদেশ সমুদ্রে নির্ধারিত ২৮টি ব্লকে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করলেও মিয়ানমার ও ভারতের অব্যাহত মালিকানা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এতদিন কর্মপন্থা প্রয়োগ করা যায়নি। অবশেষে ১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইনবিষক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসন হয়। রায় অনুযায়ী সমুদ্রে বাংলাদেশের ১,১১,৬৩১ বর্গকিমি সীমানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় : বাংলাদেশ ও মিয়ানমার হলো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দুটি দেশ। তাছাড়া দুই দেশেরই রয়েছে গভীর সমুদ্রসীমা। সুতরাং দেশ দুটি যদি তাদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে তবে তারা খুব দ্রুতই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। দেশ দুটির সম্পর্ক উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে :

- মিয়ানমার তার উদ্বৃত্ত জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি করতে পারে।
- দুই দেশের সীমানায় অবৈধ অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান বন্ধ করতে হবে।
- বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রস বর্ডার লিংকরোড নির্মাণ করতে হবে।
- চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশে বিনিয়োগ সুবিধা বাড়াতে হবে।
- বাংলাদেশ আসিয়ান (ASEAN) এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মিয়ানমারের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারে।
- সার্কের (SAARC)-এর সহায়তায় উভয় দেশ বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে হবে।
- মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্ব দান করতে পারে।
- রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে পারে।
- সর্বোপরি উভয় দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতি রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের আবির্ভাবের পশ্চাতে রয়েছে সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস। এ দুটি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্ব ব্যবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মিয়ানমার সফর দুটি দেশের জনগণের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুবাতাস বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

০৮ ▮ দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট রয়েছে। এ সঙ্কট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার কোনো ভূমিকা আছে কি? আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জনসংখ্যা, জাতীয় আয়, দারিদ্র্যসীমা, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন দিক থেকে বৈচিত্র্যময় হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাময় অঞ্চল। এ অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান বাধা হচ্ছে অপর্যাপ্ত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ। এ সঙ্কট মানুষের (খাদ্য, জীবিকা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক দিক) এবং জাতীয় নিরাপত্তার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তদুপরি উৎপাদন

কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ পরিবেশের উপর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কটের বিরূপ প্রভাব সীমাহীন। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ যা প্রায় ১.৭৫ বিলিয়ন লোক দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে, যা জ্বালানি ও বিদ্যুতের জন্য একটি বিশাল বাজার। মাথাপিছু জ্বালানি ভোগের মধ্যে পৃথিবীর মোট চার ভাগের এক ভাগ দক্ষিণ এশিয়ায় ভোগ হয়। অপরদিকে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনে পৃথিবীর গড় আটভাগের মাত্র এক ভাগের মতো এখানে উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ (২০%), মালদ্বীপ (১০০%) জ্বালানি আমদানি নির্ভর দেশ। উপরন্তু, আগামী ১৫ বছরে জ্বালানি চাহিদা বর্তমানের থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। এর পিছনে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সবার নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছানোসহ আরোও অনেক কারণ। অপরদিকে, জ্বালানির উচ্চমূল্য, সরকার এবং আমলাতান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয়ের জন্য এদের সরবরাহ চাহিদা বৃদ্ধির সাথে তাল মেলাতে পারছে না। এর ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে দিন দিন জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান ও ইরান। ইরান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত সব দেশেই কমবেশি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **জ্বালানি পরিস্থিতি :** জ্বালানির উৎস মূলত প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তেল ইত্যাদি। জ্বালানির এ উৎসসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থা উল্লেখ করা হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** সিআইএর ওয়ার্ল্ড ফেক্টবুক তথ্যমতে, বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের যে মজুদ আছে এর পরিমাণ প্রায় ১৯৫ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার। গ্যাস মজুদের দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ৪৬তম। কিন্তু আমাদের সরকার যে হিসাব দিয়ে থাকে, তা খুবই কম। অথবা পরিমাণটা কমিয়ে দেখানো হয়। একসময় বলা হতো বাংলাদেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে। বাংলাদেশের কোনো সরকারই গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও অবকাঠামো তৈরির কাজে গুরুত্ব দেয়নি। জাতীয় সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টিকে অবহেলা করা হয়েছে।
অন্যদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোতেও রয়েছে চাহিদার তুলনায় তীব্র গ্যাস সঙ্কট। এসব দেশ গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নানা কৌশল গ্রহণ করেও বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। যেমন শান্তির পাইপ লাইন নামে খ্যাত ইরান-পাকিস্তান-ইন্ডিয়া (IPI) পাইপ লাইনের ব্যাপারে ভারত ২০০৮ সালে সম্মত হলেও মার্কিন চাপে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

২. **কয়লা :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী, কয়লা সম্পদে বাংলাদেশের অবস্থান ৪১তম। মজুদের পরিমাণ ৩২৩ মিলিয়ন টন। সরকারের দাবি অবশ্য ২.৭ বিলিয়ন টন। আমরা এটা উত্তোলন এবং ব্যবহার করছি না বললেই চলে। কী পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হবে, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। শেষমেশ প্রধানমন্ত্রী একটা জনপ্রিয় ঘোষণা দিলেন, 'পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কয়লা রেখে যাওয়া হবে।' কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় মতৈক্য গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ এই সরকার গ্রহণ করতে পারল না। এ সুযোগে আরও বেশি জ্বালানি তেল আমদানি হবে, হবে আরও কমিশন-বাণিজ্য।
বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতেও রয়েছে কয়লা সম্পদের স্বল্পতা। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, এসব দেশে সামান্য পরিমাণে যে কয়লা সম্পদ রয়েছে বা উত্তোলনের সম্ভাবনা রয়েছে তাও কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩. **তেল :** তেল সম্পদে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্বল। বর্তমান উত্তোলনযোগ্য মজুদ ২৮ মিলিয়ন ব্যারেল। সুতরাং এর ওপর নির্ভর করে বেশি দূর এগোনো যাবে না। ইরান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো তেল সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। এসব দেশ উৎপাদন, মজুদ ও রপ্তানির দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর উপর। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো নানা শর্তারোপ করে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রচুর টাকা।

খ. **বিদ্যুৎ পরিস্থিতি :** যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩৮০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশের উপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলো, যেখানে জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা নিকট ভবিষ্যতে প্রায় অসম্ভব, সেসব দ্বীপের মানুষের জীবনযাত্রা আমূল পাল্টে দেয়া সম্ভব; যদি আমরা সৌরবিদ্যুতের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে পারি। কিন্তু আমরা এই সম্ভাবনার এক ভগ্নাংশও ব্যবহার করছি না। নবায়নযোগ্য জ্বালানির আরেকটি বড় উৎস হলো জলবিদ্যুৎ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ তৈরির সম্ভাবনা ১ হাজার ৯৮৭ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদনক্ষমতা হচ্ছে সর্বোচ্চ ২৩০ মেগাওয়াট (১২ শতাংশ)। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নেপালে ৯০ হাজার থেকে ৯৫ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। ভুটানের জল ও বায়ু ব্যবহার করে আরো ৩০ হাজার থেকে ৩৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। অথচ এ অঞ্চলে মোট বিদ্যুতের চাহিদার বিপরীতে ঘাটতির পরিমাণ ৩০ হাজার মেগাওয়াটের একটু বেশি, যা ভুটান থেকে উৎপাদন করেই মেটানো সম্ভব।

ভারতে প্রতিদিনকার এক লাখ ১০ হাজার মেগাওয়াটের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদিত হচ্ছে ৯৫ হাজার মেগাওয়াট। প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি মাথায় নিয়ে ভারত সুপার পাওয়ার অর্জনে মরিয়া। বাংলাদেশের চাহিদা ছয় হাজার থেকে সাড়ে ছয় হাজার কোনো কোনো দিন সর্বোচ্চ সাত হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু উৎপন্ন হচ্ছে গড়ে সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট। ঘাটতি ১০০০ থেকে ১৫০০ মেগাওয়াট। নেপালে দৈনিক বিদ্যুৎ প্রয়োজন ৭০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট। কিন্তু উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৬০০ মেগাওয়াট। ঘাটতি ১০০ থেকে ৪০০ মেগাওয়াট। ভুটানের দৈনন্দিন বিদ্যুতের পরিমাণ ৪ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার। কিন্তু উৎপাদিত হচ্ছে সাড়ে ৩ হাজার মেগাওয়াট। ঘাটতি ৫০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট। শ্রীলংকার বিদ্যুতের চেহারা এ অঞ্চলে সবচেয়ে আশাপ্রদ। শ্রীলংকার প্রতিদিনকার চাহিদা ২০০০ মেগাওয়াট। আর উৎপাদিত হচ্ছে এর চেয়েও বেশি। পাকিস্তানে বিদ্যুতের নিত্যদিনকার চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট। কিন্তু উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ১৫ থেকে ১৬ হাজার মেগাওয়াট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীলংকা ছাড়া মোটামুটি প্রায় সবদেশেই বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎস : দক্ষিণ এশিয়ার একেক দেশের মধ্যে একেক রকমের জ্বালানি উৎস রয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে প্রচুর গ্যাস ও কয়লা রয়েছে। অপরদিকে ভারত, নেপাল এবং ভুটানের রয়েছে পানি শক্তি (সম্পদ)। এর মধ্যে ভারত ও নেপালের বর্তমানে উৎপাদিত পানি বিদ্যুতের দ্বারা আগামী ৩০ বছরের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে। উপরন্তু, প্রত্যেক দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির রয়েছে অপ্রতুলতা (পর্যাপ্ততা)। উপরোক্ত সম্পদের যথপোযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সহযোগিতার ভিত্তিতে জ্বালানি ও বিদ্যুতের এই সংকট নিরসন করা সম্ভব।

দক্ষিণ এশিয়ায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার ভূমিকা আছে কিনা : দক্ষিণ এশিয়ায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার ব্যাপক ভূমিকা আছে। এ আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনে নিম্নোক্ত উপায়ে ভূমিকা পালন করতে পারে :

১. **CBM গঠন :** দক্ষিণ এশিয়ায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে বহুজাতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকরী Confidence Building Measure (CBM) গঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত সুবিধা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণ হিসেবে শীতকালে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎ অন্য দেশে রফতানি করা যায়। আবার নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সেবার পরিধি বিস্তৃতির সাথে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। এর ফলে খানাপ্রতি বার্ষিক গড় আয় বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে কেরোসিনের আমদানি ব্যয় কমার ফলে ১৩.৯৫ বিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাচানো সম্ভব হবে। সেচের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ উপকৃত হবে।

২. **দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা :** দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে এক দেশ আরেক দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ আমদানি-রফতানি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নেপালের পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ থেকে ৫৯২২ MU ভারতে রফতানি করে। আবার ভারত ১০০ MU নেপালে রফতানি করে। দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সহযোগিতাকে অন্যান্য দেশের সাথে বৃদ্ধি করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কট নিরসন সম্ভব। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিকভাবে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে কমপক্ষে ৫০০ MW বিদ্যুৎ আমদানি-রফতানির চুক্তি করে যা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনে ভূমিকা রাখবে।

৩. **তৃতীয় দেশের মাধ্যমে :** যে কোনো দুই দেশ তাদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ আমদানি-রফতানির জন্য অন্য দেশের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। এটি হতে পারে ভূখণ্ড ব্যবহার থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। এর ফলে ঘাটতি মোকাবিলায় তৃতীয় দেশ আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের মাধ্যমে গ্যাস আমদানি-রফতানির ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ২০০৫ সালে সম্পাদন করে। এই চুক্তিতে ভারত-মিয়ানমার থেকে গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে আমদানি করবে। অপরদিকে বাংলাদেশ নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করার ক্ষেত্রে ভারতের সাথে একই রকমের চুক্তি করতে পারে যা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হিসাবে গণ্য হবে এবং সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

৪. **আঞ্চলিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পুল :** অন্যান্য অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ায়ও আঞ্চলিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পুল গঠন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা-কানাডা পাওয়ার পুল, দক্ষিণ আফ্রিকার পাওয়ার পুল, নরদপুল (ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন) ইত্যাদি পুলের সফলতা দক্ষিণ এশিয়ায় জ্বালানি ও বিদ্যুতের জন্য পুল গঠনে উৎসাহিত করে যা এই সঙ্কট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৫. **সার্ক ঘোষণা বাস্তবায়ন :** সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সার্ক সম্মেলনে যেসব ঘোষণা করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেও দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যমান জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসন করা সম্ভব। নিচে এরূপ কিছু ঘোষণা উল্লেখ করা হলো :

ক. **ইসলামাবাদ ঘোষণা ২০০৪ :** জ্বালানি রিং-এর ধারণা প্রবর্তন।

খ. **ঢাকা ঘোষণা ২০০৫ :** সার্ক অঞ্চলে জ্বালানি উৎস এবং এর বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য সার্ক জ্বালানিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

গ. কলম্বো শীর্ষ সম্মেলন ২০০৮ :

১. জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার জন্য আঞ্চলিক আন্ত-সরকার ধারণার প্রবর্তন।
২. ২০০৯ সালে জ্বালানি মন্ত্রীবর্গের সম্মেলন।
৩. জ্বালানি রিং গঠন এবং খাতভিত্তিক গ্রুপ গঠন (উদাহরণস্বরূপ– গ্যাস, বিদ্যুৎ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি)।

ঘ. থিম্পু সম্মেলন ২০১০ :

১. জ্বালানি বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইসলামাবাদের সার্ক জ্বালানি সেন্টারকে দায়িত্ব দেয়া।
২. ভারতের সার্ক বিদ্যুৎ মার্কেটের উন্নয়নের জন্য একটি রোড ম্যাপ তৈরির প্রস্তাব।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের দেশসমূহের তুলনায় দারিদ্র্যপীড়িত হলেও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় দেশ। পশ্চিমা কূটনৈতিক কূটকৌশল ও দেশীয় প্রযুক্তির অভাবে এসব সম্পদ উত্তোলন ও যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের কার্যক্রমকে জোরদার করে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসন করতে পারে।

০৯ ▌ দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক ব্যবসা ও তার নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের ফলে সভ্যতার চাকা অধিকতর গতিশীল হলেও কতিপয় সমস্যা সভ্যতার গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে আশঙ্কাজনকভাবে। এ সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাদক সমস্যা। মাদক সমস্যা সমসাময়িককালে বিশ্বমানবতার জন্য ভয়াবহতম অভিশাপ। মাদকের ধ্বংস ক্ষমতা পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী। কেননা মাদক বিশ্বসভ্যতার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নয়, সমগ্র বিশ্বকে তার বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতকে তিল তিল করে ধ্বংস করে চলেছে। মাদক মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে চলেছে। মাদকের কারণে মানুষের জানমাল ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অশুভ প্রভাব রয়েছে মাদকের। মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ ব্যবসার ফলে বিশ্ব আজ সামাজিক অস্থিরতা ও অনাচারে জর্জরিত। জাতিসংঘ প্রকাশিত এক তথ্যে বলা হয়েছে, এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মিয়ানমার হচ্ছে বিশ্বের ২০টি প্রধান মাদক পরিবহন বা অবৈধ মাদক উৎপাদন দেশের কেন্দ্রস্থল। জাতিসংঘ প্রকাশিত অপর এক রিপোর্টে আরো বলা হয়, "Identifying the trafficking of heroine from…. though smugglers use South Asia mainly as a transit point in the process, it stimulates the illicit market in South Asia–leading to more abuse."

দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক ব্যবসা : বর্তমান বিশ্বে বছরে যে পরিমাণ হেরোইন ও আফিম উৎপাদিত হয় তার পাইকারি বাজার দর যথাক্রমে প্রায় ৫৫ এবং ৭ থেকে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দুটো মিলিয়ে বাজার দর বার্ষিক প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলার। এ অঙ্ক অনেক দেশের বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশি। মূলত পৃথিবীর তিনটি অঞ্চলে আফিম উৎপাদন হয় : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (প্রধানত মিয়ানমার), দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকা (মেক্সিকো ও কলম্বিয়া)। এশিয়ায় আফিম ক্রয় বেশি হয়। কেননা এশিয়ায় আফিমের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এশিয়ার এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বছরে প্রায় ১৮

মেট্রিক টন হেরোইন ক্রয় করে। গত শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে আফিম শক্তিশালী হেরোইনে রূপ নিয়েছে। ইরান, পাকিস্তান ও ভারতের মতো দেশে আফিম নিজের একটি বড় বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এশিয়ার মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওসকে হেরোইন ব্যবসার 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' বলা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় যত আফিম আসে তার প্রধান সরবরাহকারী মিয়ানমার। কিছু অংশ সরবরাহ করে লাওস। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার কিছু কিছু দেশে আফিম চাষ হয় বলে অনুমান করা হয়। এসব দেশে যে মিয়ানমার ও লাওস থেকে আফিম আসে তার বেশকিছু প্রমাণ মিলেছে। দেশ দুটি মিলে ২০০৮ সালে ৪০ মেট্রিক টন হেরোইন তৈরি করেছে, যার পুরোটাই মিয়ানমারে রিফাইন করা। মিয়ানমারে উৎপাদিত প্রায় ৪০ মেট্রিক টন (বার্ষিক) হেরোইনের ৪ ভাগের এক ভাগ স্থানীয় ও আঞ্চলিক (প্রধানত চীন) বাজারে যায়। বাকিটা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মহাসাগরীয় দেশগুলোতে।

এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি আফিম উৎপাদন করে মিয়ানমারের হেরোইন ব্যবসায়ীরা। ১৯৭০-৮০ সালের দিকে মিয়ানমার ছিল বিশ্বের প্রধান আফিম উৎপাদক দেশ। মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লওসের আফিম থাইল্যান্ড থেকে সমুদ্রপথে হংকং অথবা তাইওয়ানে পৌঁছায়। সেখানে আফিম হেরোইনে রূপান্তরিত হয়। সেখান থেকে জাহাজে করে যায় যুক্তরাষ্ট্রে। চীনে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের আফিম পাচার হয় এবং হেরোইনে রূপান্তর হয়। চীনা ব্যবসায়ীদের আফিম ক্রয়ের পরিমাণ অনেক কমে এসেছে। তবু বছরে প্রায় ১২ মেট্রিক টন আফিম ক্রয় করে। চীনে প্রায় ২২ লাখ হেরোইনসেবী রয়েছে। চীনে ২০০৮ সালে প্রায় ৪৫ মেট্রিক টন হেরোইন ঢুকেছে। চীনের সিংহভাগ হেরোইন আসে মিয়ানমার ও আফগানিস্তান থেকে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় মাদক বিরোধী শক্ত আইন থাকা সত্ত্বেও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের হেরোইন দেশ দুটোতে সহজেই ঢুকে পড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হেরোইন চাহিদার প্রায় অর্ধেকই পূরণ করত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। তিনটি দেশকে একত্রে হেরোইন ব্যবসার 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' বলা হয়। যদিও বিশ্বের প্রধান হেরোইন উৎপাদক দেশ ইরানে সম্প্রতি হেরোইন ক্রয়ের হার কমেছে। ধারণা করা হয়, গোল্ডেন ক্রিসেন্টের সিংহভাগ হেরোইন এখন সমুদ্রপথে ইউরোপে যায় এবং কিছু অংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কারণে পাকিস্তান আফিম চাষ বন্ধ করতে দৃশ্যত অনেকাংশেই সফল হয়েছে। তারপরও চীন, উপসাগরীয় দেশ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকান দেশগুলোতে হেরোইন পাচারের জন্য পাকিস্তানি বন্দরগুলো বিশেষত করাচি প্রধান ভূমিকা রাখছে। শুধু করাচি থেকেই বছরে ১১ মেট্রিক টন হেরোইন সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাচার হয়। পাকিস্তান প্রায় ২৫ মেট্রিক টন হেরোইন পাঠায় এশিয়ার অন্যান্য দেশে। ২০০৬ সালের তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানে প্রায় ৫ লাখ হেরোইন আসক্ত রয়েছে। ২০০৮ সালে করাচিতে ১৯ মেট্রিক টন হেরোইন এবং বছরে ৮০ মেট্রিক টন আফিম ঢোকে। গোল্ডেন ক্রিসেন্টের আরেক সদস্য ইরানও আফিম চাষ রোধে পদক্ষেপ নিয়েছে। ইরানের মাদক ব্যবসায়ীরা এখন আফগানিস্তান থেকে হেরোইন আমদানি করে। দেশটি এখন বছরে প্রায় ৪৫০ মেট্রিক টন আফিম কেনে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় উৎপাদিত আফিম সমুদ্র পথে তুরস্কে যায়। সেখানকার গোপন গবেষণাগারে আফিম হেরোইনে রূপান্তরিত হয়। এশিয়ায় উৎপাদিত প্রায় শতভাগ হেরোইন তুরস্ক হয়ে বলকান রুট দিয়ে ইউরোপে পৌঁছায়। বুলকান রুটের উত্তরের শাখাপথ দিয়ে হেরোইন রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লাভাকিয়া পৌঁছে। ২০১০ সালে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দপ্তর তাদের প্রতিবেদনে জানায়, বলকান রুট হলো হেরোইন পাচারের প্রধান ট্রানজিট, যার ওপর দিয়ে অন্যস্থানে পৌঁছানো যায়। সম্প্রতি দেখা গেছে, বিশ্বে যে পরিমাণ হেরোইন বিক্রি হয় তার প্রায় অর্ধেকের ক্রেতা ইউরোপ ও

রাশিয়া। এ অঞ্চলদ্বয়ে প্রধানত আফগান থেকে হেরোইন আসে। ইউরোপের দেশগুলো বছরে ৮৫ থেকে ৯০ মেট্রিক টন হেরোইন কেনে। এর মধ্যে ক্রয়ের দিক থেকে ৪টি দেশ শীর্ষে—ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানি। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার হেরোইন রাশিয়ার জন্য এক বিরাট সমস্যা। রুশ মাদক ব্যবসায়ীরা মধ্য এশিয়ার পথ ব্যবহার করে রাশিয়া ও ইউরোপে হেরোইন পাচার করে থাকে। রাশিয়া বছরে ৫৮ মেট্রিক টন আফিম এবং ৭০ মেট্রিক টন হেরোইন কেনে। কাজাখস্তান রাশিয়ায় হেরোইন প্রবেশের গেটওয়ে হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক তথ্যমতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেরোইনের সিংহভাগই আসে লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো ও কলম্বিয়া থেকে এবং বাকিটা আসে ইউরোপ ও আফ্রিকা হয়ে আফগানিস্তান থেকে। খুব বেশি পিছিয়ে নেই অস্ট্রেলিয়াও। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বছরে ১.৮ মেট্রিক টন হেরোইন ক্রয় করে। যার পুরোটাই আসে আফগানিস্তান ও মিয়ানমার থেকে।

২০১০ সালে জাতিসংঘের বরাত দিয়ে দি টাইমস অব ইন্ডিয়া প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্য ভারতে ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার হেক্টর জমিতে আফিম চাষ করা হচ্ছে। ২০০৮ সালে ভারতে মোট ১৭ মেট্রিক টন হেরোইন ঢুকেছে, কিন্তু এখন প্রতি বছর দেশটিতে ৬৫ থেকে ৭০ মেট্রিক টন আফিম ঢুকছে। ভারতে এখন সীমিত আকারে হেরোইন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ভারতে আফগানিস্তান থেকে আফিম আসে না এবং ভারতের প্রতিবেশী দেশ যেমন– বাংলাদেশ ও নেপালে আফিম ক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে। শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে– ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিপ্লবীরাও সম্ভবত এ আফিম ও হেরোইন ব্যবসায় লাভবান হয়। নাইজেরিয়া আফিম কিংবা হেরোইন উৎপাদক নয়। কিন্তু এ দেশটি হেরোইন স্থানান্তরের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। আফ্রিকা প্রসঙ্গে জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১২ লাখ আফ্রিকান হেরোইন সেবীর জন্য বছরে ২৫ মেট্রিক টন হেরোইন প্রয়োজন হয়। এর সিংহভাগ চাহিদা পূরণ করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া হয়ে আফগান হেরোইন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পৌঁছায়। আফ্রিকায় প্রধান হেরোইন সরবরাহকারী দেশ পাকিস্তান। পাকিস্তান আফ্রিকায় বছরে ২০ মেট্রিক টন হেরোইন পাচার করে। আফগান হেরোইনের প্রধান অংশ পাকিস্তান হয়েই আফ্রিকায় পৌঁছায়।

ইএসসিএপি মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে হেরোইন সেবীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপে হেরোইন পাচারের জন্য বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তান থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে, ভারত থেকে বাণিজ্যিক মোটরযান ও ট্রেনের মাধ্যমে এবং মিয়ানমার থেকে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ট্রাক ও পাবলিক পরিবহনের মাধ্যমে বাংলাদেশে হেরোইন প্রবেশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জনবল এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে দেশটিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন হতে পারছে না। আরো বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ হেরোইন অন্যান্য দেশের উদ্দেশ্যে পাচার হয় এবং বাকি হেরোইন বেরিয়ে যায় সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দিয়ে। এছাড়া বাংলাদেশের কুরিয়ার সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও হেরোইন পাচারের সাথে সম্পৃক্ত। নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকাতে সীমিত আকারে আফিম চাষ হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলগুলোর বাজার ধরে রেখেছে মিয়ানমার ও আফগানিস্তানের সরবরাহকারীরা। বাংলাদেশ হেরোইনের একটি ট্রানজিট পয়েন্ট। বাংলাদেশের বন, পাহাড়ি অঞ্চল এবং এদেশসহ মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের মাছের ট্রলারগুলো বাংলাদেশে হেরোইন পাচারের নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ভারত ও মিয়ানমারের রুট ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসায়ী ও মাফিয়ারা বাংলাদেশকে রুট হিসেবে বেছে নিয়েছে।

আফগানিস্তানে আফিমের কাঁচামাল পপিকে হেরোইন ও মরফিনে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানি ক্রমেই বাড়ছে, আর এসব আমদানি করছে মাদক চোরাচালানকারীরা। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, তারা এসব রাসায়নিক দ্রব্যাদি নতুন পথে চোরাচালান করছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি চোরাচালান ও ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার প্রধান স্থানান্তরিত নতুন রুট হলো পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা। বিগত বছরগুলোতে আফগানিস্তানের পপি চাষের এলাকা শতকরা ২২ ভাগ কমিয়ে আনা সত্ত্বেও আফগানিস্তান এখনো বিশ্বের মধ্যে আফিম উৎপাদনে শীর্ষে। ঐতিহাসিকভাবে চোরাচালানিরা আফগানিস্তানে উৎপাদিত কাঁচা আফিম বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে তা হেরোইন ও অন্যান্য আফিম জাতীয় মাদকে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফগানিস্তান পরিশোধিত পণ্যের একটা বড় উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মাদক চোরাচালানিরা সব ধরনের মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে। এর মধ্যে আছে অপরিশোধিত আফিম, আধা পরিশোধিত মরফিন ও পরিশোধিত হেরোইন। পপি চাষ কম হলে তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে অর্থনীতি ও নিরাপত্তার বিষয়। আফগানিস্তানে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ে আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, চোরাচালানিরা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটাতে পরিশোধন কার্যক্রম বিস্তৃত করতে চায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন আফগানিস্তানে মাদক উৎপাদন মোকাবিলা করার জন্য এর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। জর্জ বুশের কার্যকালের অধিকাংশ সময় মাদক ব্যবসা উচ্ছেদের দিকে জোর তৎপরতা ছিল। এর ফলে মাদকদ্রব্য বোঝাই জাহাজ ও চোরাচালানিদের গ্রেফতারের ঘটনা বেড়ে যায়। এখন জোর দেয়া হচ্ছে পপির বদলে অন্য ধরনের শস্য উৎপাদনের ওপর। এর ফলে পপি চাষের ওপর নির্ভরশীল কৃষকরা জীবনধারণের জন্য অন্য শস্য উৎপাদন করার সুযোগ পাবে। আফগানিস্তানের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, আফিম ও হাশিস পাচারের পথ হলো পাকিস্তান। আফগানিস্তানে গত বছর হেরোইনের রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্বের আফিম উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদন করে। এর মূল্য ২৮০ কোটি মার্কিন ডলার।

মাদকদ্রব্য সেবন যে কোনো মূল্যবোধের দিক থেকে ঘৃণিত হলেও সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ মাদক সেবন, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি কাজে জড়িত বিধায় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বিশ্ববিবেকের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জিং সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। মাদকদ্রব্যের বিষাক্ত নেশায় নেশাগ্রস্ত বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ। ফলে এ মরণ নেশা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে লাখ লাখ মানব সন্তানের। মাদকদ্রব্যে আসক্তির কারণে রোগাক্রান্ত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। সমাজে জন্ম নিচ্ছে নানা অপরাধ, গড়ে উঠেছে বৈশ্বিক ও রাষ্ট্রীয় অপরাধের বলয়। এসব অপরাধ বলয় কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী তৈরি হচ্ছে মাফিয়া চক্র। এদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। ফলে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের বিপরীতে মাদক সম্রাটরাও তাদের অপতৎপরতা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। তাই মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও তার বিস্তার সারা বিশ্বের জন্য এক বিশাল ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও বিস্তার রোধে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল স্তরে সর্বাত্মক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০ ▌ ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর শেষে ঘোষিত যৌথ ইশতেহার-এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এরপর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? *[৩১তম বিসিএস]*

***অথবা,* ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ও ভারতের অর্থমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে দু দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।**

উত্তর : ১০-১৩ জানুয়ারি ২০১০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি চুক্তি এবং দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ছাড়াও দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠককালে পারস্পরিক সম্পর্কিত সব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অমীমাংসিত বিষয়ের সন্তোষজনক সমাধানের পথ নির্দেশনা তৈরি করেছে। অন্যদিকে ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার এক ঝটিকা সফরে ৭ আগস্ট ২০১০ বিকালে ঢাকা পৌঁছে রাতেই আবার ফিরে যান। বহুল আলোচিত ও প্রত্যাশিত এ সফরের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া ইতিবাচক প্রয়াসগুলোকে অগ্রসর করতে পারলে নিকটতম প্রতিবেশী দেশটির সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর : শান্তিপূর্ণ ও দারিদ্র্যমুক্ত দক্ষিণ এশিয়া গঠনের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারত সফর করেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরকালীন এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কিছু কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১১ জানুয়ারি : রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয় ☐ ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসএম কৃষ্ণা এবং বিরোধীদলীয় নেতা সুষমা স্বরাজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করেন ☐ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ☐ কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী।

১২ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথাক্রমে শান্তিবান, শক্তিস্থল ও বীরভূমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ☐ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরালের সাথে বৈঠক করেন ☐ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেন ☐ রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সাথে বৈঠক করেন।

১৩ জানুয়ারি : আজমীর শরীফে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির (র) মাজার জিয়ারত ☐ দেশের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন।

স্বাক্ষরিত তিন চুক্তি : প্রধানমন্ত্রীর আলোচিত এ সফরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিনটি বিষয়ে চুক্তি এবং দুটি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরে ৫০ দফার যৌথ ঘোষণা। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত এ তিনটি চুক্তিতে নিজ নিজ দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব সোবহান সিকদার ও ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব জি কে পিলাই।

১. **সাজাপ্রাপ্ত বন্দি হস্তান্তর চুক্তি :** এ চুক্তির আওতায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা নিজ নিজ দেশে সামাজিক পুনর্বাসনের সুযোগ পাবেন ☐ ফৌজদারি অপরাধের কারণে দণ্ডিত ও সাজাপ্রাপ্তরা নিজ দেশে সাজা ভোগ করার সুযোগ পাবেন ☐ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী চুক্তিভুক্ত দেশে হস্তান্তর হলেও সেখানে তাকে অবশিষ্ট সাজা ভোগ করতে হবে ☐ দণ্ডপ্রাপ্ত নাগরিক নিজ দেশে ফিরতে নিজে বা আইনগত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারের কাছে বন্দি হিসেবে হস্তান্তর হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ বন্দি হস্তান্তরের শর্ত হলো আবেদনকারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে এ সুযোগ পাবেন না, বিচারের রায় চূড়ান্ত হতে হবে এবং যে অপরাধে ঐ নাগরিক দণ্ডিত তা উভয় দেশে দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

২. **আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিরোধ, সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং অবৈধ মাদক পাচার রোধ চুক্তি :** এ চুক্তির আওতায় কোনো সন্ত্রাসীচক্র ও তাদের সহযোগীরা দু'দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালালে এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা ব্যবহার করলে দু'দেশ সাধারণ ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করতে পারবে ☐ মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার সংক্রান্ত অপরাধ ও অপরাধ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের নমুনা বিনিময় করবে দু'দেশ।

৩. **ফৌজদারি অপরাধ বিষয়ে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতা চুক্তি :** এ চুক্তি অনুযায়ী ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কিত সমন জারি, গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল, অনুসন্ধান, সন্ত্রাস সনাক্তকরণ, বাধা দান, অপরাধ সংক্রান্ত প্রাপ্ত দলিলপত্র জব্দ ও বাজেয়াপ্তকরণ বিষয়ক অপরাধ দমন এবং ফৌজদারি বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে দু'দেশ। এ চুক্তির আওতায় সব অনুরোধ লিখিতভাবে করতে হবে। তবে জরুরি ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে অনুরোধ করা যাবে।

দু'সমঝোতা স্মারক : সফরে বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বিষয়ক দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নিজ নিজ দেশের পক্ষে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সচিব আবুল কালাম আজাদ ও ভারতীয় বিদ্যুৎ সচিব এইচ এস ব্রহ্ম বিদ্যুৎ সহযোগিতাসংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচিসংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন পররাষ্ট্র সচিব মিজারুল কায়েস ও ভারতের সাংস্কৃতিক সচিব জওহর সরকার।

ভারতের অর্থমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর : ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার এক ঝটিকা সফরে ৭ আগস্ট ২০১০ বিকালে ঢাকা পৌঁছে রাতেই আবার ফিরে যান। এ সময় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১. **ঋণ সহায়তা চুক্তি :** বাংলাদেশ-ভারত একশ কোটি ডলার বা সাত হাজার কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৭ আগস্ট ২০১০। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ভারতের এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিসিএ রঙ্গনাথন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ও বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ড. আবুল মাল আব্দুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। স্বাক্ষরিত একশ কোটি ডলার ঋণের বিপরীতে ১.৭৫ শতাংশ হারে সুদ, কমিটমেন্ট ফি নামে অতিরিক্ত সুদ এবং খেলাপি হলে ২ শতাংশ হারে জরিমানা দিতে হবে। ২০ বছর মেয়াদি এ ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থ হলে সুদের দ্বিগুণ জরিমানা গুনতে হবে। এছাড়া শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে বার্ষিক ফি'র অতিরিক্ত ০.৫০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। চুক্তিতে সব ধরনের পণ্য ও সেবা ভারত থেকে সরবরাহের কথা বলা হয়েছে।

২. **বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি :** ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির অবকাঠামো নির্মাণের অংশ হিসেবে দুই দেশের মধ্যে ৩৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ সঞ্চালনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৬ জুলাই ২০১০। বাংলাদেশের পক্ষে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) সচিব আজিজুল ইসলাম এবং ভারতের পক্ষে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের (পিজিসিআইএল) নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্যিক) অরুণ কুমার চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির জন্য পিজিসিআইএল পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সহসঞ্চালন লাইন তৈরি করবে। এ লাইনে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য দাম (হুইলিং চার্জ) নির্ধারণ করবে ভারতের কেন্দ্রীয় এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন। লাইনটির বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরুর দিন থেকে এ দাম কার্যকর হবে। পিডিবি মাসিক ভিত্তিতে এ দাম পরিশোধ করবে। পরিশোধে ৬০ দিনের বেশি বিলম্ব হলে তা জরিমানাসহ পরিশোধ করতে হবে।

যৌথ ঘোষণা : ১১ জানুয়ারি ২০১০ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ড. মনমোহন সিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকের একদিন পর ১২ জানুয়ারি ২০১০ সন্ত্রাসবাদ দমন, ট্রানজিট, সীমান্ত বিরোধ ও ব্যবস্থাপনা, পানিবণ্টন, বাণিজ্যবৈষম্য বিলোপ এবং বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত ৫০ দফা যৌথ ঘোষণা দেয়া হয়। এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো :

- টিপাইমুখ প্রকল্পে বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো পদক্ষেপ নেবে না ভারত।
- তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে মার্চ মাসের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে জেআরসি বৈঠক।
- ভারতে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের অধিকার পাবে বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে ভারতের সম্মতি।
- রেলওয়ে উন্নয়নে বাংলাদেশকে এককালীন ১০০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা দান।
- ৩০০ বাংলাদেশীকে শিক্ষা বৃত্তি দিবে ভারত।
- দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও তিনবিঘা করিডোরে ফ্লাইওভার নির্মাণ।
- ভুটান ও নেপালের পণ্যবাহী ট্রাক জিরো পয়েন্ট থেকে বাংলাবান্ধা-ফুলবাড়ী সীমান্ত স্থলবন্দরে ২০০ মিটার পর্যন্ত আসবে।
- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারবে ভারত।
- ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপন।
- দু'দেশ একে অন্যের সমুদ্র, রেল ও সড়কপথ ব্যবহার করবে।
- নেপাল ও ভুটানে ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশকে ভারতের সীমান্ত ব্যবহারের সম্মতি।
- বাংলাদেশের আশুগঞ্জ ও ভারতের শিলঘাট বন্দরকে 'পোর্ট অব কল' ঘোষণা।
- দু'দেশের সীমানাসংক্রান্ত অমীমাংসিত সমস্যা ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আলোকে সমাধান।
- রহনপুর-সিঙ্গাবাদ ব্রডগেজ রেল যোগাযোগ চালুর বিষয়ে ঐকমত্য।
- ইছামতী নদী খনন এবং মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিখ, আত্রাই, ধরলা ও ফেনী নদীর তীর সুরক্ষায় পদক্ষেপ।
- বিএসটিআইয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতের সহায়তা ঘোষণা।
- সাবরুম-রামগড় এবং দেমাগিরি-থেগামুখ স্থল শুল্ক স্টেশন সক্রিয়করণ।
- ২০১১-১২ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য পদ লাভে ভারতকে বাংলাদেশ এবং ২০১৬-১৭ সালে একই পদে বাংলাদেশকে ভারত সমর্থন জানাবে।

বাংলাদেশ-ভারত বহুমাত্রিক সম্পর্কের চার দশক : ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। এ বহুমাত্রিক সম্পর্কের সূচনা ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। এ দিন ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। সেই থেকে দীর্ঘ চার দশকে বহুমাত্রিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনের নিরীখে এ দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসংখ্য চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষর হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

চুক্তি-প্রটোকল-সমঝোতা স্মারক	স্বাক্ষরের তারিখ	মেয়াদ (বছরে)
মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি	১৯ মার্চ ১৯৭২	২৫
বাণিজ্য চুক্তি	২৮ মার্চ ১৯৭২ (পুনঃস্বাক্ষর-১৯৮০, ১৯৮৮) ২০০৬ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)	১ এপ্রিল ২০০৯- ৩১ মার্চ ২০১২ —
অভ্যন্তরীণ নৌ ট্রানজিট ও বাণিজ্য প্রটোকল	১১ নভেম্বর ১৯৭২ (নবায়ন-২৮ মার্চ ২০০৯)	১ মার্চ ২০০৯- ৩১ মার্চ ২০১১
সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি	৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২	অনির্দিষ্ট
ভূমি সীমানা নির্ধারণ চুক্তি	১৬ মে ১৯৭৪	অনির্দিষ্ট
১০০ মিলিয়ন রুপি ঋণ সহায়তা প্রটোকল	১৬ মে ১৯৭৪	—
বিমান যোগাযোগ চুক্তি	৪ মে ১৯৭৮	অনির্দিষ্ট
যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন চুক্তি	৭ অক্টোবর ১৯৮২	অনির্দিষ্ট
দ্বৈত কর পরিহার ও মুদ্রা পাচার রোধ চুক্তি	২৭ আগস্ট ১৯৯১	অনির্দিষ্ট
গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি	১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬	৩০
মোটরযান যাত্রী চলাচল নিয়ন্ত্রণ চুক্তি	১৭ জুন ১৯৯৯	অনির্দিষ্ট
ঢাকা-কলকাতা যাত্রীবাহী বাস পরিচালনা প্রটোকল	১৭ জুন ১৯৯৯	প্রতি দু'বছরে নবায়নযোগ্য
বেনাপোল-পেট্রাপোল রেল যোগাযোগ চুক্তি	৪ জুলাই ২০০০	২
ঢাকা-আগরতলা যাত্রীবাহী বাস পরিচালনা প্রটোকল	১০ জুলাই ২০০১	—
অবৈধ মাদকদ্রব্য পরিবহন প্রতিরোধ চুক্তি	২১ মার্চ ২০০৬	অনির্দিষ্ট
বিএসটিআই-ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্স সমঝোতা স্মারক	৬ জুন ২০০৭	অনির্দিষ্ট
বেসামরিক বিমান পরিবহন সমঝোতা স্মারক	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮	অনির্দিষ্ট
বিনিয়োগ নিরাপত্তা চুক্তি	৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯	১০
আন্তঃপরিবহন চুক্তি	৩১ মে ২০১০	—
বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি	২৬ জুলাই ২০১০	৩৫
ঋণ চুক্তি	৭ আগস্ট ২০১০	—
মাদক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ চুক্তি	২৪ মার্চ ২০১১	—
কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি	২৯ জানুয়ারি ২০১২	—
বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২	—

উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দুটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। সর্বশেষ ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন ও বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনে ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সমাধান হয় গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা। এছাড়া ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চার দশকব্যাপী বাংলাদেশ-ভারত বহুমাত্রিক সম্পর্কের মেলবন্ধন সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে অনেক অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে। তবে আশার কথা, প্রধানমন্ত্রীর এ সফরে দু'দেশের যৌথ ঘোষণায় সেসব অমীমাংসিত সমস্যা নিষ্পত্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে। যে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা দু'দেশের জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে বাংলাদেশ-ভারত পরস্পরের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ দু দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের দীর্ঘ ৩৮ বছরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সবার প্রত্যাশা—বিশ্বায়ন ও আন্তঃনির্ভরশীলতার এ যুগে নিকটতম প্রতিবেশী দেশ দুটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানব নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সহযোগিতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ও পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১১। 'ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি' দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক প্রতিযোগিতাকে কোন দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় (New World Order) সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত ও নব্য পরাশক্তি ভারতের মধ্যে অতি সম্প্রতি যে বহুল আলোচিত-সমালোচিত পরমাণু চুক্তি হয়েছে, সেটাকে বিশ্লেষকগণ দক্ষিণ এশিয়া তথা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং সার্ক (SAARC)-এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়া গত এক দশক জুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে, বিশেষত ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তান নতুন করে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা শুরু করার ফলেই। যদিও ভারত ১৯৭৪ সালেই পরমাণু শক্তির অধিকারী হয়, তবুও পাকিস্তান এটাকে কোনোরূপ হুমকি মনে করেনি। কিন্তু যখন ১৯৯৮ সালে রাজস্থানের পোখরানে ভারত নতুন করে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালাল এবং বিশ্বকে নতুন করে জানান দিল যে রাজস্থানের মরুভূমিতে অস্ত্র পরীক্ষার সাফল্যের মাধ্যমে ভারত এতদ্‌অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চায়, ঠিক সে সময়ে ভারতের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানও এ উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) সুসংহতকরণে বেলুচিস্তানের চাগাই পার্বত্য এলাকায় ভারতের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ১৯৯৮ সালেই পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালায়। তারপর থেকে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় কারগিল যুদ্ধসহ উভয় দেশেই নানারকম সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং চিরাচরিতভাবেই একে অপরকে পরস্পর দোষারোপ করে চলেছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) স্থাপিত হওয়ায় এ অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষ আণবিক যুদ্ধের দামামা এখন পর্যন্ত দেখেনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষ্যকারগণ সাম্প্রতিক সময়ের ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি'কে অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখছেন এবং মনে করছেন এ চুক্তি এতদ্‌অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে, যা পুরো অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার ওপর হুমকিস্বরূপ।

পরমাণু চুক্তি : আপাতদৃষ্টিতে পরমাণু চুক্তি বলতে এক ধরনের 'Military Nuclear Contract' বা সামরিক পরমাণু চুক্তি বোঝানো হলেও পরমাণু চুক্তি যে শুধু সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে হয় তা কিন্তু নয়। কেননা বেসামরিক উদ্দেশ্যে কোনো দেশ যখন তার ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণকল্পে 'International Atomic Energy Agency' (IAEA) অনুসৃত সকল শর্ত মেনে শুধু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন করে কিংবা অন্য কোনো দেশের নিকট হতে IAEA'র শর্তানুযায়ী সহায়তা নিয়ে থাকে, সেটাকেই বেসামরিক পরমাণু চুক্তি বা 'Non-Military Nuclear Contract' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো দুটি দেশ কিংবা কোনো আঞ্চলিক বন্ধুভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক দেশ জাতিসংঘের সকল নিয়মকানুন মেনে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, বেসামরিক ভিত্তিতে পারমাণবিক সহযোগিতামূলক কোনো চুক্তিতে সই করলে সেটাকেই পরমাণু চুক্তি বলা হয়। তবে এক্ষেত্রে জাতিসংঘ, IAEA ও বিশ্ব জনমতের সমর্থন থাকা বাঞ্ছনীয়।

আর সামরিক ক্ষেত্রে পরমাণু চুক্তি পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পুরো বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) ব্যবস্থাকে জোরদার করা হচ্ছে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠন করা হলেও এটা পুনঃস্থাপন ও শক্তিশালী করা হয় ১৯৭৮ সালে। এছাড়া পারমাণবিক মারণাস্ত্র উৎপাদন নিষিদ্ধ ও এর সামগ্রিক সংগ্রহ সীমিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই জাতিসংঘের উদ্যোগে 'NPT' বা 'Nuclear Non-Proliferation Treaty' নামক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্যাবলী হলো–

১. পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো হতে অপারমাণবিক দেশগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধকরণ;
২. পরমাণু ক্ষমতার অধিকারী দেশগুলোতে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা এবং
৩. বিশ্বের সকল দেশকেই তাদের পারমাণবিক প্রযুক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

এছাড়া ১৯৯৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫১তম অধিবেশনে 'Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty' (CTBT) বা 'সর্বাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি' নামক চুক্তিটি উত্থাপন করে এবং সাধারণ পরিষদে আলোচনার পর ১৫৮ ভোটে এর খসড়া অনুমোদন লাভ করে, যেখানে সকল ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পরমাণু চুক্তি মূলত সামরিক উদ্দেশ্যে নয়, বরং বেসামরিক উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে পরমাণু জ্বালানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই কোনো দেশ একক ভিত্তিতে কিংবা দ্বিপাক্ষিকভাবে অথবা বহুজাতিকভাবে সকল শর্ত মেনে সম্পাদন করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ও বিস্তার সবক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ সেহেতু যে কোনো পরমাণু চুক্তি হতে হবে অসামরিক ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পূর্বশর্ত।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি : যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের পরমাণু চুক্তিটি নানা চড়াই-উৎরাই পার করে গত ১০ অক্টোবর ২০০৮ সালে কার্যকর হয়। এর আগে প্রায় আড়াই বছর পূর্বে অর্থাৎ ২ মার্চ ২০০৬ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং 'ভারত-মার্কিন বেসামরিক পরমাণু চুক্তি' স্বাক্ষর করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ চুক্তি কার্যকরের মাধ্যমে ভারত কৌশলগতভাবে অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে উল্লেখ করে জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেন–

'ভারত যুক্তরাষ্ট্রের এক অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হয়েছে এবং দু'দেশ পারস্পরিক কৌশলগত সহযোগিতার এক অনন্য নজির স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে, যার ফলে বিশ্বসমাজে ভারতের প্রভাব ও অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী ও সুদৃঢ় হবে।'

এ চুক্তিটির নাম হলো 'ভারত-মার্কিন শান্তিপূর্ণ পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি'। এটি ১২৩ ধারা নামে পরিচিত এবং এর মেয়াদ ধরা হয়েছে ৪০ বছর, যা প্রতি ১০ বছর অন্তর নবায়ন করা যাবে। এ

পরমাণু চুক্তিটি কংগ্রেসে পাস হয়– "The United States And Indian Nuclear Co-operation Promotion Act of 2006" নামে। মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউজ অব রিপ্রেজেনটিভ (House of Representative)-এ H. R. 5682 ভার্সন নামে ৩৫৯-৬৮ ভোটে ২৬ জুলাই ২০০৬ তারিখে এর খসড়া অনুমোদন লাভ করে এবং মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে S. 3709 ভার্সন নামে ৮৫-১২ ভোটে ১৬ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে এটি প্রাথমিকভাবে অনুমোদন লাভ করে। তারপর প্রায় ২ বছরেরও অধিককাল ধরে পর্যালোচনার পর মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে 'The United States and Indian Nuclear Co-operation Promotion Act' নামক চুক্তিটির চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে সিনেটে পাঠায় এবং ৩ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে মার্কিন সিনেট ৮৬-১৩ ভোটে এ চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ৮ অক্টোবর ২০০৮ এ চুক্তিতে সই করেন, যার ফলে এটা আইনে পরিণত ও কার্যকরী হয়। এ উপলক্ষে ওয়াশিংটনের এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বুশ মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের ধন্যবাদ দেন এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন–

'এ চুক্তি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের পরমাণু বিস্তার রোধ প্রচেষ্টা আরো শক্তিশালী ও সুসংহত করবে।'

এরপর তৎকালীন মার্কিন 'Secretary of State' কন্ডোলিৎসা রাইস এ চুক্তিকে চূড়ান্তভাবে কার্যকর করার জন্য ২০০৯ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লি সফরে আসেন এবং উল্লেখ করেন–

'যুক্তরাষ্ট্র চায় ভারতের সাথে স্থায়ী মৈত্রীর সম্পর্ক, এ চুক্তি যার সূচনামাত্র।'

সর্বশেষ ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ IAEA'র সাথে বেসামরিক পরমাণু চুল্লী পরিদর্শন চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত। এর মাধ্যমেই ভারত-মার্কিন চুক্তি বাস্তবায়নের পথে সব ধরনের বাধা অপসারিত হয়।

এ চুক্তিটির কয়েকটি মৌলিক দিক রয়েছে। যথা–

ক. পরমাণু প্রযুক্তিকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা;
খ. শুধু অসামরিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণে সহায়তাকরণ;
গ. বেসামরিক প্রয়োজনে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ;
ঘ. পরমাণু সরঞ্জাম সহজেই বেচাকেনা করা যাবে;
ঙ. পরমাণু প্রযুক্তির উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
চ. ব্যাপকভিত্তিক পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন, মজুদ ও বিস্তার রোধকরণ।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ২৫-২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সফরের প্রথম দিন ২৫ জানুয়ারি মোদি-বারাক-এর মধ্যে বৈঠক শেষে ছয় বছর ধরে বাস্তবায়িত না হয়ে ঝুলে থাকা পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির প্রভাব-প্রেক্ষিত পাকিস্তান : ১৯৯৫ সালে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর এক সম্মেলনে ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত 'রারাতোঙ্গা চুক্তি (Raratonga Treaty)'র মতো সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এই অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি, মজুদ, পরীক্ষা ও পারমাণবিক বর্জ্য ফেলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়, যা 'ব্যাংকক চুক্তি' (Treaty of Bangkok, 1995) নামে পরিচিত। ব্যাংকক সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক দেশসমূহ নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারেও একমত হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পরমাণু অস্ত্রমুক্ত দক্ষিণ এশিয়া গড়ার প্রত্যয় থাকলেও ভারত একতরফাভাবে ১৯৯৮ সালের ১১ ও ১৩ মে রাজস্থান রাজ্যের পোখরান মরুভূমিতে বেশ কয়েকটি

পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের ২৮ মে পাকিস্তান তার বেলুচিস্তান প্রদেশের চাগাই পার্বত্যাঞ্চলে পাল্টা ব্যবস্থাস্বরূপ বেশ কয়েকটি পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল গড়ার (NWFZ) আশা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে।

১৯৭০ সালের ৫ মার্চ কার্যকর হতে যাওয়া 'Nuclear Non-Proliferation Treaty' বা NPT চুক্তিতে এ পর্যন্ত ১৯০টি দেশ স্বাক্ষর করেছে, যেখানে ৩টি দেশ– ভারত, পাকিস্তান ও ইসরাইল এতে স্বাক্ষর করেনি। উত্তর কোরিয়া এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে (২০০৩ সালে) নেয়। শুধু তাই নয়, উক্ত দেশগুলো 'Comprehensive Test Ban Treaty' বা CTBT-তেও স্বাক্ষর করেনি। পাকিস্তান ঐ সকল চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার কারণ হিসেবে শুধুমাত্র ভারতের স্বাক্ষর না করাকেই উল্লেখ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আঞ্চলিক শক্তিমত্তার ভারসাম্য সুরক্ষায় পাকিস্তানের যুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কেননা শুধু কাশ্মীর প্রশ্নেই এ দুটি দেশ এযাবৎ চারবারেরও বেশি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সে হিসাবে আঞ্চলিক শক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে জাহির করতে ভারত যেমন মরিয়া, তেমনি পাকিস্তানও তার নিজের সার্বভৌমত্ব ও শক্তিমত্তা সুরক্ষায় শক্তির ভারসাম্যকে (Balance of Power) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবে এটাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাধারণ প্রক্রিয়া। সে হিসেবে নতুন ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তি পাকিস্তানকেও তার পরমাণু ক্ষমতার প্রসারণ ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে তৎপর করবে, যার ফলে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এ উপমহাদেশে নতুন করে নব উদ্যমে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে বলে বিশ্লেষকগণ আশঙ্কা করছেন।

মার্কিন পরমাণু নীতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি ও পরমাণু নীতিতে এক ধরনের অদ্ভুত ও অনিয়মতান্ত্রিক ভাব লক্ষ করা গেছে যা নব্বইয়ের দশকে এসে 'Cold War' বা স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর আরো স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষত, যুক্তরাষ্ট্র 'NPT' বা 'CTBT' চুক্তিতে স্বাক্ষর ও অনুমোদন দানের জন্য বিশ্বের প্রায় সব দেশগুলোকে উৎসাহিতকরণ কিংবা চাপ প্রয়োগ করলেও মার্কিন কংগ্রেস কিন্তু 'CTBT' অনুমোদন করেনি। রাশিয়া ও চীন সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে যে, কেবল যুক্তরাষ্ট্র 'CTBT' অনুমোদন করলেই তারাও সেটার অনুমোদন দিবে। আসল কথা হলো, পরমাণু শক্তিধর উন্নত দেশগুলো নিজেদের কাছে থাকা ব্যাপক অস্ত্রসম্ভার ধ্বংস করার বা কমানোর কোনো উদ্যোগ না নিলেও অনুন্নত দেশগুলোকে NPT বা CTBT চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করিয়েছে, যা বিশ্বে কৌশলগত শান্তি প্রক্রিয়াকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এক্ষেত্রে ভারত-ব্রাজিলসহ অনেক জোট নিরপেক্ষ দেশ (NAM) এ সবকিছুর জন্য একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করে আসছে।

মার্কিন পরমাণু নীতির সবচেয়ে দুর্বলতম দিক হলো, ১৯৭৮ সালে মার্কিন কংগ্রেস যখন NPT মঞ্জুর করে, তখন তারা এই বলে ঘোষণা দেয়–"যেসব দেশ NPT সই বা অনুমোদন করেনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই ঐসব দেশে কোনোরকম পরমাণু সরঞ্জাম সরবরাহ, প্রযুক্তির যোগান কিংবা কোনোরূপ পারমাণবিক সহায়তা করবে না।" কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি ভারত তেমনই একটি দেশ যারা NPT বা CTBT কোনোটাই সই করেনি, তথাপি যুক্তরাষ্ট্র সেই ভারতকেই তার নতুন পরমাণু চুক্তির অংশীদার বানাল যা শুধু পাকিস্তান বা চীনকেই নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়াকে অশান্ত ও অগ্নিদগ্ধ করবে বলেই সকলে আশঙ্কা করছেন।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির প্রভাব-প্রেক্ষিত চীন : ২০০৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী পল ক্রুগম্যান তার এক নিবন্ধে চীনকে নবতর আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় (New International Economic Order) এক নতুন দুর্দান্ত পরাশক্তি হিসেবেই দেখিয়েছেন। তাই গণচীনের এ প্রবল উত্থান ও উদীয়মান

অর্থনৈতিক মহাশক্তি সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্ব যারপরনাই শঙ্কিত। আর তাই চীনের অগ্রযাত্রা ঠেকানো ও মুসলিম পরমাণু শক্তিধর দেশ পাকিস্তানকে দুর্বল করতে তথা এ অঞ্চলে মার্কিন একাধিপত্য কায়েম করতেই আজ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে তথাকথিত মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। চীনও বসে নেই। পশ্চিমা শক্তির সাথে তার দ্বন্দ্ব (Conflict) মোকাবিলা করতে সে মাও সে তুং-এর তত্ত্ব 'Lean to one side' থেকে সরে এসে তার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি উদারনৈতিক মুক্তবাজার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আর যার ফলে হংকংভিত্তিক নয়া অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আর এর ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পুরো মার্কিনবলয়। অন্যদিকে, তার সামরিক প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সামরিক বাজেট উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়েছে এবং রাশিয়া ও মধ্য এশীয় দেশগুলোকে নিয়ে নতুন সামরিক জোট 'সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' (SCO) গড়ে তুলেছে। আর এক্ষেত্রে তার পুরোনো বন্ধু পাকিস্তানকে পেলে 'ভারত-মার্কিন নীতি' মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। চীনের তিব্বত, কাশ্মীরের লাদাখ এবং সিকিম-অরুণাচল নিয়ে ভারতের সাথে সুস্পষ্ট বিরোধ রয়েছে। তাই ভারত-মার্কিন পরমাণু নীতি চীনকেও যে আরো কঠোর পারমাণবিক প্রতিযোগিতায় নিয়ে আসবে তা বলার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

মার্কিন নীতি মুসলিমবিদ্বেষী : ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় পাক প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ ইউসুফ রাজা গিলানি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একই রকম চুক্তি করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র স্যান ম্যান কোরোক তাৎক্ষণিকভাবে এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন— 'ইসলামাবাদের সাথে এরকম চুক্তির কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই। কারণ পাকিস্তানের ট্রাক-রেকর্ড ঠিক নেই। যুক্তরাষ্ট্র আপাতত পাকিস্তানের সাথে এতদ্অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায়-ই কাজ করতে অধিক আগ্রহী, অন্য কিছুতে নয়।'

এ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্র মূলত পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানকে কৌশলগতভাবে দুর্বল করতে ব্যস্ত। হান্টিংটনের 'The Clash of Civilization' বা 'সভ্যতার সংঘাততত্ত্ব' অর্থাৎ পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার দ্বন্দ্বই হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল এজেন্ডা বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে মুম্বাই হামলা ও গাজা সংকটই যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতীয় লোকসভার MP (Member of Parliament) সিতারাম ইয়েচুরিসহ পার্লামেন্টের বিরোধী দল ইন্দো-মার্কিন এ চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থই দেখবে, ভারতের নয়। মার্কিনীরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই ধ্বংস উপহার দিয়েছে। আজ সারাবিশ্বে যে আল-কায়েদা সন্ত্রাসী সংগঠনের কথা বলা হয়, এগুলো মার্কিনীদেরই সৃষ্টি। এ পরমাণু শক্তি ভারতের সামগ্রিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করবে। ভারতের উচিত আমেরিকা-ইসরাইল ঘেঁষা নীতি পরিত্যাগ করা।' আর তার এ মন্তব্যের কয়েক মাসের মধ্যেই মুম্বাই হামলার মতো ঘটনা ঘটেছে।

সম্প্রতি বাস্তবায়িত হওয়া 'The United States And Indian Nuclear Co-operation Promotion Act' সত্যিকারার্থেই সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে নজিরবিহীন পারমাণবিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করবে। 'Nuclear Suppliers Group' বা NSG ভারতের ওপর থেকে যে পরমাণু নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছে তা এতদঅঞ্চলে জটিল পরিস্থিতির-ই সৃষ্টি করবে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র 'হাইড অ্যাক্ট' এর কথা উল্লেখ করেছে, তথাপিও নির্দ্বিধায় বলা যায়– বেসামরিক পরমাণু চুক্তি হলেও এতদ্অঞ্চলে বিরাজ করছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধোন্মুখ জটিল পরিস্থিতি, যে কারণে এরকম পরমাণু চুক্তি পুরো অঞ্চলের জন্যই বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন সবাই।

১২। পাকিস্তান ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এবং বাংলাদেশের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উত্তর : পাকিস্তান এবং ভারতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেশ দুটির স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র দুটি ভূস্বর্গ কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পাকিস্তানের দখলে কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ এবং ভারতের দখলে কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছে। পাকিস্তানের অধিকৃত অংশ আজাদ কাশ্মীর এবং ভারতের অধিকৃত অংশ জম্মু ও কাশ্মীর নামে পরিচিত। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে চারবার পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং এর সীমান্ত রেখায় দু দেশের সেনারা সমরসজ্জায় রয়েছে। পাক-ভারত এ দ্বন্দ্বের ফলে নিজেদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে মনোযোগী না হয়ে সমরাস্ত্র তৈরি এবং ক্রয়ের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিশালী করতে চেয়েছে। তারা পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাশক্তি হতে পারেনি। অনেক পরে হলেও তারা বুঝতে পেরেছে যে, দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে নিজেদের এগিয়ে নিতে হবে।

বিশ্বে যে কয়টি আঞ্চলিক সীমান্ত সমস্যা রয়েছে পাক-ভারত সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। এসব ক্ষেত্রে পরাশক্তিগুলোর থাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব। পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে রয়েছে ব্যাপক প্রভাব।

পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র খুব জোরালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এজন্য দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ নীতি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক জোরদার করে। অপর দিকে পাকিস্তান ভারতের সাথে টেক্কা দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। তৎকালীন স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ অঞ্চলে নিজের মিত্র পাওয়ার জন্য মূলত যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে। সামরিক সাহায্যও দিতে চেয়েছিল, যা তৎকালীন আরেক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য সম্ভব হয়নি। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর বিশ্ব রাজনীতি ক্রমশই পরিবর্তিত হয়ে এককেন্দ্রিক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের দখলে চলে আসে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তান গুরুত্ব হারাতে থাকে। ১৯৯৮ সালে ভারত রাজস্থানের পোখরানের ভূগর্ভে ৫টি পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় এবং নিজেকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। এ ঘটনার কয়েকদিন পর পাকিস্তান বেলুচিস্তানের চাগাই মরুভূমিতে ৫টি এবং পরে ১টি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। এ পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশকে সাহায্য দেয়া বন্ধ করে।

কিন্তু ২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে হামলার পর বিশ্ব রাজনীতি অন্য মোড় নেয়। সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী আলকায়দার ঘাঁটি নামে পরিচিত আফগানিস্তানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানের হাত দিয়ে সোভিয়েত বাহিনী তাড়ানোর জন্য মুসলিম জঙ্গিবাদের বীজ বুনেছিল আফগানিস্তানে খোদ যুক্তরাষ্ট্রই। টুইন টাওয়ারে হামলার পর তালেবানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের কারণে পাকিস্তান প্রচণ্ড চাপে পড়ে তালেবানের পক্ষ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে অংশ নেয়। আর এর ফলে পাকিস্তানের উপর থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে সাহায্য প্রদান পুনরায় শুরু হয়। পারমাণবিক বোমা তৈরির ফর্মুলা ইরানে পাচার করার অভিযোগ এবং কাশ্মীরে মুসলিম জঙ্গিবাদকে সাহায্য ও সমর্থন করছে

বলে পাকিস্তানের ওপর অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে ভারতের সাথে সামরিক চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী জোটের সদস্য হিসেবে ভারত ও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রয়েছে। পাকিস্তানের ভেতরে ও বাইরে যে সন্ত্রাসবাদী অবস্থা তৈরি হয়েছে তা থেকে পাকিস্তানকে সামরিক, গোয়েন্দা এবং অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করছে যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া ভারত সব সময় কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনগুলোকে সাহায্য এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশের অভিযোগ করে আসছিল।

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে আরেক উদীয়মান পরাশক্তি চীনকে মোকাবিলার জন্য ভারতকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে চাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এজন্য ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে ১০ বছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের একমাত্র ভারতেরই রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে। এর অর্থ এত দিনের মিত্র পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় ভারত-চীন সম্পর্ক খুব বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, যতটা পাক-চীন সম্পর্ক রয়েছে।

পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা হলো নিজস্ব স্বার্থসংশ্লিষ্ট। তাই পাকিস্তান এবং ভারতকে বুঝতে হবে নিজেদের ভালো। ভারত কাশ্মির ইস্যুতে সব সময় তৃতীয় পক্ষকে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু আগামী বিশ্ব শুধু অস্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে না। তাই প্রতিবেশী দেশ দুটিকে আঞ্চলিক সংস্থা SAARC-এর মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক সব ধরনের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশ এক সময় অখণ্ড ভারত বা ভারতবর্ষের অংশ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তাই বাংলাদেশের অনেক কিছু করার আছে পাক-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সার্ক-এর উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু সার্ক ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাক-ভারত দ্বন্দ্ব এটাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

পাকিস্তান এবং ভারত উভয়ই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ এবং বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তাই বাংলাদেশ সব সময় কাশ্মীরসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য কথা বলেছে, চেষ্টা চালিয়েছে। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন সম্ভব। আর সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ প্রায়। তাই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এক না হতে পারলে এ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই পরাশক্তির তাবেদার হওয়ার চেয়ে নিজেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলে তবেই জনগণের মঙ্গল সাধিত হবে। আর এটাই দক্ষিণ এশিয়ার সকল জনগণের আশা।

১৩। ক. ট্রানজিট বলতে কি বোঝায়?

খ. ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ কি কি লাভ পেতে পারে এবং কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে?

গ. ভারত এই ট্রানজিটের ব্যাপারে এত আগ্রহ প্রকাশ করছে কেন?

উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরাজিত অসংখ্য ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা এবং বিবাদ-বিসংবাদের সাথে সম্প্রতি ট্রানজিট সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এ নতুন সমস্যাটির ইতিহাস বা সূচনা প্রায় ৫০ শতাব্দীর পুরনো, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের ইতিহাসের সাথেই জড়িত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পরই ভূ-রাজনৈতিক বা কৌশলগত বিবাদ-বিসংবাদ ও ট্রানজিট সমস্যার মতো সব জটিলতার জন্ম হয়েছে।

ট্রানজিট কি

ট্রানজিট একটি ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ 'পারাপার সুবিধা'। ট্রানজিট শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'Process of going or conveying across over or through.' ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডসমূহে লোক, যন্ত্রপাতি ও পণ্য পারাপারের সুবিধা লাভকেই ট্রানজিট বলা হয়েছে। এছাড়া বলা যায়, 'Transit facilities mean that India would use the territories of Bangladesh including Chittagong port for movement of men, machines and materials through specific routes by land to its seven eastern states.' এ ট্রানজিট সুবিধার আওতায় (চুক্তি বাস্তবায়িত হলে) ভারত তার পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য যেকোনো প্রদেশ থেকে মালামাল ও পণ্য বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর (চট্টগ্রাম ও মংলা), নৌপথ, রেলপথ এবং বিশেষভাবে স্থলপথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি বাংলাদেশের সার্বভৌম জমিনের ওপর দিয়ে শর্টকাট পন্থায় দ্রুত, লাভজনক, কৌশলগত ও সুবিধাজনকভাবে তার স্থল পরিবেষ্টিত বিচ্ছিন্নপ্রায় এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদপ্রবণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে সহজেই পারাপারের সুযোগ পাবে এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ লাভ করবে কিছুটা আর্থিক সুবিধা ৭০০-১০০০ কোটি টাকার ট্রানজিট ফি।

একটি দেশ এক বা একাধিক দেশকে তার ভূ-খণ্ডের মধ্য দিয়ে সড়ক, রেল, নৌ এবং বিমান পথে বাণিজ্য সামগ্রী বা যাতায়াতের সুবিধা প্রদানই হচ্ছে ট্রানজিট। সাধারণত জলপথ ও স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা হ্রাসে ট্রানজিট এর প্রয়োজন হয়। সে কারণে ট্রানজিট একধরনের অর্থনৈতিক বিষয় বা একধরনের বাণিজ্য। ট্রানজিট প্রাচীন ধারণা হলেও এর বাণিজ্যিক বাস্তবতা সাম্প্রতিক। এখানে রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র বড় একটা বিবেচনায় আসে না। পাক-ভারত সম্পর্ক খুব খারাপ হলেও এখনও পাকিস্তানের ট্রেন লাহোর হতে ভারতের অমৃতসর এবং অমৃতসর থেকে লাহোর যাতায়াত করছে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ভারতের ট্রানজিট সুবিধা অব্যাহত ছিল। তুরস্ক ইরাককে তার ভূমির উপর দিয়ে তেলের পাইপ বসিয়ে বিদেশে তেল বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে। এমনকি পাকিস্তান তার দেশের মধ্য দিয়ে ভারতকে ইরান থেকে তেল-গ্যাস আনার ট্রানজিট দিয়েছে।

বাংলাদেশের লাভ

বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য থেকে ট্রানজিটের ফলে বাংলাদেশ যেসব লাভ ও সুবিধা পাবে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো—

১. ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট স্থাপিত হলে ভারতকে যে ট্রানজিট সুবিধা দেবে তার বিনিময়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ বা ফি বাবদ বছরে ৭০০ থেকে ১,০০০ কোটি টাকা পাবে।

২. ধারণা করা হয়, ভারত ট্রানজিট সুবিধার বিনিময়ে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণে গঙ্গার পানি প্রবাহিত করতে হয়তো রাজি হবে।

৩. ট্রানজিটের জন্য ভারত বাংলাদেশের হাইওয়ে, রেলওয়ে ও বন্দরসমূহের নির্মাণ ও উন্নয়নে বিপুল বিনিয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ বিনা খরচে তার যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুকূল সুযোগ পাবে, যাতে দেশের শত শত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

৪. 'Centre for Policy Dialogue'-এর ৯৫-র কর্মশালায় বক্তাগণ ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট বিনিময়ের দ্বারা বাংলাদেশকেও নেপাল ও ভুটানের সাথে ট্রানজিট স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন, যা ভারত বহু আগে থেকেই অস্বীকার করে আসছে। জনাব রেহমান সোবহানসহ আরো অনেকের মতে, এমন ট্রানজিট চালু হলে (ভারত রাজি হলে) বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান আর্থিকভাবে দারুণ লাভবান হবে।

৫. একই কর্মশালার সুপারিশে ওই ট্রানজিটের বিনিময়ে বাংলাদেশকে সাপটা চুক্তির আওতায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যিক তৎপরতা বিস্তার করার কথা বলা হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশও লাভজনকভাবে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

৬. ট্রানজিট ব্যবস্থা চালু হলে বাংলাদেশে ভারতীয় চোরাকারবারজাত পণ্যের সরবরাহ বন্ধ করে বৈধ বাণিজ্যিক পণ্যের সরবরাহ বাড়বে এবং একই কারণে বাংলাদেশ এসব ভারতীয় পণ্যের ওপর আরোপিত ট্যারিফ বাবদ শত শত কোটি টাকা অর্থ লাভ করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের ক্ষতি

১. ট্রানজিট ব্যবস্থার আওতায় নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থায় যদি বাংলাদেশ মেঘালয়ের বিদ্যুৎ কিনে বাংলাদেশের গ্রিডে চালানোর উদ্যোগ নেয় এবং ভারত যদি দুদেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোয় সহযোগিতার অজুহাতে বাংলাদেশ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও নতুন আবিষ্কৃত কয়লা আমদানি করতে চায় তবে বাংলাদেশে শিল্পায়নের জ্বালানি খাতে নেমে আসবে এক রকম দুর্যোগ; ভবিষ্যৎ প্রজন্মও হবে মহামূল্যবান জ্বালানি সম্পদের ভবিষ্যৎ সঞ্চয় থেকে দারুণভাবে বঞ্চিত।

২. ট্রানজিটের আওতায় ভারতকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করলে বাংলাদেশের প্রধানতম বহির্বাণিজ্যের অপ্রতুল আয়োজন সম্পন্ন ও বন্দরটিকে বাংলাদেশের বিপুল প্রয়োজনে ব্যবহার করা থেকে বহুলাংশে ছাড় দিতে হবে। ভারত এ বন্দর ব্যবহারের সুযোগ লাভ করলে বাংলাদেশকে বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যদি ভারতের ট্রানজিটভুক্ত পণ্যাদি পারাপারে বিঘ্ন ঘটে অথবা কোনো নাশকতামূলক প্রচেষ্টার কারণে ওই সব পণ্য ও পথ ধ্বংস হয় তবে বাংলাদেশকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার জন্য দারুণ ক্ষতিকর হবে।

৪. ভারতকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে পণ্য পাঠাতে বর্তমানে বাধ্য হয়ে নিজ পণ্যের ওপর ট্যারিফ নির্ধারণ করতে হয়। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ওই সব রাজ্যে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্যাদি রপ্তানি করে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য সুবিধা লাভ করে থাকে, যা থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আয় হয়। কিন্তু ভারত ট্রানজিট সুবিধা পেলে এসব রাজ্যে বাংলাদেশ এ সুবিধা ও আয় থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ ভারতীয় সস্তা ও উন্নতমানের বিপুল পণ্য সহজ প্রবাহের ফলে বাংলাদেশের পণ্যাদি সহজেই প্রতিযোগিতায় মার খাবে।

৫. ট্রানজিট সুবিধা না থাকলে বাস্তব কারণে ভারতকে তার বহু মূল্যবান অথচ প্রয়োজনীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পণ্যসামগ্রী, যেমন– কাঠ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, চা, রাবার ইত্যাদি খুব কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করতে বাধ্য হতে হয়; যা বর্তমানে অনেকটা কার্যকর।

এসব বাণিজ্যিক ও আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ট্রানজিট ব্যবস্থা ভারতের জন্য অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের জন্য মোটেও লাভজনক হবে না।

ভারতের আগ্রহের কারণ

নিচে ভারতের ট্রানজিট প্রস্তাবের অর্থনৈতিক লাভালাভের চিত্র তুলে ধরা হলো—

১. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ, যা ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও অন্যান্য রাজ্যের শিল্পের বিকাশ ও ব্যবহারের অন্যতম উপাদান, তা পরিবহন ও স্থানান্তরের জন্য বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতের ট্রানজিট সুবিধা লাভ একান্ত প্রয়োজন।

২. ভারতের সীমান্তবর্তী সব জেলা ও রাজ্যগুলোতে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ চা-বাগান, কফি, রাবার, তেজপাতা, কমলালেবু, নাশপাতি আর নানা মূল্যবান ফল ও ভেষজ বৃক্ষের বাগান। ভারত ওই সব পণ্যের বিরাট অংশ বিদেশে রপ্তানি করে কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে। কিন্তু ওই অঞ্চলের সাথে সরাসরি কোনো সমুদ্রবন্দরের সংযোগ না থাকার ফলে ভারতকে এই অঞ্চলের রপ্তানি পণ্য দেড়-দুই হাজার মাইল পথ ঘুরিয়ে শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে পশ্চিমবেঙ্গর কলকাতা বন্দরে নিয়ে আসতে হয়। ফলে ভারতকে প্রতিবছর পাঁচ থেকে সাত হাজার কোটি রুপি অর্থ অতিরিক্ত ব্যয় কতে হয়। অথচ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এক হাজার কোটি রুপি ট্রানজিট ফি দিয়ে যদি শর্টকাট ট্রানজিট নিতে পারে তবে ভারত পরিবহন খাতে অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার কোটি রুপি সাশ্রয় করতে পারবে।

৩. ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পপ্রধান ও কৃষি উদ্বৃত্ত রাজ্যসমূহের সস্তা ও বহুল উৎপাদিত শিল্পজাত ও কৃষিজাত ব্যবহার্য পণ্যাদি (যেমন-খাদ্যদ্রব্য, বিনোদনসামগ্রী, ওষুধ ও যন্ত্রপাতি) আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের পার্বত্য, গ্রামীণ ও শহুরে জনপদে অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারলে তা হবে ভারতের জন্য এক ব্যাপক লাভজনক ব্যবসায়িক সাফল্য। কারণ ওই সব অঞ্চলে রয়েছে এক সম্ভাবনাময় বাজার। শুধু ট্রানজিটের অভাবে ভারত সুবিধা করতে পারছে না। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা লাভ করলে ভারত নিজ দেশের স্থানীয় পণ্য বাজারজাত করারও বিপুল সুবিধা পাবে।

৪. ভারতের সেভেন সিস্টারসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রয়েছে অত্যন্ত মূল্যবান কাঠের বৃক্ষ (যেমন-মেহগনি, শিশু, জারুল)। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন শহরে রয়েছে এসব কাঠের ব্যাপক চাহিদা। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আসাম, ত্রিপুরা বা অন্য অঞ্চলসমূহে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হলে শত শত কোটি টাকার কাঠ দ্রুততার সাথে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

৫. বাংলাদেশের সাথে ট্রানজিট চুক্তি সম্পাদিত হলে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এসব দূরবর্তী দীর্ঘ সংযোগ লাইনের (রেল, সড়ক, বিমান) ব্যয়বহুল রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন খাতের বিপুল বাজেট প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনতে পারবে। অপরপক্ষে বাংলাদেশে এর মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ (ফি ছাড়া) খরচ করতে হবে প্রতিবছর।

৬. বোড়ো, মণিপুরি ও উলফা বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের গুপ্ত হামলায় ও নাশকতামূলক আক্রমণে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার পণ্য নষ্ট হয়। ট্রানজিট সুবিধা ভারতকে ওই ভীতি ও আশঙ্কা থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দেবে।

৭. ট্রানজিট চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারত তার মালামাল ও পণ্য পারাপারের সুযোগ পেলে তখন স্বীয় দূরবর্তী ভূখণ্ডসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশে তার আরো বেশি ও জোরালো বাণিজ্যিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ ও সুবিধা পাবে, যেমন-সাপটা (SAPTA) চুক্তির মাধ্যমে এবং বিশ্ব মুক্ত অর্থনীতির সুযোগে ভারত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ১০০:৪ অনুপাতের বিপুল বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ট্রানজিট ব্যবস্থা চালু হলে বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশই সুবিধা পাবে। তবে এক্ষেত্রে ভারতের সুবিধা সিংহভাগ হবে। আর এজন্যই ভারত এ বিষয়ে অনেকটা আগ্রহ প্রদর্শন করছে। যদিও এ ব্যাপারে দুদেশের মধ্যেই আলোচনা অনেকটা এগিয়ে গেছে, তবুও শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে অগ্রসর হবে। পাশাপাশি দেশের স্বার্থ রক্ষারও চেষ্টা থাকতে হবে।

১৪। বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিন এবং এ মামলার রায় বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : বিগত ১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানির হামবুর্গস্থ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল তথা ইটলস কর্তৃক বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এ রায় কেবল বাংলাদেশের জন্যই নয়; বরং আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসেও একটি মাইলফলক। ঐতিহাসিক এ রায়ে অর্জিত বাংলাদেশের নতুন সমুদ্র সীমায় তেল-গ্যাসের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল ধারণা করছে।

মানব সভ্যতার বিবর্তনে সমুদ্র : সমুদ্র ঐতিহাসিক কাল থেকেই মানব সভ্যতার বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম ছাড়াও জানা-অজানা বিপুল সম্পদের আধার হিসেবেও সমুদ্র বরাবরই জাতিসমূহের বিরোধের কারণ হিসেবে পরিচিত থেকেছে। সমুদ্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং বিরোধের সম্ভাবনা সংকোচনের প্রয়াস দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে। এ প্রয়াসের সাফল্য হিসেবে ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন কনভেনশন তথা আনক্লস গৃহীত হয়। এর পূর্বেও রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক এ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সহায়তায় সমুদ্র এলাকা নিয়ে তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পন্ন করেছে এবং নিজস্ব সমুদ্র এলাকা সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে সমুদ্রসম্পদের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছে।

সমুদ্র সীমানা নির্ধারণে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী একটি দেশ; সে হিসেবে সমুদ্রে এদেশের জনগণের নানাবিধ স্বার্থ জড়িত। পরবর্তী পৃষ্ঠায় সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো :

১. **বিরোধ নিরসন :** বাংলাদেশ ছাড়াও বঙ্গোপসাগরে ভারত ও মিয়ানমারের অংশীদারিত্ব রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পূর্বে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত ছিল না। ফলে সমুদ্রের সীমা নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমারের বিরোধ ছিল এক অনিবার্য বাস্তবতা। এ বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যেই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল।

২. **সমুদ্রাঞ্চলে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা :** ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সম্মতির ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ ব্যতিরেকে সমুদ্রাঞ্চলে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল।

৩. **সমুদ্র সম্পদ আহরণ :** সীমানা নির্ধারিত না থাকার ফলে বিগত চার দশক যাবত বাংলাদেশের জনগণ সমুদ্রতলদেশের সম্পদ (যেমন– তেল, গ্যাস) আহরণে কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। এছাড়া সুনির্দিষ্ট সীমানার অভাবে এ দেশের জেলে সম্প্রদায় যেমন মৎস্য আহরণে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তেমনি আমাদের মৎস্য সম্পদ অন্য দেশের জেলেরা অবাধে শিকার করেছে। তাই বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ অধিক জরুরি ছিল।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : নিচে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো :

১. **বাংলাদেশ আঞ্চলিক পানি ও সমুদ্র অঞ্চল আইন প্রণয়ন :** বঙ্গোপসাগরে বহুমাত্রিক বিশাল সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে তৎকালীন মুজিব সরকার 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক পানি ও সমুদ্র

অঞ্চল আইন ১৯৭৪ (দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস এ্যান্ড মেরিটাইম জোনস এ্যাক্ট) প্রণয়ন করেন, যার মাধ্যমে একটি গভীরতা ভিত্তিক বেস লাইন নির্ধারণ, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা এবং কন্টিনেন্টাল মার্জিন পর্যন্ত মহীসোপান ঘোষণা করা হয়।

২. **সম্মত কার্যবিবরণী :** ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকায় সীমানা নির্ধারণে একটি 'সম্মত কার্যবিবরণী' গৃহীত হয়। উক্ত কার্যবিবরণী মোতাবেক বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ এবং মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সমদূরত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি সীমানারেখা অঙ্কন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কার্যবিবরণীটিকে আর চুক্তিতে রূপান্তর করা হয়নি।

৩. **শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগ :** বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সমুদ্র সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদি সমাধানের জন্যে তিনি তার প্রজ্ঞা দিয়ে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিগত সময়ে তার সরকার ২০০১ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের সমুদ্র আইন সম্পর্কিত কনভেনশন তথা আনক্লস-১৯৮২ অনুসমর্থন করে যা বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরে এদেশের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জাতিসংঘের মহীসোপান নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কিত কমিশনে (ইউএনসিএলসিএস) পেশ করতে সক্ষম হয়।

৪. **বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংকোচন :** সমদূরত্ব পদ্ধতিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমানা রেখা অঙ্কন করা হলে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের সীমানারেখাদ্বয় একটি ত্রিকোণাকৃতি সমুদ্রাঞ্চল তৈরি করে এবং বাংলাদেশকে ১৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে আবদ্ধ করে দেয়। ফলে ২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত এবং এর বাইরে মহীসোপান এলাকায় বাংলাদেশের প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৫. **পাল্টাপাল্টি প্রস্তাব :** বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংকোচনের কারণে আনক্লস ১৯৮২-এর অনুচ্ছেদ ৭৪ এবং ৮৩ অনুসরণে বঙ্গোপসাগরের অনুপম ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিষয়গুলো আমলে নিয়ে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে এটি সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সমদূরত্বের পরিবর্তে বিকল্প কোনো পদ্ধতি অনুসরণের জন্য সকল দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় প্রস্তাব রাখে। অপরদিকে, ভারত ও মিয়ানমার এই ধরনের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনতে অস্বীকার করে এবং 'কঠোর সমদূরত্ব প্রক্রিয়া' অনুসরণের ওপর তাদের প্রস্তাব অব্যাহত রাখে।

৬. **বাংলাদেশের মহীসোপান এলাকা দাবি ও বিভক্তিকরণ :** আনক্লসের ৭৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক জাতিসংঘের নিকট প্রদত্ত বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ২০০ নটিক্যাল মাইলের উর্ধ্বে বিশাল মহীসোপান এলাকায় নিজস্ব দাবি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। বাংলাদেশের স্বার্থ হুমকির মুখে পড়ে যখন ভারত ও মিয়ানমার জাতিসংঘের নিকট তাদের মহীসোপানের দাবি পেশ করে এবং উভয় দেশের দাবি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশ দুটি বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ২০০ মাইলের অনেক পূর্বেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে এই ধারণা থেকে বাংলাদেশের দাবিকৃত মহীসোপান এলাকা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়।

৭. **সালিশ নিষ্পত্তির নোটিশ :** সরকার দ্রুত গতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর আনক্লস-১৯৮২ এর অধীনে ভারত ও মিয়ানমারকে সালিশ-নিষ্পত্তির নোটিশ দেয়। উভয় প্রতিবেশী দেশ এই সালিশী প্রক্রিয়ার অনুকূলে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেয়। তবে আলোচনার দুয়ারও খোলা থাকে। সালিশ-নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের পর মিয়ানমারের প্রস্তাব ও বাংলাদেশের সম্মতিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার মামলাটি আনক্লস এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ও জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত স্থায়ী বিচারিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দি ল্রুল অফ দি সি (ইটলস) এ প্রেরণ করা হয়।

৮. **চূড়ান্ত রায় :** মামলায় লিখিত আরজি দাখিলের পর (বাংলাদেশের মেমোরিয়াল ও জবাব এবং মিয়ানমারের কাউন্টার মেমোরিয়াল ও প্রত্যুত্তর দেয়ার পর) ২০১১ সালের ৮ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর সমন্বিত ও দীর্ঘ মৌখিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত ও মৌখিক কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে (www.itlos.org) দেয়া হয়। চূড়ান্ত রায় দেয়া হয় ১৪ মার্চ ২০১২ সালে।

৯. **মামলায় বাংলাদেশের এজেন্ট :** পররাষ্ট্রমন্ত্রী (তৎকালীন) ডা. দীপু মনি, এম.পি. উক্ত মামলাসমূহে বাংলাদেশের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তিনি ডেপুটি এজেন্ট রিয়ার এডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম-সহ একটি উল্লেখযোগ্য লিগ্যাল টিমের নেতৃত্ব দেন, যাতে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যুক্তরাজ্যের জেমস ক্রফোর্ড, ফিলিপ স্যান্ডস ও অ্যালান বয়েল, যুক্তরাষ্ট্রের পর রাইখলার ও লরেন্স মার্টিন এবং কানাডার পায়াম আখাভান প্রমুখ।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে সমুদ্রসীমা বিভক্তিকরণ : বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্দিষ্ট করার জন্য একে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথমটি হচ্ছে ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি দুপক্ষের রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রের সীমা নির্ধারণ, দ্বিতীয়টি ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত তাদের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ করা। বাংলাদেশ তিনটি অংশেই সীমানা নির্ধারণের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করে। অপরদিকে মিয়ানমার ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করে। ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে মিয়ানমার ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে।

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়সমূহ : ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. **সমদূরত্ব পদ্ধতি মোতাবেক সমুদ্র সীমা নির্ধারণ :** আনক্লসের অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকায় ১৯৭৪ সালের সম্মত কার্যবিবরণী মোতাবেক অথবা সমদূরত্ব পদ্ধতি (বিশেষ অবস্থা বা ঐতিহাসিক স্বত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে) মোতাবেক সমুদ্র সীমা নির্ধারণ।

খ. **অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের ন্যায়পরতা ভিত্তিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণ :** আনক্লসের অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুযায়ী ২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানে ন্যায়পরতা নিশ্চিত করে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ। এক্ষেত্রে সাধারণত অস্থায়ী একটি সীমানারেখা অংকন করে ন্যায়পরতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ভৌগোলিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে তা পরিমার্জন করা হয়ে থাকে।

গ. **২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে আইনগত ভিত্তি আছে কিনা :** আনক্লস এর ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘের মহীসোপানের সীমা নির্ধারক কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের পূর্বে উক্ত এলাকায় সীমানা

নির্ধারণের এখতিয়ার রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ এবং বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে আদৌ সম্প্রসারিত করার আইনগত ভিত্তি রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ।

ঘ. **সম্প্রসারিত মহীসোপানের ন্যায়পরতা ভিত্তিক সীমা নির্ধারণ :** এখতিয়ার সংক্রান্ত আপত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে আনক্লসের অনুচ্ছেদ ৮৩ অনুযায়ী ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে সম্প্রসারিত মহীসোপানে ন্যায়পরতা নিশ্চিত করে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ।

ঙ. **বর্ধনকৃত এলাকা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা :** সবশেষে উভয় দেশের প্রাসঙ্গিক উপকূল নির্ধারণ করে বর্ধনকৃত সমুদ্র এলাকার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণ।

ইটলস-এর রায় : বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একক সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক মামলাগুলোর গতিধারা অনুসরণ করে ইটলস নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে রায় প্রদান করে :

১. **রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রে সীমানা নির্ধারণ :** রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার পৃথক পৃথক দাবি উপস্থাপন করে। উভয়ের দাবি পর্যালোচনা করে ট্রাইব্যুনাল রায় দেয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **বাংলাদেশের দাবি :** বাংলাদেশ ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে সীমানা নির্ধারণের জন্য দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়, ১৯৭৪ সালে সম্মত কার্যবিবরণী অনুযায়ী অথবা সেন্ট মার্টিনস দ্বীপকে ১২ নটিক্যাল মাইল বরাদ্দ দিয়ে সমদূরত্ব রেখার ভিত্তিতে সীমা নির্ধারণ।

খ. **মিয়ানমারের দাবি :** মিয়ানমার ১৯৭৪ সালের সম্মত কার্যবিবরণীকে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। মিয়ানমার বাংলাদেশ প্রস্তাবিত সমদূরত্ব পদ্ধতিতে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপকে Half Effect তথা ০৬ নটিক্যাল মাইল বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করে।

গ. **ট্রাইব্যুনালের রায় :** ট্রাইব্যুনাল ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্মত কার্যবিবরণীকে আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যবাধকতামূলক সম্মতি হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। তবে ট্রাইব্যুনাল সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমুদ্রসীমার চিহ্ন হিসেবে বিবেচনার জন্য বাংলাদেশের সাথে একমত পোষণ করে এবং স্বীকার করে যে, সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চারপাশে ১২ নটিক্যাল মাইল এলাকার উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চলে এমন অধিকার রয়েছে যেখানে মিয়ানমারের সাথে এ ধরনের একীভূত উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল নেই। অতএব ট্রাইব্যুনাল দ্বীপটিকে ০৬ (ছয়) নটিক্যাল মাইল উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমিত রাখার মিয়ানমারের যুক্তিকে প্রত্যাখান করে। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কৌশলগতভাবে এবং রায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকার আয়তন হিসেবে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিজয়ী হয়েছে।

২. **২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপান :** ২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দাবি এবং ট্রাইব্যুনালের রায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. **বাংলাদেশের দাবি :** একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের অভ্যন্তরে অবস্থিত মহীসোপানের একক সীমানা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল আনক্লস এর অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুযায়ী ন্যায়পরতা নিশ্চিত করা এবং যেহেতু সমদূরত্ব পদ্ধতি

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের জন্য ন্যায়পরতা নিশ্চিত করে না, অতএব বিকল্প পদ্ধতি অণুসরণ করা। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ কৌণিক দ্বিখণ্ডকরণ (Angle-Bi-sector) পদ্ধতিতে ২১৫ দিগংশ (Azimuth) বরাবর সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান যুক্তি ছিল বঙ্গোপসাগরের এবং বাংলাদেশের উপকূলের অবতলতা (Concavity)। এছাড়া বাংলাদেশ সমুদ্র তলদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন (Bengal Depositional System) এবং সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের অবস্থানকেও প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনার জন্য যুক্তি প্রদান করে।

খ. **মিয়ানমারের দাবি :** আলোচ্য বিষয়ে মিয়ানমার সমদূরত্ব বা প্রাসঙ্গিক বিষয় পদ্ধতিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয় এবং অবতলতাম্ব-কে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কঠিন সমদূরত্ব অনুসরণের প্রস্তাব দেয়। মিয়ানমারের যুক্তি ছিল, কঠোরভাবে অনুসৃত সমদূরত্ব রেখা যদিও বাংলাদেশকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তবুও এটিই হচ্ছে ন্যায়পর।

গ. **ট্রাইব্যুনালের রায় :** বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দাবির প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালতে অনুসৃত তিন ধাপ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে প্রথম সমদূরত্বের ভিত্তিতে রেখা টানা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক অবস্থার ভিত্তিতে ন্যায়পরায়ণতার/ন্যায্যতার আলোকে তা নিরীক্ষা করা হয়। সবশেষে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিরূপণ করা হয়। প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের দেয়া অবতল উপকূলের যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। ট্রাইব্যুনালের মতানুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুধু উপকূলের অবতলতাই নয় বরং অবতল উপকূলের কারণে সৃষ্ট উপকূলের কৌণিক প্রভাবই বেশি প্রাসঙ্গিক। আর সে অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল সমদূরত্বের ভিত্তিতে সীমানা রেখা সংশোধন করার পক্ষে মত দেয় এবং সংশোধন করে। এতে বাংলাদেশ তার অবতল উপকূলের প্রভাব প্রশমনসহ বিশাল এলাকা জুড়ে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রবেশাধিকারের সুবিধা অর্জন করে এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে বাংলাদেশের জন্য মহীসোপান উন্মুক্ত হয়।

৩. **২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের মহীসোপান এলাকার সীমানা নির্ধারণ :** ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান এলাকায় সীমানা নির্দিষ্টকরণ ছিল এই ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত কাজ। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **মিয়ানমারের দাবি :** আলোচ্য এলাকায় সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল প্রথমে মিয়ানমারের এখতিয়ার সংক্রান্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করেছে। মিয়ানমার দাবি করে যেহেতু জাতিসংঘ কর্তৃক উভয় দেশের মহীসোপান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত এখনো বিবেচিত হয়নি এবং অনুচ্ছেদ ৭৬ অনুযায়ী দেশ দুটির সম্প্রসারিত মহীসোপানের ভূতাত্ত্বিক প্রাপ্যতা এখনো নির্ধারিত হয়নি। অতএব উক্ত এলাকায় সীমানা নির্ধারণ ট্রাইব্যুনালের জন্য 'ঘোড়ার আগে গাড়ি স্থাপনের (Putting the cart before the horse) শামিল হবে। মিয়ানমার আরো দাবী করে যে, ট্রাইবুনালের উক্ত এলাকায় সীমানা নির্ধারণের এখতিয়ার থাকলেও বাংলাদেশ-মিয়ানমার মামলার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না, কেননা, যেহেতু সমদূরত্বের

কারণে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইলের পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। অতএব বাংলাদেশের ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে কোনো মহীসোপানই নেই।

খ. **বাংলাদেশের দাবি :** মিয়ানমারের দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ যুক্তি দেয় যে, আনক্রসের ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহীসোপানের সীমা নির্ধারণের সাথে দ্বিপাক্ষিক সীমানা নির্ধারণের কোনো বিরোধ নেই; বরং যেহেতু জাতিসংঘের মহীসোপানের সীমা নির্ধারক কমিশনের দ্বিপাক্ষিক সীমানার বিষয়ে কারো মন্তব্য করার অধিকার নেই। অতএব ট্রাইব্যুনালের-ই দ্বিপাক্ষিক সীমানা নির্ধারণ করার কথা। অন্যথায় তা অনির্ধারিতকালের জন্য অনিষ্পন্ন থেকে যাবে। বাংলাদেশ আরো যুক্তি দেয়, আনক্রস-এর অনুচ্ছেদ ৭৬ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকারের বিষয়টি ভূতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী প্রশ্নাতীত। বাংলাদেশ এ বিষয়ক যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রমাণ ট্রাইব্যুনালের নিকট উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদকে প্রয়োজনে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য শুনানিকালে আদালতে উপস্থিত করে।

গ. **ট্রাইব্যুনালের রায় :** ট্রাইব্যুনাল মিয়ানমারের এখতিয়ার সংক্রান্ত যুক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের অবতল উপকূলের কারণে সমদূরত্ব রেখা দ্বারা সৃষ্ট কৌণিক প্রভাবের ফলে (কাট অফ) ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে বাংলাদেশের মহীসোপানে কোনো অধিকার নেই; এমন যুক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বাংলাদেশের উপর যেকোনো কৌণিক প্রভাবকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে।

৪. **আনুপাতিক/ন্যায়পরতার পরীক্ষা (Proportionality test) :** সবশেষে ট্রাইব্যুনাল সীমানা নির্ধারণ শেষে উভয় দেশের প্রাসঙ্গিক উপকূল মোতাবেক বণ্টনকৃত সমুদ্র এলাকার আয়তন আনুপাতিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে। উল্লেখ্য, সমুদ্রসীমা নির্ধারণে উপকূলে প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। মিয়ানমার প্রস্তাব করে উভয় দেশের প্রাসঙ্গিক উপকূলের অনুপাত ১:২ (বাংলাদেশের ৩৬৪ কিমি এবং মিয়ানমারের ৭৪০ কিমি)। রায়ে দেখা যায়, ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক উপকূল নির্ধারণ করেছে ৪১৩ কিমি এবং মিয়ানমারের প্রাসঙ্গিক উপকূল নির্ধারণ করেছে ৫৮৭ কিমি। ফলে ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ ৪০% এবং মিয়ানমার ৬০% সমুদ্র এলাকা পাওয়ার অধিকারী। সে হিসেবে বাংলাদেশ ১,১১,৬৩১ বর্গকিমি এবং মিয়ানমার ১৭১,৮৩২ বর্গকিমি এলাকা পেয়েছে যা সবশেষে উভয় দেশের জন্য নিজ নিজ উপকূলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ন্যায়পর সমাধান নিশ্চিত করেছে।

তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরের দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন সমুদ্রসীমার বিষয়টি সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে, ১৪ মার্চ ২০১২ প্রদত্ত আদালতের রায়ে এ নিষ্পত্তি ঘটে। এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ ন্যায়পর (ইকুইটেবল) সমাধান পেয়েছে যা আইনের আশ্রয় নেয়ার পূর্বে দীর্ঘ ৩৮ বছর কূটনৈতিক অচলাবস্থার বেড়াজালে আটকে ছিল। বিগত চার দশকের বাস্তবতা ছিল ১৩০ নটিক্যাল মাইলের অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা যার আয়তন ৫০,০০০ বর্গকিমি-র ও কম। অন্যদিকে আইনী সমাধানের ফলে বাংলাদেশের অর্জন হয়েছে তার দ্বিগুণেরও বেশি এলাকা। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের জন্য অবিস্মরণীয় একটি অর্জন।

১৫। দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান ও আল-কায়েদার উত্থানকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : দক্ষিণ-এশিয়ার সমাজের বিভিন্ন স্তরে উগ্র মৌলবাদ এখন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা। এই মৌলবাদ চরমবাদে এবং চরমবাদ জঙ্গিবাদে রূপ নিচ্ছে। নির্মম বাস্তবতা হলো, জঙ্গিবাদ এবং জঙ্গিবাদের সম্ভাব্য উত্থান এই অঞ্চলের শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও সভ্যতার জন্য বড় আকারের হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জঙ্গিবাদ বিস্তারের পরিধির তারতম্য থাকলেও এর পিছনে রাজনৈতিক ভূমিকা প্রায় একই। অপরাজনীতির কারণেই আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতো সমাজে জঙ্গিবাদের শিকড় খুব গভীরে।

তালেবানদের উত্থান : রুশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে না নিতেই আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা নিয়ে মুজাহিদ দলগুলো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সকলেই যখন একটি তৃতীয় পক্ষের অপেক্ষা করছিল, সেই মুহূর্তে ১৯৯০ সালে আফাগানিস্তানের মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় 'তালেবান' নামক সংগঠন।

১৯৯৪ সালে তারা কান্দাহার শহর দখল করে নেয়। অতঃপর তারা দুরাহী শহর অতি সহজে দখল করে নেয়। তারা প্রথমে গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার বাহিনীকে পরাস্ত করে তাদের দখলকৃত প্রদেশসমূহ অধিকারভুক্ত করে নেয়। অতঃপর তারা ধীরে ধীরে কাবুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সে সময়ের ক্ষমতাধর গোষ্ঠী আহমদ শাহ মাসুদ বাহিনীর কাছ থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তালেবানগণ ১৯৯৬ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর সমগ্র আফগানিস্তানের অধিকাংশ দখল করে নেয়। তাদের অধিকারভুক্ত জায়গার পরিমাণ ছিলো মোট আফগানিস্তানের ৯০ শতাংশ। তালেবান নেতা মোল্লা ওমর ইসলামী আইনের ভিত্তিতে দেশটি পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব দেন। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব এই ইসলামী বিপ্লবকে নিজেদের জন্য পথের কাঁটা মনে করে বসে। শুরু হয় এ বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে তাদের নতুন ষড়যন্ত্র।

পাকিস্তানে তালেবানদের উত্থান ও অসন্তোষের কারণ

প্রথমত, পাকিস্তানের পাঠান ও পশতুনদের সাথে আফগান পশতুনদের মাঝে নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় মিল রয়েছে। তাই আফগানিস্তানে তালেবানরা আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাদের প্রতি স্বভাবজাতভাবেই পাকিস্তানিদের সহমর্মিতা জাগে। এই সহমর্মিতাবোধ থেকে সৃষ্টি হয় প্রতিরোধের। তাই যখন তালেবানরা স্বজাতি পাক-পশতুনদের নিকট আশ্রয় নেয় তখন পশতুনরা তাদের শুধু আশ্রয় দেয়া নয় বরং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা করতে থাকে। মূলত পাকিস্তান সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণই এ অঞ্চলে তালেবানের সশস্ত্র উত্থান ঘটিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকা যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানকে তালেবানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লাগিয়ে দিতে প্রস্তুত। রক্তের সংযোগ এবং রুশবিরোধী লড়াইয়ের সূত্র ধরে পাকিস্তানের সরকার, সেনাবাহিনী, সাধারণ জনগণ প্রত্যেকেই তালেবানদের প্রতি দুর্বল। পাকিস্তানের সাথে তালেবানদের সুসম্পর্ক ভাবিয়ে তোলে যুক্তরাষ্ট্রকে। তাই তালেবানদের বিষয়ে তাদের মনোভাব দুর্বল করার জন্য তারা বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি হামলায় মদদ যুগিয়ে পাকিস্তানের সাথে তালেবানদের সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে

এবং তালেবানকে দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ দেখিয়ে আমেরিকা জঙ্গি দমনের নামে বহু অর্থ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' তথা তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

আল-কায়েদার উত্থান

আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। সৌদি আরবে গড়ে ওঠা এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিহত ওসামা বিন লাদেন। ১৯৭৯ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' ওসামা বিন লাদেনকে সরাসরি সহযোগিতা দেয়। পরে সিআইএ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্পে বিন লাদেন প্রশিক্ষণ নেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮৩ সালে হোয়াইট হাউসে আল-কায়েদা কমান্ডারদের সাথে বৈঠক করেন। আল কায়েদাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য হাসিলের পর আমেরিকার কাছে আল-কায়েদার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। অতঃপর তালেবানদের ইসলামী বিপ্লব সফল হলে আল-কায়েদাও তাদের মিত্র হিসাবে কাজ করতে থাকে। এদিকে তালেবানদের উত্থানে শংকিত আমেরিকা যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা থেকে সরানো এবং মধ্যপ্রাচ্যের পর মধ্য-এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা আটতে থাকে। ২০০১ সালে ৯/১১ এই মোক্ষম সুযোগ এনে দেয় তাদের হাতে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ শহর নিউইর্য়কের 'টুইন টাওয়ার' সুরম্য ভবনসহ অনেক স্থানে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় বিপুলসংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয় এবং অসংখ্য আহত হয়। সেই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন 'আল কায়েদাকে' এবং এর শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেনকে, যিনি তখন আফগানিস্তানে বসবাস করছিলেন। সেই সময় দেশটি একটি ইসলামী সরকার 'তালেবানদের' দ্বারা শাসিত ছিল এবং কাবুল সরকারের প্রধান ছিলেন মোল্লা ওমর। আমেরিকা এবং তার মিত্ররা লাদেন ও 'তালেবানদের' সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী করে আফগানিস্তানে সামরিক আক্রমণ করে 'তালেবান' সরকারকে উৎখাত করে। যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলার পর তালেবান নামক সংগঠনটিকে কাছে টেনে নেন বিন লাদেন। তালেবান হয় আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন। প্রায় ৯ বছর পর ২০১১ সালে ওসামা বিন লাদেনের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্র। অবশেষে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ২০১১ সালের ২ মে মার্কিন কমান্ডোদের হাতে নিহত হন ওসামা।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান ও আল কায়েদার উত্থানকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান ও আল-কায়েদার উত্থানকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ হুমকির সম্মুখীন। আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকাতেও তালেবান ও আল-কায়েদার জঙ্গি কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **পাকিস্তান :** তালেবান ও আল-কায়েদা গোষ্ঠী পাকিস্তানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা লক্ষ্য করে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ম্যারিয়েট হোটেলে হামলা, পুলিশ স্টেশনে হামলা, শ্রীলংকান ক্রিকেটারদের উপর হামলা ইত্যাদি। এছাড়াও নৃশংসভাবে তারা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে মসজিদ-মাদরাসা ও পাবলিক প্লেসে। তালেবান নেতাদের মধ্যে মাওলানা ফয়জুল্লাহ ২০১০ সালে সোয়াতে শরীয়াহ আইন জারির মাধ্যমে সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সফলতা অর্জন করেন। কিন্তু পাকিস্তানে অবস্থানরত তালেবান ও আল-কায়েদা গোষ্ঠী নিতান্ত অবিবেচকের মতো নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আগ বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে লিপ্ত

হয়। ফলে আমেরিকার চাপে নড়বড়ে সরকার বাধ্য হয়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে এবং জঙ্গিদেরকে বুনার অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পর শান্তিচুক্তির আওতাভুক্ত সোয়াত অঞ্চলেও জঙ্গিবিরোধী অভিযান শুরু করে। অতঃপর বর্তমানে ওয়াজিরিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানি সেনা ও তালেবানসহ সেখানে নিহত হয়েছে কয়েক সহস্রাধিক। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধাঞ্চল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ পাকিস্তানকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পাক সেনাবাহিনী এখন নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে এবং নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেই শেষ করে দিচ্ছে। তাই আমেরিকা পাকিস্তানের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে খোলাখুলি প্রস্তাব করে যে, যেহেতু পাকিস্তান এককভাবে জঙ্গিদের সামাল দিতে পারছে না তাই পাক ও আমেরিকার সৈনিকরা পাক সীমান্তে একসাথে যৌথ অভিযান পরিচালনা করলে জঙ্গিদের দমন করা যাবে। পাকিস্তান তাদের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর জঙ্গিদের দমন নিয়ে এই লেজে-গোবরে অবস্থার মধ্যে জঙ্গি দমনের নামে আমেরিকা চালকবিহীন ড্রোন গোয়েন্দা বিমান হামলা করেছিল। পাকিস্তান সরকারের সকল অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সে সময়ে মার্কিনিরা পাক সরকারের বিনা অনুমতিতে ২২ বারেরও বেশি বিমান হামলা করে এবং প্রায় ৩০০ জন পাকিস্তানি নাগরিককে হত্যা করে, যাদেরকে জঙ্গি বলে চালিয়ে দেয়া হয়।

২. **আফগানিস্তান :** সামরিক কৌশলগত দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ আফগানিস্তান। দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবেও পরিচিত। আফগানিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ বিশেষ করে পাকিস্তান, চীন ও ইরানের ওপর চাপ বজায় রাখা সম্ভব। আর এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র তালেবান ও আল-কায়েদা ইস্যুকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তানের ওপর তার দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সৈন্যের উপস্থিতির কারণে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়েছে। আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় প্রতিবেশী দেশগুলো বিশেষ করে ইরান, পাকিস্তান, ভারত ও চীনের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বেড়েছে।

৩. **ভারত :** যে সময় ইরাক ও সিরিয়ায় উগ্র মৌলবাদী 'আইসিস' (ISIS) (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া) সামরিক অভিযান চাপিয়ে একের পর এক জনপদ দখল করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করছে, তখন আল কায়েদার প্রধান আইমান আল জাওয়াহিরি দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার মুসলমানদের রক্ষা এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য আল কায়েদার এ অঞ্চলের শাখা সংগঠন একিউআইএস-এর মাধ্যমে তৎপরতা প্রসারিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাওয়াহিরির ৫৫ মিনিটের ভিডিও বার্তাটি ইন্টারনেটে প্রচারিত হওয়ার পর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়।

৪. **বাংলাদেশ :** ১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি হরকাত-উল জিহাদের জঙ্গিরা বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানকে তাঁর বাড়িতে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। কবিকে আঘাত করতে না পারলেও হামলাকারীদের বাধা দিতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূ আহত হয়েছিলেন এবং হামলাকারীরা গ্রেফতার হয়েছিল। এর ছয় বছর পর শামসুর রাহমান হত্যা প্রচেষ্টার সূত্র ধরে পুলিশ যখন হরকাত-উল জিহাদের অর্ধশত জঙ্গি গ্রেফতার করে, তখন বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিষয়টি

ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। গ্রেফতারকৃতদের ভেতর একজন দক্ষিণ আফ্রিকা এবং একজন পাকিস্তানের নাগরিকও ছিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক আহমেদ সাদেক জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্বীকার করেছে– ওসামা বিন লাদেন তাদের ২০ লাখ ডলার দিয়েছিলেন বাংলাদেশে জঙ্গি রিক্রুট ও ট্রেনিংয়ের জন্য। এই অর্থ সে গ্রেফতারকৃত পাকিস্তানি মোহাম্মদ সাজেদকে দিয়েছিল, কারণ সাজেদ ছিল আফগানিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে আল কায়েদার নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী। বাংলাদেশে হরকাত-উল জিহাদের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯৯ সালে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় হুজির ওপর প্রথম আঘাত আসে, ব্যাপক ধরপাকড়, আস্তানা ও প্রকাশনা বন্ধ করবার মাধ্যমে। এরপর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দলের নেতা, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাবেশ এমনকি পীরের মাজারে হামলা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০১-২০০৬ সালে। ২০০০ সালের জুনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য হুজি কোটালিপাড়ায় তার জনসভাস্থলে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বোমা স্থাপন করেছিল, যা সভা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে পুলিশ অক্ষত অবস্থায় ফিউজসহ উদ্ধার করে। এরপর শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য আরও কয়েক দফা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, যার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট তার সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে নৃশংসতম গ্রেনেড-বোমা হামলায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান ও আল-কায়েদার উত্থান এবং তাদের ধ্বংসযজ্ঞ এখন আর নতুন কিছু নয়। এদের ধ্বংসযজ্ঞ আপাতদৃষ্টিতে শুধু আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে লক্ষ্য করা গেলেও বাস্তবে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যভাবে এরা হামলা চালিয়ে সার্বিক নিরাপত্তাকে আজ হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। তাই দক্ষিণ এশিয়াকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণকে আরও সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে। সময়মতো এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নিলে এদের দমন করতে গিয়ে একদিন সম্পদ ক্ষয় এবং লোক ক্ষয়ের ফাঁদে আটকা পড়বে পুরো দক্ষিণ এশিয়া। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ায় নিরাপত্তার স্বার্থেই তালেবান ও আল-কায়েদাদের দমন জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৬। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরুন।

উত্তর : ১১ মে ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের চতুর্দশ পার্লামেন্ট নির্বাচন। একই সাথে চারটি প্রাদেশিক পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বৈরতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র আর সেনাতন্ত্রে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত পাকিস্তানে এবারের নির্বাচন ছিল নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। দেশটির ৬৬ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবারই প্রথম পূর্ণ সময় ক্ষমতায় থাকার পর একটি নির্বাচিত সরকারের হাত থেকে অন্য একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এটিই পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচন।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন ২০১৩ এর ফলাফল : ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ (PML–N) সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করায় 'শের-ই-পাঞ্জাব' বা 'পাঞ্জাবের সিংহ' নামে খ্যাত মিয়া মুহাম্মদ নওয়াজ শরিফ দেশটির ১৮তম প্রধানমন্ত্রী হন। তার দল ১২৫টি আসনে জয়লাভ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি পার্লামেন্টারিয়ান্স (PPPP) এবং পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI) যথাক্রমে ৩১টি ও ২৮টি আসনে জয়লাভ করে।

অন্যদিকে, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ও PML-N মোট ২৯৭টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২১৪ টিতে। PPPP ১৩০টির মধ্যে ৬৬টিতে এবং PTI ৯৯টির মধ্যে ৩৫টি আসনে যথাক্রমে পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং খাইবার পাখতুন খাওয়ায় জয়লাভ করে। যার ফলে নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হন। এর আগে দুই মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ডটি ছিল যৌথভাবে বেনজির ভুট্টো ও তার নিজের। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন ৩৪২টি, এর মধ্যে সাধারণ আসন ২৭২টি এবং সংরক্ষিত আসন ৭০টি, যার মধ্যে আবার অমুসলিমদের জন্য ১০টি এবং নারীদের জন্য ৬০টি আসন সংরক্ষিত।

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

১. **গ্রহণযোগ্য নির্বাচন :** ব্যাপক হানাহানির পূর্বাভাস থাকলেও তুলনামূলকভাবে অল্প বিস্তর হানাহানির মধ্যে পাকিস্তানের ইতিহাসে এবং বর্তমান পরিস্থিতির সন্ধিক্ষণে সমাপ্ত হলো একটি সফল এবং মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। ৬০ শতাংশ ভোটারের সমাগম হয়েছিল, যার মধ্যে ২৫ শতাংশই ছিল তরুণ ভোটার। নারী ভোটারদের উপস্থিতিও কম ছিল না। করাচি, লাহোরসহ কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠলেও ফলাফল নিয়ে তেমন আপত্তি করেনি কোনো দলই।

২. **সন্ত্রাস নির্মূলের আশা :** বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েই অনেকে সন্দিহান। তদুপরি সন্ত্রাসের সূতিকাগার হিসেবেই পাকিস্তানকে দেখা হয়। হয়তো সে অপবাদ কিছুটা হলেও ঘুচবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে। দৃশ্যত সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাজনীতি থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার। নওয়াজ শরিফের তৃতীয়বারের মতো উত্থান অনেকটা এ মতামতকে সমর্থন করে।

৩. **ইমরান খানের দলের পরাজয় :** এ নির্বাচনের একটি বড় ঘটনা হলো ইমরান খানের তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের উত্থান। এই দল তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এর সাফল্য এবার কম নয়। তবে যেমনটা ভাবা হয়েছিল তেমনটি না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ পাঞ্জাবে নওয়াজ শরিফের দলের একচেটিয়া প্রভাব, আর ইমরান খানের দলের মধ্যবিত্ত ইমেজ। ইমরানের দল প্রান্তিক বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব জনগোষ্ঠীর ভোট আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাছাড়া সরকার চালানোর বা নীতিনির্ধারণের পর্যায়ের অভিজ্ঞতাও নেই ওই দলের। ইমরানের বৃহত্তর সমর্থক গোষ্ঠী শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাঁর দলের বড় সাফল্য খাইবার পাখতুন খাওয়া প্রদেশে (সাবেক উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)।

৪. **খাইবারে মার্কিন আগ্রাসনের প্রভাব নির্বাচনে :** এ নির্বাচনের আরেকটি দুর্ঘটনা হলো পাকিস্তানের চলমান সংঘাত আর যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের বিচরণক্ষেত্র খাইবার পাখতুন খাওয়ায় অত্যন্ত শক্তিশালী আঞ্চলিক দল এএনপির (আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি) অস্তিত্বই নেই। অথচ এমন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে তেহরিকের মতো নতুন দলের আগমন। এর প্রধান কারণ ইমরান খানের মার্কিন বিরোধী বিশেষ করে ওই প্রদেশের উপজাতিদের ওপরে মার্কিনদের ড্রোন হামলার বিরোধী ভূমিকা। ইমরান খান বরাবরই ড্রোন হামলা, তৎকালীন শাসক দল পিপিপির মার্কিন তোষামোদি ও ওই সরকারের দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

৫. **তালেবান সমস্যার সমাধানের আশা :** নওয়াজ শরিফের মতো ইমরানও পাকিস্তানের তালেবানদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের পক্ষপাতী। ইমরান খানের দল যদি ওই প্রদেশের সরকার গঠন করে তবে ওই সরকারের পক্ষে তাদের কথা রাখা কতখানি সহজ হবে, তা

হবে দেখার বিষয়। এমনটা করতে হলে কেন্দ্রে নওয়াজ শরিফের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। নওয়াজ শরিফ অতখানি যেতে রাজি হবেন কিনা, তা-ও হবে দেখার বিষয়। অপরদিকে ওই প্রদেশে যদি পিএমএল-এন আর জেইউআই-এফের সরকার গঠিত হয় তবে কেন্দ্রের নীতি নির্ধারণ সহজ হবে বলে মনে করা হয়। সে ক্ষেত্রে ইমরান খানের দলের ভূমিকা হবে লক্ষণীয় বিষয়। যদিও সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে ইমরানের দলের ফল হতাশাব্যঞ্জক তথাপি নতুন দল হিসেবে তেহরিক পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে তালেবান সমস্যা সমাধানে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে।

৬. **নিশ্চিহ্ন পিপিপি :** পাকিস্তানের হালের নির্বাচনে দ্বিতীয় বড় ঘটনাটি হলো তিনবারের শাসক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) কেন্দ্রে ও তিনটি প্রদেশে ব্যাপক ভরাডুবি। দলটি পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মাত্র একটিতে, সিন্ধু প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে এমকিউএমের সহযোগিতায় প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে পারে। তাছাড়া অন্য তিনটি প্রদেশে প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মতোই অবস্থা হয়েছে। বিগত পিপিপি সরকারের বহু বড় নেতা, এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী গিলানির দুই ছেলেও এবারের নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছেন। পিপিপির এই বিরাট বিপর্যয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যেমন :

প্রথমত, ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে বেনজির ভুট্টোর হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র পাকিস্তানে যে ধরনের সহমর্মিতা দেখা গিয়েছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছিল ওই সময়কার নির্বাচনে। কিন্তু পাঁচ বছরের শাসনামলে ব্যাপক অব্যবস্থা, দুর্নীতি, দুজন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আদালত অবমাননার অভিযোগ, খোদ প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ইত্যাদির কারণে নির্বাচনে এ ধস নেমেছে।

দ্বিতীয়ত, তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অতীব দহরম-মহরমসহ উপজাতীয় এলাকায় প্রতিদিনের ড্রোন হামলা, পাকিস্তানি তালেবানদের ব্যাপক উত্থান, আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পাকিস্তানের মাটিতে সরকারের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ওসামা বিন লাদেনের হত্যার অভিযোগ ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানিরা পিপিপির বিরুদ্ধে এই অবস্থান নিয়েছে বলে মনে হয়।

আগামী সেপ্টেম্বরে জারদারির প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও পিপিপির নেতৃত্ব নিয়ে সন্দিহান। নির্বাচনের আগে বিলাওয়ালের দেশত্যাগও পিপিপির জন্য বড় ধরনের ধাক্কা ছিল। সব মিলিয়ে পিপিপির ভবিষ্যৎ সুখকর হবে না। বিশেষ করে তেহরিক-ই-ইনসাফের অভ্যুদয়ের পর।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন পাকিস্তান সরকার : নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যদিও ইতিপূর্বের দুই দফার কোনোবারই মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। তবু পাকিস্তানের ইতিহাসে তিনিই হবেন প্রথম রাজনীতিবিদ যিনি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রায় সব দল এবং বিশ্বের বহু দেশের নেতারা। তাদের মধ্যে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও। নওয়াজ শরিফের বিজয়ে ভারতের আনন্দিত হওয়ার কারণ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও নির্বাচনে জয়ে নওয়াজ শরিফকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন বারাক ওবামা। নওয়াজ শরিফের পররাষ্ট্রনীতি কেমন হয় তা দেখার বিষয়। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। ভারতের সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতির যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক নীতি নয় নওয়াজ শরিফের সামনে রয়েছে অভ্যন্তরীণ অনেক চ্যালেঞ্জ। সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নওয়াজ শরিফ কতখানি সার্থক হন, তা দেখতে সমগ্র বিশ্ব উদগ্রীব।

সাবেক সেনাশাসক পারভেজ মোশাররফের বিরুদ্ধে চলে গেছে বর্তমান পাকিস্তান। তার বিরুদ্ধে চলছে তিনটি মামলার বিচার। তার শাসনামলে বিচারপতিদেরকে অবহেলা করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি একরকম গৃহবন্দী রয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিতে ক্ষমতার যে পালাবদল হতে যাচ্ছে, তাতে পাকিস্তানিরা অবশ্যই আনন্দ ও গর্ববোধ করতে পারেন। আশা করি, এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর গণতন্ত্রের সুফলের সর্বপ্রথম স্তর। পাকিস্তানের নির্বাচন তারই প্রমাণ।

১৭। ক. আঞ্চলিকতাবাদ কি?

খ. এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতার সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন।

উত্তর : পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার বাস বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একমাত্র থাইল্যান্ড ছাড়া এ অঞ্চলের প্রায় সবগুলো দেশই কোনো না কোনো সময় বিদেশী শাসন আর শোষণের শিকার হয়েছে। মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিনির্ভর এ অঞ্চলের দেশগুলো এখনো পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক, সামরিক কিংবা রাজনৈতিকভাবে প্রতিযোগিতা করে পারছে না। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে তৎকালীন ভারতীয় নেতা জওহরলাল নেহেরু যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন তা আজও বাস্তব রূপ পায়নি। ১৯৪৭ সালে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম Asian Relations Conference-এ তিনি বলেছিলেন যে, 'A change is coming over the scene now and Asia is again finding herself. ..... The countries of Asia can no longer be used as pawns by other's; they are bound to have this own policies in world affairs'. অবশ্য পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় এশিয়ার অর্থনীতি আজ অনেক বেশি স্থিতিশীল ও অগ্রবর্তী। বিশেষ করে জাপানের অর্থনৈতিক উত্থানের পর চীন, ভারত এবং এশিয়াভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সহযোগিতা এ অঞ্চলের জনগণের একটি সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বলছে। কিন্তু আঞ্চলিক সহযোগিতা বলতে যা বোঝায়, যেমনটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে সেরূপ কোনো বৃহত্তর সহযোগিতার সম্ভাবনা এ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

আঞ্চলিকতাবাদের অর্থ

'আঞ্চলিকতাবাদ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Regionalism', আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি নতুন প্রপঞ্চ। আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান। বর্তমানে বিশ্বের সব প্রান্তেই আঞ্চলিকতাবাদের জোয়ার বইছে। বৃহৎ শক্তিবর্গ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোও আঞ্চলিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। আঞ্চলিকতাবাদের মূল কথা হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের কতিপয় রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ অঞ্চলের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আঞ্চলিকতাবাদের শক্ত উদাহরণ। এছাড়াও রয়েছে– সার্ক, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরব লীগ, ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন, আসিয়ান, ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস (UNASUR) ইত্যাদি।

এসব সংগঠন আঞ্চলিকতাবাদের প্রেরণা নিয়ে গঠিত হয়েছে। এ আঞ্চলিকতাবাদের আলোকে তারা পারস্পরিকভাবে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাস করে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোতে নিজেদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতা : এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে কখনোই আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism)-এর ধারণাটি শক্ত ভিত রচনা করতে পারেনি। তবে আঞ্চলিকতাবাদ একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রচেষ্টা চলেছে বিভিন্ন সময়ে। যেমন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন বিশ্বব্যবস্থায় এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় Asian Relations Conference এবং সে সম্মেলনে নেহেরুকে প্রধান করে একটি Provisional council গঠন করা হয়। তাছাড়া নয়াদিল্লিতে প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে Asian Regional Organization নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও অনুমোদিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টির এর বেশি আর তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। তারপর ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অন্য আরেকটি সম্মেলনে আঞ্চলিক ব্যবস্থা (Regional Arrangement) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। তারপর ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়া বান্দুংয়ে Asian-African Conference অনুষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের উন্নয়নকামী দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতার আশা আবার জাগ্রত হয়। তারই পথ ধরে ২০০৫ সালেও আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তা কতটা ফলদায়ক হচ্ছে তাই ভেবে দেখার বিষয়। অবশ্য সীমিত পর্যায়ে হলেও এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার জাতিসমূহের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (ASEAN—Association of South East Asian Nations)-এর প্রতিষ্ঠা এবং কার্যক্রম। এ সংস্থাটি কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয় বরং অন্যান্য দেশ; যেমন— ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতির সাথে নানামুখী সহযোগিতা কার্যক্রম গড়ে তুলছে। বিশেষ করে ASEAN Regional Forum (ARF) এক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত সফল কার্যক্রম। তাছাড়া SEATO, CENTO, কলম্বো পরিকল্পনা প্রভৃতির মাধ্যমে এ অঞ্চলে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও তার কোনোটিই এশিয়াকে আলাদা অস্তিত্ব দিতে পারেনি। বিশেষ করে এসব প্রচেষ্টার কোনো কোনোটি বেশ সম্ভাবনাময় হলেও অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্তি ও প্রভাবের কারণে খাঁটি এশীয় সংগঠন ও কার্যক্রম কোনোটিতেই প্রাধান্য পায়নি। তাছাড়া বর্তমানে সার্ক, আসিয়ান, বিমসটেক প্রভৃতি সংস্থা থাকলেও এদের কোনোটিই সর্বব্যাপী চরিত্র ধারণ কিংবা ঐক্যবদ্ধ এশিয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঞ্চলিকতাবাদের জন্মদানে সমর্থ নয়।

আঞ্চলিকতাবাদের ক্ষেত্রে সমস্যা

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদের প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিত্তিতে বৃহত্তর সহযোগিতার পথে রয়েছে নানামুখী সমস্যা। যেমন—

প্রথমত, ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত এবং আদর্শিক ভিন্নতা এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায়। দূরপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অধিকাংশ কনফুসিয়াসিজমে বিশ্বাসী এবং অন্যান্য অধিকাংশ দেশই মুসলিম। এদিকে ১২৬ কোটি ৭৪ লাখ (UNFPA 2014) জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতের জনগোষ্ঠী মূলত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপক ভিন্নতা এসব দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতার জন্ম দিচ্ছে। ফলে সরকারগুলো অনেক সময় বৃহত্তর সহযোগিতার প্রশ্নে নানামুখী সমস্যার মুখে পড়ছে।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিভেদের কারণে এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ কোনোদিনই একই ঐক্যমঞ্চে আসীন হতে পারেনি। দ্বিপাক্ষিক বিভেদের কারণেও অনেক সময় বহুপাক্ষিক সহযোগিতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন— ভারত-পাকিস্তানের বিভেদ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে সহযোগিতার পথে প্রধান বাধা। তাছাড়া Asian Triangle বলে পরিচিত চীন, জাপান ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভেদ দীর্ঘ দিনের। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর প্রতিবেশী দুটি দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকলেও প্রকৃত অর্থে সুসম্পর্ক আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন

তার প্রতিবেশী জাপানের সাথেও নানামুখী সমস্যায় জড়িত। তাছাড়া দুই কোরিয়ার বিভক্তি, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি প্রভৃতি এ অঞ্চলকে প্রায়ই অস্থির করে তোলে। ফলে এশিয়ায় আঞ্চলিকতাবাদ জন্ম নেয়ার মতো রাজনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণও তেমন ফলপ্রসূ হয় না।

তৃতীয়ত, এশিয়ার দেশসমূহের ভাষাগত পার্থক্যও এ অঞ্চলের ঐক্য ও সংহতির পথে একটি বিরাট বাধা। ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ইংরেজি চালু থাকায় তাদের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ যতটা সহজতর চীনা, জাপানি, আরবি, হিন্দি, বাংলা, মালয়সহ অসংখ্য ভাষাভাষি লোকের বাস থাকায় এশিয়ায় তেমনটি সম্ভব হচ্ছে না।

চতুর্থত, এশিয়ায় উপআঞ্চলিকতা (Sub-regionalism) তথা Localism অধিক মাত্রায় বিকাশ লাভ করায় এদের সমন্বিত রূপ হিসেবে আঞ্চলিকতা (Regionalism) তেমন গড়ে উঠতে পারেনি। যেমন— দক্ষিণ এশিয়ায় সার্ক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসিয়ান, মধ্যপ্রাচ্যে আরব লীগ বা জিসিসি প্রভৃতির প্রভাবে বৃহত্তর এশীয় সংহতির প্রচেষ্টা সাংগঠনিক ভিত্তি অর্জন করতে পারছে না।

পঞ্চমত, এশীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পারস্পরিক সহযোগিতার পথে আরেকটি বাঁধা। কেননা এসব দেশ যখন আলোচনায় বসে তখন জাপানের ভূমিকা আর বাংলাদেশ কিংবা মিয়ানমারের ভূমিকা একরূপ হয় না। অন্যদিকে শক্তিধর চীন, ভারত কিংবা পাকিস্তান যে ভূমিকা রাখতে চায় তা নেপাল, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া কিংবা কম্বোডিয়ার মতো হয় না।

ষষ্ঠত, এশিয়ার দেশসমূহের পশ্চিমা দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নীতিগত পার্থক্য অনেক সময় নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে। স্নায়ুযুদ্ধকালে এ সমস্যা আরও প্রকট ছিল কিন্তু বর্তমানেও এ সমস্যার প্রকটতা তেমন হ্রাস পায়নি।

সম্ভাবনা : আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এশীয় দেশসমূহ ব্যর্থ বলেও তা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এখনো রয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলো হলো—

প্রথমত, এডওয়ার্ড সাঈদ Orientalism নামে যে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন তা একেবারে অর্থহীন নয়। তিনি এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক, আদর্শিক ও ঐতিহাসিক যে সাযুজ্য দেখিয়েছেন তা যথাযথভাবে গ্রন্থিকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিকতাবাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হতে পারে। পশ্চিমা আগ্রাসী সংস্কৃতি এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে গ্রাস করলেও এখনো এক ধরনের পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাছাড়া স্যামুয়েল হান্টিংটন সভ্যতাসমূহের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এশিয়ার সভ্যতাসমূহের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

দ্বিতীয়ত, এশিয়ার মধ্যে কেবল জাপানকে বাদ দিলে বাকি সবগুলো দেশই উন্নয়নশীল। এদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগ নির্ভরশীলতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্র্য প্রভৃতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এদের পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে তাদেরকে অধিকতর সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে আগ্রহী করছে।

তৃতীয়ত, এ অঞ্চলের সহযোগিতার ক্ষেত্রে অন্যতম সুবিধা হলো একক শক্তির অনুপস্থিতি। এখানে এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যে একাই পুরো এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে আঞ্চলিকতাবাদের পথে বাধা সৃষ্টি করার মতো কোনো শক্তি এখানে নেই বললেই চলে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক সহযোগিতা সৃষ্টির যে ব্যাপক প্রবণতা তা এশিয়ার ক্ষেত্রেও সত্য। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদানের মতো দেশ এখানে অনুপস্থিত। আশার কথা হলো আসিয়ানের আদলে একটি বৃহত্তর এশীয় সহযোগিতা সংস্থা প্রতিষ্ঠা খুব একটি কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ 'লাইন অব কন্ট্রোল' কি?

উত্তর : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার চিহ্নিত সীমান্তরেখাকে 'লাইন অব কন্ট্রোল' বলা হয়। এটি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীর ও ভারত অধিকৃত জম্মু কাশ্মীরের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা।

প্রশ্ন-০২ সেভেন সিস্টার্স (Seven Sisters) কি?

উত্তর : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামী সাতটি রাজ্য একত্রে 'সেভেন সিস্টার্স' হিসেবে পরিচিত। রাজ্যগুলো হলো আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মনিপুর, মেঘালয় ও মিজোরাম।

প্রশ্ন-০৩ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। উল্লেখ্য, ৩০ বছর মেয়াদি এ চুক্তি সম্পাদিত হয় নয়াদিল্লিতে। চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের পক্ষে সে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া।

প্রশ্ন-০৪ র‍্যাডক্লিফ লাইন কি?

উত্তর : পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চিহ্নিত সীমান্ত রেখার নাম র‍্যাডক্লিফ লাইন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচারপতি স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠিত হয়। স্যার র‍্যাডক্লিফ এ সীমা নির্ধারণ করেন বলে এর নামকরণ করা হয় র‍্যাডক্লিফ লাইন।

প্রশ্ন-০৫ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত কতবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?

উত্তর : পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত চারবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রথম, ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো যুদ্ধে লিপ্ত হয় এ দু দেশ। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধবিরতি ঘটে। ১৯৭১ সালে তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা সিমলা চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে এবং ১৯৯৯ সালে কাশ্মীর নিয়ে চতুর্থবারের মতো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পাক-ভারত।

প্রশ্ন-০৬ 'পঞ্চশীল' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : 'পঞ্চশীল' হলো ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারত-চীন সম্পর্ক নির্ধারণের নিমিত্তে গৃহীত পাঁচটি নীতি। 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত ঐ পাঁচটি নীতিই 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন' (ন্যাম)-এর পথ আরও ত্বরান্বিত করেছিল। এ পাঁচটি নীতি হলো— ক. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, খ. ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গ. অনাগ্রাসন, ঘ. অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা এবং ঙ. সমতা ও পারস্পরিক সুবিধা প্রদান। প্রকৃতপক্ষে এ 'পঞ্চশীল' নীতির ওপর ভিত্তি করেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন-০৭ **২৪তম অক্ষরেখা কি?**

উত্তর : পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার কচ্ছ (গুজরাটের উত্তরে সমুদ্র তীরবর্তী স্থান বিশেষ) এলাকার সীমান্তরেখার নাম ২৪তম অক্ষরেখা। ১৯৪৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় এ অক্ষরেখা নিয়ে। এ উত্তেজনা প্রশমন করার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে দেশ দুটির মধ্যে এ অক্ষরেখা দ্বারা সীমানা নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানেও এ এলাকা নিয়ে পাক-ভারতের মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-০৮ **টিপাইমুখ বাঁধ এবং বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।**

উত্তর : 'টিপাইমুখ বাঁধ' হলো সিলেট জেলার পূর্ব সীমান্ত থেকে ১০০ কিমি উজানে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মনিপুরের চোরাচাঁদপুর জেলার টিপাই নামক স্থানে নির্মীতব্য একটি বাঁধ, যা মূলত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিতর্কিত প্রয়াস। এ বাঁধ নির্মাণ দ্বারা ভারত জেন্টেলম্যান এগ্রিমেন্ট লঙ্ঘনসহ ২০০৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩৬তম জেআরসির বৈঠকের সিদ্ধান্তও উপেক্ষা করে চলেছে। ভারতীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান আসাম রাজ্যের নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (নিপকো) ইতিমধ্যেই এ বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন অনুমোদন আদায় করে এবং বাস্তবায়নের নানা কাজও শুরু করে। ২০১২ সালের মধ্যে সমাপ্ত ৮ হাজার ৮৬৭ কোটি রুপি ব্যয়ের এ বাঁধ তৈরি হলে সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর নাব্যতা আরো হ্রাস পাবে। আর এ দু নদীর উৎসমুখই হচ্ছে বরাক নদী। এর ফলে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, লক্ষ্মীপুর ও বরিশালসহ মেঘনা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিণত হবে মরুভূমিতে। সিলেটের বিশাল এলাকা জুড়ে যে হাওড় রয়েছে তা শুকিয়ে যাবে। কৃষি ও মৎস্য খাতে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে। দেশের খাদ্য উৎপাদনে দেখা দেবে মারাত্মক বিপর্যয়। পরিবহন, শিল্প ও সেচব্যবস্থাও একই পরিস্থিতির শিকার হবে। লাখ লাখ মানুষ বেকার হবে, খাদ্যাভাব দেখা দেবে, বর্ষাকালে বন্যায় ভাসবে বৃহত্তর সিলেট। শুষ্ক মৌসুমে পুরো মেঘনা অববাহিকার সকল নদনদী শুকিয়ে যাবে। অন্যদিকে, শীতে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে। তাছাড়া টিপাই বাঁধের কারণে গোটা সিলেট অঞ্চলে ভূমিকম্পের ব্যাপকতা বেড়ে যাবে। এ বাঁধটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ বাঁধে আঘাত হানলে তার ভয়াবহ পরিণতি বাংলাদেশকে ভোগ করতে হবে। তাছাড়া এ বাঁধ চালু হলে ভারতের মনিপুর ও মিজোরামের ৩১১ বর্গকিলোমিটার এলাকা ডুবে যাবে এবং কমপক্ষে ৪০ হাজার ভারতীয় নাগরিকও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং বাংলাদেশকে মেরুকরণ থেকে বাঁচাতে এবং সার্বিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভারতকে তাদের এ টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

প্রশ্ন-০৯ **গোল্ডেন ওয়েজ, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলতে কি বোঝায়?**

উত্তর : মাদক চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্তকে গোল্ডেন ওয়েজ বলে। আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্ত গোল্ডেন ক্রিসেন্ট এবং মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ডের মধ্যকার মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল নামে পরিচিত।

টীকা

♦ ভারত-চীন যুদ্ধ

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নেহেরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সমাজতান্ত্রিক চীনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর ভোর চারটায় এ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে চীন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে ২৪,০০০ বর্গ কিমি এলাকা দখল করে নেয়।

♦ পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর দু দেশের মধ্যে তিনটি (ঘোষিত) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাছাড়া কাশ্মীর প্রশ্নে সীমান্ত যুদ্ধ তো নিত্যদিনের ঘটনা। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ বাধে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে পুনরায় দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ সালে আবারও দু'দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তাছাড়া ১৯৯৯ সালের মে মাসে কাশ্মীরকে নিয়ে কারগিল পর্বতশৃঙ্গে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

♦ জাফনা দ্বীপ

শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলীয় শহর জাফনা এলটিটিই গেরিলা বিদ্রোহীদের অঘোষিত রাজধানী এবং তাদের কার্যক্রমের মূল ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে দীর্ঘ দিন থেকে। ১৯৭৫ সালে জাফনার তৎকালীন তামিল মেয়র আলফ্রেড দুরিয়াফকে গুলি করে হত্যার মধ্য দিয়ে ১৯৭৮ সালে Leberation Tiger of Tamil Elam বা LTTE গেরিলা বাহিনীর উদ্ভব। ১৯৯০ সালে সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে তামিল গেরিলারা জাফনা দখল করে। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে জাফনায় শেষ অভিযান শুরু হয়। ৪৭ দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় আড়াই হাজার লোকের প্রাণহানী ঘটে। যুদ্ধে ১৯২৫ জন তামিল এবং ৫০০ জন সরকারি সৈন্য নিহত হয়। অবশেষে ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ জাফনার পতন ঘটে। পুনরায় গেরিলা বাহিনী জাফনা দখল করে নেয়। ২০০৫ সালে মাহিন্দ রাজাপাকসে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট হয়েই তামিল গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাতে সরকারি বাহিনীর নেতৃত্বে দেয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল সরথ ফনসেকা। কয়েক বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯ মে ২০০৯ এলটিটিই নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের হত্যার মধ্য দিয়ে সংবিধানটির স্থায়ী পতন ঘটে।

♦ বাংলাদেশ-ভারত নদী সম্পর্ক

অভিন্ন নদী প্রবাহে এক যুগপৎ সঙ্গী বাংলাদেশ। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে যথাক্রমে ৫৪ ও ৩টি নিয়ে মোট ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী প্রবাহে সংযুক্ত বাংলাদেশ। ৫৪টি অভিন্ন নদী নিয়ে বিশালায়তনের নদী সম্পর্কে বাংলাদেশ-ভারত কখনোই অভিন্ন রকম স্বার্থ নিয়ে এগুতে পারেনি। বরং এক্ষেত্রে রচিত হয়েছে বিরোধের ইতিহাস। এজন্য প্রধান ও একতরফাভাবে ভারতই দায়ী। আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির উপর যেমন উজান দেশের অধিকার রয়েছে, তেমনি অধিকার রয়েছে ভাটির দেশেরও। কিন্তু ভারত একপক্ষীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নদী আইনকে অবজ্ঞা করে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে অভিন্ন নদীর পানির উপর যথেচ্ছ কর্তৃত্বারোপ করছে। নদী সম্পর্কে বাংলাদেশ ও ভারত-এর মধ্যকার

বিরোধের অন্যতম দিক বাঁধ নির্মাণ। হেলসিংকি চুক্তি ১৯৯২, জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯৭, বার্লিন রুলস ২০০৪ লঙ্ঘন করে ভারত এরই মধ্যে এ ধরনের ৩৬টি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করেছে। ছোট-বড় শতাধিক বাঁধের মধ্যে ফারাক্কা বাঁধ ও টিপাইমুখ বাঁধসহ তিস্তার পানি বণ্টন বিরোধ অন্যতম বিরোধপূর্ণ ইস্যু। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে ভারত এখন পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী পানি দেয়নি। দীর্ঘ ৩৬ বছরে ভারত কর্তৃক গঙ্গার একতরফা পানির প্রত্যাহার বাংলাদেশের জীবন ও জীববৈচিত্র্যেরই শুধু ধ্বংস করেনি; ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে এ দেশে হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা কৃষি, শিল্প, বনসম্পদ ও প্রাণ বৈচিত্র্য। ফারাক্কায় প্রবাহ প্রত্যাহারের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নদ-নদীসমূহ বর্তমানে প্রায় মৃত। ভারতের মণিপুর রাজ্যের মিজোরাম সীমান্তের কাছে চুরাচাঁদপুর জেলার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল টিপাইমুখে বরাক নদীর উপর ভারতের নির্মিতব্য একটি বাঁধ হলো টিপাইমুখ বাঁধ। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকি, নকশাজনিত ঝুঁকিসহ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাজনিত বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনার মুখে দাঁড়ানো টিপাইমুখ বাঁধ খুব দ্রুতই বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘনা অববাহিকায় পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। ভারতের সুকৌশলী ও ভয়াবহ পানি আগ্রাসনের শিকার বাংলাদেশের জন্য ফারাক্কারূপী নতুন মরণফাঁদ এই টিপাইমুখ বাঁধ। বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর অন্যতম তিস্তা। ব্রহ্মপুত্রের উপনদী তিস্তা উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। এ নদীর পানি বণ্টন বা ভাগাভাগি নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবত ভারতের সাথে বিরোধ বিদ্যমান। ১৯৭২ সালে গঠিত যৌথ নদী কমিশনের পর তিস্তার পানি বণ্টন ইস্যুর মীমাংসা চেষ্টার পরও আজো তা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। এভাবে অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার ও বণ্টনে ভারতের যথেচ্ছ ব্যবহার শুধু এ কয়টি বাঁধের উপরই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এক তথ্যমতে, ভারতের নির্মিত এমন বাঁধের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। এর সাথে রয়েছে অসংখ্য পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পও।

♦ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্পর্ক

ভৌগোলিকভাবে তিন দিক দিয়ে বাংলাদেশ ভারত দ্বারা বেষ্টিত। দেশটির সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিলোমিটার। নদীর মতো সীমান্ত সম্পর্কেও দেশ দুটির মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধ রয়েছে। সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক নির্বিচারে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা, অপদখলীয় ভূমি, অনিষ্পন্ন সীমানা ও ছিটমহল নিয়ে বিরোধই সীমান্ত সম্পর্কের আসল বিবদমান ইস্যু। কাঁটাতারের বেড়ায় চিহ্নিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত যেন এক মৃত্যুপ্রাচীর। কারণ এ সীমান্ত ভারতের পক্ষে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF) পাহারা দেয় এবং কোনো প্রকার সতর্কতা ছাড়াই নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের তারা নির্মম অত্যাচার ও হত্যা করে। সীমান্তে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF) কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, অপহরণ ও পুশইনের মতো অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন কিছুতেই থামছে না। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের কিছু ভূখণ্ডই ছিটমহল। বাংলাদেশ ও ভারতের এ ধরনের ১৬২টি ভূখণ্ড এক একটি ছিটমহল হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশে এবং ৫১টি বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের অপদখলীয় ভূমি রয়েছে ৩,০২৪ একর। আর ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের অপদখলীয় ভূমির পরিমাণ ৩,৫০৬ একর। এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দৈ খাটা, লাঠিটিলা ও বেলুনিয়া অঞ্চলের ৬.৫০ কিলোমিটার সীমানা

অচিহ্নিত অবস্থায় রয়েছে এ বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ, অপদখলীয় ভূমির নিষ্পত্তি এবং ছিটমহল সমস্যা সমাধানে দুই দেশের তৎকালীন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী 'ভূমি সীমানা চুক্তি ১৯৭৪' স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ সরকার একই বছরের ২৩ নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর [সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৭৪] মাধ্যমে এ চুক্তিটি অনুমোদন করে। ভারতীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় ৬ মে ২০১৫ এবং নিম্নকক্ষ লোকসভায় ৭ মে ২০১৫ এ চুক্তিটি অনুমোদিত হয়। বর্তমান মোদি সরকার বিলটি পাসের বিষয়ে শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করার সত্যিকারের বাস্তবায়ন ঘটে ২০১৫ সালের ৫, ৬ ও ৭ মে যথাক্রমে মন্ত্রিপরিষদ, রাজ্যসভা ও লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাসের মাধ্যমে। ১৯৯০ সালে ভারত বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোরটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল সমস্যার একটি সাময়িক সমাধান হয়। ১০-১১ নভেম্বর ২০১০ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত যৌথ সীমান্ত কার্যদলের (জেবিডব্লিউজি) ছিটমহল সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে স্বাক্ষরিত হয়েছে সীমান্ত প্রটোকল ও স্ট্রিপম্যাপ। সর্বশেষ ৭ মে ২০১৫ সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়।

♦ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক

জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (এসকাপ) ১৯৫৯ সালে এশিয়ান হাইওয়ের যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত ২৩টি দেশের স্বাক্ষরের মাধ্যমে আলোর মুখ দেখতে শুরু করে। যদিও বাংলাদেশসহ ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও উত্তর কোরিয়া তখন এ বিষয়ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকে। তৎকালীন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এ উদ্যোগের ১৫টি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়েও স্বাক্ষর না করার জন্য ভবিষ্যতের সম্ভাবনা থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। এক লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ হাইওয়েতে এ পর্যন্ত ৩২টি দেশের মধ্যে ২৮টি দেশ যুক্ত হয়েছে স্বাক্ষরের প্রদানের মাধ্যমে।

♦ বন্দি প্রত্যর্পণ ও ভিসা সহজীকরণ চুক্তি

২৮ জানুয়ারি ২০১৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শেষে স্বাক্ষরিত হয় বন্দি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত 'বহিঃসমর্পণ চুক্তি' ও ভিসা সহজীকরণ সংক্রান্ত 'সংশোধিত ভিসা ব্যবস্থা বিষয়ক (Revised Travel Arrangement-RTA) দলিল'। চুক্তি অনুযায়ী এক দেশের অপরাধী যদি অন্য দেশে পালিয়ে যায়, তবে তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। তবে কোনো অপরাধীর মামলা বিচারাধীন থাকলে তাকে হস্তান্তর করা যাবে না। ইন্টারপোলের মাধ্যমে অপরাধীদের নাম-পরিচয় পাঠাবে ভারত-বাংলাদেশ। দুই সরকার কোনো বিচারকের মাধ্যমে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করবে। নতুন ব্যবস্থায় জ্যেষ্ঠ নাগরিক ও শিশুদের অন অ্যারাইভ্যাল (আগমন-পরবর্তী) ভিসার প্রস্তাব রয়েছে। পর্যটকদের যথাযথ কারণ দর্শন সাপেক্ষে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ এক বছরের মাল্টিপল ভিসা দেয়া হবে। নতুন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকালীন ব্যাপ্তি অনুসারে ভিসা পাবেন। রোগীরা প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েক বছরের মাল্টিপল ভিসা পাবেন। তাদের দেখভালের জন্য সহযাত্রী স্বজনকেও প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ের মাল্টিপল ভিসা দেয়া হবে। ব্যবসায়ীরা এখন থেকে পাবেন কয়েক বছরের মাল্টিপল ভিসা। আর যেসব সরকারি কর্মকর্তা সরকারি পাসপোর্ট ব্যবহার করেন, তারা ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারবেন।

♦ ট্রানজিট, করিডোর, ছিটমহল

ট্রানজিট : একটি দেশ দ্বিতীয় দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো দেশের জন্য যখন পণ্য বহন করে নিয়ে যায়, তখন তা হয় প্রথম দেশটির জন্য ট্রানজিট-সুবিধা। অর্থাৎ দ্বিতীয় দেশটি তাদের ভূখণ্ড (সড়ক বা নৌপথে) ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার মাধ্যমে ট্রানজিট-সুবিধা দেয়। যেমন– বাংলাদেশী পণ্যবাহী যান যখন ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল বা ভুটানে যায়, তখন তা হলো ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে ট্রানজিট-সুবিধা দেয়া।

করিডোর : সাধারণত দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে করিডোর সৃষ্টি হয়। যেমন– বাংলাদেশ যখন ভারতীয় পণ্যবাহী যানকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আগরতলায় যাওয়ার সুযোগ দেয়, তখন তা হয় করিডোর-সুবিধা। অর্থাৎ, এখানে তৃতীয় কোনো দেশের সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু ট্রানজিটের ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। তাই ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পণ্যসামগ্রী উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোয় যাওয়ায় জন্য বাংলাদেশী ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দেয়াটা হলো মূলত করিডর-সুবিধা। একটু বৃহত্তরভাবে এটাকে 'ভারত থেকে ভারতে ট্রানজিট' বলা যেতে পারে।

ছিটমহল : ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ও বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের কিছু ভূখণ্ডই ছিটমহল। বাংলাদেশ ও ভারতের এ ধরনের ১৬২টি ভূখণ্ড এক একটি ছিটমহল হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশে এবং ৫১টি বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এ ১৬২টি ছিটমহলের অধিবাসীরা 'ছিটের মানুষ' বলে পরিচিত। মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ থাকলেও ছিটমহলবাসীর কোনো দেশ নেই, নেই কোনো পরিচয়। বাংলাদেশ যেমন এদের নাগরিকত্ব দেয়নি, দেয়নি ভারতও। সম্প্রতি ৭ মে ২০১৫ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সীমান্ত বিল পাস হয় ভারতের লোকসভায়। সীমান্ত বিল সর্বসম্মতভাবে পাস হওয়ায় অবসান ঘটেছে দীর্ঘশ্বাসে ভরা ছিটের মানুষের জীবনের।

♦ অপারেশন পুশ ব্যাক

'অপারেশন পুশ ব্যাক' হলো ভারত সরকার কর্তৃক জবরদস্তিমূলক একতরফাভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলাদেশে *ঠেলে* পাঠানোর একটি অপচেষ্টা। ১৯৯২-এর আগস্ট মাসের শেষের দিকে হঠাৎ করেই বিভিন্ন বস্তি থেকে বাংলা ভাষাভাষীদের ধরে ট্রাকে তুলে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশ সীমান্তে। ভারতীয়দের মতে যাদের 'পুশ ব্যাক' করার চেষ্টা করা হয় তারা বাংলাদেশী। কিন্তু ভারতের হাতে কোনো প্রমাণ ছিল না যে এরা বাংলাদেশী। বরং তাদের দিল্লির রেশন কার্ড ছিল, ভোটার তালিকায় নাম ছিল, সর্বোপরি এই সব বস্তিবাসী নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করতো। এছাড়া বাংলাদেশে *ঠেলে* পাঠানোর ব্যাপারে ভারত সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশ এবং যাদের পুশ ইন করার চেষ্টা করা হয় তাদের কাউকে আগাম কোনো নোটিস দেয়া হয়নি। এটা ছিল নাগরিক, মানবিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের লঙ্ঘন। বাংলাদেশ সরকার এই অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করে। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারাও ব্যাপারটির প্রতিবাদ করে। বাংলাদেশ সরকার সীমান্তে বিডিআর পাহারা জোরদার, কার্ফু জারি, দেখামাত্র গুলির নির্দেশ ছাড়াও অপারেশন পুশ ব্যাক প্রতিহত করার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

♦ জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF)

ভারতনিয়ন্ত্রিত একটি অঙ্গরাজ্যের বিপ্লবী সংগঠনের নাম জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট। ভারত সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, শোষণ, নির্যাতন আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বিশ্ব রাজনীতির আসরে নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে এই সংগঠন। ১৯৮৯ সালে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

কাশ্মীরের গোড়ার কথা : মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় (খ্রি. পূর্ব ২৭২-২৩২ অব্দ) কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ করে এবং খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া থেকে আগত কুষাণদের শাসনামলে দেশটিতে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে কর্কট বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। পরবর্তীতে ১৫৮৬ সালে শামসুদ্দিনের শাসনামলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। ১৮১৯ সালে পাঞ্জাবের রাজা রঞ্জিত সিং কাশ্মীর দখল করে শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীতে ১৮৪৬ সালে ব্রিটিশরা শিখদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ-ভারত সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত করে এবং কাশ্মীরকে ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জম্মুর গোলাব সিংয়ের নিকট বিক্রি করে দেয়। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের ইসলামী জাতীয়তাবাদী দলগুলোর চরম বিদ্রোহের এক পর্যায়ে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করে গোলাব সিং-এর বংশধর হরি সিং এবং ভারতের সাথে কাশ্মীর একীভূত হওয়ার স্বার্থে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠায়। ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর ভারত কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বিরতি হয়। ১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে কাশ্মীর কোন দেশের সঙ্গে থাকবে তার একটা গণভোটের কথা থাকলেও পরবর্তীতে ভারত সে চুক্তি থেকে সরে আসে এবং ১৯৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারা মোতাবেক কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে একীভূত করা হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় বিদ্রোহ এবং সর্বশেষ JKLF-এর আবির্ভাব।

যে কারণে জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট ব্যর্থ হচ্ছে

- যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত সে রাষ্ট্রের চেয়ে সামরিক দিক থেকে অধিক শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্রের সমর্থন পায়নি।
- JKLF-এর একটি অংশ এবং কাশ্মীরের হিন্দুরা ভারতের সঙ্গেই থাকতে আগ্রহী।
- ইসলাম ধর্মাবলম্বী কাশ্মীরের একটি অংশ স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী। অর্থাৎ কাশ্মীরীরা রাজনৈতিকভাবে ত্রিধাবিভক্ত।
- কাশ্মীর সমস্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নীরবতা স্বাধীন কাশ্মীর গঠনের প্রধান অন্তরায়।
- ক্ষমতা হারানো বা জনসমর্থন কমে যাওয়ার ভয়ে পাকিস্তান বা ভারত কেউই কাশ্মীরের ব্যাপারে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিচ্ছে না।

♦ কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা (LOC) *[২২তম বিসিএস]*

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটি সীমান্ত রেখাকে লাইন অব কন্ট্রোল (LOC) বলা হয়। এটি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীর ও ভারত অধিকৃত জম্মু কাশ্মীরের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা। এটি যেহেতু বিভক্ত কাশ্মীরের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা এবং এ রেখা বরাবর বিবদমান দুটো দেশের সীমান্ত রেখা চিহ্নিত— সেহেতু এ রেখাটি কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা হিসেবেও আখ্যায়িত হয়।

♦ সিমলা চুক্তি

১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৯৭২ সালের ২ জুলাই ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ইতিহাসে এ চুক্তিই সিমলা চুক্তি নামে খ্যাত।

সিমলা চুক্তির প্রধান দিকসমূহ

ক. ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই উভয় দেশের জাতীয় সংহতি, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দেবে, জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী উভয়ই পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করবে না।

খ. উভয় দেশ তাদের নিজ নিজ সৈন্যদের স্ব স্ব দেশের আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে সরিয়ে নেবে এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধবিরতির ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ রেখাকে মেনে নেবে।

গ. দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য ধাপে ধাপে ডাক, তার, স্থল ও আকাশপথে উভয় দেশের মধ্যে পুনরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

ঘ. উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে বৈরী প্রচার বন্ধ করবে।

ঙ. দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে। বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহ দেয়া হবে।

চ. উভয়ের সমস্যাদি আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে দুই দেশের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে মিলিত হবেন।

ছ. এ চুক্তি কোনো দেশই একতরফাভাবে বদলাতে পারবে না।

♦ ফারাক্কা বাঁধ *[২৭তম বিসিএস]*

কলকাতা বন্দরকে পলির হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত কর্তৃক মনোহরপুরের কাছে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের, বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক ও ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ১৬.৫ কিমি উজানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ করেছে। ভারত কর্তৃক গঙ্গার পানির একতরফা প্রত্যাহার বাংলাদেশের কেবল প্রতিবেশ ও পরিবেশ ব্যবস্থা ধ্বংস করছে না বরং এ দেশের কৃষি, শিল্প, বনসম্পদ ও নৌযোগাযোগের মতো অর্থনৈতিক খাতগুলোর ওপরও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। সংকট নিরসনে বহুবার উদ্যোগ নিলেও বিভিন্ন কারণে তা ভেস্তে গেছে। পরিশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়।

অধ্যায় ০৭

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ
Bangladesh in International Affairs

Syllabus | ***Bangladesh in International Affairs** : Major achievements, challenges, future directions.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [২৮তম বিসিএস]

০২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরুন। [৩১তম বিসিএস]

০৩. 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [৩০তম; ১৫তম বিসিএস]
অথবা, সার্কের প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক' (SAARC)-এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (SAARC)-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? [২৯তম বিসিএস]
অথবা, 'আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিহার্য।' আলোচনা করুন। [২৫তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

০৫. স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে অর্জনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৬. অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহের বর্ণনা দিন।

০৭. জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সম্পর্ক আলোচনা করুন।

০৮. জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৯. বৈদেশিক সাহায্য কি? বাংলাদেশ কি কি উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

১০. এ পর্যন্ত জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষী মিশন গঠিত হয়েছে? বর্তমানে বাংলাদেশ কোন কোন মিশনে শান্তিরক্ষায় কাজ করছে?

১১. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা আলোচনা করুন।

১২. বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
০২. কত সালে সার্ক গঠিত হয়? এর উদ্যোক্তা কে?
০৩. বাংলাদেশ কবে সিডও সনদ স্বাক্ষর করে?
০৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম লিখুন।
০৫. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি?
০৬. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।
০৭. বাংলাদেশের আসিয়ান (ASEAN) জোটে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
০৮. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।

টীকা

- *টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ*
- *টিকফা*
- *শান্তির সংস্কৃতি*
- *বাংলাদেশ-ভারত নৌ ট্রানজিট চুক্তি*
- *ঢাকায় BIMSTEC সচিবালয়*
- *IPU'র প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ*
- *CPA'র চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ*
- *উন্মোচিত মহিষের জীবনরহস্য*
- *পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ*
- *সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ । বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলতে পারে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ্ব মন্দা বিশ্ব অর্থবাজার ও পুঁজিবাজারের ধসের ফল। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের মত হচ্ছে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত লোভের কারণেই বিশ্ব অর্থনীতির এ নিমজ্জন। তবে বিশ্ব মন্দার মূল কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধকী ঋণের সংকট। এটা শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউজিং সেক্টরে। সেখানে খুব বেশি সাবপ্রাইম লেনডিং হয়েছিল। তবে বিশ্ব অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এবারের মন্দার দুটি প্রধান কারণ নির্ধারণ করেছেন। ১. সাব-প্রাইম লেনডিং এবং ২. নিয়ন্ত্রণহীনতা ও ক্রেডিট ডিফল্ট। অর্থনৈতিক মন্দা জটিল রূপ ধারণের একটি বড় কারণ পরিবেশ বিপর্যয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে অস্ট্রেলিয়ায় দাবানল, ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে খরা ইত্যাদি কারণে বহু মানুষ কর্ম হারিয়ে ফিরেছে নিজ ঘর অথবা নিজ দেশে।

মন্দায় কর্মসংস্থান হ্রাসের বৈশ্বিক চিত্র : এবারের মন্দার সূত্রপাত যেহেতু আমেরিকাতে সেহেতু কর্মসংস্থান হ্রাস হয়েছে আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি। সেদেশে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়েছে ৬ লাখ ৫১ হাজার কর্মী। জানুয়ারি মাসে ৬ লাখ ৫৫ হাজার এবং ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকরি হারিয়েছে ৬ লাখ ৮১ হাজার কর্মী (সূত্র : শ্রম দপ্তর, আমেরিকা)। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার জন্য ব্যয় সংকোচনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর প্রাথমিক কৌশল হিসেবে তারা কর্মী ছাঁটাই করছে। মন্দার কারণে ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে বিশ্বের প্রায় ১ কোটির বেশি লোক চাকরি হারিয়েছেন। মন্দার প্রভাব এখন বড় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোয়। তাছাড়া তেলের মূল্য কমে যাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যেও কাজের বাজার সংকুচিত হচ্ছে। ২৬ জানুয়ারি ২০০৯ ভারী যন্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ক্যাটারপিলার, ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফাইজার, টেলিকম প্রতিষ্ঠান স্প্রিন্ট নেক্সটেল

করপোরেশন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হোম ডিপো একসাথে ৬১ হাজারেরও বেশি কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। এছাড়া ব্যাংকিং খাতের দুরবস্থার কারণে ইতোমধ্যে চীনের রপ্তানি বাজারে ধস নেমেছে। এতে প্রচুর লোক চাকরি হারিয়েছেণ ও হারাচ্ছেন। আর জাপান, স্পেন, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, জার্মানি, মেক্সিকো, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলসহ বহু উন্নত রাষ্ট্রে কর্মসংস্থান হ্রাসের হিড়িক পড়েছে। মন্দার কারণে ২০০৯ সালের শুরুতে যুক্তরাজ্যে ১৯ লাখ ৭০ হাজার লোক বেকার হয়েছে।

বাংলাদেশে বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব : বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব শুরু হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশ সরকারের দূরদর্শী কিছু সিদ্ধান্ত বিশেষ করে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির সুসমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। অর্থনীতিবিদরা এ অবস্থা মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলেছেন। বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা নিচে আলোচিত হলো :

১. **রপ্তানিতে প্রভাব :** রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, রপ্তানি খাতগুলোর মধ্যে সাত মাসে কাঁচা পাটের রপ্তানি কমেছে ১৫.২ শতাংশ, পাটজাত পণ্য ১৯.৮ শতাংশ, চামড়া ৩১.৮ শতাংশ এবং হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানি কমেছে সাড়ে পাঁচ শতাংশ। পোশাক রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সূত্রে জানা গেছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে রপ্তানি কাজের পরিমাণ কমেছে ৪.৯৮ শতাংশ, ফেব্রুয়ারিতে কমেছে ১৭.৫৮ শতাংশ। একই সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পোশাকের দাম কমেছে ২ শতাংশ। দেশের রপ্তানি পণ্যের ৯০ শতাংশ যায় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার কারণে তৈরি পোশাক আমদানি কমেছে প্রায় ৩ শতাংশ। তবে অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক বিক্রি কমে গেছে আট শতাংশ। মোট জিডিপি'র বড় অংশ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত থেকে। সুতরাং রপ্তানি কমে গেলে প্রভাব পড়বে মোট জিডিপিতে।

২. **জনশক্তি রপ্তানিতে প্রভাব :** দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সেরা মাধ্যম জনশক্তি রফতানি বা প্রবাসী আয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজার সংকটহেতু জনশক্তি রপ্তানিতে ধ্বস দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে প্রতিনিয়তই স্থবির করে তুলছে। প্রায় তিন বছর ধরে জনশক্তি রপ্তানির নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশে মানুষরূপী অমানুষদের পদচারণ ও অপতৎপরতায় বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তি সংকট, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কূটনৈতিক তৎপরতার অভাবসহ নানাবিধ কারণ এর পেছনে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে রাজনৈতিক সংকটে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসার প্রবণতায় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে যোগ করেছে সংকটের নতুন মাত্রা। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশ হয়েও হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখা এ বৃহৎ খাতটির স্থবিরতা দূর করা প্রয়োজন সবার আগে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে চাহিদার ভাটা পড়লেও পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে যাওয়া দেশগুলোতে দক্ষ ও অদক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিকে সহায়তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজারের যে ধাক্কা লেগেছে তা পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন করে শ্রমবাজার পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এখন প্রয়োজন দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতারে নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশীদের কাজ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সংকটময় পরিস্থিতিতেও দেশের জনশক্তি

রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ ধরে রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান বাংলাদেশের সামনে। এক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার জন্য জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

৩. **রেমিট্যান্স কমেছে :** বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য থেকে দেখা যায়, অন্যান্য মাসের তুলনামূলক চিত্রে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রেমিট্যান্স আসা না কমলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে রেমিট্যান্স আসা কিছুটা কমেছে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো দেশ থেকেই ২০০৯ সালের জানুয়ারির তুলনায় ফেব্রুয়ারিতে রেমিট্যান্স আয় কমেছে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৯ সালে জানুয়ারি মাসে মধ্যপ্রাচ্যের ৮ দেশ থেকে মোট ৫৬৯ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারিতে এ দেশগুলো থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৫৩৪ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহ ঘটে ১০,৯৮৭.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১০-১১ অর্থবছরে (এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত) সর্বমোট রেমিট্যান্স প্রবাহ ঘটে ৯,৫৮৭.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ৯,৫২৭.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত) রেমিটেন্স প্রাপ্তির পরিমাণ ৯,২০৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যেখানে স্পষ্টত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে।

৪. **শিল্পক্ষেত্রে ধস :** আমাদের এক সময়ের প্রধান রপ্তানি খাত পাট শিল্প, দেশীয় চাহিদা মেটানোর জন্য সুতা ও চিনি শিল্পসমূহ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী ৮০টি মিলের মধ্যে ১৭ মিলের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ। আংশিকভাবে চলছে ১১ মিল। বাকিগুলো বন্ধ হওয়ার পথে। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা কমেছে ৫০%, আর দাম কমেছে ৩০%। সরকারি, বেসরকারি খাত মিলে পাটকলে কর্মরত আড়াই লাখ শ্রমিকের মধ্যে কর্ম হারিয়েছে প্রায় ১ লাখ শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। মহাবিপর্যয়ের কবলে পড়েছে টেক্সটাইল খাত। সুতা উৎপাদনকারী স্পিনিং মিলগুলোতে দেড় লাখ মেট্রিক টন সুতার স্তূপ পড়ে আছে। ভারতীয় সুতায় বাজার সয়লাব থাকায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সুতার বিক্রি নেই। দেশের ৩৪১ স্পিনিং মিলের ১৪টি মিল বন্ধ হয়ে গেছে। উৎপাদন কমেছে ৩৫%। কর্মচ্যুত হয়েছে ৫০ হাজার শ্রমিক। অবিক্রিত পড়ে থাকা সুতার মূল্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশের করণীয় : মন্দাকে মোকাবিলা করার জন্য যেটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সেটা রাজস্বনীতি এবং মুদ্রানীতির বুদ্ধিদীপ্ত সুসমন্বয়। সরকারকে অবস্থা বুঝে এমনভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে যেন আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ নীতি ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যায়। এক কথায় মন্দাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে। উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের সাথে উৎপাদন সম্প্রসারণ করা এবং উৎপাদনের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা হাতে নিলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব। বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে এবং নিজেদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে—

ক. ঋণদান, অনুসন্ধান ও চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও সকলের বোধগম্য হতে হবে।
খ. নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো অবশ্যই শক্তিশালী ও স্বচ্ছ হতে হবে।
গ. অর্থনৈতিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
ঘ. ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্যই কঠোর হতে হবে।

অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্বকে পিছনে ফেলে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় সরকার এবং ব্যবসায়ীদের একযোগে কাজ করতে হবে।

০২। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রবাসী শ্রমিক, রেমিট্যান্স ও বাংলাদেশের অর্থনীতি একই যোগসূত্রে গাঁথা। কারণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশি শ্রমিক। বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বের অস্থিতিশীল রাজনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সংকুচিত হয়ে আসছে দেশের অর্থনীতির প্রাণ ভোমরা রেমিট্যান্স প্রবাহ। আরব দেশগুলোর বর্তমান পরিস্থিতির কারণে প্রায় লক্ষাধিক জনশক্তি দেশে ফিরে আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কমে যাচ্ছে তাদের রেমিট্যান্স। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার রেশ কাটতে না কাটতে বিশ্ব অর্থনীতির নতুন এ সংকটে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর রেমিট্যান্স-নির্ভর অর্থনীতি এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার : বিশ্বের প্রায় দেশেই বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রয়েছে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ওমান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, লিবিয়া, কাতার, জর্ডান, লেবানন, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিশাস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। সারা বিশ্বে অন্তত ৯০ লাখ বাংলাদেশী বৈধভাবে চাকরি নিয়ে বসবাস করছেন, যার প্রায় ৬০ শতাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গমনকারী বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ লাখ ৮০ হাজার ১৯৮ জন, যা মোট জনশক্তির ৩৬ শতাংশ। তন্মধ্যে শুধু ২০১৩ সালে প্রায় ৪,০৯,২৫৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছে। সংখ্যার বিচারে ওমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ মতে, ২০১৩ সালে দেশটিতে গমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ১,৩৪,০২৮ জন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন কুয়েতে ৭ শতাংশ, কাতারে ২ শতাংশ ও লিবিয়ায় ১ শতাংশ বাংলাদেশী শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত এ ৮০ শতাংশ শ্রমবাজারের অবশিষ্ট ২০ শতাংশ মালয়েশিয়া (১০ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৪ শতাংশ) ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স চিত্র : ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ শুরু হয়। ঐ বছর মোট রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৩৫.৮৫ কোটি টাকা। এরপর প্রতিবছরই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরের দেশের রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ৯২০৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে কয়েক বছর যাবত এককভাবে সৌদি আরবের পরই সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবস্থান। বিশ্বব্যাংকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিট্যান্সেস ফ্যাক্ট বুক-২০১১ অনুযায়ী, ২০১০ সালে রেমিট্যান্স অর্জনে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে, যার পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্স অর্জনে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান।

আরব, মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ : আরব বিশ্বজুড়ে এখন রাজনৈতিক সুনামি চলছে। সেই সুনামি আঘাত হানছে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট। আন্দোলনের ভয়ে তটস্থ সিরিয়া, জর্ডান, ইয়েমেন, মরক্কো, বাহরাইন, এমনকি সৌদি আরবও। তিউনিসিয়ার বেন আলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সুনামি শুরু হয়। এতে ঝরে পড়েন বেন আলী। একই পরিণতি বরণ করেন মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। পরবর্তীতে ভয়াবহ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে লিবিয়ার নেতা কর্ণেল গাদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত হন ও নিহত হন। সাম্প্রতিক ইয়েমেন সংকট মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) হিসাবে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বৈধ চ্যানেলে লিবিয়া থেকে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ১০ কোটি ২২ লাখ টাকা বা ১৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই থেকে ডিসেম্বর) লিবিয়া থেকে বৈধ পথে রেমিট্যান্স এসেছে ২ কোটি ৯৪ লাখ টাকা (৪ লাখ ২০ হাজার ডলার)। লিবিয়ার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দরুন বাংলাদেশের শ্রমবাজার আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফিরে এসেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। প্রবাসী আয়ের শতকরা ৯০ ভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে চলমান রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত) প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় সৌদি আরব ২০৩৯.১, সংযুক্ত আরব আমিরাত ১,৭৩৯.১, বাহরাইন ২৮২.৮, ওমান ৪৩২.৫ এবং কুয়েতে ৭২৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু এসব দেশের বাংলাদেশী জনশক্তি আমদানির প্রতি বিমুখতা এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট দুইয়ে মিলে দেশের জনশক্তি রফতানি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রমবাজার সংকট, সম্ভাবনা ও করণীয় : দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সেরা মাধ্যম জনশক্তি রফতানি বা প্রবাসী আয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজার সংকটহেতু জনশক্তি রফতানিতে বিপর্যয় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে প্রতিনিয়তই স্থবির করে তুলছে। প্রায় তিন বছর ধরে জনশক্তি রফতানির নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশে মানুষরূপী অমানুষদের পদচারণ ও অপতৎপরতায় বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তি সংকট, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কূটনৈতিক তৎপরতার অভাবসহ নানাবিধ কারণ এর পেছনে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে রাজনৈতিক সংকটে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসার প্রবণতায় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে যোগ করেছে সংকটের নতুন মাত্রা। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশ হয়েও হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। সম্প্রতি দীর্ঘ ৬ বছর পর (১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫) সৌদি আরবে জনশক্তি পাঠানোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখা এ বৃহৎ খাতটির স্থবিরতা দূর করা প্রয়োজন সবার আগে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে চাহিদার ভাটা পড়লেও পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে যাওয়া দেশগুলোতে দক্ষ ও অদক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানিকে সহায়তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজারের যে ধাক্কা লেগেছে তা পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন করে শ্রমবাজার পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি

হয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এখন প্রয়োজন দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতারে নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশীদের কাজ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সংকটময় পরিস্থিতিতেও দেশের জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ ধরে রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান বাংলাদেশের সামনে। এক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার জন্য জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রম বাজার এক বিশাল সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

০৩। 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। *[৩০তম; ১৫তম বিসিএস]*
***অথবা,* সার্কের প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।**
অথবা,* আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক' (SAARC)-এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (SAARC)-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[২৯তম বিসিএস]
অথবা,* 'আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিহার্য।' আলোচনা করুন। *[২৫তম বিসিএস]

উত্তর : বর্তমান বিশ্ব সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশ্ব। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান তৈরিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আর পারস্পরিক কল্যাণ ও আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক উদ্দেশ্য নিয়েই সার্ক-এর যাত্রা। অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা যেমন– আসিয়ান, সিরডাপ, ইইসি, ডি-৮, জি-৮ প্রভৃতি সংগঠনের মতো সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংগঠিত একটি আঞ্চলিক সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন সাত সদস্য দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও আফগানিস্তানসহ সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮। প্রস্তাবক এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সার্কের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ এ আঞ্চলিক জোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সার্কের নামকরণ ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহ : দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী সাতটি রাষ্ট্র নিয়ে যে সংস্থাটি গঠিত হয়, তার নামকরণ করা হয় SAARC—South Asian Association for Regional Co-operation. অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। উল্লেখ্য, সার্ক গঠনের পূর্বে এর নামকরণ প্রসঙ্গে ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিবগণ ৪টি প্রস্তাব করেছিলেন। প্রস্তাবিত নামগুলো হলো : ১. South Asian Association for Co-operation (SAAC), ২. Association for South Asia (ASA), ৩. Association of South Asia for Co-operation (ASAC), ৪. Organization of South Asian States (OSAS)। ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাবিত নামগুলোর কোনোটিই গৃহীত হয়নি। ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে সংস্থাটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহায়তা (SARC) নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে নেপালের তৎকালীন রাজা বীরেন্দ্র বিক্রম শাহ দেব SARC-এর বদলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা

বা SAARC নামকরণের প্রস্তাব দেন। পরে ১৯৮৬ সালে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলন থেকে এ সংস্থাটি South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) নামে পরিচিত হয়। সার্কের সদস্য আটটি রাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আফগানিস্তানকে সার্কের অষ্টম সদস্য পদ দেয়া হয় এবং চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সার্কের জন্ম : ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৮১ সালের ২১-২৩ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ দিল্লিতে তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে মন্ত্রিবর্গ একীভূত বা যৌথ কর্মসূচি (Integrated Program of Action) নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির আওতায় সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এর আগেই অবশ্য সার্কের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়।

সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : সার্ক সনদে এ সংস্থার পাঁচ স্তরবিশিষ্ট একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন।
২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন।
৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি।
৪. টেকনিক্যাল কমিটি ও
৫. সার্ক সচিবালয়।

সার্কের মূলনীতি

ক. এ সংস্থার যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে।
খ. দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না।
গ. আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক লাভালাভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে।
ঘ. এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবন মান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা।
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৫. অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

সার্ক সচিবালয় : সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। ১৯৮৭ সালের ১৬ জানুয়ারি এটি উদ্বোধন করা হয়। সার্কের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটর করা, সংস্থার বিভিন্ন সভায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং সার্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করাই সার্ক সচিবালয়ের দায়িত্ব।

একজন সেক্রেটারি জেনারেল, ৭ জন পরিচালক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে সার্ক সচিবালয় গঠিত। সার্কের মহাসচিব ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী দুই বছরের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন। তার মনোনয়ন কোনো ক্রমেই এক মেয়াদের বেশি হবে না। সচিবালয়ের পরিচালকগণ সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক মনোনয়নের প্রেক্ষিতে সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হন, যা বিশেষ ক্ষেত্রে সেক্রেটারি জেনারেল আরো একটি পূর্ণ মেয়াদের জন্য বর্ধিত করতে পারেন।

সার্ক সনদ : ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনেই অনুমোদিত হয় সার্ক সনদ। এ সনদের আওতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

ক. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদের জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি।
খ. এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিশ্বাস, সামাজিক প্রগতি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দ্রুততর করা।
গ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতার প্রসার ও শক্তিবর্ধনে সাহায্য করা।
ঘ. পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ায় সাহায্য দান।
ঙ. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি।
চ. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
ছ. সমজাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা প্রসার।
জ. ঐসব লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা সম্পন্ন করা।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ : ১৯৮৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সদস্য রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ ১৮ বার শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। সর্বশেষ শীর্ষ বৈঠক হয় ২০১৪ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর নেপালের কাঠমান্ডুতে।

সার্কের সম্মেলনসমূহ

সম্মেলন	সাল	স্থান	চেয়ারম্যান
প্রথম	৭-৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫	ঢাকা, বাংলাদেশ	এইচ এম এরশাদ
দ্বিতীয়	১৬-১৭ নভেম্বর ১৯৮৬	ব্যাঙ্গালোর, ভারত	রাজীব গান্ধী
তৃতীয়	২-৪ নভেম্বর ১৯৮৭	কাঠমান্ডু, নেপাল	রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেব
চতুর্থ	২৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	বেনজির ভুট্টো
পঞ্চম	২১-২৩ নভেম্বর ১৯৯০	মালে, মালদ্বীপ	মামুন আবদুল গাইয়ুম
ষষ্ঠ	২১-২২ ডিসেম্বর ১৯৯১	কলম্বো, শ্রীলংকা	রানাসিংহে প্রেমাদাসা
সপ্তম	১০-১১ নভেম্বর ১৯৯৩	ঢাকা, বাংলাদেশ	বেগম খালেদা জিয়া
অষ্টম	২-৪ মে ১৯৯৫	নয়াদিল্লি, ভারত	নরসীমা রাও
নবম	১২-১৪ মে ১৯৯৭	মালে, মালদ্বীপ	মামুন আবদুল গাইয়ুম

সম্মেলন	সাল	স্থান	চেয়ারম্যান
দশম	২৯-৩১ জুলাই ১৯৯৮	কলম্বো, শ্রীলংকা	চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা
একাদশ	৪-৬ জানুয়ারি ২০০২	কাঠমান্ডু, নেপাল	শের বাহাদুর দেউবা
দ্বাদশ	৪-৬ জানুয়ারি ২০০৪	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	মীর জাফরুল্লাহ খান জামালি
ত্রয়োদশ	১২-১৩ নভেম্বর ২০০৫	ঢাকা, বাংলাদেশ	বেগম খালেদা জিয়া
চতুর্দশ	৩-৪ এপ্রিল ২০০৭	নয়াদিল্লি, ভারত	ড. মনমোহন সিং
পঞ্চদশ	২-৩ আগস্ট ২০০৮	কলম্বো, শ্রীলংকা	মাহিন্দ রাজাপাকসে
ষোড়শ	২৮-২৯ এপ্রিল ২০১০	থিম্পু, ভুটান	জিগমে ওয়াই থিনলে
সপ্তদশ	১০-১১ নভেম্বর ২০১১	আদ্দু সিটি, মালদ্বীপ	মোহাম্মদ ওয়াহিদ হাসান
অষ্টাদশ	২৬-২৭ নভে-২০১৪	কাঠমান্ডু, নেপাল	সুশীল কৈরালা

১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ২০১১ : সেতুবন্ধ রচনা

২০১১ সালের ১০-১১ নভেম্বর ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মালদ্বীপের আদ্দু শহরে। এ সম্মেলনে ৪টি চুক্তিসহ ২০ দফা আদ্দু ঘোষণা করা হয়।

এক সার্ক এক ভিসা : ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি দৃঢ়করণের লক্ষ্যে সার্কের দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ভিসা পদ্ধতি তুলে নিয়ে 'এক সার্ক এক ভিসা' নামের একটি পরিকল্পনা পেশ করে পাকিস্তান।

৪ চুক্তি স্বাক্ষর : ১১ নভেম্বর ২০১১ আটটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এগুলো হলো—সার্ক এগ্রিমেন্ট অন র‍্যাপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিজাস্টারস ⊙ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন মাল্টিল্যাটেরাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিকগনিশন অব কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট ⊙ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ইমপ্লিমেনটেশন অব রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস ⊙ সার্ক সিড ব্যাংক এগ্রিমেন্ট।

১৮তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৪ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর সার্কের ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের শেষ দিনে ২৭ নভেম্বর ২০১৪ 'সার্ক ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ফর এনার্জি কো-অপরারেশন (ইলেকট্রিসিটি)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে ৩৬ দফা কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী ১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০১৬ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে।

চেয়ারপার্সন : সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালা। ২৬ নভেম্বর ২০১৪ মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহ ইয়ামিনের কাছ থেকে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী ১৯তম শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি

সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় : ২০১০ সালের ২৬ আগস্ট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে শুরু হয় সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বা সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। সার্কভুক্ত আটটি দেশের ছাত্রছাত্রীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রথমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন চার হাজার ছাত্রছাত্রী। পরে অবশ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাত হাজারে উন্নীত করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অর্ধেক হবেন ভারতীয়। বাকিরা আসবেন সার্কের অন্য সাতটি সদস্য রাষ্ট্র থেকে।

সার্ক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এসএআরএসও) প্রতিষ্ঠা : সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা তথা পণ্যের আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে পণ্যের মান সকল দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে অভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং। ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দফতর হবে ঢাকায়। এটি ১২টি পণ্যের মান নির্ণয় করবে। পণ্যগুলো হচ্ছে– সিমেন্ট, ইলেকট্রিকস ক্যাবল, ভেজিটেবল ঘি, ইন্সট্যান্ট নুডলস, চিনি, পাট, টেক্সটাইলস ফ্যাব্রিক্স, স্ট্রাকচারাল স্টিল, স্টিল টিউবস, গ্যালভানাইজড স্টিল, স্কিমড মিল্ক পাউডার ও টয়লেট সোপ।

সন্ত্রাস দমনে তথ্য বিনিময় : সন্ত্রাসবাদ সার্ক অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। ইতোমধ্যে প্রায় সব দেশ সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন বোধ করে সার্ক দেশগুলো। এজন্য ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে 'এগ্রিমেন্ট অন এ মিউচুয়াল লিগ্যাল এসিস্ট্যান্স ইন ক্রিমিনাল মেটারস' নামক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ও সার্ক : ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক-এর প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাড়া জাগানো এ শীর্ষ বৈঠকে যোগদান করেন। তারা সহযোগিতা ও সমঝোতায় গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এ শীর্ষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম, নেপালের প্রেসিডেন্ট বীর বিক্রম শাহদেব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়াবর্ধনে।

ঢাকা ঘোষণা : সার্কের জন্মভূমি ঢাকায় এ যাবত তিনটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৯৩ সালে সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন এবং ২০০৫ সালে ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১৪ দফা ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ ঘোষণায় সাত নেতা আশা ব্যক্ত করেন যে, ঢাকা সম্মেলন ও নবগঠিত সার্ক দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, প্রগতি, আস্থা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে একত্র হয়ে অভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমতা ও সুযোগ-সুবিধার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যসমূহ সফল করার উদ্দেশ্যে সাত দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মাঝে মাঝে সম্মেলনে মিলিত হবার সম্মতি ব্যক্ত করেন। ঢাকা ঘোষণায় সাত দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম ক্ষমতা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, অন্য দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন না করা এবং জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সব সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম বলে তারা উল্লেখ করেন। এ ঘোষণায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশিত হয়। এতে সার্কভুক্ত দেশগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতার উত্তেজনাকর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে আণবিক অস্ত্র তৈরি, পরীক্ষা ও মজুদ করা ইত্যাদি পুরোপুরি বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা ঘোষণায় বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলোর চাহিদা পূরণে আন্তর্জাতিক

অর্থ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা হ্রাসের নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এসবের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান ও উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানানো হয়।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ঢাকা ঘোষণায় (১৯৯৩) সার্ক তৎপরতার ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মসূচিকে আরো সংহত ও জোরদার করা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও অবক্ষয়রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোট ৬৩ দফা সম্বলিত এই ঘোষণাপত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও জনসংখ্যা, বাসস্থান, শিশু, যুব, প্রতিবন্ধী, নারীকল্যাণ, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ছোট দেশগুলোর নিরাপত্তা, সকল পর্যায়ে যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংস্থায় পর্যবেক্ষক পর্যায়ে সদস্যপদ দান বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুদের রক্ষা, তাদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দানের অঙ্গীকার করে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ব্যাপারেও সার্ক নেতৃবৃন্দ একমত হন। দক্ষিণ এশিয়ার যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে অভিহিত করে ১৯৯৪ সালকে 'সার্ক যুব বর্ষ' ঘোষণার ব্যাপারেও তারা একমত হন।

১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কয়েকটি মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সহযোগিতার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১০ ভাগ শুল্ক কমানোর কথা বলা হয়েছে। অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর করা হবে। অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আরো কতিপয় জরুরি সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ২০০২ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ। নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০১ সালের মধ্যে SAFTA (South Asian Free Trade Area) গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ৮৪ দফা সম্বলিত ঐতিহাসিক কলম্বো ঘোষণায় ক. আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়ন, খ. অর্থনৈতিক সহযোগিতা ত্বরান্বিতকরণ, গ. জনগণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি, ঘ. ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বিধান, ঙ. সন্ত্রাস ও মাদক চোরাচালান বন্ধ, চ. ৭টি দেশের সার্কভুক্ত অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বারোপসহ বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানানো হয়।

২০০৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্কে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এ সম্মেলনে আফগানিস্তানকে সার্কের অষ্টম সদস্য এবং চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দান, ২০০৬-১৫ সালকে 'দারিদ্র্যমুক্ত সার্ক দশক' ঘোষণাসহ ৫৩ দফা ঢাকা ঘোষণা গৃহীত হয়। ঢাকা ঘোষণার প্রধান দফাগুলো—

- আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার।
- সার্ক ডেভেলপমেন্ট গোলস অনুমোদন।
- সার্ক দারিদ্র্য বিমোচন ফান্ড (এসপিএএফ) গঠনের সিদ্ধান্ত।
- সার্ক অর্থমন্ত্রীদের পরবর্তী বৈঠক হবে পাকিস্তানে।
- অর্থমন্ত্রীরা এখন থেকে প্রতি শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম ৪ মাসের মধ্যেই বৈঠক করবেন।
- অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ।
- ১ জানুয়ারি থেকে সাফটা কার্যকরের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ।

- সার্ক অঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত।
- পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে ট্রানজিটসহ অন্যান্য বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণে ঐকমত্য।
- সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রতিদিন বিমান চলাচল ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত।
- নন-ট্যারিফ এবং প্যারা-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ।
- নারী ও শিশুপাচার রোধে কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা।
- স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক উদ্যোগ গ্রহণে ঐকমত্য।
- রিজিওনাল এনভায়রনমেন্টাল ট্রিটি করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে।
- সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার।
- সদস্য দেশগুলোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বার্ষিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত।
- দেশগুলোর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ।
- রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ঐকমত্য।

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নকামী দেশগুলোর জনগণের সার্বিক উন্নতি সাধন, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ক। সার্কের মূলমন্ত্র হলো 'সংহতি, সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, উন্নয়ন, প্রগতি, সমৃদ্ধি ও শান্তি।' ইতিমধ্যে সার্ক অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সহযোগিতা সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ার এসব অঞ্চলের সমস্যা প্রকট কিন্তু আন্তরিক ও সহযোগিতার মনোভাব থাকলে কোনো সমস্যাই অনতিক্রম্য হয়ে উঠতে পারে না। ১৯৮৫ সালে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে 'ঢাকা ঘোষণা' দিয়ে ঢাকা থেকে সার্কের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল মাঝে সার্ক নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার গণমানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল— সবাই ভাবতে শুরু করেছিল সার্ক অকার্যকর ও স্তবির একটি সংস্থা। কিন্তু না, ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্ক পেয়েছে নতুন গতি। আজ আবার এখান থেকেই এক শক্তিশালী ও কল্যাণকামী সার্কের অগ্রযাত্রা শুরু হোক— এটাই বাংলাদেশসহ সার্ক অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় জনগণের প্রত্যাশা।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪। বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর : দীর্ঘ ২৩ বছর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর দক্ষ ও সুকৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। অতঃপর সেসব সংস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে কুড়িয়েছে বিশ্ববাসীর প্রশংসা এবং অর্জন করেছে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান। মুজিব-পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সরকারের আমলে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। শুধু ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ ১১টি আন্তজাতিক সংস্থার নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছে। তার আগের বছরগুলোতে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ডজনখানেক সংস্থাসহ ৩০-৩২টি ফোরামে বাংলাদেশ নেতৃত্ব প্রদান করেছে, যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে : বাংলাদেশ একটি দরিদ্র ও উন্নয়শীল দেশ হলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় গৌরবময় ভূমিকা রাখার দরুন বিশ্ব দরবারে এ দেশের অবস্থান অনেক উচ্চ আসনে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা (যেমন—CEDAW, UNHCR, UNFPA, UNICEF ইত্যাদি), IMSO, HFA প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে নিচে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

১. **ইউএনপিকেও (UNPKO) :** বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) সংস্থায়। ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক শান্তি মিশনে (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group—UNIIMOG) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের পথ চলা শুরু হয়। এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ অগ্রযাত্রা চলমান রয়েছে। সর্বশেষ (২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫) তথ্যানুযায়ী জাতিসংঘের চলমান ১৬টি মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ ১০টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। এগুলো হলো UNIFIL, MINURSO, UNMIL, UNOCI, MINUSTA, UNMID, MONUSCO, UNMISS, MINUSMA, MINVSCA। চলমান এসব মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে।

২. **সিডো (CEDAW) :** দীর্ঘকাল থেকে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দূর করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ Convention on the Eleminitation of all Forms of Discrimination Aganist Women (CEDAW)। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এ দলিলে স্বাক্ষর করে। CEDAW এর সদস্য পদে ২০১১-২০১৪ প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের জ্যৈষ্ঠ নারী কূটনীতিক ইসমাত জাহান। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে ইসমাত জাহান বাংলাদেশকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

৩. **আইপিইউ (IPU) :** বিশ্বের ১৬৪টি দেশের আইনসভার সংগঠন Inter Parliamentary Union (IPU). সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় ২০১৪ সালের ১২-১৬ অক্টোবর পাঁচদিনব্যাপী আইপিইউএর সম্মেলন (আইপিইউ-এর ১৩১তম সাধারণ অধিবেশন) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনজন প্রার্থীকে (ইন্দোনেশিয়ার সংসদ সদস্য নুরহায়াতি আলী আসিগাফ, মালদ্বীপের আইনসভার সাবেক স্পিকার আবদুল্লাহ শহীদ ও অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের স্পিকার ব্রনউইন বিশপ) পরাজিত করে আওয়ামী লীগের ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী আইপিইউ-এর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। সাবের হোসেন চৌধুরী নির্বাচনে ১৬৯ ভোট পেয়ে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে আইপিইউ-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনে সাবের হোসেন চৌধুরীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের স্পিকার ব্রনউইন বিশপ পান ৯৫ ভোট। সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় মাইলফলক অর্জনকারী সংস্থা IPU-এর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল ভূমিকা রাখছে।

৪. **সিপিএ (CPA) :** ১৯১১ সালে Commonwealth Parliamentary Association (CPA) এর যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সিপিএ-এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৩ সালে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর গণতন্ত্র, সুশাসন, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে সিপিএ। বর্তমানে ৫৩টি দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মিলিয়ে ১৭৫টি পার্লামেন্ট এই এসোসিয়েশনের সদস্য। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর সিপিএ-এর ৬০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াওন্দেতে। এই সম্মেলনে সরাসরি ভোটে ৭০টি ভোট পেয়ে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী সিপিএ'র চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ৩ বছর মেয়াদি এই পদে ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ক্যারিবীয় অঞ্চলের কেইম্যান আইল্যান্ডসের স্পিকার জুলিয়ানা ও'কনর। তিনি পান ৬৭টি ভোট। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট ডেপুটি স্পিকার থাকাকালে সিপিএ'র নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করেন।

৫. **ইউএনএইচআরসি (UNHRC) :** ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ United Nations Human Rights Council (UNHRC) এর সদস্য নির্বাচিত হয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ২০১৫-২০১৭ মেয়াদের জন্য ১৪৯ ভোটে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কাতার ও আইল্যান্ডকে হারিয়ে বাংলাদেশ ২০১৫-২০১৭ মেয়াদের দুই বছরের জন্য এই মানবাধিকার সংস্থার (UNHRC) সদস্য নির্বাচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করে আসছে।

৬. **ইন্টারপোল (INTERPOLE) :** ইন্টারপোল হলো আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের সনাক্ত ও ধরিয়ে দিতে এ সংস্থার বিকল্প নেই। ১৯২৩ সালে মাত্র ১৯টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এ সংস্থাটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে। ইন্টারপোলের সদস্যভুক্তির পর বাংলাদেশ পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে এ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের ভূমিকা ও প্রচেষ্টা ইন্টারপোলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে এ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ ও নতুন পরিকল্পনা দিয়ে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৭. **এইচএফএ (HFA) :** বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ক সংস্থা Hyogo Framework for Action (HFA)। বাংলাদেশ আগামী ৫ বছরের জন্য হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন (এইচএফএ) কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। বিগত দিনে বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্য হিসেবে ছিল। ১৪ মার্চ ২০১৫ জাপানের সেন্ডাই নগরীতে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে মনোনয়নের এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ হিউগো ফ্রেমওয়ার্কের সব শর্ত পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ শর্ত পূরণে আইনগত, উন্নয়ন পরিকল্পনা, দুর্যোগ হ্রাস বিষয়ক পরিকল্পনা ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৮. **আইএমএসও (IMSO) :** আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (আইএমও) আওতায় প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যভিত্তিক International Mobile Satellite Organization (IMSO)। এটি একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা, যা ১৯৭৭ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে। IMSO মূলত স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহনের নিরাপত্তা, বিপদের পূর্বাভাস, বিপদ বা দুর্যোগ কবলিত সমুদ্র পরিবহনের সন্ধান ও উদ্ধার কাজের সমন্বয়, সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য সম্প্রচার ইত্যাদি সেবা প্রদান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালে আইএমএসও এর সদস্যপদ লাভ করে। ইউরোপের বাইরে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ক্যাপ্টেন মঈন আহমদ ২০১৫ সালে আইএমএসও এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হন।

৯. **আইটিইউ (ITU) :** ১৭ মে ১৮৬৫ International Telecommunication Union (ITU) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি মূলত বিভিন্ন দেশের টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সমঝোতার উপর ভিত্তি করে মান অনুমোদন করে। এই সমঝোতা স্বাক্ষরকারী দেশগুলো এইসব নিয়ম বা অনুমোদিত মান মেনে চলার ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্য থাকে। বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। ২০১৪ সালের ২৭ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আইটিইউর বার্ষিক সম্মেলনে আইটিইউ সংস্থার নির্বাচনে বাংলাদেশ বিজয়ী হয়ে কাউন্সিল সদস্যপদ লাভ করে। নির্বাচনে ১৬৭ ভোটের মধ্যে ১১৫ ভোট পেয়ে বিশাল ব্যবধানে দ্বিতীয় বারের মতো ৪ বছর মেয়াদে সংস্থাটির কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ উক্ত সংস্থাটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১০. **উইটসা (WITSA) :** তথ্য অধিকার নিয়ে সরব বিশ্ব প্রতিষ্ঠান World Information Technology Services Alliance (WITSA)। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেক্সিকোর গুয়াদাজারায় অনুষ্ঠিত জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে WITSA-এর গ্লোবাল ট্রেড কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাংলাদেশের মো. সবুর খান। মো. সবুর খান চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে WITSA-এর উদ্দেশ্য (যেমন-শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আইটি পণ্য এবং পরিসেবার বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি) বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

১১. **আইএলও (ILO) :** আন্তর্জাতিক শ্রমমান নির্ধারণ, সামাজিক সুরক্ষা, কাজের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯১৯ সালে International Labour Organization (ILO) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এর সদস্য পদ লাভ করে ২২ জুন ১৯৭২। সম্প্রতি (জুন ২০১৪) বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের ডেপুটি মেম্বার নির্বাচিত হয়। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদে বাংলাদেশ এ দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ এ পদে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১২. **এসিইউ (ACU) :** আন্তর্জাতিক লেনদেন নিষ্পন্নকারী সংস্থা Asian Clearing Union (ACU) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে। ২৩ মে ২০১৪ ইরানের কিশ দ্বীপে অনুষ্ঠিত ACU-এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাটির সভাপতি নির্বাচিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ACU-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক লেনদেনে ভারসাম্য বজায় রাখা, পেমেন্ট ব্যবস্থা সহজীকরণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও স্থানান্তর খরচের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছে।

১৩. **সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ব্যুরো :** সাউথের সাথে সাউথের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ তার সহযোগী সংস্থা হিসেবে সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯ মে ২০১৪ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ব্যুরোর সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। দুই বছরের জন্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১৪. **আইওএসসিও (IOSCO) :** ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় International Organization of Securities Commision (IOSCO)। এর প্রয়োগ ও সহযোগিতা বিষয়ক (এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন) উপদেষ্টা পদে নিয়োগ লাভ করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (BSREC) নির্বাহী পরিচালক ফরহাদ আহমেদ। IOSCO-এর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নিয়োগ পাওয়া তিনিই প্রথম বাংলাদেশী নাগরিক।

১৫. **এপিআরএসিএ (APRACA) :** ১৯ মে ২০১৪ Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA)-এর ১৯তম সাধারণ সভায় দুই বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরী। বর্তমানে নতুন চেয়ারম্যান APRACA এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য টেকসই আর্থিক সহযোগিতা, গ্রামীণ অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে বাংলাদেশের সুকৌশলী নেতৃত্ব। যার দরুন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে এবং অগ্রগতির পথে ধাবমান হচ্ছে। বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সুনাম বৃদ্ধি তথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেতৃত্ব দানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

০৫। স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল পশ্চিমা শাসকবর্গের শাসন-শোষণের ফল। নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে আত্মত্যাগ ও ভারত-সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার চূড়ান্ত প্রতিফলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতাউত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয়। আর এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনসমূহ : কূটনীতি, বৈদেশিক নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, শিক্ষা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ ও প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন আশাতীত। নিচে স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে শেখ মুজিব সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফেরার পথে শশাংক শেখর ব্যানার্জির সাথে আলোচনা ও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে রাজি করান। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৭-১৯ মার্চ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হয়।

২. **বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি :** স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশ শুধুমাত্র ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) এবং ভুটান (৭ ডিসেম্বর ১৯৭১) এর স্বীকৃতি লাভ করে। বড় বড় পরাশক্তির নিকট থেকে তাই স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা বাংলাদেশের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক দক্ষতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশের সংখ্যা ১১৯টি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ ইরাক (৮ জুলাই ১৯৭২), প্রথম মুসলিম এবং আফ্রিকান দেশ সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) এবং প্রথম আমেরিকান দেশ বার্বাডোস।

৩. **মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক :** স্বাধীনতা উত্তরকালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের আরেকটি বড় সাফল্য হলো মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন । শেখ মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রনায়কই কমবেশি বিদেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যার দরুন বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ আজ ব্যাপকভাবে পরিচিত।

৪. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ :** স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর দক্ষ ও কৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। মুজিব পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সরকারের আমলে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথ, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ, ওআইসি ও আইডিবির সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ CEDAW, UNHCR, UNFPA, UNICEF, IMO, HFA, UNPKO, IPU, ITU, CPA, INTERPOLE, IMSO, WITSA, ILO, ACO প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

৫. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শুধুমাত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদই লাভ করেনি, পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। অতীতে যেমন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছে বাংলাদেশ, ঠিক তেমনি বর্তমানকালেও তা অব্যাহত রয়েছে। যেমন– ২০১৪ সালে CEDAW এর সদস্য পদে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হন ইসমাত জাহান। ২০১৪ সালে বিশ্বের ১৬৪টি দেশের আইনসভার সংগঠন আইপিইউ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশ্ববাসীকে অবাক করে বাংলাদেশের দশম সংসদের স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী সিপিএ এর ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউরোপের বাইরে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ক্যান্টেন মঈন আইএমএসও এর মহাপরিচালক নির্বাচিত হন ২০১৫ সালে।

৬. **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সাফল্য :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ ১৫ জন সেনাবাহিনীর সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন মিশনে অংশ নিয়ে এ পর্যন্ত ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৫৪টি মিশনে এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে ১০টি চলমান মিশনে বাংলাদেশ কাজ করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাফল্যের দরুন সিয়েরালিওন বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৭. **মাতৃভাষা আন্তর্জাতিকীকরণ :** মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখ ব্যক্তির বলিদানে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। তাই বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আর তাই এ বিরল ঘটনার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের UNESCO কর্তৃক ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। মাতৃভাষার এ আন্তর্জাতিকীকরণ বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সাফল্য।

৮. **সমুদ্র বিজয় :** দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিরল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমুদ্রবিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের সামনে আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক শান্তি প্রতিষ্ঠার নতুন নজির স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক আইনের ওপর আস্থা রেখে এবং সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল অব ল অব দি সি (ITLOS, ১৪ মার্চ ২০১২) এবং পার্লামেন্ট কোর্ট অব আরব্রিট্রেশন (CPA, ৮ জুলাই ২০১৪)-এর রায়ে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয় রচিত হয়। এই রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ১ লাখ ১৮ হাজার ৪১৩ বর্গকিমি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে ১ লাখ ১১ হাজার বর্গকিমি সমুদ্র অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এই সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ব্যাপক সম্পদ আহরণের পাশাপাশি নতুন নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ পেয়েছে।

৯. **এমডিজির আংশিক লক্ষ্য পূরণ :** বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। এমডিজির মোট ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪, ৫ ও ৬নং লক্ষ্য অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, এইচআইভি এইডস ও ম্যালেরিয়া দমনে বাংলাদেশ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এছাড়া ১, ২, ও ৩নং লক্ষ্য যথা– দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা নিবারণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্য এমডিজির লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১০. **আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ :** গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুস ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। ২০১০ সালে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ যুক্তরাজ্যের নাইট উপাধি লাভ করেন। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১০ সালে বাংলাদেশ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, ২০১৪ সালে ডিজিটাল ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ও শিক্ষার প্রসারে ভূমিকার জন্য সাউথ সাউথ পুরস্কার ও ২০১৩ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সাউথ সাউথ (আইওএসএসসি) পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো নানাবিধ পুরস্কার প্রাপ্তি বাংলাদেশকে সম্মানজনক স্থানে আসীন করেছে।

১১. **পোশাক রপ্তানিতে সাফল্য :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্যাপক সুনাম বয়ে এনেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্রেতা। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ৪% রপ্তানি করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্লেষকদের মতে, ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১০% এ উন্নীত হতে পারে।

১২. **আবিষ্কার :** ডা. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সফলভাবে উন্মোচিত হয় পাটের জিনোম সিকোয়েন্স বা পাটের জীবনরহস্য।

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এই বিজ্ঞানী। ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ে বসবাস করেন তিনি। পাট ছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হয়ে পেঁপে, মালয়েশিয়ার হয়ে রাবারসহ মোট আটটি উদ্ভিদের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কারের ঘোষণা দেন।

১৩. **খেলাধুলা :** আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জন কম নয়। ৩১ মার্চ ১৯৮৬ সালে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে), ১৯৯৭ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্বীকৃতি, আরো পরে ২০০০ সালে আইসিসি'র ১০ম পূর্ণ সদস্য হিসেবে টেস্ট মর্যাদা লাভ করে। ২০১১ সালে বিশ্বকাপ এবং ২০১৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসে বাংলাদেশে। জিম্বাবুয়ে, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে পাকিস্তানকে বাংলাদেশ হোয়াইট ওয়াশ (বাংলা ওয়াশ) করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করে। ৩৮তম জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করেছে যথাক্রমে গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ, গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান এবং গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার। এছাড়া অ্যাথলেট, ব্যাডমিন্টন ও গলফ খেলাতেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

১৪. **জাতিসংঘের অধিবেশনে অংশগ্রহণ ও ভাষণ :** ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এর কয়েকদিন পর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব সংহতকরণের সুযোগও সৃষ্টি হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ মাহমুদ আলী বলেন, সার্বিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি সংহতকরণে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকারের সাফল্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী ভঙ্গুর নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চরমপন্থীদের সহিংসতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

১৫. **এভারেস্ট জয় :** ২০১০ সালের ২৩ মে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন মুসা ইব্রাহিম। এরপর ২০১১ সালের ২১ মে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন এম এ মুহিত। ২০১২ সালের ১৯ মে নিশাত মজুমদার এবং সর্বশেষ ওয়াসফিয়া নাজনীন ২০১৩ সালের ২৬ মার্চ সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট চূড়া জয় করেন। মুসা ইব্রাহিম, মুহিত, নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজনীন বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রাপ্তির পাল্লা অপ্রাপ্তির চেয়ে অনেক বেশি ভারী। ব্যর্থতাগুলোকে জয় করে সফলতা ছিনিয়ে আনতে পারলে তা বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথকে আরও মসৃণ করে তুলবে। মোটকথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস ও জনসচেতনতা বাড়াতে পারলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। যার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো জরুরি।

০৬। অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহের বর্ণনা দিন।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এর অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে যেমন নানামুখী প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, তেমনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও নানামুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা এখন সময়ের দাবি। কেননা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্ব যেভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সে অগ্রসরমান মাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ যদি সম্মুখপানে অগ্রসর না হয় তবে অচিরেই দেশ বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ : বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দুর্নীতি, প্রশাসনে অস্বচ্ছতা, পরিবেশ দূষণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দারিদ্র্য, শিল্পে অনগ্রসরতা, কম মাথাপিছু আয় ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। অভ্যন্তরীণ এসব সমস্যার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশের জন্য নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা :** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা বর্তমানে বাংলাদেশের এক নম্বর বৈশ্বিক সমস্যা। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসকল দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দেড় মিটার বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় ২২ হাজার বর্গকিলোমিটার বা প্রায় ১৬% এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ুর এ পরিবর্তন অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সমুদ্র ১২০ কি.মি. এলাকার মধ্যে ঢুকে যাবে। এছাড়া নানাবিধ সমস্যার মুখে পতিত হবে বাংলাদেশ। সুতরাং এ ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলা করে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয় দান বাংলাদেশের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

২ **জঙ্গি মোকাবিলা :** দক্ষিণ এশিয়ায় যে হারে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ঘটছে তাতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ হুমকির সম্মুখীন। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান, আল-কায়েদা ও আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান এবং ভারতে আসামের উলফা গোষ্ঠীর উত্থান ও এদের

ধ্বংসযজ্ঞের প্রভাব ঐ সকল দেশ ছাপিয়ে বাংলাদেশেও আঘাত হানছে। তালেবান, আল-কায়েদা ও উলফার জঙ্গিরা বাংলাদেশেও নানা কায়দায় হামলা চালিয়ে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে ব্যস্ত। সুতরাং আন্তর্জাতিক এসব জঙ্গিগোষ্ঠীর মোকাবিলা করা বাংলাদেশ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৩. **এমডিজির লক্ষ্য পূরণ :** জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমডিজির ৮টি লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে পূরণ করার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত মাত্র ২টি লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ দুটি হলো- ক. মাতৃমৃত্যু হ্রাস ও খ. শিশুমৃত্যু হ্রাস। বাকি ৬টি লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এমডিজির লক্ষ্য পূরণ করাও বাংলাদেশের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

৪. **ভারতের সাথে পানি চুক্তির বাস্তবায়ন :** ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার ভারতের সাথে ফারাক্কার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশ পানির যে ন্যায্য হিসাব পাবার কথা তা পাচ্ছে না। ফলে খরা মৌসুমে বাংলাদেশের চাষাবাদ ব্যবস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অতএব, এটা স্পষ্ট যে, ভারতের সাথে পানি চুক্তির বাস্তবায়ন করে দেশের উত্তরাঞ্চলের চাষাবাদ ব্যবস্থায় সুবিধা আনয়ন করা জরুরি।

৫. **ভূমিকম্প মোকাবিলা :** ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিজ্ঞানীদের মতে, ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে ৭ রিখটার স্কেলের উপরে ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের অর্ধেকের বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। অথচ এ ভূমিকম্প মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। প্রস্তুতির অভাবের পাশাপাশি রয়েছে উন্নত যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা।

৬. **বৈদেশিক সাহায্য :** বৈদেশিক সাহায্য তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুন্নয়নের অন্যতম কারণ। তথাপি তারা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ না করে পারে না। কিন্তু এর বিরাট অংশ পুনরায় দাতাদেশের পকেটে ফেরত চলে যায়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আইডিবি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সাহায্য প্রদানের সাথে সাথে তাদেরও স্বার্থ উদ্ধারকারী নানা শর্ত চাপিয়ে দেয়, তা গ্রহীতা দেশের জন্য যতই প্রতিকূল হোক না কেন বাংলাদেশও এ প্রভাব থেকে এখন পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেনি।

৭. **আমদানি নির্ভরতা :** বহির্বাণিজ্য দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। বাংলাদেশ যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদেশ থেকে আমদানি করে। ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বাংলাদেশের প্রতিকূলে চলে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বৈদেশিক বাণিজ্য বাংলাদেশের আরেকটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ।

৮. **রপ্তানি বৃদ্ধি :** বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বাণিজ্যিক ভারসাম্য সর্বদাই বাংলাদেশের প্রতিকূলে। অর্থাৎ বাংলাদেশ যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানি করে। তাই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখতে রপ্তানি বৃদ্ধির বিকল্প নেই। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, চীন, জাপানসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। এ বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে এনে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৯. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগের ফলে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়, সৃষ্টি হয় নতুন কর্মসংস্থান, বৃদ্ধি পায় উৎপাদন। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগের ফলে নতুন প্রযুক্তির আদান প্রদান ঘটে। যা দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিদেশী বিনিয়োগসহ দেশীয় বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ খুব একটা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়াসহ প্রভৃতি দেশ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিতে অনেক উন্নত পর্যায়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

১০. **প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ একদিকে যেমন শিল্পের কাঁচামাল যোগায় তেমনি রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সাহায্য করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও এর অবস্থা একেবারে খারাপও নয়। আমাদের রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিনশিলা,কাঁচ বালি, খনিজ বালি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির বড় অভাব। এগুলো উত্তোলন করতে প্রায়শই আমাদের বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হয়।

১১. **আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থান :** একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব হলো মুক্ত বাণিজ্যের বিশ্ব। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব আজ সীমাবিহীন একক বাজারে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো আজ শঙ্কিত। এ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যেমন আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি সুযোগ রয়েছে লাভবান হওয়ার। কিন্তু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বেশ দুর্বল বিধায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে।

১২. **যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি :** দারিদ্র্যের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত বাংলাদেশে মূলধন গঠনের হার অত্যন্ত কম। ফলে শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল বিদেশ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি নির্ভরতা কমানোও বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ।

১৩. **প্রযুক্তি বিদ্যার আমদানি :** বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তিতে যে যত উন্নত সে তত এগিয়ে। তাই প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বাণিজ্যের মাধ্যমে নিত্য নতুন প্রযুক্তি আমদানি করে দেশকে সময়ের সাথে যুগোপযোগী করে তোলা যায়।

১৪. **খাদ্য ঘাটতি পূরণ :** খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশের একটি নিয়মিত ঘটনা। খাদ্য ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশ প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। কাজেই বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ বাংলাদেশের সরকারের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

১৫. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার :** বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ভাব ও সংস্কৃতি আদান-প্রদান ঘটে। ফলে বাণিজ্যরত দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ভাব ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান একে অপরকে পরিচিত করে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফলতা অনেক। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নে রোল মডেল হিসেবে দেখা হয়। তাই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করতে পারলে অচিরেই এদেশ আলোর মুখ দেখবে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

০৭ ▌ জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সম্পর্ক আলোচনা করুন।
অথবা, **'বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।**

উত্তর : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সরব ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে যথাযথ স্থান লাভ করে এবং জাতির কষ্টার্জিত রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে গঠনমূলক কর্মকুশলতা ও যথাযথ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতিসংঘে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়। ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রধান বা সদস্য নির্বাচিত হয়। সব মিলিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের যোগদান অনেকখানি সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়েছে।

জাতিসংঘের জন্ম : ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের সনদ রচনা করেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওকসের বৈঠকে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের গৃহীত প্রস্তাবসমূহের ওপর ভিত্তি করেই সনদ রচিত হয়। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। পোল্যান্ড সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলেও পরে এতে স্বাক্ষর করে প্রথম স্বাক্ষরকারী ৫১টি রাষ্ট্রের ১টিতে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর অধিকাংশ স্বাক্ষরকারী দেশের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের ছয়টি মূল অঙ্গ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. সাধারণ পরিষদ (General Assembly)
২. নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)
৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council)
৪. অছি পরিষদ (Trusteeship Council) *[১৯৯৪ সালে অছি পরিষদের কর্মকাণ্ডের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে]*
৫. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
৬. সচিবালয় (Secretariat)

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ : জাতিসংঘ হচ্ছে বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের স্বেচ্ছাচালিত একটি সংস্থা। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় দেশ যারা জাতিসংঘের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে আগ্রহী তারা ইচ্ছা করলে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। তবে সদস্য হওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ এবং সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির আবেদন করে। নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যসংক্রান্ত আবেদনটি উত্থাপন করলে চীন এর বিরোধিতা করে এবং এর বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করে (২৫ আগস্ট ১৯৭২)। কিন্তু জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির জন্য নেতৃবৃন্দের জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্দিবিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে। একই বছর (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত হয় এবং মুসলিম দেশসমূহের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। পাকিস্তানের স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি জোরালো ভিত্তি লাভ করে। এ সময় কাউন্সিলের ভেতরে এবং বাইরে বাংলাদেশ দক্ষ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতভাবে ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও তার বহু আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন যেমন— UNCTAD, WHO, IMF, IBRD ইত্যাদিতে যোগদান করে। কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু। এ সূত্র ধরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে সাবলীলভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষণ : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে ভাষণ দান করেন। মাতৃভাষা বাংলায় তিনি এই ভাষণ দান করেন। তার এ ভাষণে বাংলাদেশ যেমন স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী আনুষ্ঠানিক পরিচিতি পায়, তেমনি বাংলা ভাষাও বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়। প্রথম ভাষণে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য বিশ্ববাসীকে ধন্যবাদ জানান। জাতিসংঘের সনদসমূহের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তিনি বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলেন, তিনি কেবল বাংলাদেশের পক্ষে নয়, গোটা তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপূর্ণ বক্তৃতা রাখেন।

জাতিসংঘের উচ্চপদে বাংলাদেশ : বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছে এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলো :

- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী Human Rights Commission-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।
- শাহ এ এম এস কিবরিয়া ESCAP-এর নির্বাহী সচিবের পদমর্যাদায় ১৯৮১-৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- বিচারপতি টি এইচ খান International Criminal Tribunal-এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

– মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুস সালাম UN Peacekeeping Mission-এর কমান্ডার হিসেবে ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
– মিসেস সালমা খান CEDAW-এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে ২০০০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০২ সালের আগস্টে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন।
– পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের প্রধান সামরিক লিয়াজো অফিসার পদে ব্রিগেডিয়ার রিজাউল হায়দার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাফিজ ক্রোয়েশিয়া ও আইভরি কোস্টে প্রধান সামরিক লিয়াজো অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।
– জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রশাসন ও বাজেট সংক্রান্ত পঞ্চম কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আনোয়ারুল করিম চৌধুরী দায়িত্ব পালন করেন।
– ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির (ইকোনোমিক অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।
– ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
– ২৮ জুন ২০১০ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসমাত জাহান CEDAW কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
– ২৮ এপ্রিল ২০১০ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশ এশিয়ান গ্রুপ থেকে ২০১১-২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩ বছরের জন্য UNDP-এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়।
– ১০ নভেম্বর ২০১০ দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ UN Women-এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়।

পরবর্তীতে এগুলো ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংগঠন বা সংস্থার উল্লেখযোগ্য কিছু পদে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয় এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ : জাতিসংঘ ১৯৪৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ দায়িত্ব পালনকালে ১৬৫০-এর মতো শান্তি সেনা মারা গেছে। এদের জনবল, সরঞ্জাম ও রসদ যোগান দিয়েছে বিশ্বের ১৮০টি দেশ। শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এই মহান কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রায় ৮৪ জন শান্তি সেনা প্রাণ হারিয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও জাতিসংঘ : ১৯৭১ সাল থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ কার্যক্রমের লক্ষ্যবিন্দু। এ দেশের মানুষের দুর্ভোগ লাঘব এবং বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ মানবিক তৎপরতা শুরু করে। সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে জাতিসংঘ ব্যবস্থার ১১টি মিশন (UNDP, WFP, UNFPA, UNICEF, WHO, FAO, ILO, World Bank, IMF, UNHCR, UNESCO) বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছে। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তের উচ্ছেদ ঘোষণা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১৩ বছরব্যাপী কর্মসূচি চালানোর পর এ সাফল্য অর্জিত হয়। এছাড়া জাতিসংঘ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছে UNIC (United Nations Information Centre)।

লাগসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা : বাংলাদেশে উন্নয়ন সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের অবস্থান উল্লেখ করার মতো। দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, চাকরির

সুযোগ সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের মতো বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপসহ বাংলাদেশে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের ২০১০-১১ অর্থবছরে সাহায্যের পরিমাণ ১৬০.৩২ মিলিয়ন ডলার। এগুলোর মূলকথা হলো লাগসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সরকারি, বেসরকারি, উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি : খাদ্য ঘাটতি লাঘব এবং জরুরি কার্যক্রমে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও জরুরি ত্রাণকাজে WFP প্রায় ৪০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের খাদ্য সাহায্য প্রদান করেছে। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে WFP-এর দুটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু আছে— একটি পল্লী উন্নয়ন এবং অন্যটি দুস্থ পরিবার উন্নয়ন। সেই সাথে জনসংখ্যা কার্যক্রমের উন্নয়নে ১৯৭৪ সাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)।

শিশু অধিকার সংরক্ষণে UNICEF-এর ভূমিকা : বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় কমিটি ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপের মাধ্যমে UNICEF কার্য পরিচালনা করছে। UNICEF হচ্ছে জাতিসংঘের একমাত্র সংস্থা, যা একান্তভাবে শিশুদের প্রয়োজনে নিয়োজিত। শিশুদের পক্ষে কথা বলা এবং শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ UNICEF-এর কাজ। সম্প্রসারিত টিকাদান পদ্ধতির আওতায় অনূর্ধ্ব ১ বছর বয়সী সকল শিশুকে টিকা দানের কৃতিত্ব UNICEF-এর। UNICEF বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি যৌথ কর্মসূচিতে বিশ্বের শতকরা ৮০টি শিশুকে ঘাতক ব্যাধি পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া ও যক্ষ্মার টিকাদানের ফলে প্রতি বছর ৩০ লাখের বেশি শিশুর জীবন রক্ষা পাচ্ছে।

বাংলাদেশে FAO ও WHO-এর ভূমিকা : ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে FAO-এর প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় শতাধিক। একই সময়ে বাংলাদেশ ৮টিরও বেশি FAO-এর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে FAO-এর থানাভিত্তিক উন্নত খাদ্য উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সমন্বিত শস্য বালাই প্রতিরোধ কার্যক্রম, শস্যবীজ ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, পশুসম্পদ, বন ও পরিবেশ উন্নয়নে ২৭টির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে WHO।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন : বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক দপ্তর UNHCR।

বাংলাদেশের ILO-এর কার্যক্রম : জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার্যক্রম শুরু করে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ করে নারী ও শিশুর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে ILO-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে UNESCO-এর ভূমিকা : প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শান্তির ক্ষেত্র নির্মাণ ও পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশে UNESCO নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকা World Heritage Site-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া এ তালিকায় বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারও স্থান পায়। এ কৃতিত্বের দাবিদার UNESCO-এর World Heritage Committe। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)-এর সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

দিবস' হিসেবে উদযাপনের একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ থেকে বিশ্বের ১৯৩টি রাষ্ট্রে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। এছাড়াও World Bank এবং IMF-ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন ও বাংলাদেশ : ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ তিন দিনব্যাপী 'জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন' শেষ হয়। জাতিসংঘের ৫৫তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত এই সম্মেলনে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৫০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অংশগ্রহণ করেন। 'একুশ শতকে জাতিসংঘের ভূমিকা : দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী বিশ্বের ১০০ কোটি মানুষের জন্য ২০১৫ সাল নাগাদ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘের নিউইয়র্কস্থ সদর দপ্তরে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ এই শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। যে কোনো বিবেচনায় এ সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। এই সম্মেলন ছিল শুধু জাতিসংঘের নয়, বরং ইতিহাসের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ কূটনৈতিক সমাবেশ বা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মহা মিলনমেলা। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ভাষণ দেন এবং তিনি তার ভাষণে মানুষের কল্যাণে জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। বাংলাদেশে ডেঙ্গুজ্বর ও খাবার পানিতে আর্সেনিক সমস্যার উল্লেখ করে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এদিকে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ পনের সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ছিল নিরাপত্তা পরিষদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বৃহৎ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান পর্যায়ের সম্মেলন। এর আগে ১৯৯২ সালে নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে জনগণের ভোটে নির্বাচিত কোনো সাংবিধানিক সরকারকে অসাংবিধানিক উপায়ে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কমনওয়েলথের অনুরূপ ভূমিকা নেয়া যেতে পারে। তার মতে শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এটি অপরিহার্য।

একুশ শতকের জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি : অর্ধশতাব্দীর অধিককাল আগে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে কোনো হানাহানি, অবিচার, অন্যায় থাকবে না। জাতিসংঘ সনদের মূল কথাই ছিল বিবাদসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং যে কোনো বিশ্ব সংঘাত এড়ানোর জন্য এর সম্পদ এবং শক্তিসমূহ ব্যবহার করা। কালের বিবর্তনে জাতিসংঘ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বর্তমান সময়ে পৌঁছেছে। অনেক রকম বিতর্ক রয়েছে জাতিসংঘের ভূমিকার ব্যাপারে। সবকিছু মিলিয়ে জাতিসংঘের অস্তিত্বকে আজও অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একুশ শতকে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে :

১. **শান্তি প্রতিষ্ঠা :** জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণে বিশ্বাসী এবং এর জন্য যথাসাধ্য কাজ করে যাবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে NPT এবং CTBT-তে স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ CWC (Chemical Weapons Convention) এবং BTWC (Convention on Biological and Toxic Weapon)-এও স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২০০০ সালকে Year of the Culture and peace এবং ২০০১-২০১০ সাল পর্যন্ত দশককে The Decade of Culture of Peace হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানান। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় অবদান রাখার জন্য তিনি UNESCO পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশ কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করছে।

২. **মানবাধিকার :** মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের বিষয়টি মুখ্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের চর্চা এবং একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদে বাংলাদেশ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধের বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে বাংলাদেশ আশা করে।

৩. **উন্নয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা :** উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বাংলাদেশ জাতিসংঘে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চলতি শতাব্দীতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক বিষয়ই হবে একুশ শতকের মূল চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের দায়িত্ব হবে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক বিষয়গুলো উত্থাপন করা। একুশ শতকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। Least Developed Countries-এর জন্য বিষয়টি দারুণ খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করবে। Official Development Assistance (ODA)-এর হ্রাসমান প্রভাব এবং ঋণের সুদ প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত খারাপ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দরিদ্র দেশসমূহকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। একুশ শতকে জাতিসংঘকে এ বিষয়ে উদার এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। প্রতিটি উন্নত দেশ যেন তাদের GNP-এর ০.৭% উন্নয়নশীল দেশের জন্য বরাদ্দ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **দারিদ্র্য বিমোচন :** জাতিসংঘ দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। তবুও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র প্রতিহত করা বেশ কঠিন কাজ। একুশ শতকে দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গঠনের জন্য জাতিসংঘকে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাক্ষরতা বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হবে।

৬. **পরিবেশ ইস্যু :** নতুন শতকে পরিবেশগত বিষয়টি সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হিসেবে বিশ্বে আবির্ভূত হবে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধও জাতিসংঘের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. **নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা :** নারীর ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ ইতিমধ্যে অনেক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তবুও অনেক কিছুই করার বাকি রয়েছে। নারী নির্যাতন, নারী পাচার, শোষণ ইত্যাদি বিষয় অনেক জটিল আকার ধারণ করেছে। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। এ বিষয়ে জাতিসংঘকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্কের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নয়নের জন্য উভয়ের অংশীদারিত্ব। জাতিসংঘের বহু সংস্থা ও বিশেষায়িত এজেন্সির সঙ্গে বাংলাদেশের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং অনেকগুলোর কার্যনির্বাহী পরিষদে বাংলাদেশ একাধিকবার নির্বাচিত হয়েছে। অপরপক্ষে বাংলাদেশে এসব সংস্থা ও এজেন্সির মিশন রয়েছে। তবে বাংলাদেশ একুশ শতকে এ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আরো বিশাল অবয়বে দেখতে চায়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ রক্ষা, মানবাধিকার ও সমতাভিত্তিক উন্নয়নে জাতিসংঘ একুশ শতকে অধিক মাত্রায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে বাংলাদেশ প্রত্যাশা করে।

০৮ । জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্যপীড়িত স্বল্পোন্নত দেশ। দেশটির বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক শক্তি কাঠামোতে অবস্থান বিবেচনা করলেও মোটের ওপর দুর্বল অবস্থান সুস্পষ্ট। তথাপি বাংলাদেশ তার জন্মের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শান্তি ও সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচিতে সমর্থনদান এবং বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মধ্যে কুয়েতে স্থলমাইন অপসারণ এবং সিয়েরা লিওনের শান্তিরক্ষা ও পুনর্গঠনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে UNDP, UNICEF, UNESCO সহ বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিকাশ, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আবেদন করলে চীন নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়। চীনের যুক্তি ছিল উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে না আসায় বাংলাদেশ সদস্যপদ পেতে পারে না। ১৯৭৩ সালেও চীন আর একবার ভেটো প্রদান করে। অতঃপর পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

নিরস্ত্রীকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ নিরসনে বাংলাদেশের ভূমিকা : বাংলাদেশ 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' নীতিতে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির কথা এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি সংহতি ও সম্পর্ক জোরদার করার কথা। ৬০ নং ধারায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল জাতিসংঘ তা বন্ধ করতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত এনপিটি (NPT) চুক্তি ১৯৭০ সালে কার্যকর হয়। ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নিরস্ত্রীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৬ সালে পারমাণবিক নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে ঢাকায় একটি শান্তি সম্মেলন আয়োজন করে এবং একই বছর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনেও ভূমিকা রাখে। উভয় সম্মেলনেই বাংলাদেশ নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানায়। ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা হিসেবে ঘোষণার দাবি জানায় বাংলাদেশ। পরে এ সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটিতে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ভূমিকা : বাণিজ্য ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সম্মেলন বা আঙ্কটাডের চারটি অঙ্গের একটি হচ্ছে গ্রুপ-৭৭। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ক্ষমতা ও

রপ্তানি বৃদ্ধি এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ এই গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। বাংলাদেশ গ্রুপ ৭৭-এর পক্ষে বরাবরই বক্তব্য রেখেছে। ৩০ নভেম্বর, ১৯৯৯ যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে এবং ২০০৩ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে তাদের সমস্যা তুলে ধরে। বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ২০০৪ সালের পর আরো পাঁচ বছর অব্যাহত রাখার দাবি জানায়।

পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা : জাতিসংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। ১৯৯২ সালের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯৭ সালের কিয়োটো সম্মেলন এবং ২০০২ সালের বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনসহ প্রতিটিতে যোগ দেয় বাংলাদেশ। রিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে স্বাক্ষরিত আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন এবং জীববৈচিত্র্য কনভেনশন উভয় চুক্তি কার্যকর করে বাংলাদেশ এবং ১৯৯৪ সালে তা অনুমোদন করে। এছাড়া এজেন্ডা ২১-এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। ১৯৮৭ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রোটোকলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। কিয়োটো সম্মেলনে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় তাতে গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাসের ব্যাপারে একটি ঐকমত্য হয়। বাংলাদেশ এতেও স্বাক্ষর করে।

সমুদ্র সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে : সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনে অংশগ্রহণ এবং সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে বাংলাদেশের স্পষ্ট ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ ১২ নটিক্যাল মাইলের নিজস্ব সীমানার ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং সমুদ্র সংক্রান্ত সম্মেলনে ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ও স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। কনভেনশনে সমুদ্র বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক আইন গৃহীত হয় তা অনেকাংশ বাংলাদেশের দাবির প্রতিফলন। উল্লেখ্য, এই কনভেনশন আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারিত হওয়ার পাশাপাশি উপকূলবর্তী দেশসমূহ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত 'একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে' বিদ্যমান সম্পদের ওপর অধিকার ভোগ করবে এবং মহাদেশীয় সোপানে বিদ্যমান সম্পদের ক্ষেত্রে ২০০ নটিক্যাল মাইল আওতার বাইরেও রাষ্ট্রসমূহের অধিকার বজায় থাকবে।

অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসনে : মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয়দান এবং মিয়ানমারে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি জাতিসংঘের সহায়তায় ও দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সফলভাবে মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়েছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিনের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ভারতে অবস্থানরত প্রায় ৫০ হাজার চাকমা শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনে। এছাড়া দীর্ঘদিনের গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে উক্ত সমস্যাটি উত্থাপন করে কিন্তু সেনেগাল, অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার অনুরোধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসার জন্য অনুরোধ জানায়। মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া এবং গায়ানার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারত ফারাক্কা প্রশ্নে ঢাকায় একটি বৈঠকে বসতে রাজি হয়। ২০ নভেম্বর ১৯৭৬ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এক বিবৃতিতে উক্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং ফলাফল জাতিসংঘকে জানাতে অনুরোধ করে। ১৯৯৩ সালেও বাংলাদেশ পুনরায় উক্ত ইস্যুটি জাতিসংঘে উত্থাপন করে। অতঃপর ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ ৩০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং জাতিসংঘের মহাসচিব তা সমর্থন করেন।

আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনে : ২০ আগস্ট, ১৯৮৮ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত (মার্চ ২০১৫) জাতিসংঘের ৫৪টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ। জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের পাঠানো সেনাবাহিনীর সংখ্যা বর্তমানে প্রথম। কুয়েতে স্থল মাইন অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যথেষ্ট প্রশংসিত। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তানের আগ্রাসন এবং ১৯৭৮ সালে ভিয়েতনাম কর্তৃক কম্পুচিয়া দখলের পর বাংলাদেশ জাতিসংঘে এই আগ্রাসনের নিন্দা জানায়।

জাতিসংঘে বরাবরই বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি স্বার্থের পক্ষে মত দিয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে বক্তব্য আরব বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং এ কারণে ফিলিস্তিন সংক্রান্ত কমিটিতে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘে ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা অপরিবর্তিত রয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমিকা : জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও তহবিলে বাংলাদেশের অবদান খুবই নগণ্য। বাংলাদেশের এক্ষেত্রে অবদান মাত্র মোট বাজেটের ০.০১ শতাংশ। তবে বাংলাদেশ মনে করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ধনী দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ বাড়ানো উচিত এবং ধনী দেশগুলো তাদের জিএনপির ৭ শতাংশ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য হিসেবে দেয়া উচিত। জাতিসংঘের উদ্যোগে এ ব্যাপারে সম্মেলন করারও আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। অত্যন্ত গরিব দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ এবং কিস্তি পুনর্নির্ধারণেরও দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমের অবাধ যাতায়াত, উন্নত দেশগুলোর বাজারে গরিব ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার, উন্নত দেশগুলোর কৃষিতে ভর্তুকি হ্রাসসহ নানা ইস্যুতে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা রাখছে। কানকুন সম্মেলনে এ সকল দাবিতে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়ই ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্পর্কিত পশ্চিমা ধারণাকে সমর্থন করেনি। আশির দশকে জাতিসংঘে দেয়া বক্তব্যে বাংলাদেশ বলেছে, মানবাধিকারের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক উপাদান রয়েছে। এটিকে বাদ দিয়ে মানবাধিকারের কথা চিন্তা করা যায় না।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন : যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘ ও সহযোগী সংস্থাগুলো স্বাধীনতার পর থেকেই এখানে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন—

ক. **যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে সহায়তা :** বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম দেশটির জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর সহযোগিতায় এগিয়ে আসে জাতিসংঘ। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে গঠিত হয় UNROD যা পরে UNROB বা বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিশেষ ত্রাণ দপ্তর নামে পরিচিতি লাভ করে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য জাতিসংঘ ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করে। এবং বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সহযোগিতায় এ অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ফলে ১৯৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রায় ১.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও প্রকল্প সাহায্য লাভ করে, যা কেবল জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

খ. **গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন :** বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক বিপুল পরিমাণ ঋণ ও প্রকল্প সাহায্য দিয়ে আসছে। তাছাড়া গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে UNDPসহ অন্যান্য সংস্থা ব্যাপক অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

গ. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন :** জাতিসংঘ তার অন্যান্য সদস্যের মতো বাংলাদেশেও দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। UNICEF দেশের সরকার, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থা সংগঠনের সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং নারী ও শিশু উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে। এ সকল ক্ষেত্রে UNDP বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে তাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে জনগণকে সরাসরি সেবা ও উপকরণ বিতরণসহ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে UNICEF এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য—এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে WHO। তাছাড়া জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা সহায়তা করছে।

ঘ. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশে সকল সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কাজ করছে UNFPA। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি জনগণের মাঝে জনসংখ্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আশার কথা হলো, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করছে।

ঙ. **সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ঐতিহ্য রক্ষা :** বাংলাদেশের জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ঐতিহ্য রক্ষায় সহায়তা দিচ্ছে UNESCO। ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর UNESCO সুন্দরবনকে World Heritage Sight ঘোষণা করে। তাছাড়া বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারও এ তালিকায় স্থান পায়। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে UNESCO একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিলে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া UNEP বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে।

চ. **অন্যান্য :** উপরে বর্ণিত ক্ষেত্র ও সংস্থা ছাড়া জাতিসংঘের আরো কতিপয় সংস্থা ও সংগঠন বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন—জাতিসংঘ সংক্রান্ত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য প্রদানে সেবা দিচ্ছে UNIC। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে UNHCR। FAO বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে নানাভাবে সহায়তা করছে। WFP বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে কার্যক্রম শুরু করে এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থাটি বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সাহায্য দিয়ে আসছে।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশ যে ভূমিকা রেখেছে তার স্বীকৃতিও পেয়েছে দেশটি। ১৯৭৯-৮০ এবং ২০০০-২০০১ সময়ের জন্য বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচিত হয়। এছাড়া ১ জুন ২০০১ বাংলাদেশ এক মাসের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তোলেন। সর্বোপরি বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বশান্তি রক্ষা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ, বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করে আসছে। এছাড়া জাতিসংঘ বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

০৯। বৈদেশিক সাহায্য কি? বাংলাদেশে কি কি উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর : বর্তমান সময়ে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকর্তৃক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা দারুণভাবে সমাদৃত। আর সেজন্য উন্নয়নমূলক বাজেট প্রণয়নও এখন রাষ্ট্রগুলোর কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করতে গিয়ে বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র যখন ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করতে শুরু করলো, তখন আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করা একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেল। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলোর উচ্চভিলাসী বাজেটের অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য দেশীয়ভাবে সম্ভব না হওয়ায় বিদেশি দাতা সংস্থা বা দেশগুলোর সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে দরিদ্র দেশগুলোতে উৎপাদনশীল খাতগুলোতে বিনিয়োগের চেয়ে সৌন্দর্য্য বর্ধনমূলক খাতে বেশি বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন না বাড়ায় বিদেশি সাহায্যের নির্ভরশীলতা থেকে দরিদ্র দেশগুলো বের হয়ে আসতে না পারায় ধনী দেশিগুলোর করোদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বৈদেশিক সাহায্য : বৈদেশিক সাহায্য নামক ব্যাপারটির সাথে আমরা সবাই কম-বেশি পরিচিত। উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রদত্ত আর্থিক ও দ্রব্য সহায়তাই হলো মূলত বৈদেশিক সাহায্য। সাধারণত ঐসব দেশে অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এসব সাহায্য প্রদান করা হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী—Foreign aid, the international of transfer of capital, goods or services from a country or international organization for the benefit of the recepient country or its population. Aid can be economic military, or emergency humanitarian (e.g. aid given following natural disasters)

বাংলাদেশে প্রচলিত মানরীতি অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য বলতে কেবল বেয়াতি শর্তাবলিতে প্রাপ্ত ঋণ ও দান বোঝায়। বাংলাদেশে বিদেশি ঋণদাতাদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ বিশেষ দেশ, বহুজাতিক অর্থ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিকরণ হয় সাহায্যের শর্ত উৎস ও ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে। নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য হলো ঋণ ও অনুদান। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাহায্য, অথবা খাদ্যসাহায্য, পণ্যসাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।

বাংলাদেশে কি কি উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে?

গুরুতর আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতার উষালগ্নে দেশটির শিল্প উৎপাদন প্রায় বন্ধই ছিলো; কৃষি উৎপাদানে দারুন অবনতি হয়েছিল এবং স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও বিপুল বৈদেশিক সাহায্যের ধারাবাহিক প্রবাহ ব্যতীত একটা নতুন জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা ও টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রধানত দুভাবে আসে। যথা - (i) ঋণ ও (ii) অনুদান।

(i) **ঋণ :** বাংলাদেশের বাজেট ঘাটতি হ্রাস, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন ধনী দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো ফেরতযোগ্য স্বল্প সুদে বা নামমাত্র সুদে যে অর্থ সাহায্য দেয় প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঋণ। বৈদেশিক ঋণকে বৈদেশিক সাহায্য বলার কারণ হলো— দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান যেহেতু সুদশর্তে হলেও কোনো না কোনো সংস্থা বা দেশ থেকে পাওয়া যায় এবং দেশের উন্নয়ন কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়।

(ii) **অনুদান :** ধনী দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো শর্তহীন, অফেরতযোগ্য, সুদহীন যে সাহায্য বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে দেয় তাকে বৈদেশিক অনুদান বলে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ইতিহাস শুরু হয় স্বাধীনতার কিছুকাল পর হতে। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য মূলত তিনটি চ্যানেলের মাধ্যমে আসে। এগুলো হলো— ১. খাদ্য সাহায্য, ২. পণ্য সাহায্য ও ৩. প্রকল্প সাহায্য।

১. **খাদ্য সাহায্য :** স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ খাদ্য সাহায্য ও দুর্যোগকালে ত্রাণ সাহায্যরূপে ব্যাপকভাবে বৈদেশিক সাহায্য পেতে শুরু করে। দেশের উন্নয়নের প্রয়োজন আরো বেশি অনুভূত হওয়ায় সাহায্য ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পরিমাপের বৃদ্ধি অনুযায়ী সাহায্যও বিভিন্নমুখী হয়ে পড়ে।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ খাদ্য পেয়েছিল ১৮২.৫৫ মিলিয়ন ডলারের। এটা দু বছরের মধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এ প্রবৃদ্ধি ১৯৮০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐ বছরেই খাদ্যসাহায্যের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায় এবং এ খাতে বাৎসরিক সাহায্য প্রবাহ ২০০ মিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায়। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে মোট খাদ্য সাহায্য ছিল বাংলাদেশের সকল ধরনের বৈদেশিক সাহায্যের পুঞ্জীভূত পরিমাণের ১৬.৮%। ১৯৮১/৮২ সাল থেকে ১৯৯৯/২০০০ সাল পর্যন্ত ১৯ বছরের সময়কালের পরিসংখ্যান থেকে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, গড়পড়তা, প্রতি বছরে ২.০৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছিল এবং এর ৫০% খাদ্যসাহায্য হিসেবে এসেছিল। বাংলাদেশে খাদ্য সাহায্যের প্রায় পুরোটাই (৯৯%-এরও বেশি) ছিল গম এবং প্রতিশ্রুত ও প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্যের সবটাই ছিলো অনুদান। খাদ্যসাহায্য প্রদানের দাতাসংস্থা ও দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউএন সিস্টেম (প্রধানত, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, কানাডা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া।

২. **পণ্য সাহায্য :** পণ্য সাহায্য ব্যবহৃত হয়েছে মূলত লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে এবং স্থানীয় মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় মেটাতে। বাংলাদেশে ১৯৭২-৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে মোট পণ্যসাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল ১০.৩৯ বিলিয়ন ডলারের পাওয়া গিয়েছিল ১০.০৯ বিলিয়ন এবং ঐ সময়ের মধ্যে পণ্যসাহায্য ছিল মোট সাহায্যর ২৯%। পণ্যসাহায্য ১৯৯৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তারপর এর হ্রাস ঘটে। বাংলাদেশে পণ্য সাহায্য অনুদান ও ঋণ হিসেবে প্রায় সমানভাবে এসেছে এবং ১৯৯০-এর দশকে পণ্যসাহায্য ঋণের গড় বার্ষিক অংশ ছিল ৪৮%। বাংলাদেশে পণ্যসাহায্যদাতা প্রধান দেশের মধ্যে রয়েছে জাপান, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস্, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

৩. **প্রকল্প সাহায্য :** বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের বৃহদাংশ হলো প্রকল্প সাহায্য। ১৯৭২-৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে ২৬.১৭ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প সাহায্যর প্রতিশ্রুতি ছিলো। এর মধ্যে ১৮.৮৪ বিলিয়ন ডলার পাওয়া যায়। ঐ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে পুঞ্জীভূত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের অংশ ছিল ৫৪.১৯%। একই সময়ে কারিগরি সহযোগিতা ছিল মোট সাহায্যের প্রায় ৪%। গড় বার্ষিক প্রকল্প সাহায্যের ৬৩% ভাগ ঋণ হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল, বাকিটা অনুদান হিসেবে। এডিবি, আইডিএ, ইফাদ ও ওপেক হলো প্রধান বহুপাক্ষিক দাতা গোষ্ঠীর একক নেতা। অন্য দাতা দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্রান্স, সৌদি আরব ও চীন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদান : ঋণ ও অনুদান এ দুটি হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যর মূল উৎস। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অর্থবছরে

অনুদানের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। নিচে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের একটা সারণি দেওয়া হলো—

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		
	অনুদান	ঋণ	মোট
২০১০-১১	৭৪৫	১০৩২	১৭৭৭
২০১১-১২	৫৮৮	১৫৩৮	২১২৬
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১
২০১৩-১৪	৩১৮	১৫০৯	১৮২৭

[উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত)]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে এখন বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। সাহায্যপ্রার্থী দেশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে দাতাগোষ্ঠীগুলোকে তাদের বাজেট করার সময় প্রায়শ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। দাতা গোষ্ঠীগুলোর অনুদানের তুলনায় শর্তাধীন ঋণের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে তাতে বিষয়টা যা দাড়ায় তা হলো ঋণের ভারে জর্জরিত থাকা। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশীয় অর্থায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

১০। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষী মিশন গঠিত হয়েছে? বর্তমানে বাংলাদেশ কোন কোন মিশনে শান্তিরক্ষায় কাজ করছে?

উত্তর : পৃথিবী জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুকাল পর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন। United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) মিশনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের মে মাসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন তার যাত্রা শুরু করে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ১৫ জন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা নিয়ে United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) মিশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে যাত্রা শুরু করে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন : ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বর্তমান (মার্চ ২০১৫) পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ৬৯টি মিশন গঠন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ৬৯টি মিশনের মধ্যে ৬৩টি মিশন সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ১৯টি মিশন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংঘাত-কলহ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিচে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন কর্তৃক সমাপ্ত ও চলমান মিশনগুলোর তালিকা ছকে উল্লেখ করা হলো :

ক. সমাপ্ত মিশনসমূহ :

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন কর্তৃক ৬৩টি সমাপ্ত মিশনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে ছকের আকারে দেখানো হলো :

মিশনের নাম	শুরুর তারিখ	সমাপ্ত তারিখ
First United Nations Emergency Force (UNEFI)	নভেম্বর ১৯৫৬	জুন ১৯৬৭
United Nations Operation in the Congo (ONUC)	জুলাই ১৯৬০	জুন ১৯৬৪
United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG)	আগস্ট ১৯৯৩	জুন ২০০৯
United Nations Observer Mission in Liberia (UNOMIL)	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
United Nations Mission in Bosnia and Harzegovina (UNMIBH)	ডিসেম্বর ১৯৯৫	ডিসেম্বর ২০০২
United Nations Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL)	জুলাই ১৯৯৮	অক্টোবর ১৯৯৯
United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)	অক্টোবর ১৯৯৯	মে ২০০২
United Nations Operation in Burundi (ONUB)	জুন ২০০৪	ডিসেম্বর ২০০৬
United Nations Mission in the Sudan (UNMIS)	মার্চ ২০০৫	জুলাই ২০১১
United Nations Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT)	সেপ্টেম্বর ২০০৭	ডিসেম্বর ২০১০

খ. চলমান মিশনসমূহ :

বর্তমানে (এপ্রিল ২০১৪) বিশ্বব্যাপী ১৯টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কাজ চলমান রয়েছে। নিচে এগুলো ছকের আকারে উল্লেখ করা হলো :

মিশনের নাম	শুরুর তারিখ
United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)	মে ১৯৪৮
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)	জানুয়ারি ১৯৪৯
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)	মার্চ ১৯৬৪
United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)	জুন ১৯৭৪
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)	মার্চ ১৯৭৮
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)	এপ্রিল ১৯৯১
United Nations Interim Administration Mission in KOSOVO (UNMIK)	জুন ১৯৯৯
United Nations Mission in Liberia (UNMIL)	সেপ্টেম্বর ২০০৩
United Nations Operation in Cote d'Ivoire (UNOCI)	এপ্রিল ২০০৪
United Nations Stabilization in Haiti (MINUSTAH)	জুন ২০০৪
African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)	জুলাই ২০০৭
United Mission in Nepal (UNMIN)	২০০৭
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MOUSCO)	জুলাই ২০১০
United Nations Organization Interim Security Force for Abyei (UNISFA)	জুন ২০১১
United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)	জুলাই ২০১১
United Nations Multidimensional Integrated Stabilizasion Mission in Mali (MINUSMA)	এপ্রিল ২০১৩
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA)	এপ্রিল ২০১৪
United Nations Logistic Base (UNLB)	–
United Nations Headquarter (UNHQ)	–

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের যেসব মিশনে কাজ করছে : ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়ে এ পর্যন্ত (মার্চ ২০১৫) ৫৪টি মিশনে অংশ নিয়েছে এবং ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিশন হলো– UNAMA (আফগানিস্তান), UNSMA/UNGOMAP (আফগানিস্তান-পাকিস্তান), UNBIH (বসনিয়া), BINUB (বুরুন্ডি), UNMEE (ইথিওপিয়া/ইরিত্রিয়া), UNMIK (কসোভা) ইত্যাদি। ৩৭টি মিশনে বাংলাদেশের ১,২১,৪০৭ জন শান্তিরক্ষী অংশ নেন। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর ১,০২,৪৯৯ জন, নৌবাহিনীর ২,৭৬৭ জন, বিমানবাহিনীর ৩,৫৯০ জন এবং পুলিশবাহিনীর ১২,৫৫১ জন অংশ নেন এসব মিশনে। বর্তমানে (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তথ্যানুযায়ী) বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের চলমান ১৬টি মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে কাজ করছে। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক্রমিক নং	দেশ	মিশনের নাম	মোট (জন)
১.	লাইবেরিয়া	UNMIL	৫৪২
২.	আইভরি কোস্ট	UNOCI	২,৩৭৩
৩.	দক্ষিণ সুদান	UNMISS	৩০৩
৪.	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো	MONUSCO	২,৯৫৩
৫.	সুদান (দারফুর)	UNAMID	৯৩২
৬.	লেবানন	UNIFIL	৩২৬
৭.	পশ্চিম সাহারা	MINURSO	২৯
৮.	মালি	MINUSMA	১৮৫
৯.	হাইতি	MNUSTAO	৩২৩
১০.	নেপাল	UNMIO	১
		মোট	৭,৯৬৭

১. **UNMIL (লাইবেরিয়া) :** ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে লাইবেরিয়ার সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে সংঘাতের দরুন অসংখ্য লোক প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দেশ সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায়। তাছাড়া প্রতিনিয়ত মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এহেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন United Mission in Liberia (UNMIL) নামে একটি মিশন গঠন করে ২০০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। পরবর্তীতে UNMIL মিশনটি লাইবেরিয়ায় প্রেরণ করে। এতে বাংলাদেশের ৫৪২ জন সদস্য অংশ নেন।

২. **UNOCI (আইভরি কোস্ট) :** আইভরি কোস্টের জাতিগত সংঘাতের দরুন বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা যখন বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম, ঠিক সেই মুহূর্তে জাতিসংঘ সনদের চ্যাপ্টার VII অনুযায়ী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে গঠন করা হয় United Nations Operation in cote d'Ivoire (UNOCI) মিশন। এ মিশনের প্রাথমিক সময়সীমা ছিল এপ্রিল ২০০৪ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আইভরি কোস্টের সংঘাতের অবসান না হওয়ায় এর সময়সীমা বৃদ্ধি পায়। UNOCI মিশনে বাংলাদেশের ২,৩৭৩ জন নিয়োজিত রয়েছে। চলমান মিশনগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশী সদস্য রয়েছে এ মিশনে।

৩. **UNMISS (দক্ষিণ সুদান) :** ৯ জুলাই ২০১১ দক্ষিণ সুদান নামক দেশ পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়ার একদিন আগে অর্থাৎ ৮ জুলাই ২০১১ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল রেজুলেশন ১৯৯৬ (২০১১) অনুযায়ী United Mission in South Sudan (UNMISS) মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগঠিত দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মিশনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ মিশনে বাংলাদেশের ৩০৩ জন সদস্য কাজ করছেন।

৪. **MONUSCO (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো) :** ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর সংঘাত নিরসনে ৩০ নভেম্বর ১৯৯৯ প্রতিষ্ঠা করা হয় United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC)। ২০১০ সালে এলে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO)। ৯ এপ্রিল ২০১৫ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের শান্তি মিশনে যোগ দিতে ঢাকা ত্যাগ করে বাংলাদেশ নারী পুলিশের দ্বিতীয় কনটিনজেন্ট (১২৫ সদস্য)। এ মিশনে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য নিয়োজিত রয়েছেন। নিয়োজিত সদস্যের সংখ্যা ২,৯৫৩ জন।

৫. **UNAMID (সুদান, দারফুর) :** আফ্রিকার অন্যতম সংঘাতপূর্ণ স্থান সুদানের দারফুর। এ সংঘাতপূর্ণ স্থানে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে United Nations Security Council Resolution 1769 অনুসারে ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই গঠন করা হয় United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID)। এ মিশনে বাংলাদেশের ৯৩২ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

৬. **UNIFIL (লেবানন) :** লেবানন থেকে ইসরাইলের সৈন্য প্রত্যাহারের লক্ষ্যে United Nations Security Council Resolution 425 and 426 অনুযায়ী ১৯ মার্চ ১৯৭৮ সালে গঠিত হয় United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)। মিশনের উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়ার দরুন এখনো এ মিশন কাজ করে যাচ্ছে। UNIFIL মিশনে বাংলাদেশের ৩২৬ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

৭. **MINURSO (পশ্চিম সাহারা) :** পশ্চিম সাহারার বিবদমান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে United Nations security Council Resolution 690 অনুযায়ী ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ গঠিত হয় United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)। এ মিশনে বাংলাদেশের ২৯ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

৮. **MINUSMA (মালি) :** সংঘাত জর্জরিত দেশগুলোর মধ্যে মালি অন্যতম। মালির সংঘাত নিরসনে United Nations Security Council Resolution 2100 অনুসারে ২৫ এপ্রিল ২০১৩ গঠিত হয় United Nations Multidimentional Integrated Stabilization Mission in Muli (MINUSMA)। এ মিশনে বাংলাদেশের ১৮৫ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

৯. **MNUSTAH (হাইতি) :** আফ্রিকার আরেকটি সংঘাতপূর্ণ ও অশান্ত দেশের নাম হাইতি। হাইতির সংঘাত নিরসনে United Nations Stabilization Mission in Haiti (MNUSTAH) মিশন গঠিত হয় ১ জুন ২০০৪ সালে। United Nations Security Council Resolution 2180 অনুসারে এ মিশনের মেয়াদকাল ১৪ অক্টোবর ২০১৪ হতে ১৫ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত। এ মিশনে বাংলাদেশের ৩২৩ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

১০. **UNMIN (নেপাল) :** ২০০৬ সালের ২১ নভেম্বর, 'Comprehensive Peace Agreement' স্বাক্ষরের মাধ্যমে নেপাল সরকার ও মাও বিদ্রোহীদের সংঘাতের অবসান ঘটে। অতঃপর নেপালে মাওবিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণ ও সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচন ২০০৭ এর প্রস্তুতিতে সহায়তা ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে United Nations Mission in Nepal (UNMIN) গঠিত হয় ২৩ জানুয়ারি ২০০৭। UNMIN মিশনে বাংলাদেশের ১ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে শান্তিরক্ষী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ প্রতিটি দেশে প্রেরিত বাংলাদেশের এসব শান্তিরক্ষীরা যেমন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তেমনি বয়ে এনেছেন দেশের জন্য সুনাম। পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রায় ২ হাজার সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে প্রায় ১০টি দেশে কর্মরত থেকে বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছেন। আবার ১৯৮৯-২০১৪ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোট ১১২ জন সদস্য নিহত এবং ১৫৪ জন সদস্য আহত হয়েছে। মোটের উপর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান অপরিসীম।

১১। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা আলোচনা করুন।
***অথবা,* জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত যেসকল মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা করুন।**

উত্তর : বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অংশ হিসেবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে শান্তিরক্ষী মিশন প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধ কিংবা বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে ভারসাম্য আনয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো বাহিনী নেই। এর সদস্য দেশগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে শান্তিরক্ষী মিশনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রথম শান্তিরক্ষী মিশনে সৈন্য নেওয়া হয় ১৯৮৮ সালে। এ পর্যন্ত (মার্চ ২০১৫) বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ৫৪টি মিশনে অংশ নিয়ে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং বিশ্বব্যাপী দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা : ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ ১৫ জন সেনাবাহিনীর সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ পর্যন্ত (মার্চ ২০১৫) বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৬৯টি মিশনের মধ্যে ৫৪টি মিশনে অংশ নিয়ে ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ৩৭টি মিশনে বাংলাদেশের ১,২১,৪০৭ জন শান্তিরক্ষী অংশ নেন। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর ১,০২,৪৯৯ জন, নৌবাহিনীর ২,৭৬৭ জন, বিমানবাহিনীর ৩,৫৯০ জন এবং পুলিশবাহিনীর ১২,৫৫১ জন অংশ নেন এসব মিশনে। নিচে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ আলোচনা করা হলো :

ক. **সেনাবাহিনী :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা নীল হেলমেট মাথায় নিয়ে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অসামান্য সাফল্যের ইতিহাস তৈরি করেছেন। নিচে এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো :

১. **সাবেক যুগোশ্লাভিয়া :** ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনী বিহাচে (Bihac) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এমনকি বসনিয়া ও ক্রোয়াট বাহিনী দ্বারা বেশ কয়েক সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পরও বাংলাদেশী সেনা সদস্যরা বিহাচে সততা ও দৃঢ়তার সাথে তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে জাতিসংঘের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন।

২. **সোমালিয়া :** ১৯৯৫ সালে সোমালিয়ায় জাতিসংঘের মিশন ইউনোসোম (UNOSOM) জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ সময় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তাদের সাহস ও মনোবলের মাধ্যমে শান্তিমিশন শেষ হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘের বেসামরিক কর্মীদের এবং অন্যান্য সামরিক কন্টিনজেন্টের জন্য নিরাপদ প্রস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করেন।

৩. **কঙ্গো প্রজাতন্ত্র :** ২০০৩ সালে যখন ব্যাপক ও বিস্তৃত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, তখন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কঙ্গোর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সেনা অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করে। কঙ্গোর মামবাসা অঞ্চলে বিদ্রোহীদের (মাই মাই সিমবা) প্রতিহত করে শহর থেকে তাদের বিতাড়ন করায় ফোর্স কমান্ডার বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কঙ্গোর সরকারি বাহিনীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

৪. **আইভরি কোস্ট (ইউনোসি) :** আইভরি কোস্টে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সবচেয়ে গোলযোগপূর্ণ এলাকা আবিদজান, ডালোয়া, মান এবং বহুল আলোচিত গালফ হোটেলে অবস্থানরত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রেসিডেন্ট আলাসান ওয়াতারার নিরাপত্তার দায়িত্বে সাফল্যের সঙ্গে নিয়োজিত ছিলেন। আবিদজানে নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টগুলো বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের ৬০ জনেরও বেশি কূটনীতিককে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও সফলভাবে সম্পন্ন করে। ফোর্স দপ্তরের সামরিক ও বেসামরিক সব সদস্যের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও সাফল্যের সঙ্গে নিশ্চিত করেন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা।

৫. **দক্ষিণ সুদান (আনমিস) :** দক্ষিণ সুদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জুবা অঞ্চলে নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টগুলো তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত গণভোট সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে। এটি দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

৬. **লাইবেরিয়া (আনমিল) :** আইভরি কোস্টের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি চলাকালে লাইবেরিয়ায় নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টগুলো প্রত্যক্ষভাবে শরণার্থী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সীমান্ত অঞ্চলে নিয়োজিত ছিল। শরণার্থী নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশী কন্টিনজেন্ট কুটুও নামক স্থানে একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করে। সামগ্রিকভাবে লাইবেরিয়ার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষ করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রকৌশল সহায়তায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ইতিবাচক ভূমিকায় স্থানীয় জনগণ ও সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া লাইবেরিয়ার সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ ব্যানইঞ্জিনিয়ার কম্পানির প্রশিক্ষণের বিষয়টি ওই দেশের সরকার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।

৭. **অন্যান্য :** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা ইরিত্রিয়া, অ্যাঙ্গোলা ও সুদানে মাইন নিষ্ক্রিয়করণ, সোমালিয়ায় উদ্বাস্তুদের নিরাপদে স্থানান্তর এবং সিয়েরা লিওনে স্কুল ও চিকিৎসাসেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। এছাড়া মোজাম্বিক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কসোভো, পূর্ব তিমুর প্রভৃতি দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছেন।

খ. **নৌবাহিনী :** ২০০৫ সালে সুদানে ইউএনএমআইএসএস (UNMISS) মিশনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স রিভারাইন ইউনিটকে (বিএএনএফআরইউ-BANFRU) একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে মোতায়েন করা হয়। UNIFIL-এর আওতায় ফর্মড মেরিটাইম টাস্কফোর্সের (এফএমটিএফ) অংশ হিসেবে ২০১০ সালে লেবাননে বিএনএস ওসমান ও বিএনএস মধুমতি মোতায়েন করা হয়। জাহাজগুলো এক বছর সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে তাদের কাজের মেয়াদ আরো একবছর বাড়ানো হয়। জাতিসংঘের ২৫টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে (ইউএনপিকেও) এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১ হাজার ৫১৬ জন অফিসার ও নাবিক অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে ৮টি ইউএনপিকেওতে ৫২৬ জন অফিসার ও নাবিক পর্যবেক্ষক, এসও ও কন্টিনজেন্ট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গ. **বিমানবাহিনী :** ১৯৯৩ সালে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় UNPOROFOR-এ অংশ নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়। এরপর ১৯৯৫ সালে ইউনিফমে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী হেলিকপ্টারসহ অংশ নেয়। আট-বছর ধরে ওই অভিযানটি অব্যাহত ছিল। ২০০৩ সালে পূর্ব তিমুরে UNMISET-তে বিমানবাহিনীর আরো একটি কন্টিনজেন্ট মোতায়েন করা হয়। অত্যন্ত ভিন্ন পরিবেশ সত্ত্বেও বিমানবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় সহায়তা করেন। ২০০৩ সালে এ বাহিনী MONUC-তে পাঁচটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ এয়ারফিল্ড সার্ভিসেস কন্টিনজেন্ট পাঠায়। এরপর ২০০৯ ও ২০১০ সালে শাদে তিনটি বেল-২১২ হেলিকপ্টারসহ একটি এয়ার কন্টিনজেন্ট এবং মুভমেন্ট কন্ট্রোল প্লাটুন পাঠানো হয়। ২০১১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২১টি দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ২,৬৫৯ জন সদস্য সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব সম্পন্ন করেন।

ঘ. **পুলিশবাহিনী :** ১৯৮৯ সাল থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা অংশ নিচ্ছেন। নির্বাহী ও পর্যবেক্ষণ মিশনে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জটিল দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি টেকসই পুলিশ ব্যবস্থা উন্নয়ন, স্থানীয় তদন্তকারীদের উৎসাহিত করতে সহায়তা, মানুষের ঝুঁকি প্রশমন ছিল তাদের অন্যতম কাজ। উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর সাফল্যের কারণে ২০১৫ সাল নাগাদ জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশী নারী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ২০ শতাংশে উন্নীত করে।

অন্যান্য : সফলভাবে সমাপ্তকারী মিশন, চলমান মিশনে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যসংখ্যার পরিসংখ্যান, আহত ও নিহতদের পরিসংখ্যান নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

১. **সমাপ্ত মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা :** বাংলাদেশ এ পর্যন্ত (মার্চ ২০১৫) ৫৪টি মিশনে অংশ নিয়ে ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। নিচে ৩৭টি মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনী	সেনা	নৌ	বিমান	মোট
১.	সশস্ত্রবাহিনী	১,০২,৪৯৯	২,৭৬৭	৩,৫৯০	১,০৮,৮৫৬
২.	পুলিশবাহিনী	-	-	-	১২,৫৫১
				সর্বমোট	১,২১,৪০৭

২. **চলমান মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা :** বর্তমানে (মার্চ ২০১৫) বিভিন্ন দেশে চলমান মিশনগুলোর মধ্যে ১৬টি মিশনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছে। নিচে এদের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনী	সেনা	নৌ	বিমান	মোট
১.	সশস্ত্রবাহিনী	৫,২৩২	৪০৫	৫০৬	৬,১৪৩
২.	পুলিশবাহিনী				১,৮২৪
				মোট	৭,৯৬৭

৩. **নিহত সদস্য সংখ্যা :** ১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১১২ জন সদস্য প্রাণ হারান। নিচে এদের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনীর নাম	মোট
১.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	৯১
২.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	০১
৩.	বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	০৪
৪.	বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী	১৬
	মোট	১১২

৪. **আহত সদস্য সংখ্যা :** ১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১৫৪ জন সদস্য আহত হন। নিচে এদের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনীর নাম	মোট
১.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১৩৯
২.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	০১
৩.	বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	০৫
৪.	বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী	০৯
	সর্বমোট	১৫৪

উপসংহার : সংঘাত নিরসন ও সংঘাত নিরসন পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশে উন্নয়ন ঘটাতে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীরা বিশ্বের সর্বত্র দক্ষতা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে সাহায্য করছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অর্জিত আয় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। মোটকথা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সফলতা বিদেশে যেমন প্রশংসিত, তেমনি দেশেও সর্বত্র প্রশংসিত।

১২। বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর : বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার— সীমান্ত ঘেঁষা তিন প্রতিবেশী দেশ। স্থল ও সমুদ্র সীমান্ত— এ দু'ভাবেই পরস্পর সম্পৃক্ত এ তিন দেশ। বন্ধুপ্রতীম দেশ হওয়া সত্ত্বেও নিজ স্বার্থ চরিতার্থে হীন মানসিকতায় সময়ে সময়ে প্রতিবেশী দু'দেশ কর্তৃক সীমান্তে সৃষ্টি হয়েছে বহুমুখী সমস্যা। রূঢ় বাস্তবতায়

যার মূল ভুক্তভোগী সবার সাথে বন্ধুত্ব নীতির ধারক বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা, সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের সীমান্ত : বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমার দু'দেশের সীমান্ত রয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশের মোট সীমানা ৫১৩৮ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কিমি। আর মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য ২৭১ কিমি। এ দু'দেশের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩০টি এবং মিয়ানমারের সাথে তিনটি। দু'দেশের সাথে বাংলাদেশের একমাত্র সীমান্তবর্তী জেলা রাঙামাটি।

সীমান্ত সমস্যার বিভিন্ন দিক

বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার— প্রতিবেশী দেশ তিনটির মধ্যে সীমান্ত কেন্দ্রিক নানা সমস্যা প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সীমান্তে সংঘর্ষ, রোহিঙ্গা শরণার্থী, ইয়াবা ব্যবসা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, সীমান্তে হত্যা, চোরাচালান, ছিটমহল, সমুদ্র সীমা বিরোধ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিচে সীমান্ত সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. **সীমান্ত সংঘর্ষ :** সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংঘাত সীমান্ত সমস্যার অন্যতম দিক। আর সীমান্তে এ সংঘাত বললে দৃশ্যপটে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে, সীমান্ত বাহিনীর সংঘর্ষের দৃশ্যই ফুটে ওঠে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)-এর মধ্যে এমন সংঘর্ষ বেশ কয়েকবার সংঘটিত হয়। তার মধ্যে ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বড়াইবাড়িতে সংঘটিত দু'দেশের সংঘর্ষ ছিল ভয়ানক। তবে অন্য প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার সীমান্তে এমন সংঘর্ষের ঘটনা খুবই বিরল হলেও সাম্প্রতিক সময়ে এ সীমান্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দু'দেশই। উস্কানিমূলক আচরণের জের ধরে সৃষ্ট উত্তেজনায় মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি ও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-এর মধ্যে গোলাগুলি ও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। এর আগে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে দুই দেশের সীমান্তে এমন সংঘর্ষ হয়েছিল। ঐ সময়ে ঐ ঘটনার পরপরই বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

২. **রোহিঙ্গা শরণার্থী :** মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যার প্রধান একটি দিক হলো রোহিঙ্গা শরণার্থী ও অনুপ্রবেশ সমস্যা। মিয়ানমারের অন্তর্গত ভূ-খণ্ডে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অবস্থানজনিত বিরোধকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হওয়া এবং সীমান্তবর্তী দেশসমূহে বিশেষত বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ সমস্যার উদ্ভব ১৯৫০-এর দশক থেকে। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলায় এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটেছে সময়ে সময়ে। বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে বসবাস করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মিয়ানমারে বৌদ্ধ-রোহিঙ্গা দাঙ্গায় হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে চলা হাজার হাজার রোহিঙ্গা সীমান্তে জড়ো হলে সীমান্তে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ সমস্যা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিগত কয়েক দশকের তিক্ত অভিজ্ঞতায় এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, রোহিঙ্গা শরণার্থী বা অনুপ্রবেশ একটি জটিল প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করে এবং জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের যৌক্তিক আহ্বানকে পায়ে ঠেলে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব, মর্যাদা ও অধিকার প্রদানে মিয়ানমার সরকারের একরোখা অস্বীকৃতি 'রোহিঙ্গা শরণার্থী ও অনুপ্রবেশ' সমস্যাকে ক্রম থেকে ক্রমান্বয়ে আরো জটিল করে তুলেছে। তাই বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের এ জ্বলন্ত ইস্যুর আশু সমাধানও এখন সুদূর পরাহত।

৩. **ইয়াবা ব্যবসা :** বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত আলোকিত সমস্যার নাম ইয়াবা ব্যবসা ও এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। মিয়ানমার থেকে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে প্রচুর ইয়াবা প্রবেশ করছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের প্রায় পনেরটি অরক্ষিত পয়েন্ট দিয়ে ইয়াবার চালান বাংলাদেশে ঢুকছে। অরক্ষিত এসব পয়েন্টগুলো কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত। মিয়ানমারের প্রায় চল্লিশটি কারখানায় উৎপাদিত ভয়ংকর মাদক ইয়াবা স্থল ও সমুদ্র— দুই পথ দিয়েই আসছে। আসছে অন্যান্য মাদকদ্রব্যও। অবৈধভাবে আসা এসব মাদকদ্রব্য ছড়িয়ে পড়ছে দেশের সর্বত্র। গড়ে উঠছে ইয়াবা ব্যবসার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। সর্বনাশা ইয়াবায় নিঃশেষ হচ্ছে দেশের তরুণ সমাজ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। রোহিঙ্গা ইস্যুর মতই এক দীর্ঘমেয়াদি জটিল সমস্যার আবর্ত তৈরি করছে সীমান্তে এ ইয়াবার অবাধ আগমন ও অবৈধ ব্যবসা।

৪. **অবৈধ অনুপ্রবেশ :** বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী দুই দেশের সীমান্তেরই একটি অভিন্ন সমস্যা অবৈধ অনুপ্রবেশ। মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে দেশে রোহিঙ্গা অবৈধ অনুপ্রবেশ এক পক্ষীয় অভিযোগ হলেও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন অংশ দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ দুই দেশেরই। তবে বাংলাদেশের দিকে এ অভিযোগটি শক্তভাবে বিদ্ধ। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দাবি, কেবল বাংলাদেশিরাই ভারতের অভ্যন্তরে অবৈধ অনুপ্রবেশে উন্মুখ। কিন্তু প্রকৃত সত্য বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশের ভারতীয়রা কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। আইন ও নীতির যথার্থ পরিপালন করা এবং নির্দয় বিএসএফের মতো উদ্ধত আচরণ বিজিবি করে না বলেই দেশের অভ্যন্তরে অবৈধ ভারতীয় অনুপ্রবেশের বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশ হয় না। অথচ অবৈধ অনুপ্রবেশের অন্যায় অভিযোগ তুলে প্রতিনিয়ত নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা করে যাচ্ছে বিএসএফ। অধিকন্তু দেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে সন্ত্রাসীসহ অসংখ্য অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দের নানা অস্থিতিশীল দুষ্কর্মের খতিয়ান যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান।

৫. **সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন :** বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক প্রতিনিয়ত নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা সীমান্ত সমস্যার উত্তপ্ত বিষয়। অবৈধ অনুপ্রবেশ আর চোরাচালান রোধের ধুয়া তুলে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে নির্দয় বিএসএফ বাহিনী। কাঁটাতারের বেড়ায় চিহ্নিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত যেন এক মৃত্যু প্রাচীর। এটি সংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সীমান্ত। সামগ্রিকভাবে সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সন্দেহভাজনদের হত্যার বিষয়টি বিএসএফে প্রায় প্রতিষ্ঠিত। প্রাতিষ্ঠানিক নীতিতে পরিণত হয়েছে বলেই এ নির্মম হত্যাকাণ্ড করছে তারা। মানবাধিকার সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত ১২ বছরে গড়ে প্রতি চার দিনে একজন নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। নির্যাতন করেছে অসংখ্য মানুষকে। কোনো ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া শান্তির সময়ে কোনো দেশ তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ হত্যার হারের দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নজির বিশ্বের কোথাও নেই। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং নাগরিক সমাজ বিনা বাক্য ব্যয়ে এ হত্যা মেনে নেবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিষয়টি দু'দেশেই উপেক্ষিত থেকে গেছে সবসময়। কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলে থাকা শত শত ফেলানির নিথর দেহের নৃশংস ছবি আমাদের সাময়িক ব্যথিত করলেও সীমান্তে হত্যা বন্ধের বিষয়টি রয়ে গেছে গুরুত্বহীন। প্রতিশ্রুতি আর সীমান্ত সম্মেলনের মতো কেবল আলোচনা ও উদ্যোগের মধ্যেই সীমান্তে হত্যা বন্ধের চেষ্টা সীমাবদ্ধ।

৬. **চোরাচালান :** বাংলাদেশ-ভারত ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে চোরাচালান সমস্যা গুরুতর। সীমান্ত অঞ্চল যেন চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য। ইলেকট্রিক পণ্যদ্রব্য, কসমেটিক, শাড়ি-কাপড়, মাদকদ্রব্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ, গরু ইত্যাদি চোরাচালান হয়ে থাকে এ সীমান্ত দিয়ে। বিশেষ উপলক্ষে সীমান্তে চোরাচালান বেড়ে যায় কয়েক গুণ। জনবল সংকট, ঢিলেঢালা টহল, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, যথাযথ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং সার্বিক দুর্নীতি এসব চোরাচালানের প্রধান কারণ। আর চোরাচালানে আর্থিক ও অন্যান্য দিক থেকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশ। কেননা চোরাচালানে দেশে ঢোকা প্রায় দ্রব্যসামগ্রীই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর ও অনহিতকর। বিশাল আর্থিক মূল্যের চোরাচালানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি।

৭. **ছিটমহল, অপদখলীয় ভূমি ও অচিহ্নিত সীমানা :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অচিহ্নিত, অনিষ্পন্ন সীমানা হেতু সৃষ্ট ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমি সমস্যা দীর্ঘ সময়ের সীমান্ত ইস্যু। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের কিছু ভূখণ্ডই হলো ছিটমহল। বাংলাদেশ ও ভারতের এ ধরনের ১৬২টি ভূ-খণ্ড রয়েছে। এর মধ্যে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশে এবং ৫১টি বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতে অবস্থিত। ১৬২টি ছিটমহলের অধিবাসীরা 'ছিটের মানুষ' বলে অভিহিত। সীমান্তের ঘেরাটোপে বন্দীশালার মানুষ এরা। অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের অপদখলীয় ভূমি রয়েছে ৩০২৪ একর। আর ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের অপদখলীয় ভূমির পরিমাণ ৩৫০৬ একর। এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়েকটি এলাকায় সীমানা অচিহ্নিত অবস্থায় রয়েছে।

মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্মপরবর্তী সময়ে দুই দেশের মানচিত্র বিভাজনে ব্রিটিশ আইনজীবী র‍্যাডক্লিফের আঁকা সীমান্ত মানচিত্র থেকেই এ সীমানা বিরোধের উদ্ভব।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এ বিরোধ জটিল আকার ধারণ করে। এ সমস্যা সমাধানে ১৯৭৪ সালের সীমান্ত চুক্তিসহ সাম্প্রতিক সময়ে স্বাক্ষরিত সীমান্ত প্রটোকল, স্ট্রিপম্যাপসহ অন্যান্য উদ্যোগের কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায়। তবে আশার কথা হলো সর্বশেষ গত ৬, ৭ মে ২০১৫ যথাক্রমে ভারতের রাজ্যসভায় ও লোকসভায় সীমান্ত সংক্রান্ত বিলটি পাস হওয়ার মাধ্যমে ভারতের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘ ৬৮ বছরের সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে এক মাইলফলক অগ্রগতি অর্জন হলো। এর ফলে ছিটমহল, অপদখলীয় ভূমি ও অচিহ্নিত সীমানা সমস্যা সমাধান কেবল সময়ের ব্যাপার।

সার্বিক বিশ্লেষণ ও করণীয় : ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যার উপরিউক্ত ইস্যুগুলোর সার্বিক বিশ্লেষণে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছোট আয়তনের বাংলাদেশই সীমান্ত সমস্যার বেশি ভুক্তভোগী। সীমান্তে প্রতিবেশী দু'দেশের সাথে বাংলাদেশের আন্তরিক আচরণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ নীতিই যেন প্রতিবেশী দেশের কাছে দুর্বলতার প্রতীক। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা, ইয়াবা, ছিটমহলসহ প্রধান প্রধান সীমান্ত ইস্যুতে বাংলাদেশই নিগ্রহের শিকার। আন্তর্জাতিক নীতি, আইন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের আহ্বান সবকিছুই যেন বাংলাদেশের জন্যই পালনীয়; প্রতিবেশী অন্য দু'দেশের জন্য নয়। উপেক্ষার নীতিতে আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাসী বলে প্রতীয়মান ভারত, মিয়ানমারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ তারই বহিঃপ্রকাশ। তবে এমন অবস্থা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কারণ এটি সমস্যাকে শুধু জিইয়ে রাখবে সমস্যার সমাধান করবে না। তাই প্রয়োজন সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সমস্যা সমাধানের বাস্তবিক ও সত্যিকার উদ্যোগ গ্রহণ। ভুক্তভোগী হিসেবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উদ্যোগকেও সম্পৃক্তকরণের জোরালো ব্যবস্থা নিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?

উত্তর : বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই জাতিসংঘের প্রতি আস্থাশীল। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে জাতিসংঘ বিরাট অবদান রাখে। কিন্তু চীনের বিরোধিতার কারণে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে বাংলাদেশের বিলম্ব ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

প্রশ্ন-০২ কত সালে সার্ক গঠিত হয়? এর উদ্যোক্তা কে?

উত্তর : আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল প্রতিবেশী সাতটি দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠন করে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা সফরকালে এ ধরনের একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এ প্রচেষ্টার আশাব্যঞ্জক সাড়া পেয়ে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশ তথা পাকিস্তান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা ও ভুটান সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি পত্র লেখেন ও বিশেষ দূত পাঠান। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট দিল্লি বৈঠকে সার্কের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এর জন্ম হয়। সার্ক গঠনে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে আফগানিস্তানসহ সার্কের সদস্য সংখ্যা ৮।

প্রশ্ন-০৩ বাংলাদেশ কবে সিডও সনদ স্বাক্ষর করে?

উত্তর : সিডও (CEDAW) হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী অধিকারের একটি দলিল। সিডও (CEDAW)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ এ দলিল অনুমোদন ও স্বাক্ষর করে।

প্রশ্ন-০৪ বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার হচ্ছেন রবার্ট ডব্লিউ গিবসন আর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন বর্তমান রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকার্ট।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের কূটনীতিকদের বলা হয় হাইকমিশনার। আর কমনওয়েলথ বহির্ভূত দেশসমূহের কূটনীতিকদের বলা হয় রাষ্ট্রদূত।

প্রশ্ন-০৫ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি?

উত্তর : সাধারণত কোনো রাষ্ট্র যে নীতির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বিদেশ নীতি বা পররাষ্ট্রনীতি বলে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গত তিন দশক ধরে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো হলো :

১. জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা।
২. জাতিসংঘ, EEC, EU, ASEAN, OPEC, OIC, GCC, আরব লীগ, কমনওয়েলথ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।
৩. জোট নিরপেক্ষতা।
৪. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।
৫. অর্থনৈতিক কূটনীতির (Economic Diplomacy) ওপর গুরুত্বারোপ।
৬. বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করা।
৭. মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

প্রশ্ন-০৬ জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের তেমন কোনো সহায়ক ভূমিকা না থাকলেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। কিন্তু চীনের ভেটো প্রদানের কারণে সদস্যপদ লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পুনরায় আবেদন করে এবং কোনো ভেটো না পড়ায় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বাংলাদেশ ১৩৬তম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে থাকে। ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ পরিষদে প্রথম মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। ১০ নভেম্বর, ১৯৭৮ বাংলাদেশ জাপানকে পরাজিত করে নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। তৎপরবর্তী বাংলাদেশ জাতিসংঘের একাধিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন হয়। ২০০০-২০০১ সালের জন্য বাংলাদেশ পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বাধিক সৈন্য সরবরাহকারী দেশ। বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার বিভিন্ন সময় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমেও বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

প্রশ্ন-০৭ বাংলাদেশের আসিয়ান (ASEAN) জোটে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

উত্তর : আসিয়ান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠন। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমার সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইতোমধ্যেই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে অনেক দূর সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সংগঠন সার্কের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় দেশের কূটনীতিক মহলের অভিজ্ঞ অনেকেই বাংলাদেশের আসিয়ানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি, এমনকি এতে যোগদানের কথাও বলছেন। ভারত ইতোমধ্যেই আসিয়ানের ডায়ালগ পার্টনার হয়েছে এবং চীনও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের ব্যাপারে চুক্তি করেছে। এদিকে বাংলাদেশ আসিয়ানের সদস্যপদ চাইলে থাইল্যান্ড, মিয়ানমারসহ কতিপয় দেশ ইতোমধ্যেই সমর্থন দানের কথা ব্যক্ত করেছে। এমতাবস্থায় যারা বাংলাদেশের আসিয়ানে যোগদানের কথা বলছেন তাদের যুক্তি হলো, প্রথমত, সার্ককে কার্যকর করার ব্যাপারে ভারতের অনীহা হেতু সার্ককে কার্যকর করার বাংলাদেশের প্রচেষ্টা তেমন সফল হবে না। তাই বাংলাদেশকে সার্কের বিকল্প হিসেবে আসিয়ানে যোগদান করা উচিত। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ সবসময়ই অর্থনৈতিক কূটনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্র হিসেবে খ্যাত অধিকাংশ দেশ এ অঞ্চলে অবস্থিত বলে বাংলাদেশ আসিয়ানে যোগ দিলে আমাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হবে। তৃতীয়ত, ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদকে পা' কাটিয়ে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা এখন সময়ের দাবি।

প্রশ্ন-০৮ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশীদার। বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষণ (UNIIMOG) মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে তার পদযাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে যৌথ বাহিনীতে অংশগ্রহণকৃত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করে। এরপর থেকে বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক বাহিনী এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক হারে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার এবং সৈন্য প্রেরণ শুরু হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে বিগত ২৭ বছরে বাংলাদেশের ভূমিকা দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ চলমান ১০টি মিশনসহ মোট ৬৪টি শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সৈন্য যোগানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

টীকা

♦ টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) দেশের প্রথম জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন করে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ গড়াই এ কৌশলপত্রটির মূল লক্ষ্য। পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হলো টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development)। মোটকথা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার পরিবেশকে অবিবেচ্য রেখেও পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ দুইয়ের যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় সেটাই 'টেকসই উন্নয়ন'। জাতিসংঘ পরিবেশের বিষয়ে মুখ্য অধিবক্তা এবং 'টেকসই উন্নয়ন'-এর নেতৃত্বস্থানীয় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছে। আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনতির সম্পর্কের বিষয়টি প্রথম উপস্থাপিত হয় ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলনে (United Nations Conference on the Human Environment)। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কমিশন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে এ কমিশনের ১৯৮৭ সালের প্রতিবেদনেই উন্নত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিকল্প পথ হিসেবে টেকসই উন্নয়নের ধারণা উপস্থাপিত হয়। এ প্রতিবেদন বিবেচনা করে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন আহ্বান করে।

১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (United Nations Conference on Environment and Development– UNCED) বা ধরিত্রী সম্মেলনে (Earth Summit) অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এ সম্মেলনে এজেন্ডা ২১ (Agenda 21) গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ ধরিত্রী সম্মেলন + ৫ (Earth Summit + 5)। এ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে সরকার প্রধানরা পুনরায় নিশ্চিত করেন। ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট–৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে (World Summit on Sustainable Development— WSSD) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা এজেন্ডা ২১ (Agenda 21) বর্ণিত টেকসই উন্নয়নের নীতি এবং অন্যান্য বিধিমালার বিষয়ে পুনরায় ঐকমত্য হয়। ২০১২ সালের ২০-২২ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী বা রিও+২০ সম্মেলনেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।

♦ টিকফা

TICFA-এর পূর্ণরূপ Trade and Investment Co-operation Framework Agreement বাংলায় 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সংক্রান্ত কাঠামোগত সমঝোতা চুক্তি'। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বাংলাদেশকে এ ধরনের চুক্তির প্রস্তাব দেয়। দু'দফায় বিভিন্ন কারণে দুই দেশের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। এর পর ২০১১ সালের অক্টোবরে দু' দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। ২০১২ সালের ৮ এপ্রিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দীপু মণি জানান, দু' দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

♦ শান্তির সংস্কৃতি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ক্ষমতায়ন এবং 'শান্তির সংস্কৃতি' শীর্ষক দুটি প্রস্তাব জাতিসংঘে পেশ করার মধ্য দিয়ে 'শান্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নের' যে মডেল তুলে ধরেছিলেন, তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে। ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ অধিবেশনে ২৯ নম্বর এজেন্ডা হিসেবে প্রস্তাব দুটি সমর্থন করে। এরপর রেজ্যুলেশন আকারে তা পাস করা হয়। প্রস্তাব দুটির প্রথমটি 'জনগণের ক্ষমতায়ন' মডেল ২০১১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে তুলে ধরা হয়। এরপর ঐ বছর ২৩ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের সভায় প্রধানমন্ত্রীর একই বছরের সর্বসম্মতিক্রমে রেজ্যুলেশন আকারে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে একই বছর ২২ ডিসেম্বর 'জনগণের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন' শিরোনামে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাবটি আওয়ামী লীগ সরকারের আগের মেয়াদের শেষ দিকে ২০০১ সালে প্রথম উপস্থাপিত হয়। ২০০১ থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এ প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে আসছে এবং তা প্রতিবছরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে আসছে। ২০১২ সালের প্রস্তাবে 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্রতিবছর আয়োজন করার বিধান রাখা হয়।

♦ বাংলাদেশ-ভারত নৌ ট্রানজিট চুক্তি

নৌপথে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ও ট্রানজিট বিষয়ক Protocol on Inland Water Transit and Trade চুক্তিটি নবায়নের লক্ষ্যে দু'দেশের সচিব পর্যায়ের বৈঠক ২০০৯ সালের ২৩ মার্চ ঢাকায় শুরু হয়। দু'দিনের এ বৈঠক শেষে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংশোধন ছাড়াই চুক্তিটিতে নতুন করে স্বাক্ষর করেন উভয় দেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা। বিদ্যমান চুক্তিটির মেয়াদ ৩১ মার্চ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এর নবায়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌপথে বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত ১১ বার চুক্তিটিকে নবায়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ওই বছরের ১ নভেম্বর চুক্তিটি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে বাণিজ্য চুক্তিটি নবায়ন করা হলে সে চুক্তির ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিদ্যমান প্রটোকলটিও নবায়ন হয়ে আসছে। ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সফরে এলে ১৯৮০ সালের পর আবারো বাণিজ্য চুক্তিটি নবায়ন করা হয়। এর সূত্র ধরেই নবায়ন করা হয় নৌপথে বাণিজ্য ও ট্রানজিট বিষয়ক প্রটোকলটি যা কার্যকর থাকে ২০১১ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে ২০১২ এটার মেয়াদ ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, মংলা, খুলনা ও সিরাজগঞ্জ নৌবন্দরে পোর্ট অব কল (বন্দর ব্যবহারের সুবিধা) সুবিধা পায় ভারত। একইভাবে ভারতের কলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ ও পাণ্ডুতে পোর্ট অব কল সুবিধা পায় বাংলাদেশ। এছাড়া জলপথে পণ্য পরিবহনের এ প্রটোকল অনুসারে দু'দেশ আটটি রুটে একে অপরের পণ্যবাহী কার্গোকে ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে থাকে। এ আটটি রুট হলো- ১. কলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-কাউখালি-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিলমারী-ধুবড়ি-পাণ্ডু। ২. একইভাবে পাণ্ডু-ধুবড়ি-চিলমারী থেকে চালনা হয়ে হলদিয়া-কলকাতা। ৩. কলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-মংলা-কাউখালি-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-ভৈরববাজার-আজমিরীগঞ্জ-মারকুলি-শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ। ৪. একইভাবে করিমগঞ্জ থেকে কলকাতা। ৫. রাজশাহী-গোদাগাড়ী-ধুলিয়া। ৬. ধুলিয়া-গোদাগাড়ী-রাজশাহী। ৭. করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-আজমিরিগঞ্জ-ভৈরববাজার-নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিলমারী-ধুবড়ি-পাণ্ডু। ৮. একইভাবে পাণ্ডু থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে করিমগঞ্জ।

♦ ঢাকায় BIMSTEC সচিবালয়

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাত দেশের জোট বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (BIMSTEC) স্থায়ী সচিবালয় ঢাকার গুলশানে উদ্বোধন করা হয়। এটি হলো ঢাকায় স্থাপিত প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সচিবালয়। ১-৪ মার্চ ২০১৪ মিয়ানমারের নাইপিদোতো অনুষ্ঠিত বিমসটেকের তৃতীয় সম্মেলনে স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় স্থাপনের ব্যাপারে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতদিন জোটভুক্ত বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ২০১৪ সালের জুন থেকে ঢাকায় এ জোটের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৬ জুন ১৯৯৭ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিমসটেক গঠিত হয়।

♦ IPU'র প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ

১৬ অক্টোবর ২০১৪ জাতীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনসভার আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। IPU'র ১২৫ বছরের ইতিহাসে সাবের হোসেন চৌধুরী প্রথম বাংলাদেশি, যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১২-১৬ অক্টোবর ২০১৪ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় IPU'র ১৩১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার শেষ দিন ১৬ অক্টোবর তিনি নির্বাচিত হন। ঐদিনই তিনি IPU'র ২৮তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচনে সাবের হোসেন চৌধুরী ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ইন্দোনেশিয়ার সংসদ সদস্য নুরহায়াতি আলী আসিগাফ, অস্ট্রেলীয় আইনসভার স্পিকার ব্রনউইন বিশপ ও মালদ্বীপের আইনসভার সাবেক স্পিকার আবদুল্লাহ শহীদ। সাবের হোসেন চৌধুরী এ নির্বাচনে ভোট পান ১৬৯টি। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রনউইন বিশপ ভোট পান ৯৫। সাবের হোসেন চৌধুরী দক্ষিণ এশিয়া থেকে নির্বাচিত IPU'র তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। তার আগে দক্ষিণ এশিয়া থেকে ভারতের গুরুদয়াল সিং ধিলন (১৯৭৩-৭৬) ও নাজমা হেপতুল্লাহ (১৯৯৯-২০০২) IPU'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

♦ CPA'র চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (CPA) নির্বাহী কমিটির নতুন চেয়ারপার্সন। ৯ অক্টোবর ২০১৪ ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াওন্দেতে সিপিএ'র ৬০তম সম্মেলনে (২-১০ অক্টোবর ২০১৪) তিন বছর মেয়াদি এ পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে তিনি তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম ক্যারিবীয় সাগরের কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জের আইনসভার স্পিকার জুলিয়ানা ও'কনর-কন্নোলিকে ৭০-৬৭ ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সিপিএ'র প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম বাঙালি নারী চেয়ারপার্সন। সিপিএ'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি তিন বছর ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সনের

দায়িত্ব পালন করবেন। তার পূর্বে ১৯৮৪-৮৭ মেয়াদে ভারতের এমপি বালরাম ঝাকার এবং ২০০৫-২০০৮ মেয়াদে পশ্চিমবঙ্গের এমএলএ হাশিম আবদুল হালিম সিপিএ'র চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন।

♦ উন্মোচিত মহিষের জীবনরহস্য

বিশ্বে প্রথমবারের মতো মহিষের জিনোম সিকোয়েন্স বা জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন বাংলাদেশ ও চীনের এক দল গবেষক। বাংলাদেশের কৃষিবীজ উৎপাদন ও বিপণন কোম্পানি লাল তীর লাইভস্টক কোম্পানি ও চীনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান বেইজিং জিনোম ইনস্টিটিউটের (BGI) যৌথ উদ্যোগে এ সফল আবিষ্কার অভিযান সম্পন্ন হয়। ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ এ আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। বাংলাদেশের লাল তীর লাইভস্টক কোম্পানি ও চীনের বেইজিং জিনোম ইনস্টিটিউট (BGI) মহিষের *(Bubalus bubalis)* জীবনরহস্য উন্মোচনের জন্য ২০১১ সালের মার্চ মাস থেকে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। মোট ১৪ জন বিজ্ঞানী ২ বছর ৩ মাস সময় ধরে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন বিজেআই-এর চেয়ারম্যান জিয়ান উয়াং এবং লাল তীরের বিজ্ঞানী মো. মনিরুজ্জামান।

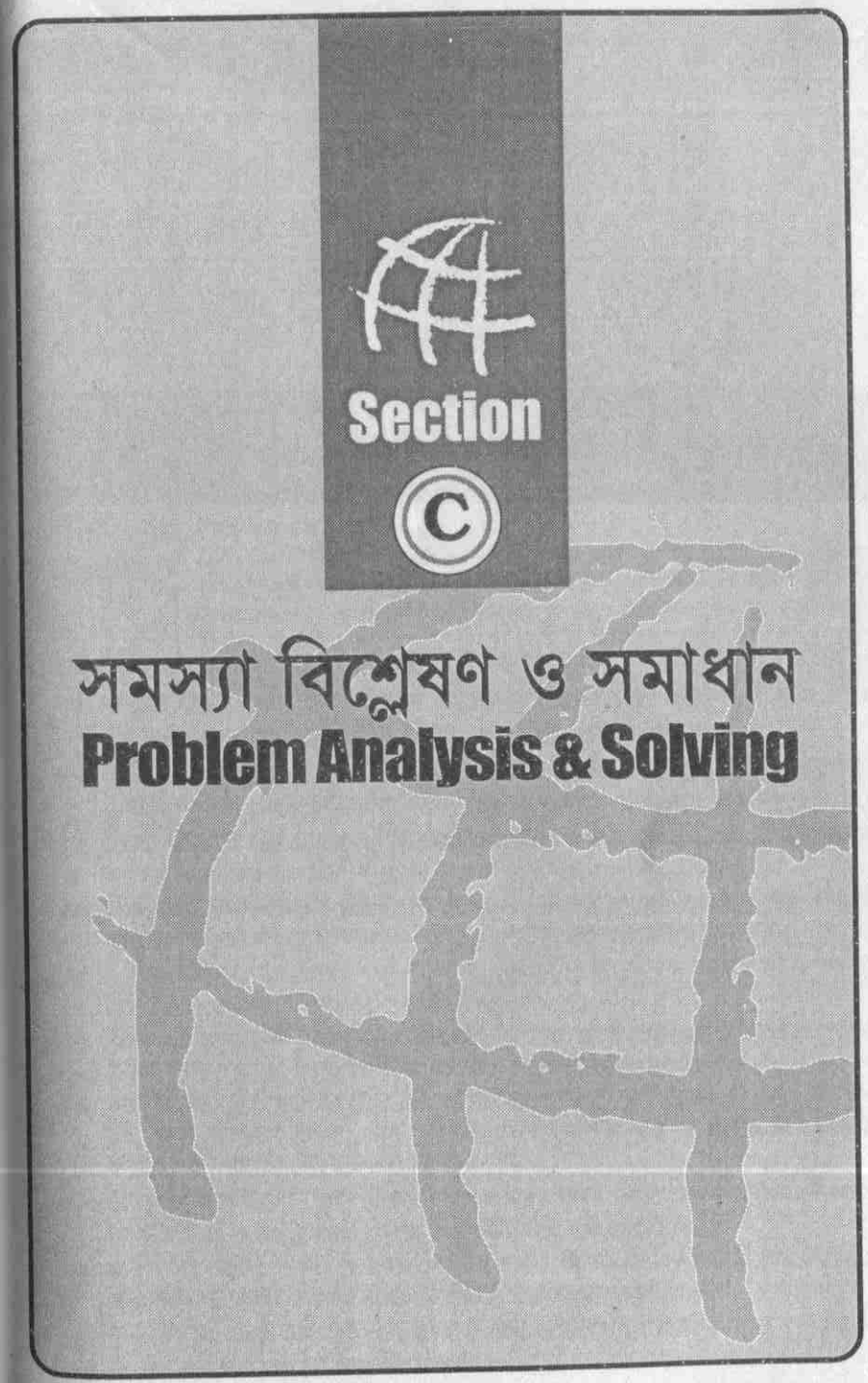
♦ পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ

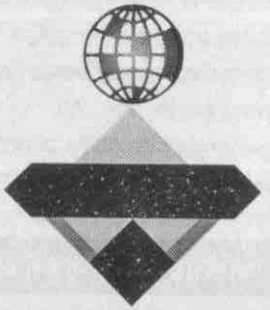
২৭ মার্চ ২০১৪ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ১১টি দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। বাংলাদেশের সর্বশেষ পোলিও রোগী ছিল সুনামগঞ্জের ৪ বছর বয়সী হৃদয় আহমেদ, যাকে শনাক্ত করা হয় ২২ নভেম্বর ২০০৬। এরপর থেকে বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত অবস্থায় থাকার পরেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করা যায়নি। নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দেশকে নয়, পোলিওমুক্ত ঘোষণা করা হয় একটি অঞ্চলকে। আর পোলিওমুক্ত ঘোষণার জন্য একটি অঞ্চলের প্রতিটি সদস্য দেশকে পরপর তিন বছর পোলিওমুক্ত থাকার প্রয়োজন হয়। ভারতে সর্বশেষ ১৩ জানুয়ারি ২০১১ পোলিও রোগী শনাক্ত হওয়ায় এ অঞ্চলকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করা যায়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ হচ্ছে— বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, উত্তর কোরিয়া, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর ও মিয়ানমার।

♦ সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি

ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আলোচনা শুরু হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হলেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় ৮ অক্টোবর ২০০৯ সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তিতে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের স্থায়ী সালিশি আদালতে (Permanent Court of Arbitration– PCA) আবেদন করে বাংলাদেশ। ৩১ মে ২০১১ বাংলাদেশ PCA'তে তার যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে। জুলাই ২০১২ ভারত লিখিতভাবে পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করে। এর পর ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ কাউন্টার মেমোরিয়াল বা যুক্তি তুলে ধরে বাংলাদেশ। ভারত তাদের শেষ লিখিত যুক্তি উপস্থাপন করে ৩১ জুলাই ২০১৩। এরপর ৯-১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ স্থায়ী সালিশি আদালতে মামলার চূড়ান্ত শুনানি হয়। শুনানি শেষ হওয়ার পর ৬ মাসের মধ্যে রায় ঘোষণার কথা জানায় PCA। ৭ জুলাই ২০১৪ নিষ্পত্তি হয় বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ। ১৪ মার্চ ২০১২ মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছিল।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রায়ের ফলে বাংলাদেশ এক বিপুল অঞ্চলে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। রায় অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ পাবে ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার আর ভারত পাবে ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এ রায়ের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।





সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধান
Problem Analysis & Solving

Syllabus

Problem-solving
The candidates may be asked to come up with an analysis of a problem and its solution on any aspect of global developments and security issues, such as trade, climate change, foreign aid, arms proliferation etc.

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০১. আইএস কিভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ? আইএস-এর কবল থেকে বিশ্বকে নিরাপদ রাখতে করণীয় বিষয় কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

০২. আফ্রিকার অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ নাইজেরিয়ায় বোকো হারামকে কেন্দ্র করে দেশটির অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং সমাধানের পথগুলো আলোচনা করুন।

০৩. বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্য এবং বিশ্বকে অস্ত্রের ঝনঝনানিমুক্ত করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

০৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুত অর্থের বাস্তবায়নে সমস্যা এবং সমাধানকল্পে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করুন।

০৫. পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী ও অনুন্নত দেশগুলোতে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সমাধান হিসেবে কী কী করা যেতে পারে?

০৬. বিশ্বের ভয়াবহ কয়েকটি ভূমিকম্পের পরিচয় প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভূমিকম্পের আশঙ্কা চিহ্নিত করুন। ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনামূলক মতামত দিন।

০৭. সবুজ অর্থনীতি কি? সবুজ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক উল্লেখপূর্বক টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এর ভূমিকা আলোচনা করুন। সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও করণীয় কি? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করুন।

০৮. রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায় নির্দেশ করুন। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত বলে মনে করেন কি?

০৯. জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার জন্য আপনি কি সংস্থাটির সংশোধন বাঞ্ছনীয় মনে করেন? সংস্কারের রূপরেখা বিষয়ে আপনার নিজের মতামতগুলো দিন।

১০. 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা সে দেশগুলোর উন্নয়নের অন্তরায়'— বিষয়টি আলোচনাপূর্বক সমাধানের পথগুলো নির্দেশ করুন।

১১. *জিএসপি কি? যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার এ দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে কিরূপ প্রভাব ফেলবে? জিএসপি সুবিধা বহাল রাখতে হলে বাংলাদেশকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে?*

১২. *ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে কি কি বাধা রয়েছে? এগুলো দূরীকরণে আপনার সুপারিশ কি?*

১৩. *ইউরো জোনের কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণ বর্ণনা করুন। কিভাবে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। আইএস কিভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ? আইএস কবল থেকে বিশ্বকে নিরাপদ রাখতে করণীয় বিষয় কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো আইএসআইএস (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া অথবা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড আশ-শাম)-এর উত্থান পরবর্তী সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড এবং এরই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা নতুন চ্যালেঞ্জ। বস্তুত এ সংগঠনটি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে যে শক্তিমত্তার সাথে নাড়িয়ে দিয়েছে তা বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির চালকদের ভাবিয়ে তুলছে।

আইএস (IS)-এর পরিচয় : আইএস ২০০৪ সালে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার অন্যতম শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০১৪ সালের শুরুর দিকে আইএস আল কায়েদার মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে হাজির হয়। সালাফি ও ওয়াহাবি ইসলামী তত্ত্বে বিশ্বাসী ইরাকভিত্তিক এই সংগঠনটি আধুনিকতাকে বর্জন না করে বরং তা গ্রহণ ও ব্যবহার করে যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য পাচ্ছে। আদর্শগত দিক থেকে আইএসের উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এরই প্রেক্ষিতে আইএস উত্তর ও পশ্চিম ইরাক এবং পূর্ব ও উত্তর সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো দখল করে ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে পদ্ধতিগত জায়গা থেকে আইএসের উদ্দেশ্য হলো সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বর্তমান উদারনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে শরীয়াহ আইনভিত্তিক রাজনৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করা।

বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার বিদেশী যোদ্ধা আইএস-এ যোগদান করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যোদ্ধা এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ব্রিটিশ মুসলিম নারীর আইএসের যোদ্ধা হিসেবে যোগ দেওয়া। আইএস মূলত বিদেশী মুসলিম তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করে খিলাফতের পথে পরিচালিত করার কৌশলে অনেকখানি সফল বলে মনে করা যায়।

আইএস যেভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ : আইএস তিনটি স্তরে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকি দিচ্ছে। প্রথম স্তরকে বলা হচ্ছে 'অভ্যন্তরীণ বলয়', যা জর্ডান, ইসরাইল, ফিলিস্তিন, লেবানন, ইরাক ও সিরিয়া নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় স্তর হলো 'নিকটতম প্রবাস বলয়' যা পূর্ববর্তী আরব খিলাফত রাষ্ট্রগুলো যেমন- আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। তৃতীয় স্তরটি হলো 'দূরবর্তী প্রবাস বলয়'; এর অঞ্চলগুলো হলো ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ সাইবার ক্ষেত্রগুলো।

উপরের তিনটি স্তরেই যে আইএস চরমভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তা সংগঠনটির সাম্প্রতিক সময়ের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। ২০১৪ সালের জুন থেকে আইএস ইরাকের মোসুল, নেনেয়াভাহ, তিকরিত ও কিরকুক দখল করে এবং সিরিয়ার আল-রাকাহ শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সাম্প্রতিক সময়ে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় এক মসজিদে আইএস কর্তৃক আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্রায় ১৪০ জন নিহত হয় (২০ মার্চ ২০১৫) এবং আরো কিছুদিন পূর্বে লিবিয়ায় ২১ জন মিশরীয় খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর শিরশ্ছেদ করে আইএস। যে ঘটনাটি পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংসযজ্ঞের বার্তা দিয়েছে তা হলো ১৮ মার্চ ২০১৫ তিউনিসিয়ার রাজাধানী তিউনিসের একটি জাদুঘরে আইএস কর্তৃক বন্দুক হামলায় ২৩ জন নিহত হওয়া, যাদের মধ্যে রয়েছে পোল্যান্ড, জার্মানি, স্পেন ও ইতালির নাগরিক।

এই অল্প সময়ের মধ্যে আইএস আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। যথা :

ক. মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে আইএস সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে অতি দ্রুত শক্তিশালী করে তুলেছে এবং নিজের অস্তিত্বকে দম্ভের সাথে জানান দিচ্ছে বিশ্বব্যবস্থায়।

খ. আইএসের টার্গেটগুলো হলো মূলত অর্থনৈতিক ও ভূ-কৌশলগতভাবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অঞ্চল, যেখান থেকে খুব সহজেই যোগাযোগ ও যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়।

গ. অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মতো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে আইএস এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরে থেকে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ঘ. মুসলিম তরুণ সমাজ আইএসের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ছে সংগঠনটির কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত আধুনিকতার প্রয়োগের কারণে।

ঙ. রিয়েলিস্ট বা বাস্তববাদী ভূ-রাজনীতির দর্শনকে প্রাধান্য দিয়ে আইএস ভূখণ্ড দখলের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সচেষ্ট।

চ. আইএস অর্থনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালী হওয়ার কারণে সনাতন যুদ্ধ পরিচালনায় সংগঠনটির খুব বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ তেলখনিগুলো এর দখলে থাকার ফলে প্রতিদিন সংগঠনটির কালোবাজারে তেল বিক্রি করে এক মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করছে। অন্যান্য আয়ের উৎসগুলো হলো অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় এবং হামলার মাধ্যমে লুটপাট করা।

ছ. আইএসের এত দ্রুত বিকাশের আর একটি কারণ হলো আধুনিক অস্ত্র। যেমন ড্রোন, এন্টি ট্যাংক ও এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল প্রভৃতির ব্যবহার পশ্চিমা যুদ্ধ কৌশলেরই আরেকটি রূপ।

আইএসের কবল থেকে বিশ্বকে নিরাপদ রাখতে করণীয় : উপরের আলোচ্য কারণগুলোকে আমলে নিয়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা তাত্ত্বিকগণ যে প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন তা হলো— কিভাবে আইএসের প্রভাব বলয় থেকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে মুক্ত রাখা যায়? এক্ষেত্রে মোটাদাগে যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

১. আইএস সামরিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে যথেষ্ট আধুনিক হওয়ায় সনাতন যুদ্ধে সংগঠনটিকে কোণঠাসা করা বেশ কঠিনই এবং সাধারণ জনগণকে এ জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। কাজেই তাদের ক্ষেত্রে আধুনিক যুদ্ধ কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

২. আইএস একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডভিত্তিক না হওয়ায় সংগঠনটিকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে ভূ-কৌশলগত দিকটিকে বিবেচনায় রেখে দমননীতি প্রণয়ন করা।

৩. আইএস ইরাক ও সিরিয়ার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে দখল করে দেশ দুটির জাতিগত, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক বিভাজনকে আরো গভীর করছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একযোগে কাজ করলে বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে আইএসকে এক্ষেত্রে পরাজিত করা সম্ভব।

৪. মধ্যপ্রাচ্য রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল হওয়ার কারণে ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে নেওয়া যে কোনো সিদ্ধান্ত এ অস্থিতিশীলতাকে আরো ঘনীভূত করতে পারে। কাজেই আন্তর্জাতিক শক্তিকে বেশি করে কৌশলী হতে হবে।

৫. অর্থনৈতিকভাবে আইএস যেভাবে শক্তিশালী হচ্ছে তাতে অতি দ্রুততার সাথে রোধ করা না গেলে সংগঠনটিকে কোণঠাসা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে।

৬. আইএস যেভাবে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে তাতে বুদ্ধি ও কৌশল দিয়ে এই অগ্রগতি রোধ করতে না পারলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংগঠনটির প্রভাব বলয়ে চলে যেতে পারে।

৭. মুসলিম বিশ্বকে আইএস মোকাবিলায় সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে হবে।

৮. আইএসের অর্থের উৎস বন্ধ করতে হবে এবং কোনো দেশের নাগরিকই যাতে আইএসে যোগ দিতে না পারে সেজন্য সীমান্তে ও বিমানবন্দরে কড়া নজরদারি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি দেশ-বিদেশে আইএস বিরোধী প্রচারণা চালাতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের জীবনযাত্রাকে চরমভাবে আঘাত করছে। বিশ্বনেতৃত্বের ভুল পদক্ষেপ ও দুর্বল ভাবনা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে আরো সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। তালেবান, আল কায়েদা, বোকো হারাম, আল শাবাব এবং সাম্প্রতিক সময়ের আইএসের কর্মকাণ্ড বিশ্বকে অস্থির করে তুলছে। অথচ কয়েক দশক পূর্বেও এসব সংগঠনের কর্মকাণ্ড অনুপস্থিত ছিল। প্রতিটি সংগঠনের শুরু ও পেছনে পশ্চিমা স্বার্থ জড়িত ছিল। যদিও পশ্চিমা বিশ্ব এসব সংগঠনের বিরুদ্ধে বর্তমানে একজোট হয়ে কাজ করছে। বিশ্বকে বসবাসের জন্য নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে তৈরি করতে হলে সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ এবং প্রতিটি দেশ একে অন্যকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। আইএস যে ধরনের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে অচিরেই তা বন্ধ করতে না পারলে বিশ্ববাসীকে এর চরম মূল্য দিতে হবে।

০২। আফ্রিকার অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ নাইজেরিয়ায় বোকো হারামকে কেন্দ্র করে দেশটির অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ও সমাধানের পথগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : আফ্রিকার এ সময়ের অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ নাইজেরিয়ায় জাতীয় সমস্যা হিসেবে যতগুলো বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তারমধ্যে অন্যতম হলো ইসলামপন্থী সংগঠন বোকো হারামের উত্থান ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত সমস্যা। দুর্নীতি নামক দুষ্টক্ষতের কারণে দেশটি এমনিতেই নাজেহাল অবস্থায় রয়েছে, তদুপরি দেশের সেনাবাহিনীর দুর্বলতার কারণে বোকো হারামের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর গড়ে ওঠা এবং দেশের মধ্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র কায়েম করার ঘোষণা নাইজেরিয়া সরকারের নিকট বিষফোঁড়া হিসেবে দেখা দিয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ক্যামেরুন, চাঁদ ও নাইজারের সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বোকো হারামের সন্ত্রাসী বাহিনীকে দমন করার চেষ্টা চালালেও আশানুরূপ সাফল্য আসেনি। ইতোমধ্যে আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতারা এই বিষফোঁড়াকে দমন করার জন্য

উঠে পড়ে লেগেছে কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। কেননা মিলিশিয়ারা নিত্যনতুন কৌশলের মাধ্যমে তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সংগঠনটি ইরাক-সিরিয়ার আইএস-এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে খলিফা আবু বকর আল বাগদাদিকে তাদের খলিফা হিসেবে স্বীকার করে অর্থনৈতিক, সামরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার কৌশল হাতে নিয়েছে। দূর ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা না গেলেও অদূর ভবিষ্যতে যে এই মিলিশিয়া গোষ্ঠীকে খুব সহজে দমন করা যাচ্ছে না একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বোকো হারামের পরিচয় : বোকো শব্দটি নাইজেরিয়ার একটি স্থানীয় হাউসা ভাষার শব্দ, যার অর্থ পশ্চিমা শিক্ষা, আর হারাম শব্দটি আরবি ভাষার, যার অর্থ অবৈধ বা নিষিদ্ধ কাজ। বোকো হারাম শব্দ দুটির একত্রে অর্থ বোঝায় পশ্চিমা শিক্ষা পাপ বা পশ্চিমা শিক্ষা নিষিদ্ধ। নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক এ সংগঠনটির মূল অবস্থান বোর্নো প্রদেশের রাজধানী মাইদুগুরিতে। এছাড়াও এ গোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী দেশ নাইজার, চাঁদ, ক্যামেরুনেও তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনটি ২০০২ এ মোহাম্মদ ইউসুফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর কার্যক্রম বোর্নো প্রদেশের রাজধানী সাইদুগুরিতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সংগঠনটি ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে বেশি নজর দিলেও তাদের লুকায়িত একটি উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা এবং সে উদ্দেশ্যেই গরিব ইসলামপন্থী পরিবারের ছেলেদের সংগঠনে নিয়োগ দিতে থাকে এবং তাদের জিহাদি অন্তর্ভুক্তি সহজ হয় ঐ অঞ্চলটি রক্ষণশীল ইসলামপন্থী থাকার কারণে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে পরবর্তী সাত বছর বোকো হারামের কর্মকাণ্ড ছিল অনেকটাই শান্তিপূর্ণ কিন্তু ২০০৯ সালে তাদের নেতা ইউসুফকে ফাঁসি দেওয়া হলে তারা সহিংস আন্দোলন শুরু করে। সেই থেকে এ গোষ্ঠীর নেতা হন আবু বকর শেকাউ, তিনি আজ অবধি নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বোকো হারামের বর্তমান সদস্য সংখ্যা সাত থেকে দশ হাজার। প্রাথমিক অবস্থায় এটি আল কায়েদার সাথে সংহতি প্রকাশ করলেও ২০১৪ থেকে আইএস-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে আসছে।

আদর্শবাদের দিক থেকে সংগঠনটি গোড়া সুন্নি ইসলামপন্থী। এটি ওয়াহাবিজম ও সালাফিজমকেও তাদের আদর্শবাদ বলে মনে করে থাকে।

বোকো হারামের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড : ২০০৯-এ নাইজেরীয় সরকারি বাহিনী 'অপারেশন ফ্লাশ' নামে একটি অনুসন্ধানী অভিযান চালানোর সময় ২৬ জুলাই নিরাপত্তা বাহিনী নয় বোকো হারাম সদস্যকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের অস্ত্র ও বোমা বানানোর উপাদানগুলো জব্দ করে। এ কারণে গোষ্ঠীটির সাথে সরকারি বাহিনীর সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি সম্মিলিত বাহিনীর অভিযানে ৩০ জুলাই সাতশত মানুষ প্রাণ হারায় যাদের অধিকাংশ বোকো হারামের সদস্য। এ সময় সংগঠনের নেতা মোহাম্মদ ইউসুফ গ্রেপ্তার হয় এবং পরে কারাগারেই তার মৃত্যু হলে সংগঠনটি প্রতিহিংসাপ্রবণ হয়ে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে।

২০১০ এর সেপ্টেম্বরে নতুন নেতার নেতৃত্বে বোর্নো প্রদেশের রাজধানী মাইদুগুরি কারাগারে হামলা করে তাদের ১০৫ জন সদস্যকে মুক্ত করার পাশাপাশি অন্য আরো ৬০০ জন্য অপরাধীকে মুক্ত করে এবং উত্তর নাইজেরিয়ার কয়েকটি এলাকায় হামলা শুরু করে।

২০১১ এর জুনে আবুজার পুলিশ সদর দপ্তরে হামলা করে ৬ জনকে হত্যা করে। পশ্চিমা শক্তিগুলোর উপর তাদের হামলা শুরু হয় ২০১১ এর আগস্ট মাসে আবুজায় অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে হামলার মধ্য দিয়ে। যাতে ১১ জন জাতিসংঘ কর্মকর্তাসহ অন্য আরো ১২ জন মারা যায় এবং একশোর অধিক লোক আহত হয়। বোকো হারাম ২০১১ সালে ১১৫টি হামলা পরিচালনা করে, যাতে প্রায় ৫৫০ জন মারা যায়।

২০১২ সালের শুরুতেই তারা ২০১১ সালের অর্ধেক লোককে হত্যা করে। নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী দক্ষিণের খ্রিস্টানদের দুই দিনের মধ্যে উত্তরাঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। ঐ বছরের ২০ জানুয়ারিতে পুলিশ ভবনে হামলা করে ১৯০ জনকে হত্যা করে।

২০১৩ এর ফেব্রুয়ারিতে বোকো হারাম সাত জন ফরাসি পর্যটককে জিম্মি করে এবং নভেম্বরে একজন ফরাসি ধর্ম প্রচারককে অপহরণ ও জিম্মি করে। আর ঐ দুটি ঘটনা ঘটে ক্যামেরুনের একেবারে উত্তর অঞ্চলে।

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে সংগঠনটি বোর্নো প্রদেশের চিবুক থেকে ২৭৬ জন স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করে, যদিও তার মধ্যে থেকে ৫০ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। এ ঘটনা বিশ্ব মিডিয়ায় আলোড়ন তুললে আমেরিকান সরকার আবু বকর শেকাউ-এর খোঁজ দেওয়ার জন্য সাত মিলিয়ন আমেরিকান ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে। ঐ বছরের জুলাই মাসে ক্যামেরুনের সীমান্ত এলাকার এক বাড়িতে হামলা করে তারা সে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্টের স্ত্রীকে অপহরণ করলেও অক্টোবর মাসে অবশ্য তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

২০১৫ সালের ৩ জানুয়ারিতে বাগা নামক সামরিক ঘাটিতে যা মিত্রবাহিনীর ঘাটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো সেখানে আঘাত হেনে বোকো হারাম প্রায় দুই হাজার মানুষকে হত্যা করে। এ বছরের ১২ জানুয়ারিতে ক্যামেরুনের সামরিক ঘাটি কোলোফাতাতে আঘাত হানলে ১৪৩ জন মারা যায়। ৪ ফেব্রুয়ারি চাঁদের সেনাবাহিনী বোকো হারামের দু'শ যোদ্ধাকে হত্যা করলে তারা পাল্টা আঘাতে ক্যামেরুনের ফোতোকোল শহরে ৪১ জন সাধারণ মানুষসহ ১৩ জন চাঁদ ও ৬ জন ক্যামেরুনের সেনা সদস্যকে হত্যা করে।

২০১৫ সালের ৭ মার্চে আবু বকর শেকাউ আইএস-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এক টুইটার বার্তা পাঠালে ১২ মার্চ আইএস-এর মুখপাত্র আবু মোহাম্মদ আল-আদনানি এক অডিও বার্তায় তাদের প্রতি বোকো হারামের আনুগত্যকে স্বাগত জানায় এবং বোকো হারামের অধিকৃত অঞ্চলকে ইসলামি খিলাফতের বর্ধিত অংশ বলে ঘোষণা করে।

বোকো হারামের অর্থায়ন : প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে দেশীয় দাতাদের নিকট থেকে ধর্মীয় প্রচারণার জন্য অর্থ সাহায্য পেলেও ২০০৯ থেকে সহিংস হামলা চালানোর পর থেকে দলটি বিভিন্ন দিক থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে বোকো হারামের অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রগুলো হলো :

১. **অপহরণ, ডাকাতি ও চাঁদা :** সাম্প্রতিক বোকো হারামের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ব্যাংক ডাকাতি ও বিভিন্ন দেশের নাগরিককে জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় করা। ২০১৩ সালের শুরুতে সংগঠনটি ক্যামেরুন সীমান্ত থেকে সাত জন ফরাসি নাগরিককে জিম্মি করে ৩.১৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়। নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্ব কানো ও বৌচি প্রদেশের গভর্নররা বোকো হারামকে নিয়মিতভাবে চাঁদা দিত।

২. **বিভিন্ন দেশের সমর্থকদের অনুদান :** প্রাথমিক অবস্থায় সংগঠনটি দেশীয় ও বিদেশী দাতাদের অনুদানের উপর ভরসা করেই চলতো। এখনো তাদের ব্যয়িত অর্থের অধিকাংশই আসে সৌদি আরব ও যুক্তরাজ্যের সমর্থকদের নিকট থেকে। এছাড়াও সংগঠনটি একিউআইএম ও একিউএপি এর নিকট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্র পেয়ে থাকে।

৩. **মাদকদ্রব্য চোরাচালান :** মাঝেমধ্যে বোকো হারামকে কোকেন পাচারের সাথে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। লোরেত্তা ন্যাপোলিওনি নামক একজন সন্ত্রাসী সংগঠনের অর্থায়নের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে মাদকদ্রব্য পশ্চিম আফ্রিকা হয়ে যে ইউরোপে পৌঁছে তার সাথে বোকো হারামের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও বোকো হারাম আফ্রিকার অন্যান্য অপরাধী সংগঠনের সাথে সংযুক্ত থেকে গণ্ডার ও হাতি পাচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য নাইজেরিয়া, নাইজারের দক্ষিণাংশ, চাঁদের লেক চাঁদ এবং ক্যামেরুনের উত্তর পশ্চিমাংশে ইসলামপন্থী সংগঠন বোকো হারাম যে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তাতে করে পশ্চিম আফ্রিকায় বিশেষ করে উপর্যুক্ত চারটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পশ্চিমা শক্তিশালী দেশগুলো বোকো হারামকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করার পাশাপাশি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনটির প্রধানের যুক্তিসংগত অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য দেওয়ার জন্য সাত মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষনা করে, চিবুক পাহাড়ে অপহৃত দুই শতের অধিক স্কুল ছাত্রীর অবস্থান নাইজেরিয়ার গোয়েন্দা বাহিনী তথ্য দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আমেরিকা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এছাড়াও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া নিন্দা জানানোর সাথে সাথে নাইজেরিয়ার সরকারি বাহিনীকে প্রয়োজনে সর্বপ্রকার সাহায্যে দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বোকো হারাম জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য দেশটির সরকার মিলিশিয়াদের সাথে যদি এখনই কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ না নিতে পারে তাহলে আইএসের সহযোগিতায় সংগঠনটি সামনের দিনগুলোতে আরো যে বিধ্বংসী হবে না, তা কিন্তু বলা যায় না।

০৩। বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্য এবং বিশ্বকে এ অস্ত্রের ঝনঝনানিমুক্ত করার জন্য বিশ্বনেতৃবৃন্দের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংঘটিত ভয়াবহ দুটি বিশ্বযুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি এখনো বিশ্ববাসীকে তাড়িয়ে বেড়ালেও বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের পুরোধা দেশগুলো সেই স্মৃতি বেমালুম ভুলে গিয়ে নতুন উদ্যমে অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র উৎপাদন, ব্যবসায়-বিপণন ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নতুন করে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের কথা বললেও বাস্তবতার সাথে কথাগুলো যায় না, কেননা শান্তির জন্য যে ভারসাম্য বা শক্তির ভারসাম্য প্রয়োজন সে নীতিতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে না বলেই প্রতীয়মান। বিশ্বের প্রতিটি দেশ অস্ত্র উৎপাদন, বিপণন ও বন্ধু রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে সরবরাহ করা শতভাগ বন্ধ করবে এ আশায় আমি কখনো আশান্বিত হই না। কেননা সেটা সম্ভব নয়, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বৈশ্বিক সমরনীতি, কূটনীতি সেটাই প্রমাণ করে। তবে বৈশ্বিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, শান্তি প্রভৃতির জন্য বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস ও আস্থার উন্নয়ন ঘটানোর মতো বিকল্প ব্যবস্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অন্যথায় আগামীর বিশ্ব যে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা অবলীলায় বলা যায়।

বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্যে শীর্ষে যারা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্ব নেতৃত্ব নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যারা দুর্বল তারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সাথে চুক্তি স্থাপন করে সোভিয়েতবিরোধী একটি জোট গঠন করে। যদিও তারা সোভিয়েতের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে হিটলারের পতনের জন্য যুদ্ধ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই নাৎসিদের পরাজয় এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ক্ষমতা অনেকটা নিঃশেষিত হবার ফলে বিশ্বব্যাপী যে শক্তি শূন্যতা বা Power Vacuum সৃষ্টি হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজস্ব শক্তি দিয়ে তা পূরণে সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত আগ্রাসন রুখতে

ছিল বদ্ধ পরিকর। এভাবে দুই পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তৎকালীন দুই পরাশক্তির লড়াই ছিল দুই ভিন্নধর্মী আদর্শকেন্দ্রিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ঠাণ্ডা লড়াই পরিচালনা করে। অপরদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠাণ্ডা লড়াই পরিচালনা করে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নামে।

স্নায়ুযুদ্ধকে শক্তিশালী রূপ দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তার অনুকূলে কতকগুলো নীতি গ্রহণ করে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ট্রুম্যান-ডকট্রিন, মার্শাল প্ল্যান এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ব্রাসেলস চুক্তি সম্পাদন এবং যৌথ সামরিক জোট হিসেবে ন্যাটো গঠন। অপরদিকে ব্রাসেলস সন্ধি ও মার্শাল প্ল্যান-এর প্রত্যুত্তরে রাশিয়া কমিনফর্ম গঠন, মার্শাল প্ল্যানের প্রতিপক্ষ হিসেবে পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে রাশিয়া পারস্পারিক অর্থনৈতিক সাহায্য পরিষদ বা কমেকন গঠন করে আর ন্যাটোর প্রতিপক্ষ হিসেবে গঠন করে 'ওয়ারশ জোট'।

স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রতিপক্ষ দেশগুলো নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি করে। ঐ সময়ের বা ১৯৮৯-১৯৯৩ পর্যন্ত বিশ্ব অস্ত্র রপ্তানির একটি চিত্র দেওয়া হলো :

সারণি

বিশ্বে অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশসমূহের অংশীদারিত্ব, ১৯৮৯-১৯৯৩ (শতকরা হার হিসেবে)

সাল	যুক্তরাষ্ট্র	সোভিয়েত ইউনিয়ন/ রাশিয়া	ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি	অন্যান্য ইউরোপ	চীন	অন্যান্য
১৯৮৯	২৭	৩৯	১৭	১৭	৫	৫
১৯৯০	৩০	৩৪	২৫	৫	৩	৩
১৯৯১	৩৬	২২	২৯	৫	৫	৩
১৯৯২	৪২	১০	২৯	৯	৪	৬
১৯৯৩	৪৭	১২	২৮	৬	৪	৩

সূত্র : World Militany Expenditure and Arms Transfers, 1993-1994 Washington D.C., U.S. Arms Control and Disarmament Agency, 1995, P. 15.

স্নায়ুযুদ্ধে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার আবির্ভাব ঘটে এবং তার পর থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ পর্যন্ত সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য থাকলেও উল্লিখিত সময়ের পর সেই প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে, আর নতুন করে চীন ও রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। চীন ও রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বকে প্রতিহত করা এবং তাদের বিশাল সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে নিরাপত্তা দানের জন্য আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের উৎপাদানের পরিধি বাড়ানোর কথা বললেও দেশ দুটি বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্যের বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সামরিক ব্যয় হ্রাস-পাওয়ায় তাদের অস্ত্র উৎপাদন ও বিপণন অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার কতিপয় রাষ্ট্র তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে সামরিক সরঞ্জামের প্রয়োজন তা মূলত তাদের আমাদানিকৃত অস্ত্র-শস্ত্রের ওপরই নির্ভরশীল।

১৬ মার্চ ২০১৫ সুইডেনভিত্তিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও মুক্তকরণে বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্স ইনস্টিটিউট (SIPRI) ২০১০-১৪ সাল নাগাদ অস্ত্র রপ্তানি বাজার

পর্যালোচনা করে বিশ্ব অস্ত্র রপ্তানিবিষয়ক এক ভলিউম প্রকাশ করে। SIPRI-এর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো :

অস্ত্র আমদানি-রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ দেশ

আমদানিকারক	বৈশ্বিক আমদানির শতকরা অংশ	রপ্তানিকারক	বৈশ্বিক রপ্তানির শতকরা অংশ
ভারত	১৫	যুক্তরাষ্ট্র	৩১
সৌদি আরব	৫	রাশিয়া	২৭
চীন	৫	চীন	৫
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৪	জার্মানি	৫
পাকিস্তান	৪	ফ্রান্স	৫
অস্ট্রেলিয়া	৪	যুক্তরাজ্য	৪
তুরস্ক	৩	স্পেন	৩
যুক্তরাষ্ট্র	৩	ইতালি	৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৩	ইউক্রেন	৩
সিঙ্গাপুর	৩	ইসরাইল	২

চীনের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অস্ত্রের ক্রেতা এশিয়ার তিন দেশ- পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার। রাশিয়ার অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা দেশ ভারত। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। আফ্রিকার অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা দুই দেশ যথাক্রমে- আলজেরিয়া ও মরক্কো।

বৈশ্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও বিশ্বকে অস্ত্রের ঝনঝনানি থেকে মুক্তি দিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কার্যক্রম

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পরমাণু অস্ত্র হ্রাসের বিষয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছেন। এর ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ২০১৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে পরমাণু অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব তুলে ধরেন। তবে কি পরিমাণ অস্ত্র হ্রাস করা হবে সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেননি। রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে তা অনুমোদন করা হয়। এই চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ২০১৮ সালের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা এক হাজার সাড়ে পাঁচশোতে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করার প্রয়াস হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো অনেকদিন থেকেই ইরানকে চাপ দিয়ে আসছে এবং দেশটি পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অবরোধ আরোপ করছে। কিন্তু তাতে ইরানকে নিবৃত্ত করা যায়নি। ইরানের এই একগুঁয়েমির কারণ হলো মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্র গোপনে পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার কারণে। বর্তমান পৃথিবীতে ইউনিপোলার বিশ্ব ব্যবস্থা আর নেই। বিশ্ব ক্ষমতা এখন বহুমেরুভিত্তিক হয়ে গেছে। আর এ কারণেই আমেরিকা চাইলেই আর আগের মতো করে কারো ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারে না। ফলে বৈশ্বিক অস্ত্র উৎপাদন ও বিপণন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্য, উৎপাদন, বিস্ফোরণ ইত্যাদি যাতে মানব সভ্যতার ধ্বংস ডেকে না আনে সেজন্য দুই বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া নানা সময়ে তাদের উৎপাদিত অস্ত্রের পরিমাণ ও মাত্রাগত বিষয়গুলো

হ্রাস করার নানা ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিগুলোর মধ্যে ১৯৭১ এর 'সল্ট-১' ১৯৭৯ এর 'সল্ট-২, ১৯৯১ এর 'স্টার্ট-১' ১৯৯৩ এর স্টার্ট-২ চুক্তি উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যে আইএস, ইয়েমেন ইস্যু নিয়ে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা থেকে সকল বিশ্বশক্তিগুলোই সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে। আর এ ধরনের চেষ্টা অব্যাহত থাকলে এবং বর্তমানের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো আন্তরিকতা ও আস্থাপূর্ণ উদ্যোগ যদি বিশ্বশক্তিগুলোর মধ্যে না দেখা যায় তাহলে ভবিষ্যতের বৈশ্বিক অবস্থা আরো সংকটাপূর্ণ হবে সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনাস্থা স্থায়ী বৈশ্বিক শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্ব পরাশক্তিদ্বয় বৈশ্বিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজেদের যাবতীয় পারমাণবিক কর্মসূচি হ্রাসকরণের সত্যতা যদি বিশ্ববাসীর নিকট পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে পারে তাহলে আশা করা যায় বিশ্ব মোড়লদের মোড়লিপনা ইরান ও উত্তর কোরিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোর পারমাণবিক কর্মসূচির উদ্যোগকে পরিহার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। আর একটি বিষয় না বললেই নয় যে, পশ্চিমা বিশ্বের বিশেষ করে খ্রিস্টান বিশ্বের দেশগুলো ইসলামপন্থী মিলিশিয়াদের দমনের নামে এশিয়ায় যে ধ্বংস চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমাদের আদর্শ মতবাদকে প্রতিহত করার জন্য জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। আমি মনে করি পশ্চিমা বিশ্ব ও মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো যদি এখনই পারস্পরিক সমঝোতায় না আসে তাহলে আগামী অর্ধ-শতকের মধ্যে বিশ্ব শান্তি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কোনো সম্ভাবনা নেই।

০৪। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুত অর্থের বাস্তায়নে সমস্যা এবং এর সমাধানকল্পে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর টেকসই উন্নয়ন ও মানবজাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর আন্ত:সরকারি প্যানেল (Inter-governmental Panel on climate Change–IPCC) 'বিজনেস আজ ইউজুয়াল' পটভূমিতে হিসেব করে দেখেছে যে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা ৪.২ ডিগ্রি বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের উডহোল ওসানোগ্রাফিক ইনস্টিটিউটের গবেষক জন ডি মিলিম্যানের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ২০৫০ সালে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি যখন গ্রিনহাউসের প্রভাবে ৭৯ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে, বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে পানি তখন বাড়বে ১৪৪ থেকে ২০৯ সেন্টিমিটার। এতে ১৬ থেকে ১৮ ভাগ জমি তলি..য় যাবে। ১৩ থেকে ১৫ ভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ব্যাপারটি এক সময় আশঙ্কা মনে করা হতো, এখন প্রায় সকলে একে অবশ্যম্ভাবী মনে করেন। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে একটি মারাত্মক হুমকিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বৃদ্ধি, আবহাওয়া উপাদানসমূহে পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণ এবং এদের প্রভাবে আজ জীবন ও জীবিকা বিপন্ন।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের সমস্যাসমূহ : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। পরবর্তী পৃষ্ঠ..য় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থায়নের অভাব :** বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ও দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর কোটি কোটি মানুষ ও জনপদ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায়। খাদ্য, পানি, জীবন-জীবিকা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে। এ নাজুকতা কাটাতে উন্নত দেশসমূহ এমন কি জাতিসংঘ প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করেনি। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

২. **অর্থায়নে রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব :** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের লক্ষ্যে যে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় তাতে রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হিমশিম খাচ্ছে।

৩. **জলবায়ু তহবিলের স্বচ্ছতার অভাব :** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থায়নের জন্য 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' গঠিত হলেও এ তহবিলে অর্থ নেই। ২০১০ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিন বছরে ৩ হাজার কোটি ডলার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল উন্নত দেশগুলো। কিন্তু এ পর্যন্ত ঘোষিত অর্থের মাত্র ২৯০ কোটি ডলার প্রদান করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন দাবি করেছে এর মধ্যেই ৩ হাজার ২শ' কোটি ডলার দেয়া হয়েছে। এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব কবলিত দেশগুলোকে এক ভয়ঙ্কর শুভঙ্করের ফাঁকির মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

৪. **জলবায়ু তহবিলের দ্রুত ছাড়ের ক্ষেত্রে গড়িমসি :** উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে গড়িমসি লক্ষ্য করা যায়। কথা ও কাজের মধ্যে তাদের বিস্তর ফারাক। এ সমস্যার কারণেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো প্রতিশ্রুত তহবিল ঠিকমত পাচ্ছে না।

৫. **জলবায়ু অর্থায়ন নীতিমালায় গলদ :** জলবায়ু অর্থায়ন নীতিমালায়ও গলদ রয়েছে। জলবায়ু অর্থায়ন নীতিমালায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুদের বিশেষ চ্যালেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রতিফলন নেই। এ সমস্যার কারণেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো অভিযোজনের সমস্যা সহজে মোকাবিলা করতে পারছে না।

৬. **ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের অভাব :** জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন এবং জবাবদিহিতার বেশ অভাব। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একক কোনো সম্মেলন হয় না। নেই পারস্পারিক কোনো আলোচনা। লক্ষ্য করা যায় না সম্মিলিতভাবে কর্মসূচি দিতে। ফলে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

৭. **দুর্নীতি :** জাতিসংঘ প্রতিশ্রুত সবুজ জলবায়ু তহবিলের গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে দুর্নীতি তথা সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব বিদ্যমান। যারা এ তহবিল বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা যতটা না জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে আগ্রহী তার চেয়ে বেশি আগ্রহী আত্মোন্নয়নে। যার দরুন দুর্নীতি ছাপিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো অভিযোজনে ব্যর্থ হচ্ছে।

৮. **অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভাব :** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন দেশ যেমন– বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা এবং জাতীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে। কিন্তু এগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অভাব আছে। এতে করেও সমস্যা জিইয়ে রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের সমস্যা সমাধানকল্পে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের সমস্যা সমাধানকল্পে জাতিসংঘ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ আলোচনা করা হলো :

১. **ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) গঠন ও কপ :** ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোতে বসে জাতিসংঘের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে দুশ্চিন্তা এই সম্মেলনে প্রথম আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পায়, গঠিত হয় ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC–United Nations Framework Convention On Climate Change)। ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘভুক্ত ৫০টি দেশ সম্মতি দিয়ে ইউএনএফসিসিসি কার্যকর করে। এরপর থেকে প্রতিবছর স্বাক্ষরকারী দেশগুলো একবার করে সম্মেলনে মিলিত হয়। একে বলা হয় কপ (COP-Conference of the Parties)। গঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কপ-এর ২০টি সম্মেলন হয়েছে। যার প্রতিটি সম্মেলনেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুকি মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা হয়। নিচে কপ-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **কপ-১ ও ৩ :** ১৯৯৫ সালে প্রথম কপ সম্মেলন বসে জার্মানির বার্লিন শহরে। এ সম্মেলনে কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে অনুষ্ঠিত হয় কপের তৃতীয় সম্মেলন। এ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক কিয়োটো প্রটোকল। এতে বলা হয়, উন্নত দেশগুলোকে ২০০৮-২০১৫ সালের মধ্যে তাদের ১৯৯০ সালে যা কার্বন নির্গমন ছিল তা থেকেও ৬-৮% কমাতে হবে, আমেরিকাকে কমাতে হবে ৭%।

খ. **কপ-১৬ :** ২৯ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত হয় কপ-১৬ এর সম্মেলন। জাতিসংঘের এ সম্মেলনের অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজনের সমস্যা সমাধানকল্পে উন্নত দেশগুলো কীভাবে সহযোগিতা করবে এবং এই অর্থায়ন কীভাবে হলে সবচাইতে কার্যকরী হবে। কানকুন সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো সবুজ জলবায়ু তহবিল গঠনের প্রস্তাবনা দিয়েছে। এ তহবিল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা শুরু করবে বলে আশ্বাস দেয়। এই সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দেরও আশ্বাস দেয়।

গ. **কপ-১৭ :** ২৮ নভেম্বর-০৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে সপ্তদশ জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ-১৭) অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা নিরাপদ অবস্থায় রাখতে আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি সংক্রান্ত আলোচনা শুরুর জন্য এ চুক্তি হয়। এ চুক্তিতে সম্মত হন বিশ্বের ১৯৪টি দেশের প্রতিনিধিরা। চুক্তি অনুযায়ী, কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনতে বিশ্বের সব দেশের জন্য একটি আইনি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তিতে পৌঁছানোর আলোচনা ২০১২ থেকে শুরু হবে এবং ২০১৫ সাল নাগাদ তা চূড়ান্ত হবে বলে বলা হয়। আর এ আইনি বাধ্যবাধকতা ২০২০ সাল থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। তবে, এই প্রথম চীন ও ভারতের মতো কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোকে একই আইনি বাধ্যবাধকতায় আনার পদক্ষেপ নেয়া হয় এ সম্মেলনে। এ সম্মেলনও জলবায়ু সংকট থেকে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য একটি তহবিল গঠনের বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

ঘ. **কপ-১৮ :** ২৬ নভেম্বর-০৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে কাতারের রাজধানী দোহায় অষ্টাদশ জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ-১৮) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অনেক বিষয়ের মধ্যে ২টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর প্রথমটি ছিল কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ বাড়ানো প্রসঙ্গে। কেননা ২০১২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যেত এবং ওই প্রটোকল অনুযায়ী বৈশ্বিক উষ্ণতা কমানোর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। দোহা জলবায়ু সম্মেলনে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচিত হয় সেটি হচ্ছে কার্বন নিঃসরণের ফলে তৃতীয় বিশ্বের যে দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটির ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ ও আফ্রিকান দেশগুলোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দোহা জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষতিপূরণের নতুন অর্থায়নের মডেল দাবি করেছে। এর প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ এ তহবিলে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ঙ. **কপ-১৯ :** ১১-১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে ১৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (কপ-১৯) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করার জন্য দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তা দেয়া, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পরবর্তীতে খাপ খাওয়াতে অর্থ সহায়তা দেয়ার বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘ মতবিরোধের পর একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া এ সম্মেলনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনে, একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হবে, এই বিষয়ে একমত হয়েছে ধনী আর উন্নয়নশীর দেশের প্রতিনিধিরা। সর্বোপরি কার্বন নিঃসরণ বন্ধে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আর ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্যে সাহায্য দিতে একমত হয়েছে দেশগুলো।

চ. **কপ-২০ :** ০১-১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে পেরুর রাজধানী লিমাতে ২০তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (কপ-২০) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় একমত হয়েছে। আর এ লক্ষ্যে আগামী সম্মেলনের আগেই প্রতিটি দেশ এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করবে। এতে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী সম্মেলনে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তাতে প্রত্যেকটি জাতির সামর্থ্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দায়-দায়িত্ব থাকবে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঝুঁকি মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে, ২০১৫ সালের প্রথম প্রান্তিকের মধ্যে ইচ্ছুক দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করতে হবে এবং জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিটি ২০১৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে দেশগুলোর পাঠানো পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দেবে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

২. **জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত :** জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল (Human Rights Council) জলবায়ু পরিবর্তনের বীভৎসতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ২৬ মার্চ ২০০৮ সালে এক সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তে তারা জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সনদ ছাড়াও চলমান জাতিসংঘে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনকে সমর্থন করে। কাউন্সিল টেকসই উন্নয়ন ও উন্নয়নের অধিকারের বিবেচনায় প্রতিটি মানুষকে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ঘোষণা দেয় যে জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর গরিব জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে ক্ষতি করছে। একই সঙ্গে তারা ছোট দ্বীপভিত্তিক দেশ, সমুদ্রের ধারে নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা তুলে ধরে।

৩. **বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন :** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজন সমস্যা সমাধানকল্পে জাতিসংঘ ২০০৯ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো সমস্যা তুলে ধরে। যেমন– বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকানো তখনই সম্ভব হবে যখন দারিদ্র্য দূর করা যাবে। তিনি বলেন, এলডিসি দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির মোকাবিলায় একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এই তহবিলে এ পর্যন্ত অর্থ পাওয়া গেছে মাত্র ১৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু এখানে প্রয়োজন ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি বলেন, এলডিসি দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়বস্তুর মূল লক্ষ্য হতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, সমাজ ও দেশ। সেই ভিত্তিতেই জলবায়ু সংক্রান্ত সব আলোচনা, আইন, নীতিমালা নির্ধারণ করতে হবে। একটি সর্বজনীন স্থায়ী বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক সনদ প্রণয়ন করতে হবে (Legally binding International Instruments) এবং তৎসংলগ্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে জলবায়ুসংক্রান্ত সব প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণ ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অভিযোজন সমস্যা মোকাবিলা করা ও জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন।

০৫। পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে সকল সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা আলোচনা করুন। এর সমাধানের উপায় হিসেবে কি কি করা যেতে পারে?

উত্তর : একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর টেকসই উন্নয়ন ও মানবজাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর আন্তঃসরকারি প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) হিসাব করে দেখিয়েছে যে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা ৪.২ ডিগ্রি বাড়বে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ব্যাপারটি এক সময় আশঙ্কা মনে করা হতো, এখন প্রায় সকলে একে অবশ্যম্ভাবী মনে করেন। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে একটি মারাত্মক হুমকিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বৃদ্ধি, আবহাওয়া উপাদানসমূহে পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণ এবং এদের প্রভাবে আজ জীবন ও জীবিকা বিপন্ন। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা কিন্তু এর প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দরিদ্রপীড়িত দেশসমূহ। ভৌগোলিক অবস্থান, অত্যধিক জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতা খুবই ভয়াবহ।

জলবায়ু পরিবর্তন : সাধারণভাবে আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিবর্তন যা প্রাকৃতিকভাবে ঘটে তাকে বোঝায়। পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের আবহাওয়ার গড় অবস্থার পরিবর্তন মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলেও ঘটতে পারে। মনুষ্যসৃষ্ট দূষণের কারণে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বণীকরণ ও মরুকরণের ফলে ভূমিতে প্রতিফলনীয়তা পরিবর্তন ভূপৃষ্ঠ কর্তৃক সৌরশক্তি শোষণের পরিমাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত সালফারের এরোসল মেঘমালাকে পরিবর্তিত করে। ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের কারণে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের পরিবর্তন জলবায়ুকে প্রভাবিত করে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের গড় জলবায়ুর মাত্রা উন্নীত হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে গড় নয়, আবহাওয়ার চরম ভাবাপন্নতাই ক্ষতি ঘটবে বেশি। এতে ঘটবে প্রচণ্ড খরা ও ঝড়, পরিণামে ঘটবে মৃত্যু।

জলবায়ু পরিবর্তন মূলত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming) নামে অভিহিত। শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই বায়ুমণ্ডলে তাপ ধরে রাখতে সক্ষম গ্যাসসমূহের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। বিজ্ঞানের ভাষায় একে গ্রিনহাউজ প্রভাব (Greenhouse Effect) বলে। আর গ্রিনহাউজ প্রভাবের জন্য দায়ী গ্যাসসমূহকে গ্রিনহাউজ গ্যাস বলে। গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC), নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2) এবং মিথেন (CH_4)। গত শতাব্দীতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৫%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ১৯% এবং মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে ১০০%। বিশ্ব উষ্ণায়ন, আবহাওয়ার ধরন এবং ঋতু বৈচিত্র পাল্টে দিচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– অতি বৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।

পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে সকল সমস্যা দেখা দিচ্ছে : পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সমতলের নিকটবর্তী ও অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোর ওপর একটি বড় প্রভাব। বাংলাদেশ এর মধ্যে অন্যতম। আইপিসিসি তার চতুর্থ প্রতিবেদনে বলেছিল, ২১০০ সালে আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৮৬ সেন্টিমিটার বাড়বে। কিন্তু এখন বলছে, ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটারের ওপর ছাড়িয়ে যাবে। এতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৩ ভাগ মানুষের আবাস সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবে। তার মানে, বাংলাদেশের প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা সমুদ্রের পানিতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদিকে কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন যখন চলছে তখন বিবিসির বাংলা বিভাগ এক সংবাদে বলেছে, বাংলাদেশের উপকূলে প্রতিবছর ১৪ মিলিমিটার করে সমুদ্রের পানি বাড়ছে। গত ২০ বছরে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ সেন্টিমিটার। ২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে পানির উচ্চতা আরও বেড়ে যাবে এবং বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের হুমকির সৃষ্টি করবে।

২. **ঘূর্ণিঝড় :** ইউএনডিপির 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো : উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, এশিয়ার সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড়ের মুখে রয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৮০-২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ঘূর্ণিঝড়ে মারা গেছে আড়াই লাখ মানুষ, যার ৬০ শতাংশই বাংলাদেশের। ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের চেয়ে ফিলিপাইন তিনগুণ বেশি ঝুঁকিতে থাকলেও আমাদের দেশে মৃতের সংখ্যা ফিলিপাইন থেকে দশগুণ বেশি। ১৯৯১ সালের ২০ এপ্রিলের পর থেকে ২০০৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে চারবার ঘূর্ণিঝড় হলেও তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডরের আঘাতে দেশ যে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা কেউ ভাবতে পারেনি। সিডর আঘাত হানার ছয়মাস পর আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস। ২০০৮ সালের ২৬ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় রেশমি, ১৫ নভেম্বর থাইমুক, ২৬ নভেম্বর নিসা, ২০০৯ সালের ১৭ এপ্রিল বিজলি ও ২৫ মে ২০০৯ আঘাত করে ঘূর্ণিঝড় আইলা। এসবই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

৩. **কৃষি সঙ্কট :** পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপকূল, চরাঞ্চল আর হাওরে কৃষি সঙ্কট যেন জীবনের সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অঞ্চলগুলোতে কৃষি ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। আগে যেসব ফসল হতো, তা এখন আর এলাকায় দেখা যায় না। ঋতুচক্রের পরিবর্তনে হারিয়ে গেছে ধানের জাত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধানের উৎপাদন কমেছে। বহু কৃষক পেশা বদল করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের কৃষিভিত্তিক জীবনধারা বদলে যাচ্ছে। যেমন— বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে শতকরা ৩১ ভাগ মধ্যম কৃষি পরিবার তাদের নিজস্ব জমির ওপর ভিত্তি করে জীবিকার সঙ্কুলান করতে পারত। অথচ ১৯৯৬ সালে এ সংখ্যা ৩১ থেকে নেমে ১১-তে এসে দাঁড়ায়। ১৯৬০ সালে অকৃষি পরিবার ছিল শতকরা ১৯ ভাগ, যা ১৯৯৬ সালে বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩০ ভাগে।

৪. **খরা :** পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খরা দেখা দিচ্ছে। যেমন— বাংলাদেশে প্রতিবছর খরার কারণে শতকরা ৯০ ভাগ আমন ফসলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের প্রায় ৯.৩২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আমন ছাড়াও বোরো, গম, ভুট্টা, আলু, আখ, নানা শাকসবজি ও তেলবীজ উৎপাদন খরার কবলে পড়েছে। খরার কারণে বর্তমান হারে কৃষি উৎপাদন কমতে থাকলে একুশ শতকে তা আমাদের দেশে ৩০ শতাংশ কমে যাবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশের ধান ও গমের উৎপাদনে বড় বিপর্যয় দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

৫. **জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় :** পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ভয়াবহ দুর্ভোগের সূচনা দেখা দিয়েছে। যেমন— বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিপর্যয়, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের চরম অবনতি, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, শ্বাসকষ্ট, সর্দি-কাশি, যক্ষ্মা, চর্মরোগ, মানসিক ভারসাম্যহীনতার ব্যাপক ব্যাপ্তি ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে। এছাড়া হচ্ছে জলবাহিত রোগ, যেমন— কলেরা, যকৃতের ব্যাধি, ডায়রিয়ার প্রসার। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এদেশের মোট রোগের ৬৪ শতাংশ সংঘটিত হয় জলদূষণের কারণে এবং এর জন্য চিকিৎসা বাবদ ৭০ লাখ মার্কিন ডলারের বিপুল অর্থও ব্যয়িত হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক জুন ২০০৯ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে ডায়রিয়া, চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া ও মানসিক রোগ অন্যতম। এ রিপোর্টে দেখা যায়, বিগত ১০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে নতুন মানসিক রোগীর সংখ্যা ২২,৪৩১ জনে বৃদ্ধি পায়, যা ডেঙ্গুর চেয়ে বেশি (৩,৩০৫)।

৬. **দরিদ্র ও জলবায়ু শরণার্থী বৃদ্ধি :** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমতলের নিকটবর্তী অন্যান্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশেও দরিদ্র ও জলবায়ু শরণার্থী উভয়ই আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের জলবায়ুবিষয়ক সবচেয়ে প্রভাবশালী গবেষক স্যার নিকোলাস স্টার্নের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আর্থ-সামাজিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষতি অন্যদের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে যাবে। এ কারণে ভৌগোলিকভাবে নাজুক ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র বাংলাদেশের অবস্থা হবে সবচেয়ে খারাপ। ৪ নভেম্বর ২০০৮ একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত 'জলবায়ু পরিবর্তন : দারিদ্র্য ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে ড. আতিক রহমান বলেন, বিগত দুই তিন বছরে দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে

দেখা যাচ্ছে, যেখানে বিশ্বে ২০৫০ সাল নাগাদ ৪৫ জনের মধ্যে ১ জন জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হবে, সেখানে বাংলাদেশের প্রতি ৭ জনে ১ জন শরণার্থী হবে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের ৩ কোটি মানুষ স্থায়ী উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে পারে।

৭. **রোগ বৃদ্ধি :** সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হেপাটাইটিস বি, সংক্রামক ব্যাধি, মেনিনজাইটির মতো গ্রীষ্মকালীন রোগগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে। সেইসঙ্গে সূর্যের বিকিরণকৃত আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির কারণে চামড়ার ক্যান্সার ও চোখের ছানি পড়া রোগ বৃদ্ধি পাবে। এমন কি খাদ্যশস্যে তেজস্ক্রিয়তা বেড়ে যাবে। খাদ্যাভাব দেখা দেবে। এ অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ বিপর্যয়কে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপ্রথাগত হুমকি বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৮. **বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্যাসের উপস্থিতি :** বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মতে, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ২০১৪ সালে বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্যাসের উপস্থিতি রেকর্ডমাত্রায় পৌঁছেছে। সংস্থাটির মতে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর দীর্ঘস্থায়ী গ্যাসগুলোর কারণে ১৯৯০ থেকে ২০১৪ সালে আবহাওয়ায় উষ্ণায়নের হার ৩৪ শতাংশ পরিমাণে বেড়েছে। আগামী দশকে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। এসবই পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাব।

৯. **বন্যা :** পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবজনিত কারণে বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে হিমালয়ের বরফগলা পানিসহ উজানের নেপাল ও ভারতের বৃষ্টিপাতের পানি বাংলাদেশের প্রধান নদনদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এভাবে দেখা যায়, প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১০৯৪ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ১৫ লাখ হেক্টর চাষের জমি বন্যা ও জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে যাচ্ছে।

১০. **শীতকালের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে :** পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শীতকালের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। যেমন—বাংলাদেশে শীতকালের স্থায়িত্ব কমে যাওয়ায় রবি শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে না। আবার শৈত্যপ্রবাহের ফলে সরিষা, মসুর, ছোলাসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসবের ফলে সারা বিশ্বে যে জলবায়ু পরিবর্তনের আলামত দেখা দিয়েছে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

১১. **অন্যান্য :** উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে চাষাবাদের সময়কাল সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে।
২. পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ার নেতিবাচক প্রভাব বনাঞ্চলে পড়ার দরুন প্রাকৃতিক ভারসাম্যে পরিবর্তন আসছে,
৩. প্রাণিকুল, ভূমি, পানি ইত্যাদির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে,
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তুহারা হওয়ার উপক্রম।

৫. জলবায়ুর পরিবর্তনে বাংলাদেশের দক্ষিণের বিরাট অংশ তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের গাছপালা ও পশুপাখির ২০ শতাংশই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

৭ আইপিসিসি এর মতে, এই মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস আছে তা ২০২৫ সাল নাগদ ১.৮ ফা. তাপ বাড়াবে এবং পরবর্তী শতাব্দীর শেষ নাগাদ এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ১০ ফা.। এতে স্থানীয় আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হবে এবং তা সামাজিক ও পারিবেশিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

৮. জীবাশ্ম জ্বালানির ফলে বায়ুদূষণ প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে ২০৬০ সালের পরে non melanoma skin ক্যান্সারের সংখ্যা শতকরা ৬ থেকে ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

৯. সমুদ্র সমতল বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বৃহৎ শহর ও উপকূলের উর্বর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করে লাখ লাখ জনসাধারণকে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করবে। এটি শুধু ব্যবস্থাপনার অযোগ্য বিরাট সংখ্যক পরিবেশগত উদ্বাস্তুই তৈরি করবে না বরং খাদ্য ঘাটতি এবং তার প্রেক্ষিতে কিছু কিছু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের দেখা দিতে পারে।

১০. অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও অদক্ষ অবস্থা Bacteria এবং অন্যান্য বিষাক্ত উৎপাদক, যেমন— ফাংগাস থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। যার ফলে খাদ্য দূষিত হয়ে নষ্ট হওয়ার পরিমাণ সম্ভবত বৃদ্ধি পাবে। আকাশ মেঘবৃত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠে পতিত সৌর বিকিরণ হ্রাস পাবে, যা তাপমাত্রা, বাষ্পীয় প্রস্বেদন ও বারিপাতকে হ্রাস করবে।

পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়/করণীয় : পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবজনিত সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততা কমানোর ক্ষেত্রে উপকূলে পরিকল্পিতভাবে পলি ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে টিআরএম পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. কৃষি বিপর্যয় রোধে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষসহ চাষাবাদের নতুন পদ্ধতি ও ফসলের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা জরুরি।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল ঠিক করতে হবে।

৪. প্রতিনিয়ত নদীগর্ভ খনন করে এর নাব্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নগরের পয়োনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে।

৫. অবৈধভাবে বৃক্ষকর্তন ও ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া বন্ধ করতে হবে।

৬. সারা বিশ্বের কার্বন উদ্গীরণের মাত্রা কমিয়ে এনে এই দুর্যোগ অতিক্রম করা সম্ভব।

৭. বিশ্ববাসীদের বাংলাদেশ ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৮. একটি সমন্বিত ফান্ড গঠন করতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সাহায্যের জন্য।

৯. শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোকে প্রযুক্তি ভাগাভাগি করে নিতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে, যেন তারা পরিচ্ছন্ন শক্তির দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে।

১০. জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্যোগগুলোর সাথে সাথে অভিযোজনের বিষয়টিও মুখ্য। এই অভিযোজনের বিষয়টি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয়ভাবেই হতে হবে।

১১. জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের একটি বৃহৎ ব্যয় সাপেক্ষ ও ব্যাপক প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রযুক্তি ও অর্থ সংস্থানের সমন্বয় প্রয়োজন।

পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশসহ সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, দীর্ঘমেয়াদি বন্যা, জলাবদ্ধতা, খরা, অতিরিক্ত লবণাক্ততা এসব সমস্যা এখন প্রকট। এসব সমস্যার কারণে প্রতিবছর দেশের লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এ অবস্থায় এসব উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের বিষয়টি বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের নেতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থাপন করলেও এখনও এ সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি মিলছে না। ফলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের বেশির ভাগই মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ভূমিকা রাখবে— এটাই সবার প্রত্যাশা।

০৬। বিশ্বের ভয়াবহ কয়েকটি ভূমিকম্পের পরিচয় প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কতটুকু? ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনামূলক মতামত দিন।

উত্তর : ভূ-অভ্যন্তরে শিলায় পীড়নের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সেই শক্তির হঠাৎ মুক্তি ঘটলে ভূপৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়। এ রূপ আকস্মিক ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প (Earthquake) বলে। ভূমিকম্প পরিমাপের জন্য যে মানদণ্ডের ব্যবহার করা হয় তা রিখটার স্কেল নামে পরিচিত। এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্পের মাত্রা হলো ৯.৫; যা ১৯৬০ সালের ২২ মে সংগঠিত হয়। এর উৎসস্থল ছিল চিলির রাজধানী সান্তিয়াগো থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে ক্যানিটি নামক স্থানে। এটি গ্রেট চিলিয়ান আর্থকোয়াক নামে পরিচিত। এর প্রভাবে সৃষ্ট সুনামি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়িয়ে এশিয়া মহাদেশের জাপান ও ফিলিপাইন এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে নেপালে ৭.৮ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানলে ৮ হাজারের বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটে। এছাড়া প্রচুর ঘরবাড়ি ও অবকাঠামোর ধ্বংস নেপালের অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছে। বাংলাদেশ, চীন ও ভারতেও এ ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভূত হয়।

বিশ্বের ভয়াবহ কয়েকটি ভূমিকম্প : বিশ্বের ভয়াবহ ১০টি ভূমিকম্পের ইতিহাস নিচে তুলে ধরা হলো-

১. **সেনসেই, চীন :** ১৫৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি চীনের সানজি (সাবেক সেনসেই) প্রদেশের রাজধানী জিয়ানে ৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত হয় প্রায় ৮ লাখ ৩০ হাজার মানুষ। এ ভূমিকম্পে ব্যাপক ভূমি ধস হয়। শহরের বড় বড় সব ভবন মাটির সাথে মিশে যায়।

২. **তাংশান, চীন :** ১৯৭৬ সালের ২৭ জুলাই ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এতে নিহতের সংখ্যা ৬ লাখ ৫৫ হাজার। তবে সরকারি হিসেবে এ সংখ্যা ২ লাখ ৫৫ হাজার। এ ভূমিকম্পের আঁচ বেইজিংয়েও পড়ে।

৩. **আলেপ্পো, সিরিয়া :** বর্তমানে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সিরিয়ায় সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল ১১৩৮ সালের ৯ আগস্ট। এ ভূমিকম্পের মাত্রা কত ছিল সেটা জানা যায়নি। তবে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২ লাখ ৩০ হাজার।

৪. **সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া :** ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় ৯.২ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এ ভূমিকম্পে প্রাণ হারায় ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৯৮ জন। ১৭ লাখ মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার ১৪টি দেশে এর প্রভাবে সুনামি হয়। সর্বমোট ২,৯০,০০০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এ দুর্যোগে।

৫. **হাইতির ভূমিকম্প :** ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারি রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে মারা যায় ২ লাখ ২২ হাজার ৫৭০ জন। আহত হয় ৩ লাখ এবং এক লাখ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

৬. **দামঘান, ইরান :** ৮৫৬ সালের ২২ ডিসেম্বর ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর দামঘানে এ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। এর মাত্রা সম্পর্কে কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ।

৭. **হাইজুয়ান, নিংজিয়া, চীন :** ১৯২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ উল্লিখিত অঞ্চলে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটে। এ ভূমিকম্পে হাইজুয়ানে নিহত হয় ৭৩ হাজার। গুয়ান কাউন্টিতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজারে। লংদি এবং হুইজিয়াংয়ের প্রায় সব ভবনই ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে নিহতের সংখ্যা ২ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

৮. **আরদাবিল, ইরান :** ৮৯৩ সালের ২৩ মার্চ ঘটা এ ভূমিকম্পে জীবন যায় প্রায় দেড় লাখ মানুষের। ১৯৯৭ সালেও এ এলাকায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে।

৯. **কান্তো, জাপান :** ১৯২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত হয় ১ লাখ ৪২ হাজার ৮০০ জন। ভূমিকম্পের কারণে বিভিন্ন ভবনে অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয় ৩ লাখ ৮১ হাজার। ৬ লাখ ৯৪ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

১০. **আশগাবাত, তুর্কেমেনিস্তান :** ১৯৪৮ সালের ৫ অক্টোবর ৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে ১ লাখ ১০ হাজার মানুষের প্রাণ যায়। আশগাবাতের বিভিন্ন গ্রাম মোটামুটি ধ্বংস হয় বিশেষ করে ইটের তৈরি ঘর ধ্বংস হয়ে যায়।

এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমার ভূমিকম্প ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়ংকর।

ভূমিকম্প জোনে বাংলাদেশের অবস্থান : বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান প্লেটেরই একটি অংশ। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর আগে বার্মিজ প্লেট এবং উত্তরে তিব্বতিয়ান প্লেট, যা ইউরেশিয়ান প্লেটের একটি অংশ। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় কৌণিকভাবে বার্মিজ এবং তিব্বতিয়ান প্লেটকে ধাক্কা দিচ্ছে। ফলে পূর্বদিকে ইন্ডিয়ান প্লেট দেবে যাচ্ছে বার্মিজ প্লেটের নিচে এবং বার্মিজ প্লেট ওপরে ওঠায় আরাকান-ইয়োমা পর্বতশ্রেণির সৃষ্টি। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-সিলেট এলাকা পর্বতশ্রেণির অংশ।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তি দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত-মিয়ানমার ও বাংলাদেশ অংশের ভূতাত্ত্বিক প্লেটটি এখনো সক্রিয় এবং তা ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। বুয়েটের গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে আটটি ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি বা ফল্ট জোন সচল অবস্থায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, রাজাশাহীর তানোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের ডুবরী, সীতাকুণ্ড, সিলেটের শাহজীবাজার ও রাঙামাটির বরকল। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে এ ধরনের আরো দুটি ফল্ট রয়েছে (মধুপুর ও দুখাই) যা থেকে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে।

উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের পুনরাবৃত্তি ঘটে গড়ে প্রতি ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে। সেই হিসেবে ঢাকায় ১৩০ বছরে কোনো বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়নি যা চট্টগ্রামে ২৫০ বছর এবং সিলেটে ১০০ বছর। এ সময় গ্যাপের কারণে খুব শীঘ্রই একটি ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে।

ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা : বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। কমপ্রিহেনসিভ ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

প্রধান তিনটি শহর ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৫ লাখ ৫৮ হাজার স্থাপনা ধসে পড়বে। ঢাকায় প্রায় ৭৮ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে যাতে সরকারি ভবন প্রায় ৫ হাজার। দিনে ভূমিকম্প হলে মারা যাবে প্রায় ১.৫ লাখ মানুষ এবং আহত হবে আরও ১ লাখ মানুষ। রাতে ভূমিকম্প হলে আরও প্রায় ২ লাখ মানুষ আহত বা মারা যেতে পারে। সিলেট ও চট্টগ্রামে প্রায় ৯৫ ভাগ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত হলেও বিশেষ করে ঢাকায় অপরিকল্পিত নগরায়ন, নাজুক দালান-কোঠা এবং অত্যধিক জনসংখ্যা ভূমিকম্পে ক্ষয়-ক্ষতির সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতার যে মাত্রা রয়েছে সে সূচক অনুযায়ী ঢাকা পৃথিবীর শীর্ষ ২০টি ঝুঁকিপূর্ণ শহরের অন্যতম। ভূমিকম্প ঝুঁকি অনুযায়ী ঢাকাকে চারটি এলাকায় ভাগ করা যায়। ঢাকার উত্তরা এলাকা সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং খিলগাঁও, বাড্ডা, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট এবং পুরনো ঢাকার বুড়িগঙ্গা সংলগ্ন অঞ্চল বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রয়েছে।

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ইতিহাস : ১৮৮৫ সালে ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জে বিশাল এক ভূমিকম্প হয়েছিল (আনুমানিক ৭ থেকে ৮ মাত্রার) যা ইতিহাসে 'বেঙ্গল আর্থকোয়েক' নামে পরিচিত। এখন যদি ঢাকায় এ ধরনের কোনো ভূমিকম্প হয়, তবে অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। চট্টগ্রামেও ১৭৬২ সালে চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তে একটি বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সর্বশেষ সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে তৎকালীন শ্রীমঙ্গল বা সিলেট অঞ্চলে যা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৬। সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রামে ১৯৯৭ সালে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। এছাড়া ১৮৯৭ এবং ১৯৫০ সালে আসামে যে দুটি বিশাল ভূমিকম্প হয়েছিল,তা ছিল সিলেট সীমান্ত থেকে খুব কাছেই। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের খুব কাছে ডাউকি ফল্ট এবং ইউরেশিয়া-ইন্ডিয়ান প্লেটের সংযোগস্থলের অবস্থান হওয়ায় এ অঞ্চল ভূমিকম্পের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় বিষয়

ভূমিকম্পের আগে করণীয় :

১. বাড়ির ভেতরে এবং বাইরে নিরাপদ স্থানগুলো চিহ্নিত করা জরুরি, যাতে ভূমিকম্পের সময় ভাবতে না হয় কোথায় আশ্রয় নেবেন। বাড়িতে ছোটদের এ বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

২. ভারী মালপত্র উপরে রাখা যাবে না, শেলফের নিচের দিকে রাখতে হবে। ঝাঁকুনিতে যাতে এগুলো গায়ের ওপর না পড়ে।

৩. লিক হওয়া গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত এবং নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

৪. মাঝেমধ্যেই জরুরি প্রয়োজনে দৌড়ে বাড়ির বাইরে বের হওয়ার মহড়া দিতে হবে। যাতে কম্পন অনুভূত হলেই সবাই এক দৌড়ে বাইরে বের হতে পারেন।

৫. নিজের কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে এবং প্রতিবেশীদের এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে, যাতে আতঙ্ক না ছড়িয়ে সবাই সাবধানে থাকতে পারেন।

৬. শুকনো খাবার ও জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জাম হাতের কাছে রাখা প্রয়োজন।

৭. অন্ধকারে দেখার জন্য হাতের কাছে টর্চ লাইট রাখা প্রয়োজন।

৮. স্কুলে স্কুলে ভূমিকম্প সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করতে হবে। বাড়িতেও সবাইকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

ভূমিকম্পের সময় ঘরে থাকলে করণীয়

১. ভূমিকম্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়তে হবে, শক্ত-মজবুত কোনো আসবাবপত্রের নিচে ঢুকে যেতে হবে এবং সেটিকে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে, যাতে সরে না যায়। মনে রাখা দরকার, আমাদের দেহের মধ্যে মাথা হলো সবচেয়ে নমনীয় অঙ্গ, আসবাবপত্রের আশ্রয় না পেলে হাত দিয়ে মাথা রক্ষা করতে হবে।

২. আসবাবপত্র না পেলে ঘরের ভেতরের দিকের দেওয়ালের নিচে বসে আশ্রয় নিতে হবে। কারণ বাইরের দিকের দেওয়াল বিপজ্জনক।

৩. জানালার কাচ, আয়না, আলমারি, দেওয়ালে ঝুলানো বস্তু থেকে দূরে থাকুন। এগুলো ভেঙে মাথায় পড়তে পারে, তাই সতর্ক থাকতে হবে।

৪. বহুতলে থাকলে ঘরের ভেতরে থাকাই ভালো। কারণ নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর আগেই ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া নামতে নামতেও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

৫. ভূকম্পন থেমে গেলে বের হয়ে আসতে হবে।

৬. নিচে নামতে চাইলে কোনোভাবেই লিফট ব্যবহার করা যাবে না। সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নামতে হবে। নামার সময় মোবাইল ফোন আর ঘরের চাবিটা সম্ভব হলে হাতে রাখতে হবে।

৭. বিছানায় শুয়ে থাকলে বেশি দূরে না গিয়ে মজবুত বিছানা হলে তার নিচেই আশ্রয় নিতে হবে।

ঘরের বাইরে থাকলে করণীয়

১. খোলা জায়গা খুঁজে আশ্রয় নিতে হবে। বহুতলের নিচে কোনো ভাবেই দাঁড়ানো যাবে না।

২. লাইটপোস্ট, বিল্ডিং, ভারী গাছ অথবা বৈদ্যুতিক তার ও পোলের নিচে কোনো অবস্থাতেই দাঁড়ানো যাবে না।

৩. রাস্তায় ছোটাছুটি করা যাবে না। মাথার ওপর কাচের টুকরো, ল্যাম্পপোস্ট অথবা বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চলমান গাড়িতে থাকলে করণীয় :

১. তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে খোলা জায়গায় পার্ক করে গাড়ির ভেতরেই আশ্রয় নিতে হবে।

২. কখনো ব্রিজ, ফ্লাইওভারে থামা যাবে না।

৩. বহুতল দালান কিংবা বিপজ্জনক জায়গা থেকে দূরে গাড়ি রাখতে হবে।

৪. ভূমিকম্প না থামা পর্যন্ত গাড়ির ভেতরেই অপেক্ষা করতে হবে।

ভূমিকম্পের পরে করণীয় :

১. ভূমিকম্প শেষ হলেও আগামী কম্পনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রায়ই পরপর কয়েকবার কম্পন হয়। এই আফটার শকের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। আফটার শক এক ঘণ্টার মধ্যেই দুইবার হয়ে যায়। কখনো এক মাসের মধ্যেও হতে পারে।

২. যথাসম্ভব শান্ত থাকতে হবে। কম্পন থেমে গেলেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তারপর বের হতে হবে। কারণ উপর থেকে ঝুলন্ত জিনিসপত্র কিছুক্ষণ পরেও পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. নিজে আহত কিনা পরীক্ষা করে, অপরকে সাহায্য করতে হবে। বাড়িঘরের ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিরাপদ না হলে সবাইকে নিয়ে বের হয়ে আসতে হবে।

৪. গ্যাসের সামান্যতম গন্ধ পেলে জানালা খুলে বের হয়ে যেতে হবে এবং দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. কোথাও বৈদ্যুতিক স্পার্ক চোখে পড়লে মেইন সুইচ বা ফিউজ বন্ধ করে দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিং থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ অগ্নিকাণ্ড হতে পারে।

ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়লে করণীয় :

১. আগুন জ্বালানো যাবে না। বাড়িটিতে গ্যাসের লাইন লিক থাকলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

২. ধুলাবালির মধ্যে পড়লে হাত অথবা রুমাল দিয়ে নাক মুখ ঢেকে নিতে হবে।

৩. ধীরে নড়াচড়া করতে হবে এবং উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

৪. উদ্ধার কাজের সময় নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে পাইপ অথবা দেয়ালে আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে শব্দ করতে হবে। চিৎকার না করাটাই ভালো, এতে প্রচুর পরিমাণে ধুলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যেতে পারে।

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হওয়ার কারণে মানুষের পক্ষে এটিকে এড়ানো সম্ভব না। তবে পূর্ব সচেতনতা ও প্রস্তুতি গ্রহণ ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানিকে নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়া প্রতিটি সামর্থবান ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

০৭। সবুজ অর্থনীতি কি? সবুজ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক উল্লেখপূর্বক টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এর ভূমিকা আলোচনা করুন। সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও করণীয় কি? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করুন।

উত্তর : পরিবেশ ও অর্থনীতি টেকসই উন্নয়নের পরিপূরক এক যুগপৎ সঙ্গী। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্ধ ছুটে চলায় তার থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হচ্ছে পরিবেশ। পরিবেশহীন উন্নতির অলীক স্বপ্ন নিয়ে ছুটে চলা শ্রান্ত অর্থনীতি যেন হঠাৎই ধরিত্রীবাসীর কাছে মূল্যহীন। কেননা ধরিত্রীর সংকটকেই যেন তাড়িত করছে এ বিচ্ছিন্নতা। পৃথিবী জুড়েই পরিবেশ নিয়ে বিরাজ করছে প্রবল উৎকণ্ঠা। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে উদ্বেগ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নামে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারে গ্রিন হাউস গ্যাসের ব্যাপক নিঃসরণসহ পরিবেশবিরোধী সব কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি হয়েছে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি। পৃথিবীর এ বিপন্নাবস্থা থেকে উত্তরণে 'সেভ আওয়ার প্লানেট' হৃদয় নিংড়ানো আহ্বান থেকে উঠে এসেছে 'সবুজ অর্থনীতি'র ধারণা ও বাস্তবায়ন প্রেক্ষাপট। ক্রমশই জোরালো হচ্ছে এতে সম-অন্তর্ভুক্তির আহ্বান।

সবুজ অর্থনীতি : সবুজ অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Green Economy। সবুজ অর্থনীতির 'সবুজ' প্রত্যয়টি পরিবেশের প্রতি নির্দেশ করে। এ অর্থে সবুজ অর্থনীতি বলতে বোঝায় পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি। এটি পরিবেশ ও অর্থনীতির মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে। অর্থাৎ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্তই পরিবেশের অনুকূল থাকবে। পরিবেশের কোনো রূপ ক্ষতি না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কার্যাবলি পরিচালনা সবুজ অর্থনীতির মূল কথা। 'সবুজ অর্থনীতি' হচ্ছে সেই অর্থনীতি, যার দ্বারা পরিবেশগত ঝুঁকি ও বাস্তুতান্ত্রিক অভাব কমিয়ে মানবকল্যাণ ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। সবুজ অর্থনীতিতে সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, নিম্নকার্বন অর্থনীতি এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত হবে।

সবুজ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক : কতগুলো দিককে কেন্দ্র করে সবুজ অর্থনীতির ধারণা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। নিচে সবুজ অর্থনীতির এসব দিকসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সবুজ জ্বালানি :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম খাত জ্বালানি। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং খনিজ তেল জ্বালানির উৎস। ক্রমাগত ও অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট

ভূমিকম্পের সময় ঘরে থাকলে করণীয়

১. ভূমিকম্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়তে হবে, শক্ত-মজবুত কোনো আসবাবপত্রের নিচে ঢুকে যেতে হবে এবং সেটিকে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে, যাতে সরে না যায়। মনে রাখা দরকার, আমাদের দেহের মধ্যে মাথা হলো সবচেয়ে নমনীয় অঙ্গ, আসবাবপত্রের আশ্রয় না পেলে হাত দিয়ে মাথা রক্ষা করতে হবে।

২. আসবাবপত্র না পেলে ঘরের ভেতরের দিকের দেওয়ালের নিচে বসে আশ্রয় নিতে হবে। কারণ বাইরের দিকের দেওয়াল বিপজ্জনক।

৩. জানালার কাচ, আয়না, আলমারি, দেওয়ালে ঝুলানো বস্তু থেকে দূরে থাকুন। এগুলো ভেঙে মাথায় পড়তে পারে, তাই সতর্ক থাকতে হবে।

৪. বহুতলে থাকলে ঘরের ভেতরে থাকাই ভালো। কারণ নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর আগেই ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া নামতে নামতেও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

৫. ভূকম্পন থেমে গেলে বের হয়ে আসতে হবে।

৬. নিচে নামতে চাইলে কোনোভাবেই লিফট ব্যবহার করা যাবে না। সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নামতে হবে। নামার সময় মোবাইল ফোন আর ঘরের চাবিটা সম্ভব হলে হাতে রাখতে হবে।

৭. বিছানায় শুয়ে থাকলে বেশি দূরে না গিয়ে মজবুত বিছানা হলে তার নিচেই আশ্রয় নিতে হবে।

ঘরের বাইরে থাকলে করণীয়

১. খোলা জায়গা খুঁজে আশ্রয় নিতে হবে। বহুতলের নিচে কোনো ভাবেই দাঁড়ানো যাবে না।

২. লাইটপোস্ট, বিল্ডিং, ভারী গাছ অথবা বৈদ্যুতিক তার ও পোলের নিচে কোনো অবস্থাতেই দাঁড়ানো যাবে না।

৩. রাস্তায় ছোটাছুটি করা যাবে না। মাথার ওপর কাচের টুকরো, ল্যাম্পপোস্ট অথবা বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চলমান গাড়িতে থাকলে করণীয় :

১. তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে খোলা জায়গায় পার্ক করে গাড়ির ভেতরেই আশ্রয় নিতে হবে।

২. কখনো ব্রিজ, ফ্লাইওভারে থামা যাবে না।

৩. বহুতল দালান কিংবা বিপজ্জনক জায়গা থেকে দূরে গাড়ি রাখতে হবে।

৪. ভূমিকম্প না থামা পর্যন্ত গাড়ির ভেতরেই অপেক্ষা করতে হবে।

ভূমিকম্পের পরে করণীয় :

১. ভূমিকম্প শেষ হলেও আগামী কম্পনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রায়ই পরপর কয়েকবার কম্পন হয়। এই আফটার শকের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। আফটার শক এক ঘণ্টার মধ্যেই দুইবার হয়ে যায়। কখনো এক মাসের মধ্যেও হতে পারে।

২. যথাসম্ভব শান্ত থাকতে হবে। কম্পন থেমে গেলেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তারপর বের হতে হবে। কারণ উপর থেকে ঝুলন্ত জিনিসপত্র কিছুক্ষণ পরেও পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. নিজে আহত কিনা পরীক্ষা করে, অপরকে সাহায্য করতে হবে। বাড়িঘরের ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিরাপদ না হলে সবাইকে নিয়ে বের হয়ে আসতে হবে।

৪. গ্যাসের সামান্যতম গন্ধ পেলে জানালা খুলে বের হয়ে যেতে হবে এবং দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. কোথাও বৈদ্যুতিক স্পার্ক চোখে পড়লে মেইন সুইচ বা ফিউজ বক্স করে দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিং থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ অগ্নিকাণ্ড হতে পারে।

ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়লে করণীয় :

১. আগুন জ্বালানো যাবে না। বাড়িটিতে গ্যাসের লাইন লিক থাকলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

২. ধুলাবালির মধ্যে পড়লে হাত অথবা রুমাল দিয়ে নাক মুখ ঢেকে নিতে হবে।

৩. ধীরে নড়াচড়া করতে হবে এবং উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

৪. উদ্ধার কাজের সময় নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে পাইপ অথবা দেয়ালে আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে শব্দ করতে হবে। চিৎকার না করাটাই ভালো, এতে প্রচুর পরিমাণে ধুলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যেতে পারে।

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হওয়ার কারণে মানুষের পক্ষে এটিকে এড়ানো সম্ভব না। তবে পূর্ব সচেতনতা ও প্রস্তুতি গ্রহণ ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানিকে নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়া প্রতিটি সামর্থবান ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

০৭। সবুজ অর্থনীতি কি? সবুজ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক উল্লেখপূর্বক টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এর ভূমিকা আলোচনা করুন। সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও করণীয় কি? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করুন।

উত্তর : পরিবেশ ও অর্থনীতি টেকসই উন্নয়নের পরিপূরক এক যুগপৎ সঙ্গী। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্ধ ছুটে চলায় তার থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হচ্ছে পরিবেশ। পরিবেশহীন উন্নতির অলীক স্বপ্ন নিয়ে ছুটে চলা শ্রান্ত অর্থনীতি যেন হঠাৎই ধরিত্রীবাসীর কাছে মূল্যহীন। কেননা ধরিত্রীর সংকটকেই যেন তাড়িত করছে এ বিচ্ছিন্নতা। পৃথিবী জুড়েই পরিবেশ নিয়ে বিরাজ করছে প্রবল উৎকণ্ঠা। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে উদ্বেগ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নামে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারে গ্রিন হাউস গ্যাসের ব্যাপক নিঃসরণসহ পরিবেশবিরোধী সব কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি হয়েছে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি। পৃথিবীর এ বিপন্নাবস্থা থেকে উত্তরণে 'সেভ আওয়ার প্লানেট' হৃদয় নিংড়ানো আহ্বান থেকে উঠে এসেছে 'সবুজ অর্থনীতি'র ধারণা ও বাস্তবায়ন প্রেক্ষাপট। ক্রমশই জোরালো হচ্ছে এতে সম-অন্তর্ভুক্তির আহ্বান।

সবুজ অর্থনীতি : সবুজ অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Green Economy। সবুজ অর্থনীতির 'সবুজ' প্রত্যয়টি পরিবেশের প্রতি নির্দেশ করে। এ অর্থে সবুজ অর্থনীতি বলতে বোঝায় পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি। এটি পরিবেশ ও অর্থনীতির মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে। অর্থাৎ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্তই পরিবেশের অনুকূল থাকবে। পরিবেশের কোনো রূপ ক্ষতি না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কার্যাবলি পরিচালনা সবুজ অর্থনীতির মূল কথা। 'সবুজ অর্থনীতি' হচ্ছে সেই অর্থনীতি, যার দ্বারা পরিবেশগত ঝুঁকি ও বাস্তুতান্ত্রিক অভাব কমিয়ে মানবকল্যাণ ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। সবুজ অর্থনীতিতে সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, নিম্নকার্বন অর্থনীতি এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত হবে।

সবুজ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক : কতগুলো দিককে কেন্দ্র করে সবুজ অর্থনীতির ধারণা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। নিচে সবুজ অর্থনীতির এসব দিকসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সবুজ জ্বালানি :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম খাত জ্বালানি। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং খনিজ তেল জ্বালানির উৎস। ক্রমাগত ও অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট

এখন মূর্তিমান আতঙ্ক। উন্নয়নের অন্যতম উপায় হিসেবে এর যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশগত হুমকির একটি বড় কারণ। এর বিপরীতে সবুজ জ্বালানির বা পরিবেশবান্ধব নগরায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে সবুজ অর্থনীতি। সবুজ অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতটি সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস প্রকল্প, বায়ুবিদ্যুৎ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. **সবুজ কর্মসংস্থান :** সবুজ কর্মসংস্থান বলতে পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রসমূহে বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তির বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহে কর্মসংস্থানকে বুঝায়। নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচুর ব্যবহার নিশ্চিতের মধ্যেই সবুজ কর্মসংস্থানের প্রসার ও বিস্তৃতি নির্ভরশীল।

৩. **সবুজ বিনিয়োগ :** সবুজ অর্থনীতির অন্যতম দিক হচ্ছে সবুজ বিনিয়োগ। পরিবেশবান্ধব শিল্প, প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগই এর মূল কথা। সবুজ বিনিয়োগ সব ধরনের ব্যবসায়কে পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৪. **সবুজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :** সবুজ অর্থনীতির আরেকটি প্রধান দিক হচ্ছে সবুজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। এটি চারটি R-কে বোঝায়— Reduce (দূষণ হ্রাস), Reuse (পুনঃব্যবহার), Recycle (পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ) ও Recover (পুনঃআবরণ)। সবুজ অর্থনীতির এ ফর্মুলা পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তি ও পণ্য উৎপাদনেও সহায়ক।

৫. **সবুজ পরিবহন :** পরিবেশের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না— এমন সব পরিবহন বা চলাচল মাধ্যম যেমন বাস, ট্রাক, নৌজাহাজ ইত্যাদি সবুজ পরিবহনের উদাহরণ যা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করে চলাচল করে। বাতাসে কার্বন তথা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা হ্রাস করা সবুজ অর্থনীতির এ দিকটার প্রধান লক্ষ্য।

৬. **সবুজ কৃষি :** সবুজ অর্থনীতির এ দিকটি মূলত ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত। জমির উর্বরতা ধরে রাখা এবং সাথে সাথে উর্বরতা বৃদ্ধিসহ স্বল্প ভূমিতে অধিক পরিমাণে নিরাপদ ফসল উৎপাদন এর মূল কথা। এ ব্যবস্থা রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার, শস্যের বহুমুখীকরণ, মিশ্র ফসল উৎপাদনসহ পরিবেশবান্ধব সব উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যবস্থার কথা বলে।

৭. **নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা :** সবুজ অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি। নদ-নদী, জলাশয়ের পানি নানাবিধ দূষণের কবল থেকে মুক্ত রাখার কর্মপরিকল্পনা এবং দূষিত পানিকে যথার্থ প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করাসহ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ করে তা ব্যবহারের কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করে সুপেয় পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে সবুজ অর্থনীতির এ দিকটি গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সবুজ অর্থনীতির ভূমিকা : সুস্থ ও সুন্দর ধরণী গড়ার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ আজ সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে সবুজ অর্থনীতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **টেকসই উন্নয়নে সবুজ অর্থনীতির ভূমিকা :** 'উন্নয়ন' ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন ধারার একটি দিক হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। উন্নয়নের স্থায়িত্ব ও পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়টি নিয়ে এ উন্নয়ন ধারণার উদ্ভব ও পথচলা। টেকসই উন্নয়ন এমন উন্নয়ন, যেখানে বর্তমান প্রজন্মের ভোগের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয় ভোগের সম্ভাব্যতা সীমিত হবে না। অর্থাৎ আন্তঃপ্রজন্ম সমতা এর মূল কথা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ— এ তিনটি হচ্ছে টেকসই

উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ। পরস্পর সম্পর্কিত ও আন্তঃনির্ভরশীল এ স্তম্ভগুলোর যুগপৎ অগ্রযাত্রায় টেকসই উন্নয়ন সাধিত হয়। টেকসই উন্নয়নের এ পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চালক হচ্ছে 'সবুজ অর্থনীতি'। পরবর্তী প্রজন্মের ভোগের অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখতে টেকসই উন্নয়ন যেমন উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ সংরক্ষণে জোর দেয়, তেমনি সবুজ অর্থনীতিও পরিবেশকে বাঁচিয়ে উন্নয়নের কথা বলে। অর্থাৎ উন্নয়ন, তবে তা পরিবেশবান্ধব। সবুজ অর্থনীতিতে পরিবেশ অর্থনৈতিক উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি, ভ্যালু, ভারসাম্য রক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির সূচক যা পরিবেশগত ঝুঁকি নিরসনের সাথে সাথে প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখে। এককথায় ধরিত্রীকে সংকটে না ফেলে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম সবুজ অর্থনীতি।

খ. **দারিদ্র্য দূরীকরণে সবুজ অর্থনীতির ভূমিকা :** সবুজ অর্থনীতি পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পুঁজি রক্ষা ও উন্নয়ন সবুজ অর্থনীতির একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে নির্ভরশীল উপকূলীয় বা বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার বিশাল অংশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখে সবুজ অর্থনীতি। আর মৎস্য, বনায়ন ও কৃষিসহ অন্যান্য খাতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এর প্রধান উপায়। সবুজ অর্থনীতিতে উন্নয়ন পরিবেশকে সাথে নিয়ে হওয়ায় উন্নয়নের অংশীদারিত্বে শামিল হতে পারে সকল শ্রেণীর মানুষ, যা প্রান্তিক পর্যায়ের দারিদ্র্য দূরীকরণ বা হ্রাসে কার্যকর। এটি একই সাথে শহুরে ও গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে সমতা বিধান করে।

সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা : সবুজে ঘেরা সুন্দর ভবিষ্যৎ পৃথিবী গড়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হবে সবুজ অর্থনীতি— একথা এখন অনেকটাই প্রমাণিত সত্য। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সবুজ অর্থনীতির সমবাস্তবায়নে রয়েছে নানা প্রচ্ছন্ন বাধা। অঞ্চলভিত্তিক উপযোগিতা নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। তদুপরি উন্নত দেশগুলোর কথা ও কাজের বিস্তর ফারাক ও ভোগবাদী দর্শন সবুজ অর্থনীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন ও যাত্রা নিয়ে সীমাহীন সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। নিচে সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. ধনী দেশগুলোর শিল্পকারখানার মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ।
২. বিভিন্ন সময়ে গৃহীত চুক্তির অবমাননা।
৩. আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন।
৪. ধনী দেশগুলোর ঐকমত্যের অভাব।
৫. উন্নয়নশীল দেশের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি না করা।
৬. জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি।

সবুজ অর্থনীতির বাস্তবায়নে করণীয় : সবুজ অর্থনীতির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. ধনী দেশগুলোকে সত্যিকারের সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।
২. সবার আগে দিতে হবে শর্তহীন প্রযুক্তি ও অর্থ সহায়তা, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো সমভাবে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ সবুজ অর্থনীতিতে সমঅন্তর্ভুক্তি বা সমতার নিশ্চয়তা বিধান করা জরুরি।
৩. কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনা।
৪. ধনী দেশগুলোর ঐকমত্যে পৌঁছা।
৫. জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
৬. বিভিন্ন সময়ে গৃহীত চুক্তির বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

সবুজ অর্থনীতিতে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি : পরিবেশ দূষণ কিংবা উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমিকা নগণ্যমাত্রায় হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসসাধন দেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। বিগত দশকগুলোর তুলনায় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের শূন্যতা বেড়েছে বহুগুণ। বন উজাড়করণ, বাস্তুসংস্থান ধ্বংস এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি— এ শূন্যতাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। অল্প আয়তনের ছোট্ট বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যা প্রাকৃতিক বনজসম্পদের ধ্বংস সাধন করছে প্রতিনিয়ত। ফলশ্রুতিতে একটি দেশের জন্য সর্বনিম্ন ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকার প্রয়োজনীয়তা থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশ। এর পাশাপাশি দেশে কৃষি পণ্য উৎপাদন বাড়লেও রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অপব্যবহারে পানি দূষণের সাথে সাথে জমির মানের বা উর্বরতার অবনমন ঘটছে। ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় এটি একই সাথে মানুষের নানা স্বাস্থ্যগত সমস্যাকেও উস্কে দিয়েছে। পানি দূষণজনিত কারণে পরিবেশগত বিপর্যয় অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর। আর দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের উপরই এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে সর্বাধিক দূষণের শিকার মেক্সিকোর বায়ু দূষণের চেয়েও বেশি ঢাকার বায়ু দূষণ। পুরাতন যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ইট ভাটার নির্গত ধোঁয়াসহ কলকারখানায় নির্গত বর্জ্য ঢাকার বায়ু দূষণের জন্য প্রধানভাবে দায়ী। এছাড়া দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও পরিবেশকে দূষিত করছে বিভিন্ন উপায়ে। সব মিলিয়ে পরিবেশের প্রতি নির্দয় ও বিরূপ আচরণে সবুজ সংকটের এক উচ্চ ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। অপ্রিয় হলেও সত্য, মানুষের নির্বিচার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলেই এ সার্বিক সবুজ সংকট। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে খাতভিত্তিকভাবে যার অবদানও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নতি দেশের টেকসই উন্নয়ন নয়। প্রকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আরেকটির পরিপূরক। তাই একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন, অন্যদিকে তার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ— দুই-ই দেশের জন্য অপরিহার্য। এমন প্রেক্ষাপটে 'সবুজ অর্থনীতি'ই হতে পারে যুগপৎ উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ বিকল্প মাধ্যম। মধ্যম আয়ের দেশের পথে আগুয়ান সবুজ সংকটে জর্জরিত দেশের জন্য বরং সবুজ অর্থনীতি এক অসাধারণ উপায়রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আর এ পথে এখন অনেকটাই ধাবিত বাংলাদেশ।

সবুজ অর্থনীতি কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম : সবুজ অর্থনীতি কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো :

- ⊙ পরিবেশবান্ধব প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি।
- ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ আইন অনুমোদন।
- ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার প্রসার, যেমন— সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের দ্রুত সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
- ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাণিজ্যিক উৎপাদনের উপর থেকে পাঁচ বছরের জন্য আয়কর মওকুফকরণ।
- ⊙ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা কার্যক্রম।
- ⊙ পরিবহনে তুলনামূলক কম দূষণকারী জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি।
- ⊙ পৌর বর্জ্য থেকে কমপোস্ট বা জৈব সার তৈরির সিডিএম প্রকল্প চালু এবং ইতোমধ্যেই এর কার্বন ক্রেডিট লাভ।
- ⊙ ইটভাটা থেকে সৃষ্ট মারাত্মক বায়ু দূষণের হ্রাসের লক্ষ্যে এগুলোকে পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চালুকরণ।

- ⊙ Polluters Pay Principle-এর আওতায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তানুসারে শিল্পসমূহের দূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- ⊙ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে Green Banking-এর নীতিমালা জারি ইত্যাদি।

পৃথিবীকে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হলে সবুজ অর্থনীতির বিকল্প নেই। তাই সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নের পথে যেসব সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করা জরুরি। উল্লেখ্য যে, সবুজ অর্থনীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নও জরুরি।

০৮। রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায় নির্দেশ করুন। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত বলে মনে করেন কি?

উত্তর : সাম্প্রতিক মিয়ানমারের জাতিগত দাঙ্গায় আবারও জীবন্ত হয়ে উঠেছে রোহিঙ্গা ইস্যু। দেশটির পদদলিত সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গা জাতির ওপর নির্যাতনের ভুলে যাওয়া ইতিহাস আবারও জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। পরবাসেও আশ্রয়দাতার গলার কাঁটা। শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তারা আশ্রয় খুঁজছে বেশ কয়েক দশক ধরে। বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় দমনাভিযানের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গারা এখনো বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। মিয়ানমারের এ রোহিঙ্গাদের জাতিসংঘ তার এক প্রতিবেদনে 'বিশ্বের সবচেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

রোহিঙ্গা কারা : নবম-দশম শতাব্দীতে আরাকান রাজ্য 'রোহান' কিংবা 'রোহাঙ' নামে পরিচিত ছিল। সেই অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবেই 'রোহিঙ্গা' শব্দের উদ্ভব। মিয়ানমার সরকার 'রোহিঙ্গা' বলে কোন শব্দের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। রোহিঙ্গারা পূর্বতন বার্মা, অধুনা মিয়ানমারের রাখাইন (আরাকান) রাজ্যের মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আরাকানি মুসলিমরা সেখানে হাজার বছর ধরে বসবাস করে এলেও বাংলাভাষী ও মুসলিম হওয়ার কারণে তারা (রোহিঙ্গারা) মিয়ানমার সরকার ও নাগরিকদের কাছে 'বিদেশি', 'বাঙালি' বা 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত। এ কারণে রোহিঙ্গারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের কাছ থেকে চরম বৈরিতার শিকার হয়ে থাকে বিশেষ করে বর্ণবাদী রাখাইনরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী নয়। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব স্বীকার না করলেও ইতিহাস কিন্তু তাদের পক্ষেই।

রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণসমূহ : সম্প্রতি মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক দাঙ্গা শুরু হয় ৩ জুন ২০১২। এ দাঙ্গায় বহু মুসলিম রোহিঙ্গা নিহত এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। উদ্ভূত এ রোহিঙ্গা সমস্যার পিছনে একক কোনো কারণ নিহিত নয়, এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ ও বহু অতীত ইতিহাস। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বার্মা রাজার আরাকান দখল :** ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মার রাজা বোদাফিয়া আরাকান দখল করেন। বর্মীরাজ বোদাফিয়া দীর্ঘ ৪২ বছর বার্মা শাসন করেন। তার দুঃশাসনে মুসলিম রোহিঙ্গারা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে পৌঁছে। তিনি মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ করে দেন এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলেন প্যাগোডা, বৌদ্ধবিহার, স্তূপ ইত্যাদি। মুসলমানদের বিতাড়িত করে সর্বোতভাবে আরাকানকে তিনি একটি বৌদ্ধভূমিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এ সময় বেশ কিছু আরাকানি মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৮২৩ সালে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ব্রিটিশ সরকার আরাকান ও বার্মা দখল করে নেয়।

২. **বার্মার স্বায়ত্তশাসন :** ১৯৩৭ সালে বার্মাকে হোম রুল বা স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় এবং ব্রিটিশ পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বাদ দিয়ে বর্মীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। ফলে বার্মা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ বার্মা বিশে করে আরাকানে অসংখ্য দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এতে প্রায় এক লাখ মুসলমান নিহত এব রোহিঙ্গারা অনেকেই নিজ নিজ ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। ব্রিটিশদের তাড়াবার লক্ষ্যে দ্বিতী বিশ্বযুদ্ধকালে বর্মীরা জাপানিদের পক্ষাবলম্বন করে। জাপানিদের আচরণ আরো তিক্ততার মে হলে তারা মত পরিবর্তন করে ব্রিটিশদের সহায়তা করে। এর বিনিময়ে বার্মা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা লাভ করে।

৩. **জাতি-উপজাতি বিচ্ছিন্নতার দাবি :** স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বার্মার সংহতি সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতি উপজাতিগুলো বিচ্ছিন্নতার দাবি তোলে। ১৯৫৮ সালে আ প্রদেশের কেরণ সম্প্রদায় রাজধানী রেঙ্গুনের পতন অনিবার্য করে তোলে। ভারতের সাহায্য সহযোগিতায় সে বিদ্রোহ দমন করা হয়। এ সময় আরাকানি বৌদ্ধরা ক্ষমতা সংহত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনা করে।

৪. **নে উইনের ক্ষমতা দখল :** ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক নে উইন মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তী পর্যায়ে সেনাপ্রধান নে উইন রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং ইতোপূর্বে স্বীকৃত অধিকার ও সুবিধাসমূহ বানচাল করে দেন। নে উইন বার্মার প্রচলিত বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বাতিল করে দেন। একমাত্র দল বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির নেতৃত্বে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রোহিঙ্গাদের কথা বলার যে সুযোগটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও তিরোহিত হয়।

৫. **১৯৪২ সালে রোহিঙ্গা হত্যা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে, ১৯৪২ সালে, জাপানিরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে দখল করে নেয়। স্থানীয় রাখাইনরা এ সময় জাপানিদের পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণকে আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণের শিকার হয় মূলত (রোহিঙ্গা) মুসলমানরা। ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রাখাইন অধ্যুষিত মিমবিয়া ও মোহাং টাউনশিপে প্রায় পাঁচ হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করে রাখাইনরা।

৬. **রোহিঙ্গাদের পাল্টা প্রতিশোধ :** রোহিঙ্গা হত্যার পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে রোহিঙ্গারা উত্তর রাখাইন অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার রাখাইনকে হত্যা করে। সংঘাত তীব্র হলে জাপানিদের সহায়তায় রাখাইনরা রোহিঙ্গাদের কোণঠাসা করে ফেলে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার জাপানিদের দখলে থাকে। এ তিন বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে তৎকালীন বাংলায় চলে আসে। সে যাত্রা এখনো থামেনি। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা আবারও মিয়ানমার দখল করে নেয়। এই দখলে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে রোহিঙ্গারা। ব্রিটিশরা এ সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সহায়তার বিনিময়ে উত্তর রাখাইনে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাজ্য গঠন করে দেবে তারা। কিন্তু আরো অনেক প্রতিশ্রুতির মতোই ব্রিটিশরাজ এ প্রতিশ্রুতিও রাখেনি।

৭. **পূর্ব পাকিস্তান ও আরাকান রাজ্য সংযোগের প্রচেষ্টা :** ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগের সময় রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ আরাকান রাজ্যকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এ নিয়ে জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ করেন রোহিঙ্গানেতারা। রোহিঙ্গারা একটি বড় সশস্ত্র

গ্রুপও তৈরি করে এবং মংদু ও বুথিধাং এলাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত করতে উদ্যোগ নেয়। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, রোহিঙ্গাদের এ উদ্যোগ ছিল আত্মঘাতী এবং মিয়ানমারে বৈষম্যের শিকার হওয়ার পেছনে এটি একটি বড় কারণ। মিয়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সেই সময়কার রোহিঙ্গা উদ্যোগকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে।

৮. **১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন পাশ :** ১৫ অক্টোবর ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা নাগরিকত্ব আইন প্রকাশ করে। এ আইনে মিয়ানমারে তিন ধরনের নাগরিকত্বে বিধান রাখা হয়– পূর্ণাঙ্গ, সহযোগী এবং অভিবাসী। এ নতুন আইনে বলা হয়, ১৮২৩ সালে মিয়ানমারে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে মিয়ানমারে বাস করা ১৩৫টি গোত্রভুক্ত মানুষই মিয়ানমারের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। রোহিঙ্গাদের গোত্র হিসেবে অস্বীকার করে সামরিক সরকার। আইনে 'সহযোগী নাগরিক' হিসেবে শুধু তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হয়, যারা ১৯৪৮ সালের নাগরিকত্ব অ্যাক্টে ইতিমধ্যেই আবেদন করেছে। এছাড়া 'অভিবাসী নাগরিক' (মিয়ানমারের বাইরে জন্ম নিয়েছে এমন মানুষদের নাগরিকত্ব) হিসেবে কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়, যেগুলো 'যথাযোগ্যভাবে প্রমাণসাপেক্ষ' বলে বলা হয়, যারা মিয়ানমারের স্বাধীনতার আগে (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) এ দেশে প্রবেশ করেছে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় ভাষায় দক্ষ এবং যাদের সন্তান মিয়ানমারে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাই এ ধারায় নাগরিকত্ব পেতে পারে।

৯. **নাগরিক কার্ড থেকে বঞ্চিত :** ১৯৮৯ সাল থেকে মিয়ানমার তিন ধরনের নাগরিক কার্ডের প্রচলন করে। পূর্ণাঙ্গ নাগরিকদের জন্য গোলাপি, সহযোগী নাগরিকদের জন্য নীল এবং অভিযোজিত নাগরিকদের জন্য সবুজ রঙের কার্ড দেয়া হয়। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়াশোনা-চিকিৎসাসেবাসহ সব ধরনের কাজকর্মে এ কার্ডের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু রোহিঙ্গাদের কোনো ধরনের কার্ড দেওয়া হয় না। এর ফলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে মিয়ানমারে টিকে থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে।

১০. **নির্দিষ্ট গ্রামে বন্দি :** মিয়ানমার জান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। আর তাই 'বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত এসব রোহিঙ্গাকে রাখা হয়েছে কারাগারে। না, আট লাখ রোহিঙ্গাকে বন্দি করার মতো বড় কারাগার মিয়ানমার তৈরি করতে পারেনি, তাই রোহিঙ্গারা নিজ গ্রামেই বন্দি। মিয়ানমারের অন্য কোনো অঞ্চলে যাওয়ার কথা তো দূরূহ, পাশের গ্রামে যাওয়ারও কোনো অনুমতি নেই তাদের। নিজ গ্রামের বাইরে যেতে হলে তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকার কাছ থেকে ট্র্যাভেল পাস নিতে হয়। এ ট্র্যাভেল পাস নিয়েই তারা গ্রামের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু ট্র্যাভেল পাস পাওয়া কঠিন বিষয়। এ জন্য নাসাকাকে দিতে হয় বড় অঙ্কের ঘুষ। তার পরও রক্ষা নেই। যদি ট্র্যাভেল পাসে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ গ্রামে ফিরতে ব্যর্থ হয় কোনো রোহিঙ্গা, তা হলে তার নাম কাটা যায় এ গ্রামের তালিকাভুক্তি থেকে। সে তখন নিজ গ্রাম নামের কারাগারেও অবৈধ হয়ে পড়ে। তাদের ঠাঁই হয় জান্তা সরকারের জেলখানায়।

১১. **বিয়েতে বাধা :** ১৯৯০ সালে আরাকান রাজ্যে স্থানীয় আইন জারি করা হয়। আইনটিতে উত্তর আরাকানে বাস করা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা এই আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে বাস করা রোহিঙ্গাদের বিয়ের আগে সরকারি অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

১২. **জন্মনিয়ন্ত্রণ :** ২০০৫ সালে নাসাকা বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। এ সময় দীর্ঘদিন বিয়ে সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয় নাসাকা। পরের বছর যখন আবার আবেদন গ্রহণ চালু হয়,

তখন নিয়মকে করা হয় আরো কঠোর। তখন থেকে আবেদনের সাথে নবদম্পতিকে মুচলেকা দিয়ে বলতে হয় যে এ দম্পতি দুইয়ের অধিক সন্তান নেবে না।

১৩. **চিকিৎসা ও শিক্ষায় সীমিত অধিকার :** রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারের নাগরিক অধিকার অনেক দূরের ব্যাপার। সরকারি চাকরি তাদের জন্য নিষিদ্ধ। উত্তর আরাকানের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রোহিঙ্গাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসেবা চালু আছে। কিন্তু এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখাইন এবং বার্মিজ নাগরিকরা স্থানীয় রাখাইন ভাষায় কথা বলার কারণে রোহিঙ্গারা সেখানে গিয়ে পূর্ণ চিকিৎসা নিতে পারে না। সরকারি বড় হাসপাতালে তাদের প্রবেশ পদ্ধতিগতভাবে নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের জন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগ নিতে পারে না। এমনকি রোহিঙ্গা মহিলাদের জরুরি ধাত্রীবিদ্যা শেখানোর উদ্যোগ নিয়েও মিয়ানমার সরকারের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেবা সংস্থাগুলো।

১৪. **সাম্প্রতিক ধর্ষণের অভিযোগ ও রোহিঙ্গা হত্যা :** ২০১১ সাল থেকেই নতুন করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তাদের প্রায়ই রোহিঙ্গা, বার্মিজ মুসলমান, কালার, মুসলিম গোষ্ঠী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতে থাকে। ২০১২ সালের ১ এপ্রিল উপনির্বাচনে অং সান সু চির জয়ের পর থেকে রোহিঙ্গাবিরোধী তৎপরতা বাড়তে থাকে। সু চির জয়ের দুই সপ্তাহ পরে কচিন রাজ্যের হপকান্তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। মধ্য মিয়ানমারে মগবি অঞ্চলে দাঙ্গাবাজরা আরেকটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় এবং স্থানীয় মুসলমানদের সম্পত্তি লুটপাট করে। এবারের নৃশংসতা শুরু হয়েছে এক বৌদ্ধ নারীর ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তিন রোহিঙ্গা ঐ নারীকে হত্যা করেছে বলে প্রচার করা হয় ১ জুন ২০১২। তবে পরে জানা যায়, ঐ ঘটনার সাথে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু হামলা চালানোর জন্য একদল লোক মুখিয়ে ছিল। তারা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিধনযজ্ঞ শুরু করে ৩ জুন ২০১২। হত্যা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া, মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়াসহ নানাভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালানো শুরু হয়।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উপায় : শুধু মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবেই নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ ও বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে হলেও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করা জরুরি। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে আমি মনে করি :

১. **কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার :** রোহিঙ্গা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়দেশের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা উচিত। এক্ষেত্রে ভারত ও চীনের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নিতে পারে।

২. **দ্বিপাক্ষিক আলোচনা :** রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উত্তম হাতিয়ার হলো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। উভয় দেশ নিজ নিজ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে পারে।

৩. **রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান :** মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব প্রদান সম্পর্কিত যে কালো আইন প্রণয়ন করে তাতে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তাই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানের লক্ষ্যে হয় ১৯৮২ সালের আইন বাতিল করতে হবে নতুবা আইনটির সংস্কার করতে হবে।

৪ **জাতিসংঘ কর্তৃক মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ :** সুদীর্ঘকাল থেকে জিইয়ে থাকা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ মিয়ানমারকে আইনের আওতায় এনে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

৫ **নাসাকা বাহিনীর সদয় মনোভাব :** মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা জান্তা সরকারের নির্দেশে রোহিঙ্গাদের উপর প্রতিনিয়ত নির্যাতনের স্টীম রোলার চালায়। নাসাকা বাহিনী এ নিষ্ঠুর মনোভাব থেকে বেরিয়ে সদয় মনোভাবের আশ্রয় নিলেও অনেকাংশে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান হতে পারে।

৬. **সামরিক জান্তার মানবিক উদ্যোগ :** মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার মানবিক হয়ে স্বৈরাচারের খোলস থেকে বেরিয়ে আসলে রোহিঙ্গা সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারে।

৭. **রোহিঙ্গাদের সম্পদে পরিণত :** সামরিক জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের সমস্যা না ভেবে তাদের সম্পদ হিসেবে গণ্য করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে।

৮. **বন্দিত্বের অবসান :** মিয়ানমারের সামরিক জান্তার রোষানলে পড়ে রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট গ্রামে বন্দি অবস্থায় আছেন দীর্ঘদিন। রোহিঙ্গাদের এ বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়েও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত কিনা : মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে কোনোভাবেই আশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। কেননা ১৯৭৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকার শুরু করে 'অপারেশন নাগামিন' বা 'ড্রাগন রাজ'। এ অপারেশনে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার নামে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় রাখাইনরা। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ১৯৭৮ সালের মে মাসের মধ্যে কমপক্ষে দুই লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, যার বোঝা বাংলাদেশ বয়ে বেড়াচ্ছে। এ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা দেশের জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করছে। পরিচয় গোপন করে বাংলাদেশের পাসপোর্ট গ্রহণ করে রোহিঙ্গারা বিদেশে যাচ্ছে। তাই শুধু ভাষা, ধর্ম কিংবা নৃতাত্ত্বিক গঠনের সাদৃশ্য থাকার কারণেই মিয়ানমারের ২০ লাখ রোহিঙ্গাদের দায় বাংলাদেশ নিতে পারে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার সীমান্ত প্রহরা শিথিল না করায় সাহসী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে মিয়ানমারের বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

১. জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাবে,
২. অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাবে,
৩. মিয়ানমারের সাথে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হবে,
৪. দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে,
৫. মাদক ও চোরাচালানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে,
৬. সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে ইত্যাদি।

রোহিঙ্গা সমস্যার সাথে বাংলাদেশ কোনোভাবেই যুক্ত হতে পারে না। ইতোমধ্যে যে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে হবে এবং নিজ জন্মভূমিতে যাতে নাগরিক হিসেবে রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়, সে বিষয়ে নিতে হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক উদ্যোগ।

০৯ । জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত করার জন্য আপনি কি সংস্থাটির সনদের সংশোধন বাঞ্ছনীয় মনে করেন? সংস্কারের রূপরেখা বিষয়ে আপনার নিজের মতামতগুলো দিন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘ হলো একটি ঐতিহাসিক সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই এ ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে রদ ও রহিত করে ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৎকালীন বিশ্বনেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা করে এবং এ লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ হিসেবে জাতিপুঞ্জ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং এর ভিত্তিতে ১৯১৯ সালের ২৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) গঠিত হয়। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে জাতিপুঞ্জের প্রথম অধিবেশন বসে। এভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট : আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হলেও এ সংস্থার সাফল্য ও স্থায়িত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বরং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই এ সংস্থাটির তাবৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৩৯ সালে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশনস তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ফলে বিশ্বের মাটিতে সর্বপ্রথম জন্মলাভ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনের অকাল মৃত্যু ঘটে। অতঃপর লীগ অব নেশনসের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নব উদ্যম এবং উৎসাহে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি দেশের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল সংগঠন জাতিসংঘ (United Nations) গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। জাতিসংঘ ৬৯ বছরের ইতিহাস অতিক্রম করেছে এবং এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩-এ পৌঁছেছে। একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব জাতিসংঘের লক্ষ্য হলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায়নি। এ সময়ে বিশ্বের অনেক এলাকায় ছোট বড় অনেক যুদ্ধ হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে জীবন ও সভ্যতা। এখনো বড় দেশগুলো ছোট দেশগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করছে। জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বড় দেশগুলো ছোট দেশগুলোর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হলো :

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা : বহু হতাশা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ এখনও যুদ্ধ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নির্যাতন ও দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে বিরাজ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি ও বিরামহীন আঞ্চলিক সংঘাতের মধ্যে শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন কার্যক্রম প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘ শুধু শান্তিরক্ষা ও সংঘাত নিরসনেই কাজ করছে না, সাথে সাথে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো বিশ্বের মানুষের সেবার জন্যও নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ, মার্কিনিদের একচেটিয়া প্রভাব নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্র জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন।

সংস্কারের রূপরেখা সম্পর্কে মতামতগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো

১. **সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ :** জাতিসংঘের বর্তমান সনদে সাধারণ পরিষদের হাতে তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। সাধারণ পরিষদের সদস্যরা নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু

এ কথা বলা অনস্বীকার্য যে সাধারণ পরিষদেই জাতিসংঘের সকল সদস্য অন্তর্ভুক্ত তাই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সাধারণ পরিষদকে করা একান্ত আবশ্যক এবং জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরি।

২. **নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ :** বর্তমান ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা এবং অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে।

৩. **ভেটো ক্ষমতা রহিতকরণ :** নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা রহিত করতে হবে। কারণ এটি একটি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এর পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করতে হবে। বিশেষ করে কোনো প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের গ্রহণযোগ্যতা রাখতে হবে।

৪. **মহাসচিবের ক্ষমতা :** বর্তমান পদ্ধতিতে জাতিসংঘের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মহাসচিব কাগজে কলমে ক্ষমতাধর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। সনদের দেয়া ক্ষমতানুসারে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ। বর্তমান সনদ সংশোধন করে মহাসচিবের নিকট সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পনিষদসহ জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনকে দায়বদ্ধ রাখার বিধান করতে হবে।

৫. **স্থায়ী শান্তিরক্ষা বাহিনী :** জাতিসংঘের নিজস্ব শান্তিরক্ষা বাহিনী থাকা একান্ত আবশ্যক। জাতিসংঘকে তার সদস্য দেশগুলো থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী সদস্য সংগ্রহ করে একটি শক্তিশালী শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করতে হবে, যা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে।

৬. **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন :** জাতিসংঘ তার বাজেটের সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর চাঁদা থেকে। কিন্তু জাতিসংঘের এমন অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকা উচিত, যা নিজেকে একটি শক্ত অর্থনৈতিক ভিতের উপর দাঁড় করায় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে। এই তহবিল থেকে জাতিসংঘ তার বার্ষিক বাজেট, যাবতীয় খরচ এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ধারণ করতে পারবে।

৭. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যক্রম বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ও উন্নয়নের জন্য সদস্য দেশগুরোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮. **জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব :** জাতিসংঘের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বসবাস এশিয়াতে। এশিয়া থেকে নিরাপত্তা পরিষদে শুধু ১টি স্থায়ী সদস্য অর্থাৎ চীনকে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জনগণের বাস ইউরোপে। সেখান থেকে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়াসহ তিনটি স্থায়ী সদস্য নেয়া হয়েছে। উত্তর আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশ থেকে কোনো স্থায়ী সদস্য নিয়োগ করা হয়নি। এখানে জনসংখ্যার আনুপাতিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের বৈষম্য বিদ্যমান। তাই সকল এলাকা থেকে জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন ঘটানো উচিত। এই লক্ষ্যে জাতিসংঘের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

৯. **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে :** জাতিসংঘ কর্মচারী নিয়োগে অর্থ ও পরাশক্তির প্রভাব থাকায় জাতিসংঘের নিরপেক্ষ কার্যক্রমে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাসাম্য নিশ্চিতকরণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। আর এজন্য জাতিসংঘ সনদের সংস্কার আবশ্যক।

১০. **পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি কর্তৃক জাতিসংঘ সনদ প্রণীত হয়। পরাজিত অক্ষশক্তির সদস্য ইতালি, জাপান, জার্মানি বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং শিল্পোন্নত 'জি-৭' পরিবারের সদস্য। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জাতীয় শক্তির মুখ্য নির্ধারক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় বিশ্বব্যবস্থায় এ দেশগুলোর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দেশগুলো জাতিসংঘের উচ্চ চাঁদা প্রদানকারী দেশ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমের সক্রিয় অংশীদার অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তি বর্তমানে বিশ্বব্যবস্থার বাস্তবতা। তাই এসব দেশ থেকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে জাতিসংঘের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

১১. **নিরস্ত্রীকরণ :** নিরস্ত্রীকরণ অর্থাৎ শক্তিশালী এবং সমরাস্ত্র নির্মূল করে শক্তিসাম্য রক্ষা এবং বিশ্বকে নিরাপদ বসতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরস্ত্রীকরণের পূর্ণ ক্ষমতা জাতিসংঘকে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে সমরাস্ত্রে সজ্জিত দেশগুলোকে মারণাস্ত্র নির্মূলে আইনের মাধ্যমে বাধ্য করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কঠোর আইন প্রণয়ন করার অধিকার জাতিসংঘের থাকতে হবে। আঞ্চলিক ও সামরিক চুক্তিগুলোও বাতিল করতে হবে।

জাতিসংঘ সনদের সংস্কার : ১৯৪৫ থেকে ২০১৫ এ দীর্ঘ ৭০ বছরে বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। এ ৬৯ বছরের ইতিহাসে জাতিসংঘের যেমন বহু সাফল্য রয়েছে তেমনি ব্যর্থতাও কম নয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি আজকের জাতিসংঘ। বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে জাতিসংঘকে ব্যবহার করছে। জাতিসংঘের ৬৯ বছরের পরিণত জীবনে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলো হলো :

১. মধ্যপ্রাচ্য তথা ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় টালবাহানা এবং ইসরাইলের ঔদ্ধত্য না দেখার ভান করা।
২. বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলিম নিধনে নির্লিপ্ততা।
৩. সোমালিয়ায় বিতর্কিত ভূমিকা।
৪. নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকেই মার্কিন মিত্র বাহিনীর আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ বাধা প্রদানে ব্যর্থতা।

যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে পাঁচটি রাষ্ট্রকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে সনদের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেল এ বৃহৎ শক্তিবর্গের 'ভেটো' নামক এক বিশেষ ক্ষমতার বলে অনেক অকার্যকর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তাই ৬৯ বছর আগে গঠিত জাতিসংঘকে আধুনিক যুগোপযোগী, গতিশীল ও কার্যকরী করে এর মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটানো একান্ত জরুরি। আর তাই পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে জাতিসংঘকে সংস্কারের মাধ্যমে ঢেলে সাজানো উচিত।

১৯৯৫ সালের ২৫ জুন সান ফ্রান্সিসকোতে একটি সভায় মিলিত হয়ে জাতিসংঘের তৎকালীন ১৮৫ (বর্তমানে ১৯৩) সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের পুনর্গঠনের আবশ্যকতা জরুরি বলে মত পোষণ করেছেন।

সার্বিকভাবে জাতিসংঘের সংস্কারের লক্ষ্যে সাবেক মহাসচিব কফি আনান প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দশ দফা কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাজেটের ব্যয় হ্রাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রয়াসকে জোরদারকরণ। এছাড়াও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাসচিব নিয়োগ ইত্যাদি।

জাতিসংঘের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজন। জাতিসংঘ মার্কিন-সোভিয়েত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর ঠাণ্ডা লড়াই তুঙ্গে ওঠে। আবার দুই পরাশক্তিকে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব কারণে জাতিসংঘকে সংস্কারের মাধ্যমে এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আমি মনে করি নিম্নলিখিত কারণে জাতিসংঘ সনদের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন :

১. **স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি করা :** ১৯৪৫ সালে ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী সদস্যসহ মোট ১১টি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়। তখন জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৯৩টিতে পৌঁছেছে। যদিও ১৯৬৩ সালে সনদের ২৩ ধারার সংশোধন করে অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ১০-এ উন্নীত করা হয়। ১৯৬৫ সালে সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দাঁড়ায় ১৫। ১৯৪৫ সালে যে পাঁচটি দেশকে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দেয়া হয়, তখনকার প্রেক্ষাপটে তা বাস্তবসম্মত হলেও ২০০৯ সালের পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তা বাস্তব নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অবাস্তব ও একনায়কতান্ত্রিক মনে হয়। সে কারণে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

২. **শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা :** ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠনের সময় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চীন এই পাঁচটি দেশকে স্থায়ী সদস্য এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের মুঠোয় ছিল বিধায় উক্ত সিদ্ধান্তকে বাস্তব সম্মত বলা যেতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং গণতন্ত্রের উত্তরণ বিশ্ব ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতিসংঘ সংস্কারের মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. **ভেটো ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা :** জাতিসংঘ সনদে স্থায়ী পাঁচটি সদস্যকে শুধুমাত্র ভেটো ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। ভেটো ক্ষমতা চরম অগণতান্ত্রিক। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একমত থাকলেও যে কোনো একটি স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতার ব্যবহারে যে কোনো প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। তাই মনে করি, জাতিসংঘের সংস্কার করে স্থায়ী সদস্য বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে গণতন্ত্রের স্বার্থে ভেটো ক্ষমতার পরিবর্তনে জাতিসংঘ সংস্কার প্রয়োজন।

৪. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য :** জাতিসংঘের বাজেটের এক-চতুর্থাংশই দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া অর্থের পরিমাণ মোট খরচের এক-চতুর্থাংশ। এতে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি জাতিসংঘকে এসব আর্থিক সুবিধা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে জাতিসংঘ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। ফলে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য সংস্কার একান্ত জরুরি।

৫. **জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব :** বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৭২৬ কোটি ২১ লাখ, যা ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত। এখানে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের বৈষম্যও বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ইউরোপ মহাদেশ থেকে রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স তিনটি, উত্তর আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার অধিকারী এশিয়া মহাদেশ থেকে শুধুমাত্র চীন এবং আফ্রিকা মহাদেশে একটিও স্থায়ী সদস্য নেই। তাই নিরাপত্তা পরিষদে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে নতুন সদস্য নিয়ে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন ঘটানো উচিত। আর তাই জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজন।

৬. **মহাসচিবের ক্ষমতা :** জাতিসংঘ মহাসচিব সংস্থার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য মহাসচিব অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হন। এ জন্য সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সার্বিক কাজকর্মে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সংস্কারের ব্যাপারে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সাবেক মহাসচিব কফি আনানও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য দশ দফা কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছেন। তার এ প্রস্তাব থেকে একথা সুস্পষ্ট যে জাতিসংঘের অন্যান্য বিভাগেরও সংস্কার জরুরি। বর্তমান একুশ শতকের পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান শতকের উপযোগী করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি। সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে জাতিসংঘের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রকৃত অর্থেই প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে ব্যর্থতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে নতুন প্রজন্মকে একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় বিশ্ব উপহার দিতে হলে জাতিসংঘের কিছু মৌলিক সংস্কার জরুরি। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যুদ্ধ, মানবাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘের যে ব্যাপক সফলতা আমরা দেখতে পেয়েছি তা জাতিসংঘকে নতুন করে এগিয়ে যেতে সাহস যোগাবে। তাই অপেক্ষাকৃত কম সফলতার ক্ষেত্রগুলোতে সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আপন মহিমায়, হাসি ফোটাতে পারে আগামী প্রজন্মের প্রতিটি মানুষের মুখে।

১০। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা সে দেশগুলোর উন্নয়নের অন্তরায়'— বিষয়টি আলোচনাপূর্বক সমাধানের পথগুলো নির্দেশ করুন।

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে উপনিবেশবাদের পরিসমাপ্তির সূচনা। এর দুই দশক পর অধিকাংশ উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা অর্জন, যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ পুনর্গঠন ও স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিশেষ করে প্রয়োজনীয় তহবিল গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বৈদেশিক সাহায্য (Foreign aid) পরিচিতি পাওয়া শুরু করে। এছাড়া বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে যুদ্ধোত্তর সময়ে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি নামক প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে বৈদেশিক সাহায্য নতুন মাত্রায় গুরুত্ব পায়। কোনো দেশের বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অনন্য।

তবে উন্নয়নশীল বিশ্বে এসব দাতা সংস্থা ও দাতা দেশগুলোর ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের কথাও শোনা যায়। অনেকের মতে এসব দাতারা অনুন্নত দেশগুলোতে নব্য-উপনিবেশবাদ তৈরি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। বিভিন্ন কঠিন শর্তে বৈদেশিক সাহায্য প্রদান এবং গ্রহীতা রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন বিষয়ে দাতা দেশগুলোর হস্তক্ষেপে বৈদেশিক সাহায্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে দেশপ্রেমিকদের নিকট সংশয় জন্ম নেয়া অমূলক নয়। এ কথাও সত্য যে পৃথিবীর যে সকল দেশ বৈদেশিক সাহায্য নিয়েছে সে সকল দেশের উন্নত হওয়ার হার নগণ্য। খুব কম সংখ্যক উন্নত দেশের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য নেয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য সাহায্যনির্ভরতা সমস্যা হওয়ার কারণ : দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সাহায্যনির্ভরতা একটি বড় ধরনের সমস্যা। একটি দেশকে স্বনির্ভর ও উন্নত হওয়ার জন্য সবার আগে প্রয়োজন দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ব পালন। যদিও অনুন্নত দেশগুলোর সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, তবু এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেশি একটা ত্বরান্বিত করে না। বিদেশীদের চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন কঠিন শর্ত গ্রহীতা দেশকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে পালন করতে হয়। ফলশ্রুতিতে স্বল্প সময়ের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ভালো মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে মন্দ ফলাফল-ই বয়ে আনে। নিম্নোক্ত কারণে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা উন্নয়নশীল দেশের জন্য সমস্যার কারণ–

১. **অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দাতাদের হস্তক্ষেপ :** বৈদেশিক সাহায্য দেয়ার অজুহাতে গ্রহীতা দেশগুলোর বিভিন্ন বিষয়ে দাতাগোষ্ঠী কিংবা দাতা দেশগুলো হস্তক্ষেপের সুযোগ খুঁজে। তারা গ্রহীতা দেশের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। এতে একটি দেশের স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দাতা দেশগুলো সময়ে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রহীতা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপের দ্বারা মূলত ঐ সকল দেশের উপর দাতা দেশগুলোর প্রভাব বিস্তার করা হয়।

২. **চড়া সুদ ও কঠিন শর্তারোপ :** বৈদেশিক সাহায্যের বিরাট অংশটি এখন ঋণ আকারে ছাড় হয়। পূর্বে অনুদান ও পণ্য সাহায্যের আধিক্য থাকলেও বর্তমানে এসবের পরিমাণ কমে গিয়ে ঋণের আধিক্য বেড়ে গিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে ঋণকে কম সুদে প্রদত্ত সাহায্য বলা হলেও বিভিন্ন পরোক্ষ বিষয় হিসাব করে দেখা গিয়েছে বাণিজ্যিক সুদ আকারেই দাতা দেশগুলোকে গ্রহীতা দেশ সুদ-আসল পরিশোধ করছে। এছাড়া একটি প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হলেও দাতা সংস্থাগুলো অন্যান্য প্রকল্পেও হস্তক্ষেপ করে এবং ঋণ ছাড়ে নানা জটিল শর্ত আরোপ করে। এর ফলে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রাপ্ত সাহায্যের কেবল ২৫ শতাংশ অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন কাজে ব্যয় হয়। অথচ পরিশোধ করতে হয় পুরো শতভাগ এবং সেই সাথে চক্রবৃদ্ধিসহ সুদ। তাই বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সমস্যার কারণ।

৩. **আধিপত্যবাদ বিস্তার :** পূর্বে উপনিবেশবাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো অর্থ ও সম্পদ হাতিয়ে নিত। কিন্তু বর্তমানে উপনিবেশবাদের শাসন রহিত হলে এবং অধীন উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন করলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো ভিন্ন উপায়ে এসব রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানকে তারা নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক সাহায্য বড় রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ ছাড়া উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সরবরাহ হচ্ছে না।

বিশেষ করে পূর্বের উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো বৈদেশিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিরাজ রাখার চেষ্টা করছে। ফলে সাহায্য বা ঋণ প্রদানে দাতা দেশগুলোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৪. **দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি :** দেশের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য আনা হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দুর্নীতিবাজদের জন্য এটি একটি উর্বর ক্ষেত্র। উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে দুর্নীতিবাজরা বৈদেশিক সাহায্যের বিরাট একটি অংশ নিজেদের পকেটে ভরে নেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর পর্যন্ত দেশে মোট বৈদেশিক সাহায্য এসেছে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। যার মধ্যে বিভিন্ন কায়দায় দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদরা ১২,৬০০ কোটি টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে। যা দেশের উন্নয়ন কাজকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে।

৫. **শর্ত আরোপের মাধ্যমে দেশীয় নীতির অবজ্ঞা :** ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দাতা দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো শর্তের বেড়াজালে গ্রহীতা দেশগুলোর উন্নয়নকে আটকে দেয়। দেখা গিয়েছে আইএমএফ এর ঋণ সুবিধার বিপরীতে ১৬টি শর্ত, এডিবির ঋণের বিপরীতে ১৫টি শর্ত গ্রহীতা দেশগুলোকে মেনে চলতে হয়। এসব শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো ভ্যাট সম্প্রসারণ করে রাজস্ব বাড়ানো, ভর্তুকি কমানো, বিদ্যুৎ জ্বালানীর দাম বাড়ানো, সরকারি খাতের ব্যয় সংকোচন প্রভৃতি। যা একটি দেশের অর্থনৈতিক মৌলিক ও নাগরিক অধিকার নীতির সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

৬. **বৈদেশিক সাহায্যের আড়ালে পণ্য বিক্রি :** বিভিন্ন সমীক্ষার বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় বৈদেশিক সাহায্যের আড়ালে দাতা দেশগুলো নিজ দেশের পণ্য গ্রহীতা দেশে বিক্রি করে। বৈদেশিক ঋণদাতাদের সময় বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। অথচ এগুলোর জন্য উঁচু হারের ফি বা দাম পরিশোধ করতে হয়। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী সাহায্যপ্রাপ্ত ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ২৩ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে দাতাদের অনুরাগী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশী যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে। অন্যদিকে দাতাদের পছন্দের পরামর্শকদের দিতে হয়েছে ২১ হাজার ৬শ কোটি টাকা। প্রাপ্ত সাহায্যের ২৫ শতাংশই নিয়ে গেছে দাতাদের পছন্দের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যার ফলে প্রাপ্ত সাহায্যের কম অংশই উন্নয়ন কাজে ব্যয় হয়েছে।

৭. **দেশের সম্পদ পাচার :** অনুন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থা যেমন– বহুজাতিক কোম্পানি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউএস এইড, বহুজাতিক ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে এসব দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে শর্তাধীনে ঋণ দেয়, ব্যাংকিং পদ্ধতি ও ঋণদান পরিশোধ প্রক্রিয়া, শিক্ষা গবেষণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতপক্ষে এসবের মাধ্যমে নব্য উপনিবেশ তৈরি করে এবং শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুন্নত দেশের সম্পদ পাচার করে নেয়।

৮. **অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি :** যেহেতু বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ-ই বিভিন্ন অসাধু ও দুর্নীতিবাজদের পকেটে চলে যায়। তাই অসাধুদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। এছাড়া যাদের জন্য সাহায্য আনা হলো বা যে কাজের জন্য সাহায্য আনা হলো, সে উদ্দেশ্যে ব্যয় না হলে সাধারণ মনে একটি ক্ষোভ তৈরি হয়। যা থেকে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন অধ্যাপক বিশ্বের ১২৫টি উন্নয়নশীল দেশের উপর ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ১০% খাদ্য সহায়তা বৃদ্ধির দ্বারা ঐ সকল দেশে সংঘর্ষের মাত্রা ৪% বেড়ে গিয়েছে। যা একটা দেশের স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম বাধা।

এছাড়া সাহায্য গ্রহণের দ্বারা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক নষ্ট, অভ্যন্তরীণ সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, দীর্ঘমেয়াদে ঋণের বোঝা টানা প্রভৃতি অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাসকল্পে করণীয় : আক্ষরিক অর্থে বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ভালো মনে হলেও পরোক্ষভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বৈদেশিক সাহায্যের বেশ কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। এখানে অনুন্নত দেশগুলোর জন্য বৈদেশিক সাহায্য যতটা না কাজে লাগে তার চেয়ে বেশি দাতাগোষ্ঠীগুলো নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। এছাড়া উন্নয়নের কথা বলে আনা হলেও প্রকৃত উন্নয়ন কমই হয়। তথাপি দীর্ঘকাল যাবত ঋণের বোঝা বহন করতে করতেই উন্নয়নশীল দেশগুলো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রকৃত উন্নয়নের জন্য সাহায্যনির্ভর চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল দেশগুলো যে উপায়ে সাহায্য নির্ভর চক্র থেকে বেরিয়ে আসবে সেগুলোর আলোচনা নিম্নরূপ।

১. **অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর গুরুত্ব :** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে প্রচুর পরিমাণের জনশক্তি। দক্ষ উপায়ে ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এ সকল জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। এছাড়া দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানি আয় অর্জন করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটানো যায়।

২. **দুর্নীতি নির্মূল :** বৈদেশিক সাহায্য নিলেও দুর্নীতি হয় এবং না নিলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতি হয়। বৈদেশিক সাহায্য নিলে দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতিতে দৌরাত্ম্য আরো বেড়ে যায়। ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। কাজেই দুর্নীতিকে তৃণমূল থেকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত চরমভাবে নিরুৎসাহিত করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা যায়। এতে করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের উন্নতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি নির্মূলের দ্বারা সেসব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৩. **কৃষিকে গুরুত্ব দেয়া :** উন্নয়নশীল দেশগুলো সাধারণত কৃষি নির্ভর। এসব দেশের কৃষিতে জনশক্তির সিংহভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের এ সচেতনতার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করা যায়। দাতা দেশগুলো প্রতি বছর উন্নয়নশীল বিশ্বে ১০০ বিলিয়নের মত ঋণ প্রবাহ করলেও তারা নিজ দেশে ৪০০ বিলিয়নের বেশি কৃষি খাতে ব্যয় করে। যেহেতু উন্নয়নশীল দেশগুলো কৃষিবান্ধব; তাই কৃষির মাধ্যমে এসব দেশ দাতা দেশগুলোর বাজার দখল করতে পারে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিকল্প পদ্ধতি :** উন্নয়নশীল বিশ্বকে ঋণের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিকল্প উপায়ের উপর বেশি জোর দিতে হবে। বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রার প্রাচুর্যতাকেই বুঝায় তাই এসবের মজুদ দ্বারাই বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈদেশিক মুদ্রার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে পারে।

৫. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম একটি বড় বাধা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে নষ্ট করে, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ও সমাজে বিভাজন তৈরি করে। এতে বিদেশীরা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে শুধু ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে পরের তিন মাসে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্ষতি হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। যা প্রকৃত উন্নয়ন বাজেটের প্রায় অর্ধেক এবং কয়েক বছরের বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের সমান।

এছাড়া শতাধিক লোকের প্রাণহানি ও সহস্রাধিক লোকের পঙ্গুত্ব জীবনে সামাজিক ও নাগরিক অধিকারকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র থেকে এ রাজনৈতিক অসুস্থতা নির্মূল করা প্রয়োজন।

৬. **কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদারকরণ :** গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে কারিগরি শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের উন্নয়ন আমাদেরকে কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষ জনসম্পদ গঠনের দিকেই নির্দেশ দান করে।

৭. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** উন্নয়নশীল বিশ্বের আরেকটি সমস্যা হলো জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। অধিক জনসংখ্যার খাদ্য ও বাসস্থান নিশ্চিত করতে সে সকল দেশের সরকারদের হিমশিম খেতে হয়। বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা নিশ্চিত করা সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জের কারণ। ফলশ্রুতিতে বাধ্য হয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিদেশী প্রভুদের দ্বারস্থ হয়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার স্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অর্জন সম্ভবপর নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো চীনকে এ ক্ষেত্রে আদর্শ মডেল হিসেবে অনুসরণ করতে পারে।

উপরিউক্ত বিষয়াবলি পর্যালোচনা করে বলা যায় বৈদেশিক সাহায্য অনুদান হোক কিংবা ঋণ হোক তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এবং তাদের প্রভাবিত দাতা সংস্থাগুলো এক ধরনের নতুন উপনিবেশবাদ নীতি চাপিয়ে দেয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে গ্রহীতা দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে তাকালে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সেখানে পশ্চিমা দেশগুলো প্রচুর বৈদেশিক ঋণ সরবরাহ করেছে কিন্তু ফলাফল হলো দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য। আর অন্যদিকে চীন বৈদেশিক ঋণ না নিয়ে কত সুন্দর স্বনির্ভরতা অর্জন করছে।

সুতরাং পশ্চিমাদের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ প্রাথমিক পর্যায়ে আকর্ষণীয় হলেও শেষদিকে উন্নয়নশীল দেশের জন্য ভালো বার্তা বয়ে আনে না। কাজেই এসব দেশের উচিত বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ নির্ভরতা বাদ দিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য এবং অন্যান্য দেশের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। এমন অবস্থায় বৈদেশিক সাহায্য সাধারণত অনুদান এবং শর্তযুক্ত হয়ে থাকে।

১১ । জিএসপি কি? যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার এ দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে কিরূপ প্রভাব ফেলবে? জিএসপি সুবিধা বহাল রাখতে হলে বাংলাদেশকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে?

উত্তর : *'আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে জিএসপি সুবিধা পায়, সেটা স্থগিত করাই উপযুক্ত পদক্ষেপ। কেননা, তারা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।'— মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।*

রানা প্লাজা ধসের পর একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ জরিপ দেখিয়েছে, প্রায় ৭০ শতাংশ মার্কিন রানা প্লাজা ধসের কথা শুনেছেন এবং প্রায় ৪০ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ভবিষ্যতে কিনতে আর আগ্রহী নাও হতে পারেন। তৈরি পোশাক কারখানায় কাজের পরিবেশ ও শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায়

গাফিলতি থাকায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্যের অবাধ বাজার সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করেছে ওবামা প্রশাসন। গত ২৭ জুন ২০১৩ মধ্যরাতের এ সংক্রান্ত ঘোষণা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে, এ থেকে উত্তরণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে বাংলাদেশকে।

জিএসপি কি : জিএসপি বুঝতে হলে প্রথমে বোঝা দরকার এমএফএন (মোস্ট ফেবারড নেশন) এর ধারণা। কারণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) এই ধারণাটি থেকে জিএসপির সৃষ্টি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একটি সাধারণ নিয়ম আছে, সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর প্রতিটি তাদের বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে সমভাবে বিবেচনা করবে, অর্থাৎ কোনো দেশ অন্য একটিকে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো বাণিজ্য বা শুল্ক সুবিধা দিতে পারবে না, যদি সেই সুবিধা সবার জন্য প্রযোজ্য না হয়।

ডব্লিউটিও-র এ নীতিমালার অধীনেই এমএফএন বা সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের ধারণা। তবে বিশেষ বিবেচনায় কোনো দেশের জন্য এই ধারাটিকে শিথিল করার কিংবা এটি থেকে ছাড় দেয়ার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিকেই বলা হয় জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স বা জিএসপি। এই নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো কিছু নির্দিষ্ট উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো বিশেষ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিদানহীনভাবে শুল্কমুক্ত বা শুল্কহ্রাস সুবিধা দিয়ে থাকে।

মূলত সত্তরের দশকের দিক থেকে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো পশ্চাৎপদ দেশগুলোর রপ্তানি বাড়ানোর জন্য এই সুবিধা দিয়ে আসছে, যাতে রপ্তানিকারক দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে। তবে একটা কথা বুঝতে হবে যে শুল্কযুক্ত সুবিধা দিয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে যে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষমতা প্রদান করা হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পণ্যটির উৎপাদন ব্যয় হয়তো আমদানিকারক উন্নত দেশে বেশি পড়বে, ফলে তাদের নিজস্ব ভোক্তাদের সেটি বেশি দামে কিনতে হবে।

জিএসপি-এর বর্তমান পরিস্থিতি : যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৪ সাল থেকে জিএসপি সুবিধা বহাল করেছে বিভিন্ন দেশ ও পণ্যের ক্ষেত্রে। এটি বছর বছর পর্যালোচনা করে নবায়ন করা হয়, সে সময় বিভিন্ন কারণ ও যুক্তিতে এই সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য ও দেশের তালিকায় রদবদল করা হয়। যেমন– ২০১২ সালে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার কারণে জিব্রালটা, তুরস্কসহ আরো দুটি দেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে নতুন করে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে সেনেগাল ও দক্ষিণ সুদানকে। আবার আর্জেন্টিনার সুবিধা বাতিল করা হয়েছে, কারণ দেশটি মার্কিন নাগরিকদের পক্ষে দেয়া সালিসি রায় বাস্তবায়নে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়নি। ২০১১ সালে পেশকৃত কিছু তদন্ত ২০১২ সালে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যেমন– শ্রীলংকার ক্ষেত্রে সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে, শ্রম অধিকার সংক্রান্ত দুটি আবেদন গৃহীত হয়েছে ইরাক ও ফিজির ক্ষেত্রে। একই বিষয়ের উপর তদন্ত অব্যাহত ছিল বাংলাদেশ, নাইজার, ফিলিপাইন, উজবেকিস্তান ও জর্জিয়ার ক্ষেত্রে। এই তদন্তের ওপর ভিত্তি করেই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যেসব পূর্বশর্তের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা দিয়ে থাকে, সেসব পর্যালোচনা করে দেখলে বোঝা যায় সুবিধাটি কেবল অর্থনৈতিক সহায়তা প্রকল্প নয় সে দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলনও বটে। সে কারণে রাশিয়া বা ভেনিজুয়েলার মতো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে জিএসপি সুবিধা পায়। তবে এই সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি দেশটির নিজ স্বার্থ যাতে লঙ্ঘিত না হয় সে বিষয়েও রাখা হয়েছে সুস্পষ্ট নীতির সংস্থান। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা, কিংবা এই সুবিধাটি দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে দেয়া হচ্ছে কিনা–এসব বিষয় নিশ্চিত করেই জিএসপি সুবিধার

বিষয়গুলো নির্ধারণ করা হয়। এমনকি সুবিধাপ্রাপ্ত দেশে মার্কিন পণ্যের যৌক্তিক এবং ন্যায্য প্রবেশাধিকার আছে কিনা, মার্কিন নাগরিকদের সম্পদ বা ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে সুরক্ষা কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ রক্ষা অধিকার আইন বলবৎ আছে কি না–এসবও বিবেচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে যেসব দেশকে জিএসপি সুবিধা দেয়া নিষিদ্ধ সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. অন্যান্য শিল্পায়িত দেশ,
২. কমিউনিস্ট বা আন্তর্জাতিক কমিউনিজম কর্তৃক পরিচালিত দেশ; যদি না তারা ডব্লিউটিও এবং আইএমএফ-এর সদস্য হয়,
৩. অন্যদেশের পণ্য আমদানি বন্ধ করার জন্য যে দেশ গোপনে কোনো বিশেষ দেশের সঙ্গে চুক্তি করে,
৪. যে দেশ মার্কিন নাগরিকদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে,
৫. যে দেশ কোনো আন্তর্জাতিক জঙ্গি ব্যক্তি বা সংগঠনকে প্রশ্রয় বা মদদ দান করে কিংবা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না।

এছাড়া বাধ্যতামূলক পূর্বশর্ত হচ্ছে যে সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য দেশটিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকার (যথা ট্রেড ইউনিয়ন, নিম্নতম আয়সহ উপযুক্ত কর্মপরিবেশ, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা, স্বাস্থ্যসেবা) প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া এবং নিকৃষ্টতম শিশুশ্রম বন্ধের জন্য তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা। এসব পূর্বশর্ত পরিপালনক্ষম যেসব দেশের মাথাপিছু আয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের কম, সেসব দেশকেই জিএসপি সুবিধা দেয়া হয়। এসব শর্ত ঠিক থাকলে দেখা হয় নির্দিষ্ট পণ্যটির অন্যূন ৩৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন রপ্তানিকারক দেশটিতে হয় কি না এবং পণ্যটির শুল্কমুক্ত প্রবেশ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনকারী এবং শ্রমিকদের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছে কি না। জিএসপি ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন নামে যুক্তরাষ্ট্রের আরো কিছু বাণিজ্যসুবিধা ব্যবস্থা রয়েছে আফ্রিকা, আন্দিজ অঞ্চল (বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু) এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু দেশের জন্য। কেবল জিএসপির অধীনেই যুক্তরাষ্ট্র ১৭০টি দেশ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়ে থাকে। তবে পণ্যের তালিকা বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জিএসপি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। কারণ, এখানে অস্ত্র ছাড়া সব পণ্যই অন্তর্ভুক্ত। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্বল্পোন্নত দেশে সহজে উৎপাদনযোগ্য পণ্যের চেয়ে দেশটি তাদের অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজারের কথা বেশি বিবেচনা করে। তাই পোশাক, কাচ, ইস্পাত ইত্যাদি পণ্যকে তাদের জিএসপি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি। সে কারণেই বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধাবঞ্চিত।

রপ্তানি বাণিজ্যে জিএসপি স্থগিতাদেশের প্রভাব : যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারের পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে এর ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ধস নামবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে তৈরি পোশাকশিল্প। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির সিংহভাগ অংশই তৈরি পোশাক এবং এটি জিএসপি সুবিধাবহির্ভূত একটা পণ্য। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ছিল ২৪২৯ কোটি ডলার, যার মধ্যে তৈরি পোশাক থেকে আসে ১৯০৯ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭৯ শতাংশ। একই বছর মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ১১৩৭ কোটি ডলার এসেছে ইইউভুক্ত দেশ থেকে, আর ২৪ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫৩ কোটি ডলার মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আগেই বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ থেকে পাঁচ হাজারের বেশি পণ্য আমদানি করে জিএসপির আওতায়, অথচ এই সুবিধায় বাংলাদেশ পায় মাত্র তিন কোটি ৫০ লাখ

ডলারের শুল্কমুক্ত রপ্তানি। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যেসব পণ্যের ওপর জিএসপি সুবিধা পায় সেগুলোর মধ্যে আছে তামাক, প্লাস্টিকসামগ্রী, চীনামাটির তৈজস ও ক্রীড়া সরঞ্জাম। এখানে একটা তথ্য উল্লেখ করা উচিত যে ২০১০ ও ২০১২ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্ত রপ্তানিকারক দেশের প্রথম ২০টি দেশের মধ্যেও বাংলাদেশ নেই, অথচ সেখানে ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং এমনকি পাকিস্তানও আছে।

অতএব যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের মারাত্মক কোনো ক্ষতি হবে না। তবে ইইউ যদি যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে, তাহলে সত্যিকার বিপর্যয় নেমে আসতে পারে আমাদের ওপর। তার জন্য এখন থেকেই নিদানমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে দেশের কর্মপরিবেশ এবং শ্রম অধিকারসংক্রান্ত অভিযোগ এবং ঘাটতিগুলো দূর করা যায়। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে সে দেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন জোট এএফএল-সিআইও বাংলাদেশের শ্রম অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যর্থতা সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেছিল ২০০৭ সালে। বিষয়টিকে আমরা তখন থেকেই যদি আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আজ জিএসপি বাতিলের কোনো অজুহাত পেত না। আমরা জানি এই সুবিধাটি বাতিলের ফলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি বেশি না হলেও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। এমন আশা করাও উচিত হবে না যে ইইউ যে কোনো সময় যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরবে না।

সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে বাংলাদেশকে শাস্তি দেয়ার জন্য। রানা প্লাজায় সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং নৈতিক যৌক্তিকতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা পোশাক খাতের জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রতিবেদনের শেষে বলা হয়েছে, জিএসপিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে পোশাকের ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করে ওয়াশিংটন উন্নয়নশীল বিশ্বের শ্রমিকদের আরো সাহায্য করতে পারত। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যদি আরো সহজে পোশাক রপ্তানি করতে পারে, তারা দ্রুত শিল্পায়নে অগ্রগতি লাভ করতে পারবে। সরকারের ব্যর্থতার জন্য দেশের প্রগতিকে শ্লথ করে দিলে শাস্তিটা দেশকেই দেয়া হয় এবং পুরস্কৃত করা হয় এএফএল-সিআইওর পশ্চাৎপদ দর্শনকে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের কাছে শুনানির সময় এই সংগঠনটিই বাংলাদেশের শ্রমব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের আগের অসন্তোষে অবিচল ছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় বাজার ধরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরো বড় রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ঢোকার জন্য অবশ্যকরণীয় কাজগুলো সমাধা করতে হবে যথাশিগগির সম্ভব। মনে রাখতে হবে, দারিদ্র্য হ্রাস, পোশাকশিল্পে শিশুশ্রম বন্ধ এবং কারখানার মানোন্নয়ন এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক। বাকি কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করা গেলে এবং অন্য কোনো পররাষ্ট্র-রাজনৈতিক বাধা না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের হৃত সুবিধা পুনর্বহাল করা সহজতর হবে।

জিএসপি পুনর্বহালে বাংলাদেশের করণীয় : তৈরি পোশাকশিল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের উদ্বেগ দূর করা এখন তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে। বিষয়গুলো হচ্ছে–

১. **শ্রম আইন সংশোধন করে এর কার্যকর প্রয়োগ :** জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে শ্রম আইন এমনভাবে সংশোধন করতে হবে, যাতে করে সেটি শ্রমবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। এরপর এ আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রম আইন সংশোধন করার দায়িত্ব সরকারের হলেও দেশের সুশীল সমাজ ও শিল্পপতিদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাবের দরকার রয়েছে।

২. **পোশাক কারখানার কর্মপরিবেশের মানের দৃশ্যমান উন্নতি :** ২০১৩ সালের ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট কমিটি অন রিলেশনসে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের উপর একটি শুনানি হয়। এই শুনানিতেই জিএসপির বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। শুনানিতে বলা হয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড বানিয়ে শ্রমিকদের মাস গেলে জোটে ৩৮ ডলার। ১৫ কোটি মানুষের দেশটি ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্নও দেখে। পোশাকশিল্পে ৪০ লাখ শ্রমিকের ৮০ শতাংশই নারী। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানার কাজের পরিবেশের দুরবস্থা বলতে গিয়ে তারা ১০০ বছর আগের যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক কারখানার দুর্দশাকেও তুলনা করেছে। তারা বলেছে আক্ষরিক অর্থেই তাদের চাকরি তাদেরকে হত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ILO'র ২০১৪ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ইউএস ডলারে নিম্নরূপ :

দেশ	*ন্যূনতম মাসিক মজুরি*
বাংলাদেশ	৬৮
চীন	১৬৬
ভারত	৭০
ইন্দোনেশিয়া	৭৪
ফিলিপাইন	১৫২
থাইল্যান্ড	২৩৭
ভিয়েতনাম	৯০

ওয়ার্কার্স রাইটস কনসোর্টিয়ামের গবেষণায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের একজন পোশাক শ্রমিক জীবনধারণের উপযোগী মজুরির মাত্র ১৪ শতাংশ পান। এসব বিষয় সংশোধন করা জরুরি।

৩. **ট্রেড ইউনিয়ন চালু :** ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন ও যৌথ দরকষাকষির প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শ্রমিকরা যেন চাকরি না হারান বা নিপীড়নের শিকার না হন সেটির নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইপিজেড ও ইপিজেডের বাইরের কারখানার শ্রমিকদের মাঝে কোনো বৈষম্য না থাকা অর্থাৎ ইপিজেডের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যেসব শ্রমিকনেতাকে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, খুন করা হয়েছে, তাদের বিষয়গুলো যথাযথভাবে সুরাহা করতে হবে এবং যেসব শ্রমিক অধিকার সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে সেগুলোর পুনঃনিবন্ধনের অনুমতি দিতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাকশন প্লান : ইউরোপের ৭০টি আন্তর্জাতিক খুচরা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড জুলাই ২০১৩-তে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক সরবরাহকারী শিল্প কারখানাগুলোকে আগামী নয় মাসের মধ্যে পরিদর্শনে সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে তিনটি বিষয়ে অগ্রগতির সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল ইইউ। এর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে কারখানা পরিদর্শকের সংখ্যা ২০০ তে উন্নীত করা এবং আগামী জুনের মধ্যে সব কারখানার কাঠামো ও নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শন শেষ করার কথা বলা হয়েছিল। জাতীয় সংসদের জুলাই ২০১৩ অধিবেশনেই শ্রম আইন সংশোধন করার কথা বলা হয়েছিল। এ আইন

সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার পূর্ণ অধিকার ও দর-কষাকষির ক্ষমতা দিতে হবে। ইইউ বলেছে, তারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অগ্রগতি হচ্ছে কি-না তা খতিয়ে দেখবে এবং অগ্রগতি না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে তাঁরা।

২০০৭ সালে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন (এএফএল-সিআইও) জিএসপি বাতিলের আবেদন জানালেও ছয় বছর পর মার্কিন প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। ২৭ জুন ২০১৩ মধ্যরাতে স্থগিত হওয়া জিএসপি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়েছে। কাজেই শ্রমমানের উন্নতির দৃশ্যমান পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিস্থিতির উন্নতি না হলে জিএসপি ফিরে পেতে বাংলাদেশের আবেদন করার সুযোগ নেই। বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শিগগির বাংলাদেশের এ সুবিধা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এক কর্মকর্তার মতে, মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের (ইউএসটিআর) নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, শ্রমমান নিয়ে তাদের উদ্বেগ দূরের পর বাংলাদেশ জিএসপি ফিরে পেতে পারে। এ এর মধ্যে 'পরিস্থিতির সন্তোষজনক অগ্রগতি' হলে তা বাংলাদেশের জন্য সুখবর বয়ে আনবে। তা না হলে জিএসপি ফিরে পেতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে অপেক্ষায় থাকতে হবে। তবে মার্কিন প্রশাসন, রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র দাবি করছে, অনেক সময় পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে নির্ধারিত সময়ের আগেই শুনানির নজির রয়েছে। বিশেষ করে, যে বিষয়গুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ রয়েছে, তা দূর হলেই যুক্তরাষ্ট্রেরই কোনো মহল বাংলাদেশের বিষয়টিকে সদয় বিবেচনা করতে পারে।

১২। ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে কি কি বাধা রয়েছে? এগুলো দূরীকরণে আপনার সুপারিশ কি?

উত্তর : মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা বিশ্ব রাজনীতির এক অন্যতম সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। তবে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কেন্দ্রবিন্দু হলো ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবি এবং ইসরাইলের নাকচ। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এখানে বিভিন্ন জঙ্গিগ্রুপ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার। ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেসব জঙ্গিগ্রুপ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো হামাস। ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার বার এ হামাসকে দায়ী করে আসছে। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে অস্ত্রবিরতির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বহু আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়া হলেও তাতে কোনো সফলতা আসেনি। এর পিছনে হামাসের হাত আছে বলে মনে করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ইসরাইলি সৈন্যদের হাতে নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নিহত হলে মার্কিন প্রশাসন চুপ করে থাকে কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনরত জঙ্গি হামাস নেতারা তাদের জনগণের হত্যার প্রতিশোধ নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে হামাসের কারণেই নাকি বার বার শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

সমস্যার বর্তমান অবস্থা : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হলে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার ফাতাহ্ গ্রুপ ওই দিন থেকেই পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় 'ইন্তিফাদা' শুরু করে, যা ক্রমশ পূর্ব জেরুজালেমসহ সকল ফিলিস্তিনি-অধ্যুষিত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ পূর্ব জেরুজালেমে টেম্পল মাউন্ট সফরে গেলে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে, যা ২৯ সেপ্টেম্বর সংঘর্ষে রূপ নেয়। ইসরায়েলি সৈন্যরা বিক্ষুব্ধ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে। এমনকি ট্যাংক, রকেট, মিসাইল, হেলিকপ্টার, গানশিপ ইত্যাদিও ব্যবহার করে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার এ

সংঘর্ষ বন্ধে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ক্লিনটন একটি উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। পরে ২৩ ডিসেম্বর ২০০০ ক্লিনটন ওয়াশিংটন ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের নিকট ফিলিস্তিন-ইসরায়েল চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এতে ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি অস্বীকার ও জেরুজালেম ও মসজিদুল আক্সার ওপর ফিলিস্তিনের আংশিক সার্বভৌম বিষয়টি না থাকায় অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি।

২০০১ সালের শুরুতে ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। জানুয়ারিতে বুশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং ফেব্রুয়ারির অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বুলডোজার খ্যাত এরিয়েল শ্যারন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে। ফলে পাল্টে যেতে থাকে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রচেষ্টার সকল সম্ভাবনা। শ্যারন সামান্য অজুহাতে ফিলিস্তিনিদের ওপর একের পর এক হামলা চালাতে থাকে। শুরু হয় নতুন আগ্রাসন। ১০ এপ্রিলে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা উপত্যকার কিছু অংশ দখল করে নেয়। সেদিন গাজা এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইসরায়েল রকেট আক্রমণ শুরু করে। ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য রকেট বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকে। ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দ ইসরায়েলের এ হামলাকে যুদ্ধকর্ম বলে অভিহিত করেন এবং বিশ্ববাসীর নিকট তা তুলে ধরেন। ১৬ এপ্রিল ইসরায়েল পূর্ব লেবাননে সিরিয়ার একটি রাডার স্টেশনে হামলা চালায় এবং হিযবুল্লাহ গেরিলাদের সংযত করা না হলে আরো হামলা চালানোর হুমকি দেয়। ১০ এপ্রিলের হামলার পর ফিলিস্তিনের একজন উর্ধ্বতন আলোচক সাঈদ এরাফাত গাজা ও পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর আহ্বান জানায়। মার্চ ২০০১ জাতিসংঘ এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব আনলেও মার্কিন ভেটোর কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। ২০০১ সালের পুরোটাব্যাপী ইসরায়েলের আগ্রাসন চলতে থাকে। এর মধ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ আমেরিকার টুইন টাওয়ার সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস হলে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেনকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে তালেবানদের হটিয়ে দিলে প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল নতুন উদ্যমে হামলা চালাতে শুরু করে। ১৭ অক্টোবর অচেনা বন্দুকধারীদের গুলিতে ইসরায়েলের পর্যটনমন্ত্রী জিভি নিহত হলে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ইসরায়েল রামাল্লাহ, জেনিন, বেথেলহাম, বায়েতজালা, কালকিয়া ও তুলকারমে ট্যাংক দিয়ে হামলা চালায়। এতে বহু ফিলিস্তিনি হতাহত হয়।

ইসরায়েলি ট্যাংক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে হামাস ইসরায়েলে একাধিক সুইসাইড বোম ফাটায়। ফলে ৩ ডিসেম্বর ২০০১ থেকে ইসরায়েল এফ-১৬ জঙ্গি বিমান থেকে প্যালেস্টাইনি এলাকায় বোমা বর্ষণ করে। ইসরায়েল প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয় এবং প্যালেস্টাইনের বড় একটা অংশ পুনঃদখল করে নেয়। মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষ বন্ধের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আরো একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে যুক্তরাষ্ট্র আবারো তাতে ভেটো দেয়। জানুয়ারি ২০০২-এ ইসরায়েল দীর্ঘকালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চালায়। ১৮ জানুয়ারি ২০০২ ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী ডিনামাইটের সাহায্যে প্যালেস্টাইনি রেডিও স্টেশন ধ্বংস করে দেয়। তারা রামাল্লায় প্রেসিডেন্টের ভবন ট্যাংক দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং আরাফাতকে গৃহবন্দী করে রাখে। ২১ জানুয়ারি তারা তুলকারম-এ ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে বহু ফিলিস্তিনি আবাসস্থল গুঁড়িয়ে দেয়। তারপরেও যুক্তরাষ্ট্র আরাফাতকে দায়ী করে এ সংঘর্ষের জন্য এবং শ্যারনকে ছাড় দেয়। অবশেষে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ ইসরায়েল প্রেসিডেন্ট ভবনের চারদিক থেকে ট্যাংক সরিয়ে নেয়। তবে আরাফাতকে কেবল রামাল্লায় চলাচলের অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ১১ নভেম্বর ২০০৪ প্যালেস্টাইনের এই অবিসংবাদিত নেতা মৃত্যুকোলে ঢলে পড়েন।

এরপর ২০০৭ সালের জুন মাসে ইসরায়েল গাজার ওপর অবরোধ আরোপ করে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসরায়েল গাজার ওপর বর্বরোচিত হামলা করে হাজার হাজার নারী ও শিশুসহ সাধারণ জনগণ হত্যা করে। মানবিক সাহায্য নিয়ে গাজা অভিমুখী নৌবহর ফ্রিডম ফ্লোটিলাই ২০১০ সালের ৩১ মে ইসরায়েল হামলা করে কমপক্ষে ২০ জনকে হত্যা ও ৩৬ জনকে আহত করে।

সর্বশেষ তিন ইহুদি কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার প্রতিশোধ নিতে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ৮ জুলাই ২০১৪ ইসরাইল Operation Protective Edge নামের সাংকেতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে গাজায় নির্বিচার বিমান হামলা শুরু করে। এ হামলায় বর্বর ইসরাইলিরা কোনো কিছুই অক্ষত রাখেনি, হত্যা করে নিরীহ নারী ও শিশুদের। বিশ্ববিবেকের সকল আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করে তারা চালিয়ে যেতে থাকে এ হামলা। এরপর ১৭ জুলাই ২০১৪ গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযান শুরু করে ইসরাইলি বাহিনী। সীমান্ত পেরিয়ে গাজায় প্রবেশ করে ইসরাইলের ট্যাংক, আর্টিলারি, পদাতিক সেনাসহ বিশাল এক দল।

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সমস্যা সমাধানের বাধাসমূহ

১. **জেরুজালেমের কর্তৃত্ব :** ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জেরুজালেম সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করেই মূলত আরব ইসরাইল দীর্ঘ ঐতিহাসিক সংকটের প্রেক্ষিত সৃষ্টি। ফিলিস্তিন বরাবরই দাবি করে আসছে যে পূর্ব জেরুজালেম হবে নতুন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী। কিন্তু ইসরায়েল এই দাবি কখনো মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ক্যাম্প ডেভিড শান্তি আলোচনায় ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমে যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। আসলে জেরুজালেম প্রশ্নটি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয়ের জন্যই খুবই স্পর্শকাতর। নগরীর মধ্যভাগে অবস্থিত টেম্পল অব দ্য মাউন্ট ইহুদিদের নিকট অতি পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত হয়ে আসছে শত-সহস্র বছর ধরে। ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে থাকেন, এই টেম্পলে একদিন মুসা নবীর পুনরাবির্ভাব ঘটবে এবং সেদিন তাদের মুক্তি আসবে। পক্ষান্তরে এই টেম্পল অব দ্য মাউন্টই মুসলমানদের নিকট পবিত্র হারেম-উস-শরীফ নামে পরিচিত। এখানেই অবস্থিত মসজিদুল আকসা। আর এই মসজিদ থেকে হজরত মোহাম্মদ (স) বোরাকে সওয়ার হয়েছিলেন এবং আল্লাহর দিদার লাভের জন্য মেরাজ শরীফ গমন করেন। খ্রিস্টানদের নিকটও টেম্পল মাউন্ট পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত। তারা বিশ্বাস করে থাকেন যে যিশুখ্রিস্টকে এখানেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে সমস্যাটি ধামাচাপা দিয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন।

২. **ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু সমস্যা :** নরওয়ের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াগলান্দ কর্তৃক শান্তি প্রস্তাবের মতে, ইসরাইলে ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু বিষয় সমস্যা সমাধানের দাবি। তিনি মনে করেন, বিশ্বের প্রায় ১৫ লক্ষ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুকে ইসরায়েলে পুনর্বাসনের দাবিতে পিএলও যেভাবে অনড় রয়েছে, সেটাকে তিনি শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন। কারণ ইসরায়েল বরাবরই এই দাবির বিরোধিতা করেছে। ইসরায়েল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মেনে নেবে না। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে উদ্বাস্তু সমস্যাকে ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দ গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে ইসরায়েল উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের বিরোধী।

৩. **রাজনৈতিক গুরুত্ব :** মধ্যপ্রাচ্য ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তেলের প্রাচুর্যের কারণে বিশ্বরাজনীতিতে এই এলাকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুয়েজ খাল খননের

ফলে জলপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচলে ফিলিস্তিন অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ অঞ্চল এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার যোগসূত্র। এখান থেকে জল, স্থল ও আকাশথে স্বল্প দূরত্বে উক্ত তিন মহাদেশের সাথে যোগাযোগ করা যায়। এ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ, হরমুজ প্রণালী, বার-আল-মান্দের প্রণালী প্রভৃতি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ পথ রয়েছে। তাই এই অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলো উদগ্রীব। এই প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সংকট। মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বের ৭৬% জ্বালানি তেলের মজুদ; আর তেলের সুষ্ঠু সরবরাহের ওপর বিশ্ব-অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর শিল্পপ্রধান দেশসমূহ মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য দেশসমূহ তেলের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট এবং মিত্ররাষ্ট্র ইসরায়েলকে সর্বাত্মক সক্রিয় সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, যা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য অন্তরায় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রণ ভার বজায় থাকলে একদিকে যেমন বিশ্বের সকল এলাকা নিয়ন্ত্রণে থাকবে অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপরও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। তাই এই বিশাল রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকায় বিশ্বের পরাশক্তিগুলো চায় মধ্যপ্রাচ্যকে সব সময় অস্থিতিশীল রাখতে।

৪. **মার্কিন স্বার্থ :** অতীতের মতো বর্তমানেও মধ্যপ্রাচ্য শান্তির পথে মূল প্রতিবন্ধকতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের কারণে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরায়েলকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসরায়েলকে টিকিয়ে রাখা এবং সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মূলত এ অঞ্চলে একটি নিরাপত্তা রক্ষী তৈরি করেছে যে সর্বদা মার্কিন স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখবে। যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ তেল মজুদ থাকলেও দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে তেল ব্যবসায় নিয়োজিত। খনিজ তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট। মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন অস্ত্র ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। প্যালেস্টাইন সমস্যা বিলম্বিত করার মাধ্যমে আরব-ইসরায়েল বিরোধ অব্যাহত থাকলে তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলো ইসরায়েলের মোকাবেলায় প্রচুর অস্ত্র ক্রয় করবে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র একদিকে প্যালেস্টাইনে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা তৈরির লক্ষ্যে ইসরায়েলকে সমরাস্ত্র সরবাহ করছে অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অগণতান্ত্রিক দেশগুলোর নিকট অস্ত্র সরবরাহ করে উভয় পক্ষকে মুখোমুখি অবস্থানে রেখে মার্কিন স্বার্থ হাসিল করছে।

৫. **যুক্তরাষ্ট্র সরকারে ইহুদি লবির প্রভাব :** যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নে সরকারের ওপর সব সময় ইহুদি লবির এক বিশাল প্রভাব বিরাজমান। মার্কিন প্রশাসন, সামরিক ও শিল্পক্ষেত্রে ধনাঢ্য ইহুদি লবির প্রভাব বিস্তারের কারণে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি-প্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত ক্লিনটন সরকারের শেষের দিকে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি-প্রক্রিয়া বেশ আশার আলো জ্বালিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বুশ প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে কট্টর মার্কিন নীতির প্রতিফলন ঘটে। তার পেছনে ছিল বুশ প্রশাসনের প্রভাবশালী ইহুদি কর্তাদের প্রভাব। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে যদিও সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত দিয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

৬. **হামাস ও ফাতাহর ইন্তিফাদা আন্দোলন :** ইসরায়েলের দখলদারিত্বের ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের জঙ্গি গ্রুপের আন্দোলনকে ইন্তিফাদা আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে ফাতাহ ও হামাস। ফিলিস্তিন শান্তি-প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার এই হামাস এবং ফাতাহর সশস্ত্র আন্দোলনকে দায়ী করছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে অস্ত্র বিরতির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বহু আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়া হলেও তাতে কোনো সফলতা আসেনি। তার পেছনেও এই ইন্তিফাদাকে দায়ী করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি-প্রক্রিয়া চলাকালে ইসরায়েলি সৈন্যদের হাতে নিরপরাধ ফিলিস্তিন নিহত হলে মার্কিন প্রশাসন চুপ থাকে অপরদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনরত জঙ্গি হামাস নেতারা তাদরে জনগণের হত্যার প্রতিশোধ নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে হামাসের কারণেই নাকি বারবার শান্তি-প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৭. **আরবদের অনৈক্য :** ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের একটি প্রধান বাধা হিসেবে আরবদের অনৈক্যকে দায়ী করা হয়। বারবার আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ হলেও কখনই আরবগণ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। এমনকি সর্বশেষ ইরাক যুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনে আরব রাষ্ট্রগুলো একত্র হতে ব্যর্থ হয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে একে অন্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারছে না। PLO এর আন্তবিরোধ এবং স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিন সংগঠনগুলোর অনৈক্যের কারণে ইসরায়েলবিরোধী কঠোর আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে জাতিগত দাঙ্গা, সিয়া-সুন্নি বিরোধ, উপজাতিগত সমস্যা, ধর্মীয় উগ্রপন্থী সংগঠন, নেতৃত্বের সংকট, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, যা মধ্যপ্রাচ্যকে একটি প্লাটফর্মে দাঁড় করাতে বাধা দিয়েছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি। সর্বোপরি নিজেদের স্বার্থে মার্কিন তোষণনীতি আরবদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেনি। আর এর ফলে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা আন্দোলন তেমন শক্তিশালী রূপ ধারণ করতে পারেনি।

৮. **জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা :** ফিলিস্তিনের অধিকার রক্ষায় বিগত দিনের জাতিসংঘের ভূমিকা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে পৌছেছিল ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের পর। কিন্তু জাতিসংঘ শান্তি রক্ষকের ভূমিকা লাভ করেছে ১৯৯১-এ। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ অবসানের পর ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এ কথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের পরিবর্তে বৃহৎ শক্তির নির্দেশ বা মধ্যস্থতাই প্রাধান্য পাচ্ছে। ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ পরিণত হয়েছে একটি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে এই বিষয়ে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগকেও প্রতিহত করতে পারেনি।

ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে সুপারিশসমূহ : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধান মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মধ্যপ্রাচ্যের এই অগ্নিগর্ভ সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হলো :

১. ঐতিহাসিক ভিত্তিকে গুরুত্ব প্রদান করে সর্বপ্রথম আল আকসা মসজিদের ও জেরুজালেমের কর্তৃত্ব বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে হবে।
২. ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক নীতির পরিবর্তন করে সমস্যা সমাধানে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩. জাতিসংঘের শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণসহ উভয় পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করতে হবে।
৪. ওআইসি ও আরব লীগকে ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে।
৫. পশ্চিমা বিশ্বসহ অন্যান্য পরাশক্তির অংশগ্রহণের জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে ও উভয় পক্ষকে তা মানতে বাধ্য করতে হবে।
৬. ফিলিস্তিন ও উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।
৭. ফিলিস্তিনিদের হামাস-ফাতাহ্ দ্বন্দ্ব দূরীভূত করতে হবে।
৮. ফিলিস্তিনে একটি গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
৯. ফিলিস্তিনের গেরিলা তৎপরতা ও ইসরায়েলিদের সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে ও
১০. উদ্ভূত সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কেবল আঞ্চলিক কোনো বিষয় নয়। ইসরাইল ক্ষুদ্র হলেও তার পিছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তি। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে ইসরাইলের প্রতি হামাস ও ফাতাহর মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। নয়তো সেই সরকারের সাথে তারা কাজ করবে না। এর আগে ইরানেও কট্টরপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর বৈরী মনোভাবের কারণে মুসলিম বিশ্ব নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আর এ অবস্থার পরিবর্তনের মূল দায়িত্ব তাদের। ফিলিস্তিন আগে যাই করেছে তা একটি রাজনৈতিক দল বা গ্রুপ হিসেবে, আর ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যা করবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে। তার মূল উদ্দেশ্যই হবে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা। সুতরাং আমরা মনে করি, যুক্তরাষ্ট্র বা পাশ্চাত্য দেশগুলো এখনই যদি হামাসের ব্যাপারে কঠিন মনোভাব গ্রহণ করে তাহলে শান্তি প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে এগুতে পারবে না। এ বিষয়টি ফিলিস্তিনকেও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই ফিলিস্তিন শান্তির মহাসড়ক সুপ্রশস্ত হবে।

১৩। ইউরো জোনের কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণ বর্ণনা করুন। কিভাবে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ১৯৯২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ম্যাসট্রিট চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তিতে দেশগুলোর ঘাটতি অর্থায়নে এবং ঋণের মাত্রার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ ছিল। কিন্তু ২০০০ সালের দিকে ইউরো জোনের কিছু দেশ এ সীমাবদ্ধতা মানতে ব্যর্থ হয় এবং তারা ঋণ ও ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত সরকারের রাজস্বের দিকে হাত বাড়ায়। গ্রিসে সরকারি খাতের উচ্চ বেতন-ভাতা এবং পেনশন চুক্তি এ ঋণ সংকটের সাথে জড়িত। তবে বিভিন্ন দেশে সংকটের কারণও ভিন্ন ভিন্ন। ইউরো জোনের আর্থিক ইউনিয়ন নীতি অর্থাৎ অভিন্ন মুদ্রা নীতি অথচ ভিন্ন রাজস্ব নীতিও (কর, সরকারি পেনশন) এ ঋণ সংকটের পেছনে দায়ী। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা দরকার।

ইউরো জোন সংকট কি : ইউরোপীয় সার্বভৌম ঋণ সংকট বা ইউরো জোন সংকট হচ্ছে ইউরো অঞ্চলের কয়েকটি দেশে, যেমন : গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, ইতালিতে চলমান অর্থনৈতিক সংকট— যে দেশগুলো তাদের সরকারি ঋণ তৃতীয় পক্ষের সহায়তা ছাড়া মেটাতে অক্ষম। ইউরো অঞ্চলের সংকট বেশ কয়েকটি জটিল কারণের দ্বারা সৃষ্ট যার মধ্যে রয়েছে অর্থের বিশ্বায়ন অর্থাৎ সহজ ঋণ ব্যবস্থা, যার ফলে ২০০২-২০০৮ সাল সময়ের মধ্যে ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ লেনদেন হয়েছে। এছাড়া ২০০৭-২০১২ সালব্যাপী বিশ্বের মন্দা, আবাসন খাতের প্রসার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈষম্য ইত্যাদি কারণ বিদ্যমান।

ইউরোপীয় সার্বভৌম ঋণ সংকটের কারণ : ইউরো জোনের সংকটের পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। তবে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিচে আলোচিত হলো :

১. **সরকারি ও বেসরকারি ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি :** একক মুদ্রা হিসেবে ইউরোর প্রচলন ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশকে স্বল্প সুদে অধিক ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এ সংকটের আগের বছরগুলোতে। যার ফলে, তুলনামূলকভাবে দুর্বল মুদ্রার দেশের ঋণগ্রহণকারীরা সুবিধাজনক শর্তে প্রচুর ঋণ পায়, যা সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কিছু দেশ যেমন আয়ারল্যান্ড ও স্পেনে স্বল্প সুদের ফলে আবাসিক ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে, যা অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। অনেক সমালোচক এটাকে ইউরোর সমস্যা বলেও অভিহিত করেছেন।

সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে– অনেক অর্থনীতিবিদ এ ধারণার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাদের মতে বৃহৎ ঋণ অব্যবস্থাপনার ফলেই এ সংকট তৈরি হয়েছে। ২০০৭ সালে ইউরো অঞ্চলে আর্থিক ঘাটতি ছিল মাত্র ০.৬% যা অর্থনৈতিক সংকটের সময় ৭% এ দাঁড়ায়। একই সময়ে ঐ অঞ্চলে সরকারের গড় ঋণ ৬৬% থেকে বেড়ে জিডিপির ৮৪% এসে পৌছায়।

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানের মতে গ্রিসই একমাত্র দেশ যার সংকটের কারণ আর্থিক দায়িত্বহীনতা। ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা রবার্ট সিডেস্কির মতে, মূলত ব্যাংকগুলোর অস্বাভাবিক ঋণ প্রদানের ফলেই এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে, ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের ফলে নয়।

২. **বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা :** ফিনান্সিয়াল টাইমসের সাংবাদিক মর্টিন ওলফ মন্তব্য করেছেন যে, এ সংকটের মূল কারণ বাণিজ্যে অসমতা। যখন থেকে এই সংকটের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল অর্থাৎ ১৯৯২-২০০৭ সাল পর্যন্ত জার্মানির একটা ভালো অবস্থান ছিল সরকারি ঋণ এবং ঘাটতির ক্ষেত্রে। অথচ ঐ একই সময়ে কয়েকটি দেশের যেমন– পর্তুগাল, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, স্পেনের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের অবস্থা খুবই নেতিবাচক ছিল, যেখানে ১৯৯৯ সালের পর থেকে জার্মানির বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত বাড়ছিল সেখানে ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল।

প্রচুর ক্যাপিটাল ইনফ্লো হবার ফলে কিছু দেশে সুদের হার কমে যায় এবং অর্থনীতি অযথা ফুলে উঠে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়িয়ে দেয়। কিছু সময়ের জন্য প্রচুর মূলধন বা পুঁজির সরবরাহ ঐসব দেশে সম্পদের মায়াচ্ছন্নতা তৈরি করে, সম্পদের দাম বাড়ে, মুদ্রামান শক্ত হয় এবং সবকিছু সুন্দর ও স্বাভাবিক লাগছিল। কিন্তু অচিরেই এই ঘোর কেটে গেল। সম্পত্তি বাষ্পের মতো উধাও হয়ে গেল কিন্তু এসব ঋণ রয়েই গেল।

৩. **ইউরো অঞ্চলের কাঠামোগত সমস্যা :** ইউরো তথা অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। এ অঞ্চলে মুদ্রা অভিন্ন হলেও রাজস্বনীতি, পেনশন এবং কোষাগার কার্যক্রম কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। ইউরো ব্যবস্থায় দেশগুলোর অভিন্ন মুদ্রা গ্রহণ করা দরকার, কিন্তু এটা বাস্তবায়নের জন্য তাদের নির্দিষ্ট কোনো কার্যকর প্রতিষ্ঠান নেই। তাই দেশগুলো তাদের ইচ্ছেমতো করনীতি ও পেনশন দিচ্ছে।

তাই যদিও এ দেশগুলো ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে এ সংক্রান্ত কতিপয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তথাপি তারা সহজেই এগুলোকে না করাটাকে পছন্দ করে। এর ফলে কিছু ফ্রি রাইডার তৈরি হয়েছে, যেমন গ্রিসের রাষ্ট্রাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ইউরোভুক্ত দেশগুলো কর্তৃক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করানো এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করানো এখন অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতি বিদ্যমান।

তদুপরি এখন পর্যন্ত ইউরোপে কোনো ব্যাংকিং ইউনিয়ন গড়ে উঠেনি যার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়। ব্যাংক ডিপোজিট ইন্সুরেন্স ব্যাংককে দেউলিয়া হতে বাধা প্রদান করে। রি-ক্যাপিল্যাইজেশনের মাধ্যমে দ্রুত অর্থ সরবরাহ করে তাৎক্ষণিক জরুরি দাবি-দাওয়া মেটানো সম্ভব। এ রকম ব্যবস্থা ২০০৮ সালে "Trouble Asset Relief Program" এর আওতায় গড়ে উঠেছিল। ইউরোপের অর্থনীতি খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ ছিল কিন্তু তা আবার অস্বাভাবিক স্বাধীন ছিল। এটা একটা মারাত্মক জটিল অবস্থা। এই ধরনের অবস্থা কয়েকটি দেশে থাকলে তারা আবার যদি অভিন্ন মুদ্রা ব্যবহার করে তাহলে যে সংকট ঘটবে এটাইতো স্বাভাবিক।

৪. **আর্থিক নীতির অনমনীয়তা :** ইউরো অঞ্চলে একটি একক আর্থিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার ফলে কোনো দেশ চাইলেই স্বাধীনভাবে এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না। বিশেষত তারা ইউরো তৈরি করতে পারে না যার দ্বারা তারা প্রয়োজনে দেনা পরিশোধ করবে এবং খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কমাবে। যেহেতু তারা একই মুদ্রা ব্যবহার করে তাদের বাণিজ্য অংশীদারের মতো তাই তারা মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি বাড়াতে পারে না, যার ফলে তাদের বাণিজ্য ভারসাম্য ভালো হতো এবং নমিনাল জিডিপি এবং কর রাজস্ব বাড়ত।

অন্যদিকে অবমূল্যায়নের ফলে সঞ্চয়কারীর সম্পদের ক্ষতি হয়। যেমন– ইউরোর ২৫% বিনিময় হার কমে যাওয়ায় এবং ৫ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায় ইউরোজোনের যে সকল বিনিয়োগকারী পাউন্ডে বিনিয়োগ করেছেন তারা তাদের পরিশোধে ৩০ শতাংশ কম মুদ্রা পেয়েছেন ২০১১ সালের শেষের দিকে।

৫. **বিশ্বাসের অভাব :** সংকট শুরুর আগেও ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ভেবেছিল সার্বভৌম ঋণ নিরাপদ। ব্যাংকে প্রচুর বন্ড ছিল গ্রিসের মতো দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর। এগুলোর প্রিমিয়ামও কম ছিল এবং নিরাপদ বলেও বিবেচিত হতো। যখন সংকট ঘনীভূত হতে লাগল, এটা তখন স্পষ্ট হলো যে গ্রিস এবং অন্যান্য দেশের বন্ডগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এর ফলে এ খাতে ব্যাপক ধস নামল।

তদুপরি বিনিয়োগকারীদের মনে সংকট দ্রুত অপসারিত হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ জাগল। যেহেতু ইউরোভুক্ত দেশগুলোর আর্থিক নীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ (ঋণ পরিশোধে টাকা ছাপাতে পারে না) তাই নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে তাদের সবাইকে মতৈক্যে পৌঁছতে হয়। ফেডারেল রিজার্ভের মতো ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মসংস্থানের ম্যান্ডেট নেই, শুধু মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত ম্যান্ডেট রয়েছে।

৬. **অভ্যন্তরীণ সমস্যা :** ২০১২-১৩ সালে বহু ইউরোপীয় দেশ মারাত্মক চাপে ছিল বিশেষ করে স্পেন। পুঁজি সরবরাহের সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, বিনিয়োগকারীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এবং ব্যাংকগুলোও একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

জুন ২০১২ এর দিকে ইউরোর বিনিময় হার আরো কমে, তখন গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, বিত্তবানরা তাদের সম্পদ ইউরো জোনের বাইরে পাচার করছে এবং ইউরো অঞ্চলে রাখলেও তা উত্তর ইউরোপীয় দেশে রাখছে। জুন ২০১১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ইতালি ও স্পেন যথাক্রমে ২৮৬ ও ২৩৫ বিলিয়ন ইউরো হারায়। ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো তাদের জিডিপির ১০% মূল্যের সম্পদ হারায়।

ইউরোপীয় সংকটের স্বরূপ

গ্রিস : ১০-১২ বছর আগেও গ্রিসের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ছিল যদিও কিছু অবকাঠামোগত সমস্যা ছিল। ২০০০ সালের পরে বৈশ্বিক মন্দার সময় গ্রিসের অর্থনীতি ব্যাপক মার খায় বিশেষ করে এর জাহাজ শিল্প এবং পর্যটন শিল্পে ধস নামে। সরকার আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ

করে। ২৩ এপ্রিল ২০১০ গ্রিসে সরকার ৪৫ বিলিয়ন ইউরো ঋণ সহায়তা প্রার্থনা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আইএমএফের কাছে। এর পরই ব্যাপক প্রতিবাদ ও সংঘর্ষ শুরু হতে থাকে। বর্তমানে দেশটির সরকারি ঋণ জিডিপির ১৭৭%।

আয়ারল্যান্ড : এ দেশের সংকট সরকারি ঋণের ফলে সৃষ্টি হয়নি বরং ছয়টি ব্যাংকের অবিবেচনাপ্রসূত ঋণ প্রদানের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আইরিশ ব্যাংকগুলো প্রায় ১০০ বিলিয়ন ইউরো হারায় যার অধিকাংশই আবাসন খাতের জন্য যা ২০০৭ সালে ধসে পড়ে। ২০০৮ সালে অর্থনীতিতেও ধস নামে। ২০১০ এ বেকারত্বের হার ১৪% এ পৌঁছায়। ২০০৭ সালে যেখানে বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল সেখানে ২০১০ সালে জিডিপির ৩২% বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়।

স্পেন : সংকটের পূর্বে স্পেন তুলনামূলকভাবে কম ঋণ ছিল। আবাসন খাতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমেই এ দেনা পরিশোধ করা হতো। আবাসন খাতে ধস নামার পর ব্যাংকগুলোকে টিকে থাকার জন্য প্রণোদনা দেয়া হয়। ব্যাংকগুলোর অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। অন্যদিকে অন্যান্য খাতেও প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে। ফলে সরকারের ঘাটতি বেড়ে যায়। ২০১৩ সালের শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক মন্দা ভয়াবহ ছিল। তার পর থেকে অর্থনীতির চাকা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেও বর্তমানে সেখানে বেকারের হার ২৩% বিরাজ করছে।

পর্তুগাল : আমেরিকান ও ইউরোপীয় সংকট দ্রুত পর্তুগালের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ে। এর সার্বভৌম বন্ড তার র‍্যাংকিং হারায়। সরকারের উপর চাপ বাড়ে। ২০১১ সালে সরকার ইইউ-আইএমএফের কাছে ৭৮ বিলিয়ন ইউরো বেইল আউট প্যাকেজ সাহায্য চায়। মন্দা থেকে উত্তরণ শুরু হলেও এখনো পর্তুগালের জিডিপির ১২৮.৭% হলো সরকারি ঋণ।

সাইপ্রাস : সেপ্টেম্বর ২০১১ সালের দিকে সাইপ্রাসের সার্বভৌম বন্ডও ব্যাপক মূল্য হারায়। অন্যদিকে রাজস্ব ও কাঠামোগত উন্নতিও ব্যাহত হয়। গ্রিসের ধস দ্বারা দেশটির অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির ক্রেডিট রেটিং এবং সরকারের তা পরিশোধে ব্যর্থতা দেশটির অর্থনীতিতে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সংকট উত্তরণে কতিপয় সুপারিশ

১. **ব্যাংকগুলোকে সরাসরি ঋণ প্রদান :** ২০১২ সালের ২৮ জুন ইউরো অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ সংকটাপন্ন ব্যাংকগুলোকে ইউরোপীয় স্ট্যাবিলিটি মেকানিজমের (ইএসএম) মাধ্যমে সরাসরি ঋণ প্রদানে একমত হন, যার ফলে তাদেরকে আর ঐ অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ নিতে হবে না এবং এতে তাদের সার্বভৌম ঋণ বাড়বে না। তবে এটি ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিকল্পনার সাথে জড়িত। ইতোমধ্যেই ইতালি এবং স্পেনে এই সংস্কার কার্যক্রমের সুফল পাওয়া গেছে। তাই এটি আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

২. **সঠিক বিনিয়োগে শিথিলতা :** এই সংকট থেকে উত্তরণ পেতে ঐ অঞ্চলের দেশগুলো বিনিয়োগ ক্ষেত্রে যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে সেগুলো শিথিল করা প্রয়োজন। গ্রিস এবং স্পেনে এখন মুদ্রাসংকোচন নীতি কার্যকর রয়েছে, যা কেবল দেশগুলোর মন্দা দীর্ঘায়িতই করবে। আইএমএফের এক প্রতিবেদেন দেখা যায় যে সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি প্রবৃদ্ধির পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। প্রতিবেদনে বলা হয়– আর্থিক কঠোরতার নীতি যেমন কর বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন অর্থনীতিতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে, অন্যদিকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানকারী দেশ জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তুলনামূলকভাবে ভালো করছে।

৩. **বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন :** সংকটাপন্ন দেশগুলোর উচিত তাদের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় বেশি দক্ষতা অর্জন। এর ফলে দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে এবং বাণিজ্য শর্ত (টার্মস অব ট্রেড) উন্নতি লাভ করবে। ইউরোপীয় দেশগুলো তিন ধরনের চাপের মুখোমুখি হয়– জনতাত্ত্বিক (বেশি বয়স্ক লোক), প্রযুক্তি (কম লোক দ্বারা বেশি কাজ সম্ভব) এবং বিশ্বায়ন (যার ফলে সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং বিশ্বের যে কোনো স্থানে স্বল্প সময়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে)। মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে এই বাণিজ্য সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব কিন্তু ইউরো জোনের দেশগুলোতে অভিন্ন মুদ্রা হওয়ায় তা সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে অন্যান্য অপশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

৪. **অভ্যন্তরীণ অবমূল্যায়ন :** অভ্যন্তরীণ অবমূল্যায়নের মাধ্যমে ইউনিট লেবার খরচ কমিয়ে জার্মানি তুলনামূলক দাম/মজুরি এর ১৬ শতাংশ কমিয়ে এনেছে। গ্রিস এবং ইতালিতেও এই পদ্ধতি ফল দিচ্ছে।

৫. **রাজস্ব অবমূল্যায়ন :** আরেকটি অপশন হচ্ছে রাজস্ব অবমূল্যায়ন। এক্ষেত্রে করপোরেট কর কমিয়ে মূল্য সংযোজন কর এবং পরিবেশ দূষণকারী খাতে কর বাড়ানো যেতে পারে। জার্মানি ও পর্তুগাল ইতোমধ্যে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

৬. **চলতি হিসাবের ঘাটতি কমানো :** এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থিতিশীলতা ছড়িয়ে যেতে পারে।

৭. **ঋণ আবর্তন :** ২০১২ সালে স্পেন ও ইতালির ঋণ ক্রয়ের জন্য কিছু প্রস্তাব করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবগুলো দেশ মিলে একটি পরিকল্পনায় পৌঁছতে হবে।

৮. **ইউরোপীয়ান রাজস্ব ইউনিয়ন :** আর্থিক নীতির মতো রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রেও ইউরোপের দেশগুলোকে একক হতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আবশ্যক।

৯. **ব্যাংক সহায়ক প্রতিষ্ঠান :** ইউরো অঞ্চলের ব্যাংকগুলোকে দেউলিয়াত্বের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাংক রিকভারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষের দরকার রয়েছে। তবে ৬ জুন ২০১২ এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ইউরোপীয় কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

১০. **ইউরোবন্ডস :** এ সংকট উত্তরণে ইউরোবন্ড কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ইউরোপীয় কমিশনের মতে এ বন্ড ১৭ ইউরো জাতি কর্তৃকই ইস্যু করা হবে যা স্থিতিশীলতা বন্ড হিসেবে এ সংকট প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

১১. **ইউরোপীয় মনিটরিং ফান্ড :** এর মাধ্যমে সংকটাপন্ন দেশগুলো ঋণগ্রহণ করতে পারে। এটি কেবল এ ধরনের সংকটের সময়ই কাজ করবে। এটি এক্ষেত্রে বন্ডও ইস্যু করতে পারবে।

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। তা না হলে এ সংকট বিশ্বব্যাপী ছড়াতে পারে। করনীতি, বাজারনীতি ইত্যাদি সংশোধন করা দরকার। ব্যাংকগুলো রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। ইউরো জোন ভেঙ্গেও যেতে পারে। এ ব্যাপারে ইউরো জোনের দেশগুলোকে একমত হতে হবে যে তারা রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যথাযথ স্থানে রাখবে।

৩৫তম বিসিএস



মডেল প্রশ্ন

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

মডেল প্রশ্ন-০১
মডেল প্রশ্ন-০২
মডেল প্রশ্ন-০৩
মডেল প্রশ্ন-০৪
মডেল প্রশ্ন-০৫

মডেল প্রশ্ন

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

মডেল প্রশ্ন ০১

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[বি. দ্র. *প্রার্থীদেরকে অবশ্যই ১নং ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং ২নং থেকে ৫নং প্রশ্নের মধ্য থেকে যে কোনো ৩টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. **টীকা লিখুন : (যে কোনো ১০টি)** **১০ × ৪ = ৪০**

ক. আন্তর্জাতিক রাজনীতি
খ. ওপেক (OPEC)
গ. হামাস
ঘ. 'পঞ্চশীল'
ঙ. ভূ-রাজনীতি
চ. বিশ্বায়ন (Globalization)
ছ. সাম্রাজ্যবাদ
জ. প্রতিরোধ কূটনীতি
ঝ. ডোমিনো থিউরি
ঞ. জিএসপি (GSP)
ট. আঞ্চলিকতাবাদ
ঠ. WTO

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩০, ৯৬, ২০০, ৯৩, ১৯৭, ২৫৯, ২৬৩, ২৯৫, ২৯৭, ৩৭৫, ৩৭৯, ৩৭৭।

বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন **৩ × ১৫ = ৪৫**

২. ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝেন? ৫
খ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন। ৫
গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। ৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২।

৩. স্নায়ুযুদ্ধ কি? স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫।

৪. দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট রয়েছে। এ সঙ্কট নিরসনে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো ভূমিকা আছে কি? আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৫৮।

৫. 'ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি' দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক প্রতিযোগিতা কোন দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৭০।

সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন ১ × ১৫ = ১৫

৬. আইএস কিভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ? আইএস-এর কবল থেকে বিশ্বকে নিরাপদ রাখতে করণীয় বিষয় কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ১৫
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৫৮।

মডেল প্রশ্ন ০২ সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[বি. দ্র. *প্রার্থীদেরকে অবশ্যই ১নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং ২নং থেকে ৫নং প্রশ্নের মধ্য থেকে যে কোনো ৩টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. **টীকা লিখুন : (যে কোনো ১০টি) :** ১০ × ৪ = ৪০
ক. চতুর্থ বিশ্ব
খ. এফবিআই (FBI)
গ. বাফার জোন
ঘ. জাতীয়তাবাদ
ঙ. রিও + ২০ সম্মেলন
চ. AIIB : চীনের বিশ্বব্যাংক
ছ. গ্রিনপিস
জ. সাধারণ পরিষদ
ঝ. সিডো
ঞ. আফিম যুদ্ধ
ট. বাস্তিল দুর্গ
ঠ. CPA
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৪, ২০৬, ২০৭, ২৬২, ৪১২, ৩৭৭, ৪১৬, ৪৮৩, ৪৯২, ৫৬২, ৫৬৭, ৯৪।

বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন ৩ × ১৫ = ৪৫

২. সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৪।

৩. স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এসব দেশের অবস্থান তুলে ধরুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৯।

৪. বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলতে পারে— সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮০৪।

৫. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান পানি বণ্টন সমস্যার উপর আলোচনা করুন। পানি বণ্টন ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪৫।

সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন ১ × ১৫ = ১৫

৬. বিশ্বের ভয়াবহ কয়েকটি ভূমিকম্পের পরিচয় প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভূমিকম্পের আশঙ্কা চিহ্নিত করুন। ভূমিকম্পে করণীয় বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনামূলক মতামত দিন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৭৫।

মডেল প্রশ্ন ০৩ সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[বি. দ্র. *প্রার্থীদেরকে অবশ্যই ১নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং ২নং থেকে ৫নং প্রশ্নের মধ্য থেকে যে কোনো ৩টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. **টীকা (যে কোনো ১০টি) :** ১০ × ৪ = ৪০
ক. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
খ. শান্তি রক্ষা কার্যক্রম বিভাগ
গ. শিল্প বিপ্লব
ঘ. রুশ বিপ্লব
ঙ. আনজুস (ANZUS)
চ. ন্যাটো (NATO)
ছ. এপেক (APEC)
জ. ফাতাহ
ঝ. সিমলা চুক্তি
ঞ. টিফফা
ট. সিরিয়া সংকট
ঠ. ভূ-রাজনীতি
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৮৬, ৪৮৯, ৫৬৪, ৫৬৪, ৫৬৮, ৬৬৫, ৬৬২, ৭২৮, ৮০১, ৮৫২, ৭১৫, ১৯৭।

বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন ৩ × ১৫ = ৪৫

২. যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে রাজনৈতিক ও সামরিক উপাদান কি ভূমিকা পালন করে?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫০৫।

৩. WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সম্পর্কে কি জানেন? WTO সম্পর্কে উন্নত ও স্বল্পোন্নত বিশ্বের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৯৩।

৪. কূটনীতির গুরুত্ব ও কার্যাবলি আলোচনাপূর্বক কূটনীতিবিদদের ভূমিকা আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৮১।

৫. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রকৃতি ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এর প্রতিকারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন বলে আপনি মনে করেন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩০০।

সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন ১ × ১৫ = ১৫

৬. বৈশ্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অস্ত্র বাণিজ্য এবং বিশ্বকে অস্ত্রের ঝনঝনানিমুক্ত করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৬৩।

মডেল প্রশ্ন ০৪ সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[বি.দ্র. *প্রার্থীদেরকে অবশ্যই ১নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং ২নং থেকে ৫নং প্রশ্নের মধ্য থেকে যে কোনো ৩টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. **সংক্ষিপ্ত ধারণামূলক প্রশ্ন : (যে কোনো ১০টি) :** ১০ × ৪ = ৪০

ক. জেনেভা কনভেনশন কি? এর মূল উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৬২।

খ. জাতিসংঘের প্রথম ও বর্তমান মহাসচিবের নাম কি এবং তারা কোন দেশের অধিবাসী?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৬৩।

গ. সংক্ষেপে চীনের পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখ করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৪৩।

ঘ. ভারতে মুক্তবাজার অর্থনীতির জনক কে?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৪৩।

ঙ. 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট' বলতে কি বোঝেন?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৯৮।

চ. কিয়োটো প্রটোকল কোন ধরনের চুক্তি এবং এর মূল উদ্দেশ্য কি?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৯৮।

ছ. G-77 বলতে কি বোঝায়? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৯৮।

জ. ন্যাটো কি? ন্যাটোর (NATO) বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৫২।

ঝ. 'গ্রিনলাইন' কি
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭১২।

ঞ. কার্টেল (Cartel) কি?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৭৩।

ট. টিপাইমুখ বাঁধ এবং বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৯৬।

ঠ. গোল্ডেন ওয়েজ, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলতে কি বোঝায়?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৯৬।

বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন ৩ × ১৫ = ৪৫

২. ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক গঠনে কিভাবে প্রভাবিত করছে—আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১০৯।

৩. বিশ্বায়নের এ যুগে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিষয়টি তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না—ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৭।

৪. 'বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।' আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৭০।

৫. তিন দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে সার্কের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬২৪।

সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন ১ × ১৫ = ১৫

৬. পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র সমতলের নিকটবর্তী ও অনুন্নত দেশগুলোতে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সমাধান হিসেবে কি কি করা যেতে পারে?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৭০।

মডেল প্রশ্ন ০৫ সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[বি.দ্র. *প্রার্থীদেরকে অবশ্যই ১নং ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং ২নং থেকে ৫নং প্রশ্নের মধ্য থেকে যে কোনো ৩টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. **সংক্ষিপ্ত ধারণামূলক প্রশ্ন : (যে কোনো ১০টি)** ১০ × ৪ = ৪০

ক. বাফার স্টেট (Buffer State) কি?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৯।

খ. আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়নে ক্রীড়াতত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৯।

গ. ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র কি?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৯১।